শ্রীশ্রীভক্তমালগ্রন্থ



শ্রীশ্রী ভক্তমাল গ্রন্থ

ও

সাধক মহাপুরুষদের জীবন কথা

['সাধক-জীবনকথা' পর্ব পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত]

(বিবিধ পাঠান্তর সংবলিত)

শ্রীলালদাস বাবাজী দ্বারা পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে বিরচিত

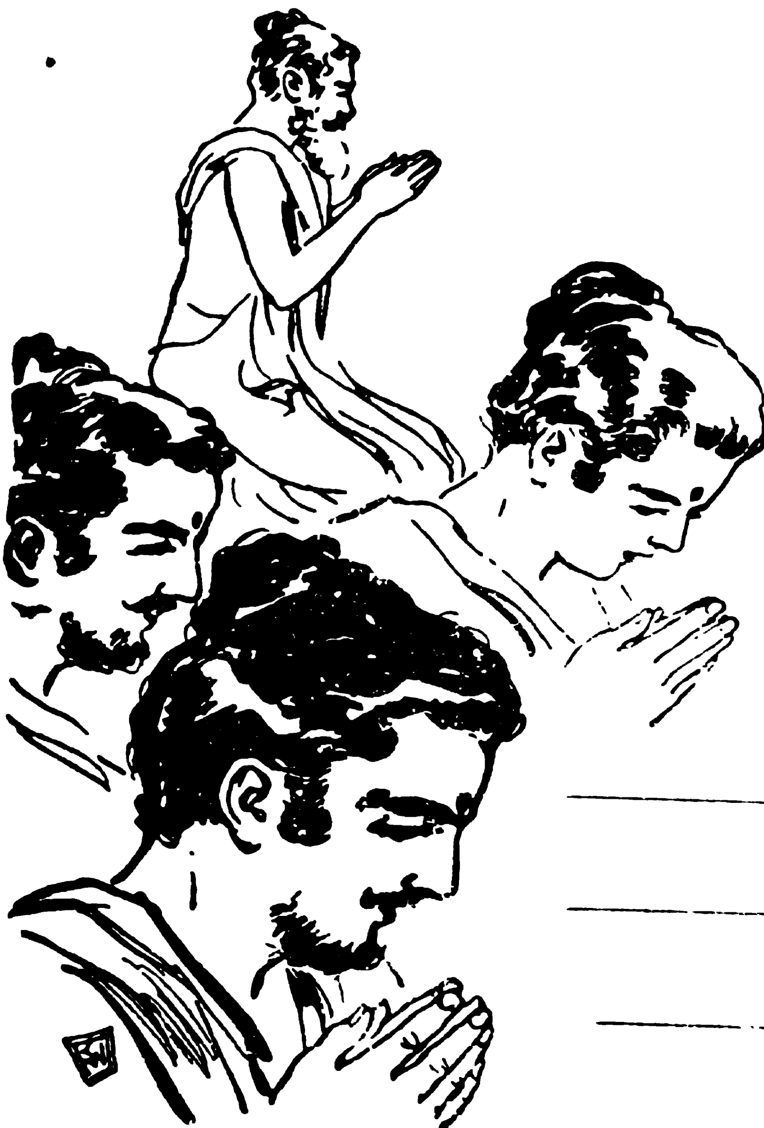
(সংশয় নিরসনার্থ স্থানে স্থানে প্রমাণ-প্রয়োগ সংবলিত)

কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীশ্রীচণ্ডী,
গীতা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, রামকৃষ্ণ উপদেশামৃত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের সম্পাদক

সুবোধচন্দ্র মজুমদার

সম্পাদিত

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড



উপহার

ভক্তমাল গ্রন্থ প্রসঙ্গে

ভক্তমাল বৈষ্ণবদের একখানি ধর্মগ্রন্থ। প্রায় সকল শাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থের সহিত সংশ্লিষ্ট চারিটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু থাকে—বিষয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ এবং অধিকারী। এই চারিটিকে বলে অনুবন্ধ চতুষ্টয়। তুঃ—

"অধিকারী চ বিষয়ঃ সম্বন্ধশ্চ প্রয়োজনম্।
শাস্ত্রারম্ভফলং প্রাহুরনুবন্ধচতুষ্টয়ম্॥"

গ্রন্থটির আলোচ্য বস্তু বা প্রতিপাদ্য বিষয়, গ্রন্থের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য, গ্রন্থের আলোচ্য বস্তুর সঙ্গে উদ্দেশ্যের সম্বন্ধ বা সংগতি এবং উক্ত গ্রন্থপাঠের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি—এই কয়টি বিষয় মনোমধ্যে রাখিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনা করিলেই তাহা সার্থক হয়।

এই ভক্তমাল গ্রন্থটির নামের ভিতর দিয়াই ইহার আলোচ্য বিষয় সূচিত হইতেছে। ভক্তদের মালা অর্থাৎ সমূহ যাহাতে, অর্থাৎ যে গ্রন্থে অসংখ্য ভক্তের বিচিত্র জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে—ইহাই ভক্তমাল গ্রন্থের নামগত অর্থ। এই গ্রন্থে বৈষ্ণব ভক্তদের চরিত এবং প্রসংগক্রমে বৈষ্ণবের কর্তব্য, অকর্তব্য, ভক্তির লক্ষণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস এবং শ্রীবৃন্দাবন ধামের বর্ণনা ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি ও ভক্তদের প্রতি আকর্ষণের সঞ্চার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। যাঁহার মন সাধন ভজন কীর্তন ইত্যাদি দ্বারা মার্জিত হইয়াছে এবং কুতর্ক কুযুক্তি ইত্যাদির পাশ ছিন্ন করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছে তিনিই এই গ্রন্থপাঠের অধিকারী বা অভিপ্রেত যোগ্য ব্যক্তি।

ভক্তমাল গ্রন্থে ভক্তিধর্মেরই প্রাধান্য বিবৃত হইয়াছে, জ্ঞানের নহে। সাধনমার্গে ভক্তি ও জ্ঞান এই দুইটির মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য রহিয়াছে। ভক্তি হৃদয়ের ধর্ম, হৃদয়ের আবেগ ও উচ্ছ্বাস হইতে ইহার উদ্ভব আর জ্ঞান হইল মনের ধর্ম যুক্তিতর্ক বিচার ইত্যাদি ইহার প্রধান অবলম্বন। ভক্ত তাহার হৃদয়ের আকুলতার দ্বারা তাহার প্রিয় শ্রীভগবানকে পাইতে চায়, আর জ্ঞানী চায় নিরাকার, নির্গুণ, নিরুপাধিক ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে। ভক্ত বলে, "তুমি সুন্দর তাই তোমার বিশ্ব সুন্দর শোভাময়", আর জ্ঞানী বলে, "ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, সেই ব্রহ্ম মনের অগোচর, বাক্যের অগোচর—মনে তাঁহাকে ধারণা করা যায় না, বাক্যে তাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং এইদিক দিয়া জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর বিরোধী।"

যুক্তিবাদী বিচার দ্বারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে অনেক কথা জানিলেও মর্মে মর্মে প্রায়শঃ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহার ব্রহ্মজ্ঞান শুধু পুস্তকগত বা গুরুমুখগতই থাকিয়া যায়। কিন্তু ভক্ত কোনরূপ যুক্তিতর্ক বিচারের ধার ধারে না, সরল বিশ্বাসে গুরুর উপদেশ অনুযায়ী শ্রীভগবানের ভজনা করে। ভগবান্‌কে না পাইলেও তাঁহার জন্য যে নিষ্ঠা ও আকুলতা জন্মে সেইটুকুই তাহার লাভ। ভক্তমাল গ্রন্থ এইরূপ ভক্তদের জন্যই বিরচিত। সেই জন্যই ইহাতে ভক্তদের নানারূপ অলৌকিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে তাহাদের মন ভক্তির পথে সবলে আকৃষ্ট হয়। জড়বাদীর নিকট যাহা অবিশ্বাস্য, ভক্তের নিকট তাহাই ভক্তিরসের উদ্দীপক। সুতরাং ভক্তের নিকটই ভক্তমাল গ্রন্থের সার্থকতা, অপরের নিকট নহে।

শ্রীচৈতন্যদেব করুণা করিয়া কলিতে আবির্ভূত হইলেন, জগতে শৃঙ্গার রস বিশিষ্ট ভক্তিরস প্রচারের জন্য। ইহার তাৎপর্য হইল এই যে শ্রীভগবান্‌কে আমরা শুধু ভক্তি করিব না, তাঁহাকে অতি আপন জন করিয়া লইয়া ভালবাসিব—জগতের যতগুলি প্রীতির সম্বন্ধ আছে, নিজের অধিকার অনুযায়ী সেই সেই সম্বন্ধ তাঁহার সঙ্গে স্থাপন করিব। শান্ত সমাহিত ভাবে তাঁহাকে ভালবাসিব, তাঁহাকে প্রভু মনে করিয়া অনুগত ভৃত্যের মত ভালবাসিব, সখা মনে করিয়া হৃদয় বিনিময় করিব, সন্তান ভাবিয়া স্নেহ করিব অথবা প্রিয়তম মনে করিয়া মনপ্রাণ দেহ দিয়া তাঁহার সেবা করিব, তাঁহার সঙ্গে আনন্দ করিব, মান অভিমান, তাড়ন, ভর্ৎসন ইত্যাদিও করিব। এই পাঁচটি ভাবের নাম শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর বা শৃঙ্গার রস সব রসের শ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্যদেব রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া সেই উজ্জ্বল বা মধুর রস নিজের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিলেন, এবং জগদ্‌বাসীকে তাহার পথ দেখাইলেন। এই যে শৃঙ্গার রস বা আনন্দ রস তাহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্ স্বয়ং আস্বাদন করিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা এই দুই বিগ্রহে বিভক্ত হইয়া। সখী ভাবাবিষ্ট ভক্ত তাঁহার প্রিয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন, বিচ্ছেদ, মান, প্রণয়, কলহ ইত্যাদি ঘটাইয়া অর্থাৎ অন্তরে উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ ও পরমার্থ লাভ করিয়া থাকেন। মায়াময় জগতের অনিত্য সুখসম্ভোগ আর তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না।

ভক্তপ্রবর নাভাজী এবং তাঁহারই অনুসরণে শ্রীলালদাস শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই লীলারস এই গ্রন্থে সরলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, কোনরূপ তত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হন না। তত্ত্ববিচার হয় পরের সঙ্গে বা বহিরঙ্গ জনের সঙ্গে, আত্মজনের কাছে বা শ্রদ্ধাশীল ভক্তের কাছে তাহার প্রয়োজন হয় না। এই সরলতার জন্যই ভক্তমাল গ্রন্থ বৈষ্ণব সাধকদের পরম আদরের বস্তু এবং তাহাদের সাধনপথের দীপবর্তিকা। সুতরাং শ্রীনাভাজী ও তদনুগামী শ্রীলালদাসের ভক্তমাল গ্রন্থবিরচন সর্বতোভাবে সার্থক।

নিবেদন

ভক্তমাল গ্রন্থ শেষ হওয়ার পর আমরা একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিলাম। কেন করিলাম তাহারও একটি কারণ আছে।

ভক্ত পাঠকগণ ভক্তমাল গ্রন্থে অনেক সাধক পুরুষদের জীবনকাহিনী পাঠ করিবেন। কিন্তু সব পাঠক সেই রস পুরাপুরি আস্বাদন করিতে পারিবেন কিনা তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। কারণ ভক্তমাল গ্রন্থ প্রাচীন ভাষায় পয়ার ছন্দে রচিত। উহার অনেক শব্দের সংগেই বর্তমানকালের পাঠকদের পরিচয় নাই। কাজেই আমরা সহজ সরল গদ্য ভাষায় একশত সাধক মহাপুরুষের জীবনকথা ইহাতে সন্নিবেশ করিয়াছি। তাহা পাঠ করিয়া সেইসব মহাপুরুষদের জীবনের আদর্শ ও গুণাবলী সকলেই বুঝিতে সক্ষম হইবেন এবং ভক্তমাল গ্রন্থ পাঠ করিবার আগ্রহ সকলের বাড়িবে বলিয়াই মনে করি।

এই অধ্যায়ে আমরা শুধু বৈষ্ণব ভক্তদের জীবনী সংযোজন করি নাই, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রাচীন ও আধুনিক সাধক মহাপুরুষদের পুণ্য জীবনকথা সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছি।

এই 'সাধক-জীবনকথা' অধ্যায়টি আমাদের পরম সুহৃদ রহড়া ব্রহ্মানন্দ পি-জি-বি-টি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হইল।

বর্তমান যুগ ধর্মসমন্বয়ের যুগ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিরোধ তাহা আজ ভুলিতে হইবে। জগতে বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন মানুষের মধ্যে সকল বিরোধ দূর করিয়া প্রেম ও ভালবাসা প্রচার করিতে। প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মের সারমর্ম এবং মূল লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ, জীবপ্রেম এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা। সেই মহান্ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা নানা সম্প্রদায়ের ভক্ত সাধকদের জীবনকথা ইহাতে সন্নিবেশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

এই জীবনী আহরণ করিতে গিয়া অনেক প্রাচীন ও বর্তমান গ্রন্থ তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিতে হইয়াছে। আরও অসংখ্য ভক্ত মহাপুরুষদের জীবনকথা নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। পাঠকদের যদি আগ্রহ জাগে তবে পরে ঐগুলিও দিবার ইচ্ছা রহিল।

আমাদের যদি কোন ত্রুটি ঘটিয়া থাকে তবে আশা করি ভক্ত পাঠকগণ নিজগুণে মার্জনা করিবেন। ইতি—

প্রকাশক

সূচীপত্র

চতুর্ব্বিংশ মালা

পঞ্চবিংশ মালা

সাধক-জীবনকথা

———





শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তি

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ

প্রথম মালা

গুর্ব্বাদিবন্দন ও মঙ্গলাচরণ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

অনুবাদ।—শ্রীগুরুদেবের শ্রীসম্পন্ন চরণকমল আমি বন্দনা **করিতেছি**; [illegible] অর্থাৎ শ্রীসনাতনের সহিত শ্রীরূপ এবং সঙ্গিগণ-সমন্বিত **শ্রীরঘুনাথ** [illegible] প্রভৃতি বৈষ্ণব গুরুদিগকে বন্দনা করিতেছি; শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ [illegible] এবং পরিজন-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা **করিতেছি**, এবং [illegible] সহ শ্রীললিতা-বিশাখা প্রভৃতি-সমন্বিত **শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ**-[illegible] আমি বন্দনা করিতেছি।

[illegible] মুরারে-
[illegible] সাধয়েৎ কোঽপি ভদ্রম্।
[illegible] সিন্ধোঃ,
[illegible] বোধাম্ভো নমস্যাম্॥

অনুবাদ [illegible] শ্রবণ, মনন, সংকীর্ত্তন [illegible] পুরুষার্থরূপ কল্যাণ [illegible] কিন্তু অপার প্রেমামৃত-[illegible] অচিন্তনীয় রসবহস্য [illegible]

[illegible] চতুষ্টয়াশা,
[illegible] বিধায় হরেরুপাসাম্।
[illegible] তু,
[illegible] শরণং করোমি॥

অনুবাদ [illegible] মোক্ষ এই পুরুষার্থ [illegible] দ্বারা জগদীশ্বরের ভজনা [illegible] শ্রীহরির উপাসনা করিয়া তাঁহার **দাস হউন**; কিন্তু আমি শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে **শরণ লইতেছি, কারণ** আমার বুদ্ধি রহস্যপদে কিঞ্চিন্মাত্র **লুব্ধ হইয়াছে।**

হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ।
দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ॥

অনুবাদ—যাঁহারা হরিভক্তিপরায়ণ এবং **হরিনামপরায়ণ** তাঁহারা দুর্ব্বৃত্ত বা সদাচারী **যাই হউন, সর্ব্বদা** তাঁহাদিগকে নমস্কার করি।

ভগবদ্ভক্তপাদাব্জপাদুকাভ্যো নমোঽস্তু মে।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চাখিলসত্তমম্॥

অনুবাদ ভগবদ্ভক্তের চরণকমলের পাদুকাকে নমস্কার, যে পাদুকার **সঙ্গলাভ অশেষ কল্যাণজনক সাধন** ও সাধ্য।

শ্রীগুরুচরণ বন্দ, অভয় পরমানন্দ,
ভুক্তি-মুক্তি-ভক্তি-সিদ্ধিদাতা।
আলম্বন উদ্দীপন,[১] ত্রিজগত-রসায়ন,
স্বয়ং কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রেমদাতা॥
সাধুগণের আরাধ্য, সিদ্ধমধ্যে স্বতঃসিদ্ধ,
উপাস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।
দাতা-মধ্যে শ্রেষ্ঠধন, প্রেমভক্তি বিতরণ,
করিয়া করয়ে আত্মসম॥
পঞ্চম পুরুষার্থ[২] সনে, চতুর্ব্বর্গ চেড়ীগণে,
আর সাধ্য জ্ঞানযোগ আদি।
বেঢ়ি যেন দ্বিজরাজে, তারা অগণন সাজে,
মণিহার মধ্যে পদ্মনিধি॥
ভক্তাবেশ অবতারী,[৩] চৈতন্যরূপে অবতরি,
করে জীবগণের নিস্তার।
প্রেমভক্তি দান করি, সাক্ষাৎ চৈতন্য হরি,
করুণায় দয়ার সাগর॥
মোরে কৃপাবান্ লহ, শ্রীচরণ শিরে দেহ,
করুণা-কটাক্ষ দৃষ্টি করি।
বহুদুঃখে তোমা ধন, পাইনু যে করি পণ,
দেখ প্রভু অন্তরে বিচারি॥
লোক ধর্ম্ম অভিলাষ, বন্ধুবান্ধবের আশ,
ছাড়িয়া পাইয়া কদর্থনা।[৪]
তোমা হেন গুণধাম, নারায়ণ অভিরাম,
আঁচলে বান্ধিয়া দিলা সোণা॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত।
কলিযুগপাবন অদ্ভুত সুচরিত॥
শরণ্য শরণাগতবৎসল দয়াময়।
তিন রূপ এক আত্মা সর্ব্বগুণালয়॥

অঞ্জলি মস্তকে দন্তে তৃণগুচ্ছ ধরি।
একান্ত ভাবেতে বন্দোঁ চরণ-মাধুরী॥
হে নাথ হে দীনবন্ধো করুণাসাগর।
পূরাও মনের আশা শরণ তোমার॥
শুনি মালীরূপে প্রেমফল বিলাইলে।
আমার জঠর জ্বলে মোরে কি করিলে॥
জগাই মাধাই মহাপাপী উদ্ধারিলে।
আমার উপায় প্রভু তবে কি করিলে॥
প্রতিজ্ঞা করিলে ত্রিভুবনের নিস্তার।
তবে কেন হে নাথ এ দুর্গতি আমার॥
সত্য সংকল্প তব সাধুলোকে গায়।
আমার দুর্দ্দৈব তাহা কিছু না কুলায়॥
হে নাথ হে প্রভো হে হে অগতির গতি।
একবার কৃপাদৃষ্টি কর দীন-প্রতি॥
যে ফল বিলাইলে জগতেরে মালী হঞা।
সেই ফল কিছু দেহ মোর মুখ চাঞা॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করোঁ চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেরিত যে জগতে আচার্য্য।
বৈষ্ণব-আখ্যান-পথে সকলের আর্য্য॥
প্রেমভক্তি-রসের যে পথ-প্রদর্শক।
সর্ব্বশাস্ত্র মথি শুদ্ধমাধুর্য্য-স্থাপক॥
নানা গ্রন্থ প্রকাশিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপিল।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি প্রকাশ হইল॥
সে সব সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র-সাগরের নীরে।
অবগাহি জগতের জুড়াইল শরীরে॥
স্বরূপ-দামোদর আদি অগ্রবন্দনীয়
প্রভুসঙ্গে সদা স্থিতি অতি রমণীয়॥
গৌরাঙ্গভকত বন্দোঁ অনন্ত অপার।
বিশেষে শ্রীশ্রীনিবাস আশ্রয় আমার॥
তাঁর পদদ্বন্দ্ব বন্দোঁ লোটাঞা ধরণী।
চৈতন্যের আবেশাবতারে যাঁরে গণি॥
যমুনায় জলক্রীড়ায় কুণ্ডল পড়িলা।
যেই খুঁজি প্যারিজীর কর্ণে পরাইলা॥

১। রসের বিষয় ও আশ্রয়ের নাম আলম্বন, আর যাহা দ্বারা রস উদ্দীপিত হয় তাহা উদ্দীপন। মধুর রসের আশ্রয় শ্রীরাধা, বিষয় শ্রীকৃষ্ণ এবং বংশীধ্বনি প্রভৃতি উদ্দীপন। শ্রীচৈতন্যদেব একাধারেই সব।

২। কৃষ্ণপ্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ।

৩। যাঁহার বিভিন্ন অবতার হন তিনিই অবতারী অর্থাৎ অবতারের মূল।

৪। কদর্থনা -বিড়ম্বনা, পীড়ন।

অনেক তারিলা তেঁহো কহিতে না জানি।
যাঁর পরিবার[১] প্রিয়াদাস গুণখনি॥
বন্দো শ্রীঅগরদাস যাঁর শিষ্য নাভা।
তেঁহো কৈলা ভক্তমাল সজ্জনের লোভা॥
চারিযুগের ভাগবতগণের চরিত্র।
ভক্তমাল গ্রন্থ কৈলা পরম পবিত্র॥
যাহার শ্রবণে উপজয়ে কৃষ্ণে রতি।
বৈষ্ণবচরণরজে হয় দৃঢ়মতি॥
মহাত্মোমতি অতিনিন্দুক বা হয়!
অবশ্য শ্রবণে তার শ্রদ্ধা উপজয়॥
চারিযুগের ভক্তগণের অপূর্ব্ব চরিতে।
প্রিয়াদাসে আজ্ঞা দিলা টীকা বিস্তারিতে॥
বৃন্দাবনবাসী প্রিয়াদাস মহামতি।
বিচক্ষণবুদ্ধি শুদ্ধভক্তিমতরতি॥
অল্পাক্ষরে বহু অর্থ অনুপ্রাস যমক।
ভক্তগণের রীতি বর্ণে সন্ধান পূর্ব্বক॥
তাঁহার চরণ বন্দোঁ অভীষ্ট লাগিয়া।
গ্রন্থ প্রকাশিলা যেই টীকা বিস্তারিয়া॥
গ্রন্থ হয় ব্রজভাখা সভে বুঝে নাহি।
সেহেতু গৌড়িয়া[২] বাক্যে শ্রেণীমত কহি॥
রচনাপূর্ব্বক কহিবারে নাহি জানি।
যথাশক্তি যোড়েযাড়ে মিলাইয়া ভণি॥
উপহাস কেহ নাহি করিহ ইহাতে।
বৈষ্ণবের গুণগাণ করি কোনমতে॥
অতেব টীকার অর্থ বুদ্ধি-সাধ্যমতে।
রচিয়া কহিব মাত্র মন বুঝাইতে॥
যথা যথা প্রিয়াদাস সংক্ষেপেতে অতি।
বর্ণিলা না প্রবেশয় সাধারণমতি॥
সেই সেই কোন কোন স্থানে কিছু কিছু।
বিস্তার করিয়া করোঁ তাঁর পাছু পাছু॥
বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে কর অঙ্গীকার।
সমাপন করোঁ ইহ বাসনা আমার॥

১। পরিবার--শিষ্য-অনুশিষ্য প্রভৃতি।
২। গৌড়িয়া বাক্যে—বাংলা ভাষায়।

সকল বৈষ্ণব-পদে করিয়া প্রণতি।
লালদাস করে পরিহার[১] নতি স্তুতি॥

অথ মঙ্গলাচরণ (হিন্দী)

মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য মনহরণ জুকে।
চরণকো ধ্যান মেরে নাম মুখ গাইয়ে॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম রূপ।
বদনেতে গাও হৃদে ধরহু অনূপ (ক)॥

ভক্তির স্বরূপ (হিন্দী)

শ্রদ্ধাই ফুলেল ঔ উবটনো শ্রবণ কথা।
মৈল অভিমান অঙ্গ অঙ্গনি ছুটাইয়ে॥
মনন সুনীর অহ্বায় অংগুছায় দয়া।
নবনি বসন প্রনসোঁ ধোলে লগাইয়ে॥
আভরণ নাম হরি সাধুসেবা কর্ণফুল।
মানসী সুনথ সঙ্গ অঞ্জন বনাইয়ে॥
ভক্তি মহারাণীকো শিঙ্গার চারু বীরী চাহ।
রঙ্গ জো নিহারি লহে লাল প্যারী গাইয়ে॥

অস্যার্থঃ।

ভক্তি মহারাণীর যে শিঙ্গার[২] সেবন।
হৃদয়েতে রাখ যত্নে করহ শ্রবণ॥
শ্রদ্ধা-সুগন্ধ তৈলে শ্রীঅঙ্গ-মর্দ্দনে।
কর্ম্মজ্ঞানমলা ছুটাও শ্রবণ-উদ্বর্ত্তনে[৩]॥
মনন-নীরে স্নান দয়া-আঙ্গোছায়[৪] মোছন।
নিষ্ঠা-সুবস্ত্র হরিসেবা-আভরণ॥
সাধুসেবা-কর্ণফুল স্মরণ-সুনথ[৫]।
সৎসঙ্গ-অঞ্জন অনুরাগ-বীড়ী কত॥
এইমত ভক্তিদেবীর সেবন করিয়া।
লাল প্যারীরসে রহ মগন হইয়া॥

পাঠান্তর—(ক) অনূপ- অনুরূপ।
১। পরিহার—(এখানে) ক্ষমা প্রার্থনা।
২। শিঙ্গার—বেশভূষা সম্পাদন।
৩। উদ্বর্ত্তনে—গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা গাত্র মার্জ্জনে।
৪। আঙ্গোছায়—গামছায়।
৫। সুনথ—উত্তম নাসিকাভরণ।

অথ ভক্তির পঞ্চরস বর্ণন (হিন্দী)

শান্তি দাস্য সখ্য বাৎসল্য ঔ শৃঙ্গার চারু।
পাঁচো রস সার বিস্তার নীকে গায়হৈঁ॥
টীকাকো চিমতকার জানোগে বিচারি মন।
ইন্‌কে স্বরূপমেঁ অনূপ লে দিখায়হৈঁ॥
জিন্‌কে ন অশ্রুপাত পুলকিত গাত কভু
তিনহুকো ভাবসিন্ধু বোরিসো ছকায় হৈঁ।
জোলৌ রহে দূরি রহে বিমুখতা পূরি হিয়ো
হোই চুর চুর নেক শ্রবণ লগায় হৈঁ॥
পঞ্চ রস সোঈ পঞ্চরঙ্গ ফুল থাকে নীকে
পীয়কে পৈরায়বেকো রচিকে বনাঈ হৈ।
বৈজয়ন্তী দাম ভাববতী অলি নাভা নাম
ল্যাঈ অভিরাম শ্যামমতি ললচাঈ হৈ॥
ধারী উর প্যারী ক্যোঁ হু করত ন ন্যারী অহো
দেখো গতি ন্যারী ঢরি পাঁয়নিকো আঈ হৈ।
ভক্তি ছবিভার তাতে নমিত শৃঙ্গার হোত
হোত রস লখে জোঈ য়াতে জানি পাঈ হৈ॥

অস্যার্থঃ।

পঞ্চরস ভক্তি মৌলি বৈজয়ন্তী মালা।
প্রেম-মকরন্দ তাহে সুগন্ধি রসালা॥
ভাববতী অলি নাভা অভিরাম মতি।
লালসার উর দিয়া পিয়ে মধু মাতি॥
অহো তাহার মতি গতি কিছু ন্যারি।
ভক্তি শ্যাম ছবি হেরি বহে প্রেমবারি॥

অথ সৎসঙ্গ প্রভাব (হিন্দী)

ভক্তিতরু পোধা তাহি বিঘ্নডর ছেরিহুকো
বারদে বিচারবারি সীচ্যো সৎসঙ্গসো।
লগ্যোঈ বঢ়ন গোদা চহুঁদিশি কঢ়নসো
চঢ়ন আকাশ জস্ ফৈল্যো বহুরঙ্গসো॥
সন্তউর আলবালশোভিত বিশাল ছায়া
জীয় জীব জাল তাপ গএ য়োঁ প্রসঙ্গসো।
দেখো বঢ়বার জাহি অজাহুকী শংকাহুতী
তাহী পেড় বন্ধে ঝুলৈঁ হাথী জীতে জঙ্গসোঁ॥

অস্যার্থঃ।

ভক্তি নব বৃক্ষ তাহে সৎসঙ্গসিঞ্চনে।
পালন করহ ভাই পরম যতনে॥
বিচার যে বাড়[১] দেহ রক্ষার কারণে।
অসৎসঙ্গ-গো-ছাগল না করে ভোজনে॥
তবে সেই বৃক্ষ শাখা প্রশাখা লইয়া।
আকাশে উঠয়ে নানারঙ্গে বেয়াপিয়া॥
হৃদি-আলবালে[২] শোভি করে স্নিগ্ধছায়া।
সর্ব্বজীবের হরে দুষ্খ পাপ তাপ মায়া॥
যবে সেই ভক্তিবৃক্ষ বলবান হয়।
দুষ্টসঙ্গ-করী হৈতে বিঘ্ন না জন্ময়॥

অথ শ্রীনাভাজীর গুণবর্ণন।

[টীকা হিন্দী]

জাকো জো স্বরূপ সো অনূপ লে দিখাই দিয়ো
কিয়ো জো কবিত্ত পট মিহি মধি লাল হৈ।
গুণপৈ অপার সাধু কহে অংক চারিহীমেঁ
অর্থ বিসতার কবিরাজ টংকসাল হৈ॥
সুনি সন্তসভা ঝুমি রহী অলিশ্রেণী মানো
ঘুমিরহী কহে য়হ কহাধোঁ রসাল হৈ।
সুনে হৈ অগর অব জানেমেঁ অগরসহী
চোবা ভএ নাভা ঔ সুগন্ধ ভক্তমাল হৈ॥

অস্যার্থঃ।

ভক্তগণ যাঁর সেই স্বরূপ কথন।
অপূর্ব্ব কবিত্ব সূক্ষ্ম রক্তিম বসন॥
নাভাজীর গুণ আর অপার মহিমা।
কবিত্ব টাঁকসাল অর্থ কত নাহি সীমা॥
পরম রসাল শুনি সাধুগণ ঝুমে[৩]।
কমলের গন্ধে যেন অলিকুল ভ্রমে॥
অগুরু চন্দনময় নাভাজী-স্বরূপ।
তার গন্ধ ভক্তমাল গ্রন্থ অপরূপ॥

১। বাড়—বেড়া।
২। আলবালে—আইলে, জল-বেষ্টনীতে।
৩। ঝুমে—যেন নেশায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়।

অথ ভক্তমালস্বরূপ।

[টীকা হিন্দী]

বড়ে ভক্তিমান নিশি দিন গুণগান করেঁ
হরেঁ জগপাপ জাপ হিয়ো পরিপূর হৈ।
জানি সুখ মানি হরি সন্তসনমান সচে
বচেউ জগত রীতি প্রীতি জানি মূরহৈ॥
তেউ দুরারাধ কোউ কৈসেকৈ আরাধিসকৈ
সমঝ্যো ন জাত মন কম্প ভয়ো চূর হৈ।
শোভিত তিলকভাল মাল উর রাজৈ তৌপৈ
বিনা ভক্তমাল ভক্তিরূপ অতিদূর হৈ॥

অস্যার্থঃ।

অহো ভক্তিমান করে দিবানিশি গান।
স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিময় ভক্ত অভিমান॥
জগতের পাপ তাপ হরয়ে আনন্দে।
হরি সাধু সম্মান উপদেশে মূঢ় মন্দে॥
জগতের রীতি দেখি মোহ-মন্দমতি।
দুরারাধ্য তাহে সিদ্ধবস্তু নহে প্রাপ্তি॥
ভাবিতে জগতগতি মনে হৈল দুঃখ।
স্বতঃ প্রকাশিয়া জীব তারিতে উন্মুখ॥
ললাটে তিলক কণ্ঠে তুলসীর মাল।
হরি-গুণগানে মত্ত স্বভাব-দয়াল॥
ভক্তমাল ভক্তিময় ভক্তিদানে শূর।
ভক্তমাল বিনা ভক্তিরূপ অতি দূর॥

অথ মঙ্গলাচরণ।

[দোঁহা মূল হিন্দী]

ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু চতুর নাম বপু এক।
ইন্‌কে পদ বন্দন করৈ নাশৈ বিঘন অনেক॥

অস্যার্থঃ।

ভক্ত আর ভক্তি গুরু আর ভগবান।
এক বপু চারি নাম চারি মাত্র ভাণ॥
যাঁর পদবন্দনাতে সর্ব্ববিঘ্ন নাশে।
সাধ্য[১] বস্তু সাধন সেই বেদে ইহা ভাষে॥

১। সাধ্য—সাধনা দ্বারা যাহা পাইতে হইবে।

অথ ভক্তবিশেষ লক্ষণ।

[টীকা হিন্দী]

হরিগুরুদাসনসোঁ সাঁচো সোঈ ভক্ত সহী
গহী এক টেঁক ফিরি উরতে ন টরী হৈ।
ভক্তিরসরূপকো স্বরূপ য়হৈ ছবিসার,
চারু হরিনাম লেত অশ্রুবনি ঝরী হৈ॥
বহী ভগবন্ত সন্তপ্রীতিকো বিচার করে
ধরে দূরি ঈশ তাহু পাণ্ডোনীসোঁ করী হৈ।
গুরু গুরুতাঈকী সচাঈ লে দিখাঈ জাহি
গাঈ শ্রীপৈ হরিজূকী রীতি রঙ্গভরী হৈ॥

অস্যার্থঃ।

হরি গুরু ভক্ত যেই এক করি জানি।
ইহাতে না টলে মতি সেই শ্রেষ্ঠ মানি॥
ভক্তির স্বরূপ নাম সর্ব্বানর্থ নাশে।
সর্ব্ব-স্বার্থ লভ্য হয় কিঞ্চিত আভাসে॥
ভগবানে ভক্তে আর গুরুর চরণে।
প্রেম-ভাব কেহ দিতে নারে তেঁহো বিনে॥
স্বয়ং ভগবান হন আপনি মহান্ত[১]।
স্বয়ং গুরুদেব হন স্বয়ং ভক্তিমন্ত॥
রাধাকৃষ্ণ রসরঙ্গ মন্ত্র কৃষ্ণ নাম।
অতএব যত্নে হৃদে রাখ অবিরাম॥
নিজ স্বার্থ তেজি যেই এ সকল তত্ত্বে।
আনন্দকৌতুকে যে পিরীতিভাবে বর্ত্তে[২]॥
সেই ধন্য শ্রেষ্ঠ মধ্যে তাহার গণনা।
নতুবা বণিক-বৃত্তি করে অন্য জনা॥
মূলের তাৎপর্য্য অর্থ প্রিয়াজী কহিলা।
নাভাজীর মনোবৃত্তি যে জন জানিলা॥

অথ আজ্ঞাদান।

[দোঁহা মূল হিন্দী]

মঙ্গল আদি বিচারি য়হ বস্তু ন ঔর অনূপ।
হরিজনকে যশ গাবতে হরিজন মঙ্গলরূপ॥
সন্তন মিলি নির্ণয় কিয়ো মথি পুরাণ ইতিহাস।
ভজবেকো দোঈ সুঘর কৈ হরি কৈ হরিদাস॥

১। মহান্ত—কৃষ্ণভক্ত, গুরু।
২। বর্ত্তে—অবস্থান করে থাকে।

অগ্রদেব আজ্ঞা দঈ ভক্তনকো যশ গাব।
ভবসাগরকো তরনকো নাহি'ন আন উপাব॥

অস্যার্থঃ।

সর্ব্ববিচারের পার, সর্ব্বমঙ্গলের সার,
সারাৎসার বস্তু চমৎকার।
হরিজনের গুণগান, হরিরস আস্বাদন,
নিতান্ত সিদ্ধান্ত পারাবার॥
ভজ কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-চরণ।
মথিয়া শ্রুতিপুরাণ, ইতিহাস দরশন,
সিদ্ধান্ত যে কহে মহাজন॥ ধ্রু॥
শ্রীগুরু অগরদাস, গাইতে ভক্তের যশ,
কৃপা করি আজ্ঞা মোরে দিলা।
অপার সংসার পার, উপায় নাহিক আর,
নাভা ইহা নিশ্চয় করিলা॥

আজ্ঞা সময়ের প্রসঙ্গ।

[টীকা হিন্দী]

মানসী স্বরূপমে' লগেহৈ' অগ্রদাসজু বে
করত বয়ার নাভা মধুর স'ভারসোঁ।
চঢ়্যো হৈ জহাজ পৈজু শিষ্য এক আপদামে'
কর্য়ো ধ্যান খস্যো মন ছুটয়ো রূপসারসোঁ॥
কহত সমর্থ গয়ো বোহিত বহুত দূরি
আবো ছবিপুরি ফিরি ঢরো তাহি ঢারসোঁ।
লোচন উঘারিকৈ নিহারি কহি বোল্যো কৌন
বহী জৌন পাল্যো শীথ দৈদৈ সুকুমারসোঁ॥

প্রত্যুত্তর।

[টীকা হিন্দী]

আচরজ দয়ো নয়ো ইহাঁলৌঁ প্রবেশ ভয়ো
মন সুখ ছয়ো জান্যো সন্তনপ্রভাবকো।
আজ্ঞা তব দঈ য়হৈ ভঈ তোপে সাধুকৃপা
উন্হীকো রূপ গুণ কহো হিয়ভাবকো॥
বোল্যো কর জোরি য়াকো পাবত ন ওর ছোর
গাউ' রামকৃষ্ণ নহি' পাউ ভক্তদাবকো।
কহি সমুঝাই বেঈ হৃদৈ আয় কহে সব
জিন লে দিখাই দিয়ো সাগরমে' নাবকো॥

অস্যার্থঃ।

অগ্রদাস অন্তর্ম্মনা ধ্যানাবিষ্ট আছেন।
মন্দ মন্দ বায়ু নাভা পশ্চাৎ করিছেন॥
জাহাজে চঢ়িয়া অগ্রদাসের শিষ্য এক।
কোথাও বাণিজ্যে যাইতে লাগি গেল ঠেক[১]॥
আপদে পড়িয়া গুরুর স্মরণ করিল।
অমনি ধ্যানস্থ গোসাঞি অনুকূল হৈল॥
জাহাজে চলিল গোসাঞি দয়াবান্ হঞা।
তথাপিহ মনোযোগ সেবক লাগিয়া॥
পাছু হৈতে নাভাজিউ বলে মৃদুস্বরে।
জাহাজ ছুটিল এবে আইস নিজ ঘরে॥
ইহা শুনি আঁখি মেলি কহে কেটা তুমি।
নাভা কহে ঝুঁঠাখোর[২] সেই হও আমি॥
তেঁহো কহে বৈষ্ণবের সেবার শকতি।
কৃতার্থ হইলা ইহা হইল প্রতীতি॥
অতএব বৈষ্ণবের চরিত্র বর্ণন।
যতনপূর্ব্বক তুমি করহ গ্রন্থন॥
নাভা কহে ভক্তরীত জানিব কেমতে।
"সাগরে নায়ের কথা জানিলে যেমতে"॥

অথ নাভাজীর আদি অবস্থা।

[টীকা হিন্দী]

হনুমানবংশহী মৈ জনম প্রসিদ্ধ জাকো।
ভয়ো দৃগহীন সো নবীন বাত ধারিয়ে॥
উমর বরষ পাঁচ মানিকৈ অকাল আঁচ।
মাতু বন ছোরি গঈ বিপতি বিচারিয়ে॥
কীল্হ ঔ অগর তাঁহি ডগর দরশ দিয়ো
লিয়ো যো অনাথ জানি পুঁছি সো উচারিয়ে।
বড়ে সিদ্ধ জল লে কমণ্ডলুসোঁ সীঁচে' নৈন
চৈন ভয়ো খুলে চক্ষু জোড়ীকো নিহারিয়ে॥
পাঁয় পরি আসু আয় কৃপা করি সঙ্গ ল্যায়
কীল্হ আজ্ঞা পায় মন্ত্র অগর সুনায়ো হৈ।
গলতে প্রগট সাধুসেবা সো বিরাজমান
জান অনুমান তাহি টহল লগায়ো হৈ॥

১। ঠেক—বন্ধ অবস্থা, প্রতিবন্ধক।
২। ঝুঁঠাখোর—প্রসাদ ভোজনকারী।

চরণ প্রক্ষাল সন্ত শীতসোঁ অনন্দ প্রীতি
জানি রসরীতি তাতে হৃদৈ রঙ্গ ছায়ো হৈ।
ভঙ্গী বঢ়বার তাকো পাবে কৌন পারাবার
জৈসো ভক্তরূপসো অনূপ গিরা গায়ো হৈ॥

অস্যার্থঃ।

হনুমানবংশে জন্ম অন্ধ দুটি নেত্র।
কোটী আঁখি তার দেহে যেই হরিভৃত্য॥
পঞ্চবর্ষ বয়স নাভা আকাল[১] সময়।
উদরের দাহে মাতা বনে ছাড়ি যায়॥
কীল্‌হ অগর দুই ভাই দয়ার নিধান।
অনাথ দেখিয়া তারে পুছেন কারণ॥
কমণ্ডলুর জল-ছিটা চক্ষেতে মারিলা।
তৎক্ষণাৎ দুটি চক্ষু প্রকাশ পাইলা॥
ভবিষ্যৎ কৃষ্ণভক্ত বুদ্ধিমান্ ধীর।
দোঁহার চরণে পড়ে চক্ষে বহে নীর॥
কীল্‌হজী-আজ্ঞায় অগর সেবক করিলা।
নিযুক্ত করিয়া বৈষ্ণব-সেবায় রাখিলা॥
বৈষ্ণবের পদসেবা উচ্ছিষ্ট-ভোজন।
করিতে করিতে হইল কৃপার ভাজন॥
বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টি ভাগ্যে যার ফলে।
ত্রিভুবনে অলভ্য কি আছে তার বলে॥
সাধুকৃপা হৈতে হৃদে কি রঙ্গ ছাইল।
ভক্তি শক্তি অপার সাগর উথলিল॥
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্ত দোঁহার চরিত।
অমৃত নিন্দিত কোটি সুধাংশু নিন্দিত॥
বর্ণিয়া শ্রীনাভাজীউ জগৎ তারিলা।
বৈষ্ণবমঙ্গল ভক্তমাল প্রকাশিলা॥

চব্বিশ অবতার বর্ণন।

[মূল হিন্দী]

জয় জয় মীন বরাহ কমঠ-নরহরি বলি বামন।
পরশুরাম রঘুবীর কৃষ্ণকীরতি জগপাবন॥
বুদ্ধ কলংকী (ক) ব্যাস পৃথু হরি হংস মন্বন্তর।
যজ্ঞ ঋষভ হয়গ্রীব ধ্রুব বরদৈন ধন্বন্তর॥
বদ্রীপতি দত্ত কপিলদেব সনকাদিক করুণা করো।
চৌবীশ রূপ লীলা রুচির অগ্রদাসউর পদ ধরো॥

[টীকা হিন্দী]

জেতে অবতার সুখসাগর ন পারাবার।
করৈ বিসতার লীলা জীবনি উধারকো॥
জাহি রূপমাহিঁ মনলগৈ জাকো পগে তিহি
জগৈ হিয়ে ভাব বহী পাবে ক্যোঁ ন পারকো।
সবহী হৈ নিত্যধ্যান করত প্রকাশৈ চিত্ত।
জৈসে রংক পাবৈ বিত্ত জো পৈ জানৈ সারকো॥
কৈশনি কুটিলতাঈ ঐসে মীন সুখদাঈ।
অগর-সুরীতি ভাঈ বসো উর হারকো॥

অস্যার্থঃ।

জয় জয় জয় মীন বরাহ কমঠ[১]।
জয় জয় নরহরি[২] বামন উদ্ভট॥
জয় ভৃগুপতি[৩] রাম রাঘব বুদ্ধ কল্কী।
ব্যাস পৃথু হরি হংস মন্বন্তর বল্কি[৪]॥
যজ্ঞ ঋষভ শ্রীধন্বন্তরি হয়গ্রীব।
বদ্রীপতি[৫] সনকাদি শ্রীকপিলদেব॥
আর দত্ত[৬] এই যে চব্বিশ অবতার।
অবতারী কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বরূপ যাঁর॥
করুণা করিয়া অগ্রদাসের হৃদয়।
ধরহ অভয় সুন্দর পদদ্বয়॥
যত অবতার সব সুখ-পারাবার।
লীলা বিস্তারিয়া করে জীবের উদ্ধার॥
যার চিত্তে যেইরূপ লাগে দৃঢ় করি।
তার চিত্তে জাগে সদা দিবস শর্ব্বরী॥
তার মধ্যে অদভূত শ্রীকৃষ্ণকীরিতি।
দরিদ্রের ধন হেন সভার পিরীতি॥
রূপ গুণ লীলা নামে যার চিত্ত ডুবে।
প্রাকৃত বস্তুতে নাহি তার মন ক্ষোভে॥

পাঠান্তর—(ক) কলংকী- কল্কি।
১। আকাল দুর্ভিক্ষ।

১। কমঠ—কচ্ছপ, কূর্ম্ম।
২। নরহরি—নৃসিংহ।
৩। ভৃগুপতি—পরশুরাম।
৪। বল্কি—তাহা ছাড়া।
৫। বদ্রীপতি—নর-নারায়ণ।
৬। দত্ত—দত্তাত্রেয়।

চব্বিশ যে রূপ চৌদ্দ ভুবন-মন্দিরে।
বিরাজ করয়ে অগ্রদাসের অন্তরে॥

অথ চরণচিহ্ন বর্ণন।

[মূল হিন্দী]

চরণচিহ্ন রঘুবীরকে সন্তন সদা সহায়কা
অঙ্কুশ অম্বর কুলিশ কমল জব ধ্বজা ধেনুপদ।
শঙ্খ চক্র স্বস্তীক জম্বুফল কলশ সুধাহ্রদ॥
অর্দ্ধচন্দ্র ষট্‌কোণ মীন বিন্দু উরধরেষা।
অষ্টকোণ ত্রিকোণ ইন্দ্রধনু পুরুষ বিশেষা॥
সীতাপতিপদ নিত বসত এতে মঙ্গলদায়কা।
চরণচিহ্ন রঘুবীরকে সন্তন সদা সহায়কা॥

[টীকা হিন্দী]

সন্তনসহায়কাজ ধারে নৃপরাজ রাম-
চরণসরোজনমেঁ চিহ্ন সুখদাইয়ে।
মন হৈ মতঙ্গ মতবারো হাথ আবে নাহিঁ,
তাকে লিয়ে অঙ্কুশ লে ধাত্যো হিয়ে ধাইয়ে॥
ঐসেহী কুলিশ পাপপর্ব্বতকে ফোরিবেকো,
ভক্তিনিধি জোরিবেকো কঞ্জ মন ল্যাইয়ে।
জোপৈ বুধবন্ধ গুণ সম্পতিমৈ
করিলে বিচার সব নিশি দিন গাইয়ে॥

অস্যার্থঃ।

রামচন্দ্র নৃপরাজ চরণ-কমলে।
ভক্ত রক্ষা হেতু অস্ত্র রাখে চিহ্নছলে॥
সুন্দর সুখদ স্নিগ্ধ মনোজ্ঞ মাধুর্য্য।
ভক্তের হৃদয়ানন্দ তদিতর বর্জ্জ্য[১]॥
মন-মাতঙ্গ মত্ত নিবারণ-কাজে।
অঙ্কুশ ধরয়ে পদে সুন্দর বিরাজে॥
তথা যে কুলিশ[২] পাপ-চূর্ণের কারণে।
বজ্র ধরে শ্রীচরণে স্নেহ-বিতরণে॥
ভক্তিনিধিপ্রাপ্তি হেতু পদ্মনিধি ধরে।
ইত্যাদি ধারণে রিপু নাশি সুখী করে॥
সেই বুদ্ধিমন্ত শান্ত, ধন্য তার জন্ম।
ঊনবিংশ যারাশ্রয় সেই জানে মর্ম্ম॥
স্মর স্মর স্মর ভাই দিবানিশি গাও।
শ্রীচরণসুধারসসিন্ধু অবগাও[৩]॥

১। তদিতর বর্জ্জ্য—তদ্ভিন্ন অন্য সব বাদ।
২। কুলিশ—বজ্র।
৩। অবগাও—স্নান কর।

ইতি শ্রীভক্তমালে গুর্ব্বাদিবন্দন মঙ্গলাচরণ নাম প্রথমমালা।

দ্বিতীয় মালা

চৈতন্যপার্ষদ-গুণবর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
গুর্ব্বাদি-বন্দন-আদি মঙ্গলাচরণ।
করিল কহিব এবে মূল প্রয়োজন॥
প্রথমে গাইব গুণ গৌরাঙ্গপার্ষদ।
যাহার প্রসাদে ঘুচে অন্তর (ক) বিষাদ॥
শ্রীল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
শ্রীচরণ আস্বাদিত (খ) যত ভক্তবৃন্দ॥
তা সবার শ্রীচরণ হৃদয়ে ধরিয়া।
গাইব শ্রীগৌরাঙ্গের পিরীতি লাগিয়া॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ

[মূল হিন্দী]

শ্রীনিত্যানন্দ-কৃষ্ণচৈতন্য কী ভক্তি দশোঁ দিশি বিস্তরী।
গৌড়দেশ পাখণ্ডমেং টিকিয়ো ভজন-পরায়ণ।
করুণাসিন্ধু কৃতজ্ঞ ভয়ে অগতিন গতিদায়ন॥
দশধা রস অক্রান্ত মহন্তজনচরণ উপাসে।
নাম লেত নিষ্পাপ দুরিত তিঁহি নরকে নাসে॥
অবতার বিদিত পূরব মহী উভৈ মহন্তদেহী ধরী।
শ্রীনিত্যানন্দ-কৃষ্ণচৈতন্য কী ভক্তি দশোঁ দিশি বিস্তরী॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

[টীকা হিন্দী]

গোপিনীকে অনুরাগ আগে আপ হারে শ্যাম.
জান্যো য়হ লাল রঙ্গ কৈসে আবে তনমেং।
এতো সব গৌর তন নখ শিখ বনী ঠনী.
খুল্যো যো সুরঙ্গ অঙ্গ অঙ্গ রঙ্গে বনমেং॥

শ্যামতাঈ মাঁঝ সো ললাঈহূ সমাঈ জাহি
তাসে মেরো জান ফিরি আঈ য়হ মনমে।
জসুমতিসুত সোঈ সচীসুত গৌর ভয়ে
নয়ে নয়ে নেহ চোজ নাচে নিজগনমেং॥
আবে কভূ প্রেম হেম পিণ্ডবত তন হোত
কভূ সন্ধি সন্ধি ছুটি অঙ্গ বাঢ় জাত হৈ।
ঔর এক ন্যারী রীতি অশ্রু পিচকারী মাঁনো
উভে লাল প্যারী ভাবসাগর সমাত হৈ॥
ঈশতা বখানি কহা করো সো প্রমান য়াকো
জগন্নাথ ক্ষেত্র নেত্র নিরখি সাক্ষাত হৈ।
চতুর্ভুজ ষট্‌ভুজ রূপ লে দিখায় দিয়ো
দিয়ো জো অনুপহিত বাত পাত পাত হৈ॥
কৃষ্ণচৈতন্য নাম জগত প্রগট ভয়ো
অতি অভিরাম লে মহন্ত দেহি করী হৈ।
জিতো গৌড়দেশ ভক্তি লেশহু ন জানে কোউ
সোউ প্রেমসাগরমেং বোর‍্যো কাহি হরী হৈ॥
ভয়ে শির মোর এক এক জগ তারিবেকো
ধারিবেকো কোন সাথি পেখি নমেং ধরী হৈ।
কোটি কোটি অজামীল বারি ডারে দুষ্টতা পৈ
ঐসেহু মগন কিয়ে ভক্তি ভূমি ভরী হৈ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু।

[টীকা হিন্দী]

আপ বলদেব সদা বারুণিসোঁ মত্ত রহৈ
চহৈ মন মানো প্রেম মত্ততাঈ চাখিয়ে।
সোঈ নিত্যানন্দ প্রভু মহন্তকী দেহ ধরী
ভরী সব আনি তউ পুনি অভিলাখিয়ে॥
ভয়ো বোঝ ভারী ক্যোঁহূং জাত ন সম্ভারী জব
ঠৌর ঠৌর পারিষদমাঁঝ ধরী রাখিয়ে।
কহত কহত ঔর সুনত সুনত জাকে
ভয়ে মতবারে বহু গ্রন্থ তাকী সাখিয়ে॥

পাঠান্তর—(ক) অন্তর—অনন্ত।
(খ) আস্বাদিত- আস্বাদক।

অস্যার্থঃ।

নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তিরসে।
দশদিগ বিস্তারিয়া অমঙ্গল নাশে॥
কৃষ্ণভক্তিহীন গৌড়দেশ যে পাষণ্ড।
দলন করিলা দিয়া ভক্তি-তীক্ষ্ণদণ্ড॥
সভেই ভজনপরায়ণ-মতি হৈল।
করুণাসাগর অগতির গতি ভেল॥
দশরসভাবাক্রান্ত মহান্ত সজ্জনে।
চরণ উপাসে ভিজে প্রেম-বরিষণে॥
কৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম লৈতে।
মুক্ত হৈল সভে ভবদুর্গতি হইতে॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরাম ভুবি অবতরি[১]।
মহী উদ্ধারিলা দোঁহে ভক্তরূপ ধরি॥
ব্রজে বলদেব মত্ত বারুণী[২] পানেতে।
এবে নিত্যানন্দরূপে মত্ত প্রেমরীতে॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি[৩] জগৎ তারিলা।
ধরি ধরি হরিনাম সভারে লওয়াইলা॥
নিজ পারিষদ সহ প্রেমে মাতোয়ার।
তার সাক্ষী সাধুগণ বহু গ্রন্থ আর॥

আপন মাধুরী, চমকিত হেরি,
রাধার পরাণনাথ।
এ হেন মাধুরী, রাধিকা সুন্দরী,
আস্বাদয়ে সখি সাথ॥
কত (ক) সুখে ভাসে, না জানি কি রসে,
প্রেমের সাগরমাঝ।
এতেক ভাবিতে, উছলিল চিতে,
ক্ষণেক (খ) না সহে ব্যাজ॥
রাধা-ভাবামৃতে, আস্বাদিতে চিতে,
আইলা গউড়মাঝ।
নবদ্বীপসিন্ধু, কুমুদিনীবন্ধু,
উদয় যে দ্বিজরাজ॥

পাঠান্তর—(ক) কত—কভু। (খ) ক্ষণেক—ক্ষণেকে।
১। ভুবি অবতরি—পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া।
২। বারুণী—মদ্য।
৩। অঙ্গীকরি—গ্রহণ করিয়া।

রাধারূপরস, চিন্তিয়া উল্লাস,
ভাবিতে ভাবিতে মনে।
আনন্দে ভুলিল, সেই রূপ ভেল,
গউর হেমবরণে॥
গৌরাঙ্গী কালিয়া, মিশাল হইয়া,
গৌরাঙ্গী সরস ভেল।
কালিয়া ঢাকিয়া, ব্যাপক হইয়া,
নিজ রূপ প্রকাশিল॥
নবদ্বীপে আসি, গৌর রূপরাশি,
গণের সহিত নাচে।
সে রূপ রতনে, যে দেখে নয়নে,
সে কি পরাণেতে বাঁচে॥
সে নৃত্য সে প্রেম, সে বরণ হেম,
সে সব (ক) সঙ্গিয়া সনে।
দেখিল নয়নে, তখন যে জনে,
সে আনন্দ সেই জানে॥
কিবা চমৎকার, প্রেমের বিকার,
নাহি লোক বেদে শুনি।
কভু হেমতনু, মণিপদ্মে জনু,
কভু পদ্মরাগ মণি॥
কভু হেমপিণ্ড, কভু খণ্ড খণ্ড,
অস্থিসন্ধি ছুটি যায়।
কভু লোমকূপে, রক্তধারা ব্যাপে,
অশ্রু পিচকারিপ্রায়॥
বুঝি প্রেমরস, হইয়া সরস,
উপচি বহিয়া যায়।
মণিমুক্তা যথা, অনুভব তথা,
সুভগ সোণার গায়॥
প্রকাশি ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যের ধুর্য্য[১],
দেখায় ভক্তগণেরে।
কভু চতুর্ভুজ, কভু ষড়ভুজ,
নিজ নানা রূপ ধরে॥

পাঠান্তর—(ক) সব—সঙ্গ।
১। ধুর্য্য শ্রেষ্ঠ।

কভু রাধা সহ, নীলকান্তি দেহ,
মুরলীবদন রূপে।
সংকীর্ত্তন মাঝে, কীর্ত্তনে বিরাজে,
কভু বহু রূপে ব্যাপে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নাম মহাধন্য,
প্রকট করি জগতে।
উদ্ধারিল লোক, গেল রোগ শোক,
মগ্ন হৈল প্রেমামৃতে॥
গৌড়দেশ ধন্য, যাঁহা অবতীর্ণ,
গৌরাঙ্গ পরশমণি।
কর্ম্মী জ্ঞানী যত, যত ছিল হত,
সবে ভেল প্রেমধনী॥
গৌরাঙ্গ ভকত, পারিষদ যত,
একজন এক নিধি।
অপার মহিমা, করিবারে সীমা,
কে আছে এমন সুধী॥
গৌর গুণধাম, পুরাইতে কাম,
হেন কি জগতে আছে।
দয়ার সাগর, তারিতে পামর,
কভু নাহি আগে পাছে॥
কোটি অজামিল, সব দুষ্টশীল,
জগাই মাধাই ছিল।
তাহা দুই জনে কৃপাবলোকনে,
অনায়াসে তরাইল॥
গৌরাঙ্গের কৃপা, অমৃত স্বরূপা,
ব্যাপিত দেখি ভুবনে।
অধম চণ্ডাল, অতিমন্দ ভাল,
একা লালদাস বিনে॥

১। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বরূপতঃ কে এবং তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার কারণ নিম্নোক্ত দুইটি শ্লোকে বলা হইয়াছে।

(ক) রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদ্
একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

(খ) শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

এ হেন গৌরাঙ্গ গুণনিধি-পারিষদ।
গুণগান করিব মনের বড় সাধ॥
গৌরাঙ্গের প্রেম-গুণ আস্বাদ লাগিয়া।
তাঁর ভক্তগুণ গাই অভেদ জানিয়া॥

১। চরিত্র শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী।

[মূল হিন্দী]

শ্রীরঘুনাথ গুসাঈ গরুড় জ্যোঁ।
সিংহ পৌরি ঠাঢ়ে রহৈঁ॥
শীতকাল সকলাত বিদিত।
পুরুষোত্তম দীনী॥ ইত্যাদি।

[টীকা হিন্দী]

অতি অনুরাগ ঘর-সম্পত্তিসো রহ্যো পাগি
তাহু করি ত্যাগ নীলাচল কিয়ো বাস হৈ।
ধনকো পঠাবৈ পিতা তৌপৈ নহিঁ ভাবৈ কছু
দেখিবো সুহাবৈ মহাপ্রভুজুকো পাস হৈ॥
ইত্যাদি।

অস্যার্থঃ।

মূল লিখিবারে বহু পুস্তক বাড়য়।
অতএব অর্থমাত্র লিখ যে আশয়॥
শ্রীমান্ রঘুনাথ দাস যে গোস্বামী।
প্রচণ্ড বৈরাগ্য যাঁর মহাভক্ত প্রেমী॥
অনুরাগ-পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধা-গোবিন্দে।
দিবানিশি নাহি জানে মত্ত প্রেমানন্দে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপাবলে বৈরাগ্য জন্মিল।
পিতার যে রাজ্যাস্পদ তাহে ঘৃণা হৈল॥
সুন্দরী যুবতী নারী ভূষণে ভূষিত।
বিষতুল্য মানে তাহা হইয়া কম্পিত॥
সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে।
যাইয়া প্রপন্ন (ক) হইবারে হৈল মনে॥

পাঠান্তর—(ক) প্রপন্ন—প্রসন্ন।

নিকষিয়া যায় পুনঃ পুনঃ ধরি আনে।
পিতা-মাতা কাতর সদাই দুঃখ মনে॥
নবলক্ষের রাজ্যাস্পদ সোঁপিল তাঁহারে।
অপ্সরার তুল্য যে যুবতী নারী ঘরে॥
তথাচ রাখিতে নারে কৃষ্ণ-অনুরাগে।
সে সকল তুচ্ছ করি বিষয়-ভয়ে ভাগে (ক)॥
অনেক পাহারা চৌকী রাখিয়া হারিল।
শেষে রজ্জু দিয়া হস্ত বাঁন্ধিয়া রাখিল॥
রঘুনাথ উৎকণ্ঠাতে গৌরাঙ্গ বলিয়া।
উচ্চস্বরে কান্দে সাধু ভূমেতে পড়িয়া॥
কেহ শিষ্ট লোক কহে অনুচিত ইহ।
নির্ব্বোধ তোমরা কেহ বুঝিতে নারহ॥
এ হেন ঐশ্বর্য্য আর এ যুবতী নারী।
হেন রজ্জু ছিণ্ডে যেই তারে হরি হরি॥
পট্টরজ্জু দিয়া কি বান্ধিয়া রাখা যায়।
কেন বৃথা বান্ধ খুলি দেহ হায় হায়॥
এত শুনি বন্ধন খুলিয়া নিজ জন।
অনেক বুঝায় সভে করিয়া ক্রন্দন॥
তেঁহো হেঁটমাথে রহে কিছু নাহি কহে।
গৌরাঙ্গ হৃদয়ে যে গ্রহ চাপে দেহে॥
লোক চৌকি রাখি সভে সতর্ক রহিল।
রাত্রিযোগে রঘুনাথ উঠি পলাইল॥
অতি উৎকণ্ঠিত মন উন্মত্তের প্রায়।
দিগবিদিগ নাহি ফিরিয়া তাকায় (খ)॥
জল কি জঙ্গল তৃণ কণ্টক শর্করা।
নাহি মনে, ধায় মাত্র বাউলের পারা॥
বারো দিনে উত্তরিলা শ্রীপুরুষোত্তম।
তার মধ্যে তিন সন্ধ্যা আহার যে নাম॥
পুরুষোত্তম গিয়া শ্রীমান্ চৈতন্য-চরণে।
পড়িলা হঠাৎ গিয়া করিয়া ক্রন্দনে॥
হে নাথ হে প্রভো হে হে করুণা-নিধান।
কৃপা কর শ্রীচরণে লইনু শরণ॥
অনাথ অধম মুঞি গতিহীন দীন।
কৃপাবলোকন কর জানিয়া অধীন॥
শ্রীচরণ-তলে পড়ি ধূলায় ধূসর।
স্তুতি নতি করে অতি কাতর অন্তর॥
কাতর দেখিয়া প্রভুর দয়া উপজিল।
মুচকি হাসিয়া তুলি আলিঙ্গন কৈল॥
শক্তি সঞ্চারিয়া তবে প্রেম-ভক্তি দিল।
নিজ পারিষদে প্রভু প্রধানে গণিল॥
শ্রীমান্ দাস রঘুনাথ নাম হৈল খ্যাত।
পরম বৈরাগ্য কৃষ্ণপ্রেমে উনমত॥
সিংহদ্বারে থাকি কৈল অযাচক বৃত্তি।
কথো দিনে তাহা ছাড়ি কৈল কিছু যুক্তি॥
শড়া (১) মহাপ্রসাদ যাহা কুণ্ডেতে ডারয়ে।
ধুইয়া তাহার মধ্যে কণা যে থাকয়ে॥
তাহাই আহার মাত্র প্রাণরক্ষাকাজে।
বিষয়সুখের লেশমাত্র নাহি সুজে (২)॥
প্রভু তাহা শুনি অতি আনন্দিত হঞা।
প্রশংসেন অন্য ভক্তগণে শুনাইয়া॥
প্রভুর আজ্ঞায় দাস-গোসাঞি মহান্।
কথোদিনে কৈল বৃন্দাবনেতে গমন॥
শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে করিলেন বাস।
দিবানিশি সদা রাধাকৃষ্ণ-প্রেমোল্লাস॥
রাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি লাগি সদা উৎকণ্ঠিত।
সদা হাহাকার, ক্ষণে স্থির নহে চিত॥
হে হে বৃন্দাবনেশ্বরি হে ব্রজনাগর!
দেখাইয়া শ্রীচরণ রাখ প্রাণ মোর॥
নিদ্রাহার নাহি, সদা করয়ে ফুৎকার।
বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার॥
দাস-গোস্বামীর পূর্ব্বাপর যত লীলা।
কহিতে নারিএ কিছু সংক্ষেপে বর্ণিলা॥
পতিতপাবন দাস-গোস্বামি-চরণ।
আমা সভার পরম উপায় অতিধন॥
হে শ্রীগোস্বামী প্রভু কৃপাদৃষ্টি কর।
লালদাস-মস্তকে চরণপদ্ম ধর॥

পাঠান্তর—(ক) বিষয়-ভয়ে ভাগে—বিষয়ে সদা ভয় লাগে।
(খ) দিক্‌বিদিক্ ফিরি বলে গ্রাম না তাকায়।

১। শড়া—পচা, বাসি।
২। নাহি সুজে—ভাল লাগে না।

২১ চরিত্র শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামী

[মূল হিন্দী]

শ্রীরূপ সনাতন ভক্তিজল শ্রীজীবগুসাঈ সর গম্ভীর
বেলা ভজন সুপক্কাযায়ন কবহুঁ না লাগী।
বৃন্দাবন দৃঢ়বাস জুগল চরণনি অনুরাগী॥
পোথী লেখনি পানি অঘট অক্ষর চিত দীনো।
সদ্‌গ্রন্থনকো সার সবৈ হস্তামল কীনো॥ ইত্যাদি

অস্যার্থঃ।

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন শ্রীজীব গোস্বামী।
হরিভক্তিমূর্ত্তির প্রকট নর-ভূমি॥
প্রেমাকারাকারবৃত্তি অষ্ট যে সাত্ত্বিকী (১)।
তরঙ্গ বহয়ে সদা চরকি চরকি॥
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা মহাপণ্ডিত অগাধ।
সিদ্ধান্ত স্থাপিল অসদ্ব্যাখ্যা করি বাদ॥
সুশীল সুধীর শুভমতি শিষ্ট শান্ত।
প্রিয়ংবদ পর উপকারেতে একান্ত॥
সর্ব্বগুণাকর গুণ কহনে না যায়।
ত্রৈলোক্যপাবন মহা-মহান্ত-আশয়॥
নানাগ্রন্থ কৈল সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।
প্রাকৃত পণ্ডিতে যার নাহি পায় অন্ত॥
পরম উপায় যাহা আশ্রয় করিয়া।
কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব পায় জগত ভরিয়া॥
কর্ম্মজ্ঞানে লোক সব জড়িত আছিল।
শুদ্ধভক্তি অমৃতের স্বাদ আস্বাদিল॥
এ হেন দয়ার নিধি ভুবনে আইল।
জীবত্রাণ হেতু বুঝি বিধি সিরজিল॥

গুণ কে কহিতে পারে যাঁহার সদ্‌গুণে।
বশীভূত শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি বাখানে॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি আইসে কোন জন।
তাহারে পুছয়ে প্রভু করিয়া যতন॥
কেমতে আছয়ে মোর শ্রীবৃন্দাবন।
কেমন আছয়ে মোর রূপ সনাতন॥
সৌভাগ্যের সীমা যাতে গুণের সাগর।
পূজ্য আরাধ্যমধ্যে জগতের সার॥
মহাভক্তি মহাপ্রেম মহান্ পাণ্ডিত্য।
মহাজিতেন্দ্রিয় মহাগুণবান্ নিত্য॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন দুই সহোদর।
উজীর আছিলা দোঁহে গৌড়িয়া পাৎসার॥
দবীরখাস নাম আর সাকর মল্লিক।
খেতাব দোঁহার সর্ব্ব খেতাবে অধিক॥
বড় বুদ্ধিমান বড় প্রতাপে উন্নত।
অর্থে পরিপূর্ণ যথা লক্ষ্মী বশীভূত॥
ভাগ্যের দেখহ সীমা দয়াল গৌরাঙ্গ।
পূর্ণ কৃপা কৈলা যাতে ছুটে সর্ব্বসঙ্গ (ক)॥
প্রথমে শ্রীবৃন্দাবন গমন উদ্যমে।
প্রভু কানাইর নাটশালা নাম এক গ্রামে॥
আইলেন যবে শুনি রূপ সনাতন।
রাত্রিযোগে গিয়া লৈল চরণে শরণ॥
বহু স্তুতি নতি করি চরণে পড়িয়া।
আত্মসমর্পণ কৈল কাতর হইয়া॥
প্রভু বড় কৃপা কৈল দয়ার্দ্র হইয়া।
সংক্ষেপে কহিলা কিছু উপদেশ দিয়া॥
বিষয় তেজিয়া হও নিশ্চিন্ত মানস।
পশ্চাত মিলিব মুঞি কহিল বিশেষ॥
প্রভুরে দেখিতে লোক লক্ষ লক্ষ আইসে।
সঙ্গ নাহি ছাড়ে, চলে ঘোর চারিপাশে॥
সনাতন কহে প্রভু লোক লক্ষ কোটি।
সহ বৃন্দাবন যাওয়া নহে পরিপাটী॥
সনাতন বাক্যে প্রভু আনন্দিত হিয়া।
অতি গ্রাহ্য কৈলা সেই বাক্য প্রশংসিয়া॥

(১) শ্রীরূপ...চরকি—রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী—এই তিনজন ছিলেন মূর্ত্তিমতী হরিভক্তির আধার স্বরূপ, এবং তাঁহাদের দেহে সব সময় প্রেমজনিত আটটি সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পাইত। সেই আটটি ভাব—স্তম্ভ (শরীরের স্তব্ধতা), স্বেদ (ঘাম), রোমাঞ্চ (পুলক), অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ্য (বিবর্ণতা), স্বরভঙ্গ, প্রলয় (মন ও শরীরের চেষ্টা লোপ)।

পাঠান্তর—(ক) সর্ব্বসঙ্গ—সর্ব্ববন্ধ।

রূপ সনাতন নাম দোঁহাকারে দিয়া।
পুন ফিরি পুরুষোত্তম গেলেন চলিয়া॥
প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ॥
জন্মিল যাহাতে আর পরম বৈরাগ॥
প্রথমে শ্রীরূপ গেলা বিষয় ছাড়িয়া।
কৃষ্ণাবেশে মগ্ন সদা বৃন্দাবনে গিয়া॥
শ্রীল সনাতন সদা উৎকণ্ঠিত মন।
বৈরাগ্যের পথে নিজ রাখিয়া নয়ন॥
রাজকর্ম্মে নাহি জ্ঞান বিরলেতে বসি।
শাস্ত্র অনুশীলন করেন দিবানিশি॥
পাতসা ডাকিয়া লোক পাঠাইলে কহে।
কহ গিয়া তার কিছু পীড়া হয় দেহে॥
পীড়া শুনি পুন রাজা বৈদ্য পাঠাইলা।
বৈদ্য আসি পরখিয়া সুস্থ দেখি গেলা॥
সুস্থ শুনিঞা রাজা উদ্বিগ্ন হইয়া।
আপনি আইলা সনাতনেরে চাহিয়া॥
আস্তেব্যস্তে সনাতন সম্মান করিয়া।
বসাইল উপযুক্ত আসন অর্পিয়া॥
রাজা কহে তোমার মনের কথা কিবা।
কার্য্যে নাহি যাহ, নাহি বুঝি কি করিবা॥
এক ভাই তোমার ফকির হইয়া গেলা।
তুমিহ তাহাই বুঝি করিবে ভাবিলা॥
তবে সনাতন কহে অন্তরের মর্ম্ম।
আমা হৈতে আর নাহি চলিবেক কর্ম্ম॥
তত্ত্ব বুঝি সনাতনে রাখে কারাগারে।
কয়েদ রাখিলা কিন্তু বিষাদ অন্তরে॥
দৈবাত চলিলা রাজা দক্ষিণদেশেতে।
কোন প্রতিযোগী সনে বিগ্রহ[১] করিতে॥
হেথা বন্দিখানার যে প্রধান যবন।
তাহারে বিনীত করি কহে সনাতন॥
আমি তব আজন্ম যে উপকার কৈনু।
তার প্রত্যুপকার মোর কর কিছু জনু॥
মোরে বন্দিখানা হৈতে যদি ছাড়ি দেহ।
গোসাঞি তরাবে তব বাপদাদা সহ॥
আর পাঁচ হাজার যে মুদ্রা আগে লহ।
ধর্ম্ম অর্থ লাভ হবে যদ্যপি করহ॥
জমাদার কহয়ে যে আজ্ঞা কর পারি।
কিন্তু যে তস্কির[১] হৈলে প্রাণে পাছে মরি॥
তেঁহো কহে ভয় কি যুকতি আছে ভাল।
রাজারে কহিবে তেঁহো জলে প্রবেশিল॥
গঙ্গাতে লইয়া গেনু স্নান করাইতে।
ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিল বিবেকেতে॥
এই দেশে না রব মুঞি হৈয়া দরবেশ।
দেশান্তর যাব, রাজা না পাবে উদ্দেশ॥
তথাচ যবন-মন প্রসন্ন নহিল।
তবে আর কিছু মনে যুকতি করিল॥
সাত হাজার মুদ্রা আনি যবনের আগে।
ধরিলা যবন সেই মুদ্রা-অনুরাগে॥
খালাস করিয়া গঙ্গা পার করি দিলা।
ঈশান নামেতে ভৃত্য সহিত চলিলা॥
লুকাইয়া পঞ্চদশ মোহর ঈশান।
পথের সম্বল হেতু বান্ধি লইলেন॥
বনপথে চলে গোসাঞি নগর ছাড়িয়া।
ফল মূল জল মাত্র আহার করিয়া॥
কথোক দিবসে গেলা পাতোড়া-পর্ব্বতে।
তথা এক দস্যু হয় কুটুম্ব-সহিতে॥
ভূঞা করি খ্যাত হয় হাত-গণনাতে।
যার স্থানে যেই দ্রব্য পারয়ে কহিতে॥
উত্তরিলা অপরাহ্ণ সময় যাইয়া।
হাত গণি নিজ স্বার্থ জানি সেই ভূঞা॥
গোসাঞিরে বহু সমাদরে সেবা কৈলা।
রাজমন্ত্রী সনাতন চিন্তিতে লাগিলা॥
এই ব্যক্তি বিনে পরিচয়ে কেনে মোরে।
যথোচিত প্রণয় আদর ভক্তি করে॥
বিরলে ডাকিয়া কিছু পুছেন ঈশানে।
সত্য কহ কিছু দ্রব্য আছে তব স্থানে॥
ঈশান কহেন হয় পনের মোহর।
গোসাঞি কহেন এই কৃতান্তের চর॥

বিগ্রহ যুদ্ধ।

১। তস্কির—প্রকাশ, গোলযোগ।

কেনে আনিয়াছ সাথে করিয়া যতন।
ত্যাগ কর এখনি যে যাইবে জীবন॥
এত কহি মোহর ঈশান-স্থান হৈতে।
মাগিয়া লইলা সুধী দস্যে সমর্পিতে॥
একটি ঈশানে দিয়া চৌদ্দটি লইয়া।
ভূঞার হস্তেতে দিলা বিনয় করিয়া॥
হাসিয়া কহয়ে ভূঞা সুবুদ্ধি যে তুমি।
ইহা হেতু রাত্রে তোমায় মারিতাম আমি॥
চৌদ্দটি মোহর দিলে আর এক হয়।
ভাল ভাল থাকুক নাহিক কিছু ভয়॥
ভাল কৈলে দ্রব্য দিলে আপন স্বেচ্ছায়।
তুষ্ট হৈনু নাহি লব দিব যে তোমায়॥
এত বলি মোহর ফিরিয়া পুন দিল।
গোসাঞি একান্তে তাহা লৈতে না চাহিল॥
তথাচ যতন করি তাঁর হস্তে দিল।
গোসাঞি লইয়া মুদ্রা ঈশানে সোঁপিল॥
তাহারে কহিলা এই স্বর্ণমুদ্রা লও।
মোর সঙ্গ ছাড়ি তুমি গৃহে চলি যাও॥
রোদন করিয়া তেঁহো গৃহে চলি গেলা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোসাঞি চলিলা একেলা॥
চলিতে চলিতে হাজিপুর স্থানে গিয়া।
রাত্রে এক বাগিচাতে রহিলা পড়িয়া॥
তাঁর ভগ্নীপতি ঘোড়া-খরিদ কারণ।
আসিয়াছে সেই বাগিচাতে বাসাস্থান॥
হাওয়াখানা টুঙ্গির উপরে বসিয়াছে।
নিকটে গোসাঞি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ফুকারিছে॥
স্বর শুনি মনে কিছু সন্দিগ্ধ হইয়া।
নাম্বিয়া আপনি তথা গেলেন চলিয়া॥
দেখে গিয়া বসি রাজমন্ত্রী সনাতন।
চমৎকার হৈল মুখে না সরে বচন॥
হাহাকার করিয়া অঙ্গুলি নাকে ধরি।
কহয়ে খেদোক্তি করি চক্ষে পড়ে বারি॥
একি দশা আহা হেন রাজ্যপদ ছাড়ি।
মলিন বসন কেনে ভ্রমে যাহ গড়ি॥
এ হেন সুখের দেহে এতেক কেলেশ।
কেমনে সহিব এ দুঃখের নাহি শেষ॥
বৈরাগ্য না কর গৃহে বসি কৃষ্ণ ভজ।
আইস আইস গৃহেতে মলিন বস্ত্র তেজ॥
সনাতন বলে ভাই ও কথা না কহ।
মোর ভাগ্যে যে আছে হবে, তুমি ঘরে যাহ॥
উৎকট বুঝিয়া তেঁহ পুন না কহিল।
শীত নিবারণ হেতু সাল আনি দিল॥
মুচকি হাসিয়া গোসাঞি দূরে তেয়াগিল।
তাহা রাখি পুন এক বনাত আনিল॥
উত্তম জানিয়া সাধু তাহাও না নিল।
তবে তেঁহো মনে কিছু বিচার করিল॥
আশয় বুঝিয়া এক ভোট যে কম্বল।
আনিয়া দিলেন তবে চক্ষে বহে জল॥
তাহাই লইয়া অঙ্গে উঠিলা (ক) গোসাঞি।
চলিলা পশ্চিম দিগে সঙ্গে কেহ নাই॥
শ্রীচৈতন্য-শ্রীচরণ লক্ষ্য যে করিয়া।
উত্তরিলা সাধূত্তম কাশীপুরে গিয়া॥
শ্রীচৈতন্য বলিয়া ফুকারে বারবার।
গদগদভাবে বহে গলদশ্রুধার॥
যারে তারে পুছে ভাই গৌরাঙ্গসুন্দর।
কেহ দেখিয়াছ কোথা গুণের সাগর॥
উন্মত্তের প্রায় সাধু খুঁজিয়া বেড়ায়।
চন্দ্রশেখরের ঘরে জানিলা নিশ্চয়॥
দ্বারে গিয়া ভাবে সাধু ভিতরে যাবার।
নীচ অধম আমি নাহি অধিকার॥
এত ভাবি বাহিরে দুয়ারে বসিয়াছে।
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি তাহা জানিয়াছে॥
ঘর হৈতে কহে প্রভু কোন নিজজনে।
দেখ ত বাহিরে কেহ বৈষ্ণব ওখানে॥
বসিয়া থাকয়ে যদি বোলাইয়া আন।
তেঁহো দেখি আসিয়া প্রভুরে কহে পুন॥
বৈষ্ণব না হয় এক কাঙ্গাল আছয়।
প্রভু কহে বোলাইয়া আন যেহ হয়॥
যতন করিয়া তবে ডাকিয়া আনিল।
প্রভু-দরশনে সাধু আনন্দে ভাসিল॥

পাঠান্তর—(ক) উঠিলা—উড়িলা।

দুইগোচ্ছা তৃণ করে, একগোচ্ছা দন্তে ধরে,
পড়িল গৌরাঙ্গ-রাঙ্গা পায়।
দুনয়নে শতধারা, রাজদণ্ডিজন-পারা[১],
অপরাধী আপনা মানয়॥
তোমার চরণ নাহি, ভজি মোর গতি এহি,
সংসার ভ্রমণে সদা ফিরি।
কদর্য্য বিষয়ভোগ, কামাদি ষড়বর্গ রোগ,
তাহে ভ্রমি সুখবুদ্ধি করি॥
নীচ সঙ্গে সদা স্থিতি, নীচ ব্যবহারে মতি,
নীচ কর্ম্মে সদাই উল্লাস।
এ হেন দুর্লভ জন্ম, পাইয়া কি কৈনু কর্ম্ম,
কেবল হইল উপহাস॥
শরণ লইনু প্রভু, হে নাথ গৌরাঙ্গ বিভু,
করুণা-কটাক্ষ মোরে কর।
ও রাঙ্গাচরণে মতি, ত্রৈলোক্যের সারগতি,
এ অধম জনারে বিচার॥
সনাতনের আর্ত্তনাদ, শুনিয়া দৈন্য-বিষাদ,
ছল ছল প্রভুর নয়ন।
আলিঙ্গন দিতে চায়, সনাতন পাছে ধায়,
কহে মোরে না কর স্পর্শন॥
তোমা স্পর্শযোগ্য প্রভু, মুঞি ছার নহি কভু,
ঘৃণাস্পদময় (ক) এই দেহ।
পাপময় সুকদর্য্য, সাধুর সভায় বর্জ্জ্য,
মোরে স্পর্শ কভু না করহ॥
প্রভু কহে সনাতন, দৈন্য কর সম্বরণ,
তোর দৈন্যে ফাটে মোর বুক।
কৃষ্ণ যে দয়াল হয়, ভাল মন্দ না গণয়,
হইল যে তোমার সম্মুখ॥
কৃষ্ণকৃপা তোমা' পরি, যতেক কহিতে নারি,
উদ্ধারিলা বিষয় কূপেতে।
নিষ্পাপ তোমার দেহ, কৃষ্ণভক্তি মতি অহ,
তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে॥

সনাতনের হাতে ধরি, বসাইয়া গৌরহরি,
আগমন শুভবার্ত্তা পুছে।
ভোট কম্বল গায়, প্রভুরে নাহিক ভায়,
বিষয়ের শেষ কিছু আছে॥
অন্তরে প্রভু ভাবয়, ভোটপানে ঘন চায়,
সনাতন তৎক্ষণে বুঝিলা।
ক্ষণেক বিলম্বে উঠে, গিয়া জাহ্নবীর তটে,
মনে কিছু যুকতি সৃজিলা॥
ভোট-কম্বল খানি, এক যে বৈষ্ণব জানি,
তাঁরে দিয়া তাঁর কান্থা খানি।
পরিবর্ত্ত করি লৈল, তেঁহো তাহে তুষ্ট হৈল,
গোসাঞি লইল শলাঘা মানি॥
সেই কান্থা গলে দিয়া, প্রভুর নিকটে গিয়া,
দণ্ডবত করিয়া পড়িলা।
প্রভু, গলে কান্থা দেখি, ছল ছল করে আঁখি,
উঠাইয়া আলিঙ্গন কৈলা॥
প্রভু কহে সনাতন, কৃষ্ণ যে রতনধন,
অনেক যে দুঃখেতে মিলয়।
দেহ গেহ পুত্র দার, বিষয় বাসনা আর,
সর্ব আশা যদি তেয়াগয়॥

তবে প্রভু সনাতনে বড় কৃপা কৈলা।
শক্তি সঞ্চারিয়া নিজ তত্ত্ব জানাইলা॥
সুমধুর নানা তত্ত্ব যে কহিলা বাণী।
মূর্খ মুঞি সে সকল কহিতে না জানি॥
সনাতনে কহে তুমি বৃন্দাবনে গিয়া।
ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশহ শাস্ত্র বিচারিয়া॥
যতেক কহিল মুঞি এই মত সার।
সিদ্ধান্ত যে এই শাস্ত্র-অনুসার॥
মহিষী-হরণ আদি লোকে না বুঝিয়া।
কুব্যাখ্যা করয়ে যত মর্ম্ম না জানিয়া॥
সে সব ভঞ্জন করি সিদ্ধান্ত স্থাপিয়া।
অদ্বৈত বিরুদ্ধ মত নিরাস করিয়া॥
নানা গ্রন্থ বর্ণন করহ লোকহিতে।
কৃষ্ণ-কৃপা তোমারে হইবে অচিরাতে॥

১। যে রাজদণ্ড লাভ করিয়াছে তাহার মত।
পাঠান্তর—(ক) ঘৃণাস্পদময়—ঘৃণাস্পদ মোর।

সনাতন কহে প্রভু এ সব বিচার।
মূর্খ হৈয়া কেমতে করিব মুঞি ছার॥
প্রভু কহে মোর আজ্ঞায় বেদশাস্ত্র যত।
হৃদয়ে উদয় হবে সুসিদ্ধান্ত মত॥
এক চতুরাই কৈলা তবে সনাতন।
পুছয়ে প্রভুর স্থানে করিয়া যতন॥
শুক্ল রক্ত তথা পীত ইত্যাদিক করি।
যুগে যুগে অবতার করেন যে হরি॥
তিনযুগে যে যে অবতার তা কহিলে।
পীতবর্ণ কলিতে কে তাহা না বলিলে[1]॥
প্রভু কহে সনাতন চতুরাই ছাড়।
ঐ বাক্যে নিজ তত্ত্ব কহিলা যে দঢ়॥
সংক্ষেপে কহিনু প্রভু-সহিত মিলন।
তবে চলি গেল গোসাঞি শ্রীবৃন্দাবন॥
অলৌকিক অসম্ভব গোসাঞির প্রেম।
বৈরাগ্যের সীমা আর অপতিত নেম[2]॥
মূর্ত্তিমান মহাতেজ সমুদ্র গম্ভীর।
সাগরান্তা পৃথিবীর মধ্যে এক ধীর॥
প্রতিদিন এক এক বৃক্ষতলে বাস।
প্রতিদিন পরিক্রমা নাহিক আলস॥
বৃক্ষতলে বসি সদা গ্রন্থানুশীলন।
অলক্ষ্যে করেন পরিক্রমা বৃন্দাবন॥
এক লীলা গোসাঞির শুন চমৎকার।
যাহার শ্রবণে হয় ভবনিধি পার॥
একদিন গোসাঞি স্নান করিতে যমুনা।
স্পর্শমণি পাইলেন যাতে হয় সোণা॥
মনে ভাবে কোন দীন দরিদ্র দেখিয়া।
তারে দিব এখন কোথাও রাখি লৈয়া॥
স্পর্শ না করিয়া খাপরাতে ধরি লঞা।
কোন স্থানে রাখিলা মৃত্তিকা আচ্ছাদিয়া॥

১। তুঃ—আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥
ভাগবত ১০।৮।৯
শুক্লরক্ত পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য ত্রেতা কলিযুগে ধরেন শ্রীপতি॥
চৈঃ চঃ।

২। নেম—নিয়ম।

দৈবযোগে গৌড়দেশে এক যে ব্রাহ্মণ।
বর্দ্ধমান দক্ষিণে মানকরেতে ভবন॥
জীবন তাহার নাম, বহু যে কুটুম্ব।
সুদরিদ্র কিছুমাত্র নাহি অবলম্ব॥
বিবেকী হইয়া কাশীপুরেতে যাইয়া।
অর্থাকাঙ্ক্ষী হই বহু বৎসর ব্যাপিয়া॥
শিব-আরাধনা কৈল তীব্র তপ করি।
প্রসন্ন হইয়া শিব কহে বিপ্রোপরি॥
বৃন্দাবন যাহ তথা সনাতন নাম।
সাধুর নিকটে গিয়া পুরিবেক কাম॥
বহু ধন পাবে তথা যাবে দরিদ্রতা।
লোকেতে দুর্লভ যাহা সর্ব্বদুঃখহন্তা॥
কিবা দয়াময় দেখ দেব-দেববর।
গরল চাহিতে দিলা অমৃতসাগর॥
শিবের আজ্ঞাতে বিপ্র ধনের আশাতে।
বৃন্দাবনধাম তবে চলিলা ত্বরিতে॥
বিপ্রের সংসার-ক্ষয়-উন্মুখ সময়।
তাহা নাহি জানে, ধন চিন্তয়ে হৃদয়॥
বিধাতা সদয় যবে হয় দুঃখিজনে।
গুগুলি[1] খুঁজিতে হস্তে মিলয়ে রতনে॥
কথোদিনে বৃন্দাবনধামে সনাতন।
নিকট হইল গিয়া সুকৃতী ব্রাহ্মণ॥
গোসাঞিরে গিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ করি।
আনন্দ-আবেশে রহে করযোড় করি॥
গোসাঞি প্রণাম করি করি যোড়কর।
পুছেন ব্রাহ্মণে মিষ্টবাক্যে প্রিয়ঙ্কর॥
কে তুমি ঠাকুর মহাশয় কিবা অর্থে।
আগমন হৈল কৃপা করি মোর মাথে॥
গোসাঞির নম্রতা সুমিষ্ট বাক্য শুনি।
দ্রবিল বিপ্রের চিত্ত চমৎকার গণি॥
বিপ্র কহে মহাশয় আমি সুদরিদ্র।
অর্থ লাগি বহুকাল ভজিলাম রুদ্র॥
কৃপা করি মহাদেব আদেশ করিলা।
তোমার চরণে মোরে আসিতে কহিলা॥

১। গুগুলি—ছোট শামুক।

বৃন্দাবনে সনাতন গোসাঞির স্থান।
যাইলে পাইবে অর্থ পরম রতন (ক)॥
গোসাঞি কহেন মুঞি অর্থ কোথা পাব।
মহাদেব মোর স্থানে কি হেতু পাঠাব॥
ভিক্ষাজীবী মুঞি মোর অর্থ কোথা হয়ে।
ইহা শুনি ব্রাহ্মণের বিদরে হৃদয়ে॥
হা হা মোর ভাগ্যে কি ঈশ্বর প্রতারিল।
কিংবা মুঞি স্বপনে কি প্রলাপ দেখিল॥
ব্রাহ্মণে কাতর দেখি দয়াল (খ) গোসাঞি।
আকাশ পাতাল ভাবি কুল নাহি পাই॥
দৈবাৎ পড়িল মনে মণির বৃত্তান্ত।
আশ্বাস করিয়া ব্রাহ্মণেরে কহে (গ) শান্ত॥
হায় হায় (ঘ) ঠাকুর মোর স্মরণ হইল।
মিথ্যা নহে শ্রীমন্ মহাদেব যে কহিল॥
স্পর্শমণি হয় (ঙ) চল দেখাইয়া দিই।
বিস্মৃত হইনু তেকারণে কহি নাই॥
ব্রাহ্মণেরে লঞা যমুনার তীরে গিয়া।
বামহস্ত তর্জ্জনী অঙ্গুলী হেলাইয়া॥
কহে এইখানে দেখ মৃত্তিকা খুদিয়া।
ব্রাহ্মণ খুদিয়া বুলে না পাই খুঁজিয়া॥
গোসাঞিরে কহে কোথা দেহ উঠাইয়া।
তেঁহো কহে না স্পর্শিব সিনান করিয়া॥
পুন তলাসিতে বিপ্র মণি যে পাইল।
গোসাঞিরে দণ্ডবৎ করিয়া চলিল॥
পথে চলি যায় বিপ্র ভাবে মনে মনে।
এ হেন পদার্থ গোসাঞি দিলা কি কারণে॥
রাখিবার কাজ থাকুক স্পর্শ নাহি করে।
স্পর্শের থাকুক কাজ ঘৃণায় নেহারে (চ)॥
আমার চরিত্র এই সেই বস্তু লাগি।
তপ করি ঈশ্বরসেবনে অনুরাগী॥
ছি ছি মোরে ধিক্ ধিক্ হেন তুচ্ছ বস্তু।
যাহার লাগিয়া মুঞি সদাই অসুস্থ॥

অতএব হেন বস্তু দূরে তেয়াগিয়া।
গোসাঞির চরণে শরণ লব গিয়া॥
তেঁহো যে রতন প্রাপ্ত হইয়া মজিল।
তাহাই লইব এই প্রতিজ্ঞা করিল॥
তাঁহার চরণে গিয়া শরণ লইব।
বিনিমূল্যে তাঁর পায় বিক্রীত হইব॥
এতেক ভাবিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া।
বটেশ্বর গ্রাম হৈতে গেলেন ফিরিয়া॥
গোসাঞির পদে গিয়া পড়ি বিপ্রবর।
নিজ অভিলাষ যাহা কহিলা বিস্তর॥
এ তুচ্ছ রতনে মোর নাহি কিছু কাম।
কৃপা করি প্রভু মোরে কর আত্মসম॥
শরণ লইনু তব অভয় চরণে।
কৃতার্থ করহ দিয়া কৃষ্ণপ্রেমধনে (ক)॥
গোসাঞি কহেন তুমি তাহা না পাইবে (খ)।
ঘরে গিয়া কৃষ্ণ ভজ সংসার তরিবে॥
তেঁহো কহে নাহি যাব তোমার চরণে।
শরণ লইনু কৃপা কর মূঢ়জনে॥
গোসাঞি কহেন তবে পার যোগ্য হৈতে।
স্পর্শমণি যদি শক্ত হও তেয়াগিতে॥
এত শুনি বিপ্র স্পর্শমণি লৈয়া করে।
টান মারি ফেলি দিল যমুনা-মাঝারে॥
গোসাঞি দেখিয়া তবে আনন্দিত হৈলা।
ব্রাহ্মণেরে ধরি গাঢ় আলিঙ্গন কৈলা॥
প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা দিয়া।
কৃতার্থ করিলা কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারিয়া॥
অতএব শ্রীমান্ সনাতন স্পর্শমণি।
যার পদ-দৃষ্ট-স্পর্শ মাত্র হৈল ধনী॥
প্রাকৃতিক তুচ্ছ ধনে বিরক্তি হইল।
পরম রতন কৃষ্ণপ্রেমধন পাইল॥
সর্ব্বদুঃখ দূরে গেল ধনাঢ্য হইল।
ত্রিজগতে ধন্য মান্য পূজ্যতম ভেল॥

পাঠান্তর—(ক) পরম রতন—ইথে নাহি আন। (খ) দয়াল—বলেন। (গ) কহে—করে। (ঘ) হায় হায়—হয় হয়। (ঙ) হয়—লবে। (চ) নেহারে—না হেরে।

পাঠান্তর—(ক) কৃষ্ণপ্রেমধনে—কৃষ্ণ প্রেমদানে। (খ) পাইবে—পারিবে।

তাঁহার নন্দন শ্রীল ভাগবত নামে।
তাঁহার সন্তান কাঁটামাড়গাঁয়ে গ্রামে॥
অদ্যাপিহ আছেন গোসাঞি বলি খ্যাত।
পূর্ব্ব মানকর এবে মাড়গাঁ বসত॥
বিপ্র যবে স্পর্শমণি যমুনায় ডারিল।
একব্বর পাৎসা পরম্পরায় শুনিল॥
মণি উঠাইতে বহু যতন করিল।
হস্তিপদে জিঞ্জির বাঁধিয়া নাম্বাইল॥
যমুনার জলে ইতি-উতি ফিরাইতে।
শিকল সুবর্ণ হইল ঠেকিয়া মণিতে॥
মণি না পাইল নানা উপায় সৃজিয়া।
ঈশ্বরের কৃপা বিনে কে পায় খুঁজিয়া॥
গোস্বামীর লীলা হয় অনন্ত অপার।
পরমপবিত্র পদে পদে চমৎকার॥
সব কে কহিতে পারে কিঞ্চিৎ কহিল।
আরো কিছু কহিবারে উৎসাহ বাঢ়িল॥
মন-মোহনিঞা শ্রীমন্ মদনমোহন।
শ্রীমতী কুব্জা মহিষীর প্রকাশন॥
মথুরাচৌবের নারী করেন সেবন।
নিতি মাধুকুরি[১] হেতু যান সনাতন॥
ঠাকুরের মাধুরী দেখিয়া প্রেম হয়ে।
কিন্তু অনাচারে সেবে দেখি দুঃখ পায়ে॥
আচার করিয়া যে সেবিতে সনাতন (ক)।
ক্রমমত কহি দিলা করিয়া যতন॥
চৌবের ঘরণী তাহা নাহি সমুঝিলা।
নিজমত প্রেমভাবে সেবিতে লাগিলা॥
আর দিন সনাতন যাইয়া দেখেন (খ)।
চৌবের বালক সহ মদনমোহন॥

১। মাধুকুরি—মধুকর অর্থাৎ ভ্রমর যে ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে সেইরূপ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা।
পাঠান্তর—(ক) সেবিবারে সনাতন।
(খ) সনাতন দেখিতে ইচ্ছিল।
এখানে অতিরিক্ত দুইটি পঙ্‌ক্তি দেখা যায়ঃ—
(চৌবের বাড়ীতে গিয়া উপনীত হৈল)॥
আচার...গণন (এর) পর
(ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করে ব্রজেন্দ্র নন্দন)॥

একত্র বসিয়া অন্ন করেন ভোজন।
আচার বিচার কিছু না করে গণন॥
গোসাঞি দেখিয়া তাহা প্রেমে মূর্চ্ছা হয়।
চৌবের ঘরণী প্রতি স্তবন করয়॥
গোসাঞি যে আপনাকে অপরাধী মানি।
বিনয় করয়ে তাঁরে করি যোড় পাণি॥
মাতা তুমি যেমত আচারে কর সেবা।
সেইমত কর (ক) অন্যমত না করিবা॥
তেঁহো কহে, ভাল ভাল তাহাই করিব।
দিন চড়ি যায় আচার করিতে নারিব॥
গোসাঞি কহেন মাতা নিবেদন করি।
আজ যদি মোরে কিছু দেহ মাধুকুরি॥
তোমার শিশুর এই পাত্র অবশেষ।
যাহা থাকে তাহা দেহ, করি কৃপালেশ॥
তাহি উঠাইয়া গোসাঞিরে মাতা দিলা।
গোসাঞি পাইয়া কৃতকৃতার্থ মানিলা॥
সাক্ষাতে দেখিলা মদনমোহনে খাইতে।
মদনমোহন দেখাইলা জানাইতে॥
প্রসাদ পাইয়া সাধু আনন্দে বিহ্বল।
মদনটেরেতে বাস যথা অর্কলোল॥
রাত্রিকালে স্বপনে শ্রীমদনমোহন।
শ্রীমান্ সনাতন গোস্বামীরে যে কহেন॥
তুমি মোরে চৌবের ভবন হৈতে আনি।
সেবা কর দিয়া মাত্র তুলসী আর পানি॥
হোতা চৌবে ঠাকুরাণী প্রতি কহে হরি।
সনাতনে দেহ মোরে সমর্পণ করি॥
প্রাতে সনাতন হর্ষভরে তথা গিয়া।
ঠাকুরাণী প্রতি কয় বিনয় করিয়া॥
মদনমোহন আজ্ঞা করিল আমারে।
মনে সাধ হৈল বনে বাস করিবারে॥
ঠাকুরাণী কহে হুঁহুঁ সত্য বটে বটে (খ)।
শঠের বিদ্যায় পারগ বটে ঘটে॥
আমারেও কহিলা যাইব অন্যস্তরে।
পূর্ব্বের স্বভাব যে তা ছাড়িতে না পারে॥

পাঠান্তর—(ক) কর—সেব।
(খ) ঠাকুরাণী কহে ইহ সত্য হয় বটে।

সুয়া (ক) পক্ষী যথা প্রতিপালন করয়।
শিকল কাটিয়া পাছে (খ) উড়িয়া পলায়॥
শ্রীমতী যশোদা প্রাণপণেতে পালিল।
ক্ষণমাত্র বুকে শেল হানি পলাইল॥
যার যে স্বভাব হয়, তাহা কোথা যাবে।
যায় যাউক আমার তাহাতে কিবা হবে॥
যদ্যপি অন্তরে দুঃখ সহিতে না পারি।
বরঞ্চ মরিব দেহ যমুনায় ডারি॥
মাতার মাধুর্য্য গাঢ় প্রেমের কারণ (গ)।
শুদ্ধ বাৎসল্য তাহে প্রেমের ভর্ৎসন॥
শুনিঞা শ্রীসনাতন প্রেমের (ঘ) সাগরে।
ভাসিয়া আনন্দধারা বহে গলদ্ধারে॥
মাতা আর্ত্তনাদ করি শ্রীল সনাতনে।
মদনমোহন দিয়া পড়ে অচেতনে॥
উচ্চস্বরে কান্দে মাতা ভূমে গড়ি যায়।
যশোদা মাতার দশা যথা পূর্ব্বে হয়॥
সনাতন মদনমোহন যে পাইয়া।
আপন আশ্রমে আনে অতি হৃষ্ট হঞা (ঙ)॥
দারিদ্র্য যেমন নিধি পাইয়া আহ্লাদ।
হস্তেতে পাইল যথা আকাশের চাঁদ॥
সূর্য্যঘাট নিকটে সুরম্য টিলাপরি।
ঝোপড়া বান্ধিলা এক তৃণ জড় করি॥
চুটকি মাঙ্গিয়া আনি আঙা কড়ি করি।
হরিষবিষাদে সুকুমার আগে ধরি॥
মদনমোহন কহে লবণ বিহীনে।
খাইতে না পারি মোর না রুচে বদনে॥
সনাতন কহে যদি খাইতে নারিব।
লবণ নিতানি (চ) তবে মুঞি কোথা পাব॥
আর দিন লবণ মাঙ্গিয়া আনি দিল।
পুন কহে রুখ আঙা খাইতে নারিল॥
তেঁহো কহে ঘৃত শর্করা কোথা পাব।
[illegible] স্থানে মুঞি মাঙ্গিতে নারিব॥

পাঠান্তর—(ক) সুয়া—টিয়া। (খ) পাছে—পাখী।
(গ) কারণ—কথন। (ঘ) প্রেমের—অমৃত।
(ঙ) হঞা—হিয়া।
(চ) লবণ নিতানি—নিতুই লবণ।

ক্রমে ক্রমে তুমি নানা বাহেনা করহ।
আমা হৈতে নাহি হবে চাহ করি লহ॥
দৈবযোগে এক মহাজন দ্রব্য লৈয়্যা।
মথুরায় যাই সেই জাহাজে চড়িয়া॥
আটকিয়া গেল তরী চড়ায় লাগিয়া।
মহাজন সর্ব্বনাশ হইল গণিয়া॥
হাহাকার করি নানা উপায় চিন্তয়।
রাত্রিযোগে দেখে তীরে এক মহাশয়॥
গদগদভাবে কৃষ্ণনাম বসি জপে।
এক শ্রীবিগ্রহ তথা তেজে বন ব্যাপে॥
অতি আর্ত্ত হই মহাজন কান্দি কহে।
শরণ লইনু প্রভু রক্ষা কর মোহে॥
কৃপা করি সঙ্কটে এবার কর রক্ষে।
প্রতিজ্ঞা করিনু মুঞি কায়মনোবাক্যে॥
এবার বাণিজ্যে যত উপস্বত্ব হব।
সমুদায় শ্রীচরণপদ্মে সমর্পিব॥
মন্দির নির্ম্মাণ করি সেবার শৃঙ্খলা।
করি দিয়া পশ্চাৎ করিব গৃহে মেলা॥
এতেক প্রার্থনা করি মহাজন গিয়া।
জাহাজে চড়িবামাত্র চলিল ধাইয়া॥
মথুরা যাইয়া হৈল বাণিজ্য দ্বিগুণ।
জানিল করিল ইহা মদনমোহন॥
যত লাভ হৈল তেজি অন্তর-সঙ্কোচ
মদনমোহন অর্থে করিলা খরচ॥
বৃহৎ মন্দির আর নাটশালা আদি।
বিহারের স্থান নানা আর রত্নবেদী॥
সেবার শৃঙ্খলা নানা জাতি ভোগরাগ।
বন্ধান বনান কৈল করি অনুরাগ॥
শ্রীমৎ (ক) সনাতন তাহে অতিহৃষ্ট মন।
বসাইয়া সেবে তাহে মদনমোহন॥
অদ্যাপিহ সেই যে মন্দির বর্ত্তমান।
গোস্বামিপাদের সেই বসিবার স্থান॥
লালদাস অভাগিয়া তাঁহার চরণ।
পরম উপায় জানি লইল শরণ॥

পাঠান্তর—(ক) শ্রীমৎ—শ্রীল।

শ্রীরূপ গোস্বামী

শ্রীমদ্‌রূপ গোস্বামীর অপার মহিমা।
যথা সনাতন তথা মহিমার সীমা॥
রূপ-সনাতন বলি জগত বিখ্যাত।
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়তম গৌর যার নাথ॥
অতএব রূপ গোস্বামীর কিছু গুণ।
গাইব আপন মতি-শোধন কারণ॥
অনন্ত অপার লীলা শ্রীরূপের হয়।
কিঞ্চিত কহিব সব কহা নাহি যায়॥
একদিন ব্রহ্মকুণ্ডতীরেতে বসিয়া।
অনাহারে রহে কৃষ্ণে মানস অর্পিয়া॥
অনাহার জানি কৃষ্ণ দয়ার্দ্র হইয়া।
গ্রাম্য বালকের রূপ ধারণ করিয়া॥
একভাণ্ড দুগ্ধ আনি খাইবারে দিল।
দুগ্ধ দিয়া বালক চলিয়া পুন গেল॥
শ্রীরূপ ভাবিয়া স্থির করিতে নারিলা।
দুগ্ধ লইয়া পান করিতে লাগিলা॥
দুগ্ধের আস্বাদ নহে অলৌকিক স্বাদ।
কোটি কোটি অমৃতের স্বাদ মাত্র বাদ॥
খাইতে খাইতে উথলিল প্রেমভাব।
অপ্রাকৃত বস্তু তার এমতি স্বভাব॥
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড রাখিতেই মাত্র।
আপনি চলিয়া গেল অপ্রাকৃত পাত্র॥
শ্রীমৎ সনাতন শুনি এ সব বারতা।
চলিয়া আইল দ্রুত রূপ বসি যথা॥
অনুযোগ কৈল বহু আর্ত্তনাদ করি।
কৃষ্ণে দুঃখ দেহ কেনে অনশন করি॥
মাধুকুরী ভিক্ষা করি উদর ভরহ।
সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রে দুঃখ নাহি দেহ॥
আর অপরূপ শুন গোবিন্দ প্রকটে।
হইলা যেমতে বৃন্দাবনে যোগপীঠে॥
শ্রীগোবিন্দ আজ্ঞা দিলা শ্রীমদ্‌রূপেরে।
যোগপীঠে হও মুঞি মৃত্তিকা ভিতরে॥
এক গাভী নিতি আসি দাণ্ডায় যথায়।
স্তন হৈতে দুগ্ধ খেরে (ক) আমার মাথায়॥
মোরে লক্ষ্য করি সেই স্থানে যে খুদিয়া।
উঠাও আমারে সেব তথাই স্থাপিয়া॥
এত শুনি শ্রীরূপ গোসাঞি হৃষ্টমনে।
উঠাইয়া গোবিন্দ স্থাপিলা সিংহাসনে॥
অভিষেক আদি করি আনন্দ-কৌতুকে।
সেবন করয়ে যথা (খ) থাকে প্রেমসুখে॥
হে শ্রীমদ্‌রূপ গোস্বামী কর দয়া।
লালদাস-শিরে ধর শ্রীচরণ ছায়া॥

শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী

শ্রীজীব গোস্বামী হন তত্তুল্য মহান্ত।
প্রেমে পরাকাষ্ঠা যে গুণের নাহি অন্ত॥
ক্রমসন্দর্ভ আর ষট্‌সন্দর্ভ আদি।
নানাগ্রন্থে ভক্তি স্থাপি নিরাসিলা বাদী॥
শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র মন্ত্রশিষ্য হন।
শ্রীচৈতন্যকৃপাপাত্র পার্ষদ-প্রধান॥
তাঁহার চরিত্রলীলা কহা নাহি যায়।
কিছু গুণগান করি পবিত্র আশয়॥
ষট্‌সন্দর্ভ প্রকাশি জীবের হিত কৈলা।
অতি চমৎকার বড় সিদ্ধান্ত স্থাপিলা॥
সন্দেহভঞ্জন হেন নাহি ক্ষিতিতলে।
যত শাস্ত্রে বিরুদ্ধার্থ লোকে জল্পে বলে॥
পণ্ডিত অভিমানী যত কুব্যাখ্যা করিয়া।
অজ্ঞের সভায় কহে ভঙ্গি প্রকাশিয়া॥
ষট্‌সন্দর্ভ একবার যে করে শ্রবণ।
অন্য কলকলে তার নাহি ফিরে মন॥
যেই জন ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ না দেখিল।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সেই কভু না জানিল॥
পণ্ডিত গম্ভীর জীবগোসাঞির বিনে।
হেন বুঝি আর নাহি এ তিন ভুবনে॥

পাঠান্তর—(ক) খেরে—ক্ষরে।
(খ) যথা—সদা।

দিগ্‌বিজয়ী এক সর্ব্বত্র জিনিয়া।
ব্রজে রূপসনাতন পণ্ডিত জানিয়া॥
বিচার করিতে আইল গোসাঞির স্থানে।
নির্ম্মৎসর অহঙ্কার-শূন্য দুই জনে॥
বিচার না করি জয়পত্র লিখি দিলা।
পুনশ্চ শ্রীজীবগোসাঞির স্থানে গেলা॥
যমুনায় শ্রীজীবগোসাঞি স্নান করে।
হস্তী অশ্ব সহ দিগ্‌বিজয়ী গিয়া তীরে॥
কহে রূপ সনাতন বিচারের ডরে।
জয়পত্র লিখি দোঁহে দিলা যে আমারে॥
তুমিহ বিচার কর, নহে লিখি দেহ।
গোসাঞি শুনিয়া কিছু হইলা অসহ॥
মনে মনে চিন্তে এই পণ্ডিতাভিমানী।
রূপ-সনাতনের মহিমা নাহি জানি॥
পরাভব হৈল বলি করিয়াছে গর্ব্ব।
তাহার উচিত আজি করিব যে খর্ব্ব॥
ইহা ভাবি কহে, তুমি রূপ-সনাতনে।
বিনে শাস্ত্র-প্রসঙ্গেতে জিনিলে কেমনে॥
সে যা হউ তাঁহা সভা সহিত বিচারে।
তুমিত না হও যোগ্য, তেঁহো থাকু দূরে॥
আমি তাঁহা সভার ক্ষুদ্র শিষ্য-অভিমানী।
মোরে পরাভব কর তবে তোমা জানি॥
এত কহি বিচার তাহার সনে কৈল।
দিগ্‌বিজয়ী বিচারে হারি দর্প খর্ব্ব হৈল॥
একথা শুনিয়া রূপগোসাঞি কুপিয়া।
জীবগোসাঞিরে কহে ভর্ৎসন করিয়া॥
তুমিত বৈরাগী হার-জিত তেজি হৈলে।
তবে কেনে জিতিবারে আগ্রহ করিলে॥
সেই ব্যক্তি হারি-জিত অভিমানময়।
তাহার হৃদয়ে হয় জয়পরাজয়॥
তুমি কেনে পরাভব আপনি হইয়া।
না দিলে তাহার মান দীনতা করিয়া॥
তেঁহো কহে কৈল মোর গুরুর নিন্দন।
বিধি অনুসারে তার করিল শাসন॥
জীবগোসাঞির কভু অভিমান নাই।
তাহাও বুঝিয়াছেন শ্রীরূপগোসাঞি॥
তথাপিহ শাসন করয়ে ভঙ্গি করি।
লোক সংগ্রহের (ক) হেতু তাঁহার উপরি॥
কহে আজি হৈতে তব না হেরিব মুখ।
বজ্রতুল্য বাক্য শুনি কাঁপি গেল বুক॥
কাতর হইয়া বহু স্তুতি নতি কৈলা।
যদ্যপি গোসাঞি তাহে প্রসন্ন নহিলা॥
অন্নজল তেয়াগিয়া যমুনার তীরে।
গোসাঞির পদমাত্র ধেয়ান অন্তরে॥
পড়িয়া রহিলা দুনয়নে ধারা বহে।
শীর্ণ (খ) হইল দেহ প্রাণ মাত্র রহে॥
কথোক দিবস পরে (গ) বিশেষ কথন।
শুনিয়া খেদিত হইলা শ্রীল সনাতন॥
শ্রীরূপের নিকটে যাইয়া ধীরে ধীরে।
বাক্যছল করি তাঁরে এক প্রশ্ন করে॥
সদাচার যতেক তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
কিবা স্থির করিয়াছ সকলের ইষ্ট॥
শ্রীরূপ কহেন প্রভু মোর বিবেচনে।
জীবে দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রেতে বাখানে॥
গোসাঞি কহেন তবে কেনে নাহি হয়।
বাক্যের শ্লেষেতে তেঁহো বুঝিলা হৃদয়॥
যে আজ্ঞা বলিয়া জীব গোসাঞিরে ডাকি।
আলিঙ্গন করি মিলে ছল ছল আঁখি॥
শ্রীজীবগোসাঞি কৃতকৃতার্থ মানিয়া।
শতেক প্রণাম করে চরণে পড়িয়া॥
তাঁহার স্বভাব গুণ গাম্ভীর্য প্রভাব (ঘ)।
কহিবারে পারে যেই সেই অনুভাব॥
মুঞি মূর্খ নির্ব্বোধ অধম দুরাচার।
সে সব কথনে মোর নাহি অধিকার॥
তবে যে করিতে চাহি তাঁহার বর্ণন।
অন্ধ যেন শিল্প-রচনায় করে মন॥
অতএব মোটামুটি বাছাবাছা করি।
কোন মতে সে অভয় শ্রীচরণ স্মরি॥

পাঠান্তর—(ক) সংগ্রহের—শিখাবার।
(খ) শীর্ণ—বিশীর্ণ।
(গ) পরে—ব্যাজে।
(ঘ) তাঁহা সভার গুণ আর গাম্ভীর্য্য স্বভাব।

চরিত্র শ্রীগোপাল ভট্টের

[দোঁহা—মূল হিন্দী]

শ্রীবৃন্দাবনকী মাধুরী ইনমিলি আস্বাদন কিয়ো।
সর্ব্বস্ব রাধারমণ ভট্টগোপাল উজাগর॥ ইত্যাদি

শ্রীমান্ গোপাল ভট্ট অদ্ভুত চরিত্র।
ভুবনমঙ্গল কথা পরম মহত্ত্ব॥
শ্রবণমঙ্গল ভববন্ধ-বিমোচন।
কৃষ্ণপ্রেমরসময় ভক্তির জনন॥
ভট্ট গোস্বামী মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র।
প্রীতি হইয়া দিলা হরিনাম-মন্ত্র॥
যার প্রেম-অনুরোধে শ্রীরাধারমণ।
শালগ্রাম হইতে হৈলা মুরলীবদন॥
তাঁহার গুণের কথা কে কহিতে পারে।
কিছু গান করি মতিশোধনের তরে॥
তেঁহো মোর প্রভু তাঁর চরণেতে রতি।
জন্মে জন্মে রহে যেন এই মোর গতি॥
শ্রীমান্ মহাপ্রভু যবে তীর্থ-ভ্রমে[১] গেলা।
ভট্টমারি[২] (ক) গ্রামে চাতুর্ম্মাস্যস্থিতি কৈলা॥
শ্রীমান্ বেঙ্কটভট্ট নামে মহাশয়।
তাঁহার গৃহেতে রহে হইয়া সদয়॥
তাঁহার নন্দন শ্রীগোপালভট্ট নাম।
সদাই করয়ে যে প্রভুর সেবাকাম॥
প্রভু তাঁরে কৃপা করি শক্তি সঞ্চারিলা।
হরিনাম-মহামন্ত্র কর্ণেতে অর্পিলা॥
রাধাকৃষ্ণ-মাধুর্য্য শুদ্ধ-প্রেমভক্তি দিলা।
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব-আদি জানাইলা॥
বিষয় ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আকর্ষিলা।
শ্রীরাধারমণরূপে বড় কৃপা কৈলা॥
তাঁহার বৃত্তান্ত শুন অতি চমৎকার।
কোন যুগে কোথায় উপমা নাহি আর॥
এক শালগ্রাম সেবা করেন গোসাঞি।
প্রেমানন্দে (ক) মগ্ন দিবা নিশি জানে নাঞি॥
অন্য অন্য মহান্তের বিগ্রহ সেবন।
এক ধনী আসি সব করি দরশন॥
শ্রদ্ধাক্রমে সর্ব্ববিগ্রহের সেবাযোগ্য।
নানা বস্ত্র অলঙ্কার আর নানা ভোগ্য॥
সামগ্রী আনিয়া দিলা প্রত্যেকে প্রত্যেকে।
সেইমত দিলা শালগ্রামের সম্মুখে॥
অপূর্ব্ব গহনা বস্ত্র দেখিয়া গোসাঞি।
উদ্দীপন হইয়া পড়িল মূরছাই॥
পুনঃ উঠি ভাবে মনে হেন পরিচ্ছদ।
ঠাকুরে পরান-হেতু মনে হয় খেদ॥
শালগ্রাম আমার যে যদ্যপি ঞিহার।
প্রকাশ হইত অবয়ব পদ কর॥
তবে এই অলঙ্কার বস্ত্র পরাইত।
কি শোভা হইত, তবে কি আনন্দ হৈত॥
মনোরথ করি গোসাঞি নিশি পোহাইলা।
রাত্রিমধ্যে শালগ্রাম রূপ (খ) প্রকাশিলা॥
ভক্তাধীন নিজ প্রিয় ভক্তের ইচ্ছায়।
নানারূপ হইল পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ যে হয়॥
তাহে নিজ স্বরূপ ধারণে কি আশ্চর্য্য।
যাতে শ্রীগোপালভট্ট ভক্তমধ্যে আর্য্য॥
ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা রূপ মুরলীবদন।
সুচিক্কণ অঙ্গ রূপে ভুবনমোহন॥
গোসাঞি হেরিয়া শুভ আনন্দে ভাসিল।
দরিদ্র যেমন মহানিধি প্রাপ্ত হৈল॥
'শ্রীরাধারমণ' নাম বলিয়া রাখিল।
ঐকান্তিক মনোরথ সফল হইল॥
নিজ শিষ্য শ্রীল ভক্তদাস পূজারিরে।
সেবা সমর্পিয়া প্রভু গেলা নিজপুরে॥
তাঁহার সন্তান তাঁর দৌহিত্র সন্তান।
অদ্যাপি করেন সেবা শ্রীরাধারমণ॥
অদ্যাবধি সেই রাধারমণ বিরাজে।
বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন মাঝে॥

পাঠান্তর—(ক) ভট্টমারি—শ্রীরঙ্গম্।
১। তীর্থ-ভ্রমে—তীর্থ ভ্রমণে।
২। ভট্টমারি—এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী।
ইহারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকে ও অসেব্য সেবা করে। কেহ কেহ ইহাদিগকে ভর্ত্তৃহরি সম্প্রদায় বলেন।

পাঠান্তর—(ক) প্রেমানন্দে—প্রেমরসে।
(খ) রূপ—কৃপা।

ননীর পুতলী যেন দেখিতে কোমল।
সৎ-চিৎ আনন্দময় অঙ্গ ঝলমল॥
বিচার করিয়া দেখ আশ্চর্য্য কথন।
রাধারমণের দেহ কিসেতে গঠন॥
অন্য যে বিগ্রহ পূর্ব্ব পাষাণে নির্ম্মাণ।
নির্ম্মাণ হইলে তেঁহো অপ্রাকৃত হন॥
শ্রীরাধারমণ পূর্ব্বে না শিলা না মণি।
অতএব পূর্ব্ব হৈতে চিদানন্দ মানি॥
গোপীগণ সহ নিজ প্রকাশ-স্বরূপ।
শ্রীরাসমণ্ডলে যৈছে হৈলা বহুরূপ॥
ভট্টগোসাঞির গুণ কত কহা যায়।
প্রেমভক্তি-পাণ্ডিত্যাদি তুলনা না হয়॥
লোকের হিতের লাগি অপূর্ব্ব সংগ্রহ।
হরিভক্তিবিলাস করিলা শুভাবহ॥
হরিপরিকর নিত্য ব্রজপুর হৈতে।
প্রভুসহ আইলা যেঁহো লোক নিস্তারিতে॥
পরম আশ্চর্য্যরূপে উপদেশ দিল।
শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে জগৎ ছাইল॥
জগত-উদ্ধার ধ্যান-ধারণা করিলা।
ইহা শুনি লালদাস শরণ লইলা॥

চরিত্র শ্রীমধুপণ্ডিত ঠাকুরের

শ্রীলোকনাথ ভূগর্ভ গোসাঞি কৃষ্ণদাস।
আদি করি নাভাজীউ বর্ণে সভা-যশ॥
প্রত্যেকে সভার গুণ বর্ণিতে নারিল।
কহি কিছু যাতে গোপীনাথ প্রকটিল॥
শ্রীল মধুপণ্ডিত ঠাকুর মহাপ্রেমী।
বৃন্দাবন গমন করিলা ভ্রমি ভ্রমি॥
বৃন্দাবন যাইয়া চৌদিকে নেহারয়।
কৃষ্ণ অন্বেষণ করে দেখিতে না পায়॥
ফুৎকার করয়ে ধারা বহে দুনয়নে।
দরশন না পাইয়া উৎকণ্ঠিত মনে॥
প্রতি বনে বনে লতাকুঞ্জে কুঞ্জে ঢুঁড়ে।
বিরহে কাতর কভু ভূমিতলে পড়ে॥
যমুনার তীরে বংশীবটের তলায়।
অনাহারে ক্ষিতিতলে পড়িয়া রহয়॥
হেনকালে শ্রীমদ্ বংশীবটের সমীপে।
দেখে নবঘন জিনি ত্রিভঙ্গিম রূপে॥
গোপীনাথ স্বয়ং আসি প্রতিমারূপেতে।
দরশন দিলা প্রিয় ভক্তের পীরিতে॥
পণ্ডিত চমকি উঠি দ্রুততর গিয়া।
উঠাইয়া লইল যে পাথালি করিয়া॥
ছুটিয়া পলায় যথা তস্করের প্রায়।
রতন পাইয়া যেন বিঘ্ন আশঙ্কায়॥
রাখিবার স্থান ঢুঁড়ি ইতি উতি ধায়ে।
মহানিধি কেহ যেন পাছে কাড়ি লয়ে॥
যমুনার তীরে কেশীঘাটের নিকটে।
সেবার শৃঙ্খলা কৈলা প্রেমের সম্পুটে॥
কালে কোন ভাগ্যবান পুরী-শ্রীমন্দির।
নির্ম্মাণ করিয়া দিলা পরম সুধীর॥
অতএব শ্রীমধুপণ্ডিত মহাশয়।
তাঁহার মহিমা-গুণ কহা নাহি যায়॥
তাঁহার চরণে মতি রহুক আমার।
মো-সম দুর্ভাগ্য আর যতেক সভার॥
তবে সভে মেলি তরি এ দুঃখ সংসারে।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে ভাসি সুখের সাগরে॥
যতেক প্রভুর গণ সভে নিত্যসিদ্ধ।
আগে তার কহিব বিস্তার যে প্রসিদ্ধ॥

ইতি শ্রীভক্তমালে চৈতন্যপার্ষদগুণবর্ণন-গান নাম দ্বিতীয় মালা ॥ ২ ॥

তৃতীয় মালা

যঃ শ্রীবৃন্দাবনভুবি পুরা সচ্চিদানন্দসান্দ্রো
গৌরাঙ্গীভিঃ সদৃশরুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত্ত।
তাসাং শশ্বদ্দৃঢ়তরপরীরম্ভসম্ভেদতঃ * কিং,
গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ ॥ ১ ॥
নমস্যামোঽস্যৈব প্রিয়পরিজনান্ বৎসলহৃদঃ,
প্রভোরদ্বৈতাদীনপি জগদঘৌঘক্ষয়কৃতঃ।
সমানপ্রেমাণঃ সমগুণগণাস্তুল্যকরুণাঃ,
স্বরূপাদ্যা যেঽমী সরসমধুরাস্তানপি নুমঃ ॥ ২ ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনভূমিতে সচ্চিদানন্দঘন ও শ্যামকান্তি যিনি তুল্যকান্তিযুক্ত গৌরাঙ্গীদের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন, তিনিই কি সেই গৌরাঙ্গীদের সর্ব্বদা দৃঢ়তর আলিঙ্গনজনিত সম্ভোগ বা মিলনের ফলে গৌরাঙ্গ হইয়া নবদ্বীপ অবলম্বনপূর্ব্বক জয়যুক্ত হইতেছেন? (শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকা ১ম শ্লোক)।

ইঁহারই প্রিয় পরিজন, জগতের পাপসমূহ ক্ষয়কারী, দয়ার্দ্রহৃদয় অদ্বৈত প্রভৃতিকে প্রণাম করি। তাহা ছাড়া সমান প্রেমসম্পন্ন, সমান গুণসমূহযুক্ত, সমান দয়ার্দ্রহৃদয় ঐ যে **সরসমধুর** স্বরূপ প্রভৃতি তাঁহাদিগকেও প্রণাম করি। (গৌঃ গঃ দীঃ—২য় শ্লোক)।

ভক্তরূপ (স্বয়ং শ্রীচৈতন্য), ভক্তস্বরূপ (শ্রীনিত্যানন্দ), ভক্তাবতার (শ্রীঅদ্বৈত), ভক্তাখ্য (শ্রীবাসাদি) ও ভক্তশক্তি (শ্রীগদাধর আদি)—ইঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—আদিলীলা-১৪)।

---

* পাঠান্তর—সম্ভেদতঃ—সম্ভোগতঃ।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীমান্ দয়াল গৌরাঙ্গ।
জীবের নিস্তার লাগি কৈলা লীলারঙ্গ (ক)॥
কিবা অপরূপ কিবা চমৎকার লীলা।
স্বয়ং যে দুর্লভ তাহা লোকে দেখাইলা॥
দুর্লভ যে প্রেমরত্ন সাধারণ লোকে।
বিলাইলা নীচ উচ্চ বৃদ্ধাদি বালকে॥

পাঠান্তর—(ক) লীলারঙ্গ—নানারঙ্গ।

হরিনাম মহামন্ত্র প্রকাশ করিয়া।
যারে তারে দিয়া নাচে আনন্দিত হিয়া (ক)॥
পঞ্চতত্ত্বে মেলি পঞ্চতত্ত্ব বিলাইয়া।
পঞ্চতত্ত্বে নাচে পঞ্চতত্ত্ব আস্বাদিয়া॥
পঞ্চতত্ত্বের অর্থ শুনহ চমৎকার।
পরাৎপর বস্তু যাহা লোকবেদসার॥
ভক্তরূপ গৌরচন্দ্র শ্রীনন্দনন্দন।
শ্রীভক্তস্বরূপ শ্রীমন্ নিত্যানন্দ রাম॥

পাঠান্তর—(ক) হিয়া—হৈয়া।

ভক্তাবতার শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য।
মহাবিষ্ণু যেঁহো যাঁতে শিবের সাযুজ্য॥
ভক্তাখ্য শ্রীশ্রীনিবাস-আদি ভক্তরূপ।
শ্রীল-গদাধরপণ্ডিত ভক্তশক্তি যে অনূপ॥
শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরাদ্বৈত শ্রীমান্ নিত্যানন্দ।
তিন প্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বসুখানন্দ॥
তার মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
দুই প্রভুর প্রেমাস্পদ যেঁহো অগ্রগণ্য॥
পার্ষদ যতেক প্রভুর সকল মহান্ত।
নিত্যসিদ্ধ সকলি যে মহিমা অনন্ত॥
তার মধ্যে ব্যূহ যেই প্রভুর অংশাংশ।
অনেক হয়েন অন্য ভক্ত-অবতংস॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দগণ যতেক গোপাল।
ব্রজে গোপ শিশু সখা নিত্য (ক) পশুপাল॥
তৎসম্বন্ধে অন্য উপগোপাল সত্তম।
নীলাচল আদ্যে মহত্তর এই নাম॥
দাক্ষিণদেশীয়-আদি যতেক মহান্ত।
প্রভুর দর্শনে হৈল (খ) সুযোগ্য তাবন্ত॥
যতেক মহান্ত সভে নিজ নিজ মতে।
শ্রীমন্নবদ্বীপধামে কহে নানা রীতে॥
কেহ কহে সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবনধাম।
কেহ কহে শ্রীমান্ গোলোক অভিরাম॥
কেহ কহে শ্বেতদ্বীপ কেহ পরব্যোম।
কেহ অযোধ্যাদি কহে নিজভাবসম॥
অতএব জয় জয় শ্রীমন্নবদ্বীপ।
আশ্চর্য্য মহিমা সর্ব্বধামের অধিপ॥
সকল সম্ভবে যাতে শুন তার কথা।
সর্ব্বরূপ প্রভুদেহে কৃষ্ণদেহে যথা॥
তথাই যে সর্ব্বধাম নবদ্বীপে স্থিতি।
বৈসয়ে যে নিজ-নিজ-নায়ক সংহতি॥
শ্রীমান্ মহাপ্রভু হন সর্ব্ব-অবতার।
শ্রীল-নবদ্বীপ সর্ব্বধামময় সার॥

পাঠান্তর—(ক) নিত্য—যত।
(খ) হৈল—হেন।

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীচৈতন্য প্রভু।
শ্রীমন্নবদ্বীপ ব্রহ্ম সনাতন বিভু॥
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভ লীলাচেষ্টারসে।
সর্ব্বপারিষদগণ আসিয়া প্রকাশে॥
তাহা সভার পূর্ব্বাপর নাম রূপলীলা।
কহিব বিশেষ যেঁহো যেরূপ হইলা॥
শ্রীচৈতন্য অবতারে অপরূপ লীলা।
প্রেম প্রচারিয়া চমৎকার দেখাইলা॥
চারিযুগে চারি যুগ-অবতার হয়।
সত্যে শুক্লবর্ণ 'শুক্ল' নামেতে উদয়॥
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ 'পৃশ্নিগর্ভ' নাম।
দ্বাপরে বরণ শ্যাম নাম হয় 'শ্যাম'॥
কলিযুগে কৃষ্ণ-বর্ণ-নাম-অবতার[১]।
পূর্ব্ব কলিযুগে চাষপক্ষ-বর্ণধর[২]॥
কলিযুগে হরিনাম একমাত্র ধর্ম্ম।
যেই নাম সেই হরি ইথে বুঝ মর্ম্ম॥

পাদ্মে—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

অনুবাদ।—নাম আর নামীতে ভেদ নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার নাম অভিন্ন, উভয়ই চিন্তামণির মত সকল অভীষ্টদানকারী এবং উভয়ই পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত (মায়াস্পর্শশূন্য) এবং উভয়ই আনন্দ ও চৈতন্যস্বরূপ। (হরিভক্তিবিলাস)।

কলি আর দ্বাপরের যুগ-অবতার।
কৃষ্ণ আর গৌরাঙ্গ যবে হয়েন প্রচার॥
দোঁহা-রূপে দোঁহা-রূপ একত্রে মিলিয়া।
গূঢ়রূপে যুগধর্ম্ম সাধে প্রকটিয়া॥
সর্ব্ব অবতার-রূপ সর্ব্ব-অবতারী।
দয়াল চৈতন্য প্রভু ক্ষিতি অবতরি॥
নাম প্রেম ভক্তি দিয়া জীব নিস্তারিলা।
পরম রহস্য ভক্তিপথ দেখাইলা॥

১। এখানে কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ 'যিনি কৃষ্ণের বর্ণনা করেন'।
২। চাষপক্ষ-বর্ণধর—চাষপাখীর পাখার মত যাহার বর্ণ।

অতএব কলিযুগে চৈতন্যগোসাঞি।
পরম উপায় হেন আর কেহ নাই॥
মাধ্বী-সম্প্রদায়-আদি সর্ব্বশিরোমণি।
এবে সম্প্রদায়-শিষ্য হইলা আপনি॥
লোকে ধর্ম্ম প্রচারিতে ভক্তরূপ ধরি।
করিলা অপূর্ব্ব লীলা আশ্চর্য্য মাধুরী॥
রাধাভাব-মধুপান মূল যে কারণ।
গন্ধর্ব্ব-নর্ত্তনে তার হয় বিবরণ॥
সম্প্রদাপ্রমাণ পদ্মপুরাণে বিদিত।
জগতে প্রসিদ্ধ চারি সম্প্রদা উদিত॥

তথাহি পাদ্মে—

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥

অনুবাদ।—সুতরাং কলিযুগে শ্রী, রুদ্র, ব্রহ্ম এবং সনাতন নামক জগৎপবিত্রকারী চারিটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইবে।

মাধ্বী সম্প্রদায় গুরুপ্রণালী পাবন।
প্রসঙ্গে তাহার কিছু করিব কীর্ত্তন॥

যথা—

পরব্যোমেশ্বরস্যাসীৎ শিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ।
তস্য শিষ্যো নারদোঽভূদ্ ব্যাসস্তস্যাপশিষ্যতাম্ (ক)॥
শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ (খ)।
তস্য শিষ্যাঃ প্রশিষ্যাশ্চ বহবো ভূতলে স্থিতাঃ॥
ব্যাসাল্লব্ধকৃষ্ণদীক্ষো মাধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ।
চক্রে বেদান্ বিভজ্যাসৌ সংহিতাং শতদূষণীম্।
নির্গুণাৎ ব্রহ্মণো যত্র সগুণস্য পরিষ্ক্রিয়া॥
তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্যো মহাশয়ঃ।
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ॥
অক্ষোভস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ।
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ॥

পাঠান্তর—(ক) তস্যাপশিষ্যতাম্—তস্যাপি শিষ্যতাম্।
(খ) জ্ঞানাবরোধনাৎ—জ্ঞানাববোধনাৎ।

বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ।
জয়ধর্ম্মমুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ।
শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুরী যস্য (ক) ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ॥
জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূৎ ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্॥
শ্রীমাল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ॥
কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামনি তিষ্ঠতঃ।
প্রীতপ্রেয়োবৎসলতোজ্জ্বলাখ্যফলধারিণঃ॥
তস্য শিষ্যোঽভবচ্ছ্রীমানীশ্বরাখ্যপুরী যতিঃ।
কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গারফলাত্মকঃ॥
অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্যসখ্যে ফলে উভে।
শ্রীমান্ রঙ্গপুরী হ্যেষ বাৎসল্যে যঃ (খ) সমাশ্রিতঃ॥
ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে।
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্॥
স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তী পূর্ব্বসুদুষ্করে।
অন্তর্বহী-রসাম্ভোধিঃ শ্রীনন্দ-নন্দনোঽপি সন্॥
আদ্যব্যূহোঽপি চৈতন্যমবিশদ্ যঃ পুরে পুরা।
বিচুক্ষোভ মনো যস্য (গ) দৃষ্ট্বা গন্ধর্ব্বনর্ত্তনম্॥
দ্বারকাস্থোঽপি ভগবানবিশৎ শ্রীশচীসুতম্।
নানাবতারঃ (ঘ) সুতরামেককাল-প্রভাবতঃ॥
যথা শ্যামোঽবিশৎ কৃষ্ণং ভগবন্তং পুরা স্বয়ম্।
যোগমায়াবলাদেতে তিষ্ঠন্তোঽন্যত্র যদ্যপি।
তথাপি প্রাবিশন্ গৌরেঽচিন্ত্যলক্ষণলক্ষিতাঃ॥

যথোক্তং প্রভাসখণ্ডে—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ইতি॥

"রঘুনাথং প্রবিশ্যাপি যথা তিষ্ঠতি ভার্গবঃ।
এবং শ্রীনারদমুখাস্তিষ্ঠন্ত্যন্যোষু ধামসু।
তথৈব প্রভুণা সার্দ্ধং দীব্যন্তি শ্রুতিদেহবৎ॥

পাঠান্তর—(ক) যস্য—যস্তু।
(খ) হ্যেষ বাৎসল্যে যঃ—তে চ সবাৎসল্যে।
(গ) মনো যস্য—মনস্তস্য, অথবা, মানোঽপ্যস্য।
(ঘ) নানাবতারঃ—নামাবতারঃ।

কিন্তু যদ্যদ্ভভক্তগণা যদ্যদ্ভাবাবিলাসিনঃ।
তত্তদ্ভাবানুসারেণ ব্রজে তেষামভূদ্গতিঃ॥
গৌরচন্দ্রোদয়েঽদ্বৈতং প্রতি গৌরবচো যথা।"
দাস্যে কেচন কেচনপ্রণয়িনঃ সখ্যে ক এবোভয়ে (ক)॥
রাধামাধবনৈষ্ঠিকাঃ কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ।
সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচন পরে যে বাবতারান্তরে,
ময্যাবদ্ধহৃদোঽখিলান্ বিতনবৈ বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ॥

অনুবাদ।—জগতের পতি ব্রহ্মা পরব্যোমের অধীশ্বর নারায়ণের শিষ্য হইয়াছিলেন। নারদ হইলেন ব্রহ্মার শিষ্য, আর ব্যাসদেব হইলেন নারদের শিষ্য। ব্যাসদেবের জ্ঞান নিজ অন্তরে অবরুদ্ধ করিয়া শুকদেব তাঁহার শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পৃথিবীতে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য বহু আছেন।

মহাযশস্বী মধ্বাচার্য্য ব্যাসদেবের নিকট কৃষ্ণদীক্ষা লাভ করিয়া বেদ বিভাগপূর্ব্বক শতদূষণী সংহিতা প্রণয়ন করেন। তাহাতে নির্গুণ অপেক্ষা সগুণ ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপালিত হইয়াছে। উন্নতস্বভাব পদ্মনাভাচার্য্য তাঁহার শিষ্য হইলেন ; তাঁহার শিষ্য নরহরি ; তাঁহার শিষ্য দ্বিজমাধব। তাঁহার শিষ্য হইলেন অক্ষোভ। তাঁহার শিষ্য জয়তীর্থক। জয়তীর্থের শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু ; তাঁহার শিষ্য মহানিধি। মহানিধির শিষ্য বিদ্যানিধি। তাঁহার শিষ্য রাজেন্দ্র ; তাঁহার শিষ্য জয়ধর্ম্ম মুনি। ভক্তিরত্নাবলী প্রণেতা শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী এবং পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য জয়ধর্ম্মের শিষ্য হন। বিষ্ণুসংহিতা প্রণয়নকারী ব্যাসতীর্থ পুরুষোত্তমের শিষ্য। ভক্তিরসের আশ্রয়স্বরূপ লক্ষ্মীপতি ব্যাসতীর্থের শিষ্য। লক্ষ্মীপতির শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী, যাঁহা হইতে এই বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রীত, প্রেয়, বাৎসল্য ও উজ্জ্বল নামক ফলধারণকারী যে কল্পবৃক্ষ ব্রজধামে বিরাজিত মাধবেন্দ্রপুরী তাহারই অবতার। এই কল্পবৃক্ষের শৃঙ্গার নামক ফলস্বরূপে যিনি শৃঙ্গাররসেরই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন সেই যতি ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রের শিষ্য হইয়াছিলেন। দাস্য এবং সখ্য রূপ দুইটি ফলের বিস্তার করেন অদ্বৈতাচার্য্য এবং বাৎসল্যরসের আশ্রয়স্বরূপ হইলেন শ্রীমান্ রঙ্গপুরী। শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ঈশ্বরপুরীকে গুরুত্বে বরণ করিয়া প্রাকৃতাত্মক ও অপ্রাকৃতাত্মক জগৎকে প্লাবিত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং শ্রীনন্দ নন্দন, অন্তরে ও বাহিরে রসের সমুদ্রস্বরূপ। পূর্ব্বে যাহা তাঁহার পক্ষে সুদুষ্কর ছিল, চৈতন্যাবতারে তিনি তাহাই করিলেন। তিনি শ্রীরাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করিলেন।

পূর্ব্বে যিনি পুরমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন সেই আদ্যব্যূহ নারায়ণ (বা বাসুদেব) শ্রীচৈতন্যে প্রবেশ করেন। গন্ধর্ব্ব নৃত্য দর্শনে যাঁহার মন ক্ষুভিত হইয়াছিল সেই দ্বারকাপতি ভগবানও শ্রীশচীনন্দনে প্রবিষ্ট হন। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ একই সময়ে নানা অবতারস্বরূপ, কারণ একই কালে সকল অবতারের ভাব তাঁহাতে বিদ্যমান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণে যেমন যুগাবতার শ্যাম (রাম) প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তেমনি যোগমায়ার প্রভাবে অন্যত্র অবস্থান করিয়াও অচিন্ত্য লক্ষণবিশিষ্ট অন্যান্য অবতারগণ শ্রীগৌরাঙ্গে প্রবিষ্ট বা সমাবিষ্ট হইয়াছিলেন। প্রভাসখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

যে সকল তত্ত্ব অচিন্ত্য অর্থাৎ বুদ্ধির অগম্য (কারণ অপ্রাকৃত) সে সকল তত্ত্বে তর্ক যোজনা করা উচিত নহে।

যেরূপ ভৃগুনন্দন পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রেও অবস্থান করেন, সেইরূপ নারদ প্রভৃতিও অন্যান্য ধামে অবস্থান করিয়াও শ্রুতিদেহের ন্যায় (বেদের মত) প্রভুর সহিত লীলাবিহার করেন। কিন্তু যে যে ভক্ত যে যে ভাবের বিলাসী সেই সেই ভাব অনুযায়ী তাঁহাদের ব্রজগতি লাভ হইয়াছিল।

গৌরচন্দ্রোদয়ে এইরূপ একটি কথা অদ্বৈতের প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের উক্তিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। যথা—

কেহ কেহ দাস্যভাবে, কেহ কেহ সখ্যভাবে, কেহ কেহ উভয়ভাবে অনুরাগসম্পন্ন, কেহ কেহ রাধামাধবের প্রতি, কেহ কেহ দ্বারকাধিপতির প্রতি, কেহ কেহ উভয়ের প্রতি, কেহ কেহ আমার অন্য অবতারের প্রতি অনুরক্ত। আমি সকলের মন নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী আমাতে আবদ্ধ করিব, এবং বৃন্দাবনাসক্তির ভাব সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিব। তুঃ—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেঃ—

এই ভক্তগণ মধ্যে নানা ভাব হয়।
দাস্যে কারো প্রীতি কারো সখ্যভাবাশ্রয়॥
দাস-সখ্য দুই মত কেহ আমা নিষ্ঠ।
কেহ রাধা-মাধবের নিষ্ঠাতে আবিষ্ট॥
কেহ রাধাকৃষ্ণনিষ্ঠ উজ্জ্বল আশ্রয়।
কেহ বা দ্বারকাধীশ ভাবনিষ্ঠ হয়॥
বৃন্দাবন দ্বারকাতে কারো কারো প্রীতি।
মোর অন্য অবতারে কারো কারো রতি॥
সর্ব্বমন আকর্ষিয়া আমাতে বান্ধিব।
স্বভাবনাসক্ত ভাব সভাকারে দিব॥
বৃন্দাবনে সভা লঞা করিব বিহার।
এই মনোরথ চিত্তে আছয়ে আমার॥

পাঠান্তর—(ক) ক এবোভয়ে—তথৈবাপরে, অথবা, ত এবোভয়ে।

প্রণালীর মূলশ্লোক ইহাতে জানিবে।
তার মধ্যে প্রভু শিষ্য হৈলা ভক্তভাবে (ক)॥
শ্রীমন্নারদের শিষ্য (খ) কোন যে গন্ধর্ব্ব।
গন্ধর্ব্বিণী সহ করে কৃষ্ণলীলাপর্ব্ব॥
নারদের কৃপাশক্তি সঞ্চার-প্রভাবে।
যথা অনুকরণ করয়ে সেই ভাবে॥
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণের সমীপে।
আইলা ধরিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে (গ)॥
অতি চমৎকার যথা অভেদ-স্বরূপ।
নৃত্য হাস্য কৌতুক রসের অনুরূপ॥
নিজ লীলা অভেদ দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র।
মোহিত হইয়া প্রকাশিলা প্রেমানন্দ॥
আপনা আপন (ঘ) রূপ দেখি চমকিত।
মনে কিছু অভিলাষ হইল উদিত॥
হেন রূপরস আস্বাদয় শ্রীরাধিকা।
না জানি কেমন রস কি রসে রসিকা॥
রাধিকা-উচিত প্রেমরস আস্বাদিব।
আনুষঙ্গে কলির জীব নিস্তার করিব॥
এত ভাবি রাধা-ভাব-কান্তি অঙ্গীকরি।
নবদ্বীপে উদয় করিলা আসি হরি॥
অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সহ।
চমৎকার লীলা করে ধরি গৌরদেহ॥
শ্রীল-কবিকর্ণপূর রূপ সনাতন।
আদি করি অনন্ত যে পারিষদগণ॥
তাঁহা সভার একেকের শক্তিতে বুঝহ।
পণ্ডিত সর্ব্বজ্ঞ সিদ্ধ তেজঃপুঞ্জ-দেহ॥
মহাপ্রেমভাব অলৌকিক ব্যবহার।
যাঁহা সভার বাক্য হয় বেদবিধিসার॥
তেঁহো সব সাক্ষাত দেখিয়া যে কহিল।
সেই বাক্য সুপ্রামাণ্য শতবেদতুল্য॥

পাঠান্তর—(ক) ভক্তভাবে—প্রেমভাবে।
(খ) শ্রীমন্নারদের শিষ্য—নারদের শিষ্য এক।
(গ) শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে—তারা রাধাকৃষ্ণরূপে।
(ঘ) আপনা আপন—আপনি আপনা।

তথা হি শ্লোকঃ—

যে ত্যক্তসর্ব্ববিষয়াঃ সুধিয়ো মহান্তঃ,
শাস্ত্রান্তগাঃ পরহিতায় কৃতপ্রবন্ধাঃ।
তেষাং বচো যদি ন সংশয়হারি তৎ তে,
দুর্ভাগ্যমত্র বদ কেন বিমোচনীয়ম্॥

অনুবাদ।—যাঁহারা সকল বিষয়সুখ ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা সুধী ও মহান্, যাঁহারা শাস্ত্রে পারদর্শী, যাঁহারা পরের কল্যাণের জন্য চেষ্টাযুক্ত ও আগ্রহশীল হইয়া নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের বাক্যে তোমার সংশয় দূর না হইলে, বল এ জগতে কে তোমার মিথ্যা জ্ঞান দূর করিবেন।

তাহাতে প্রতীতি যেই মূঢ়ে না জন্ময়।
তার ভ্রান্তি দূর করিবারে কে পারয়॥
অচিন্ত্য ঈশ্বরচেষ্টা দুরূহ দুর্গম।
তর্কেতে যোজনা নাহি করে শিষ্টতম॥
ব্রজপরিকর আর অন্য অন্য ধামে।
যতেক পার্ষদ সহ অবতীর্ণ ভূমে॥
সেই সেই ধামে পরিকর সেই রূপে।
থাকিয়া 'প্রকাশ'রূপে আইলা নবদ্বীপে॥
ভার্গবপ্রবেশ যথা দেহে রঘুনাথ।
শ্রুতিগণ যথা ব্রজে গোপীদেহে রত॥
অদ্বৈত প্রভুরে স্বয়ং প্রভু যে কহিলা।
যাহা শুনি ভক্তসভে আনন্দিত হৈলা॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্য ভাবেতে।
অন্য-অবতার-ভক্ত কিংবা দ্বারকাতে॥
মোরে যে ভজয়ে মোতে প্রপন্ন১ হইয়া।
তার সনে লীলা করি ব্রজে বাস দিয়া॥
কোন্ পারিষদ কোন্ রূপে অবতার।
কোন্ মহাশয় কোন্ রসে অধিকার॥
তবে (ক) কিছু বর্ণিব যে আনন্দিত হিয়া (খ)।
শ্রীল-কবিকর্ণ-পদ স্মরণ করিয়া॥
শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।
কল্পবৃক্ষসম সর্ব্বরস-প্রযোজক॥

পাঠান্তর—(ক) তবে—এবে।　(খ) হিয়া—হৈয়া।
১। প্রপন্ন—প্রাপ্ত আশ্রিত।

তাঁর শিষ্য শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরী যতি।
মধুর-রসাশ্রয় সেই প্রেমানন্দমতি॥
শ্রীমান্ মাধবশিষ্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু।
দাস্যসখ্যরস-প্রযোজক মহাবিভু॥
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ সকলে সমর্থ।
তথাপিহ দাস্যসখ্যে কিছু বিশেষত্ব॥
শ্রীমান্ রঙ্গপুরী হন বাৎসল্য-আশ্রিত।
শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীতে অঙ্গীকৃত (ক)॥
শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করি।
জগতে প্লাবিত (খ) কৈলা প্রেমের লহরী॥
আদ্যব্যূহ শ্রীচৈতন্য শ্রীনন্দ-নন্দন।
সর্ব্বধামনায়ক সর্ব্ব-অবতার হন॥
সর্ব্বরূপে যে যে মাতা পিতা আদিগণ।
গৌরাঙ্গলীলায় হয় সভার গমন॥
পর্জ্জন্য নামেতে গোপ কৃষ্ণের পিতামহ।
শ্রীহট্টে জন্মিল, আসি পঞ্চপুত্র সহ[১]॥
তাঁহার মহিষী গোপী নামে বরীয়সী।
কৃষ্ণের পিতামহী হন্ গুণেতে সরসী॥
শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র আর কমলাবতী নাম।
পঞ্চপুত্র মধ্যে জগন্নাথ গুণধাম॥
নবদ্বীপে আসি তেঁহো করিলেন বাস।
অন্য নাম পুরন্দর লোকে মহাযশঃ॥
তাঁর পত্নী জগন্মাতা শচী ঠাকুরাণী।
জগন্নাথ শ্রীল নন্দ শচী নন্দরাণী॥
সভে কহে নিজ নিজ উপাসনা মত।
অদিতি কশ্যপ আর কৌশল্যা দশরথ॥
কেহ কহে বসুদেব-দেবকী-রোহিণী।
নহিলে কেমনে বিশ্বরূপের জননী॥
শ্রীল বিশ্বরূপ বলদেব অবতার।
পুন গিয়া হৈল পদ্মাবতীর কুমার (গ)॥

ইহার কারণ কিছু নিশ্চয় না হয়।
যথা দেবকীতে হৈতে রোহিণীতে যায়॥
অতএব সর্ব্বরূপা (ক) শচী ঠাকুরাণী।
সর্ব্ব অবতার পিতা মিশ্র-দ্বিজমণি॥
সর্ব্ব অবতার যথা চৈতন্যেতে (খ) বর্ত্তে।
মাতা পিতা তথা শচীমাতা জগন্নাথে॥
অতএব পুরন্দর মিশ্র শচীমাতা।
ত্রিলোকের পরম আরাধ্য একত্রাতা॥
তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণ যে লও।
সর্ব্ব অভিলাষ ত্যজি ঐকান্তিক হও॥
শ্রীমান্ বলরাম স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ।
তাঁহার মহিমা আগে কহিব প্রবন্ধ॥
তাঁর মাতা পিতা পদ্মাবতী শ্রীমুকুন্দ।
রাঢ়ে স্থিতি যাঁহার গৃহেতে পূর্ণচন্দ্র॥
অন্য নাম হাড়াই পণ্ডিত লোকে খ্যাত।
শুদ্ধ যে লৌকিক ভাব সামান্যের মত॥
শ্রীসুমিত্রা-দশরথ অবতার দোঁহে।
শ্রীমান্ লক্ষ্মণের ভাব নিত্যানন্দে বহে (গ)॥
পৌর্ণমাসী ব্রজে যাঁর কৃষ্ণসুখে প্রীত।
তেঁহো শ্রীগোবিন্দাচার্য্য গায়ক পণ্ডিত॥
অম্বিকা নামেতে পূর্ব্বধাত্রী যে জননী।
এবে সে মালিনী (ঘ) নাম শ্রীবাসগৃহিণী॥
অম্বিকামাতার ভগ্নী শ্রীল-কিলিম্বিকা।
নারায়ণী নাম যাঁর গুণেতে অধিকা॥
কৃষ্ণাধরামৃত পানে যেঁহো মত্ত হৈলা।
যাঁর প্রেমাবেশ দেখি প্রভু প্রশংসিলা॥
মিথিলার পতি শ্রীমান্ জনক রাজন।
তেঁহো শ্রীবল্লভাচার্য্য বিপ্র তপোধন॥
ভীষ্মক রাজন হন কাহার সম্মত।
শ্রীজানকী শ্রীরুক্মিণী দোঁহাতে (ঙ) মিলিত॥
লক্ষ্মীনামে সুতা সেই বল্লভাচার্য্যের।
ত্রৈলোক্য-ঈশ্বরী হর্ত্তা কর্ত্তা জগতের॥

পাঠান্তর—(ক) অঙ্গীকৃত—অধিকৃত।
(খ) প্লাবিত—প্লাবিতে।
(গ) কুমার—কোঙর।

১। কিন্তু গৌরগণোদ্দেশদীপিকা মতে সপ্ত পুত্র ("উপেন্দ্রমিশ্রঃ সঞ্জাতঃ শ্রীহট্টে সপ্তপুত্রবান্"।)

পাঠান্তর—(ক) সর্ব্বরূপা—সর্ব্বমাতা।
(খ) চৈতন্যেতে—শ্রীচৈতন্যে।
(গ) বহে—রহে। (ঘ) সে মালিনী—শ্রীমালিনী।
(ঙ) দোঁহাতে—দোঁহেতে।

একদিন সখীসঙ্গে গঙ্গাস্নানে যান।
প্রভুদৃষ্টিপাতমাত্রে পড়ি গেল মন॥
সনাতন মিশ্র যেঁহো সত্রাজিত রাজা।
জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া যাঁহার আত্মজা॥
পূর্ব্বে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা সত্যভামা হন।
পৃথিবী যাঁহার অংশে বেদে করে গান॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয়া মহিষী।
পরমবিদগ্ধা সর্ব্বগুণে বরীয়সী (ক)॥
শ্রীরামের বিবাহে ঘটক বিশ্বামিত্র।
সনন্দ ব্রাহ্মণ যেঁহো রুক্মিণী-প্রেরিত॥
তেঁহো দোঁহে (খ) মিলি এবে বনমালী আচার্য্য।
প্রভুর বিবাহে যেঁহো ঘটক সুচর্য্য॥
সত্রাজিত-প্রেরিত ঘটক বিপ্র যেঁহো।
এবে কাশীনাথ ঘটক বিপ্রবর তেঁহো॥
যেঁহো কহে তেঁহো পূর্ব্বে রুক্মিণী-প্রেরিতা।
তন্মতে (গ) রুক্মিণীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা॥
কোন অবান্তর মতে কহে সাধুজন।
নতুবা যে একতত্ত্ব একবস্তু হন॥
রূপান্তরে শ্রীমতী সত্যভামার প্রকাশ।
শ্রীমান্ জগদানন্দ পণ্ডিত সুযশঃ॥
মতান্তরে কৃষ্ণে যজ্ঞসূত্র দিলা যেঁহো।
অবন্তীতে বাস সান্দীপনি মুনি তেঁহো॥
কেশবভারতী যেঁহো গৌরাঙ্গে সন্ন্যাসী।
করিয়া লইয়া গেলা নবদ্বীপ-শশী॥
রামচন্দ্র-গুরু শ্রীবশিষ্ঠ তপোধন।
তাঁহার প্রকাশ গঙ্গাদাস সুদর্শন॥
তাঁহা দোঁহা-স্থানে প্রভুর বিদ্যাভ্যাসলীলা।
অনেক চাঞ্চল্য প্রভু তাহাতে করিলা॥
বৃষভানু (ঘ) মহারাজা ব্রজপুরধাম।
তেঁহো শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধি নাম॥
স্বয়ং শ্রীরাধার ভাব গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
'বিদ্যানিধি বাপ' বলি কান্দিলা ফুকারি॥

পাঠান্তর—(ক) বরীয়সী—গরীয়সী।
(খ) দোঁহে—দুহ।
(গ) তন্মতে—তাহাতে।
(ঘ) বৃষভানু—বৃকভানু।

প্রেমপরাকাষ্ঠা দেখি প্রেমনিধি নাম।
রাখিলা আনন্দে প্রভু গৌর গুণধাম॥
মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্য গৌরবের পাত্র।
তাঁহার প্রকাশ হন শ্রীমাধব মিশ্র॥
রত্নাবলী নাম তাঁর পত্নী শ্রীকীর্ত্তিদা।
লীলা অনুসারে সভে নাম ধরে দ্বিধা॥
আদ্যব্যূহ শ্রীচৈতন্য স্বয়ং গৌরদেহ।
বলদেব বিশ্বরূপ দ্বিতীয় যে ব্যূহ॥
নিত্যানন্দ অবধূত তাঁহার প্রকাশ।
গৌরাঙ্গের প্রেমে যেঁহো (ক) সদাই উল্লাস॥
কলি ধর্ম্মরাজ প্রতি গৌরাঙ্গের লীলা।
গূঢ়ভাবে সর্ব্ব হর্ষ-বিষাদে কহিলা॥
গৌরাঙ্গ অগ্রজ শ্রীল (খ) বিশ্বরূপ মতি।
দারপরিগ্রহ নাহি কৈলা হৈলা যতি॥
শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরীতে রাখি নিজশক্তি।
অর্পি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি॥
প্রভু নিত্যানন্দ (গ) এক শক্তি প্রকাশিলা।
ভক্তগণ মধ্যে তেজঃপুঞ্জ-রূপ হৈলা॥
সহস্র সূর্য্যের তেজ ধারণ করিলা।
শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিলা॥
যাঁর অংশ শেষ যেঁহো সন্ধিনীশকতি।
কৃষ্ণধাম বাস ভূষা সর্ব্বরূপে স্থিতি॥
বারুণী রেবতী দোঁহে বসুধা জাহ্নবা।
নিত্যানন্দপ্রিয়া দোঁহে অতুলনা প্রভা॥
সূর্য্যসম তেজ শ্রীল সূর্য্যদাস যেঁহো।
পূর্ব্ব (ঘ) যে ককুদ্মী নাম মহারাজা তেঁহো॥
রেবতীর পিতা এবে প্রভুর পার্ষদ।
করিতে আইলা লীলা অপূর্ব্ব বিনোদ॥
বসুধা জাহ্নবা-কন্যা জগল্লক্ষ্মীময়ী।
ভাগ্যের নাহিক সীমা সৌভাগ্যবিজয়ী॥
কেহ কহে বসুধাজী সরস্বতীরূপ।
অনঙ্গমঞ্জরী হন জাহ্নবাস্বরূপ॥

পাঠান্তর—(ক) যেঁহো—তেঁহো।
(খ) গৌরাঙ্গ অগ্রজ শ্রীল—গৌরাঙ্গের অগ্রজ শ্রী।
(গ) প্রভু নিত্যানন্দ—নিত্যানন্দ প্রভু।
(ঘ) পূর্ব্ব—পূর্ব্বে।

দুই যে স্বরূপ হয় পূর্ব্বন্যায়মতে।
ইহাতে সন্দেহ নাহি সাধুর সম্মতে॥
তাঁহাদিগের মহিমা যে অপার সাগর।
কে কহিতে পারে বেদাবধি-অগোচর॥
সাক্ষাতে দেখহ শ্রীল গোপীনাথ-পার্শ্বে।
শ্রীজাহ্নবাজী অদ্যাপি বিরাজ করে হর্ষে॥
তাঁহার বৃত্তান্ত কিছু সংক্ষেপে কহিব।
যাহা শুনি ভক্তগণের আনন্দ হইব॥
প্রকটকালেতে শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণী (ক)।
আপনা প্রতিমা এক প্রকাশে আপনি॥
তাহে আবির্ভাব করি কহে বৃন্দাবনে।
বসাও লইয়া গোপীনাথের আসনে॥
আজ্ঞার প্রমাণে বৃন্দাবন লঞা গেলা।
পূজারী প্রভৃতি সভে বৃত্তান্ত শুনিলা॥
সঙ্কোচ করিয়া পার্শ্বে বসাইতে নারে।
গোপীনাথ আদেশ করিলা সভাকারে॥
অনঙ্গমঞ্জরী ইঁহো আমার প্রেয়সী।
বামেতে বসাও মনে সঙ্কোচ না বাসি॥
প্যারীজীকে ডাহিনে বসাই তাঁরে বামে।
বসাইলা সভে গোপীনাথ আজ্ঞাক্রমে॥
তাহাতে হইল মান প্যারীজীর মনে।
আদেশ করিলা কোন নিজপক্ষ জনে॥
কোথাকারে বাঙ্গালিনী (খ) আসিয়া বসিল।
বামে হৈতে মোরে উঠাইয়া আসি দিল॥
পুন যদি বামদিগে বসিতে না পাই।
অন্নজল নাহি খাব দঢ়াইলাম[১] (গ) এই॥
এত শুনি চমক পড়িল সভা মনে।
ইহার বিহিত কিবা কর্ত্তব্য এখনে॥
দুজনার দুই মত ইহার কি হবে।
পাথারে পড়িয়া সভে পরস্পর ভাবে॥
জয়পুরের রাজা শুনি আইলা তুরিতে (ঘ)।
সাধুবর্গ লইয়া বিচারে নানামতে॥

পাঠান্তর—(ক) অপ্রকটকালেতে জাহ্নবাঠাকুরাণী।
(খ) বাঙ্গালিনী—কাঙ্গালিনী।
(গ) দঢ়াইলাম—দাঁঢ়াইলাম।
(ঘ) তুরিতে—ত্বরিতে।

১। দঢ়াইলাম—দঢ় পণ বা সঙ্কল্প করিলাম।

শ্রীমতীর পক্ষ প্রায় সকল ভকত।
কিন্তু যে জাহ্নবাজীর বড় উপরোধ (ক)॥
তথাচ শ্রীপ্যারীজীর প্রেম-অনুরোধে।
পক্ষপাত করি গোপীনাথের বিরোধে॥
বামদিগে (খ) বসাইলা শ্রীমতীরে লঞা।
দক্ষিণে বসিলা শ্রীল জাহ্নবাজী গিয়া॥
গোপীনাথ তাহে আনন্দিত মন হৈলা।
প্যারীজীর মান দেখিবারে ভঙ্গি কৈলা॥
শ্রীমতীর ছোটভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরী।
স্নেহপাত্র আর তাহে কৃষ্ণপ্রেমে ভোরি (গ)॥
তথাচ বাহ্যেতে[১] এক ভঙ্গি উঠাইলা।
প্রিয়সুখহেতু নিজ মান প্রকাশিলা॥
গোপীনাথ মনে (ঘ) আর কারণ আছিল।
ছলে যে জাহ্নবাজীর (ঙ) তত্ত্ব জানাইল॥
পরেতে শ্রীমতীজীর অনুমতিক্রমে।
জাহ্নবাজী বসিলেন গোপী-নাথ বামে॥
পরিবর্ত্ত হৈল আপসেতে (চ) দোঁহাকার।
আজ্ঞা হৈল যবে তবে নাহিক বিচার॥
সঙ্কর্ষণের ব্যূহ শ্রীপয়োহব্ধিশায়ী।
চৈতন্য-অভিন্ন বীরচন্দ্র যে গোসাঞি॥
কোন কার্য্য অনুরোধে তাঁহাতে আবেশ।
নিশঠ উলমুক (ছ) দুই আভীর বিশেষ॥
মীনকেতন রামদাস সঙ্কর্ষণব্যূহ।
নিত্যানন্দসুতা গঙ্গা গঙ্গানাম সহ॥
শান্তনু রাজন শ্রীমান্ মাধব আচার্য্য।
পতিভাবে তাহে কৈল যেঁহো সর্ব্ব আর্য্য॥
ব্যূহ তৃতীয় প্রদ্যুম্ন যেঁহো বৃন্দাবনে।
প্রিয়নর্ম্মসখা নিত্য উজ্জ্বল-আখ্যানে॥

পাঠান্তর—(ক) উপরোধ—অনুরোধ।
(খ) বামদিগে—বামভাগে।
(গ) ভোরি—ভরি।
(ঘ) মনে—মান।
(ঙ) যে জাহ্নবাজীর—শ্রীজাহ্নবাজীর।
(চ) আপসেতে—সম্মতিতে।
(ছ) উলমুক—উল্মুখ।

১। বাহ্যেতে—প্রকাশ্যে।

শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত-তনুর সমান।
তেঁহো প্রিয় পারিষদ শ্রীরঘুনন্দন॥
ব্যূহ চতুর্থ অনিরুদ্ধ ভক্তিশক্তিমান্।
বক্রেশ্বর (ক) পণ্ডিত যেঁহো প্রেমের নিধান॥
কৃষ্ণাবেশে নিত্য প্রভুসুখ লাগি মাগে।
সহস্র গায়ক নিজ দেহ (খ) অনুরাগে॥
প্রকাশভেদেতে তেঁহো শশিরেখা সখী।
দুইরূপে (গ) এক দেহ গৌরসুখে সুখী॥
গৌরাঙ্গের আবেশ নকুল ব্রহ্মচারী।
তথা প্রদ্যুম্ন মিশ্র সমান তাহারি॥
গৌরাঙ্গের কলা খঞ্জ ভগবান্ আচার্য্য।
গোপীনাথাচার্য্য ব্রহ্মা ত্রিজগত-আর্য্য॥
নবব্যূহে সদাশিব ব্রজ-আবরণ।
যেঁহো শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু চৈতন্য-অভিন্ন॥
যেঁহো গোপেশ্বর বৃন্দাবনে গোপবেশে।
নৃত্য কৈলা কৃষ্ণ আগে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে॥
শিবাতন্ত্রে কহে শুন ইহার প্রমাণ।
ভৈরব প্রিয়ার সনে কহিলা যেমন॥
এক কার্ত্তিকেয়-দীপযাত্রা মহোৎসবে।
রামকৃষ্ণ সখাসনে নৃত্য (ঘ) করে যবে॥
মোর গুরু মহাদেব শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে।
হেরিয়া উন্মত্ত হৈলা প্রেমানন্দমদে॥
গোপশিশু রূপ ধরি গোপাল সহিতে।
চক্রভ্রমণ যথা লাগিলা নাচিতে॥
কুবের গুহ্যকেশ্বর[১] মহাদেব মিত্র।
তুষিলা শ্রীদেবদেবে জপি সিদ্ধমন্ত্র॥
প্রসন্ন হইয়া কহে কি বর মাগহ।
তেঁহো কহে তুমি মোর পুত্রজন্ম লহ॥
'তথাস্তু' বলিয়া শিব অঙ্গীকার কৈলা।
কোনোকালে তব পুত্র হব বর দিলা॥

পাঠান্তর—(ক) বক্রেশ্বর—চক্রেশ্বর।
(খ) দেহ—সহ।
(গ) দুইরূপে—এইরূপে।
(ঘ) নৃত্য—ক্রীড়া।
১। গুহ্যকেশ্বর—যক্ষরাজ।

সেই কাল প্রতীক্ষা করিয়া যক্ষরাজ।
কষ্টেতে যাপন সেই কাল করে ব্যাজ[১]॥
প্রভুর পার্ষদে আসি তেঁহো জনমিলা।
সে রূপেও কুবের তাঁহার নাম হৈলা॥
তাহার নন্দন শ্রীল অদ্বৈত গোসাঞি।
তাঁহার গৃহিণী সীতা শ্রীনাম্নী দুই॥
দুই ঠাকুরাণী যোগমায়ার প্রকাশ।
মহাপ্রভু প্রতি যাঁর স্নেহের বিলাস॥
সীতাঠাকুরাণী-পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
কার্ত্তিকেয় পূর্ব্বে যিনি রূপে জিনি চন্দ্র (ক)॥
অচ্যুতানামেতে পূর্ব্বগোপী কেহ কহে।
দুই রূপ মিলি প্রকাশয়ে এক দেহে॥
কৃষ্ণমিশ্র তাঁহার অনুজ বিচক্ষণ।
তাঁহারেও কার্ত্তিকেয় কহে সাধুজন॥
নন্দিনী জঙ্গলী দুই সীতা-সহচরী।
পূর্ব্বে যেঁহো শ্রীজয়া বিজয়া অনুচরী॥
যোগমায়া প্রতিবিম্ব উমা মায়াশক্তি।
অভেদ করিয়া কহেন 'যোগমায়া' উক্তি॥
শ্রীবাসপণ্ডিত ধীমান্ নারদ আসিত (খ)।
শ্রীমান্ পর্ব্বতমুনি শ্রীরাম পণ্ডিত॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত হনুমান্ কপিবর।
শ্রীঅঙ্গদ শ্রীমান্ পণ্ডিত পুরন্দর॥
শ্রীসুগ্রীব কপিরাজ শ্রীগোবিন্দানন্দ।
বিভীষণ মহারাজ পুরী রামচন্দ্র॥
জটিলা রাধিকাশ্বশ্রু তাহাতে মিলিত।
যে হেতুক প্রভু-ভিক্ষাসঙ্কোচনে রত॥
ঋচিকমুনির পুত্র ব্রহ্মনাম যেঁহ।
প্রহ্লাদ তাহার সহ মিশ্র (গ) এক দেহ॥
হরিদাসরূপ যেঁহো নামের মহিমা।
বাহু তুলি কহিলেন করিয়া গরিমা॥
তাঁহার মহিমা কিছু আশ্চর্য্য কথন।
প্রভু নৃত্য কৈলা যাঁরে করি আলিঙ্গন॥

পাঠান্তর—(ক) কার্ত্তিকের রূপে পূর্ব্বে যেঁহ জিনি চন্দ্র।
(খ) আসিত—আসীৎ।
(গ) প্রহ্লাদ—প্রহ্লাদ। মিশ্র—মিলি।
১। কাল করে ব্যাজ—সময় কাটায়।

যবনের কুলে জন্ম হৈল যে কারণ।
পিতৃ-অভিশাপ শুন তার বিবরণ॥
পিতা শ্রীঋচিক মুনি, তাঁহার আজ্ঞাতে।
তুলসী আনিয়া দেন নিতি নিতি প্রাতে॥
একদিন অধৌত তুলসী আনি দিলা।
বালুকা আছিল দেখি শাপান্ত করিলা॥
কৃষ্ণভক্ত জন কি যবন কি ব্রাহ্মণ।
হানিলাভ কিসে তার সকলি সমান॥
বৃন্দাবনে অষ্টসিদ্ধি অণিমা আদিক।
অষ্ট-ভক্তরূপ প্রভুপদে প্রেমাধিক (ক)॥
অনন্ত গোবিন্দ রঘুনাথ সুখানন্দ।
দামোদর কেশব রাঘব কৃষ্ণানন্দ॥
ব্রহ্মপুত্র ঊর্দ্ধরেতা সমদর্শী সাধু।
নব ভাগবত জন্মে যথা নব বিধু॥
গৃহ মাতা পিতা ত্যেজি সন্ন্যাস করিল।
প্রভুসঙ্গে সদা থাকি তোষ জন্মাইল॥
নৃসিংহানন্দ-তীর্থ আর ভারতী-সত্যানন্দ (খ)।
শ্রীনৃসিংহ জগন্নাথ তীর্থ চিদানন্দ॥
বাসুদেব-তীর্থ আর শ্রীপুরুষোত্তম।
গরুড়-অবধূত আর গোপেন্দ্র শ্রীরাম॥
শঙ্খনিধি পদ্মনিধি (গ) আদি নবনিধি।
নিধি রত্ন শব্দ নাম গর্ব্বে নব সুধী॥
পদ্মনিধি শঙ্খনিধি আর শ্রীশ্রীনিধি।
শ্রীগর্ভ শ্রীকবিরত্ন আর সুধানিধি॥
রত্নবাহু বিদ্যানিধি আর গুণনিধি।
প্রভুপ্রিয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভক্তিনম্র সুধী॥
সুমুখ নামেতে গোপ শ্রীযশোদা-পিতা।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী পিতা শচীমাতা॥
গর্গমুনি সহ তেঁহো হন একদেহ।
প্রভুর ভাবি-জন্মকথা কহিলেন যেঁহ॥
যশোদা মাতার মাতা পাটলা-নামিনী।
শচীমাতার মাতা নীলাম্বরের ঘরণী॥

পাঠান্তর—(ক) প্রেমাধিক—প্রামাণিক।
(খ) ভারতী-সত্যানন্দ—ভারত সত্যানন্দ।
(গ) শঙ্খনিধি পদ্মনিধি—আচার্য্যরত্ন রত্নাকর পণ্ডিত।

পুরাণপাঠক দেবানন্দ যে পণ্ডিত।
শ্রীভাগুরি মুনি পূর্ব্বে ব্রজে পুরোহিত॥
সনকাদি চতুঃসম চারি নামে খ্যাত।
কাশীনাথ রামনাথ শ্রীনাথ লোকনাথ॥
শ্রীল বেদব্যাস শ্রীমান্ দাস-বৃন্দাবন।
সখা শ্রীকুসুমাপীড় তাঁহাতে মিলন॥
শ্রীমান্ শুকদেব মহামহিমা অপার।
তেঁহো শ্রীবল্লভভট্ট প্রভু প্রাণ যাঁর॥
শ্রীমান্ গঙ্গাদাস আর জগন্নাথাচার্য্য।
দুইরূপ হয়েন দুর্ব্বাসা মুনিবর্য্য॥
শ্রীচন্দ্রশেখর আর শ্রীউদ্ধব দাস।
চন্দ্রের আবেশে দোঁহে করেন প্রকাশ।
নিশাপতি বলি প্রভু ডাকিলা যাঁহারে।
বিশেশ্বর আচার্য্য যে হন দিবাকরে॥
ভাস্কর ঠাকুর পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা হন।
ভিক্ষুক বনমালী যেঁহো সুদামা ব্রাহ্মণ॥
প্রভুসঙ্গধন প্রাপ্তে দুঃখভ্রম গেল।
প্রেমভক্তিনিধি মিলি মহা আঢ্য[১] হৈল॥
শ্রীবৈকুণ্ঠদ্বারপাল শ্রীজয় বিজয়।
গোবিন্দ গরুড় দোঁহে প্রভুপ্রিয় হয়॥
শ্রীগরুড় গরুড় পণ্ডিত হয় যেঁহ।
অক্রূর হয়েন যেঁহ গোপীনাথসিংহ॥
কেহ কহে অক্রূর যে কেশবভারতী।
পুরী শ্রীপরমানন্দ উদ্ধবের মূর্ত্তি॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা শ্রীমান্ রাজা প্রতাপরুদ্র।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য দেবগুরু ভদ্র॥
প্রিয়নর্ম্মসখার্জ্জুন পাণ্ডব (ক) অর্জ্জুন।
মিলি রায় রামানন্দ প্রভুর স্বজন॥
কেহ কহে অর্জ্জুনীয়া নামে গোপীসহ।
পাদ্মোত্তরখণ্ড সহ বিচার করহ॥
পাণ্ডব অর্জ্জুন ব্রজে গোপীদেহ হৈল।
অর্জ্জুনীয়া বলি নাম তাঁহার হইল॥
আরো যে প্রমাণ প্রভুবাক্য বলবত্ত্ব।
ভবানন্দ প্রতি প্রভু কহিলা যে তত্ত্ব॥

পাঠান্তর—(ক) পাণ্ডব—পণ্ডিত।
১। আঢ্য—ধনী।

তুমি পাণ্ডু হও তব পাঁচ যে নন্দন।
পাণ্ডব হয়েন পঞ্চ গুণে অগণন॥
ইহাতে অর্জ্জুন তার নাহিক সন্দেহ।
অতএব তিনরূপে হন একদেহ॥
প্রভুর অধিক প্রিয় সদাই আসঙ্গ।
প্রভু ভৃত্যে দোঁহে মেলি কৃষ্ণকথারঙ্গ॥
গৌরাঙ্গ-ভকত যত ব্রজপরিকর (ক)।
সংক্ষেপে করিব কিছু বর্ণন তাহার॥
শ্রীমান্ শ্রীদাম্ শ্রীল-অভিরাম ভেল।
ষোল সাঙ্গের (খ) কাষ্ঠ যেঁহো বংশী বাজাইল॥
সুন্দর ঠাকুর যেঁহ পূর্ব্বে শ্রীসুদাম।
পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় তেঁহো বসুদাম॥
প্রসিদ্ধ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত সুবল।
কমলাকর পিপিলাই যেঁহো 'মহাবল'॥
সুবাহু গোপাল যেঁহো উদ্ধারণদত্ত।
'মহাবাহু' সখা শ্রীমান্ মহেশ পণ্ডিত॥
স্তোককৃষ্ণ যেঁহো তেঁহো দাস পুরুষোত্তম।
নাগর পুরুষোত্তম তেঁহো পূর্ব্ব ব্রজে দাম॥
অর্জ্জুন নামে যে সখা (গ) পরমেশ্বর দাস।
লবঙ্গ নামেতে সখা কালা-কৃষ্ণদাস॥
খোলাবেচা শ্রীধর পণ্ডিত যে ব্রাহ্মণে।
খোলা কাড়াকাড়ি প্রভু কৈলা যার সনে॥
তেঁহো যেঁহো হন ব্রজে শ্রীমধুমঙ্গল[১]।
হলায়ুধ ঠাকুর হন পূরবে প্রবল॥
বলদেবসখা তেঁহো নাম যে 'প্রবল'।
গুণেতে সমান প্রায় সমান যে বল॥
বরূথপ (ঘ) কৃষ্ণসখা শ্রীরুদ্রপণ্ডিত।
গন্ধর্ব্ব-আখ্যান কুমুদানন্দ পণ্ডিত॥
পূর্ব্বে যেঁহো ব্রজে চেট[২] ভৃঙ্গার ভঙ্গুর।
প্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দ কাশীশ্বর॥

পাঠান্তর—(ক) ব্রজপরিকর—প্রিয় পরিকর।
(খ) ষোল সাঙ্গের—ষোড়শাঙ্গের।
(গ) নামে যে সখা—নামেতে সখা।
(ঘ) বরূথপ—স্বরূপেতে।
১। শ্রীমধুমঙ্গল—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা মতে কুসুমাসব।
২। চেট—ভৃত্য।

ব্রজে পূর্ব্বে দাস প্রিয় রক্তক পত্রক।
বৈদ্য হরিদাস আদি অন্য (ক) যে সেবক॥
নীরসংস্কারী পূর্ব্বে পয়োদ বারিদ।
রামাই নন্দাই ভৃত্য প্রভুমনবেদ্য[১]॥
ব্রজের গায়ক মধুকণ্ঠ মধুব্রত।
মুকুন্দ শ্রীবাসুদেব নায়ক বিদিত॥
নট চন্দ্রমুখ এবে মকরধ্বজ-কর।
প্রভু-সুখে সুখী যেঁহ গুণের সাগর॥
ব্রজে যেঁহ মৃদঙ্গবায়েন সুধাকর।
ডম্ফবাদ্যে বিজ্ঞ তেঁহো ঘোষ শ্রীশঙ্কর॥
চন্দ্রহাস নৃত্যরসে (খ) গুণের অবধি।
পণ্ডিত শ্রীজগদীশ নর্ত্তনবিনোদী॥
কৃষ্ণের মুরলী মাল্য রাখে মালাধর।
এবে তেঁহো বনমালী পণ্ডিত সুন্দর॥
বৃন্দাবনে শারী শুয়া 'দক্ষ' 'বিচক্ষণ'।
শিবানন্দ পুত্র মধ্যে দুই ভ্রাতা হন॥
কবিকর্ণপুরের অগ্রজ গুণধাম।
শ্রীচৈতন্যদাস রামদাস দোঁহানাম॥
অতঃপর বল্লবীবর্গের (গ)[২] যে প্রকাশ।
কহিব কিঞ্চিত যে যে চৈতন্যে বিলাস॥
প্রেমের স্বরূপা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী।
তেঁহো শ্রীমদ্‌গদাধর-পণ্ডিত রূপধারী॥
বৃন্দাবনলক্ষ্মী শ্যামসুন্দরবল্লভা।
গৌর প্রেমলক্ষ্মী গোরা-অঙ্গকান্তি-প্রভা॥
রাধাকৃষ্ণ দুই তনু মিলিয়া গৌরাঙ্গ।
গদাধর শ্রীরাধা দ্বিধারূপে রসরঙ্গ॥
শ্রীরাধার প্রাণসমা ললিতাসুন্দরী।
নিজনামতুল্য নাম অনুরাধা করি॥
তেঁহো শ্রীরাধার রূপ গদাধরদেহে।
চৈতন্য শ্রীরাধা যথা তথা মিলি রহে॥

পাঠান্তর—(ক) আদি অন্য—বৃহৎ-শিশু।
(খ) নৃত্যরসে—নৃত্যরাস।
(গ) অতঃপর বল্লবীবর্গের—অতএব বল্লবীগণের।
১। প্রভুমনবেদ্য—প্রভুর মন যোগাইতে সক্ষম।
২। বল্লবীবর্গের—গোপীসমূহের।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের মতে।
এবং শ্রীস্বরূপগোস্বামীর বর্ণনাতে॥
শ্রীরাধা শ্রীগদাধর নাহিক সন্দেহ।
রুক্মিণীদেবীর সহ মিলি কহে কেহ॥
সেহ সত্য যেঁহো লক্ষ্মী রাধিকার অংশ।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী রাধা সর্ব্ব-অবতংশ॥
মহাপ্রভু নৃত্য কৈলা ধরি রাধা বেশ।
গদাধর হৈলা তবে ললিতা আবেশ॥
ইহাতে নাটকমতে প্রমাণ যে হয়।
সকল সম্ভব অলৌকিক যে বিষয়॥
গদাধর-প্রকাশ ব্রহ্মচারী ধ্রুবানন্দ।
ললিতার রূপ করি কহে সাধুবৃন্দ (ক)॥
প্রভুদেহে শ্রীরাধাশ্রীললিতাবিলাস।
ললিতা অংশেতে কিংবা (খ) দ্বিতীয় প্রকাশ॥
শ্রীরাধাবিভূতি চন্দ্রকান্তি পূর্ব্বে ব্রজে।
তেঁহো এবে গদাধরদাসরূপে রাজে॥
পূর্ণানন্দা গোপী যেঁহো বলদেব-প্রিয়া।
বিরাজয় অন্য গদাধর প্রকাশিয়া॥
চন্দ্রাবলী কৃষ্ণপ্রিয়াবলীর প্রধানা।
কবিরাজ-সদাশিব প্রকাশ অধুনা॥
পূর্ব্বে ভদ্রাসখী এবে শঙ্কর পণ্ডিত।
যেঁহো তারকা পালি দোঁহ ব্রজে অবস্থিত॥
এবে জগন্নাথ শ্রীগোপাল দোঁহ রূপ।
দামোদর পণ্ডিত চণ্ডীসখীর স্বরূপ॥
কার্য্যবিশেষেতে সরস্বতীর আবেশ।
প্রভুর প্রিয় যে গুণে নাহি যার শেষ॥
স্বয়ং শ্রীললিতাদেবী স্বরূপ গোস্বামী।
চৈতন্যের প্রিয় চৈতন্যেতে মহাপ্রেমী॥
রাধাকৃষ্ণগুণলীলা কেহ যদি বর্ণে।
রসাভাস হৈলে প্রভু নাহি শুনে কর্ণে॥
প্রথমে শ্রীস্বরূপগোসাঞি পরখেন।
তবে মহাপ্রভু তাহা গ্রহণ করেন॥
কেহ কহে বিশাখাস্বরূপ তেঁহো হন।
শ্রীরাধারে যেঁহো কলাবিলাস শিখান॥

পাঠান্তর—(ক) সাধুবৃন্দ—ভক্তবৃন্দ।
(খ) ললিতা অংশেতে কিংবা—ললিতার অংশে কিবা।

বেশরচনায় পটু যেঁহ চিত্রাসখী।
বনমালী কবিরাজ প্রভুসুখে সুখী॥
চম্পকলতিকা রাধাসুখের বিলাসী।
রাঘবপণ্ডিত তেঁহো গোবর্দ্ধনবাসী॥
'ভক্তিরত্নপ্রকাশ' নাম গ্রন্থ চমৎকার।
বর্ণিয়া করিলা যেঁহো ভক্তির প্রচার॥
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তুঙ্গবিদ্যা রসবতী।
তেঁহো শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী যতি॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত আদি কর্ণপেয়[১]।
বর্ণিলেন গ্রন্থ সুধাধিক উপাদেয়॥
ইন্দুরেখা (ক) সখী চন্দ্রমুখী রাধাপ্রিয়।
শ্রীমৎ-কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী-নামধেয়॥
রঙ্গদেবী সুরঙ্গিণী ভট্ট-গদাধর।
সুদেবী অনন্তাচার্য্য গৌরাঙ্গকিঙ্কর॥
কাশীশ্বরগোস্বামী শশিরেখা যেঁহো পূর্ব্বে
ধনিষ্ঠা শ্রীরাঘবপণ্ডিত যেঁহো এবে॥
ব্রজে কৃষ্ণে বনে খাদ্যবস্তু লয়্যা দেন।
হেথা প্রভুহেতু ঝালি সাজাইয়া যান॥
গুণমালা তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী।
কিবা স্নেহময় তাঁর গৌরাঙ্গে পিরীতি॥
রত্নলেখা (খ) কৃষ্ণদাস কৃষ্ণানন্দ যেঁহো।
ব্রজপুরে (গ) সখী কলাবতী নাম তেঁহো॥
শৌরসেনী এবে নারায়ণবাচস্পতি।
পীতাম্বর যেঁহো তেঁহো কাবেরী সুমতি॥
সুকেশী মকরধ্বজ মাধবী যে গোপী।
মাধব আচার্য্য যশ যাঁর পৃথ্বীব্যাপি॥
ইন্দিরা রূপসী যেঁহো শ্রীজীবপণ্ডিত[২]।
সুমধুরা নামে তুঙ্গবিদ্যা সহ প্রীত॥
তেঁহো বিদ্যা বাচস্পতি সে ওড্রদেশীয়।
সুবিজ্ঞ পরম ধীর গৌরাঙ্গের প্রিয়॥

পাঠান্তর—(ক) ইন্দুরেখা—ইন্দুলেখা।
(খ) রত্নলেখা—রত্নরেখা।
(গ) ব্রজপুরে—ব্রজে পূর্ব্বে।
১। কর্ণপেয়—শুনিতে মধুর।
২। শ্রীজীবপণ্ডিত—ইনি শ্রীজীব গোস্বামী নহেন। তিনি বিলাসমঞ্জরী।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীমধুরেক্ষণা।
চিত্রাঙ্গী শ্রীনাথমিশ্র শিষ্ট মহামনা॥
কবিচন্দ্র যেঁহো তেঁহো মনোহরা সখী।
সারঙ্গ ঠাকুর তেঁহো যেঁহো নান্দীমুখী॥
প্রহ্লাদের আবেশ তাঁহাতে কেহ কহে।
শিবানন্দসেন যে মহান্তমতে নহে॥
কলকণ্ঠী সুকণ্ঠী যে গন্ধর্ব্বী-আখ্যান।
বসু-রামানন্দ আর সত্যরাজ-খান॥
কাত্যায়নী নামেতে গোপী শ্রীকান্ত সেন।
বৃন্দাবনে বনদেবী বৃন্দা যে আখ্যান॥
তেঁহো শ্রীমুকুন্দদাস খণ্ডবাসী হন।
বীরা নামে দূতী তেঁহো শিবানন্দ সেন॥
সর্ব্বগোপীদূতী যেঁহো সর্ব্ব সমঞ্জস।
কৃষ্ণসুখে সদা সুখী কৃষ্ণে রসোল্লাস॥
ব্রজে বিন্দুমতী যেঁহো তাঁহার ঘরণী।
কবি শ্রীমান্ কবিকর্ণপূরের জননী॥
পূর্ব্ব মধুমতী ব্রজে এবে যে প্রভুর।
প্রিয়তম নরহরি সরকার ঠাকুর॥
ব্রজে প্রাণসখী যাঁর নাম রত্নাবতী।
এবে তেঁহো গোপীনাথাচার্য্য মহামতি॥
কৃষ্ণপ্রিয় বংশী বংশীদাস সে ঠাকুর।
শ্রীরূপমঞ্জরী রূপে গুণেতে প্রচুর॥
তেঁহো শ্রীমান্ রূপ নাম গোস্বামী প্রসিদ্ধ।
সর্ব্বগুণধাম সর্ব্বজগতে আরাধ্য॥
গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় যে কলেবর হয়।
যেঁহো বিনে কলিযুগের (ক) কি হৈত উপায়॥
শ্রীরূপমঞ্জরীপ্রেষ্ঠা (খ) শ্রীরতিমঞ্জরী।
তাঁর নামভেদ হয় লবঙ্গ-মঞ্জরী॥
তেঁহো শ্রীমান্ সনাতন গুণের সাগর।
শ্রীচৈতন্য অভিন্ন তাঁহার কলেবর॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য অমূল্যরতন।
তাঁহাতে প্রবেশ চতুঃসন-সনাতন॥

পাঠান্তর—(ক) কলিযুগের—কলিজীবের।
(খ) প্রেষ্ঠা—শ্রেষ্ঠা।

জগতে আচার্য্যরূপে উপদেশ দিলা।
দুর্ল্লভ মাধুর্য্য-ভক্তিরস প্রচারিলা॥
শ্রীমান্ লবঙ্গমঞ্জরীর যে প্রকাশ।
শিবানন্দচক্রবর্ত্তী বৃন্দাবনে বাস॥
পতিতপাবন শ্রীগোপালভট্ট যেঁহো।
শ্রীগুণমঞ্জরী শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রিয় তেঁহো॥
সমুদ্র-গম্ভীর যাঁর আশয় অগম্য।
নিদ্রাহার বিহারাদি দেহধর্ম্ম (ক) সাম্য॥
কৃষ্ণপ্রেমপরাকাষ্ঠা যে প্রেমের বশে (খ)।
শালগ্রামশিলা (গ) তেজি ত্রিভঙ্গ প্রকাশে॥
অনঙ্গমঞ্জরী সখী তাঁহাতে প্রবেশ।
সাধুগণ কহে যেঁহো জানয়ে বিশেষ॥
শ্রীমান্ রঘুনাথভট্ট গোস্বামী-মহান্।
গৌরাঙ্গ সর্ব্বস্ব যাঁর গৌরাঙ্গ-পরাণ॥
পণ্ডিত সুশান্ত মহাগম্ভীর স্বভাব।
শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে ঐকান্তিক ভাব॥
ব্রজে তেঁহো শ্রীরতিমঞ্জরী আর রাগ[১]।
দুইরূপে এক দেহ সর্ব্বত্র বিরাগ॥
শ্রীমান্ দাস রঘুনাথ ব্রজে শ্রীরসমঞ্জরী।
চৈতন্যকৃপায় পুনঃ বাস ব্রজপুরী॥
বিরক্ত উদার মহা মহাপ্রেমবান্।
কৃষ্ণের দুঃখ জানি নিজ কুটীর বানান॥
সদা কৃষ্ণ ব্যাঘ্র হৈতে রক্ষার কারণে।
লগুড় হস্তেতে ফিরে শ্রীকুঞ্জের (ঘ) বনে॥
গোসাঞি জানিয়া ঘর বান্ধিয়া রহিলা।
কৃষ্ণের ব্যামহ[২] জানি সহিতে নারিলা॥
শ্রীরতিমঞ্জরী কেহ তাঁহারে কহেন।
নামভেদে ভানুমতী যাঁহার আখ্যান॥
শ্রীবল্লভাত্মজ (ঙ) শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী।
বিলাসমঞ্জরী যেঁহো ব্রজে পূর্ব্বনামী॥

পাঠান্তর—(ক) দেহধর্ম্ম—বেদধর্ম্ম।
(খ) বশে—বসে।
(গ) শালগ্রামশিলা—শালগ্রামরূপ।
(ঘ) শ্রীকুঞ্জের—শ্রীকুণ্ডের।
(ঙ) শ্রীবল্লভাত্মজ—শ্রীবল্লভানুজ।
১। রাগ—রাগমঞ্জরী।
২। ব্যামহ—দুঃখ কষ্ট বা পীড়া।

শত মুখ হৈলে যাঁর গুণ কহা যায়।
কিন্তু বিজ্ঞে পারে মো-সভার সাধ্য নয়॥
এই ছয় গোস্বামীর মঞ্জরী-আখ্যান।
কহিলাম সাধুজনার বর্ণন যেমন॥
ভূগর্ভ ঠাকুর তেঁহো শ্রীপ্রেমমঞ্জরী।
লোকনাথ গোস্বামী শ্রীলীলা যে মঞ্জরী॥
'কলাবতী' 'রসোল্লাসা' 'গুণতুঙ্গা' ব্রজে।
শ্রীবিশাখাকৃতগীতে রাধাকৃষ্ণ পূজে॥
তাঁহা-সভা-প্রকাশ যে গুণেতে (ক) জানিহ।
গোবিন্দ মাধবানন্দ বাসুদেব যেঁহ॥
রাগরেখা (খ) কলাকেলি রাধাদাসী দুঁহ।
শ্রীশিখিমাহাতি মাধবী ভগ্নী সহ (গ)॥
পুলিন্দতনয়া মল্লী কালিদাস এবে।
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী যজ্ঞপত্নী পূর্ব্বে॥
যাঁর স্থানে মহাপ্রভু অন্ন মাগি খান।
কেহ কহে ব্রহ্মচারী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ॥
অন্য যজ্ঞপত্নী দোঁহা জগদীশ হিরণ্য।
একাদশী দিনে প্রভু মাগি খাইলা অন্ন॥
মথুরায় কৃষ্ণপ্রিয়া সৈরিন্ধ্রী সুন্দরী।
তেঁহো কাশীমিশ্র বাস নীলাচলপুরী॥
মালতী শ্রীচন্দ্রলতিকা মঞ্জুমেধা আদি।
শুভানন্দ শ্রীধরাদি নাহিক অবধি॥
সহস্র সহস্র গোপী চৈতন্যপারিষদ (ঘ)।
পুরুষরূপেতে করে প্রেমের আস্বাদ॥
নানালীলা করে নানাদেশে অবতরি।
লৌকিকের ন্যায় রূপ স্বভাব আচরি॥
অসংখ্য গণন কহিবারে না পারিয়ে।
কিঞ্চিৎ কহিল নিজ পবিত্র লাগিয়ে॥
মহান্ত যে কেহ কেহ উপ যে মহান্ত।
সকলেই গুণসিন্ধু সকলেই শান্ত॥
খণ্ডবাসী নরহরি আদি আর যত।
গৌরাঙ্গ-পার্ষদগণ কত শত শত॥

পাঠান্তর—(ক) গুণেতে—ক্রমেতে।
(খ) রাগরেখা—রাগলেখা।
(গ) সহ—সেহ।
(ঘ) পারিষদ—পার্ষদ।

সকল কহিতে নাহি পারয়ে অনন্ত।
কিঞ্চিত কহিল যাহা প্রকাশে মহান্ত॥
শ্রীমান্ কবিকর্ণপূর শিবানন্দসুত।
তাঁহার মহিমা কিছু শুনিতে অদ্ভুত॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ণ কৃপা কৈলা।
শিশুকালে যাঁর মুখে পাদাঙ্গুষ্ঠ দিলা॥
পাদাঙ্গুষ্ঠদান-ছলে শক্তি (ক) সঞ্চারিলা।
গর্ভে যবে তবে পুরীদাস নাম দিলা॥
মহাকবি যেঁহো মহাকাব্য প্রকাশিলা।
শ্রীআনন্দবৃন্দাবন-চম্পূ যে বর্ণিলা॥
নিজ নিত্যসিদ্ধ নাম দৈন্যেতে না কহে।
গুরুনাম নাহি কহে অপ্রকাশ্য যাহে॥
শঠ মীমাংসক আর তার্কিকের স্থানে।
গোপন করিবে সদা কদাচ না শুনে॥
ইতি গৌরগণোদ্দেশ কহিল সংক্ষেপে।
বৈষ্ণবের নাম গুণ কহি (খ) কোনরূপে॥
শ্রীমন্ নাভাজীর মনের আশয় জানিয়া।
গৌরগুণ কহিনু কিছু বিস্তার করিয়া॥

ত্রিপদীচ্ছন্দ

গৌরাঙ্গভকতগণ, গুণসাগরের কণ,
ব্রহ্মা শিব না পারে কহিতে।
অন্যের শকতি কোথা, পঙ্গুর পর্ব্বত যথা,
অসম্ভব লঙ্ঘন করিতে॥
কি আশ্চর্য্য গৌরাঙ্গপার্ষদে।
ত্রিজগতে সুদুর্লভ, প্রেমানন্দ-অনুভব,
হেন প্রেম দীপ্ত পদে পদে॥
কিবা নৃত্য কিবা গীত, কিবা নিষ্কপট রীত,
নির্ম্মৎসর দয়ার সাগর।
অনন্য (গ) শুদ্ধ ভকতি, মাধুর্য্য পিরীতি রীতি,
স্বাভাবিক যুগলে সভার॥

পাঠান্তর—(ক) শক্তি—ভক্তি।
(খ) নাম গুণ কহি—গুণগান গাহি।
(গ) অনন্য—অনন্ত।

গৌরাঙ্গে পিরীতিভাব, অলৌকিক অসম্ভব,
কোটি প্রাণ হৈতে অতিশয়।
গৌরাঙ্গভকত যত, গৌরাঙ্গের অভিমত,
ত্রিজগতে তুলনা না হয়॥
মহাপ্রেম মহাভাব, মহাসঙ্কীর্ত্তন রব,
মহানৃত্য গীত-বাদ্য আদি।
মহারস-উল্লাসে, আনন্দসাগরে ভাসে,
অশ্রুজলে বহি যায় নদী॥
প্রভুর স্বরূপশক্তি, যতেক ভকতপংক্তি,
চিদানন্দসন্ধিনী শকতি।
আহার বিহার যত, সকলি ত্রিগুণাতীত,
সৎ-চিৎ-আনন্দ মূরতি॥

প্রভুর ভকত বিনে, তাঁর মর্ম্ম কেবা জানে,
প্রাকৃত বলিয়া অজ্ঞে কহে।
শ্রীমূর্ত্তি তার্কিক জনে, যেমন প্রাকৃত মানে,
তথা মূঢ়জনে দেখে তাহে॥
গৌরাঙ্গ-ভকত-পদে, যে জন বিষয়মদে,
শরণ না লৈল মূঢ়মতি।
তবে (ক) জন্ম বৃথা হৈল, পশুবত জনমিল,
ফল মাত্র তাহার দুর্গতি॥
সাধুবাক্য না শুনিঞা, শাস্ত্রে নাহি প্রবেশিয়া,
দম্ভে নানামত আরোপিয়া।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
হেরি কাঁপে লালদাস হিয়া॥

পাঠান্তর—(ক) তবে—তার।

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ-স্বরূপ-বর্ণন নাম তৃতীয়-মালা ॥ ৩ ॥

চতুর্থ মালা

দ্বাদশমহাভাগবতাদি
চরিত্র-বর্ণন

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
দ্বাদশ মহান্ত ভাগবত আদি কথা।
শুনহ আশ্চর্য্য তার বিবরণ যথা॥

[দোঁহা—মূল হিন্দী]

বিধি নারদ শঙ্কর সনকাদিক কপিলদেব মনুভূপ।
নরহরিদাস জনক ভীষ্মরু (ক) বলি শুকমুনি ধর্ম্মস্বরূপ॥
অন্তরঙ্গ অনুচর হরিজুকে জো ইনকো যশ গাবে।
আদি অন্তলোঁ মঙ্গল তিনকে শ্রোতা বক্তা পাবে॥
অজামীল প্রসঙ্গ (খ) য়হ নিরণয় (গ) পরমধর্ম্মকো জান।
ইনকী কৃপা ঔর পুনি সমুঝে দ্বাদশ ভক্তপ্রধান॥

[টীকা হিন্দী]

দ্বাদশ প্রসিদ্ধ ভক্তরাজকথা ভাগবত।
অতি সুখদাঈ নানাবিধি করি গায়ে হৈঁ॥
শিবজীকী বাত এক বহুধা ন জানৈ কোউ।
সুনি সরসানে হিয়ে ভাব উর ঝায়ে হৈ॥
সীতাকে বিয়োগ রাম বিকল বিপিন দেখি
শঙ্কর নিপুণ সতীবচন সুনায়ে হৈঁ।
কৈসে য়ে প্রবীণ ঈশ কৌতুকো নবীন দেখো
মনেউ করত অঙ্গ বৈসেহী বনায়ে হৈঁ॥

সীতাকো স্বরূপ বেষ লেশহু ন ফেরফার
রামজু নেহারি নেকু মনমেঁ ন আঈ হৈ।
তব্ ফিরি আয়কৈ সুনায় দঈ শঙ্করকো
অতি দুখ পায় বহুবিধি সমুঝাঈ হৈ॥
ইষ্টকো স্বরূপ ধর্য্যো তাতে তন পরহর্য্যো
পর্য্যো বড়ো শোচ মতি অতিভরমাঈ হৈ।
ঐসে প্রভুভাবপগে পোথিনমে জগমগে
লগে মোকো প্যারে য়হ বাত রীঝি গাঈ হৈ॥
চলে মগ জাত উভে খরে শিব দীঠি পরে
করে পরনাম হিয়ে ভক্তি লাগি প্যারী হৈ।
পারবতী পুঁছৈ কিয়ে কৌনকো জু-কহো মোসোঁ
দিসউ ন জন কোউ তবলোঁ উচারী হৈ॥
বরষ হজার দশ বীতে তঁহা ভক্ত ভয়ো
নয়ো ঔর হৈহৈ দুজে ঠৌর বীতে ধারী হৈ।
সুনিকে প্রভাব হরিদাসনসোঁ ভাব বঢ্যো
রহ্যো-কৈসে জাত চঢ্যো রঙ্গ অতি ভারী হৈ॥

অস্যার্থঃ।

দ্বাদশভক্তরাজ-কথা ভাগবতে গায়।
তাহে শিবজীর এক কথা গুহ্য হয়॥
ভক্তিপ্রবীণতাচার্য্য শ্রীশঙ্কর হয়ে।
যাহা শুনি বৈষ্ণবের আনন্দ বাঢ়য়ে॥
বনমধ্যে রামচন্দ্র সীতার বিয়োগে।
বিকল দেখিয়া শিব ব্যস্ত সতী-আগে॥
কৌতুকে পার্ব্বতী সীতারূপ ধরি আইলা।
রামচন্দ্র তার পানে ফিরি না চাহিলা॥
ফিরি আসি মহাদেবে হাসিয়া কহিলা।
তাহা শুনি দেবদেব মনে দুঃখ পাইলা॥
দেহত্যাগ করি পুন দেহান্তর ধর।
ইহা শুনি সুচ মনে কিবা যুক্তি কর॥
এ প্রসঙ্গ হয়ে কোন শাস্ত্র-অভিমতে।
যেহেতুক দেহত্যাগ দক্ষের যজ্ঞেতে॥

পাঠান্তর—(ক) ভীষ্মরু—ভীখম।
(খ) প্রসঙ্গ—পরসঙ্গ।
(গ) নিরণয়—নির্ণৈ।

এক গ্রামস্থান (ক) দেখে আকাশে চলিতে।
দেখি মাত্র ক্ষণেক স্তম্ভিত হৈল চিতে॥
নামিয়া প্রণাম করে গদগদ-ভাবে।
সতী কহে শূন্যস্থানে প্রণমহ কিবে॥
তেঁহো কহে বৈকুণ্ঠাদিতুল্য এই স্থান।
অযুত বৎসর পূর্ব্বে ছিল এক মহান্॥
আর এক বৈষ্ণবস্থিতি-ভবিষ্যৎস্থানে।
প্রণাম করিলা বহুসহস্র নমনে॥
হরিদাসের প্রভাব শুনি গিরীশ-নন্দিনী।
রঙ্গ চাঢ় গেল চিত্তে অদ্ভুত কাহিনী॥

চরিত্র শ্রীঅজামিলজীউর

[টীকা হিন্দী]

ধর্য়ো পিতু মাতু নাম অজামীল সাঁচো ভয়ো
কিয়ো অজামীল ছোটী তিয়া শূদ্রজাতকী।
কিয়ো মদ্যপান সো সয়ান গহি দূরি ডার্য়ো
মার্য়ো তন বাহি সো জুকীনো লেকে পাতকী॥
করি পরিহাস কাহু দুষ্টনে পাঠায়ো সাধু
আয় গৃহ দেখি বুদ্ধি আয় গঈ সাতকী।
সেবা করি সাবধান সন্তনি রিঝায় লিয়ো
নারায়ণ নাম ধর্য়ো গর্ভবাল বাতকী॥
আয় গহ্যো কাল মোহজালমেং লপটি রহ্যো
মহাবিকরাল যমদূতহু দিখাইয়ে।
বহী সুত নারায়ণ নাম জো কৃপাকৈ দিয়ো
লিয়ো সো পুকারি সুর আরতি সুনাইয়ে॥
সুনতহি পারষদ আয়ে বাহি ঠৌর দৌরি
তোরি ডারে পাশ কহ্যো ধর্ম্ম সমঝাইয়ে।
হারলোঁ বিড়ারে জায় পতিপৈ পুকারে কহী
সুনো বজমারে মতি জাবো হরি গাইয়ে॥

অস্যার্থঃ।

অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ-কুমার।
সমধর্ম্মবহিষ্কৃত অধর্ম্ম অপার॥
গো-ব্রাহ্মণ-সহস্রহা মদ্যপ মাংসাশী।
ব্যাধের আচার করে হত্যা রাশি রাশি॥

পাঠান্তর—(ক) গ্রামস্থান—রম্যস্থান।

গৃহ-স্ত্রী-ত্যাগী বেশ্যা-সনে বনে বাস।
তাতে (ক) চারি পুত্র এক গর্ভেতে নিবাস॥
দৈবযোগে এক সাধু অতিথি আইলা।
অজামিল আতিথেয় দুষ্টে কহি দিলা॥
অহো অজামিলের ত্রাণ উন্মুখ হইল।
ভাগ্যবশে সাধুর পাদস্পর্শ গৃহে হৈল॥
পত্নী তাঁর ভক্তিভাবে আতিথ্য করিল।
সাধু তবে তাহাদিগের বৃত্তান্ত জানিল॥
সাধু পরদুঃখে দুঃখী দয়া উপজিল।
তাহার মঙ্গল কিছু মনে বিচারিল॥
কৃষ্ণনাম উপদেশ ইহারা না লবে।
কেমতে এ হেন পাপী উদ্ধার হইবে॥
ইহা ভাবি মনে এক উপায় চিন্তিলা।
বিনয়ে বেশ্যার স্থানে কহিতে লাগিলা॥
ভোজন করাঞা মোরে তুষ্ট কৈলে যেবা।
তেমতি আমার এক নেহোরা[১] রাখিবা॥
তোমার গর্ভেতে এবার যে পুত্র জন্মিবে।
নারায়ণ বলি তার নামটি রাখিবে॥
বেশ্যা হাসি হাসি কহে ইথে কি লাগিব।
ভাল ভাল ঐ নাম অবশ্য রাখিব॥
হাস্যরূপে সে দিন হৈতে ঐ নাম চলিল (খ)।
সাধু দরশন-সুধা বিধাতা সিঞ্চিল (গ)॥
কথোদিনে সেই শিশু ভূমিষ্ঠ হইল।
পিতাপ্রিয়তম দেহ পীড়িত আছিল॥
নারাযুক্ত হেতু পুন নারায়ণ নাম।
দুই কারণেই (ঘ) পুত্রে রাখে অবিরাম॥
মৃত্যুকালে যমদূত দণ্ডপাশ লঞা।
ঘেরিল আসিয়া সব পাপিষ্ঠ জানিয়া॥
ভয়ে নিজপুত্রে ডাকে বলি নারায়ণ।
সর্ব্বপাপ ছুটি হৈল সংসারমোচন॥
শ্যামলসুন্দর দুই বৈকুণ্ঠের দূত।
হা হা হরি-ভক্তে দণ্ডে এ কি অদভূত॥

পাঠান্তর—(ক) তাতে—তাহে।
(খ) ঐ নাম চলিল—সেই নাম নিল।
(গ) বিধাতা সিঞ্চিল—সঞ্চার হইল।
(ঘ) কারণেই—করে লয়ে।

১। নেহোরা—অনুরোধ, প্রার্থনা।

বলিতে বলিতে আসি যমদূতগণে।
গদার প্রহার আর তাড়ন ভর্ৎসনে॥
অস্ত দন্ত কার কার হস্ত পদ ভাঙ্গি।
কহিতে লাগিলা অরে মূঢ়মতি ঢঙ্গি॥
নিষ্পাপ নির্গুণ অজামিল মহামতি।
এহেন জনেরে দন্ড কি তোর শকতি॥
ধর্ম্মরাজদূত মোরা তোমরা কে হও।
অপমান কর আর পাপীরে ছুটাও॥
তেঁহো কহে তোর ধর্ম্মরাজ কি এমতি।
ধর্ম্ম ত নাহিক জানে (ক) অহঙ্কারমতি॥
জন্মিয়া যে একবার নারায়ণ ভণে (খ)।
তারে পাপী কহে তবে কি ধর্ম্ম সে জানে॥
ইহা শুনি দূতগণ যমালয়ে গিয়া।
কান্দিয়া কহয়ে দন্ডপাশ আছাড়িয়া॥
কিসের রাজত্ব তব কিবা অধিকার।
ত্রৈলোক্যে তোমার আজ্ঞা না চলিবে আর॥
ধর্ম্মরাজ কহে দূত কি অন্যায় হৈল।
দূত বলে আমাদের নাক কাটা গেল॥
অজামিল মহাপাপী নাহি পুণ্যলেশ।
তোমা লঙ্ঘি তারে লঞা গেল কোন্ দেশ॥
কি জানি কাহার নাম নারায়ণ হয়।
পুত্রকে ডাকিল সেই নাম অনুযায়॥
হেনকালে দুই মহাপুরুষ-রতন।
নবঘন জিনি রুচি কমল-নয়ন॥
আসি মাত্র তার কৈল বন্ধবিমোচন (গ)।
মো-সভার গতি এই দেখ বিদ্যমান॥
ইহা শুনি ধর্ম্মরাজ হর্ষ-ভয় পাইল।
ক্ষণেককাল (ঘ) মৌনে স্তব্ধ হইয়া রহিল॥
কম্প অশ্রু পুলক বৈবর্ণ্য স্বরভেদ।
প্রেমের বিকার (ঙ) হৈল নানামত ভেদ॥

ধৈর্য্য হয়্যা কহে রাজা গিয়াছিলা কোথা।
কি কার্য্য করিলে বাপু খায়্যা মোর মাথা॥
হের আইস শুন কহি অতিগুহ্য কথা।
প্রভুর নাম লৈল কেনে গিয়াছিলে তথা॥
ত্রৈলোক্যের নাথ হরি জগতনিবাস।
তাঁর নাম লৈল সেই, মুঞি যাঁর দাস॥
কোটি কোটি মহাপাপ অতিপাপ হয়।
অগ্নিকণে (ক) তুলারাশি ভস্ম যৈছে হয়॥
ইহা শুনি দূতগণ চমৎকার চিত্তে।
অনিমিখে রহে যেন পুত্তলিকা ভিত্তে[১] (খ)॥
ধীরে ধীরে কহে তবে ধর্ম্মরাজ আগে (গ)।
হেন যদি তবে কেনে না কহিলে আগে॥
তোমার প্রভুর জনে কিবা রীত হয়ে।
তবে কেহ আর মোরা না যাব তথায়ে॥
হরিনাম গুণকথা যথায় শুনিবে।
তুলসীর মালা ভালে[২] তিলক দেখিবে॥
নমস্কার করি তথা দূরপথে যাবে।
মুঞি যাঁরে নমস্কার করোঁ কায়-রবে (ঘ)॥
মোর বাক্য না শুনিলে পাবে অনুতাপ।
দূত কহে বুঝিলাম আর না রে বাপ॥
শ্রীল নাভাজীর এই তাৎপর্য্য অর্থ।
লালদাস কহে তাঁর পদরজস্বার্থ॥

[দোঁহা—মূল হিন্দী]

মো চিত্তবৃত্তি নিত তহাঁরহো জহাঁ নারায়ণপারষদ
বিষ্বক্‌সেন জয় বিজয় প্রবল বল মঙ্গলকারী।
নন্দ সুনন্দ সুভদ্র ভদ্র জগ আময়-হারী॥
চন্ড প্রচন্ড বিনীত কুমুদ কুমুদাক্ষ করুণালয়।
শীল সুশীল সুসেন ভাবভক্তন প্রতিপালয়॥

পাঠান্তর—(ক) ধর্ম্ম ত নাহিক জানে—ধর্ম্মতো সে নাহি জানে।
(খ) নারায়ণ ভণে—ডাকে নারায়ণে।
(গ) বন্ধবিমোচন—বন্ধনমোচন।
(ঘ) ক্ষণেককাল—ক্ষণকাল।
(ঙ) বিকার—বিকাশ।

পাঠান্তর—(ক) অগ্নিকণে—অগ্নিযোগে।
(খ) ভিত্তে—চিত্তে বা চিত্রে।
(গ) আগে—লাগে।
(ঘ) মুঞি যাঁরে নমস্কার করোঁ কায়-রবে—মুঞি তাঁরে নমস্কারি কায়-মন-রবে।

১। যেন পুত্তলিকা ভিত্তে—প্রাচীরে আঁকা ছবির মত নিশ্চল হইয়া।
২। ভালে—কপালে।

লক্ষ্মীপতি-প্রীনন প্রবীনমহ ভজনানন্দ ভক্তান হদ।
মো চিত্তবৃত্তি নিত তঁহা রহো জহাঁ নারায়ণপারষদ॥

অস্যার্থঃ।

বৈকুণ্ঠের নারায়ণের (ক) পারিষদগণ।
তাঁহাদিগের শ্রীচরণে রহু চিত্ত মন॥
বিষ্বক্‌সেন জয় বিজয় প্রবল আর বল।
নন্দ সুনন্দ ভদ্র সুভদ্রমঙ্গল॥
চন্ড প্রচন্ড শুভ করুণানমিত।
কুমুদ কুমুদাক্ষ প্রভু বিনীত পুনীত১॥
শীল সুশীল ভক্তপালক সুসেন।
লক্ষ্মীপতি প্রেমানন্দে সেবানন্দে মন॥
মোক্ষপারিষদ প্রভুর মহা-অনুভব।
সনকাদি প্রেরি কৈল অজ পুনর্ভব॥
জয় বিজয়েরে কৈল (খ) প্রতিকূলভাব।
যুদ্ধরস নহে বিনে সমান বৈভব॥
নিজ পারিষদ-সনে সুরঙ্গ (গ) কৌতুক।
অঙ্গছায়াসনে যেন খেলয়ে বালক॥
তিন জন্ম পরে নিজ আলয়ে আনিয়া।
নিত্যপ্রেমানন্দ-রসে রাখে ডুবাইয়া॥

[দোঁহা—মূল হিন্দী]

হরিবল্লভ সব প্রারথোঁজিনপদরজ-আশা ধরী॥
কমলা গরুড় সুনন্দ আদি ষোড়শ প্রভুপদরতি।
হনুমন্ত জাম্বুবন্ত সুগ্রীব বিভীষণ শবরী খগপতি॥
ধ্রুব উদ্ধব অম্বরীষ বিদুর অক্রুর সুদামা।
চন্দ্রহাস চিত্রকেতু গ্রাহ গজ পান্ডবনামা॥
কৌষারব কুন্তীবধূ পট ঐঞ্চত লজ্জা হরী।
হরিবল্লভ সব প্রারথোঁ জিনপদরজ-আশা ধরী॥

[টীকা হিন্দী]

হরিকে জে বল্লভ হৈঁ দুর্লভ ভুবনমাঁঝ
তিনহী কী পদরেণু-আশা জিয় করী হৈ।
যোগী যতি তপী তাসো মেরো কছু কাজ নাহি।
প্রীতিপরতীতি রীতি মেরী মতি হরী হৈ॥

পাঠান্তর—(ক) বৈকুন্ঠের নারায়ণের—বৈকুন্ঠে শ্রীনারায়ণের।
(খ) জয় বিজয়েরে কৈল—জয় বিজয়ের প্রতি।
(গ) সুরঙ্গ—সরস।

১। পুনীত—পুণ্যস্বরূপ।

কমলা গরুড় জাম্ববান সুগ্রীবাদী সবৈ।
স্বাদরূপ কথা জাকী পোথিনমেঁ ধরী হৈ॥
প্রভুসোঁ সচাঈ জগ কীরতি চলাঈ অতি।
মেরে মন ভাঈ সুখদাঈ রসভরী হৈ॥

অস্যার্থঃ।

হরির বল্লভ যেই জগতদুর্লভ।
যাহার চরণরজে সর্ব্বার্থ সুলভ॥
সেই রজ-আশা-মাত্র করি অবিরাম।
যোগী যদি তপী সনে নাহি কিছু কাম॥
ভক্তপদরজমাত্র অর্থ করি মানি।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অর্থে না বাখানি॥
কমলা গরুড় জাম্ববান সুনন্দাদি।
ষোল মহাভাগবত প্রভুপদে রতি॥
হনুমান সুগ্রীব বিভীষণ অম্বরীষ।
খগপতি শবরী ধ্রুব গ্রাহ গজ-ঈশ॥
উদ্ধব বিদুর অক্রুর চন্দ্রহাস।
সুদামা চিত্রকেতু যার হৃদে হরিবাস॥
পান্ডব কুন্তীবধূ গ্রাহ কৌষারব-নামী।
যা-সভার শ্রীচরণ অগতির স্বামী॥
বেদে গায় যার কীর্ত্তি করিয়া বাখান।
ভুবনপাবন হয় যার গুণগান॥

চরিত্র শ্রীহনুমানজীর

[টীকা হিন্দী]

রতন অপার সার সাগর উধার কিয়ে
লিয়ে হিত চায়কে বনায় মালা করী হৈ।
সব সুখসাজ রঘুনাথ মহারাজজুকো
ভক্তসো বিভীষণজু আনি ভেঁট ধরী হৈ॥
সভাহীকী চাহ অবগাহ হনুমান গরে।
ডারি দঈ সুধী ভঈ মতি অববরী হৈ॥
রাম বিন কাম কৌন ফোরি মণি দীনে ডারি।
খোলি ত্বচা নামহিঁ দিখায়ো বুদ্ধি হরী হৈ॥

অস্যার্থঃ।

হনুমান্ কপিপতি, ভক্তরাজ মহামতি,
পরম উদার মহাশয়।
জগতের পূজ্যতম, যার যেই মনস্কাম,
যার নামে সর্ব্বসিদ্ধ হয়॥
রামচন্দ্র প্রিয়তম, জগতের অভিরাম,
উদারমহত্ত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
যত পারিষদগণ, লক্ষ কোটি অগণন,
প্রেষ্ঠমধ্যে (ক) সকলের জ্যেষ্ঠ॥
শুদ্ধ প্রেমানন্দধাম, অদ্ভুত যাহার কাম,
তার মধ্যে শুন এক কথা।
ত্রিভুবনে সভে জানে, প্রসিদ্ধ শ্রীরামায়ণে,
দেব-নর গায়ে যেই গাথা॥
বিভীষণ মহারাজা, রত্নাকর[১] যার প্রজা,
তার স্থানে লয়্যা সারমণি।
অনুরাগে হার গাঁথি, রামচন্দ্র প্রাণপতি,
গলে লয়্যা দিলা ধন্য মানি॥
রামচন্দ্র হার লয়্যা, চারিপানে দেখে চায়্যা,
ভাবে কোথা মোর হনুমান্।
সুগ্রীবাদি যত জন, সভে ভাবে মনে মন,
না জানি কে এ প্রসাদভাজন॥
তবে হনুমান-গলে, অমূল্য রতন মালে,
পরাইয়া হরিসে নিরখে।
হার পায়্যা মহাশয়, আনন্দে মগন হয়,
ফিরাইয়া ঘুরাইয়া দেখে॥
রামনাম নাহি দেখি, মনে হৈলা মহাদুঃখী,
প্রভু মোরে একি বিড়ম্বিলা।
পুন ভাবে বুঝিলাম, ইহার অন্তরে নাম,
একটি মণি দশনে ভাঙ্গিলা॥
ভাঙ্গিয়া নিরখে পুন, না দেখিয়া নামগুণ (খ)
পুন ভাঙ্গে পুন না দেখয়ে।
এইমত কটমটে, ভাঙ্গি ডারে ক্ষিতিতটে[২]
প্রভু দেখি মুচকি হাসয়ে॥

অরে বৎস হনুমান, কি তোমার বিবেচন,
হেন দ্রব্য হেলায় ভাঙ্গিলে (ক)।
হনু কহে কিবা দ্রব্য, কিবা গুণ কিবা লভ্য,
রামনামবিহীন বিফলে॥
পুন চন্দ্রমুখ কহে, দেহ ত তোমার হয়ে,
অস্থিচর্ম্মমাংসময় মাত্র।
তাহে রামনাম কোথা, তবে কেন ধর বৃথা,
কি বিচারে করি মানো মিত্র॥
ইহা শুনি কপিরাজ, উঠে সেই সভামাঝ,
নখে ধরি ফাড়ে বক্ষঃস্থল।
তারকব্রহ্ম রামনাম, চমৎকার অভিরাম,
অস্থি-সন্ধি অঙ্কিত সকল॥
জনকনন্দিনী সীতা, স্নেহানন্দে পুলকিতা
রঘুমণি-মুখপানে চায়।
হর্ষ শোক স্নেহ মোহ, ক্রোধ মান হর্ষ সহ,
দুনয়নে জলধারা বয়॥
হনু গুণ আদ্যোপান্ত, সঙরিয়া[১] স্নেহবৎ
শোক মোহ অকৃতজ্ঞ মানি (খ)।
প্রিয় প্রতি ক্রোধ মান, হনুমানে কিবা দান,
প্রত্যুপকার কি করিলে জানি॥
তবে দয়াময় স্নেহে, আলিঙ্গিয়া হনুদেহে,
প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন।
সুগ্রীবাদি বিভীষণ, দেবতা গন্ধর্ব্বগণ,
জয় জয় করে ঘনেঘন॥
হনুমতে যোড়করে, হর্ষে স্তুতি নতি করে,
ধন্য ধন্য করয়ে জগতে।
মুঞি দীনহীন অতি, ভকতি-বঞ্চিত মতি,
পদযুগ ধর মোর মাথে॥

পাঠান্তর—(ক) প্রেষ্ঠমধ্যে—শ্রেষ্ঠমধ্যে।
(খ) নামগুণ—রামগুণ।
১। রত্নাকর—সমুদ্র।
২। ডারে ক্ষিতিতটে—মাটিতে ফেলিয়া দেয়।

পাঠান্তর—(ক) ভাঙ্গিলে—ডারিলে।
(খ) শোক মোহ অকৃতজ্ঞ মানি—শোকে মোহে অকৃত্রিম জ্ঞানী।
১। সঙরিয়া—স্মরণ করিয়া।

চরিত্র শ্রীবিভীষণজীর

[টীকা হিন্দী]

ভক্তি জো বিভীষণকী কহে ঐসো কৌন জন
ঐপৈ কছু কহি জাত সুনো চিত লায়কে।
চলত জহাজ পরী অটক বিচার কিয়ো।
কোউ অঙ্গহীন নর দিয়ো লে বহায়কে॥
জায় লগ্যো টাপু তাহি রাক্ষসনি গোদ লিয়ে
মোদভরি রাজাপাস গয়ে কিলকায়কে।
দেখত সিংহাসনতে কুদি পরে নৈন ভরি
য়াহীকে অকার রাম দেখে ভাগ পায়কে॥
রচি সো সিংহাসনপৈ লৈ বৈঠারে তাহি ছিন
রাক্ষসনি রীঝ দেত মানি শুভ ঘরী হৈ।
চাহত মুখারবিন্দ অতিহি আনন্দভরী
ঢরকত হৈ নৈন নীর টেক ঠাঢ়ো ছরী হৈ॥
তউ ন প্রসন্ন হোত ছিন ছিন ছিন জোতি
হুজিয়ে কৃপাল কহো মেরী মতি ডরী হৈ।
করো সিন্ধুপার মেরে য়হি সুখসার দিয়ে
রতন অপার ল্যাএ বাহী ঠৌর ফিরী হৈ॥
রামনাম লিখি শীসমধ্য ধরি দিয়ো য়াকে
য়হী জলপার করে ভাব সাঁচো পায়ো হৈ।
তাহী ঠৌর বৈঠ্যো মানো নয়ো ঔর রূপ ভয়ো
গয়ো জো জহাজ সোঈ ফিরি করি আয়ো হৈ॥
লিয়ো পহিচানি পূছ্যো সবসোঁ বখান কিয়ো
হিয়ো হুলসায়ো সুনি বিনৈকে চঢ়ায়ো হৈ।
পর্যো নীর কুদি নেকু পাপ ন পরস কর্যো
হর্যো মন দেখি রঘুনাথ নাম ভায়ো হৈ॥

অস্যার্থঃ।

বিভীষণ মহারাজ, অতুলনা ভক্তমাঝ,
মহিমার বর্ণন না হয়।
ভাইবন্ধু রাজ্যভোগ, অনায়াসে করি ত্যাগ,
শ্রীচরণ করিলা আশ্রয়॥
স্ত্রী-পুরুষ দুইজন, সেবে রাঙ্গা শ্রীচরণ,
ভাসিয়া যে আনন্দসাগরে।
সরমা শরণ ভাবে, ঠাকুরাণীপদ সেবে,
আপনি সেবয়ে ঠাকুরেরে॥
যারে মৈত্রভাব করি, আলিঙ্গন করে হরি,
নিজহস্তে রাজ-অভিষেক।
স্বহস্ত বুলায়্যা অঙ্গে, পিরীতি কৌতুকরঙ্গে,
বরদান করিলা অনেক॥
ভকতির চমৎকার, নাহি যার পারাবার,
তাহে এক অপরূপ শুন।
এক সদাগর হয়, জাহাজ লইয়া যায়,
চরে লাগি আটকিল পুন॥
জাহাজ-উপরে কেহ, আছে হীন-অঙ্গ দেহ.
সিন্ধুজলে তারে ডারি দিল।
অল্পবুদ্ধি সদাগর, শ্রেয় (ক) হেতু ডারে নর,
ভাসি ভাসি লঙ্কায় লাগিল॥
দেখিয়া রাক্ষসগণে, এ কি জন্তু সভে ভণে (খ),
খিলি খিলি হাসয়ে সভাই।
কৌতুকেতে সভে তারে, উঠাইলা লয়্যা করে,
রাজা-আগে রাখে লয়্যা যাই॥
রাজা চমকিত মন, যেন দারিদ্র্যের ধন,
লম্ফ দিয়া উঠাইয়া লৈল।
রামচন্দ্র নরাকৃতি, উদ্দীপন হৈল মতি,
দেহ অশ্রু-পুলকে ব্যাপিল (গ)॥
রত্নসিংহাসন আনি, বসাইয়া নিজ পাণি,
তলে করে চরণসেবন।
নানা বস্ত্র অলঙ্কারে, সাদরে পূজয়ে তারে,
চমকিত নিশাচরগণ॥
স্বর্ণ-আশা করে লয়্যা, চিবুকে ঠেকনা দিয়া,
দূরে দাণ্ডাইয়া মুখ হেরে।
নর চিতে ভীত অতি, প্রসন্ন না হয় মতি,
কান্দিয়া কহয়ে উচ্চস্বরে॥
কৃপালু হইয়া মোরে, দেহ লয়্যা সিন্ধুপারে,
সেই বহু রত্নলাভ মোর।
বাহ্যস্ফূর্তি হয়্যা রাজা, পাইয়া ঈষৎ লজ্জা,
ভৃত্যে কহে দেহ করি পার॥

পাঠান্তর—(ক) শ্রেয়—স্রোত।
(খ) সভে ভণে—ভাবে মনে।
(গ) ব্যাপিল—ভরিল।

রামনাম লিখি শিরে, ফেলে সমুদ্রের নীরে,
যে নৌকায় ভব হয় পার।
হেনই সময়ে পুন, রামনামের কিবা (ক) গুণ,
আইল সেই নৌকা পুনর্ব্বার॥
সদাগর প্রেমে ভরি, ঝরয়ে নয়নে বারি,
উঠাইয়া পুছে সমাচার।
ভক্তরাজ-গুণকথা, নামের মহিমা যথা (খ),
প্রেমভাবে (গ) কহে তবে নর॥
অহো সাধুসঙ্গগুণ, সাক্ষাৎ দেখহ পুন,
তৎক্ষণাতে ভক্তিরত্ন লভে।
পশুসম যে আছিল, ক্ষণমাত্র সঙ্গ হৈল.
(আপনি) তরিল আর তরাইল সভে॥
অতএব শ্রুতি স্মৃতি, আগম পুরাণ আদি,
ফুকারিয়া পুনঃ পুনঃ কহে।
বৈষ্ণবের সঙ্গ কর, হরি অনুরাগে চর (ঘ),
ইহা বিনু আর কিছু নহে॥
শ্রীনাভাজীব শ্রীচরণ, ধূলি শিরে বিভূষণ,
করি এই অভিলাষ মনে।
বৈষ্ণবের গুণগান. করিব অমৃতপান,
জন্মে জন্মে প্রেমদেবী সনে॥

চরিত্র শ্রীশবরীজীর

[টীকা হিন্দী]

বনমে রহত নাব সিবরী কহত সব
চহতি টহল সাধু তন ন্যূনতাঈ হৈ।
রজনীকে শেষ ঋষি আশ্রম প্রবেশ করী
লকরীন বোঝ ধরী আবে মন ভাঈ হৈ॥
হ্নাইবেকো মগঝারী কাঁকরিন বীনি ডারী
বেগি উঠি যাই নেকু জাতি ন লখাঈ হৈ।
উঠত সবার কহে কৌন ধোঁ বুহারি গয়ো
ভয়ো হিয়ে শোচ কোউ বড়ো সুখ-দাঈ হৈ
ইত্যাদি।

পাঠান্তর—(ক) কিবা—দেখ।
(খ) যথা—তথা।
(গ) প্রেমভাবে—প্রেমানন্দে।
(ঘ) হরি অনুরাগে চর—হেরি অনুরাগ ধর।

অস্যার্থঃ।

পঞ্চবটীবনে এক চণ্ডালের কন্যা।
মহাভাগ্যবতী তেঁহো ত্রিজগতে ধন্যা॥
শ্রীরামচরণে যার দৃঢ়ভক্তিমতী।
অতএব সাধু মহাপূজ্য মহাব্রতী॥
অপূর্ব্ব তাহার কথা শুন দিয়া মন।
যাহার শ্রবণে সর্ব্বপাপ-বিমোচন॥
বনমধ্যে কৃষ্ণভক্ত সাধু মুনিগণ।
তাঁহাদিগের সেবা শবরীর হৈল মন॥
বন হৈতে শুষ্ককাষ্ঠ বোঝা বান্ধি আনে।
আশ্রমে রাখয়ে রাত্রে কেহ নাহি জানে॥
নদী যাইবার পথ বোহারি[১] করিয়া (ক)।
কাঁটা কুটা কাঁকর সব দূরেতে ডারিয়া (খ)॥
প্রতিদিন করে ঋষিগণ ভাবে মনে।
কেবা পথ ঝাঁট দেয় কেবা কাষ্ঠ আনে॥
একদিন শিষ্যগণ জাগিয়া রহিল।
দেখে রাত্রে কাষ্ঠ লৈয়্যা শবরী আইল॥
ধরিয়া তাহারে সভে চৌদিকে বেড়িল।
ত্রাসে মুখ হেঁট করি' কাঁপিতে লাগিল॥
ঋষিগণ মধ্যে কেহ হরিভক্তি-ধীর (গ)।
ভক্তমর্ম্ম জানে মহাপণ্ডিত গম্ভীর॥
সাধুসেবা-মতি দেখি আর্দ্র হইল চিত।
রামনাম দীক্ষা দিলা করিয়া পিরীত॥
যত যত ছিল তথা বহির্ম্মুখগণ।
জাতিপংক্তি হৈতে তারে করিল বর্জ্জন॥
তেঁহো কহে অজ্ঞ যে তোমরা নাহি জান।
বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করি শ্রেষ্ঠ মান॥
তথাচ না বুঝি তাঁরে অসংগ্রহ কৈল।
মুনি বিজ্ঞতম তাহে কাতর না হৈল॥
শবরীরে কহে মোর কাল পূর্ণ হৈল।
শ্রীরামচন্দ্রের লীলা দেখিতে না পাইল॥
তুমি ভাগ্যবতী শীঘ্র দেখিবে নয়নে।
মোরে পরলোক যাইতে হইল এখনে॥

পাঠান্তর—(ক) করিয়া—করয়। (খ) ডারিয়া—ডারয়।
(গ) হরিভক্তি-ধীর—হরিভক্ত ধীর।
১। বোহারি করিয়া—ঝাঁট দিয়া।

রামচন্দ্রের আগমন আদ্যোপান্ত লীলা।
উপদেশ দিয়া মুনি তত্ত্ব জানাইলা॥
দেহত্যাগ করি তবে বৈকুণ্ঠে চলিলা।
শবরী গুরুর শোকে কাতর হইলা॥
একদিন মুনিগণ নদীতে প্রত্যূষে।
স্নানকালে শবরীও গেলা একপাশে (ক)॥
মোদিগের (খ) ঘাটে স্নান করে চণ্ডালিনী।
ইহা বলি ভর্ৎসনা করিল কটু বাণী॥
ভক্ত-অপরাধ পূর্ব্বে হৈত এবে দেখ।
ক্রমে নানা ভিন্ন মতি হৈল নানা দুঃখ॥
তৎক্ষণাৎ নদীর জল হৈল রক্তপ্রায় (গ)।
ক্রমি কপট হৈল দেখি উঠিয়া পলায়॥
তথাচ না বুঝে সব ব্রাহ্মণের গণ।
বলে হায় জল কেনে হইল এমন॥
পত্রের কুটীর এক ঝোপড়া বান্ধিয়া
শবরী রহেন রামচন্দ্র-পথ চায়্যা॥
তৃষিত চাতক (ঘ) যেন মেঘ আগমন।
প্রতীক্ষা করিয়া থাকে উৎকণ্ঠিত মন॥
বনমধ্যে ফলমূল (ঙ) আনে বহু দুখে।
মিষ্ট হৈলে রামচন্দ্রে দিব বলি রাখে॥
চাখিতে চাখিতে যেই ফল মিষ্ট লাগে।
যতনে রাখয়ে তাহা অতি অনুরাগে॥
শবরীর আশাবৃক্ষ সফল হইল।
কথোদিন পরে প্রভুর আগমন হৈল॥
দয়ার সাগর রাম বনে প্রবেশিয়া।
প্রথমেই ডাকে মোর শবরী বলিয়া॥

ত্রিপদী ছন্দ

অমৃতনিন্দিত বাণী, ভুবনমোহন ধ্বনি,
আর তাতে স্নেহের সহিত।
শবরীর কর্ণে আসি, প্রবেশিল সুধারাশি,
কর্ণ পাতি রহে চমকিত॥

চারুদিগ পানে চায়, উন্মত্ত পাগলী প্রায়,
স্তম্ভ যেন দাণ্ডায়্যা রহিল।
হেনকালে দয়াময়, স্নেহে নেত্রে ধারা বয়,
তথা আসি উপনীত হৈল॥
চিত্রপুত্তলিকা-প্রায়, অনিমিখ নয়নে চায়,
রামরূপে (ক) ডুবিল হৃদয়।
ক্রমে উঠে নানা ভাব, সুধা জিনি প্রেমার্ণব,
রোমাঞ্চাদি দেহেতে ব্যাপয়॥
প্রভু ভৃত্যে দোঁহে কান্দে, দোঁহাপ্রেমে দোঁহাবান্ধে,
দুহুঁজনে স্থির নাহি বান্ধে।
শ্রীলক্ষ্মণ সুকুমার, প্রেম দেখি দোঁহাকার,
তেঁহো পুন ফুলি ফুলি কান্দে॥
তবে স্থির বান্ধি মনে, সেই ফলমূল আনে,
আনন্দের আজু সীমা নাই।
উচ্ছিষ্ট শুকুনা ফুল, ভাঙ্গা মৃত-পাত্রে[১] জল,
পত্রাসন রচিল তথাই॥
দয়াল শ্রীরামচন্দ্রে, সহিত অনুজানন্দে,
বৈসে সেই কুটীর দুয়ারে।
অমৃতের স্বাদু পায় (খ), সেই ফল জল খায়,
কিবা ভক্তবৎসল ঠাকুরে॥
আকাশে অপ্সরা নাচে, দুন্দুভিবাজন বাজে,
পুষ্পবৃষ্টি ঘন বরিষয়।
অহে কি দয়াল হরি, ধন্য প্রেমসুমাধুরী,
ধন্য ধন্য শবরীর পায় (গ)॥
ব্রাহ্মণ সমূহগণ (ঘ), দেখি প্রভুর আচরণ,
কেহ তুষ্ট কেহ ত বিমন।
কর্ম্মী জ্ঞানী নানা জন, নাহি ভক্তিরসজ্ঞান,
তারা কহে এ কি বিবরণ॥
তার মধ্যে ভক্তিমর্ম্ম, যে জানে পরম ধর্ম্ম,
তার মনে উল্লাসিত হৈল।
জাতিপাঁতি পাণ্ডিত্যাদি, ধিক্ ব্রহ্মসতকৃতি,
ইহা বলি নাচিতে লাগিল॥

পাঠান্তর—(ক) একপাশে—এক দেশে।
(খ) মোদিগের—মুনিদিগের।
(গ) রক্তপ্রায়—রক্তময়।
(ঘ) চাতক—চাতকী।
(ঙ) ফলমূল—ফলফুল।

পাঠান্তর—(ক) রামরূপে—শ্যামরূপে।
(খ) স্বাদু পায়—স্বাদুপ্রায়।
(গ) শবরীর পায়—শবরী যে হয়।
(ঘ) ব্রাহ্মণ সমূহগণ—ব্রাহ্মণ তপস্বিগণ।
১। মৃত-পাত্রে—মৃৎপাত্রে, মাটির পাত্রে।

পয়ার

নদীতটে গিয়া প্রভু পুছয়ে ব্রাহ্মণে।
জল রক্ত কৃমি হৈল কিসের কারণে॥
মুনিগণ বলে প্রভু কারণ না জানি।
আচম্বিতে একদিন হইল অমনি॥
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি পরম ঈশ্বর।
শবরী-হেলায় হৈল কহে পূর্ব্বাপর॥
তখনে বুঝিলা সব ব্রাহ্মণের গণ।
শবরীরে স্তুতি নতি করয়ে বাখান॥
রামচন্দ্র কহে শবরীর পদতল।
জলে স্পর্শ করাহ (ক) জল হইবে নির্ম্মল॥
তবে মুনিগণ সভে শবরীরে লঞা।
জলে নাম্বাইয়া দিল যতন করিয়া॥
তৎক্ষণে নদীর জল হইল নির্ম্মল।
মহাতীর্থ হৈল মহামহিমা বাঢ়িল॥
প্রভু ছলে নিজভক্ত-মহিমা দেখাইল।
শবরীরে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে পাঠাইল॥
অতএব বেদের যে সিদ্ধান্ত যুকতি।
যবন চণ্ডাল কৃষ্ণভক্তে করে নতি (খ)॥
কৃষ্ণভক্ত সেবে যেই নিষ্কপট মনে।
লালদাস মাগে তাঁর চরণে শরণে॥

পাঠান্তর—(ক) করাহ—কৈলে।
(খ) করে নতি—কর রতি।

চরিত্র খগপতি জটায়ুর

[টীকা হিন্দী]

জানকী হরণ কিয়ো রাবণ মরণকাজ।
সুনি সীতাবানী খগরাজ দৌরি আয়ো হৈ॥
বড়ীয়ে লরাঈ লীন দেহ বারি ফোরি দীন।
রাখে প্রাণ রামমুখ দেববো সুহায়ো হৈ॥
আএ আপ গোদ সীস ধারি দৃগধার শীঁচ্যো।
দেই সুধি দেই গতি তনহু জয়ায়ো হৈ॥
দশরথতাত মানি কিয়ো জলদান যহ।
অতি সনমান নিজরূপ ধাম পায়ো হৈ॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীজানকী জগন্মাতা দুষ্টাত্মা রাবণ।
হরি লয়্যা যায় করি রথ-আরোহণ॥
রাম রাম বলি মাতা কান্দে উচ্চস্বরে।
খগরাজ মহামতি দেখে হৈতে দূরে॥
রামচন্দ্র-মহিষী যে জগতের (ক) মাতা।
রাক্ষসে লইয়া যায় মনে পায়্যা ব্যথা॥
ক্রোধে রক্তবর্ণ চক্ষু অঙ্গ ফুলাইয়া।
প্রচণ্ড বেগেতে যায় হুংকার করিয়া॥
কে রে দুষ্ট থাক্ থাক্ এতেক যোগ্যতা।
মুঞি বর্ত্তমানে মোর লয়্যা যায় মাতা॥
আজি তোরে যমালয়ে পাঠাব নিশ্চয়।
ইহা বলি এক পক্ষ-আঘাত করয়॥
শ্রীরাম-ভকত তারে কে জানিতে (খ) পারে।
কিন্তু তার বধ্য নহে যেহেতু (গ) না মরে॥
পাখাঘাতে বেদনা পাইয়া নিশাচর।
দ্রুতগতি যায় পুন হইয়া সোঁসর॥
পুনর্ব্বার খগরাজ রথের সহিতে।
ওষ্ঠ বিস্তারিয়া গেলা প্রচণ্ড কোপেতে॥
গিলিয়া ভাবয়ে মনে কি কৈনু অকায (ঘ)।
গিলিনু জানকী সহ মোর মুণ্ডে বাজ (ঙ)॥
ইহা বলি (চ) কণ্ঠে হৈতে উগারিয়া ডারে।
নানা অস্ত্র শেল শূল রাবণিয়া মারে॥
এইমতে মহাযুদ্ধ হৈল দুই জনে।
জটায়ুর পক্ষ কাটি চলিল সদনে॥
স্বাসমাত্র আছে খগরাজের শরীরে।
শ্রীমুখ হেরিয়া আশা প্রাণ তেজিবারে॥
প্রাণ যাউক তাহে দুঃখ নাহি জটায়ুর।
এ দুঃখ-সিংহের ভাগ হরয়ে কুক্কুর॥

পাঠান্তর—(ক) যে জগতের—ত্রিজগতের।
(খ) কে জানিতে—কে জিনিতে।
(গ) যেহেতু—সেহেতু।
(ঘ) অকায—প্রমাদ।
(ঙ) মোর মুণ্ড বাজ বড় বিসংবাদ।
(চ) বলি—ভাবি।

কথোক্ষণে রামচন্দ্রের (ক) দেখি শ্রীবদন।
কহিতে নারিলা সব তেজিলা জীবন॥
পক্ষিরাজ মহামতি দশরথের সখা।
পিতার বিয়োগ-শোক মনে দিল দেখা॥
কান্দেন শ্রীরাম জটায়ুরে কোলে করি।
বিলাপ করিল কত ফুকরি ফুকরি॥
পিতৃকর্ম্ম ন্যায় ক্রিয়া লৌকিক করিলা।
ভক্তরাজ ভাগ্যবান্ বৈকুণ্ঠেরে গেলা (খ)॥
তাঁর পদরজে মুঞি লুটৌ বারে বার।
এ জন মাগয়ে মাত্র এই ধন (গ) সার॥

চরিত্র শ্রীঅম্বরীষ মহারাজার

[টীকা হিন্দী]

অম্বরীষ ভক্তকী জু রীস কোউ করৈ ঔর
বড়ো মতিবৌর ক্যোহুঁ জাতি নহী ভাষিয়ে।
দুরবাসা ঋষি সীখ সুনী নহী কাহু সাধু
মানি অপরাধ শির জটা খেঁচী নাখিয়ে॥
লেই উপজাই কালকৃত্যা বিকরালরূপ
ভূপ মহাধীর রহ্যো ঠাঢ়ো অভিলাষিয়ে।
চক্রদুঃখ মানিকৈ কৃশানুতেজ রাখ করী
পরী ভীর ব্রাহ্মণকো ভাগবত সাখিয়ে॥   ইত্যাদি

অস্যার্থঃ।

অম্বরীষ মহারাজের সম্যক্ প্রকারে।
গুণযশ মহিমা যে চাহে কহিবারে (ঘ)॥
উন্মাদ বাউল সেই বাঙন হইয়া।
চান্দ ধরিবারে চাহে হাত বাড়াইয়া॥
আপন পবিত্র হেতু কিঞ্চিৎ মহিমা।
গাঙ১ বাঞ্ছা করি তেজি অন্তর-গরিমা॥
কৃষ্ণ-ভক্ত জনের দেখ মহিমা প্রচণ্ড।
দুর্ব্বাসা অপরাধী হয়্যা ভ্রমিলা ব্রহ্মাণ্ড॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কেহ নারিলা রাখিতে।
রক্ষা হৈল সেই ভক্ত শরণ লইতে॥
অতেব বৃত্তান্ত তাঁর শুন মন দিয়া।
বিশেষ কথন কিছু কহি বিবরিয়া॥
মহান্ তপস্বী ঋষি দুর্ব্বাসা মহর্ষি।
দ্বাদশীর প্রত্যুষে অতিথি হৈলা আসি॥
মহারাজ অম্বরীষ সম্মান করিলা।
শিষ্যসহ মুনিবর স্নান হেতু গেলা॥
দ্বাদশী অল্পক্ষণ পারণের কাল।
অভুক্ত অতিথি গৃহে ভাবে মহীপাল॥
বিচার করিয়া মনে জলবিন্দু খাইলা।
হেনকালে ঋষি আসি বৃত্তান্ত জানিলা॥
ক্রোধে মহাচণ্ড মুনি কহয়ে রাজারে।
জলপান কৈলি আগে উপেক্ষিয়া মোরে॥
ইহা কহি একজটা ছিণ্ডিয়া ফেলিলা।
দীপ্ত এক অগ্নিকৃত্যা১ তাহাতে জন্মিলা॥
মহাবিকরাল সেই রাজারে ধাইলা।
নির্ভয়েতে মহারাজা দাণ্ডায়্যা রহিলা॥
সর্ব্বতেজের আত্মা মহাতেজ-চূড়ামণি।
ভক্তরক্ষা হেতু সদা ফিরয়ে আপনি॥
তাঁর তেজ কণামাত্রে নিমিষ মধ্যেতে।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে হয় ভস্মসাতে॥
সেই প্রভুচক্র সুদর্শন উপনীত।
দেখে কৃত্যা ভক্তদ্রোহ করিতে উদ্যত॥
দেখিয়া ক্রোধেতে হৈলা প্রলয়-আনল (ক)।
কৃত্যা অগ্নি গ্রাস (খ) কৈলা যেন বিন্দুজল॥
তবে দুর্ব্বাসারে ভস্ম করিতে ধাইলা।
ত্রাসে মুনি পলায়নপরায়ণ হৈলা॥
মুনিবর (গ) পিছে চক্ররাজ ধাবমান।
ভয়ে কম্পান্বিত মুনি সংশয়-জীবন॥

পাঠান্তর—(ক) রামচন্দ্রের—শ্রীরামের।
(খ) বৈকুণ্ঠেরে গেলা—গোলোকে চলিলা।
(গ) এই ধন—সেই ধন।
(ঘ) চাহে কহিবারে—কহে চাহিবারে।
১। গাঙ—গান করি।

পাঠান্তর—(ক) আনল—অনল।
(খ) গ্রাস—নাশ।
(গ) মুনিবর—মুনিরাজ।
১। অগ্নিকৃত্যা—তপঃপ্রভাবে সৃষ্টা ধ্বংসকারিণী অগ্নিময়ী দেবী বিশেষ।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিয়া ব্রহ্মালোকে উপনীত।
রক্ষ রক্ষ বলি ব্রহ্মার চরণে পতিত॥
বৃত্তান্ত শুনিঞা ব্রহ্মা কর্ণে হাত দিল।
আমিত নারিব শীঘ্র হেতা হৈতে চল (ক)॥
বৈষ্ণবাপরাধী তার না করি সম্ভাষ।
শীঘ্র যাও মোরে কেনে করহ বিনাশ॥
নিরাশ হইয়া পুন শিবলোকে গেলা।
সেখানেও ওইমত বচন শুনিলা॥
বৈকুণ্ঠেরে গেলা যথা স্বয়ং লক্ষ্মীপতি।
ঘর্ম্মাক্ত-শরীর কম্পান্বিত ত্রাসমতি॥
উচ্চস্বরে কহে রক্ষ রক্ষ জগন্নাথ।
সুদর্শন আজি মোরে করয়ে নিপাত॥
পূর্ব্বাপর অন্তর্য্যামী শুনি তাঁর স্থানে।
অন্তরে জন্মিল ক্রোধ চাহে মুনিপানে॥
মৃদু মৃদু স্বরে কিছু কহিতে লাগিলা।
যাহা শুনি মুনি চিত্তে চমৎকার হৈলা॥
ভক্ত মোর প্রাণ মুঞি ভক্তের অধীন।
মুঞি ভক্তহৃদে বসি আমাতে অভিন[১]॥
এ দেহ বিক্রীত মোর ভকতের স্থানে।
হেন ভক্তদ্রোহ তুমি কৈলে কি বিধানে (খ)॥
পণ্ডিত বেদজ্ঞ গূঢ় অভিমান ধর (গ)।
কি বিচার করি অম্বরীষে দণ্ড কর॥
শরণাগতের রক্ষা এ মোর প্রতিজ্ঞে।
কিন্তু বিনা মোর ভক্তদ্রোহিজন অজ্ঞে॥
তথাচ উপায় কহি শুন সাবধানে।
সুদর্শন হৈতে যদি বাঁচিবে পরাণে॥
শীঘ্র অম্বরীষের শরণ লও গিয়া।
তা বিনে কোথাও রক্ষা না পাবে ভ্রমিয়া॥
এত শুনি মুনি ভয়ে লজ্জা পাইল মনে।
বায়ুগতি চলিলা প্রণমি শ্রীচরণে॥
হোথা মহারাজা সেই দিবস হইতে।
অনাহারে সেই স্থানে আছে বর্ষ হৈতে॥
নিজ বিঘ্ন না গণয় সাধু মহাশয়।
বিঘ্নাকুল (ক) এই পাছে ব্রহ্মহিংসা হয়॥
হেনকালে ঋষি গিয়া চরণে পড়িয়া।
বহুস্তুতি কৈলা ভক্ত-মহিমা জানিয়া॥
সুদর্শন দগ্ধ করু তাহে নাহি ভয়।
কৃষ্ণভক্তদ্রোহ কৈনু (খ) এ বড় সংশয়॥
আগে নাহি জানি তোমা সভার মহিমা।
এবে জানিলাম মহা মহিমার সীমা॥
তপ যোগ সাধি মোরা করি অভিমান।
তোমাসভার ভক্তিসিন্ধুর নহে এক কণ॥
যুগে যুগে সাধি মোরা কি ফল (গ) পাইনু
তুমি সব ধন্য মুঞি প্রত্যক্ষে দেখিনু॥
ব্রাহ্মণের কাকুবাদ স্তুতি শুনি রাজা।
মহাকুণ্ঠ হৈলা যেন রাজদণ্ডী প্রজা॥
সুদর্শনে বহু স্তুতি করে যোড় করে (ঘ)।
ব্রাহ্মণের অপরাধ ক্ষমহ আমারে॥
তবে চক্ররাজ অপরাধ ক্ষমা কৈলা।
দুর্ব্বাসা মহর্ষি তবে স্বস্থানে চলিলা॥
আর এক কথা শুন অপূর্ব্ব কাহিনী।
কৃষ্ণে দৃঢ়মতি উপজয়ে যাহা শুনি॥
দেশান্তরে এক রাজকন্যা ভাগ্যবতী।
অম্বরীষ-কৃষ্ণভক্ত (ঙ) শুনে মহামতি॥
বিধি হেন পতি দেয় এই বাঞ্ছা হৈল।
লজ্জা ত্যাগ করি মাতা-পিতারে কহিল॥
অম্বরীষ রাজা যদি স্বামী মোর হয়।
নতুবা ত্যজিব প্রাণ কহিনু নিশ্চয়॥
এত শুনি পিতা তথা পত্রী পাঠাইল।
অম্বরীষ রাজা তাহা উপেক্ষা করিল॥

পাঠান্তর—(ক) আমিত নারিব শীঘ্র হেথা হৈতে চল—রাখিতে নারিব আমি হেথা হৈতে চল।
(খ) বিধানে—কারণে।
(গ) ধর—দড়।
১। অভিন—অভিন্ন, এক।

পাঠান্তর—(ক) বিঘ্নাকুল—মন আকুল।
(খ) কৃষ্ণভক্তদ্রোহ কৈনু—কৃষ্ণভক্তদ্রোহী হৈনু।
(গ) কি ফল—বিফল।
(ঘ) সুদর্শনের অভিস্তুতি করে করযোড়ে।
(ঙ) কৃষ্ণভক্ত—কৃষ্ণভক্তি।

পুনশ্চ বৃত্তান্ত কহি দ্বিজ পাঠাইল।
শুনি অঙ্গীকার করি খড়্গ তারে দিল॥
হর্ষ হইয়া বিপ্র সেই খড়্গ আনিল।
শুভলগ্নে খড়্গসহ বিবাহ হইল॥
পতিগৃহে আইল তবে কৌতুকবিধানে।
রহে রাজ্ঞী যোগ্যস্থানে আসনে ভূষণে॥
প্রাতঃকালাবধি রাজা কৃষ্ণসেবা করে।
গৃহমার্জ্জনাদি ইহা বিদিত সংসারে॥
রাণী ব্রহ্মমুহূর্ত্তে উঠি সব সমাধয়ে।
রাজা আসি দেখে মোর কর্ম্ম কে করয়ে॥
একদিন দেখে রাজা সন্ধান করিয়া।
সেবাকর্ম্ম নই-রাণী করিছে আসিয়া॥
রাজা মনে তুষ্ট কিছু (ক) রুষ্টভাবে কহে।
মোরে বঞ্চ তুমি হেন উপযুক্ত নহে॥
হেন শ্রদ্ধা যদি হয় বিগ্রহরূপধারী।
সেবন করহ তবে নিজ মাথে ধরি॥
রাজার আজ্ঞাতে রাণী বিগ্রহ স্থাপিয়া।
সেবানন্দে দিবানিশি (খ) মগ্ন হৈল হিয়া॥
রাণীর চরিত্র রাজা শুনিয়া আনন্দ।
ভাবভক্তি দেখিবারে অন্তরে প্রবন্ধ[১]॥
একদিন রাত্রিযোগে করিয়া গোপন।
রাণীর মহলে যান আনন্দিত মন॥
প্রকাশিতে দাসীগণে নিবারণ করি।
সন্ধিস্থানে দাণ্ডাইয়া দেখে উঁকি মারি॥
বীণা বাজাইয়া রাণী গায় প্রভু-আগে।
অশ্রু-পুলক-তনু প্রেমে ডগমগে॥
দেখিয়া পুলক রাজা সন্নিকটে গেলা।
সেবার শৃঙ্খলা দেখি চমকিত হৈলা॥
অন্য অন্য রাণীগণ সম্ভ্রমে উঠিল।
নই-রাণী প্রেমে মগ্ন স্ফূর্ত্তি না হইল॥
দাসীগণে আস্তেব্যস্তে চেতাইতে চাহে।
রাজা হাত তুলি পুন মানা করে তাহে॥

পাঠান্তর—(ক) কিছু—কিন্তু।
(খ) দিবানিশি—নিশিদিন।
১। প্রবন্ধ—অভিসন্ধি, মতলব।

দণ্ডেক বিলম্বে রাণীর বাহ্যস্ফূর্ত্তি হৈল।
রাজা দেখি চমকিয়া সম্ভ্রমে উঠিল॥
গদগদভাবে (ক) রাজা বহু প্রশংসিলা।
শ্লাঘ্যতম মানি পুন নিজ স্থানে গেলা॥
নই-রাণী-সঙ্গে লক্ষ রাণী ভক্ত হৈলা।
কৃষ্ণপ্রেম-রঙ্গে পুরে হাট বসাইলা॥
কোটি কোটি জন্মের পুণ্যপুঞ্জ মূল্য দিয়া।
যতনে রতন কেনো সেই হাটে গিয়া॥
সে মূল্যে যদি না মিলে মূল্য আছে আর।
সাধুসঙ্গে লোভমাত্র উপায় তাহার॥

তথাহি শ্লোকঃ মহাজনস্য—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ,
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং,
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

অনুবাদ—যদি কোথাও শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসে সুবাসিত বুদ্ধি পাওয়া যায়, কিনিয়া রাখ। তাহার প্রতি লালসাই তাহার একমাত্র মূল্য, সেইরূপ বুদ্ধি কোটি জন্মের পুণ্যফলেও লাভ হয় না।

সেই মহারাজা আর রাণীর চরণ।
লালদাসের কবে হবে মস্তকে ভূষণ॥

চরিত্র শ্রীবিদুরজীর

[টীকা হিন্দী]

হাঁহি বিদুরনারী অঙ্গনি প্রক্ষাল করি
আয় গণ দ্বার কৃষ্ণ বোলিকৈ সুনায়ো হৈ।
সুনতাহি সুরসুধি ডারি লৈ নিডরী মানো
রাখ্যো মদ ভরি দৌরি আনিকৈ চিতায়ো হৈ॥
ডারি দিয়ো পীত পট কটি লপটাই লিয়ো
হিয়ো সকুচায়ো বেস বেগহী বনায়ো হৈ।
বৈঠি ঢিগ আই কেরা ছীলি ছিলকা খবাই
আয়ো পতি খীজ্যো দুঃখ-কোটি গুণো পায়ো হৈ॥
ইত্যাদি।

পাঠান্তর—(ক) ভাবে—ভাষে।

অস্যার্থঃ।

বিদুরের নারী স্নান করে বস্ত্র রাখি।
হেনকালে আইলা কৃষ্ণ বাহির-খিড়কি॥
ডাকেন মধুরস্বরে বিদুর বলিয়া।
জানিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারে দাণ্ডাইয়া॥
স্বরমাত্র শুনি প্রেমে উন্মত্ত হইলা।
বাহ্য ভুলি (ক) ঐমনি বিবস্ত্রে চলি গেলা॥
ভাব বুঝি কৃষ্ণচন্দ্র নিজ পীতাম্বর।
উত্তরীয় বস্ত্র ডারি দিলা অঙ্গোপর॥
বস্ত্র অঙ্গে জড়াইতে উঠিতে পড়িতে।
কৃষ্ণকর ধরি লয়্যা আইলা গৃহেতে॥
আনন্দে বিহ্বল কি করিবে নাহি আইসে[১]।
পাদ ধোয়াইতে মাল্য পরাইতে বৈসে॥
বস্ত্র অলঙ্কার খুঁজি খেমি ঝাঁপি পাড়ে।
পাড়িতে না সহে ব্যাজ[২] দুড় দুড় ডারে[৩]॥
কিছুই নাহিক ঘরে নহিল পূরণ।
খাদ্যসামগ্রীমাত্র আছে মর্ত্তমান॥
সুদারিদ্র্য-দশা মোর বিধাতা করিল।
ইহা চিন্তি খেদে অতি বিকল হইল॥
সুবাসিত জল (খ) আর মর্ত্তমান রম্ভা।
তাহি খাওয়াইতে মনে হৈল অতি আম্বা[৪]॥
চান্দমুখ হেরি হেরি বিহ্বল হিয়ায়।
নিকটে বসিয়া স্নেহে কদলী খাওয়ায়॥
ছিলিকা[৫] ফেলিয়া রম্ভা শ্রীহস্তেতে দেয়।
কখন বা শস্য ফেলি ছিলিকা খাওয়ায়॥
চন্দ্রমুখ ভক্তাধীন অমৃতের অমৃত।
ছোবা কলা দুই খান সুধাপরিমিত॥
হেনকালে শ্রীমদ্ বিদুর মহাশয়।
শুনিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরের সভায়॥

পাঠান্তর—(ক) ভুলি—ভূমি।
(খ) জল—বারি।
১। নাহি আইসে—মনে আসে না।
২। ব্যাজ—বিলম্ব।
৩। ডারে—ফেলে।
৪। আম্বা—আকাঙ্ক্ষা।
৫। ছিলিকা—খোসা।

আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া চলিল নিজ গৃহে।
যাইয়া দেখয়ে পূর্ণচন্দ্রে সুধা বহে॥
শ্রীচন্দ্রবদন তাহে সুধা মৃদুহাসি।
হেরিয়া নাচয়ে সাধু প্রেমসিন্ধু ভাসি॥
আজি (ক) মোর ধন্য জন্ম ধন্য মোর গৃহ।
সফল হইল মোর এ মানব দেহ॥
ইহা বলি মুখচন্দ্র হেরে বার বার।
দেখয়ে কলার ছোবা শ্রীহস্ত উপর॥
নারীরে ভর্ৎসয়ে হারে দুর্ভগা পামরী।
শ্রীহস্তে তুলিয়া দেহ ছোবা[১], শস্য ডারি॥
তাহা শুনি ভাগ্যবতী উঠে চমকিয়া।
শ্রীহস্ত হইতে ছোবা লইল কাড়িয়া॥
বাহ্যস্ফূর্ত্তি হৈয়া বহু আর্ত্তনাদ কৈল।
হা হা মুঞি প্রিয়তমে ছোবা খাওয়াইল॥
সেই দুই নারী আর পুরুষ-চরণে।
লক্ষ লক্ষ পরণাম মোর কায়মনে॥

চরিত্র শ্রীসুদামাজীর

[টীকা হিন্দী]

বড়ো নিহকাম লের চুনহু ন ধামাঢিগ
আই নিজ ভাম প্রীতি হরিসোঁ জনাঈ হৈ।
শুনি শোচ পর্যো হিয়ো খরো অরবর্যো মন।
গাঢ়ো লোকে কর্যো বোল্যো হাঁজু সরসাঈ হৈ॥
জাবো একবার বহ বদন নিহারি আবো
জোপৈ কছু পাবো ল্যাবো মোকো সুখদাঈ হৈ।
কহী ভলী বাত সাত লোক মৈঁ কলঙ্ক হৈবৈহৈ
জানিয়ত য়াহী লিয়ে কীহুী মিত্রতাঈ হৈ॥
ইত্যাদি।

অস্যার্থঃ।

সুদামা বিপ্রের কথা অপূর্ব্ব কথন।
যাহার তণ্ডুলকণা খাইলা ভগবান্॥

পাঠান্তর—(ক) আজি—অদ্য।
১। ছোবা—খোসা।

অতিশয় নিষ্কাম যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
সের (ক) অন্ন নাহি ঘরে করিতে ভক্ষণ॥
ভিক্ষা-উপজীবী কষ্টে দিবস যাপন।
কভু তাহা মিলে কভু করে অনশন (খ)॥
একদিন তাঁহার ঘরণী শান্তমতি।
পুরাতনী বার্ত্তা কহে স্বামীর সংহতি॥
কৃষ্ণ যে তোমার সখা দ্বারকার নাথ।
দারিদ্র্যভঞ্জন প্রভু জগতের তাত॥
তাঁর স্থানে গেলে সর্ব্বদুঃখ হবে নাশ।
তাহা শুনি ব্রাহ্মণের হইল উল্লাস॥
সত্য বটে মোর সখা দ্বারকার পতি।
কি দ্রব্য লইয়া যাব তাঁহার সংহতি॥
তণ্ডুলের কণাগুলি আছিল গৃহেতে।
পুঁটলী বান্ধিয়া লৈল ভেটের নিমিত্তে॥
চলিলা ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ পথ নাহি দেখে।
খুদের পুঁটলী কাঁখে কৃষ্ণ বলি ডাকে॥
কথোদিনে দ্বারকায় উপনীত হয়্যে।
পুরীর সৌষ্ঠব দেখি মনে বিচারয়ে॥
মোর সখা কৃষ্ণের কি এতেক ঐশ্বর্য্য।
কিংবা কোন ধনী হয় কিংবা রাজবর্য্য[১]।
এত ভাবি চলে পুরীদ্বারে ধীরে ধীরে।
কৃষ্ণ অহে সখা অহে (গ) বলিয়া ফুকারে॥
ব্রাহ্মণের অবারিত দ্বার সভে জানে।
লয়্যা গেলা ব্রাহ্মণেরে অন্তঃপুর স্থানে॥
চারিপানে চায় (ঘ) দেখে মণিমুক্তাময়।
ধীরে ধীরে খুদ পুঁটলী বগলে লুকায়॥
কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষ্মীসনে রত্নসিংহাসনে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয়্যা পড়িলা ব্রাহ্মণে॥
কৃষ্ণ আসি (ঙ) আগুসরি উঠাইয়া লৈলা।
আইস আইস সখা বলি আলিঙ্গন কৈলা॥
প্রিয়বাক্যে (ক) তুষি বহু পাদ ধোয়াইয়া।
পুছেন মঙ্গলবার্ত্তা গৃহে বসাইয়া॥
পুরাতনী গুরুগৃহে পাঠের বারতা।
চর্চ্চা পড়িল কাষ্ঠ আনিবার কথা॥
কৃষ্ণ কহে সখা তোমার কক্ষে কিবা হয়।
সুদামা কহেন না না (খ) না না কিছু নয়॥
ইহা বলি লজ্জা পাই খুদের পুঁটলী।
ইথি উথি চাহে আর দাবে[১] কাঁখ-তলি॥
টানিয়া লইয়া কৃষ্ণ একমুষ্টি খাইলা।
লক্ষ্মীদেবী করপাতি একমুষ্টি লৈলা॥
পুন একমুষ্টি কৃষ্ণ লইয়া খাইতে।
ঝাঁপিয়া ধরিয়া হাত তুলি ধরে (গ) মাথে॥
মোর দিব্য যদি সখা পুনঃ আর খাও।
তোমার অযোগ্য ইহা তুমি যোগ্য নও (ঘ)॥
কথোক দিবস বিপ্র তথায় থাকিয়া।
বিদায় হইয়া মনে ভাবে পথে যায়্যা॥
সখা মোর অতিশয় সম্মান করিল।
কিন্তু অর্থ সম্বল মোরে কিছু নাহি দিল॥
পুন ভাবে না দিল যে, সেই বহু দিল।
অর্থে রজ-তম-বৃদ্ধি ইহা বিচারিল॥
অতএব নিজপদে মতির স্থাপন।
ধন নাহি দিল মোরে ইহার কারণ॥
পুন ভাবে ঘরে কিছু নাহিক সম্বল।
গৃহে যাই ব্রাহ্মণীরে বলিব কি বোল॥
ভাবিতে ভাবিতে নিজ গ্রামে উপনীত।
নিজ গৃহ নাহি দেখে হৈলা চমকিত॥
কোন্ ধনী ইঁহা আসি কৈল রত্নাগার।
মহা ঠাটঝাট দেখি দাসী অনুচর॥
ব্রাহ্মণী কোথায় মোর কি করি উপায়।
হেনকালে বিপ্র দূরে হৈতে সে দেখয়॥

পাঠান্তর—(ক) সের—কভু।
(খ) কভু তাহা মিলে কভু করে অনশন—কভু বা আহার মিলে কভু অনশন।
(গ) কৃষ্ণ অহে সখা অহে—অহে কৃষ্ণ অহে সখা।
(ঘ) চারিপানে চায়—চারিপার্শ্বে চাহি।
(ঙ) কৃষ্ণ আসি—কৃষ্ণচন্দ্র।
১। রাজবর্য্য—শ্রেষ্ঠরাজা, নৃপশ্রেষ্ঠ।

পাঠান্তর—(ক) প্রিয়বাক্যে—প্রীতিবাক্যে।
(খ) না না—সখা।
(গ) ধরিয়া হাত তুলি ধরে—লইয়া হাত তুলি দিল।
(ঘ) নও—লও।
১। দাবে—চাপিয়া রাখে।

এক নারী শত শত দাসীগণ সনে।
নানা মণিমুক্তার ভূষণ (ক) আভরণে॥
নিকটে আসিয়া ডাকে সমাদর করি।
বিপ্র কহে কে তুমি ডাকহ কার নারী॥
হাসিয়া কহয়ে আমি তোমার ঘরণী।
লক্ষ্মীনারায়ণ কৃপা কৈলা ভক্ত জানি॥
তাঁহার আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা আসি কৈল।
এ ঘর দুয়ার ধনধান্য তিনি (খ) দিল॥
তখন বুঝিলা বিপ্র সখার এ কর্ম্ম।
আসিতে কিছু না দিলেন এই তার মর্ম্ম॥
নবযুবারূপে দোঁহে ভুঞ্জে নানাভোগ।
যাঁর শ্রীচরণরজে খণ্ডে ভবরোগ॥
জন্ম মৃত্যু জরা রোগ শোক গেল দূরে।
ডুবিয়া (গ) শ্রীকৃষ্ণপ্রেম অমৃতসাগরে॥

চরিত্র শ্রীচন্দ্রহাস রাজার

[টীকা হিন্দী]

হুতো নৃপ এক তাকো সুত চন্দ্রহাস ভয়ো
 পরী যোঁ বিপত্তি ধাই লাঈ ঔর পুর হৈ।
রাজাকো দিবান তাকে রহী ঘর আনি বাল
 আপনে সমানসঙ্গ খেলৈ রস দূর হৈ॥
ভয়ো ব্রহ্মভোজ কোউ ঐসোঈ সংযোগ বন্যো
 আয়ে বে কুমার জহাঁ বিপ্রনকো সুর হৈ।
বোলি উঠে সবৈ তেরী সুতাকো জুপতি য়হৈ
 হুবো চাহৈ জানি সুনি গয়ো লাজ ঘুর হৈ॥
ইত্যাদি।

অস্যার্থঃ।

এক রাজপুত্র তার চন্দ্রহাস নাম।
বিপদকালেতে লয়্যা রাখে অন্য ধাম॥
অন্য সেই দেশ-অধিরাজার (ক) দেওয়ান।
শিশু লয়্যা ভেট দিল নৃপতির স্থান॥
পালন করিয়া রাজা রাখে নিজ ঘর।
দাসীপুত্রন্যায় থাকে নাহি সমাদর॥
একদিন রাজপুরে ব্রাহ্মণ-ভোজন।
সেইখানে গেল শিশু সঙ্গে শিশুগণ॥
সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দেখি শিশুবর।
রাজার জামাতা হবে কহে পরস্পর॥
রাজা তাহা শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মনে।
মোর কন্যাযোগ্য এই দাসীর নন্দনে॥
এত ভাবি বিচারিল বালকে মারিতে।
নীচগণে (খ) আজ্ঞা দিল মশানে লইতে॥
স্বাভাবিক বালকের কৃষ্ণপদে রতি।
অচ্ছেদ্য অভেদ্য হয় বেদের সম্মতি॥
শিশুরে লইয়া গেল কাটিতে মশানে।
কৃষ্ণে যার মন (গ) তার কি করিবে আনে॥
চন্দ্রহাস কহে মোরে দৈবেতে মারিবে (ঘ)।
কিন্তু এক কথা মোর নেহোরা[১] রাখিবে (ঙ)॥
আঁখি মুদি মুহূর্ত্তেক বসিয়া থাকিব।
শির হেলাইব যবে খড়্গ হানিব॥
ইহা বলি কৃষ্ণপদে মন নিয়োজিল।
শির হেলাইয়া খড়্গ হানিতে কহিল॥
কৃষ্ণের করুণা মহাবলবান্ হয়।
আর্দ্র হইল নীচগণের হৃদয়॥
কেহ কেহ ছাড়ি দেহ যাকু অন্যন্তরে[২]।
মারিনু বলিয়া চল (চ) কহিব রাজারে॥
কেহ বলে কিছু চিহ্ন লহ দেখাইতে।
অঙ্গুলি কাটিয়া লহ প্রতীত হইতে॥

পাঠান্তর—(ক) মণিমুক্তার ভূষণ—মণিমুক্তা ভূষিত।
(খ) তিনি—বহু।
(গ) ডুবিয়া—ডুবিল।

পাঠান্তর—(ক) দেশ-অধিরাজার—দেশাধিপ রাজার।
(খ) নীচগণে—জল্লাদেরে।
(গ) মন—মতি।
(ঘ) দৈবেতে মারিবে—হইবে মরিতে।
(ঙ) রাখিবে—রাখিতে।
(চ) চল—ছলে।
১। নেহোরা—প্রার্থনা।
২। যাকু অন্যন্তরে—অন্যস্থানে চলিয়া যাউক।

বালকের এক হস্তে ছয় অঙ্গুলি ছিল।
বৃদ্ধ দুই অঙ্গুলির এক কাটি নিল॥
ঈশ্বরের কৃপা দেখ হয় গূঢ়তর।
রাজাযোগ্য নাহি হয় ছয় অঙ্গুলি নর॥
এই হেতু তার এক অঙ্গুলি কাটিল (ক)।
পরে নৃপাসনযোগ্য ছলে করাইল॥
নীচগণ লইয়া অঙ্গুলি দেখাইল।
চন্দ্রহাস যাইয়া অরণ্যে প্রবেশিল॥
ঐ রাজার প্রতিযোগী[১] কোন রাজা অন্য।
মৃগয়া করিতে গিয়া ঘোরিল অরণ্য॥
তার মধ্যে দেখে এক অপূর্ব্ব বালক।
আনিয়া রাখিল ঘরে বৎসর কথোক॥
পুন সেই রাজা স্থানে ঐ যে বালক।
আর কত দাস দাসী ধনাদি যতেক॥
অর্পিসেতে ভেট দিল বিনয়পূর্ব্বক (খ)।
চমকিয়া নৃপতি চাহিয়া রৈল মুখ॥
এনা বালকেরে পূর্ব্বে কাটে মোর দূত।
পুন কোথা হইতে আইল এ কি অদভুত॥
নৃপ বুদ্ধিমান্ মনে বিচার করিলা।
দূতগণ ছাড়ি মোরে প্রবঞ্চনা কৈলা॥
বালক কৃষ্ণভক্ত আর বিবাহ নির্ব্বন্ধ।
তথাচ না বুঝে রাজা মূঢ়মতি মন্দ॥
পুন মারিবারে চেষ্টা করয়ে নৃপতি।
কিছু দূরে উপবন পুত্র আছে তথি॥
ভ্রাতা-অনুগত রাজার কন্যা নাম 'বিখে'।
ভ্রাতার নিকটে থাকে স্নেহেতে অধিকে॥
বিষ খাওয়াইয়া চন্দ্রহাসে মারিবারে।
উপায় চিন্তিলা উপবনে পুত্রদ্বারে॥
পত্রী লেখে পুত্রে ঞিহোঁ যে দণ্ডে যাইবে।
সেইক্ষণে বালকেরে বিষ সমর্পিবে॥
পত্রী চন্দ্রহাসে দিয়া কহয়ে নৃপতি।
উপবনে পুত্র-স্থানে যাহ শীঘ্রগতি॥

পাঠান্তর—(ক) কাটিল—কাটা গেল।
(খ) বিনয়পূর্ব্বক—প্রণয়পূর্ব্বক।
১। প্রতিযোগী—প্রতিদ্বন্দ্বী, শত্রু।

পত্রী লয়্যা শীঘ্র দিলা রাজপুত্র-স্থানে।
পত্রী পাঢ়ি বালক দেখিয়া হর্ষ মনে॥
সুন্দর কুমার দেখি বিচারয়ে মনে।
রাজা পাঠাইলা 'বিখে'-কন্যার কারণে॥
ইহা বুঝি রাজপুত্র সেইক্ষণ মাত্রে।
ভগিনীর বিবাহ দিলেক সেই পাত্রে॥
হরিভক্ত-মহিমার মর্ম্ম কে জানয়।
বিখ দিতে বিখে মিলে (ক) এ বড় বিস্ময়॥
বর কন্যা ঘরে আইলা মঙ্গলাচরণে।
বৃত্তান্ত শুনিয়া নৃপ নিন্দয়ে আপনে॥
ছি ছি ধিক্ ধিক্ মোর এ ছার জীবনে।
এত অপমান মোর না সহে পরাণে॥
মোর (খ) কন্যা হেন বরে বিধি ঘটাইল।
গর্ভবাসে মোর কেনে মৃত্যু না হইল॥
শিশু কৃষ্ণভক্ত আর বিবাহ নির্ব্বন্ধ।
তথাচ না বুঝে নৃপ মূঢ়মতি মন্দ॥
পুন মারিবার তভু উপায় চিন্তয়ে।
কন্যা রাঁড়[১] হএ হকু স্বীকার হয়ে (গ)॥
বিবাহের পরে দেবীপূজা কুলধর্ম্ম।
করিবারে গেলা বর লয়্যা শুভকর্ম্ম॥
রাণীগণ রাজপুত্রগণ সভে গেলা।
চন্দ্রহাসে মারিবারে দূত পাঠাইলা॥
ভালমন্দ চন্দ্রহাস কিছুই না জানে।
মনবুদ্ধি সদা মাত্র কৃষ্ণের চরণে॥
দেবীরে প্রণাম যে করিতে সভে কহে।
সেইতর্কে[২] দূতগণ খড়্গ হস্তে রহে॥
কৃষ্ণভক্ত হিংসা দেবী সহিতে নারয়ে।
প্রতিমা ফাটিয়া উগ্র মূর্ত্তি বাহিরায়ে॥

পাঠান্তর—(ক) বিখ দিতে বিখে মিলে—বিষ দিতে বিখে দিলে।
(খ) মোর—মম।
(গ) কন্যা রাঁড় হয় হোক স্বীকার করয়ে।
১। রাঁড়—বিধবা (<রণ্ডা)।
২। সেইতর্কে—সেই তাকে, সেই সুযোগের অপেক্ষায়।

খড়্গাঘাতে রাজপুত্র আদি নীচগণে।
মস্তক কাটিয়া করে কন্দুক ক্রীড়নে॥
রাজা শোকাকুলি হয়্যা যায় দেবী-আগে।
আত্মঘাত করি নিজ পরাণ তেয়াগে॥
কৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা অব্যর্থ সন্ধান।
চন্দ্রহাস বৈসে সেই রাজসিংহাসন॥
অতেব বিঘ্নের বিঘ্ন হরির ভকত।
তাঁর পদে যার মতি সেই অইমত॥
চন্দ্রহাস রাজসিংহাসনেতে বসিয়া।
শাসন করিলা রাজ্য কৃষ্ণভক্তি দিয়া॥
এ ছার জনমে মোর প্রার্থনীয় এই।
সেই রাজ্যে প্রজা হঞা যেন জন্ম লই॥

ইতি শ্রীভক্তমালে দ্বাদশ-মহাভাগবতাদি-চরিত্র-বর্ণনং নাম চতুর্থমালা ॥৪॥

পঞ্চম মালা

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীকুন্তীজীর

[টীকা হিন্দী]

কুন্তী করতুতি কৈসে করৈ কৌন ভূত প্রাণী
মাগত বিপত্তি জাসো ভাজে' সব জন হৈ।
দেখ্যো মুখ চাহো লাল দেখে বিন হিয়ে সাল
হুজিয়ে কৃপালু নহি' দীজৈ বাস বন হৈ॥
দেখি বিকুলাঈ প্রভু আঁখি ভরি আঈ ফিরি
ঘরহিকো লাঈ কৃষ্ণ প্রাণ তন ধন হৈ।
শ্রবণ বিয়োগ সুনি তনক ন রহ্যো গয়ো
ভয়ো বপু ন্যারো অহো এহী সাঁচোপন হৈ॥

অস্যার্থঃ।

ভাগ্যবতী কুন্তীজীর মহিমা অপার।
কিঞ্চিত শকতি কারো নহে কহিবার॥
অলঙ্ঘ্য অগম্য গুহ্যতমাধিক গুহ্য।
অসম্ভব অলৌকিক মহিমাপ্রাচুর্য্য॥
কৃষ্ণকৃপা-অমৃতের রতনভাজন।
যাঁর কৃপা শুভদৃষ্টি মাগে জগজন॥
তাঁহার চরিত্র-কথা বর্ণন না হয়।
যেন সিন্ধুজল সেঁচি শেষ নাহি পায়॥
যাঁর সর্ব্বৈশ্বর্য্যপদে মন না ভাইল (ক)।
বিপদ-ঐশ্বর্য্য পুন প্রার্থনা করিল॥
কৃষ্ণপ্রেম-মকরন্দ আস্বাদের মর্ম্ম।
যারে বেদ্য হয় সেই ভুলে দেহধর্ম্ম॥
অতএব কুন্তীজীর মহিমা অপার।
পার না পাইয়া করি সংক্ষেপ-বিচার॥

পাঠান্তর—(ক) ভাইল—যাইল।

তাঁর কণাভিক্ষা-আশে হৃদয় পসারি[১]।
দরিদ্র আমরা আছি নিরীক্ষণ করি॥
হে দেবি কৃপায় কর দারিদ্র্যভঞ্জন।
শূন্য মোর চিত্তগৃহ দেহ অই ধন (ক)॥

চরিত্র শ্রীদ্রৌপদীজীর

[টীকা হিন্দী]

দ্রৌপদী-সতী কী বাত কহৈ ঐসা কৌন পটু
খেঁচতহী' পট পট কোটিগুনে ভএ হৈ'।
দ্বারিকাকে নাথ কহি বোলী জব সাথ হুতে
দ্বারিকাসোঁ ফিরি আএ ভক্ত বানি নএ হৈ'॥
ইত্যাদি।

অস্যার্থঃ।

দ্রৌপদী সতীর অসাধারণ মহিমা।
গুণের সাগর যার নাহি হয় সীমা॥
যাঁর গুণ গাইতে ভারত-ইতিহাস।
উল্লাসে উপরি ঘন ঝুপরি বহে শ্বাস॥
সভামধ্যে লইয়া দুর্ম্মতি দুঃশাসন।
বিবস্ত্রা করিতে করে বস্ত্র আকর্ষণ॥
'কৃষ্ণ হে' বলিয়া সতী ডাকে উচ্চস্বরে।
উৎকণ্ঠা হইয়া আসি বস্ত্ররূপ ধরে॥
বিপক্ষ যতেক বস্ত্র টানিয়া খসায়।
ততই আইসে তার শেষ নাহি হয়॥
নানাচিত্রবিচিত্রিত অমূল্য বসন।
রাশি রাশি কৈল কত না যায় গণন॥
সভাসদ দেখি সভে চমৎকার হৈল।
বিপক্ষ ভাবিয়া কিছু পার না পাইল॥
মহারাজগণ সভে বুঝিলেন মর্ম্ম।
অনুভাবে (খ) পাণ্ডবনাথের এই কর্ম্ম॥

পাঠান্তর—(ক) অই ধন—প্রেমধন।
(খ) অনুভাবে—আমা সভা।
১। পসারি—প্রসারিত করিয়া।

একদিন বনবাসে পাণ্ডবের স্থানে।
বিপক্ষপ্রার্থিতে সে দুর্ব্বাসা শিষ্যসনে॥
ভোজনের পরে দিবা-অবসান-সমে১।
দশ হাজার শিষ্য সনে আইলা আশ্রমে॥
ভক্ষ্যসামগ্রী কিছু নাহিক কুটীরে।
উদ্বিগ্ন হইলা অতি কম্পিত অন্তরে॥
সূর্যদত্ত পাকস্থালী পাক কৈলে তায়।
লক্ষ লোক খাওয়াইলে নাহিক ফুরায়॥
কিন্তু দ্রৌপদী যেই পর্য্যন্ত নাহি খায়।
খাইলে স্থালীর অন্ন তৎক্ষণে (ক) ফুরায়॥
একেতে অতিথি তাহে দুর্ব্বাসা তেজস্বী।
করিবে এখনি কটাক্ষেতে ভস্মরাশি॥
সন্ধ্যা করিবারে মুনি গেলা নদীতীর।
দ্রৌপদীসহিত সভে ভাবিয়া অস্থির॥
দ্রুপদনন্দিনী সতী ভাবিলা যুকতি।
পাণ্ডবের নাথ কৃষ্ণ বিনে নাহি গতি॥
হে কৃষ্ণ হে সখে হে হে (খ) শ্রীমধুসূদন।
এইবার রক্ষা কর লইনু শরণ॥
তোমার পাণ্ডবকুল আজি যে হইতে।
বিনাশ হইল রাখ এই সঙ্কটেতে॥
ইহা বলি উচ্চনাদে (গ) কান্দিতে লাগিলা।
হেনকালে শীঘ্র কৃষ্ণ উপনীত হৈলা॥
কৃষ্ণ কহে কেন সখি কান্দ কি কারণে।
চমকিয়া উঠি হর্ষে কহে বিবরণে॥
কৃষ্ণ কহে যে হউ সে পশ্চাতে করিহ।
সম্প্রতি আমার ক্ষুধা খাইতে কিছু দেহ॥
বিপদ ভুলিয়া স্নেহে চকিত হইল (ঘ)।
কৃষ্ণমুখ শুষ্ক দেখি অন্তর বিকল॥
হা হা ঘরে কিছু নাহি কি দিব খাইতে।
কৃষ্ণ কহে বহু দ্রব্য আছে পাকপাত্রে॥
দ্রৌপদী কহেন পাত্র রেখেছি ধুইয়া।
কৃষ্ণ কহে আছে দেখ আশপাশ চায়্যা॥

পাঠান্তর—(ক) তৎক্ষণে—তৎক্ষণাৎ।
(খ) হে হে—ওহে। (গ) উচ্চনাদে—উচ্চস্বরে।
(ঘ) চকিত হইল—চমকিত হৈল।
১। সমে—সময়ে।

দেখয়ে আছয়ে মাত্র এক শাককণা।
কৃষ্ণ জোরাবরি দিলা বদনে আপনা॥
বিশ্বম্ভর সেই কণায় তৃপ্ত যদি হৈলা।
জগতের ক্ষুধা তৃষ্ণা সব দূরে গেলা॥
হোথা ঋষি দশহাজার শিষ্যের সহিতে।
উদরস্পন্দন কেহ না পারে চলিতে॥
নানা মিষ্ট সামগ্রীর উদ্গার উঠয়।
হেউ হেউ করি পেটে স্বহস্ত বুলায়॥
পরস্পর সভে সভার মুখপানে চাহে।
উদর ফাটিয়া উঠে সভে সভায় কহে॥
রাজা-স্থানে না কহিয়া (ক) কারে না কহিয়া।
ঐমনি শিষ্যের সহ গেলা পলাইয়া॥
কৃষ্ণ যারে রক্ষা করে ত্রৈলোক্যের মাঝে।
কোথা পরাভব তার কেবা তারে ব্যাজে১॥
অতএব কৃষ্ণকৃপা পূর্ণ দ্রৌপদীতে।
লজ্জা নিবারিলা পুন রাখে ঋষি হৈতে॥
অনেক প্রকারে কৃপা কৈলা কৃষ্ণচন্দ্র (খ)।
অতএব সৌভাগ্যের নাহি যার অন্ত॥
তাঁহার চরণরজঃ ধরি মস্তকেতে।
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তিনিধি লভ্য যাহা হৈতে॥

চরিত্র শ্রীশ্রুতদেবের

যোগেশ্বর-আদি হরিরসে-সুপ্রবীণ।
তার মধ্যে শ্রুতদেবের কহি প্রেম চিন॥
হরি-গৃহে আইল দেখি প্রেমে ভরি গেলা।
বস্ত্র উড়াইয়া ফিরি (গ) নাচিতে লাগিলা॥
উর্দ্ধবাহু হয়্যা ঘুরি ফিরিয়া (ঘ) বেড়ায়।
'ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং' বলি বলে উচ্চরায়॥
উন্মত্ত পাগল যেন ক্ষণে উঠে পড়ে।
কম্প অশ্রু কণ্ঠরোধ বাক্য গড়েবড়ে॥

পাঠান্তর—(ক) কহিয়া—যাইয়া।
(খ) বহুরূপে কৃপা যায় কৈল কৃষ্ণচন্দ্র।
(গ) ফিরি—ঘুরি।
(ঘ) ফিরিয়া—নাচিয়া।
১। ব্যাজে—প্রতারণা করিতে বা অপদস্থ করিতে পারে।

যত সাধুসেবা-সঙ্গ-বিনয়-প্রসঙ্গ।
করিলা শুতদেব সব (ক) তাহারি এ রঙ্গ॥
অতএব সাধুসেবা সাধুসঙ্গে মজ।
দেখিয়া শুনিয়া ভাই বৈষ্ণবেরে ভজ॥
বৈষ্ণবের পাদরজ শিরের ভূষণ।
করিয়া এড়াবে ভাই সংসার-বন্ধন॥
কৃষ্ণপ্রেম-সুধা-সুখসার-মহার্ণবে।
অবগাহিবারে কেহ বুদ্ধিমান্ হবে॥
একান্ত নিশ্চয় তবে এই সুসিদ্ধান্ত।
বৈষ্ণবচরণে লও শরণ একান্ত॥
কুতর্ক না কর ইথে তর্কে বহুদূর।
অতিদূরে তেজ সঙ্গ তার্কিক অসুর॥
সাধুশাস্ত্রমতে সৎ-সম্প্রদানুক্রমে।
যজ যদি আশা কর রত্ন (খ) কৃষ্ণপ্রেমে॥
প্রবেশ করিয়া মতি অন্তরে বিচার।
কৃষ্ণ-প্রেমভক্ত-রস আস্বাদন কর॥

[মূল হিন্দী]

অংঘ্রী-অম্বুজ-পাংসুকো জনম জনম হেঁা যাচিহেঁা
প্রাচীনবর্হি সত্যব্রত রহগণ সগর ভগীরথ।
বালমীক মিথিলেশ গএ জে জে গোবিন্দ-পথ॥
রুক্মাঙ্গদ হরিচন্দ ভরত দধীচি উদারা।
সুরথ সুধন্বা সিবৰি সুমতি অতি বলিকী দারা॥
নীল মোরধ্বজ অলর্ক কীরতি রাচি হেঁা।
অংঘ্রী-অম্বুজ-পাংসুকো জনম জনম হেঁা যাচি
হেঁা॥

অস্যার্থঃ।

সত্যব্রত রহূগণ সগর ভগীরথ।
প্রাচীনবর্হি রুক্মাঙ্গদ বাল্মীকি ভরত॥
মিথিলেশ হরিশ্চন্দ্র দধীচি উদার।
সুরথ সুধন্বা শিবি ভবনিধিপার॥
তাম্রধ্বজ অলর্ক আর নীল মৌরধ্বজ।
বসুমতি (গ) অতি বলিদারা পাদরজ॥

পাঠান্তর—(ক) করিলা শ্রুতদেব সব—করিলা যে শ্রুতদেব।
(খ) রত্ন—বর্ম্ম।
(গ) বসুমতি—ব সুমতি (ব=উঅ=এবং)।

জনমে জনমে করি মস্তকে ভূষণ।
ইহা বিনু নাহি মাঙ্গো আর কিছু ধন॥

[টীকা হিন্দী]

জনমে জনমকো ন মেরে কছু শোচ অহো।
সন্তপদকঞ্জরেণু সীসপর ধারিয়ে॥
প্রাচীনবর্হিকৈ আদি কথা পরসিদ্ধ জগ।
উভৈ বালমীক বাত চিততে ন টারিয়ে॥
ভএ ভীল সঙ্গে ভীল ঋষিসঙ্গ ঋষি ভএ।
রামদর্শন পায় লীলা বিসতারিয়ে॥
জিহৈ জগ গাই ক্যোহু সকৈ ন অঘাই চাই।
ভাঙ্গ ভরি হিয়ো ভরি নৈন ভরি ডারিয়ে॥

চরিত্র শ্রীপ্রাচীনবর্হি রাজার

অস্যার্থঃ।

প্রাচীনবর্হি আদি করি প্রসিদ্ধ যে হয়।
যেন রবি শশী পরিচয় না বুয়ায়॥
তথাপিহ তার মধ্যে কিঞ্চিত কহিয়ে।
বিবরণ মাত্র নিজ পবিত্র লাগিয়ে॥
আর কিছু শোক[১] মোর নাহিক অন্তরে।
বৈষ্ণবের পাদরেণু মাত্র ধরি শিরে॥
প্রাচীনবরহি আর দুই যে বাল্মীক।
এক ভিলকুলে জন্মি হইলা অধিক॥
আরে বিপ্রকুলে জন্মি ভিলসঙ্গ হৈল।
পশ্চাৎ সৎসঙ্গ বশে (ক) ত্রৈলোক্য তারিল॥
তাঁহা-দোঁহার মহিমা যে পশ্চাৎ কহিব।
প্রাচীনবর্হের কথা কিঞ্চিৎ বর্ণিব॥
প্রাচীনবর্হি রাজা পূর্ব্বাবস্থায় কর্ম্মী হয়।
নারদ দেবর্ষি যাঁর ঘুচাইলা সংশয়॥
প্রাদেশ-প্রমাণ কুশা পাতি যজ্ঞ করে।
দ্বিতীয় যজ্ঞের দীক্ষা সেই কুশা-অগ্রে॥
পশ্চিম-সাগর হৈতে পূর্ব্ব-জলনিধি।
সঙ্কল্প করিলা যজ্ঞ নাহিক অবধি॥

পাঠান্তর—(ক) সৎসঙ্গ বশে—সৎসঙ্গ হৈতে।
১। শোক—কিন্তু মূল হিন্দীর শোচ শব্দের অর্থ 'কল্পনা' করিলে ভাল হইত।

দয়ালু নারদ ঋষি থাকিয়া আকাশে।
দেখিয়া ভাবেন মূর্খ না জানে বিশেষে॥
কর্ম্মরজোরজে ইহার চক্ষু অন্ধ হয়ে।
অন্ধজনে (ক) সূর্য্যের কিরণ না দেখয়ে॥
অতেব (খ) হঠাৎ ভক্তিযোগ না কহিব।
প্রথমেতে এক ইতিহাসেতে বুঝাব॥
ইহা চিন্তি দেবঋষি তথাতে আইলা।
বুঝি বহুকালে নৃপের ভাগ্য প্রকাশিলা॥
বহু সমাদর করি আসন অর্পিলা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দণ্ডবত স্তুতি কৈলা॥
ঋষি কহে কিছু বার্ত্তা চাহি কহিবারে।
মনোযোগে কর যদি সুস্থির অন্তরে॥
গোসাঞি দয়ার নিধি অপূর্ব্ব কাহিনী।
কহেন শুনয়ে রাজা করি যোড়পাণি॥
পুরঞ্জন পুরঞ্জনী নামেতে মিথুন।
অপূর্ব্ব পুরীতে বৈসে রতনে জটন॥
পুরী নবদ্বার নবদিগেতে বিহরে।
রূপ-রস-শব্দ আদি ভোগ দ্বারে দ্বারে॥
পূর্ব্বাপর ভূত ভবিষ্যৎ দিবানিশি।
কিছু নাহি জানে মাত্র মগ্ন সুখরাশি॥
পঞ্চশীরষা সর্প (গ) পুরী রক্ষা করে।
দম্ভ-অহঙ্কার বলে (ঘ) আপনা পাসরে॥
এইরূপে কিছুকাল (ঙ) করয়ে যাপন।
কালকন্যা রাক্ষসী জরা করিয়া আখ্যান॥
ত্রৈলোক্য বিজয়ী সেই আসিয়া পশিল।
পুরী ভাঙ্গিবারে তথা উদ্যম (চ) করিল॥
পঞ্চশীরষা সর্প রক্ষক সহিতে।
নিগ্রহ (ছ) করিয়া তারে হানে পদাঘাতে॥
পরাভব করি তার কপাট ভাঙ্গিয়া।
ক্রমে ক্রমে গৃহ ভাঙ্গি পুরী প্রবেশিয়া॥
ভাঙ্গিয়া চূর্ণিত করি দেয় খেদাড়িয়া।
পুন বৈসে অন্য পুরী নির্ম্মাণ করিয়া॥
পুন যাই জরা পুন পুরী ভাঙ্গি ডারে।
খেদাড়িয়া দেয় আর পদাঘাত করে॥
এইমত কোটি কোটি পুরীতে বৈসয়ে।
সকলি ভাঙ্গয়ে আর নিগ্রহ করয়ে॥
দুঃখের অবধি নাহি চিন্তয়ে উপায়।
কাহার শরণ লব কেবা নিস্তারয়॥
রক্ষাকর্ত্তা-জ্ঞানে সর্ব্বদেব-পিতৃযজ্ঞ (ক)।
সভার শরণ ক্রমে ক্রমে লৈল অজ্ঞ॥
কেহ রক্ষা করিবারে না হইল শক্ত।
ক্লেশের অবধি নাই ভাবে দিবানক্ত[১]॥
পুরঞ্জনী কহে প্রিয় কি করি উপায়।
আমি ত সহিতে আর নারি দুঃখচয়॥
ত্রৈলোক্যে সভার ক্রমে লইনু শরণ।
কেহ ত নহিল দুঃখে রক্ষার কারণ॥
এক কথা মনে মোর পড়িল হঠাৎ।
তব পুরাতন সখা সভাকার নাথ॥
আছয়ে, ভাবিয়া দেখ পড়ে কি না মনে।
পুরঞ্জন কহে হয় হইল স্মরণে॥
তাঁহার শরণ যবে (খ) যাইয়া লইল।
আর কোন ভয় নাহি নির্ব্বিঘ্ন (গ) হইল॥
রাজা কহে গোসাঞি মুই বুঝিতে নারিনু।
অল্পবুদ্ধি মোর, নাহি বুঝি স্পষ্ট বিনু॥
পুন বিবরিয়া মুনি কহে স্পষ্ট অর্থ।
যাহাতে বুঝয়ে রাজা অর্থের যাথার্থ্য॥
যে কহিনু পুরঞ্জন পুরঞ্জনী নাম।
জীব আর বুদ্ধি হয় মিথুন-অনুক্রম॥
পুরী নানাদেহ (ঘ) নব-দ্বার নব রন্ধ্র।
যাহার দ্বারায় সুখ ভুঞ্জে মাত্র ধন্ধ (ঙ)॥

পাঠান্তর—(ক) অন্ধজনে—অন্ধকারে।
(খ) অতেব—অতএব।
(গ) পঞ্চশীরষা সর্প—পঞ্চশির সর্প তাহে।
(ঘ) বলে—বশে।
(ঙ) এইরূপে কিছুকাল—কিছুকাল এইরূপ।
(চ) উদ্যম—উদ্যোগ।
(ছ) নিগ্রহ—বিগ্রহ (যুদ্ধ)।

পাঠান্তর—(ক) সর্ব্বদেব-পিতৃযজ্ঞ—সর্ব্বদেব-পিতৃযোগ্য।
(খ) যবে—তবে।
(গ) নির্ব্বিঘ্ন—নির্ব্বৃত্ত (সুখী)।
(ঘ) পুরী নানাদেহ—পুরীসম দেহ।
(ঙ) ধন্ধ—বন্ধ।

১। দিবানক্ত—দিনরাত।

পঞ্চশীরষা সর্প পঞ্চ প্রাণবাত।
যাহা বিনে দেহেন্দ্রিয় তৎক্ষণে নিপাত॥
কালকন্যা জরা যেই কহিনু রাক্ষসী।
কালক্রমে ক্ষয় করে জরা দেহে পশি॥
পঞ্চশীরষা সনে যুদ্ধ যে কহিনু।
জরা ভাঙ্গিবারে চাহে প্রাণ রাখে তনু॥
জরা-স্থানে পরাভবে রাখিতে নারিলা।
কপাট দশন ভাঙ্গি দেহে প্রবেশিলা॥
দেহরূপ পুরী সেই ক্রমে ক্রমে নাশে।
কাশশ্বাস-আদি জন্মে বিনাশয়ে শেষে॥
এইমত কোটি কোটি শরীর জন্ময়।
একবার হয় আরবার যায় ক্ষয়॥
কভু স্বর্গে কভু মর্ত্ত্যে কভু বা নরকে।
কভু দ্বীপান্তরে জন্মে কভু নাগলোকে॥
শৃগাল কুকুর কীট পতঙ্গ পাদপ।
নদ নদী গিরি প্রেত ভূত নিল ভূপ॥
নানাযোনি নানাবস্থা (ক) হয় অগণন।
রক্ষাহেতু করে নানাদেব-আরাধন॥
নানাযজ্ঞ নানাবিধি করি শ্লাঘ্য মানে।
কাহার শকতি নাহি সংসারের ত্রাণে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে সাধুকৃপা হয়।
পুরাতন সখা তবে মনেতে পড়য়॥
কর্ম্মের বাসনা যায় বুঝে ভক্তিমর্ম্ম।
সাধুসঙ্গে যজে তবে পরমার্থ ধর্ম্ম॥
পুরাতন সখা পরমাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র।
তাঁহার শরণ তবে লইয়া আনন্দ॥
সংসারমোচনহেতু মধ্যম (খ) কারণ।
উত্তম প্রেমভক্তি যে নির্হেতু (গ) সনাতন॥
মুক্তি যাতে তুচ্ছ ফল করিয়া মানয়।
যার দেহে শুদ্ধভক্তিদেবীর আলয়॥
এত শুনি প্রাচীনবর্হি মহারাজা।
বুঝিয়া আপন বিবরণ পায় লজ্জা॥

অপূর্ব্ব প্রহেলি শুনি চমৎকার হয়।
আপনা ধিক্কার করি ঋষিরে কহয়॥
আপনি কহিলে যেই সেই সত্য হয়ে।
ইহাত (ক) আচার্য্যগণ মোরে না জানায়ে॥
মুনি কহে বিপ্রগণ অর্থ-আকাঙ্ক্ষিত।
যেহ জানে সেহ নাহি কহয়ে উচিত॥
তৎক্ষণেতে যজ্ঞে রাজা হইয়া বিরতি।
কুশাঙ্গুরি খুলিয়া ডারিয়া দিল ক্ষিতি॥
গোসাঞির শ্রীচরণে পড়িয়া কান্দয়।
শরণ লইনু কহ আমার উপায়॥
মুনি কহে শ্রীকৃষ্ণচরণে সোঁপি মন।
এখনি চলহ বনে ছাড়ি রাজ্য ধন॥
রাজা কহে পুত্রে করি রাজ্যসমর্পণ।
মুনি কহে না না না না (খ) এখনি গমন॥
মুনিস্থানে দীক্ষা শিক্ষা করিয়া রাজন।
অমনি গমন কৈল কৃষ্ণে ধরি মন॥
অতএব সাধু সঙ্গের দেখহ মহিমা।
ক্ষণমাত্র মহিমার নাহি হয় সীমা॥
বিশেষে শ্রীনারদ মুনি হন দয়াময়।
জীবের নিস্তার হেতু কাতর আশয়॥
হেন যে গোস্বামিপদে রহু মোর মতি।
জন্মে জন্মে এই মোর একান্ত কাকুতি॥

চরিত্র শ্রীবাল্মীকিজীর

দুই বাল্মীকির মধ্যে একের চরিত্র।
পশ্চাতে বর্ণিব তাঁর মহিমা পবিত্র॥
আর বাল্মীকি যেঁহ শ্রীল রামায়ণ (গ)।
প্রকাশ করিয়া কৈলা ত্রৈলোক্য পাবন॥
লোকে প্রকাশিয়া রামলীলাগুণকথা।
ত্রিভুবন উদ্ধারিলা ভগীরথ যথা॥
পূর্ব্বাবস্থা অসৎসঙ্গে দস্যুবৃত্তি কৈলা।
সৎসঙ্গে প্রথমে (ঘ) 'মরা মরা' যে জপিলা॥

পাঠান্তর—(ক) নানাবস্থা—নানাবর্ণ।
(খ) মধ্যম—প্রধান।
(গ) যে নির্হেতু—যেই হেতু।

পাঠান্তর—(ক) ইহাত—ইহা কি।
(খ) না না না না—তাহা নহে।
(গ) রামায়ণ—নারায়ণ।
(ঘ) সৎসঙ্গে প্রথমে—সৎসঙ্গগুণে।

বল্মীকের মৃত্তিকাতে দেহ আচ্ছাদিল।
তে কারণে বাল্মীকি ঋষি নাম প্রকাশিল॥*
সেই বাল্মীকেরে (ক) মহাভাগবত বলি।
শ্রুতি স্মৃতি যাঁর গুণ গায় বাহু তুলি॥
তাঁর নামগুণগান যেই নর করে।
সেই ধন্য ধন্য হয় জগতসংসারে॥
তাঁর পাদরজ-ধারণের অধিকাই।
সেই ভাগ্য মুঞি বুঝি কভু করি নাই॥
জনমে জনমে আর কিছু নাহি আশ।
আশ এইমাত্র হউঁ বৈষ্ণবের দাস॥

চরিত্র শ্বিতীয়বাল্মীকিজীর

মহাভারতে যে রাজসূয়ের আখ্যানে।
যজ্ঞপূর্ণ হৈল রাজার যাঁর আগমনে॥
বাল্মীকি তাঁহার নাম শ্বপচ[১] জাত্যংশে।
ভুবনপাবন তাঁর পরীক্ষা যজ্ঞাংশে॥
তাঁর বিবরণ কিছু সংক্ষেপে বর্ণিব।
দিগ্ দরশন মাত্র স্থূলার্থ কহিব॥
মহারাজা পান্ডু ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
শুদ্ধ অনুষ্ঠানে রাজসূয় কৈলা ধীর॥
ব্রাহ্মণভোজন বহু লক্ষ লক্ষ হয়।
ক্রম করিয়া ঘণ্টা শঙ্খ যে বাজয়॥
পূর্ণকালে নাহি বাজে বিস্ময় হইয়া।
রাজা জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণে চমকিত হিয়া (খ)॥
শঙ্খ ঘণ্টা না বাজিল কি ছিদ্র[২] হইল।
কৃষ্ণ কহে মহৎ ছিদ্র বৈষ্ণবে না খাইল॥
সেহেতু অপূর্ণ তায় শঙ্খ না বাজিল।
শ্রুতিস্মৃতি-প্রমাণেতে বিধিহীন হৈল॥
রাজা কহে লক্ষ লক্ষ লোক যে খাইল।
ইহার মধ্যে কি কেহ বৈষ্ণব না ছিল॥

কৃষ্ণ কহে নাহি নাহি শুদ্ধভক্ত যাঁরা।
যজ্ঞেতে আসিয়া কেনে খাইবেন তাঁরা॥
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণভোজনে যেই ফল।
এক ভাগবতভোজনের নহে কল[১]॥
অতএব যজ্ঞপূর্ণ না হয় তোমার।
রাজা কহে তবে কহ উপায় ইহার॥
কৃষ্ণ কহে এই তব নগরের মধ্যে।
বাল্মীকি নামে রুইদাস[২] আছয়ে সত-বুদ্ধে (ক)॥
ভাগবত-রসবন্ত অতি সে সুপাত্র।
জাতিবুদ্ধি নাহি করো পরম পবিত্র॥
আমি যে কহিনু ইহা প্রকাশ না হয়।
জানিলে করিবে রোষ মোরে অতিশয়॥
মোর ভক্তগণ নিজ প্রকাশ না করে।
সাধারণ যেন বাহ্যে ভকতি অন্তরে॥
ইহা শুনি রাজা চমকিত ভাবভরে।
আনিতে পাঠায় ভীমার্জ্জুন দোঁহাকারে॥
বাল্মীকি কৃষ্ণসেবানন্দেতে মগন।
সুধীর স্বভাব অতি তদগদ[৩] মন॥
ঢুঁড়িতে ঢুঁড়িতে দোঁহে তথা উপনীত।
বাল্মীকি দেখিয়া হৈলা অতি চমকিত॥
থরথর কাঁপে সাধু সভয় অন্তরে।
আমি নীচ রাজা কেনে আমার দুয়ারে॥
দণ্ডবত করি দোঁহে করে বহু স্তব।
বাল্মীকি কহে ছি ছি এ কি অসম্ভব॥
পুন সাধু দোঁহা অগ্রে (খ) অষ্টাঙ্গে পড়িলা।
উঠাইয়া দোঁহে তাঁরে হৃদয়ে লইলা॥
বিনয় করিয়া কহে মোদের সদনে।
পাদক্ষালনাদি (গ) আর উচ্ছিষ্ট অর্পণে॥
যাইতে হইবে কৃপা করি একবার।
তেঁহো কহে 'এ কি এ কি' কচালিয়া কর[৪]॥

পাঠান্তর—(ক) বাল্মীকেরে—বাল্মীকিরে।
(খ) হিয়া—হৈয়া।
১। শ্বপচ—চণ্ডাল। ২। ছিদ্র—ত্রুটি।
* কোন কোন পুস্তকে এখানে একটি অতিরিক্ত পঙ্‌ক্তি আছে—'ষাটি হাজার বর্ষ তার মধ্যে যে আছিল।' কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বের "পূর্ব্বাবস্থা...কৈলা"—এই পঙ্‌ক্তি নাই।

পাঠান্তর—(ক) বাল্মীকি নামেতে রুইদাস সত বুদ্ধে।
(খ) দোঁহা অগ্রে—দোঁহে আগে।
(গ) পাদক্ষালনাদি—পদধৌত আদি।
১। কল—অংশ। ২। রুইদাস—মুচি
৩। তদগদ—তদ্‌গত, তন্ময়।
৪। কচালিয়া কর—হাত কচলাইয়া।

আমি নীচজাতি ক্ষুদ্র অস্পৃশ্য পামর।
আমি কিসে যোগ্য যাইবারে রাজদ্বার॥
তবে যদি যাউ' আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
মো-সমান-যোগ্য কর্ম্ম করিবারে পারি॥
উচ্ছিষ্ট ডারিব আর ঝাড়ু বাড়ু দিব।
পাদ ধোয়াইতে মুঞি যোগ্য না হইব॥
কৃপা করি এই আজ্ঞা যদি মোরে হয়।
সেহ-যোগ্য নাহি পুরীস্পর্শ না যুয়ায়॥
পাথালি করিয়া[১] শ্রীল ভীম মহাশয়।
লইয়া আসিয়া শ্রেষ্ঠ আসনে বসায়॥
মঙ্গলাচরয়ে দ্বারে দ্বারে পাতি ঘট।
কদলীর বৃক্ষ রোপে নাচে নটী নট॥
হুলু হুলু ধ্বনি শঙ্খবাদ্য কোলাহল।
পরস্পর দেয় দধি হরিদ্রার জল॥
মহামহোৎসব হৈল রাজার সদনে।
নানা বাদ্য বাজে স্তুতি করে বন্দিগণে॥
কৃষ্ণচন্দ্র বিরলে ডাকিয়া দ্রৌপদীরে।
নানা পরিপাটী পাক সামগ্রী বিচারে॥
সুন্দর শাল্যন্ন ক্ষীর ব্যঞ্জন রসালা।
নানামত অমৃত-আস্বাদ পাক কৈলা॥
স্বর্ণপাত্রে সাজাইয়া সুন্দর প্রকারে।
বাল্মীকিরে ডাকে রাজা সন্তোষ-অন্তরে॥
বাল্মীকি কহেন মোরে বাহির অঙ্গনে।
একমুষ্টি দেহ যাই করিয়া ভোজনে॥
রাজা পাকশালা গৃহে লয়্যা বসাইলা।
সামগ্রী দেখিয়া সাধু আনন্দিত হৈলা॥
শাক সূপ রসালাদি ক্রম নাহি গণে।
কিছু কিছু সব দ্রব্য করে আস্বাদনে॥
ভোজনের তাৎপর্য্য না হয় সাধুর।
কৃষ্ণ কৈছে আস্বাদিলা কোন সে মধুর[২]॥

এইমাত্র অনুভবে আনন্দ হৃদয়।
দ্রৌপদীর মনে কিছু অবজ্ঞা জন্ময়॥
হেন পরিপাটীরূপে রন্ধন করিল।
নীচকুলে জন্ম, খাবার ক্রম না জানিল॥
পূর্ণ শঙ্খ না বাজিল রাজা জিজ্ঞাসয়।
বেত্রাঘাত করি কৃষ্ণ শঙ্খেরে কহয়॥
হাঁরে মূঢ়মতি তুমি ধর্ম্ম নাহি জানো।
বৈষ্ণবের গ্রাসে গ্রাসে নাহি বাজ কেনো॥
শঙ্খ কহে অবিচারে রোষ (ক) আমা প্রতি।
বৈষ্ণবেরে জাতিবুদ্ধি করিলা দ্রৌপদী॥
ইহা শুনি রাজা বহু অনুযোগ কৈলা।
পরিহার করি সতী লজ্জিতা হইলা॥
তখন বাজয়ে শঙ্খ ঘণ্টা বার বার।
গ্রাসে গ্রাসে শ্বাসে শ্বাসে ঘোর চমৎকার॥
অতএব বৈষ্ণবের মহিমা অপার।
অপেক্ষা না করে জাতি-কুলের বিচার॥
পরম-পবিত্র হয় ভুবন-পাবন।
জাতিবুদ্ধি করিলেই নরকে গমন॥
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পাদরজ পাদোদক।
ধারণ সেবন সর্ব্ব-অনর্থ-নাশক॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-কার্য্যকারণ নিশ্চয়।
দাম্ভিক জনার ইহা (খ) প্রতীত না হয়॥
কৃষ্ণভক্তি অঙ্গমধ্যে বৈষ্ণবসেবন।
প্রধানাঙ্গ হয়, তা না জানে (গ) মূঢ়জন॥
বৈষ্ণব ছাড়িয়া মাত্র কৃষ্ণেরে ভজয়।
ভক্তমধ্যে নহে সেই জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণে যদি নাহি ভজে, বৈষ্ণব সেবয়।
তথাপিহ শ্রেষ্ঠ সেই কৃষ্ণপ্রিয় হয়॥
অর্জ্জুনেরে কহিলা শ্রীমুখে (ঘ) ভগবান।
"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ!" ইত্যাদি প্রমাণ॥

১। পাথালি করিয়া—পাঁজাকোলা করিয়া।

২। ভোজনের...মধুর—সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্য ভক্ষণ বাল্মীকির জিহ্বার লালসাতৃপ্তির কারণ হয় নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে তৃপ্তির সহিত ইহা আস্বাদন করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার সুখ।

পাঠান্তর—(ক) রোষ—দোষ।
(খ) ইহা—ইথে।
(গ) তা না জানে—নাহি জানে।
(ঘ) অর্জ্জুনেরে কহিলা শ্রীমুখে—অর্জ্জুনে কহিল ইহা কৃষ্ণ।

সাধুশাস্ত্র লোকব্যবহার যুক্তিমতে।
সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত হয় বৈষ্ণব সেবিতে (ক)॥
নিত্যত্ব কাম্যত্ব আর নৈমিত্ত্য বিধানে।
বৈষ্ণব সেবিতে শাস্ত্রে কহে লক্ষ স্থানে॥
শাস্ত্র আর সাধুমার্গ একই সমান।
সাধুমার্গে কালিদাস-আদি সপ্রমাণ॥
তার মধ্যে মাধব আচার্য্য মহাধীর।
নির্ম্মৎসর১ সাধু অতি পণ্ডিত গম্ভীর॥
কৃষ্ণের ভকত যদি চণ্ডালেতে হয়।
বিকাইলাম তাঁর পায় আর নাহি দায়॥
তেঁহো সে কহিলা ভাষা-ছন্দে উঘাড়িয়া।
তাহা কিছু কহি শুন প্রতীত (খ) লাগিয়া॥
কৃষ্ণের ভকত যদি হয় ত যবন।
জন্মে জন্মে হই তার দাসীর (গ) নন্দন॥
শাস্ত্রের প্রমাণ বহু পরে যে লিখিল।
এক করি (ঘ) দেখ তাহে সাধু যে কহিল॥
যুক্তি এক প্রমাণ হয় পণ্ডিতের মতে।
তাহার সিদ্ধান্ত কিছু কহি সংক্ষেপেতে॥
কৃষ্ণ সবাকার নাথ জগতের প্রাণ।
তাঁর প্রিয়তম যেই যেই পূজ্যমান্ (ঙ)॥
গঙ্গা যেই শ্রীচরণে ঠেকি একবার।
ত্রিলোকপাবনী যেঁহো মহিমা অপার॥
শ্রীল-মহাদেব দেবদেবের জটায়।
যে স্পর্শগৌরবে বাস অদ্যাপি করয়॥
সেই শ্রীচরণ যেই হৃদে দিবানিশি।
ধরে তাঁর কি কহিব মহিমার রাশি॥

তথাহি—

আরূঢ়া হরমূর্দ্ধানং যৎপাদস্পর্শগৌরবাৎ।
ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা কিং তস্য মহিমোচ্যতে॥

অনুবাদ।—যাঁহার চরণস্পর্শমাত্রজনিত গৌরবে ত্রিলোক-পাবনী-গঙ্গা মহাদেবের মস্তকে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার (এখানে অর্থ—সেই শ্রীহরির চরণে নিয়ত আসক্ত জনের) মহিমার কথা আর কি বলা যায়?

সদাচার ত্রিভুবনে দেখ পূর্ব্বাপর।
বৈষ্ণবসেবন মাত্র ব্রত সভাকার॥
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-পাদোদক-পাদরজ।
উল্লাস করিয়া সেবে তেজি ঘৃণা লাজ॥
যাহার মহিমাবলে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত।
প্রত্যক্ষ দেখহ তার প্রতাপ (ক) মহত্ত্ব॥
বৈষ্ণব অধরামৃত যেই নাহি খায়।
কৃষ্ণপ্রেম দূরে রহু, সংসার না যায়॥
কর্ম্মি-জ্ঞানি-মতে আর সকাম-বিধানে।
ফিরয়ে অশুদ্ধবুদ্ধি মর্ম্ম নাহি জানে॥
লোকাচারে দেখ নারীবালবৃদ্ধযুবা।
বৈষ্ণবের স্থানে কুণ্ঠ কিবা দেবী দেবা॥
দান-পূজা-সেবা-স্থলে সভার বচন।
বৈষ্ণবেরে কর বলি সভার রটন॥
আর দেখ বৃদ্ধবেশ্যা উদরজ্বালায়।
বৈষ্ণবের ভেক মাত্র করিয়া বেড়ায়॥
যদ্যপিহ তার পূর্ব্বাবস্থা সভে জানে।
তথাপিহ নমস্কারি 'ঠাকুরাণী' ভণে॥
অতেব (খ) বৈষ্ণব হয় সভার উপরি।
পরম আরাধ্য, ভজ সাদর আচরি॥
যদি বল বাদী বিনে কেনে এত জল্প।
অল্পমূঢ়জনে মাত্র বুঝাবার কল্প॥
কেহ বলে হরী হরী সেহ নারদ প্রহ্লাদ।
অন্য ভক্তে করি হেলা করে নানা বাদ॥
না জানে আপন হিত বিচার শাস্ত্রের।
সেই মূর্খ মর্ম্ম নাহি জানে সাধকের॥
উত্তম মধ্যম আর কনিষ্ঠ ত্রিবিধা।
অপ্রাকৃত তিন ইথে কভু নাহি দ্বিধা॥
বৈরাগ্য ভকতিমার্গের নহে এই অঙ্গ।
অপেক্ষয়ে মাত্র সদ্গুরু-পদসঙ্গ॥

পাঠান্তর—(ক) সেবিতে—সেবাতে।
(খ) প্রতীত—প্রতীতি।
(গ) দাসীর—দাসের।
(ঘ) এক করি—ঐক্য করি।
(ঙ) পূজ্যমান্—পুণ্যবান্।

১। নির্ম্মৎসর—যাহার মনে পরশ্রীকাতরতা নাই।

পাঠান্তর—(ক) প্রতাপ—প্রভাব।
(খ) অতেব—তবে ত।

কর্ম্ম-জ্ঞান-মিছিলাতে[১] ব্যভিচার হয়।
শুদ্ধভক্ত নহে সেই, কৃষ্ণ নাহি পায়॥
এতএব শুদ্ধভক্ত কনিষ্ঠ মধ্যম।
পূজ্যতম হয় তাতে সুতরাং উত্তম॥
ইহাতে ত্রিবিধ ভক্ত হয় মহারাধ্য।
সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ॥
এই জ্ঞান কভু বিনা চারি সম্প্রদায়।
কদাচিত না হয় কুঞ্জরশৌচপ্রায়[২]॥
সম্প্রদাবিহীন গুরু আশ্রয় যে করে।
নিষ্ফল তাহার সব ভক্তি নাহি স্ফুরে॥

পাদ্মে তথা গৌতমীয়ে তথা নারদপঞ্চরাত্রে—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈর্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি॥

অনুবাদ।—সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রকে নিষ্ফল বলিয়া মনে করা হয়। শতকোটি কল্পের সাধনসমূহ দ্বারাও তাহা সিদ্ধ হয় না।

আপনার হিত যদি বাঞ্ছ ভাই কেহ।
ভাগবত আদি শাস্ত্র বিচার করহ॥
না পড় কুতর্কগর্ত্তে, দম্ভ পরিহরি (ক)।
পূর্ব্বাপর নিজদশা অন্তরে বিচারি॥
কিসে বা কল্যাণ কিসে অকল্যাণ হয়।
অনুভব করিতেই হইবে উদয়॥
সদ্‌গুরুচরণ-কৃষ্ণ বৈষ্ণব-আশ্রয়।
বিচার করিতে মাত্র এই দৃঢ় হয়॥
অতএব বৈষ্ণব-চরণে লও মতি।
ইহা বিনে সেই কৃষ্ণপদে নহে রতি॥
লবণ-বিহীনে যেন ব্যঞ্জনের স্বাদ।
তেন-মত (খ) ভক্ত বিনে ভক্তি পড়ে বাদ॥
ভজ ভজ ভজ ভাই বৈষ্ণব-চরণ।
মদ মোহ ছাড়ি লও একান্ত শরণ॥

পাঠান্তর—(ক) পরিহরি—দূর করি।
(খ) তেন-মত—সেইমত।

১। মিছিলাতে—মিশ্রণ হওয়াতে।
২। কুঞ্জরশৌচপ্রায়—হাতী স্নান করিয়া আরও কর্দ্দমাক্ত হয়।

অভাগিয়া সেই নাহি জানে এ সন্ধান।
কৃষ্ণভক্তি-পথে সেই বড়ই অজ্ঞান॥
কৃষ্ণ নাহি পায়, ভক্তিরস নাহি জানে।
তপ জপ করি আপনারে সাধু মানে॥
সাধুমার্গ অনুসার শাস্ত্রমত যজ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-স্বরূপ-বৈষ্ণবপদ ভজ॥
দন্তে তৃণ ধরি মুঞি করি নিবেদন।
বৈষ্ণব গোসাঞি দেহ চরণে শরণ॥

চরিত্র শ্রীরুক্মাঙ্গদ রাজার

রুক্মাঙ্গদ মহারাজা মহাভাগ্যবান্।
ছলে একাদশীব্রত হৈলা কৃপাবান্॥
অপূর্ব্ব পুষ্পের উদ্যান গৃহের নিকটে।
নানামত সৌগন্ধি আছয়ে ফুল ফুটে॥
কৌতুকে দেবতাঙ্গনা পুষ্পের চয়নে।
নিতি নিতি আইসে যায় দৈবে একদিনে॥
বাগানের (ক) কাঁটা এক ফুটিল চরণে।
গতিরোধ হৈল তার স্বর্গের গমনে॥
মালিগণ শীঘ্র যাই কহে রাজাস্থানে।
রাজা আসি শুনে গতিরোধ-বিবরণে॥
জিজ্ঞাসয় ইহার কি উপায় করিবে।
দেবকন্যা কহে তাহা তোমা হৈতে হবে॥
অনুগ্রহ করি মোরে অনুকূল হও।
বিহিত করিয়া মোরে স্বর্গেতে পাঠাও॥
একাদশীব্রত তব গ্রামে কেহ করে।
তার কিছু ফলাভাস দেহ যদি মোরে॥
তবে যে বিপদ হৈতে আমি ত্রাণ হই।
তোমারে আশিষ করি স্বর্গে চলি যাই॥
রাজা বলে একাদশীব্রত সে কেমন।
দেবকন্যা কহয়ে মহিমা অনুষ্ঠান॥
রাজার আজ্ঞাতে লোক গ্রামেতে যাইয়া।
অনুষ্ঠানমতে নাহি পায় তলাসিয়া॥

পাঠান্তর—(ক) বাগানের—বাগুনের।

এক বণিকের দাসী কলহ করিয়া।
উপবাসী আছে ক্রোধে রজনী জাগিয়া (ক)॥
সে দিনে যে একাদশী সেহ নাহি জানে।
উপবাস করি রহে কলহ-কারণে॥
তাহারে আনিয়া রাজা দেবী আগে দিলা।
দেবী কহে তুমি একাদশী যে করিলা॥
তাহার কিঞ্চিৎ ফল মোরে যদি দেহ।
বিপদ হইতে মোরে উদ্ধার করহ॥
দাসী বলে সে কি আমি কভু করি নাই।
হাসি হাসি দেবী কহে তোমারে বুঝাই॥
হরির দিবসে তুমি কলহ করিয়া।
উপবাসী রহ (খ) সর্ব্ব-রজনী জাগিয়া॥
তাহার কিঞ্চিত ফল প্রদান করহ।
তুমিই বৈকুণ্ঠ কালে (গ) যাবে বন্ধুসহ॥
ইহা শুনি তাঁরে কিছু ফল সমর্পিলা।
তৎক্ষণেতে দেবী নিজ স্থানে চলি গেলা॥
রাজা বিবরণ সব দেখিয়া শুনিয়া।
চমৎকার হৈল ব্রতের মহিমা জানিয়া॥
সেই দিন হৈতে রাজ্যে ঢেঁড়ি ফিরাইল।
রাজার শাসনে একাদশী সভে কৈল॥
নিজ পরিবার প্রজা হস্তী অশ্ব আদি।
বাল বৃদ্ধ পশু পক্ষ (ঘ) যুবক যুবতী॥
অন্ন জল ফল মূল গোরস যবস।
কেহ নাহি খায় হরিবাসর-দিবস॥
রাজার তনয় অন্যদেশে গিয়াছিল।
গৃহেতে আসিতে দৈবযোগে না খাইল॥
দুই দিন উপবাসী রাত্রি দিনে (ঙ) পেঁাছে।
একাদশী-বৃত্তান্ত না জানে তেঁহো তৈছে॥
খাইবারে চাহে স্ত্রী-আদি-পরিবার।
কেহ নাহি দেয় খাইতে শাসন রাজার॥

পাঠান্তর—(ক) রজনী জাগিয়া—অন্ন না খাইয়া।
(খ) রহ—ছিলে।
(গ) বৈকুণ্ঠ কালে—বৈকুণ্ঠে চলে।
(ঘ) পক্ষ—পক্ষী।
(ঙ) রাত্রি দিনে—রাত্রে গৃহে।

রাজার তনয় সুকুমার দেহ হয়।
রজনীপ্রভাতকালে পরাণ তেজয়॥
আনুষঙ্গ্য একাদশী-মহিমা দেখহ।
বৈকুণ্ঠগমন কৈল ধরি দিব্যদেহ॥
মহারাজা রুক্মাঙ্গদ একাদশী মাত্র।
সেবিয়া হইলা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র॥
ভাগবত বলি যাঁরে শাস্ত্রেতে বাখানে।
যাঁর গুণকীর্ত্তন করয়ে ত্রিভুবনে॥
শ্রীমদ্ভাগবত গীতাশাস্ত্রেতে শ্রীহরি।
একাদশী সর্ব্বধর্ম্মব্রতের উপরি॥
কহিলা সাক্ষাতে আমি সর্ব্বব্রতমধ্যে।
অতএব সার সর্ব্বশাস্ত্রগদ্যপদ্যে॥
অন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রত তপস্যা সগুণ।
কৃষ্ণভক্তি অঙ্গ হরিবাসর নির্গুণ॥
অতএব রুক্মাঙ্গ হরি-বাসর সেবিলা।
জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগবত হৈলা॥
তাঁহার চরণে মোর নিবেদন হয়।
একাদশীব্রত যেন মোরে স্পর্শ হয় (ক)॥
মুঞি পাপী অধম অধৈর্য্য-কলেবর।
জন্মাবধি হেন ব্রতের না হৈনু গোচর॥
ছি ছি ধিক্ ধিক্ মুঞি হেন জন্ম পাঞা।
আঁচলেতে গ্রন্থি দিনু কনক ডারিয়া॥

চরিত্র শ্রীহরিশ্চন্দ্র রাজা-আদির

হরিশ্চন্দ্র রাজা আর সুরথ সুধন্বা।
ভরত দধীচি আদি ভকতে গণনা॥
ভগবান্ যারে পরখিলা ছল করি।
অকাতরে দিলা দেহ পুত্র ধন স্ত্রী॥
হরিশ্চন্দ্র শিবি-আদি চরিত্র প্রসিদ্ধ।
সংক্ষেপে কহিল আছে সভাকার বেদ্য[১]॥

পাঠান্তর—(ক) হয়—বয়।
১। বেদ্য—জ্ঞাত, জানা।

চরিত্র শ্রীবিন্ধ্যাবলীজীর

বলি মহারাজার স্ত্রী নাম বিন্ধ্যাবলী।
পরম সুশীলা স্নিগ্ধা সর্ব্বগুণাবলী॥
শ্রীবামনদেব যবে অবামন (ক) হৈলা।
ত্রিপাদ ভূমের ছলে বলিরে বান্ধিলা॥
সেইকালে ব্রহ্মা-আদি স্তবন করয়ে।
হেনকালে বিন্ধ্যা কিছু প্রভুরে কহয়ে॥
অপূর্ব্ব অমৃত বিন্ধ্যাবলীর বচন।
বিরতি হইলা ব্রহ্মা করিতে স্তবন॥
বিন্ধ্যা কহে প্রভু বলি-রাজারে বান্ধিলে।
উপযুক্ত বটে ভাল বিচার করিলে॥
সুন্দর করিয়া দণ্ড উহার যুকতি।
কার ধন কারে দেয় দাম্ভিক কুমতি॥
তোমার ক্রীড়ার ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-ভুবন।
অহঙ্কারে পুনশ্চ তোমারে করে দান॥
অতএব দণ্ড-অর্হ্য[১] রাজা বলি হয়।
কিন্তু যে তোমার ভক্ত ক্ষমিতে যুয়ায়॥
তোমা-অনুরাগে গুরু-আজ্ঞা তেয়াগিল।
তীক্ষ্ম অভিশাপ যে অঞ্জলি করি লৈল॥
দুস্ত্যজ (খ) ত্রৈলোক্যরাজ্য অনাসে[২] তেজিল।
বিপক্ষের পক্ষ জয় দৃক্‌পাত না কৈল॥
তোমার শ্রীমুখশশী হেরিয়া ভুলিলা।
ব্রহ্মার দুর্লভ শ্রীচরণ ধোয়াইলা॥
পিরীতে পরাণ দিতে উদ্যত হইল।
নিগ্রহ যে কৈলে পুরস্কার মানি লৈল॥
অতএব শীঘ্র প্রভু বন্ধন ঘুচাও।
মরিল তোমার ভৃত্য কৃপাদৃষ্টে চাও॥
রাজা লাগি মোর কিছু দুঃখ নাহি মনে।
তোমার কলঙ্ক পাছে ঘোষে ত্রিভুবনে॥
বিন্ধ্যার যে মধুর বচন জগন্নাথ।
শুনিয়া (গ) পুলক যে নয়নে অশ্রুপাত॥
হেন বিন্ধ্যাবলীর শ্রীচরণ ধরি শিরে।
যেন সেই দুর্লভ চরণে মন হরে॥
পাষাণ হৃদয় মোর কুসঙ্গ-আতপে।
তাপিত (ক) শীতল করু কৃপাচন্দ্রাতপে॥

পাঠান্তর—(ক) অবামন—'আগমন' অথবা 'অবতার'।
(খ) দুস্ত্যজ—দুস্ত্যজ্য।
(গ) শুনিয়া—হৃদয়ে।
১। দণ্ড-অর্হ্য—শাস্তির যোগ্য।
২। অনাসে—অনায়াসে।

চরিত্র শ্রীমোরধ্বজ রাজার

অর্জ্জুনের ভক্ত-অভিমানে কিছু গর্ব্ব।
জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ করিবারে চাহে খর্ব্ব॥
ছল করি মোরধ্বজ রাজার নিকটে।
লইয়া গেলেন তথা হইয়া কপটে॥
আপনি হইলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ।
অর্জ্জুনে করিলা মুগ্ধ-বালক-স্বরূপ॥
যাইয়া রাজার গৃহে কহে ভৃত্যগণে।
সমাচার কহ নৃপে অতিথি-ভবনে॥
লোক গিয়া অন্তঃপুরে কহে সমাচার।
কৃষ্ণসেবা-কার্য্যে রাজা উৎকণ্ঠা অপার॥
সম্মানপূর্ব্বক বসাইতে কহি দিলা।
আমিহ পশ্চাৎ শীঘ্র যাইব কহিলা॥
লোকমুখে সমাচার শুনিয়া ব্রাহ্মণ।
রাজা উপেক্ষিলা বলি করয়ে গমন॥
শীঘ্র আসি রাজা বিপ্রচরণে পড়িয়া।
কাকুবাদ বহু করে কাতর হইয়া (খ)॥
বিপ্র কহে মোর কিছু যাচিঞা আছয়।
পুরাও যদ্যপি নহে কি কায কহায়॥
রাজা কহে যাহা চাহ তাহা মুঞি দিব।
প্রতিজ্ঞা করিনু মোরে পরসন্ন ভব[১]॥
প্রসন্ন-বদনে বিপ্র হইয়া পূজিত।
কহিতে লাগিলা তবে নিজ মনোনীত॥
বনপথে আসিতেই সিংহ এক রহে।
মোর এই শিশু সেই খাইবারে চাহে॥
তাহারে কহিনু মোর শিশু না খইহ।
প্রতিজ্ঞা করিনু দিব আর যাহা চাহ॥

পাঠান্তর—(ক) তাপিত—তাপিল।
(খ) কাতর হইয়া—মিনতি করিয়া।
১। ভব—হও।

সিংহ বলে তবে তোর বালক না খাব।
রাজার অর্দ্ধাঙ্গ ফাড়ি (ক) মাংস যদি দিব॥
অতএব অকাতরে যদি ইহা দেহ।
তবে মোরে সত্য হৈতে রক্ষা যে করহ॥
রাজা বলে এই দেহ অসার অনিত্য।
পর-উপকারে যেই লাগে সেই সত্য॥
ইহা বিনু ভাগ্য মোর কিবা আছে আর।
ভস্ম না হইয়া হবে পর-উপকার॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে তোমার স্ত্রী এক ভাগে।
করাত টানিবে আর পুত্র অন্যদিগে॥
রাজার আজ্ঞায় দুই গৃহিণী তনয়।
দুইজনে দুই দিগে করাত টানয়॥
নাসা-তক্[১] কাটি যবে করাত আইল।
চক্ষু হৈতে তবে জলবিন্দুপাত হৈল॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া তবে ক্রোধে জ্বলি গেলা।
কহে হাঁরে (খ) দুষ্টমতি কাতর হইলা॥
রাজা বলে ঠাকুর মুঞি তাহে না কাতর।
অর্দ্ধ অঙ্গ বৃথা হৈল এ হেতু ফাঁফর॥
তখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া।
দেখা দিলা নিজরূপ প্রকাশ করিয়া॥
শুভদৃষ্টে নৃপদেহ পূর্ব্বমত হৈল।
চমৎকার হইয়া শ্রীচরণে পড়িল॥
কৃষ্ণ কহে রাজা তব চরিত্র দেখিতে।
কৌতুকে আইনু মুঞি পরীক্ষা করিতে॥
রাজা কহে প্রভু মোরে এক বর দিবে।
এতাদৃশ পরীক্ষণ কারে না করিবে॥
অতএব হরির ভকত যেই হয়।
তাঁহার চরিত্র মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥
তাঁহার দাসের দাস যেই জন হয়।
তাঁহার আশয় পণ্ডিতের বেদ্য নয়॥
কেহ কহে মোরধ্বজ দানশীল হয়।
কেহ কহে জ্ঞানী কেহ তপস্বী কহয়॥

পাঠান্তর—(ক) ফাড়ি—কাটি।
(খ) হাঁরে—তাঁরে।
১। নাসা-তক্—নাক পর্য্যন্ত।

অতএব যার যত দূর দৌড় হয় (ক)।
যথার্থ না জানি নিজমত সেই লয়॥
মোরধ্বজ কৃষ্ণভক্ত জানিহ নিতান্ত।
পর-উপকারে যথা দধীচি মহান্ত॥

চরিত্র শ্রীঅলর্কজীর

এক রাজা হয় তার স্ত্রী মন্দালসা (খ)।
ভাগবত তেঁহো যাঁর সঙ্গ ভবনাশা॥
পর-উপকার মাত্র প্রতিজ্ঞা যাঁহার।
পরায় সভার গলে কৃষ্ণভক্তিহার॥
ক্রমে ক্রমে চারি পুত্র জন্মিলা উদরে।
কৃষ্ণভক্তি দীক্ষা-শিক্ষা দিয়া সভায় তারে॥
মন্দালসা-সতীগর্ভে যে করে ভজনা।
পুনর্ব্বার নাহি হয় গর্ভের বাসনা (গ)॥
রাজা নাহি জানে অন্তঃপুরে (ঘ) পুত্রগণে।
শ্রীকৃষ্ণভজনে পাঠাইয়া দেয় বনে॥
রাণীর যুক্তিতে যায় রাজা নাহি জানে।
পুত্রশোকে মগ্ন রাজা স্থির নহে মনে॥
পুনরায় আর এক পুত্র জনমিল।
অন্নপ্রাশনে রাজা বহুবারম্ভ কৈল॥
নামকরণের কালে রাণীরে জিজ্ঞাসে।
ধনী বড় হবে পুত্র জন্মলগ্নবশে॥
অতএব ধনেশ বলিয়া নাম রাখি।
রাণী ভাবে এ ত বড় মোহ অন্ধ দেখি॥
মনে ক্ষুব্ধ হঞা কিছু কহে মন্দালসা।
পুত্রের ঐশ্বর্য্যে তোমার বড় দেখি আশা॥
পুত্র আর রাজ্য মান ধনে কি করিবে।
অভিমানফলমাত্র পরিণাম যাবে॥
অতএব কৃষ্ণে ভক্তিধন আশা করি।
পুত্রে হরিদাস নাম রাখহ বিচারি॥

পাঠান্তর—(ক) অতএব...হয়—অতএব যেবা যেই অধিকারী হয়।
(খ) মন্দালসা—মদালসা।
(গ) বাসনা—যন্ত্রণা।
(ঘ) অন্তঃপুরে—অন্তস্পটে।

রাণীর বচনে রাজা চমৎকার (ক) চিত্ত।
বাহির করিল মোর ঞিহো চারি পুত্র॥
ভাবিয়া ক্ষণেক রাজা স্তব্ধপ্রায় রহে।
শোকাকুলি হইলা (খ) রাণীরে কিছু কহে॥
বুঝিলাম তোমার এমত ব্যবহার।
তুমি চারি পুত্র বনে পাঠাইলা নির্দ্ধার (গ)॥
যে কৈলে সে কৈলে এবে মোর মুখ চাহ।
এবার মিনতি মোর এটিরে (ঘ) রাখহ॥
রাজা হইবারে এক চাহি ত অবশ্য।
রাজা বিনে ধর্ম্মনাশ লোকে হয় দস্য॥
রাজার কথায় মন প্রসন্ন না হয়।
তথাপি স্বামীর মুখ চাহিয়া কহয়॥
ভাল ভাল এ সন্তান রাজ্যে রাজা হবে।
তোমার কোলেতে রাখ প্রীতি জন্মাইবে॥
রাণী নাম রাখিবেন 'অলর্ক' বলিয়া।
দুর্ভাগ্য হইল বলি দুঃখিত হইয়া॥
কথোক দিবসে কিছু জ্ঞানবান্ হইতে।
সদা দূরে রাখয়ে মায়ের স্থান হইতে॥
রাণী মনে ভাবে মোর পাঁচটি সন্ততি।
চারি ত উদ্ধার হৈল একের কি গতি॥
ভাবিয়া অন্তরে কিছু উপায় সৃজিল।
কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব এক পত্রেতে লিখিল॥
সোণার সম্পুট করি তাহাতে রাখিয়া।
দৃঢ় বন্ধ কৈল যেন না দেখে খুলিয়া॥
পুত্রস্থানে দিলা সেই সম্পুটরতন।
কহিলা রাখিবে অতি করিয়া যতন॥
যখন তোমার ঘোর বিপদ পড়িবে।
তখনি বিরলে ইহা খুলিয়া দেখিবে॥
মহৎ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবে।
অন্য সময় না খুলিবে পূজাদি করিবে॥
রাণীর অন্তরে কিছু নিগূঢ় আশয়।
কৃষ্ণে মতি রহে বিনে দুঃখের সময়॥

তে-কারণে আপদ সময় খুলিবারে।
যতন করিয়া রাণী কহি দিলা তারে॥
অলর্ক পাইয়া তারে অতি যত্ন করি।
নিগূঢ় স্থানেতে রাখে চিত্তে হর্ষ ভরি॥
রাজার অন্তরে কিছু উৎকণ্ঠা আছয়।
পাছে বালকেরে রাণী কোন যুক্তি দেয়॥
আশঙ্কাতে (ক) রাজা পুত্রে কথোদিন বাদ।
কাশী লঞা রাখে যথা কর্ম্ম-মায়াবাদ॥
কালে রাজা রাণী দোঁহার বিয়োগ হইল।
অলর্ক যে রাজসিংহাসনেতে বসিল॥
পূর্ব্বে চারি ভাই যারা বৈরাগ্য করিলা।
তাঁহারা শুনিল ছোট ভাই রাজা হৈলা॥
চারিজন মিলি দুঃখ ভাবিয়া অন্তরে।
কনিষ্ঠ ভ্রাতার ত্রাণ উপায় বিচারে॥
মাতা আমাদিগকে ত্রাণ কৃপা করি কৈল।
ছোট ভাইটিরে অন্ধকূপে ডারি (খ) গেল॥
এত চিন্তি তবে এক উপায় সৃজিল।
তার প্রতিযোগি-রাজা সহিত মিলিল॥
রাজবেশ করি সভে যাইয়া তথায়।
মোরা তব প্রতিযোগি-রাজার তনয়॥
শিশুকাল হৈতে তীর্থভ্রমণ মোরা করি।
কনিষ্ঠ হেথায় হৈল রাজ্যে অধিকারী॥
পৈতৃক রাজ্যেতে জ্যেষ্ঠ ভায়াদ (গ) থাকিতে।
কনিষ্ঠ না হয় রাজা বিচার-সম্মতে॥
অতএব তুমি মোর পক্ষপাত কর।
তোমার শরণ লৈনু যে হয় বিচার॥
এত শুনি রাজা বহু আশ্বাস করিলা।
অলর্ক-স্থানেতে তবে কহি পাঠাইলা॥
অলর্ক রাজ্য করে সুখে আসক্ত হইয়া।
কহে কোথাকার ভাই উপেক্ষা করিয়া॥
তবে (ঘ) যুদ্ধ করিবারে প্রবৃত্ত হইলা।
অলর্ক হারিয়া ঘোর বিপদে পড়িলা॥

পাঠান্তর—(ক) চমৎকার—চমকিত।
(খ) শোকাকুলি হইলা—শোকাকুল হইয়া।
(গ) নির্দ্ধার—আমার।
(ঘ) এটিরে—এ পুত্রে।

পাঠান্তর—(ক) আশঙ্কাতে—অসাক্ষাতে।
(খ) ডারি—রাখি।
(গ) ভায়াদ—ভ্রাতাদি (দায়াদ?)
(ঘ) তবে—উভে।

সেইকালে মাতাদত্ত সোণার পুটিকা।
মনে পড়ি গেলা সেই বিপদনাশিকা॥
মাতা মোরে কহে যবে বিপদে পড়িবে।
খুলিয়া দেখিবে অন্য সময় না দেখিবে॥
অতএব এই ঘোর বিপদ সময়।
এইকালে সেই কৌটা খুলিতে যুয়ায়॥
ইহা চিন্তি সেই রত্নপুটিকা খুলিলা।
দারিদ্র্য ভঞ্জনে বিধি রত্ন (ক) পাঠাইলা॥
সাগর-পতিতে বুঝি তরি আসি মিলে।
অন্ধকূপ হৈতে বন্ধুলোক যেন তোলে॥
অতএব শুভনিশি প্রভাত হইল।
খুলিয়া পরমতত্ত্ব পত্রী পাঠ কৈল॥
শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি যাতে আছে তাৎপর্য্যার্থ।
ত্রৈলোক্যের রাজা আর মুক্তি-তক (খ) ব্যর্থ॥
পড়িতে পড়িতে হৈল বিবেক উদয়।
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে মতি উপজয়॥
ভ্রাতাগণে কহিয়া পাঠায় মহামতি।
তোমরা আসিয়া লহ এ ঘরবসতি॥
মাতা মোরে বঞ্চি রত্নপুটিকাতে ভরি।
মহাস্পদ (গ) রাজ্য রাখি ভস্ম দিল ডারি॥
পুনশ্চ তাঁহার কৃপাপুটিকা খুলিয়া।
অর্থ প্রাপ্ত হৈল, এবে চলিনু লইয়া॥
ইহা কহি একমাত্র কৌপীন পরিয়া।
শ্রীকৃষ্ণভজনে গেলা সব তেয়াগিয়া॥
ভ্রাতাগণ জানিলা অলর্ক বনে গেলা।
প্রতিযোগি রাজা স্থানে খুলিয়া কহিলা॥
আমাদিগের রাজ্য-হেতু তাৎপর্য্য নহে।
ভ্রাতা অলর্ক মোর (ঘ) অন্ধকূপে রহে॥
তাহার উদ্ধার হেতু ভূমিকা করিনু।
কার্য্যসিদ্ধ হৈল মোরা বিদায় হইনু॥
প্রয়াস পাইয়া তুমি রাজ্য যে জিনিলা।
তুমি ভোগ করহ সে তোমার হইলা॥

ইহা বলি ভেক যে কৌপীন কমণ্ডল।
লইয়া চলিলা হর্ষে অন্তর নির্ম্মল॥
যাইয়া মিলিলা যথা আছে অলর্ক ভাই।
পরস্পর বলাবলি গলাগলি যাই॥
অতএব কৃষ্ণভক্তি আর ভক্ত রীত।
অপার অগাধ, বিজ্ঞে না হয় বিদিত॥
আমা সভা মূঢ়ে, হেন আশা বড় চিত্র।
অতেব চরণে তাঁর চিত্ত রহু মাত্র॥

চরিত্র শ্রীরন্তিদেবের

রন্তিদেব রাজা মহারাজ-চক্রবর্ত্তী।
কৃষ্ণে দৃঢ়মতি যাঁর অনন্য ভকতি॥
মহারাজ ভোগ-সুখ দুঃখ করি মানে।
সমস্ত অর্পণ কৈলা শ্রীকৃষ্ণ-চরণে॥
রাজ্য ধন দারা পুত্র কৃষ্ণার্থে অর্পিয়া।
অযাচকবৃত্তি১ মাত্র শরীর লাগিয়া॥
অযাচিত অন্ন আদি যে কেহ (ক) আনয়।
তাহাই ভোজন বিনে কভু না যাচয়॥
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া মন দিবসু যাপন।
কিছুকাল ব্যাজে আর শুন বিবরণ॥
চল্লিশ আর আট দিন কিছু নাহি মিলে।
উপবাসি রহে রাজা না চাহে না বলে॥
দৈবাত্ত যে কেহ অন্ন পায়স আনিলা।
পরখিতে কৃষ্ণ সেইকালে ছল কৈলা॥
এক শূদ্ররূপে এক কুক্কুর সহিতে।
অতিথি হইলা রন্তিদেবের গৃহেতে॥
অভুক্ত জানিয়া রাজা সেই অন্ন জল।
বাঁটিয়া দিলেন দুই জনারে সকল॥
খাইয়া তাহারা কহে না পূরে উদর।
আর কিছু নাহি রাজা কহে জুড়ি কর॥

পাঠান্তর—(ক) রত্ন—নিধি।
(খ) মুক্তি-তক—যুক্তি তর্ক।
(গ) মহাস্পদ—মহাসম্পদ অথবা মহাপদ।
(ঘ) মোর—মোহ।

পাঠান্তর—(ক) যে কেহ—কেহবা।
১। অযাচকবৃত্তি—না চাহিলেও লোকে দয়া করিয়া যাহা দেয় তাহা দ্বারা জীবন ধারণ।

করুণাসাগর কৃষ্ণ দয়া উপজিল।
"রাজ্যভোগ সুখ সব আমারে সোঁপিল॥
আমার লাগিয়া মহা উৎকণ্ঠা অপার।
অযাচকবৃত্তি করি রহে অনাহার॥"
এত ভাবি দয়ানিধি অন্তরে দ্রবিল।
ভুবনমোহন নিজরূপ প্রকাশিল॥
নবঘনশ্যাম বনমালা পীতবাস।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মনোহর মৃদুহাস॥
অসংখ্য জন্মের সীমা রাজার এবার।
সর্ব্বমঙ্গলের সুফলের পারাবার॥
রূপ দেখি রাজা মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল।
অষ্ট সাত্ত্বিক দেহে বিকার হইল॥
স্তব স্তুতি করি বহু গৃহে বসাইয়া।
সেবন করয়ে সুখসাগরে ডুবিয়া॥
দারিদ্র্য যেমন রত্ন কলস পাইয়া।
রাখিবার স্থান যেন না পায় খুঁজিয়া॥
তেন-মত (ক) রাজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া।
কি করিতে কি না করে সংজ্ঞা না পাইয়া॥
অঞ্জলি মস্তকে করি দন্তে তৃণ ধরি।
তাঁহার চরণে মুঞি নিবেদন করি॥
সেই প্রেমামৃত-সিন্ধু কল্লোলের ফেনা।
তার এক কণা পাউঁ মনের বাসনা॥

পাঠান্তর—(ক) তেন-মত—তেন মনে।

ইতি শ্রীভক্তমালে কুন্তী-আদি-ভক্তমহিমা কথনং নাম পঞ্চম মালা॥ ৫॥

ষষ্ঠ মালা

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

পুরু ইক্ষ্বাকু-আদি-নামকীর্ত্তনম্

পুরু ইক্ষ্বাকু আর ঐল গাধিবেগ[১]।
শুচি শতধন্বা রঘু সাধু পরতেক॥
উতঙ্গ (ক) পিপ্পল ভূরি ঋভু অমূরতি।
ভরদ্বাজ বৈবস্বত সতী অরুন্ধতী॥
নহুষ যযাতি যদু গুহ মানধাতা।
মনু দক্ষ শরভঙ্গ সঞ্জয় সংঘাতা॥
দিলীপ শমীক যাজ্ঞবল্ক্য নিমি শুচি।
দেবল উত্তানপাদ আদি আর রুচি॥
চতুঃসন প্রভৃতি এ সব সাধুগণ।
হরিমায়াতীত ত্রিভুবনের ভূষণ॥
এ সভার পাদরজ ভূরি রত্ননিধি।
মস্তকে ভূষণ করি যত্নে নিরবধি॥

চরিত্র শ্রীগুহরাজার

গুহ নাম ভিল্লরাজ ভুবনপাবন (খ)।
যাঁহার স্মরণে (গ) তাপত্রয়বিমোচন॥
ইহ আনুষঙ্গ্য ফল ভক্তি যে দুর্লভ।
তাহা প্রাপ্তি প্রতি এক কারণ সুলভ॥
মৈত্র বলিয়া রামচন্দ্র যে যাঁহারে।
দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা পুলক-অন্তরে॥
মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীরামের প্রেষ্ঠ।
অতএব জগতের ইষ্টমধ্যে জ্যেষ্ঠ॥
তাঁহার চরিত্র কিছু শুন মন দিয়া।
সফল হইবে জন্ম হর্ষ হবে হিয়া॥
রামচন্দ্র সীতাসহ অনুজ লক্ষ্মণ।
বনে গেলা যবে পিতৃসত্যের কারণ॥
হেরিয়া গুণের নিধি রূপের অবধি।
ভাসিলা শ্রীগুহরাজ আনন্দসুধাব্ধি॥
নয়নে গলয়ে (ক) ধারা মনে উতরোল।
চমকি চাহিয়া রহে নাহি আইসে বোল॥
নিমিখ নাহিক পড়ে চাহিয়া রহিল।
কাষ্ঠের পুতলিপ্রায় অস্পন্দ হইল॥
এ কি চমৎকার এ কি অপরূপ দেখি।
হেন রূপ হেন গতি কভু না নিরখি॥
ভাবিতে ভাবিতে মনে প্রেম উথলিল।
স্বাভাবিক রতি গুহরাজের হইল॥
ধীরে ধীরে নিকটে যাইয়া সাধু কহে।
তোমার বালাই যাই আইস মোর গৃহে॥
প্রভু তারে লয়্যা দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা।
মৈত্র বলিয়া তবে সম্ভাষা করিলা॥
গুহ বলে ভাল ভাল তুমি মোর মিতে।
তোমাতে সোঁপিনু দেহ পরাণ-সহিতে॥
তুমি মোর সরবস প্রাণ ধন রাজ্য।
তুমি মোর ভুক্তি মুক্তি তুমি শুভকার্য্য॥
আমি মর্য্যে যাই তব বালায়ের সনে।
দেহ সমর্পিনু মিতা তোমার চরণে॥
পরিবার দেহ গেহ রাজ্য আর ধন।
কায়মনবাক্যে কৈনু সব সমর্পণ॥
বনফল মিষ্ট আর দধি দুগ্ধ ঘৃত।
নানাদ্রব্য আয়োজন করি নানামত॥
খাওয়াইতে যত্ন কৈল প্রণয়-অন্তরে।
তেঁহো কহে মিতা ইহা নাহি কহ মোরে॥

পাঠান্তর—(ক) উতঙ্গ—উতঙ্ক।
(খ) ভুবনপাবন—পতিতপাবন।
(গ) স্মরণে—শরণে।

১। গাধিবেগ—কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন, বিশ্বামিত্র (গাধির বেগ অর্থাৎ প্রবাহ অর্থাৎ বংশ।)

পাঠান্তর—(ক) গলয়ে—বহয়ে।

চৌদ্দ বৎসর মুঞি প্রতিজ্ঞা করিনু।
অন্য দ্রব্য নাহি খাব ফলমূল বিনু॥
তাহা শুনি সাধু তবে মিষ্ট নানাফল।
খাওয়াইলা প্রেমানন্দে হইয়া বিহ্বল॥
তবে জিজ্ঞাসয়ে মিতা কহ বিবরণ।
জটা-বল্ক ধরি বনে যাও কি কারণ॥
হেন সুকুমার দেহ সুকুমারী সহ।
অনুজ লক্ষ্মণ তাহে সুকুমারদেহ (ক)॥
কণ্টকিত বনে (খ) তাহে নিশাচরগণ।
ব্যাঘ্র ভল্লুক তাহে পশু অগণন॥
শীত বাত বৃষ্টি তাহে অতি সে দুঃসহ।
কেমতে বেড়াবে বনে কমলিনী সহ॥
এ হেন কমলপদে (গ) কণ্টক বিন্ধিবে।
আহা মরি মরি তাহে কত দুঃখ পাবে॥
ভাবিয়া (ঘ) আমার প্রাণ ফাটিয়া উঠয়।
নাহি যাও বনে মিতা রহ এই ঠাঁয়॥
মোর এই রাজ্য ধন সমুদয় লহ।
লক্ষ্মণ সীতার সহ এইখানে রহ॥
রামচন্দ্র কহে মিতা ও কথা না কবে।
মোর ধর্ম্ম যাতে রহে তাহাই করিবে॥
পিতৃ-সত্যপালনে যে চৌদ্দ বৎসর।
বনে বাস করিবার প্রতিজ্ঞা আমার॥
গৃহ মধ্যে নাহি যাব, রাজ্য না করিব।
চৌদ্দবৎসর মাত্র বনেতে রহিব॥
কেকয়ীমাতার বাক্য (ঙ) ভরতের রাজ্য।
বনে পাঠাইয়া পিতা হইলা অধৈর্য্য॥
ক্রমে ক্রমে আদ্যোপান্ত সকলি কহিলা।
বনগমনের কথা বৃত্তান্ত জানিলা॥
শুনিতে শুনিতে গুহরাজের শরীরে।
আগুনের কণা প্রতি লোমকূপে ঝরে॥

পাঠান্তর—(ক) সুকুমারদেহ—সুকোমলদেহ।
(খ) বনে—বন।
(গ) কমলপদে—কোমলপদে।
(ঘ) ভাবিয়া—ভাবিতে বা ভাবিলে।
(ঙ) বাক্য—বাক্যে।

ক্রোধে কম্পান্বিত দেহ আরক্ত (ক) লোচন।
সাজ সাজ বলি এক দিলেক লম্ফন॥
রামচন্দ্রে বঞ্চি রাজ্য ভরত লইয়া।
বাকল পরায়্যা দিল বনে পাঠাইয়া॥
চল আজি যুদ্ধে তারে পরাভব করি।
করিব আমার মিত্রে রাজ্য-অধিকারী॥
এত কহি চতুরঙ্গ (খ) সৈন্য যে সাজিয়া।
অযোধ্যাভিমুখে চলে বিক্রম করিয়া॥
রামচন্দ্র তাহা দেখি তটস্থ হইলা।
বারণ করিতে লক্ষ্মণেরে পাঠাইলা॥
তেঁহো যাই সান্ত্বনা করিয়া গুহরাজে।
ডাকিয়া আনিলা যথা শ্রীরাম বিরাজে॥
গুহের হস্ত ধরি প্রভু অনেক বুঝান।
ভরত আমার প্রিয়, আমি তাঁর প্রাণ॥
তাঁর কিবা পিতা মাতা কারু দোষ নাই।
দৈবের ঘটনা মাত্র যত দেখ ভাই॥
অতএব শান্ত হও, চিন্তা না করহ।
পুনর্ব্বার রাজা হব নয়নে দেখিহ॥
এত কহি রামচন্দ্র বিদায় হইলা।
গুহরাজ অচেতনে ভূমেতে পড়িলা॥
পরিবার রাজ্য সহ ক্রন্দনের ধ্বনি।
মহাকোলাহল শব্দে কম্পিত মেদিনী॥
বুকে কর হানে কেহ ভূমে গড়ি যায়।
হাহাকার করিয়া লুণ্ঠয়ে গুহরায়॥
হাহা কিবা অনুরাগ চণ্ডালের গণে।
তা সভার দাস হয়্যা জন্ম নৈল কেনে॥
লোকাচারে সংকেত চণ্ডাল নাম মাত্র।
দেবতাগণের পূজ্য হয় মহাপাত্র॥
শ্রীরামবিচ্ছেদে গুহরাজ মহাশয়।
গৃহে নাহি গেলা, ভূমে পড়িয়া রহয়॥
আসন ভূষণ শয্যা আহার বিহার।
সব তেজি কৈল মাত্র রাম নাম সার॥

পাঠান্তর—(ক) আরক্ত—রকত।
(খ) চতুরঙ্গ—চতুরঙ্গিনী।

পুনরায় করে (ক) রামচন্দ্র আগমন।
হইবেক এই মাত্র দিবসগণন॥
চৌদ্দ বৎসর চৌদ্দ কল্প করি মানে।
নিরন্তর জলধারা বহয়ে নয়ানে॥
দূর্ব্বাদলশ্যামরূপময় চারিদিগে।
যে দিগে নেহারে সাধু দেখে সেই দিগে॥
রাম রাম মৈত্র হে সখা যে (খ) কোথায়।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ, নহে বাহিরায়॥
রাম রাম বলি উচ্চস্বরে গুহ কান্দে।
শ্রবণসুখদ যেন সুধা বহে চান্দে॥
এইমত চৌদ্দ বৎসর গুহরাজ।
বিহরে বিহ্বল সদা লুণ্ঠে ভূমিমাঝ॥
চৌদ্দবর্ষ-পূর্ণ-দিনে অপরাহ্নকালে।
না আইলা রামচন্দ্র অন্তর বিকলে॥
কহে যদি মোর প্রাণ না আইলা রাম।
এই শুধু (গ) দেহ তবে রাখিয়া কি কাম॥
অগ্নিতে প্রবেশ করি ছাড়ি নিজ দেহ।
আর নাহি সহে রামবিচ্ছেদবিরহ॥
তবে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি প্রবেশ-উন্মুখ।
হইতেই শুভবার্ত্তা হইল সম্মুখ॥
শ্রবণমঙ্গলধ্বনি রামনামবাণী।
আকাশ হইতে চমকিত সভে শুনি॥
গুহরাজ কহে সব অমাত্যের গণে।
দেখ ত মধুরধ্বনি আইসে কোথা হনে॥
কে মোর মৃতকদেহে পরাণ স্থাপিল (ঘ)।
অমৃতের বৃষ্টি করি অভিষেক কৈল॥
কে মোরে সাগরপাথারেতে উদ্ধারিল।
দরিদ্রজনেরে ধন জাড়ি১ (ঙ) সমর্পিল॥
চৌদিকে ধাইল সব অনুচরগণে।
আকাশ নিরিখে (চ) কেহ কেহ ধায় বনে॥

পাঠান্তর—(ক) করে—কবে।
(খ) সখা যে—সখে হে।
(গ) শুধু—ছার।
(ঘ) স্থাপিল—সোঁপিল।
(ঙ) জাড়ি—যাচি।
(চ) আকাশ নিরিখে—আকাশে নিরখে।
১। জাড়ি—জালা, বৃহৎ পাত্র।

চমক পাড়িল সভে চকিত নয়নে।
চাহিয়া রহিলা অন্য (ক) স্মৃতি নাহি মনে॥
হেনকালে সুমধুর গভীর উচ্চধ্বনি।
যেন সুধাসিন্ধু উথলিয়া আইসে জানি॥
শ্রীরাম জয়রাম জয়রাম রামগান।
উচ্চস্বরে করিয়া আইসে হনুমান্॥
হেন বুঝি হনুমান্ জগতে আশ্বাসে।
আর ভয় নাই ভাই রাম আইলা দেশে॥
ভক্তগণের বিরহ-আনল নিভাইতে।
রাম-আগমন-বাণী অমৃত সিঞ্চিতে॥
গুহরাজ প্রেমানন্দসাগরে ভাসিয়া।
মুখে নাহি আইসে বাণী দুরু দুরু হিয়া॥
ক্ষণেক সাভালি (খ) কহে কি দেখি আকাশে।
পশুর আকৃতি কিন্তু প্রকৃতি সরসে॥
রাম-প্রেমে ডগমগ ধীর-চূড়ামণি।
সাধু সাধু ধন্য ধন্য ঞিহার জননী॥
আহা কে ইনি ঞিহার বালাই লয়্যা মরি।
বুঝি মোর শ্রীরামের দূত অনুসারি॥
এত কহি গুহরাজ উদ্ধমুখ হয়্যা।
উচ্চস্বরে ডাকে তাকে (গ) কান্দিয়া কান্দিয়া॥

ত্রিপদী ছন্দ

কে তুমি হে ওহে বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
ভুবনপাবন-শিরোমণি।
ওহে ভাই ওহে পিতা, ওহে নাথ ওহে ত্রাতা,
ওহে রামচন্দ্র-প্রেমধনি (ঘ)॥
কে তুমি হে ওহে ভাই, তোমার নিছনি যাই,
বালাই লইয়া আমি মরি।
হের আইস তোমায় দেখি, হৃদয়মাঝারে রাখি,
পরাণ যথায় তথা চিরি॥

পাঠান্তর—(ক) অন্য—আত্ম।
(খ) সাভালি—সাম্ভালি (=অপেক্ষা করিয়া)।
(গ) ডাকে তাকে—কহে তবে।
(ঘ) ধনি—ধনী।

রামনাম কি শুনাইলে, কি সুধা কর্ণে ডারিলে (ক),
জুড়াইল প্রাণ মন দেহ।
জন্মে জন্মে একেবারে, কিনিয়া লইলে মোরে,
তনু মন জীবনের সহ॥
আইস আইস আইস ভাই, হৃদয় বিছায়্যা দেই,
বৈস তাহে চরণ অর্পিয়া।
কোটি জন্মের পুণ্যবারি, অঞ্জলি অঞ্জলি করি,
তাহে দিই পাদ ধোয়াইয়া॥
হনুমান্ মহামতি, হেরিয়া তাঁহার গতি,
চমৎকারে চাহিয়া রহয়।
কেবা এই মহাশয়, কিবা মতি সদাশয় (খ),
কিবা প্রেমভাবের উদয়॥
এই যে পুরুষবর, রামচন্দ্র-অনুচর,
প্রিয়তম-তমের-উত্তম।
মোদের যে অভিমান, ভকত বলিয়া জ্ঞান,
বৃথা করি আজি বুঝিলাম॥
হৃদয়মাঝারে ধরি, বালাই লইয়া মরি,
ঞিহার গুণের বলিহারি।
এই যে মহানমতি, প্রভুর ঞিহার প্রতি,
যথেষ্ট করুণা অনুসারি॥
আসিবার কালে মোরে, প্রভু গদগদ স্বরে,
কহিয়া দিলেন যত্ন করি।
গুহনামে ভিল্লরাজ, যাইতে অরণ্যমাঝ,
সম্ভাষিয়া যাবে অব্জপুরী॥
শীঘ্র যাই তার সনে, মিলিবে আনন্দ মনে,
আমি শীঘ্র আসিতেছি ক'বে।
সেই এই মহামতি, বুঝিনু প্রকৃতি প্রতি,
প্রভুর সে প্রিয়তম হবে॥
ইহা ভাবি শীঘ্রগতি, নভ হৈতে নাম্বি ক্ষিতি,
প্রেমভাবে পুলকিত হৈয়্যা।
দুই বাহু পসারিয়া, ধাইয়া তাহারে গিয়া,
আলিঙ্গিল বাহ্য পাসরিয়া (গ)॥

পাঠান্তর—(ক) ডারিলে—ঢালিলে।
(খ) সদাশয়—সদা হয়।
(গ) বাহ্য পাসরিয়া—বাহু পসারিয়া।

দোঁহে দোঁহা হৃদে ধরি, গাঢ় আলিঙ্গন করি,
মুরছিত হইয়া পড়িলা।
ক্ষণেক বিলম্বে দোঁহে, ধৈর্য্য করি (ক) গুহ কহে,
কহ মোর রাম কোথা রৈলা॥
হনুমান কহে ভাই, আর তব দুঃখ নাই,
তোমার পরাণ রামচন্দ্র।
জনক-নন্দিনী সীতা, বামপার্শ্বে শোভান্বিতা,
সহিত লক্ষ্মণ ভক্তবৃন্দ॥
পুষ্পক-বিমানোপরি, আকাশ-পথেতে হরি,
আসিতেছে এখনি পাইবে।
মনে কর যে আশ্বাস, এখনি পুরিবে আশ,
কিঞ্চিৎ বিলম্বে যে দেখিবে॥
এত শুনি গুহবরে, আনন্দ না দেহে ধরে,
পরিবার সহিত মাতিল।
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ ভুমে গড়ি যায়,
প্রেমানন্দ-উৎসব হইল॥
নানামত বাদ্য বাজে, বাহু তুলি গুহরাজে,
উদ্দন্ড নাচয়ে কুতূহলে।
উঠে পড়ে গড়ি যায়, ক্ষণে স্তব্ধ হৈয়্যা রয়,
জয়রাম শ্রীরাম ক্ষণে বলে॥
কেহ মঙ্গলাচার করে, ঘট পাতে দ্বারে দ্বারে,
কদলীর বৃক্ষ থরে থরে।
চন্দ্রাতপ শত শত, পতাকা উড়য়ে কত,
মাল্যবন্ধন মুক্তাহারে॥
দীপমালা সারি সারি, চন্দনাভিষিক্তপুরী,
ক্ষালন-লেপন-সমস্কারে[১]।
এইমত সুমঙ্গল, করি সব কোলাহল,
আনন্দেতে আপনা পাসরে॥
যে পথে আসিবে রাম, বাঞ্ছিত মনের কাম,
সেইদিগে নয়ন অর্পিয়া।
যেমন চাতকগণে, জলধর-আগমনে,
রহে সভে তেমনি চাহিয়া॥

পাঠান্তর—(ক) করি—ধরি।
১। সমস্কারে—সংস্কারে শোধনে।

হেনকালে অতিদূরে, পুষ্পক-বিমানোপরে,
ধ্বজার আভাস দৃষ্ট (ক) হৈল।
কেহ বলে দেখ অই, কেহ বলে কই কই,
কেহ বলে দেখিতে না পাইল॥
কেহ বলে অই অই, ধ্বজা দেখিয়াছি মুঞি,
কেহ কহে অই কই বল।
কিবা বালবৃদ্ধ সভে, ধাওয়াধাই মহোৎসবে,
কোলাহল নগরে পড়িল॥
হেনকালে চন্দ্রানন, সঙ্গে পারিষদগণ,
গুহরাজপুরীগিরিমাঝে।
উদয় হইলা আসি (খ), করুণা-কিরণরাশি,
রঘুবীর ভকত-সমাজে॥
গগনচান্দ্রমাকরে, বাহ্য অন্ধকার হরে,
রামচন্দ্র হৃদয়তিমিরে।
প্রেমানন্দজ্যোৎস্নাকর, বিস্তারিয়া শশধর (গ),
আমূল সহিত দূর করে॥
সহাস্য-কটাক্ষ-সুধা, জগত জনক মুদা,
বৃষ্টি করে ভিল্লরাজোপরি।
বিচ্ছেদ-বাড়বানলে, প্রেমানন্দসিন্ধুজলে,
নিভাইলা করুণা বিস্তারি॥
হৃদয়-সাগর-খাতে, প্রেমময়-বারি তাতে,
সাত্ত্বিকাদি-ভাব-ঝঞ্ঝাবাতে।
উছলি তরঙ্গ বহে, ধৈর্য্য-বেলা লঙ্ঘি তাহে,
ব্যাভিচারি[১] ফেনা উঠে তাতে॥
দয়াল পরমানন্দ, প্রেমাধীন রামচন্দ্র,
ভকতবৎসল গুণধাম।
প্রিয় ভক্তরাজ গুহ, হেরিয়া পুলকদেহ,
হৃদয়ে লইয়া প্রিয়তম॥

পাঠান্তর—(ক) আভাস দৃষ্ট—আকার দৃষ্টি।
(খ) আসি—শশী।
(গ) শশধর—শশিবর।

১। ব্যাভিচারি—শৃঙ্গার, করুণ প্রভৃতি রসে অস্থায়ী ভাবে নির্ব্বেদ, গ্লানি, নিদ্রা প্রভৃতি ত্রৈত্রিংশ প্রকার ভাব বা অবস্থা দেখা দেয়। ঐগুলিকে সঞ্চারী বা ব্যাভিচারী ভাব বলে।

গাঢ়-আলিঙ্গনে দোঁহে, প্রভু-ভৃত্যে লাগি রহে,
অশ্রুজলে দোঁহা-অঙ্গ ভিজে।
ধন্য গুহ মহাশয়, চারিদিকে জয় জয়,
কোলাহল হৈল ক্ষিতিমাঝে॥
স্বর্গ হইতে দেবগণ, করে পুষ্পবরিষণ,
চমকিতচিত্তে ঘনে ঘনে।
কহে অহো কিবা ভাগ্য, কিবা যোগ্য কি সৌভাগ্য,
এই প্রাজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনে॥
দুন্দুভিবাজন বাজে, আনন্দে অপ্সরা নাচে,
প্রশংসয় ত্রিভুবনলোক।
রাম অনুকূল যারে, কেবা নাহি পূজে তারে,
সেই করে ত্রৈলোক্য আলোক॥
কি অলভ্য তার আছে, চতুর্ব্বর্গ[১] তার পাছে,
ফিরে সেই না করে দৃক্‌পাত।
কি ধন অভাব তার, ত্রৈলোক্যের ধন সার,
প্রাপ্ত সেই রাম যার নাথ॥
প্রেমানন্দ ব্রহ্মানন্দ, সূর্য্য-আগে দিবাচন্দ্র (ক),
চন্দ্র আগে যেমন খদ্যোত।
নদ-নদী আগে যেন, পুষ্করিণীর খাত হেন,
সাগরের আগে নদীস্রোত॥
অতএব গুহরাজ, হেন প্রেমানন্দ-মাঝ,
ডুবিয়া পাথার নাহি পায়।
অমূল্য রতননিধি, দুর্লভ রতনাবধি,
রামধন পাইয়া আলয়॥
আনন্দে মগন হিয়া, কেহ আইসে জল লৈয়া,
কেহ শ্রীচরণ পাখালয়।
কেহ রাজসিংহাসন, তাহাতে কমলাসন,
পাতি তাহে (খ) প্রভুরে বসায়॥
কেহ মালাচন্দন, নানা বস্ত্র আভরণ,
কেহ মুখচন্দ্র নিরখয়।
নানা দ্রব্য মিষ্ট-অন্ন, গব্য ফল বনোৎপন্ন,
নানা মত সংস্কার করয়॥

পাঠান্তর—(ক) দিবাচন্দ্র—যেন চন্দ্র।
(খ) তাহে—তারে।

১। চতুর্ব্বর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

পারিষদগণ সহ, সমান পিরীতি স্নেহ,
সমান ভকতি সহ সভে।
ভোজন ভূষণ বাসে, করি বহু পরিতোষে,
আনন্দসাগরে ভাসি সেবে॥
সুগ্রীবাদি কপিগণ, বিভীষণ জাম্ববান,
যত পারিষদগণচয়।
গুহরাজের প্রেম দেখি, অবিরাম ঝুরে আঁখি,
পরস্পর বহু প্রশংসয়॥
ধন্য ধন্য মহাশয়, হেন প্রেম যার হয়,
জনম জীবন ধন্য ধন্য।
রামচন্দ্রে এত প্রীত, সুশীল সমতা-রীত,
সর্ব্বগুণধাম সর্ব্বমান্য॥
প্রভুর যতেক ভক্ত, সর্ব্বমধ্যে অতিরিক্ত,
এই জন প্রিয়তম হবে।
ঞিহার যে গুণ দেখি, যুড়ায় হৃদয় আঁখি,
যে হেতুক রামচন্দ্র লভে॥
সেই গুহ মহারাজ, চৌদ্দ ভুবন মাঝ,
পূজ্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেষ্ঠ (ক)।
যাহার তুলনা নাই, বেদে ত (খ) তাৎপর্য্য এই,
যার প্রিয় রামচন্দ্র ইষ্ট॥
বিধি ভব পুরন্দর, আদি-দেব-দেবী নর,
পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব কিন্নরে।
সভেই আনন্দ পায়, নিরন্তর গুণ গায়,
জয় জয় ধন্য ধন্য করে॥
জাতি কুল বিদ্যা তপ, কর্ম্ম জ্ঞান ব্রত জপ,
কিছুর অপেক্ষা নাহি করে।
শ্রীচরণ আশ্রয়, কোনমতে কেহ লয়,
সেই ত্রিপাবন-শক্তি ধরে॥
তার পদরজস্পর্শে, কোটি মহাপাপ ধ্বংসে,
ভুক্তি মুক্তি সেহ থাকু দূরে।
দুর্লভ যে হরিভক্তি, ক্ষণমাত্রে দিতে শক্তি,
হাহা (গ) কিবা মহিমা অপারে॥

পাঠান্তর—(ক) প্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ।
(খ) বেদে ত—বেদের।
(গ) হাহা—তাহা।

হরিজনের জাতি কুল, বিচারয়ে সেই মূঢ়,
ভক্ত যে যবন শ্রেষ্ঠতম।
তার সাক্ষী গুহরাজ, পাবন ভুবনমাঝ,
নহে বৃথা ব্রাহ্মণ-জনম॥

মহাভারতে—

"চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো (ক) হরিভক্তিপরায়ণঃ
হরিভক্তিবিহীনশ্চ (খ) দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥"

অনুবাদ।—হরিভক্ত চণ্ডালও মুনি হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু হরিভক্তিশূন্য ব্রাহ্মণ চণ্ডালেরও অধম।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদবাক্যম্—

"বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥"

অনুবাদ।—ব্রাহ্মণ দ্বাদশ প্রকার গুণসম্পন্ন হইয়াও যদি পদ্মনাভ শ্রীহরির চরণকমলে বিমুখ হয়, তবে সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যে চণ্ডাল মন, বাক্য, কর্ম্ম, অর্থ ও প্রাণ শ্রীহরিতে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। কারণ তিনি (সেই চণ্ডাল) নিজের বংশ পবিত্র করেন, কিন্তু সেই গুণগর্ব্বিত (প্রভূত সম্মানের অধিকারী) ব্রাহ্মণ তাহা পারেন না। (ব্রাহ্মণের ১২টি গুণ, যথা—ধন, আভিজাত্য, সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, কান্তি, প্রতাপ, বল, উদ্যম, প্রজ্ঞা, অষ্টাঙ্গ যোগ। মতান্তরে—ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপস্যা, অমাৎসর্য্য, হ্রী অর্থাৎ লজ্জা, তিতিক্ষা অর্থাৎ সহিষ্ণুতা বা ক্ষমা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি ও শ্রুত। মতান্তরে—শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব অর্থাৎ সারল্য, বিরক্ততা অর্থাৎ সংসারে বৈরাগ্য, মৌন, বিজ্ঞান অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, সন্তোষ, সত্য, আস্তিক্য।)

অথ গারুড়ে—

"ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা (গ) যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি
বর্ত্ততে।

পাঠান্তর—(ক) মুনিশ্রেষ্ঠো—মুনেঃ শ্রেষ্ঠো অথবা দ্বিজশ্রেষ্ঠো।
(খ) বিহীনশ্চ—বিহিনস্তু।
(গ) ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা—ভক্তিরষ্ট বিধিহ্যেষা।

স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ
পণ্ডিতঃ (ক)।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ॥"

অনুবাদ।—এই আট প্রকার ভক্তি যে ম্লেচ্ছেতেও বর্ত্তমান, সেই ম্লেচ্ছও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, মুনি, শ্রীমান, যতি এবং পণ্ডিত। ভক্তিরহস্য প্রভৃতি তাঁহাকেই দিবে ও তাঁহার নিকট হইতে লইবে। তিনি শ্রীহরির ন্যায় পূজনীয়।

অতএব হরিভক্তে নীচ নাহি মানো।
পরম পাবন নিজ ইষ্ট করি জানো॥
বৈষ্ণবের মহিমার সীমা নাহি হয়।
বেদাবিধি সর্ব্বশাস্ত্র ফুকরিয়া কয়॥
হরিভক্ত-মহিমাদি (খ) আরাধন-বিধি।
সহস্র প্রমাণ যার নাহিক অবধি॥
একেক অঙ্গের হয় শতেক প্রমাণ।
এক এক শ্লোকে করি দিগ্‌দরশন॥
শ্রীল-সনাতন কলিত্রাণের আচার্য্য।
হরিভক্তিবিলাস বর্ণিলা গ্রন্থ আর্য্য॥
তাহার প্রমাণে কহি কিঞ্চিত আভাস।
বিশেষ কহিনু ইহা লাগিয়া (গ) বিশ্বাস॥
বৈষ্ণবেতে জাতিবুদ্ধি যেইজন করে।
সে জন নারকী মজে দুঃখের সাগরে॥
বৈষ্ণবেরে নীচজাতি করিয়া মানয়।
নিশ্চয় যে সেই জন নরক ভুঞ্জয়॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥"

অনুবাদ।—যে ভগবানের ভক্তকে শূদ্র, ব্যাধ বা চণ্ডাল ইত্যাদি সাধারণ ভাবে জাতির বিচারে দেখে সে অবশ্যই নরকে যায়।

পাঠান্তর—(ক) স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ—স যাতি পরমাং গতিম্।
(খ) হরিভক্ত-মহিমাদি—হরিভক্তিমহিমাদি।
(গ) লাগিয়া—করিয়া।

পদ্যাবল্যাম্—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি-
বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে
শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধী-
র্যস্য বা নারকী সঃ॥"

অনুবাদ।—যে অর্চ্চনীয় নারায়ণ মূর্ত্তিকে শিলা, গুরুকে সাধারণ মানুষ, বৈষ্ণবকে শূদ্র, চণ্ডাল ইত্যাদি জাতি, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের কলিকলুষনাশক পাদোদককে (পা ধোওয়া জলকে) সামান্য জল, সর্ব্বপাপনাশক বিষ্ণুর নাম বা মন্ত্রকে সামান্য শব্দ, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অন্যান্য দেবতার সমান মনে করে সে নরকগামী হয়।

হরিভক্তি বর্ত্তে যদি ম্লেচ্ছ বা চণ্ডালে।
দানগ্রহণের পাত্র সেই বেদে বলে॥
হরিবৎ পূজিব তারে ভকতি-পূর্ব্বকে।
গারুড়াদি প্রমাণ স্বয়ং কহয়ে শ্রীমুখে॥

গারুড়ে—

"ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ॥
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ॥"

অনুবাদ—পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

"ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী (ক) মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥"

অনুবাদ।—চারি বেদে পণ্ডিত ব্যক্তিও আমার প্রিয় নহে, কিন্তু আমার প্রতি ভক্তিমান্ চণ্ডালও আমার প্রিয়। তাঁহাকে ভক্তি পূজা ইত্যাদি দান করিবে, তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানাদি গ্রহণ করিবে, আমার মত তাঁহাকে পূজা করিবে।

ভক্তে ভক্তি বিনা কৃষ্ণভক্ত-মধ্যে নহে।
স্বয়ং শ্রীমুখেতে কৃষ্ণ অর্জ্জুনেরে কহে॥

পাঠান্তর—(ক) প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী—ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী।

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥" (ক)

অনুবাদ।—হে অর্জ্জুন! যাহারা আমার ভজনা করে তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে। আমার ভক্তদের যে ভজনা করে তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

সাধুমার্গে শাস্ত্রমতে সিদ্ধান্ত সুদৃঢ়।
বৈষ্ণবের শ্রীচরণ ভজ করি দৃঢ়॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদবলিসংবাদে—

"বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবানিদং জগৎ॥
মদ্ভক্তো দুর্লভো (খ) যস্য স এব মম দুর্লভঃ (গ)।
তৎপরো দুর্লভো (ঘ) নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয়॥"

অনুবাদ।—হে অর্জ্জুন, তুমি বৈষ্ণবদিগকে ভজনা কর, অন্য দেবগণকে ভজনা করিও না। সকল বৈষ্ণবই সর্ব্ব দেবতাকে এবং সমগ্র জগৎকে পবিত্র করেন। হে ধনঞ্জয়, আমার ভক্ত যাঁহার নিকট দুর্লভ (অথবা বল্লভ= প্রিয়) তিনিও আমার নিকট দুর্লভ (অতি প্রিয়)। আমি সত্য সত্য বলিতেছি, তাহা অপেক্ষা দুর্লভ (অর্থাৎ প্রিয়) আমার কেহ নাই।

অজশক্রতুল্য নাহি করি কৃষ্ণভক্ত।
বিচার করহ গূঢ় পরমার্থতত্ত্ব॥

পাদ্মে—

"বিবুধাঃ কিং পুনঃ সর্ব্বে অজঃ শক্রো ভবেদ্ যদি।
ন কেঽপি সমতাং যান্তি কৃষ্ণভক্তস্য নারদ॥"

অনুবাদ।—হে নারদ, সকল দেবতার কথা কি বলিব, স্বয়ং ব্রহ্মা বা ইন্দ্রও কৃষ্ণভক্তের তুল্যতা প্রাপ্ত হন না।

বৈষ্ণবের পাদোদক পরম পাবন।
পান করি পুন শুচি হৈতে করে মন॥

পাঠান্তর—(ক) মম ভক্তা হি যে পার্থ ন মে ভক্তাস্তু তে জনাঃ।
মদ্ভক্তস্য তু যে ভক্তা মম ভক্তাস্তু তে মতাঃ॥
(খ) দুর্লভো—বল্লভো।
(গ) দুর্লভঃ—বল্লভঃ।
(ঘ) দুর্লভো—বল্লভো।

সেই অপরাধী (ক) ব্রহ্মহত্যার পাতকী।
তাহার প্রমাণ শাস্ত্র সৌপর্ণে[১] নিরখি॥

গারুড়ে—

"বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা।
য আচামতি সম্মোহাৎ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে॥"

অনুবাদ।—বিষ্ণুর বা ভক্তের চরণামৃত পান করিয়া যে ভ্রমবশে আচমন করে, সে ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়া কথিত হয়।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট যে সংসারের ত্রাণ।
নারদপঞ্চরাত্রসূত্র-গ্রন্থপরমাণ॥

যথা—

"বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ পরং নির্ব্বাণহেতুনা।
পরং নির্ব্বাণহেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজনম্॥"

অনুবাদ।—বৈষ্ণবকে কন্যাদান এবং বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন নির্ব্বাণের হেতু (অর্থাৎ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির উপায়)।

শ্রীভাগবতে—

"উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ।
সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ॥" ইত্যাদি

অনুবাদ।—(ব্যাসদেবের প্রতি নারদের উক্তি) আমি দ্বিজগণের অনুমতিক্রমে তাঁহার ভিক্ষাপাত্রে সংলগ্ন উচ্ছিষ্ট অন্ন একবার মাত্র ভোজন করিলাম। তা সর্ব্বপাপ মুক্ত হইলাম।

হরির প্রতিমা হন বৈষ্ণবঠাকুর।
দর্শন স্পর্শন পূজা কর্ত্তব্য প্রচুর॥
বহুভাগ্যেতে যার শ্রদ্ধা জনময়।
সুকৃতি বলিয়া তারে শ্রুতিগণ গায়॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

"স্বদর্শন-স্পর্শন-পূজনৈঃ কৃতী,
তমাংসি বিষ্ণুপ্রতিমেব বৈষ্ণবঃ।
ধুন্বন্ বসত্যত্র জনস্য যন্ন তৎ,
স্বার্থং পরং লোকহিতায় দীপবৎ॥"

পাঠান্তর—(ক) অপরাধী—অপরাধে।
১। সৌপর্ণে—গরুড় পুরাণে (সুপর্ণ=গরুড়)।

অনুবাদ।—পুণ্যবান্ বৈষ্ণব যে বিষ্ণুপ্রতিমার মত নিজ দর্শন, স্পর্শন ও পূজন দ্বারা লোকের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে সংসারে বাস করেন, তাহা তাঁহার নিজের জন্য নহে, কিন্তু প্রদীপের আলোর মত শুধুই পরহিতের জন্য।

পাদ্মে—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

অনুবাদ।—হে মহারাজ, যাহাদের পুণ্য অল্প, তাহাদের মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, নামব্রহ্মেতে এবং বৈষ্ণবে বিশ্বাস জন্মে না।

বৈষ্ণব স্মরণ যদি গৃহে বসি করে।
সদ্য সে জীবনমুক্ত সেবা রহু দূরে॥

শ্রীভাগবতে—

"যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ॥"

অনুবাদ।—যাঁহাদের (যে আপনাদের) স্মরণমাত্রই লোকের গৃহ তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া যায়, তাঁহাদের (সেই আপনাদের) দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন ও আসনাদি দ্বারা যে কি হইবে তাহা কি বলিব? (অর্থাৎ জীব যে পবিত্র হইবে তাহা বলা বাহুল্য।)

বৈষ্ণবেরে নমস্কার অষ্টাঙ্গ হইয়া।
যেই করে, সেই ধন্য শরীর ধরিয়া॥
দুর্ব্বৃত্তো বা সুবৃত্তো বা বৈষ্ণব যে জন।
অবশ্য নমস্য সেই সূতের বচন॥

সূতবাক্যম্—

"হারভাক্তরসাস্বাদমুদিতা যে নরোত্তমাঃ।
নমস্করোম্যহং তেষাং তৎসঙ্গী মুক্তিভাগ্‌যতঃ॥"
হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ।
দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেষাং নিতং নমো নমঃ॥"

অনুবাদ।—হরিভক্তিরূপ রসের আস্বাদনে যে শ্রেষ্ঠ মানবগণ প্রমুদিত (অত্যন্ত হৃষ্ট) তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম করিতেছি, কারণ তাঁহাদের সঙ্গীরাও মুক্তিলাভের অধিকারী। যাঁহারা হরিভক্তিপরায়ণ ও হরিনামে যাঁহাদের অবিচলিত নিষ্ঠা, তাঁহারা সদাচারপরায়ণ বা কদাচারপরায়ণ যাহাই হউন না কেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা নমস্কার জানাই।

বৈষ্ণবের নামে সর্ব্বপাতক নাশয়।
কৃষ্ণভক্তি জন্মে ভাগবতে বহু গায়॥
প্রাতঃকালে উঠি যেই করয়ে কীর্ত্তন।
ভারতের এক শ্লোক শুনহ প্রমাণ॥

যথা—

"নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানান্তু কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে॥"

অনুবাদ।—হে বলিরাজ, প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া যাঁহারা বৈষ্ণবদের গুণগান করেন, কলিকালে তাঁহারাই ভাগবত (ভগবদ্‌ভক্ত) এবং শ্রীকৃষ্ণের সমান।

বৈষ্ণবসেবনে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ।
চতুর্ব্বর্গ ফল ইহ না হয় আধিক্য॥
মুখ্যফল হয় মাত্র কৃষ্ণে রতি মতি।
মুক্তি তুচ্ছফল, ফল শ্রীকৃষ্ণে ভকতি॥
তবে যে কহেন শ্রুতিগণ নানাফল।
বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তির কারণ কেবল (ক)॥
অনেক প্রমাণ তাহে পুস্তক বাড়য়ে।
দুই এক শ্লোক লিখি কিঞ্চিত আশয়ে॥

ভারতবর্ষপ্রসঙ্গে—

"হরিকীর্ত্তনশীলো বা তদ্ভক্তানাং প্রিয়োঽপি বা।
শুশ্রূষুর্ব্বাপি মহতাং স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ॥"

অনুবাদ।—যিনি হরিকীর্ত্তনশীল বা তাঁহার ভক্তগণের প্রিয়, অথবা মহাপুরুষদের সেবায় অভিলাষী, তিনি আমাদের বন্দনীয়, কারণ তিনিই শ্রেষ্ঠ।

তথা চ—

"বহির্ম্মুখপ্রবৃত্ত্যৈ তৎ কিন্তু মুখ্যং ফলং রতিঃ॥"
ইতি

অনুবাদ।—(ভক্তির ফল) যাহারা বহির্ম্মুখ তাহাদিগের মনে ইহা ভক্তিমার্গে প্রবৃত্তি উৎপাদন জন্মায়, কিন্তু ইহার মুখ্য ফল রতি (অর্থাৎ প্রবল অনুরাগ)।

বৈষ্ণব দর্শনে মাত্র তৎক্ষণে পবিত্র।
মৃৎ-শিলাময়ী দেব-গঙ্গার অতিরিক্ত॥
সেবাদিকরণে পূত করেন তাঁহারা।
বৈষ্ণবদর্শনমাত্র তখনি বিজ্বরা॥

পাঠান্তর—(ক) কেবল—বিফল বিকল।





শ্রীমদ্ভাগবতে -

"ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥"

অনুবাদ।—জলময় তীর্থ এবং মৃত্তিকাময় ও শিলাময় দেববিগ্রহ বহুকালে পবিত্র করে। কিন্তু সাধুগণ দর্শন-মাত্রই পবিত্র করেন।

বৈষ্ণবের পূজা সর্ব্বপূজা হৈতে শ্রেষ্ঠ।
অন্য দেবা দূরে রহু কৃষ্ণ হৈতে ইষ্ট॥

একাদশে শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

"বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা"।
"মদ্ভক্তপূজাভ্যাধিকা"॥

অনুবাদ।—বৈষ্ণবের প্রতি বন্ধুজনের ন্যায় সৎকার বা সম্মাননা দ্বারা আমার পূজা করিবে। আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজা সর্ব্বতোভাবে অধিক।

বিনা অভিষিক্ত বৈষ্ণবের পাদরজ।
কারু স্কন্ধে সিদ্ধ নহে কভু কোন কায॥

পঞ্চমস্কন্ধে—

"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি,
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব (ক) জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা
মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥"

অনুবাদ।—হে রহূগণ, মহতের পদধূলির অভিষেক ছাড়া কেহ তপস্যা, দান, যজ্ঞ, গৃহস্থ ধর্ম, বেদপাঠ বা জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা এই বস্তু (বাসুদেব স্বরূপ বস্তু বা সিদ্ধি) লাভ করিতে পারে না।

বৈষ্ণবের সেবা করে দাস-অভিমানে।
পরম গতিকে পায় বৈকুণ্ঠভুবনে॥

তথা হি পাদ্মে-

"বিষ্ণুভক্তস্য যে দাসা বৈষ্ণবান্নভুজশ্চ যে।
তেঽপি ক্রতুভুজাং বৈশ্য! গতিং যান্তি নিরাকুলাঃ॥"

অনুবাদ।—হে বৈশ্য, যাঁহারা বিষ্ণুভক্তের দাস এবং বৈষ্ণবের অন্ন ভোজনকারী তাঁহারা নিরুদ্বেগে দেবগণের গতি লাভ করেন।

পাঠান্তর- (ক) নৈব - নাপি।

সর্ব্ব আরাধনাসার বিষ্ণু-আরাধনা।
তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের উপাসনা॥

পাদ্মে উত্তরখণ্ডে—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

অনুবাদ। হে দেবি! সমস্ত আরাধনের মধ্যে বিষ্ণুর আরাধন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহা অপেক্ষাও অধিক শ্রেষ্ঠ তাঁহার ভক্তগণের অর্চ্চনা।

ইহাতে অন্যথাবুদ্ধি নাহি কেহ কর।
এই বাক্য হৃদয়ে কবচ করি পর॥
বৈষ্ণব তেজিয়া হরি একান্ত-ভজনে।
কৃষ্ণকৃপা নাহি হয়, ভক্তে নাহি গণে॥
কৃষ্ণ না ভজিয়া মাত্র বৈষ্ণবভজনে।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি ভক্তি পাই শাস্ত্রেতে বাখানে॥
অতএব প্রযত্নেতে বৈষ্ণব পূজহ (ক)।
সর্ব্বদুঃখ পাপ-আদি (খ) হইতে তরহ॥

তথাহি শাস্ত্রান্তরে—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥"

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

পাদ্মে—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ॥"

অনুবাদ।-যে গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার ভক্তগণের অর্চ্চনা না করে, তাহাকে ভাগবত (ভগবদ্ভক্ত) বলা হয় না, তাহাকে শুধু দাম্ভিক বলিয়া মনে করা হয়। সেই জন্যই সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত সর্ব্বদা বৈষ্ণবদের পূজা করিবে। শ্রেষ্ঠ ভক্তদের পূজা দ্বারা লোকে সকল দুঃখ উত্তীর্ণ হয়।

বৈষ্ণব দেখিয়া মহা আনন্দ করিব।
কতকালের বন্ধু যেন দেখি হৃষ্ট হব॥

পাঠান্তর—(ক) পূজহ—ভজহ।
(খ) পাপ-আদি—পাপতাপ।

যাঁর কৃষ্ণে শুদ্ধভক্তি তাঁর এই রীত।
স্বাভাবিক জন্মে ভক্ত দেখিয়া পিরীত॥

একাদশে শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

"বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা"।
"মদ্ভক্তপূজাভ্যাধিকা"॥ ইতি।

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব ভোজন যার গৃহেতে করয়।
তার সঙ্গে যার সঙ্গ নিষ্পাপ সে হয়॥
কৃতান্তের অধিকার তাহাতে নাহিক।
যম নিজদূতে কহে করিয়া অধিক॥

পাদ্মে—

"বৈষ্ণবো যদ্‌গৃহে ভুঙ্‌ক্তে যেষাং বৈষ্ণব-সঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গহৃতকিল্বিষাঃ॥"

অনুবাদ।—যাঁহাদের গৃহে বৈষ্ণব ভোজন করেন, যাঁহাদের বৈষ্ণবসঙ্গ লাভ হয়, হে দূতগণ! তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, কারণ তাঁহারা বৈষ্ণবসঙ্গগুণে নিষ্পাপ।

ভক্তরসনায় কৃষ্ণ রস আস্বাদয়।
রাশীকৃত সামগ্রীতে তাদৃক্ তৃপ্ত নয়॥

ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

"নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্বৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ॥"

অনুবাদ।—হে কমলাসন (ব্রহ্মা), আমার (অর্থাৎ আমার মূর্ত্তির) সম্মুখে স্থাপিত নৈবেদ্য দেখিয়া আমি তাহা স্বীকার (অর্থাৎ গ্রহণ) করি, কিন্তু তাহার স্বাদ গ্রহণ করি ভক্তের জিহ্বাগ্র দ্বারা।

সর্ব্বত্র বৈষ্ণব পূজ্য স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
দেবতা মনুষ্য আদি যতেক অখিলে॥

নারদীয়ে—

"সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
দেবতানাং মনুষ্যাণাং তথৈবোরগরক্ষসাম্॥
যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ।
দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥"

অনুবাদ।—স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালে দেবতা, মানুষ, সর্প ও রাক্ষস—সকলের নিকটই বৈষ্ণবগণ পূজনীয়। বৈষ্ণব মহাত্মাদের স্মরণমাত্র শতলক্ষ পাপ তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাতঃকালে উঠি লয় বৈষ্ণবের নাম।
কৃষ্ণতুল্য হয় সেই সর্ব্বগুণধাম॥

মহাভারতে রাজধর্ম্মে—

"নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানান্তু কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে॥"

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবপ্রসঙ্গ হৃৎকর্ণরসায়ন।
মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণকথা অমৃতভাজন॥
অপবর্গদ্বার[১] আর শ্রদ্ধা রতি ভক্তি।
ক্রমিক জন্ময়ে হয় সুদৃঢ় আসক্তি॥

শ্রীভাগবতে—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

অনুবাদ।—(শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন) সাধুরা একত্র মিলিত হইয়া আমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদের সঙ্গ হইতে সেইসব হৃদয়রঞ্জন শ্রুতিমধুর কথা শুনিয়া শীঘ্রই মুক্তির পথস্বরূপ ভগবানের প্রতি ক্রমশঃ মনে শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও প্রেমভক্তির উদয় হয়।

বৈষ্ণবের পাদুকায় নতি পুনঃ পুনঃ।
যে প্রভাবে (ক) মিলে সাধ্য সাধন নির্গুণ॥
কর্ম্মাবলম্বন কারো আলম্বন জ্ঞান।
মো সভার বৈষ্ণবের পাদুকালম্বন॥

শ্রীমধ্বাচার্য্যস্য—

"ভগবদ্ভক্তপাদাব্জপাদুকাভ্যো নমোঽস্তু মে।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চাখিলমুত্তমম্॥" ইতি

অনুবাদ।—যাঁহাদের সঙ্গলাভই জগতে শ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য সেই ভগবদ্‌ভক্তগণের চরণপদ্মের সংলগ্ন পাদুকাকেও আমার নমস্কার।

পাঠান্তর—(ক) প্রভাবে—প্রসাদে।
১। অপবর্গদ্বার—মুক্তির উপায়।

পদ্যাবল্যাম্—

"জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্ম্মাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥" ইতি

অনুবাদ।—কেহ জ্ঞানকে কেহ বা কর্ম্মকে অবলম্বন করেন। কিন্তু আমরা শ্রীহরির দাসগণের পাদুকা অবলম্বনকারী।

দর্শন স্পর্শন-আদি করি সহবাসে।
ক্ষণমাত্র শুদ্ধ হয় যবন পুক্কশে॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

"দর্শনস্পর্শনালাপসহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশম্॥" ইতি

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ, দর্শন, স্পর্শন, আলাপ এবং সঙ্গ দ্বারা সাক্ষাৎ চণ্ডালকেও ক্ষণমাত্রে পবিত্র করেন।

হরিভক্ত পূজে যেই হরিবুদ্ধি (ক) করি।
তারে তুষ্ট ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি ত্রিপুরারি॥

তত্রৈব—

"হরিভক্তিরতান্ যস্তু হরিবুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ।
তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥" ইতি

অনুবাদ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, যিনি হরিভক্তগণকে হরিজ্ঞানে পূজা করেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন।

ভক্ত ভগবান্ স্বয়ং লোকরক্ষাহেতু।
ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ প্রাকৃতিক ন হু॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

"অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥" ইতি

অনুবাদ।—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমিই সর্ব্বদা প্রচ্ছন্নদেহে ভগবদ্ভক্তরূপে লোকসমূহকে রক্ষা করি।

হরিভক্তসঙ্গিসঙ্গ ক্ষণমাত্র হয়।
সর্ব্ব মহাপাতকাদি তৎক্ষণেতে যায়॥

বৃহন্নারদীয়ে—

"হরিভক্তিপরাণান্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাত্রতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি॥" ইতি

অনুবাদ।—যাহারা মহাপাপী তাহারাও হরিভক্তের সঙ্গীর সঙ্গমাত্র লাভ করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

বৈষ্ণবের আরাধনা অসংখ্যগণন।
পুস্তক বাড়য়ে কত করিব বর্ণন॥
কিঞ্চিত কহিল মাত্র দিগ্‌দরশন।
যেন তেন মতে করি বৈষ্ণবের গান॥
বৈষ্ণবের মহিমা কি কহিব অধিক।
বিনা বৈষ্ণবের পূজা সকলি অলীক॥
গোবিন্দ ভজয়ে যে নাহি ভজয়ে বৈষ্ণবে।
ভক্তমধ্যে নহে সেই দাম্ভিক জানিবে॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ॥"

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব সন্তান যাঁর সেই ভাগ্যবান্।
পুত্রবতী সেই নারী পিতা পুত্রবান্॥

সৌপর্ণে—

"কলৌ ভাগবতং নাম যস্য পুংসঃ প্রজায়
জননী পুত্রিণী তেন পিতৃণান্তু ধুরন্ধরঃ॥" ইতি

অনুবাদ।—কলিতে যে পুরুষের নাম ভগবৎসম্বন্ধবিশিষ্ট হয় (অর্থাৎ কৃষ্ণদাস, হরিচরণ ইত্যাদি হয়) তাহার দ্বারা মাতা পুত্রবতী (অর্থাৎ সৎপুত্রের জননী বলিয়া কথিত) হন, সেই পুরুষ পিতৃগণের ধুরন্ধর (অর্থাৎ চালক বা উদ্ধারকর্ত্তা) হয়।

দুর্লভ ভাগবত-নাম কলিতে যাঁহার।
ব্রহ্মরুদ্রপদ হৈতে উৎকৃষ্ট তাঁহার॥

তত্রৈব—

"কলৌ ভাগবতং নাম দুর্লভং নৈব লভ্যতে।
ব্রহ্মরুদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম॥" ইতি

অনুবাদ।—(ইন্দ্রের উক্তি) কলিতে ভাগবত নাম দুর্লভ বা একেবারেই লাভ করা যায় না। আচার্য্য বৃহস্পতি আমাকে বলিয়াছেন যে এই ভাগবত নাম ব্রহ্মপদ এবং রুদ্রপদ হইতে শ্রেষ্ঠ।

পাঠান্তর (ক) হরিবুদ্ধি হরিভক্তি।
১। পুক্কশে চণ্ডালে।

বৈষ্ণবের চিহ্ন যার শরীরে দেখিবে।
নিঃসন্দেহ কলিতে সে দেবতা জানিবে॥

তত্রৈব—

"যস্য (ক) ভাগবতং চিহ্নং দৃশ্যতে তু হরির্মুনে (খ)।
গীয়তে চ (গ) কলৌ দেবা জ্ঞেয়াস্তে নাস্তি (ঘ)
সংশয়ঃ॥" ইতি

অনুবাদ।—হে মুনিবর, যাঁহার শরীরে ভাগবত চিহ্ন দেখা যায় এবং যিনি হরিনাম গান করেন কলিতে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে করা হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চণ্ডাল যে হরিভক্ত ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ।
হরিভক্তিহীন যতি শ্বপচাপকৃষ্ট॥ (ঙ)

নারদীয়ে—

"শ্বপচোঽপি মহীপাল! বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো (চ) যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥"
ইতি

অনুবাদ।—হে রাজন্! বিষ্ণুর ভক্ত চণ্ডাল হইলেও ব্রাহ্মণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর বিষ্ণুভক্তি না থাকিলে যতিও চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

ইন্দ্র মহেশ্বর ব্রহ্মা সেই সে হইল।
চণ্ডাল হরির তোষ যেই জন্মাইল॥

স্কান্দে রেবাখণ্ডে—

"ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈব হি।
শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব॥"

অনুবাদ।—হে কেশব, তুমি যখন তুষ্ট হও, তখন চণ্ডালও ইন্দ্র, মহেশ্বর, ব্রহ্মা এবং পরব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকে।

সেই সর্ব্বধর্ম্মকর্ত্তা হরিভক্তিকৃতি (ছ)।
সর্ব্বপাপকর্ত্তা যেই অভক্ত দুর্ম্মতি॥

তত্রৈব—

"স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥
ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে॥"
ইতি

অনুবাদ।—হে কেশব, যিনি তোমার ভক্ত তিনি সর্ব্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী, আর যে তোমার ভক্ত নহে সে সর্ব্বপাপকারী। হে অচ্যুত, তোমার ভক্তদের দ্বারা কৃত অধর্ম্ম ও ধর্ম্ম হয়, তোমার অভক্তের দ্বারা কৃত ধর্ম্মও পাপে পরিণত হয়।

সর্ব্বধর্ম্ম করি সেই নরকেতে যায়।
হরির অভক্ত যেই জন দুরাশয়॥
সদ ব্রহ্মহত্যা যদি ভক্তেরে ঘটয়।
তভু শুদ্ধ থাকে তারা বাধা না জন্ময়॥

তত্রৈব—

"নিঃশেষধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিশুধ্যতি॥"

অনুবাদ।—হে হরি, তোমার অভক্ত সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও সর্ব্বদা নরকে বাস করে। আর তোমার ভক্ত ব্রহ্মহত্যাকারী হইলেও বিশুদ্ধ হয়।

তাবৎ সংসার ভ্রমে পিণ্ডাকাঙ্ক্ষী হয়।
যাবৎ কুলে হরিভক্ত পুত্র না জন্ময়॥ (ক)

তত্রৈব—

"তাবদ্ ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিণ্ডতৎপরাঃ।
যাবৎ কুলে ভক্তিযুক্তঃ সুতো নৈব প্রজায়তে॥"

অনুবাদ।—যে পর্য্যন্ত বংশে ভক্ত পুত্র না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডের আশায় সংসারে [illegible] করেন।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য চণ্ডাল যবন।
হরিভক্ত যেই সেই সর্ব্বোত্তমোত্তম॥

তত্রৈব—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥" ইতি

পাঠান্তর—(ক) যস্য—যেষাং।
(খ) হরির্মুনে—তনৌ মনে।
(গ) গীয়তে চ—গীয়ন্তে যে।
(ঘ) নাস্তি—নাত্র।
(ঙ) বিভক্তি (ভক্তিহীন) শ্বপচ নহে তত তাহা হইতে অপকৃষ্ট।
(চ) বিহীনো যো—বিহীনোঽপি।
(ছ) হরিভক্তিকৃতি হরিভক্তকৃতি।

পাঠান্তর (ক) তাবৎ সংসারে ভ্রমে পিণ্ডাকাঙ্ক্ষী [illegible]।
[illegible] কুলে হরিভক্ত [illegible]।

অনুবাদ।—যে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা যে-কেহ হউক না কেন, তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

হরিনাম মহাপূত যেই নীচ জাতি।
জপে, সেই পবিত্র পাবন মহামতি॥
কৃষ্ণের পিরীতি সেই সাধু জন্মাইল।
বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ জনমে কি হইল॥

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যম্ --

"নামযুক্তজনাঃ কৌচিৎ জাত্যন্তরসমন্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি মে যথা প্রীতিং ন তথা বেদপারগাঃ॥" ইতি

অনুবাদ।—আমার নামযুক্ত জন, অন্য জাতির অর্থাৎ নীচ জাতির অন্তর্গত হইলেও সে আমার যেরূপ সন্তোষ বিধান করে, বেদপারগ ব্রাহ্মণও তাহা করিতে পারেন না।

হরিভক্তিহীন যেই সেই সে চণ্ডাল।
হরিভক্ত চণ্ডাল যে ভুবনমণ্ডল॥

তত্রৈব -

"বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চাণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ॥" ইতি

অনুবাদ। যাহারা বিষ্ণুভক্তিহীন তাহারাই চণ্ডাল বলিয়া কথিত হয়। হরিভক্ত চণ্ডালগণও অবশ্যই শ্রেষ্ঠ।

বৈষ্ণব বর্ণের বাহ্য ত্রৈলোক্যপাবন।
শ্বপচসমান অবৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণ॥

তত্রৈব

"শ্বপাকমিব (ক) নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥" ইতি

অনুবাদ।—অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের মত বলিয়াও মনে করিবে না (তাহা হইতেও নিকৃষ্ট)। চতুর্ব্বর্ণের বাহিরে হইলেও (অর্থাৎ নীচ জাতি হইলেও) যে বৈষ্ণব সে ত্রিভুবন পবিত্র করে।

শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রিত পাপযোনি হয়।
স্ত্রী শূদ্র বৈশ্য আদি যে কেহ ভজয়॥
পরমপবিত্র সেই দুর্লভ যে গতি।
অনায়াসে পায়, করে বৈকুণ্ঠে বসতি॥

পাঠান্তর (ক) শ্বপাকমিব শ্বপচমিব।

শ্রীভগবদ্গীতাসু—

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥" ইতি

অনুবাদ।—হে অর্জ্জুন! স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য বা পাপযোনি (অর্থাৎ নীচ জাতি) যেই হউক না কেন, আমাকে আশ্রয় করিলে অবশ্যই পরমা গতি লাভ করে।

সর্ব্বযজ্ঞ-সর্ব্ববেদ-পারগ ব্রাহ্মণ।
হেন কোটি কোটি নহে বৈষ্ণব সমান॥
এহেন সহস্র ভক্ত করিয়া সমানে।
ঐকান্তিক এক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণে॥

গারুড়ে—

"সত্রযাজিসহস্রেভ্য সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥" ইতি

অনুবাদ।—সহস্র সত্রযাজী (সত্রযজ্ঞকারী) হইতে একজন সর্ব্ববেদান্তপারগ শ্রেষ্ঠ, কোটি সর্ব্ববেদান্ত পারদর্শী হইতে একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ আর সহস্র সহস্র বৈষ্ণব হইতে একজন ঐকান্তিক ভাবে কৃষ্ণভক্ত শ্রেষ্ঠ।

সদাচার-হীন দুরাচার যদি হয়।
অনন্যভাবেতে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥
সাধু সেই মান্য সেই সর্ব্বসারকৃত।
তাৎপর্য্য যে ব্যবসায়-নিপুণ চরিত॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াম্—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥" ইতি

অনুবাদ।—অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অন্যের ভজনা না করিয়া একান্তভাবে আমার ভজনা করে, তবে তাহাকে সাধুই মনে করিবে, কারণ তাহার সংকল্প বা চেষ্টা ঠিক (সম্যক্)।

শালগ্রামপূজা বৈষ্ণবের আবশ্যক।
স্ত্রী কিংবা শূদ্র ইহা শাস্ত্র নিয়ামক॥

পাদ্মে—

"শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন।
স চাণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ॥" ইতি

অনুবাদ।—যে শালগ্রাম শিলার পূজা না করিয়া কিছু খায়, সে কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত চণ্ডালাদির বিষ্ঠার কৃমিরূপে জন্মগ্রহণ করে।

স্কান্দে চ—

"গৌরবাচলশৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদ্যতে তস্য বৈ তনুঃ।
ন মতির্জায়তে যস্য শালগ্রামশিলার্চ্চনে॥" ইতি

অনুবাদ।—শালগ্রামশিলার পূজায় যাহার মতি না জন্মে, সে অতি উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গাগ্রদ্বারা বিদারিত হয় (অথবা পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পাতিত করিয়া তাহার দেহ বিদারিত করা হয়)।

এই দুই শ্লোক সাধারণ-ভক্তপর।
বিশেষ স্ত্রীশূদ্রভক্তপর শুন আর॥

যথা তত্রৈব—

"এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ সম্পূজ্যো ভগবৎপরৈঃ॥" ইতি

অনুবাদ।—এইরূপে শালগ্রাম শিলাস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে ভগবৎপরায়ণ ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও স্ত্রীলোক সকলেই পূজা করিবে।

তথা স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে চাতুর্ম্মাস্যব্রতে

শালগ্রামশিলার্চ্চন-প্রসঙ্গে—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥" ইতি

অনুবাদ।—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের এবং বৈষ্ণব শূদ্রগণের শালগ্রামে অধিকার আছে, অন্য কাহারও (অর্থাৎ অবৈষ্ণবের) কখনও অধিকার নাই।

তত্রৈবান্যত্র—

"স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদম্॥" ইতি

অনুবাদ।—স্ত্রীলোক, শূদ্র, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়াদি যেই হউক শালগ্রামশিলার পূজা করিয়া শাশ্বত পদ লাভ করে।

সচ্ছূদ্রপদে শূদ্রবংশে যে বৈষ্ণব।
শালগ্রামে অধিকারী ইতরে দুর্লভ॥

তবে যে নিষেধমতে বচন যে শুন।
অবৈষ্ণবপর, নহে বৈষ্ণবে কথন[1]॥

তত্র বচনং যথা--

"ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ॥
প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতামিয়াৎ॥" ইতি

অনুবাদ।—ব্রাহ্মণ শুচি বা অশুচি যাহাই হউন, আমি তাঁহার পূজ্য। স্ত্রী ও শূদ্রের হস্তের স্পর্শ আমার নিকট বজ্র হইতেও অতীব দুঃসহ। শূদ্র প্রণব অর্থাৎ ওঁ-মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, শালগ্রামশিলার পূজা করিলে বা ব্রাহ্মণী গমন করিলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।

অতএব এ বচন সামান্য উপর।
নিষেধ যে হয়, তত্র বৈষ্ণব ইতর॥
কিংবা কেহ দম্ভক্রমে বচন গঢ়িল।
গোস্বামী আচার্য্য ইহা আশঙ্কা করিল॥
হরিভক্তিবিলাসেতে শ্রীপাদ কহয়ে।
নতুবা বিরোধ শাস্ত্রান্তরমতে হয়ে॥
আর কহি শুন হরিভক্তিবিলাসেতে।
গোস্বামী শ্রীসনাতন যে কহে টীকাতে॥
"ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং" ইহার মধ্যেতে।
এব-কার হয় এব-কারের অর্থেতে॥
অন্যব্যবচ্ছেদ[2] হয় এই ত নির্ণয়।
অথচ দেখিয়ে বহুশাস্ত্রেতে কহয়॥
স্ত্রী-শূদ্র শালগ্রামপূজা অধিকারী।
ইহাতেই এ বচন কৃত্রিম বিচারি॥
এ বচন প্রমাণ যে যদ্যপি হইত।
অন্য অন্য শাস্ত্রে তবে বিধি না থাকিত (ক)॥
বিচার করিলে ইথে পণ্ডিত যে হবে।
দম্ভ-ঈর্ষা মতে নিজ মত না স্থাপিবে॥

পাঠান্তর—(ক) এ বচন যদ্যপিহ প্রামাণ্য হইত।
অন্য শাস্ত্রমতে তবে বিধি না থাকিত।

১। অনুরূপ শ্লোক (হরিভক্তিবিলাসে):
অতো নিষেধকং যদ্ যদ্ বচনং শ্রূয়তে স্ফুটম্।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

২। অন্যব্যবচ্ছেদ—আর সব কিছু বর্জ্জন করা।

পুনর্ব্বার আর শুন শাস্ত্রেতে (ক) প্রমাণে।
বৈষ্ণবী-স্ত্রী-শূদ্র অধিকারী শালগ্রামে॥

বায়ুপুরাণে—

"অযাচকঃ প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ।
পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েৎ॥
সন্ধ্যার্য্যা বৈষ্ণবৈর্যত্নাচ্ছালগ্রামশিলাঽসুবৎ।
সা চার্চ্চ্যা (খ) দ্বারকাচক্রাঙ্কিতোপেতৈব সর্ব্বদা॥"

অনুবাদ।—কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা না করিয়া পরকে অকাতরে দান করিবে, জীবিকার জন্য কৃষিকর্ম্ম করিবে, প্রতিদিন পুরাণপাঠ শ্রবণ করিবে এবং শালগ্রাম-শিলার পূজা করিবে। বৈষ্ণবগণ শালগ্রামশিলাকে প্রাণতুল্য মনে করিয়া যত্নের সহিত ধারণ করিবেন। সর্ব্বদা দ্বারকা-চক্রচিহ্নযুক্ত শালগ্রামেরই পূজা করিতে হয়।

এতেক প্রমাণশাস্ত্র বিরোধি যে বাক্য।
গ্রাহ্য নাহি হয় বহু শাস্ত্রেতে অনৈক্য॥
'ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং' ইত্যাদি বচন।
কেহ কহে শাস্ত্রের নহে দাম্ভিক-বচন॥
তস্মাৎ যে অন্য বহু শাস্ত্রের বিরোধি।
অতএব সাধুজন ইহাতে বিবাদী॥
যদি বল স্ত্রী শূদ্র বৈষ্ণব কিমাকার।
গৃহীত যে বিষ্ণুদীক্ষা বিষ্ণুপূজাপর॥
ইহার ইতর[১] সেই অবৈষ্ণবগণে।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই পণ্ডিতে বাখানে॥

প্রমাণং হরিভক্তিবিলাসে—

"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

অনুবাদ।—যিনি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিষ্ণুর পূজায় নিরত হইয়াছেন পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বৈষ্ণব বলেন, এই কারণে অন্যেরা অবৈষ্ণব।

শূদ্র-আদি অন্ত্যজ সে বৈষ্ণব যদি হয়।
শূদ্র নীচ নহে, সেই পূজ্যের আলয়॥

হরিভক্তিহীন শুদ্ধ (ক) যতি কেনে নয়।
শ্বপচ-অধিক সেই নীচ দুরাশয়॥

তথা নারদীয়ে—

"শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥"

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥"

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

নিষাদ শ্বপচ শূদ্র হরির ভকতে।
নীচ করি মানে যেই যায় নরকেতে॥
ভগবদ্ভক্ত যেই সেই শূদ্র কভু নহে।
অভক্ত ব্রাহ্মণাদিক শূদ্র শাস্ত্রে কহে॥

পাদ্মে চ—

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু (খ) ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"

অনুবাদ।—ভগবদ্‌ভক্তেরা শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবত বলিয়া কথিত। যাহারা জনার্দ্দনের ভক্ত নহে তাহারাই সর্ব্ববর্ণের মধ্যে শূদ্র।

দ্রব্যের সংযোগ কাঁসা সোণা হয় যথা।
কৃষ্ণদীক্ষামাত্র নর দ্বিজ হয় তথা॥

তথা চ তত্রৈব—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

অনুবাদ।—কাঁসা যেমন রসসংযোগে সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মানুষের দীক্ষা-বিধি দ্বারা দ্বিজত্ব লাভ হয়।

পিতৃগোত্রে যথা কন্যা অবিবাহে থাকে।
বিবাহ হইলে স্বামিগোত্রে প্রবর্ত্তকে॥
তথা বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষামাত্রে শ্রেষ্ঠ হয়।
নীচত্ব শূদ্রত্ব তেজি দ্বিজত্বকে পায়॥

পাঠান্তর—(ক) শাস্ত্রেতে—শাস্ত্রের।
(খ) সা চার্চ্চ্যা—সাভার্চ্চ্যা।
১। ইতর—অন্য, ভিন্ন।

পাঠান্তর—(ক) শুদ্ধ—যদি।
(খ) স্তে তু—স্তেঽপি।

যথা—

"পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা স্বামিগোত্রেণ গোত্রিকা।
তথা দীক্ষা-প্রভাবেণ দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

অনুবাদ।—পিতার গোত্রবিশিষ্টা কন্যা যেমন বিবাহের পর স্বামীর গোত্রে গোত্রযুক্তা হয়, সেইরূপ মানুষেরও দীক্ষার দ্বারা দ্বিজত্বপ্রাপ্তি হয়।

অতএব তৃতীয়স্কন্ধে দেবহূতিবাক্যম্—

"যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ,
যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে,
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥"

অনুবাদ।—হে ভগবান্! কদাচিৎ যে তোমার নাম শুনিলে বা গান করিলে বা তোমাকে নমস্কার করিলে চণ্ডালও তৎক্ষণাৎ সোমযাগ করিবার উপযুক্ত হয়, সেই তোমার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিলে যে পবিত্র হওয়া যায়, তাহা বলাই বাহুল্য।

বিষ্ণুর নাম আদি যদি চণ্ডালে কহয়।
যজ্ঞযজনের (ক) যোগ্য পবিত্র সে হয়॥

তথা চ হরি ভক্তিসুধোদয়ে শ্রীভগবদ্-
ব্রহ্মসংবাদে—

"তীর্থান্যশ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রাস্তথা স্বয়ম্।
মদ্ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতে তনবো মম॥"

অনুবাদ।—তীর্থসমূহ, অশ্বত্থ বৃক্ষসকল, গোসমূহ, ব্রাহ্মণগণ ও আমার ভক্তগণ এই পাঁচটিকে আমার সাক্ষাৎ দেহ মনে করিবে।

অশ্বত্থ গো-দ্বিজ-আদি ভগবানের ভক্ত।
নিজতনু হয় স্বয়ং মুখে করে ব্যক্ত॥

চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুমহারাজবর্ণনে—

পৃথু মহারাজ শক্ত্যাবেশ অবতার।
শ্রীমুখে কহিলা শুন রহস্য তাহার॥
সর্ব্বত্র শাসনে মূর্ত্তি এই দণ্ডধৃক্।
বিনে যে অচ্যুতগোত্র বৈষ্ণব সর্ব্বাধিক॥

অতএব হরিভক্ত বর্ণবাহ্য হয়।
নীচ উচ্চ জাতি সব কৃষ্ণতনুময়॥

যথা—

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥"

অনুবাদ।—ব্রাহ্মণ বংশ ভিন্ন এবং অচ্যুত গোত্র ভিন্ন (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব ভিন্ন) সর্বত্র তাঁহার আদেশ ছিল অপ্রতিহত এবং তিনি ছিলেন সপ্তদ্বীপের অদ্বিতীয় সম্রাট্ (দণ্ডধারী)।

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-স্থানে সাবধান হৈতে।
পূর্ব্বাপর কহে শাস্ত্রে দুই স্বতন্ত্রেতে (ক)॥
বিপ্র কহি পুনশ্চ বৈষ্ণব কহি যবে।
ইহাতে বুঝহ অন্যবর্ণ যে বৈষ্ণবে॥
পণ্ডিত যে হবে ইহা বুঝহ (খ) বিচারি
মূর্খ কুতার্কিকজন (গ) নহে অধিকারী॥
অবৈষ্ণব বিপ্র হৈতে দুর্জ্জাতি বৈষ্ণব
শ্রেষ্ঠতম হয় শাস্ত্রে কর অনুভব॥

শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে—

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ" ইত্যাদি।

পূর্বে সম্পূর্ণ শ্লোক ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য

অতএবোক্তং হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবতা

শ্রীহয়গ্রীবেণ পুরুষোত্তমপ্রতিষ্ঠায়াম্

"মূর্ত্তিপালায় দাতব্যা দেশিকার্দ্ধেন দক্ষিণা।
তদর্দ্ধং বৈষ্ণবানান্তু তদর্দ্ধন্তু (ঘ) দ্বিজন্মনাম্॥"

অনুবাদ।—মূর্তি রক্ষকদিগকে দক্ষিণা অর্থাৎ আচার্যের অর্দ্ধেক বৈষ্ণবদিগকে তাহার অর্দ্ধেক এবং ব্রাহ্মণদিগকে তাহার অর্দ্ধেক দিবে।

দক্ষিণাদি ভগবত সম্বন্ধে যে দ্রব্য।
বৈষ্ণবেরে দিবে ভূমা আদি হব্য কব্য॥
তাহার অর্দ্ধেক বিপ্রে করিব প্রদান।
অতএব ভগবদ ভক্ত সর্ব্বপূজাবান্॥

পাঠান্তর—(ক) যজ্ঞযজনের- যজ্ঞযাজনের।

পাঠান্তর—(ক) দুই স্বতন্ত্রেতে- দুইমত হয়।
(খ) বুঝহ- বুঝিবে।
(গ) কুতার্কিকজন- কুতার্কিকগণ।
(ঘ) তদর্দ্ধন্তু- তদর্দ্ধং তু।

তথা চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রিয়ব্রতোপাখ্যানে (ক)।

ধর্ম্মব্যাধস্যাপি শ্রীশালগ্রামশিলাপূজনমুক্তম্—

"ততঃ স বিস্মিতঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মব্যাধস্য তদ্বচঃ।
তস্থৌ স চ সমানীয় দর্শয়ামাস তাবুভৌ॥
নির্ণিক্তবসনৌ বৃদ্ধাবাসনস্থৌ নিজৌ গুরূ।
শালগ্রামশিলাঞ্চৈব তৎসমীপে সুপূজিতাম্॥"

অনুবাদ।—অনন্তর তিনি সেই ধর্ম্মব্যাধের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন। ধর্ম্মব্যাধও আসনে অধিষ্ঠিত এবং ধৌত বস্ত্র পরিহিত নিজের বৃদ্ধ গুরুদ্বয় (অর্থাৎ মাতাপিতা) এবং উক্তরূপে পূজিত শালগ্রামশিলা তাঁহার নিকট আনিয়া দেখাইলেন।

ব্যাধ কৃষ্ণভক্ত শালগ্রাম পূজা কৈলা।
ধর্ম্ম মহামুনি যাতে উপদেশ দিলা॥
অতএব ইহাতে যে অবোধ নিন্দয়।
না জানিয়া কহে কিংবা (খ) দম্ভের আশ্রয়॥
এ বিধান কৈল যেই তাহা আচ্ছাদন।
অতএব সকল দেশে করয়ে যাজন॥
মধ্যদেশে দক্ষিণ দেশের দেখ রীত।
সব বৈষ্ণবেতে শালগ্রাম সুপূজিত॥
সম্প্রদায় মধ্যে ইহা হয় পূর্ব্বাপর।
অতএব সাধুমার্গ শাস্ত্র অনুসার॥
অবশ্যকর্ত্তব্য বৈষ্ণবের শিলাপূজা।
পরম সিদ্ধান্ত এই ইথে নাহি দুজা॥
কলিভবরোগে শ্রীলক্ষ্মণ আচার্য্য।
নিরপেক্ষ সদ্গুণশালি (গ) সকলের আর্য্য॥
সনাতন সনাতনধর্ম্ম সিদ্ধ প্রসিদ্ধ
এপথ সন্দর্শি পরমার্থপথে বদ্ধ॥
বিচার করিয়া নিরূপিলা শুদ্ধ মত।
পরমার্থ তত্ত্ব যাহা নিরোধোপেত (ঘ)॥
প্রচার করিয়া কৈলা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত।
ইহার অন্যথা কহে যে না জানে অন্ত॥

এবং শ্রীমদ্ভাগবত আদির পঠন
বৈষ্ণব উপরে নাহি নিষেধবচন॥
স্বধর্ম্মযাজন বিধিনিষেধ শতেক।
বৈষ্ণব ইতর-পর অন্যান্য (ক) যতেক॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্" ইত্যাদিবচনৈঃ।

অনুবাদ।—হে রাজন্! ইনি দেবর্ষিগণ, ভূতগণ, আত্মীয়কুটুম্বগণ, পিতৃপুরুষগণ কাহারও কিঙ্কর নহেন বা কাহারও নিকট ঋণী নহেন।

কর্ম্মপরিত্যাগে বৈষ্ণবের নাহি দোষ।
কভু (খ) অধিকার নাহি যাতে হরিতোষ॥

তত্রৈব—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

অনুবাদ। যে পর্য্যন্ত বৈরাগ্যের উদয় না হয় অথবা যে পর্য্যন্ত আমার কথাশ্রবণ ইত্যাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে সেই পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে।

করণেও বিরুদ্ধ ব্যভিচার দোষ হয়।
অনন্যভক্তিহানি শাস্ত্রের নির্ণয়॥

শ্রীগীতায়াম্—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে" ইত্যাদি।

পূর্ব্বশ্লোক ও অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য

ইত্যাদি অনেক বিধি প্রমাণ আছয়।
কতেক লিখিতে পারি পুস্তক বাড়য়॥
অতেব শ্বপচ শূদ্রকুলে যে বৈষ্ণব।
নীচ শূদ্র নহে সেই পরম দুর্লভ॥
সদ্গুরু আশ্রয় বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা মাত্র।
যেই কেহ নয় কেনে পরম পবিত্র॥

পাঠান্তর (ক) প্রিয়ব্রতোপাখ্যানে — ধর্ম্মব্যাধোপাখ্যানে।
(খ) কিংবা — কিবা।
(গ) সদ্গুণশালি — শুদ্ধশালি।
(ঘ) নিরোধোপেত — নিরোধোপেত।
মুদ্রা [illegible] ২

পাঠান্তর (ক) অন্যান্য — অন্য।
(খ) কভু — কর্ম্ম।

যথা—

"ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা" ইত্যাদি।
(পূর্ণশ্লোক ও অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।)
"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ" ইত্যাদি।
(পূর্ণশ্লোক ও অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।)

"সংকীর্ণযোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে।
ম্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"
"স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥"
"অশ্বত্থ-তুলসী-ধাত্রী-গো-ভূমিসুর-বৈষ্ণবাঃ।
পূজিতাঃ প্রণতা (ক) ধ্যাতাঃ ক্ষপয়ন্তি নৃণামঘম্॥"
"সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণা (খ) গাবো বৈষ্ণবাঃ (গ) খং-মরুজ্জলম্।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে॥"

অনুবাদ।—মধুসূদনের ভক্তেরা বর্ণসঙ্কর হইলেও পবিত্র। জনার্দ্দনের অভক্তেরা কুলীন হইলেও ম্লেচ্ছতুল্য। হে কেশব, তোমার ভক্ত সর্ব্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী. হে অচ্যুত, তোমার অভক্ত সর্ব্বপাপকারী। অশ্বত্থ, তুলসী, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের পূজা, প্রণাম ও ধ্যান করিলে ইঁহারা মানুষের সকল পাপ ক্ষয় করেন। হে ভদ্র. সূর্য্য, অগ্নি, গো, ব্রাহ্মণ. বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল. ভূমি, আত্মা ও সকল প্রাণী এই এগারটি পদার্থ আমার পূজার উৎকৃষ্ট আধার বা অধিষ্ঠান।

পূজার আধার হন বৈষ্ণবঠাকুর।
নীচ উচ্চ বিচার সে রহু বহুদূর॥
শালগ্রাম-পূজা-আদি তাহে কি বিচার।
যাঁহার চরণ-স্পর্শে সংসার-নিবার১॥
অকারণে প্রত্যবায়২ অধিক ত আর।
আচার্য্য সিদ্ধান্ত কৈলা করিয়া বিচার॥
শ্রীরূপ সনাতন জগত আচার্য্য।
এবং সর্ব্বাচার্য্য আর সর্ব্বসাধুবর্য্য॥

পাঠান্তর—(ক) প্রণতা—নমিতা।
(খ) র্ব্রাহ্মণা—ব্রাহ্মণো।
(গ) বৈষ্ণবাঃ—বৈষ্ণবঃ।
১। সংসার-নিবার—সংসার অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্তি।
২। প্রত্যবায়—পাপ।

সভার সম্মত শাস্ত্রবেদ অনুসারে।
লোকনিস্তারের হেতু করিলা বিচারে (ক)॥
অতএব দৃঢ় হৈল সিদ্ধান্ত বিচারে।
বুঝিবে সুবোধ, নাহি বুঝিবে ইতরে॥
ইথে যেই অভাগিয়া বৈষ্ণব নিন্দয়।
নীচ জ্ঞান করি জাতি-কুল বিচারয়॥
এ সব সিদ্ধান্তে যেই হেয় বুদ্ধি করে।
বৈষ্ণব-চরণরজ নাহি ধরে শিরে॥
বৈষ্ণব-চরণে দাসবুদ্ধি না করিল।
তবে বজ্রাঘাত তার শিরেতে পড়িল॥
শ্রীল নাভাজীর মনপ্রীতের লাগিয়া।
তাঁহার অন্তরগূঢ় আশয় বুঝিয়া॥
বৈষ্ণবমহিমা কিছু বাহুল্য লাগিয়া।
কথোগুলি শ্লোক লিখিল সুপ্রমাণ দিয়া॥
ইহাতে যে ভালমন্দ বিচারিতে নারি।
অপরাধ না লবেন দাস অঙ্গীকরি॥
হে হে (খ) শ্রীল নাভাজীউ কটাক্ষ করহ।
শ্রীচরণ লালদাসমস্তকে ধরহ॥
বৈষ্ণবমহিমামৃত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
লক্ষ লক্ষ কহিবারে কার শক্তি হয়॥
প্রসিদ্ধ জগতে ইহা কহিয়া কি ফল।
তথাপিহ প্রয়োজন আছয়ে প্রবল॥
দাম্ভিক অবোধ কুতার্কিক দুরাশয়ে।
নিন্দুক পাষণ্ডী জনার হিতের লাগিয়ে॥
দ্বিতীয় কারণ বৈষ্ণবের গুণগান।
কোন ছলে করি যদি পদে দেন স্থান॥
সাধুকৃপা সুকৃতি যে বিনা কোনমতে।
কখন বিশ্বাস নহে হরির ভকতে॥

পাদ্মে—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্! বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"
অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

পাঠান্তর—(ক) বিচারে—বিস্তারে।
(খ) হে হে—ওহে।

—হরিভক্তি অঙ্গ যে অন্বয়-ব্যতিরেকে[১]।
চৌষট্টি প্রকার যে প্রসিদ্ধ সর্ব্বলোকে॥
বৈষ্ণবের আরাধনা সেইমত হয়।
তার মধ্যে যে যে অঙ্গ সম্ভাবনা লয়॥
তাহার প্রমাণ আর বৈষ্ণবমহিমা।
রসামৃত-সিন্ধুগ্রন্থ সিদ্ধান্তের (ক) সীমা॥
আরাধনবিধি পূর্ব্বে প্রমাণ কহিল।
দিগ্দরশনমাত্র সীমা না পাইল॥
কৃষ্ণ হৈতে কৃষ্ণভক্তে অধিক পূজিব।
তাৎপর্য্য-অর্থ ইথে ত্রুটি না করিব॥
বৈষ্ণবের মহিমা কে কহিবারে পারে।
শ্রীল শঙ্কর বিনা ইহা অন্য অগোচরে॥
ইহাতে সন্দেহ কিবা দেখহ (খ) বিচারি।
ভক্তিমিশ্র বিনা জ্ঞানি-কর্ম্মি-আদি করি॥
ফল নাহি পায় কভু (গ) স্থূল তুষ কুটে[২]।
ভক্তিমিশ্র হৈলে মুক্তি আদি করপুটে[৩]॥

শ্রীদশমে—

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

অনুবাদ। হে বিভু! যাহারা অন্তঃসারশূন্য তুষকে আঘাত করে তাহাদের যেমন শ্রম ব্যর্থ হয়, তেমনি কল্যাণ লাভের উপায়স্বরূপ তোমার ভক্তিকে যাহারা বাদ দিয়া কেবল জ্ঞান লাভের চেষ্টা করেন, তাঁহাদের শ্রমও ব্যর্থ হয়। (কষ্টই সার হয়)।

প্রার্থনা করিয়া সুর-মুনি যাহা কহে।
দিলেও সে হরিভক্ত নাহি ফিরে চাহে॥

তত্রৈব—

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

অনুবাদ।—সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে বাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সামীপ্য (আমার নিকটে অবস্থান), সারূপ্য (আমার সমান রূপ), একত্ব (সাযুজ্য, আমার সহিত অভিন্নতা)- এই পাঁচ প্রকারের মুক্তি দান করিলেও ভক্তজনেরা আমার সেবা ভিন্ন তাহা গ্রহণ করে না।

হেন যে ভকতি যার দেবতার পূজ্য।
যোগি-যতি-তপি-আদি সকলের আর্য্য॥
সেহ দূরে থাকুক, যেই ভক্তিতে প্রবর্ত্ত।
কিঞ্চিত ভকতি কিন্তু কর্ম্মেতে নিবর্ত্ত॥
জ্ঞানের যে পরিপাকে কর্ম্ম যায় ক্ষয়।
সে জন জীবন্মুক্ত প্রবর্ত্তেই হয়॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াম্—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥"

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

অতএব প্রবর্ত্ত সাধক ভক্ত যেঁহ।
সকলের পূজ্য তেঁহো ইথে কি সন্দেহ॥
তাহাও থাকুক দূরে শুনহ রহস্য।
প্রসিদ্ধ জগতে ইহা গান করে বিশ্ব॥
বৈষ্ণব যাহার কুলে গর্ভে জনময়।
তার পিতৃলোক যদি নরকে থাকয়॥
নরক (ক) হইতে উঠি আস্ফোটন করে।
মোর বংশে বৈষ্ণব জন্মিবে (খ) অতঃপরে॥
সংসারের দুঃখ আর নাহিক ভুঞ্জিব।
বালক জন্মিবামাত্র সবে মুক্ত হব॥

পাঠান্তর—(ক) সিদ্ধান্তের মহিমার।
(খ) দেখহ—দেখন।
(গ) কভু—যথা।

১। অন্বয়-ব্যতিরেকে—বিধি ও নিষেধ দ্বারা। কোন পদার্থের থাকায় অন্য পদার্থের থাকার নাম অন্বয়, কোন পদার্থের না থাকায় অন্য পদার্থের না থাকার নাম ব্যতিরেক। যেমন ধর্ম্ম আছে বলিয়াই জগৎ আছে (অন্বয়); ধর্ম্ম না থাকিলে জগৎ থাকে না (ব্যতিরেক)।

২। স্থূল তুষ কুটে—ভিতরের শস্যকণার বদলে স্থূল খোসা কুটে; কিন্তু তাহাতে শস্যকণা নাই বলিয়া, শ্রম বৃথা হয়।

৩। মুক্তি আদি করপুটে—অতি সহজেই মুক্তি ইত্যাদি লাভ হয়।

পাঠান্তর—(ক) নরক—নরকে।
(খ) জন্মিবে—জন্মিব।

অথ সম্প্রদাপ্রকরণ।

সম্প্রদায়ী সদ্গুরুর চরণ-আশ্রয়।
লবামাত্র কর্ম্ম ছুটে পবিত্র সে হয়॥
শ্রীকৃষ্ণে নিষ্কাম-প্রেমভক্তি উপজায়।
ইহার প্রমাণ শত কত কহা যায়॥
কিঞ্চিত কহিব মাত্র দিগ্দরশন।
সাধুমার্গ শাস্ত্রমতে দিয়া যে প্রমাণ॥
সম্প্রদাবিহীন যেই বৈষ্ণবাভিমানী।
শাস্ত্রের প্রমাণে তারে বৈষ্ণবে না গণি॥
কোটিকল্পে তার সিদ্ধি (ক) কভু নাহি হয়।
সেই মন্ত্র নিষ্ফল যে জানিহ নিশ্চয়॥

পাদ্মে তথা গৌতমীয়তন্ত্রে তথা স্থানান্তরে—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈর্নসিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি॥"

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবসম্প্রদা চারি প্রসিদ্ধ ভুবনে।
শ্রী মাধবী রুদ্র আর সনক বিধানে॥

পাদ্মে—

"কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-মাধবী-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবা ভুবি পাবকাঃ॥"

অনুবাদ।—কলিতে অবশ্যই পৃথিবীতে শ্রী, মাধবী, রুদ্র ও সনক এই চারিটি পবিত্রতা সম্পাদনকারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইবে।

অবৈষ্ণবস্থানে যদি বিষ্ণুমন্ত্র লয়।
নরকগমন সেই পশ্চাতে করয়॥
ভ্রমে যদি করে পুন বৈষ্ণব গুরুতে (খ)।
দীক্ষা করিবেক সেই শাস্ত্রবিধিমতে॥

নারদপঞ্চরাত্রে তথা যামলে হরিভক্তি-
বিলাস-গ্রন্থ-প্রসিদ্ধঃ—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্ (গ) বৈষ্ণবাদ্-
গুরোঃ॥"

অনুবাদ।—অবৈষ্ণব কর্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা নরকে যাইতে হয়। সুতরাং পুনরায় সম্যক্‌ভাবে বিধিমত বৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

পাদ্মোত্তরখণ্ডে মহাদেব উবাচ—

"ন্যাসে বাপ্যর্চ্চনে বাপি মন্ত্রমেকান্তমাশ্রয়েৎ (ক)।
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ ন পরা গতিঃ॥
অবৈষ্ণবোপদিষ্টং চেৎ (খ) পূর্ব্বমন্ত্রবরদ্বয়ম্।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ বৈষ্ণবাদ্গ্রাহয়েন্মনুম্ (গ)॥"

অনুবাদ।—ন্যাস-ক্রিয়াতেই হউক বা পূজাতেই হউক, একান্তভাবে মন্ত্র আশ্রয় করিবে। কিন্তু অবৈষ্ণবের দ্বারা উপদিষ্ট মন্ত্রে পরমা গতি লাভ হয় না। পূর্ব্বের দুইটি শ্রেষ্ঠ মন্ত্র (লক্ষ্মী মন্ত্র ও নারায়ণ মন্ত্র) যদি অবৈষ্ণবের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া থাকে তবে বৈষ্ণবের নিকট হইতে বিধিমত পুনরায় সেই মন্ত্র গ্রহণ করাইবে।

মহাকুলোদ্ভব সর্ব্বযজ্ঞেতে দীক্ষিত।
নিগমসহস্রশাখা যদ্যপি পঠিত॥
হেন যে ব্রাহ্মণ যদি অবৈষ্ণব হন।
গুরু নাহি হন তাঁরা (ঘ) করিলে বরণ॥

তত্রৈব—

"মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥"

অনুবাদ।—উচ্চবংশে জন্মিয়াও সকল যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াও এবং সহস্র শাখা অধ্যয়ন করিয়াও অবৈষ্ণব গুরু হইতে পারেন না।

পুনশ্চ পাদ্মে

"সহস্রশাখাধ্যায়ী চ সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
কুলে মহতি জাতোঽপি ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
যস্তু মন্ত্রদ্বয়ং সম্যগধ্যাপয়তি বৈষ্ণবঃ।
স আচার্য্যস্তু বিজ্ঞেয়ো ভববন্ধবিদারকঃ॥"

অনুবাদ।—সহস্র শাখা অধ্যয়ন করিয়া, সকল যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া এবং উচ্চ কুলে জন্মলাভ করিয়াও অবৈষ্ণব গুরু হইতে পারেন না। যে বৈষ্ণব দুইটি মন্ত্র (ন্যাস

পাঠান্তর—(ক) সিদ্ধি—সিদ্ধ।
(খ) বৈষ্ণব গুরুতে—বৈষ্ণবগুরুত্বে।
(গ) গ্রাহয়েদ্—গৃহ্ণীয়াদ্।

পাঠান্তর—(ক) মন্ত্রমেকান্তমাশ্রয়েৎ—মন্ত্রমেকম্ সমাশ্রয়েৎ।
(খ) চেৎ—সতঃ
(গ) বৈষ্ণবাদ্গ্রাহয়েন্মনুম্—গৃহ্ণীত বৈষ্ণবাৎ সুধীঃ
(ঘ) তাঁরা—তেঁহো।

মন্ত্র ও অষ্টাক্ষর মন্ত্র) সম্যক্‌ভাবে অধ্যাপন করেন, তাঁহাকেই সংসারবন্ধন মোচনকারী আচার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে।

অবৈষ্ণবে বিষ্ণুমন্ত্র লৈলে কি হইবে।
ভক্তি যে বর্দ্ধিষ্ণু নহে যাহাতে তরিবে॥

নারদপঞ্চরাত্রে—

"গৃহ্লাতি ভক্তো ভক্ত্যা চ কৃষ্ণমন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণবাৎ।
অবৈষ্ণবাদ্‌ গৃহীত্বা চ হরিভক্তির্ন বর্দ্ধতে॥"

অনুবাদ।—ভক্ত ভক্তির সহিত বৈষ্ণবের নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, অবৈষ্ণবের নিকট হইতে মন্ত্র লইলে হরিভক্তি বর্দ্ধিত হয় না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে

"বিষ্ণুভক্তিবিহীনাচ্চ ভক্তিহীনো ভবেন্নরঃ।
শৈবাৎ শাক্তাদ্‌ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তির্ন বর্দ্ধতে॥"

অনুবাদ।—নর বিষ্ণুভক্তিবিহীন লোকের নিকট হইতে মন্ত্র লইলে মানুষ ভক্তিহীন হয়। আর শৈব ও শাক্তের নিকট হইতে মন্ত্র লইলে বিষ্ণুভক্তি বর্দ্ধিত হয় না।

কালীতন্ত্রে—

"ন চ শাক্তাৎ ন শৈবাচ্চ গৃহ্লীয়াদ্‌ বৈষ্ণবাদ্‌ দ্বিজাৎ।
শাক্তাৎ শৈবাৎ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তির্ন জায়তে॥"

অনুবাদ।—যে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে, শাক্তের বা শৈবের নিকট হইতে নহে। শাক্ত ও শৈবের নিকট মন্ত্র লইলে হরিভক্তি জন্মে না।

দেবীপুরাণে—

"শৈবঃ সৌরো গাণপত্যঃ শাক্তঃ শাঙ্কর এব চ।
বর্জ্জয়েচ্চ প্রযত্নেন সর্ব্বজ্ঞমপি নাস্তিকম্‌॥"

অনুবাদ।—[illegible] শৈব, সৌর (সূর্য্যের উপাসক), গাণপত্য (গণেশের উপাসক), শাক্ত এবং শঙ্করমতাবলম্বী সকলেই সযত্নে বর্জ্জন করিবে।

শৈব সৌর শাক্ত আদি বর্জ্জন করিয়া।
বিষ্ণুমন্ত্র লইবেক বৈষ্ণব জানিয়া॥
বিপর্য্যয়-পথ যদি গুরু শিষ্য হয়।
কোথা আরাধনা তার ভক্তির উদয়॥

পাদ্মে—

"বিপর্য্যয়ে চ বর্ত্মে চ গুরুশিষ্যে যদি ক্বচিৎ।
কথমারাধ্যতে ইষ্টং কথং তদ্ভক্তিসুস্থিরম্‌॥"

অনুবাদ।—গুরু এবং শিষ্যের পথ (অর্থাৎ সাধন পথ) যদি বিপরীত হয়, তাহা হইলে শিষ্য কিরূপে ইষ্টদেবতার আরাধনা করিবে এবং কিরূপে সেই ইষ্টদেব তাহার ভক্তিতে অন্তঃকরণে স্থিরভাবে অবস্থান করিবেন?

এ প্রমাণ বহু হয় কতেক লিখিব।
কৃষ্ণভক্তি ইচ্ছে যেই বিচার করিব॥
সদ্‌গুরু শব্দেতে সম্প্রদায়ীকে বুঝায়।
সৎ-শব্দে নিত্য ইহা অভিধান হয়॥
সম্প্রদায় গুরুপরম্পরা যে প্রণালী।
নিত্য তার ধ্বংস নাহি আসিতেছে চলি॥
সেই প্রণালীতে গুরু যেই জন হন।
সদ্‌গুরু বলিয়া হয় তাঁহার আখ্যান॥
পূর্ব্বে যে কহিল সম্প্রদায়-উপদেশ।
বিনা যে নিষ্ফল তার ধর্ম্মের নাহি লেশ॥
তাহা বিনে বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ যে নহিল।
তবে যে বৈষ্ণব বলি যতেক কহিল॥
তাহাতে জানিবে সম্প্রদায়ী হন তেঁহ।
নতুবা বিরোধ হয় পূর্ব্বাপর সহ॥
অতএব যেঁহো সম্প্রদোপদিষ্ট হন।
বৈষ্ণব-শব্দেতে শাস্ত্রে তাঁহারে কহেন॥
সর্ব্ব যে লক্ষণে হীন আচার্য্য হয়েন।
যদি বিষ্ণুপরায়ণ ভকতি বহেন॥
সেই সে দুর্লভ তেঁহো সদ্‌গুরু হয়েন।
সত্য সত্য করি পুনঃ শাস্ত্রেতে কহেন॥

দেবীপুরাণে—

"সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি আচার্য্যঃ স ভবিষ্যতি।
যস্য বিষ্ণৌ পরা ভক্তির্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ।
স এব সদ্‌গুরুর্জ্ঞেয়ঃ সত্যমেতদ্‌ বদামি তে॥"

অনুবাদ।—যাঁহার বিষ্ণুতে এবং নিজ গুরুতে পরমা ভক্তি আছে তিনি সর্ব্বলক্ষণহীন হইয়াও আচার্য্য (গুরু) হইবেন। তোমাকে সত্যই বলিতেছি, তাঁহাকেই সদ্‌গুরু বলিয়া [illegible] হইবে।

চারি সম্প্রদায় ক্রম হয় শাস্ত্রসিদ্ধ।
অনাদি-ব্যবহারে দেখ লোকেতে প্রসিদ্ধ॥
আর দেখ চমৎকার সম্প্রদোপদিষ্ট।
অনন্যভাবেতে (ক) হয় ইষ্টভক্তিনিষ্ঠ॥
অসম্প্রদায়ী জন যেই কৃষ্ণমন্ত্র যজে।
নিষ্ঠা দূরে রহু নাহি জানে কারে ভজে॥
সর্ব্ব দেব (খ) জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি সমান জানে।
নানাকর্ম্ম করি আপনারে সাধু মানে॥
বিচার করিয়া দেখ পূর্ব্বাপর-ক্রমে।
সদ্‌গুরু আশ্রয় বিনে পথান্তর ভ্রমে॥
গুরু সকলের মূল সভার প্রকৃতি।
ভুক্তি-মুক্তি-দাতা আর কৃষ্ণে ভক্তি রতি॥
যেমন আশ্রয় যার তেমতি সে হয়।
এক 'দোঁহা' তার দৃষ্ট মহাজনে কয়॥

[দোঁহা—হিন্দী]

জল-বরোবর মীন রহে, জাতি বুঝকে বুদ্ধি।
জাকো যৈছে গুরু মিলে, তাকো তৈছে সিদ্ধি॥
অতএব সাধুমার্গ শাস্ত্রমত যজ।
বৈষ্ণবের পথ লও, সদ্‌গুরুকে ভজ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিন এক করি জানো।
আপনারে নীচ অপরাধী করি মানো॥
তরুবত সহিষ্ণুতা আপনেতে করো।
অমানী আর মানদান সদাই বিচারো॥

যথা—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

অনুবাদ।—তৃণ হইতেও নীচ বা নত এবং বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হইয়া নিজে অমানী অর্থাৎ অভিমান শূন্য হইয়া এবং স[illegible] সম্মান দিয়া সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিতে হইবে।

যে জনার হরিভক্তি অকিঞ্চনা হয়।
অসংখ্য মহিমা তাঁর কহা নাহি যায়॥

সকল দেবতা সর্ব্বগুণের সহিত।
তাঁহার শরীরে বৈসে হৈয়্যা আনন্দিত॥
হরি অভক্ত জনে সদ্‌গুণ কোথায়।
ইন্দ্রিয়-সুখের হেতু ইথি উথি ধায়॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

অনুবাদ।—ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চন অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তি আছে, তাঁহার অন্তরে দেবগণ সর্ব্বদা সকল গুণের সহিত অবস্থান করেন। কিন্তু যে হরিভক্তিহীন এবং ভক্তির বাহিরে বিষয়সুখ বা মুক্তিরূপ অসৎ বস্তুর প্রতি ধাবিত হইতেছে তাহার মধ্যে প্রেমাদিকের প্রভৃতি মহৎ গুণ কিরূপে সম্ভব হয়?

সামান্যত বৈষ্ণব আকার কহি শুন।
পূর্ব্বে কহিয়াছি তথাপিহ কহি পুনঃ॥
"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

"বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকশ্চ স এব বৈষ্ণবো দ্বিজ।" ইত্যাদি

অনুবাদ।—হে দ্বিজ, যিনি বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক তিনিই বৈষ্ণব।

সম্প্রদায়ী শব্দ যদি এ শ্লোকে না হয়।
তথাপি জানিবে সম্প্রদায়ীর আশ্রয়
পুঁথি দেখি মন্ত্র উপাসনা নাহি হয়।
ইহাতে জানিবে তেঁহো সদ্‌গুরু আশ্রয়॥
বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা করি ভক্ত্যঙ্গ যজয়।
সেই জন বৈষ্ণবেতে জানিহ নিশ্চয়॥
ইহার ইতর যত অবৈষ্ণবগণ।
কিন্তু সম্প্রদায়ী তেঁহো বৈষ্ণব না হন॥
যতেক কহিল এত অভিধান হয়।
বৈষ্ণব-অপরাধে কিন্তু সব নাশ যায়॥
বৈষ্ণবেতে অপরাধে সর্ব্বনাশ হয়।
আয়ু-শ্রী-যশোধর্ম্ম লোকাশিষ ক্ষয়॥

পাঠান্তর—(ক) অনন্যভাবেতে—অনন্যভাবেতে।
(খ) দেব—বেদ।

আর যত শ্রেয় (ক) কোটি জন্মের সঞ্চয়।
অধিক কি কব (খ) কৃষ্ণভক্তি দূরে যায়॥
"আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥"

অনুবাদ।—মহৎ লোককে অতিক্রম অর্থাৎ অবজ্ঞা করিলে তাহাতে পুরুষের আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম, স্বর্গ প্রভৃতি লোক, আশিষ অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তু এবং সকল প্রকার কল্যাণ নষ্ট হয়।

বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই মূঢ়মতি।
পিতৃসহ রৌরবেতে ভুঞ্জয়ে দুর্গতি॥

স্কান্দে—

"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে॥"

অনুবাদ।—যে মূর্খেরা মহাপ্রাণ বৈষ্ণবদের নিন্দা করে তাহারা পিতৃপুরুষদের সঙ্গে মহারৌরব নামক নরকে [illegible] হয়।

বৈষ্ণব দেখিয়া যেই সম্মান নাহি করে।
আসন হইতে উঠি প্রণয় আদরে॥
দাম্ভিক সে জন সে নিন্দিত ভ্রষ্টমতি।
অচিরাতে হয় সেই নরকে অতিথি॥

পাদ্মে—

"বৈষ্ণবং জনমালোক্য নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ।
প্রণয়াদরতো বিপ্র! স নরো নরকাতিথিঃ (গ)॥"

অনুবাদ।—হে বিপ্র! যে বৈষ্ণব জনকে দেখিয়া প্রীতিভরে এবং আদরের সহিত অভ্যুত্থান না করে (উঠিয়া না দাঁড়ায়) সে নরকের অতিথি (নরকগামী) হয়।

সদ্‌গুরু আশ্রয় কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবন।
এই ধন্য নরদেহ করিয়া ধারণ॥
অন্বয় ব্যতিরেক মতে বৈষ্ণবমহিমা।
প্রসঙ্গে কহিল কিছু সিদ্ধান্তচন্দ্রিমা॥
সম্প্রদায় সৎ-প্রণালী আগে ত কহিব।
লালদাস পাদরজ মাগিয়া (ঘ) লইব॥

পাঠান্তর—(ক) শ্রেয়—শ্রেষ্ঠ।
(খ) অধিক কি কব—আর কি কহিব।
(গ) স নরো নরকাতিথিঃ—স ভবেন্নরকাতিথিঃ।
(ঘ) মাগিয়া—মাঙ্গিয়া।

চরিত্র শ্রীনবযোগেন্দ্র (ক)

নমি (খ) নব যোগেশ্বর যা-সভা-পাদুকা।
পরমশরণ্য যেই ভবাব্ধির নৌকা॥
কবি হরি করভাজন আর অন্তরীক্ষ।
চমস প্রবুদ্ধ আর পিপ্পল সুদক্ষ॥
দ্রুমিলাদি জগজন-তাপবিমোচন।
ভুবনে বিতরে কৃষ্ণভক্তি জ্ঞানাঞ্জন॥

ভক্তিমহিমাকথন

নববিধা ভক্তি যেই যাজন করয়।
তার-শ্রীচরণরেণু পরম উপায়॥
নব অঙ্গ দূরে রহু, এক অঙ্গ ভজে।
পরম ধামকে পায়, মায়াবন্ধ তেজে॥
শ্রবণে শ্রীপরীক্ষিত, কীর্ত্তনে শ্রীব্যাস (গ)।
স্মরণে প্রহ্লাদ, অর্চ্চনে পৃথুমহাযশ (ঘ)॥
কমলা চরণ সেবি, বন্দনে অক্রুর।
শুদ্ধদাস্যরস-অঙ্গে পায় কপীশ্বর॥
সখ্যে পার্থ, আত্মনিবেদনে বলিরাজ।
এক এক অঙ্গে ভজি সাধে নিজ কাজ॥

যথা—

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে (ঙ)
লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ,
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥"

অনুবাদ।—শ্রীবিষ্ণুর নামগুণ ইত্যাদি শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে ব্যাসসুত শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, চরণসেবনে লক্ষ্মী দেবী, পূজনে পৃথু, বন্দনে অক্রুর, দাস্যে কপিপতি হনুমান্, সখ্যে অর্জ্জুন এবং দেহসমন্বিত আত্মনিবেদনে বলিরাজ ইঁহাদের সকলেরই সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

পাঠান্তর—(ক) যোগেন্দ্র—যোগেশ্বর।
(খ) নমি—নিমি।
(গ) শ্রীব্যাস—শ্রীশুক।
(ঘ) পৃথুমহাযশ—পৃথুরাজক (ক ও খ পাঠান্তর পরবর্ত্তীকালে কাহারও কৃত মনে হয়)।
(ঙ) তদঙ্ঘ্রি ভজনে—তথাঙ্‌ঘ্রিভজনে।

ভগবান যার বশ তার নামগুণে।
ত্রৈলোক্য পবিত্র সেই পূজ্য ত্রিভুবনে॥

ভক্তি-অঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

অনুবাদ।—শ্রীবিষ্ণুর নাম-গুণাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, তাঁহার চরণসেবা, তাঁহার অর্চ্চনা ও বন্দনা (স্তবস্তুতি), দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন (নিজেকে সর্ব্বতোভাবে সঁপিয়া দেওয়া)—এই হইল নববিধা ভক্তি।

চরিত্র শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজার

রাজা পরীক্ষিত, ভুবনে বিদিত,
মহিমা অপার যাঁর।
যাঁর যশ গুণ, করিয়া বাখান,
তরয়ে এ তিন সংসার॥
অহো (ক) অদ্ভুত, শুনি চমকিত,
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে।
গর্ভের ভিতরে, শ্যামল-সুন্দরে,
দেখা দিলা রক্ষা-ছলে॥
সেই হৈতে হিয়া, উচ্চাটন হৈয়া,
কি দেখিনু কিবা সেই।
তেমন না দেখি, সচঞ্চল আঁখি,
সভা-মুখ নেহারই॥
এই বা সে হয়, বিতর্ক করয়,
যার তার পানে চাহি।
সেই অভ্যাসেতে, যার যে মনেতে,
কহিতে শকতি নাহি (খ)॥
গুণের সাগর, কিবা চমৎকার,
কহিতে বিরমে মতি।
শ্রীল-শুকমুনি, সাধুশিরোমণি,
পূজিত ত্রৈলোক্যে অতি॥
অব্যাহত গতি, এক স্থানে স্থিতি
গো-দোহন-কাল নহে।
হেন সে যদ্যপি, স্বভাব (ক) তথাপি,
রাজার গুণেতে মোহে॥
সপ্ত দিবানিশি, একাসনে বসি,
আনন্দে মগন হিয়া।
শ্রীল-ভাগবত, নৃপের সহিত,
আস্বাদেন বন্ধু পায়্যা॥
রাজা মহামতি, অই রসে মাতি,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে।
প্রেমানন্দামৃত, অন্তরে পূরিত
কি করিব দ্বন্দ্ব বাদে॥
কর্ম্মী জ্ঞানী তপী, চারিদিগে ব্যাপি
ভক্তিমর্ম্ম নাহি বুঝে।
তাহা নৃপবরে, বুঝিয়া অন্তরে,
তা সভা বুঝাবা কাজে॥
নাহি বুঝিলাম, হেন করি ভাণ,
প্রশ্ন করে পুনঃ পুন।
পুন সে গোসাঞি, ব্যক্ত করি তাই,
কহে বুঝে অন্য জন॥
রাজা পরীক্ষিত, ত্রিজগত হিত,
করিলেন অনায়াসে।
যাঁহার আদরে, শুক মুনিবরে,
ভাগবত পরকাশে॥
তাঁহার চরিতে, কে পারে কহিতে
তাহে মুঞি ছারমতি।
টীকার আভাস, নৃপগুণযশ,
কহি যে কিঞ্চিত রীতি॥
তাঁহার চরণে, যদ্যপি কখনে,
কোন সুকৃতির ফলে।
ভক্তি উপজায়, তবে সে জুয়ায়,
বর্ণিতে গুণ-সঙ্কুলে॥

পাঠান্তর—(ক) অহো—হেন।
(খ) নাহি—গাহি।

পাঠান্তর (ক) স্বভাব—সভাব

লালদাস চিতে, চরণ-অমৃতে,
কুমতি-বিষ ঘুচাও।
প্রভু ভৃত্য দুহুঁ, কৃপা করি পহুঁ,
অন্তরে উদয় হও॥

চরিত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামীর

শুকদেব মুনিবর, তুলনা নাহিক যাঁর,
ত্রিজগত চৌদ্দ ভুবনে।
পূজ্যবর্গে সাধুমার্গে, সমতা সদ্‌গুণ বিজ্ঞে,
যাঁর সম না হয় বাখানে॥
কৃষ্ণভক্তচূড়ামণি, বেদের মঙ্গলধ্বনি,
ফুকারিয়া গায় উচ্চনাদে।
যাহা শুনি সব লোকে, তরয়ে সংসারদুখে,
দ্বন্দ্বধর্ম্ম না করে বিবাদে॥
যাঁর নাম গুণ যশ, পরম কৌতুকরস,
যারে বেদ্য সেই জানে স্বাদ।
ভুবন মঙ্গলধ্বনি, পরানন্দবিস্তারিণী,
ইতর রসের করে বাদ॥
সেই সে রসেতে ভক্ত, তার প্রেমে অনুরক্ত,
গুণ কত কহনে না যায়।
কৃষ্ণপাদ-পদ্মমধু, মন মত্তভৃঙ্গ লুব্ধ,
দিবানিশি তাহাতে চরায় (ক)॥
নিশিদিন (খ) স্ফূর্ত্তি নাহি, কিবা করি কিবা কহি,
কেবা মুক্তি নাহিক সন্ধান।
মদিরা মদান্ধ যেন, নিজদেহে জ্ঞানহীন,
তেমতি প্রেমান্ধ মতিমান্॥
কিবা সে রহস্য কথা, গর্ভ হৈতে কেবা কোথা,
নাড়ীসহ ভূমিষ্ঠ হইয়া।
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া মন, তৎক্ষণাৎ সুগমন
পিতা মাতা উপেক্ষা করিয়া॥

পাঠান্তর (ক) চরায়—চরয়।
(খ) নিশিদিন—[illegible]

চলিতে পথ নাহি হেরে, নদী কিবা সরোবরে,
কিংবা বৃক্ষ পর্ব্বত সম্মুখে।
ঐমনি চলিয়া যায়, কেহ নাহি বাধে তায়,
হরিজনে কেহ নাহি রোখে॥
জল স্থলময় হয়, গিরি-বৃক্ষ-আদি-চয়,
দোফাল হইয়া পথ দেয়।
আনল শীতল হয়ে (ক), বায়ু মৃদু মৃদু বহে (খ),
শীত বর্ষা স্বভাব তেজয়॥
নবকঞ্জ[1] সুনয়ানে (গ), ধারা বহে অবিরামে,
নীলবরণ শুভ (ঘ) তনু।
যেন নব কাদম্বিনী, নির্ঝরে ঝরয়ে (ঙ) পানি,
হুহুংকার সুগর্জ্জন জনু॥
প্রলম্ব সুবাহুদ্বয়, আজানু দুলিয়া যায়,
করিশুণ্ড যেন লক্‌লকে।
অর্দ্ধ-উন্মীলিত আঁখি, প্রদোষে সুধাংশু দেখি,
পদ্ম যেন মুদিত উন্মুখে॥
দরশন চমৎকার, গুণের নাহিক পার,
রূপ-গুণে (চ) অতুল সংসারে।
ত্রিজগতে এক ধন্য, এক শ্রেষ্ঠ এক মান্য,
পূজ্যের পূজ্যতম-তমোত্তরে[2]॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রত জপ, জ্ঞান যজ্ঞ যোগ (ছ) তপ,
আদি করি পুরুষার্থ যতেক।
ত্রিজগতে উচ্চাগিরি, সভাই আশ্রয় করি,
সাধু করি মানে পরতেক॥
হরিভক্তি মহারাণী, তাঁর দাস দাসী মানি,
সেই উচ্চাগিরি লোকে আর্য্য।
আপন সেবকগণে, শক্ত নহে ফলদানে,
বিনা দেবী সকলি অগ্রাহ্য॥

পাঠান্তর— (ক) অনল শীতল হয়ে—অনল শীতল হয়।
(খ) বহে—বয়।
(গ) সুনয়ানে—দু-নয়নে।
(ঘ) শুভ—শুদ্ধ।
(ঙ) ঝরয়ে—ধবয়ে।
(চ) রূপ-গুণে—রূপে-গুণে। (ছ) যোগ—জপ।
১। নবকঞ্জ—নূতন পদ্ম।
২। পূজ্যতম-তমোত্তরে—এখানে তম ও তর প্রত্যয়ে আরও 'অধিক পূজ্য' বুঝাইতেছে।

ভক্তিদেবী মুখপানে, করি থাকে নিরীক্ষণে,
ঠাকুরাণী শুভদৃষ্টি কৈলে।
সেবকেরে ফল দিব, নহে সব ব্যর্থ হব,
গীতোপনিষদে ইহা বলে॥
অতএব হরিভক্তি, বিনা মিশ্র নহে শক্তি,
কোন সাধনের ফলদানে।
আপনি স্বতন্ত্র হন, সর্ব্বফলে শক্তিবান্ (ক),
চিদ্ঘনস্বরূপ বেদে ভণে॥
সেই দেবীর প্রিয়ধাম, শুকদেব অভিরাম,
সম্যক্ প্রকারে যাতে স্থিতি।
অভিন্ন কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি, তাঁর ধাম তাঁর শক্তি,
শক্তি শক্তিবানে (খ) এক রীতি॥
অতএব ভক্ত ভক্তি, কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি,
শক্তি শক্তিবানেতে (গ) অভেদ।
যে হেতুক কৃষ্ণভক্ত, ভক্তে যেই (ঘ) অনুরক্ত,
সেই কৃষ্ণ বিশেষে (ঙ) শুকদেব॥

পাঠান্তর—(ক) শক্তিবান্—শক্তিমান্।
(খ) শক্তিবানে—শক্তিমানে।
(গ) শক্তিবানেতে—শক্তিমানেতে।
(ঘ) ভক্তে যেই—ভক্তি যাতে।
(ঙ) সেই কৃষ্ণ বিশেষে—অতএব কৃষ্ণ তুল্য।

কলি ভব-কারাগার, নাহি যাহে পারাবার,
ঘোর তিমির অগেয়ান।
তাহে বন্দী জীবগণ, হেরিয়া কাতর মন,
করিলা যে উপায় সৃজন॥
শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র, কলিজয় মহা-অস্ত্র,
প্রকাশিলা সদয় হৃদয়।
তাহা যে আশ্রয় করি, সিন্ধুমধ্যে যেন তরি,
পাইয়া উত্তরে[১] দুঃখচয়॥
তাঁহার চরণরেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
স্মরণ ভজন নমস্কারে।
কৃষ্ণভক্তি রহু দূরে (ক), সংসার নাহিক তরে,
ধর্ম্ম অর্থ সেহ না সঞ্চারে॥
লালদাস ধিক্ মতি, তাঁহার চরণে রতি,
হেন কৃষ্ণ ভকতি বিহীনে (খ)।
হেন দিন কবে হব (গ), তাঁহার শরণ লব (ঘ),
অনুরাগ হইবে সে ধনে (ঙ)॥

পাঠান্তর—(ক) রহু দূরে—বহু দূরে।
(খ) হেন কৃষ্ণ ভকতি বিহীনে—হীনকৃষ্ণভক্তিনিধি মাগে।
(গ) হব—হবে। (ঘ) শরণ লব—করুণা লবে।
(ঙ) অনুরাগ হইবে সে ধনে—সে ধনে হইবে অনুরাগে।
১। উত্তরে—উত্তীর্ণ হয়, পার হয়।

ইতি শ্রীভক্তমালে পুরু-ইক্ষ্বাকু-আদি-গুণকথনং তথা ভক্তসেবা-অঙ্গ তথা ভক্তিদেবী-গুণকীর্ত্তনং নাম ষষ্ঠমালা॥ ৬॥

সপ্তম মালা

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

———

চরিত্র শ্রীপ্রহ্লাদ (ক) ভক্তরাজের

প্রহ্লাদের (খ) গুণগান পরম অদ্ভুত।
যাঁর গুণে বশীভূত প্রভু যে অচ্যুত॥
অহো কি আশ্চর্য্য কথা কিবা চমৎকার।
যাঁর অনুরোধে প্রভু হৈলা অবতার॥
লক্ষ্মী-শিব-ব্রহ্মা-আদি ভয়ে পলাইয়া।
প্রহ্লাদের (গ) অঙ্গ স্নেহে চাটিতে লাগিলা॥
অগ্নি জল বিষ আদি হৈতে রক্ষা কৈলা।
যাঁর সঙ্গে শিশুগণ বৈষ্ণব হইলা॥
পরম অদ্ভুত কথা প্রহ্লাদ-চরিত্র (ঘ)।
শ্রবণসুখদ হয় জগত (ঙ) পবিত্র॥
বিস্তারি (চ) বর্ণিতে তাহা নাহিক শকতি।
কিঞ্চিত কহিব মাত্র যথাবুদ্ধিমতি॥
রচনার ভাল মন্দ না কর্য বিচার।
পবিত্র কথন বলি কর্য অঙ্গীকার॥
নাভাজীর বর্ণন আর প্রিয়াজীর টীকা।
সংক্ষেপে কহিলা কিন্তু অমৃত অধিকা॥
কিঞ্চিত বিস্তার করি কহিবারে চাহি।
চান্দ ধরিবারে মতি (ছ) কীটসম নহি॥
অতএব যথাশক্তি যথাবুদ্ধিমতি।
কহি যে পবিত্র হেতু আপন প্রকৃতি॥

হিরণ্যকশিপু অতি দুর্দ্দান্ত অসুর।
ভয়ে কম্পকম্পান্বিত হয় তিন পুর॥
আপনা ঈশ্বর মানে ভগবত-দ্বেষ্টা।
বিষ্ণুরে মারিব বলি করে মূঢ় চেষ্টা॥
তাহার বনিতা নাম কয়াধু সুশীলা।
তাহার সদ্‌গুণ ভাগবতে বাখানিলা॥
কৃষ্ণভক্ত মধ্যে তেঁহো ভাগবত-শ্রেষ্ঠ।
সুশীলা সুধীরা সম শান্ত দান্ত শিষ্ট॥
ইন্দ্র যবে হরণ করিয়া লঞা গেলা।
নারদের বাক্যে দেবরাজ চমকিলা॥
কৃষ্ণভক্তা কয়াধু সে আরাধ্য স্বভাবে (ক)।
দ্বিতীয় পরমভাগবত ইঁহার গর্ব্ভে (খ)॥
তাহা শুনি দেবরাজ সঙ্কোচিত হৈয়া।
পূজিলা তাঁহারে অতি ভকতি করিয়া॥
নমস্কার প্রদক্ষিণ স্তুতি নুতি (গ) করি।
পাঠাইয়া দিলা তারে আপন নগরী॥
কয়াধুর গুণ কত (ঘ) না যায় বর্ণন।
যাঁর গর্ব্ভে জন্মিলেন প্রহ্লাদ-রতন॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে রতি (ঙ) গোপনে রাখয়।
বহির্ম্মুখ স্বামী পাছে জানে দুরাশয়॥
তেঁহো রত্নগর্ভা তাঁর জঠর-সাগরে।
দুর্লভ অমূল্য রত্ন জন্মিলা অন্তরে॥
প্রহ্লাদ (চ) মহানুভব পৃথিবীর রত্ন।
সেই আঢ্য যেই করে তাঁর পদে যত্ন॥
শ্রীল-শ্রীমন্নারদ গোস্বামী মহাশয়।
জগতের গুরু ভক্ত্যাবেশ দয়াময়॥
অন্তরে জানিলা কয়াধুর শুভগর্ভে।
লীলাহেতু নৃসিংহের অবতারপর্ব্বে॥

———

পাঠান্তর—(ক) শ্রীপ্রহ্লাদ—শ্রীপ্রহ্যাদ।
(খ) (গ) প্রহ্লাদের—প্রহ্যাদের।
(ঘ) প্রহ্লাদ-চরিত্র—প্রহ্যাদ-চরিত্র।
(ঙ) জগত—পরম।
(চ) বিস্তারি—বিস্তার।
(ছ) মতি—চাহি।

পাঠান্তর—(ক) স্বভাবে—সভারে।
(খ) গর্ব্ভে—গর্ব্ভেরে।
(গ) নুতি—নতি।
(ঘ) কত—যত।
(ঙ) রতি—মতি। (চ) প্রহ্লাদ—প্রহ্যাদ।

জন্মিলা মহান্ এক পুরুষ-রতন।
যাঁর বাধ্য ভগবান্ জগত-কারণ॥
জানিয়া আইলা ঋষি কয়াধুর স্থানে।
ভাগবত শাস্ত্র ইষ্টগোষ্ঠী১ অনুক্ষণে॥
গর্ব্ভের ভিতরে থাকি শুনেন প্রহ্লাদ (ক)।
আনন্দে মগন সাধু প্রেমে অবসাদ॥
সময়েতে গর্ভ হৈতে ভূমিষ্ঠ হইলা।
রাহুগ্রস্ত হৈতে যেন চন্দ্র প্রকাশিলা॥
মঙ্গলসূচক দশদিগেতে ব্যাপিল।
ত্রৈলোক্যের অমঙ্গল আজু হৈতে গেল॥
প্রহ্লাদের (খ) স্বাভাবিক কৃষ্ণপদে রতি।
বাল্য হৈতে মহান্তের বিষয়ে বিরতি॥
অন্য অন্য বালক অন্য অন্য ক্রীড়া করে।
প্রহ্লাদ (গ) মৃন্মূর্ত্তি করি পূজয়ে কৃষ্ণেরে॥
ভোজনের কালে মাতা খাইতে ডাকয়।
না যাব এখন কহে সেবা নাহি হয়॥
অন্যোন্য (ঘ) বালক নাচে ধূলি উড়াইয়া।
প্রহ্লাদ (ঙ) নাচয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে বলিয়া॥
হিরণ্যকশিপু রাজা ভগবত-দ্বেষ্টা (চ)।
প্রসিদ্ধ সবাই জানে তাহার কুচেষ্টা॥
প্রহ্লাদের (ছ) সুধারা শ্রীকৃষ্ণভক্তি দেখি।
বিপর্য্যয় মানে রাজা কোপে রক্ত আঁখি॥
তাড়ন ভর্ৎসন করে বালক-উপরে।
হাঁরে শিশু ও নাম শিখাল কেবা (জ) তোরে॥
মারিবারে ধায় মহা তর্জ্জন করিয়া।
শিশু মৌনে রহে কৃষ্ণে মন সমর্পিয়া॥
কয়াধু সুমতি পুত্রে বিরলে লইয়া।
গোপতে বুঝান মুখচুম্বন করিয়া॥
তোমার বালাই যাই ওরে মোর স্তন্য।
তুমি হেন পুত্র মোর গর্ভে ধন্য ধন্য॥

পিতা তব মূঢ়মতি তাড়ন করয়।
তাহাতে কি ভয় যার শ্রীকৃষ্ণ সহায়॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে দৃঢ়মতি যার রহে।
অচ্ছেদ্য অভেদ্য সেই সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
অতএব আমার পরাণ-পুতলিয়া।
কৃষ্ণ নাহি ভুল, ভজ একান্ত করিয়া॥
গদগদ ভাবে মহা-আনন্দে প্রহ্লাদ (ক)।
কান্দয়ে ধরিয়া সাধু মাতার দুইপাদ॥
ধন্য সে জননী তুমি যাতে কৃষ্ণভক্তা।
হেন উপদেশ দেয় সেই সত্য মাতা॥
বিধাতা সদয় মোরে কত ভাগ্য কৈনু।
কোটি জন্ম পুণ্যে তব গর্ভে জনমিনু॥
কথোক দিবসে রাজা পুত্রে পড়াইতে।
সোঁপিলা পণ্ডিত শণ্ডামর্ক (খ) গুরুহস্তে॥
শণ্ডামর্ক (খ) প্রহ্লাদে (গ) লইয়া নিজালয়।
অন্যোন্য (ঘ) বালক সহ যতনে পড়ায়॥
প্রহ্লাদ (ঙ) অনন্যচেতা তাহে নাহি মন।
কেবল চিন্তয়ে মাত্র কৃষ্ণের চরণ॥
গুরুর সমীপে ততক্ষণ মৌনে থাকে।
তেঁহো স্থানান্তর গেলে 'কৃষ্ণ' বলি ডাকে॥
কথোদিন পরে রাজা পুত্রে বোলাইলা।
শণ্ডামর্ক (চ) শিশু সহ রাজ স্থানে আইলা॥
প্রহ্লাদের (ছ) সৌন্দর্য্যে রাজা স্নেহে মগন হৈয়া।
চুম্বন করয়ে মুখ ক্রোড়ে বসাইয়া॥
রাজা কহে বৎস কহ কি বিদ্যা পড়িলে।
কোন্ বিদ্যা শ্রেষ্ঠ কিবা অভ্যাস করিলে॥
প্রহ্লাদ (জ) কহেন পিতা সকলি অনর্থ।
বিদ্যা তপ জ্ঞান (ঝ) সব কৃষ্ণ বিনা ব্যর্থ॥
সেই বিদ্যা হয় সর্ব্ববিদ্যামধ্যে শ্রেষ্ঠ।
যাতে কৃষ্ণে মতি জন্মে সেই সে উৎকৃষ্ট॥

পাঠান্তর—(ক) (গ) (ঙ) প্রহ্লাদ—প্রহ্‌লাদ।
(খ) (ছ) প্রহ্লাদের—প্রহ্‌লাদের।
(ঘ) অন্যোন্য—অন্যান্য।
(চ) ভগবত-দ্বেষ্টা—ভাগবত-দ্বেষ্টা।
(জ) কেবা—কেরে।
১। ইষ্টগোষ্ঠী—অভিমত বিষয়ে কথাবার্ত্তা।

পাঠান্তর—(ক) (ঙ) (জ) প্রহ্লাদ—প্রহ্‌লাদ।
(খ) (চ) শণ্ডামর্ক—ষণ্ডমর্ক।
(গ) প্রহ্লাদে—প্রহ্‌লাদে।
(ঘ) অন্যোন্য—অন্যান্য।
(ছ) প্রহ্লাদের—প্রহ্‌লাদের।
(ঝ) জ্ঞান—জপ।

অতএব কৃষ্ণনাম বিদ্যাচূড়ামণি।
ইহা বিনে (ক) আর যত অর্থে না বাখানি॥
তাহা শুনি রাজা কোপে অগ্নি সম জ্বলে।
কোলে হৈতে প্রহ্লাদেরে† টান মারি ফেলে॥
জ্বলন্ত আনল (খ) যেন দুই চক্ষু জ্বলে।
শণ্ডামর্ক পানে চাহে যেন কালানলে॥
কোপে কহে আরে (গ) বটু কি বিদ্যা পড়ালি।
আমার শত্রুর নাম বালকে শিখালি॥
কম্পিত হৃদয়ে শণ্ডামর্ক তবে কহে।
আমি নাহি শিখাই মহারাজ কভু নহে॥
কি জানি কাহার স্থানে শিখে দুষ্টমতি।
বৃথা মহারাজ রুষ্ট হও মোর প্রতি॥
অতঃপর সমুচিত করিব উহার।
ও নাম পুনশ্চ যেন না কহয়ে আর॥
এত বলি শণ্ডামর্ক পুন লয়্যা গেলা।
গৃহে যায় প্রহ্লাদেরে অনেক ভর্ৎসিলা॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রহ্লাদের মন চরে।
তাহা নাহি শুনে যেন ঝিল্লী ডাকে দূরে॥
সমূহ বালক সনে পড়াইতে বসাইলা।
কৃষ্ণ-কথাহীন যেই শাস্ত্র পাঠ দিলা॥
অক্ষরে অক্ষরে শিশুর কৃষ্ণ পড়ে মনে।
উদ্দীপন হয় (ঘ) প্রেমধারা দুনয়নে॥
শণ্ডামর্ক উঠি যবে (ঙ) কর্ম্মান্তরে যায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তবে উঠিয়া নাচয়॥
অন্যোন্য (চ) বালকগণ চমকিয়া চাহে।
সভে মিলি প্রহ্লাদেরে ধীরে ধীরে কহে॥
প্রহ্লাদ রে ভাই কহ কান্দ কি লাগিয়া।
কি নাম করিয়া নাচ উন্মত্ত হইয়া॥

পাঠান্তর (ক) ইহা বিনে—ইহা ভিন্ন।
(খ) আনল—অনল।
(গ) আরে—হাঁরে।
(ঘ) হয়—হয়ে।
(ঙ) যবে—তবে।
(চ) অন্যোন্য—অন্যান্য।

†সর্ব্বত্র প্রহ্লাদ স্থানে প্রহ্যাদ এবং শণ্ডামর্ক স্থানে ষণ্ডামর্ক পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

সদা অন্যমনা থাক, কি ভাব অন্তরে।
কি স্মর, কি জপ, কহ আমা-সভাকারে॥
অহে কি আশ্চর্য্য সাধুসঙ্গের মহিমা।
বেদে না কহিতে পারে যে মহিমার (ক) সীমা॥
ক্ষণমাত্র প্রহ্লাদের দর্শন প্রভাবে।
দ্রবিল সভার মন ফিরি গেল তবে॥
হেন বুঝি বিধি ভবসাগরতরঙ্গে।
তরি আনি দিলা রঙ্গে প্রহ্লাদের সঙ্গে॥
প্রহ্লাদ কহেন ভাই শুন মন দিয়া।
যে ভাবি যে জপি তাহা কহি বিবরিয়া॥
কৃষ্ণ যে সুখের নিধি সুখের অবধি।
মোর চিত্ত ভাসে সেই সুখজলনিধি॥
পাথারে ভাসিয়া মুঞি নাহি পাই পার।
ডুবিনু না জানি তাহে ধৈরয সাঁতার॥
ভুবনমোহন রূপে গুণে মন ঝুরে।
যার চিত্তে লাগে (খ) তার সব (গ) যায় দূরে॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম গৃহ বিত্ত (ঘ) স্বজন বান্ধব।
ছাড়িয়া করয়ে পান চরণ-আসব॥
তৃষিত চাতক মোর মন কৃষ্ণবারি।
ধারাপথে রথে আশাচঞ্চু যে পসারি॥
বিদ্যা ধন মান গ্রাম্যসুখ রাজ্যসম্পদ।
দূরে ত্যাগ কর ভাই বলবীর্য্যমদ॥
ভজ ভাই শ্রীকৃষ্ণচরণ সুখরাশি।
খসায় (ঙ) গলার দৃঢ় সংসারের ফাঁসি॥
প্রেমানন্দসুখ পাবে বন্ধন ছুটিবে।
বিষয়-কদর্য্যসুখ-বাসনা যাইবে॥
শিশুগণ কহে ভাই সংসারের সুখ।
জন্মে জন্মে ভুঞ্জি যে কিবা তার দুখ॥
নানা শুভকর্ম্ম করি স্বর্গাদি ভুঞ্জিব।
পুনর্জ্জন্ম হয় পুন সৎকর্ম্ম করিব॥
ইথে কেনে নিন্দ মৃত্যু আর পুনর্ভব[১]।
শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়া ভাই কি ধন পাইব॥

পাঠান্তর (ক) যে মহিমার—মহিমার।
(খ) লাগে—জাগে।
(গ) সব—স্বভাব। (ঘ) বিত্ত—বৃত্তি।
(ঙ) খসায়—খসাও।
১। পুনর্ভব—পুনর্জ্জন্ম।

প্রহ্লাদ কহেন ভাই এই যে কহিলে।
অতি নীচ বাক্য ইহা অগ্রাহ্য ভূতলে॥
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন মন দিয়া।
অজ্ঞান যাইবে দূরে, প্রকাশিবে হিয়া॥
ত্রিবিধা প্রকৃতি লোক সংসারেতে হয়।
তম-রজ সত্ত্ব গুণে জগতে ভ্রময়॥
তমাধিক্য লোক পাপ শঠমতি হয়।
রজাধিক্য কর্ম্মপরা সুখ ইচ্ছাময়॥
সত্ত্বের প্রাধান্যে শম-দম-তপ-মতি।
কিন্তু কৃষ্ণভক্তি বিনে সকলি দুর্গতি॥
কৃষ্ণভক্তি নির্গুণ নির্গুণজনে হয়।
ধর্ম্ম কর্ম্ম তপে সে না দৃক্‌পাত করয়॥
কর্ম্মী নানাকর্ম্ম করি শলাঘা যে করয়।
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মূঢ় তত্ত্ব না জানয়॥
পরমার্থ নাহি জানে ফিরে দুরাশয়ে।
কাহারে ভজয়ে মূঢ় কি ধন লাগিয়ে॥
সর্ব্বধনের ধন কৃষ্ণ ত্রিজগতে হয়।
কি ধন লাগিয়া মূঢ় অন্যেরে ভজয়॥
অন্য ধর্ম্মকর্ম্মে ভাই যে কহিলে সুখ।
সেই সুখ ব্যর্থ কেবল দুঃখের উন্মুখ॥
স্বর্গ আর নরক ভাই একুই সমান।
যেই তত্ত্ব জানে নাহি করে বস্তুজ্ঞান॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

"স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥"

অনুবাদ।—কৃষ্ণভক্ত স্বর্গ, অপবর্গ (মোক্ষ) এবং নরক একই রূপ মনে করেন।

সাযুজ্য সুখদ করি মানয়ে ইতর।
ভক্তিবিপর্য্যয় ভক্ত করয়ে ধিক্কার॥
সংসারের ভয়ে মাত্র পলাইয়া বাঁচে।
ভক্তিরসে হীন মূঢ় পস্‌তায় পাছে॥
পুনরায় ভক্তিপ্রাপ্তি হইয়া কচিৎ।
কৃষ্ণ পায় পূর্ব্বভক্তিমিশ্রফলোচিত॥
সেই যে নির্ব্বাণ সেহ ভক্তিগন্ধ বিনে।
না পায় জ্ঞানাদি যেন অজা-গলস্তনে॥

তথাহি মহাজনস্য উক্তিঃ—

"ভক্তি বিনে কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেন ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥
অজা-গলস্তনপ্রায় অন্যান্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন॥

শ্রীভাগবতে—

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে॥" ইত্যাদি

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

স্বর্গের যে সুখ ভাই নরক-সমান।
তাহার কারণ কহি শুন দিয়া কাণ॥
তথায় অপূর্ব্ব ভোগ অমৃত-সমান।
অপূর্ব্ব সুন্দরী সঙ্গে রসের বিধান॥
গান বাদ্য শ্রবণ যে গন্ধ নানাজাতি।
নয়ন-আনন্দ দেখি শোভা নানাভাতি॥
স্বর্ণ অট্টালিকা সুকোমল শয্যা তায়।
সুখেতে শয়ন অভিমানেতে বৈসয়॥
দেখহ বিচারি ভাই এই (ক) যত সুখ।
শূকর দেহেতে হয় সকলি সম্মুখ॥
স্বর্গেতে যে রসভোগ (খ) জিহ্বার আস্বাদে।
শূকরের বিড়্ ভক্ষ্যে তেন (গ) সুখ-স্বদে॥
তথা যে সুন্দরী সঙ্গে রস-আস্বাদন।
শূকর-শূকরী সঙ্গে তৈমতি গমন॥
গান বাদ্য শ্রবণের সুখ তথা যথা।
শূকর নবীন বালকের রবে তথা॥
তথা যে সুগন্ধিসুখে মগন যেমতি।
শূকর অভোজ্য গন্ধে মাতয়ে তেমতি॥
নয়ন আনন্দ আর রত্নময় গৃহে।
যথা তথা খোঁয়াড়েতে শূকরীর সহে॥
অতএব ভাই পঞ্চেন্দ্রিয় সুখদুঃখ।
সামান্যে চরায্যা বুলে[১] যদা জীব মূর্খ॥

পাঠান্তর—(ক) এই—ইথে।
(খ) স্বর্গেতে যে রসভোগ—তথায় যতেক ভোগ।
(গ) শূকরের বিড়্ ভক্ষ্যে তেন—শূকরেতে বিষ্ঠা ভক্ষে সেই।

১। বুলে—ভ্রমণ করে।

স্বর্গেতে যে সুখ সেহ দুঃখেতে মিশ্রিত।
অন্যের উৎকর্ষ দেখি ঈর্ষায় তাপিত॥
পুণ্যক্ষয় পতনের সময় জানয়।
তাহাতে উদ্বিগ্নচিত্ত আছয়ে সদায়॥
অসুরের পরাক্রমে স্থানভ্রষ্ট হৈয়্যা।
দীনহীনপ্রায় কভু বেড়ায় ফিরিয়া॥
নিশ্চয় জানিহ ভাই কৃষ্ণাশ্রয় (ক) বিনে।
কোথাও নিবৃতি (খ) নাহি এ তিন ভুবনে॥
কৃষ্ণাশ্রয়মাত্র তাপত্রয় যায় ক্ষয়।
চিদানন্দ-নিত্যদেহে প্রেম আস্বাদয়॥
তথাচ স্বর্গাদিসুখ শ্রেষ্ঠ করি মানি।
যদ্যপি সে নিত্য হয় কথঞ্চিত গণি॥
অনিত্য অগ্রাহ্য সেই সাধুর সমীপে।
পরমসম্পত্তি (গ) বলি ইতরেতে জপে॥
অক্ষয়স্বর্গকামে নানা যাগযজ্ঞ করে।
তাতে দৃঢ়বুদ্ধি কেহ বুঝাইতে (ঘ) নারে॥
স্বর্গ যে অক্ষয় নহে তাহা নাহি বুঝে।
শিষ্ট শান্ত সাধু করি আপনা সমুঝে॥
অতএব স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি ত্রিভুবনে।
বিভুর মায়ায় হিতাহিত নাহি জানে॥
একবার মরে আরবার জনময়।
দুঃখের অবধি নাহি তার যাতনায়॥
ঊর্দ্ধপাদে হেঁটমাথে নাড়ীর বন্ধনে।
বিষ্ঠামূত্রক্লেদ তাহে দংশে কৃমিগণে॥
শতেক জন্মের কথা তথা স্মৃতি হয়।
তখন ভাবিয়া জীব আকুল-হৃদয়॥
শোচনা করয়ে হা হা কি কর্ম্ম করিনু।
কি বিষ খাইনু কেনে কৃষ্ণ না ভজিনু॥
ইন্দ্রিয় তুচ্ছ যে সুখ তাহার লাগিয়া।
বহু পাপপুণ্য (ঙ) কৈনু মুগধ হইয়া॥

পাঠান্তর—(ক) কৃষ্ণাশ্রয়—কৃষ্ণপ্রেম।
(খ) নিবৃতি—নির্বৃত্তি।
(গ) পরমসম্পত্তি—পরমসদ্গতি।
(ঘ) দৃঢ়বুদ্ধি কেহ বুঝাইতে—মূঢ়বুদ্ধি কেহ বুঝিবারে।
(ঙ) পাপপুণ্য—পাপকর্ম্ম।

পুনঃ পুনঃ এইরূপ গর্ভের যাতনা।
ভুঞ্জিয়া বেড়াই হা হা এ কি কদর্থনা[১]॥
এবার জন্মিয়া কৃষ্ণচরণ ভজিব।
পুনঃ পুনঃ এ নরক আর না ভুঞ্জিব॥
একান্তভাবেতে এই সুদৃঢ় করিনু।
কায়মনে কৃষ্ণপদে শরণ লইনু॥
দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করয়ে দুঃখসমে[২]।
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ভুলে মায়াভ্রমে॥
জনময়ে একেলা দ্বিতীয়-সঙ্গহীন।
ক্রমে ক্রমে ভ্রমে চেষ্টা হয় দিন দিন॥
বাল্যাবস্থাকালাবধি বাল্যরসে যায়।
পৌগণ্ডেতে[৩] বিদ্যার অভ্যাসে কালক্ষয়॥
যৌবন-উদ্রেকে নারীসঙ্গে লোভ জন্মে।
বিবাহ করিয়া মহা উৎসবেতে (ক) রমে॥
সন্তান-কারণ মূঢ় আর্ত্তনাদ করি।
নানা যাগ করে পূজে পুত্রবতী নারী॥
কালে পুত্র কন্যা দশ পাঁচ জনময়।
পৌত্র দৌহিত্র আদি বহুজন হয়॥
এক ছিলা বহু হৈলা বাড়ি গেলা লেঠা।
আসক্তি বাড়িল বহু বহু হৈল চেষ্টা॥
লালন-পালন রক্ষা ভরণ পোষণ।
সদা অই রসে মাতি হইলা মগন॥
ধন উপার্জ্জন হেতু দেশদেশান্তর।
গমন করয়ে দুঃখে নাহি অবসর॥
বাত বরিষা রৌদ্র ভয় অপমানে (খ)।
নানা ক্লেশ নাহি গণে অর্থের সন্ধানে॥
বন্ধুজন-বিয়োগ-বিচ্ছেদ অর্থনাশে।
অবিচ্ছিন্ন দুঃখশোক-সাগরেতে ভাসে॥
উষ্টর যেমন শমী কণ্টক চিবায়।
জিহবা (গ) ওষ্ঠে ক্ষত হয় তভু না তেজয়॥

পাঠান্তর—(ক) উৎসবেতে—উৎসাহেতে।
(খ) বাত বরিষা রৌদ্র ভয় অপমানে—বাত বর্ষা রৌদ্র আর ভয় অপমানে।
(গ) জিহবা—ভুজ।

১। কদর্থনা—কষ্ট, উৎপীড়ন।
২। দুঃখসমে—দুঃখের সময়ে।
৩। পৌগণ্ডেতে—৫ হইতে ১৫ বৎসর বয়সে।

তৈছে জীবের গতি এত যে কেলেশ।
তভু না বুঝয়ে মূঢ়মতি লবলেশ॥
কালে জরা আসিয়া প্রবেশ কৈল দেহে।
বলবীর্য্য গেল গতি রতি স্মৃতি সহে॥
কাস শ্বাস উদ্গার বাক্যে-জড়তা হইলা।
চক্ষু কর্ণ দন্ত কেশ পশ্চাত করিলা॥
স্ত্রী পুত্র পরিবার অবজ্ঞা করয়।
তাড়ন ভর্ৎসন কোপদৃষ্টিতে চাহয়॥
তথাপিহ তাহারি মঙ্গল-ধ্যানে থাকে।
গুহাপিঁড়া লেপয়ে টুকরি করি কাঁখে॥
মৃত্যুকাল বৎসর ছয় মাস সম্ভাবনা।
তথাপি না ভজে কৃষ্ণ বিষয়-উন্মনা॥
মৃত্যু পর্য্যন্ত অই (ক) বিষয় ভাবিয়ে।
মরিয়া নরক ভুঞ্জে গিয়া যমালয়ে॥
দুঃখের অবধি নাহি অশেষ যাতনা।
তখন ভাবয়ে হা হা (খ) খাইনু আপনা॥
কদর্য্য অনিত্য বিষ-বিষয় পাইয়া।
বৃথা জন্ম গোঙাইনু কৃষ্ণ না ভজিয়া॥
হায় হায় কি করিব উপায় কি হবে।
এ দুঃখসাগর হৈতে কে ত্রাণ করিবে॥
এইমত আর্ত্তনাদ পুনঃ পুনঃ করি।
শতযুগ ভুঞ্জে দুঃখ যমের নগরী॥
নরকান্তে পুন নানাযোনিতে জন্ময়।
শৃগাল-কুক্কুর আদি চৌরাশী ভ্রময়॥
তাহাতে অনন্ত দুঃখ নাহি পারাবার।
গৃহহীন শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় কাতর॥
দাবাগ্নিতে দহে কভু বাণদণ্ডাঘাতে।
কভু অস্ত্রাঘাতে মরে নানা-যন্ত্রণাতে॥
বিড়্-কীট পতঙ্গ পক্ষ (গ) জলজন্তু আদি।
জন্মিয়া মরয়ে পুনঃ নাহিক অবধি॥
মধ্যে মধ্যে চৌরাশীর অন্তে একবার।
মানব জনম হয় জনমের সার॥

কর্ম্মবশে সেহ (ক) অন্ধ আতুর ত্রিবঙ্ক।
নীচজাতি মূক অঙ্গাধিক অঙ্গভঙ্গ॥
কেহ বা সুন্দরদেহ বুদ্ধিমান্ হয়।
এ হেন দুর্লভ জন্ম পাই দুরাশয়॥
কৃষ্ণের চরণে যদি না কৈল আশ্রয়।
পুনর্ব্বার অই গতি জন্ম মৃত্যুচয়॥
বালক কহয়ে ভাই মায়ার প্রভাবে।
কৃষ্ণে না উপজে রতি উপায় কি হবে (খ)॥
প্রহ্লাদ কহয়ে ভাই উপায় সুন্দর।
আছয়ে তাহার কথা রহস্য বিস্তর॥
সংক্ষেপে কিঞ্চিত মাত্র স্থূল কহি শুন।
পরম উপায় সুপবিত্র গুহ্যতম॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপ আদি যত হয়।
ভক্তির বিরোধী মাত্র দিতে শক্ত নয়॥
সংসারের ক্ষয়োন্মুখ কোন ভাগ্যবানে।
যবে হয় তবে মিলে সঙ্গ সাধুসনে॥
কৃষ্ণকৃপা সুকৃতির সাধুসঙ্গ হৈতে।
পাপ আর সংসার যায় আনুষঙ্গমতে॥
কৃষ্ণপ্রেম মহাধন অমূল্য রতন।
পাইয়া পরমসুখী হয় সে তখন॥
পরম নির্বৃতি হয় দুঃখ রহু দূর (গ)।
শুদ্ধপ্রেমানন্দসুখে সদাই বিভোর॥
দেবগণ ধন্য ধন্য করয়ে ফুৎকার।
জগতের শ্রেষ্ঠ সেই ভবাব্ধিপার॥
সেই পূজ্যতম (ঘ) সেই আরাধ্য জগতে।
তাঁর পাদরজস্পর্শ প্রশংসে দেবেতে॥
বড় বড় কর্ম্মী জ্ঞানী মুক্ত (ঙ) করি মানে।
অহংকার মাত্র সেই তথ্য নাহি জানে॥
কৃষ্ণের ভকতপাদরজ যে পর্য্যন্ত।
মস্তকে না ধরে বৃথা মরে সেই ভ্রান্ত॥

পাঠান্তর—(ক) মৃত্যু পর্য্যন্ত অই—মৃত্যুকালাবধি ঐ।
(খ) হা হা—না না।
(গ) পক্ষ—পক্ষী।

পাঠান্তর—(ক) সেহ—দেহ।
(খ) হবে—তবে।
(গ) নির্বৃতি হয় দুঃখ রহু দূর—নির্বৃত্ত হয় দুঃখ বহুতর।
(ঘ) পূজ্যতম—পুণ্যতম।
(ঙ) মুক্ত—মুক্তি।

প্রেমভক্তিমান্ যেই সেহ থাকু দূরে।
অনন্যভকত সদাচার নাহি করে॥
হেন যে বৈষ্ণব সেহ ভুবনপাবন।
সাধু মধ্যে সেহ হয় শাস্ত্রে নিরূপণ॥

শ্রীশ্রীগীতায়াম্—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ ব্যবসিতো হি সঃ॥"

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

অতএব বৈষ্ণবের মহিমার সীমে।
মুঞি কি কহিব ভাই শ্রুতি যাতে ভ্রমে॥
যেহেতুক ভজ ভাই কৃষ্ণের চরণ।
সুদূরে তেয়াগি চতুর্ব্বর্গাদি শরণ (ক)॥
ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম যে স্বধর্ম্ম তেজিয়া।
অন্য দেবীদেবা জ্ঞান তপস্যা ছাড়িয়া॥
একমাত্র শরণ্য জগত-ঈশ হরি।
দৃঢ়নিষ্ঠা করি ভজ যথা সতী নারী॥
আর যত দেখিবে শুনিতে শ্রুতিগত (খ)।
সকল অনর্থ ত্রিভুবন মধ্যে যত॥
একা কৃষ্ণভক্তি বিনে সকলি অসার।
ধিক্ ধিক্ সেই সব জনম-বিকার॥
শিশুগণ কহে শুন প্রহ্লাদ রে ভাই।
এবে বুঝিলাম কৃষ্ণ বিনে আর নাই॥
যতেক কহিলা ইহা প্রত্যক্ষ সকলি।
বুঝিলাম তত্ত্ব মোরা দৃঢ় ভালি ভালি (গ)॥
কিন্তু এক কথা বলি তার কি বিচার।
বিবরিয়া কহ ভাই কর্ত্তব্য তাহার॥
কৃষ্ণের ভজন যে সারোদ্ধার হৈল।
এখনি না কৈল বৃদ্ধাবস্থায় করিল॥
তাহাতে বা হানি লাভ কি দোষ আছয়ে।
প্রহ্লাদ কহয়ে এই বাক্য গ্রাহ্য নহে॥
দুর্লভ যে কৃষ্ণভক্তি সাধারণ নহে।
ক্কচিৎ বড় ভাগ্য যার ভাগ্য সিন্ধু বহে॥

পাঠান্তর (ক) শরণ-স্মরণ।
(খ) শ্রুতিগত শ্রুতগত।
(গ) ভালি ভালি ভাই বলি।

অনেক যতনে তারে মিলে এক বিন্দু।
জলচর দেখে যেন সিন্ধুমধ্যে ইন্দু॥
হেন ধনে হেলা কি করিতে কেহ পারে।
উন্মত্ত পাগল বিনে সম্বরিতে নারে॥
স্পর্শমণি পাইয়া কি কহে কোন জন।
আজি নহে কালি লব থাকুক এখন॥
তবে যে কহয়ে সেই নির্ব্বোধ উন্মত্ত।
কালি মিলে কি না মিলে তার নাহি বুঝে তত্ত্ব॥
হরি ভক্তরত্ন ভাই দুর্লভ পদার্থ।
পরাৎপর রস (ক) আর নাশে সর্ব্বানর্থ॥
তাতে (খ) হেন ধন ভাই যখনি পাইব।
তখনি লইয়া হৃদিমাঝারে ভরিব (গ)॥
পরাণ চিরিয়া তার সারাংশ যথায়।
তারে সমাদর (ঘ) করি রাখহ তথায়॥
লোকালয় সঙ্গ (ঙ) তেজ দুর্জ্জনের ভয়ে।
পরম রতন পাছে ছেনাইয়া লয়ে॥
অতি সাবধানে ভাই যতনে রতন।
রক্ষা অর্থে সর্ব্ব ত্যাগি কর ভিক্ষাটন॥
তাহার বর্দ্ধিষ্ঠ (চ) হেতু সৎসঙ্গে নিবাস।
করহ একান্ত ছাড় জীবনের আশ॥
যেই মূর্খ কহে কৃষ্ণ পশ্চাতে ভজিব।
এখনি কি হৈল কত দিবস বাঁচিব॥
সেই মূঢ় রজোগুণ স্বভাবে কহয়ে।
বায়ুগ্রস্ত লোক যেন প্রলাপ করয়ে (ছ)॥
সেই মুগ্ধ নাহি বুঝে স্বভাব আপন।
মনে করে মুঞি বড় সুবুদ্ধিভাজন॥
শরীর যে ক্ষণধ্বংসি কোন ক্ষণে যায়।
তাহার নিশ্চয় নাহি ভরসা কি তায়॥
পশ্চাত ভজিব বলি নিশ্চিন্ত রহিল।
দেহপাত হৈল যদি বঞ্চিত হইল॥

পাঠান্তর—(ক) রস—বস্তু।
(খ) তাতে—যাতে।
(গ) তখন ঐ মণি হৃদিমাঝারে লইব।
(ঘ) সমাদর—অনাদর।
(ঙ) সঙ্গ—সর্ব্ব।
(চ) বর্দ্ধিষ্ঠ—বর্দ্ধন।
(ছ) করয়ে—বকয়ে।

কিংবা নানা বিঘ্ন হয়ে বিষয় (ক) কুসঙ্গে।
স্ত্রীসঙ্গে হয় মোহ যাতে সর্ব্ব ভঙ্গে॥
অতএব কৃষ্ণভক্তি যখনি পাইবে।
তখনি ভজিবে ভাই গউণ না করিবে॥
যদ্যপি তাহার রস-অনুভব নাই।
তথাপিহ সাধুজনার ভঙ্গি দেখি ভাই॥
মনেতে চিন্তিয়া কর অনুভব সার।
ভক্তিরসে না জানি কেমত চমৎকার॥
সর্ব্বধর্ম্ম (খ) বিষয় দুস্ত্যজ্য নারীপুত্র।
তেজিয়া সকলি মজিয়াছে যাতে মাত্র॥
হেন কৃষ্ণরূপ-গুণলীলার মাধুরী।
না জানি কি মধু সেই কি গুণে আগরি॥
ইহা অনুভবি মনে আশাপাত্র স্থাপি।
সেই মধুর উদ্দেশ কর আজন্ম যে ব্যাপি॥
অবশ্য মিলিবে তার কণার আস্বাদ।
ক্রমেতে বর্দ্ধিষ্ণু হবে ঘুচিবে বিষাদ॥
চতুর্ব্বর্গ বাধা আশা সংসার বিষাদ।
মায়াগন্ধ যাবে, পাবে পরম আহ্লাদ॥
আরো বলি শুন ভাই সুবিচার বাক্য।
হয় নয় বুঝহ মনেতে করি ঐক্য॥
বাল্যপৌগণ্ডসমে ভজনের কাল।
ইহার অধিকে দেখ অনেক জঞ্জাল॥
এ দুই সময়ে মতি স্বচ্ছন্দ অন্তর।
কোন চিন্তা নাহি, নহে উদ্বেগ-কিঙ্কর॥
অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণ ভজন (গ) নিরুদ্বেগে।
ক্রমেতে বর্দ্ধিষ্ণু হয়, বিঘ্ন নাহি লাগে॥
বাল্যাবস্থার সংস্কার পাষাণের দাগ।
কভু নাহি ছুটে (ঘ) হয় দৃঢ় অনুরাগ॥
কৈশোর আদিতে হয় বিদ্যাদির চেষ্টা।
যৌবন উদ্রেকে নারীসঙ্গে হয় তৃষ্ণা॥
ধনগর্ব্বমান্ (ঙ) জয় পরাজয় সদা চিন্তে।
রাগ দ্বেষ ঈর্ষায় নিন্দয়ে যশমন্তে॥

পাঠান্তর—(ক) বিষয়—বিষম।
(খ) সর্ব্বধর্ম্ম—সর্ব্বানর্থ।
(গ) ভজন—ভজহ।
(ঘ) ছুটে—টুটে।
(ঙ) ধনগর্ব্বমান্—ধনবান্।

বার্দ্ধক্যসময় ভাই বিঘ্নময় মাত্র।
কাশ শ্বাস জরা ব্যাধি চর্ম্মমাত্র (ক) গাত্র॥
সমস্ত ইন্দ্রিয় অপাটব ক্রমে হয়।
সদাই অসুস্থ মন, বুদ্ধি না স্ফুরয়॥
কৃষ্ণনাম লইতে যদ্যপি মনে করে।
কাশশ্বাস উঠে, লইবারে নাহি পারে॥
ভজন করিবে কিবা দেহ অপাটব।
জীবনে মরণ তুল্য কোথা ধ্যান জপ॥
অতএব কৈশোরে যৌবনে বিঘ্ন করে।
বার্দ্ধক্যেতে জরা বিঘ্ন কৃষ্ণ (খ) নাহি স্ফুরে॥
যেহেতুক বাল্যাবস্থা ধন্য করি মানি।
নির্ব্বিঘ্নে ভজন হয় সংস্কারে বাখানি॥
সেই সমস্কারে (গ) দৃঢ়নিষ্ঠা স্থায়ী হয়।
মতবাদিমতে (ঘ) কভু মন না চলয়॥
এত শুনি শিশুগণ প্রহৃষ্ট-হৃদয়।
প্রহ্লাদেরে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করয়॥
আলিঙ্গন করে সভে গদ্‌গদ্‌ভাবে।
পাইনু দুর্লভ জ্ঞান তোমার প্রভাবে॥
পিতা মাতা বন্ধু ভাই গুরু জ্ঞানদাতা।
তুমি সে পরম ভবসাগবের ত্রাতা॥
বহু স্তুতি করয়ে, নয়নে অশ্রু বহে।
নির্ম্মল হইল চিত্ত, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে॥
হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ বলিয়া সভে নাচে।
আগুসরি প্রহ্লাদ বালকগণ পাছে॥
প্রহ্লাদ যে আনন্দের সাগরে ভাসিল।
হরিসংকীর্ত্তনধ্বনি গগনে উঠিল॥
শণ্ডামর্ক দূরে হৈতে শুনি কলরবে।
ধাইয়া আইল দ্বিজ অতিক্রোধভাবে॥
আসিয়া দেখয়ে করে হরিসংকীর্ত্তন।
ক্রোধাবেশে করে দ্বিজ তাড়ন ভর্ৎসন॥
হাঁ রে শিশুগণ এ কি বিপরীত কার্য্য।
পুনঃ পুনঃ মানা করি তভু কর আর্য্য॥

পাঠান্তর—(ক) চর্ম্মমাত্র—লোমচর্ম্ম।
(খ) কৃষ্ণ—বুদ্ধি।
(গ) সমস্কারে—সংস্কারে।
(ঘ) মতবাদিমতে—যত বাদিমতে।

প্রহ্লাদিয়া ছোঁড়া দেখ পাগল হইল।
পাড়ার বালকগণ সব বিগাড়িল॥
ও নাম পালি রে কোথা কে রে শিখাইল।
বুঝিলাম তোর মৃত্যু নিকট হইল॥
মহারাজা দোরদণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড।
তাঁহার রিপুকে ভজ হাঁ রে মূঢ় ভণ্ড॥
পুত্র হইয়া কর প্রতিকূল আচারে।
তোমারে বাঁধিবে আর বাঁধিবে আমারে॥
এত শুনি শিশুগণ মৌন হইলা।
মনে মনে কৃষ্ণ নাম জপিতে লাগিলা॥
প্রহ্লাদ না শুনে তাহা কেবা কহে কাকে।
কর্ণে শব্দমাত্র যেন ঝিঁঝিপোকা ডাকে॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে মন অর্পণ করিয়া।
আঁখি মুদি রহে ধারা পড়য়ে বাহিয়া॥
দ্বিজ মনে ভাবে বুঝি ভয়েতে প্রহ্লাদ।
কান্দয়ে নয়ন মুদি করিয়া বিষাদ॥
নিকট হইয়া কিছু তুষিয়া কহয়।
আইস পঢ়হ বাপু নাহি কিছু ভয়॥
হেন কর্ম্ম কভু বৎস আর না করিহ।
পিতৃপিতামহ যেই সেই ধর্ম্মে রহ॥
শণ্ডামর্ক শিষ্যে ভাল উপদেশ দিল।
ত্রিভুবনলোক সব হাসিয়া উঠিল (ক)॥
কথোক দিবসে রাজা পুত্রে বোলাইলা।
শণ্ডামর্ক প্রহ্লাদেরে লইয়া চলিলা॥
শিখাইয়া বুঝাইয়া অনেক কহিল।
রাজার আগে বিষ্ণুর নাম (খ) কদাচ না বল॥
তবে দ্বিজ লয়্যা গেল রাজার সভায়।
প্রহ্লাদ আইসে যেন চন্দ্রের উদয়॥
স্থূলবপু চিক্কণ শ্যামল পদ্মনেত্র।
স্বর্ণমণি আভরণ (গ) বসন বিচিত্র॥
পীনবক্ষে মণিহার আন্দোলায়মান।
ধীরে ধীরে পদন্যাস গজেন্দ্র গমন॥

সঙ্গে পারিষদগণ সমান বয়েস
সমান চরিত্র সম আভরণ বেষ॥
রাজ-মন্ত্রিগণ অনুব্রজি¹ সঙ্গে সঙ্গে।
দেখিতে আইসে গ্রামের লোক সব রঙ্গে (ক)॥
মান অপমান আর বসন ভূষণে।
কিঞ্চিত নাহিক ক্ষোভ উপেক্ষায় মানে॥
কিছুমাত্র চেষ্টা নাহি অনন্যবাসনা।
সর্ব্বভাবে মাত্র কৃষ্ণচরণ-ভাবনা॥
ধীরে ধীরে সভামধ্যে আসি প্রবেশিলা।
চৌদিগে সকল লোক চাহিয়া রহিলা॥
প্রহ্লাদের রূপ দেখি রাজার আনন্দ।
আদর পূর্ব্বক কিছু (খ) কহে মন্দ মন্দ॥
আইস আইস বৎস জীবন আমার।
জুড়াক পরাণ ক্রোড়ে করি একবার॥
বাহু পসারিয়া রাজা ক্রোড়ে বসাইলা।
মস্তক-আঘ্রাণ মুখ-চুম্বন করিলা॥
জিজ্ঞাসয়ে কহ বাপু কি বিদ্যা পঢ়িলা।
কিবা নীতি কিবা ধর্ম্ম সার কি বুঝিলা॥
রাজ-নীতি কি জানিলে ধনুর্ব্বিদ্যা আদি।
রাজ্যের পালন যাতে বিজয় বিবাদী॥
করযোড়ে প্রহ্লাদ কহয়ে ঋজুভাবে।
আজ্ঞা যদি হয় মহারাজ কহি তবে॥

ত্রিপদীচ্ছন্দ।

নীতি আর ধর্ম্ম যত, ধনুর্ব্বিদ্যা-আদি শত,
রাজ্য আর জয় পরাজয়।
সকলি কেবল ব্যর্থ, সংসার-হেতু অনর্থ,
যাতে কৃষ্ণে মতি না জন্মায়॥
মহারাজ বিবেক ভজহ হৃদিমাঝ।
এই যে সংসার-সুখ, পরিণামে দুঃখোন্মুখ,
হেন রাজ্যসুখে কিবা কায॥

পাঠান্তর (ক) ত্রিভুবনে লোক যাহা শুনিয়া হাসিল।
(খ) রাজার আগে বিষ্ণুর নাম—রাজা আগে কৃষ্ণ নাম।
(গ) স্বর্ণমণি আভরণ—সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার।

পাঠান্তর—(ক) দেখিবারে আইসে গ্রামের লোক রঙ্গে।
(খ) আদর পূর্ব্বক কিছু—সগর্ব্বেতে নৃপবর।
১। অনুব্রজি—অনুগমন করিয়া।

সেই সুখ রাজ্যাস্পদ, সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যমদ,
সেই বিদ্যা রিপুপরাজয়।
সম্পদের সার সেই, সেই তপ তীর্থ সেই (ক),
যদি কৃষ্ণভক্তি উপজয়॥
নতুবা বিফল দেহ, সঙ্গে নাহি যাবে কেহ,
স্ত্রী-পুত্র ধন মান গর্ব্বে।
একেলা উলঙ্গবেশে, আসিয়া সংসার-বাসে,
অমনি গমন পুন সর্ব্বে॥
আসিয়া দিনকথোকাল, মিথ্যা মদ আস্ফালি,
করিয়া ফিরয়ে মোর মুঞি।
কলহ মেদিনী লয়্যা, মিথ্যা জয় পরাজয়া,
দু'আঁখি মুদিলে কিছু নাই॥
অতএব মহারাজ, সাধু মানি জগমাঝ,
সেই যেই কৃষ্ণাশ্রয় করি।
বিঘ্নকরী (খ) সদা হিয়া, গৃহকূপ তেয়াগিয়া,
বনেতে গমন শান্তি ধরি॥
ছাড়িয়া অনিত্য রাজ্য, চিন্তহ আপন কার্য্য,
অন্য আশা দ্বেষ রাগ ছাড়ি।
ভজহ শ্রীকৃষ্ণপদ, দুরলভ সুসম্পদ,
ঘুচিবে সংসার-দৃঢ়-বেড়ি (গ)॥
শুনিতে শুনিতে রাজা, ত্রিবিজয়ী মহাতেজা,
ক্রোধে কালান্তক যম-সম।
দুই নেত্র জ্বলে যেন, জ্বলন্ত অঙ্গার হেন,
অন্য থাকু কম্পমান যম॥
সৈন্য-সামন্ত জন, অমাত্য পার্ষদগণ,
সভাসদ আদি দেব নর।
সভে কম্পকম্পান্বিত, ভয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি হত,
প্রহ্লাদের নাহি কিছু ডর॥
কৃষ্ণের কিঙ্কর যেই, ত্রৈলোক্য-বিজয়ী সেই,
ভয়ে (ঘ) কোথা কাল নহে প্রভু।
স্বরক্ষায় শক্ত নহে, মৃত্যুর কিঙ্কর তাহে,
সে কি পীড়া দিতে পারে কভু॥

পাঠান্তর—(ক) তীর্থ সেই—তীর্থস্নায়ী।
(খ) বিঘ্নকরী—বিঘ্নময়।
(গ) ঘুচিবেক দৃঢ় মায়া-বেড়ি।
(ঘ) ভয়ে—ভয়।

তবে রাজা ক্রোধাবেশে, ঘন ঘন বহে শ্বাসে,
মার মার কহে বার বার।
ভয়ানক দূতগণে, উচ্চরবে দুর্ব্বচনে,
কহে শির ছেদহ ইহার॥
আমার শত্রুর গুণ, কহে দুষ্ট পুনঃপুনঃ,
আর মোরে ভজিবারে কহে।
গুরুর সমান হৈয়া, কহে জ্ঞান শিখাইয়া,
এ দৌরাত্ম্য পরাণে কি সহে॥
দূতগণ খড়্গ ধরে, যাইয়া আঘাত করে,
প্রহ্লাদের অঙ্গে নাহি বাধে।
উদ্যম বিফল সেই, শিশু যেন কোপে ধাই,
থুথু খেপণ করে চান্দে॥
চান্দে সে লাগিবে কোথা, পড়ে নিজমুখ যথা,
তেমতি অসুরগণ-মতি।
প্রহ্লাদে হানয়ে দণ্ড, খায় আপনার মুণ্ড,
তেঁহো ত অক্ষয় নিশাপতি॥
অস্ত্র নাহি পৈশে দেহে, হেরিয়া নৃপতি কহে,
কিবা মন্ত্র শিখিল কোথায়।
অস্ত্রাঘাতে না মরিবে, পর্ব্বত উপরে তবে,
উচ্চ হৈতে ডারহ উহায়॥
তবে দূতগণ লৈয়া, পর্ব্বত উপরে যায়্যা,
অতি উচ্চ হইতে ডারিলা।
পতনে মরণ কোথা, স্নেহেতে জননী যথা,
ক্রোড়ে হইতে ভূমে শোয়াইলা॥
শুনি রাজা বিবরণ, চিন্তায় বিরস মন
পুন কহে অগ্নিতে ডারহ।
জাজ্বল্য অগ্নির মাঝে, ডারয়ে ভকতরাজে,
পোড়াবে কি সেবে যায়্যা সেহ॥
পুন সাগরের জলে, বুকেতে বান্ধিয়া শিলে,
ফেলে লয়্যা সুদূর গম্ভীরে।
কৃষ্ণের ভকত জানি, তীর্থগণশিরোমণি,
না ডুবায় ধরি রাখে শিরে॥
তথা হৈতে আনি পুন, এবার কৌতুক শুন,
করিপদতলে দিলা ডারি।
হস্তী পশু কিবা জানে, হরির ভজন গুণে,
পৃষ্ঠে বসাইল শুণ্ডে ধরি॥

মারিতে অনেক চেষ্টা, করে মূঢ় অভিদ্বেষ্টা (ক),
কোনমতে না মৈল বালক।
তথাচ না বুঝে মন্দ, পুন করে নানা ছন্দ,
উপায় কি ভাবে তিনলোক॥
দন্ড ত অনেক কৈল, তাহাতে নাহিক মৈল (খ),
তবে সাম-দান-ভেদ-মতে।
বিবিধ উপায় করি, কোনমতে মোর বৈরী,
নাহি ভজে ক্ষেময়ে (গ) যাহাতে।
এতেক চিন্তিয়া মনে, পাঠায় মায়ের স্থানে,
বুঝাইতে কহি পাঠাইলা।
কয়াধু সুমতি বাণী, ভুবনপাবনী ধনি,
প্রহ্লাদেরে কোলে করি লৈলা॥
ঘন মুখে চুম্ব দেয়ে, মস্তক আঘ্রাণ লয়ে,
চিবুক ধরিয়া হেরে মুখ।
আহা মরি বৎস মোর, নিরদয় নিকঠোর (ঘ),
পিতা তব কত দিল দুখ॥
বিরলে লইয়া রাণী, কহয়ে অমৃতবাণী,
লোক-বেদ-সাধুর সম্মত।
আমার গুণের নিধি, কুরু (ঙ) তোমা নিরবধি,
কুলের প্রদীপ লোকাশ্রিত॥
কৃষ্ণের ভকতি-নিধি (চ), রাখহ হৃদয়ে বান্ধি,
দুষ্টের কথায় নাহি ভুল।
ভয় কি অসুর হৈতে, শ্রীকৃষ্ণ সহায় যাতে,
বিঘ্নের সে বিঘ্ন অনুকূল॥
দুষ্টমতি রাজা তোরে, প্রতিকূল বুঝাবারে,
আমারে কহিয়া পাঠাইলা।
হাহা কি দুর্দ্দৈবগতি, কি দুষ্ট অশুভ-মতি (ছ),
বিধি নিধি বঞ্চিত করিলা॥

পাঠান্তর (ক) মূঢ় অভিদ্বেষ্টা—মূঢ়মতি দ্বেষ্টা।
(খ) তাহাতে নাহিক মৈল—কোন মতে নাহি মৈল।
(গ) ক্ষেময়ে—ক্ষময়ে।
(ঘ) নিকঠোর—সুকঠোর।
(ঙ) কুরু—ধরু।
(চ) কৃষ্ণের ভকতি নিধি—শ্রীকৃষ্ণ ভকতি নিধি।
(ছ) অশুভ-মতি—অসুরমতি।

কৃষ্ণপ্রেম-সুধাধার, নাহি যার পারাবার,
হেন সুখে বঞ্চিত হইলা।
আর তাহে নিন্দে দুষ্ট, বিষয়-গরলে পুষ্ট,
হিতাহিত না বুঝে বিহেবালা (ক)॥
তুমি যে হরির ভক্ত, তোমা দ্বেষে অনুরক্ত,
ইহাতে মঙ্গল কভু নহে।
অচিরাতে হবে নাশ, হইবে নরকে বাস,
এ দৌরাত্ম্য ধর্ম্মে নাহি সহে॥
তুমি মাত্র শ্রীচরণ, রাখহ করিয়া পণ,
হৃদয় মাঝারে দৃঢ় করি।
জনম জীবন মন, তাঁরে কর সমর্পণ,
সদা রক্ষা করিবেন হরি॥
এতেক কয়াধু সতী বুঝাইল পুত্র প্রতি,
স্নাপন ভোজন করাইয়া।
নানা মণি হার হীরা, বিচিত্র বসন চীরা,
চন্দনাদি দিলা পরাইয়া॥
সুগন্ধি পুষ্পের মালা, কণ্ঠেতে করিল আলা,
ভালে দিল তিলক-মঞ্জরী।
ভুবন-মোহন রূপ, সুরূপগণের ভূপ,
কিবা হৈল অপূর্ব্ব মাধুরী॥
রাজা পুন বোল হৈলা, রাণী পাঠাইয়া দিলা,
সাজাইয়া সাধে রাজসভা।
দেখিয়া পুত্রের রূপ, আনন্দিত হৈলা ভূপ,
চিত্ত-মন নয়নের লোভা॥
অন্তরে ভাবেন ভূপতি, প্রহ্লাদের সে কুমতি,
ঘুচি গেল মায়ের বাক্যেতে।
সুবুদ্ধি কয়াধু রাণী, বুঝাইতে নীতবাণী,
পাঠাইয়া দিলেক সভাতে॥
ডাকে দিয়া হাতছানি, পসারিয়া দুই পাণি,
আইস মোর পরাণ প্রহ্লাদ।
হৃদয় মাঝারে রাখি, তোমার বদন দেখি,
ঘুচুক যে মনের বিষাদ॥

পাঠান্তর (ক) না বুঝে বিহেবালা—বুঝিতে নারিলা।

এতেক আদর করি, প্রহ্লাদের করে ধরি,
বসাইলা আপন নিকট।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া, কহে রাজা বুঝাইয়া,
মোর সনে না করিহ হট॥
শুন বৎস নীতবাণী, মুঞি যারে নাহি গণি,
মোর সুত হৈয়া তারে ভজ।
অতি অনুচিত হয়ে, কাপুরুষতার ন্যায়ে,
অতএব হেন বুদ্ধি তেজ॥
প্রহ্লাদ কহয়ে পুন, মহারাজ কহি শুন,
যতেক কহিলে নীতবাণী।
সকলি অনীত হয়, সৎমার্গে বিপর্য্যয়,
নিন্দিত অগ্রাহ্য দুষ্য মানি॥
যার সনে কর হট, সেই প্রাণেন্দ্রিয় পট,
তাহা বিনে পড়িয়া রহয়।
শৃগাল কুক্কুর ভক্ষ্য, এই যে সুখের পক্ষ,
ক্ষণমাত্র উড়িয়া পলায়॥
মহারাজ হরিপদ (ক) অভয় শরণ।
কাপুরুষ সেই জন, না ভজয়ে শ্রীচরণ,
করে সেই নরক-ভুঞ্জন॥
তাঁরে না গণয়ে যেই, জগতে নিন্দিত সেই,
নিশ্চয় বিধাতা তারে বাম।
সংসার-যাতনা ভোগ, সদা সেবে শোক রোগ,
কদাচিত পূর্ণ নহে কাম॥
ইন্দ্রিয়-বিষয়জ্ঞানে, দুঃখে সুখ করি মানে,
নাসিকায় মায়ারজ্জু বশে।
অবিদ্যা যাহার দাসী, পরাৎপর সুখরাশি,
না বুঝিয়া বঞ্চিত সে রসে॥
অতএব মহারাজা, অন্তরে ত্যজহ দুজা[১],
ভজ হরি-অভয় চরণ।
বিষয় যে কুটিনাটি, ছাড় অন্য পরিপাটি,
সদা কর অনন্য শরণ॥

পাঠান্তর—(ক) হরিপদ—হরিধর্ম্ম।
১। দুজা—দ্বিধা, সন্দেহ।

এতেক শুনিয়া রাজা, অসুরাগ্র্য মহাতেজা
ক্রোধে যেন প্রচণ্ড আনল (ক)।
প্রলয়ের বায়ু যেন, শ্বাস বহে ঘনে ঘন
রক্তবর্ণ নয়নযুগল॥
উচ্চস্বরে কহে চ্ছার, অরে দুষ্ট কুলাঙ্গার
তথাচ ঐ নাম পুন লবি।
মস্তক চ্ছেদিব তোর, না জান প্রতাপ মোর
আজি তুঞি যমালয় যাবি॥
এত কহি কোলে (খ) হৈতে, খড়্গ লইল হাতে
চোট হানিবারে (গ) মনে করে।
নাহি মরে খড়্গাঘাতে, যে (ঘ) কথা আছয়ে (ঙ) চিতে
লজ্জায় না পারে মারিবারে॥
ধীরে ধীরে কহে পুন, মোর এক বাক্য শুন
এই যে এতেক লোক আছে।
কেহ বা না ভজে কেন, তুমি কেনে পুনঃপুন
ভজিবারে ধাও তার পাছে॥
জিজ্ঞাসি তোমার ঠাঁঞি, মিথ্যা যে কহিবে নাই
আর কিছু নাহি চাই আমি।
বিষ্ণুর ভজন প্রতি, কে তোমারে হেনমতি
দেয় কার ঠাঁঞি শিখ তুমি॥
তবে কহে শিশুবর, করি আগে যোড়কর
মহারাজ করি নিবেদন।
এই যে যতেক জন, নাহি ভজে নারায়ণ,
যে কহিলে শুন বিবরণ॥
কৃষ্ণভক্তি মহাবিভু, বিনে সাধুকৃপা কভু,
নাহি হয় শাস্ত্রের প্রমাণ
দুর্লভ যে শুভোদয়, সাধারণ কোথা হয়
যার হয় সেই ভাগ্যবান্॥
মহারাজ কৃষ্ণে মতি অতি যে দুর্লভ।
স্বত কি পরত নহে, গৃহকূটধর্ম্ম সহে
মিথুনীক্রিয়াতে যার লোভ॥

পাঠান্তর—(ক) আনল—অনল।
(খ) কোলে—কোষে।
(গ) হানিবারে—মারিবারে।
(ঘ) যে—সে।
(ঙ) আছয়ে—উদয়।

কৃষ্ণে মতি কোথা তার, অনর্থে শয়ন (ক) যার,
দিবসে বিষয় কর্ম্মে ফিরে।
নিশিতে করি শয়ন, পুন সেই চিন্তন,
করে যেন গোধন যাগরে¹॥

রাজা শুনি পুন কহে, কৃষ্ণ তোর কোথা রহে,
প্রহ্লাদ কহয়ে সর্ব্বস্থরে।
স্থাবর জঙ্গম কীট, পতঙ্গ পাবক ভীট²,
চরাচর সভার অন্তরে॥

রাজা কহে যদি হয়, স্তম্ভ যে স্ফটিকময়,
ইহাতে আছয়ে তোর হরি।
পুনশ্চ প্রহ্লাদ কহে, সে কভু অন্যথা নহে,
শুনি কোপে উঠে খড়্গ ধরি॥

ধাইয়া অসুরবরে, তাহাতে আঘাত করে,
স্তম্ভরাজ দুইখণ্ড হৈল।
শুনহ অদ্ভুত কথা অপূর্ব্ব মঙ্গলগাথা (খ),
তাহে এক বস্তু নিকষিল³॥

যাহা লাগি যোগিগণ, একান্তে করয়ে ধ্যান,
ছাড়ি সর্ব্ব বিষয় বাসনা।
শ্রুতিগণ নিরন্তর, যাঁর অন্বেষণপর,
বিচার-বিতণ্ডা করে নানা॥

যাঁর যশ গুণ কর্ম্ম, ছাড়িয়া সকল ধর্ম্ম,
সাধুগণ পুলক-অন্তরে।
গায় শুনে করে ধ্যান, ছাড়ি রাজ্য অভিমান,
স্বজন বান্ধব করি দূরে॥

সর্ব্ব-আত্মা-অন্তর্য্যামী, সভার জীবনস্বামী,
এক বিভু ত্রৈলোক্য-অন্তরে।
সৃজন-পালন-কর্ত্তা, প্রলয়-আদি-সংহর্ত্তা,
ত্রিভুবন যাঁর গুণে ঝুরে॥

ত্রৈলোক্যে যে বৈভব, সকলি বস্তু সুলভ,
সুদুর্লভ যাহা নাহি মিলে।
হেন বস্তু স্তম্ভ হৈতে, স্বভক্তের অভিমতে,
নিকষিলা প্রপঞ্চের মেলে¹॥

অহো কি লোকের ভাগ্য, কিবা মূঢ় কিবা প্রাজ্ঞ,
কিবা সুর অসুর রাক্ষস।
নয়নগোচর হৈল, ভবাগ্নি নির্ব্বাণ ভেল,
শেষ হৈল জঠর-নিবাস॥

যবে স্তম্ভে নিকষিল, ক্ষুদ্রাটি প্রতীত ভেল,
দেখিতে দেখিতে মহাকায়।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-নভোব্যাপী, রৌদ্র প্রচণ্ড-রূপী,
মহাবিকরাল মূর্ত্তি হয়॥

কটি অধ নরাকৃতি, শ্যামল-সুন্দর ভাতি,
পীতাম্বর মণি-আভরণে।
শ্রীচরণ কটি-অধে, ভক্তে দত্ত অনুরোধে,
শক্ত নহে অন্যথাকরণে॥

উর্দ্ধে হরি² ভয়ংকর, রূপ কিন্তু মনোহর,
ভক্তগণের আনন্দজনক (ক)।
ভক্ত-অনুরোধ করি, রূপ ধরি নরহরি,
ক্রীড়া করে যেমন বালক॥

অতঃপর শুন তবে, হিরণ্যকশিপু যবে,
দেখি সেই বিকৃতি (খ) স্বরূপ।
দুঃশীল অসুর রীতি, কোপেতে বিবশ মতি,
নাহি বুঝে নিজ শুভাশুভ॥

মুদ্গর মুষল ভেলা, বৃক্ষ বৃহতী শিলা,
শেল শূল নানা অস্ত্র-শস্ত্র।
বিক্রম করিয়া মারে, প্রভু তাহা লুফি ধরে,
উলটিয়া মারে সেই অস্ত্র॥

ইতর অসুরগুলা, দূর হৈতে মারে ঢেলা,
সেগুলার গ্রীবা ধরি ধরি।
ভূমেতে আছাড় মারে, ছটফট করি মরে,
কথোগুলা পলায় তা হেরি॥

পাঠান্তর—(ক) শয়ন শরণ।
(খ) মঙ্গলগাথা মঙ্গলকথা।
১। যাগরে (:) যাবরে খৈলমিশ্রিত বিচালিকে।
২। ভীট—ভীটি, মাটি ঘরের মাঝে।
৩। নিকষিল—বাহির হইল।

পাঠান্তর—(ক) আনন্দজনক—আনন্দদায়ক।
(খ) বিকৃতি—বৃহৎ।
১। প্রপঞ্চের মেলে—মায়ার প্রভাবে।
২। হরি—সিংহ।

পুনরপি দুই জন, বাহুযুদ্ধ অনুক্ষণ,
পৃথিবী কম্পিত পদভরে।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল, তলাতল-পাতাল,
সুমেরু কাঁপয়ে থরেথরে॥
যুদ্ধলীলা কথোক্ষণ, করি প্রভু সনাতন,
দৈত্যরাজে ধরিয়া শ্রীহস্তে।
উরুর উপরে ধরি, উদর পাড়য়ে (ক) চিরি,
ক্রোধাবেশে যেন বেণাপত্রে[১]॥
উদরের নাড়ীগুলা, মালা করি গলে দিলা,
অতি বিকরাল রূপ হৈলা।
প্রলয়-আনল যেন, দুই চক্ষু জ্বলে তেন,
লোমাবলি উত্তান[২] করিলা॥
নাসাপুটে বহে শ্বাস, শিলা বৃক্ষ আশ পাশ,
উপাড়িয়া পড়ে গিয়া দূরে।
দশন অচলশৃঙ্গ[৩], হরধনু যেন ভঙ্গ,
কটমট শব্দে ব্যাপে পুরে॥
শিরে জটা ঘূর্ণনে, ছিন্নভিন্ন মেঘগণে,
দেবগণ পলায় ধাইয়া।
মহাতেজা মহাবল, প্রতাপ প্রদীপ্তানল,
কালের অন্তক রৌদ্রকায়া॥
দুঃসহ চীৎকার রবে, গর্ভবতীর গর্ভ স্রবে,
সুরাসুরনরনারীগণ।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, সুমেরুর শৃঙ্গ নড়ে
কটাহ ফাটিল কিবা আন[৪]॥
মহা উগ্ররূপ প্রচণ্ড, কালান্তক কালদণ্ড,
মহাভয়ানক মহারৌদ্র।
চরণ-আস্ফালনভরে, ক্ষিতি টলমল করে,
সৃষ্টি সংহারেন যেন রুদ্র॥
দেখিয়া চিন্তিত মনে, ব্রহ্মা-আদি-দেবগণে,
হাহাকার করেন সভাই।
অকালে প্রলয় হয়, কি কর্ত্তব্য কি উপায়,
ত্রস্ত পরস্পর ধাওয়াধাই॥

শিব-ব্রহ্মা-ইন্দ্র-আদি, স্তব করে আঁখি মুদি,
সুদূরে হইতে ভয়ে অতি (ক)।
আঁখি না মেলিতে পারে, নিকটে যাইতে নারে,
কম্পিত হেরিয়া তীক্ষ্ম ভাতি॥
কেহ কহে লক্ষ্মীদেবী, তাঁহার চরণ সেবি,
আন যাই বৈকুণ্ঠ হইতে।
তেঁহো যদি আসি কহে, তবে এই সৃষ্টি রহে,
প্রভুর এ রূপ সম্বরিতে॥
পরামর্শ প্রশংসিয়া, সভে বহু আরাধিয়া,
স্বধাম হইতে তাঁরে আনে।
ভয়াল বিকট রূপ, নরসিংহ স্বরূপ,
হেরি মাত্র মুদিলা নয়নে॥
মুখ ফিরাইয়া যায়, চলি যায় নিজালয়,
ভয়ে ভীত কমলা-হৃদয়।
পুনরপি এক উপায়, স্থির কৈলা দেবচয়,
ভকতবৎসল প্রভু হয়॥
প্রহ্লাদের কর স্তব, পূরণ হইবে সব,
রক্ষা হবে জগৎ সংসার।
ইহা চিন্তি সভে মেলি, অন্তরে সুকুতুহলী,
স্তব করে করিয়া বিচার॥
প্রহ্লাদ ঘনায়্যা যায়, অন্তরে অকুতভয়,
সিংহের বালক (খ) যেন সিংহে।
হেরিয়া নাহিক ডরে, ক্রোড়ে বসি ক্রীড়া করে,
মাতা পিতা বক্ষে রাখে স্নেহে॥
তেমতি কৌতুক দেখ, ত্রিজগত পায় সুখ,
সর্ব্বলোক যাহার শ্রবণে।
তাহার যে বিবরণ, শুন সভে দিয়া মন,
পরম আনন্দ পাবে মনে॥
সম্মুখে দাণ্ডায়্যা সাধু, বিধু যেন স্রবে সীধু[১],
স্তব করে সুমিষ্ট বচনে।
দেবগণ তাহা শুনি, মুখে না নিঃসরে বাণী,
নিরীখয়ে (গ) অনিমিখ নয়নে॥

পাঠান্তর—(ক) পাড়য়ে—ফাড়য়ে।
১। বেণাপত্রে—খসখসের পাতায়।
২। উত্তান—উচ্চ, খাড়া।
৩। অচলশৃঙ্গ—পর্ব্বতচূড়া।
৪। কটাহ...আন কড়াই বা অন্য কিছু ফাটিল।

পাঠান্তর—(ক) ভয়ে অতি—ভয়মতি।
(খ) বালক—তনয়।
(গ) নিরীখয়ে—নিরখয়।
১। বিধু যেন স্রবে সীধু—চন্দ্র যেন সুধা ক্ষরণ করে।

আর্দ্রীভূত অন্তরে, দুনয়নে বারি ঝরে,
পুলকিত অঙ্গ সভাকার।
প্রভু প্রহ্লাদের পানে, স্নিগ্ধদৃষ্টে সুনয়নে,
স্নেহভাবে হেরে বার বার॥
গ্রীবা হেলাইয়া চাহে, বদন নিরখি নহে,
ক্রোড়ে তুলি হৃদয়ে লইলা।
শ্রীহস্ত অঙ্গেতে দিয়া, শিরে হাত বুলাইয়া,
বদন চুম্বন (ক) বহু কৈলা॥
পশুরূপ ধরি হরি, পশুভাব (খ) অঙ্গীকরি,
স্নেহে প্রহ্লাদের অঙ্গ চাটে।
কিবা ভক্তপ্রিয় (গ) প্রভু, কিবা দয়াময় বিভু,
যত্নে রাখে হৃদয়-সম্পুটে॥
হেন যে দয়াল নিধি, তাঁরে ভজ নিরবধি,
অন্য ধর্ম্ম বাসনা তেজিয়া।
কাহারে ভজিবে আর, কি ধন লাগিয়া ছার,
কাঁচ লাগি (ঘ) কাঞ্চন ছাড়িয়া॥
সাক্ষাতে দেখহ ভাই, হেন দয়াল আর নাই,
নয়ান-বিবাদ তেয়াগিয়া।
হেন দয়াল কেবা আছ, শুদ্ধ প্রেমানন্দ যাচে (ঙ),
পরাৎপর নিন্দিয়া অমিয়া॥
প্রহ্লাদের (চ) কিবা ভাগ্য, কিবা প্রাজ্ঞ কিবা যোগ্য,
কিবা দীর্ঘ সৌভাগ্য শোভন।
ত্রিভুবননাথ বিভু, কর্ত্তা হর্ত্তা ভর্ত্তা প্রভু,
যার লাগি কৈলা (ছ) প্রকটন॥
কণ্ঠেতে ধরিয়া পুনঃ, সুকোমল বৎস যেন,
স্নেহে অঙ্গ চাটয়ে গোধন।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া, অশ্রুজলে ভিজাইয়া (জ),
পুনঃ পুন হেরয়ে বদন॥

প্রহ্লাদ গম্ভীর মতি, না ভিজে আদর প্রতি,
শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমগতি।
যাহাতে সুস্নিগ্ধ মন, মাগে মাত্র শ্রীচরণ,
কেবল সেবনমাত্র মতি॥
অপার গুণের সিন্ধু, মো-সভা পরমবন্ধু,
তাঁর চরণের রজকণা।
তাহে অনাদর করি, নানাপথে সদা ফিরি,
যে হেতুক সংসার বাসনা॥
বৈষ্ণবে না কৈনু রতি (ক), খাইয়া আপন মতি (খ)
হায় হায় কি দুর্দ্দৈবদশা।
পড়িল মস্তকে বাজ, এ হেন (গ) বৈষ্ণবরাজ,
তাঁর পদে না জন্মিল আশা॥
নানাযোনি সদা ফিরি, কদর্য্য ভক্ষণ করি,
নানাকর্ম্ম করি চাহি অর্থ।
যে অর্থ অনর্থমাত্র, বিশেষতঃ স্ত্রী পুত্র,
স্বর্গ যে সুখদ সেহ (ঘ) ব্যর্থ॥
বৈষ্ণবসেবন সার, ধর্ম্মমধ্যে পরাৎপর,
যাতে সর্ব্ব অর্থ লভ্য হয়ে।
অন্য ফলের কিবা কথা সেত তুচ্ছময় (ঙ) বৃথা,
যাতে কৃষ্ণপ্রেম উপজয়ে॥
হেন বৈষ্ণবের পদে, মতি না করিনু মদে,
হারাইনু পাইয়া রতন।
যে ভাগ্যে এ পদ মিলে, বুঝি কভু কোনোকালে,
সেই ভাগ্য না কৈনু কখন॥
এবে দন্তে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি,
শ্রীচরণে করি নিবেদন।
হে হে শ্রীল শ্রীপ্রহ্লাদ, ঘুচাও মনের বাদ,
মোরে দেহ ভকতি রতন॥

পাঠান্তর—(ক) বদন চুম্বন—যেন ঘন চুম্বন।
(খ) পশুভাব—পদাভব।
(গ) ভক্তপ্রিয়—ভক্তিপ্রিয়।
(ঘ) লাগি—লাগিয়া।
(ঙ) প্রেমানন্দ যাচে—প্রেমানন্দে নাচে।
(চ) প্রহ্লাদের—তোমাদের।
(ছ) কৈলা—হৈলা।
(জ) ভিজাইয়া—ভিজাই।

পাঠান্তর—(ক) রতি—মতি।
(খ) মতি—গতি।
(গ) এ হেন—ঐছন।
(ঘ) স্বর্গ যে সুখদ সেহ—স্বর্গ অপবর্গ যেহ।
(ঙ) সেত তুচ্ছময়—সেহ তুচ্ছমাত্র।

পুরুষ-রতন তুমি, কি আর বলিব আমি,
কৃপাদৃষ্টি কিঞ্চিত করহ।
চরণে শরণ লৈনু, বিনা মূলে বিকাইনু,
মো পাপী আপন করি লহ॥
তোমার হৃদয়কোষে, অশেষ দারিদ্র নাশে,
আছয়ে যে (ক) অমূল্য রতন।
দারিদ্র আমার মন, নাহি কৃষ্ণপ্রেমধন,
কিছু দেহ হেরিয়া কৃপণ১॥

পাঠান্তর—(ক) আছয়ে যে—আছে তথায়।
১। কৃপণ—কৃপাপাত্র, কাঙাল।

অনুচর কর মোরে, চরণ ধরহ শিরে,
ভৃত্যভাবে কর অঙ্গীকার।
শ্রীকৃষ্ণ-ভকতি রসে (ক), তোমার যে গ্রাসশেষে (খ),
দেহ পাতিয়াছি মতিকর (গ)॥
পরিহার শ্রীচরণে, কিঞ্চিৎ নয়ানকোণে,
নেহার হে দয়ার (ঘ) ঠাকুর।
দীনহীন লালদাস, কৃপালেশ করে আশ,
কর নিজ উচ্ছিষ্ট কুক্কুর১॥

পাঠান্তর—(ক) রসে—রস।
(খ) গ্রাসশেষে—গ্রাস-আশ।
(গ) পাতিয়াছি মতিকর—পাতি আছি নিজ কর।
(ঘ) দয়ার—দয়াল।
১। কর...কুক্কুর—আমাকে তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজনকারী কুক্কুর কর।

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীপ্রহ্লাদভক্তরাজ গুণ-কথং নাম সপ্তমমালা ॥ ৭ ॥

অষ্টম মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীঅক্রূর ভক্তরাজের

কংসের আদেশে সাধু শ্বফলক-পুত্র।
অক্রূর ভকতরাজ যশ সুপবিত্র (ক)॥
কৃষ্ণে লইবারে ব্রজপুরে গেলা যবে।
তাঁহার মহত্ত্ব কিছু কহি শুন সবে॥
অপূর্ব্ব স্বর্ণের রথে চড়িয়া চলিলা (খ)।
পথে পথে নানা তর্ক করিতে লাগিলা॥
মুঞি হীনমতি অতি ভকতি-বিহীন।
মোর চক্ষুগোচর কি হবে ভক্তাধীন॥
নয়নে গলয়ে ধারা যেন মেঘ বর্ষে।
রাম-কৃষ্ণদরশন মোরে নাহি অর্শে॥
হেন কি আমার এবে হইবে সুদিনে।
হেরিব শ্রীহলধর নন্দের নন্দনে॥
শ্রীবদনচন্দ্র (গ) হেরি চরণে পড়িব।
খুড়া বলি উঠাইয়া আলিঙ্গন দিব॥
এইমত মনোরথ করিতে করিতে।
শ্রীচরণচিহ্ন দেখি ব্রজে প্রবেশিতে॥
পুলক-কদম্ব দেহ (ঘ) অশ্রু বহে ধারে।
গড়াগড়ি দিয়া তাহে দণ্ডবৎ করে॥
পুনঃপুন উঠে পড়ে উন্মত্তের ন্যায় (ঙ)।
কভু হাসে কভু কান্দে প্রেমের আশয়॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি চলে মহাশয়।
দেখে গোষ্ঠে রাম-কৃষ্ণচন্দ্রের উদয়॥

পাঠান্তর—(ক) যশ সুপবিত্র—যশস্বী পবিত্র।
(খ) চড়িয়া চলিলা চড়ি ব্রজে গেলা।
(গ) শ্রীবদনচন্দ্র শ্রীচন্দ্রবদন।
(ঘ) পুলক কদম্ব-দেহ পুলক হৃদয় দেহ।
(ঙ) ন্যায়—প্রায়।

আনন্দসাগর-মাঝে ডুবিলা মহান্ত।
কি সুখে সাঁতারে তার নাহি হয় অন্ত॥
কৃষ্ণ বলরাম দুই ভাই পূর্ণশশী।
হেরিয়া অক্রূরে আলিঙ্গন কৈলা আসি॥
করে ধরি গৃহে আনি আতিথ্য-ব্যভারে।
নানামত সেবা কায়মনবাক্যে করে॥
নরলীলা লৌকিক-ব্যভারে দুই ভাই।
অক্রূরে সেবয়ে পান ভোজন করাই॥
অক্রূরের প্রেমভক্তি শুনি জগজ্জনে।
আপনা নিন্দিয়া লোক করয়ে বাখানে॥
তেঁহো যদি কিঞ্চিত কটাক্ষদৃষ্টে হেরে।
ক্ষুদ্র জীব মো-সভার দুঃখ যায় দূরে॥
সিন্ধু বিন্দু-জল যেন টুনিপাখী পাইলে (ক)।
উদর পূরয়ে সিন্ধু নাহি টুটে জলে॥
অতএব ক্ষুদ্র মোরা চাহি মাত্র এই।
সেই প্রেমরস-বিন্দুকণা (খ) যদি পাই॥

চরিত্র শ্রীবলি রাজার

বলি মহারাজরাজ ভুবনে বিখ্যাত।
মহামহিমার সীমা শাস্ত্র অভিমত॥
কি কব অবাধ দেখ ত্রৈলোক্যের নাথ।
দ্বারে দ্বারিরূপে স্বয়ং রহে রমানাথ॥
ধন জন দারা সহ ত্রৈলোক্যের রাজ্য।
আত্ম সমর্পিলা শ্রীচরণে সাধুবর্য্য (গ)॥
কৃপাসিদ্ধ বলিরাজ শাস্ত্রমতে শুনি।
কোথা যজ্ঞ করে কোথা মিলে গুণমণি॥
কর্ষণ করিতে মিলে স্পর্শমণিধন।
যতনবিহীনে যেন মিলয়ে রতন॥

পাঠান্তর—(ক) পাইলে—খাইলে।
(খ) প্রেমরস-বিন্দুকণা—প্রেমরস-সিন্ধু-কণা।
(গ) আত্মমন সমর্পিলা সাধু মহাবর্য্য।

অতএব তাঁহার চরিত্র কিছু শুন।
শ্রবণসুখদ অতি সুধাসার (ক) যেন॥
আনন্দজনক আর সংসারতারক।
হৃদ্রোগনাশক আর (খ) প্রেমাব্ধিদায়ক॥
দেবরাজ প্রার্থনেতে আপনি শ্রীহরি।
অবতীর্ণ হইলা বামনরূপ ধরি॥
দেবতার কার্যদান ছলমাত্র করি।
ভুবনপাবনলীলা কৈলা অবতরি॥
মহাতেজপুঞ্জ বটু-ব্রাহ্মণরূপেতে।
উপনীত হৈলা যাই বলির যজ্ঞেতে॥
বলি রাজা দেখি চমৎকার হৈল চিত্তে।
অনিমিখে চাহে যেন পুত্তলিকা ভিত্তে॥
বহু সমাদর বহু নতি স্তুতি করি।
বসাইলা উচ্চ রত্ন-সিংহাসনোপরি॥
করযোড় করি কহে মৃদু মৃদু ভাষে।
কিবা অর্থে আগমন কিবা অভিলাষে॥
বটু কহে ভূপতি (গ) আইনু তোমা স্থানে।
অভিলাষ হয় কিছু যাচিঞা-কারণে॥
যদি দেহ তবে বলি নহে কেন ব্যর্থ।
রাজা কহে যাহ চাহ দিব সেই অর্থ॥
গুরু শুক্রাচার্য্য মুনি (ঘ) হইয়া তটস্থ।
ভর্ৎসয়ে বলিরে অরে করিলি অনর্থ॥
বিষ্ণু ছলরূপে (ঙ) আইলা বুঝিতে নারিলি।
আপনার দোষেতে আপন মাথা খালি॥
প্রতিশ্রুত হৈলি দিলি ব্রাহ্মণেরে বাক্য।
বিপ্র নহে ছলে তোমার বিপক্ষের পক্ষ॥
রাজা কহে গোসাঞি যে আপনি কহিলে।
ছদ্মরূপে (চ) বিষ্ণু আইলা ব্রাহ্মণের (ছ) ছলে॥
তবে ত ইহার পর ভাগ্য কি আছয়ে।
যাহা চাহে তাহা দিব সেই ধন্য হয়ে॥

রাজা পুন বটুর চরণে নিবেদয়।
কি অর্থ মাগহ কহ করিয়া নিশ্চয়॥
বটু কহে ধনরত্ন কিছু মাগি নাই।
মোর পদসম মাত্র ত্রিপাদভূমি চাই॥
শুক্রাচার্য্য পুনঃপুন আঁখি মটকায়।
বাক্য অপহ্নব[১] করিবারে যে কহয়॥
রাজা তাহা দেখি যেন নাহিক দেখয়।
বটুস্থানে কহে পুন করিয়া বিনয়॥
ফল্গু[২] অর্থ চাহ গোসাঞি সুবিজ্ঞ (ক) হইয়া
গ্রাম-রত্ন ধন-ধান্য-আদি তেয়াগিয়া॥
তেঁহো কহে মুঞি হউ (খ) তপস্বী ব্রাহ্মণ
ধনধান্যে মোর কিছু নাহি প্রয়োজন॥
তপস্যার লাগি মাত্র স্থান কিছু চাই।
যোগের নির্ব্বাহ যাতে তাৎপর্য্য এই॥
রাজা কহে তবে তোমার স্বেচ্ছা হয় যেই।
তাহাই করিব মোর কর্ত্তব্য যে সেই॥
এত কহি মহারাজা সম্মতিপূর্ব্বক।
দান করিবারে তবে হইলা উৎসুক॥
মুনি কহে কোপে তবে হাঁরে দুর্ম্মতি।
সর্ব্বনাশ হৈল যে না দেখ তাহা প্রতি॥
ছল করি বিষ্ণু তোর সর্ব্বস্ব হরিতে।
আইলা বামনরূপে ইন্দ্রের প্রেরিতে॥
রাজা কহে বিষ্ণু যদি প্রতিগ্রহ[৩] করে।
তাহার অধিক ভাগ্য কি আছে সংসারে॥
নতুবাও যদি হয় তেজস্বী ব্রাহ্মণ।
প্রতিশ্রুত হৈয়া পুন অন্যথাকরণ॥
নরকের দ্বার সেই অযশ ভুবনে।
জীয়ন্তে মরণতুল্য ধিক্কার জীবনে॥
পুনরপি মুনি কহে যথা সর্ব্বনাশ।
অর্থের রক্ষণে মিথ্যা কহনে না দোষ॥

পাঠান্তর—(ক) সুধাসার—সুধাধার।
(খ) আর—কৃষ্ণ।
(গ) ভূপতি—মহারাজ।
(ঘ) মুনি—শুনি।
(ঙ) ছলরূপে—ছদ্মরূপে।
(চ) ছদ্মরূপে—ছলরূপে।
(ছ) ব্রাহ্মণের—যাচিঞার।

পাঠান্তর—(ক) গোসাঞি সুবিজ্ঞ—মিত্র সুবুদ্ধি।
(খ) হউ—হই।
১। অপহ্নব—অস্বীকার।
২। ফল্গু—তুচ্ছ।
৩। প্রতিগ্রহ করে—দান গ্রহণ করেন।

অতএব মোর বাক্য হেলন করিবে।
অচিরাতে রাজ্য-আদি শ্রীভ্রষ্ট হইবে॥
যদ্যপিহ মুনিবর অভিশাপ (ক) দিলা।
তথাপিহ রাজা বলি (খ) দৃকপাত না কৈলা॥
রাণী বিন্ধ্যাবলী দূরে দাণ্ডাইয়া ছিলা।
মুনির বারণ শুনি দুঃখিত হইলা॥
পরমরূপসী সতী সুশীলচরিতা।
নানা আভরণ অঙ্গে মাণিকামুকুতা॥
শত শত দাসীগণ চৌদিগে বেড়িয়া।
তথাপিহ শীঘ্র এক জলঘট লৈয়া॥
ক্রোধ হর্ষ সহ যজ্ঞস্থলে রাজা-স্থানে।
আসিয়া কহয়ে কিছু কুপিত বচনে॥
শ্রীচরণ মহারাজ শীঘ্র ধৌত কর।
সাধুর সম্মত নিজ মঙ্গল বিচার॥
মুনিঠাকুরের শাপে যে হয় সে হউক।
রাজ্য আর স্ত্রী অর্থ যায় সে যাউক॥
প্রতিকূল মুনিবাক্য দূরে তেয়াগিয়া।
যাহা চাহে তাহা দেহ সৌভাগ্য মানিয়া॥
এ হেন ভাগ্যের সীমা সাধুর দুর্লভ।
আজু সে তোমার অগ্রে সম্প্রতি সুলভ॥
অতএব অতিশীঘ্র শ্রীচরণ আগে।
সমর্পণ কর ধন প্রাণ যাহা মাগে॥
এত বলি বিন্ধ্যাবলি জল ঢালে পদে।
মহারাজ বলি রাজা প্রক্ষালে আমোদে॥
দুখানি সুন্দর পদ প্রক্ষালন করি।
হৃদয়ে ধরয়ে পুন চক্ষে বহে বারি॥
শ্রীচরণধৌতজল মস্তকে ধরিল।
জনম সফল কৃতকৃতার্থ মানিল॥
যে চরণজল শিব অদ্যাপি যতনে।
মস্তকে ধারণ করি শিব[১] করি মানে॥
বারি ঝারি কুশা তিল তুলসী লইয়া।
ত্রিপাদ ধরণীদানে উদ্‌যুক্ত (গ) হইলা॥

তথাপিহ শুক্র পুন বারণ করয়ে।
ফিরিয়া না চাহে রাজা কর্ণে না শুনয়ে॥
হরির চরণে যার আর্টাকিল (ক) মন।
অন্য বিঘ্নে কি করিবে কালের দুর্গম॥
একান্ত যদ্যপি রাজা না শুনিলা বাক্য।
বিচার করিলা এক মনেতে কুতর্ক॥
সূক্ষ্মরূপে প্রবেশিলা ঝারির ভিতরি।
জল চলিবার পথ-নাল রুদ্ধ করি॥
দানের সংকল্পহেতু ঝারি লয়্যা করে।
জল ঢালিবারে চাহে জল নাহি সরে॥
ব্যস্ত হইয়া (খ) রাজা কুশা এক লৈলা॥
কিসে আর্টাকিল বলি নালে চালাইলা॥
প্রভুর স্বেচ্ছায় এক কৌতুক হইল।
কুশাগ্র যাইয়া মুনির চক্ষেতে বিন্ধিল॥
বেদনা পাইয়া বিপ্র বাহির হইল।
সেই হৈতে মুনির এক চক্ষু অন্ধ হৈল॥
রাজা শ্রীবামনদেবে ত্রিপাদ ধরণী।
বিধিমতে দান করি করে যোড়পাণি॥
দেবতাগণের কার্য্য বলিরে করুণা।
ভুবনপাবনী লীলা এ তিন বাসনা॥
তিন কার্য্য সাধে (গ) আর অবান্তর বহু।
তাহার বৃত্তান্ত চমৎকার শুন পহু॥
বামন আছিলা প্রভু অবামন হৈলা।
দেখিতে দেখিতে রূপ বৃহত করিলা॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন নভ ব্যাপি।
অপ্রমেয় চমৎকার ত্রিবিক্রমরূপী॥
একপাদে ব্যাপি নিল ভূ অতল-আদি।
দ্বিতীয়ে ব্যাপিলা ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতি॥
ব্রহ্মলোকে ঊর্দ্ধে যায়্যা কটাহ ভেদিল।
যে চরণে ত্রিপাবনী গঙ্গা জনমিল॥
তৃতীয় চরণ ধরিবার স্থান নাই।
বলিরে কহয়ে দেহ স্থান আর কই॥

পাঠান্তর- (ক) অভিশাপ - অভিশপ্ত।
(খ) বলি—বাণী।
(গ) উদ্‌যুক্ত—উন্মুখ।
১। শিব - মঙ্গল, কল্যাণ।

পাঠান্তর- (ক) আর্টাকিল—প্রবেশিল।
(খ) ব্যস্ত হইয়া—ব্যস্তসমস্ত হয়ে।
(গ) সাধে—সাথে।

মহারাজ কহে প্রভু আর কোথা (ক) পাব।
কি ধন আছয়ে আর শ্রীচরণে দিব॥
প্রভু কহে প্রতিশ্রুত হইয়া বঞ্চিলে।
আজি তুমি মোর স্থানে দণ্ডার্হ হইলে॥
এত কহি বলিরাজে বন্ধন করিলা।
মহারাজ প্রেমাবেশে আনন্দ হইলা॥
প্রভুর যে গূঢ়াশয়[১] কে বুঝিতে পারে।
কোন্ ছলে অনুগ্রহ নিগ্রহ বা করে॥
ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র আদি যত দেবগণ।
নারদ প্রহ্লাদ-আদি করয়ে স্তবন॥
বলিরাজা কহে কিছু অপূর্ব্ব কথন।
তাহা কিছু কহি শুন কর্ণরসায়ন॥
মহারাজা (খ) কহে প্রভু দয়ার সাগর।
তুমি সে শরণ্য এক জগত ভিতর॥
মুঞি হেন মূঢ় পাপী অসুর (গ) অগ্রাহ্য।
পরদ্রোহকারী নীচ সতের অভোজ্য॥
এ হেন পামর জনে এত কৃপা কৈলে।
ভজন সাধন কিছু হেতু না গণিলে॥
তোমার কৃপার কোনরূপে নহি পাত্র।
প্রহ্লাদের পৌত্র এক হেতু দেখি মাত্র॥
তোমার আশয় প্রভু অতি সে গম্ভীর।
বুঝিতে পারয়ে আছে হেন কোন্ ধীর॥
পুরন্দর পক্ষ হৈয়া ছলিলে আমারে।
তাহারে অনর্থ দিয়া অর্থ দিলে মোরে॥
দেবরাজ মূর্খ ইহা বুঝিতে নারিলা।
ক্ষুদ্র-অর্থ-সাধনে তোমারে পাঠাইলা॥
তুমি হেন ধন নাহি চিনিল বর্ব্বর।
কাঞ্চন বেচিয়া নিল সুতুচ্ছ কঙ্কর॥
সাধুর অগ্রাহ্য রাজ্য অনিত্য অসার।
হেন তুচ্ছ ধন হেতু হারাইলা সার॥
তুমি যে দুর্লভ ধন সারাৎসার বস্তু।
না চিনিল মন্দমতি মূঢ় বস্তুতন্তু॥

পাঠান্তর—(ক) কোথা—কিবা।
(খ) মহারাজা—বলিরাজা।
(গ) অসুর—অধম।
১। গূঢ়াশয়—গোপন উদ্দেশ্য।

বড় কৃপা কৈলে মোরে মায়াফাঁস হইতে।
মুক্ত করি দিলা নিজ চরণ-অমৃতে॥
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ বলির বচন।
শুনিয়া প্রশংসা করে আনন্দিত মন॥
ইন্দ্র দেবরাজ শুনি সলজ্জ হইলা।
বলিরাজে ধন্য মানি আপনা নিন্দিলা॥
অন্তরে আনন্দ প্রভু বলির বচনে।
যথার্থ কহিলা বলি প্রশংসয় মনে॥
বলি প্রতি দয়া অতি যদ্যপি প্রবল।
প্রতিকূল-ন্যায়[১] বাহ্যে কহয়ে দুর্ব্বল॥
হাঁ রে রে দুর্ম্মতি মোর তৃতীয় চরণ।
কোথায় রাখিব কহ শীঘ্র দেহ স্থান॥
বলি কহে শ্রীচরণ রাখিবার যোগ্য।
আমার মস্তক এক স্থান হয় দীর্ঘ॥
ইহাতে ধরহ পদকমল সুন্দর।
বাক্যদত্ত হৈতে মুঞি হৈনু অবসর॥
তোমার শরীর এই জগত তোমার।
তোমার চরণে সোঁপিলাম সে নির্দ্ধার॥
তুমি প্রভু তুমি বিভু তুমি জগন্নাথ।
বিশেষে আমার (ক) তুমি অনাথের নাথ॥
যেই ইচ্ছা কর তুমি শরণ লইনু।
আত্মনিবেদন এবে চরণে করিনু॥
বলির সৌভাগ্য কিবা কহনে না যায়।
জগন্মঙ্গল পদ ধরিলা মাথায়॥
জয় জয় ধন্য ধন্য নমোনম শব্দ।
ত্রিজগতে কোলাহল হৈল কর্ণলুব্ধ॥
বন্ধন ঘুচায়্যা প্রভু গদগদভাবে।
আলিঙ্গন করি বহু তোষে মৃদুরবে॥
তুমি মোর প্রিয় আমি তোমাতে বিক্রীত।
হইলাম নিত্য বন্ধ পরাণ সহিত॥
এত কহি আজ্ঞা দিলা দেবশিল্পকারে।
পাতাল-ভুবনে এক পুরী রচিবারে (খ)॥

পাঠান্তর—(ক) বিশেষে আমার—বিশেষত হও।
(খ) রচিবারে—করিবারে।
১। প্রতিকূল-ন্যায়—বিরোধীর মত।

অপূর্ব্ব অমরাবতী ন্যক্কার (ক) করিয়া[১]।
মণিময়-পুরী দিলা নির্ম্মাণ করিয়া॥
প্রভু ভৃত্যে দোঁহে তাঁহা বিরাজ করিলা।
বলি সিংহাসনে বৈসে প্রভু দ্বারী হৈলা॥
নিত্য দরশন করে বিরাজয়ে রঙ্গে।
দিবানিশি ভাসে রাজা প্রেমের তরঙ্গে॥
অতএব ধন্য ধন্য বলি মহাশয়।
যাঁর যশ গুণ কীর্ত্তি ত্রিভুবনে গায়॥
তাঁহার চরণরেণু ভুবনপাবন।
যদি কোনভাগ্যে মিলে তার এক কণ॥
তবে এই সংসার-বাড়বানল হৈতে।
এড়াই দারুণ দুঃখ যম-যাতনাতে॥
কৃষ্ণভক্তি নিত্যসুখ পরম-আনন্দে।
পরাৎপর লাভ হয় ছুটে ভববন্ধে॥
হে হে শ্রীল-বলিরাজা (খ) মোরে কৃপা কর।
লালদাস মস্তকে চরণযুগ ধর॥

কতিপয় ভক্ত—নামসংকীর্ত্তন।

*হরি-কৃপারস আস্বাদিতে ভক্ত জেতে (গ)।
ভক্তি মহারত্ন লভ্য যার স্মৃতিমাত্রে॥
শ্রীশংকর শুকদেব সনকাদি মুনি।
কপিল নারদ শ্রেষ্ঠ দয়ালু বাখানি॥
হনুমান বিষ্বক্‌সেন প্রহ্লাদ বলি ভীষ্ম।
অর্জ্জুন অম্বরীষ ধ্রুব ব্যক্ত সর্ব্ববিশ্ব (ঘ)॥
বিভীষণ অক্রূর উদ্ধব অধিকারী।
ভগবন্ত-প্রসাদ যাঁহার প্রতি ভারী॥

পাঠান্তর—(ক) ন্যক্কার—তুল্য যে।
(খ) রাজা—রাজ।
(গ) জেতে—যাতে।
(ঘ) সর্ব্ববিশ্ব—সর্ব্বরিষ্য।

১। ন্যক্কার করিয়া—অর্থাৎ শোভায় তাহাকে অতিক্রম করিয়া।

* কোন কোন পুস্তকে ইহার পূর্ব্বে অতিরিক্ত দুই লাইন আছে। কতিপয় ভক্তগণ নাম সঙ্কীর্ত্তন। করিলাম মাত্র আত্মশুদ্ধির কারণ॥

ইঁহা সভার পাদরেণু-মহিমা অপার।
কৃতকৃত্য হই যদি পাউঁ মুঞি ছার (ক)॥
পরমাত্মা হরি চতুর্ভুজ (খ) ধ্যান-পরা।
তাঁ-সভার শ্রীচরণ-ধ্যানে হউঁ ভোরা॥
অগস্ত্য পুলহ আর পুলস্ত্য চ্যবন (গ)।
বশিষ্ঠ সৌভরি অত্রি কর্দ্দম সুজন॥
ঋচীক গৌতম গর্গ শ্রীব্যাস লোমশ।
ভৃগু দাল্‌ভ্য শৃঙ্গী আর অঙ্গিরা চমস॥
মাণ্ডব্য দুর্ব্বাসা শিষ্য সহস্র আটাশী।
বিশ্বামিত্র জামদগ্নি জাবালিক ঋষি॥
কশ্যপ পর্ব্বত পরাশর পদরজ।
সংসার ত্রাণের অগ্রসর উচ্চ ধ্বজ॥

অথ পুরাণসংখ্যা তত্র শ্রীমদ্ভাগবত মহিমা কথন।

শ্রীল ব্যাস ইতিহাস আদি করি শাস্ত্র।
অষ্টাদশ পুরাণ বর্ণিলা সুপবিত্র॥
তথাচ প্রসন্ন যে নহিল বুদ্ধি-মন।
শ্রীনারদ উপদেশ দিলা বিলক্ষণ (ঘ)॥
ত্রৈলোক্যপাবন শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র।
সাধুজন-চকোরের সুধাপান-পাত্র॥
জগত মঙ্গল নিধি বিধি নিরমিলা।
সম্প্রদায়-ক্রমে আইলা শুক প্রচারিলা॥
ব্যাসগোস্বামী যত্নে গ্রন্থন করিয়া।
জগতে রসের মালা দিলা পরাইয়া॥
যতেক পুরাণশাস্ত্র তাহা কহি শুন।
তামস রাজস আর সাত্ত্বিক নির্গুণ॥
মৎস্য আর কূর্ম্ম তথা লিঙ্গ শৈব স্কন্দ।
আর অগ্নি এই ছয় তামস প্রবন্ধ॥
ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মবৈবর্ত্ত আর যে মার্কণ্ড।
ভবিষ্য বামন ব্রহ্ম রাজস ষট্‌খণ্ড॥

পাঠান্তর—(ক) কৃতকার্য্য হই যদি পাই মুঞি ছার।
(খ) হরি চতুর্ভুজ—হরিগুণ সদা।
(গ) চ্যবন—শ্রীমান।
(ঘ) বিলক্ষণ—বিচক্ষণ।

বিষ্ণু আর নারদীয় গারুড় পদম[১]।
বরাহ ভাগবত লঘু সাত্ত্বিক উত্তম॥

সংখ্যা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

"মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি (ক) তামসানি নিবোধত (খ)॥
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত (গ)॥
বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ (ঘ)॥"

অনুবাদ।—মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ এবং অগ্নি—এই ছয় পুরাণকে তামস বলিয়া জানিবে। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্ম—এই ছয়টিকে রাজস পুরাণ বলিয়া জানিবে। বিষ্ণু, নারদ, শুভ ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ—এই ছয়টিকে হে শুভদর্শনে মনীষিগণ সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত হয়ে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক।
মহিমাতে নাহি যার সমান অধিক॥
শ্রবণসুখদ ভক্তিরসময় নিধি।
একবার যেই শুনে ঝুরে নিরবধি॥
গুণের অবধি নাহি এক তাহে শুন।
শ্রবণ করিব বলি চিন্তে যেই জন॥
তাহার হৃদয়পথে (ঙ) শ্রীকৃষ্ণসুন্দরে।
তৎক্ষণাতে বদ্ধ হন প্রসন্ন অন্তরে॥
তম-রজ-সত্ত্বগুণে পুরাণ যে কহিল।
তাহার বিশেষ কহি শাস্ত্রে যে শুনিল॥
তামস যে মৎস্য-আদি-পুরাণ-আখ্যানে।
সত্ত্বময় প্রসঙ্গ আছয়ে স্থানে স্থানে॥
তবে যে তামস নাম তাহার কারণ।
তমের আখ্যান হয় অধিক বর্ণন॥

পাঠান্তর—(ক) ষড়েতানি—পুরাণানি।
(খ) নিবোধত—নিবোধ মে।
(গ) নিবোধত—মনীষিভিঃ অথবা নিবোধ মে।
(ঘ) মনীষিভিঃ—শুভানি বৈ।
(ঙ) হৃদয়পথে—হৃদয়পুরে।
১। পদম—পদ্ম।

সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মতবিরোধ যথায়।
তামস যে মত সেই জানিবে তথায়॥
রাজস পুরাণে রজগুণের আধিক্য।
সাত্ত্বিক পুরাণে সত্ত্বময় গুণ-বাক্য॥
তম-কল্পে যেই যেই পুরাণ বর্ণিলা।
সেই সেই তমভাবে উৎপন্ন হইলা॥
রাজস সাত্ত্বিক যত অই মত হৈলা।
নির্গুণ শ্রীভাগবত স্বত প্রকাশিলা॥
যদি বল অষ্টাদশ ভাগবত সহ।
ঊনবিংশ কহিলে যে বড়ই সন্দেহ॥
তাহার কারণ ভাগবতের টীকাতে।
বৃহৎতোষণী আর ষট্সন্দর্ভ গ্রন্থে॥
সিদ্ধান্ত আছয়ে তাহা কহি এবে শুন।
না জানিয়া অন্য লোকে চিন্তে পুনঃপুন॥
প্রথম ভাগবত নামে চারি হাজার শ্লোকে।
বর্ণিলা শ্রীব্যাসদেব পুরাণ সাত্ত্বিকে॥
পরে যবে শ্রীনারদ উপদেশ দিলা।
শ্রীমদ্ভাগবত নাম গ্রন্থ প্রকাশিলা॥
পূর্ব্বগ্রন্থ চারিহাজার আনুষঙ্গ ক্রমে।
শ্রীমদ্ভাগবত সেহ সকলি বিশ্রামে॥
স্বতন্ত্রেও চারি হাজার সে গ্রন্থ রহিল।
তন্ত্রভাগবত নাম তাহার হইল॥
লঘু-ভাগবত বলি লোকেতে কহয়।
উপপুরাণের মধ্যে গণনা যে হয় (ক)॥
অষ্টাদশ উপপুরাণ পুরাণ সপ্তদশ।
মহাপুরাণ ভাগবত মহাগুণযশ॥
দশলক্ষণ আক্রান্ত মহিমার সীমা।
গাইল তাহার গুণ করিয়া গরিমা॥
বহুশাস্ত্রে ভাগবতের মহিমা কহয়।
কত কহা যায় মাত্র কহি শ্লোকত্রয়॥

গারুড়ে—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥

পাঠান্তর—(ক) গণনা যে হয়—গণনা করয়।

পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥

অনুবাদ।—এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থ বা মহাপুরাণ ব্রহ্মসূত্রের (বেদান্তসূত্রের) অর্থ বা ভাষ্যস্বরূপ; মহাভারতের অর্থ ইহাতে বিশেষভাবে নির্ণীত হইয়াছে। ইহা গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ; ইহাতে বা ইহা হইতে বেদের অর্থ বিস্তারিত হইয়াছে। সামবেদ যেমন বেদশ্রেষ্ঠ ইহাও সেইরূপ পুরাণশ্রেষ্ঠ। ইহা স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ইহাতে বারোটি স্কন্ধ এবং একশত বিচ্ছেদ বা প্রকরণ আছে। ইহাতে আঠারো হাজার শ্লোক আছে।

পাদ্মে—

"পাদৌ যদীয়ৌ প্রথম-দ্বিতীয়ৌ,
তৃতীয়-তুর্য্যৌ কথিতৌ যদূরূ।
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো,
ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ॥
কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো যদীয়ো,
মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্।
একাদশো যস্য ললাটপট্টং,
শিরোঽপি যদ্দ্বাদশ এব ভাতি॥
তমাদিদেবং করুণানিধানং
তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপার-সংসারসমুদ্র সেতুং
ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্॥"

অনুবাদ।—হে রাজন্! ভাগবতস্বরূপ তমাল কান্তি (শ্যামবর্ণ), করুণার আধার আদিদেবকে আমরা প্রণাম করি। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ ইঁহার দুই চরণ, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ ইঁহার উরুযুগল, পঞ্চম স্কন্ধ ইঁহার নাভি, ষষ্ঠ স্কন্ধ ইঁহার বক্ষঃ, সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধ ইঁহার দুই বাহু, নবম স্কন্ধ ইঁহার সুন্দর কণ্ঠ, দশম স্কন্ধ ইঁহার প্রফুল্ল বদনকমল, একাদশ স্কন্ধ ইঁহার ললাটদেশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ ইঁহার মস্তকরূপে শোভিত হইতেছে। দুস্তর সংসারসমুদ্রের ইঁনি সেতুস্বরূপ, জগতের সুমঙ্গলের (তৃপ্তির) জন্য ইঁনি অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তদীয় (ক) ভাবেতে ব্যক্ত অতি সে অনুপ॥

পাঠান্তর—(ক) তদীয়—স্বদীয়।

অতেব পুরাণশাস্ত্র তদীয়-সম্ভব (ক)।
অপার গুণের মধ্যে গাই এক লব॥
তার মধ্যে ভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম।
ত্রিজগতে পরাৎপর শাস্ত্র অনুপম॥
গায়ত্রী ব্রহ্মসূত্রার্থ বেদার্থ ভারত।
সর্ব্বময় সারাৎসার শ্রীমদ্ভাগবত॥
অন্যান্য পুরাণশাস্ত্রে অন্যান্য বাখান।
শ্রীমদ্ভাগবতে মাত্র কৃষ্ণ গুণগান॥
অন্যান্য শ্রবণে মন অন্যপথে যায়।
ভাগবত শ্রুতমাত্র কৃষ্ণে আটকায় (খ)॥
'অতএব জীবের যে একান্ত কর্ত্তব্য।
শ্রীমদ্ভাগবতকথা অবশ্য শ্রোতব্য॥
এক ভাগবত হয় ভক্তিরসপাত্র।
আর ভাগবত হয় ভাগবতশাস্ত্র॥"
সাধুমুখে এই বাক্য শুনিয়ে শ্রবণে।
শরণ লইনু মুঞি তাঁহার চরণে॥
ভাগবত শ্রবণের পদ্ধতি শুনিল।
যতনে কবচ করি কণ্ঠেতে ধরিল (গ)॥
সজাতীয়াশয়-সাধু-সঙ্গেতে বসিব।
শ্রীমদ্ভাগবতকথা আস্বাদ করিব॥
তবে সে শ্রবণে সুখ অধিক জন্ময়।
নতুবা শ্রবণে রস তাদৃক্ না হয়॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

"শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে॥"

অনুবাদ।—রসিকজনদের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থসমূহের আস্বাদন এবং সমজাতীয় প্রবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট, স্নিগ্ধস্বভাব এবং নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ (ভক্তিসাধনের প্রধান অঙ্গস্বরূপ)।

অবৈষ্ণব স্থানেতে শ্রবণ নহে ইষ্ট।
দুগ্ধ-হেন বস্তু যেন সর্পের উচ্ছিষ্ট॥

পাঠান্তর—(ক) তদীয়-সম্ভব—স্বদীয়-সম্ভব।
(খ) কৃষ্ণে আটকায়—কৃষ্ণে মন ধায়।
(গ) ধরিল—পরিল।

পাদ্মে—

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ।
ন শ্রোতব্যং বৈষ্ণবানাং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"

অনুবাদ—সর্পের উচ্ছিষ্ট দুগ্ধ যেমন পানের অযোগ্য সেইরূপ অবৈষ্ণবের মুখে উচ্চারিত শ্রীভগবানের পবিত্র কীর্ত্তিকথাও বৈষ্ণবের শুনিবার অযোগ্য (শোনা উচিত নহে)।

ভাগবত হেন ধন পাইয়া করেতে।
চিনিতেই না পারিনু (ক) দুর্দ্দৈববিপাকেতে॥
দন্তে তৃণ করি ধরি অঞ্জলি মস্তকে।
হে হে শ্রীমদ্ভাগবত কৃপা কর মোকে॥
তোমার চরণে রতি-মতি দেহ মোর (খ)।
লালদাস নিবেদয় কাতর অন্তর (গ)॥

অথ অষ্টাদশস্মৃতি-গুণকথন।

অষ্টাদশস্মৃতি প্রকাশিলা ঋষিগণ।
মস্তকে ধরহুঁ তাহা-সভার চরণ॥
কৃষ্ণভক্তি গ্রন্থের তাৎপর্য্য-অর্থ হয়ে।
না বুঝিয়া কর্ম্মী জ্ঞানী অন্যথা কহয়ে॥
উপক্রম অভ্যাস উপসংহার আদি ছয়।
লক্ষণে প্রাধান্যমাত্র ভক্তির আশয় (ঘ)॥
অতএব অষ্টাদশস্মৃতি-নাম শুন।
যাতে সর্ব্বপাপ হরে জন্ম নহে পুন॥
মনু আর অত্রি হন বৈষ্ণবী হারীত।
যামী যাজ্ঞবল্ক্য আর অঙ্গিরাবক্ত্রত (ঙ)॥
শনৈশ্চর সামৃতক কাত্যায়ন দাষী।
সাংখিল্য গোতমী তথা বশিষ্ঠ সুভাষী॥

পাঠান্তর—(ক) না পারিনু—নারিনু।
(খ) মোর—মোরে।
(গ) কাতর অন্তর—একান্ত অন্তর।
(ঘ) আশয়—আশ্রয়।
(ঙ) অঙ্গিরাবক্ত্রত—অঙ্গিরাবভূত।

সুরগুরু শাতাতপী (ক) পরাশর ক্রতু।
আশাপাশ-মুক্তিদাতা ভক্তির নির্হেতু (খ)॥

শ্রীরামচন্দ্রপার্ষদ-গুণকথনম্।

নামকীর্ত্তনম্।

শ্রীরামের পারষদ্ স্মরণ যেই করে।
অনপায়িনী¹ ভক্তি পায় সে জন অদূরে॥
ভুবনবিজয়ী সর্ব্বমঙ্গলের ধাম।
নিত্যসিদ্ধরূপী চিদানন্দ অভিরাম॥
মন্ত্রিবর্গ আদি যত অসংখ্য গণন।
পবিত্র লাগিয়া কিছু করি সংকীর্ত্তন॥
যাহার কীর্ত্তনে সর্ব্বপাপ বিঘ্ন হরে।
অনায়াসে রঘুমণি বৈসয়ে অন্তরে॥
শ্রীসুগ্রীব কেশরেয় দধিমুখ দ্বিবিদ।
পয়োদ² ঋক্ষপতি³ যেঁহ প্রিয়রামপদ॥
উল্কা সুভট আর দরীমুখ (গ) নল।
গয় নীল সুসেন কুমুদ মহাবল॥
পনস গবাক্ষ শরভঙ্গ অতিবল।
অঙ্গদ (ঘ) যুবরাজ-আদি গন্ধমাদন॥
ইত্যাদি আঠারো (ঙ) পদ্ম যূথমন্ত্রী হয়ে।
আর কত শত তার কে সংখ্যা করয়ে॥
সভা (চ) পাদরজবৃষ্টি শুভদৃষ্টি করি।
মো-পাপীর শিরে কর কৃপণ বিচারি॥

পাঠান্তর—(ক) শাতাতপী—আসাতাপী।
(খ) ভক্তির নির্হেতু—ভক্তি নির্হেতু।
(গ) দরীমুখ—দধিমুখ।
(ঘ) অঙ্গদ—শ্রেষ্ঠ।
(ঙ) আঠারো—আটাশী।
(চ) সভা—সভায়।

১। অনপায়িনী—যাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না বা দূরীভূত হয় না।
২। পয়োদ স্থানে নাভাজীর মূল হিন্দী গ্রন্থে আছে মৈন্দ।
৩। ঋক্ষপতি—ভল্লুকরাজ জাম্ববান।

ইতি শ্রীভক্তমালে অক্রূরাদি-ভক্তগণ চরিত্র-বর্ণনং নাম অষ্টমমালা॥ ৮॥

নবম মালা

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রীস্বরূপ শ্রীনিবাস জগদানন্দ।
জয় রায় রামানন্দ প্রেমানন্দ-কন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

শ্রীমদ্ব্রজপরিকরগণ-নাম-গুণাদি বর্ণন।

ব্রজের যে বড় গোপ প্রধান পর্জ্জন্য।
ত্রিলোকে যাহার বড় সম নাহি অন্য॥
শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ অধিক কি কব।
জগতের আর্য্য পূজ্য মঙ্গলের শিব॥
ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ ইষ্ট শ্রেষ্ঠে সুচরিত।
সর্ব্বোত্তমোত্তম শুভ পুত্র মনোনীত॥
কামনা করিয়া ঘোরতর তীব্র তপ।
ধেয়ান সমাধি কৈলা নানাবিধ (ক) জপ॥
তাহাতে জন্মিলা সাত পুত্র[১] শুভোদয়।
সুধন্য মেদিনী যাতে আনন্দহৃদয়॥
সুশীল সুশান্ত দান্ত উদারচরিত (খ)।
সর্ব্বগুণাকর সর্ব্বলোকের পূজিত॥
নিরীহ নির্গুণ নিত্য চিদানন্দময়।
স্বাভাবিক প্রভু জন্ম লৌকিকের প্রায়॥
তার মধ্যে শ্রীল নন্দরাজ মহাশয়।
যাঁহার মহিমা বেদে শতমুখে (গ) গায়॥
তাঁহার মহিমা গুণ হেন কে সংসারে।
কোটি যে অংশের লব কহিবারে পারে॥
কি কহিব চমৎকার মুখে না যুয়ায়।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাঁহার তনয়॥

লালন-পালন করে তাড়ন ভর্ৎসন।
গৃহস্থালি পাতিয়াছে ত্রিলোকরঞ্জন॥
যাঁহার সৌভাগ্য দেখি অজ-ভব-আদি।
আপনা নিন্দয় গায় গুণ নিরবধি॥
ত্রিজগতে গানচ্ছন্দে সর্ব্বলোক গায়।
দুস্তর সংসার হৈতে যাহাতে এড়ায়॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি সুধাসাগরে পড়িয়া।
ডুবি ডুবি খায় সদা উদর পূরিয়া॥
তাঁহার মহিমা মুঞি কি কহিতে জানি।
বামন হইয়া চান্দ ধরিবারে গণি॥
ছার মূর্খ দুরাচার মূঢ় জ্ঞানহীন।
ভক্তিভাবিহীন তাতে ইন্দ্রিয় অধীন॥
হেন ব্যক্তি করে হেন বিচারেতে কাম।
লোকে উপহাস্য যে কেবল ধার্ষ্ট্যতাম॥
তথাপিহ গড়বড় করি যোড়যাড়ে।
রচি যাতে যদি সে চরণ মনে পড়ে॥
তাঁহার স্মরণে (ক) মতি পবিত্র-কারণ।
রচনা উদ্যম নহে পৌরুষভাজন॥
পর্জ্জন্যের সপ্তপুত্র তাঁ সভার নাম।
ক্রমে কহি শ্রবণ-মঙ্গল অভিরাম॥
ধরানন্দ ধ্রুবানন্দ তৃতীয় উপনন্দ।
অভিনন্দ চতুর্থ পঞ্চম তথা নন্দ॥
ষষ্ঠ সুনন্দ[১] আর সপ্তম শুভানন্দ।
আশপাশ সহ বাস (খ) সহ পশুবৃন্দ।
ধরানন্দ বড় পুত্রে রাজ্য অভিষেক।
করিতে উদ্যোগ কৈলা সম্ভার অনেক॥
তেঁহো অসম্মতি হৈলা সকলে মিলিয়া।
নন্দ যে পঞ্চম ভ্রাতায় নৃপতি লাগিয়া॥
কহিলা পর্জ্জন্য রাজে রাজা না হইব।
নন্দ মহারাজা হৈলে তাহে সুখী হব॥

পাঠান্তর (ক) নানাবিধ—নানাবিধি।
(খ) উদারচরিত—উদার চরিত্র।
(গ) বেদে শতমুখে—লোকে বেদে সদা।
১। সাত পুত্র—শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা মতে পঞ্চপুত্র।

পাঠান্তর—(ক) স্মরণে—চরণে।
(খ) সহ বাস—গ্রামবাসী।
১। সুনন্দ—অপর নাম সন্নন্দ।

অতএব ব্রজে রাজা নন্দরায় হৈলা।
জগন্মাতা শ্রীযশোদা মহিষী মহিলা (ক)॥
তাঁহার অশেষ গুণ অতুল মহিমা।
বেদ-বিধি শুক-আদি নাহি পায় সীমা॥
ভাগবতে শুকদেব করিলা কীর্ত্তন।
কহিবারে নাহি জানি ক্ষান্তি তে কারণ॥
কিবা সে সৌভাগ্য কৃষ্ণজননীর পারী।
লালন-পালনকর্ত্রী কৃষ্ণে স্তনদাত্রী॥

শ্রীভাগবতে—

"নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্! শ্রেয় এব মহোদয়ম্।
যশোদা চ (খ) মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥

অনুবাদ।—হে ব্রহ্মণ, নন্দ মহাসৌভাগ্যজনক কি পুণ্য করিয়াছিলেন, আর মহাভাগাবতী যশোদাই বা কি পুণ্য করিয়াছিলেন, স্বয়ং হরি যাহার স্তন্য পান করিয়াছিলেন।

তেঁহো মোর ঠাকুরাণী তাঁহার চরণ।
কবে মুঞি ধোয়াইব করিয়া যতন॥
কবে তেঁহো আজ্ঞা দিবা শ্রীকৃষ্ণ লাগিয়া।
রচিবারে মিষ্ট অন্ন অঙ্গুলি হেলাইয়া॥

[মূল হিন্দী]

"বাল বৃদ্ধ নরনারী জিতে গোপ হেঁ অর্থী উন
পাদরজ॥
নন্দ গোপ উপনন্দ ধ্রুব ধরানন্দ মহরি যশোদা।
কীরতিদা বৃষভানু-কুম্বরি সহচরি বিহরিত মন
মোদা॥
মধুমঙ্গল সুবল সুবাহু ভোজ অর্জ্জুন শ্রীদামা।
মণ্ডলি গবাল অনেক শ্যাম সঙ্গী বহুনামা॥
ঘোষনিবাসনকী কৃপা সুর নর বাঞ্ছিত আদি অজ।
বাল-বৃদ্ধ নর নারী জিতে গোপ হেঁ অর্থী উন
পাদরজ।
ব্রতরাজ সুবন সঙ্গ সদন বন অনুগ সদা ততপর
রহৈ॥

রক্তক পত্রক অবর পত্র সবহী মন ভাবে।
মধুকণ্ঠ মধুবর্ত্ত রসাল বিশাল সুহাবে॥
প্রেমকন্দ মকরন্দ আনন্দ সদা চন্দ্রহাসা।
পয়দ বকুল রসদান শারদা বুদ্ধি প্রকাশা॥
সেবাসমৈ বিচারিকৈ চারু চতুর চিতকী লহৈ।
ব্রতরাজ সুবন সঙ্গ সদন বন অনুগ সদা ততপর
রহৈ॥

অস্যার্থঃ।

ব্রজের গোপ বাল বৃদ্ধ যত নর নারী।
পশু পক্ষ বৃক্ষ বনস্পতি আদি করি॥
নিত্যসুখময় অপ্রাকৃত চিদানন্দ।
পরম উপাস্য সভার চরণারবিন্দ॥
ব্রহ্মময় ধাম শ্রীল বৃন্দাবন-ভূমি।
যোগী যতি তপীর অগম্য জ্ঞানী কর্ম্মী॥
তাঁহার মহিমা কহিবার শক্তি কার।
অনুভব কর নিত্য ধ্যান কর যার॥
নিত্যনিবাসের স্থান কৃষ্ণ বলরাম।
শ্রীনন্দাদি যশোদা রোহিণী অনুপাম॥
শ্রীযশোদা-জগন্মাতা মহিমা-আভাস।
কিঞ্চিত কহিল পূর্ব্বে না পুরিল আশ॥
পুনর্ব্বার কিছু কহিবারে মনে করি।
নিজে মূর্খ নাহি জানি আঁকুপাঁকু করি॥
শ্রীরোহিণী মাতা আর যশোদাসুন্দরী।
দুই মাতা সম দুই গুণের গাগরি॥
ত্রিভুবনে পূজ্য মান্য ধন্য সদুপাস্য।
শান্ত শিষ্ট সুশীল সুস্নিগ্ধ প্রিয়ভাষ্য॥
মর্য্যাদক সুমর্য্যাদা সকলের আর্য্য।
সভারে সমান যথাযোগ্য শৌর্য্যবীর্য্য॥
অধিক কি কব রামকৃষ্ণের জননী।
যাঁর স্তনপান করে (ক) সুধাধিক মানি॥
পুতনা রাক্ষসী মাতৃবেশে স্তন দিল।
জিঘাংসা করিয়াও মাতৃগতিকে পাইল॥
অতএব মহামতি মাতা শ্রীযশোদা।
ভুবনপাবনী সর্ব্ব-অর্থ সিদ্ধিপ্রদা॥

পাঠান্তর—(ক) মহিলা—হইলা।
(খ) চ—বা।

পাঠান্তর—(ক) করে—করি।

তাঁহার মহিমা বেদ-বিধি-অগোচর।
আত্মারাম শুকদেব প্রশংসে বিস্তর॥
নাভাজী শ্রীব্রজপুরের কৃষ্ণপরিকর।
সংক্ষেপে বর্ণিলা বহু না কৈল বিস্তার (ক)॥
তাঁহার আশয় আদি পদের যে অর্থ।
বর্ণিব বিস্তারি কিছু যেমন সমর্থ॥
গোপগোপী আদি গুণ ক্রমেতে গাইব।
শ্রীচরণে প্রেমভক্তি মাগিয়া লইব॥
শ্রীকৃষ্ণের জেঠা জেঠী খুড়া খুড়ী আদি।
মামা পিসা আদি আর (খ) পুলিন্দ অবধি॥
নাম সংকীর্ত্তন করি নিজাভীষ্ট লাগি।
দুর্ম্মতি-শোধন আর প্রেমানন্দভাগী॥
শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামীর বর্ণন-মাধুরী।
গণোদ্দেশদীপিকা যে গ্রন্থ অনুসারি॥
বর্ণিব কিঞ্চিত মাত্র তাহার অন্তরে।
অগ্রপশ্চাৎ ক্রম কিছু না জানি বিচারে॥
অক্ষরমিলন-হেতু যথা আইসে মনে।
অপরাধ ক্ষম বিপর্যায়ের বর্ণনে॥

গারুড়োক্ত—

শ্রীনন্দ রাজার সখা রাজা বৃষভানু।
নন্দনাভূমীহর্যী যশোদা শ্যামতনু॥
শক্রধনুবর্ণ বাস না স্থূল ন কৃশা।
কিঞ্চিত দীঘল অতি সুন্দরী সুকেশা॥
অন্য নাম দেবকী, দেবকী যার সখী।
ঐন্দবী নামেতে আর সখী সুষ্ঠুমুখী॥

আদিপুরাণোক্ত -

শ্রীকৃষ্ণের বহুমাতা দেবী শ্রীরোহিণী।
বলদেব হৈতে কৃষ্ণস্নেহ (গ) কোটিগুণি॥
মতান্তরে নন্দ-মহারাজ পাঁচ ভাই।
তাহা ব্যতিরেকেতে যে খুড়াত হয়ে দুই॥
পূর্ব্বকথিত নামে কিছু হয়ে ভেদ।
সকলি সম্ভবে যাহা কহে সাধু বেদ॥

কেহ কহে সপ্ত ভাই কেহ পঞ্চজন।
কল্পভেদে কিংবা কিছু থাকিবে কারণ॥
শ্রীল উপনন্দ (ক) আর অভিনন্দ দুই।
শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত স্নেহেতে একুই॥
সনন্দ নন্দন দুই কাকা সমতুল।
সদাই শ্রীকৃষ্ণস্নেহানন্দেতে বিহ্বল॥
উপনন্দ সিতারুণবর্ণ (খ) হরিদ্বস্ত্র।
তাহার ঘরণী তুঙ্গী কৃষ্ণে মন ন্যস্ত॥
ভ্রমরের ন্যায় বর্ণ নারঙ্গ-বসন (গ)।
অভিনন্দ কৃষ্ণবস্ত্র শঙ্খের বরণ॥
তস্য ভার্য্যা পীবরী নাম পাটলবরণ।
নীলবস্ত্রধারি স্নেহে (ঘ) কৃষ্ণ প্রাণধন॥
সনন্দের সুন্দর দ্বিতীয় নাম হয়ে।
চতুর্থ ভাই যে ঞিহো সুন্দর আশয়ে॥
কুন্দবর্ণ শ্যামবস্ত্র অল্প পক্ককেশ।
কৃষ্ণেতে পরম স্নেহ নাহি যার শেষ (ঙ)॥
মাহিষ দুগ্ধেতে শরীরের পুষ্টি হয়ে।
যে হেতুক কৃষ্ণ লাগি মহিষ রাখয়ে॥
ভার্য্যা যে কুবলা (চ) রক্তবস্ত্র পদ্মবর্ণ।
কৃষ্ণমুখবাক্যে (ছ) যেই পাতি রহে কর্ণ॥
নন্দন পঞ্চম ভ্রাতা একত্র বসতি।
বিশেষ কৃষ্ণেতে অনুরাগ মহামতি॥
শিখিকণ্ঠবর্ণ হয় গুণের নিধান।
চণ্ডাত পুষ্পের বর্ণ বস্ত্র পরিধান॥
অতুলা তাঁহার ভার্য্যা বিদ্যুতের কান্তি।
মেঘাম্বর পরিধান কৃষ্ণময় ভ্রান্তি॥
কণ্ডর দণ্ডর¹ শ্রীনন্দের খুল্লপুত্র।
সুদামা কণ্ডর-স্ত্রী গুণেতে পবিত্র॥

পাঠান্তর—(ক) বিস্তার—বিস্তর।
(খ) আর—কবি।
(গ) কৃষ্ণস্নেহ—[illegible]।

পাঠান্তর—(ক) উপনন্দ—উপানন্দ।
(খ) উপনন্দ সিতারুণবর্ণ—উপানন্দ পীতারুণবর্ণ।
(গ) নারঙ্গ-বসন—সোনার বসন।
(ঘ) নীলবস্ত্রধারি স্নেহে—নীলবস্ত্রধারী তেঁহো।
(ঙ) নাহি যার শেষ—না জানি বিশেষ।
(চ) কুবলা—অঙ্গনা।
(ছ) কৃষ্ণমুখবাক্যে—কৃষ্ণসুখবাক্যে।
১। কণ্ডর দণ্ডর—শ্রীনন্দের খুড়া উর্জ্জন্যের পুত্র।

দন্ডরের স্ত্রীর নাম সুরমা সুন্দরী।
রূপে গুণে সম দোঁহে প্রেমের গাগরি॥
বাটুক চাটুক (ক) আর দুই জ্ঞাতি ভাই।
দধিসারা হবিঃসারা স্ত্রী দোঁহার দুই॥
নন্দের ভগিনী দুই সানন্দা নন্দিনী।
শ্রীকৃষ্ণের পিসী স্নেহে সমান জননী॥
কৃষ্ণবর্ণ বসন কিঞ্চিত উচ্চ দন্ত।
শ্যামল চিক্কণ বর্ণ মতি শিষ্ট শান্ত॥
সানন্দার স্বামী মহানীল হয়ে নাম।
নন্দিনীর স্বামী সুনীল গুণধাম॥
নন্দরাজের ভগ্নীপতি শ্রীকৃষ্ণের পিসা।
স্নেহময়ী প্রেমামৃতে সদাই বিলাসা॥
শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ মহোৎসাহযুক্ত।
সুমুখ তাঁহার নাম স্নেহে অতিরিক্ত॥
শঙ্খবর্ণ লম্বশ্মশ্রু জম্বুবর্ণ কান্তি।
মাতামহী তস্য পত্নী পাটলা সুমতি॥
মাহিষ দধির বর্ণ হরিত বসন।
শিরে কেশ পাটলপুষ্পের যে বরণ॥
তাঁর সহচরী হন মখরা বড়াই।
যশোদা মাতার ধাত্রী স্নেহে অধিকাই॥
সুমুখের ছোট ভাই চারু-মুখ নাম।
অঞ্জন-বরণ তাঁর রূপে অনুপাম॥
তস্য ভার্য্যা বলাকা কুলটী-পুষ্পবর্ণ।
পাটলার ভ্রাতা গোল (খ) বানর-আনন॥
বানর-আকৃতি-মুখ হেরিয়া সুমুখ।
শ্যালাভাবে হাসিলা তাহাতে পাইলা দুখ॥
দুর্ব্বাসা মুনির বহু আরাধনা কৈলা।
বর মাগি তেঁহো মহাকুলীন হইলা॥
তাঁহার ভার্য্যার নাম জটিলা কর্কশা।
অভিমন্যুর মাতা তেঁহো শ্রীমতীর শাশা॥
কাকের বরণ তাঁর বৃহৎ উদর।
কলহেতে প্রিয় সদা সহজে মুখর॥

পাঠান্তর—(ক) বাটুক চাটুক—বটুক চটুক।
(খ) গোল—হন।

কৃষ্ণের মাতামহী-ভ্রাতা তাঁহার নন্দন।
অভিমন্যু মাতুল সম্পর্কে তে-কারণ॥
যদ্যপিহ বিপক্ষ জটিলা-আদি যেহ।
আনন্দমূরতি কৃষ্ণে তথাপিহ স্নেহ॥
যশোধর (ক) যশোদেব সুদেবাদি আর।
কৃষ্ণের মাতুল সহোদর যশোদার॥
অতসীপুষ্পের বর্ণ পান্ডুর বসন।
তাঁহাদিগের ভার্য্যাগণ কৃষ্ণ-অন্ত-প্রাণ॥
বেমা রেমা সুরেমা যে ক্রমেতে তিনের।
ঘরণীর নাম স্নেহে (খ) সমান মায়ের॥
মামা-মামী-স্থানে কৃষ্ণ সোহাগভাবেতে।
বস্ত্র ধরি আকুট করয়ে কতমতে॥
কর্কটী-পুষ্পের বর্ণ কম্বুবর্ণ (গ) পট।
কৃষ্ণপ্রেমে উনমত নাচে হৃদি-নট॥
মাতার ভগিনী দুই শ্রীকৃষ্ণের মাসী।
যশোদেবী যশস্বিনী রূপগুণরাশি॥
দধিসারা হবিঃসারা দ্বিতীয় দোঁহার নাম।
দুই দুই নাম দোঁহার রূপে অনুপাম॥
স্বাভাবিক মাতা হৈতে মাসীর বহু স্নেহ।
তাহে কৃষ্ণ স্নেহপাত্র মাসী যাতে এেহ॥
জ্যেষ্ঠা যশোদেবী শ্যামবরণ যাঁহার।
কনিষ্ঠা যে যশস্বিনী গৌরাঙ্গ তাঁহার॥
হিঙ্গুল বরণ বস্ত্র হয় দোঁহাকার।
চাটু বাটু নাম দুই স্বামী দুজনার॥
মাসুয়া কৃষ্ণের জ্ঞাতি-ভাই যে নন্দের (ঘ)।
মিষ্টান্ন পাঠান বহু লাগি বালকের॥
জ্যেষ্ঠা যশোদেবী মাসী তাঁর এক পুত্র।
সুরূপ 'সুচারু' নাম সুন্দর চরিত্র॥
গোল যে আভীর অভিমন্যুর জনক।
তাঁহার ভ্রাতার কন্যা 'সুচারু' যৌতক॥

পাঠান্তর—(ক) যশোধর- যশোধীর।
(খ) স্নেহে- স্নেহ।
(গ) কম্বুবর্ণ -মুদ্গবর্ণ।
(ঘ) জ্ঞাতি-ভাই যে নন্দের- জ্ঞাতি-ভাই উপনন্দের,
অথবা জ্ঞাতি ভাইপো নন্দের।

তুলাবতী নাম তাঁর প্রেমে অধিকাই।
রূপে গুণে শীলে জ্যেষ্ঠ (ক) কৃষ্ণের ভোজাই॥
অথ পিতামহতুল্যগণ শ্রীকৃষ্ণের।
কৃষ্ণসুখে সুখী চেষ্টা নাহিক দেহের॥
তাঁহা সভার নামগুণ কীর্ত্তন করিয়া।
প্রেমধন মাগি হৃদি-টিকরা পাতিয়া॥
তুণ্ডু আর কুঠের পশুবেদনা কিলাত।
কৃপীট (খ) পুরটা নাট তুল্য পিতৃতাত॥
অনেক আছয়ে আর কে কহিতে পারে।
মাতামহগণমধ্যে (গ) কিছু কহি আরে॥
বীরারোহ বরারোহ কন্দোট্ট কারণ্ড (ঘ)।
তরীষণ বরীষণ আদি আর গোণ্ড (ঙ)॥
বৃদ্ধা পিতামহীতুল্যা ভারুণী ভঙ্গিলা।
ভেরী সুখাম্ভরা ভঙ্গী ভার শাখালীলা (চ)॥
শিখা-আদি বৃদ্ধা আর অনেক আছয়।
মাতামহী তুল্যা মধ্যে কহি যেবা হয়॥
ভারুণ্ডা জটিলা ভেলা করালা ঘর্ঘরা।
ঘুর্ঘুরী (ছ) ঢক্কলী ঘণ্ঠা (জ) ডুণ্ডী ঘোণী ঘোরা॥
করবালি সুঘন্টিকা ঢোণ্ডিকা ডিণ্ডিমা।
ডামনী ডামরী ডংকা পুণ্ডাদি অসীমা॥
জনকের সম হয় অনেক ব্রজেতে।
শ্রীনন্দরাজের সখা ভ্রাতাদিক-মতে॥
জঙ্গল-পিঙ্গল পিঙ্গ মাঠর পট্টিশ।
শংকর সঙ্গর পাঠ ভৃঙ্গ হরিকেশ॥
ঘুনি-ঘান্টিক সারঘা দাণ্ডিকেদার (ঝ) পটীর।
ধুরীণ ধুর্ব্ব চক্রাঙ্গা সৌরভেয় হর॥

কলাঙ্কুর উৎপলাদি মস্কর কন্দলা (ক)।
সুপক্ষ সৌধ হারীতা কৃষ্ণস্নেহে ভোলা॥
উপনন্দ-আদি পিতৃতুল্য আর হয়।
অনন্ত কহিতে নারে অন্যের কি দায়॥
পর্জ্জন্য সুঘন দোঁহে বাগ্‌বন্ধবন্ধুত্ব।
কৈশোরে আর ত দুই স্নেহাদির পাত্র (খ)॥
নন্দ আদি নামে মিত্র অনেক আছয়।
কতেক তাহার কিছু না হয় নির্ণয়॥
মাতাতুল্যামধ্যে কৃষ্ণের করিব কীর্ত্তন।
প্রেম-অর্থ বিনে (গ) যায় সংসার যাতন॥
তরঙ্গাক্ষী তরুণিকা সুভদ্রা (ঘ) মালিকা।
অঙ্গদা বৎসলা তালী মেদুরা সালিকা॥
কুশলা মসৃণা কৃপা শঙ্কিনী বিম্বিনী।
মুদ্রা প্রভা নীতি ধরা সুগভা ভোগিনী॥
হিঙ্গুলা কপিলা পুণ্ডী ধমনী পট্টিকা।
পক্ষতি সুতুণ্ডী তুষ্টি (ঙ) রঞ্জনা বর্ত্তিকা॥
সল্লকী বল্লকী (চ) বেলা আদি মাতৃসমা।
স্তন্যদাত্রী ধাত্রীমাতা দুই অনুপমা॥
অম্বিকা কিলিম্বা নাম কৃষ্ণস্নেহবতী।
যশোদা-মাতার স্থানে সদা অনুগতি॥
কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ প্রা . কৃষ্ণ সরবস।
তিল আধ কৃষ্ণ বিনে রুদ্ধ হয় শ্বাস॥
দুই মধ্যে শ্রেষ্ঠা ব্রজেশ্বরীর প্রিয়সখী।
অম্বিকা হয়েন মুখ্যা সদা হাস্যমুখী॥
অথ মহীসুরা দ্বিধা গোকুলে বসতি।
পুরোহিত কেহ কেহ আশিষক-রীতি॥
বষট্‌কার স্বধাকার প্রাঘারাদ্বি দ্বিজা।
আশীর্ব্বাদক মান্য সভে করে পূজা॥

পাঠান্তর—(ক) জ্যেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ।
(খ) কৃপীট—কপীট।
(গ) মাতামহগণমধ্যে—মহামহাগণমধ্যে।
(ঘ) ধীরারোহ ধরারোহ কর্ণেট্ট কারণ্ড।
(ঙ) ভীমসেন বীরসেন আদি আর গোন্দ।
(চ) শাখালীলা—শাখী শীলা।
(ছ) ঘুর্ঘুরী—'ঘুঘুরী' বা 'ঘুর্ঘরী'।
(জ) ঘণ্ঠা—ঘোল্টা।
(ঝ) দাণ্ডিকেদার—দাণ্ডিকে।

পাঠান্তর—(ক) কন্দলা—কম্বলা।
(খ) 'কিশোর আর ত দুই এদিগের মিত্র' এবং 'কিশোর আর ত দুই স্নেহাদের পাত্র'।
(গ) বিনে—মিলে।
(ঘ) তরুণিকা সুভদ্রা—তরলিকা শুভদা।
(ঙ) সুতুণ্ডী তুষ্টি—সুভণ্ডা তুণ্ডী।
(চ) সল্লকী বল্লকী—সন্ধকী বন্ধকী।

সামিধেনী মহাকব্যা বেদিকাদি সতী।
ব্রাহ্মণের স্ত্রীগণ (ক) ক্রমেতে গণিত॥
পুরোহিত বেদগর্ভ মহাযজ্বা (খ) আর।
ভাগুরি আদিক পুরোহিত কুলাচার॥
ক্রমে তাঁহাদিগের পত্নী শ্রীগৌতমী শাব্বা।
কৃষ্ণক্রীড়া-অনুকূল বিশেষতঃ গাগা॥
পুরোহিত বহু অন্য ব্রাহ্মণী অনেক।
ব্রজেশ্বরী অনুগতা পূজ্যা পরতেক॥
কুব্জিকা বামনী স্বাহা শাণ্ডিলী সুলভা।
ভার্গবী ইত্যাদি সুধা সুপূজ্যা দুর্লভা॥
পৌর্ণমাসী ভগবতী সান্দীপানিসুতা[১]।
তেজিয়া অবন্তীপুরী ব্রজে অনুগতা॥
শ্রীমন্নারদের শিষ্যা মহাতপস্বিনী।
কৃষ্ণলীলা-কুতূহলী সর্ব্ববিধায়িনী॥
যোগমায়া-অংশ হন চিৎশক্তিময়ী।
মায়া আচ্ছাদিয়া কৃষ্ণলীলার বিধায়ী॥
ব্রজেশ্বর-ব্রজেশ্বরী-আদি ব্রজপুরে।
সকলের মান্য পূজ্য সর্ব্বত্র বিহরে॥
নিবিড় বনেতে বাস পত্রের কুটীরে।
রাধাকৃষ্ণ-মিলন উপায় ধ্যান করে॥

অথ গোপীযূথ-আদি ভেদ।

অথ যূথ গোপীগণে দুই মত হয়।
বয়স্যা দাসিকা অন্তঃপাতি দূতীচয়॥
ইহাতে ত্রিকুল অই যূথের অন্তরে।
কুলমধ্যে মণ্ডল যে বর্গ তথা পরে॥
বর্গ হইতে গণ গণে হয় সমবায়।
সমবায় হৈতে তথা হয়েন সঞ্চয়॥
সঞ্চয় হইতে হয় সমাজ আখ্যান।
সমাজ হইতে সমন্বয় প্রয়োজন॥
নয়-ভেদ-ক্রমে লঘু ইহাতে বিশেষ।
প্রেমতারতমময়ে উচ্চ মধ্যে শেষ॥

ইত্যাদি অনেক ভেদ কত কহা যায়।
তাৎপর্য্য নাহিক মাত্র পুস্তক বাঢ়য়॥
যতেক কহিল ব্রজপরিকর ধন্য।
ত্রিলোক-উপাস্য দেবতার পূজ্য-মান্য॥
বিশেষ গোপীর কিছু মহিমা বিরল।
চতুর্দ্দশ ভুবনে উপমার নাহি স্থল॥
বৈকুণ্ঠেও যাঁর যশ গায় লক্ষ্মীগণ।
আশ্চর্য্য কথনে বিরময়ে শ্রুতিগণ॥
অতএব কহি কিছু গোপিকা-চরিত।
কৃষ্ণসুখানন্দ হয় (ক) রসময় গীত॥
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী আর দ্বারকামহিষী।
অষ্টোত্তর শত ষোল হাজার রূপসী॥
তিলেক কৃষ্ণের মন হরিতে না পারে।
গোপী ভুরুভঙ্গে মাত্র বিন্ধে কামশরে॥
সমর্থা সুস্নিগ্ধা রতি আত্মসুখ-বর্জ্জ্য।
অদ্বিতীয় ত্রিভুবনে সকলের আর্য্য॥
শুদ্ধপ্রেমানন্দভাব মাধুর্য্যের পুর।
কামগন্ধ নাহি মাত্র আস্বাদে মধুর॥
প্রেমানন্দে ডগমগ সুধার সাগরে।
ডুবিয়া ডুবিয়া পিয়ে তৃপ্তি না সঞ্চারে॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ তন মন (খ)।
কৃষ্ণ যে সুখের নিধি পরশ-রতন (গ)॥
কুল শীল ধর্ম্ম কর্ম্ম লোকলজ্জা ভয়।
দেহ গেহ সম্পদ যে নাহি কি আছয়॥
মদিরা-মদান্ধ যেন কটির বসন।
আছে কি না আছে তাহে নাহি আলোচন॥
তবে যে গৃহের কর্ম্ম রন্ধন ভোজন।
দেহের অভ্যাসে করে নাহি তাহে মন॥
শরীরের মার্জ্জন ভূষণ বেশ ন্যাস।
যতন করিয়া করে তাহাতে উল্লাস॥
কৃষ্ণ যাতে রত কৃষ্ণসুখের বিলাস।
অতএব দেহের সৌন্দর্য্যে অভিলাষ॥

পাঠান্তর—(ক) স্ত্রীগণ—স্ত্রীগণের।
(খ) মহাযজ্বা—মহাযশা।
১। সান্দীপানি সুত যাহার, বহুব্রীহি।

পাঠান্তর—(ক) কৃষ্ণসুখানন্দ হয়—কৃষ্ণসুখানন্দময়।
(খ) তন মন—তনুমন।
(গ) পরশ-রতন—পরম রতন।

কৃষ্ণসুখে সুখী গোপী কামগন্ধহীন।
শুদ্ধপ্রেমভাবময় কহয়ে প্রবীণ॥
গোপীর মহিমা কিবা আশ্চর্য্য কথন।
ন ভূত ন ভবিষ্যত নহে বর্ত্তমান॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভাগবত-গীতা-শাস্ত্রে।
যে যৈছে ভজে ভজি (ক) ভাবযোগ্য রীতে।
সত্যসংকল্প সেই গোপিকার স্থানে।
বিফল হইল কৃষ্ণ, বদ্ধ হৈলা ঋণে॥
ইহার প্রমাণ ভাগবত-পঞ্চাধ্যায়।
জগতে প্রসিদ্ধ হয় সর্ব্বলোকে গায়॥
বিচার করহ আত্মারাম-আদি ভক্ত।
বহু কিন্তু কোথা কৃষ্ণ হেন (খ) অনুরক্ত॥
রূপ-গুণ-শীল-প্রেম-সৌভাগ্য-বিদগ্ধ।
সদ্বক্তা সুমিষ্টভাষা শুভমতি স্নিগ্ধ॥
লক্ষ্মীর রূপের যে কণার কোটি অংশ।
ত্রিভুবনব্যাপী তার একাংশ রূপাংশ॥
হেন লক্ষ্মীদেবী ব্রজ-গোপিকার আগে।
রূপের (গ) অধিক থাকু সমান না লাগে॥
গুণ-শীল-সৌভাগ্যাদি তেমতি জানিবে।
প্রেমবিদগ্ধতা-অংশে শতাংশ না হবে॥
শুদ্ধ যে সমর্থা রতি মাধুর্য্য বিরল।
বিদগ্ধার শিরোমণি গোপিকা প্রবল॥
লক্ষ্মীঠাকুরাণী সমঞ্জসা-ভাব-রতি।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে নিজে হয় দাসীমতি॥
সমতা নাহিলে নহে রসের পুষ্টতা।
অতএব গোপীসম নহে বিদগ্ধতা॥
কৃষ্ণসনে রাসকেলি করিবারে ব্রজে।
আসি তাহা না পাইয়া তপ করে লাজে॥
ব্রজের রমণী বিনে বৃন্দাবন-শশী।
কাহারেও না স্পর্শে যদি হয় রূপরাশি॥
ব্রজকুমুদিনীগণ কৃষ্ণশশী বিনা।
নারায়ণ-আদি সূর্য্য না করে গণনা॥

গোপী কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপী বিনে নাহি জানে।
অতএব প্রেমে রূপে নাহিক সমানে॥
যার সম অধিক বৈকুণ্ঠে না সম্ভবে।
ইহাতেই গোপিকার মহিমা জানিবে॥
ত্রৈলোক্যের মধ্যে শ্রীউদ্ধব মহাশয়।
ভক্তগণ-গণনাতে এক শ্রেষ্ঠ হয়॥
লোক বেদ সর্ব্বশাস্ত্রে দৃঢ়তর গায়।
গোপীভাব দেখি তেঁহো চমৎকার হয়॥
অষ্টাঙ্গ করিয়া সাধু ভূমেতে লোটায়।
পাদরজ আশা করি আপনা নিন্দয়॥
ব্রজে গুল্মলতা জন্ম প্রার্থনা করয়ে।
গোপী-পাদরাজ অঙ্গে যদ্যপি লাগয়ে॥
গোপীর অনুগা বিনু ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় যশোদা নন্দনে (ক)॥
সাধারণ বৈষ্ণবচরণে রতি বিনে।
কৃষ্ণ নাহি পায় ভক্তিরস নাহি জানে (খ)॥
বিশেষে গোপিকা সাধ্য সাধন সিদ্ধিকদ।
অতএব ভজনীয় বস্তু একান্তত॥
কৃষ্ণ না ভজিয়ে ভজে গোপীর চরণ।
রাধাকৃষ্ণ পায় ব্রজে পায় প্রেমধন॥
গোপী ছাড়ি কৃষ্ণ ভজনের নহে ফল।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি দুর্লভ প্রবল॥
সদ্গুরুচরণাশ্রিত সৎসঙ্গতি বিনে।
শ্রীরূপ সনাতনের মর্ম্ম নাহি জানে॥
যেই বুঝে গোপীতত্ত্ব ভজনের তত্ত্ব।
রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তিবর্ত্ম ব্রজের মহত্ত্ব॥
কুতার্কিক শুষ্কজ্ঞানী কর্ম্মীর অগম্য।
উলূক না জানে যেন রবিকর-মর্ম্ম[১]॥
ত্রৈলোক্যের ভূষণ শ্রীবৃন্দাবন ধাম।
তাহার ভূষণ রাধাকৃষ্ণ অনুপাম॥
তাঁর লীলারসভূষা গোপিকা সুন্দরী।
সুধীর ললিত কৃষ্ণে কহে যাতে করি॥

পাঠান্তর—(ক) ভজি—ভজে।
(খ) কৃষ্ণ হেন—কৃষ্ণে হেন।
(গ) রূপের—রূপেতে।

পাঠান্তর—(ক) কদাচ না মিলে ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দনে।
(খ) এই দুই লাইন বটতলার পুস্তকে আছে।
১। উলূক অর্থাৎ পেঁচা যেমন সূর্য্যকিরণের মর্ম্ম জানে না।

তার মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্বশিরোমণি।
মহাভাবস্বরূপা হ্লাদিনী শক্তি গণি॥
কায়ব্যূহরূপ তাঁর সর্ব্বগোপীগণ।
বহুরূপ বিনে নহে লীলার পোষণ॥
অত্যন্তবল্লভা রাধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী।
তিল আধ না দেখিলে ম্লান মুখশশী॥
এক আত্মা দেহ দুই রূপমাত্র ভেদ।
দোঁহা না দেখিয়া দোঁহার প্রাণ করে খেদ॥
প্রেমপরাকাষ্ঠা যার পরে আর নাই।
দু'জনার বালাই লইয়া মর্য়ো যাই॥
কিশোর কিশোরী দু'টি সুন্দর সুন্দরী।
প্রাণ চিরি তথা রাখি তারে অনাদরি॥
হৃদয়কমল তার মৃদু সারভাগ।
বিছাইয়া দিই চালাইতে রাঙ্গাপাদ॥
লুকাইয়া যদি পাই হিয়ামাঝে রাখি।
বিরলে বসিয়া (ক) দু'টি ক্ষণে ক্ষণে দেখি॥
বৃন্দাবনশশী কৃষ্ণ রাই কুমুদিনী।
গোপীগণ চকোরী ভ্রমরী লুভধনী॥
লীলারসামৃতপুষ্টি নহে গোপী বিনে।
গোপী ধন্য পূজ্য মান্য বেদেতে বাখানে॥
অতএব পঞ্চ পুরুষার্থ পরাৎপর।
যদি চাহ ভজ গোপীপদ বার বার॥

ত্রিপদীচ্ছন্দ

গোপী কল্পতরুবর, গাঢ়ছায়া-স্নিগ্ধকর,
তার তল করহ আশ্রয়।
ভবগতায়াতশ্রান্তি, পাশ আশা তৃষ্ণা ভ্রান্তি,
দূরে যাবে জুড়াবে হৃদয়॥
দুঃখ যাবে, সুখ পাবে, প্রেমফল আস্বাদিবে,
অমৃতনিন্দিত-রসরাশি।
পাইয়া সে রসার্ণবে, পরম আনন্দ পাবে,
গলার খসিবে মায়াফাঁসি॥

যুগলচরণে প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
যদি তাহা আশা কর মনে।
হৃদি দারিদ্রতা যাবে, পরম ধনাঢ্য হবে,
ধর তবে গোপীর চরণে॥
প্রেম-স্পর্শমণি-রত্ন, প্রাপ্ত্যোপায় কর যত্ন,
গোপীহৃদিকোষ পরিপূর্ণ।
তাহার শরণ লহ, কায় বাক্য মন সহ,
ত্যেজি ধর্ম্ম মান কুল বর্ণ॥
পাবে সে দুর্লভ ধনে, তাহা (ক) নাহি ত্রিভুবনে,
তপ জপ জ্ঞান যোগে মিলে।
সামান্য রতন আশ, স্বর্গাদি বাসনাফাঁস,
মুক্তি-আশা গ্রাহক প্রবলে॥
তাহে হও সাবধান, দূরে তেজ কর্ম্মজ্ঞান,
যেহ অর্থ প্রাপ্ত্যের বাধক।
তৎপরত্বে নিরমল, মতি কর অচঞ্চল,
রঞ্জো দিয়া সে প্রেম-যাবক॥
অতএব গোপী ভজ, তাঁহার চরণে মজ,
এই ব্রতমাত্র কর সার।
অশক্ত দুর্ব্বলমতি, লালদাস তাহা প্রতি,
জড়প্রায় বিঘ্নের কিংকর॥

রূপ-গুণ।

অতঃপর কিছু গুণ-রূপ আদি নাম।
কীর্ত্তন করিব চমৎকার অভিরাম॥
পরমপ্রেষ্ঠসখী হন সকলের শ্রেষ্ঠ।
তার মধ্যে দুই ভেদ বর[১] আর বরিষ্ঠ॥
বরিষ্ঠ সভার মান্য উত্তমোত্তমে গণ্য।
তাঁহা সভার তুলনাতে নাহি কেহ অন্য॥
রূপে গুণে প্রেমে শীলে বিদগ্ধাদি মতে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় কুশল সেবাতে॥
অতি অন্তরঙ্গা সদা নিকটে থাকেন।
গুহ্য যে রহস্যকথা কহেন শুনেন॥

পাঠান্তর—(ক) বসিয়া—চরণ।

পাঠান্তর—(ক) তাহা—যাহা।

১। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকামতে অবর ("বরিষ্ঠাশ্চাবরশ্চোক্ত")।

অপার-গুণরূপাদি মাধুরীভূষিতা।
অনন্য-সমান ঊর্দ্ধ সর্ব্বমধ্যে খ্যাতা॥

বরিষ্ঠ।

ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পকলতিকা।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা (ক) রঙ্গদেবী সুদেবিকা॥

তত্র শ্রীললিতা।

তত্র শ্রীললিতা আদ্যা অষ্টমধ্যে শ্রেষ্ঠা।
সতের[১] দিনের শ্রীমদ্রাধা হৈতে জ্যেষ্ঠা॥
অনুরাধা অন্য নাম, বামা প্রখরা।
গোরোচনা নিন্দি কান্তি শিখিপিচ্ছাম্বরা॥
সর্ব্বকর্ম্মে নিপুণতা সর্ব্বার্থসাধিকা।
সকলের মান্যা ধন্যা প্রাধান্যে অধিকা॥
অষ্টমধ্যে প্রিয়তমা শ্রীরাধাকৃষ্ণের।
নিগূঢ়-সুগুহ্য বাক্য পাত্র কহনের॥
দরশনমাত্র দোঁহার আনন্দজনক।
দোঁহে বশীভূত হন দৃঢ়বাধ্য-বাধক॥
বিশোক নামেতে পিতা মাতা বিশারদী[২]।
গোবর্দ্ধনমল্লসখা ভৈরব যে স্বামী॥
প্রিয়াপ্রিয়সখীমুখে তাম্বূল অর্পিয়া।
আনন্দসাগরে ভাসে প্রেমময় হিয়া॥

তত্র শ্রীবিশাখা।

দ্বিতীয়া বিশাখা ললিতার সম গুণে।
প্রিয়সখী-সম বয় জন্ম এক ক্ষণে॥
তারাবলীবস্ত্র অঙ্গে বরণী বিদ্যুতা (খ)।
পাবনের কন্যা মুখরার ভগ্নীসুতা (গ)॥
জটিলার ভগ্নী-পুত্রী দক্ষিণা মাতরি।
পতি-অভিমানী নাম বাহিক আভীরি॥
প্রেমনর্ম্মসখী এঁহো সুকর্ম্মকুশলা।
নর্ম্ম উক্তি-সুকৌশলা সুমন্ত্রী প্রবলা॥
দ্যূতকর্ম্মে পণ্ডিত সন্ধিতে বুদ্ধিমান।
চতুষ্টয়-জ্ঞাতা ভেদ দণ্ড সাম দান॥
পত্রাবলি রচনায় বাদ্য নৃত্য-গীতে।
সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল চিত্র যে কারিত্বে॥
বেণী-বেশ-রচনায় সূচিকর্ম্ম আদি।
সূর্য্যপূজাসামগ্রীর আবিষ্কারে সুধী॥
শ্রীরাধিকার মনোবৃত্তি কথনে আনন্দ।
গলাগলি দোঁহে কৃষ্ণকথার প্রবন্ধ॥
রঙ্গণ মাধবী আর মালত্যাদি সখী।
সহ অধিকারী বৃন্দাবনেতে হরখি (ক)॥

তত্র শ্রীচম্পকলতা।

তৃতীয়া চম্পকলতা চম্পকবরণ।
চাষপক্ষবর্ণ পরিধেয় যে বসন॥
এক দিবসের ছোট প্রিয়সখী সহ।
মাতরি বাটিকা পিতা আরাম গোদোহ॥
চণ্ডাক্ষ নামে স্বামী গুণে বিশাখার সম।
সর্ব্বকর্ম্মে বিজ্ঞ দ্যূতাতন্ত্রে (খ) অনুপম॥
রাধাকৃষ্ণের ঘটনায় যুক্তিবিশারদা।
প্রতিপক্ষে প্রতারণা আকর্ষণে মুদা॥
ফল-আদি-গুণ দৃষ্টিমাত্রে অনুভবে।
মিষ্টান্নপাকাদি শিল্প নানাগুণশ্রবে (গ)॥
নানান (ঘ) মৃত্তিকাপাত্র অদ্ভুত রচনে।
দাসীসহ কতেক বা প্রকার বনানে॥
দ্রুমলতা-গুল্ম আদি রোপণেতে পটু।
ষড়রস পরখে মিষ্টাদি তিক্ত কটু॥
কৃষ্ণ লাগি নানাশিল্পবৈদগ্ধ্য-চাতুর্য্য।
সদা অই চিন্তা মাত্র আন চেষ্টা বর্জ্জ্য[১]॥

তত্র শ্রীচিত্রা।

চিত্রা চতুর্থী গোরী কাশ্মীর-বরণী।
কাচাম্বরা কনিষ্ঠা ষড়্বিংশতি রজনী॥

পাঠান্তর (ক) ইন্দুলেখা—ইন্দুরেখা।
(খ) বিদ্যুতা—বিষুতা।
(গ) ভগ্নীসুতা—ভগ্নীষুতা।

১। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকামতে সাতাশ দিন ("প্রিয়সখ্যা ভবেজ্জ্যেষ্ঠা সপ্তবিংশতিবাসরৈঃ")।

২। শ্রীকৃষ্ণগণ দ্দেশদীপিকামতে শারদী।

পাঠান্তর—(ক) হরখি—নিরখি।
(খ) দ্যূতাতন্ত্রে—দৌত্যকর্ম্মে।
(গ) নানাগুণশ্রবে—নানা গুণে স্রবে।
(ঘ) নানান—বানান।

১। অন্য কোন চেষ্টা নাই।

সূর্য্যমিত্র-বৃষভানু পিতৃব্যনন্দন।
চতুরাখ্য পিতা চর্চ্চিকাখ্যা মাতাখ্যান॥
পিঠর নামেতে পতি গোষ্ঠপরায়ণ।
কৃষ্ণসুখে সুখী যোগমায়ার করণ (ক)॥
বিচিত্র চাতুর্য্য সর্ব্বস্থান-প্রবেশিনী।
যশমন্ত প্রিয়ংবদা সুমৃদুভাষিণী॥
অখিলকর্ম্মেতে পটু ইঙ্গিতে বুঝেন।
নানাদেশভাষা সর্ব্ব বুঝেন কহেন॥
দৃষ্টিমাত্র সভার আশয় অনুভবে।
মধু-ক্ষীর-আদি-কর্ম্মে প্রশংসয়ে সভে॥
কাঁচময় পাত্রাদি নির্ম্মাণে বিচক্ষণ।
মন্ত্র-তন্ত্র-জ্যোতিষ-শাস্ত্রেতে বিলক্ষণ॥
পশুবৈদ্য-বিদ্যা-বৃক্ষ-উপচার-শাস্ত্রে।
পয়বস্তু (খ) রন্ধনাদি-কারণ সমস্তে॥
অতিদক্ষ সৌখ্য (গ) কৃষ্ণচন্দ্রে সুখ দিতে।
বনস্পতি-আদি-অধিকারী সখীসাথে॥

তত্র শ্রীতুঙ্গবিদ্যা[১]।

তুঙ্গবিদ্যা পঞ্চমী সুপাণ্ডিত্য নিপুণা।
অষ্টাদশ বিদ্যা রসশাস্ত্রে বিলক্ষণা (ঘ)॥
নাটক নাটিকা আর গন্ধর্ব্ববিদ্যায়ে।
আচার্য্যের উপাসিতা পাণ্ডিত্যবিষয়ে॥
বিশেষতঃ গীতমার্গে বীণার বাদনে।
দূত্যকর্ম্মে সুপণ্ডিতা সন্ধি কর্ম্মস্থানে॥
সখীসঙ্গে গানে আর মৃদঙ্গাদি-বাদ্যে।
নানারস-রঙ্গভঙ্গী নৃত্যকলাপদ্যে॥
কৃষ্ণসুখে সুখী সুখ দিতে সুপণ্ডিত।
বৃন্দাবনে অধিকারী সখীর সহিত॥

তত্র শ্রীইন্দুলেখা।

ইন্দুলেখা ষষ্ঠী হরিতালের বরণা।
দাড়িম্বপুষ্পবসনা তিন দিনের ন্যূনা॥
বেলা নামে মাতা পিতা সাগর-সনামা।
সোয়ামী 'দুর্ব্বল' স্বভাব প্রখরতা বামা॥
প্রিয়সখী-অর্থে বশীকরণ-মন্ত্রতন্ত্রে।
সামুদ্রিক-আদি বিশারদা নানা যন্ত্রে॥
কৃষ্ণ-আকর্ষণী কায কত ছন্দ বন্ধ।
ছিটাফোঁটা আদি জানে কতেক প্রবন্ধ॥
হারাদিগ্রন্থনে আর দশন-বন্ধনে।
অতিপটু আর সর্ব্বরত্নপরীক্ষণে॥
পট্টথোপ-ডোর-ঝাম্পা-পুষ্পাদি-নির্ম্মাণে।
সুবেশকরণে কেশে বেণীর রচনে॥
সৌভাগ্য তিলকযন্ত্র কপালে লিখনে।
দূত্যকর্ম্মে নিপুণা অভিসারাদি মিলনে॥
প্রিয়াপ্রিয়সখী-অর্থে গুণের অর্পণ।
সমর্পণ দেহ-গেহ-আদি প্রাণ ধন॥
রহস্য-নিগূঢ়-কথা-কহনের যোগ্য।
সর্ব্বগুণময়ী যুগলের সুমনোজ্ঞ॥
পালিন্ধী প্রভৃতি সখী সঙ্গে কর্ম্মদক্ষ।
দোঁহার সুখের সুখী বৃন্দাবনের অধ্যক্ষ॥

তত্র শ্রীরঙ্গদেবী।

রঙ্গদেবী সপ্তমী পদ্মকিঞ্জল্কবরণী।
সপ্তরাত্রির কনিষ্ঠা রক্তবরণবসনী॥
চম্পকলতিকাসম গুণের গাগরি।
রঙ্গসার নামেতে পিতা করুণা মাতারি॥
ললিতার পতি যেঁহো ভৈরব তাঁর কনিষ্ঠ।
বক্রেক্ষণ নাম পতি জা ললিতা জ্যেষ্ঠ॥
সদাই উত্তুঙ্গহাস্যরঙ্গে তরঙ্গিণী।
রঙ্গদেবী যথা-নাম মূর্ত্তিমান্ জানি (ক)॥
কৃষ্ণ-প্রিয়সখী-অগ্রে নর্ম্ম-কুতূহলী।
কত রঙ্গভঙ্গি গান-নৃত্য সহ আলি॥
আপনি যেমত রঙ্গী সঙ্গিনী তেমতি।
পরমানন্দিত হোঁর যুগলের মতি॥
নর্ম্ম-পরিহাস্যে সদা পরম উৎসুকা।
কৃষ্ণহর্ষে প্রশংসেন শ্রীমতী কৌতুকা॥

পাঠান্তর—(ক) করণ—কারণ।
(খ) পয়বস্তু—প্রেয় বস্তু।
(গ) সৌখ্য—সখ্য।
(ঘ) বিলক্ষণা—বিচক্ষণা।

১। তুঙ্গবিদ্যার পিতা পুষ্কর, মাতা মেধা, স্বামী বালিশ।

পাঠান্তর—(ক) জানি—মানি।

আনন্দ পাইয়া উঠি আলিঙ্গন করে।
কৃষ্ণ আলিঙ্গিতে কত সুরঙ্গ বিথারে॥
ষড়্‌গুণের চতুর্থগুণে যুক্তিতে নিপুণ।
কৃষ্ণ আকর্ষণ-তন্ত্রমন্ত্রে বিচক্ষণ॥
বিচিত্র অষ্টাঙ্গরাগে পশু-পক্ষ-বশ।
অঙ্গের সৌরভ্য যাতে শ্রীকৃষ্ণ বিবশ॥
সৌগন্ধ-শ্রীবৃন্দাবনে পুষ্পাদি অধ্যক্ষ।
সখীসঙ্গে আনন্দে ফিরয়ে দোঁহাপক্ষ॥

তত্র শ্রীসুদেবী।

সুদেবী অষ্টমী রঙ্গদেবীর বহিন।
দুই ভগ্নী যমক রূপে গুণেতে প্রবীণ॥
একুই আকার গুণ চিনা নাহি যায়।
দোঁহার দর্শনে চিত্তে ভ্রান্তি জন্ময়॥
বহিনীর পতি বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ।
স্বামী একগৃহে বাস সহিত জা জ্যেষ্ঠ॥
কেশ-সংস্কার তথা অঞ্জনপ্রদান।
শ্রীঅঙ্গমার্জ্জন আর অঙ্গসংবাহন॥
ইহাতে নিপুণ সদা পার্শ্বেতে থাকিয়া।
প্রণয়-আহ্লাদে সেবে আগ্রহ করিয়া॥
শারিকায় নানাকাব্য-রহস্য-পড়ানে।
সর্ব্বপশুপক্ষ্যাদির বচন বুঝনে॥
নানা বিদ্যাভ্যাস কাব্যরস উদ্গীরণে।
দুগ্ধ-আবর্ত্তনে (ক) ধীর সর্ব্বগুণগণে॥
বিজ্ঞতম পুষ্পাদির শয্যাদি রচনে।
প্রতিপক্ষগণের যে আশয় সন্ধানে॥
ধূর্ত্তা নানা (খ) বেশ-রচনায়েতে নিপুণ।
কোন কার্য্যে নহে ন্যূন বিশেষ এ গুণ॥
পিকদানি-হস্তে সদা নিকটে থাকেন।
নর্ম্মবাক্যে যুগলের প্রহৃষ্ট করেন॥
বৃন্দাবনে মৃগ পক্ষ বনদেবীগণ।
সখীসহ সকলের অধিকারী হন॥
লালাদাস মাঙ্গে রাঙ্গা চরণে শরণ।
নিজ দাসী করি মাথে ধরহ চরণ॥

অথ বর।

বরিষ্ঠ কহিল এবে বর পরশ্রেষ্ঠ।
নাম-গুণ-আদি গান করি জানি ইষ্ট॥
প্রথম-মণ্ডল ইষ্ট দ্বাদশ বর্ষীয়া।
শ্রীরাধিকার প্রিয়তমা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া॥
কলাবতী শুভাঙ্গদা হিরণ্যাঙ্গী করি।
রত্নলেখা শিখাবতী কন্দর্পমঞ্জরী॥
ফুল্লকলিকা আর অনঙ্গমঞ্জরী।
যৌবন-উদ্রেক এই অষ্ট নব-গৌরী॥

তত্র কলাবতী।

হরিচন্দনবর্ণ কীরবর্ণ পরিধেয়।
পরমসুন্দরী কলাবতী নামধেয়॥
ভানুর মাতুল কলাঙ্কুর নাম পিতা।
সুশীলচরিতা সিন্ধুমতী নাম মাতা॥
বাহিকের অনুজ কপোত নাম পতি।
কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণে ন্যস্ত মতি॥

শুভাঙ্গদা।

শুভাঙ্গদা বিশাখার অনুজা ভগিনী।
তড়িতবরণকান্তি স্নিগ্ধা সুনয়নী॥
পিঠরের অনুজ পতত্রী নাম পতি।
জ্যেষ্ঠা ভগিনী সহ একত্র বসতি॥

হিরণ্যাঙ্গী।

হিরণ্যাঙ্গী হরিণীর গর্ভেতে জনম।
হিরণ্যবরণকান্তি শোভা লক্ষ্মীসম॥
হরিণীর গর্ভজাতা তাহার বিশেষ।
কহি যে শুনিনু যাহা গ্রন্থ গণোদ্দেশ॥
মহাবসু নাম গোপ ভানুরাজমিত্র।
সুন্দরী তনয়া কাম সুন্দর সুপুত্র॥
যজ্ঞ করিলেন তাহে চরু যে উঠিলা।
আঙ্গিনায় রাখি ভ্রমে কর্ম্মান্তরে গেলা॥
রঙ্গিণী মৃগীর কন্যা সুরঙ্গী আখ্যান।
কিঞ্চিত তাহার সেই করিলা ভোজন॥
অপর তাঁহার স্ত্রী সুচন্দ্রা খাইলা।
চরুর প্রভাবে দোঁহে গর্ভিণী হইলা॥

পাঠান্তর—(ক) আবর্ত্তনে—উদ্বর্ত্তনে।
(খ) ধূর্ত্তা নানা—চূড়া আদি।

সুচন্দ্রার গর্ভে স্তোককৃষ্ণ কৃষ্ণসম।
হরিণীর গর্ভে কন্যা হিরণ্যাঙ্গী নাম॥
জন্মিলা অপূর্ব্ব পুত্র কন্যা সুরূপিণী।
গোষ্ঠে প্রসবিল সেই সুরঙ্গী হরিণী॥
চরুর বৃত্তান্ত জানি গোপ মহাবসু।
লালন-পালন করে কন্যা আর শিশু॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রীরাধিকার সখী।
কৃষ্ণাপরাজিতাবর্ণ বস্ত্র চন্দ্রমুখী॥
জরদ্‌গব নামে পতি মহিষ বিস্তর।
অতি বলবান আলবেলিয়া অন্তর॥

রত্নলেখা।

তানুরাজ মাসির তনয় পয়োনিধি।
তাঁর পত্নী মিত্রা নাম পুত্রবতী যদি॥
তথাপিহ কন্যা অভিলাষে পুজে সূর্য্য।
তাহাতে জন্মিলা কন্যা রত্নলেখা আর্য্য॥
গৈরিক বরণ ভ্রমরের বর্ণ বস্ত্র।
কড়ার নামেতে পতি কুঠারিকাপুত্র॥
কৃষ্ণসঙ্গে অভিসার প্রিয়সখী লাগি।
সূর্য্যের পূজায় (ক) তেঁহো অতি অনুরাগী॥

শিখাবতী।

কৃষ্ণের ভোজাই কুন্দলতার ভগিনী।
শিখাবতী কর্ণিকার-পুষ্পের বরণী॥
তিত্তির-পক্ষের ন্যায় বরণ-বসনী।
ধেনুধন্য পিতৃনাম সুশিখা জননী॥
গড়ু গন্ডর (খ) নাম পতি সদা গোষ্ঠে বাস।
এথায় নির্ব্বিঘ্নে কৃষ্ণের সঙ্গেতে উল্লাস॥

কন্দর্পমঞ্জরী।

কন্দর্পমঞ্জরী কান্তি অশোকবরণ।
কৃষ্ণের মনোজ্ঞরূপ বিচিত্র বসন॥
পুষ্পকর নাম পিতা কুরুবিন্দা মাতা।
কন্যাটি রূপসী দেখি মনে অভিমতা॥

পাঠান্তর—(ক) সূর্য্যের পূজায়—সূর্য্যেরে পূজয়ে।
(খ) গড়ু গন্ডর—গড়ু গন্ড।

কৃষ্ণেরে বিবাহ দিব যদি বিধি করে।
পরকীয়া নিত্যকান্তা সে বাসনা দূরে॥

ফুল্লকলিকা।

ফুল্লকলিকা ইন্দীবরশ্যামবর্ণ।
নাসায় তিলক শোভা করে বর্ণ স্বর্ণ॥
শ্রীমল্ল (ক) নাম পিতা কমলিনী মাতা।
বিদুর নামেতে স্বামী মহিষ-রক্ষিতা॥

অনঙ্গমঞ্জরী।

অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীমতীর সহোদরা।
গুণের তুলনা নাহি রূপে মনোহরা॥
বর্ণন না হয় রূপ-গুণের কাহিনী।
যেমত ভগিনী প্রায় তেমত আপনি॥
দুর্ম্মদ নামেতে পতি প্যারীর দেবর।
নামতুল্য মদ কিন্তু কৃষ্ণে মনচর॥
দুই ভগ্নী এক ঘরে একত্র বসতি।
ললিতা-বিশাখার প্রিয়সখী শুদ্ধমতি॥
বসন্তকেতকীবর্ণ ইন্দীবর-বস্ত্র।
কৃষ্ণের প্রেয়সী জ্ঞাতা সর্ব্বরসশাস্ত্র॥

অথ বর-দ্বিতীয়মণ্ডল।

অথ বর-দ্বিতীয়মণ্ডল পুন কহি।
গাইয়া অভীষ্টবর প্রেমভক্তি চাহি॥
পূর্ব্ব হৈতে ঞেহা সভার সৌভাগ্যাদি গুণ।
প্রেম সৌন্দর্য্য চতুরাই কিছু ন্যূন॥
তাহে দুই বর্গ হয় অসমা সমস্নেহা।
নিত্যা আর সাধনসিদ্ধা চিদানন্দদেহা॥
নিত্যসিদ্ধা দশকোটিগণ যে প্রধানা।
অসংখ্য সাধনসিদ্ধা নাহিক গণনা॥
যতেক সাধনসিদ্ধা প্রায় যে অসমা।
প্যারী প্রিয় কৃষ্ণ কোটি প্রাণের উপমা॥
অষ্ট যে পরম প্রেষ্ঠসখীর অনুগা।
সকল সুন্দরী কৃষ্ণরসের পথগা॥
তার মধ্যে বহু যূথ আদি ভেদ হয়।
বহুযূথেশ্বরী তার সংখ্যা কে করয়॥

পাঠান্তর—(ক) শ্রীমল্ল—শ্রীমল্লাত।

কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকাতে যে শুনিল।
শ্রীরূপ করুণা করি ভুবি প্রকাশিল॥
তাঁর উপদেশমতে সেই মন্ত্র গাই।
তাহা বিনে ভাল মন্দ কিছু জানি নাই॥

তত্র যূথেশ্বরী।

সুমুখী ধনিষ্ঠা কলহংসা কলাপিনী।
মাধবী মালতী চন্দ্ররেখিকা হরিণী॥
কুঞ্জরী চপলা শুভাননা কুরঙ্গাক্ষী।
সুচরিতা সুরভি মণ্ডলী পংকজাক্ষী[১]॥
শৌরসেনী সুমন্দিরা রামিকা (ক) চন্দ্রিকা।
রসালিকা তিলকিনী চন্দ্রাতিলকা (খ)॥
সুগন্ধিকা মণিকুণ্ডলা মদনামোদনী।
সুমধ্যা কামনাগরী (গ) সর্ব্বগুণখনি॥
কাবেরী নাগবেলিকা (ঘ) কন্দর্পসুন্দরী।
সুকেশী চারুকবরা প্রেমমঞ্জরী॥
মঞ্জুমেধা সুমধুরা কামলতিকা।
বিচিত্রাঙ্গী কলকণ্ঠী মঞ্জুকেশিকা (ঙ)॥
সুভদ্রা (চ) মদনালসা কমলা হারহীরা।
মধুরেন্দিরা শশিকলা হারকণ্ঠী বরা॥
মহাহীরা মনোহরা বিচিত্রলেখিকা।
মধুরেক্ষণা তনুমধ্যা রঙ্গবাটিকা॥
মধুস্যন্দা গুণচূড়া বহুগুণযুতা।
বরাঙ্গদা (ছ) তুঙ্গভদ্রা আদি সুসঙ্গদা॥
রসোত্তুঙ্গা (জ) আদি আর যতেক গোপিনী।
সকলের শ্রেষ্ঠা মান্যা রাধাঠাকুরাণী॥
সকলেই সেবাপরা আনন্দ-কৌতুকে।
কারে কোন্ আজ্ঞা হয় কর্ণ পাতি থাকে॥

পাঠান্তর—(ক) রামিকা—রমিলা বা কামিলা।
(খ) চন্দ্রাতিলকা—চন্দ্রলতিকা।
(গ) কামনাগরী—কামনগরী।
(ঘ) নাগবেলিকা—নাগরেলিকা।
(ঙ) মঞ্জুকেশিকা—মঞ্জুকেলিকা।
(চ) সুভদ্রা—সুন্দরী।
(ছ) বরাঙ্গদা—বরাঙ্গিকা।
(জ) রসোত্তুঙ্গা—রসতুঙ্গা।

১। পংকজাক্ষী স্থলে কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় কন্দুকাক্ষী।

কেহ বেশরচনাতে কেহ বীণাবাদ্য।
কেহ নৃত্য করেন যে সকল রসে সিদ্ধ॥
সকলেই সর্ব্বকর্ম্ম যদ্যপি জানেন।
তথাপিহ এক একে নিযুক্ত থাকেন॥
কেহ বা নিয়মে নহে উপস্থিত মতে।
সকলি করেন সদা থাকেন পার্শ্বেতে॥
বয়স্যা এঁহারা পাছে কহিব দাসিকা।
এঁহারাও অন্যসখীর মানেতে অধিকা॥
পরমপ্রেষ্ঠ প্রধানা যে ললিতা সুন্দরী।
অনুগতা তাঁহার সর্ব্বে সভার আগরি॥
তেঁহো সর্ব্বগুণধাম সভার আরাধ্যা।
সকলের শ্রেষ্ঠা তেঁহো সকলেই বাধ্যা॥
মালাকার রজক নাপিত কন্যা-আদি।
সকলের অধ্যক্ষ যে উচ্চনীচাবধি॥
বৃন্দাবন অক্ষয় (ক) বনদেবীগণ যত।
শ্রীমতী ললিতাদেবী সভার সম্মত॥
সেহো দেবীগণ যাউ (খ) তাঁর আজ্ঞাকারী।
রাধাকৃষ্ণ সমিহ করেন যাঁরে হেরি॥
যাঁর ভয়ে প্যারীজীউ মান নাহি করে।
করিলেও কভু ভয়ে তেজিতে না পারে॥
ললিতা সুবুদ্ধি তাঁর পরামর্শ বিনা।
জল নাহি খান যথা তাঁহার অধীনা॥
যে সব সুন্দরী কর্ম্মে নিযুক্তা হয়েন।
তাঁহারা বিশেষগুণে বিদগ্ধা হয়েন॥
মানের পুষ্টিতা যে করেন পক্ষপাতে।
কৃষ্ণেরে ভর্ৎসনা আদি করেন সাক্ষাতে॥
সন্ধিও করিতে নানা কৌশলেতে পটু।
কখন প্রণয় বাক্য কভু কহে চাটু॥
পুষ্পমণ্ডন শয্যা আদি রচনায়।
ইঙ্গিতে করেন কার্য্য বুঝিয়া আশয়॥
রঙ্গলেখা রতিকলা দুই সহচরী।
ললিতার অতি প্রিয় গুণে বশীকরী॥

পাঠান্তর—(ক) বৃন্দাবন অক্ষয়—বৃন্দাবনের অধ্যক্ষ।
(খ) যাউ—যে বা যেহো।

সকলের শ্রীচরণ মস্তকে ধরিয়া।
বর মাগি তোমা সভার দাসীর লাগিয়া॥

অথ শিল্পনিপুণা।

বাক্যের চাতুর্য্যরসে কৃষ্ণে পরাভব।
সৃজনে শ্রীরাধিকার মানের উদ্ভব॥
ইত্যাদি করিয়া শিল্পনৈপুণ্য যতেক।
প্যারীজীর পক্ষপাতী হয়েন অনেক॥
পিণ্ডকেলি বিতণ্ডিতা-আদি পুণ্ডরীকা।
সিতাখণ্ডী-চারুচণ্ডী সখী সুদণ্ডিকা॥
অকুণ্ঠিতা কলাকণ্ঠী রামঠী মঠিকা।
কৃষ্ণসুখজনক রসরঙ্গেতে অধিকা॥

তত্র পিণ্ডকেলি।

তত্র পিণ্ডকেলি তাম্রবরণ বসন।
পিক-অণ্ডবর্ণ সদা শ্লেষ বচন॥
ছলে অপরাধী করি কৃষ্ণে লজ্জা দেন।
প্যারীজীর পক্ষ হৈয়া মানাদি বাঁচান (ক)॥

বিতণ্ডিকা।

বিতণ্ডিকা হরিদ্বর্ণ[১] হরিৎ-বস্ত্র হয়ে।
মিলিয়া যে নর্ম্ম-সখা সুবলাদিচয়ে॥
বিতণ্ডা করিয়া কৃষ্ণে করি অপরাধী।
প্রিয় সখীর জয় করে হল্লোল্বয় সাধি॥

পুণ্ডরীকা।

পুণ্ডরীকা অঙ্গ-বস্ত্র পদ্মের বরণ।
অপরাধী ছলে কৃষ্ণে করয়ে তর্জ্জন॥

সিতাখণ্ডী।

সিতাখণ্ডী ঞেহার পূর্ব্বনাম আছে গৌরী[২]।
সিতাখণ্ডী নাম কৃষ্ণ রাখে ভঙ্গি করি॥
মিষ্টবাক্যে ভর্ৎসে তাতে মধুর কটুত্ব।
তাহে সিতাখণ্ডী মিছরির খণ্ড অর্থ॥

গউর বরণ পীত-বরণ[১] বসন।
কৃষ্ণ আনন্দিত তাঁর শুনিয়া ভর্ৎসন॥

চারুচণ্ডী।

চারুচণ্ডী সিতাখণ্ডীর অনুজা ভগিনী।
ভৃঙ্গবর্ণ তড়িদ্বস্ত্র ক্রোধান্বিত বাণী॥
যেহেতুক চারুচণ্ডী নাম কৃষ্ণ কহে।
সেই ক্রোধভাঙ্গিবাক্যে কৃষ্ণমন মোহে॥

সুদণ্ডিকা।

সুদণ্ডিকা শিরীষবর্ণ কুরণ্টক-বাস।
উজ্জ্বল বাক্যের অর্থ অনুজ্জ্বল ভাষ[২]॥

কলাকণ্ঠী।

কলাকণ্ঠী ক্ষীরোদকবরণ বসন।
সুন্দরী বিদগ্ধা কুলী-পুষ্পের বরণ॥
শ্রীরাধিকা-আগমনে সমাদর করি।
অনুব্রজি আনিয়া (ক) বসান করে ধরি॥
প্যারীজীর পক্ষপাত বাক্যের চাতুরী।
চাটুবাক্য কহেন নয়নভঙ্গী করি॥

রামঠী।

রামঠী ললিতাজীর ধাত্রীমাতার কন্যা।
গৌরবর্ণ অশোকবসন রূপে ধন্যা॥
কৃষ্ণ যে চতুর তাহার পর চতুরাই।
তর্জ্জনে কম্পায়মান করেন তথাই॥

মঠিকা।

মঠিকা যে পিণ্ডিপুষ্পরুচি বস্ত্র পাণ্ডু।
কৃষ্ণবাক্যে ছল ধরি ঝকড়িতে টণ্ডু (খ)॥
শঠতা করিয়া বহু করি অপরাধী।
প্রিয়সখীচরণে ধরান নিরবধি॥

পাঠান্তর—(ক) বাঁচান—বাঢ়ান।

১। হরিদ্বর্ণ স্থলে শ্রীকৃষ্ণ গণোদ্দেশদীপিকায় আছে হরিদ্রাভা।

২। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা মতে গৌরী স্থানে শারী।

পাঠান্তর—(ক) আনিয়া—আসিয়া।
(খ) টণ্ডু—চণ্ডু।

১। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় আছে সিতাম্বরা (শুভ্রবসনা)।

২। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকানুযায়ী দুইটি লাইন কোন সংস্করণে দেখা যায়, যথা—

অকুণ্ঠিতা পদ্মবর্ণা বিসশুভ্রবাস।
দোষে কৃষ্ণে স্বসমক্ষ ধাক্ক করি আশ॥

অথ দূতী।

মান করি কলহকরণে রত দূতী।
সখীগণ সহিত সখ্যতা নর্ম্ম রতি (ক)॥
পেটরী বারূড়ী ঠারী কোটরা কেটরা।
কর্লাটিপ্পনী নাম রজকের দারা॥
মারুণ্ডা মোরটা চূড়া চুণ্ডরী গোণ্ডিকা।
পিণ্ডকেলি-আদি সদা নিকটবর্ত্তিকা॥

তত্র পেটরী।

তত্র যে পেটরী বৃদ্ধা গুঞ্জরী জাত্যংশে।
মৃণালের বর্ণ জটা চতুর সর্ব্বাংশে॥

বারূড়ী ও ঠারী।

বারূড়ী গারূড়ী বেণী ঠারী কুঠারীর।
ভগ্নী তপস্বিনী কাত্যায়নীব্রতা ধীর॥

কোটরা ও কর্লাটিপ্পনী।

কোটরা সুপক্বকেশ জাতি আভিরিণী।
কর্লাটিপ্পনী অতিবৃদ্ধা জাতি রজকিনী॥

মারুণ্ডা।

মারুণ্ডা মুণ্ডিতশিরা পাণ্ডুর বরণ (খ)।
কপালে লোলিত মাংস লগুড় ধারণ॥

মোরটা।

মোরটা জাবালি জাতি কাশপুষ্পকেশ।

চুণ্ডরী।

চুণ্ডরী ব্রাহ্মণ-কন্যা তপস্বিবিশেষ (গ)॥
স্তুতি করেন কৃষ্ণচন্দ্র মানাপ্রকরণে।
রসের প্রসঙ্গে কিছু সলজ্জ বদনে॥

চূড়া।

চূড়া যে বণিকবধূ স্বামি-বিরহিতা।
ললাটদেশেতে শুভ্রকেশ ভারে উজ্জ্বলিতা (ঘ)॥

পাঠান্তর—(ক) নর্ম্ম রতি—নর্ম্মবতী।
(খ) বরণ—বসন।
(গ) তপস্বিবিশেষ—তপস্বিনীবেশ।
(ঘ) অনেক গ্রন্থে এই দুই লাইন নাই।

গোণ্ডিকা।

গোণ্ডিকা সুবৃদ্ধা পাণ্ডুবর্ণ শিরে কেশ।
দূত্যকর্ম্মে পটু রসপ্রসঙ্গে বিশেষ॥

অথ সন্ধিদূতী।

অথ দূতী সন্ধি-আদি করণে পারগা।
দুর্জ্জয় মানের ভঞ্জনাদিতে অগ্রগা॥
মাধবের পরিবারে মমতা অধিক।
স্নেহক্রমে বহু দেন সুপারিতোষিক॥
মানের সন্ধিতে সুচতুরা বুদ্ধিমান।
উভয়ে মিলায় রাখি উভয়ের মান॥
কলহান্তরিতা দশা যবে শ্রীরাধার।
তাঁর পক্ষ যদ্যপি ইঙ্গিতে ললিতার॥
কৃষ্ণপক্ষ হইয়া কহেন চাটু উক্তি।
যেন পুন না করে হয়ে মানেতে বিরক্তি॥
হিতকারি শ্রীললিতা হিত মন্ত্রণাতে।
শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে দুঃখ নাহি হয় যাতে॥
সন্ধিকরণে দূতী উভয়ের প্রিয়।
যাহা সভার চরিত্র শ্রবণ-সুখোদয়॥
বায়বী (ক) শিবদা দুঁহু পরমসুন্দরী।
সোমবংশজাতা বহু জানেন চাতুরী॥
পৌরবী সুপ্রসাদা যে শান্তা তপস্বিনী।
শান্তিদা কান্তিদা দুঁহু ব্রাহ্মণনন্দিনী॥
শ্রীনারদপ্রসাদে এ (খ) সভার ব্রজে বাস।
রাধাকৃষ্ণ সেবা দূত্যকর্ম্মেতে সুযশ॥

অথ শিল্পপুষ্পমণ্ডন।

এবে কহি শিল্পপুষ্পমণ্ডন যতেক।
যথা কৃষ্ণ স্মরণীয় তথা পরতেক॥
নানাপুষ্পে নানা অলঙ্কার শয্যা আদি।
যাহার কীর্ত্তন যে সংসারমহৌষধি॥
কিরীট কুণ্ডল আর নানা কর্ণভূষা।
কেশবন্ধ-ডোরি ললাটিকা তমনাশা॥
গ্রৈবেয়ক অঙ্গদ কটক কণ্ডুলিকা।
ঝাম্পাদি হংসক রত্ন হইতে অধিকা॥

পাঠান্তর—(ক) বায়বী—রাঘবী।
(খ) এ—ইহা।

কিশোর কিশোরী দোঁহা ভূষণে ভূষিত।
রতন হইতে দোঁহাকার মনোনীত॥

অথ সখা।

ব্রজের বালকগণ গোপের নন্দন।
তাঁ সভার গুণ কিছু করিব কীর্ত্তন॥
শ্রীরামকৃষ্ণের সখা অতি প্রিয়তম।
দোঁহাতে পিরীতি রূপে গুণে দুঁহু সম॥
দুঁহু সনে সদা হাতাহাতি কোলাকোলি।
সহস্য কৌতুকরসে অঙ্গ-হেলাহেলি॥
খেলা-রসে পণ করি কান্ধে চড়াচড়ি।
মল্লযুদ্ধ করি যায় ভূমে গড়াগড়ি॥
পক্ষছায়া আগে ছুঞিবারে রড়ারড়ি[১]।
ফুল তুলি পরস্পর লৈয়া কাড়াকাড়ি॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ ছুঞিবারে সভে ছুটি ধায়।
মুঞি আগে ছুঞিনু বলি সভাই কহয়॥
এইমত অনন্ত কৌতুক লীলা করে।
সহস্রবদনে নাহি কহিবারে পারে॥
কৃষ্ণতুল্য কৃষ্ণের পার্ষদগণ হয়ে।
বিশেষ আশ্চর্য্য কিছু ব্রজশিশুচয়ে॥
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি ভাবান্তর হয়।
মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শুদ্ধ প্রেমময়॥
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া শ্রীঅর্জ্জুন মহাশয়।
তটস্থ হইয়া বহু স্তবন করয়॥
ব্রজবাসী আবাল বনিতা যত জন।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি করয়ে গণন॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের সখার চরিত্র।
কিঞ্চিৎ কহিব লাগি আপন পবিত্র॥
অনন্ত অর্ব্বুদ শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ।
অনন্ত নাহিক পারে করিতে গণন॥
শ্রীরূপ গোস্বামী যাহা প্রকাশিলা ক্ষিতি।
তাহাই কীর্ত্তন করি তরিতে (ক) দুর্গতি॥

যাহার কীর্ত্তনে ভবসংসারের ক্ষয়।
সেহ (ক) তুচ্ছফল কৃষ্ণে প্রেম উপজয়॥
সেহ বটে কিন্তু যে বিচারে তর্ক হয়।
কৃষ্ণপ্রেম-কারণ সখাগণেরে বুঝায়॥
কার্য্য কারণ আর সাধন আশ্রয়।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণসখা দুই প্রেমের বিষয়॥
দুঁহার কীর্ত্তনে দুঁহে প্রেম উপজয়।
যেই কৃষ্ণ সেই সখা প্রেমফলময়॥
ব্রজের উপাস্য সর্ব্ব (খ) পশু পক্ষ আদি।
ভাবে তারতম মাত্র নাহিক বিবাদী॥
তার সাক্ষী ব্রজ-আনুগত্য শ্রেষ্ঠকল্প।
অতএব ব্রজপুরে কেহো নহে অল্প॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণবত পিতৃ আদি (গ) মিত্র।
প্রকটাপ্রকট তবে জন্মবাদ মাত্র॥

অথ সখা চারিপ্রকার[১]।

সুহৃৎসখা সখা প্রিয়সখা নর্ম্মসখা।
অনেক মণ্ডলী তার নাহি লেখা জোখা॥

তত্র সুহৃৎসখা[২]।

সুহৃৎসখা গোভট ভদ্রাঙ্গ বীরভদ্র।
ভদ্রবর্দ্ধন কুলবীর মণ্ডলীভদ্র॥
যক্ষেন্দ্রভট মহাভীম-আদি দিব্যশক্তি।
জ্যেষ্ঠকল্প এঁহারা যে বলবান অতি॥
কংসভয়ে মাতা পিতা এঁহাদিগের হস্তে।
অর্পণ করেন কৃষ্ণে রক্ষার নিমিত্তে॥

পাঠান্তর—(ক) তরিতে—খণ্ডিতে।
১। রড়ারড়ি—ছুটাছুটি।

পাঠান্তর—(ক) সেহ—সেই।
(খ) সর্ব্ব—সর্প।
(গ) পিতৃ আদি—পিত্র আদি।

১। চারি প্রকার সখা যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে—
সুহৃদশ্চ সখায়শ্চ তথা প্রিয়সখাঃ পরে।
প্রিয়নর্ম্মবয়স্যাশ্চেত্যুক্তা গোষ্ঠে চতুর্ব্বিধাঃ॥

২। সুহৃৎসখা—ইহাদের নাম ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যথা-
বাৎসল্যগন্ধিসখ্যাস্তু কিঞ্চিৎ তে বয়সাধিকাঃ।
সায়ুধাস্তস্য দুষ্টেভ্যঃ সদা রক্ষাপরায়ণাঃ॥
সুভদ্র-মণ্ডলীভদ্র-ভদ্রবর্দ্ধন-গোভটাঃ।
যক্ষেন্দ্রভট-ভদ্রাঙ্গ-বীরভদ্র-মহাগুণাঃ।
বিজয়ো বলভদ্রাদ্যাঃ সুহৃদস্তস্য কীর্ত্তিতাঃ॥

তত্র সখা[১]।

বিজয় বিশাল দেবপ্রস্থ মণিবন্ধ।
বৃষভ আর বরূথপ ওজস্বী মরন্দ (ক)॥
করন্দম মন্দর কুসুমাপীড় কন্দ (খ)।
চন্দন কলিন্দ কুলিক সখাবৃন্দ॥
এঁহারা কনিষ্ঠকল্প সেবাতে আগ্রহ।
কৃষ্ণসুখে সুখী সদা কর্ম্মে আজ্ঞাবহ॥

তত্র প্রিয়সখা[২]।

প্রিয়সখা স্তোককৃষ্ণ কিঙ্কিণী সুদাম।
অংশু ভদ্রসেন আর বসুদাম দাম॥
বিলাসী বিটঙ্ক কলবিঙ্ক পুণ্ডরীক।
সুদামাদি শ্রীদাম যে প্রণয় (গ) অধিক॥
এঁহারা কৃষ্ণেরে খেলা-যুদ্ধে সুখ দেন।
অতএব পীঠমর্দ্দ[৩] হয়ে যে আখ্যান॥
সর্ব্বসখামধ্যে ভদ্রসেন সেনাপতি।
সর্ব্বাধ্যক্ষ খেলারসে সভে করে স্তুতি॥
স্তোককৃষ্ণ যথানাম রূপের নিধান।
গুণগণ-স্বভাবাদি কৃষ্ণের সমান॥
বিজয় নামেতে যেঁহো তাঁর বিবরণ।
শুনিতে শ্রবণসুখ অপূর্ব্ব কথন॥

শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীমাতা অম্বিকা নামেতে।
কিবা আর্ত্তি কিবা স্নেহ-প্রেম শ্রীকৃষ্ণেতে॥
রক্ষক কৃষ্ণের যে যদ্যপি লক্ষ হয়।
তথাপিহ মনের প্রতীত না জন্মায়॥
বলবান পুত্রকামে তপস্যা করয়ে।
বনে কৃষ্ণে রক্ষা করিবার যে আশয়ে॥
তাহাতে জন্মিলা পুত্র বিজয় নামেতে।
কৃষ্ণরক্ষাহেতু নিয়োজিলা নিজসুতে॥
দেহ গেহ পুত্র ধন (ক) যতেক উদ্যম।
কৃষ্ণেতে (খ) তাৎপর্য্য মাত্র নাহি কিছু কাম॥

তত্র প্রিয়নর্ম্মসখা[১]।

সুবল অর্জ্জুন গন্ধর্ব্ব সনন্দন।
বসন্ত উজ্জ্বল কোকিল-আদি যত জন (গ)॥
বিদগ্ধ চতুর সুরসজ্ঞ প্রেমবান।
তার মধ্যে বিশেষ সুহৃদ সনন্দন॥
উজ্জ্বল চিন্ময় মূর্ত্তিমান রসোজ্জ্বল।
বিলাসিশেখর কৃষ্ণ যে রসে বিহ্বল॥
অন্য যে অনঙ্গ সে অরূপ প্রাকৃতিক।
ব্রজে কাম উজ্জ্বল নির্গুণ রূপধৃক॥
নর্ম্মসখা বিদূষক হয় হাস্যকারী।
পুষ্পাঙ্গ ভারতীবন্ধ কড়ার আদি করি॥
গন্ধবেধ (ঘ) শ্রীমধুমঙ্গল বুদ্ধিমান।
রহস্থানে[২] থাকেন যে তাহে বিট[৩] আখ্যান॥
কৃষ্ণ যবে থাকেন প্রেয়সীগণ সনে।
তথায় যাইতে পারে নর্ম্মসখাগণে॥

পাঠান্তর—(ক) মরন্দ—মকরন্দ।
(খ) কন্দ—কুন্দ।
(গ) প্রণয়—প্রণয়ে।

১। সখার লক্ষণ ও সখাদের নাম ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অনুসারে যথা—

কনিষ্ঠকল্পাঃ সখ্যেন সম্বন্ধ প্রীতিগন্ধিনা।
বিশাল বৃষভোজস্বি-দেবপ্রস্থ-বরূথপাঃ॥
মরন্দ-কুসুমাপীড়-মণিবন্ধ-করন্দমাঃ।
ইত্যাদয়ঃ সখায়োঽস্য সেবাসৌখ্যৈকরাগিণা॥

২। প্রিয় সখাদের লক্ষণ ও নাম ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যথা—

বয়স্তুল্যাঃ প্রিয়সখঃ সখ্যং কেবলমাশ্রিতাঃ।
শ্রীদামা চ সুদামা চ দামা চ বসুদামকঃ॥
কিঙ্কিণী-স্তোক-কৃষ্ণাংশু-ভদ্রসেন-বিলাসিনঃ।
পুণ্ডরীক-বিটঙ্কাখ্যকলবিঙ্কাদয়োঽপ্যমী॥
রময়ন্তি প্রিয়সখাঃ কেলিভির্বিবিধৈঃ সদা।
নিযুদ্ধ-দণ্ডযুদ্ধাদিকৌতুকৈরপি কেশবম্॥

৩। পীঠমর্দ্দলক্ষণ উজ্জ্বলনীলমণিতে যথা—

গুণৈ র্নায়ককল্পো যঃ প্রেম্না তত্রানুবর্ত্তিমান্।
পীঠমর্দ্দঃ স কথিতঃ শ্রীদামা স্যাদ্ যথা হরেঃ॥

পাঠান্তর—(ক) ধন—জন।
(খ) কৃষ্ণেতে—কৃষ্ণের।
(গ) কোকিল-আদি যত জন—কোকিল-আদি গণ।
(ঘ) গন্ধবেধ—গন্ধর্ব্বেধ।

১। প্রিয়নর্ম্মসখা— অত্যন্ত রহস্য ব্যাপারে যুক্ত প্রিয়সখা।
প্রিয়নর্ম্মবয়স্যাস্তু পূর্ব্বোতোঽপ্যভিতো বরাঃ।
অত্যন্তিকরহস্যেষু যুক্তা ভাববিশেষিণঃ॥
(ভ. র. সি.)।

২। রহস্থানে—নির্জ্জন বা গোপনস্থানে।

৩। বিট—শৃঙ্গাররসে নায়কের অনুচর বিশেষ। উজ্জ্বলনীলমণিতে বিটলক্ষণ যথা—

বেশোপচারকুশলো ধূর্ত্তো গোষ্ঠীবিশারদঃ।
কামতন্ত্রকলাবেদী বিট ইত্যভিধীয়তে॥

বিশেষ রহস্যকারী বিদূষকদল[১]।
তার মধ্যে বিশেষতঃ শ্রীমধুমঙ্গল॥
প্রেয়সীসম্বন্ধে নানারসের কথনে।
কৃষ্ণে সুখ দেন বহুরঙ্গের বচনে॥

অথ চেট[২]।

বিবিধ সেবক হয়ে সেবাপরায়ণ।
সখা কিন্তু দাস-অভিমানী কথোজন॥
ভঙ্গুর ভৃঙ্গার আদি সান্ধিক গ্রহিলা।
দাস্য অভিমানে সেবে সখ্যখেলালীলা॥
শুদ্ধ দাস্যভাবে হয়ে রক্তক পত্রক।
পত্রী মধুকণ্ঠ আর তালিক পালিক॥
মধুব্রত মালা (ক) মানু আর মালাধর।
গুণের সাগর রূপে দৃষ্ট মনোহর॥
শৃঙ্গ বেণু যষ্টি পাশ এঁহারা রাখেন।
যথা কৃষ্ণ যান তথা সহিত থাকেন॥
কুঞ্জক্রীড়া-আদি যবে নিশিতে গমন।
অনুযোগ করে (খ), রহে উৎকণ্ঠিত মন॥
আজ্ঞাক্রমে সখাগণে আনিয়া ঘটান।
গৈরিক কুসুম গুঞ্জা সদাই যোগান॥
আর অল্পবয়েস কথোগুলি দাসগণ।
কলারস আলাপেতে আনন্দ জন্মান॥
সদা পার্শ্বে স্থিতি অতি বিদগ্ধ রঙ্গিল।
পল্লব জঙ্গল ফুল্ল কমল (গ) কপিল॥
গৃহে সদা সেবারত আর দাসাবলী।
সুবিলাস বিলাস রসাল রসশালী॥

জম্বুনাদী তাম্বুল-রচনে বিলক্ষণে।
পয়োদ বারিদ নীর-সংস্কার-কারণে॥
প্রেমকন্দ মহাগন্ধ মরন্দ সৈরিন্ধ্র।
মধুকন্দলাদি যে ভৃঙ্গারধর সান্দ্র॥
সুমনা কুসুম কাশ পুষ্পহাস হার।
আদি গন্ধ অঙ্গবাস পুষ্প অলংকার॥
মাল্যাদিরচন আর সৌগন্ধলেপন।
শ্রীঅঙ্গে সুবেশ কার্য্যে অতি বিলক্ষণ (ক)
ব্রজে কৃষ্ণদাসগণ মধুর চরিত।
নব নব বয় কৃষ্ণ সেবায় উচিত॥
দেখিতে সুন্দর নানা ভূষণে ভূষিত।
সদা প্রেমানন্দে মগ্ন চাহে কৃষ্ণহিত॥
কৃষ্ণসুখে সুখী মাত্র অনন্য ভাবনা।
নিজসুখে বিরাগ শ্রীকৃষ্ণসুখ বিনা॥
বুদ্ধিমান বিচক্ষণ কর্ম্মের কৌশলে।
মনোবৃত্তি বুঝি কার্য্য করে কুতূহলে॥
ভৃত্যকর্ম্মে সুপণ্ডিত স্নেহে বন্ধুসম।
সর্ব্বক্ষণ প্রেমসেবা নাহিক বিরাম॥
জগন্মাতা শ্রীযশোদা শ্রীমতী রোহিণী।
হেরিয়া আনন্দ মনে (খ) জুড়ায় পরাণী॥
সন্তুষ্ট সতত পুত্রবত স্নেহ করে।
তাঁহারাও ঠাকুরাণীগণে ভক্তি ধরে॥
মাতাগণ অতি ভালবাসে তাঁ সভারে।
প্রধান প্রধান যাঁহারাও (গ) যূথবরে॥
তাঁহার সভার নাম কিছু সংকীর্ত্তন করি।
শ্রীচরণে ঐকান্তিক মতি যে বিচারি (ঘ)॥
যে কোন সুকৃতি জন্মে জন্মে থাকে মোর।
তাঁহাদিগের শ্রীচরণে মতি হউ ভোর॥
রক্তক পত্রক পাত্রী মাধুকণ্ঠ মোদা।
মধুব্রত সুবিলাস রসাল শারদা॥
প্রেমকন্দ মরন্দ আনন্দ চন্দ্রহাস।
পয়োদ বকুল রসদান সুপ্রকাশ॥

পাঠান্তর—(ক) মালা—মালী।
(খ) করে—করি।
(গ) কমল—কোমল।

১। বিদূষক—ভোজনে লোভী, কলহপ্রিয় এবং অঙ্গভঙ্গি, বেশভূষা ও কথায় হাস্যোদ্রেককারী।

বসন্তাদ্যাভিধো লোলো ভোজনে কলহপ্রিয়ঃ।
বিকৃতাঙ্গবচোবেশৈর্হাস্যকারী বিদূষকঃ॥
—উজ্জ্বলনীলমণিঃ।

২। চেট—নায়কের সহায়বিশেষ।
সন্ধানচতুরশ্চেটো গূঢ়কর্ম্মা প্রগল্‌ভধীঃ।
—উজ্জ্বলনীলমণিঃ।

পাঠান্তর—(ক) বিলক্ষণ—বিচক্ষণ।
(খ) মনে—বড়।
(গ) যাঁহারাও—যাহা তাঁর।
(ঘ) বিচারি—আচরি।

ইত্যাদি করিয়া কৃষ্ণদাস বহুতর।
শত শত সেবাপর আনন্দ অন্তর॥
অপ্রাকৃত চিদানন্দময় নিত্যরূপ।
সর্ব্বারাধ্য সাধ্য সিদ্ধ-পূজ্যগণ-ভূপ॥
তাঁ-সভার চরণ অনুগা ভক্তিমতে।
যে সুকৃতি ভজে ব্রজরাগাত্মিকা-মতে॥
সেই ব্রজে কৃষ্ণ পায় ব্রজবাসিমতে।
অন্যথা না পায় শতকল্প যে ভজিতে॥
কদাচ না পায় ভজিলেহ কৃষ্ণ ব্রজে।
এই ত সিদ্ধান্ত হয়ে সাধুর সমাজে॥
অতএব কৃষ্ণদাস ভজ করি ব্রত।
রাগানুগা ভক্তিমার্গে হও অনুগত॥
কৃষ্ণসুখে যার মতি হয়ে ত উল্লাস।
তাঁর শ্রীচরণরজ মাগে লালদাস॥

অথ নাপিত।

কর্পূর সুগন্ধ পক্ষ কুমুদ মরন্দ।
আদি কেশ সমস্কারে দিয়া নানাগন্ধ॥
শ্রীঅঙ্গ-মর্দ্দন আর দর্পণ-অর্পণ।
কর্ণকণ্ডূয়ন করে নাপিতের গণ॥

ভাণ্ডারী।

স্বচ্ছ আর শীতল প্রগুণ আদি করি।
খাদ্য আর রত্নাদিক ভাণ্ডারে ভাণ্ডারী॥
পীঠ-আদি-দানে ভক্ষ্যস্থানাদি করণে।
কমল (ক) বিমল আদি পটু সুরচনে॥

অথ দাসীগণ।

ধনিষ্ঠা চন্দনকলা গুণমালা (খ) শোভা।
রতিপ্রভা ইন্দুপ্রভা ভরণী আর রম্ভা॥
ইত্যাদি এঁহারা পরিচারিকা গৃহের।
ক্ষীর-আবর্ত্তনে গৃহমার্জ্জনে সোসর॥
কুরঙ্গী ভৃঙ্গারি আদি সুলম্বা লম্বিকা।
চরকর্ম্মে সুচতুর ধীমান অধিকা॥
নানা বেশে নানা ছলে সদাই বেড়ান।
সুন্দরী যুবতীগণে করেন সন্ধান॥

দূতীচর্য্যামতে বামা স্বভাব যে আর।
তুঙ্গ বাবদূক মনোরমা নীতি সার॥
কেলি-কলহেতে বিশারদা ইত্যাদিকে।
যাহাতে কৃষ্ণের প্রীত জন্ময়ে অধিকে (ক)॥
কুঞ্জসমস্কারে বৃন্দা বৃন্দারিকা মৈনা।
সুবলা ইত্যাদি করি অভিজ্ঞা নিপুণা॥
তার মধ্যে বৃন্দাদেবী সর্ব্ববরীয়সী।
রাধাকৃষ্ণ-মনোনীত সর্ব্বসমঞ্জসী॥
বীরা নামে শ্রেষ্ঠা দূতী সুখ্যাতা পূজিতা।
তপস্বিনী বনে বাস ব্রাহ্মণ-দুহিতা॥

অথ দীপিকা।

মশাল-ধারণে সদা তিমির-নিশাতে।
দাণ্ডাইয়া রহে গৃহে গতায়াত-পথে॥
শোভন দীপন নাম আদি বহুজন।
কৃষ্ণ-আগে চলে যবে সভাতে (খ) গমন॥

বন্দী।

বন্দী বিচিত্ররাব আর মধুরাব।
পার্শ্বে স্তুতি করে দুঁহো (গ) প্রেমানন্দভাব॥

নর্ত্তক।

চন্দ্রহাস ইন্দুহাস (ঘ) চন্দ্রমুখ আদি॥
সভাতে করয়ে নৃত্য রাত্রে নিরবধি॥

বাদ্যকার।

মৃদঙ্গ শারঙ্গ সুধানাদ সুধাকর।
আদি বহু গুণবন্ত-আদি মিষ্টকর॥
কলাবন্ত-আদি গুণসাগর বীণাবাদ্যে।
চিত্ত-মন হরণ করয়ে যার নাদে (ঙ)॥

পাঠান্তর- (ক) কমল কোমল।
(খ) গুণমালা - গণমালা

পাঠান্তর- (ক) তাহাতে কৃষ্ণের প্রীতি জন্মায় অধিকে।
(খ) সভাতে—নিশাতে।
(গ) দুহো—দুহু বা দোঁহে।
(ঘ) ইন্দুহাস—ইন্দ্রহাস।
(ঙ) কটকলার সংস্করণে পাঠান্তর এইরূপ—
কলাকণ্ঠ-আদি অতি গুণের সাগর।
যার বাদ্য শুনি কৃষ্ণ আনন্দ অন্তর॥
নানাবিধ বাদ্য জানে নিপুণ বীণাবাদ্যে।
চিত্তমন হরণ করয়ে যার নাদে॥

গায়ক।

রসজ্ঞ তালজ্ঞ সর্ব্বপ্রবন্ধে নিপুণ।
কৃষ্ণমনোহারী তার কি কহিব গুণ॥
কলকণ্ঠ সুকণ্ঠ যে সুধাকণ্ঠ-আদি।
গায়ক সুধীর যে উগারে সুধানদী॥
তালধারী ভারত সারদা সরদাদি।
করে তাল ধরে বাদ্য জিনি মন মাদি॥

সূচি-কর্ম্মা।

সৌচিক রৌচিক-আদি সিঞে কঞ্চুকাদি।
ঞেহারা নিপুণ অতি সূচি-কর্ম্মে সুধী॥

রজক।

রজক সুমুখ আর দুর্লভ-রঞ্জন।
ইত্যাদি পারগ ধৌত করিতে বসন॥

হড্ডিক।

হস্তি পুণ্যপুঞ্জ ভাগ্যরাশি দংহু নাম।

স্বর্ণকার।

স্বর্ণকার রঙ্গণ টং :ন গুণধাম॥
প্রতিদিন নূতন ভূষণ কৃষ্ণ লাগি।
বনান অপূর্ব্ব যে সহজে অনুরাগী॥

কুমার।

কুমার মন্থনীবৃহদ্‌বর্ত্তন নির্ম্মাণ।
করেন পবন আর কর্ম্মঠ অভিধান॥

ছুতার।

ছুতার মন্থানদণ্ড খট্টাদি নির্ম্মাণ।
করেন অপূর্ব্ব বর্দ্ধকী বর্দ্ধমান॥

চিত্রকর।

চিত্রকর সুচিত্র বিচিত্র দুহংজন।
যাহার তুলনা নাহি এ তিন ভুবন॥

শিল্পকার-বিশেষ।

শিকা মন্থনের রজ্জু পেটারিকা আদি।
বানাইতে কারব কণ্ডোল-আদি সুধী॥

গাবী।

কৃষ্ণের সুপ্রিয় গাবী পিশঙ্গী ধুমলা।
গঙ্গা হংসী মণিকস্তনী (ক) বংশী আর পিঙ্গলা॥
আদি করি বহু হয় উত্তম গোধন।
কৃষ্ণ না দেখিলে নাহি ধরয়ে জীবন॥

কুক্কুর, হংস প্রভৃতি।

কুক্কুর দুই যে ব্যাঘ্র ভ্রমর আখ্যান।
রাজহংস হয়ে এক কলম্বন নাম॥
শিখী তাণ্ডবী নাম শুক বিচক্ষণ।
বৃন্দাবন মহোদ্যান সুখের নিধান॥

বৃন্দাবন-ধাম।

বৃন্দাবনধামের যে অপার মহিমা।
কহিব পশ্চাত কিছু যথা বুদ্ধিসীমা॥
ক্রীড়াগিরিরাজ শ্রীমান্ গোবর্দ্ধনস্থলী।
নীলমণ্ডপিকা ঘট্টকন্দরা মণিকন্দলী॥
তাহার মহিমা ত্রিভুবনে কে বাখানে।
কোটিশতাংশের অংশ বেদে নাহি জানে॥
যাহার স্মরণ নাম দর্শনের আশ।
কৃতমাত্র হয় প্রেম ভয় যায় নাশ॥
মানসগঙ্গার ঘাট নাম যে পারঙ্গ।
সুবিলাসা তরা নাম তরণী সুরঙ্গ॥
নন্দীশ্বর নাম শৈল সুবর্ণ আলয়।
ইন্দিরাবিলাসে সদা সর্ব্বসুখময়॥
নন্দরাজগৃহ মাতা যশোদা গৃহিণী (খ)।
পাতিয়াছে সংসার লইয়া গুণমণি॥
চবুতারা মণ্ডপ পাণ্ডুবর্ণ শৈলাসন।
বর (গ) উজ্জ্বল নাম আমোদবর্দ্ধন॥
সরোবর পাবন ক্রীড়াকুঞ্জপুঞ্জতট।
ভাণ্ডীর ন্যগ্রোধরাজ নাম বৃহদ্বট॥
কালীদহে কদম্ব কদম্বরাট্ নাম।
মণির কুট্টিম তীর্থ কুঞ্জ কুঞ্জধাম (ঘ)॥

পাঠান্তর—(ক) মণিকস্তনী -মণিকস্তুরী এবং মণিকা।
(খ) গৃহিণী—রোহিণী।
(গ) বর—বরণ।
(ঘ) তীর্থ কুঞ্জ কুঞ্জধাম—কামতীর্থ কৃষ্ণধাম।

অনঙ্গ রঙ্গভূ নাম পুলিন মহত।
অতুল যমুনাগণ নাম মহাতীর্থ॥
খেলাতীর্থ নাম যমুনার ঘাট তথা।
পরমপ্রেষ্ঠ সখী সঙ্গে সদা ক্রীড়া যথা॥
পংথ্যাদি ব্যঞ্জন মধুমারুত আখ্যান।
শরদিন্দু নামে যে মুকুর বিলক্ষণ॥
লীলাপদ্ম প্রফুল্লিত হস্তপদ্মে সদা।
সচিত্রকোরক নাম গেণ্ডুক সুখদা॥
দুইদিগে স্বর্ণবদ্ধ ধনুক চিত্রিত।
বিলাস-কার্ম্মুক নাম রত্নমুষ্টিযুত॥
মন্দ্রঘোষ নাম যে বিশালমুখ বংশী।
ভুবনমোহিনী রাধা হৃন্মীন-বঁড়শী॥
তেঁহো দ্বিতীয় নাম মহানন্দা রবতি।
ছয়রন্ধ্র বেণু নাম মদনঝঙ্কৃতি॥
মুরলী সরলা নাম যাহার ধ্বনিতে।
পিক মূক হইয়া পলায়ে স্তব্ধরীতে॥
গৌরী গুর্জ্জরী দুই রাগে অতি প্রীত।
রাধানাম জপ রাধারূপ মনোনীত॥
দণ্ড মণ্ডন নাম বীণা তরঙ্গিণী।
পাশ দুই দোহনী যে অমৃতদোহনী॥
ভুজে রক্ষাবন্ধ মাতা যশোদা-অর্পিত।
নবরত্ন নাম নানারত্নেতে খচিত॥
অঙ্গদা রঙ্গদা নাম কঙ্কণ চঙ্কণ।
মুদ্রা রত্নমুখী পীতবসন নিগম॥
কিঙ্কিণী ঝঙ্কার নাম হার তারামণি।
মঞ্জীর হংসগঞ্জন হেরি ভুলয়ে কামিনী॥
মণিমালা তড়িৎপ্রভা নিষ্ক যে (ক) মোদন।
রাধারূপ রুদ্ধ তাহে হৃদয়ে ধারণ॥
নাগপত্নীদত্ত যে কৌস্তুভমণি নাম।
নিত্যসিদ্ধ মহারত্ন যেঁহো জীবধাম॥
মকর কুণ্ডল নাম রতিরাগ রতি।
অধিদেব যাহা হেরি মাতয়ে যুবতী॥
রত্নপারা নাম হয়ে কিরীট সুন্দর।
চামরডামরি নাম চূড়া মনোহর॥
শিখণ্ড মুকুট নবরত্ন বিড়ম্বন।
গুঞ্জাহার নাগবল্লী নাম সুমোহন॥
তিলক মোহন নাম বনমালা[১] নামে।
পত্রপুষ্পময়ী সদা বক্ষঃস্থলে রমে॥
পঞ্চবর্ণ-পুষ্পমালা বৈজয়ন্তী[২] নাম।
বক্ষঃস্থলে শোভে সদা রাধা-মনোধাম॥
জন্মতিথি ভাদ্রকৃষ্ণা-অষ্টমী-রজনী।
নিশাকর উদিত স-প্রেয়সী রোহিণী॥

অথ শ্রীরাধিকা-সম্বন্ধীয় বিশেষ।

বন্যমণ্ডন আর রতনমণ্ডন।
মাতা পিতা আদি যত শ্রীরাধার গণ॥
কীর্ত্তন করিব কিছু সংক্ষেপে যে হয়ে।
বাহুল্য করিতে অতি পুস্তক বাড়য়ে॥
চন্দ্রাবলীর সখী হয়ে অসংখ্য গণন।
তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রেষ্ঠ প্রাণের সমান॥
পদ্মা শ্যামা শৈবা ভদ্রা পালি চন্দ্রশালী।
বিচিত্রা মঙ্গলা লীলা বিমলা গোপালী॥
তরলাক্ষী মনোরমা কন্দর্পমঞ্জরী।
কুমুদা কৈরবী তারা শরদাক্ষী শারী॥
শারদা মঞ্জুভাষিণী শঙ্করী কুঙ্কুমা।
কৃষ্ণা শিবা তারাবলি ইত্যাদিক রামা॥
আর কত শত তার না হয় গণনা।
সর্ব্বগুণময়ী যূথে যূথে বরাঙ্গনা॥
মুখ্যা লক্ষ-সংখ্যা যূথ কৃষ্ণের প্রেয়সী।
রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্যামলা রূপসী॥
পালি-আদি করি যত যত মুখ্যা হন।
সর্ব্বমধ্যে রাধা চন্দ্রাবলী যে প্রধান॥
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠতমোত্তমা।
যার রূপগুণচর্য্যা নাহিক উপমা॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী মধ্যে হেন নাহি আর।
দুই তনু এক প্রাণ প্রেমেতে সোসর॥

পাঠান্তর—(ক) নিষ্ক যে—নিষ্কাম।

১। বনমালা—সকল ঋতুর ফুলে গাঁথা জানু পর্য্যন্ত বিলম্বিত (মতান্তরে চরণ পর্য্যন্ত বিলম্বিত) মালার নাম বনমালা।

২। বৈজয়ন্তী—পাঁচ রঙের ফুলের মালার নাম বৈজয়ন্তী।

প্রাণের অধিক কৃষ্ণ যাঁহারে মানয়।
কি আশ্চর্য্য কি মহিমা বেদে না জানয়॥
অসমান অন-উদ্ধ্ব মাধুর্য্য বৈদগ্ধ।
সহচরী অগণন যোগ্যমতি স্নিগ্ধ॥
ভানুসখা বৃষভানু রাজার নন্দিনী।
রত্নগর্ভা নামে খ্যাতা কীর্ত্তিদা জননী॥
শ্রীমদ্‌বৃষভানু মহারাজ শিরোমণি।
শ্রীমতী কীর্ত্তিদা সুচরিতা মহারাণী॥
ইঁহাদিগের গুণকর্ম্ম কহিতে না জানি।
যাঁর সুতা শ্রীরাধিকা রমণী-শিরোমণি॥
রাধাকৃষ্ণ দুই দেহ একুই স্বরূপ।
রূপে গুণে সম বিদগ্ধাতেই অনুপ॥
হেন রাধার পিতা মাতা তাহার কি কথা।
কৃষ্ণের জনক নন্দ মা যশোদা যথা॥
তাঁহার মহিমা কহিবারে কার সাধ্য।
সকলের শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনের আরাধ্য॥
শ্রীরাধার গণ পূজ্যপূজক-সম্বন্ধে।
কৃপা কর রাখ মোরে চরণারবিন্দে॥
সূর্য-উপাসনা-ছল কৃষ্ণসঙ্গ লাগি।
কৃষ্ণনাম-মন্ত্রজপ স্বাভীষ্টসংসর্গী॥
পৌর্ণমাসী সোহাগে যে সৌভাগ্য সুবহো।
পিতামহ মহীভানু বিন্দু মাতামহো॥
পিতামহী সুখদা মুখরা মাতৃমাতা।
রত্নভানু সুভানু যে ভানুরাজভ্রাতা॥
শ্রীমতীর খুড়া দুই স্নেহে অনুপমা।
ভদ্রকীর্ত্তি মহাকীর্ত্তি কীর্ত্তিচন্দ্র মামা॥
ভানুমুদ্রা নাম পিসী মাসী কীর্ত্তিমতি।
কুশ নাম পিসা কাশ নাম মাসীপতি॥
মাতুলী মেনকা মোনা ধাত্রী-আদি করি।
শ্রীদাম-পূর্ব্বজ-ভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরী॥
পরমপ্রেষ্ঠসখী যে ললিতা আদি করি।
পূর্ব্বে যে কথিত রূপ-গুণের মাধুরী॥
সর্ব্বগুণালঙ্কৃত যে সর্ব্বগুণাগ্রিমা।
প্রিয়সখী কুরঙ্গাক্ষী আদি জিনি রমা॥
কামদা নাম ধাত্রেয়ী বৃদ্ধা পক্ক চুল।
প্রেমে মগ্ন কন্যার চেষ্টায় অনুকূল॥
লবঙ্গমঞ্জরী আর শ্রীরূপমঞ্জরী।
শ্রীগুণমঞ্জরী রতিমঞ্জরী সুন্দরী॥
শ্রীরসমঞ্জরী আর বিলাসমঞ্জরী।
এই ছয় গোসাঞিরূপ ধরে অবতরি॥
ভানুমতি অন্য নাম শ্রীরতিমঞ্জরী।
শ্রীরাগমঞ্জরী-আদি অনেক সুন্দরী॥
দাসীভাবসেবাপরা পরমকৌতুকী।
সমতা হইতে নাহি চাহে দাস্যে সুখী॥
নান্দীমুখী সিন্ধুমতি অন্তরঙ্গা দূতী।
মানরক্ষা-পূর্ব্বক সন্ধিতে বুদ্ধিমতী॥
শ্যামলা মঙ্গলা আদি হন সুহৃৎপক্ষ।
চন্দ্রাবলী মুখ্যা তেঁহো হন প্রতিপক্ষ॥
কলাকণ্ঠী পিককণ্ঠী সুকণ্ঠী প্রভৃতি।
বিশাখা-নির্ম্মিত গীতে হরে হরিমতি॥
প্রেমবতী নর্ম্মদা আর কুসুমপেশলা।
বীণাবাদ্য-আদি গানে বিশেষ কুশলা॥
নাপিতের কন্যা দুই সুগন্ধা নলিনী।
আলতা পরায় ধরি চরণ দুখানি॥
হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণকথার কৌতুকে।
নানা ছন্দবন্ধে যে কহিয়া দেয় মুখে॥
মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গবতী দুই রজক-কিশোরী।
পালিন্ধী চিত্রিণী নানাশিল্পচিত্রকারী॥
মান্ত্রিকী-তান্ত্রিকী দুই দৈবাজ্ঞনী হয়।
বয়োধিকা কাত্যায়নী-আদি দূতীচয়॥
ভাগ্যবতী মল্লপুণ্যা হস্তীর-দুহিতা।
ভৃঙ্গীমল্লি মর্ত্তাল্লি দুই পুলিন্দ-বনিতা॥
কেহ কৃষ্ণপক্ষ কেহ শ্রীমতীর গণ।
প্রিয়তম হন সখ্যভাবেতে গণন॥
গর্গের নন্দিনী গার্গী-আদি ভৃঙ্গারিকা।
পূজ্যা হন অনুকূল চেষ্টাতে অধিকা॥
সুবল উজ্জ্বল মধুমঙ্গল গন্ধর্ব্ব।
শ্রীমতীর প্রিয় নর্ম্মসখাগণ সর্ব্ব॥
মাধুর্য্যের ধুর্য্য[১] শ্রীল গোপেন্দ্রনন্দন।
প্রিয় কোটি পরাণের না হয় সমান॥

১। ধুর্য্য - শ্রেষ্ঠ।

কোটি মাতৃতুল্য স্নেহ কৃষ্ণময়ী মতি।
যতেক উদ্যম সর্ব্ব কৃষ্ণের আরতি॥
পয়োদ রক্তক আদি কৃষ্ণদাসগণে।
যাতায়াত সদা কৃষ্ণপ্রেরিত কথনে॥
পিশঙ্গী মঞ্জুলা শৃঙ্গী বহুলা-আদয়।
গাবী আর বৎসতরী তুঙ্গী আদি চয়॥
বৃদ্ধ কক্খটী আর রঙ্গিণী হরিণী।
চারুচন্দ্রিকা নাম্ সুষ্ঠু চকোরিণী॥
ময়ূরী সুন্দরী নাম সারিকা সুক্ষ্মধী।
ললিতা প্রাণের সখী গুণের অবধি॥
নিজ রাধাকুণ্ড কুণ্ডচরী মরালিকা।
তুণ্ডিকেরী (ক) নাম অতি সুন্দরী পুষ্টিকা॥
শাশুড়ী জটিলা নাম কুটিলা ননদ।
অভিমন্যু নাম পতি দেবর দুর্ম্মদ॥
স্মরমন্ত্রাখ্যান নাম তিলক নাসায়।
হরি-মনোহর নাম হরি যে হৃদয়॥
নাসায় নলকমুক্তা আন্দোলায়মান।
কৃষ্ণমনবিলাসের দোলিকা-নিধান॥
প্রভাকরী নাম তার বিম্বাধরে সখ্য।
পদক মদন নাম শোভিত সুবক্ষ॥
কৃষ্ণ-প্রতিবিম্ব তাহে অতি গুহ্যতম।
স্যমন্তক-পরিযায় তার অন্য নাম॥
কিঙ্কিণী নূপুর বাজু আভরণ যত।
অলৌকিক অপ্রাকৃত কহা যায় কত॥

পাঠান্তর—(ক) তুণ্ডিকেরী—তুঙ্গকেরী।

মেঘাম্বর নাম বস্ত্র সুধাংশু দর্পণ।
নিজমুখ দৃষ্টচ্ছলে (ক) কৃষ্ণদরশন॥
কাজর-শলাকা নাম নর্ম্মদা সোণার।
রতনচিরণী নাম স্বস্তিদা তাহার॥
কন্দর্পকুহলী নাম পুষ্পের বাটিকা।
স্বর্ণমুখী তড়িৎবন্ধ কুণ্ডস-নামিকা॥
অসম অনূর্দ্ধ যার অপার মহিমা।
বেদ-বিধি অগোচর না হয় বর্ণিমা॥
যতেক কহিল সর্ব্ব ত্রিগুণ-অতীত।
শুদ্ধ চিদানন্দময় নিত্য অপ্রাকৃত॥
হস্তি যে কহিল ব্রজে তাহার চরণ।
আশ্রয় করিয়া সেবে সেই ধন্যজন॥
বড় বড় কর্ম্মী জ্ঞানী তপী দানশীল।
হস্তীর সমান থাকু নহে এক তিল॥
ব্রজে সেব্য গুল্মলতা-আদি পশু পক্ষী।
ভাগবতে ব্রহ্মা উদ্ধব তাহে সাক্ষী॥
প্রাকৃত করিয়া যেই মানয়ে অধম।
তাহার দর্শনে পাপ দণ্ড করে যম॥
অতএব ভক্ত শ্রীব্রজের পরিকর।
বিচার করিয়া দেখ সকলের সার॥
নাভাজীর সূত্রের অর্থ কিঞ্চিত বিস্তারি।
লালদাস কহে ব্রজপুরের মাধুরী॥

পাঠান্তর—(ক) দৃষ্টচ্ছলে—দৃষ্টিছলে।

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীমদ্ব্রজপরিকরগণ-নাম-গুণাদি-বর্ণনং নাম নবম-মালা॥ ৯॥

দশম মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

[মূল হিন্দী।]

সপ্তদ্বীপমে দাস জে তে মেরে শিরতাজ॥
জম্বু ঔর পলাছ শালমলী বহুত রাজঋখি।
কুশ পবিত্র পুনি ক্রৌঞ্চ কোন মহিমা জানে লিখি॥
শাক বিপুল বিসতার প্রসিদ্ধ নাম অতি পুহকর।
পরবত লোকালোক ঔক টাপু কঞ্চন ধর॥
হরি ভৃত্য বসত জে জে জঁহা তিনসোঁ নিতপ্রতি কাজ।
সপ্তদ্বীপ মে' দাস জে তে মেরে শিরতাজ॥

অস্যার্থঃ।

সপ্তদ্বীপ নবখণ্ডে যত ভক্তগণ।
সভার চরণ করি মস্তকে ধারণ॥
বহুভাগ্যে যদি পাই চরণের রজ।
মস্তকে ভূষণ (ক) করি করি শিরতাজ॥
জম্বু প্লক্ষ শাল্মলি কুশ ক্রৌঞ্চ শাক।
পুষ্কর সপ্তম দ্বীপ সীমা লোকালোক॥
মধ্য জম্বুদ্বীপ ভাগ হয়ে নয় বর্ষ।
তাহাতে ভারতবর্ষ পুণ্যের আদর্শ॥
এ সকল স্থলীমধ্যে যে যে হরিভক্ত।
অধিষ্ঠাতা ভগবানের যে যে অনুরক্ত॥
তাঁ-সভার চরণ আর সেই সেই স্থান।
সুখাবহ সদাকাল পবিত্র বিধান॥

অথ বৈকুণ্ঠ-আবরণ অষ্ট উরগ[১]।

অষ্ট উরগকুল বৈকুণ্ঠাবরণ।
হরি-পারিষদ হরিবত সুগণন॥
দ্বারপাল যথা জয়-বিজয়াদিগণ।
চিদানন্দঘন মূর্ত্তি প্রভুগতপ্রাণ॥

পাঠান্তর—(ক) ভূষণ—ধারণ।
১। উরগ—সর্প।

ইলাপত্রমুখ (ক) অনন্ত অনন্তকীরতি।
পদ্ম শঙ্কু অসু-কমল (খ) হরিধ্যানব্রতী॥
বাসুকি অজিত করকোটক তক্ষক।
সভে প্রভু সেবাপর বাসুকি পর্য্যঙ্ক[১]॥
আগমাদিমতে অষ্ট হরি-অংশ উপাস্য।
অগর জানেন তত্ত্ব বিশ্ব যাঁর বশ্য॥

অথ সম্প্রদা-প্রণালী।

প্রথমাবতার চতুর্ব্বিংশতির মধ্যে।
হরির আবেশ রামানুজ আদি পদ্মে॥
বিষ্ণুস্বামী মধ্বাচার্য্য তথা নিম্বাদিত্য।
চারি সম্প্রদায় চারি আচার্য্য বিদিত॥
কলিভব সুদুস্তরে জীব নিস্তারিতে।
ভগবান্ অংশে আবির্ভাব পৃথিবীতে॥
গুণের সাগর মহামহান্ত দয়াল।
পাণ্ডিত্যে অপার সুসিদ্ধান্ত-মহীপাল॥
শ্রুতি-মহাসিন্ধু মথি ভক্ত্যমৃতসার।
উদ্ধার করিলা দণ্ডে সুবুদ্ধি-মন্দার॥
পরমত-বিরুদ্ধাংশ ছেদন করিয়া।
স্বমত যথার্থ স্থাপে বিচার করিয়া॥
চারি সম্প্রদায় চারি মহান্ত স্বতন্ত্র।
শিষ্য-অনুশিষ্য-ক্রমে দাতা বিষ্ণুমন্ত্র॥
শ্রীরুদ্র মাধ্বী আর সনক চতুর্থ।
এই চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণব মহত্ত্ব॥
বিনে সম্প্রদায়ী গুরু উপাসনা (গ) ব্যর্থ
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু না যায় অনর্থ॥

পাদ্মে তথা গৌতমীয়-তন্ত্রে—

"কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ

পাঠান্তর—(ক) ইলাপত্রমুখ—ইলাপত্র মুখ।
(খ) অসু-কমল—অশ্রু কমল।
(গ) উপাসনা—উপদেশ।
১। পর্য্যঙ্ক—খাট, শয়নাধার।

তত্র চ—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ"
ইত্যাদি

অনুবাদাদি পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

কোন্ সম্প্রদায় কোন্ মহান্ত প্রকাশ।
তাহার বিশেষ শুন করিয়া বিশ্বাস॥

[দোঁহা—মূল।]

রমা-পদ্ধতি রামানুজ বিষ্ণুস্বামী ত্রিপুরারি।
নিম্বাদিত্য সনকাদিক মধু কর গুরু মুখ-চারি॥

অস্যার্থঃ।

শ্রী-সম্প্রদার গুরু শ্রীল-রামানুজ স্বামী।
চতুর্ম্মুখ সম্প্রদায় মধ্বাচার্য্য-নামী॥
বিষ্ণুস্বামী মহান্ত শ্রীরুদ্র সম্প্রদায়।
নিম্বাদিত্য চতুঃসন-সনক সম্প্রদায়॥

প্রমাণং প্রমেয়রত্নাবল্যাম্—

"রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসন॥"

অনুবাদ।—রামানুজকে লক্ষ্মীদেবী, মধ্বাচার্য্যকে ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে মহাদেব এবং নিম্বাদিতকে চতুঃসন, নিজ্নিজ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীগুরুপরম্পরা।

তত্র সগুরুপরম্পরা, যথা—

"শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্॥"
অক্ষোভ (ক) জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্ বয়ম্॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ।
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন॥
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর শিষ্য ব্রহ্মা, তাঁর শিষ্য দেবর্ষি নারদ, তাঁর শিষ্য ব্যাসদেব, তাঁর শিষ্য মধ্বাচার্য্য, তাঁর শিষ্য পদ্মনাভ, তাঁর শিষ্য নৃহরি, তাঁর শিষ্য মাধব, তাঁর শিষ্য অক্ষোভ, তাঁর শিষ্য জয়তীর্থ, তাঁর শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু, তাঁর শিষ্য দয়ানিধি, তাঁর শিষ্য বিদ্যানিধি, তাঁর শিষ্য রাজেন্দ্র, তাঁর শিষ্য জয়ধর্ম্ম, তাঁর শিষ্য পুরুষোত্তম, তাঁর শিষ্য ব্রহ্মণ্য, তাঁর শিষ্য ব্যাসতীর্থ, তাঁর শিষ্য লক্ষ্মীপতি, তাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী, তাঁর শিষ্য জগদ্গুরু ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈতাচার্য্য এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ ইঁহাদের সবাইকে ভক্তির সহিত, সম্যক্প্রকারে যথাক্রমে স্তব করি। যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিয়া জগৎ নিস্তার করেন সেই ঈশ্বরপুরীশিষ্য শ্রীচৈতন্যদেবকে ভজনা করি।

পাঠান্তর—(ক) অক্ষোভ—অক্ষোভ।

অস্যার্থঃ।

মাধবী সম্প্রদায় (ক) গুরুপরম্পরামতে।
প্রণালী পবিত্র (খ) গাঁথা প্রমাণসম্মতে॥
গাই নিজ মতিকল্ক¹-প্রক্ষালন লাগি।
শুদ্ধভক্তিভাব মিলে অন্য যোগে ত্যাগি॥
শ্রীকৃষ্ণস্য শিষ্য ব্রহ্মা দেবঋষি তস্য।
তাঁর শিষ্য বেদব্যাস কবির উপাস্য॥
তাঁর শিষ্য মধ্ব তস্য পদ্মনাভ অস্য।
নরহরি মহান্ শ্রীমাধব যাঁর শিষ্য॥
তস্য শিষ্য শ্রীঅক্ষোভ জয়তীর্থ তস্য।
জ্ঞানসিন্ধু সাধু দয়াসিন্ধু তস্য শিষ্য॥
বিদ্যানিধি তস্য তস্য রাজেন্দ্র মহান্।
তস্য জয়ধর্ম্ম যেঁহ পুরুষোত্তম জান॥
তস্য শিষ্য ব্রাহ্মণ্য তস্য ব্যাসতীর্থ নাম।
ততো লক্ষ্মীপতি সাধুত্তম অভিরাম॥
ততো শ্রীমন্মাধবেন্দ্র গুণের সাগর।
যাঁর শিষ্য অঙ্গীকৃত্য অদ্বৈত ঈশ্বর॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দ জগদ্গুরু ভক্তস্বরূপ (গ)।
জীবনিস্তারের হেতু প্রকটস্বরূপ॥
মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী।
যেঁহ কৃষ্ণ বলি সদা কান্দয়ে ফুকারি॥
তচ্ছিষ্য শ্রীদেবদেব চৈতন্য গোসাঞি।
মো-সভার উপায় যাঁহাবিনে আর নাই॥

পাঠান্তর—(ক) সম্প্রদায়—সম্প্রদার।
(খ) প্রণালী পবিত্র—প্রমাণ প্রণালী।
(গ) ভক্তস্বরূপ—নিত্যরূপ।
১। কল্ক—মল, পিটা, পাপ।

প্রেমতরি দিয়া যেই তারিলা জগত।
বিচার না কৈলা ভালমন্দ সদসত॥
দুর্লভ রতন বিলাইলা যারে তারে।
হেন দয়াময় আর কে আছে সংসারে॥
এ-হেন দয়ার নিধি তাঁরে না ভজিয়া।
কাহারে ভজিবে ভাই কি ধন লাগিয়া॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া ভাই করহ ফুৎকার।
তেঁহো বিনে ত্রিজগতে গতি নাহি আর॥
জগাই মাধাই ত্রাণ জগতে শুনিয়া।
লালদাস রহে সেই পথ নিরখিয়া॥

অথ 'শ্রী'সম্প্রদার প্রণালী।

[ছপ্পয়—মূল হিন্দী।]

সম্প্রদায়শিরোমণি সিন্ধুজা রচ্যো ভক্তিবিতান্॥
বিষ্বক্‌সেন মুনিবর্য্য সপুন ষটকোপ পুনীতা।
বোপদেব ভাগবত লুপ্ত উধর্য্যো নব নীতা॥
মঙ্গল মুনি শ্রীনাথ পুণ্ডরীকাক্ষ পরমযশ।
রামমিশ্র রসরাশি প্রগট পরতাপ পরাঙ্কুশ॥
যামুন মুনি রামানুজ তিমিরহরণ উদৈ ভান।
সম্প্রদায় শিরোমণি সিন্ধুজা রচ্যো ভক্তিবিতান॥

অস্যার্থঃ।

সিন্ধুকন্যা রমাঠাকুরাণী মূলাচার্য্য।
তাঁর কৃপাপাত্র বিষ্বক্‌সেন মুনিবর্য্য॥
তত শ্রীমান্ ষটকোপ তত বোপদেব।
লুপ্ত ভাগবত উদ্ধারি ঘুচাইলা ক্ষোভ॥
তত শ্রীল শ্রীনাথ পুণ্ডরীকাক্ষ তত।
রামমিশ্র তত শ্রীযামুন মুনিব্রত॥
তাঁর শিষ্য রামানুজ-ভানু প্রকাশিয়া।
তিমির নাশিলা কৃপাদৃষ্টি-কর দিয়া॥
প্রসঙ্গে শ্রীভাগবত-উদ্ধার কারণ।
বোপদেব-গোসাঞির কহি বিবরণ॥
শ্রীল শঙ্করাচার্য্য শঙ্করাবতার।
ভগবত-আজ্ঞায় ব্রাহ্মণরূপধর॥
কলিকালে বেদের সদর্থ আচ্ছাদন।
করি ব্যাখ্যা করে মায়াবাদার্থ স্থাপন॥
কৃষ্ণভক্তি গোপন করিয়া দেবী দেবা।
উপাসনা প্রকাশিলা ত্রিবর্গের[১] সেবা॥
সুরনামে কাশীরাজ অসুর স্বভাব।
তারে লওয়াইল তম-ধর্ম্ম বামাচার॥
জীবহিংসা করে বহু তমের স্বভাবে।
শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র নিন্দে মূঢ় তবে॥
দেশদেশান্তরে গ্রন্থ যথা যথা ছিল।
বলে আনি আনি সব গঙ্গায় ডারিল॥
ভাগবতহীনদেশ দেখি সাধুগণ।
কাতরে শ্রীভগবানে করয়ে স্তবন॥
প্রিয়পাত্র শ্রীল বোপদেব গোসাঞিরে।
হইল আকাশবাণী উপায় সুন্দরে॥
যত ভাগবত গ্রন্থ গঙ্গায় ডারিল।
যতন করিয়া তাহে জাহ্নবী রাখিল॥
কিছু হানি নাহি হয় উঠাও ডুবিয়া।
যথা শুদ্ধ পূর্ব্ববত (ক) উঠিবে আসিয়া॥
এত শুনি গোসাঞি যে প্রহৃষ্ট অন্তরে।
উঠাইলা গ্রন্থ ডুবি জাহ্নবীর নীরে॥
বহু সম্মানিয়া স্থানে স্থানে পাঠাইলা।
মুক্তাফল নামে গ্রন্থের টীকা বিস্তারিলা॥
অতএব ভাগবত-উদ্ধার কারণ।
বোপদেব স্বামীর কহিল বিবরণ॥
শ্রীশঙ্কর ইহা শুনি অপরাধ মানি।
টীকা কৈলা ব্রহ্মসূত্রবত অর্থ জানি॥
আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামীর অভীষ্ট।
যামুন আচার্য্য যেঁহো মুনিব্রত শিষ্ট॥
তাঁহার মহিমা গুণ জগতে প্রসিদ্ধ।
তাঁর মত সর্ব্বাচার্য্যমতে হয় সিদ্ধ॥
যামুনাচার্য্যস্তোত্র যাহার বর্ণন।
শ্রুতিসার অর্থ যাহা পরম প্রমাণ॥
সংক্ষেপে 'শ্রী'-সম্প্রদার প্রণালী কহিল।
পরে রামানুজ হৈতে বহু স্রোত হৈল॥

পাঠান্তর—(ক) পূর্ব্ববত—পূর্ব্বমত।
১। ত্রিবর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম।

শ্রীল-রামানুজ-স্বামী ভুবন-পাবন।
এবে কিছু গুণ তাঁর করিব বর্ণন॥

[মূল হিন্দী।]

সহস্র-আস্য উপদেশ করি জগত উদ্ধরণ যতন কিয়ো।
গোপুর হৈব আরূঢ় উ'চস্বর মন্ত্র উচ্চারো্যা।
সুতে নর পরে জাগি বহত্তরি শ্রবর্ণনি ধারো্যা॥
তিন নেঈ গুরুদেব পদ্ধতি ভঈ ন্যারীন্যারী।
কুরু তারক শিষ্য প্রথম ভক্তিবপু মঙ্গলকারী॥
কৃপণপাল করুণাসমুদ্র রামানুজসম নাহি' বিয়ো।
সহস্র-আস্য উপদেশ করি জগত উদ্ধরণ যতন কিয়ো॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীমান্ রামানুজস্বামী শেষ অবতার।
কৃপা করি প্রকটিলা তারিতে সংসার॥
গুরুস্থানে মন্ত্রদীক্ষা-শিক্ষা-মাত্রে সিদ্ধ।
শ্যামলসুন্দর রূপ দেখে বস্তু সাধ্য॥
দয়ার সাগর স্বামী কৃপাবিষ্ট হৈয়া।
চিন্তয়ে অন্তরে হেন বস্তু না চিনিয়া॥
ভ্রময়ে সংসারে লোক পাপপুণ্যবশে।
বাসনা-অবিদ্যা-দুঃখসাগরেতে ভাসে॥
আজি সর্ব্বলোক নিস্তারিব যে ভাবিয়া।
সম্মুখ দুয়ারে গিয়া দু'হস্ত তুলিয়া॥
নিজ সিদ্ধ ইষ্টমন্ত্র উচ্চস্বর করি।
ফুকারিয়া কহে তিনবার সর্ব্বোপরি॥
গ্রামে বহুলোক মধ্যে বাহাত্তর জন।
শিখিলা সে মন্ত্র যেই যেই ভাগ্যবান্॥
কণ্ঠস্থ করিয়া অতিগোপনে রাখিলা।
মন্ত্রের প্রভাবে সেই সেই সিদ্ধ হৈলা॥
তাহার তাহার শিষ্য-পরম্পরা হৈতে।
ভক্তিনিধি দুর্লভ ব্যাপিলা পৃথিবীতে॥
নিস্তার হইল লোক তাহার প্রভাবে।
অদ্যাপিহ মহাশয়ের যশ গায় সভে॥
নীলাচল গেলা জগন্নাথ দরশনে।
সহস্রেক শিষ্য সঙ্গে কুতূহল মনে॥
দরশন করি মন (ক) আনন্দ পাইল।
সেবক রসুয়্যাগণের আচার না দেখিল॥
অনাচার করি জগন্নাথেরে সেবয়।
ক্ষোভিত হইয়া সব সেবক ছাড়ায়॥
নিজশিষ্য সহ সাধু শুদ্ধাচার করি।
সেবন করয়ে তবে প্রেমানন্দে ভরি॥
স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রভুর তাহে নাহি সুখ।
পূর্ব্বের সেবক-সেবায় পরম উৎসুক॥
স্বামী প্রতি কহে প্রভু বিরমহ তুমি।
পূর্ব্ববত সেবক-সেবায় সুখী আমি॥
তথাচ না বিরমহে সেবানন্দে মগ্ন।
প্রভু সনে হঠ করি করয়ে সেবন॥
জগন্নাথ প্রিয়ভক্তে কোপ নাহি করে।
গরুড়েরে আজ্ঞা দিলা রাখ লয্যা দূরে॥
রাত্রিযোগে গরুড় সহস্র শিষ্য-সহে।
রাখে লৈয়া দূরদেশে পূর্ব্বে যথা রহে॥
নিশি-অবসানে নিদ্রাভঙ্গে উঠি চাহে।
কোথা আইনু এ যে দেখি পুরুষোত্তম নহে॥
চকিত হইয়া সভে ভাবে মনে মন।
বুঝিলাম ইহা জগন্নাথের গঠন॥
ভাল ভাল তাঁহার যাহাতে হয় সুখ।
সেই মোর সুখ তাহে নাহি কিছু দুখ॥
শ্রীসম্প্রদায় আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামী।
শ্রুতির সদ্ভাষ্য যে'হ প্রকাশে আপনি॥
তাঁর শ্রীচরণ-পদ্মে শরণ লইল।
মো সবা জীবের যে'হ উপায় সৃজিল॥
শ্রুতির কুব্যাখ্যা-মেঘে আচ্ছাদন ছিল।
রামানুজস্বামি-বাতে মেঘ উড়াইল॥
তবে শুদ্ধভক্তি-রবি উদয় করিয়া।
জগতের অন্ধকার দিলা খেদাড়িয়া॥
সকল প্রসঙ্গ-মূল লেখা নাহি যায়।
যেহেতুক অতিশয় পুস্তক বাঢ়য়॥
যথাশক্তি বুদ্ধিসাধ্য ক্রমেতে বর্ণিব।
মূর্খ বলি লালদাসে ঘৃণা না করিব॥

পাঠান্তর—(ক) মন—বহু।

অথ শ্রীরামানুজস্বামীর শিষ্য-প্রশিষ্যের প্রণালী।

শ্রীল রামানুজ স্বামী বড় কৃপা কৈলা।
শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে জগত তারিলা॥
তাহার পদ্ধতি শুন পরমমহত্ত্ব।
শ্রবণমঙ্গল হয়ে পরম পবিত্র॥
প্রধান সেবক শ্রীল দেবাচার্য্য নাম।
তাঁর শিষ্য শ্রীরাঘবানন্দ গুণধাম॥
তাঁর শিষ্য হন শ্রীমান্ গুরু রামানন্দ।
ভুবনপাবন যেঁহ ভক্তপরানন্দ॥
অসংখ্য তাঁহার শিষ্য নাহিক অবধি।
তার মধ্যে কিছু কহি পবিত্রিতে বিধি (ক)॥
শ্রীঅনন্তানন্দ আর কবীর মহাশয়।
সুখা সুর পদ্মাবতী মহিমা বিজয়॥
শ্রীল নরহরি শ্রীমান্ পীপা ভাবানন্দ (খ)।
রুইদাস আর ধনা-আদি শিষ্যবৃন্দ॥
বহু শিষ্য প্রশিষ্য বিশ্বমঙ্গল-স্বরূপ (গ)।
জীবত্রাণ-কারণ দ্বিতীয় রামরূপ॥
অনন্তানন্দের পদ পরশিয়া লোক।
নির্ব্বৃতি পাইলা পাসরিলা দুঃখশোক॥
আর যোগানন্দ গয়েশ করমচন্দ্র।
অহ্ন পৈহারী শুভ ভক্তের মহেন্দ্র॥
সারী রামদাস শ্রীরঙ্গ গুণাকর।
তাঁহার চরিত্র কিছু হয় চমৎকার॥
নরহরি শুভরবি উদিত হইয়া।
মুদিত ভকতি-পদ্ম দিলা প্রকাশিয়া॥
ভকতি অপার সিন্ধু দুস্তর দুর্গম।
তাহাতে রচিলা ভেলা করিয়া সুগম॥
অনায়াসে পারতক গমন করিল।
খেলাইয়া বাইচ-সুখ আস্বাদন কৈল॥
প্রত্যেকে (ঘ) যে ইহা সভার গুণেতে বিস্তার।
কহিতে নারিল মাত্র কৈনু নমস্কার॥

শ্রীল রামানুজ স্বামী শিষ্যের সহিতে।
লালদাস শরণ লইতে চাহে চিতে॥

চরিত্র শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামীর

নিম্বাদিত্য এক দণ্ডী গৃহে নিমন্ত্রিলা।
দ্রব্য-আয়োজন-পাকে সন্ধ্যা আসি হৈলা॥
যতি শাস্ত্র-বচন পড়িয়া কহে তবে।
রাত্রে ভিক্ষা দণ্ডীর নিষেধ বিধি রবে॥
ইহা শুনি চিন্তি নিম্বাদিত্য মহাশয়।
নিজ ভক্তিবলে সাধু সৃজিলা উপায়॥
আঙ্গিনায় আছয়ে বৃহত নিম্ববৃক্ষ।
উদয় করিলা আসি বৃক্ষোপরি অর্ক[১]॥
কৃষ্ণভক্ত অনুরোধে সূর্য্যদেব আসি।
প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি॥
ভোজন করিয়া তথা বৈসে যবে যতি।
সূর্য্য নিজ স্থানে গেলা লইয়া সম্মতি॥
তখন প্রহর নিশি প্রতীত হইল।
যতির আশ্চর্য্য বোধ তখন জন্মিল॥
কৃষ্ণভক্ত নিম্বাদিত্য প্রভাব দেখিয়া।
চরণে পড়িলা যতি শরণ লইয়া॥
সাধুসঙ্গ মহিমা দেখয়ে অদভুত।
কৃষ্ণভক্ত হৈলা যতি ছাড়ি জ্ঞানমত॥
তাঁহার চরণরজ মস্তকে ধারণা।
করিয়া কৃতার্থ হই পাই এক কণা॥

চতুরাচার্য্য মহিমা বর্ণন।

চারি সম্প্রদায় চারি আচার্য্য মহান্ত।
বেদের স্বরূপ বেদনিধি বিজ্ঞ-অন্ত (ক)॥
বিচারে পাণ্ডিত্যেতে অদ্বিতীয় অপার।
কু-সিদ্ধান্তবাদি-পরাভবে খড়্গাধার॥
চারিভক্ত চারি হয়ে দিগ্‌গজস্বরূপ।
ভক্তিভূমি দাবি রহে বিক্রমে অনূপ॥

পাঠান্তর—(ক) বিধি—ধী।
(খ) ভাবানন্দ—ভবানন্দ।
(গ) বিশ্বমঙ্গল স্বরূপ—বিংবমঙ্গল স্বরূপ।
(ঘ) প্রত্যেকে—প্রত্যক্ষে।

পাঠান্তর—(ক) বেদের স্বরূপ বেদনিধিবিজ্ঞ অন্ত।
১। অর্ক সূর্য্য।

মতান্তরশক্তি (ক) কাটি খান খান কৈল।
শুদ্ধভক্তিমত ব্রহ্ম-অস্ত্র তেয়াগিল॥
কাটিয়া দুষ্ট সিদ্ধান্ত কন্দুক খেলিল।
সচ্চিৎ আনন্দরূপ রাজ্য হাত কৈল॥
রাজ্যে সুখভোগ করি প্রজা বসাইল।
প্রজা সুখী হৈয়া নৃপ-জয় মানাইল॥
প্রেমামৃত-শস্য প্রজা খায় মহানন্দে।
নির্ভয়ে বেড়ায় সদা নির্ব্বিঘ্নে নিঃসন্ধে॥

চরিত্র শ্রীলালাচার্য্যের

রামানুজস্বামীর জামাতা লালাচার্য্য।
তাঁহার চরিত্র কিছু শুনিতে আশ্চর্য্য॥
পরম ভকতিবান্ বৈষ্ণবে পিরীতি।
গুরুতে একান্ত রতি বাক্যেতে প্রতীতি॥
গুরু শিক্ষা দিলা বাপু বৈষ্ণব সেবিবে।
বন্ধুবান্ধব গুরু-বৈষ্ণবে জানিবে॥
তুলসীর মালা ভালে তিলক দেখিবে।
দোষ-গুণ-বিচার তাহার না করিবে॥
সহোদর ভ্রাতা যেন তাহারে দেখিবে।
তার হিতে রত হবে প্রণয় করিবে॥
গুরুবাক্যে লালাচার্য্যের সুদৃঢ় বিশ্বাস।
বৈষ্ণব চরণে অসাধার মনোল্লাস॥
দৈবযোগে একদিন নদীর পাথারে।
এক শব ভাসি যায় বৈষ্ণব আকারে॥
গলায় তুলসীমালা তিলক নাসাতে।
দেখিয়া শ্রীলালাচার্য্য লাগিলা চিন্তিতে॥
এই মোর ভাই হা হা কিরূপে মরিল।
ভাসিয়া যাইছে কেহ গতি না করিল॥
ইহা কহি উঠাইয়া ধরি বক্ষস্থলে।
কান্দিতে লাগিলা সাধু হইয়া বিকলে॥
লোকে বলে লালাচার্য্য কান্দ কি লাগিয়া।
হৃদয়ে ধরিছ কোথাকার শব লৈয়া॥
লালাচার্য্য কহে মোর ভাই মরিয়াছে।
নদীতে ভাসিয়া যাইতে পাইলাম কাছে॥
লোক সব উপহাস করিয়া চলিলা।
লালাচার্য্য শব লৈয়া গৃহেতে আইলা॥
বিমান সাজায়্যা বহু বৈষ্ণব আনিলা।
নামসংকীর্ত্তন করি দাহ আদি কৈলা॥
মিষ্টান্ন পক্বান্ন বহু আয়োজন করি।
মহোৎসব করি নিমন্ত্রিলা স্বনগরী॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নিজ কুটুম্ব আত্মীয়।
কেহো না আইল কহে জাত্যন্তর ভেয়॥
কোথাকার মড়া কোন্ জাতি তাহা আনি।
ভাই বলি দাহ আদি করিল আপনি॥
তার কার্য্যে নিমন্ত্রণ কর যে সজ্জনে (ক)।
নিন্দয়ে গ্রামের ভদ্রলোকে জনে জনে॥
বৈষ্ণবের গণ সেহ (খ) না আইসে তরাসে।
কি করিবে দশ-ভদ্র-সমাজেতে বৈসে॥
বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা অন্যে কি জানিবে।
প্রাকৃতের ন্যায় করি লোক মানে সভে॥
অপরাধ কৈল বৈষ্ণবেরে উপেক্ষিল।
নিজঘরে তুলিয়া আনল ভেজাইল॥
কেহো যদি না আইল লালাচার্য্য-গৃহে।
তাহার রহস্য শুন অপরূপ যাহে॥
বিবরণ গুরুস্থানে যাইয়া কহিল।
তোঁহো কহে দরিদ্র যে রত্ন হারাইল॥
বুঝিতে নারিল লোক ইহার মহিমা।
চিন্তা নাই কৃষ্ণচন্দ্র করিবেন সীমা॥
লালাচার্য্য ঘরে আসি দেখয়ে অদ্ভুত।
বৈষ্ণব আসিছে তেজঃপুঞ্জ যূথে যূথ॥
আকাশে বিমান শত শত আইসে যায়।
বৈকুণ্ঠের পারিষদগণ আসি খায়॥
কেবা দেয় কেবা আনে কেবা পরিবেষে।
কত আইসে যায় খায় নাহি হয় দিশে॥
মহামহোৎসব করি সভে যবে গেলা।
ভদ্র-অভিমানী লোক অদ্ভুত দেখিলা॥

পাঠান্তর—(ক) মতান্তরশক্তি—মহান্তের শক্তি।

পাঠান্তর—(ক) কর যে সজ্জনে—করয়ে স্বজনে।
(খ) সেহ—কেহ।

আকাশে দেখয়ে স্বর্ণ-রথ আইসে যায়।
চমকিয়া সব লোক আচার্য্যের পায় (ক)॥
যাইয়া চরণে পড়ি স্তবন করয়।
অপরাধ মো-সভার ক্ষেম মহাশয়॥
তেঁহো কহে ভাই কিছু অপরাধ নাই।
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট খাও যাইবে বালাই॥
বৈষ্ণব চরণরজ করহ বন্দন।
যাইবে সকল (খ) দুঃখ পাইবে মোচন॥

পাঠান্তর—(ক) আচার্য্যের পায়—আচার্য্যেরে পায় এবং আশ্চর্য্যের প্রায়।
(খ) সকল—যতেক।

এত শুনি বৈষ্ণবের শেষ যে আছিল।
দুই হস্তে খায় আর মাখিতে লাগিল॥
তৎক্ষণাৎ অভিমান দম্ভ দূরে গেলা।
আচার্য্য করিলা কৃপা বৈষ্ণব হইলা॥
ভক্তির কিরণে দেশ ঝলমল হৈলা।
সাধুসঙ্গ ফল ভুবি ভরিলা ফলিলা॥
জগতের অমৃত-ফল আস্বাদন কৈল।
লালদাস অভাগার ভাগ্যে না মিলিল॥

ইতি শ্রীভক্তমালে চতুঃসম্প্রদায়-আচার্য্য-গণ-বর্ণনং নাম দশম-মালা ॥ ১০ ॥

একাদশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

আখ্যান গুরুভক্ত বৈষ্ণব

গঙ্গাতীরে বাস বহু বৈষ্ণব কুটীরে।
তার মধ্যে এক গুরুভক্ত দৃঢ়তরে॥
কোন কার্য্যান্তরে গুরু গ্রামান্তরে যাইতে।
সেই শিষ্য সঙ্গ লৈল সেবা অনুগতে॥
গুরুদেব কহে তুমি সঙ্গে না যাইহ।
শিষ্য কহে বিচ্ছেদে ধরিতে নারি দেহ॥
শ্রীচরণ-সেবা মোর একান্ত নিয়ম।
কেমতে রহিব তাতে করিয়া বিরাম॥
তেঁহো কহে মুঞি অল্পদিনেতে আসিব।
গুরুর স্বরূপ এই জাহ্নবীরে সেব॥
ইহাতে হইব তব গুরুর সেবন।
তাহাতে অন্যথা নাহি, কহিনু প্রমাণ॥
ইহা শুনি শিষ্য মনে আনন্দ পাইল।
গুরুর স্বরূপ গঙ্গা বিশ্বাস হইল॥
গঙ্গার সেবায় তবে নিযুক্ত হইল।
নানামত সেবা ভক্তি করিতে লাগিল॥
জলে পাদস্পর্শ কভু ভ্রমে নাহি করে।
বিনে পান অন্য ক্রিয়া করে কূপনীরে॥
তা দেখিয়া অন্য যে বৈষ্ণব তথাকার।
ঈর্ষা করি কহে এ কি অধিক (ক) তোমার॥
স্নান নাহি করো গঙ্গাজলে নাহি নাবো।
যত লোক করে তারা নরকে কি যাবো॥
ইহা কহি কেহ ভর্ৎসে কেহ উপহাসে।
তেঁহো তাহা নাহি শুনে গুরু-আজ্ঞাবশে॥

পাঠান্তর—(ক) অধিক—আচার।

কথোক দিবসে গুরু আইলা আশ্রমে।
অন্য অন্য গুরুস্থানে কহে কথাক্রমে॥
ঞিহো গঙ্গাস্নান আদি পাদস্পর্শডরে।
এবং অন্য-ক্রিয়া-আদি কিছুই না করে॥
নিন্দাচ্ছলে কহিলেন কিন্তু গুরু মনে।
সন্তুষ্ট হইয়া বাহ্যে কিছুই না ভণে॥
সর্ব্বজ্ঞ যে গুরু মনে বিচার করিলা।
এই শ্রেষ্ঠ ইহা প্রতি গঙ্গা কৃপা কৈলা॥
আর যে ঞিহারা ইহ মর্ম্ম না জানিয়া।
ঈর্ষা করি নিন্দে, কিন্তু দিব জানাইয়া॥
এত ভাবি গুরু সর্ব্বশিষ্য সমিভ্যারে।
গঙ্গাস্নানে গেলা কিছু গূঢ়ার্থ অন্তরে॥
শত শত শিষ্য দাণ্ডাইয়া রহে তীরে।
গুরু স্নান করে নাম্বি কণ্ঠ-দঘ্ন নীরে[১]॥
গঙ্গাসেবী সেই শিষ্যে আজ্ঞা কৈলা সাধু।
গামছা আনহ বাপু কহে মৃদু মৃদু॥
তাহা শুনি চিন্তাকুলি ইথি উথি চায়।
পাদস্পর্শ কিরূপেতে করিব গঙ্গায়॥
মধ্যে হৈতে (ক) গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘিব কেমনে।
পাথারে (খ) পড়িলা সাধু উৎকণ্ঠিত মনে॥
গুরু-আজ্ঞা বলবান ভাবিয়া চলিল।
জলে পাদ অর্পিতেই কৌতুক হইল॥
গুরু-গঙ্গা-কৃপাবলে (গ) দেখ চমৎকার।
কমল প্রকাশে যথা দেয় পাদভার॥
যেখানে যেখানে পদ অর্পণ করয়ে।
সেইখানে পাদতলে কমল ফুটয়ে॥
প্রতি পাদ পদ্মোপরি ধরিয়া চলিলা।
গুরুহস্তে বস্ত্র দিয়া নেউটি[২] আইলা॥

পাঠান্তর—(ক) মধ্যে হৈতে—বিশেষত।
(খ) পাথারে—সঙ্কটে।
(গ) গুরু-গঙ্গা-কৃপাবলে—গুরু আজ্ঞা কৃপা বলে।

১। কণ্ঠ-দঘ্ন-নীরে—গলা পরিমাণ জলে, গলা জলে।
২। নেউটি—ফিরিয়া।

জলে নাহি পাদস্পর্শ হইল সাধুর।
বৈষ্ণবমণ্ডলী দেখে থাকিয়া অদূর॥
দেখি চমৎকার মুখে নাহি সরে বাণী।
এ কি অদভুত এই সাধু কে না জানি॥
ঞেহার চরণে কত কৈনু অপরাধ।
নিন্দিনু, বিদ্রূপ কৈনু, করিনু বিবাদ॥
ঞেহাতে প্রভুর কৃপা যথোচিত হয়।
তাহার প্রমাণ এবে দেখিনু নিশ্চয়॥
এত কহি তাঁহার চরণ সভে ধরে।
অপরাধ ক্ষেমাইতে স্তুতি নতি করে॥
সাধুর স্বভাব তেঁহো কুণ্ঠিত হইয়া।
করযোড় করে অতি বিনয় করিয়া॥
গুরু অনুযোগ কৈলা সব শিষ্যগণে।
বিচার নাহিক কর নিজ অভিমানে॥
উত্তম মধ্যম নাহি চিনহ অদ্যাপি।
আপনারে শ্রেষ্ঠ মান গুণ দোষ সৌঁপি॥
সেই সাধুগণ-শ্রীচরণ ধূলীকণ।
মস্তকে ধারণ করি করিয়া যতন॥

চরিত্র শ্রীরঙ্গ বণিক্

দ্যোসা (ক) নামে গ্রামে স্থিতি সরাপি ব্যবসা।
জাত্যংশে বণিক্ শ্রীরঙ্গ মহাযশা॥
তাঁর এক ভৃত্য নিজ কর্ম্মের গতিকে।
মরিয়া হইলা দূত কৃতান্ত অন্তিকে[১]॥
প্রেতাকার রূপ জীবে কর্ম্ম অনুযাই।
দেহপাত করাইয়া আকর্ষে সদাই॥
শ্রীরঙ্গের পুত্র প্রতি কু-দৃষ্টি করিলা।
পুত্র দিনে দিনে ক্ষীণ হইতে লাগিলা॥
বালকেরে কহে মোর মুক্তির উপায়।
করহ, নতুবা মুঞি মারিব তোমায়॥
বালক কিছু না কহে বুঝিতে না পারে।
এক দিন চাক্ষুষ দেখিলা স্থানান্তরে॥
বলদ-বাহকগণ দ্রব্য লৈয়া যায়।
সেই দূত এক বৃষে করিল আশ্রয়॥
অনেক বাহক মধ্যে একে কর্ম্মফলে।
শৃঙ্গ উৎপটাং (ক) করি মারে বক্ষঃস্থলে॥
মরিল বাহক যমালয়ে লৈয়্যা গেলা।
বালক চাক্ষষ দেখি কম্পিত হইলা॥
হরির ভজন নাহি করে যেই জনে।
অই গতি হয় তার জনমে জনমে॥
একদিন দূত আসি পুন কহে তারে।
তোমার পিতারে কহি মুক্ত কর মোরে॥
নতুবা তোমারে আজি মারিব পরাণে।
ভয়েতে কম্পিত শিশু কহে নিজজনে॥
আদ্যোপান্ত বিবরণ সকল কহিল।
ভাই বন্ধু মাতা শুনি চিন্তিত হইল॥
মাতা কহে সত্য হবে (খ) এ কথা প্রমাণ।
পুত্রের আকার ক্ষীণ দেখি আনচান[১]॥
ইহা কহি মাতা তার কান্দিতে লাগিলা।
তার মধ্যে কোন শিষ্ট উপায় সৃজিলা॥
মাতাকে কহয়ে তুমি চিন্তা নাহি কর।
কোন বিঘ্ন নাহি হবে মোর কথা ধর॥
শ্রীরঙ্গ পরম সাধু বৈষ্ণব মহান্ত।
তাঁহার চরণামৃতে বিঘ্ন হবে শান্ত॥
বৈষ্ণবের পাদোদক ভুবনপাবন।
অতএব বিঘ্ন নাশে মঙ্গল কারণ॥
প্রেত-মুক্তিহেতু নিজ করে বিড়ম্বন।
তার মুক্তি হবে আর বাঁচিবে নন্দন॥
শ্রীরঙ্গের পাদোদক লইয়া শয্যায়।
শুতিয়া থাকুক শিশু সতর্ক হৃদয়॥
যখন আসিবে প্রেত বিঘ্ন করিবারে।
পাদোদক যেন তার ডারে অঙ্গোপরে॥
পাদোদক-স্পর্শে প্রেত মুকুতি হইব।
দুই কার্য্য সিদ্ধ হবে সদর্থ মিলিব॥
তাহা শুনি সব জন আনন্দ পাইল।
সাধু সাধু বলি তারে প্রশংসা করিল॥

পাঠান্তর—(ক) দ্যোসা—চৌসা।
১। কৃতান্ত অন্তিকে—যমের নিকটে।

পাঠান্তর—(ক) উৎপটাং—উৎপাটন।
(খ) হবে এবে।
১। আনচান—উদ্বিগ্ন।

সেইমত আচরিল (ক) পাদোদক লৈয়্যা।
মুক্ত হইল প্রেত, শিশু রহিল বাঁচিয়া॥
অতএব বৈষ্ণব-চরণামৃত মহা।
মহিমা যে চমৎকার নাহি যায় কহা॥
মুক্তির কা কথা কৃষ্ণ-প্রেম উপজয়।
যার বিন্দু-পানমাত্রে বেদে ফুকারয়॥
বিশেষে শ্রীরঙ্গ মহাভাগবতোত্তম।
তাহাতে আশ্চর্য্য কি তা (খ) অতি সে সুগম॥
বৈষ্ণবের পাদোদকে প্রেত মুক্ত হৈল।
লালদাস ইহা শুনি ভরসা বান্ধিল॥

চরিত শ্রীকৃষ্ণদাস সাধু

কলিযুগে কৃষ্ণদাস নির্ব্বেদ-অবধি।
পয়ঃপান কৈলা অন্ন তেজি নিরবধি॥
যার শিরে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করে।
কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে সেই, বিঘ্ন যায় দূরে॥
জীবন-মুক্তি হয়, হয় সর্ব্বসিদ্ধ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যোগ তপ ঋদ্ধ॥
কৃষ্ণদাস মহামুনি জগতে বিখ্যাত।
তেজস্পুঞ্জ উর্দ্ধরেতা ভজনে উন্নত॥
যতেক ভকত-হৃদি-পদম (গ) নির্ম্মল।
তাহা প্রকাশক দিবাকর সুশীতল॥
বড় বর দেশপতি কুলক রাজন।
পর্ব্বত-কন্দরে তারে দিলা দরশন॥
বড় কৃপা কৈলা তারে ভক্তিশক্তি দিলা।
মহাভক্ত হৈলা হরিসেবায় মাতিলা॥
একদিন কৃষ্ণ-লাগি জিলেপি থালিতে (ঘ)।
নিজ শিশু একখানি নিল তাহা হৈতে॥
কৃষ্ণহেতু রাজার মনোজ্ঞ খাদ্য বস্তু।
অগ্রভাগ নিল বলি হইলা অসুস্থ॥

পুত্রের মস্তকচ্ছেদে উদ্যোগ হইলা।
সাধু দয়া করি তারে আপনি রাখিলা॥
রাজার তনয় বড় ভক্তিবান হয়।
তাহার সদ্‌গুণ বড় সর্ব্বলোকে গায়॥
বৈষ্ণবের সেবা তার অপূর্ব্ব কথন।
ভেকমাত্র দেখিলেই করয়ে স্তবন॥
বৈষ্ণবের স্ত্রীগণের গরভ দেখিয়া।
গর্ভের বালকে স্তুতি করে আর্দ্র হৈয়্যা॥
এই গর্ভে সন্তান যে মহাপূজ্যতম।
কৃষ্ণের ভকত হবে ভুবনপাবন॥
স্ত্রীগণের পূজন-সম্মান বহু করে।
বৈষ্ণবী বৈষ্ণব-স্ত্রী বৈষ্ণব-উদরে॥
অতএব তাঁহার মহিমা সুবিরল (ক)।
ভুবনপাবন তাঁর শ্রীচরণজল॥
লালসা করহ তাঁর পদরজকণ।
বৈষ্ণবের ভক্ত যেই সেই সে সুজন॥

চরিত শ্রীকীল্‌হজী

শ্রীমান্ কীল্‌হ আর অগর দুই ভাই।
মহা অনুভব পৃথিবীর রত্ন দুই॥
শ্রীমন্মথুরা-মণ্ডলে সদা বাস।
মানসিংহ রাজা আইলা করিতে সম্ভাষ॥
কীল্‌হজীর নিকটে রাজা প্রণতকন্ধর।
পুছয়ে সুমিষ্ট বাক্যে নিজ ইষ্টকর॥
হেনকালে কীল্‌হজী উঠিয়া হস্ত তুলি।
উর্দ্ধমুখ হইয়া কহয়ে ভালি ভালি॥
রাজা তাহা দেখি কিছু চমৎকার হৈলা।
সাধু স্থানে পুনঃপুন পুছিতে লাগিলা॥
রাজার আগ্রহে সাধু কহে বিবরিয়া।
মোর পিতা শ্রীসুমেরু নাম শুদ্ধধিয়া॥
গুজরাটদেশে থাকি কৃষ্ণেরে তুষিলা।
অদ্য দেহ ত্যাগি সাধু বৈকুণ্ঠে চলিলা॥

পাঠান্তর—(ক) আচরিল—আচরণে।
(খ) কি তা- কত।
(গ) পদম - পরম।
(ঘ) থালিতে -আনিতে।

পাঠান্তর—(ক) সুবিরল—সুবিমল।

রতন বিমানে অলৌকিক রূপ ধরি।
গেলা মোরে কহিলা সুকরসান করি॥
মুঞি উঠি সমাদরে সম্মান করিল।
রাজা শুনি সেই দিন লিখিয়া রাখিল॥
মাস দিন বার তিথি লিপি করি তথা।
পাঠাইলা গুজরাট সাধু ছিল যথা॥
তত্ত্ব জানিলা সুমেরুর প্রাপ্তিকথা।
সেই দিন বার (ক) মিলে নহিল অন্যথা॥
আর শুন সাধু শ্রীকীল্‌হজীচরিত্র।
কালের অধীন নহে মহিমা পবিত্র॥
হরিপূজাহেতুক পেটারি হৈতে ফুল।
লইতে তাহাতে ছিল কাল তীক্ষ্ণ ব্যাল[১]॥
অঙ্গুলিতে দংশন করিল করি রোষ।
মহাশয় মৃদু হাসি পাইলা (খ) সন্তোষ॥
সাধুর স্বভাব কিছু আশ্চর্য্য কথন।
কোপে সুখ জন্মে করিবারে আক্রমণ॥
এ কারণ পুনঃপুন সর্পে সুখ দিতে।
অঙ্গুলি কাটায় মহাশয় হর্ষচিতে॥
বিষ নাহি চড়ে হস্তে ক্ষত নাহি হয়।
সংসার-গরল যাঁরে দেখিয়া পলায়॥
তাঁর পদধূলী মহৌষধি যদি পাই।
তবে এই ভববিষ জ্বালাতে এড়াই॥

চরিত্র শ্রীঅগ্রদাসজী

শ্রীল-অগ্রদাস সদা হরিসেবামত্ত।
তৈল-ধারা ন্যায় এক ক্ষণ (গ) নহে ব্যর্থ॥
সদাচার সাধু মার্গে যথা অনুকূল।
পরিপূর্ণ তাহে যাহে হরিভক্তি মূল॥
সিদ্ধ প্রেমরাগ সদা এক রস বহে।
নির্ম্মল রসনা সদা রাম রাম কহে॥

পাঠান্তর—(ক) সেই দিন বার—সেই বার তিথি।
(খ) পাইলা—পাইয়া।
(গ) ক্ষণ—কাল।
১। ব্যাল—সর্প।

নয়নে বহয়ে ধারা বরষার নীর।
নির্দ্দোষ সুধারা শুদ্ধভক্তিমতে ধীর॥
মহারাজ মানসিংহ দর্শনে আইলা।
ভৃত্যগণ সঙ্গে বহু সমৃদ্ধি (ক) ছাইলা॥
মহাশয় আশ্রমের কুটা-পত্র আদি।
ঝাড়ু দিয়া টুকরি ভরিয়া স্থান শুধি॥
দূরগর্ত্তে ফেলায় লইয়া নিজমনে।
নিরপক্ষে সাধু নাহি চাহে রাজা পানে॥
রাজার যে আগমনে সুখ নাহি পাইলা।
দূরে বৃক্ষতলে যাই বসিয়া রহিলা॥
রাজার সাহস নহে নিকট যাইতে।
হেনকালে শ্রীনাভাজী আইলা তথাতে॥
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি স-অশ্রু নয়ানে।
যোড়করে দাণ্ডাইয়া রহে গুরুস্থানে॥
রাজা কিছু দূরে একাজাই (খ) ভূমে পড়ি।
সাষ্টাঙ্গ প্রণামি স্তব করে কর যুড়ি॥
আঁখিভঙ্গি করি দুই এক বাক্যদ্বারে।
সম্মান করিয়া নৃপে গেলা নিজঘরে॥
নিরপেক্ষ-স্বভাব সাধুর গুণ দেখ।
রাজ-অনুরোধে আশামাত্রেতে নাহিক॥
তাঁহার চরণে কোটি কোটি পরণাম।
হরির ভজন বিনু নাহি অন্য কাম॥

চরিত্র শঙ্করাচার্য্য

কলিযুগে ধর্ম্মপাল শঙ্কর-আচার্য্য।
অজ্ঞ অনীশ্বরবাদী বুদ্ধি যে কদর্য্য॥
উৎশৃঙ্খলা কুতার্কিক যে জন পাষণ্ড।
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ জনার গর্ব্ব কৈলা খণ্ড॥
বিমুখ সুমুখ কৈলা সৎমার্গে আনিয়া।
সদাচার প্রকাশিলা শক্তি সঞ্চারিয়া॥
ঈশ্বরাংশ শ্রীশঙ্কর ভুবি অবতরি।
হিত আর অহিত সৃজিলা স্বেচ্ছা করি॥

পাঠান্তর—(ক) সমৃদ্ধি—সমৃদ্ধ।
(খ) একাজাই—একা যাই।

তাঁহার বিশেষ কিছু কহি শুন সভে।
শ্রীল-রামানুজ-মধ্বাচার্য্য-মতভাবে॥
সর্ব্বাচার্য্য-শিরোমণি শ্রীল সনাতন।
শ্রীরূপ শ্রীজীব আদি যে কৈলা বাখান॥
সকল-আচার্য্যমত-ঐক্য-বাক্যমতে।
সিদ্ধান্ত কহিলা সভে শাস্ত্র-অভিমতে॥
শ্রীলশংকর শ্রীমদ্ভগবত-আজ্ঞাতে (ক)।
বিরুদ্ধ আগম সৃষ্টি কৈলা নানামতে॥
শংকর আচার্য্য নাম বিপ্ররূপ ধরি।
বেদের মুখ্যার্থ আচ্ছাদিলা ভঙ্গী করি॥
শ্রুতির তাৎপর্য্য অর্থ ভগবান শ্যাম।
প্রাপ্ত্যোপায় ভক্তি জ্ঞান পদার্থ উত্তম॥
জীব নিত্যদাস হয়ে তটস্থশকতি।
আপন স্বরূপজ্ঞানে পাওয়ায় মুকতি॥
ইহা মুখ্য অর্থ তেজি গৌণার্থ স্থাপিলা।
লক্ষণা করিয়া নিরাকারবাদ কৈলা॥
শ্রীবিগ্রহ অনশ্বর, নশ্বর কহিয়া।
কথোগুলি জীব তারে পঙ্কেতে পুঁতিয়া॥
কোটি সূর্য্যোদয় ভক্তি তাহা আচ্ছাদিয়া।
শুদ্ধজ্ঞান তমকূপে দিলা ফেলাইয়া॥
আর আর নানামতে লোক বিড়ম্বিলা।
তাহার প্রমাণ পদ্মপুরাণে কহিলা॥
আচার্য্য উত্তমগণে বিচার করিলা।
প্রমাণ প্রয়োগ দিয়া স্বমত স্থাপিলা॥
ভক্তিমার্গে সব লোক মুক্ত হৈয়া যায়।
ভগবানের সৃষ্টি-লীলা খেলা নাহি হয়॥
এ কারণ হেনমতে লোকে বিড়ম্বয়।
ঈশ্বর করিলে জীবের সাধ্য কি আছয়॥
কিন্তু হরিভক্তে কেহো ভুলাইতে নারে।
মায়াবাদে কি করিবে স্বয়ং পরিহরে॥
বিগ্রহ-অনিত্যজ্ঞান পথে যেই যায়।
সেহ মূঢ় অধম নরকভাগী হয়॥

পাঠান্তর—(ক) শ্রীমদ্ভগবত-আজ্ঞাতে—
শ্রীমদ্ভাগবত-আজ্ঞা য়।

সভামধ্যে বৈসে যদি গলে হস্ত দিয়া।
বাহির করিয়া দিব তৃস্কার করিয়া॥
স্নান আদি করি বিষ্ণুস্মরণ করিব।
পুন তার নাম মুখে নাহি উচ্চারিব॥
ইহার প্রমাণ ষট্সন্দর্ভে আছয়।
না কহিলে ইহ (ক) সেই প্রত্যবায়ী[১] হয়॥
নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান জ্ঞান যেহ।
হরিভক্তিমিশ্র বিনে সিদ্ধ নহে সেহ॥
বৃথা পরিশ্রম হয় অর্থ না মিলয়।
শস্যের আশায় যেন আগড়া কুটয়॥

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমে—

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

অনুবাদাদি পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

তাহার তাৎপর্য্য ফল নির্ব্বাণমুকতি।
অপরাধী জনে হয়ে বিনা শুদ্ধভক্তি॥
ভক্তিরস-সুখ সুধা-আস্বাদ না জানি।
কাকে যেন নিম্বফল খায় সুখ মানি॥
ভকতে ভকতি বিনু চতুর্ব্বর্গ ফল।
দৃক্পাত না করে যেন প্রণালীর জল॥
প্রত্যক্ষে দেহ আর শ্রুতিগণ কহে।
হরিভক্ত মুক্তিচতুষ্টয় নাহি চাহে॥
অতএব হেন রসে বঞ্চিত হইয়া।
মুক্তি চাহে ভবে মাত্র বাঁচে পলাইয়া॥
ভক্তজন বিঘ্নের মস্তকে দিয়া পাদ।
প্রেম যে পরমস্বাদু করয়ে আস্বাদ॥
সহস্র কহিলে ইহা মূঢ় নাহি বুঝে।
উট যেন সাঞিকাঁটা খাইবারে সুজে॥
অতএব শ্রীশঙ্কর লোক বিড়ম্বিলা।
স্বয়ং হরিভক্তিরসে মগন হইলা॥

পাঠান্তর—(ক) ইহ—ইহা।
১। প্রত্যবায়ী—পাপী।

পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণপ্রেমেতে মগনে।
শুদ্ধভক্তি প্রকাশিলা বৈষ্ণবের স্থানে॥
মত্ত হৈলা কৃষ্ণলীলা রস আস্বাদনে।
কিন্তু নাহি জানে আদিরস প্রকরণে॥
বিরক্ত হইয়া স্ত্রী-সঙ্গ না যুয়ায়।
রস জানিবারে প্রবেশয় পরকায়॥
কোন স্থানে এক রাজা তার মৃত্যু হৈল।
শুনি নিজদেহ এক গৃহেতে স্থাপিল॥
শিষ্যগণে কহে মোর রক্ষা কর দেহ।
রাজমৃত্যুদেহে মুঞি প্রবেশ করহুঁ॥
রাণীগণ সঙ্গে রস বিহার করিয়া।
জানিব রসের রীত স্বত আস্বাদিয়া॥
রস জানিবার হেতু তাৎপর্য্য অন্তরে।
রাধাকৃষ্ণ রসতত্ত্ব জানিব অদূরে॥
মোহমুদগর নামে বৈরাগ্য-প্রধান।
শোলোক রচনা করি দিলা শিষ্যস্থান॥
যদি মুঞি রাজ্যসুখে হই মুগ্ধাশয়।
এই সব শ্লোক তবে শুনাবে আমায়॥
মোর এই দেহ কেহ নষ্ট করিবারে।
যদি চাহে তবে শীঘ্র জানাবে আমারে॥
এতো কহি রাজমৃত্যুদেহে যাই পৈশে।
মরিয়া বাঁচিল রাজা সভে কহে হর্ষে॥
রাজরূপে কথোদিন রাণীগণ সনে।
নানারস বিলসয় বিশেষ কারণে॥
বড় রাণী সুচতুরা বুঝিলা অন্তরে।
এ তো কভু রাজা নহে স্বভাব-বিচারে॥
মরিয়া বাঁচয়ে এ তো না হয় সম্ভবে।
বুঝি কোন সিদ্ধ প্রবেশিলা এই শবে॥
ইহা অনুমান করি গোপনীয় মতে।
নিজলোকে কহে রাণী প্রফুল্লিতচিতে॥
এই সহরেতে যথা থাক মৃত্যুদেহ।
শীঘ্র যাই সেই শব (ক) জ্বালাইয়া দেহ॥
এত শুনি ভৃত্যগণ খুঁজিতে খুঁজিতে।
দেখে এক গৃহে এক শব বস্ত্রাবৃতে॥

পাঠান্তর—(ক) শব—সব।

বিপ্রগণে রক্ষা করে দেখি ভৃত্যগণ।
দাহ করিবারে সবে করে আকর্ষণ॥
ভাবিত হইয়া আস্তে ব্যস্তে শিষ্যগণ।
উর্দ্ধশ্বাসে যায় (ক) যথা রাজার সদন॥
বৃত্তান্ত বিস্তার করি প্রকাশ করিয়া।
উচ্চস্বরে কহে বিপ্র অন্তঃপুরে গিয়া॥
রাজরূপ আচার্য্য শুনিয়া বিবরণ।
ব্যস্তসমস্ত হৈয়া ছাড়ে সেই তন॥
চক্ষের নিমিখে সাধু পূর্ব্ব নিজদেহে।
প্রবেশিয়া চলি গেলা শিষ্যগণ সহে॥
আর কিছু শুন শঙ্করাচার্য্যের চরিত।
মানসিংহ রাজার করিলা যথা হিত॥
অদ্বৈত মায়াবাদী সেই সেবরা আখ্যান।
ভক্তিমার্গ-রাজে মোহ জন্মাবার কারণ॥
রাজার নিকটে আসি নিজ মত কহে।
আপন মহিমা সিদ্ধি আদি প্রকাশয়ে॥
অদ্বৈতবাদ ভক্তি প্রতি অকুশল পথ।
রাজারে লওয়ায় চালাইতে নিজ মত॥
হেনকালে আইলা শ্রীশঙ্কর আচার্য্য।
মহাশূর পণ্ডিত গম্ভীর সর্ব্ব-আর্য্য॥
রাজা বহুমান করি উচ্চে বসাইলা।
সেবরা দেখিয়া চিত্তে কুণ্ঠিত হইলা (খ)॥
অট্টালিকাছাতপরি (গ) বসি রাজা সহ।
বিচারে সেবরা সহ হইল কলহ॥
সেবরা কোপেতে এক মায়া সৃষ্টি করি।
রাজারে মারিতে চাহে অভিচার[১] করি॥
দেখিতে দেখিতে মহাসমুদ্র উথলি।
অতি বেগবান্ জলতরঙ্গ উছলি॥
ডুবাইয়া লোকালয় গ্রামাদি চত্বর।
অট্টালিকা উপর আইলা ভয়ংকর॥

পাঠান্তর—(ক) যায—ধায়।
(খ) কুণ্ঠিত হইলা—উৎকণ্ঠিত হৈলা।
(গ) ছাতপরি—ছাদোপরি।

১। অভিচার—শত্রুর অনিষ্টসাধন উদ্দেশ্যে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ।

সেই জলে এক তরি ভাসিয়া আইলা।
সেবরা রাজারে তাহে চঢ়িতে কহিলা॥
ভয়েতে কম্পিত রাজা চঢ়িবারে ধায়।
আচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ হাথ ধরিয়া রাখয়॥
কৃত্রিম নৌকা হয় এই মায়াময় জল।
নাহি চঢ়ো মহারাজ না হও চঞ্চল॥
তরিমধ্যে সেবরার গণেরে চঢ়াও।
এখনি বুঝিবে তত্ত্ব নাহিক ডরাও॥
এতো শুনি সেবরাগণেরে ধরি ধরি।
নৌকায় চঢ়ায় তা-সবারে দ্রুত করি॥
নৌকা তো যথার্থ নহে মায়ামাত্র হয়ে।
চঢ়াইতে উচ্চ হৈতে তলেতে পড়য়ে॥
উচ্চ অট্টালিকা হৈতে পড়ি পড়ি মরে।
রাজা স্তব করি আচার্য্যের পদ ধরে॥
আচার্য্যের উপদেশ রাজা তত্ত্ব জানি।
বৈষ্ণব করিলা সর্ব্ব রাজ্যের পরাণী (ক)॥
আচার্য্য ভ্রমিয়া সর্ব্বলোক নিস্তারিল।
বিমুখ যতেক ছিল সুমুখ হইল॥
তাঁহার চরণে মোর এই নিবেদন।
ভক্তামৃত পরিশেষে মোরে না এড়ান॥

চরিত্র শ্রীবামদেবজীর

বামদেব নাম সাধু ছিপি কর্ম্ম করি।
কাল গুজরান করে কৃষ্ণে মন ধরি॥
বাল্যেতে বিধবা এক কন্যামুখ চাই।
অন্তরে দুঃখিত (খ) কিছু মনে উপজাই॥
শ্রীবিগ্রহ-সেবা-পরিচর্য্যা করিবারে।
নিয়োজিলা ভক্তিতত্ত্ব শিখাইয়া তারে॥
সেবা পরিচর্য্য-আদি করিতে করিতে।
কৃপালেশ হৈল হরি চাহে বর দিতে॥
অল্পবুদ্ধি মুগ্ধা কন্যা দেখিয়া অন্যের।
মনে সাধ হৈল একটি পুত্র হইবার॥

প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ বর দিলা।
বিনা পুরুষের সঙ্গ গর্ভিণী হইলা॥
বিধবার গর্ভ দেখি লোকে কাণাকাণি।
বামদেব লজ্জায়ে না মুখে সরে বাণী॥
বহু খেদান্বিত হৈয়া ঠাকুরের স্থানে।
করযোড়ে কহে কর লজ্জা-নিবারণে॥
নিদ্রাকালে ঠাকুর কহিলা তারে তবে।
তব কন্যা দুষ্টা নহে, লজ্জা নাহি পাবে॥
মোর বরে তোমার কন্যার হৈল গর্ভ।
মোর আজ্ঞা তব যশ না হইবে খর্ব্ব॥
কালেতে কন্যার গর্ভে পুত্র জনমিল।
নামদেব নাম শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত হৈল॥
বাল্যাবস্থাকালে তার কৃষ্ণাবেশ হৈল।
প্রেমানন্দ-রঙ্গমালা গলায় পরিল॥
অন্যান্য বালক অন্য বাল্যচেষ্টা করে।
নামদেব কৃষ্ণসেবা-ক্রীড়ায় বিহরে॥
মাতামহ-স্থানে পুনঃপুন কান্দি কহে।
মুঞি কৃষ্ণ সেবিব নিযুক্ত কর মোহে॥
বামদেব কহে তুমি শিশুমতি হও।
বড় হইলে করিহ এখন যোগ্য নও॥
একদিন বামদেব কোন কার্য্যান্তরে।
গ্রামান্তর গেলা কহি শিশু দৌহিত্রেরে॥
দুই তিন দিন মুঞি পশ্চাতে আসিব।
ঠাকুরের সেবা পূজা দুগ্ধ খাওয়াইব॥
শিশু আনন্দিত মনে সাচার (ক) হইয়া।
পূজা করি দুই সের দুগ্ধ আনিয়া॥
নিজহস্তে আউটাইতে আনন্দে আপনা।
নিজদেহ পাসরিলা হৈয়া অন্তর্ম্মনা॥
মাতা কহে বাপু দুগ্ধ হইল উতারো।
শিশু কহে মন সহ (খ) আউটে কি করো॥
মিছিরির গুঁড়া দিয়া পবিত্র পাত্রেতে।
জুড়াইয়া আনিলা ঠাকুরে খাওয়াইতে॥
সম্মুখে রাখিয়া কহে দুগ্ধ খাও হরি।
শ্রীহস্তে তুলিয়া পান কর কৃপা করি॥

পাঠান্তর—(ক) রাজ্যের পরাণী—রাজ্যে রাজা রাণী।
(খ) দুঃখিত—চিন্তিত।

পাঠান্তর—(ক) সাচার—সদাচার।
(খ) মন সহ—এত শীঘ্র।

নতুবা তুলিয়া মুঞি ধরোঁ শ্রীবদনে।
মৃদু হাস্য করো দুগ্ধ নাহি খাও কেনে॥
বুঝি মুঞি হেথায় থাকিতে না খাইবে।
এতো কহি উঠিয়া বাহিরে গিয়া ভাবে॥
আমার সম্মুখে নাহি খাইলা মাধব।
মোর সনে পরিচয় নাহি এই ভাব॥
এতক্ষণে বুঝি খাইলা উঁকি মারে দ্বারে।
দেখে নাহি খান মনে হইল ফাঁফরে॥
বুঝি কিছু বিঘ্ন আছে দুগ্ধের মধ্যেতে।
এতো চিন্তি অন্য দুগ্ধ আনে খাওয়াইতে॥
হঠ করি একান্ত খাইতে পুনঃপুন।
কহয়ে না খাও হরি করে প্রাণপণ॥
দাদার নিকটে খাও মুঞি হৈনু দুষী।
মরিব তোমার আগে গলে দিয়া ফাঁসি॥
নতুবা খাইব বিষ গলে ছুরি দিব।
প্রাণিহত্যাপাপ আজি তোমারে লাগিব॥
এতো কহি ছুরি এক লইয়া হৃদয়।
মারিতেই হরি বাম হস্তেতে ধরয়॥
দক্ষিণ হস্তেতে দুগ্ধ খায় (ক) উঠাইয়া।
বদনে দিলেন মন্দ মধুর হাসিয়া॥
নামদেব মহানন্দ-সাগরে ভাসিল।
অবশিষ্ট কিছু দাদার লাগিয়া রাখিল॥
এইমত দুই তিন দিন নামদেব।
ঘরে আসি সেবা বার্ত্তা পুছে বামদেব (খ)॥
নামদেব কহে ঠাকুরেরে খাওয়াইয়া।
প্রসাদ রাখ্যাছি (গ) ধর্য্যা তোমার লাগিয়া॥
পাত্রেতে কিঞ্চিত দুগ্ধ দেখি বামদেব।
তুমি দুগ্ধ খাইলে কহে করিয়া আক্ষেপ॥

পাঠান্তর—(ক) দুগ্ধ খায়—দুগ্ধপাত্র।
(খ) কোন পুস্তকে এখানে অন্যরূপ আছে।
এইমত দুই তিন দিন নামদেবে।
করয়ে হরির সেবা মনের উৎসবে॥
দুই তিন দিন বাদে বামদেব আসি।
পুছিল সেবার বার্ত্তা দৌহিত্রে সম্ভাষি॥
(গ) রাখ্যাছি—রেখ্যোছি।

বালক কহয়ে দাদা তোমার শপথ।
ঠাকুর খাইলা মোরে দেহ অপবাদ॥
চমকিত হইয়া যে কহয়ে বালকে।
কেমতে ঠাকুর খাইলা দেখাহ আমাকে॥
বিগ্রহ কি হস্তে তুলি লোকে দেখাইয়ে।
ভোজন করয়ে কোথা কভু না দেখিয়ে॥
শিশু কহে হেন কেন কহ অনোচিত।
আমার সাক্ষাতে তুলি খায় নিতিনিত॥
প্রথমে কি মনে ভাবি না খাইলা হরি।
মরিব কহিনু মুঞি লইয়া কাটারি॥
তবে মোর হাতে ধরি হাসিতে হাসিতে।
দুগ্ধ পান কৈল মোর আনন্দিত-চিতে॥
বামদেব কহে মোরে দেখাইতে পার।
শিশু বলে দেখাইব কি সন্দেহ কর॥
পরদিন শিশু দুগ্ধ ঠাকুরের আগে।
রাখিয়া খাইতে কহে বামদেব লগে॥
দাদা কহে তুঞি খাইলি ঠাকুর না খায়।
দেখুক সাক্ষাতে তবে সন্দেহ ঘুচয়॥
না খাইলা যদি পুন মরিবারে চাহে।
কান্দয়ে বালক দুনয়ানে ধারা বহে॥
আস্তে ব্যস্তে ঠাকুর দুগ্ধের পাত্র লৈয়া।
খাইতে লাগিলা পুন হাসিয়া হাসিয়া॥
দরশনে বামদেব যে অপেক্ষা ছিল।
নামদেব-সুসঙ্গে তাহাও পূর্ণ হৈল॥
দেখি চমৎকার বালকের পদ ধরি।
নতি স্তুতি কৈলা বহু আপনা ধিক্কারি॥
আর কিছু শুন নামদেবের কথন।
সুপবিত্র গাথা হয় ভুবনপাবন॥
ক্রমেতে বর্দ্ধিষ্ঠ হয়ে যেন চন্দ্রকলা।
অলৌকিক প্রকটন করে নানা লীলা॥
পরম্পরা (ক) ম্লেচ্ছরাজা পাৎশাহা শুনিঞা
তলব করিয়া নামদেবে গেলা লঞা॥
রাজা কহে তোমার জহুরা লোকে কহে।
কেরামত কিছু আজি দেখাইবে মোহে॥

পাঠান্তর—(ক) পরম্পরা—পরম্পর।





নামদেব কহে যদি থাকে কেরামত।
তবে কেন ছিপিবৃত্তে করি দিনপাত॥
যত্ন কৈলা রাজা বহু বর্গ না হইলা (ক)।
বন্দিখানায় তবে কয়েদ রাখিলা॥
দুই চারি দিনে পুনর্ব্বার রাজা কহে।
তথাচ রাজার মতে সাধু বর্গ নহে॥
কৃষ্ণভক্ত আপনার মহিমা-প্রকাশ।
কদাচ না করে মাত্র দৈন্যময় ভাষ॥
দৈবাত্ত সেখানে এক মৃতক বাছুরে।
দেখিয়া কহয়ে রাজা পুন সাধুবরে॥
গরু তোমার পূজ্য হব শাস্ত্র অনুসারে।
এই গাভী বৎস লাগি কান্দিয়া ফুকারে॥
তাপিত ইহার দুঃখ মোচন করহ।
মৃত বৎস গাবীর যে বাঁচাইয়া দেহ॥
ইহা শুনি নামদেব তুড়ি দিয়া কহে।
উঠ বৎস মাতা তব কান্দয়ে বিরহে॥
কবামাত্র বাছুর উঠিয়া দুগ্ধ খায়।
রাজা চমকিত চিত্তে অনিমিখে চায়॥
স্তুতি নতি করি গ্রাম ধন দিতে চাহে।
কিছু কার্য্য নাহি মোর নামদেব কহে॥
রাজা কহে অপরাধ মর্য্যাদা (খ) করিবে।
প্রভুস্থানে হৈতে মোরে সাঁভালিয়া (গ) লবে॥
হেনকালে বহুমূল্য পালঙ্ক বিছানা।
রাজাস্থানে লইয়া আইল কোন জনা॥
বহুমূল্য চমৎকৃত দেখিয়া রাজন।
নামদেবে ভেট করিবারে হইল মন॥
অনেক যতনে তাঁর সম্মতি করিয়া।
দিলা লোক সব বাহিয়া যাইতে লইয়া॥
তেঁহো কহে কিবা কাজ বাহক মনুষ্যে।
মুঞি মাথে করিয়া লইয়া যাব বাসে॥
ইহা কহি মাথায় উঠায়্যা লইয়া যায়।
কিবা করে কোথা যায় রাজার সংশয়॥

ইসারা করিয়া লোক পাঠায় পশ্চাতে।
দেখে কথোদূরে এক বিস্তার নদীতে॥
টান মারি ফেলাইয়া চলে সাধুবরে।
লোক আসি শীঘ্রগতি কহয়ে রাজারে॥
পুন নামদেবে রাজা ডাকিয়া আনিলা।
কৌতুকে বিনতি করি কহিতে লাগিলা॥
হেন বহুমূল্য দ্রব্য নদীতে ডারিলে।
তেঁহো কহে কিবা দ্রব্য কিবা তাহে ফলে॥
প্রয়োজন থাকে চল দেই উঠাইয়া।
রাজা সঙ্গে লোক দিলা কৌতুক করিয়া॥
সেই খাট শুষ্ক শয্যা সেই আবরণ।
জলে হৈতে তুলি দিয়া করিলা গমন॥
সভে চমকিত হৈল না সরয়ে বাণী।
আর কিছু শুন তার অপূর্ব্ব কহিনী॥
গ্রামে এক বণিক তুলাদান কর্ম্ম করি।
রজত কাঞ্চন দিলা সুপাত্র বিচারি॥
সুজন সুপাত্র সাধু জানি নামদেবে।
দান দিবার হেতু বোলাইলা তাঁরে তবে॥
বার বার আবাহন করে নাহি যায়।
বহু যত্নে গেলা সাধু তারিতে তাঁহায়॥
বণিক কহয়ে মোরে অনুগ্রহ করি।
কিছু স্বর্ণ আদি লও কৃপাদৃষ্টে হেরি॥
সাধু পরদুঃখে দুঃখ ভাবয়ে অন্তরে।
এই মূর্খ কর্ম্ম করি শ্লাঘা মনে করে॥
হরিভক্তিহীন এই মর্ম্ম নাহি জানে।
ইহারে বুঝাইতে হৈল করিয়া যতনে॥
তুলসীর এক পত্রে কৃষ্ণনাম লিখি।
বিনয়ে কহয়ে সাধু বণিকে নিরখি॥
এই তুলসীর সম যদি হেম কর দান।
দেহ তবে লব, কহ মোর বিদ্যমান॥
ইহা বিনু নাহি লব কহিনু যে সত্য।
বণিক কহয়ে তবে এ কথা আপত্ত॥
তুলসীর সম স্বর্ণ রতি দুই হবে।
তাহা যে লইয়া তব কি কার্য্য হইবে॥
পুন সাধু কহে ইথে যে কার্য্য হউক।
ইহা বিনে যে কহিবে তাহে মোর দুখ॥

পাঠান্তর—(ক) হইলা—মানিলা।
(খ) মর্য্যাদা—মার্জ্জনা।
(গ) সাঁভালিয়া—সম্ভাষিয়া।

এত শুনি হাসি মনে (ক) বণিক কহয়ে।
ভাল তাহি দিব তব মনস্থ যে হয়ে॥
এত কহি তরাজুর[১] একদিকে পত্র।
আর দিগে স্বর্ণ দিলা রতি দুই মাত্র॥
তাহে না হইল আর দিলা দুই রতি।
দিলা ক্রমে ক্রমে সের পাঁচ মূঢ়মতি॥
তবু না বুঝয়ে যত ছিল চঢ়াইলা।
ভাবয়ে বণিক মুঞি প্রতিশ্রুত হৈলা॥
না পুরিয়া দিলে মোর অধোগতি হবে।
স্ত্রীগণের অঙ্গভূষা খুলে আনে তবে॥
তাহাতেও নহে তবে পড়সীর স্থানে।
অলঙ্কার মাগি আনে করজ বিধানে (খ)॥
তাহে যদি না পুরিল তবে ক্ষান্ত হৈয়া।
কহয়ে সাধুর স্থানে বিনতি করিয়া॥
পুরাইতে না পারিনু তুলসীর সম।
ইহার কারণ কি (গ) না বুঝি মরম॥
নামদেব কহে শুন ইহার কারণ।
ত্রিজগতে নাহি ভাই কৃষ্ণনাম সম॥
বড় বড় কর্ম্ম করে বড় অভিমানে।
কৃষ্ণনাম-সিন্ধু-বিন্দু না হয় সমানে॥
প্রজ্বলিত মহা-অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ-অংশ।
পৃথিবীর এক রেণু তাহার শতাংশ॥
তার কোটি কোটি অংশ তার তুল্য নহে।
কৃষ্ণনাম-আগে ধর্ম্ম বেদে যত কহে॥
কৃষ্ণভক্তি বিনে আর যত দেখ ধর্ম্ম।
সকলি অনর্থমাত্র শ্রুতিগণের মর্ম্ম॥
ভক্তিফল দিতে নারে সংসার না যায়।
পুনঃপুন তাপত্রয়ে যাতনা ভুঞ্জায়॥
হরিভক্তি না জন্মায় (ঘ) সেই ধর্ম্ম ব্যর্থ।
ভক্তিমিশ্র বিনে সেই ধর্ম্মে নাহি অর্থ॥

পাঠান্তর—(ক) হাসি মনে—মৃদু হাসি।
(খ) আনে করজ বিধানে—আনি করে যে বিধানে।
(গ) কি—কিছু।
(ঘ) জন্মায়—জন্ময়ে।

১। তরাজুর—ওজন।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥"

অনুবাদ।—পুরুষদের অতি উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মও যদি বিষ্বক্‌সেন অর্থাৎ বিষ্ণুর কথায় অনুরাগ না জন্মায় তবে তাহার পরিশ্রমই সার হয়।

যে ধর্ম্মে সংসার পুনঃপুন উপজায়।
সেই ধর্ম্ম অধর্ম্ম মানিয়া শ্রুতি গায়॥
বিষয় অনিত্যরস তাহাতে লুভিয়া (ক)।
কভু স্বর্গে কভু নর্কে বেড়ায় ভ্রমিয়া॥
কৃষ্ণ প্রভু জীব নিত্যদাস তাহা ভুলি।
নানাকর্ম্ম তপ করে অন্যে স্বামী বলি॥
গুণের অধীন জীব যার যে প্রকৃতি।
তেমতি স্বভাবে ফিরে রজ-তম-মতি॥
বহুভাগ্যে যদি হয় সাধুর সঙ্গতি।
বুঝিয়ে যথার্থ তবে ঘুচয়ে দুর্ম্মতি॥
কৃষ্ণে রতি মতি হয়ে ডর যায় ক্ষয়।
ধন্য ধন্য করে লোক-দেব-পিতৃচয়॥
সর্ব্বগুণালয় হয়ে দেবপূজনীয়।
সর্ব্বলোক-পাবন সর্ব্বমন-রমণীয়॥
অতএব সর্ব্বধর্ম্ম দূরে তেয়াগিয়া।
ভজ ভাই কৃষ্ণপদ একান্ত করিয়া॥
হরিনাম হার করি গলায় পরহ।
আনবোল গণ্ডগোল সুদূরে তেজহ॥
কৃষ্ণনাম-মহিমার যৎকিঞ্চ দেখিলা।
পাঁচ মোণ সোনা দিলা সমান নহিলা॥
পাঁচ মোণ কিবা কথা ব্রহ্মাণ্ড চঢ়াইলে।
সমান না হয় নাম কোট্যংশের তুলে॥
এত শুনি বণিকের মন ফিরি গেলা।
সাধুর চরণে পড়ি কাকুবাদ কৈলা॥
বৈষ্ণব হইলা তেঁহো ছাড়ি অন্য ধর্ম্ম।
ক্ষণমাত্র সাধুর সঙ্গের দেখ মর্ম্ম॥
আর শুন অপূর্ব্ব সুরমণীয় কথা।
রঙ্গনাথ ঠাকুর-মন্দির ফিরে যথা॥

পাঠান্তর—(ক) লুভিয়া—ভুলিয়া।

প্রদোষ-আরতি দরশনে সাধু যায়।
প্রতিদিন একপদ কীর্ত্তন শুনায়॥
একদিন লোক-ভিড় অধিক দেখিয়া।
জুতাজোড়ি কোমরে বান্ধিলা বস্ত্র দিয়া॥
সৌতি (ক) ব্রাহ্মণগণ পূজারি সেবকে।
কোমরেতে জুতাবান্ধা দেখিয়া প্রত্যক্ষে॥
ক্রোধ করি নামদেবে গলাধাক্কা দিয়া।
নাম্বাইয়ে দিলা বহু দুর্বাক্য কহিয়া॥
ক্রোধ না করিলা সাধু কিছু না কহিলা।
নাম্বিয়া ঠাকুর আগে কহিতে লাগিলা॥
মারিলেও আমারে যে করিলে সে ভালো।
গান কিছু শুনি মোর চিত্ত কর আলো॥
ইহা কহি মন্দিরের পশ্চাতে যাইয়া।
হাটুপরি পাদ ধরি (খ) গায়েন বসিয়া॥
ঠাকুর মন্দির সহ ফিরিলা সেই দিগে।
সাধু বসি গুণগাণ করয়ে যে ভাগে॥
আইলা যতেক লোক পূজারি-সহিতে।
আশ্চর্য্য হেরিয়া সভে রহে চমকিতে॥
ভক্ত অনুরোধে ফিরে জানিয়া পূজারি।
পড়িল কাতরে নামদেব-পদ ধরি॥
অপরাধ কৈনু বহু ধাকাধুকি দিনু।
তোমার প্রভাব হেন আগে না জানিনু॥
বহু স্তুতি নতি করি সেবন করিল।
ঠাকুরের স্থানে পরিহার[১] জানাইল॥
অতএব ভকতবৎসল হয়ে হরি।
অদ্যাপিহ সেই শ্রীমন্দির আছে ফিরি॥
আর এক চমৎকার কিঞ্চিত আভাস।
কহি যে শুনহ সভে করিয়া বিশ্বাস॥
একাদশী-ব্রতনিষ্ঠা সাধু নিরন্তর।
না খায় না খাওয়ায়ে না কহে খাইবার॥
এক একাদশী দিনে ছলিয়া শ্রীহরি।
সাধুগৃহে আইলা বৃদ্ধ বিপ্ররূপ ধরি॥

পাঠান্তর—(ক) সৌতি—সৌত এবং সোতি।
(খ) হাটুপরি পাদ ধরি—হাটুগাড় পদ ধরি।
১। পরিহার—ক্ষমা প্রার্থনা।

বড় ক্ষুধা বলি বিপ্র খাইবারে চাহে।
অদ্য একাদশী হয় নামদেব কহে॥
বিপ্র বলে তোর কি তা মুঞি অন্ন খাব।
নামদেব কহে মুঞি দিতে তো নারিব॥
আজি মোর গৃহে রহ কালি খাওয়াইব।
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় যতেক মাঙ্গিব॥
তথাচ ব্রাহ্মণ চাহে দুজনা ঝকড়ে।
মরিল ব্রাহ্মণ পদ পসারিয়া পড়ে॥
আশপাশ লোক নামদেবে আসি বলে।
কি কায করিলে অহে ব্রাহ্মণ বধিলে॥
উপবাসী মৈল বিপ্র খাইতে না দিলে।
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপে নাহি ডরাইলে॥
তেঁহো কহে মহাপাপ হয় কি করিব (ক)।
মরিল ব্রাহ্মণ বরং আমিহ মরিব (খ)॥
এতো কহি কাষ্ঠ আনি চিতা সাজাইয়া।
শব সহ উঠিলা যে মরিতে পুড়িয়া॥
অগ্নিতে যাইতে শব হাসিয়া উঠয়।
মরা বাঁচে দেখি লোকে চমৎকার হয়॥
গোপতে (গ) কহয়ে নামদেব-ভক্তস্থানে।
ছলিতে আইনু মুঞি না হই ব্রাহ্মণে॥
একাদশী ব্রত-নিষ্ঠা তোমার পরখিতে।
তব প্রভু হঙ মুঞি আইনু পিরীতে॥
সাধু ইহা শুনি চমকিয়া পদে ধরে।
উপবাসী বলি আছ চল মোর ঘরে॥
ঘরে আনি নানামতে ভোজন করাইয়া।
নাচয়ে আনন্দে সাধু পুলক হইয়া॥
অতঃপর আর শুন অপূর্ব্ব বারতা।
হরি নিজহস্তে ঘর ছাইল যে যথা॥
গৃহদাহ হৈল তাঁর দৈবের ঘটনে।
গৃহদ্রব্য মনুষ্যে বাহির করি আনে॥

পাঠান্তর—(ক) এবং।
(খ) পঙ্‌ক্তির পর পর যথাক্রমে অতিরিক্ত দুই পঙ্‌ক্তি যথা—
শ্রীহরি বাসর মুঞি কেমনে লঙ্ঘিব।
একাদশী লঙ্ঘনাপরাধেতে বাঁচিব॥
(গ) গোপতে—গোপনে।

সাধু পুন লই তাহা অগ্নিমধ্যে ডারে।
অগ্নি নিভাইতে সব লোকে মানা করে॥
প্রভুর ইচ্ছায় অগ্নি ঘর পোড়াইছে।
কৌতুক দেখিয়া তার আনন্দ হৈতেছে॥
না নিভাও অগ্নি প্রভুর সুখ ভঙ্গ হবে।
পুনরপি তেঁহো ঘর বানাইয়া দিবে॥
এতেক চরিত্র হরিভক্তের দেখিয়া।
নিভাইলা ছলে অগ্নি আপনি আসিয়া॥
সাধু কহে পোড়াইলা (ক) স্বয়ং নিভাইলো।
এ কৌতুকে কিবা গুণ কি সুখ পাইলো॥
যে করিলে ভাল হৈল এখনে আমার।
উপায় করিয়া দেহ মাথা রাখিবার॥
প্রভু কহে পুন বানাইয়া দেই ঘর।
তেঁহো কহে না করিলে কে বানাবে আর॥
এত কহি নিজ হস্তে ঘর বান্ধে হরি।
যোগাইয়া দেয়ে সাধু কাষ্ঠ খড় দড়ি (খ)॥
ছাপর ছাইলা হরি অতি মনোরম।
খড় তুলি দেয়ে সাধু হেরয়ে বদন॥

পাঠান্তর—(ক) পোড়াইলা—পোড়াইয়া।
(খ) দড়ি—কাড়ি।

ঐশ্বর্য্য ভকত সাধু ইষ্টনিষ্টময়।
হরি সর্ব্বকর্ত্তা কারণনিষ্ঠা হয়॥
লোকে কহে নামদেবের কে ঘর ছাইল।
কি সুন্দর ছান হেন কভু না দেখিল॥
হেন কারিগর কেবা মোরা তারে আনি।
ছাওয়াইব চাল তার ঘর কোথা শুনি॥
সাধু কহে তাঁর ঘর যদ্যপি জানিবে।
দেখিবে তাঁহারে যদি চাল ছাওয়াইবে॥
সাধুসঙ্গ কর, কর স্মরণ মনন।
তাঁর জনে ভক্তি কর শ্রবণ কীর্ত্তন॥
বিশেষ বুঝিয়া লোক হরিভক্ত (ক) হয়ে।
হেন সাধুসঙ্গে কিবা অলভ্য আছয়ে॥
অতএব নামদেব সাধুর প্রসঙ্গ।
ভক্তসঙ্গে হরির যেমত রসরঙ্গ॥
কিঞ্চিত আভাসমাত্র কহিল মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেবে যাঁর নাহি পায় সীমা॥
সেই প্রভু সেই প্রিয়ভক্তের সহিতে।
সেবাযোগ্য হতে চাহে লালদাস চিতে॥

পাঠান্তর—(ক) হরিভক্ত—হরিভক্তি।

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীগুরুভক্ত-আদি-ভক্ত-গুণ-বর্ণনং নাম একাদশ মালা॥ ১১॥

দ্বাদশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীজয়দেব গোস্বামী

এবে কহি শ্রীল-জয়দেবের চরিত্র।
শ্রবণ-সুখদ আর পরম পবিত্র॥
কেন্দুবিল্ব নামে গ্রাম-সাগর হইতে।
শ্রীমান্ জয়দেব দ্বিজ হইলা (ক) বিদিতে॥
শ্রীল-পুরুষোত্তম-মহাকাশ গিয়া।
বন্ধুত্ব করিলা অন্য পূর্ণচন্দ্র পায়্যা॥
উভয় প্রণয়রসে ভেট দোঁহে করে।
পুরুষোত্তম-চন্দ্র দিলা স্ত্রীরত্ন সাদরে॥
জয়দেব-চন্দ্র নিজ বন্ধুর চরিত।
বর্ণিয়া করিলা ভেট, করিলা মোহিত॥
দুই চন্দ্র উদয় করিয়া ত্রিভুবন।
দুরিত-তিমির নাশি কৈল আলোকন॥
তাহার জ্যোৎস্নার কিছু মহিমা শুনহ।
যথাশক্তি কিছু কহি পবিত্রিতে দেহ॥
জয়দেব মহাশয় মহান্ মানুষ (খ)।
শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বৃক্ষতলে বাস॥
অগাধ পাণ্ডিত্য হয়ে (গ) অতুল্য ভক্তিমান্।
শ্রীমান্ জগন্নাথ-প্রভুর কৃপার ভাজন॥
কান্থা করোয়া মাত্র অন্যসঙ্গহীন।
বিরক্ত উদার জিতেন্দ্রিয় দম্ভ-খীণ॥

পাঠান্তর—(ক) শ্রীমান্ জয়দেব দ্বিজ হইলা—
শ্রীমান্ জয়দেব হইলা।
(খ) মহান্ মানুষ—মহান্ মানুষ এবং মহান্ মানস।
(গ) অগাধ পাণ্ডিত্য হয়ে—অতুল পাণ্ডিত্য হয় এবং
অগাধ পাণ্ডিত্যে।

পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ যে অপত্য-বিহীন।
সেবিলা শ্রীজগন্নাথে হইয়া সুদীন॥
প্রার্থনা করিলা দ্বিজ সন্তানকারণ।
প্রতিজ্ঞা করিলা হেতু প্রভুর তোষণ॥
কন্যা কিংবা পুত্র যাহা প্রথমে জন্মিব।
দাসী কিংবা দাস মতে চরণে সোঁপিব॥
কথোক দিবসে এক কন্যা জনমিল।
কর্ম্মযোগ্যকাল যবে বয়স হইল॥
জগন্নাথ আগে দাসী করিয়া সোঁপিলা (ক)।
প্রভু অঙ্গীকার করি বিপ্রে আজ্ঞা দিলা॥
লইনু তোমার কন্যা হৈল মোর দাসী।
কিন্তু এক দাস মোর বিরক্ত উদাসী॥
জয়দেব নাম হয় অমুক স্থানেতে।
তাঁহারে লইয়া কন্যা সোঁপহ (খ) ত্বরিতে॥
তেঁহো মোর দাস, তব কন্যা হবে দাসী।
অতএব তাহে মুঞি পাব সুখরাশি॥
এতেক আদেশ বিপ্র পাইয়া তৎক্ষণে (গ)।
যথা জয়দেব সাধু গেলা সেই স্থানে॥
যাইয়া কহয়ে বিপ্র জগন্নাথ-আজ্ঞা।
কন্যা প্রতিগ্রহ কর না কর অবজ্ঞা॥
সাধু শুনি চমকিত হইয়া কহয়ে।
হেন আজ্ঞা করে প্রভু কি বিচার হয়ে॥
তাঁহারে অনেক সাজে মোরে অসম্ভব।
হেন আজ্ঞা পালিবারে নাহি পারি লব॥
কৃপা নহে এ তো মোরে অকৃপার হেতু।
বিড়ম্বনমাত্র এই নিগ্রহের সেতু॥
কন্যা লয়্যা যাও তুমি মোর কায নাই।
বরঞ্চ তাঁহার দেশ ছাড়িয়া পলাই॥

পাঠান্তর—(ক) সোঁপিলা—অর্পিলা।
(খ) সোঁপহ—দানহ।
(গ) পাইয়া তৎক্ষণে—পাই ততক্ষণে।

বিপ্র কহে আজ্ঞা তাঁর অবশ্য করিবে (ক)।
সাধু কহে না পারিব পুন না কহিবে॥
পরস্পর দুজনাতে বাক্যহঠ হৈল।
ব্রাহ্মণ বিরক্ত হৈয়া উঠিয়া চলিল॥
কন্যারে কহিলা তুমি বসিয়া থাকহ।
ঞিহ যে তোমার স্বামী নিশ্চয় জানিহ॥
কন্যার নাম পদ্মাবতী পদ্মের সমান (খ)।
বসিয়া রহিলা সেই সাধুসন্নিধান॥
সাধু কহে যাহ তুমি হেথা (গ) কায নাই।
কান্দিয়া কহয়ে কন্যা করুণা জানাই॥
পিতা সমর্পিলা আর জগন্নাথ-আজ্ঞা।
তুমি যে আমার স্বামী এ মোর প্রতিজ্ঞা (ঘ)॥
তুমি যদি কর ত্যাগ আমি না ছাড়িব।
কায়মনবাক্যে তব চরণ সেবিব॥
এতো শুনি জয়দেব বিচার করয়ে।
জগন্নাথ ইচ্ছা কভু অন্যথা না হয়ে॥
যে হউ সে হউ অঙ্গী করিতে হইল।
বুঝিলাম মায়াফাঁস গলায় লাগিল॥
জগন্নাথ জগতের কর্ত্তা বিভু হয়।
তেঁহো করিবেন তাহে কি আছে উপায়॥
ইহা ভাবি তাঁরে অঙ্গীকার করি কহে।
তবে এক ঝোপড়া বান্ধিয়া রহ তাহে॥
ঝোপড়া বান্ধিয়া এক সেবা প্রকাশিলা।
শ্রীরাধামাধব নাম ঠাকুরের হৈলা॥
তাঁর পরিচর্য্যায় পদ্মারে নিয়োজিলা।
রাধামাধবের দাসী করিয়া সৌপিলা॥
পদ্মার মহিমা কেবা কহিবে অবধি।
যথা দেব তথা দেবী নিরমিলা বিধি॥
জগন্নাথ বিচার করিয়া সমর্পিলা।
স্বামীর সমান প্রেম সমান সুশীলা॥
শ্রীরাধামাধব-রূপ দেখিয়া নয়ানে।
অন্তরে স্ফুরিলা কিছু করিতে বর্ণনে॥

পাঠান্তর—(ক) করিবে—পালিবে।
(খ) পদ্মাবতী নামে কন্যা পদ্মিনী সমান।
(গ) হেথা—ইঁহা।
(ঘ) তুমি মোর স্বামী মোর এই ত প্রতিজ্ঞা।

শ্রীগীতগোবিন্দ সর্গ দ্বাদশ বর্ণিল।
অপূর্ব্ব সুচমৎকার ভুবন ভরিল॥
অদ্যাবধি জগন্নাথ ত্রিসন্ধ্যা যে গীত।
না শুনিলে নাহি হয় নিদ্রাহার নিত॥
কি কব মহিমা তাঁর শ্রীহস্তে আপনে।
লিখিলা পুস্তকে হরি মান-প্রকরণে॥
তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্ব্ব কথন।
পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র লিখিলা যেমন॥
খণ্ডিতা-মধুররস[১] বর্ণন করিতে।
কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার পড়ে চরণেতে॥
প্রসিদ্ধ আছয়ে ইহা ত্রিজগতে গায়।
কবিরাজ-মনে কিছু হইল সংশয়॥
সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রে এতেক লাঞ্ছনা।
কেমতে বর্ণিব বলি হৈল দুষ্খমনা॥
পুস্তক রাখিয়া সাধু স্নান করিবারে।
গমন করিলা তবে সাগরের-নীরে॥
হেথা কৃষ্ণচন্দ্র জয়দেব-রূপ ধরি।
লিখিতে আইলা পদ্মা পুছে বেরি বেরি (ক)॥
এইমাত্র স্নানে গেলা ফিরি কেনে আইলা।
তেঁহো কহে বার্ত্তা এক মনে পড়ি গেলা॥
শীঘ্র লিখিয়া রাখি পুন স্নানে যাই।
এতো কহি গ্রন্থে লিখে রসের মাধাই॥
"দেহি পদপল্লবমুদারম্" ইতি।
লিখিয়া চলিলা হরি অতি দ্রুতগতি॥
পদ্মার সন্দেহ মনে কহিবারে নারে।
হেনকালে জয়দেব আইলেন ঘরে॥
চমকিত হইয়া কহয়ে পদ্মাবতী।
এই তুমি গ্রন্থ লিখি গেলা শীঘ্রগতি॥
পুন দেখি স্নান করি আইলা এইক্ষণে।
ইহার কারণ কি সন্দেহ মোর মনে॥

পাঠান্তর—(ক) বেরি বেরি—ত্বরা করি।

১। শ্রীকৃষ্ণ প্রভাতে অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন অঙ্গে লইয়া শ্রীরাধার নিকট আসিলে তাহা দেখিয়া কুপিতা শ্রীরাধা হইলেন খণ্ডিতা নায়িকা।

উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎসা হি খণ্ডিতা॥
—উজ্জ্বল নীলমণি।

ক্ষণমাত্র দেখি পুন সমুদ্রগমন।
স্নান করি পুন অর্দ্ধক্রোশ আগমন॥
লিখিলা যে সেই কেবা, কেবা হও তুমি।
ভ্রমিছে আমার মতি, কেবা মোর স্বামী॥
বুদ্ধিমান জয়দেব বুঝিলা অন্তরে।
ইথে কিছু গূঢ়কথা আছয়ে ভিতরে॥
অতিশীঘ্র গ্রন্থ খুলি দেখে মহামতি।
অপ্রাকৃত সদক্ষর ঝলকিছে জ্যোতি॥
হৃদয়ে রাখিয়া গ্রন্থ পুনঃপুন বলে।
'দেহি পদ দেহি পদ' কণ্ঠে না উগলে॥
নয়নে গলয়ে ধারা পুলক কম্পন।
প্রেমাবেশে ধরে গিয়া পদ্মার চরণ॥
তুমি ধন্য ধন্য তব সফল জীবন।
মোর ভাগ্যে না হইল হেন দরশন॥
সেই সত্য স্বামী তব নয়নগোচর।
হইল ফলিল তব জন্ম-তরুবর॥
সেই গীতগোবিন্দ ব্যাপিল ত্রিভুবনে।
ক্ষেত্রবাসী রাজার উপজে কিছু মনে॥
শ্রীগীতগোবিন্দ নামে বর্ণিয়া আপনে।
কহিলা অমাত্যগণে প্রচার কারণে॥
সভাসদ্ পণ্ডিতাদি চমকি কহয়ে।
জয়দেব-কৃত গ্রন্থ প্রভুপ্রিয় হয়ে॥
সুমিষ্ট বর্ণন তেন না হয় কুত্রাপি।
অতএব তেন লোকে না চলিব ব্যাপি॥
ইহা শুনি রাজা শ্রীমন্দিরে প্রভুস্থানে।
দুই গ্রন্থ ধরি দিলা পরীক্ষা-করণে॥
কবিরাজ-কৃত গ্রন্থ হৃদয়ে লইলা।
নৃপকৃত গ্রন্থ প্রভু চরণে ক্ষেপিলা॥
তাহাতে রাজার চিত্তে অভিমান হৈয়া।
বুড়িয়া মরিতে গেলা সমুদ্রে যাইয়া॥
রাজা নিজভক্ত পুন দয়া উপজিল।
না মর তোমার গ্রন্থ অঙ্গীকার কৈল॥
জয়দেবকৃত গ্রন্থ দ্বাদশ যে সর্গে।
তব কৃত বার শেলাক থাকিবেক অগ্রে॥
জগন্নাথ-কৃপামৃত পাইয়া রাজন।
আনন্দ-উল্লাসে সাধু হইলা মগন॥

শ্রীমান্ কবিরাজ সাধুর মহিমা।
আর কিছু শুন সভে সৌভাগ্যের সীমা॥
সাধু নিজ কুটীরের ছাপর ছাইতে।
রৌদ্রে শ্রান্তি দেখি হরি দুঃখ পায় চিতে॥
ত্বরায় হইব বলি পদ্মাবতী-ভাণে।
গিরো ফাঁড়ি দেন গৃহে থাকিয়া আপনে॥
কার্যান্তর হৈতে (ক) পদ্মাবতী আইলা দূরে।
দেখিয়া সাধুর কিছু সংশয় অন্তরে॥
ছাপন হৈতে তবে জিজ্ঞাসেন তাঁরে।
এই গিরো ফাঁড়ি দিলা পুন দেখি দূরে॥
পদ্মা কহে আমি নাহি গিরো ফাঁড়ি দেই।
সাধু নাম্বি দেখে গৃহে কোথা কেহো নাই॥
রাধামাধবের হস্তে দেখে ঝুলমলা।
বুঝিয়া সাধুর মনে অতি দুঃখ ভেলা॥
হেন সুকুমার অঙ্গ ননীর পুতলি।
এতো শ্রম কেনে কৈলে আহা যাঙ বলি॥
আর একদিন জয়দেব-রূপ ধরি।
পদ্মাহস্ত-পাক অন্ন খাইলা ছল করি॥
অতএব কত রঙ্গ কতেক কহিব।
কবিরাজ-সৌভাগ্যের তুলনা কি দিব॥
কবিরাজ-রাজের এক লীলা কহি আর।
অপূর্ব্ব কথন হয়ে লোকে চমৎকার॥
ঠাকুরসেবার হেতু আনিবারে অর্থে।
দেশান্তর হইতে আনিতে দৈবি পথে॥
দস্যুতে ঘেরিয়া অর্থ সব কাড়ি নিল।
মারিবার উদ্‌যোগে সাধু দস্যুরে কহিল॥
অর্থ তো লইলে ভাই কি কায মারিয়া।
দস্যু কহে ধরাইয়া দিবে গ্রামে গিয়া॥
কেহ বলে নাহি মার হস্তপদ কাটি।
কূপেতে ডারিয়া দেহ কিবা হটাহটি॥
এতো কহি হস্তপদ কাটি কূপে ডারি।
চলি গেল দস্যুগণ নিজ ঘরাঘরি॥
সাধুর বেদনা ক্ষোভ কিছুমাত্র নাহি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মুখে কূপে অবগাহি॥

পাঠান্তর—(ক) হৈতে—হেতু।

দুই তিন দিনে এক রাজা মৃগয়াতে।
যাইতে দেখয়ে এক নর রহে তাথে॥
সূর্য্যের কিরণ যেন অঙ্গের কিরণে।
যতনে তুলিয়া নমস্করে কায়মনে॥
হস্তপদ বিবরণ পুছয়ে রাজন।
তেঁহো কহে কৃষ্ণ ইচ্ছা ইহার কারণ॥
রাজা ভক্তিভাবেতে শিবিকা চঢ়াইয়া।
নিজগৃহে গেলা শীঘ্র সাধুরে লইয়া॥
সুন্দর স্থানেতে রাখি জিজ্ঞাসে তাঁহারে।
কিছু অভিলাষ হয় আজ্ঞা কর মোরে॥
তেঁহো কহে অভিলাষ বৈষ্ণবসেবনে।
উদ্‌যোগ করহ এইমাত্র মোর মনে॥
আরম্ভিলা বৈষ্ণব-সেবন সুপিরীতে।
চব্য-চোষ্য-আদি যে সামগ্রী বিধিমতে॥
শত শত বৈষ্ণব ভুঞ্জয়ে দিনে দিনে।
আনন্দ বাঢ়িল বৈষ্ণবের দরশনে॥
দুষ্টভাবে সেই দস্যুগণ ভেক ধরি।
আইল রাজার গৃহে কপট আচরি॥
কবিরাজ দেখে সেই দস্যু ছন্নরূপে।
আইল দুষ্টতা করি প্রতারিতে ভূপে॥
আগমনমাত্রে বহু সমাদর কৈলা।
শুশ্রূষাকারণে সাধু রাজারে কহিলা॥
এই যে বৈষ্ণবগণে সেবন করিবে।
অন্য হৈতে অধিক পরিচর্য্যা প্রীতিভাবে॥
রাজা স্বত পরত সেবয়ে নানামতে।
তাহারা কম্পিত ভয়ে স্থির নহে চিতে॥
যার হস্তপদ কাটি কূপে দিনু ডারি।
সেই দেখি এবে রাজগৃহে অধিকারী॥
বুঝি ছল করিয়া রাখিল মো সভারে।
শালে দেয় কবে কিংবা গরদানে মারে॥
খাইয়া শুইয়া কিছু সুখ নাহি মনে।
প্রতিদিন কহে মোরা যাই অন্যস্থানে।
রাজা কহে বাবাজীর অনুমতি বিনে।
যাইবারে তোমা সভায় কহিব কেমনে॥
পলাইয়া যাইবার যুকতি করয়ে।
দ্বারে দ্বারোয়ান হয়ে ছাড়িয়া না দেয়ে॥

ভাবিয়া আকুল নৃপে বিনতি (ক) করয়।
ভয়ে বাবাজীর স্থানে কেহ নাহি যায়॥
যাইবার আগ্রহ বুঝিয়া রাজা মনে।
অনুমতি লাগি কহে বাবাজীর স্থানে॥
বাবাজী কহিলা অই বৈষ্ণবগণেরে।
বহু অর্থ দেহ লোক দেহ বহিবারে॥
আজ্ঞাক্রমে রাজা বহু অর্থ সঙ্গে লোক।
বিদায় করিলা দিয়া প্রণয়পূর্ব্বক॥
ধনলোভে হর্ষমতি কথোদূরে গিয়া।
লোকগণে কহে যাহ তোমরা ফিরিয়া॥
তাহারা কহয়ে নৃপতির আজ্ঞা নাই।
সে যা হউ পুছি তোমা সভাকার ঠাঞি॥
অনেক বৈষ্ণব আইসে বাবাজীর স্থান॥
তোমাদিগে এতেক করিলা কেনে মান।
কহে তবে দুষ্টেরা স্বভাব অনুসারে।
বৈষ্ণব-অপরাধ ফলে সেই তেপান্তরে॥
বহুমান কৈল তার কারণ শুনহ।
যে হেতুক বাবাজীর অঙ্গহীন দেহ॥
এক রাজগৃহে মোরা চাকর আছিল।
ওমোরপয় নাম মুঞি (খ) জমাদার ছিল॥
কোন অপরাধে রাজা মারিতে কহিল।
অন্তস্পটে (গ) হস্তপদ কাটি ছাড়ি দিল॥
হেথা আসি ছল করি মহান্ত হইল।
পাছে মোরা ভুর (ঘ) ভাঙ্গি ভয়েতে কাঁপিল॥
আর হেতু পূর্ব্ব প্রাণরক্ষা কৈনু মোরা।
যে কারণ ধন দিলা খোসামদপারা॥
শুনি রাজভৃত্যগণ প্রসন্ন নহিলা।
ইতরের ন্যায় বাক্যে ক্ষোভিত হইলা॥
হেনকালে পৃথিবী ফাটিয়া (ঙ) দস্যুগণে।
মৃত্তিকাভিতরে নিঞা দাবে ক্রোধমনে॥

পাঠান্তর—(ক) বিনতি—মিনতি।
(খ) ওমোরপর নাম মুঞি—আমিহ প্রধান তথা।
(গ) অন্তস্পটে—গোপনেতে।
(ঘ) ভুর—ভুরু।
(ঙ) ফাটিয়া—কাটিয়া।

রাজভৃত্যগণ দেখি অবাক্ হইল।
সাধুদ্বেষী এই দুষ্ট মনে বিচারিল॥
নহে আচম্বিতে হেন দণ্ড হবে কেনে।
প্রকৃতি ইহার বুঝিলাম সম্ভাষণে॥
অর্থসহ বিশেষ রাজার স্থানে গিয়া।
কহিলা সে লোকগণ আশ্চর্য্য মানিঞা॥
রাজা বাবাজীর স্থানে পুছয়ে যতনে।
তেঁহো আদ্যোপান্ত সব কহে বিবরণে॥
দস্যু হয়ে মোর হস্ত পদ অই কাটে।
সাধুবেশ ধরিলা আইলা সটেপটে॥
রাজা পুন পুছে সমাদর কৈলে কেনে।
অর্থ বা অনেক দিলে কিসের কারণে॥
সাধু কহে সভার অন্তরে সুখদান।
অর্থে বা সম্মানে এই কর্ত্তব্যবিধান॥
বিশেষে দুষ্টের প্রতি অদৈন্য কর্ত্তব্য।
সঞ্চিতার্থ হৈলে পরহিংসা না করিব॥
কহিতে কহিতে হস্তপদ পূর্ব্ববত।
হৈল সাধু অসাধুর এই দুই পথ॥
সাধুর ঘরণী নাম পদ্মাবতী সতী।
রাজা শুনি আনাইলা আপন বসতি॥
নৃপতির রাণী তার ভাই মরিয়াছে।
ঘরণী তাহার সহগমন গিয়াছে (ক)॥
শুনিয়া কান্দয়ে রাণী পদ্মা কহে তবে।
সহমৃতা হই অতিদূর প্রেমভাবে॥
প্রিয়াধীন (খ) প্রাণ প্রিয়হীন ক্ষণমাত্র।
বাহিরায় নহে যদি কোন্ প্রেমপাত্র॥
সে কথা রাণীর মনে জাগিয়া রহিল।
পরখিতে কিছু তার উপায় সৃজিল॥
জয়দেব ঠাকুর আর রাজা দুইজনে।
বাগিচাতে থাকে কৃষ্ণকথা আলাপনে॥
রাজা গৃহে আইলে রাণী চরণে পড়িয়া।
পদ্মার প্রেমোক্তিকথা বিশেষ জানায়্যা॥
কহে গোসাঞির মিথ্যা মৃত্যুসমাচার।
পাঠাইয়া দেহ গিয়া তাঁহার গোচর॥

রাজা কহে অনোচিত অপরাধ হবে।
স্ত্রীর স্বভাব পুনঃপুন কহে তবে॥
রাজা কহে যাহা জান কর যেবা হয়।
আমি নাহি জানি তব মনে যেবা ভায়॥
মিথ্যা করি গোসাঞির মৃত্যু-সমাচার।
রাণী কহে পদ্মা আগে করি লোকদ্বার॥
শুনি-মাত্র পরাণ বিয়োগ হইল তাঁর।
রাণী অপরুদ্ধ হৈয়া করে হাহাকার॥
ভয়ে কম্পমান নৃপে দিলা সমাচার।
রাজা বহু রাণীরে করিলা তিরস্কার॥
গোসাঞির চরণে পড়িয়া রাজা কহে।
গোসাঞি কহেন রাজা চিন্তা কিবা তাহে॥
মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র কৃষ্ণনামাক্ষর।
কর্ণে শুনাইলে হবে পরাণ সঞ্চার॥
এতো কহি সাধু যাই তাঁহার নিকটে।
কৃষ্ণ কহ বলিতেই চমকিয়া উঠে॥
প্রাকৃতিক স্ত্রী যেমন সামান্য পুরুষে।
স্বামিবুদ্ধি করি হয়ে আসক্ত কুরসে॥
পাছে বুঝ পদ্মাবতীর তেমতি আশয়।
স্বামি-সম্বন্ধ যাতে কৃষ্ণপ্রেমময়॥
কৃষ্ণের সম্বন্ধে স্বামী বন্ধু কৃষ্ণভক্ত।
অতএব স্বামি-প্রেম-ব্যক্তি অপ্রাকৃত॥
কিছুদিন ব্যাজে সাধু রাজারে কহিয়া।
পুন শ্রীপুরুষোত্তম গেলা হৃষ্ট হিয়া (ক)॥
তাঁর মুখপদ্মমধু শ্রীগীতগোবিন্দে।
ত্রিজগত মত্ত হৈল যেই রসানন্দে॥
মধুর সঙ্গীত শুনি দেবনারীগণ।
পুলকে ফুৎকার করে পালটি নয়ন॥
সাধু কি পাষণ্ডী কিবা বিষয়ী পামর।
শুনিঞা না দ্রবে হেন নাহি চরাচর॥
মালীর দুহিতা এক বার্ত্তাকুর খেতে[১]।
বার্ত্তাকু উঠায় আর গায় আনন্দিতে॥
জগন্নাথ নিজলীলা-বিশেষ আখ্যান।
শুনিঞা মগন চেষ্টা প্রেয়সীর গুণ॥

পাঠান্তর—(ক) গিয়াছে—করিয়াছে।
(খ) প্রিয়াধীন—প্রিয় বিনু।

পাঠান্তর—(ক) হিয়া—হৈয়া।
১। বার্ত্তাকুর খেতে—বেগুন ক্ষেতে।

মালিনীর পশ্চাতে শুনিতে ধাবমান।
কোমল শ্রীপাদপদ্মে ফুটে শিলাকণ॥
কণ্টকে ছিণ্ডিল শ্রীঅঙ্গের মিহিবস্ত্র।
উড়নিতে বিন্ধি রহে কণ্টকিত পত্র॥
মন্দিরে আইলা যবে ছিন্নভিন্ন বেশ।
দ্বার খুলি পাণ্ডাগণ ভাবয়ে অশেষ॥
বস্ত্র-মাল্য-অলঙ্কার অঙ্গে ছিণ্ডিয়াছে।
বার্ত্তাকুর কাঁটা বস্ত্রে বিন্ধি রহিয়াছে॥
রাজা আসি চমৎকৃতে করয়ে স্তবনে।
কোথা গিয়াছিলে প্রভু অলভ্য কি ধনে॥
ত্রৈলোক্যে তোমার ক্রীড়াভাণ্ডে কিবা নাই।
কি কারণে কোথা যাও আহা বলি যাই॥
আহা মরি শ্রীচরণে কত না বেদনা।
পাইলে কোথায় কিবা পাইলে (ক) কদর্থনা॥
এ তোমার ভৃত্য প্রভু সম্মুখে থাকিতে।
আজ্ঞা না করিলা (খ) কেনে কি কায যাইতে॥
আজ্ঞা কর আকাশের চন্দ্র সূর্য্য আনি।
ব্রহ্মা আদি দেবতা বাসুকি বেদবাণী॥
ধরিয়া আনিয়া ক্ষণে দেই শ্রীচরণে।
ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণিত করি সুমেরুর সনে॥
শ্রীচরণকমলের বালাইর সনে।
ফুক দিয়া ক্ষণমাত্রে উড়াই গগনে॥
কারণ-অর্ণব স্বর্ণঝারিতে ভরিয়া।
সুকোমল শ্রীচরণ দেই ধোয়াইয়া॥
আহা এ কি কেনে কোথা কিসের লাগিয়া;
গিয়াছিলে কি অভাবে চরণে হাঁটিয়া॥
কাতর অন্তরে রাজা নয়নের জলে।
ভাসিয়া কহিলা যবে হইয়া বিকলে॥
প্রত্যাদেশ করিয়া দয়াল জগন্নাথ।
বিশেষ কহিলা তবে নৃপতির সাথ॥
মালীর দুহিতা নিজ বার্ত্তাকুর খেতে।
পড়ে গীতগোবিন্দ মুঞি গেলাম শুনিতে॥
ধাইতে পশ্চাতে বার্ত্তাকুর কাঁটা লাগে।
তুষ্ট হইনু বড় তাঁরে আন মোর আগে॥

শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠ যেখানে যে করে।
অবশ্য সেখানে মুঞি যাই শুনিবারে॥
চমৎকার ভাবে রাজা মালিনীর আগে।
শিবিকা পাঠায়্যা আনে বহু অনুরাগে॥
জগন্নাথ সম্মুখে সে পরম আনন্দে।
গাইল গোবিন্দগীত পরম (ক) প্রবন্ধে॥
অদ্যাপিহ তাহার সন্তান প্রভু আগে।
শ্রীগীতগোবিন্দ গান করে সন্ধ্যাভাগে॥
শ্রীগীতগোবিন্দ শুনিবারে প্রভু ধায়।
শুনি রাজা নগরেতে ঢেঁড়রা ফিরায়॥
কুৎসিত স্থানেতে কিংবা গমন সময়।
পাঠ যে করিবে সেই দণ্ড-অর্হ (খ) হয়॥
যবন মোগল এক তাহা তো শুনিঞা।
জগন্নাথ আইসে তাহে উৎসুক হইয়া॥
ঘোড়া চাঢ়ি যায় গীত-গোবিন্দ পঢ়য়ে।
জগন্নাথ শুনিবারে পিছে পিছে ধায়ে॥
চারিপানে (গ) চাহে সেই মোগল সুমনা।
জগন্নাথ কোথা আইসে করয়ে তর্কণা॥
দেখিবারে না পাইয়া ভাবয়ে অন্তরে।
যবন বলিয়া বুঝি উপেক্ষিলা মোরে॥
হেনকালে দেখি আগে শ্যামলসুন্দর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে হইয়া অধর॥
জবন চণ্ডাল বিপ্র হরি না বিচারে।
যেই ভজে সেই পায় গুণের সাগরে॥
শ্রীজয়দেব ঠাকুরের বৃন্দাবন যাইতে।
অন্তরে আবেশ হইল ঠাকুর সহিতে॥
ঠাকুর কিশোর রূপ স্থূল অঙ্গ ভারি।
কেমনে লইয়া যাব উপায় কি করি॥
এতেক ভাবিতে রাধামাধব কহিল।
চিন্তা কি আমারে লয়্যা বৃন্দাবন চল॥
ঝুলির ভিতর করি লইয়া যাইবে।
ছোটরূপ হব কিছু ভার না লাগিবে॥

পাঠান্তর—(ক) কিবা পাইলে—কেবা কৈল।
(খ) করিলা—করিয়া এবং করি তো।

পাঠান্তর—(ক) পরম—অমৃত।
(খ) দণ্ড অর্হ—দণ্ড অর্শ।
(গ) চারিপানে—চারিপাশে।

ঠাকুরের আদেশ পাইয়া কবিরাজ।
বৃন্দাবন গেলেন ঠাকুর ঝুলিমাঝ॥
বৃন্দাবনধাম দেখি পুলক হইলা।
কেশীঘাট-সন্নিধানে আনন্দে রহিলা॥
কোন মহাজন রাধামাধবে হেরিয়া।
আর্দ্র হইয়া দিলা মন্দির বনাইয়া॥
কবিরাট্ অপ্রকটে[১] বহুকাল পরে।
ঠাকুর লইয়া গেলা রাজা জয়পুরে॥
অদ্যাবধি তথা ঘাটিনাম রম্যস্থানে।
বিরাজ করয়ে চাঁদ ঝলকে বদনে॥
পরম সুন্দর রূপ ভুবনমোহন।
বিজুরি চমকে যেন অঙ্গের কিরণ॥
অতএব শ্রীল-জয়দেব কবিরাজ।
যাঁর গুণ কীর্ত্তি যে প্রসিদ্ধ জগমাঝ॥
অসাধার-গুণ সাধু অপার মহিমে।
যাঁর স্নান অনুরোধে গঙ্গা আইলা গ্রামে॥
কেন্দুবিল্ব হৈতে গঙ্গা হয় আঠার ক্রোশ।
প্রতিদিন গঙ্গা স্নান করে বারোমাস॥
একদিন সাধু কোন কারণ-অধীনে।
যাইতে না পারি ক্ষোভে ভাবয়ে মউনে॥
হেনকালে গঙ্গাদেবী কল্লোল করিয়া।
সাধুর আশ্রম যথা কেন্দুলি আসিয়া॥
জয়দেবে কহে গঙ্গা করাসিয়া (ক) স্নান।
তোমার পরশ লাগি আইনু তব স্থান॥
সর্ব্বতীর্থ মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ ত্রিজগতে।
মহিমা কে কবে শিব শিরে ধর্য়া যাথে॥
হেন গঙ্গা কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ পরশনে।
সৌভাগ্য গণয়ে আর ধন্য করি মানে॥
ইহার প্রমাণ বহুশাস্ত্রেতে বাখানে।
প্রচরদ্রূপ সর্ব্বলোকে অজ্ঞে নাহি জানে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা॥"

অনুবাদ। বিভো, আপনার মত ভগবদ্ভক্তেরা নিজেরাই তীর্থস্বরূপ। নিজের অন্তরে বিরাজমান অর্থাৎ নারায়ণের সংসর্গ দ্বারা আপনারা (কোন কারণে অপবিত্র) তীর্থস্থানগুলিকে আবার তীর্থে পরিণত করেন।

আমি তাঁর শ্রীচরণ অন্তরে ধরিয়া (ক)।
আশা করি আছি হৃদিপাত্র পসারিয়া॥
তার পানশেষ প্রেম-অমৃতের কণা।
লালদাস প্রাপ্তিহেতু করয়ে করুণা (খ)॥

চরিত্র শ্রীঅর্জ্জুন মিশ্র

শ্রীমান্ অর্জ্জুন মিশ্র ভাগবত সাধু।
শ্রীপুরুষোত্তমে বাস সমিভ্যার বধু॥
পণ্ডিত গম্ভীর মহা উদার চরিত।
নির্ম্মৎসর শান্ত শিষ্ট তদগত-চিত॥
ভিক্ষা উপজীব্য মাত্র সর্ব্বত্র উদাস।
শ্রীমদ্গীতা-ভাগবতে সদাই বিলাস॥
গীতা-উপনিষদের টীকা বিস্তারিতে।
'যোগক্ষেমং বহাম্যহং' শ্লোক বিচারিতে॥
মনে কিছু সন্দেহ জন্মিল সাধুবরে।
যোগ-ক্ষেম বহিয়া যে অনন্য-ভক্তেরে॥
আপনি যোগান হেন সম্ভব না হয়।
পরোক্ষেতে দেন বলি সে পাঠ কাটয়॥
লেখনীতে আঁচড়িয়া পাঠান্তর স্থাপে।
গীতা ভাগবত দেহ সাক্ষাত-স্বরূপে॥
গীতাপাঠ কাটাতে অক্ষরে আঁচড়িতে।
রামকৃষ্ণ-অঙ্গ-ক্ষত হয়ে সেই ঘাতে॥
জানাইতে তাঁহারে করিলা কিছু ভঙ্গি।
আচম্বিতে বাত-বৃষ্টি হয়ে উত্তরঙ্গী॥
ভিক্ষা না মিলয়ে মিশ্র থাকে উপবাসে।
পরদিনে গেলা পুন ভিক্ষা অভিলাষে॥
হেথা দুই ভাই জগন্নাথ বলরাম।
ব্রাহ্মণবালকরূপে আইসে মিশ্রধাম॥

পাঠান্তর—(ক) করাসিয়া—কব আসি।
১। কবিরাট্ অপ্রকটে—জয়দেব পরলোকগমন করিলে।

পাঠান্তর—(ক) ধরিয়া—করিয়া।
(খ) করুণা—কামনা।

দু'জনার স্কন্ধে দুই প্রসাদের ভার।
রোদন করয়ে অঙ্গে পড়ে রক্তধার॥
যাইয়া কহেন মিশ্র প্রসাদ পাঠাইলা।
ঠাকুরাণী চমকিয়া কহিতে লাগিলা॥
এতেক প্রসাদ তেঁহো পাইলেন কোথা।
তোমাদিগের স্কন্ধে দিতে মনে নৈল ব্যথা॥
সে যা হউক তোমাদিগের অঙ্গে রক্তধারা।
কান্দিতেছ মারিল কে হেন বুঝি পারা॥
তাঁহারা কহেন মিশ্রঠাকুর মারিল।
তেঁহো কহে অসম্ভব মনে না লইল॥
মিশ্র ঠাকুর কারু নাহি দেন পীড়া।
ব্রাহ্মণবালক থাকু নাহি হিংসে কীড়া॥
তাহাতে তোমরা হেন সুন্দর কিশোর।
হেন অঙ্গে আঘাত না করে দস্যু-চোর॥
সুকোমল অঙ্গ সুকুমার আহা মরি।
কেমন নির্দ্দয় সেই দয়া নৈল হেরি॥
পুন শিশু কহে—মাতা সত্য যে কহিনু।
মিশ্র মারিয়াছে ক্ষত হইয়াছে তনু॥
পুনঃপুন শুনি ঠাকুরাণী মনে নৈল (ক)।
তবে তবে (খ) বাপু আহা কি দয়া মারিল॥
কেনে বা মারিল হেন কুমতি হইল।
এ-হেন সোণার গায়ে (গ) আঘাত করিল॥
তাঁহারা কহেন মোরা কিছু নাহি কহি।
সন্নিকটে ছিনু মাত্র দোষ-গুণ এহি॥
লৌহ কণ্টক তীক্ষ্ন তাহার আঘাতে।
আঁচড়িলা অঙ্গে এই দেখহ সাক্ষাতে॥
এত শুনি ঠাকুরাণী দুঃখিত হইয়া।
পড়িয়া রহিলা ভূমে আক্রোশ করিয়া॥
শিশু দুই চলি গেলা মিশ্র আইলা ঘরে।
ভিক্ষা নাহি মিলে বাত-বরিষণ-তরে॥
আসিতে আসিতে ঠাকুরাণী কহে তবে।
শুন দেখি এমন হইলে তুমি কবে॥

এ-হেন কুমতি তব কি লাগি হইলা।
আহা মরি দুটি শিশু মারিয়া ডারিলা॥
এতেক নিগ্রহ কৈলে বহে রক্তধারা।
পণ্ডিত হইয়া তার ফল এই পারা॥
এতো শুনি বিপ্র সাধু আশ্চর্য্য গণিয়া (ক)।
আকাশ পাতাল ভাবে চমকিত হৈয়া॥
কহ আরে কে আইল কাহারে মারিনু।
আমি তো কাহারো কভু হিংসা না করিনু॥
কোথা হৈতে আইলা শিশু বিবরণ কহ।
বৃথা কেনে রোষ করি করহ কলহ॥
ঠাকুরাণী কহে মহাপ্রসাদের ভার।
জানো নাহি স্কন্ধে দিয়া পাঠাইলে যার॥
তেঁহো (খ) কহে আমি তো না প্রসাদ পাঠাই।
কেবা পাঠাইল প্রসাদ সে বালক বা কই॥
তবে ঠাকুরাণী পুন চমকিয়া কহে (গ)।
কেবা পাঠাইল তবে তুমি যদি নহে॥
অপূর্ব্ব-স্বরূপ দুটি গৌর-কৃষ্ণ-বর্ণ।
অতি সুকুমার অঙ্গ কর্ণেতে সুবর্ণ॥
স্কন্ধে প্রসাদের ভার অঙ্গে রক্তধারা।
কান্দিতে কান্দিতে আইলা যেন পুতুলাহারা॥
কহে প্রসাদের ভার মিশ্র পাঠাইলা।
লোহার শলাকা দিয়া অঙ্গ আঁচাড়িলা॥
পণ্ডিত সুবোধ মিশ্র মরম বুঝিলা।
গীতাপাঠ-কাটা হেতু অনুভব কৈলা॥
বুঝিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছা হইয়া পাড়িলা।
কহে তবে সত্য আমি অঙ্গ আঁচাড়িলা॥
ঠাকুরাণী চমকিয়া পুছে ধীরে ধীরে।
কারণ কি ইহার বিবরিয়া কহ মোরে॥
ঠাকুর কহেন আরে গীতা-ভাগবত।
জগন্নাথের নিজ দেহ হয়তো (ঘ) সাক্ষাৎ॥
সেই গীতা পাঠ ছাঁটি তাহে আঁচাড়িল।
অতএব জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে বাজিল॥

পাঠান্তর—(ক) নৈল—নৈল।
(খ) তবে তবে—তবে বল।
(গ) গায়ে—অঙ্গে।

পাঠান্তর—(ক) গণিয়া—মানিয়া।
(খ) তেঁহো—মিশ্র।
(গ) কহে—রহে।
(ঘ) হয়তো—হয় যে।

'বহাম্যহং' পাঠে আমি (ক) অবজ্ঞা করিল।
তাহার উদাহরণ স্কন্ধে বহি দেখাইল॥
জগন্নাথ বলরাম আইলা গৃহেতে।
তুমি ধন্য দেখিলা নহে আমার ভাগ্যেতে॥
ব্রাহ্মণীরে প্রশংসিয়া পুস্তক লইয়া।
প্রেমাবেশে হর্ষভয়ে তটস্থ হইয়া॥
'বহাম্যহং' 'বহাম্যহং' লেখে পুনঃপুন।
অপরাধ ক্ষেমাইতে করয়ে স্তবন॥
অদ্যাপিহ শ্রীঅর্জ্জুনমিশ্রের গীতাটীকা।
পণ্ডিতের মান্য হয় গৌরবে অধিকা॥
'বহাম্যহং বহাম্যহং' তিনবার হয়ে।
অর্জ্জুনমিশ্রের দ্বারে স্বয়ং যে দেখায়ে॥
অতএব সিদ্ধান্ত অনন্য যেই ভজে (খ)।
যোগক্ষেম দেন বহি আপনার ভুজে॥
অর্জ্জুনমিশ্রের ভাগ্য কিবা অনুপাম।
ছলে কৃপা কৈল জগন্নাথ-বলরাম॥
সেই মিশ্রঠাকুর-ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ।
কৃপা লাগি লালদাস করয়ে প্রার্থন॥

চরিত্র শ্রীশ্রীধরস্বামী

শ্রীল শ্রীধরস্বামী জগতে বিদিত।
শ্রীমদ্ভাগবতটীকা কৈলা বিস্তারিত॥
শ্রীনৃসিংহ-দরশন সাক্ষাতে করিলা।
টীকা মধ্যে মধ্যে গুণ-অমৃত বর্ণিলা॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ভক্তি পৃথক পৃথক।
মূঢ়জনে নাহি বুঝে মানে করি এক॥
স্বামী তাহা (গ) পৃথক্ করিয়া ব্যক্ত কৈলা।
অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন করি বাখানিলা॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-আদি হরিভক্তিগন্ধ বিনে।
বিফল উদ্যমমাত্র প্রসিদ্ধ ভুবনে॥

পাঠান্তর—(ক) আমি—মুঞি।
(খ) ভজে—ভাজে এবং ভাবে।
(গ) তাহা—তারে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো।" ইত্যাদি

অনুবাদ ও পূর্ণ শ্লোক পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ বিভু বিজয় ভুবন।
ভক্তিমুখ নিরীখয়ে কর্ম্ম যোগ জ্ঞান॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-আদি-মিশ্র ভক্তি যদি হয়ে।
ব্যভিচারী কহে শাস্ত্রে নাহি প্রশংসয়ে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব,
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ (ক) শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত! জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

অনুবাদ।—হে অজিত! তোমার কথায় সাধুগণ, আর সাধুদের মুখে তোমার কথা মুখরিত হইয়া উঠে। মানুষেরা নিজ নিজ স্থানে থাকিলেও সাধুজনের সান্নিধ্য হেতু সেই কথা আসিয়া তাহাদের কানে প্রবেশ করে। যাঁহারা সকল রকমে জ্ঞানের চেষ্টা ছাড়িয়া মনেপ্রাণে শুধু তোমার কথাকে নমস্কার করিতে করিতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, ত্রিভুবনে আর কেহ তোমাকে পরাজিত করিতে না পারিলেও তাঁহারা পারেন। তুমি তাঁহাদের বশ হও।

শুদ্ধভক্তি একমাত্র অনন্যশরণ।
অতএব নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ হ'ন॥
অনন্য অনন্য করি সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
দুরাচার হইলেও সে সাধুমধ্যে হয়॥

শ্রীগীতায়াম্—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥"

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

ইহাতেই বুঝহ অনন্য বিনে ভক্তি।
শুদ্ধ অধিকারী নহে কহে বেদ-পংক্তি॥
হরিভক্তি-আশ্রিত অন্য-দেব-আদি পূজে।
ভক্তিতত্ত্ব-রস সেই জন নাহি বুঝে॥

পাঠান্তর—(ক) স্থানস্থিতাঃ—স্থানে স্থতাঃ।

প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্ত-আদি যে তে।
যে যে অধিকারী করিবেন সেই মতে॥
হরিভক্তি জীবের যে কর্ত্তব্য তাৎপর্য্য।
কর্ম্ম জ্ঞান নহে দেহধারণের বর্য্য॥
শাঙ্কর বিরুদ্ধ গৌণ লক্ষণাব্যাখান।
দুষিয়া স্থাপিলা শুদ্ধমত বিলক্ষণ॥
শ্রীমদ্ভাগবত-অর্থ প্রচার করিলা।
যত যত বিরুদ্ধার্থ বিচারে খণ্ডিলা॥
শুদ্ধমত সাধুর সম্মত সতাং মার্গ (ক)।
নির্ণিলা নিরাসি মত, মতবাদিবর্গ॥
কাশীপুরে দণ্ডী যত মতবাদিগণ।
হঠ করি বিচার করিলা বহুজন॥
পরাভব করি স্বামী দিলা ওলাহন[১]।
তথাচ না মানে পূর্ব্বসংস্কার-কারণ॥
উভয়সম্মতিমতে প্রতিজ্ঞা করয়।
মাধব যে অঙ্গীকরে সেই সিদ্ধ হয়॥
টীকা নিঞা শ্রীলবেণীমাধব চরণে (খ)।
ধরিতেই প্রভু কৈলা হৃদয়ে ধারণে॥
স্বামী দেখে প্রভু হস্তে ধরিয়া তুলিলা।
অন্যে দেখে যেন হৃদে উড়িয়া লাগিলা॥
অতএব জয় জয় শ্রীমদ্ভাগবত।
ভাবার্থ দীপিকা টীকা সাধু সাধুমত॥
জয় শ্রীশ্রীধরস্বামী ভুবনপাবন।
ভাগবত-উপদেশে তারে জগজন॥
তাঁহার বৈরাগ্য-কথা আদ্য বিবরণ।
শুনহ কহিব কিছু কর্ণরসায়ন॥
শ্রীমান্ পরমানন্দপুরীর কৃপায়।
নৃসিংহ অকলঙ্কশশী হৃদয়ে উদয়॥
মহাভাগবতোত্তম পণ্ডিত গম্ভীর।
বৈরাগ্য জন্মিল গৃহে মতি নহে স্থির॥
গৃহে এক স্ত্রী মাত্র পূর্ণগর্ভবতী।
তেজিয়া যাইতে বন হৈল দৃঢ়মতি॥

হেনকালে নারী পুত্র প্রসব হইয়া।
কালপ্রাপ্ত হৈল তার বালক রাখিয়া॥
সাধু উৎকণ্ঠাতে গৃহে রহিতে না পারে।
চিন্তয়ে বালক এই কেবা রক্ষা করে॥
ভাবিতে ভাবিতে দৈবি (ক) এক জেঠি-ডিম্ব[১]।
চালে হৈতে পড়ি গেলা বিনা অবলম্ব॥
ভাঙ্গিয়া ভিতর হৈতে বাচ্ছা নিকশিয়া।
খাইল সম্মুখে এক মক্ষিকা ধরিয়া॥
সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করিল।
সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহারে রক্ষিল॥
এতেক ভাবিয়া তেজি গমন করিল।
অনাথ বালক গ্রাম্যলোকেতে পালিল॥
সেই শিশু কালে মহাপণ্ডিত হইলা।
ভট্টি নামে রামলীলা-সাহিত্য বর্ণিলা॥
শ্রীধরস্বামীর শ্রীচরণ-গুণ গাই।
শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচরণে মতি চাই॥

চরিত্র শ্রীবিল্বমঙ্গল মহাশয়

শ্রীমান বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বলিহারি।
সাধু-চূড়ামণি পরাকাষ্ঠা-প্রেম-ভোরি॥
অপূর্ব্ব অদ্ভুত চমৎকার সুমঙ্গল।
অলৌকিক রীত সুচরিত সুনির্ম্মল॥
কৃষ্ণহস্ত ধরি যেঁহো জোরাবরি কৈলা।
পুন নেত্র ভরি রূপসাগর দেখিলা॥
তাঁর সুচরিত্র-সাগরের এক কণা।
গাইব পবিত্র লাগি দুর্ম্মতি আপনা॥
দক্ষিণদেশেতে কৃষ্ণবেণ্বা নামে নদী।
তাহার নিকট গ্রামে প্রায় কর্ম্মবাদী॥
তথায় বসতি বিল্বমঙ্গল নাম বিপ্র।
লম্পটস্বভাব ধর্ম্ম-অংশে অতিক্ষিপ্র॥
নদীপারে এক বেশ্যা নামে চিন্তামণি।
তাহাতে আসক্ত সদা দিবস-রজনী॥

পাঠান্তর—(ক) সতাং মার্গ—সত্যমার্গ।
(খ) শ্রীল বেণীমাধব চরণে—শ্রীবেণীমাধব শ্রীচরণে।
১। ওলাহন—উপালম্ভন, তিরস্কার।

পাঠান্তর—(ক) দৈবি—দৈবে।
১। জেঠি-ডিম্ব—টিকটিকির ডিম।

একদিন বিপ্রের পিতৃশ্রাদ্ধ-মৃতাতিথি।
বেশ্যা কহে নদীপার না আসিহ ইথি॥
সারাদিন রহে ঘরে উদ্বিগ্ন-মানস।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে হইল অবশ॥
বৃষ্টিবরিষণ ঘোর বহে ঝঞ্ঝাবাত॥
উঠিয়া চলিলা নাহি মানে বজ্রাঘাত॥
নদীপার যাইতে নাহি নৌকা নাহি ভেলা।
কাম-তরণিতে চড়ি জলে ঝাঁপ দিলা॥
কামবেগে লইয়া ডুবায় জলবেগে।
ডুবিতে ভাসিতে এক শব পাইল আগে॥
জ্ঞানহত কাষ্ঠবুদ্ধ্যে মুরদরে[১] (ক) ধরিয়া।
সড়া মৃতের ক্লেদ লাগে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া॥
সে অনুধাবন নাহি, কষ্টে পার হৈয়া।
বেশ্যার বাটীর চৌদিগে ফিরয়ে ধাইয়া॥
প্রাচীরের গর্ত্তে এক সর্প মুখ দিয়া।
রহয়ে বাহিরে পুচ্ছ লম্বিত হইয়া॥
দ্বার না পাইয়া দীর্ঘ-রজ্জুবুদ্ধি করি।
সেই সর্প ধরি উঠে প্রাচীর উপরি॥
ভিতরে উপর হৈতে লম্ফ দিয়া পড়ে।
শব্দ শুনি বেশ্যাগণ ডরে হড়বড়ে॥
বাহির হইয়া আসি প্রদীপ লইয়া।
দেখে বিল্বমঙ্গল হয় আঙ্গিনায় পড়িয়া॥
পড়িয়া চূর্ণিত দেহ উঠিতে না পারে।
ধরাধরি করিয়া আনিলা সভে ঘরে॥
অঙ্গেতে দুর্গতি (খ) ক্লেদ দেখিয়া পুছয়ে।
যেরূপে আইলা গিয়া প্রত্যক্ষে দেখায়ে॥
স্নান আদি করাইয়া বসাইয়া গৃহে।
বিশেষ ভৎসনা করি বেশ্যা বহু কহে॥
ছি ছি ধিক্ ধিক্ তব হেন দুষ্টবুদ্ধি।
হেন কর্ম্মে যার মতি তার এই সিদ্ধি॥
হেন তম মদ যাতে শব কালসর্প।
না চিনিলে অধীন হইয়া কামদর্প॥

আমি বেশ্যা নীচ অতি অস্পর্শ (ক) নিন্দিত।
তাহে তুমি বিপ্র মোতে ক্রিয়া অনুচিত॥
এহেন অগ্রাহ্য কর্ম্মে হেন অনুরাগ।
ইহার যে শতাংশের অংশ (খ) একভাগ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি হইত তোমার (গ)॥
তবে কি না হইত চতুর্ব্বর্গসেবা সার (ঘ)॥
চিন্তামণিবেশ্যার যে চিন্তামণি বাক্য।
শুনি বিল্বমঙ্গলের হৃদে হৈল সৌখ্য (ঙ)॥
আগমন ক্লেশ আর ভৎসন বিশেষে।
ভাবিয়া বিবেক হৈল সুদৃঢ় মানসে॥
রাত্রি (চ) কৃষ্ণলীলাগানে প্রভাত হইল।
বৈরাগ্য করিয়া প্রাতে অমনি চলিল॥
স্থানান্তরে এক সাধু সোমগিরি নাম।
তাঁর স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র লৈলা অভিরাম॥
একভাবে বৎসরেক গুরুর সেবন।
করিয়া পাইলা রত্ন শুদ্ধপ্রেমধন॥
অলৌকিক প্রেমভক্তি পাইয়া হৃদয়।
মদপানে যেন মত্ত দিবানিশি যায়॥
কৃষ্ণ দরশনে মন-উৎকণ্ঠা হইল।
হা হা কোথা কৃষ্ণ বলি ধাইয়া চলিল॥
বৃন্দাবনে যাইবার হইল আশয়।
দিগবিদিগ নাহি (ছ) অনুরাগে ধায়॥
কথোক দিবসে এক গ্রামে উত্তরিয়া।
সরোবরতীরে বৃক্ষতলেতে বসিয়া॥
প্রেমাবেশে অন্তর্ম্মনা দুই চারি দিন।
বসিয়া রহিলা তথা আত্মস্ফূর্ত্তিহীন॥
গ্রামস্থ প্রবীণ লোকে দেখিয়া সুপাত্র।
ভক্তিভাবে প্রশংসয় ছল ছল নেত্র॥
সরোবরে স্নান করে বহু নরনারী।
সুন্দরী যুবতী এক বণিকের স্ত্রী॥

পাঠান্তর—(ক) মুরদরে—মুন্দর।
(খ) দুর্গতি—দুর্গন্ধ।
১। মুরদরে—মৃতদেহকে।

পাঠান্তর—(ক) অস্পর্শ—অস্পৃশ্য।
(খ) শতাংসের অংশ—শত অংশ অংশের।
(গ) তোমার—তোমায়।
(ঘ) চতুর্ব্বর্গসেবা সার—চতুর্ব্বর্গ সেবে যায়।
(ঙ) সৌখ্য—সখ্য।
(চ) রাত্রি—রাত্রে।
(ছ) দিগবিদিগ্ নাহি—দিগ্বিদিগ্ জ্ঞান নাহি।

দৈবাত্ত তাহার পানে দৃষ্টিপাত হৈল।
হেন যে সাধুর মন ঈষত টলিল॥
আপন অন্তর-রীতি বুঝিয়া আপনে।
উপায় সৃজিলা কিছু শান্তির কারণে॥
স্নান করি সেই নারী যে দিগে চলিলা।
সাধু তার পাছে পাছে গমন করিলা॥
বধু নিজ অন্তঃপুরে গমন (ক) করিলা।
সাধু তার গৃহদ্বারে বসিয়া রহিলা॥
হেনকালে (খ) সেই স্ত্রীর স্বামী সুচরিত।
দ্বারে সাধু বসি দেখি হইলা চকিত॥
বহু স্তব করি কহে করযোড় করি।
কিবা আজ্ঞা হয় কহ করি শিরে ধরি॥
সাধু কহে যদি মোর বচন রাখহ।
তোমার রমণী আনি আমারে দেখাহ॥
বণিক্-চরিত্র কিছু অলৌকিক হয়ে।
বৈষ্ণব-পিরীতি-কাযে স্বীকার করয়ে॥
অন্তঃপুরে গিয়া অলঙ্কার পরাইয়া।
আনিলা রমণী নিজ সুবেশ করিয়া॥
নির্জ্জনে সাধুর আগে হর্ষে আনি দিলা।
আপাদমস্তক সাধু সব নিরখিলা॥
চক্ষু সম্বোধন করি তত্ত্ব বিচারিয়া।
কহিতে লাগিলা নিজমন বুঝাইয়া॥
অরে মূঢ় চক্ষু কি দেখিয়া ভুলিয়াছ।
অগ্রাহ্য অবিদ্যাপথে কি ধন পাইয়াছ॥
রক্ত-মাংস-ক্লেদ-বিষ্ঠা-মূত্রময় দেহ।
তক (গ) আচ্ছাদন মাত্র দরশ-সুবহ॥
নির্ঘৃণ তোমার মতি এহেন কদর্য্যে।
লালসা করহ যাথে নিন্দিত অভুজ্যে॥
ধিক্ ধিক্ আরে দুষ্ট অসত ইন্দ্রিয়।
ক্ষেম বিড়ম্বন মোরে না কর অসূয় (ঘ)॥
এই তো ইহার তত্ত্ব জানিলে এখন।
পরিণামে কেবল যে দুঃখের কারণ॥

এতো কহি সেই (ক) যুবতীর স্থানে কহে।
তীক্ষ্ম দুটি সূচ শীঘ্র আনি দেহ মোহে॥
আজ্ঞা মানি সূচ দুটি যাইয়া আনিলা।
সাধু নিজ চক্ষে তাঁরে বিন্ধিতে কহিলা॥
পুনঃপুন আজ্ঞা না লঙ্ঘিতে পারি বিন্ধে।
বণিক্ দেখিয়া খেদ করে নিরানন্দে॥
আজ্ঞাক্রমে পুন সেই সরোবরতীরে।
হস্ত ধরি লইয়া রাখিলা ধীরে ধীরে॥
কৃষ্ণভজনের বাধা করিতে প্রবর্ত্ত।
যেহেতু ইন্দ্রিয় নষ্ট কৈলা শুভ-ব্রত॥
কৃষ্ণ-দরশন-রাগে চলে বৃন্দাবনে।
অনুরাগচক্ষু যার কি করে নয়ানে॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রূপ-গুণ মধু মাতি।
ক্ষণে হাসে কান্দে গায় ক্ষণে পড়ে ক্ষিতি॥
মাতোয়ার প্রায় থরথর করি চলে।
বর্ণয়ে মধুর গীত ভাসে অশ্রুজলে॥
যে গীত-অমৃতে ত্রিভুবন পুলকিত।
কৃষ্ণকর্ণামৃত নাম অদ্যাপিহ স্থিত॥
বৃন্দাবন গিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটে।
বসি কৃষ্ণপ্রাপ্তি আশা গুজরার ঘাটে॥
ভকতবৎসল কৃষ্ণ দয়ার্দ্র হইয়া।
বিল্বমঙ্গলেরে কহে সম্মুখে আসিয়া॥
রৌদ্রে কেন বসি ভাব, ভোখে (খ) কেনে রহ।
ছায়াতে আসিয়া বৈস, আহার করহ॥
তেঁহো কহে অন্ধ মুঞি দেখিতে না পাই।
কে তুমি স্বরূপে কহ তবে আমি যাই॥
কৃষ্ণ কহে গ্রামী গোপশিশু হই মুঞি।
মাতা অন্ন দিয়া পাঠাইলা তব ঠাঞি॥
শ্রীঅঙ্গ-সদগন্ধে আর সুমিষ্ট বচনে।
সাধু অনুভাবে-তত্ত্ব জানি গেলা মনে॥
আনন্দ উৎকণ্ঠা আর হিয়া গুরুগুরি।
সাপটিয়া ধরিব যে মনে আশা করি॥

পাঠান্তর—(ক) গমন—প্রবেশ।
(খ) হেনকালে—এইকালে।
(গ) তক—ত্বক্।
(ঘ) অসূয়—অপ্রীয়।

পাঠান্তর—(ক) এতো কহি সেই—এতেক বিচারি।
(খ) ভোখে—ভুকে।

কহে তবে হাথ ধরি বৃক্ষছায়ে লহ।
অন্ন আনিয়াছ কোথা খাই তবে দেহ॥
কৃষ্ণ দূরে থাকি বাম হস্ত বাড়াইয়া।
তর্জ্জনী ধরিতে কহে মুচকি হাসিয়া॥
আহা মরি সেই ভঙ্গী সেই মন্দহাসি।
ধিক্ ধিক্ কোটিচন্দ্রে কোটি সুধারাশি॥
ছল করি কহে সাধু কই কোথা তুমি।
হের আইস কোথা হস্ত নাহি পাই আমি॥
পুন কিছু হাত বাড়াইলা ভঙ্গী করি।
সাপটিয়া ধরে সাধু অতি দ্রুত করি॥
সুদারিদ্র যেন পরশমণি পথে পায়।
মরিলে পুনশ্চ যেন দেহে প্রাণ পায়॥
বহুকাল ক্ষুধার্ত্ত পাইয়া সুধারাশি।
যেমত আনন্দ পায় তেমতি পরশি॥
কৃষ্ণ কহে ছাড় মোরে মুঞি ঘরে যাই।
কি কারণে ধর তুমি কহ করি (ক) তাই॥
তেঁহো কহে হেন হস্ত ছাড়িতে কি পারি।
বান্ধিয়া রাখিব আজু হৃদয়-মাঝারি॥
বহুদুঃখে অনেক সাধনে হেন ধন।
পাইয়াছি যদি বা ছাড়িব কি কারণ॥
পর কি পরের দুঃখ বুঝয়ে কখনো।
তুমি সে এমন (খ) কভু না দেখি এমনো॥
নিজহানি নাহি পরদুঃখ-বিমোচন।
দরশন দিয়া মাত্র তাহো না করণ॥
তথাপিহ কৃষ্ণ করে হাথ টানাটানি।
চোরা যেন নাহি মানে ধর্ম্মের কাহিনী॥
সাধু যদি শক্ত করি শ্রীহস্ত ধরিলা।
আহা মরি বাজে বলি শঠতা করিলা॥
বেদনা লাগিব বলি সাধু চমকিলা।
যে-হেতুক হস্ত শ্লথ পাই পলাইলা॥
ফাঁফর হইয়া সাধু কহিতে লাগিলা।
এ বড় আশ্চর্য্য নহে হাথ ছুড়ি (গ) গেলা॥

পাঠান্তর—(ক) করি—মোরে।
(খ) এমন—যেমন অথবা কেমন।
(গ) ছুড়ি—ছাড়ি।

হৃদয় হইতে যদি পারহ যাইতে।
তবেত গণিয়ে মুঞি পৌরুষ তোমাতে॥

তদুক্তশ্লোকঃ—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য (ক) যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

অনুবাদ।—হে কৃষ্ণ! বলে হাত ছাড়াইয়া তুমি চলিয়া গেলে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। যদি আমার হৃদয় হইতে যাইতে পার তবেই তোমার পৌরুষ বুঝিব।

তবে স্নেহে কৃষ্ণ পুন কহে নিজভক্তে।
ছায়াতে আইস এই মোর সাথে সাথে॥

ত্রিপদী ছন্দ

কৃষ্ণ দূরে দূরে যায়, সাধু পাছে পাছে যায়,
চক্ষু অন্ধ না পায় দেখিতে।
চুম্বকমণির সাথে, লৌহ স্বাভাবিক রীতে,
যেন ধায় যায় তেন-মতে॥
বসাইয়া বৃক্ষতলা, দুগ্ধ অন্ন আনি দিলা,
তেঁহো কহে কভু না খাইব।
যদি মোরে একবার, দেখাও রূপের ভার,
তবে যাহা কহ সে করিব॥
কৃষ্ণ কহে কি দেখিবে, দেখিলে বা কি হইবে,
গোপ-শিশু কভু দেখ নাই।
সাধু কহে কিবা কহ, না বুঝিয়া প্রলপহ,
গোপসনে কার্য্য যে সদাই॥
হাসিয়া নিকটে যায়, পুন কৃষ্ণ পিছে ধায়,
আনন্দে কৌতুক ভক্তসনে।
নানান কৌতুক রসে, খেলয়ে পরমোল্লাসে,
সাধু হৃদি হয়ে বিদারণে॥
সম্মুখে বাঞ্ছিত নিধি, দেখিতে না পায় সুধী,
চক্ষু অন্ধ মনে ধকধকি।
আন্ধার ঘরেতে যেন, কালসর্প হয় তেন,
উৎকণ্ঠিত আশা লকলকি॥

পাঠান্তর—(ক) হস্তমুৎক্ষিপ্য—হস্তমাক্ষিপ্য।

কহে অহে কৃষ্ণ ধৃষ্ট, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর-শ্রেষ্ঠ,
দয়া নাহি তিল আধ তোমা।
দরশনমাত্রে যদি, রক্ষা পায় হত বিধি (ক),
গতপ্রাণ দেহ (খ) হয় সমা॥
তাহে তব কিবা খেতি, কিবা লাগে কিবা বেথি,
কিবা হাসো চাঞ্চল্য প্রকাশো।
পুন কহে অহে নাথ, করি বহু প্রণিপাত,
উপায় কি তাহা মোহে ভাষো॥
মোর নিন্দাবাক্য শুনি, রুষ্ট হৈলে হেন মানি,
তবে এই (গ) স্তুতি করি শুন।
এতো কহি স্তব পুন, করয়ে উন্মত্ত যেন,
প্রলাপয়ে ধায় উঠি ঘন॥
কৃষ্ণচন্দ্র মৃদু হাসি, শশীর আনন্দরাশি,
কৌতুকী হইয়া পুন কহে।
কালোরূপ কি দেখিবে, তাহে বা কি সুখ পাবে,
বর মাগ সুখৈশ্বর্য্য যাহে॥
শ্রীবিল্বমঙ্গল কহে, কি দিয়া ভুলাবে মোহে,
কি ধন তোমার আর আছে।
ভুক্তি মুক্তি যেবা হয়, ভক্তির যে চেড়ীদ্বয়,
পদ সেবি ফিরে পাছে পাছে॥
হেন ভক্তি ঠাকুরাণী, প্রেম-রতন-মণি (ঘ),
অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া।
মো হৃদয়-সিংহাসনে, বৈসে চেড়ীগণসনে,
অতএব ভুলাবে কি দিয়া॥
যদি মোরে কৃপা কর, দান কর এই বর,
মোর দুটি চক্ষুদান দিয়া।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম হৈয়া, মুরলী বদনে দিয়া,
সম্মুখে দাণ্ডাও দেখাইয়া (ঙ)॥

তবে কৃষ্ণচন্দ্র নিজ, সুধাময় করাম্বুজ,
দয়া করি চক্ষে বুলাইলা।
অপ্রাকৃত দেহ সেই, দিব্যচক্ষু হৈল দুই (ক),
কৃষ্ণরূপ-পানের পিয়ালা॥
সম্মুখে রূপের রাশি, নিন্দিয়া অসংখ্য শশী,
হেরি অচেতনে পড়ে ভূমে।
পুলকাশ্রু আদি করি, অষ্ট অনুভাব ভরি,
উঠে পড়ে নাচে গায় ক্রমে॥
এইরূপ দরশনে, নানাগুণ-বরণনে,
পরম আনন্দে দিন যায়।
কৃষ্ণ নিজ-ভুক্ত-শেষে (খ), দুগ্ধ অন্ন স্নেহাবেশে,
দোনা ভরি নিত্যানি যোগায়॥
দৈবযোগে সেই রামা, চিন্তামণি বেশ্যানামা,
কৃষ্ণকৃপা তাহার উপরি।
সকল করিয়া দূরে, কৃষ্ণপ্রেমাবেশভরে,
আসি মিলে বৃন্দাবনপুরী॥
সুবৈরাগ্য অনুরাগে, শ্রীবিল্বমঙ্গল-আগে,
আসিয়া মিলিলা চমকিতে।
শ্রীবিল্বমঙ্গল তবে, বর্ত্মোদ্দেশি[১] (গ) গুরুভাবে,
প্রণমিলা বহু ভক্তিরীতে॥
কৃষ্ণদত্ত অন্নদোনা, মিষ্টান্ন পক্বান্ন নানা,
খাইতে দিলেন যত্ন করি।
চিন্তামণি কহে মুঞি, খাইতে তোমার ঠাঁঞি,
নাহি আইনু অন্ন হরি হরি (ঘ)॥
কৃষ্ণকৃপা তোমা'পরি, তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী,
জগত শুধিতে পার হেলে।
শরণ লইনু মুঞি, আর কিছু নাহি চাই,
কৃষ্ণ মোরে দেখাও বিরলে॥

পাঠান্তর—(ক) বিধি—নিধি।
(খ) দেহ—দেহে।
(গ) এই—এবে।
(ঘ) প্রেম-রতন-মণি—প্রেম-ধন-রত্নমণি।
(ঙ) দেখাইয়া—দেখা দিয়া।

পাঠান্তর—(ক) দুই—তেঁই।
(খ) ভুক্ত-শেষে—ভুক্তশেষে।
(গ) বর্ত্মোদ্দেশি—রত্নদর্শী।
(ঘ) হরি হরি—হেথা হেরি।
১। বর্ত্মোদ্দেশি—পথপ্রদর্শক।

এতো কহি চিন্তামণি, কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী,
প্রেমাবেশে পড়য়ে ঢলিয়া।
শ্রীবিল্বমঙ্গল সাধু, হেরি তার প্রেমসিন্ধু,
আনন্দে মগন হৈল হিয়া॥
আশ্বাসয় বহু বোরি, কৃষ্ণকৃপা তোমা'পরি,
অবশ্য দিবেন দরশন।
এতো কহি কৃষ্ণস্থানে, সটেপটে শ্রীচরণে,
ধরিয়া করিলা দৃঢ় পণ॥
চিন্তামণি অধিকারী, ভক্ত-অনুরোধ ভারি,
দুই তত্ত্বে দিলা দরশন।
অহো কি আশ্চর্য্য কথা, প্রফুল্ল সৌভাগ্য লতা,
দুজনার একুই সমান॥
সেই দোঁহাকার পদ, ছাড়িয়া বিষয়-মদ,
সেবন করিব প্রেমাবেশে।
হেন দশা কবে হবে, কবে বিধি পুরাইবে,
মনের মানস লালদাসে॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীজয়দেব-আদি-ভক্ত-গুণ-বর্ণনং নাম দ্বাদশ-মালা ॥ ১২॥

ত্রয়োদশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীভাবুক ব্রাহ্মণ

গোকুলেতে স্থিতি বিপ্র ভাবুক আখ্যান।
বাল্য-উপাসক হয়ে (ক) শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
শুদ্ধমাধুর্য্য বাৎসল্যভাবে (খ) সেবে।
অনন্য-ভকতি মতি ভজে একভাবে॥
অপুত্রক বিপ্র পুত্রভাবে (গ) ভজে হরি।
সদাই মানসপথে স্নেহাবেশ করি॥
ভজিতেই ভাবসিদ্ধি (ঘ) বিপ্রের হইল।
বাল্যরূপ পুত্রভাবে সাক্ষাত হইল॥
আকাশের চান্দ যেন করেতে পাইলা।
আনন্দসাগরে বিপ্র মগন হইলা॥
প্রেমেতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান শিথিল হইয়া।
শুদ্ধমাধুর্য্য ব্রজানুগা-ভাব পাইয়া॥
লালন পালন করে পুত্র করি জ্ঞান।
ক্রোড়ে বসাইয়া অন্ন করায় ভোজন॥
নানা অলঙ্কার বস্ত্র মাল্য পরাইয়া।
সুবেশ করয়ে নাসায় তিলক রচিয়া॥
চুম্ব আলিঙ্গন করে নাচায় কাচায়।
স্নেহানন্দসিন্ধু বিপ্র দেহে না আমায় (ঙ)॥
যেখানে যে দ্রব্য ভাল দেখয়ে সম্মুখে।
গোপাল-কারণ আনি যত্ন করি রাখে॥

পাঠান্তর—(ক) বাল্য-উপাসক হয়ে—বাল্যভাবে উপাসক।
(খ) শুদ্ধমাধুর্য্য বাৎসল্যভাবে—শুদ্ধ বাৎসল্য সেই মাধুর্য্যভাবে।
(গ) পুত্রভাবে—পুত্রবত ভাবে।
(ঘ) ভাবসিদ্ধি—ভাবসিদ্ধ।
(ঙ) আমায়—আশায়।

নাটিম ঝুম-ঝুমি গেন্ডু ভাঁটা রাঙ্গাকাড়ি।
কন্যা-বর মৃত্তিকার ভাঁড় হাঁড়িকুঁড়ি॥
খেলনা খেলিতে দেয় আনন্দিত মনে।
কোলে করি নাচায় অশ্রু বহয়ে নয়ানে॥
দিবানিশি নাহি জানে গোপাল পাইয়ে।
কোটি ব্রহ্মানন্দ যার সমান না হয়ে॥
রাত্রে ক্রোড়ে করি বিপ্র করয়ে শয়ন।
হাথ চাপড়িয়া অঙ্গে নিদ্রা করায়েন॥
একদিন রাত্রে ঘরে বিড়াল ডাকয়ে।
গোপাল নিদ্রা না যায় চমকি উঠয়ে॥
ক্ষণে ক্ষণে বিপ্রের গলা জড়িয়া (ক) ধরয়ে
কেনে কেনে বলি সাধু বক্ষঃস্থলে লয়ে॥
গোপাল কান্দিয়া কহে মোরে ভয় করে।
অই যে কি ডাকে দেখ ঘরের ভিতরে॥
কোলের ভিতরে দাবি[১] ব্রাহ্মণ কহয়।
না না না না ভয় নাই বিড়াল ডাকয়॥
পুনর্ব্বার আর দিন ঐমত ডরিল (খ)।
ভরসা-বচনে তেঁহো লালন করিল॥
এক দিন দ্বিজে কিবা দুর্দ্দৈব ঘটিল।
ঐশ্বর্য্য ভাব (গ) আসি উদয় হইল॥
মনে মনে ভাবে বিপ্র এ কি অদভুত।
ত্রৈলোক্যের নাথ কৃষ্ণ ঈশ্বর অচ্যুত॥
দেবের দেবতা বিভু কালের যে কাল।
ভয়ের যে ভয় হয়ে যমের করাল॥
বিড়ালের ডাকে ঞিহো ভয় পায় কেনে।
মুগধ-বালক-প্রায় কান্দে কি কারণে॥
এতেক ভাবিয়া বাল্যভাব দূরে গেলা।
ঐশ্বর্য্যভাবেতে স্তুতি করিতে লাগিলা॥

পাঠান্তর—(ক) জড়িয়া—চাপিয়া।
(খ) ঐমত ডরিল—ঐ মতি ডুরিল।
(গ) ঐশ্বর্য্য ভাব—ঐশ্বর্য্যের ভাব।
১। দাবি—চাপিয়া।

ভাবান্তর বুঝি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা।
হাহাকার করি বিপ্র ভূমেতে পড়িলা॥
নিধিহারা রঙ্ক[১] যেন মণিহারা ফণী।
শিরে করাঘাত হানে (ক) উচ্চ করি ধ্বনি॥
দৈববাণী হৈল তবে ব্রাহ্মণের প্রতি।
এতে তব হৈল অন্য ভাবান্তর মতি॥
অতএব পুন দেখা না পাবে এ দেহে।
দেহ-অন্তে পাবে মোরে নাহিক সন্দেহে॥
দৈববাণী শুনি তবে স্থির হৈল মন।
সেইদিন নিরখিয়া রহিলা ব্রাহ্মণ॥
অতেব ঐশ্বর্য্যভাবে কৃষ্ণ নাহি পাই।
এই দেহে উৎকট মাধুর্য্য পাইল যেই॥
পুন ভাবান্তরে পুন অন্তর্দ্ধান কৈলা।
দেহান্তে স্বমতে সাধু ব্রজে কৃষ্ণ পাইলা॥
ঐশ্বর্য্যভাবেতে অন্যধাম-প্রাপ্তি হয়।
মাধুর্য্যভাবেতে ব্রজপুরে কৃষ্ণ পায়॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর চারি রস।
ব্রজে উপাসনা রতি কৃষ্ণ যাহে (খ) বশ॥
কেবল যে বিধিমার্গে ভজয়ে কৃষ্ণেরে।
মহিষীত্ব প্রাপ্ত হয়ে দ্বারকাদিপুরে॥

যামলে—

"রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে।
কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে॥

অনুবাদ।–যিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সুষ্ঠুভাবে রমণ কামনা করিয়া শুধু বিধিমার্গ অবলম্বনে তাঁহার সেবা করেন, তিনি দ্বারকাপুরে মহিষীত্ব লাভ করিতে পারেন।

প্রিয়-আত্মা-পিতৃ-সখা-গুরু-দৈব-মিত্র।
সুহৃদ-ইষ্ট-পতি-ভ্রাতৃ প্রেষ্ঠ আদি পুত্র॥
কোনো ভাবে চিন্তে যেই সেই হয়ে মুক্ত।
প্রাপ্তির বিশেষ ধাম যথা ভাবযুক্ত॥

শ্রীভাগবতে—

"ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে,
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ,
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥"

অনুবাদ।—(মাতা দেবহূতির প্রতি **কপিলদেবের** উক্তি) হে শান্তরূপে, আমি যাহাদের প্রিয়, **আত্মা, পুত্র,** সখা, গুরু, বন্ধু ও অভীষ্ট দেবতা, আমার **সেই ভক্তেরা** কখনও বিনাশপ্রাপ্ত (বৈকুণ্ঠে ভোগ বা **আনন্দ রহিত**) হয় না। আমার **কালচক্র** (অনিমিষ হেতি) **তাহাদিগকে** কখনও গ্রাস করে না।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

"পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥"

অনুবাদ।—এই সংসারে যাঁহারা **শ্রীহরিকে** পতি, **পুত্র,** সুহৃদ, ভ্রাতা, পিতা বা **বন্ধুর** মত ভাবিয়া **সর্ব্বদা উদ্যুক্ত** হইয়া ধ্যান করেন তাঁহাদিগকেও বার বার **নমস্কার**।

ভাবুক-ব্রাহ্মণ-সাধু-চরিত্র বর্ণিল।
আনুষঙ্গে রতি স্থূল কিঞ্চিত কহিল॥

চরিত্র শ্রীসুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ

সুবুদ্ধি নামেতে বিপ্র সুন্দর প্রকৃতি।
শ্রীবিগ্রহসেবা তাহে শুদ্ধ মতি-রতি॥
অন্ন-ব্যঞ্জন-আদি নানান প্রকারে।
পরম যতনে ভোগ লাগায় ঠাকুরে॥
ঠাকুরেরে কহে চুপ করি কেনে রহ।
হস্তে করি তুলি কেনে বদনে না দেহ॥
প্রতিদিন কহে সাধু ঠাকুর না শুনে।
আর দিন বিপ্র কিছু কহে ক্রোধমনে॥
নিত্য নিত্য এতেক করিয়া পাক করি।
দেখাইয়া নাহি খাও করিয়া চাতুরী॥
লবণ কি অলবণ স্বাদু কি বিস্বাদ।
কিছুই না কহ করি মোর সনে বাদ॥

পাঠান্তর—(ক) হানে—করি।
(খ) যাহে—তাহে।
১। রঙ্ক—দরিদ্র, কৃপণ।

অতএব আজি খাইতে না দিব তোমারে।
পাক করি আজি খাওয়াইব যে শিবারে (ক)॥
তোমার সাক্ষাতে তুমি চাহিয়া থাকিবে।
ক্ষুধায় কাতর হইয়া তখন বুঝিবে॥
এত কহি পাক করি ঠাকুর-নিকটে।
আনিয়া কহয়ে মিছা করিয়া কপটে॥
ধমকায় ঠাকুরেরে কপট করিয়া।
কোনমতে খান যদি তরাস পাইয়া॥
তোমারে না দিব এই শিবারে (খ) খাওয়াই।
নতুবা তুলিয়া খাও বলিহারি যাই॥
তথাপি না খাইলা যদি সক্রোধ হইয়া।
কহে এই দেখ শিবায় (গ) দেই খাওয়াইয়া।
গন্ধ তব নাকে নাহি প্রবেশিতে দিব।
নাসিকার রন্ধ্রে তুলা দিয়া বুজাইব॥
এত কহি ছুটিয়া যাইয়া তুলা আনি।
দুই নাসারন্ধ্রে চাপি ধরয়ে অমনি॥
ভকত-চরিত্র দেখি দয়াল শ্রীহরি।
হাসিয়া উঠিলা তবে কৌতুক নেহারি॥
আমি এই খাই অন্য কারে নাহি দিহ।
অন্নাদি সামগ্রী মোর নিকটে আনহ॥
ভকত (ঘ) ব্রাহ্মণ কৃতকৃতার্থ মানিঞা।
ঠাকুর-সম্মুখে অন্ন দিলেন আনিঞা॥
হাসিয়া হাসিয়া কর-কমলে আপন।
খাইতে লাগিলা বিপ্র হেরিয়া মগন॥
প্রেমানন্দ-সাগরেতে মগন হইয়া।
হাসে কান্দে নাচে গায় দু'বাহু তুলিয়া॥
স্মরণাদি (ঙ) শ্রীচরণ সেবয়ে আনন্দে।
পরমসুখেতে কাল যায় সদানন্দে॥
তাঁহার চরণে কোটি দণ্ডবত করি।
দুঢ়তর মূঢ় অন্ধকার হৈতে তরি॥

পাঠান্তর—(ক) শিবারে—শিবেরে।
(খ) শিবারে—শিবেরে।
(গ) শিবায়—শিবে।
(ঘ) ভকত—ভাবুক।
(ঙ) স্মরণাদি—শরণাদি অথবা শয়নাদি।

চরিত্র শ্রীমৌনী রাজপুত্র

জন্মিয়া অবধি এক রাজার তনয়।
বাক্য নাহি কহে জড়ভরতের প্রায়॥
কৃষ্ণচরণারবিন্দে মনের সংযোগ।
জাতিস্মর হয়ে নাহি বুঝে কেহো (ক) লোক॥
এক পুত্র রাজার তাহাতে মৌনব্রত।
খেদান্বিত উপায় চেষ্টয়ে কতমত॥
একদিন সৈন্যসামন্তগণ সহে।
মৃগয়াতে পাঠাইলা যদি বাক্য কহে॥
বনে গিয়া এক জমাদার অস্ত্রধারী।
চোট হানে এক মৃগ-গর্ভিণী উপরি॥
উদর কাটিয়া (খ) বাচ্ছা-সহ মৃগী মরে।
রাজপুত্র দয়ার্দ্র হইয়া হা হা করে॥
কহে হা হা কিবা দোষে ইহারে মারিলা।
জমাদার বাক্য শুনি মুচকি হাসিলা॥
গৃহে আসি আনন্দিতে (গ) রাজারে কহিলা।
রাজা শুনি হর্ষচিত্তে পুত্রে বোলাইলা॥
রাজা পুনঃপুন পুছে কিন্তু নাহি কহে।
জমাদার প্রতি রাজা কোপদৃষ্টে চাহে॥
হাঁরে মিথ্যাবাদী মোরে মিথ্যা শুনাইলি।
ভয় না মানিলি বুঝি বিদ্রূপ করিলি॥
যদ্যপি বালক বাক্য কহিত তখন।
তবে কোন জিজ্ঞাসিলে না কহে এখন॥
তবে রাজা জমাদারের মস্তক-চ্ছেদনে।
আজ্ঞা দিলা ক্রোধাবেশে ভৃত্যবর্গগণে॥
জমাদার ভাবে এ তো বড়ই বিপদ।
রাজপুত্র-স্থানে বহু করে কাকুবাদ॥
বাক্য কহ মহারাজ মোর প্রাণ রাখ।
পর-উপকার লাগি একবার ভাখ[১]॥
অনেক প্রকার জমাদার স্তুতি কৈল।
অল্পাক্ষরে কিছু রাজকুমার কহিল॥

পাঠান্তর—(ক) কেহো—কোন।
(খ) কাটিয়া—ফাটিয়া।
(গ) আনন্দিতে—আনন্দেতে।
১। ভাখ—কথা বল। (ব্রজ)।

বোলাতোমুয়া এই শব্দ উচ্চারিয়া।
পুন মৌনে রহে হেট মস্তক করিয়া॥
রাজা আহ্লাদিত-হিয়া লজ্জিত হইয়া।
জমাদারে পুরস্কার করয়ে তুষিয়া॥
পুত্রেরে কহয়ে বাপু কি কহিলে কহ।
কহিলে তো বাক্য তবে কেনে মৌনে রহ॥
বহু যত্ন কৈল রাজা তভু না কহিল।
সভাসদগণে প্রশ্ন করিয়া পুছিল॥
বোলাতোমুয়া এই শব্দ যে কহিল।
ইহার কি অর্থ সভে বিচারিয়া বল॥
বিচারিয়া কহে সভে নৃপতির আগে।
বোলোতোমুয়া ইথে বহু অর্থ লাগে॥
সামান্যত জল্পে রজগুণ আদি জন্মে।
পরনিন্দা আদি ছলে উপজয়ে তমে॥
রাজস্থলে বাক্যদ্বারে দণ্ড অর্হ (ক) হয়।
মিথ্যাবাক্য আদি ভ্রমে নরকেতে যায়॥
গুরু বৈষ্ণবের স্থানে অপরাধ হয়।
সর্ব্বনাশ হয় আর ধর্ম্ম যায় ক্ষয়॥
অতএব সর্ব্বোত্তম মৌন যেই হয়।
কহিলেই মরে এই ইহার আশয়॥
রাজা কহে কৃষ্ণকথা ছাড়িয়া মউন।
তাহার প্রশংসা কিবা কিবা তাঁর গুণ॥
সভাসদ কহে তাহা না বুঝয়ে মূঢ়।
অভিমানী তপস্যা বুঝয়ে অতি গূঢ়॥
মৌন যে কর্ত্তব্য বটে অন্য অন্য কথা।
কৃষ্ণকথা বক্তব্য অবশ্য যথা তথা॥
শৌনকাদি মুনিগণ দেখ মৌনব্রত।
কিন্তু কৃষ্ণকথার সময় উনমত॥
রাজা কহে মোর পুত্র সাধুর লক্ষণ।
তবে কৃষ্ণকথা বিনে থাকে কেনে মৌন॥
সভাসদ কহে ইহার কারণ আছয়।
অনুভব করি ঞিহো জাতিস্মর হয়॥
জন্মান্তরে ভজন বিষয়ে দাগা পাইল।
সেই ভয়ে নৈষ্ঠিক মউন পণ কৈল॥

পাঠান্তর—(ক) দণ্ড অর্হ—দণ্ড-অর্শ।

আর কিছু কহি যে ইহার অনুমান।
শুদ্ধ বিষয়িসনে (ক) সদা অবস্থান॥
সদংশে কহিতেও বাক্য নিষ্ঠা নাহি থাকে।
অসদংশে কহিবারে মতি নাহি রোখে॥
এ কারণে অন্তর-বৈরাগ্য মৌনে রহে।
ভক্তিরত্ন হারাই হারাই জ্ঞান যাহে॥
তেঁহো মো-পাপীর ভাগ্যে বাক্য কহে যবে।
চরণে ধরিয়া রত্ন কিছু মাগি তবে॥

চরিত্র শ্রীহরিদাস বৈরাগী

বর্দ্ধমান পশ্চিমে মানকর নামে গ্রাম।
তথায়ে অনেক বৈসে তার্কিক ব্রাহ্মণ॥
বিষ্ণুভক্তিহীন (খ) ত্যক্ত-নিজধর্ম্ম শাক্ত।
বৈষ্ণবের দ্বেষ্টা সদা বিষয়ানুরক্ত॥
হরিদাস নামে এক বৈষ্ণব মহান্।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এক গৃহস্থের স্থান।
বৈষ্ণবের সেবক জানিয়া উত্তরিলা।
ভকতিপূর্ব্বকে গৃহস্থ (গ) আতিথ্য করিলা॥
তার্কিক ব্রাহ্মণগণ দুই চারি তথা।
আসিয়া বসিলা কহে নানা গল্পকথা (ঘ)॥
নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান আর ভক্তি।
বিচারপ্রসঙ্গে বিপ্র কহে কটু উক্তি॥
বিপ্রগণ পরাভব হইয়া না হয়।
বিতণ্ডা করিয়া মাত্র কলহ করয়॥
বৈষ্ণবেরে কটু কথা যতেক কহিল।
সাধু তাহে কিছুমাত্র ক্ষোভ না করিল॥
অবোধ ব্রাহ্মণগণ দুষ্কৃতচরিত।
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিন্দে অনোচিত॥
তখন বৈষ্ণবচিত্তে ক্রোধ উপজিল।
ক্রোধাবেশে উঠি এক হুঙ্কার করিল॥
তাহাতে আশ্চর্য্য শুন যে ফল ফলিল।
ব্রাহ্মণগণের দশা যেমত হইল॥

পাঠান্তর—(ক) বিষয়িসনে—বিষয়ীর সনে।
(খ) বিষ্ণুভক্তিহীন—বিষ্ণুধর্ম্মহীন।
(গ) গৃহস্থ—গৃহী এবং গৃহে।
(ঘ) গল্পকথা—গর্ব্বকথা।

নিন্দা করিবার কালে যে ভঙ্গিতে ছিলা।
হাত মুখ নাড়ি যথা শির কাঁপাইলা॥
হুঙ্কারমাত্রেতে সেই ভঙ্গিতে রহিলা।
সাধু স্বেচ্ছাময় অন্যত্তর উঠি গেলা॥
বাক্য নাহি কহে বিপ্র ঘরে নাহি যায়।
অন্যে কেহ জিজ্ঞাসিলে উত্তর না দেয়॥
পিতা মাতা আসি হেরি কান্দিতে লাগিলা।
শিষ্টলোক তথা যেই যেই বসি ছিলা॥
তাঁহারা যে বিবরণ সকলি কহিলা।
বৈষ্ণবের অপমান অনেক করিলা॥
সেই অপরাধে এই প্রকার হইল।
তাঁহা বিনে ইহা-সভার না হইবে ভাল॥
তবে সেই বৈষ্ণবের তলাস লইতে।
গ্রামে গ্রামে গেলা সব ব্রাহ্মণগণেতে॥
কোন স্থানে গিয়া লাগ পাইয়া বৈষ্ণবে।
চরণে ধরিয়া তুষ্ট কৈলা বহু স্তবে॥
ব্রহ্মহত্যা হয় তার উপায় কি কহ।
বৈষ্ণব কহয়ে আছে উপায় করহ॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীচরণে।
শরণ লহগা গিয়া নিষ্কপট-মনে॥
সম্প্রতি গ্রামে যে তব তালপুখরিয়ে।
তাহার তলেতে (ক) এক বৈষ্ণব আছয়ে॥
তাঁহার চরণামৃত লইয়া খাওয়াও।
এখনি যে ভাল হবে উদ্বিগ্ন না হও॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে সে যে ডোমজাতি হয়।
কর্ণে হস্ত দিয়া পুন বৈষ্ণব কহয়॥
তোমরা তো বিজ্ঞ হও শাস্ত্র দেখিয়াছ।
তবে কেনে হেন বেদ-বিরুদ্ধ কহিছ॥
চণ্ডাল হইয়া যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হৈতে শ্রেষ্ঠ বেদে কয়॥
ইহার প্রমাণ সাধু অনেক কহিল।
বিপ্রগণ শুনি তাহা কিঞ্চিত রিঝিল১ (খ)॥

সাধুদরশন-ফল ফলে দেখ ক্রমে।
সেই বাক্য তোলাপাড়া করি চিত্ত ভ্রমে।
শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলে।
তৎক্ষণাত রতি হৈল সাধু কৃপাবলে॥
তথা হৈতে আসি তালপুষ্করিণীর পাড়ে।
দাণ্ডাইয়া যুক্তি করে তালবৃক্ষ আড়ে॥
কেহ বলে গুপ্তে ইহার পাদ ধোয়াইয়া।
আনহ ত্বরিতে মোরা থাকি দাণ্ডাইয়া॥
কেহ বলে একি কথা ভয় কারে কর।
আমি তো অই পথে যাব কারে নাহি ডর॥
এতো কহি সেই বৈষ্ণবের চরণামৃত।
অপরাধিগণে আনি দিলা সভে দ্রুত॥
তৎক্ষণাত উপদ্রব-শান্তি যে হইল।
বৈষ্ণব-মহিমা দেখি চমৎকার হৈল॥
সেই হৈতে গ্রামশুদ্ধ বৈষ্ণব হইল।
শ্রীচৈতন্য-পদদ্বন্দ্বে শরণ লইল॥
ঘরে ঘরে মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশিল।
বৈষ্ণবচরণামৃত একান্ত করিল॥
মহামহোৎসব ঘটা হইতে লাগিল।
প্রভুর কৃপার এক তরঙ্গ উঠিল॥
তথা শ্রীমান্ সনাতন গোস্বামীর শাখা।
জীবন নামেতে যাঁর (ক) গুণে নাই লেখা॥
তাঁর গুণ কর্ম্ম যশ পশ্চাতে বর্ণিব।
তাঁর পরিবার অই গ্রামে হৈল সব॥
অতএব সাধুসঙ্গ লবের মহিমা।
প্রত্যক্ষে (খ) দেখহ শাস্ত্রে করে যে গরিমা॥
নিগ্রহ করিতে সাধু অনুগ্রহ করে।
এমতি (গ) দয়ার নিধি বৈষ্ণবঠাকুরে॥
না জানি কেমন অপরাধ মোর হয়।
ঘৃণা করি মোর প্রতি কেহ না হেরয়॥
হরিদাস ঠাকুর সেই ব্রাহ্মণসজ্জন।
কৃপা কর মোরে মুঞি লইনু শরণ॥

পাঠান্তর—(ক) তলেতে—তীরেতে।
(খ) রিঝিল—বুঝিল।
১। রিঝিল—আনন্দিত হইল।

পাঠান্তর—(ক) যাঁর—তাঁর।
(খ) প্রত্যক্ষে—প্রত্যক্ষ।
(গ) এমতি—এমন।

চরিত্র শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামী

শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামী পৃথিবীর রত্ন।
কলির জীবের হিতে কৈলা বহু যত্ন॥
শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র অমৃতসাগর।
তাহা মথি উদ্ধারিলা সুধা পরাৎপর॥
বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী পরম পদার্থ।
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যাহা বিনে নাহি অর্থ॥
নিষ্কাম নির্ম্মোহ প্রেমানন্দাকারাকার।
শ্রীমান্ পুরী গোসাঞি মহাগুণের সাগর॥
কাশীপুরে বাস মাত্র ভক্তিপরায়ণ।
ভুক্তি-মুক্তি-আদি কিছু না করে গণন॥
পুরুষোত্তমে জগন্নাথ হয়ে মহারঙ্গী।
শ্লেষ করি পুরী প্রতি কৈলা এক ভঙ্গী॥
সেবকগণেরে প্রভু আদেশ করিলা।
ব্যঙ্গে কিছু পুরী প্রতি কহিতে কহিলা॥
কাশীতে আছয়ে পুরী তাঁরে গিয়া কহ।
ভুক্তি-মুক্তি আশে বুঝি তথায় আছহ॥
মুঞি বনচারী মোর কি অর্থ আছয়ে।
দেখিতে বাসনা করি যদি মত হয়ে॥
এইমত কৃপাবাক্য যাইয়া কহিলা।
শুনিঞা আনন্দে পুরী কহিতে লাগিলা॥
ভুক্তি দূরে রহু যেই মুক্তি চতুষ্টয়।
কোটি বৈকুণ্ঠের সুখ যতেক বিষয়॥
যে হৈতে শুনিল নাম জগন্নাথ কৃষ্ণ।
সেই হৈতে জগতে না মানি কিছু ইষ্ট॥
তেঁহো কে তাঁহার তত্ত্ব কিছু না জানিনু।
কিন্তু অই নাম-রত্ন হৃদয়ে পরিনু॥
কে জানয়ে কাশী গয়া কে জানে মথুরা।
অই নাম-রত্নমালা গলে কৈনু হারা॥
ত্রিজগতে যেই রত্ন সভে করে লোভ।
পাছে হারা হই সদা মনে হয় ক্ষোভ॥
যেখানে সেখানে বুলি গলায় গাঁথিয়া।
তেঁহো যদি বোলাইলা দেখিব যাইয়া॥
তেঁহো বনচারী সত্য কি ধন আছয়।
যে ধন চাহিব তাহা ধর্য়োছি হৃদয়॥
আপনা মহত পদ যে ছিল তাঁহার।
বন্ধক রাখিলা তাহা কাছে গোপিকার॥
তবে রূপরাশি এক অক্ষয় অব্যয়।
যে আছে তাঁহার এই দেখিব আশয়॥
কৃপা করি তেঁহো যদি বোলাইলা মোরে।
শ্রীঅঙ্গের মালা এক পাঠান আমারে॥
তবে জানি তাঁর পূর্ণ কৃপা মোরে হয়।
শ্রীচরণ পাব ইহা ভরসা জন্ময়॥
এ সব কাহিনী লোক যাইয়া কহিলা।
শ্রীঅঙ্গের রত্নমালা দিয়া পাঠাইলা॥
প্রভু এক রত্নমালা পুরীর স্থানেতে।
চাহি পাঠাইলা পুন নিজ অভিমতে॥
মর্ম্ম বুঝি পুরী ভক্তিরত্নাবলী হার।
লইয়া চলিলা হৃদে আনন্দ অপার॥
পুরুষোত্তম গিয়া পুরী দেখি শ্রীচরণ।
প্রেমানন্দে পরানন্দ পাইলা অনুপম॥
রত্নাবলী গ্রন্থ ভেট দিয়া প্রভু-আগে।
পাঠ করি শুনাইলা বহু অনুরাগে॥
পুরী প্রতি প্রভুর যে কৃপামৃতসিন্ধু।
জগ ভরি হয়ে যদি তার এক বিন্দু॥
সব ধন্য হয় তবে তাপত্রয় যায়।
শুদ্ধ পরমানন্দ-প্রেমেতে ভাসায়॥
বুঝি কভু তাঁর বিষ্ঠা-কৃমি না জন্মিনু।
যে-হেতুক হেন রত্নে বঞ্চিত হইনু॥
দন্তে তৃণ করি পুরী-গোসাঞির আগে।
লালদাস দীনহীন কৃপাদৃষ্টি মাগে॥

চরিত্র শ্রীজ্ঞানদেবজী

বণিক্ জাত্যংশে জন্ম শ্রীল জ্ঞানদেব।
ভক্তিবলে বশ কৈলা সেঁহো কৃষ্ণদেব॥
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বেদ পড়য়ে পড়ায়।
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গ্রামে ভৎর্সন করয়॥
শূদ্র হইয়াও বেদ করহ পঠন।
তোর গৃহে কেহো নাহি করিব ভোজন॥

এত কহি গ্রামে লোক কুটুম্ব বারণ।
করি দেওয়াইল কেহ না করে গ্রহণ॥
সাধুর তাহাতে মাত্র কিছু খেদ নাঞি॥
খেদ যে নির্ব্বোধ লোকে তত্ত্ব বুঝে নাঞি॥
হরিদাসগণে অন-অধিকার কিসে।
বুঝাইতে হৈল, নহে মরিবেক রিষে॥
এতেক ভাবিয়া এক ভঁঞিষের গলে।
তুলসীর মালা আর তিলক দিলা ভালে॥
গ্রামেতে লইয়া তারে ফিরায় পথে পথে।
শ্রুতিপাঠ করে ভৈঁস স্বয়ং পড়ে সাথে॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ গ্রামের যতেক।
চমৎকার হৈল সভার জন্মিল বিবেক॥
জ্ঞানদেব-চরণে আসিয়া সভে পড়ে।
অপরাধ লাগিয়া কম্পায়মান ডরে॥
জ্ঞানদেব নম্রভাবে কহে মৃদুস্বরে।
নিবেদন করি কৃপা কর মোর তরে॥
হরির ভকত-চিহ্ন ভেকমাত্র হয়।
তাহা প্রতি কোপ নাহি কর্য় মহাশয়॥
সর্ব্ব-অধিকারী সেই নাহিক সন্দেহ।
হরিভক্তিহীন বিপ্র সর্ব্বানর্হ সেহ॥
অতএব হরিভক্তি সর্ব্বচূড়ামণি।
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা গুণ যাহার বাখানি॥ *
"অপি চেৎ সুদুরাচারো" ইত্যাদি।
"বিবুধাঃ কিং পুনঃ সর্ব্বে" ইত্যাদি॥
পূর্ণ শ্লোক ও অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।
অতএব হরিভক্ত পূজ্যেতে প্রবীণ।
যদ্যপিহ হয় সর্ব্ব-'সদাচার'-হীন॥
বেদে অধিকার সর্ব্বযজ্ঞে অধিকার।
"যন্নামধেয়" শ্লোকে বিশেষ প্রচার॥
সারাৎসার হরিভক্তি বিপ্র কি চন্ডাল।
এই নিষ্ঠা মোর হৃদে রহু জন্মকাল॥

চরিত্র শ্রীত্রিলোচনজী

বণিক্ কুলেতে জন্ম ত্রিলোচন নাম।
অনন্যভকতি কৃষ্ণচরণে নিষ্কাম॥
দয়ার্দ্র-হৃদয় সদা বিষয়-বিরত।
বৈষ্ণব-সেবন যাঁর ঐকান্তিক ব্রত॥
একস্ত্রী মাত্র ঘরে টহলিয়া[১] নাঞি।
সেবাকার্য্য নাহি চলে উদ্বিগ্ন সদাই॥
ভকতবৎসল হরি উদ্বেগ দেখিয়া।
ছদ্মরূপে স্বয়ং আইসে হৈয়া টহলিয়া॥
অতি কৃশ মলিন, মলিন ছিণ্ডা বস্ত্র।
নাহিক দ্বিতীয় বস্ত্র নাহি জলপাত্র॥
দ্বারে আসি বসি রহে কাঙ্গালের ন্যায়।
ত্রিলোচন সাধু তাঁরে দেখিয়া পুছয়॥
কে তুমি বসিয়া হেথা কি তব আশয়।
ভিক্ষা যদি লহ আইস আমার আলয়॥
তেঁহো কহে কাঙ্গাল মুঞি নাহি পিতা মাতা।
টহল বলয়ে যদি করি তবে তথা॥
অন্তর্য্যামী নাম মোর মোরে সভে জানে।
যার যে কর্ম্মের সমে মোরে ডাকি ভণে॥
চারিবর্ণ আশ্রমীর যার যে আশয়।
বুঝিয়া করিতে পারি যে কর্ম্মে লাগয়॥
ত্রিলোচন কহে তবে বেতন কি লবে।
তেঁহো কহে যত খাইতে পারি তাহা দিবে॥
কিন্তু কেহো মন্দ বাক্য কহিলে না রব।
তৎক্ষণাত উঠি যথা মনে লয় যাব॥
সাধু বলে ভাল ভাল মোর ঘরে রহ।
কেহো না কহিবে কিছু তোমারে দুঃসহ॥
বৈষ্ণব-সেবায় তাঁরে নিযুক্ত করিল।
স্ত্রীর নিকটেতে হাথ যুড়িয়া কহিল॥
লোকটি রাখিনু ইহায় প্রণয়ে রাখিবে।
সাবধান কোন মন্দ কথা না কহিবে॥
সে যে টহলিয়া সে তো প্রাকৃতিক নহে।
দেখিতে পুলকে দেহ পরম উৎসাহে॥

---

* ইহার পর কোনও সংস্করণে অতিরিক্ত দুই পঙ্‌ক্তি আছে, যথা—
কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমুখে যে আপনি কহিলা।
ভুবনপাবনী গীতা ভুবি প্রকাশিলা॥

১। টহলিয়া—বাহিরে বাজার ইত্যাদি করিবার ভৃত্য।

সাধু কিছু চিত্তে মর্ম্ম ভাবিয়া না পায়।
ইহারে দেখিতে কেনে অন্তর দ্রবয়॥
বস্তুশক্তি এমতি যাহার যেই গুণ।
স্বাভাবিক প্রকাশয় অধিক বা ন্যূন॥
এইরূপে তের মাস ব্যতীত হইল।
একদিন স্ত্রী তাঁর পড়সীতে গেল॥
পড়সীর স্ত্রীর স্থানে কহে নিন্দা করি।
টহলিয়া রাখিল যে গো তারে আমি হারি॥
কত যে খাইতে পারে তার সীমা নাঞি।
তাহারে সকলি দিয়া আপনে না খাই॥
এইরূপ যবে তেঁহো অনেক কহিল।
দৈবাৎ টহলিয়া তাহা সকলি শুনিল॥
শুনিঞা তৎক্ষণে বিভু অন্তর্দ্ধান হৈল।
সাধু শোকাকুলি হঞা মূর্চ্ছিয়া পড়িল॥
তিনদিন উপবাস কিছু না খাইল।
আকাশবাণীতে প্রভু বৃত্তান্ত কহিল॥
টহলিয়া হই মুঞি ভক্ত-টহলিয়া (ক)।
ভক্তগণের টহল করি যে মুঞি গিয়া (খ)॥
তুমি যে করহ সেবা কিবা আস্বাদনে।
তাহা না হইল মোর জানিতে কারণে॥
বড়ই আস্বাদ বটে করিয়া জানিনু।
তোমার চরিত্রে বড় পিরীতি পাইনু॥
আমারে যে ভজে মাত্র তারে নাহি ভজি।
যে মোর ভক্তেরে ভজে তারে নাহি তেজি॥
এত শুনি সাধু চিত্তে চমৎকার হৈল।
দুঃখিত হইয়া কিছু কহিতে লাগিল॥
মোরে কৃপা করিবে যদ্যপি মনে ছিলা।
তবে কেনে এমন করিয়া কদর্থিলা॥১
ত্রৈলোক্য তোমার দাস, দাসরূপে আইলে।
এ তো কৃপা নহে তব, বঞ্চনা করিলে॥
সে যা হউ একবার দয়া করি মোরে।
দরশন দেহ যদি এ তব কিঙ্করে॥

পাঠান্তর -(ক) ভক্ত টহলিয়া—ভকত টহলা।
(খ) করি যে মুঞি গিয়া—করিতে মুঞি গেলা।
১। কদর্থিলা—কষ্ট দিলে।

তবে জানি তোমার করুণা ভৃত্য প্রতি।
তেঁহো কহে তোমার হৃদয়ে বসি নিতি॥
যখন ভাবিবে মোরে হৃদয়ে দেখিবে।
দেহান্তে আমারে তুমি নিশ্চয় পাইবে॥
অতএব বৈষ্ণব-সেবার যে মহিমা।
প্রকাশ হইল ত্রিলোচনে যার সীমা॥
ত্রিলোচন শ্রীচরণে শরণ লইয়া।
লালদাস মাগে বৈষ্ণবেতে ভক্তিধিয়া॥

চরিত্র শ্রীবল্লভাচার্য্য

বল্লভ আচার্য্য নাম মহান্ পণ্ডিত।
গোকুলে বসতি মন কৃষ্ণে নিয়োজিত॥
শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা স্বয়ং প্রকাশিয়া।
স্থানে স্থানে স্বামীর টীকায় দোষ দিয়া॥
শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গস্থানে গেলা শুনাইতে।
আপন পৌরুষ মানি লাগিল কহিতে॥
শ্রীধরস্বামীর মতে দোষ পড়ে বহু।
তাহা দূষি সদর্থ স্থাপিনু মুঞি পঁহু॥
ইহা শুনি প্রভু দুই কর্ণে হস্ত দিয়া।
নারায়ণ নারায়ণ স্মরণ করিয়া॥
কহেন স্বামীর প্রতি যেই দোষ দেয়।
ভ্রষ্টা করিয়া তারে বেদেতে কহয়॥
এতে শুনি আচার্য্য যে লজ্জিত হইয়া।
গৃহে গিয়া অধোমুখে রহিলা বসিয়া॥
প্রভু মোরে উপেক্ষা করিলা বলি মনে।
অভিমান করিয়া রহিলা সেই দিনে॥
সাধুর স্বভাব দ্বিজ বিচারিলা মনে।
ভাগবতটীকা কৈনু দম্ভের কারণে॥
বিশেষত অন্যের উপরে দোষ দিনু।
কেবল আপন মাত্র গর্ব্ব প্রকাশিনু॥
প্রভু অন্তর্য্যামী মোর অন্তর জানিঞা।
খর্ব্ব করিবারে কহে ভঙ্গি উঠাইয়া॥
এতো ভাবি দৈন্যভাবে প্রভুস্থানে গেলা।
শ্রীচরণে ধরি বহু বিনতি (ক) করিলা॥

পাঠান্তর—(ক) বিনতি—মিনতি।

প্রসন্ন হইয়া প্রভু আশ্বাস করিলা।
স্বতন্তর প্রভু এক লীলা প্রকাশিলা॥
আচার্য্যেরে লক্ষ্য করি সভার শাসন।
জানাইলা স্বামীর যে টীকা অনিন্দন॥
আচার্য্যের টীকা যেই অংশগ্রহ-মত।
এক কর্ম্মে বহু কর্ম্ম সাধয়ে অদ্ভুত॥
আচার্য্য করিলা বহু জনের নিস্তার।
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার॥
তাঁহার সন্তান গোকুলিয়া যে গোসাঞি।
উপাসনা বাৎসল্যেতে হেন আর নাঞি॥

চরিত্র শ্রীভক্তদাস রাজার

ভক্তদাস নাম মহারাজা শুভমতি (ক)।
শ্রীরামচন্দ্রেতে অসাধারণ পিরীতি॥
এক বিপ্রস্থানে সদা রামায়ণ শুনে।
রাজার বিশেষ প্রেম বিপ্র ভাল জানে॥
সর্ব্ব-লীলা-কথা কহে যথা স্রোত বহে।
সীতার হরণ কথা বিপ্র নাহি কহে॥
দৈবাত্ত ব্রাহ্মণ কিছু পীড়িত হইল।
অন্য ব্রাহ্মণদ্বারে (খ) শুনিতে লাগিল॥
রাজার প্রেমের তেঁহো স্বভাব না জানে।
উপস্থিত হৈল সীতাহরণ-আখ্যানে॥
রাবণ হরণ করি সীতা লৈয়া গেল।
শুনিতেই নৃপচিত্তে ক্রোধ উপজিল॥
লেঙ্গা তলোয়ার করি ঘোড়াতে চড়িয়া।
মার মার করিয়া ধাইল লম্ফ দিয়া॥
ক্রোধাবেশে ঘোড়া সহ সমুদ্রে পড়িল।
মৃত্যু না হইল প্রেমামৃতে রক্ষা কৈল॥
হরির চরণে যার প্রণয় সঞ্চরে।
কাল যে পলায় ভয়ে মৃত্যু ভাগে ডরে॥
সমুদ্র তথায় পূজা-সম্মান করিল।
রাজা ক্রোধে বলে রাবণিয়া কোথা বল॥

পাঠান্তর—(ক) শুভমতি—শুদ্ধমতি।
(খ) ব্রাহ্মণদ্বারে—ব্রাহ্মণের স্থানে।

হেনকালে দয়াল শ্রীরামচন্দ্র আসি।
কোটি চন্দ্র জিনি সহ জানকী প্রেয়সী॥
মহাভাগ্যবান্ মহারাজার সম্মুখে।
দাণ্ডাইলা মুচকি হাসিয়া চন্দ্রমুখে॥
তথাচ সংবিত নাহি করে মার মার।
হাসিয়া শ্রীরামচন্দ্র ধরিলেন কর (ক)॥
রাবণিয়া বেটারে যে বধিয়া জানকী।
আনিনু এখনি এই দেখ চন্দ্রমুখী॥
তখন চেতন পাইয়া (খ) সম্মুখে দেখয়।
চমৎকার ত্রৈলোক্যমোহন রূপ হয়॥
অনিমিখে চাহি মনে বিতর্ক করয়ে।
এ কি অপরূপ রূপ চমৎকার হয়ে॥
নব-কাদম্বিনী সহ স্থির সৌদামিনী।
কিংবা মত্ত-অলি সহ বিকচ নলিনী॥
কিংবা নীলকঞ্জ[১] সহ সোণার ভ্রমরী।
অথবা অঞ্জনপুঞ্জে হেমের গাগরি॥
নবঘনে উদিত বা শরদচন্দ্রিকা।
নবীন তমালে কিংবা স্বর্ণের লতিকা॥
এতেক চিন্তিয়া গলদশ্রুধারা বহে।
শতবার মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়য়ে॥
রামচন্দ্র কহেন যে বাঞ্ছা থাকে কহ।
ত্রৈলোক্যে সকলি দিব যাহা তুমি চাহ॥
তেঁহো কহে কি চাহিব তোমায় অধিক।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তাহে ধিক্ ধিক্॥
এই রূপ-রত্নযুগ আমার হৃদয়।
সদা ঝকমক (গ) করে করিয়া উদয়॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় মগ্ন যেন অনন্য-বিষয়।
থাকে নিরন্তর এই প্রার্থনা যে হয়॥
প্রভু কহে 'তথাস্তু' যে তাহাই হইবে।
এখন যে রাজ্য কর পাছে মোরে পাবে॥
তবে কৃপা করি হরি নিজধাম গেলা।
পূর্ণমনোরথ রাজা গৃহেতে আইলা॥

পাঠান্তর—(ক) ধরিলেন কর—হস্ত ধরেন তার।
(খ) পাইয়া—পায়্যা।
(গ) ঝকমক—ডগমগ ও জগমগ।
১। নীলকঞ্জ—নীলপদ্ম।

তাঁহার চরণে কোটি কোটি যে প্রণতি।
যে সৌভাগ্য লাগি ব্রহ্মা শিব আছে ব্রতী (ক)॥

লীলা-অনুকরণ চরিত্র

শ্রীপুরুষোত্তম করে লীলানুকরণ।
নৃসিংহ হইল কেহ কেহ দৈত্য-ভাণ॥
যে অনুকরণ যেই করে সেই সেই।
আবেশ অন্তরে হয় তার সাক্ষী এই॥
নৃসিংহ হইল যেহ হিরণ্যকশিপে।
উরু'পরি নখে বিদারিল সত্যরূপে॥
হাহাকার করি সভে চমকিত হৈল।
যে মরিল তার পিতা আসিয়া ঘেরিল॥
তেঁহো কহে ছলে মোর পুত্ররে মারিল।
কেহো কহে তা না হবে আবেশে বধিল॥
পিতা রাজাস্থানে গিয়া নিবেদন কৈল।
রাজা চমকিত হৈয়া সভা বোলাইল॥
বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা মনে বিচারয়।
নরের নখেতে নর ফাড়া নাহি যায়॥
এ কথায় ইহার যে প্রতীত না হবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে লোকেতে বুঝিবে॥
তাহারে কহিলা তুমি হও দশরথ।
যে মারিল তারে কহে হও রামবত॥
রাম বনে পাঠাইয়া দশরথ যথা।
প্রাণ তেয়াগিল কর অনুকরণ তথা॥
সেই অনুকরণ করিতে মাত্র সেই।
প্রাণ তেয়াগিল সত্য দশরথ যেই॥
অতএব কৃষ্ণ-রাম আদি বেশ করি।
লীলানুকরণ করে যে যে বেশ ধরি॥
তাহাতে অবজ্ঞা কেহ কদাচ না কর।
ভগবত-জ্ঞানে তাতে শ্রদ্ধা অনুসর॥
তার সাক্ষী দেখ পূর্ব্বাপর বৃন্দাবনে।
রাসলীলা করে ব্রজবাসি-আদিগণে॥
রাধাকৃষ্ণ সাজাইয়া সেই যে বালকে।
পরম ভকতি করি পূজে সব লোকে॥
তাহার অধরামৃত চরণামৃত লৈয়া।
কাড়াকাড়ি করি খায় পদার্থ ভাবিয়া॥
অতএব ঈশ্বর আবেশ তাহে জানি।
ভকতি উচিত হয়ে ইষ্টসম মানি॥
লীলা-অনুকরণ অনাদিসিদ্ধ হয়।
অনিরুদ্ধ কৈলা ঊষা-হরণ-সময়॥
গন্ধর্ব্ব-নর্ত্তনে দ্বারকায় কৃষ্ণচন্দ্র।
যাহা দেখি রসাবেশে হৈলা গৌরইন্দ্র॥
কিন্তু ভক্তজনের (ক) করণে রসাভাস।
কেহ কহে যদি তারে (খ) করিবে উল্লাস॥

চরিত্র শ্রীরতিবন্ত বাঈ

রতিবন্ত নামে এক বাঈ পুরুষোত্তমে।
বাল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে মতি রমে॥
গ্রামেতে কোথাও শ্রীভাগবত পাঠ হয়।
তার পুত্র শ্রবণ করিতে নিত্য যায়॥
যেই যেই আখ্যান শুনয়ে তথা বসি।
সেই সেই কথা মাতাস্থানে কহে আসি॥
আনন্দিত হইয়া শুনয়ে পুত্রস্থানে।
আর দিন উদূখল-বন্ধন-আখ্যানে॥
শুনিঞা আসিয়া মাতা-নিকটে কহিতে।
মাতা তাহা শুনি নারে পরাণ ধরিতে॥
হা হা হেন সুকুমার কমলনয়ানে।
কেমনে বান্ধিল রাণী দয়া নৈল মনে॥
ইহা কহি অচেতন হইয়া পড়িলা।
পড়িতেই অইমনি প্রাণ ছুটি গেলা॥
হা হা কিবা ভাব কিবা প্রেম কিবা স্নেহ।
বন্ধন করিলা শুনি তেজিলেন দেহ॥
হায় হায় হেন কবে সুদিন হইবে।
তাঁর পদরজে মতি কবে মোর হবে॥

পাঠান্তর—(ক) ব্রতী—বৃতি।

পাঠান্তর—(ক) ভক্তজনের—ভকতের।
(খ) কেহ কহে যদি তারে—কেহ যদি করে তাহে।

তাঁহার চরণরজস্পর্শে অধিকার।
হেন কি সাধনে কবে হইবে আমার॥
কে হেন দয়াল আছে ইহ ত্রিভুবনে।
জানিলে শরণ লই তাঁহার চরণে॥
প্রাণ নিকাশিয়া দেই যদি তেঁহো চান।
যদি পাই সে প্রেমসিন্ধুর এক কণ॥
হৃদয় মাণিক হারে যাহারে ধরিনু।
ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিনু॥
সাধ্যে উপায়-সম যে আশ্রয় কৈনু।
ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিনু॥
নারায়ণ-কৃপাবলে যে পদ পাইনু।
ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিনু॥
সর্ব্ববেদ সার যেই শাস্ত্রে যে শুনিনু।
ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিনু॥
জাহ্নবীর পশ্চিমদিশাতে মণিহার।
তাহার মধ্যে যে (ক) শোভে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
নিবেদন তাঁর পদে দন্তে তৃণ করি (খ)।
যদি কৃপা করে সেই শ্রীচৈতন্য হরি॥
তবে এই সুদৃঢ় দুর্ম্মতি-সিন্ধু পার।
হই নহে ত্রিভুবনে গতি নাহি আর॥
তেঁহো যদি কৃপা করি কটাক্ষ করয়।
তবে লালদাস দীন কৃতকৃত্য হয়॥

চরিত্র শ্রীপুরুষোত্তমবাসী মহারাজ

শ্রীপুরুষোত্তমে রাজা পুরুষোত্তম ভক্ত।
একান্ত-নৈষ্ঠিক শ্রীচরণে অনুরক্ত॥
তাঁহার সৌভাগ্য কিছু কহা নাহি যায়।
যাঁর ছিন্নহস্ত-দোনা শ্রীঅঙ্গে পরয়॥
রাজার একান্ত ভক্তিনিষ্ঠা বিবরণ।
বিস্তারিয়া কহি যে শুন অপূর্ব্ব কথন॥
এক দিন রাজা পাশক্রীড়াতে আছয়।
পাণ্ডা মহাপ্রসাদ-হস্তে আইলা তথায়॥

পাঠান্তর—(ক) মধ্যে যে —মধ্যেতে।
(খ) করি- ধরি।

মহাপ্রসাদ দিয়া নৃপে আশীর্ব্বাদ কৈল।
অন্যমনস্ক রাজা বাম হস্তে নিল॥
পশ্চাত জানিয়া কৈল জিহ্বায় দংশন।
হা হা মুঞি কি কায করিল অলক্ষণ॥
ব্রহ্মার দুর্লভ বস্তু যে মহাপ্রসাদ।
বাম হস্তে লৈনু কৈনু বড়ই প্রমাদ॥
এই অপরাধ জন্য এই দুই হস্ত।
ছেদন করিতে হয় অবশ্য প্রশস্ত॥
এতো ভাবি নিজ ভৃত্য জল্লাদগণেরে।
নিজহস্ত কাটিবারে কহে বারে বারে॥
তাহারা করিয়া যোড়হস্ত যায় দূরে।
ভৃত্য (ক) কি প্রভুর হস্ত কাটিবারে পারে॥
কেহো যদি না কাটিল কৈল কিছু যুক্তি।
কহে মোর ঘরে এক প্রেত আইসে নিতি॥
গবাক্ষের দ্বারে হস্ত বাড়ায় বাহিরে।
কি জানি কি কর্ম্ম কিছু নাহি বুঝিবারে॥
এইমত সিফাইগণেরে বুঝাইয়া।
খড়্গহস্তে সেইখানে রাখে নিয়োজিয়া॥
যখন বাড়াবে হস্ত কাটিয়া ডারিবে।
তবে মোর প্রেত হৈতে বিঘ্ন দূরে যাবে॥
এতেক কহিয়া রাজা শয়ন করিল।
মধ্যরাত্রে উঠি তথা হাথ বাড়াইল॥
রাজার কহত মতে প্রেতজ্ঞান করি।
রাজার যে বাম হস্ত কাটে চোট মারি॥
দয়াল শ্রীজগন্নাথ রাজার চরিত্র।
দৃঢ়নিষ্ঠা ভক্তি রতি আশয় পবিত্র॥
জানিঞা দয়ার্দ্র হিয়া কহে ভৃত্যগণে।
রাজার যে ছিন্নহস্ত আনগা যতনে॥
আমার বাগিচামধ্যে গাড়িয়া রাখহ।
প্রতিদিন তাহে জল সেচন করহ॥
প্রভুর যে আজ্ঞা সেইমত আচরিল।
সেই হস্ত দোনা নামে বৃক্ষ উপজিল॥
অপূর্ব্ব-সৌরভ যে সুন্দর-দরশন।
পবিত্র সুসেব্য যে শ্রীঅঙ্গ-অভরণ॥

পাঠান্তর—(ক) ভৃত্য—চাকর।

অতি প্রিয়তম করে আপনি তোটন।
অদ্যাপি বার্ষিক-যাত্রা দমনভঞ্জন (ক)॥
রাজার যেমন হস্ত হইল তেমতি।
বিভু কৃপা কৈলে তার কিসে অনিবৃতি॥
সেই মহারাজের দাসের অনুদাস।
লালদাস জন্মে জন্মে করে অভিলাষ॥

চরিত্র শ্রীকরমা বাই

মাড়োয়াড় দেশীয় শ্রীজগন্নাথভক্ত।
করমা-বাই নামেতে জগতে আছে ব্যক্ত॥
যাহার খিচুড়ি হরি খাইলা পিরীতে।
করমা-বাইর খিচুড়ি যে অদ্যাপি বিদিতে॥
তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্ব্ব কথন।
হরিভক্ত সাধুগণ-শ্রবণ-রঞ্জন॥
বাইজী প্রভাতে উঠি না ধুইয়া মুখ।
খেচরান্ন পাক করে মনে বড় সুখ॥
আদরক[১] মরিচ হিং বহু ঘৃত দিয়া।
রন্ধন করয়ে অন্ন অমৃত জিনিঞা॥
চুলা চৌকা নাহি দিয়া সেইখানে ঢালি।
ভোগ লাগাইয়া বাই আনন্দ-আকুলি॥
জগন্নাথ আসি তাহা করেন ভোজন।
তেন তৃপ্ত আর কোন দ্রব্যে নাহি হন॥
একদিন এক সাধু বৈরাগী আসিয়া।
অতিথি হইলা শুভ চরিত্র জানিঞা॥
রতিপ্রেম সর্ব্বগুণালংকৃত দেখিলা।
কিন্তু এক রীতি দেখি কিছু ক্ষোভ হৈলা॥
স্নানাদি না করি পাক করি ভোগ দেয়।
ইহাতে তো কৃষ্ণচন্দ্রের প্রীত না জন্ময়॥
এতো ভাবি বাইজীকে কহে কিছু নীত।
আচারপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবা যে উচিত॥
প্রাতে চুলা চৌকা মুখপ্রক্ষালন স্নান।
করিয়া পাকাদি করি কৃষ্ণে নিবেদন (খ)॥

করহ নতুবা অপরাধ যে জন্ময়।
ভোজনে (ক) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতি নাহি হয়॥
এতো শুনি করমা-বাই-জীউ ঠাকুরাণী।
কহয়ে যেরূপ আজ্ঞা করিলা আপনি॥
সেইমত আচার করিয়া ভোগ দিব।
স্ত্রীজাতি মুঞি নাহি জানি কি করিব॥
পরদিন সেইমত আচার করিল।
ভোগ লাগাইতে দুই প্রহর চড়িল॥
অধিক বেলাতে জগন্নাথে খাওয়াইতে।
মনক্ষোভ হৈল সুখ না জন্মিল চিতে॥
খিচুড়ি খাইতে জগন্নাথ আসি বৈসে।
হেথা শ্রীমন্দিরে ভোগ লক্ষ্মী পরিবেষে॥
আচমন না করিয়া তাড়াঘাড়ি গিয়া।
মন্দিরে বসিলা প্রভু ভোজন লাগিয়া॥
হস্তে মুখে খিচুড়ি যে লাগিয়াছে দেখি।
সেবকগণেতে তবে কহয়ে চমকি॥
কহ প্রভু কোথায় খিচুড়ি খাইলে গিয়া।
কোন্ ভাগ্যবান্ গৃহে চরণ অর্পিয়া॥
সফল করিলে কার মানবজনমে।
বুঝিলাম সেই ধন্য এ তিন ভুবনে॥
তবে প্রভু আদেশ করিলা পান্ডাগণে।
নিত্য মুঞি যাই করমা-বাইর সদনে॥
অপূর্ব্ব খিচুড়ি করি প্রণয়পূর্ব্বকে।
খাওয়ায় আমারে তাহে বড় পাই সুখে॥
নিত্য খাওয়াইত মোরে সকাল করিয়া।
অমুক বৈরাগী গিয়া কু-যুগতি (খ) দিয়া॥
নীতি শিখাইল তারে আচার করিতে।
সে হেতু বাঢয়ে বেলা দুঃখ পাই তাথে (গ)॥
বেলা হৈলে ক্ষুধা লাগে দ্বিতীয় (প্রহর) এখানে।
প্রস্তুত সময় যাইতে হয়ে সেইখানে॥
সেখানে সুস্বাদ আর বাইয়ের পিরীতে।
ছাড়িতে না পারি যে (ঘ) একান্ত হয়ে যাইতে॥

পাঠান্তর—(ক) দমনভঞ্জন—মদনভঞ্জন।
(খ) নিবেদন—কর দান।
১। আদরক—আদা।

পাঠান্তর—(ক) ভোজনে—ভজনে।
(খ) কু-যুগতি—কুষুকতি।
(গ) তাথে—তাতে।
(ঘ) যে—এই।

সেথা হেথা ছুটাছুটি না পারি করিতে।
অতএব তার কাজ নাহি আচারেতে॥
পূর্ব্বেতে যেমত করি ভোগ লাগাইত।
তেমতি করিয়া করে তাহে মুঞি প্রীত॥
অহো (ক) কি আশ্চর্য্য দেখ কৃষ্ণে যার প্রীত।
তাহার মহিমা বেদ-বিধি অবিদিত॥
কোটিগঙ্গাতুল্য সেই সুপবিত্র হয়।
তার সাক্ষী দেখ যে জগন্নাথ কহয়॥
অপেক্ষা না কৈল শুচি পিরীতি পাইল।
যেহেতুক পিরীতিপূর্ব্বক খাওয়াইল॥
অতএব পিরীতি যাহার দেহে হয়।
বেদবিধি বিচার-কিঙ্কর সেই নয়॥
প্রভুর আদেশ শুনি তটস্থ হইল।
বাইজীর স্থানে গিয়া বৃত্তান্ত কহিল॥
বাইজী শুনিঞা মহা আনন্দে ভাসিল।
বিকার সাত্ত্বিক অষ্ট শরীরে হইল॥
পূর্ব্ববত প্রাতে উঠি খেচরান্ন করি।
জগন্নাথে ভোগ দেয় প্রেমানন্দে ভরি॥

পাঠান্তর—(ক) অহো—আহা।

আচার করিতে যে বৈরাগী যুক্তি দিলা।
বিশেষ বৃত্তান্ত শুনি ভয়েতে কাঁপিলা॥
তুরিতে (ক) বাইজীর স্থানে গমন করিয়া।
দণ্ডবত করি কহে দুহস্ত যুড়িয়া॥
তোমার মহিমা আর প্রভুর আশয়।
আমি কি জানিব ছার কিসে কিবা হয়॥
তোমারে কহিনু মুঞি আচার করিতে।
তাহাতে পাইলা দুঃখ ক্রোধ হৈল চিতে॥
অতএব আছয়ে তোমার যে নিয়ম।
সেইমত কর তাহে না কর হেলন॥
সেই যে করমা বাই নামে অদ্যাপিহ।
খিচুড়ি লাগয়ে ভোগ স্বর্ণথালী যেহ॥
হে হে শ্রীকরমা বাই কৃপাদৃষ্টি কর।
কলিভব-মগ্ন জীবের উপায় বিস্তার॥
শ্রীচরণ শিরে ধর আপন গুণেতে।
অযোগ্য হইব তবে বিচার করিতে॥

পাঠান্তর—(ক) তুরিতে—ত্বরিতে।

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীভাবুক-ব্রাহ্মণাদি-ভক্ত-চরিত্র-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশ-মালা ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীশিল্পিল্লা সেবি-কন্যাদ্বয়।

বিষ্ণু-স্বামিসম্প্রদায় সুন্দর আশয়।
এক রাজা আর এক জমিদার হয়॥
দোঁহাকার এক গুরু নিকট আলয়।
দুই কন্যা দোঁহাকার চমৎকার হয়॥
তাঁহা-দোঁহার গুণ কিছু কীর্ত্তন করিব।
দুর্ম্মতি-কালসর্প-বিষ আপনা ঝাড়িব॥
দুই কন্যা সখ্যভাব অলপ বয়েস।
গুরুগৃহে থাকিতেই সদাই আবেশ॥
একদিন খেলিতে খেলিতে গেলা তথা।
বসিলেক গিয়া গুরু পূজা করে যথা॥
আচার্য্যব্রাহ্মণ ঘরে অনেক ঠাকুর।
শালগ্রামনামা চক্র শ্রীমূর্ত্তি প্রচুর॥
দুয়ারে বসিয়া দুটি কন্যা জিজ্ঞাসয়।
ইনি বা কে উনি বা কে পূজিলে কি হয়॥
গোসাঞি শুনিঞা তাহা হাসিতে হাসিতে।
ঠাকুরতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব লাগিলা কহিতে॥
সাধুকৃপা কিংবা পুরুষের সমস্কারে।
যতেক কহিলা গোসাঞি গাছিল (ক) অন্তরে॥
কহে মোদিগেরে দুটি ঠাকুর যে দেহ।
মোরা সেবা করিব কোন্ দুটি দিবে কহ॥
গোসাঞি কহেন হেন বাক্য নাহি কহ।
এখন বালক বড় হইলে করিহ॥
মন্ত্র গ্রহণ করাইব বিধিমতে।
ঠাকুর সেবার যোগ্য হইবে যাহাতে॥

মন্ত্র-গ্রহণের কথা যবে সে শুনিল।
মন্ত্র মন্ত্র করি পুন তাহাই ধরিল॥
ঠাকুর-মন্ত্রের লাগি কাঁদিতে লাগিলা।
গোসাঞি সে এক মহা-আপদে পড়িলা॥
আজি ঘরে যাও কালি দিব যে বলিয়া।
স্তোক (ক) দিয়া পাঠাইলা সান্ত্বনা করিয়া॥
গোসাঞি অন্তরে কিছু করিলা যুগতি।
শিলাপত্র দুটি আনি রাখিলেন তথি॥
কুঙ্কুম-চন্দন-পুষ্প-তুলসী-ভূষিত।
করিয়া রাখিলা তথা ঠাকুর-সহিত॥
পরদিন দুই কন্যা আইলা তথায়।
ঠাকুর দেহ মন্ত্র দেহ বলিয়া কান্দয়॥
গোসাঞি কহেন দিব ঠাকুর আর মন্ত্র।
আইস লহসিয়া (খ) কান্দ কেনে, হও শান্ত॥
এতো কহি সেই দুই শিলাপত্র দিলা।
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র কর্ণেতে কহিলা॥
নামামৃত শ্রবণমাত্রেতে মগ্ন হৈল।
আর কিছু রঙ্গ সেই বালিকার ভেল॥
শিলাপত্র নাহি জানে ঠাকুর জানিঞা।
গদগদ ভাব হৈল হৃদয় ধরিয়া॥
জিজ্ঞাসয় ইঁহার নাম কি গোসাঞি।
শিল্পিল্লা নাম কৃষ্ণচন্দ্র যে সে এই॥
শিল্পিল্লা শিলাপত্র একুই যে অর্থ।
বালকে ভুলায় ঠাকুর বলি অযথার্থ॥
বালক স্বভাব হয়ে তর্ক নাহি মনে।
সুদৃঢ় বিশ্বাস হৈল গুরুর বচনে॥
দুই জন দুই শিলা লইয়া সেবয়।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র হৃদয়ে জপয়॥
সেবয়ে সদাই জ্ঞান করি নিজ ইষ্ট।
ক্রমে ক্রমে হৈল তাহে পিরীতি বর্দ্ধিষ্ঠ॥

পাঠান্তর—(ক) গাছিল-গাহিল।

পাঠান্তর—(ক) স্তোক—স্তোভ।
(খ) আইস লহসিয়া—আইসহ লহ।

অন্য কর্ম্ম আহার-নিদ্রাদি দেহ-চেষ্টা।
সব দূরে গেল হৈল ভক্তমধ্যে শ্রেষ্ঠা॥
শিল্‌পিল্লা প্রাণধন শিল্‌পিল্লা রত্ন।
অন্য কথা নাহি অন্য ধনে নাহি যত্ন॥
রাজার কন্যার স্বামী গৃহে লইবারে।
সদা লোক পাঠায় নাহি চাহে যাইবারে॥
পুনর্ব্বার স্বামী তার আপনি আসিয়া।
অনেক যতন করি চলিলা লইয়া॥
পেটারিতে ভরি প্রিয় শিল্‌পিল্লা লৈল।
বক্ষস্থলে করি ডুলি আরোহণ কৈল॥
স্বামী তার কহে কিছু দূরেতে যাইয়া।
বৃথাই কেনে বা মর পাথর পূজিয়া॥
ভুলাইয়া গোসাঞি পাথর আনি দিল।
আমার বচন শুন টান মারি ফেল॥
সুদৃঢ় বিশ্বাস তাতে (ক) সে কথা না শুনে।
বজ্রাঘাত তুল্য সেই বাক্য করি মানে॥
জোরাবরি[১] স্বামী তার পেটারি সহিতে।
টান মারি ফেলি দিল পুষ্করিণী জলেতে॥
হাহাকার করি তেঁহো কান্দে উচ্চস্বরে।
শিল্‌পিল্লারে শিল্‌পিল্লারে করিয়া (খ) ফুকারে॥
স্বামী তাঁর মূঢ় সে তো (গ) মর্ম্ম নাহি জানে।
লইয়া চলিয়া গেলা আপন ভবনে॥
তথায় যাইয়া কন্যা অন্ন নাহি খায়।
শিল্‌পিল্লা বলিয়া মাত্র রোদন করয়॥
শাশুড়ী ননদ আর পড়সী যতেক।
আসিয়া ঘেরিল আর ইতর শতেক॥
সকলেই কহে বহু[২] এতো শোকাকুলি।
হইয়া কান্দয়ে কেনে পড়িয়া আথালি॥
শিল্‌পিল্লা বলিয়া ডাকে ইহার কি অর্থ।
দাসীগণ কহে আদ্যোপান্ত যে যথার্থ॥

শিল্‌পিল্লা ঠাকুর যে ইঁহার প্রাণসম।
পতি জলে ডারি দিলা বুঝিয়া বিষম॥
এতো শুনি তার শাশ পুত্রেরে ডাকিয়া।
বহু অনুযোগ কৈলা আক্রোশ করিয়া॥
লোক পাঠাইলা সেই পুষ্করিণী যথায়।
খুঁজিয়া পেটারি সহ তুলিয়া আনয়॥
বধূর নিকটে দিলা পেটারি লইয়া।
আঁকু পাঁকু করি হৃদে ধরয়ে উঠিয়া॥
দরিদ্রের হারাধন যেমন মিলয়।
মৃতদেহ মধ্যে যেন পুন প্রাণ পায়॥
তেমতি আনন্দ হিয়া (ক) সেবাদি করিল।
তাহার প্রসাদে সব বৈষ্ণব হইল॥
সেই শিলা হৈতে কৃষ্ণ দরশন দিল।
নিষ্ঠা যে সভার মূল কাঁচে সোণা হৈল॥
কৃষ্ণনাম আকর্ষণী হৃদয়ে পশিল।
পিরীতি যে বশীকার তাহে বশ হৈল॥
পুন জমিদারের কন্যার কথা শুন।
অইমনি শিল্‌পিল্লা প্রতি পিরীতি যে ঘন॥
দুই ভ্রাতা তাঁর দুই গ্রামেতে বৈসয়।
অপ্রণয় সদাই লড়াই যুদ্ধ হয়॥
যুদ্ধে বড় ভ্রাতা ছোট ভ্রাতার ঘর দ্বার।
লুঠিয়া লইয়া গেলা যে ছিল তাহার॥
তাহার সহিত শিল্‌পিল্লা ঠাকুর লঞা গেলা।
ঠাকুর বলিয়া শ্রীমন্দিরেতে রাখিলা॥
হেথা কন্যা শোকাকুলি শিল্‌পিল্লা লাগিয়া।
উচ্চস্বর করি কান্দে ভূমে লোটাইয়া॥
অন্যালোকে কথা (খ) বৃথা কান্দ কেনে মাতা।
তোমার তো ভাই সে, না যাহ কেনে তথা॥
তথায় যাইয়া (গ) শিল্‌পিল্লা থাকে যথা।
লইয়া আসিবে (ঘ) ইথে আছে কি অন্যথা॥
এতেক শুনিয়া বড়ভ্রাতা-গৃহে গিয়া।
কান্দিয়া পড়িল তথা আছাড় খাইয়া॥

পাঠান্তর—(ক) তাতে—তাহে।
(খ) করিয়া—বলিয়া।
(গ) মূঢ় সে তো—মূঢ়মতি।
১। জোরাবরি—বলপূর্ব্বক।
২। বহু—বধূ।

পাঠান্তর—(ক) আনন্দ হিয়া—আনন্দ হৈয়া।
(খ) অন্যালোকে কথা—অন্য লোকে বলে।
(গ) তথায় যাইয়া—যাইয়া তুমি।
(ঘ) লইয়া আসিবে—যাইয়া আনিবে।

তটস্থ হইলা সভে জিজ্ঞাসা করয়।
কেন কান্দ বলি আসি ধরিয়া উঠায়॥
তেঁহো কহে মোর দেহ হৈতে প্রাণ নিলা।
শিল্‌পিল্লা রতনধন কাড়িয়া আনিলা॥
বিশেষ জানিয়া সভে কহয়ে তাহারে।
বাছিয়া লহগা চল ঠাকুর মন্দিরে॥
মন্দিরে যাইবামাত্র শিল্‌পিল্লা আপনি।
হৃদয়ে আসিয়া লাগে তার গুণ গণি॥
তাহার নিষ্ঠাতে কৃষ্ণ সেইরূপ হৈলা।
পিরীতে তাহারে রিঝি[১] আপনা সোঁপিলা॥
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার।
লালদাস মাগে এক বিন্দু যে তাহার॥

চরিত্র ভক্তনিষ্ঠ রাজা

ভক্তে ভক্তিনিষ্ঠ এক রাজা বিজ্ঞতম।
বৈষ্ণবে একান্ত রতি নাহি যার সম॥
বৈষ্ণবের ভেক ধরি দুই চারি চোর।
চুরির সন্ধানে গেলা রাজার গোচর॥
ভক্তিভাবে রাজা পাদ-প্রক্ষালন করি।
সেবা করি বসাইলা পর্য্যংক[২] উপরি॥
অন্দরে লইয়া রাণীগণে আজ্ঞা দিল।
চরণ সেবন করি শুশ্রূষা করিল॥
রাত্রে যবে গৃহবাসী সভে নিদ্রা গেলা।
উঠিয়া রাণীর তবে গলে ছুরি দিলা॥
মারিয়া রাণীর অঙ্গের গহনা লইয়া।
চলিলা যে দস্যুগণ আনন্দিত হিয়া (ক)॥
যাইতে যে পথ না পায় ধর্ম্মের এই কর্ম্ম।
সারারাত্রি ফিরি বুলে[৩] নাহি বুঝে মর্ম্ম॥
প্রভাতে উঠিয়া দেখি দাস-দাসীগণ।
রাণীর মরণ আর দস্যুর করণ॥
হাহাকার করি দস্যুগণেরে ধরিয়া।
রাজার নিকটে লৈল বন্ধন করিয়া॥
রাজা দেখি হাহাকার করিয়া কহয়।
বৈষ্ণবেরে বান্ধে একি সর্ব্বনাশ হয়॥
ভৃত্যগণ কহে মহারাজ নিবেদন।
বৈষ্ণব না হয়, এই হয়ে দস্যুগণ॥
রাণীরে মারিয়া বস্ত্র অলংকার লৈল।
চোরগণ বৈষ্ণবের ভেক ধরি আইল॥
তথাপিহ রাজা কহে আরে ছাড় ছাড়।
মূর্খগুলা কহে বৈষ্ণবেরে চোরভাঁড়॥
রাণীর কর্ম্মেতে ছিল নিজ দোষে মৈলা।
না বুঝিয়া তোমরা বৈষ্ণবে দুঃখ দিলা॥
ঞিহা সভার পাদোদক লইয়া খাওয়াও।
এখনি বাঁচিবে রাণী মোর বাক্য লও॥
এতো কহি পাদোদক লৈয়া মুখে দিতে।
বাঁচিয়া উঠিল রাণী চাহে চারিভিতে॥
বৈষ্ণবগণেরে রাজা বহুধন দিয়া।
বিদায় করিল স্তব করিয়া তুষিয়া॥
দস্যুগণ তাহা দেখি বিবেক হইল।
বৈষ্ণবের ভেকমাত্র আমরা করিল॥
তাহার মহিমা এই দেখিনু সাক্ষাতে।
মৃতক জীবন পাইল চরণ-ধউতে॥
এতেক ভাবিয়া তারা বৈষ্ণব হইল।
সাধুসঙ্গলবমাত্রে (ক) সেই রঙ্গ পাইল॥
রাজার আশ্চর্য্য দেখ বৈষ্ণবে বিশ্বাস।
কে বুঝিবে মর্ম্ম যাথে হরির বিলাস॥
সেই রাজা সেই দস্যুগণের চরণ।
ধূলীকণ লালদাস করয়ে প্রার্থন॥

চরিত্র অন্য ভক্তনিষ্ঠ রাজা

হরিভক্ত এক মহারাজা ভক্তসেবী।
উদার চরিত্র যে শাস্ত্রজ্ঞ মহাকবি॥
দৃঢ়ব্রত ভক্তিমার্গে বৈষ্ণবে পিরীতি।
এক ভক্তরাজ আসি হইলা অতিথি॥

পাঠান্তর—(ক) হিয়া—হৈয়া।
১। রিঝি—হৃষ্ট হইয়া।
২। পর্য্যংক—খাট।
৩। বুলে—ভ্রমণ করে, ঘুরে.

পাঠান্তর—(ক) সাধুসঙ্গলবমাত্রে—সাধুসঙ্গলাভমাত্র।

পাদ ধৌত আদি করি আসন ভূষণ।
ভোজন করায়্যা কৈল অনেক স্তবন॥
বৈষ্ণবের ভক্তিভাব দেখিয়া রাজন।
রাণীর সহিতে হৈল প্রণয়ে মগন॥
বৈষ্ণব বিদায় হৈয়া চাহে যাইবারে।
রাজা কিছুকাল রহ কহে বারে বারে॥
এইমত বৎসরেক বৈষ্ণব রহিলা।
পুন আর নাহি রহে কোমর বান্ধিলা॥
রাজা প্রাণ তেজিবারে উদ্যুক্ত হইল।
রাণী উৎকণ্ঠায় এক যুক্তি ঠাহরিল॥
অনেক বিনতি করি কহিল বৈষ্ণবে।
আজি দিন রহ কালি সকালে যাইবে॥
বহু উপরোধে সাধু সেদিন রহিলা।
রাত্রে নিজপুত্রে রাণী বিষ খাওয়াইলা॥
মরিল নন্দন প্রাতে কান্দিয়া উঠিলা।
অন্তঃপুরে রোদনের ধ্বনি উথলিলা॥
প্রাতে সাধু চলিবার উদ্যোগ করিতে।
দাসী গিয়া কহে কিছু রাণীর প্রেরিতে॥
মহাশয় রাজার যে পুত্রটি মরিল।
কান্দিয়া আকুল রাণী এই দশা হৈল॥
দুই চারি দিবস থাকিলে ভাল হয়।
স্বতন্তর ইচ্ছা তব যেবা মনে লয়॥
বৈষ্ণব ভাবেন মনে এতেক প্রণয়।
বিপদ সময় যাওয়া উচিত না হয়॥
বিবেচনা করি পুন কোমর খুলিলা।
রাজা রাণী মনে মহা আনন্দিত হৈলা॥
অন্তঃপুরে গেলা সাধু (ক) সান্ত্বনা করিতে।
দেখে গিয়া রাণী বসিয়াছে আনন্দিতে॥
সাধু কহে এ তো তব আহ্লাদের কাল।
নহে যে তথাপি দেখি আনন্দ উথাল (খ)॥
হর্ষে তবে কহে রাণী সব বিবরণ।
বিষ খাওয়াইনু পুত্রে তোমারি কারণ॥

পাঠান্তর—(ক) সাধু—রাজা।
(খ) উথাল—প্রবল।

পাদোদক দেহ পুত্রে বাঁচিবে এখনি।
কৃপা করি দিনকথো থাকহ আপনি॥
পাদোদক লইয়া বালকে যবে দিলা।
নিদ্রাভঙ্গ হৈতে যেন চমকি উঠিলা॥
বিশেষ শুনিঞা আর বিশ্বাস দেখিয়া।
সাধুর আশ্চর্য্য হৈল চমকিত হিয়া॥
বিচার করিলা মনে এ হেন সৎসঙ্গ।
সদাই যাহার সনে কৃষ্ণকথারঙ্গ॥
ইহা ছাড়ি অধিক কি লাভে (ক) কোথা যাব।
এই মোর সিদ্ধস্থান হেথাই রহিব॥
রাণীরে কহেন তব এ হেন সদ্গুণ।
পুত্রে বিষ খাওয়াইলা বৈষ্ণব-কারণ॥
বৈষ্ণব-চরণামৃতে এতেক বিশ্বাস।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ তব অন্তরে বিলাস॥
তোমা হেন সৎসঙ্গ ছাড়িয়া কোথা যাব।
এই মোর সিদ্ধস্থান হেথাই রহিব॥
শুনিতে শুনিতে রাণী আনন্দ-সাগরে।
মগ্ন যে বৈষ্ণব থাকিবেন শুনি ঘরে॥
রাজন সব বৃত্তান্ত যে (খ) বিশেষ শুনিঞা।
রাণীরে প্রশংসে বহু গদগদ হিয়া॥
বৈষ্ণব থাকিল বলি উৎসাহ হইল।
খয়্রাত করিল নহবত বসাইল॥
অতএব কি আশ্চর্য্য বৈষ্ণবে পিরীতি।
কিবা সুচরিত্র নিষ্ঠা কিবা ভক্তিরীতি॥
আমরা অভাগ্যবন্ত জন্ম অকারণ।
শিশ্নোদরপরা[১] মাত্র বৃথাই জীবন॥
হে হে মহারাজ-রাজ হে হে মহারাণি।
এ দুর্গত জনে অবলম্বন দেহ পাণি॥
তবে সে নিস্তার পাই নহে কলিভব।
সাগরে ডুবিয়া মরে কিঙ্কর যে তব॥

পাঠান্তর—(ক) লাভে—লোভে।
(খ) সব বৃত্তান্ত যে—বৃত্তান্তসব।
১। শিশ্নোদরপরা—যাহাদের কাম ও ক্ষুধার নিবৃত্তিই একমাত্র কাজ।

চরিত্র শ্রীমামা-ভাগিনাদ্বয়

মাতুল ভাগিনা দুই অদ্ভুত-চরিত্র।
দোঁহে কৃষ্ণভক্ত সম দোঁহে দোঁহা প্রীত॥
দক্ষিণদেশেতে রঙ্গনাথ নামে হরি।
জানয়ে সভাই যে প্রসিদ্ধ জগ ভরি॥
তাঁহার মন্দির না দেখিয়া দুঃখ মনে।
হইল একান্ত রাগ¹ মন্দির কারণে॥
ভ্রমণ করিয়া কোথাও সুযোগ না বনে।
সন্ধান করিলা এক ভাবিয়া দু'জনে॥
সেবরাগণের সেবা পরশমণির।
সূর্য্যের আকৃতি যেন কিরণ শশীর॥
যদ্যপি সেবরা-সঙ্গ নহে যে কর্ত্তব্য।
তথাচ রাগের ধর্ম্ম মানে করি লভ্য॥
কপটে সেবক গিযা হৈল সেবরার।
স্পর্শমণি মূর্ত্তি করি চুরির বিচার॥
পরামর্শ করি দোঁহে সেবরা নিকটে।
সেবক হইলা গিয়া করিয়া কপটে॥
সেবরা অদ্বৈতবাদী যদ্যপি অগ্রাহ্য।
সেবক হইলা (ক) তাহে যদ্যপি অপূজ্য॥
চুরিবৃত্তি যদ্যপিহ অধর্ম্মের কর্ম্ম।
এ সকল যদ্যপিহ বিপর্য্যয়-ধর্ম্ম॥
তথাপিহ শ্রীকৃষ্ণেতে দৃঢ় অনুরাগে।
কৃষ্ণসুখ হেতু লঞা যায় অন্যমার্গে॥
কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য।
না থাকে বিচার মাত্র কৃষ্ণসুখ লভ্য॥
কৃষ্ণের যাহাতে সুখ এই মাত্র জানে।
রাগের স্বভাব লোকধর্ম্ম নাহি মানে॥
ইহার সিদ্ধান্ত যে কহয়ে ভাগবতে।
তদর্থে যে পাপ সেই ধর্ম্মের নিমিত্তে॥

পাঠান্তর—(ক) হইলা—হইয়া।
১। রাগ—অনুরাগ, আকর্ষণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"মন্নিমিত্তে (ক) কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে (খ) ইত্যাদি॥

অনুবাদ।—আমার জন্য কোন পাপ করিলে তাহাও ধর্ম্মে পরিণত হয়।

কথোক দিবস থাকি সেবরার স্থানে।
মণিমূর্ত্তি চুরির সদা করয়ে সন্ধানে॥
কোনোমতে অবকাশকাল নাহি পায়।
মন্দির উপরে এক যুগত (গ) আছয়॥
উপরে চড়িয়া গিয়া কলস খসায়।
তাহাতে হইল পথ লইতে উপায়॥
মন্দির ভিতরে মামা পরশ লইল।
ভাগিনা উপরে চড়ি রজ্জু ডারি দিল॥
রজ্জু ধরি উঠি সেই কলস-ফুকরে।
বগলে লাগিয়া গেল দুই দিগে না সরে॥
ভাগিনার হাতে সেই স্পর্শমণি দিয়া।
কহয়ে আমার লও মস্তক কাটিয়া॥
নতুবা প্রভাতে মোরে দেখিয়া চিনিবে।
অভিলাষ মনের যে কর্ম্ম না হইবে॥
তুমি শীঘ্র যাই কর রঙ্গনাথালয়।
সুন্দর করিয়া বানাইবে সুখময়॥
ভাগিনা কহয়ে তব মস্তকচ্ছেদন।
কেমতে করিব মোর নাহি সরে মন॥
তেঁহো কহে মোর মাথা (ঘ) মুঞি কাটিবারে।
কহিয়াছি তাহে তব কি দুঃখ অন্তরে॥
তবে শির কাটি তার ভাগিনা লইলা।
বানাইতে মন্দির রঙ্গনাথেরে চলিলা॥
যাইয়া তথায় দেখে মামা বসিয়াছে (ঙ)।
মন্দির-বানানে কারখানা লাগিয়াছে॥

পাঠান্তর—(ক) মন্নিমিত্তে—মন্নিমিত্তং।
(খ) পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে—পাপং ধর্ম্মায়ৈব প্রকল্পতে।
(গ) যুগত—যুকত।
(ঘ) মাথা—কথা।
(ঙ) বসিয়াছে—রহিয়াছে।

এতো অনুরাগ যার শ্রীকৃষ্ণ-চরণে।
তার কি মরণ আছে এ তিন ভুবনে॥
মামা আর ভাগিনাতে কোলাকুলি (ক) করি।
মুচকি হাসয়ে দোঁহে সঙরি সঙরি॥
শ্রীমন্দির বনিলা যে অতিশয় স্থূল।
অদ্যাপিহ হয় যার নাহি সমতুল॥
তাঁহার চরণে করি প্রণতি বিস্তর।
মহামোহরোগের যাহাতে প্রতিকার॥

চরিত্র মহারাজ হংস-প্রসঙ্গে

দেহে কুষ্ঠব্যাধি এক রাজার হইল।
এক চিকিৎসক আসি রাজারে কহিল॥
ঔষধ করিব রাজহংসপিত্ত (খ) দিয়া।
মান-সরোবর হৈতে আনহ ধরিয়া॥
ব্যাধগণে রাজা আজ্ঞা দিল হংস লাগি।
ব্যাধে দেখে অন্যত্র উড়িয়া যায় ভাগি॥
না পাইয়া ব্যাধগণ খেদিত হইল।
কেহ এক উপায় যুগতি (গ) কহি দিল॥
বৈষ্ণবের বেশ ধরি পুন যাও সভে।
ধরিতে পারিবে হংস উড়িয়া না যাবে॥
এত শুনি বৈষ্ণবের ভেক সভে কৈল।
বৈষ্ণব দেখিয়া হংস নাহি পলাইল॥
মান-সরোবর-হংস অপ্রাকৃতময়।
বৈষ্ণবে বিশ্বাস তার স্বাভাবিক হয়॥
অবিশ্বাসি কর্ম্ম কৈল দুষ্ট ব্যাধগণ।
ধরিয়া লইয়া গেল রাজার সদন॥
বৈষ্ণবের বেশ ব্যাধগণের দেখিয়া।
আদ্যোপান্ত সব রাজা বৃত্তান্ত শুনিঞা॥
আপনা ধিৎকার (ঘ) করি ক্ষোভিত হইলা।
বৈদ্য হংস নাহি ছাড়ে বধে প্রবর্ত্তিলা॥
রাজার বিবেক হৈল ভগবানের দয়া।
হংস ছোড়াইতে (ক) প্রভু কৈল কিছু মায়া॥
উপযুক্ত এক বৈদ্য তাহার হৃদয়।
প্রেরণ করিলা গেলা রাজার সভায়॥
ঔষধাদি দিয়া ব্যাধি শীঘ্র ভাল কৈলা।
পিঁজিরা (খ) হইতে হংস ছোড়াইয়া দিল॥
ব্যাধগণ বৈষ্ণবের ভেকমাত্র কৈল।
ভেকের মহিমা দেখ রত্ন প্রসবিল॥
ব্যাধগণের মন তখন নির্ম্মল হইল।
আপনা-আপনি কিছু বিচার করিল॥
ভেকমাত্র কৈনু মোরা বৈষ্ণব-আভাস।
তাহাতে হইল পশুপক্ষীর (গ) বিশ্বাস॥
বৈষ্ণবের না জানি যে কেমন মহিমা।
চল ভাই নীচ কর্ম্ম সব দেহ ক্ষেমা॥
কার ঘর কার দ্বার কেবা কার হয়।
সব ছাড়ি চল করি কৃষ্ণের আশ্রয়॥
এতেক বিচার করি বৈষ্ণব হইল।
সর্ব্বত্যাগ করি বৃন্দাবনবাস কৈল॥
অতএব এই দেখ ভেকের মহিমা।
পর্শমাত্র (ঘ) কৃষ্ণে রতি হইল নিষ্কামা॥
সেই যে নিষ্কাম ভক্ত তাঁহার মহিমা।
ব্রহ্মা শিব আদি যার নাহি পায় সীমা॥
সেই ব্যাধ হউ মোর ত্রাণের কারণ।
মস্তকে আমার ধরু অভয়চরণ॥

চরিত্র শ্রীমীননাথ গোরখনাথ (ঙ)

মীননাথের শিষ্য গোরখনাথ নাম।
দোঁহেই সাধনসিদ্ধ দোঁহেই নিষ্কাম॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এক রাজার সদনে।
অতিথি হইলা রাজা করিলা সম্মানে॥

পাঠান্তর—(ক) কোলাকুলি—কোলাকোলি।
(খ) রাজহংসপিত্ত—হংসরাজপিত্ত।
(গ) যুগতি—যুকতি।
(ঘ) ধিৎকার—ধিক্কার।

পাঠান্তর—(ক) ছোড়াইতে—ছাড়াইতে।
(খ) পিঁজিরা—পিঞ্জরা।
(গ) পশুপক্ষীর—পশুপক্ষের।
(ঘ) পর্শমাত্র—স্পর্শমাত্র।
(ঙ) গোরখনাথ—গোরক্ষনাথ।

দাম্ভিক বিষয়ী মত্ত হিংসা ব্যবহার।
স্বাভাবিক স্বতসিদ্ধ হয় তো রাজার॥
মীননাথ সাধু স্বাভাবিক সদাচার।
দেখিয়ে উপজে দয়া দুর্গতি রাজার॥
গোরখনাথেরে কহে কিছুকাল থাকি।
অবৈষ্ণব রাজা ইহ মূঢ়প্রায় দেখি॥
হিতচেষ্টা করি কিছু যদি কৃষ্ণভক্তি।
লওয়াইতে পারি কোনোরূপে দিয়ে শক্তি॥
গোর্খনাথ কহে এই অবৈষ্ণব-স্থান।
একক্ষণ (ক) নাহি রহা এই তো বিধান॥
পুনঃপুন গোর্খনাথ বারণ করিলা।
কদাচ না শুনে মীননাথ রহি গেলা॥
রাজার সহিত মিলি বড় হৈল মেলা।
বহু অর্থ দিলা রাজা করে পাশাখেলা॥
বিধি-বিড়ম্বন দেখ এক হৈতে আর।
হইল মায়ার ফন্দে (খ) উলটা ব্যবহার॥
বিষয় কুসঙ্গ যে এমতি বলবত্ত্ব।
হেন যে পরমসাধু ভুলিলা যথার্থ॥
রাজার সহিত রাজবিষয়ী হইলা।
রাজা নিজ কন্যা তাঁরে বরণ করিলা॥
গোর্খনাথ বহু চেষ্টা করিয়া দেখিলা।
ছাড়াইতে (গ) না পারিয়া পলাইয়া গেলা॥
ইথি উথি বেড়ায় যে ভ্রমণ করিয়া।
অন্তরে অত্যন্ত দুখ (ঘ) গুরুর লাগিয়া॥
কথোক দিবসে রাজা কালপ্রাপ্তি (ঙ) হৈল।
মীননাথ রাজসিংহাসনেতে বসিল॥
রাজ্যে মত্ত হৈলা এক পুত্র জনমিল।
গোর্খনাথ ভ্রমণ করিয়া তথা আইল॥
দ্বারিগণ ভিতরে যাইতে নাহি দেয়।
যাইতে না পায়্যা কিছু সৃজিল উপায়॥

পাঠান্তর—(ক) একক্ষণ—এতক্ষণ।
(খ) ফন্দে—ফান্দ।
(গ) ছাড়াইতে—ছোড়াইতে।
(ঘ) অত্যন্ত দুখ—অধিক দুঃখ।
(ঙ) কালপ্রাপ্তি—কালপ্রাপ্ত।

দরোজা-সম্মুখে এক ঢোল বাজাইয়া।
চেৎমছন্দ গোর্খা আয়া ইহাই বলিয়া॥
নাচিতে লাগিল হেথা মীননাথ শুনি।
স্বরে (ক) সমুঝিলা যে গোরখনাথবাণী॥
ডাকিয়া লইলা গোর্খনাথ প্রণমিলা।
সেবাতে আপন নিজ অন্দরে রাখিলা॥
গোর্খনাথ ব্যাকুল গুরুর চেষ্টা দেখি।
সদাই চিন্তয়ে একক্ষণ নহে সুখী॥
গুরুরে তো নাহি পারে জ্ঞান শিখাইতে।
জিজ্ঞাসার ছলে কিছু লাগিলা কহিতে॥
পূর্ব্বে যে সকল তত্ত্ব শিখাইলে মোরে।
হয় কি না হয় কহি তোমার গোচরে॥
যদ্যপিহ না হয় শিখাও ভালমতে।
এতো বলি সব তত্ত্ব লাগিলা কহিতে॥
সাংখ্যতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব আদি।
সদা-সর্ব্বক্ষণ যে কহয়ে নিরবধি॥
সর্ব্ব সংস্কার ক্রমে শুনিতে শুনিতে।
নির্ম্মল হইল চিত্ত লাগিলা কহিতে॥
তবে (খ) গোর্খা কি করিনু কি বিষ খাইনু।
আপনার মুণ্ডেতে আনল জ্বালি দিনু॥
ধিক্ ধিক্ মোরে এবে কি করিব কহ।
গোর্খনাথ কহে ছাড়ি এখনি চলহ॥
তেঁহো কহে কিঞ্চিৎ সম্বল সঙ্গে লই।
গোর্খনাথ কহে প্রভু কিছু কায নাঞি॥
তথাচ (গ) লইল কিছু পুটুলি বান্ধিয়ে।
গোর্খনাথ মনে মনে দেখিয়া হাসয়ে॥
নিকশিলা দোঁহে গৃহে কেহো না জানিল।
বহুদূর গিয়া গোর্খনাথ নিবেদিল॥
অর্থের পুটলি প্রভু দেহ মোর মাথে।
বেদনা হইবে ভারি দ্রব্য তব হাথে॥
এতো কহি মাথে করি লইল পুটুলি।
দেখে তাহে হীরা মণি মুক্তা নরি নরি॥

পাঠান্তর—(ক) স্বরে—পরে।
(খ) তবে—আরে।
(গ) তথাচ—তথাপি।

মনে ভাযে এই শত্রু ইথে কিবা কাম।
যোগভ্রষ্টকরী ইহ স্বভাব (ক) বিষম॥
পশ্চাৎ পশ্চাৎ (খ) যায় গুরু-অগোচরে।
এক এক লয়ে আর ঝোড়েঝাড়ে ডারে॥
মীননাথ দেখে পুন ফিরিয়া চাহিতে।
দ্রব্য টান মারিয়া ফেলায় চারিভিতে॥
হারে গোর্খা কি করিলি এ-হেন পদার্থ।
টানিয়া ফেলিলি সব বহুমূল্য অর্থ॥
গোর্খনাথ কহে প্রভু এ কোন্ পদার্থ।
আমি বুঝি এতো মাত্র কেবল অনর্থ॥
অতিতুচ্ছ দ্রব্য এত প্রস্রাব (গ) করিতে।
ইহা হৈতে উত্তম নিকশে কতমতে॥
মীননাথ কহে গোর্খা প্রলাপ কি কহ।
মণি মুক্তা ঝরে তব প্রস্রাবের সহ॥
গোর্খনাথ কহে দেখ ঝরে কি না ঝরে।
এতো কহি প্রস্রাব করয়ে ধীরে ধীরে॥
মণিমুক্তা আদি কত ঝরিতে লাগিল।
মীননাথ দেখি আপনারে ধিক্ দিল॥
পরম রতন কৃষ্ণভক্তি তাহা ছাড়ি।
অতিতুচ্ছ রাজ্যস্পর্দ অন্ধকূপে পড়ি॥
মৃত্তিকাবিকার যে প্রাকৃত মণিরত্ন।
মায়ার অধীন হৈয়্যা কৈনু তাহে যত্ন॥
আরে গোর্খা তুঞি মোরে উদ্ধার করিলি।
শিষ্য হৈয়া যে গুরুবত কার্য্য কৈলি॥
তখন জঞ্জাল গেল নির্ম্মল হইল।
পূর্ব্বমত দোঁহে পরানন্দ যে পাইল॥
অতএব গুরু তো সভারে হয় ত্রাতা।
শিষ্যও (ঘ) কখনো হয়ে গুরুর যোগ্যতা (ঙ)॥
ইহাতে বুঝিয়া ভাই সাবধান হও।
কুসঙ্গ যে কালসর্প সদাই ডরাও॥

অন্য সর্প দংশিলে যে মন্ত্রে নিবারয়।
কুসঙ্গ-সর্পের দংশে অবশ্য মরয়॥
দন্তে তৃণ করি নিবেদয়ে লালদাস।
অবৈষ্ণব সঙ্গে যেন লব নহে (ক) বাস॥

চরিত্র মহাজন সদাব্রতী (খ)

মহাজন সদাব্রতী ভক্ত-অগ্রগণ্য।
বৈষ্ণব-পিরীতে রীতি এক-ধন্য-ধন্য॥
কৃষ্ণ তাঁর নিষ্ঠা বুঝিবার হেতু মায়া।
করিয়া আইলা রূপ বৈষ্ণব হইয়া॥
বৈষ্ণব পাইয়া মহাজন সদাব্রতী।
আনন্দ-কৌতুকে সেবা করি করে স্তুতি॥
কথোক দিবস তাঁর গৃহেতে রহিলা।
ভক্তি বুঝিবারে প্রভু কৈলা এক লীলা॥
পুত্র তাঁর অতিশিশু ভূষণে ভূষিত (গ)।
নির্জ্জনে লইয়া গেলা বধের উচিত (ঘ)॥
ঘার মুচুড়িয়া তারে মারিয়া ডারিলা।
ধূলা কাঁটা কুটা দিয়া ঢাকিয়া রাখিলা॥
দুই-প্রহরতক শিশু না আইলা ঘরে।
খুঁজিয়া না পায় মাতা কান্দে উচ্চস্বরে॥
দাসী গিয়া কহে সেই বৈষ্ণব নিকটে।
তুমি যে লইয়া গেলা দেখিয়াছি বাটে[১]॥
বরঞ্চ গহনা লও শিশু আনি দেহ।
বৈষ্ণব কহয়ে মোর নাম নাহি কহ॥
মনবৃত্তি করণে প্রকাশ (ঙ) বাঞ্ছা হয়।
তথাপিহ ভঙ্গি করি দাসীরে কহয়॥
যদি দেখিয়াছ তুমি না কহিয় কথা (চ)।
মারিয়াছি আমি বটে কি করিব মাতা॥

পাঠান্তর—(ক) স্বভাব—সভারে।
(খ) পশ্চাৎ পশ্চাৎ—পশ্চাতে পশ্চাতে।
(গ) প্রস্রাব—প্রস্তাব।
(ঘ) শিষ্যও—শিষ্যর এবং শিষ্যেও।
(ঙ) যোগ্যতা—যোগিতা।

পাঠান্তর—(ক) লব নহে—নাহি হয়।
(খ) সদাব্রতী—সদাবৃত্তি।
(গ) ভূষণে ভূষিত—ভূষিত ভূষণে।
(ঘ) বধের উচিত—বধের কারণে।
(ঙ) মনবৃত্তি করণে প্রকাশ—মনোবৃত্তি প্রকাশ করণে বা মনবৃত্তি কারণে প্রকাশ।
(চ) না কহিয় কথা—না কহিও কোথা।
১। বাটে—পথে।

গহনাগুলিন যে বরঞ্চ তুমি লহ।
মোর নাম প্রকাশ করিয়া নাহি কহ॥
দাসী কহে রাখিলে যে কোথায় মারিয়া।
তেঁহো কহে চল যাই দেই দেখাইয়া॥
এতো কহি তথা গিয়া ধুলামাটি ডারি।
উঠাইয়া দিল শব (ক) ভয়ভঙ্গি করি॥
দাসী মৃত বালক আনিঞা কোলে করি।
তুফান উঠাইল সেই বৈষ্ণব-উপরি॥
মহাজন আসি দাসীমুখেতে শুনিল।
বৈষ্ণবের কর্ম্ম ইহা প্রতীত না হৈল॥
বৈষ্ণবের ক্ষুদ্র পাপে প্রবৃত্তি না হয়।
এ তো না সম্ভবে যাথে দয়ালু-হৃদয়॥
দাসী কহে নিজ মুখে কবুল হইল।
তেঁহো কহে সেহ কোন কারণে কহিল॥
দয়াল বৈষ্ণব-চিত্ত পরের কি জানি।
দুষ্খ হয়ে বসি দোষ মানয়ে আপনি॥
এতো কহি বৈষ্ণবের পাদোদক আনি।
বালকের মুখে দিতে বাঁচিল ঐর্মান (খ)॥
মহাজন সদাব্রতী স্ত্রীর (গ) সহিতে।
চরণে পড়িয়া কান্দে ভয় মানি চিতে॥
দাসী মোর কটুবাক্য তোমারে কহিল।
অপরাধ ক্ষেম মোর শরণ লইল॥
চরণ অমৃত দিয়া পুত্র (ঘ) বাঁচাইলে।
ভৃত্য বলি আপনার বড় কৃপা কৈলে॥
কন্যা এক আছে মোর বিবাহের যোগ্যা।
চরণে সোঁপিতে (ঙ) চাহি যদি হয় আজ্ঞা॥
সদাব্রতী মহাজনে বড় তুষ্ট হৈলা।
কন্যা যে বিবাহ করি এক লীলা কৈলা॥
অতএব কত প্রীত (চ) দেখহ বৈষ্ণবে।
অলৌকিক ভাব যাহা লোকে না সম্ভবে॥

পাঠান্তর—(ক) শব—সব।
(খ) ঐর্মান—অইর্মান এবং অর্মান।
(গ) স্ত্রীর—পত্নীর।
(ঘ) পুত্র—পুন।
(ঙ) সোঁপিতে—অর্পিতে।
(চ) প্রীত—প্রীতি।

তাহার চরণে করি কোটি নমস্কার।
আমা-সভার এ জন্মের ফল সেই সার॥

চরিত্র শ্রীভুবন চৌহান

ভুবন চৌহান নাম রাজার জমাদার।
কৃষ্ণে নিয়োজিত মন গুণের সাগর॥
কর্ম্মেতে কুশল রাজা অতি প্রীত (ক) করে
মৃগয়া করিতে গেলে রাজার সম্ভিব্যারে॥
বনে এক হরিণী যে পূর্ণ গর্ভবতী।
হঠাৎকার তলোয়ার হানে তাহা প্রতি॥
বাচ্ছাসহ কাটিয়া পাড়য়ে ভূমিতলে।
দেখি উপজিল দয়া কর হানে ভালে॥
ছি ছি ধিক ধিক মুঞি কি কর্ম্ম করিনু।
আপনার স্কন্ধে চোট কেনে নাহি দিনু॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে মুঞি আশ্রয় করিল।
তার প্রতিকুল আচরণ এই হৈল (খ)॥
হেন কর্ম্ম আমার যে ধর্ম্ম কভু নহে।
আজি হৈতে তলোয়ার না ধরিব দেহে॥
চাকুরি ছাড়িলে সে গুজুরান না চলিবে।
জীবিকা নহিলে কিসে স্ত্রী পুত্র বাঁচিবে॥
অতএব স্বর্ণমুট খাপ বানাইয়া।
কাষ্ঠের তলোয়ার করি গোপন করিয়া॥
তার মধ্যে রাখি যেন না জানয়ে কেহ।
হিংসা না করিতে হয় যাবত এ দেহ॥
এতো ভাবি কাষ্ঠের তলোয়ার তাহে রাখে।
বিপক্ষ তাহার মধ্যে কেহ তাহা দেখে॥
রাজার নিকটে গিয়া ঠগপনা করি।
কহয়েই চৌহানের খাপের ভিতরি॥
কাষ্ঠের তলোয়ার হয় বাহ্যে মাত্র ভাণ।
রাজা না প্রত্যয় যায় নাহি দেয় কাণ॥
পুনঃপুন প্রতিদিন যদি সে কহয়।
পরখের (গ) হেতু কিছু কৌশল করয়॥

পাঠান্তর—(ক) প্রীত—প্রীতি।
(খ) হৈল—কৈল।
(গ) পরখের—পরীক্ষার।

একদিন ফিরিতে চলিলা বাগিচাতে।
পাত্রমিত্র আর চৌহানেরে নিল সাথে॥
বাগিচার পুষ্করণীর তীরেতে বসিয়া।
রাজা কহে সভাকারে হাসিয়া হাসিয়া॥
কেমন তলোয়ার কার দেখাও খুলিয়া।
ক্রমেতে দেখাও সভে বাহির করিয়া॥
ভুবন চৌহান ভাবে হায় কি করিব।
কাষ্ঠের তলোয়ার যে কেমনে নিকশিব॥
রুটি যাবে আর যে লজ্জার সীমা নাঞি।
এ বিপদ হতে যদি রাখেন গোসাঞি॥
মনে ভাবে হে কৃষ্ণ হে লজ্জানিবারণ।
এবার রাখহ প্রভু তোমার শরণ॥
এতো ভাবি (ক) খাপে হৈতে নিকাশে তলোয়ার।
কাষ্ঠ ঘুচি হৈল যেন হীরার বিকার॥
সভা হৈতে শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব অংশেতে জিনিঞা।
বিজুরী চমকে যেন চৌদিগ ব্যাপিয়া॥
সভে প্রশংসয় নৃপের সংশয় মিটিল।
চুকুলি (খ) যে কৈল তারে বাঁধিতে কহিল॥
সাধুর স্বভাব চৌহানের দয়া হৈল।
দাণ্ডাইয়া রাজা আগে নিবেদন কৈল॥
উহার না দোষ যে না মোর কিছু গুণ।
সকলের মূলমাত্র বিভুর করুণ॥
আদ্যোপান্ত সব বিবরণ নিবেদিল।
রাজা শুনি চৌহানের প্রতি তুষ্ট হৈল॥
রোজিনা (গ) যে ছিল তাহা দ্বিগুণ করিয়া।
বন্ধান করিয়া দিল অনেক তুষিয়া॥
ঘরে বসি থাক (ঘ) কৃষ্ণ ভজন করহ।
আমার যে কর্ম্ম যুদ্ধবিগ্রহে (ঙ) না যাহ॥
কৃষ্ণকৃপা যারে তার কিসে অনিবৃতি।
তাহার চরণে কোটি দণ্ডবত নতি॥

পাঠান্তর—(ক) ভাবি—ভাবে।
(খ) চুকুলি—চুকলি ও চুগলি।
(গ) রোজিনা—মাহিনা।
(ঘ) থাক—থাকি।
(ঙ) যুদ্ধবিগ্রহে—যুদ্ধবিক্রমে।

চরিত্র শ্রীরূপ চতুর্ভুজ ঠাকুর পূজারি

রূপ-চতুর্ভুজ-ঠাকুর দক্ষিণ মুলুকে।
জগতে প্রসিদ্ধ হয় জানে সর্ব্বলোকে॥
পূজারি ঠাকুর সাধু মহা-অনুভব।
ঠাকুর তাঁহার বশীভূত যৎ সম্ভব॥
রাজা রাজপুত রাণা-খ্যাতি পুরুষাক্রান্তে।
ঠাকুর দর্শনে রাজা (ক) আইলা সন্ধ্যা-অন্তে॥
ভোগ লাগি শয়নে আছয়ে সে সময়।
দরশন নহিল রাজন্ (খ) চলি যায়॥
এইকালে পূজারিজী (গ) শ্রীঅঙ্গ হইতে।
পুষ্পহার আনি দিল রাজার গলাতে॥
দৈবাত্ত মালাতে এক পাকা চুল ছিল।
রাজা তাহা দৃষ্টমাত্রে (ঘ) অগ্নিসম হৈল॥
রাজা ক্রোধে কহে আরে ব্যাধ দুরাচার (ঙ)।
নখ-কেশ বলি তব নাহিক বিচার॥
পাকাচুল পুষ্পহারে আইল কেমতে (চ)।
হঠাত পূজারি কহে শ্রীমস্তক হৈতে॥
কহিয়া ভাবয়ে অসম্ভব কি কহিনু।
পুন ভাবে সেই সত্য কহিনু কহিনু॥
রাজা পুন গালি পাড়ে ত্রেস্কার (ছ) করয়।
হারে ধৃষ্ট শ্রীঅঙ্গে (জ) কি পাকাচুল হয়॥
পুনশ্চ পূজারি কহে হুঁ হুঁ মহারাজ।
পক্ক চুল শ্রীমস্তকে করয়ে বিরাজ॥
ক্রোধে রাজা কহে পুন পারিবে দেখাইতে।
তেঁহো কহে যে আজ্ঞা দেখাব দিবসেতে॥
রাজা কহে যদি কল্য পার দেখাইতে (ঝ)।
নতুবা করিব দূর করিয়া উচিতে॥

পাঠান্তর—(ক) রাজা—তথা।
(খ) নহিল রাজন্—না হইল রাজা।
(গ) পূজারিজী—পূজারী যে।
(ঘ) দৃষ্টমাত্রে—দৃষ্টিমাত্রে।
(ঙ) দুরাচার—অনাচার।
(চ) কেমতে—কিমতে।
(ছ) পাড়ে ত্রেস্কার—পাড়ি তিরস্কার।
(জ) ধৃষ্ট শ্রীঅঙ্গে—ভ্রষ্ট অঙ্গেতে।
(ঝ) পার দেখাইতে—না পার দেখাতে।

এতো কহি রাজা চলি গেলা নিজ গৃহে।
পূজারি উদ্বিগ্ন-মনা চিত্ত স্থির নহে॥
মোর দণ্ড করুক তাহার (ক) নাহি দায়।
পাছে মোরে প্রভুসেবা হইতে ছুটায় (খ)॥
এতো ভাবি ঠাকুরের চরণে ধরিয়া (গ)।
কাকুবাদ করে বহু স্তবন করিয়া॥
তোমার চরণ প্রভু শরণ আমার।
অপরাধ ক্ষেমা করি রাখহ এবার (ঘ)॥
আমার ভকতি নাহি তুমি তো দয়াল।
ভৃত্যের রক্ষার হেতু ধর শ্বেতবাল[১]॥
এতো কাকু উক্তি যদি করিল ভকত।
তৎক্ষণে মস্তকে চুল নিকশিল শ্বেত॥
বিপ্র সাধু সারানিশি গুণ-গান করি।
প্রেমানন্দ-নীরে ভাসে আপনা পাসরি॥
প্রাতে রাজা কোপে পদাতিক পাঠাইলা।
বিপ্রেরে আনহ মোরে পরিহাস কৈলা॥
ঠাকুরের শিরে কহে পাকা (ঙ) চুল হয়।
এইমত মিথ্যা কহি মোরে বিড়ম্বয়॥
পদাতিক আসি কহে তুরিতে (চ) চলহ।
পূজারি কহেন মহারাজে গিয়া কহ॥
শ্বেত কেশ প্রভু-শিরে হয় কিনা হয়।
আসিয়া দেখুন তবে (ছ) কি ফল (জ) যাওয়ায়॥
পদাতিক গিয়া নৃপে নিবেদন কৈলা।
রাজা নিয়মিত মতে দরশনে গেলা (ঝ)॥
যাইয়া দেখয়ে চন্দ্রবদন উজ্জ্বল।
আর এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পক্কবাল (ঞ)॥

পাঠান্তর (ক) তাহার—তাহাতে।
(খ) পাছে মোরে প্রভুর যে সেবাতে ছুটায়।
(গ) চরণে ধরিয়া—চরণ স্মরিয়া।
(ঘ) রাখহ এবার—রাখ একবার।
(ঙ) পাকা—সাদা।
(চ) তুরিতে—ত্বরিত।
(ছ) তবে—শির।
(জ) কি ফল—বিফল।
(ঝ) গেলা—আইলা।
(ঞ) পক্কবাল—পক্কচুল।

১। শ্বেতবাল—সাদা চুল।

অপ্রাকৃত রূপ সেই অপ্রাকৃত বাল।
কাঁচা পাকা চুলে তাঁর সকলি নেহাল॥
সুন্দর যে হয়ে তার সকলি সুন্দর।
মৃত্তিকাও মাখিলে সে (ক) হয়ে মনোহর॥
দেখিয়া রাজার চমৎকার হৈল চিত্তে।
অনিমিখে চাহে যেন পুত্তলিকা ভিত্তে॥
দেখিতে দেখিতে যে কুতর্ক উঠে মনে।
বুঝি এ কৃত্রিম চুল করিল ব্রাহ্মণে॥
এতো ভাবি নিকটে যাইয়া এক গাছি।
ধরিয়া টানিল রাজা মুচকি মুচকি॥
টানিতেই রক্তধারা বহিয়া পড়িল।
ভয়ে চমকিয়া রাজা পাছুতে হাঁটিল (খ)॥
তখন বিপ্রের পায় পড়িয়া মিনতি।
করিল রাজন বহু দণ্ডবত স্তুতি (গ)॥
কিন্তু সেই হৈতে রাজা রাজার সন্তানে।
আজ্ঞা নাহি ঠাকুরের গিয়া দরশনে॥
যেই দরশনে যায় তৎক্ষণেতে (ঘ) মরে।
অদ্যাবধি দরশনে নাহি যায় ডরে॥
অতএব ভক্ত-অনুরোধ করি হরি।
অলৌকিক প্রকট করয়ে রূপ ধরি॥
সেই যে পূজারি তাঁর চরণে শরণ।
লইবারে ধায় লালদাস দীনজন (ঙ)॥

চরিত্র শ্রীকমধ্বজ[১]

চারি ভাই হয়ে রাণা-রাজার চাকর।
তার মধ্যে হয়ে এক কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কমধ্বজ নাম তাঁর কৃষ্ণ অনুরাগে।
রাজকর্ম্মে নাহি যায় বিষয়-বিরাগে॥

পাঠান্তর—(ক) মৃত্তিকাও মাখিলে সে—মৃত্তিকা মাখিলে সেহ।
(খ) চমকিয়া...হাঁটিল—চমকিত...হটিল।
(গ) রাজন বহু দণ্ডবত স্তুতি—কতেক বহু দণ্ডবত নতি।
(ঘ) তৎক্ষণেতে—তৎক্ষণাতে।
(ঙ) দীনজন—হীনজন।

১। কমধ্বজ—কামধ্বজ শব্দের অপভ্রংশ।

গ্রামের নিকটে বন তাঁহা কৈল বাস।
ঘরে আসি অন্ন খাইয়া যায় এক গ্রাস॥
অন্য ভাইগণ বহু করে তিরস্কারে (ক)।
কে এতো রোজগার করি খাওয়াইবে তোরে॥
চাকুরি ছাড়িয়া কর বনে বসি ধ্যান।
মরিলে না গতি মোরা করিব কখন॥
এতো যদি ভ্রাতাগণ কহিল নিষ্ঠুর।
তেঁহো তবে কহে কিছু করিয়া মধুর॥
তোমরা চাকুরি কর মুঞি না বেকার।
যেঁহো সকলের ভর্ত্তা চাকর তাঁহার॥
তোমার ভরসা নাহি করি খাইবারে।
অভাব কিসের আছে তাঁহার সরকারে॥
মরিলে কি গতি ভাই তোমরা করিবে।
ত্রিভুবনে গতি যেই সেই করি লবে॥
এতেক কহিয়া সেই সঙ্গ ছাড়ি দিলা।
বনে বসি রামনাম জপিতে লাগিলা॥
ভর্ত্তা যেঁহো তেঁহো কোন ছলেতে আহার।
প্রতিদিন সেই বনে যোগান তাহার॥
কথোক দিবসে কালপ্রাপ্ত যবে হৈল।
শ্রীল হনুমান্ আসি শেষগতি (খ) কৈল॥
ভকতের প্রতিজ্ঞা যে তাহাই হইল।
প্রকারে শ্রীকপিরাজ লোকে ব্যক্ত কৈল॥
শ্রীরাম চরণে যেই এতেক নৈষ্ঠিক।
দয়াল প্রভুর যার প্রতি এতাদৃক॥
তাঁহার চরণে দাস জন্মে জন্মে হই।
লালদাস অভাগার আর গতি নাঞি॥

চরিত্র শ্রীমহারাজ শ্রীজয়মল

জয়মল নামে এক রাজা শুদ্ধমতি।
অনির্ব্বচনীয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণে পিরীতি॥
ভক্তি-অঙ্গ যাজনে যে সুদৃঢ় নিয়ম।
পাষাণের রেক (গ) যেন নাহি বেশি কম॥
শ্যামলসুন্দর-নাম-শ্রীবিগ্রহ-সেবা।
তাহাতে প্রপন্ন (ক) নাহি জানে দেবী দেবা॥
দশদন্ড বেলাতক (খ) তাঁহার সেবায়।
নিযুক্ত থাকয়ে সদা দৃঢ়নিয়ম হয়॥
রাজ্যধন যায় কিবা বজ্রাঘাত হয়।
তথাপিহ সেবা সমে ফিরি না তাকায় (গ)॥
প্রতিযোগী[১] রাজা ইহা সন্ধান জানিঞা।
সেই অবকাশ কালে আইল হানা দিয়া॥
রাজার হুকুম বিনে সৈন্যআদিগণ।
যুদ্ধ না করিতে পারে করে নিরীক্ষণ॥
ক্রমে ক্রমে আসি গড় ঘেরে রিপুগণ।
তথাপিহ তাহাতে কিঞ্চিত নাহি মন॥
মাতা তাঁর আসি কহে করি উচ্চ ধ্বনি।
উদ্বিগ্ন হইয়া যে মাথায় কর হানি॥
সর্ব্বস্ব লইল আর সর্ব্বনাশ হৈল।
তথাপি তোমার কিছু ভুরুক্ষেপ নৈল (ঘ)॥
জয়মল বলে মাতা কেনে দুঃখ ভাব।
যেই দিল সেই লবে তাহে কি করিব॥
সেই যদি রাখে তবে কে লইতে পারে।
অতএব আমা সবার উদ্যমে কি করে॥
শ্যামল-সুন্দর হেথা ঘোড়ায় চড়িয়া।
যুদ্ধ করিবারে গেল অস্তর ধরিয়া (ঙ)॥
একাই ভক্তের রিপু সৈন্যগণ মারি।
আসিয়া বান্ধিল ঘোড়া আপন তেওয়ারি (চ)॥
সেবা-সমাপনে রাজা নিরখিয়া দেখে।
ঘোড়ার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম শ্বাস বহে নাকে॥
জিজ্ঞাসয়ে মোর অশ্বে সওয়ার কে হৈল।
ঠাকুরের মন্দিরে বা কে আনি (ছ) বান্ধিল॥

পাঠান্তর—(ক) করে তিরস্কারে—তিরস্কার করে এবং করয়ে ভ্রেস্কারে।
(খ) শেষগতি—তার গতি।
(গ) রেক—রেখা।

পাঠান্তর—(ক) প্রপন্ন—প্রসন্ন।
(খ) বেলাতক—বেলাবধি।
(গ) সেবা সমে ফিরি না তাকায়—সেবাকালে ফিরিয়া না চায়।
(ঘ) ভুরুক্ষেপ নৈল—ভ্রূক্ষেপ নহিল।
(ঙ) অস্তর ধরিয়া—তেঁহো অস্ত্র লৈয়া।
(চ) তেওয়ারি—দুয়ারি।
(ছ) বা কে আনি—কে আনিয়া।
১। প্রতিযোগী—বিরোধী, শত্রু।

সভে কহে কে চাড়িল কে আনি (ক) বান্ধিল।
আমরা নাহিক জানি কখন আনিল॥
সংশয় হইয়া রাজা ভাবিতে ভাবিতে।
সৈন্য সামন্তসহ চলিল যুদ্ধেতে॥
যুদ্ধস্থানে গিয়া দেখে শত্তুরের (খ) সৈন্য।
রণশয্যায় শুইয়াছে মাত্র এক ভিন্ন॥
প্রধান যে রাজা সেই শেষ মাত্র আছে।
বিস্ময় হইয়া ঞিহ কারণ কি পুছে॥
হেনকালে অই প্রতিযোগিতা যে (গ) রাজা।
গলে বস্ত্র বান্ধিয়া আইল লঞা পূজা (ঘ)॥
আসিয়া জয়মল মহারাজার অগ্রেতে।
নিবেদন করে কিছু করি যোড় হাথে॥
কি করিব যুদ্ধ তব এক যে সেফাই।
পরম আশ্চর্য্য সেই ত্রৈলোক্য-বিজই॥
অর্থ নাহি মাগোঁ মুঞি রাজ্য নাহি চাহোঁ।
বরঞ্চ আমার রাজ্য চল দিব (ঙ) লহ॥
শ্যামল সেফাই যেই লড়িতে আইল।
তোমা সনে নাতা (চ) কি তার বিবরিয়া বল॥
সৈন্য যে মরিল মোর তারে মুঞি পারি।
দরশন মাত্রে মোর চিত্ত নিল হরি॥
জয়মল বুঝিল এই শ্যামলজীর কর্ম্ম।
প্রতিযোগী রাজা যে বুঝিল ইহ মর্ম্ম॥
জয়মলের চরণ ধরিয়া স্তব করে।
যাঁহার প্রসাদে কৃষ্ণকৃপা কৈল তারে॥
তাঁহা সভার শ্রীচরণে শরণ আমার।
শ্যামল সেফাই যেন করে (ছ) অঙ্গীকার॥

চরিত্র শ্রীগোয়াল ভক্ত

এক যে গোয়াল হরিভক্ত মতি ধীর।
গো ভাঁঞস রাখে কিন্তু স্বভাব গম্ভীর॥
বনে পশু ছাড়ি দিয়া নির্জ্জনে বসিয়া।
কৃষ্ণনাম করে সদা আনন্দিত হিয়া (ক)॥
দৈবাৎ ভাঁঞস এক চোরেতে লইলা।
ভাঁঞস না মিলে ঘরে মাতা জিজ্ঞাসিলা॥
মাতার ভয়েতে কহে দিল ব্রাহ্মণেরে।
ঘৃতাদি ভোজন করি পুন দিবে ফিরে॥
ভাঁঞস যে লৈল চোর (খ) দীপান্বিতা দিনে।
সেই যে ভাঁঞস সাজাইয়া সুভূষণে॥
কুলাচার মতে সেই উৎসব করিল।
চরিতে চরিতে কিছু দূরবন গেল॥
ভক্তের ভাঁঞস কৃষ্ণচন্দ্র যে জানিঞা।
রাখালের বেশ ধরি আনে চালাইয়া॥
গোয়াল-ভক্তের গৃহে আপনি আনিল।
বহু অলঙ্কার সহ গোয়াল পাইল॥
ভক্তের করিতে হিত সদাই ফিরয়।
অতএব ভক্তপদ সভার আশ্রয়॥

চরিত্র শ্রীনিষ্কিঞ্চন ব্রাহ্মণ

হরিপাল-বিপ্রপুত্র নিষ্কিঞ্চন নাম।
বৈষ্ণব-সেবন-ব্রত মাত্র (গ) অনুপাম॥
বৃত্তি জীবিকা অর্থ যতেক আছিল।
বৈষ্ণব-সেবায় সর্ব্ব অর্থ ফুরাইল॥
ঐকান্তিক অনুরাগ বৈষ্ণব সেবায়।
না পাইয়া করিতে অন্তরে দুঃখ পায়॥
উৎকণ্ঠাতে দস্যুবৃত্তি করিয়া আনয়।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য দিগ্‌বিদিগ না (ঘ) চায়॥
দিন দুই তিন কোথাও কিছুই না পায়।
বড়ই খেদিত হৈয়া ইথি উথি ধায়॥
হেথায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উৎকণ্ঠা (ঙ) হইয়া।
শীঘ্রগতি ভক্তস্থানে চলিলা ধাইয়া॥

পাঠান্তর—(ক) কে চাড়িল কে আনি—কি জানি কে আনিয়া।
(খ) শত্তুরের—শত্রুর যত।
(গ) অই প্রতিযোগিতা যে—ঐ প্রতিযোগী যেই।
(ঘ) গলবস্ত্র হইয়া লইয়া বহু পূজা।
(ঙ) চল দিব—গিয়ে তুমি।
(চ) নাতা—প্রীত।
(ছ) যেন করে—মোরে কর।

পাঠান্তর—(ক) হিয়া—হইয়া।
(খ) ভাঁঞস যে লৈল চোর—ভাঁঞস লইল চোরে।
(গ) মাত্র—ভক্ত।
(ঘ) না—নাহি।
(ঙ) হেথায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উৎকণ্ঠা—হেথা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভু উৎকণ্ঠা।

রুক্মিণী সুন্দরী বস্ত্র-অঞ্চল ধরিল।
এতো ত্বরা কোথায় যাইতে (ক) মোরে বল॥
কৃষ্ণচন্দ্র কহে এক ভক্ত বোলাইল।
ঠাকুরাণী বলে তবে মোরে লঞা চল॥
সুন্দর সুন্দরী দোঁহে ছদ্মরূপ ধরি।
ভূষণে ভূষিতা যথা প্রাকৃত নাগরী॥
হেথা (খ) নিষ্কিঞ্চন ভক্ত বনে বসিয়াছে।
তথা দিয়া চলি যায় দোঁহে আগে পাছে॥
দূরে হৈতে দেখি সাধু নিকটে আসিয়া।
রুক্মিণী দেবীর হস্ত কহয়ে ধরিয়া॥
অঙ্গ-আভরণ মোরে কিছু দিয়া যাও।
নতুবা কাড়িয়া লব যদি নাহি দেও॥
কৌতুক দেখিতে কৃষ্ণচন্দ্র পলাইলা।
কিঞ্চিত দূরেতে গিয়া চাহিয়া রহিলা॥
দেবী মনে ভাবে এতো বড়ই উৎপাত।
গহনা মাগয়ে নাহি ছাড়ি দেয় হাথ॥
আঁখি ছল ছল করে ডাকিয়া কহয়।
কৃষ্ণ কোথা গেলে (গ) মোরে ছাড়িয়া না দেয়॥
কৃষ্ণ আরো দূরে যান কৌতুক করিয়া।
দেবী উচ্চস্বর করি ডাকে ফুকরিয়া॥
কৃষ্ণ তাহা শুনে নাহি শুনিতে না পান (ঘ)।
দেবী গালি পাড়িতে লাগিলা করি মান॥
আইনু এমন দুষ্ট ধৃষ্ট সমিভব্যারে।
পলাইল দস্যু হস্তে (ঙ) ডারিয়া আমারে॥
কঙ্কণ দুগাছি সাধু খুলিয়া লইল।
অঙ্গুলির রত্নাঙ্গুরী (চ) খুলিতে লাগিল॥
ফাঁফর হইয়া দেবী কিছু নাহি কয়।
কৃষ্ণচন্দ্র যেদিগে সেই দিগ নিরখয় (ছ)॥

পাঠান্তর—(ক) যাইতে—যাইবা।
(খ) হেথা—যথা।
(গ) কৃষ্ণ কোথা গেলে—কোথা গেলে কৃষ্ণ।
(ঘ) কৃষ্ণ নাহি শুনে নাহি ফিরিয়া তাকান।
(ঙ) দস্যু হস্তে—দুষ্ট হস্তে।
(চ) রত্নাঙ্গুরী—অঙ্গুরী যে।
(ছ) সেই দিগ নিরখয়—সেদিক নিরীক্ষয়।

আঙ্গুল মুচাড়ি যে (ক) অঙ্গুরি খুলি নিলা।
তবে কৃষ্ণচন্দ্র হাসিতে হাসিতে তথা আইলা (খ)॥
ক্রোধ করি দেবী কহে আর তোমা-সনে।
কোথাও না যাব আমি যাইয়ে যেখানে॥
অলঙ্কার কাড়ি নিল তুমি পলাইলে।
কাপুরুষ প্রায় রক্ষা করিতে নারিলে॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন দেবি বৃত্তান্ত ইহার।
দস্যু নহে ঞিহ প্রিয়ভক্ত যে আমার॥
আমার ভক্তের ভক্ত বড় অধিকারী।
অনুরাগ বিশিষ্ট সেবার্থে করে চুরি॥
দেবী কহে চুরি যে সে অধমের (গ) কর্ম্ম।
কৃষ্ণ কহে ইহার আছয়ে কিছু মর্ম্ম॥
মো-বিষয়ে অনুরাগ যাহার জন্ময়।
মোর সেবা অর্থে ধর্ম্মাধর্ম্ম না দেখয় (ঘ)॥
অনুষঙ্গ তাহাতে যে পাপ কর্ম্ম হয়।
পরম ধর্ম্মের জন্য হিত উপজয়॥

প্রমাণং—

"মন্নিমিত্তে কৃতং পাপমতি ধর্ম্মায় কল্পতে" ইতি।

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

অতএব বৈষ্ণব-সেবার্থে ইহ ব্যস্ত।
আমার সুখদ সেই যতেক সমস্ত॥
বৈষ্ণব না সেবি মাত্র আমারে সেবয়।
মোর ভক্ত মধ্যে সেহ কভু নাহি হয়॥
বৈষ্ণবের সেবা অনুরাগে কৈল চুরি।
পাপ সেহ নহে প্রীত (ঙ) জন্মিল আমারি॥

আদিপুরাণে—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ"
ইত্যাদি।

(অনুবাদাদি পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য)

পাঠান্তর—(ক) আঙ্গুল মুচাড়ি যে—মুচাড়িয়া অঙ্গুলি।
(খ) তবে কৃষ্ণচন্দ্র হাসি তথায় আইলা।
(গ) অধমের—অধর্ম্মের।
(ঘ) মোর সেবা ধর্ম্মাধর্ম্মহেতু না দেখয়।
(ঙ) পাপ সেহ নহে প্রীত—পাপ যে নহিল প্রীতি।

এতো শুনি দেবী মনে আনন্দ পাইয়া।
নিষ্কিঞ্চন পানে চাহে স্নেহাবিষ্ট হৈয়া॥
ছদ্মরূপ ছাড়ি তবে স্বরূপ প্রকাশি।
চতুর্ভুজ রূপে সহ রুক্মিণী প্রেয়সী॥
সম্মুখে প্রকাশ হৈলা দোঁহে নিষ্কিঞ্চনের।
কোটি ইন্দু নিন্দি কান্তি নখে চরণের॥
অলৌকিক চিন্ময় পরমানন্দ রূপ।
হঠাৎকার দৃষ্টিপথে হইল অনূপ॥
হেরি প্রেমানন্দে মূর্চ্ছা হইয়া পড়য়।
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব[১] হইল উদয়॥
একবার পড়ে আরবার উঠি হেরে।
দণ্ডবত নতি-স্তুতি বার বার করে॥
কৃষ্ণ নিজ প্রিয়ভক্তে আত্মসাত কৈল।
বৈষ্ণব-সেবন-কল্পলতিকা ফলিল॥
অতএব অরে মন বিবেক ভজহ।
বৈষ্ণব চরণে রতি (ক) একান্ত করহ॥
নিষ্কিঞ্চন সাধু পদে প্রার্থনা যে করোঁ।
কিছু উপকার লালদাসের বিচারো॥

১। অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব—স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বিবর্ণতা, স্বরভঙ্গ, প্রলয় বা মূর্চ্ছা।

পাঠান্তর—(ক) রতি—মতি।

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীশিলাপিল্লা-সেবি-রাজকন্যা-আদি-চরিত্র-বর্ণনং নাম চতুর্দ্দশমালা ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

চরিত্র ছোট বিপ্র বড় বিপ্র

বিদ্যানগরে দুই ব্রাহ্মণ বিশিষ্ট।
কৃষ্ণভক্ত সদাচার মতি শান্ত শিষ্ট॥
পরামর্শ করি দোঁহে তীর্থভ্রমে গেলা।
অনেক দিবস তীর্থ ভ্রমণ করিলা॥
ছোট বিপ্র বড় বিপ্রের সেবা যে করিল।
তাহাতেই বড় বিপ্র সন্তোষ হইল॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে বৃন্দাবনে গেলা।
গোপাল দর্শন করি আনন্দ পাইলা॥
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে প্রসন্ন হইয়া।
কহে কিছু তাঁহা প্রতি (ক) গদগদ হিয়া॥
তুমি মোর উপকার অনেক করিলে।
সেবায় আমারে ঋণী করিয়া রাখিলে॥
ইহার যে প্রত্যুপকার যদি না করিব।
ঋণগ্রস্ত থাকি আমি কৃতঘ্নতা পাব (খ)॥
অতএব গৃহে মোর কন্যা যে আছয়।
তোমারে বিবাহ দিব কহিল (গ) নিশ্চয়॥
ছোট বিপ্র বলে তুমি কুলবন্ত হও।
মোরে কন্যা দিবে অসম্ভব কেনে কও॥
তেঁহো কহে মোর নাহি কুলের তাৎপর্য্য।
ধর্ম্ম রক্ষা হয় যাথে সেই মোর কার্য্য॥
তবে ছোট বিপ্র বলে গোপাল প্রমাণে।
যদি কহ তবে সে প্রতীত হয় মনে॥
গোপালেরে সাক্ষী তবে উভয়ে করিলা।
কথোক দিবসে নিজগৃহে চলি গেলা॥
ছোট বিপ্র কহে তবে কন্যা-বিভা দেহ।
বড় বিপ্র কহয়ে অবশ্য দিব রহ॥
নিজ পুত্র পরিবারে (ক) বিশেষ কহিল।
ধর্ম্ম প্রতিশ্রুত আছি কন্যা দিতে হৈল॥
পুত্র কহে এ কেমনে হৈলে প্রতিশ্রুত।
অপাত্রেতে কন্যা দিবে অতি অনোচিত॥
আমরা কুলীন ওতো নীচ জাত্য-অংশে (খ)।
লোকে নিন্দা করিবেক কুল যাবে বংশে॥
তেঁহো কহে কি করিব সত্য যে করিনু।
পুত্র কহে দোষ নাহি কহ না কহিনু॥
তবে যদি কন্যা দেহ করিনু নিশ্চয়।
বিষ খাব কিংবা ছুরি মারিব হৃদয় (গ)॥
বিপদে পড়িলা বিপ্র দুই বিপরীত।
ভাবিয়া না পায় কিছু হইলা দুঃখিত॥
ছোট বিপ্র আসি যবে প্রসঙ্গ করয়ে।
পুত্র মারিবারে ধায় কটু কথা (ঘ) কয়ে॥
মোর পিতা একা তাঁরে ভাঙ্গ খাওয়াইয়া।
অর্থ লুটি নিলা আর চাতুরী করিয়া॥
কহে কন্যা দিবে মোরে মিথ্যা উঠাইল।
সাক্ষী কেহ হয় ইহা জানে (ঙ) যে কহিল॥
ছোট বিপ্র কয় হয় হয় সাক্ষী (চ) আছে।
প্রতিজ্ঞা করহ পঞ্চ ভদ্রলোক কাছে॥
তবে সাক্ষী আনি বোলাইয়া যে কহাই।
পুন যদি অন্যায় না কর তবে যাই॥

পাঠান্তর—(ক) তাঁহা প্রতি—যাহা হিত।
(খ) আমি কৃতঘ্নতা পাব—কৃতঘ্নতা যে পাইব।
(গ) কহিল—কহিনু।

পাঠান্তর—(ক) নিজ পুত্র পরিবারে—নিজ পরিবারে বিপ্র।
(খ) ওতো নীচ জাত্য-অংশে—তেঁহো নীচ জাত্যংশে।
(গ) হৃদয়—গলায়।
(ঘ) কটু কথা—কটু কথা।
(ঙ) জানে—সভে।
(চ) কয় হয় হয় সাক্ষী—বলে হয় সাক্ষী মোর।

তেঁহো কহে সাক্ষী তব কোথায় আছয়।
ছোট বিপ্র বলে ইহা গোপাল জানয়॥
বৃন্দাবননাথ যোগপীঠে বিরাজয়।
তেঁহো কহে হয় হয় তেঁহো যদি কয়॥
মনে ভাবে প্রতিমা কি চলিয়া আসিবে।
অসম্ভব এই কথা গোপাল কহিবে॥
তবে ভদ্র পঞ্চ লোক প্রমাণ করিয়া।
ছোট বিপ্র গেলা ব্রজে (ক) গোপাল লাগিয়া॥
তেঁহো কি প্রতিমা বলি জানয়ে গোপালে।
সাক্ষী হৈল অবশ্য আসিবে মোর বোলে॥
দোঁহাতে জানয়ে দোঁহাকার মনোবৃত্তি।
প্রাকৃতিক বুদ্ধি যার করয়ে আপত্তি॥
এত যে আগ্রহ নহে বিবাহের লাগি।
বড় বিপ্র পাছে হয় অধর্ম্মের ভাগী॥
সাধুর স্বভাব পর-পীড়ায় পীড়িত।
অতএব ছোট বিপ্র উৎকণ্ঠিত চিত (খ)॥
হেথা বড় বিপ্র অতি কাতর হইয়া।
গোপালেরে স্তুতি করে বিনতি করিয়া॥
তোমার কিংকর মুঞি দুই রক্ষা কর।
পরিবার বাঁচে আর অসত্যে (গ) নিস্তার॥
সাক্ষী আসিয়া প্রভু দেহ কৃপা করি।
তোমার যে এক যশ (ঘ) রবে জগভরি॥
হোথা ছোট বিপ্র শ্রীমান্ (ঙ) বৃন্দাবনে গিয়া।
গোপালে যতন করে সাক্ষীর লাগিয়া॥
গোপাল কহেন মুঞি প্রতিমা হইয়া।
কেমনে যাইব পথে চরণে চলিয়া॥
বিপ্র কহে নাহি পার চলিতে চরণে।
প্রতিমা হইয়া তবে কথা কহ কেনে॥
হাসিয়া গোপাল তবে কহেন ব্রাহ্মণে।
তবে চল যাই সাক্ষী দিতে তব সনে॥

পাঠান্তর—(ক) ব্রজে—ব্রজ।
(খ) উৎকণ্ঠিত চিত—চিত উৎকণ্ঠিত।
(গ) অসত্যে—সত্যেতে।
(ঘ) যে এক যশ—এ যশ প্রভু।
(ঙ) ছোট বিপ্র শ্রীমান্- শ্রীমান্ ছোট বিপ্র।

এক সের অন্ন মোরে ভোগ লাগাইবে।
পিছে পিছে যাব তব ফিরে (ক) না চাহিবে॥
যেইখানে ফিরিয়া চাহিবে আমা পানে।
আগে আর না যাব (খ) থাকিব সেখানে॥
বিপ্র কহে যাও কিনা জানিব কেমনে (গ)।
নূপুরের ধ্বনি মোর শুনিবে শ্রবণে॥
ভাল ভাল বলি বিপ্র অগ্রসার (ঘ) হৈল।
গোপাল তাহার পাছু পাছুতে (ঙ) চলিল॥
গ্রামের নিকটে আসি নূপুর ছিদ্রিরে (চ)।
বালি সাম্বাইয়া (ছ) আর রব নাহি করে॥
ব্রাহ্মণের মনে কিছু সন্দেহ হইল।
গোপাল না আইসে বলি ফিরিয়া চাহিল॥
হাসিয়া গোপাল সেইখানে রহি গেলা।
গ্রামে গিয়া ছোট বিপ্র সভারে কহিলা॥
আশ্চর্য্য মানিয়া সভে দেখিতে আইলা।
তার মধ্যে উপযুক্ত যে যে লোক ছিলা॥
সাক্ষীর স্বরূপ তাহাদিগেরে কহিলা।
আকাশ বাণীর ন্যায় শুনিতে পাইলা॥
বড় বিপ্র নিজকন্যা ছোট বিপ্রে দিবে।
এ কথা যথার্থ হয়ে সবাই জানিবে॥
তবে বড় বিপ্রে অতি আনন্দিত হৈলা।
ছোট বিপ্রে নিজ কন্যা বরণ করিলা॥
মহামহোৎসব হৈল (জ) গোপাল লইয়া।
রাজা দিল সুন্দর মন্দির বানাইয়া॥
কথোক দিবস হরি তথাই আছিলা।
পরে শ্রীপুরুষোত্তম-পুরীতে রহিলা॥
একদিন জগন্নাথ সেবকে কহয়ে।
মোর ভোগ সামগ্রী যে যতেক আইসয়ে॥

পাঠান্তর—(ক) ফিরে—ফিরি।
(খ) আগে আর না যাব—আর আমি নাহি যাব।
(গ) প্রভু বলে যাই কিনা জানিবে কেমনে।
(ঘ) অগ্রসার—অগ্রসর।
(ঙ) পাছু পাছুতে—পাছে পাছেতে।
(চ) ছিদ্রিরে—ছিদ্রেরে।
(ছ) সাম্বাইয়া—সান্ধাইলা।
(জ) হৈল—কৈল।

গোপালের সম্মুখ হইয়া (ক) আসিতে।
সকল গোপাল খায় না পাই খাইতে॥
শ্রীমান্ জগন্নাথ যদি এতেক কহিলা।
স্বতন্তরে গোপালের পুরী বানাইলা॥
সত্যবাদী গোপাল সত্যবাদী নামে গ্রামে।
গোপালের আপনার গ্রাম (খ) নিজ নামে॥
গ্রাম ভূমি-আদি বাগবাগিচা পাটন।
বেশ ভূষা ভোগ (গ) জগন্নাথের যেমন॥
সাক্ষীগোপাল বলি জগতে বিখ্যাত।
পরম সুন্দর রূপ ত্রৈলোক্যের নাথ॥
অতএব ছোট বিপ্র বড় বিপ্র আর।
আপনি (ঘ) কৃতার্থ হৈল তারিল সংসার॥
ব্রজ হৈতে যতনে আনিল ব্রজনাথ।
নিস্তার (ঙ) করিলা লোক যথা ভগীরথ॥
তাঁ-দোঁহার (চ) শ্রীচরণে কোটি নমস্কার।
যাহার প্রসাদে লোক পাইল নিস্তার॥

চরিত্র শ্রীক্ষেত্ররাজ রাণী

ক্ষেত্রবাসী রাজার প্রেয়সী পাটরাণী।
গোপালের দরশনে (ছ) আইলা আপনি॥
গোপালের সৌন্দর্য্যাদি-সৌষ্ঠব দেখিয়া।
পুলক হইল মহা আনন্দিত হিয়া॥
সর্ব্বাঙ্গে সকল ভূষা সুন্দর দেখিল।
নাসায় নোলক না দেখিয়া দুঃখ হৈল (জ)॥
আহা মরি এমন নাসায় নাই মোতি।
কিবা শোভা হৈত তবে সহ ওষ্ঠ-জ্যোতি॥
আপনার নাসিকাতে বৃহতী (ঝ) মুকুতা।
মনে মনে সাধ করে হইয়া ব্যগ্রতা॥

পাঠান্তর—(ক) হইয়া—হয়্যা দ্রব্যাদি।
(খ) আপনার গ্রাম—আবাস হয়।
(গ) ভোগ—আদি।
(ঘ) আপনি—আপনা।
(ঙ) নিস্তার—বিস্তার।
(চ) তাঁ-দোঁহার—তাঁহা দোহে।
(ছ) গোপালের দরশনে—গোপাল দর্শনে তেঁহ।
(জ) হৈল—পাইল।
(ঝ) বৃহতী—বৃহত।

গোপালের নাকে ছিদ্র যদিহ থাকিত।
তবে এই মুক্তা নাসাতলে পরাইত॥
দরশন করি রাণী গৃহে চলি গেলা।
নিশিতে রাণীরে গিয়া আদেশ করিলা॥
মাতা মোর শিশুকালে নাক বিন্ধাইয়া।
মুক্তা পরাইয়াছিল যতন করিয়া॥
সেই ছিদ্র অদ্যাবধি আছে মোর নাসে।
মুকুতা পরিতে মোর মনের উল্লাসে॥
তোমার নাসায় অই বৃহতী মুকুতা।
পরিতে যে হয় সাধ, পাছে পাও ব্যথা॥
প্রাতঃকালে উঠি রাণী ভাবে মনে মনে।
কি স্বপ্ন দেখিনু বলি কান্দয়ে সঘনে (ক)॥
আমার মনের কথা গোপাল জানিল।
মুকুতা পরিতে (খ) সাধ করিয়া কহিল॥
তৎক্ষণাত সেই মুক্তা নাসা হৈতে খুলি।
সম্ভৃত-সম্ভার করি গেলা তথা চলি॥
গোপাল নিকটে গিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া (গ)।
কহে তব মাতা ছিদ্র নাসাতে করিয়া (ঘ)॥
মুক্তা পরাইয়াছিলা যতন করিয়ে।
সেই ছিদ্র অদ্যাপি কি (ঙ) আছয়ে নাসায়ে॥
আহা মরি এবে কেনে নাকে মুক্তা নাঞি।
মুকুতা পরিতে (চ) সাধ হইল মোর ঠাঞি॥
কেমন তোমার মাতা ভূষা পরাইল।
হেন নাসিকাতে একটি মুক্তা না জুড়িল॥
আর যে কহিলে তোমার নাসার মুকুতা।
পরিতে বাসনা হয়ে, পাছে পাও ব্যথা॥
কোনো বা সামগ্রী হয় তুমি হেন চাঁদ।
তোমারে পরাইতে কেবা নাহি করে সাধ॥
প্রাণসহ সর্ব্বস্ব তোমারে দেই যদি।
তথাচ নাহিক পাই সুখের অবধি॥

পাঠান্তর—(ক) কান্দয়ে সঘনে—করয়ে চিন্তনে।
(খ) মুকুতা পরিতে—মুক্তা পরাইতে।
(গ) কান্দিয়া কান্দিয়া—কহয়ে কান্দিয়া।
(ঘ) মাতা তোমার নাসাতলে ছিদ্র কি করিয়া।
(ঙ) অদ্যাপি কি—অদ্যাবধি।
(চ) মুকুতা পরিতে—মুক্তা পরিবারে।

মোর মন জানি (ক) তুমি চাহিলে মুকুতা।
আর কহ মুক্তা দিয়ে পাছে পাও ব্যথা॥
তবে মুক্তা সুন্দর নাসায় পরাইয়া।
মহামহোৎসব কৈল ভুবন ভরিয়া॥
অদ্যাপি রাণীর মুক্তা বলিয়া খেয়াতি।
গোপাল পরেন নাকে (খ) কোন কোন তিথি॥
গোপালের বহু লীলা কহা নাহি যায়।
মুক্তা পরিবার এক হইল উদয়॥
মনোবৃত্তি জানিঞা রাণীর মনস্কাম।
পূর্ণ কৈল, কৈল এক লীলা অভিরাম॥
রাণীর বাৎসল্য-প্রেমে আনন্দ পাইয়া।
পরিল নাসায় মুক্তা আপনি চাহিয়া॥
প্রেমের অধীন মাত্র মুক্তায় কি করে।
কোটি-কোটি লক্ষ্মী যাঁর পদ-সেবা করে॥
রাণী জগন্মাতা তাঁর শ্রীচরণ ধূলি (গ)।
ভুবনপাবন মুঞি যাঙ বলিহারি॥
জগতের মধ্যে সর্ব্ব ফলের যে ফল।
লালদাস আশা করে হইতে নেহাল॥

চরিত্র রামদাস সাধু

দ্বারকা নিকটে স্থিতি রামদাস নাম।
মহা অনুভব সাধু সর্ব্ব-গুণধাম॥
একাদশী-ব্রতপরা পরম নৈষ্ঠিক।
শ্রীমান্ রণছোড়জীর প্রিয়তম অধিক॥
আজন্ম ভরিয়া একাদশীর নিশিতে।
মন্দিরে রণছোড়জীর গুণ-কীর্ত্তনেতে॥
জাগরণ করে কিবা বর্ষা কিবা শীত।
বৃদ্ধাবস্থা হৈল বয়স হইল অশীত॥
ব্যামহ দেখিয়া ঠাকুরের হৈল দয়া।
রামদাসে কহে থাক গৃহেতে বসিয়া॥
আমি সেইখানে যাব আমারে লইয়া।
আপন গৃহেতে রাখ শুশ্রূষা করিয়া॥
রামদাস কহে তুমি রাজরাজেশ্বর।
বড় নাম বড় খ্যাত বড় অধিকার॥
আমার গৃহেতে তুমি কেমনে যাইবে।
তোমার সেবকগণ যাইতে কেনে দিবে॥
ঠাকুর কহেন মুঞি লুকাইয়া যাব।
আমি যদি যাই কেবা রাখিতে পারিব (ক)॥
মন্দির পশ্চাতে এই খিড়কি দুয়ারে (খ)।
গাড়ি এক আনি রাখ চড়ি যাইবারে॥
সময় বুঝিয়া মোরে তাহে চড়াইয়া।
নিশিযোগে যাবে তবে আমারে লইয়া॥
রামদাস-চিত্তে মনে (গ) আনন্দ জন্মিল।
নিশিযোগে গাড়ি আনি তথাই রাখিল॥
নির্জ্জন হইতে তাঁর (ঘ) গউন না সহিল।
ঐমনি ঠাকুর লৈয়া গাড়ী চাপাইল (ঙ)॥
হাঁকাইয়া জোরে কথোক দূরে গেলা (চ)।
পূজারি মন্দিরে আসি প্রবেশ করিলা॥
ঠাকুর না দেখিয়া চৌদিক পানে চাহে (ছ)।
ঠাকুর কোথায় গেলা সোর করি কহে॥
কেহ আসি কহে এক বৈরাগী লইয়া।
যাইতেছে দেখিলাম গাড়ী চড়াইয়া॥
ধাইল পূজারিগণ মার মার করি।
ভয়ে রামদাস ভাবে উপায় কি করি॥
ঠাকুর কহেন মোরে পুষ্করিণীর নীরে।
শীঘ্র রাখহ (জ) লৈয়া জলের ভিতরে॥
জলে লৈয়া রাখে সাধু ঠাকুরের বোলে।
দূরে হইতে দেখে তাহা পূজারি সকলে॥
ধাইয়া যাইয়া রামদাসের শরীরে।
শূলের আঘাত কৈল রক্ত পড়ে ধারে॥

পাঠান্তর—(ক) জানি—জান বা বুঝি।
(খ) নাকে—নাসে।
(গ) শ্রীচরণ ধূলি—চরণের ধূলি।

পাঠান্তর—(ক) কেবা রাখিতে পারিব—কেহ রাখিতে নারিব।
(খ) খিড়কি দুয়ারে—খিড়কির দ্বারে।
(গ) মনে—মহা।
(ঘ) তার—তাঁরে।
(ঙ) লৈয়া গাড়ী চাপাইল—নিঞা গাড়ী চড়াইল।
(চ) গাড়ী হাঁকাইয়া যে কথোক দূরে গেলা।
(ছ) ঠাকুর না দেখি পূজারি চৌদিগেতে চাহে।
(জ) শীঘ্র রাখহ—শীঘ্র করি রাখ।

বাউনি পুষ্কর্ণী হৈতে ঠাকুর তুলিল।
দেখে অঙ্গে রক্তধারা পড়িতে লাগিল॥
তটস্থ হইয়া সভে বিচার করিল।
ভক্তের শরীরে শূল আঘাত করিল॥
অভেদ ভক্তের সহ কৃষ্ণের যে দেহ।
তাহার প্রমাণ এই সাক্ষাতে দেখহ॥
ইহাতে যে অপরাধ হইল প্রচুর।
হা হা কি করিনু কর্ম্ম হইয়া অসুর॥
অতএব যুক্তি কৈল সভাই মিলিয়ে।
ঠাকুর লইয়া যাকু যথা স্বেচ্ছা হয়ে॥
এ সাহস বৈষ্ণবের না হয় কখনে।
ইহাতে যে অঙ্গীকার ঠাকুরের বিনে॥
পরিহার করি রামদাসে কিছু বল।
যথায় ঠাকুর যাবেন সেইখানে চল॥
কাকুবাদ করি রাঙ্গা চরণে পড়িব।
তাহাতে যে আজ্ঞা হয় তাহাই করিব॥
এতেক যুগতি করি সাধুকে কহয়।
অপরাধ মো-সভার ক্ষেম মহাশয়॥
ঠাকুর লইয়া চল যথা তব স্বেচ্ছা।
বুঝিলাম এ সকল ঠাকুরের ইচ্ছা॥
তোমা সহ পরামর্শ হইল পূর্ব্বেতে।
নতুবা যে এ সাহস নহে তোমা হইতে॥
ভাল ভাল বুঝিলাম তুমি অন্তরঙ্গ।
এবে মোরা বুঝিলাম হই বহিরঙ্গ॥
না হইবে কেনে পূর্ব্ব-স্বভাব আছয়।
অক্রুর (ক) পাইয়া ব্রজবাসীরে ছাড়য়॥
কি করিব মো-সভার ভাগ্যেতে করয়।
স্বতন্তর হৈলে তার সকলি সাজয়॥
যতেক পূজারিগণ খেদোক্তি করিল।
রামদাসমনে তার কিছু না ভাইল॥
ঠাকুর আসিবে এই উৎসাহ যে হৈল।
অক্রুর যেমন ব্রজে ফিরি না চাহিল॥
ঠাকুর লইয়া সাধু গৃহে যবে গেলা।
পূজারি সকলে বহু কাকুবাদ কৈলা॥

পাঠান্তর—(ক) অক্রুর—অক্রুরে।

ঠাকুর কহেন মুঞি তবে যাইতে পারি।
রামদাসে স্বর্ণ দেহ মো-সমান করি॥
এতো শুনি ধাইয়া চলিলা সভে ঘরে।
যার ঘরে যত ছিল স্বর্ণ আনি ডারে॥
কাঁটায় চড়ায় ঠাকুর আর দিকে সোণা।
ঠাকুর যে কত ভারি না হইল (ক) তুলনা॥
ঠাকুরের চারিগুণ সোণা চড়াইল।
তথাপি ঠাকুর পলা নাহিক উঠিল॥
বুঝিলা পূজারিগণ না যাবার মত।
নিরাশা হইয়া চলে শিরে হানি (খ) ঘাত॥
পুন পষ্ট কহিলা তোমরা ঘরে যাহ।
বিজয়-মুরতি গিয়া প্রকাশ করহ॥
তথা আবির্ভাব মোর সদাই আছয়।
অভেদ বিজয় রূপে (গ) জানিহ নিশ্চয়॥
আজ্ঞামতে মন্দিরে বিজয়মূর্ত্তি স্থাপি।
আনন্দে করয়ে সেবা ভজে বিশ্ব ব্যাপি॥
অতেব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই এক লীলা।
ভকতবৎসল হরি লোকে জানাইলা॥
অহে রামদাস ঠাকুর মহাশয় (ঘ)।
দয়ার পরম যোগ্য আমি দুরাশয়॥
"সাধবো দীনবৎসলাঃ" বলি বেদে ফুকারয়।
তাহা শুনি লালদাস লইল আশ্রয়॥

চরিত্র শ্রীজসু স্বামী

জসু নামে স্বামী বাস হয়ে অন্তর্ব্বেদ।
বৈষ্ণব সেবয়ে কৃষ্ণে করিয়া অভেদ॥
চাস (ঙ) করে সন্ত-সাধু (চ) সেবার লাগিয়ে
একখানি হাল দুটি বলদ আছয়ে॥

পাঠান্তর—(ক) না হইল—নহিল।
(খ) হানি—দিয়া।
(গ) অভেদ বিজয় রূপে—অভেদ্য বিজয়রূপে।
(ঘ) মহাশয়—দয়াময়।
(ঙ) চাস—বাস।
(চ) সন্ত সাধু—সাধু শান্ত।

একদিন গরু খেতে লোকে (ক) নিঞা গেল।
খেতে হৈতে (খ) দুটি গরু চোরেতে লইল॥
দয়াল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তের লাগিয়া।
সেই মত দু'টি গরু খেতে রাখে নিঞা॥
চোর তাহা দেখি মনে মনে ভাবে একি।
সেই গরু মোর ঘরে হৈতে আনিল কি॥
বার দুই আনাগোনা করিয়া দেখয়।
সে নহে তেমতি (গ) গরু খেতে হাল বয়॥
চোর তবে জসু স্বামীর প্রভাব (ঘ) জানিল।
স্বামীর নিকটে গিয়া প্রপন্ন হইল১॥
স্বামী তারে শিষ্য করি ভক্তি শিক্ষা দিল।
চোরবৃত্তি ছাড়ি তেঁহো ভাগবত হৈল॥
চোর সেহ তারে যদি সাধু কৃপা হৈল (ঙ)।
মো-সভার কি দুর্দ্দৈব ছায়া না স্পর্শিল॥

চরিত্র শ্রীনন্দদাস সাধু

নন্দদাস নাম সাধু বরেলিতে বাস।
বৈষ্ণব-সেবাতে তাঁর অতি অভিলাষ॥
নিন্দুক পার্ষাণ্ডিগণ (চ) সদা দ্বেষ করে।
তার মধ্যে এক বিপ্র অহিত আচরে॥
দৈবাৎ তাহার এক বাছুর মরিল।
নন্দদাস গৃহে লুকাইয়া ডারি দিল॥
লোকে জনরব করি কহিতে লাগিল।
নন্দদাস গোহত্যা করিল, মো দেখিল॥
ভদ্রলোকগণ নন্দদাসের গৃহেতে।
জড় হৈল বহুলোক শুনিঞা দেখিতে॥
দেখে মড়া বৎস পড়ি আছে আঙ্গিনাতে।
সন্দেহ করিয়া তারে পুছয়ে জানিতে॥
নন্দদাস মহাশয় ভাবেতে বুঝিল।
নিন্দুক লোকেতে এই তুফান করিল॥
ভদ্রলোকে পুছে বৎস কেমনে (ক) মরিল।
সাধু কহে বাছুর মরিল কে কহিল॥
শয়ন করিয়া আছে নিদ্রার আবেশে।
কহ উঠাইয়া দিই যাউ নিজ বাসে॥
এতেক কহিয়া দুই তিন তুড়ি দিয়া।
কহে বৎস উঠি যাও দুগ্ধ পিও গিয়া॥
বাছুর উঠিয়া লম্ফ মারিয়া ছুটিল (খ)।
যত লোক দেখি সভে চমৎকার হৈল॥
সভে সেই ব্রাহ্মণেরে ধিৎকার করিল।
মৃত বৎস ডারি দিয়া সাধুরে নিন্দিল॥
ইদানীন্তু (গ) দেখি বহু এমত পাষণ্ড।
অকারণ ঈর্ষয়ে বৈষ্ণবে করে দণ্ড॥
ইহাতেও বুঝি হেন পুর্ব্বেও আছিল।
সর্ব্বকাল-প্রেম-বৃষ্টি (ঘ) ভগবান কৈল॥
নন্দদাসচরণে এ দীন নিবেদয়।
হেন জনা সঙ্গ যেন কভু নাহি হয়॥

চরিত্র শ্রীঅহ্নজী

অহ্ন নামে সাধু পথেতে দৈবাত্ত যাইতে।
আম্র পাকিয়াছে দেখে রাজার বাগিচাতে॥
বাসনা হইল যদি কিছু আম্র পাই।
কৃষ্ণচন্দ্র তৃপ্তিহেতু (ঙ) বৈষ্ণবে খাওয়াই॥
মালীর নিকটে গিয়া যাচিঞা করিলা।
তিরস্কার করি মালী আম্র নাহি দিলা॥
সাধুর একান্ত ইচ্ছা বৈষ্ণবে খাওয়াইতে।
যতেক বৃক্ষের আম্র পড়িল ভুমেতে॥
বৈষ্ণব ডাকিয়া সাধু খাওয়ায় যতনে।
মালী ছুটাছুটি গিয়া কহে রাজস্থানে (চ)॥

পাঠান্তর—(ক) গরু খেতে লোকে—লোকে গরু ক্ষেতে।
(খ) খেতে হৈতে—ক্ষেত হতে।
(গ) তেমতি—তেমনি।
(ঘ) প্রভাব- স্বভাব।
(ঙ) হৈল—কৈল।
(চ) পার্ষাণ্ডিগণ—পাষণ্ডগণ।
১। প্রপন্ন হইল—শরণ লইল।

পাঠান্তর—(ক) কেমনে—কি মতে।
(খ) ছুটিল—চলিল।
(গ) ইদানীন্তু—ইদানীন্ত।
(ঘ) প্রেম-বৃষ্টি—প্রেতসৃষ্টি।
(ঙ) তৃপ্তিহেতু—তৃপ্ত হেতু।
(চ) রাজস্থানে—রাজাস্থানে।

অহ্লাজীর মহিমা পূর্ব্বেতে রাজা জানে।
মালীরে কহয়ে আম্র নাহি দিলে কেনে॥
আপনি আসিয়া রাজা চরণে পড়িল।
আম্র ভোগেতে মহামহোৎসব হৈল॥
সেই মহোৎসবের অধরামৃত কণা।
অমর হইবা হেতু করহ (ক) বাসনা॥

চরিত্র শ্রীবারমুখী

বেশ্যা এক হয়ে অতি ধনাঢ্য সুন্দরী।
পুষ্করণী বাগিচা বেড় ভৃত্য সহচরী॥
অনেক বৈষ্ণবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
উত্তরিলা একদিন তার বাগিচাতে॥
জলে স্থলে স্থান অতি পরিষ্কার দেখিয়া।
তৃপ্ত হৈল সাধুগণ সুচ্ছায়া পাইয়া॥
বারমুখী নিজগৃহ বালাখানা হৈতে।
ঝরকাতে উঁকি মারি লাগিলা দেখিতে॥
অহো কি আশ্চর্য্য যার নাহিক উপমা।
বৈষ্ণব-দর্শনের যে কি তক মহিমা (খ)॥
দেখিতে দেখিতে তার মন ফিরি গেলা।
আপনার দোষ যত চিন্তিতে লাগিলা॥
দুষ্কর্ম্ম করিয়া আমি অর্থ জমাইনু।
ধর্ম্মার্থে কখন কিছু ব্যয় না করিনু॥
তথাপিহ আরো অর্থ-পথ নিরখিয়া।
নিজ দেহ পণ করি রত্নে সাজাইয়া॥
ছি ছি মোরে ধিক ধিক যে অর্থ লাগিয়া।
পাপপথে সদা ফিরি একান্ত করিয়া॥
সেই অর্থে ঞিহ সব থুৎকার করিয়া।
স্বজন-বান্ধব বাম-চরণে ঠেলিয়া (গ)॥
পরম পদার্থ সর্ব্বলোকের সম্মত।
শ্রীকৃষ্ণচরণ-পদ্ম হইল আশ্রিত॥
অতএব ছি ছি মুঞি ত্যজি হেন অর্থে।
দেহ পণ করিব নিতান্ত পরমার্থে॥

এতেক চিন্তিয়া বেশ্যা অমনি উঠিল।
থালি (ক) ভরি এক থাল মোহর লইল॥
গৃহ হইতে নিকশিয়া যথা সাধুগণ।
চলিলেন ধীরে ধীরে মোহান্তের স্থান॥
পরম-সুন্দরী রত্ন-ভূষণে ভূষিত।
ঝমকিয়া চলিলা কামীর মনোনীত॥
দূরে হইতে সাধুগণ দেখিয়া চমকে।
দেবী কি অপ্সরা ঞিহ রূপে যে ঝলকে॥
নিকটে যাইয়া বেশ্যা গদ গদ স্বরে।
কহে মো-পাপীরে গোসাঞি কর অঙ্গীকারে॥
বহু অর্থ আছে মোর ভাণ্ডার ভরিয়া।
শ্যামল-সুন্দরে দেহ ভোগ লাগাইয়া॥
মহান্ত (খ) কহেন মাতা কে তুমি কি নাম।
কাহার ঘরণী তুমি কোথা ঘর গ্রাম॥
তেঁহো নিজ পরিচয় দিবার কারণে।
লজ্জা ভয়ে রহে হেঁট করিয়া বয়ানে॥
মহান্ত (গ) কহেন মাতা নির্ভয়েতে কহ।
তোমার মঙ্গল যে করিব যুক্তি সহ॥
তবে নিজ পরিচয় যথার্থ কহিল।
মহান্ত কহেন (ঘ) তবে হউক ভাল ভাল॥
কৃষ্ণে যদি মতি তব এতাদৃশী (ঙ) হয়।
তবেতো কৃতার্থ তুমি চিন্তা কি তাহায়॥
এক পরামর্শ আমি কহি যে তোমারে।
তোমার মানস পূর্ণ হইবে অদূরে॥
মোহরের থালি (চ) রঙ্গনাথের চরণে।
রাখিয়া শরণ লও গিয়া কায়মনে॥
অবশ্য করিবে দয়া ঠাকুর তোমারে।
বারমুখী বুঝিলা উপেক্ষা কৈলা মোরে॥
কান্দিতে কান্দিতে মোহরের থালি নিঞা।
চলিলেন আপনাকে ধিৎকার করিয়া॥

পাঠান্তর—(ক) করহ—করিয়ে।
(খ) বৈষ্ণব দরশনের যে কতেক মহিমা।
(গ) স্বজন বান্ধবগণ চরণে ঠেকিয়া।

পাঠান্তর—(ক) থালি—থাল।
(খ) (গ) মহান্ত—মোহান্ত।
(ঘ) মহান্ত কহেন—মোহান্ত কহয়ে।
(ঙ) এতাদৃশী—ঐকান্তিক।
(চ) থালি থাল।

রঙ্গনাথ ঠাকুর সম্মুখে থালি রাখি।
কান্দয়ে বিলাপ করি বদন নিরখি॥
বেশ্যা বলি সে দ্রব্য পূজারি না লইল।
চূড়া বানাইয়া দেহ পশ্চাত কহিল॥
ঘরেতে যাইয়া বহু অর্থ ব্যয় করি।
নানা রত্ন হার মণি মুক্তা আদি ঝুরি (ক)॥
যেখানে যে গহনা সাজয়ে রঙ্গনাথে।
বানাইয়া লইয়া গেলেন করি মাথে (খ)॥
পূজারী কহেন পুন বেশ্যার সামিগ্র।
কভু নাহি হয় ইহা ঠাকুরের যোগ্য॥
ইহা শুনি তার মুখ ম্লান যে হইল।
অশ্রুধারা দুনয়নে পড়িতে লাগিল॥
ঘরে গিয়া উপবাসী পড়িয়া রহিল।
পরাণ ছাড়িব বলি প্রতিজ্ঞা করিল॥
দয়াল হরি নাহি বাছে (গ) উত্তম অধম।
যেই প্রীত করে সেই হয় প্রিয়তম॥
পূজারিরে আদেশ করয়ে ক্রোধ করি (ঘ)।
শীঘ্র বারমুখীরে আনহ স্তুতি করি॥
বারমুখী নিজহস্তে পরাবে গহনা।
তুমি তারে শিষ্য কর না করিহ ঘৃণা॥
পূজারি কাঁপিয়া ডরে তখনি চলিলা।
বিনীত করিয়া গিয়া ডাকিয়া আনিলা॥
তার নিজ হস্তে অলংকার পরাইয়া।
সেবক করিলা মন্ত্র উপদেশ দিয়া॥
বারমুখী ঠাকুরাণী আনন্দ সাগরে।
প্রেমামৃত মদপান (ঙ) করিয়া সাঁতারে॥
সর্ব্বস্ব লোটায়্যা কৈল মহামহোৎসব।
বিষ তেজি পান কৈল কমল-আসব॥

অতেব ব্রাহ্মণ কিবা চণ্ডাল দুরাচার।
কৃষ্ণের সরকারে (ক) নাহি জাতির বিচার॥
যেই ভজে সেই হয় দেবতার শ্রেষ্ঠ।
ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে কহিল যথেষ্ট॥
অতএব বারমুখী ধনি জগন্মাতা।
তার পদরজ-কণ ত্রিভুবন ত্রাতা॥
এক কণা পাই যদি মো-হেন অধমে।
তবেতো এড়াই এই সংসার বিষমে॥

চরিত্র শ্রীরাজা ভক্তপ্রিয়

এক মহারাজা হয়ে জগতে প্রসিদ্ধ।
বৈষ্ণবেতে প্রীত (খ) যার সম নাহি উদ্ধ॥
ডোম ভাঁড়গণ করি বৈষ্ণবের বেশ।
সুন্দর সাজিয়া যথা নাহি রাগোদ্দেশ (গ)॥
রাজার সভায় আসি ফুৎকার ছাড়য়।
সংকীর্ত্তন করে কেহ নাচে কেহ গায়॥
রাজার হইল তাহে দেখি প্রেমাবেশ।
যদ্যপি জানয়ে রাজা তার সবিশেষ॥
কভু দণ্ডবত কভু (ঘ) আলিঙ্গন করে।
কভু তাহা সভার (ঙ) চরণে গিয়া ধরে॥
থালী (চ) ভরি মোহর আনিয়ে তথা দিল।
ভাঁড়গণ নিজ স্বার্থে কৃতার্থ হইল॥
কৃত্রিম জানিঞাও (ছ) রাজা প্রেমাবিষ্ট হৈল
ভাঁড়গণ ভাবে মোরা ভাল কাচ (জ) কৈল॥
অতেব কৃত্রিম বৈষ্ণবেহ নমস্কার।
রাজার তো পাদরজ জগতের সার॥

পাঠান্তর—(ক) নানা রত্ন চূর্ণ আর মণি মুক্তা ঝুরি।
(খ) লইয়া গেলেন করি মাথে—লৈয়া গেল আপনার মাথে।
(গ) নাহি বাছে—না বাছেন।
(ঘ) করয়ে ক্রোধ করি—করেন ক্রোধে হরি।
(ঙ) প্রেমামৃত মদপান—প্রেমামৃত মধু পান, অথবা প্রেমানন্দ মধুপান।

পাঠান্তর—(ক) কৃষ্ণের সরকারে—শ্রীকৃষ্ণের স্থানে।
(খ) প্রীত—প্রীতি।
(গ) যথা নাহি রাগোদ্দেশ—যার নাহি রাগদ্বেষ।
(ঘ) কভু—কবে।
(ঙ) সভার—সভাকার।
(চ) থালী—থলি।
(ছ) জানিঞাও—জানিয়া।
(জ) কাচ—কাজ অথবা কাছ।

চরিত্র শ্রীহরিভক্ত রাণীর

এক রাজা হয় যে অন্তর হরিভক্ত।
গোপনে রাখয়ে কোনমতে নহে ব্যক্ত॥
রাণী তাঁর পরম বৈষ্ণবী মহাভক্ত।
ভক্তি না দেখিয়া রাজার অন্তর উত্যাক্ত (ক)॥
সদাই করয়ে খেদ হাহা কি দুর্দ্দৈব।
স্বামী মোর হরিভক্তি-বিহীন অশিব॥
স্বামীরে বুঝায় তেঁহো কিছু না করয় (খ)।
উদাসীন ন্যায় কিন্তু মনে প্রশংসয়॥
একদিন রাজন দৈবাত্ত নিদ্রাকালে।
অলস ত্যজিতে (গ) মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে॥
রাণী তাহা শুনিঞা পরমানন্দ হৈল।
দানাদি করিল নহবত বসাইল॥
রাণীর উৎসাহ দেখি রাজা জিজ্ঞাসিল।
আজি তব মঙ্গলের বিষয় কি হৈল (ঘ)॥
প্রফুল্ল-বদনে রাণী রাজারে কহিল।
আজি তব মুখে কৃষ্ণ নাম নিকশিল॥
তটস্থ হইয়া রাজা পুন জিজ্ঞাসয়।
তবে তবে কিমতে (ঙ) কি নাম নিকশয়॥
পুন রাণী কহে যবে অলস তেজিলা।
ঘুমের ঘোরেতে কৃষ্ণ নাম উচ্চারিলা॥
হাহাকার করি রাজা ভূমেতে (চ) পড়িল।
হিয়া হৈতে রতন কিবা মোর বাহিরিল (ছ)॥
ইহা কহি (জ) তৎক্ষণাতে পরাণ তেজিল।
একি একি বলি রাণী কান্দিয়া উঠিল॥
হাহা মুঞি এতদিন ইহা না বুঝিল।
স্বামী মোর হেন মহা-অনুভব ছিল॥
হৃদয় পুটিকা-মধ্যে ছিল কৃষ্ণনাম।
এতদিন ইহা মুঞি নাহি জানিলাম॥
বাহিরিল (ক) বলি প্রাণ ছাড়ি দিল ভূপ।
এই এক মহান্তের ভাব অনুরূপ॥
তাহা না বুঝিনু মুঞি আপনা খাইয়া।
ছাড়ি গেল মোর মুখে আনল জ্বালিয়া॥
শিরে করাঘাত হানি রাণী বিলাপয়।
কেবল যে স্বামী বলি রাণী না কান্দয়॥
হেন কৃষ্ণভক্ত স্বামী বঞ্চিত হইনু।
হেন যে গুণের নিধি আগে না বুঝিনু॥
এই ভাবে বিলাপ করিয়া রাণী কান্দে।
দোঁহাকার গুণে কৃষ্ণ পড়ি গেলা (খ) ফান্দে॥
দরশন দিয়া সুধাময় দৃষ্টি দিয়া।
বাঁচিয়া উঠিল রাজা আনন্দ পাইয়া॥
সম্মুখে দেখয়ে দেহে নবঘনশ্যাম।
বাঞ্ছিত রতন-নিধি মিলে অভিরাম॥
প্রেমানন্দে যত্ন করি রত্ন-সিংহাসনে।
বসাইয়া সেবা কৈল নিছিয়া পরাণে॥
কালেতে শ্রীধাম গিয়া হৈলা অনুচর।
তাঁহা-দোঁহার শ্রীচরণে (গ) কোটি নমস্কার॥

চরিত্র শ্রীগুরুনিষ্ঠ সাধু

গুরুনিষ্ঠ এক ব্যক্তি (ঘ) মহা-অনুভব।
গুরু প্রাণধন মান (ঙ) সর্ব্বস্ব বৈভব॥
গুরুর সেবায় কৃষ্ণ-কৃপাতে পর্য্যন্ত।
সর্ব্বদেব প্রীত (চ) সদ্‌গুণের নাহি অন্ত॥
গুরুর কর্ম্মেতে কোন গ্রামান্তরে গেলা (ছ)।
পীড়িত হইয়া তথা কালপ্রাপ্ত (জ) হৈলা॥
মরিবার পূর্ব্বক্ষণে আত্মীয় লোকেরে।
সভারে সম্পদ (ঝ) দিয়া কহে বারে বারে॥

পাঠান্তর—(ক) অন্তর উত্যাক্ত—অন্তরে খেদোক্ত।
(খ) করয়—কহয়।
(গ) ত্যজিতে—ত্যজিয়ে।
(ঘ) হৈল—বল।
(ঙ) কিমতে—কেমনে।
(চ) ভূমেতে—ভূমিতে।
(ছ) কিবা মোর বাহিরিল—কি মোর বাহির হৈল।
(জ) ইহা কহি—হাহা করি।

পাঠান্তর—(ক) বাহিরিল—বাহির হৈল।
(খ) পড়ি গেলা—পড়িলেন।
(গ) তাঁহা-দোঁহার শ্রীচরণে—তাঁহা দোঁহা চরণেতে।
(ঘ) ব্যক্তি—সাধু।
(ঙ) মান—সম।
(চ) প্রীত—প্রিয়।
(ছ) গুরুর আজ্ঞাতে কোন কর্ম্মান্তরে গেলা।
(জ) কালপ্রাপ্ত—কালপ্রাপ্তি।
(ঝ) সম্পদ—শপথ।

আমি মৈলে আমার না পোড়াইহ দেহ।
গুরুর নিকটে শব লইয়া যাইহ॥
প্রাপ্তি হৈল তাঁহার যে (ক) বাক্য-অনুসারে।
লইয়া আইল শব গুরু যথাকারে॥
লোকস্থানে গুরু সব বৃত্তান্ত শুনিলা।
ইহার কারণ কিবা বিচার করিলা॥
এক হেতু গুরু শব যদ্যাপি দেখয়ে।
সর্ব্বপাপ নাশ হয় সদগতিকে পায়ে॥
তা না হবে (খ) আর কিছু থাকিবে আশয়।
মোর বাক্যে ছিল অতি বিশ্বস্তহৃদয়॥
অতএব মোর বাক্যে জীবন-আশয়।
শব মোর নিকটেতে আনিতে কহয়॥
এতেক বিচার করি আচার্য্য কহিলা।
উঠ বাপু কেনে মৃত্যু-শয়ন করিলা॥
কহিবা মাত্রেতে উঠি নমস্কার কৈলা।
নিদ্রায় হইতে যেন (গ) জাগিয়া উঠিলা॥
অতএব গুরু ইষ্ট গুরু বন্ধু হন।
গুরু হৈতে মিলে কৃষ্ণ, মিলে প্রেমধন॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ (ঘ) যেই যাহা চায়।
গুরুর চরণ ধ্যানে সকলি মিলয়॥
গুরুভক্তি বিনে যদি শতযুগ ধায়।
প্রেম কাম নাহি মিলে সর্ব্ব ব্যর্থ হয়॥
গুরুনিষ্ঠ তাঁহার চরণ করি ধ্যান।
শ্রীগুরু চরণে যেন থাকে মোর মন॥

চরিত্র শ্রীকবীরজী

কবীর তাঁর জন্ম পূর্ব্বে যবনের ঘরে।
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা যাঁহার উপরে॥
কি জানি কি পূর্ব্বে তাঁর সুকৃতি আছিল।
হঠাত শ্রীরামচন্দ্রে মতি উপজিল॥
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম মাত্র সার।
অনন্য-চিন্তায় দিবানিশি করে পার॥
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা হইল তাঁহাতে।
কৃপাবাক্য কহে প্রভু আকাশবাণীতে॥
রামানন্দ-স্থানে মন্ত্র দীক্ষা কর গিয়ে।
অচিরাতে পাবে মোরে তাঁহার আশ্রয়ে॥
শুনিঞা আকাশবাণী চিন্তয়ে (ক) কবীর।
মোরে কৃপা করিবেন কেনে তেঁহো ধীর॥
যবন অস্পর্শ (খ) মুঞি আমার বদন।
হেরিতে নিষেধ তাঁর বেদের বচন॥
এতেক চিন্তিয়া কিছু বিচার করিল।
কোনো ছলে মন্ত্রদীক্ষা উপায় সৃজিল॥
গুরু রামানন্দ স্বামী প্রত্যূষে উঠিয়া।
মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করে গিয়া॥
অতি ভোরে কিছু অন্ধকার আছে যবে।
ঘাটের নীচেতে গিয়া শুতি (গ) রহে তবে॥
গুরু রামানন্দ স্নানে আইলা সেই কালে।
অজ্ঞাতে চরণ তার অঙ্গেতে অর্পিলে॥
ত্রস্থ হইয়া স্বামী 'রাম' কহ বলে।
প্রবেশ করিল কবীরের কর্ণমূলে॥
সেই রামনাম মহামন্ত্র যে জানিঞা।
হৃদয়-সম্পুটে রাখে গোপন করিয়া॥
গৃহকর্ম্ম জাতিপাতি সকল ছাড়িয়া।
তিলক তুলসী মালা ধারণ করিয়া॥
সদা সেই মন্ত্র জপ দিবানিশি করে।
মাতা পিতা বন্ধুগণ করে তিরস্কারে॥
আপন ইমান ছাড়ি লৈলি (ঘ) হিন্দুধর্ম্ম।
কে তোরে শিখাইল করিবারে হেন কর্ম্ম॥
তেঁহো কহে গুরু মোর রামানন্দ স্বামী।
দীক্ষা দিলা তেঁহো মোরে তাঁর দাস আমি॥
এতো শুনি মাতা তাঁর কোপিত হইয়া।
গেলা স্বামী বৈসে যথা তথায় ধাইয়া॥

পাঠান্তর—(ক) প্রাপ্তি হৈল তাঁহার যে—কালপ্রাপ্ত হৈলে তাঁর।
(খ) তা না হবে—তাহা নৈলে।
(গ) নিদ্রায় হইতে যেন—যেন নিদ্রা হতে কেহ।
(ঘ) মোক্ষ—মুক্তি।

পাঠান্তর—(ক) চিন্তয়ে—চিন্তিত।
(খ) অস্পর্শ—অস্পৃশ্য।
(গ) শুতি—শুয়ে।
(ঘ) ইমান ছাড়ি লৈলি—ইচ্ছায় ছাড়ি নিলি।

স্বামীকে কহয়ে তুমি আমার (ক) ছাওয়ালে।
শিষ্য যে করিয়া কাঁটা (খ) দিলে জাতিকুলে॥
তাহারে কহেন স্বামী করি মৃদুহাস্য।
কেটা (গ) সে নাহিক জানি নাহি (ঘ) করি শিষ্য॥
সে তো চলি গেল কবীর দণ্ডবতে আইল।
তাঁরে কহে আমি তোমায় শিষ্য কবে কৈল (ঙ)॥
কবীর কহেন প্রভু অমুক দিবসে।
কৃপা যে করিলে মোরে চমক আবেশে॥
কলিভয় নিস্তারের এক মহামন্ত্র।
দুর্ব্বাদলশ্যাম-রূপের শুদ্ধ প্রেমযন্ত্র॥
স্বামীজীর স্মরণ হইল সে বৃত্তান্ত।
কবীরের প্রতি প্রীত (চ) জন্মিল একান্ত॥
আনুষঙ্গ রামনাম মোর মুখে শুনি।
দীক্ষা-নিষ্ঠা হৈল মহামন্ত্র করি জানি॥
এতেক ভাবিয়া স্বামী প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
আলিঙ্গন কৈলা তাঁরে হৃদয়ে ধরিয়া॥
তুমিতো যবন নহ বিপ্র হৈতে শ্রেষ্ঠ।
যাথে রামনামে তুমি এতাদৃশ নিষ্ঠ॥
পুন স্বামী তারে কণ্ঠী তিলক যে দিল।
শুদ্ধ জানি বৈষ্ণবের পঙ্গতে[১] লইল॥
যদি বল যবন কেমতে হৈল গ্রাহ্য।
ত্রৈলোক্যপাবন রামনাম মহাবীর্য্য॥
হাড়ি ডোম যবন কি ম্লেচ্ছ কেহ হয়।
যেই লয়ে হয়ে অই যজ্ঞের বিষয় (ছ)॥
দান গ্রহণের পাত্র অবশ্য সে জন।
বিধিলিঙ্গ (জ) লক্ষণে শ্রীগারুড়ে কহেন॥
শ্রীমদ্ভাগবতে কহে অভ্যাস (ঝ) লক্ষণে।
সর্ব্ব লক্ষণেতে কহে বিচার-প্রমাণে॥

পাঠান্তর—(ক) আমার—এ মোর।
(খ) কাঁটা—বাঁটা।
(গ) কেটা—কেবা।
(ঘ) নাহি—কারে।
(ঙ) তাঁহারে কহয়ে আমি কবে শিষ্য কৈল॥
(চ) প্রীত—প্রীতি।
(ছ) যেই লয় সেই আর্য্য যোগের বিষয়।
(জ) বিধিলিঙ্গ—বিধিমত।
(ঝ) অভ্যাস—আভাষ।
১। পঙ্গতে—পঙ্‌ক্তিতে, শ্রেণীতে।

অতএব সত্য সত্য বেদের বচন।
হরিভক্ত যবন যে ত্রৈলোক্য-পাবন॥
সহস্র সহস্র ইথে বেদের প্রমাণ।
এই এক কহি মাত্র মূঢ়-প্রবোধন॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

মন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ ইত্যাদি।
বিপ্রাদ্দ্বিষড় গুণযুতাৎ ইত্যাদি॥

পূর্ণ শ্লোক ও অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

গারুড়ে—

ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ॥
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ॥

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তমাঃ।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া॥

অনুবাদ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, ভগবানের ভক্ত যদি চণ্ডালও হন, তবু যে কোন রূপে তাঁহাকে স্মরণ, সম্ভাষণ বা পূজা করিলে, তিনি পবিত্র করিয়া থাকেন।

সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎ কোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে॥
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।
ঐকান্তিনস্তু পুরুষাঃ (ক) গচ্ছন্তি পরমং পদম্॥

অনুবাদ—হাজার হাজার সত্রযাজী (যজ্ঞকারী) হইতে একজন সর্ব্ববেদান্তে পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ। কোটি সর্ব্ববেদান্তবিদ্ হইতে একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ। হাজার হাজার বৈষ্ণব হইতে একজন শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠ। একনিষ্ঠ ভক্তেরা পরম পদ লাভ করেন।

যদি কহ উত্তম অধিকারী প্রতি কহে।
প্রমাণ দেখহ তার (খ) তাহাও যে নহে॥
পরের যে শ্লোক দেখ প্রমাণ ইহার।
বুঝিবে সুবোধ যেই (গ) করিয়া বিচার॥

পাঠান্তর—(ক) ঐকান্তিনস্তু পুরুষাঃ—ঐকান্তিনঃ সুপুরুষাঃ এবং "ঐকান্তিনঃ স্ববপুষা"।
(খ) তার—তবে।
(গ) যেই—সেই।

বিষ্ণুভক্ত সহস্রেক তুল্য একজন।
একান্ত ভকতিমান্ যে বৈষ্ণব হ'ন॥
অতএব সামান্যত ভক্তির যাজনে।
কোটি বিজ্ঞ বিপ্র হৈতে উত্তম যবনে॥
সেই মহাপূজ্য হয় (ক) সিদ্ধান্ত প্রমাণ।
সেই বুঝে যেই জানে ভকতি-সন্ধান॥
বেদ-পারঙ্গত সর্ব্বশাস্ত্র অর্থ-বেদ্য।
কিন্তু হরিভক্তি নহে অগ্রাহ্য অমেধ্য (খ)॥
উদ্যম (গ) বিফল সেই পুরুষ অধম।
জগতে নিন্দিত আর নাহি তার সম॥

তত্রৈব—

অন্তং (ঘ) গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥

অনুবাদ—সকল বেদে পারদর্শী হইয়াও **এবং সকল** শাস্ত্রের অর্থ জানিয়াও যে সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিহীন তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে।

বেদশাস্ত্র অপঠিত সর্ব্ব-ধর্ম্মহীন।
কিন্তু হরিভক্ত সে কিছুতে নহে হীন (ঙ)॥
সন্ধ্যাদি বন্দনা সর্ব্বযজ্ঞ সর্ব্বধর্ম্ম।
সকলি করিল সেই, ধন্য তার জন্ম॥

তত্রৈব—

নাধীতবেদশাস্ত্রোঽপি ন কৃতাধ্বর ইত্যপি (চ)।
যো ভক্তিং বহতে বিষ্ণৌ তেন সর্ব্বং কৃতং ভবেৎ॥

অনুবাদ—যিনি বিষ্ণুতে ভক্তিপরায়ণ তিনি বেদশাস্ত্র পাঠ না করিলেও বা যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করিলেও সকলই করিয়াছেন।

এতেক প্রমাণ দিয়া কিহবা কারণ।
অজ্ঞে বুঝাইতে নহে কিছু প্রয়োজন॥
অতেব কবীরজীউ ভুবনপাবন।
প্রসিদ্ধ আছয়ে তাহা জানে জগজন॥

তাঁহার মহিমা চমৎকার আরো শুন
যাঁহার আওয়াসে (ক) রামচন্দ্র আইলা পুন॥
মাতার ভর্ৎসনে সাধু জীবিকা-কারণ।
তাঁত বুনে হয়ে মাত্র দিন নির্ব্বাহণ॥
নলি যে চালায় দুই হাথে তালে তালে।
জয় রাম শ্রীরাঘো রাম (খ) সীতারাম বলে॥
একদিন একখানি কাপড় বুনিঞা।
হাটের কিনারে গিয়া রহে দাণ্ডাইয়া॥
বৈষ্ণব আসিয়া এক বস্ত্রখানি (গ) মাগে।
তেঁহো কহে ফাড়িয়া যে লহ অর্দ্ধভাগে॥
বৈষ্ণব কহয়ে মোর সবখানি বিনে।
কার্য্য না চলিবে দেহ যদি মন মানে (ঘ)॥
প্রসন্ন হইয়া সাধু সবখানি দিল।
ঘরে অন্ন নাহি তেঁহো লুকাঞা রহিল॥
ঘরে গেলে মাতা আদি (ঙ) করিবে ভর্ৎসন।
শূন্য এক ঘরে বসি গান রামগুণ॥
হোথা দয়াময় রামচন্দ্র (চ) তাহা জানি।
কবীরের রূপ ধরি আইলা আপনি॥
বলদে বলদে নানা সামগ্রী আনিয়া।
ঘর ভরি উঠায় আর দেয় বিলাইয়া॥
মাতা কহে এতেক সামগ্রী কোথা হৈতে।
আনিলি ডাকাতি কার কৈলি বুঝি পথে (ছ)॥
ক্ষণেক বেয়াজে ঘরে চলিলা কবীর।
অন্তর্দ্ধান কৈলা তবে ছল রঘুবীর॥
ঘরে গিয়া দেখে মহামহোৎসব হয়।
কত আইসে কত যায় কত খায় লয়॥
দেখিয়া বুঝিলা মনে এ কর্ম্ম প্রভুর।
নহে এতো দ্রব্য কেবা আনিল (জ) প্রচুর॥

পাঠান্তর—(ক) হয়—এই।
(খ) অমেধ্য—অসেব্য।
(গ) উদ্যম—উত্তম।
(ঘ) অন্তং—পারং।
(ঙ) হীন—লীন।
(চ) ন কৃতাধ্বর ইত্যপি—ন কৃতোঽধ্বরসম্ভবঃ।

পাঠান্তর—(ক) আওয়াসে—আবাসে।
(খ) জয়রাম শ্রীরাঘো রাম—জয়শ্রী রাঘবরাম।
(গ) এক বস্ত্রখানি—একখানি বস্ত্র।
(ঘ) মন মানে—লয় মনে।
(ঙ) আদি—আজি।
(চ) দয়াময় রামচন্দ্র—রামচন্দ্র দয়াময়।
(ছ) কার কৈলি বুঝি পথে—করি লয় বুঝি চিতে।
(জ) আনিল—আনিবে।

বৈষ্ণব সজ্জনে সাধু বিলাইতে লাগিল।
ব্রাহ্মণগণের মনে অসূয়া জন্মিল॥
কহে আরে বেটা জোলা তিলকধারিগণে।
অর্থ বিলাইলি কিছু না দিলি ব্রাহ্মণে॥
না দিবিতো আজি মোরা মারিব তোমারে।
কবীর বিনয় করি কহে সভাকারে॥
ঘরেতে (ক) নাহিক কিছু চেষ্টা করি গিয়া।
যদি কিছু পাই দিব বাঁটোরা করিয়া॥
এতো কহি হাটে শূন্য গৃহে (খ) গিয়া রহে।
ভয়ে নাহি গৃহে আইসে রাম রাম কহে॥
পুন বহু ধন হরি আনে রূপান্তরে।
কবীর পাঠায় বলি আনি দিল বরে॥
কবীর আসিয়া মর্ম্ম বুঝিল অন্তরে।
অদৈন্য করিয়া দিল ব্রাহ্মণগণেরে॥
তথাচ ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষা না ছাড়য়।
বৈষ্ণব সহিতে যথা দেবে দৈত্যে হয়॥
এদানী বিপ্রের রীতে অনুভব হৈল।
পূর্ব্বেও বৈষ্ণবে দ্বেষ(গ) এমতি আছিল॥
কবীরের প্রতি ঈর্ষা করি বিপ্রগণ।
জনা চারি করে নিজ মস্তক মুণ্ডন॥
বৈষ্ণবের বেশ ধরি গ্রামে গ্রামে গিয়া।
আইল ব্রাহ্মণগণ নেওতা¹ করিয়া॥
সহস্রেক বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে গিয়া†।
কবীরের গৃহে মহোৎসব যে কহিয়া†॥
কবীরের গৃহে আসি সভে জমা হৈল।
বৃত্তান্ত শুনিঞা সাধু চিন্তিত হইল॥
উপায় না দেখি এক স্থানে গিয়া বৈসে।
পূর্ব্বমত সামগ্রী লইয়া প্রভু আইসে†॥
সব সমাধান কৈল কবীরের বেশে†।
তেঁহো আসি মিলি সুখ-সাগরেতে ভাসে॥

পাঠান্তর—(ক) ঘরেতে—ঘরে তো।
(খ) গৃহে—ঘরে।
(গ) বৈষ্ণবে দ্বেষ—বৈষ্ণবদ্বেষী।
† এই পঙক্তিগুলি কোন কোন সংস্করণে নাই।
১। নেওতা—নিমন্ত্রণ।

সিদ্ধ বলি লোকে (ক) বড় জনরব হৈল।
আকার গোপন হেতু এক ছল কৈল॥
এক স্ত্রী বেশ্যা যে তাহার হাথ ধরি।
নগরে লোকেরে দেখাইয়া বুলে ফিরি॥
সাধুলোক তা দেখি অন্তরে পায় ব্যথা।
অসাধুর হর্ষ চিত্তে (খ) লাভ-অংশে যথা॥
তাঁহার অন্তরে কিছু বিকার তো নাহি।
অবজ্ঞা করয়ে লোকে ভ্রষ্ট হৈল কহি॥
এক দিন কবীর সেই বেশ্যার সহিতে।
রাজার সভাতে গেল করোয়া¹ বাঁ হাথে॥
রাজা দেখি পূর্ব্ববত ভক্তি নাহি কৈল।
দণ্ডবত না করিল আসন না দিল॥
হরিভক্তি (গ) ছাপাইলে ছাপা নাহি যায়।
মৃগমদ-গন্ধ যথা বস্ত্রে না লুকায়॥
সভা হৈতে ফিরে সাধু যাইবার কালে।
তটস্থ হইয়া করোয়ার জল ঢালে॥
রাজার অন্তরে কিছু ভয় উপজিল।
অবজ্ঞা করিনু হেতু কি জানি কি কৈল (ঘ)॥
একান্ত করিয়া রাজা পুছে বারবার।
বুঝি কিছু অনিষ্ট যে করিলে আমার॥
সাধু কহে না না তব অনিষ্ট না করি।
রাজা কহে তবে কেন ছিরিকাইলে (ঙ) বারি²॥
সাধু কহে শ্রীমন্দিরে শ্রীল পুরুষোত্তমে (চ)।
আগুন পড়িয়াছিল কোন কার্য্যক্রমে॥
ভিড়েতে সেবকগণ পাদ (ছ) দিতে ছিল।
চরণ পুড়িবে বলি জল ঢালি দিল॥
রাজা তাহা শুনি সেই দিন বার তিথি।
লিখিয়া পাঠায় ক্ষেত্রে লাগিয়া প্রতীতি॥

পাঠান্তর—(ক) লোকে—কালে।
(খ) চিত্তে—চিত্ত।
(গ) হরিভক্তি—হরিভক্ত।
(ঘ) কৈল—হৈল।
(ঙ) ছিরিকাইলে—ছরকাইলে।
(চ) শ্রীল পুরুষোত্তমে—শ্রীপুরুষোত্তমে।
(ছ) পাদ—পদ।
১। করোয়া—কমণ্ডলু।
২। ছিরিকাইলে বারি—জল ঢালিলে বা ছিটাইলে।

লোকদ্বারে রাজা তার জানিলেন তথ্য।
অগ্নি পড়্যাছিল বটে নিভাইল সত্য॥
তখন রাজার মনে ভয় জনমিল।
ভ্রষ্ট বলি বৈষ্ণবেরে অবজ্ঞা করিল॥
হা হা ছি ছি ধিক্ ধিক্ কি কর্ম্ম করিনু।
না বুঝিয়া কেনে হেন বিষপান কৈনু॥
রাজা-রাণী দোঁহে অতি আর্ত্তনাদ করি।
উপায় চিন্তয়ে অপরাধে কিসে তরি॥
দুস্ত্যজ বুহাতিমান (ক) রাজ-অহঙ্কার।
অনায়াসে ত্যজিল বৈষ্ণবে করি ডর॥
রাণীর সহিত রাজা দন্তে তৃণ করি।
গলায়ে কুড়ালি শিরে তৃণবোঝা ধরি॥
চলিল রাজন যথা সাধু আছে বসি।
অভিমান লজ্জা তেজি সহিত রূপসী॥
অহো (খ) কি সৌভাগ্য রাজার বলিহারি যাই।
ধন্য ধন্য মরি তার লইয়া বালাই॥
বৈষ্ণবেতে এতো অনুরাগ যার হয়।
ত্রিভুবনে তাহার তুলনা না মিলয়॥
যাইয়া দম্পতী শ্রীমন্ কবীর-চরণে।
পড়িয়া কান্দয়ে ধারা বহে দু'নয়ানে॥
অপরাধ ক্ষেম মোরে কর অঙ্গীকার।
না বুঝিয়া অবজ্ঞা করিনু মুঞি ছার॥
কবীর কহেন তুমি রাজরাজেশ্বর।
হেন কদর্থনা কেনে করিলা স্বীকার॥
আমি নীচ ক্ষুদ্র যে লক্ষ্যের মধ্যে নহি।
মোরে এতো স্তুতি নতি কর কিবা কহি॥
আমার নিকটে তব অপরাধ কিবা।
মোরে তুমি অপমান কবে করিলে বা॥
গৃহে যাও মহারাজ ভাল হৈবে তব।
রামচন্দ্রে মতি কর (গ) সাধু গিয়া সেব॥
প্রসন্ন দেখিয়া আর উপদেশ পায়্যা।
গৃহে গেলা সাধুর করুণারত্ন লয়্যা॥

পাঠান্তর—(ক) দুস্ত্যজ বুহাতিমান—দুস্ত্যজ্য বুহৎমান।
(খ) অহো—আহা।
(গ) কর—করি।

সেই হৈতে রাজা প্রেমানন্দপদ পাইল।
রঘুনাথের কৃপা হৈতে সংসার ঘুচিল॥
পুনশ্চ ব্রাহ্মণগণ ঈরষা করিয়া।
পাৎসার নিকটে গিয়া কহে বাদ দিয়া॥
কবীর নামেতে এক হয় মোছলমান।
গুণজ্ঞান জানে কার্য্য করয়ে বেমান[১]॥
বহু বেটী[২] লোকের বাহির করি আনে।
হাথ ধরি ফিরে গ্রামে লজ্জা নাহি মানে॥
ইমান ছাড়িয়া ভজে হিন্দুর ধরম।
কোথা হৈতে অর্থ আনে না বুঝি মরম॥
পাতসা শুনিয়া তবে তলব করিল।
সম্মুখে তাহারে খাড়া করিয়া রাখিল॥
কাজি কহে পাতসারে সেলাম কররে (ক)।
তেঁহো কহে সেলাম-যোগ্য নাহিক সংসারে॥
একা রামচন্দ্র আর তাঁহার ভকত।
আর যত দেখ সব (খ) সকলি অসত॥
তাহা শুনি পাৎসা কোপে অগ্নি-হেন জ্বলে।
এইক্ষণে বধ কর ভৃত্যগণে বলে॥
চরণে শিকলি দিয়া নদীতে ডারিল।
সভে কহে নদী-জলে ডুবিয়া (গ) মরিল॥
ক্ষণমধ্যে দেখে তীরে দাণ্ডাইয়া সাধু।
বিতর্ক করয়ে বুঝি জানে কিছু (ঘ) যাদু॥
অগ্নিতে ডারিল পুন তোপেতে ধরিল।
ভক্তির প্রভাবে যত সব ব্যর্থ হৈল॥
বিস্ময় হইয়া রাজা বিচার করিল।
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র নিশ্চয় জানিল॥
বহু স্তুতি-নতি করি সম্মান করিল।
পদানত হইয়া অপরাধ ক্ষেমাইল॥
পুনর্ব্বার মায়াদেবী মোহিনী রূপেতে।
বিড়ম্বন করিয়া আইলা ভুলাইতে॥

পাঠান্তর—(ক) পাতসারে সেলাম কররে—সেলাম করহ পাতসারে।
(খ) সব—হয় বা হয়ে।
(গ) নদী জলে ডুবিয়া—নদীর জলে বুড়িয়া।
(ঘ) বুঝি জানে কিছু—কিছু জানে বুঝি।
১। বেমান—ইসলাম ধর্ম্মবিরুদ্ধ।
২। বহু বেটী—বধূ ও কন্যা।

সাধু তাহা দেখিয়াও দৃক্‌পাত না কৈলা।
হরির ভকত স্থানে (ক) হারি মানি গেলা॥
তবে চতুর্ভুজ-রূপে প্রভু দেখা দিলা (খ)।
যতেক উদ্যম তবে সফল হইলা॥
পরম আনন্দে কথো দিবস ব্যতীতে।
প্রভুর নিকটে যাইবারে হৈল চিতে॥
পাটনা অঞ্চলে এক হয়ে রম্যস্থান।
তথাই রহিয়া সাধু করিলা পয়ান॥
বস্ত্র আবরণ (গ) অঙ্গে করিয়া শুইল।
ঐর্মনি (ঘ) বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল॥
হিন্দু আর মোছলমান দুই পক্ষে মেলি।
কলহ হইল বোলাবুলি ঠেলাঠেলি॥
কবর দিবার হেতু মোছলমান কহে।
হিন্দু তাহা নাহি মানে (ঙ) জ্বালাইতে চাহে॥
কেহ আসি কহে ভাই কলহ কি কর।
শব কোথা আগে (চ) তার মূল যে বিচার॥

পাঠান্তর—(ক) ভকতস্থানে—ভক্তের স্থানে।
(খ) তবে চতুর্ভুজরূপে প্রভু দেখাইলা।
(গ) আবরণ—আচ্ছাদন।
(ঘ) ঐর্মনি—অর্মান।
(ঙ) নাহি মানে—না মানয়ে।
(চ) আগে—আছে।

ঝোপড়ার মধ্যে গিয়া শব যে না দেখি।
আবরণ বস্ত্রখানি আছে মাত্র সাখী (ক)॥
তখন সভাই মনে বিস্ময় হইলা।
জানিল দেহের সহ বৈকুণ্ঠেরে গেলা॥
আবরণ বস্ত্রখানি দেখে উঠাইয়ে।
কথোগুলি পুষ্প আর তুলসী আছয়ে॥
জোরাবরি মোছলমান পুষ্পগুলি লৈয়া।
কবর দিলেক তাহে উৎসাহ করিয়া॥
হিন্দু যে বৈষ্ণবগণ তুলসী পাইয়া।
সমাধি (খ) করিলা নিজ মত (গ) আরোপিয়া॥
মহামহোৎসব করি সঙ্কীর্ত্তন কৈল।
যে ধ্বনিতে (ঘ) দশদিগ পবিত্র হইল॥
শ্রীল কবীর মহাশয়ের সুযশ।
ভুবন-পাবন যাহা অদ্যাপি প্রকাশ॥
তাঁহার চরণে কোটি দণ্ডবত করি।
লালদাস মাগে কৃষ্ণ-ভকতি-মাধুরী॥

পাঠান্তর—(ক) সাখী—সাক্ষী।
(খ) সমাধি—সমাধা।
(গ) মত—ঘরে।
(ঘ) যে ধ্বনিতে—সে ধ্বনিতে।

ইতি শ্রীভক্তমালে ছোটবিপ্র-বড়বিপ্র আদি-ভক্তচরিত্র-বর্ণনং নাম পঞ্চদশ-মালা ॥ ১৫

ষোড়শ মালা

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীরুইদাস

গুরু রামানন্দ শিষ্য এক ব্রহ্মচারী।
গুরুর প্রেরিতে আনে মুষ্টিভিক্ষা করি॥
পাক-আদি করে তেঁহো ভোগ দেন গুরু।
টহলেতে আজ্ঞাবহ সদা রহে ভীরু॥
মুষ্টিভিক্ষা করিতে যখন বিপ্র যান।
প্রতিদিন কহে তাঁরে এক মহাজন॥
চুটকি (ক) না কর সিধা লহ মোর স্থানে।
লইতে না পারে বিপ্র গুরু-আজ্ঞা বিনে॥
একদিন বড় বৃষ্টি দুর্দ্দিন দেখিয়া।
চুটকি না-লৈল (খ) তথা সিধা লৈল গিয়া॥
পাক-আদি করি বিপ্র প্রস্তুত করিলা।
গুরু রামানন্দ ভোগ লাগাইতে গেলা॥
ভোগ লাগাইতে ইষ্ট-ধ্যান নাহি (গ) আইসে।
ভোগ-সামগ্রী মনে ভাল নাহি বাসে॥
শিষ্য প্রতি জিজ্ঞাসেন ভিক্ষা কোথা কৈলে।
তেঁহো কহে এক বণিকের স্থানে মিলে॥
রামানন্দ স্বামী কহে বিষয়ীর স্থানে।
নাহি কর স্থূল-ভিক্ষা মুষ্টি-ভিক্ষা বিনে॥
পূর্ব্বে যে তোমারে মো কহিনু (ঘ) বারেবার।
আপন স্বধর্ম্ম মুষ্টি-ভিক্ষা বিনু আর॥
যতেক যাচিঞা সব অনাচার হয়ে।
বিষয়ীর অন্নে মন মলিন করয়ে॥

পাঠান্তর- (ক) চুটকি—চাটুকি।
(খ) না-লৈল—না করি।
(গ) নাহি—যেনা।
(ঘ) মো কহিনু—কহিলাম।

অতএব মোর বাক্য যেমন লঙ্ঘিলে।
জন্ম গিয়া লহ (ক) অচিরাত নীচকুলে॥
স্বামীর শাপেতে বিপ্র মুচির কুলেতে।
জনমিল গিয়া তবে সে-দেহ-পতিতে॥
সদ্‌গুরু আশ্রয় আর সৎসঙ্গ হইতে।
গুরুর সেবার বলে না হৈল বিস্মৃতে॥
জন্মমাত্র হরিভক্তি উদয় হইল।
জাতিস্মর হইয়া সৎক্ষণে জনমিল॥
জনমিয়া গুরুতে বিচ্ছেদ সঙরিয়া (খ)।
দুগ্ধ নাহি খায় শিশু আকুল কান্দিয়া॥
মাতা পিতা নানা মতে চেষ্টা-সন্ধি করে।
কোনোমতে দুগ্ধ পান করাইতে নারে॥
উপায় চিন্তিয়া গেলা স্বামীর চরণ (গ)।
কাকুবাদ করি কহে পুত্রের কারণ॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীরামানন্দ-স্বামী শুনিতেই।
স্ফূর্ত্তি হৈল নিজ শিষ্য জনমিল সেই॥
ভাবিয়া স্বামীর মনে দুঃখ উপজিল।
হা হা কেনে হেন পাত্রে অভিশাপ দিল॥
সম্প্রতি দুগ্ধ না খায় আমার বিচ্ছেদে।
মুঞি কৈনু (ঘ) অকর্ম্ম মাতিয়া নিজ মদে॥
অতেব বিহিত মোরে হৈল করিতে (ঙ)।
এতেক ভাবিয়া কহে চামারের সাথে (চ)॥
কোথায় তোমার ঘর বালকে কি হৈল।
চিন্তা নাঞি আমি গিয়া করো্যে দিব ভাল॥
চামার কুণ্ঠিত হৈয়া যোড়হস্তে কহে।
আপনে আমার ঘরে যাবা-যোগ্য নহে॥

পাঠান্তর—(ক) গিয়া লহ—লও গিয়া।
(খ) গুরুতে বিচ্ছেদ সঙরিয়া—গুরু প্রতি বিচ্ছেদ স্মরিয়া।
(গ) চরণ—সদন।
(ঘ) কৈনু—কৈল।
(ঙ) অতএব বিহিত করিতে হইল মোরে।
(চ) এতেক ভাবিয়া সাধু কহে চামারেরে।

স্বামী কহে ইথে মোর লাঘবতা কিবা (ক)।
পর উপকার যেই সেই হরিসেবা (খ)॥
এতেক কহিয়া চলি গেলা তার ঘরে।
স্বামীরে দেখিয়া শিশু চকিতে (গ) নেহারে॥
তৃষিত চাতকে যেন জল-ধারা মিলে।
দারিদ্র (ঘ) রতন যেন পায় (ঙ) হারাইলে॥
দুনয়ানে বহে ধারা না পারে কহিতে।
গুমরিয়া রহে নারে দুঃখ নিবেদিতে॥
স্বামী তার ভাব বুঝি অন্তরে কান্দয়।
শিরে হস্ত দিয়া বহু আশ্বাস করয়॥
চিন্তা না করিহ হরি করিবেন দয়া।
অবশ্য যে দিবেন অভয় পদছায়া (চ)॥
এতো কহি কর্ণে মহামন্ত্র যে অর্পিলা।
কৃতার্থ করিয়া স্বামী নিজবাসে গেলা॥
ক্রমে ক্রমে সাধু যত হয়েতো বর্দ্ধিষ্ঠ।
চন্দ্রবত ভক্তি তথা প্রকাশ প্রকৃষ্ট (ছ)॥
দুই জুড়ি জুতা প্রতিদিন বানাইয়া।
এক জুড়ি দেন নিতি বৈষ্ণব দেখিয়া॥
এক জুড়ি বেচি করে দেহ নির্ব্বাহণ।
বৈষ্ণবের ফাটা জুতা বনাইয়া দেন॥
এইমত কথোক দিবস গত হৈল।
কুটুম্ব হইতে ভিন্ন স্থান এক কৈল॥
ঝোপড়া বান্ধিয়া এক শালগ্রাম আনি।
তাহাতে রাখিয়া সেবা করয়ে আপনি॥
রুইদাস বলি নাম লোকেতে কহয়।
হরির কৃপার পাত্র কেহো না জানায়॥
কষ্টেস্রেষ্টে জীবিকা চলয়ে কোনো মতে।
কোন দিন উপবাস হয় না মিলাতে॥

দয়াল শ্রীরামচন্দ্র কেলেশ দেখিয়া।
ছদ্মরূপে আইলা এক পর্শমণি (ক) নিঞা॥
রুইদাস কহে কেনে কড়কা করহ।
পর্শমণি আনিয়াছি এই ধন লহ॥
তেঁহো কহে কে তুমি কোথায় তব ঘর।
প্রভু কহে আমি তব ইষ্ট রঘুবর॥
পুন কহে তুমি যদি রঘুবর হও।
তবে কেনে নিজরূপ নাহিক দেখাও॥
প্রভু কহে দেখাইব তবে (খ) মণি লও।
তেঁহো কহে পাথর আনিঞা কি ভুলাও॥
প্রভু কহে এ পাথর লোহে ছোঁয়াইলে।
তৎক্ষণেতে স্বর্ণ হয় বহু অর্থ মিলে॥
এতো কহি চামকাটা রাম্পি[১] ছোঁয়াইল।
দেখিতে দেখিতে রাম্পি সোণার হইল॥
তেঁহো তাহা দেখি ক্রোধে মুখ ফিরাইয়া।
কহেন এ করিলে কি (গ) দিলে বিগারিয়া॥
দিন গুজরান মোর ইহা হৈতে হয়।
তুমি তা করিয়া সোণা কৈলে অপচয়॥
কে তুমি করিতে আইলে মোরে বিড়ম্বন।
কায নাঞি মোর তুমি নিঞা যাও ধন॥
প্রভু কহে স্বর্ণ হইল অপচয় কহ।
তেঁহো কহে কায নাঞি তুমি নিঞা যাহ॥
অর্থে মোর অপচয় সদাই হইবে (ঘ)।
রজগুণ বৃদ্ধি হৈলে সর্ব্বনাশ হবে॥
তথাচ যতন করি প্রভু গছাইলা।
রুইদাস নিঞা চালে গুঁজিয়া রাখিলা॥
প্রেমানন্দ-রসে যেই মগন আছয়।
প্রাকৃত মণিতে কি তাহার মন ভায় (ঙ)॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অষ্টাদশ সিদ্ধি।
দৃক্‌পাত না করে যাথে অতি-তুচ্ছ-বুদ্ধি॥

পাঠান্তর—(ক) লাঘবতা কিবা—কিবা লাঘবতা।
(খ) যেই সেই হরিসেবা—হয় হরির তুষ্টতা।
(গ) চকিতে—চমকে।
(ঘ) দারিদ্র—দরিদ্রে।
(ঙ) পায়—মিলে।
(চ) অবশ্য তোমারে হরি দিবেন পদছায়া।
(ছ) চন্দ্রবত ভক্তিকলা কালে হয় পুষ্ট।

পাঠান্তর—(ক) পর্শমণি—স্পর্শমণি।
(খ) তবে—এবে।
(গ) এ করিলে কি—করিলে কিবা।
(ঘ) সদাই হইবে—সর্ব্বদাই হবে।
(ঙ) ভায়—ধায়।

১। চামকাটা রাম্পি—চামড়া কাটা বাটালি।

সে কি বস্তু জ্ঞান করে পরশ রতন।
নিত্যানন্দে পূর্ণ যার সদানন্দ মন॥
কথোক দিবস পরে পুন প্রভু আইলা।
পুছেন ভক্তেরে পর্শমণি কি করিলা॥
তেঁহো কহে তব সে পাথর আর রাঁপি।
চালে খুসি রাখিয়াছি ঘাসগুলা (ক) ঝাঁপি॥
বাহির করিয়া কহে এই নিঞা যাহ।
ওগুলা না আন এথা অন্য কারে দেহ॥
প্রভু পুন কহে এই দুঃখে কেনে মর।
যৎকিঞ্চিত কিছু দেই তাঁহি অঙ্গীকর॥
তোমার যে ঠাকুর তাঁর আসনের তলে।
পাঁচটি মোহর আছে নিত্যনি সকালে (খ)॥
তেঁহো কহে না না মোর তাহে কায নাঞি।
মোহর পাথর নিঞা দেহ অন্য ঠাঁঞি॥
তবে প্রভু (গ) গেলা ঠাকুরের শয্যাতলে।
পাঁচটি মোহর আছে দেখয়ে সকালে॥
দেখিয়া বড়ই মনে বেজার মানিল।
কহয়ে বড়ই মোর জঞ্জাল হইল॥
টান মারি দূরে ডারি দিল ক্রোধ করি।
পুন প্রভু আইলা তাহার কর্ম্ম হেরি॥
ভকতবৎসল হরি ভক্ত-দুঃখ হেরি।
পুনঃপুন আইসেন না রহিতে পারি॥
পুন আসি কহে তাঁর দুটি হাথ ধরি।
একটি নেহোরা[১] মোর রাখ অঙ্গীকরি॥
পর্শমণি না লইলে না লইলে ভাল।
পাঁচটি মোহর নিথি (ঘ) লবে মোরে বল॥
সাধু বলে কে তুমি স্বরূপ কহ মোরে।
এতেক যতন কেনে কর মোর তরে॥
তেঁহো কহে আমি তব রামচন্দ্র হই।
তব দুঃখ দেখিয়া (ঙ) অন্তরে দুঃখ পাই॥

পুন সাধু কহে যদি মোর প্রভু হও।
স্বরূপ দেখাইয়া মোরে প্রতীতি করাও॥
তবে হরি একবার নিজ মূর্ত্তি ধরি।
দেখা দিয়া (ক) ভক্তে গেলা অন্তর্দ্ধান করি॥
বিদ্যুতের ন্যায় সাধু একবার হেরি।
স্থাবরের ন্যায় রহে অনিমিখ করি॥
চমৎকার চিত্তে জ্ঞানহতপ্রায় রহে।
ক্ষণেকে সম্বিত পাই ইথিউথি চাহে॥
পুন দেখিবারে না পাইয়া চিত্ত ভ্রমে।
ঘুরিয়া বুলয়ে[১] তাপ উঠয়ে মরমে॥
উচ্চস্বরে কান্দে আহা কি দেখিনু মরি।
হেনরূপ আর কি আছয়ে জগভরি॥
পীতাম্বর নবঘন-শ্যামল সুন্দর।
কি দেখিল অপরূপ সুন্দর অধর॥
একবার কি দেখিনু আর দেখি নাঞি।
কি দোষ করিনু মুঞি বিধাতার ঠাঁঞি॥
দিয়া ধন হৃদে হৈতে কাড়িয়া লইল।
এ হেন রতন পায়্যা বঞ্চিত হইল॥
পুনঃপুন কহে মোরে মুঞি তোর প্রভু।
প্রত্যয় না কৈনু মুঞি না বুঝিনু তভু॥
তখন এমত যদি বুঝিতাম মনে।
ছাড়িয়া নাহিক দিতাম ধরিয়া চরণে (খ)॥
পর্শমণি আদি দিতে চাহিলেন মোরে।
বাক্যের হেলন তাঁর কৈনু বারে বারে॥
বুঝি সেই অপরাধে বঞ্চন করিলা।
নহে কেনে দেখা দিয়া পুন লুকাইলা॥
এতেক বিলাপ করি সম্বরণ কৈল।
আজ্ঞা হৈল অর্থ লৈতে বিচার করিল॥
তবে সেই পঞ্চ স্বর্ণ অঙ্গীকার কৈল।
স্বর্ণ নিঞা (গ) কি করিব মনে বিচারিল॥

পাঠান্তর—(ক) ঘাসগুলা—ঘাষিগুলা।
(খ) আছে নিত্যনি সকালে—পাবে নিত্য প্রাতঃকালে।
(গ) প্রভু—তেঁহ।
(ঘ) নিথি—নিত্য।
(ঙ) দেখিয়া—নেহারি।
১। নেহোরা—অনুরোধ।

পাঠান্তর—(ক) দেখা দিয়া—দেখাইয়া।
(খ) না দিত ছাড়িয়া ধরি রাখিতাম চরণে।
(গ) নিঞা—দিয়া।
১। বুলয়ে—ভ্রমণ করে।

ঠাকুরের মন্দির আর সেবার (ক) শৃঙ্খলা।
করিলা হইল বহু বৈষ্ণবের মেলা॥
সদা গান নৃত্য বাদ্য যাত্রা মহোৎসব।
কৃষ্ণ কথা বিনে আর নাহি অন্য রব॥
স্বয়ং শ্রীল রামচন্দ্র ভোজন করয়।
যাথে স্থান দেখি মাত্র চমৎকার হয়॥
ঝালি (খ) নামে এক রাণী দীক্ষা নাহি হয়।
গুরুর পরীক্ষা-চেষ্টা (গ) সদাই করয়॥
কাশীর নিকটে রুইদাস ভাগবত।
গুরু রামানন্দ-শিষ্য পরম মহত (ঘ)॥
দরশনে গেলা রাণী শুদ্ধভক্তিভাবে (ঙ)।
দরশন মাত্রেই রাণীর চিত্ত দ্রবে॥
সেবক হইতে মনে (চ) শ্রদ্ধা জনমিল।
তার্কিক ব্রাহ্মণগণ বারণ করিল॥
মুচির সন্তান স্থানে দীক্ষা যে করিবে।
লোকে ধর্ম্মে-বিরুদ্ধ এ কেমতে হইবে॥
পণ্ডিত সুবুদ্ধি রাণী কহে বিপ্রগণে।
কি কহিলে বিপরীত মুচির সন্তানে॥
আজন্ম তোমরা করি ব্রহ্ম-অনুষ্ঠান।
কহ দেখি নিজ গুণের কি কৈলে বিধান॥
স্বধর্ম্ম যাজন কর অধর্ম্মের ভয়ে।
না হয় অধিক হবে স্বর্গের বিষয়ে॥
অনিত্য সে তাহাও যে সুসিদ্ধ (ছ) দুর্লভ।
বড় ফল করি মানো কৈবল্য অভব[১] (জ)॥
সেহো মুক্তি ভুক্তি ধর্ম্ম হরির ভকত।
সাক্ষাতে আইলে নাহি করয়ে দৃকপাত॥
নীচ যে কহিলে অতি অনুচিত সেহ।
শাস্ত্র দূরে থাকু যুক্তি করিয়া বুঝহ॥

পাঠান্তর—(ক) সেবার—ভোগের।
(খ) ঝালি—কালি।
(গ) গুরুর পরীক্ষা-চেষ্টা—গুরুপরীক্ষার চেষ্টা।
(ঘ) পরম মহত—পরম মহত্ত্ব।
(ঙ) শুদ্ধভক্তিভাবে—শুদ্ধ সত্ত্বভাবে।
(চ) মনে—চিত্তে।
(ছ) সুসিদ্ধ—সুবুদ্ধি।
(জ) অভব—বৈভব।

১। কৈবল্য—মুক্তি; অভব—পুনর্জ্জন্ম না হওয়া।

পরাৎপর জগতের (ক) পরম ঈশ্বর।
যে চরণে গঙ্গা হৈল ত্রৈলোক্যের সার॥
তাঁর শ্রীচরণ যেই হৃদয়ে ধরয়।
তারে নীচ কহিলেই অপরাধ হয়॥
ব্রাহ্মণ পবিত্র জাতি হইয়া কি পায়।
নীচজাতি হরিভক্তে কি না লভ্য হয়॥
স্বাভাবিক ব্রাহ্মণের জন্ম মৃত্যু হয়।
পুনর্ব্বার নীচ জাতি (খ) কুলেতে জন্ময়॥
নীচ জাতি হরিভক্ত পুন না জন্ময়।
ব্রহ্মার প্রার্থনা যাহা হেন পদ পায়॥
অপূর্ণ ভজনে যদি জনমিতে হয়।
উত্তম জনম পাঞা সাধুমার্গ পায়॥

শ্রীগীতায়াম্—

শুচীনাং শ্রীমতাং গৃহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।

অনুবাদ—যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পূর্ব্বে আরব্ধ যোগের প্রভাবে শ্রীসম্পন্ন যোগীদের গৃহে জন্মলাভ করেন।

অতএব হরিভক্ত চণ্ডালে যে হয়।
ভুবন-পাবন সেহ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় (গ)॥
বেদশাস্ত্রে এ প্রমাণ অনুভব সর্ব্বে।
সাধারণ নাহি হয়ে রজের প্রভাবে (ঘ)॥
রজ আর তমের যে এমতি প্রভাব।
দেখিয়াও প্রত্যক্ষে না হয় অনুভব॥
এতো কহি রাণী গিয়া রুইদাস স্থানে।
শরণ লইয়া মন্ত্র করিলা গ্রহণে॥
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা অচিরাত হৈল।
অনেক জন্মের ভাগ্যফল যে ফলিল॥
রাণীরে ব্রাহ্মণ কিছু কহিবারে নারে।
পরস্পর সব বিপ্র কাণাকাণি করে॥
একদিন ঝালি রাণী গুরু রুইদাসে।
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলা নিজ বাসে॥

পাঠান্তর—(ক) জগতের—জগন্নাথ।
(খ) জাতি—আদি।
(গ) কয়—গায়।
(ঘ) প্রভাবে—স্বভাবে।

কথোপকথন ব্রাহ্মণ করিলা (ক) নিমন্ত্রণ।
একপংক্তি বসাইলা করিতে ভোজন॥
বিপ্রগণ তাহে দেখি ঊসিমুসি (খ) করে।
মুচিসহ কেমতে বসিব একস্তরে॥
রুইদাস পাশ হৈতে দূরে গিয়া বৈসে।
সেখানেও দেখে রুইদাস বসি পাশে॥
পুনর্ব্বার তথা হৈতে দূরে গিয়া বৈসে।
পুন দেখে রুইদাস বসিয়াছে পাশে॥
এইমত পরস্পর সভাই দেখয়।
বিব্রত হইয়া পরস্পর যে কহয়॥
একি হৈল পাপ আজি মুচির সহিতে।
একপংক্তি বসি বুঝি হইল খাইতে॥
এমতি তমের ধর্ম্ম বুঝিয়া না বুঝে।
অলৌকিক দেখিয়া তথাপি নাহি রিঝে (গ)॥
বিভু নিজ ভক্তের মহিমা প্রকাশিতে।
নানাখেলা করে অজ্ঞে না পারে বুঝিতে॥
রাণী সেই রঙ্গ দেখি মুচকিয়া হাসে।
অভিমানী (ঘ) বিপ্রগণ না জানে বিশেষে॥
ভোজন করিয়া সভে উঠিলেন পরে।
স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া সাধুবরে॥
চামর ব্যজন রাণী করে নিজ করে।
বিপ্রগণ আরো কিছু চমৎকার হেরে॥
রুইদাস-অঙ্গে তেজ ঝলমল করে।
স্বর্ণ-যজ্ঞোপবীত শোভয়ে স্কন্ধোপরে॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ চমৎকার হৈল।
উঠিয়া চলিল কিন্তু আদর না কৈল॥
কাশীবাসী বিপ্রগণ জ্ঞানমার্গী হয়।
বৈষ্ণব যে সেব্য তার মর্ম্ম না জানয়॥
শ্রীমান রুইদাস শ্রীমতী রাণীজীর।
চরণ ভরসা লালদাস নারকীর॥

পাঠান্তর—(ক) করিলা—করিয়া।
(খ) ঊসিমুসি—উকিঝুঁকি।
(গ) রিঝে—সুঝে।
(ঘ) অভিমানী—অভিমানে।

চরিত্র পিপাজীর

গাঙ্গরোলের রাজা নাম পিপা হয়ে শাক্ত।
দেবীর প্রতিমা পূজে অতি অনুরক্ত॥
দৈবাতে বৈষ্ণব এক অতিথি হইলা।
হেলা করি যাহা কিছু খাদ্য দ্রব্য দিলা॥
রন্ধন করিয়া সাধু খাইয়া রহিলা (ক)।
রাজা শাক্ত কৃষ্ণভক্তি-বিহীন জানিলা॥
ক্ষোভিত হইয়া কিছু মনোরথ করে।
রাজা যদি হরিভক্ত হয় দেবী-বরে (খ)॥
তবে এই রাজ্যধন মানব-জনম।
সফল যে হয় নহে কেবল ভরম॥
দেবীর কৃপার পাত্র সহজে রাজন।
বিশেষে সাধুর কৃপা পরম কারণ॥
শঙ্খিনী যোগিনী সহ নিশিতে ভবানী।
ভয়ঙ্কর রূপ ধরি যাইয়া আপনি॥
নিদ্রাকালে রাজার বসিলা বক্ষঃস্থলে।
হুঙ্কার করিয়া কিছু ক্রোধাবেশে বলে॥
হাঁরে মূঢ় সাধু করি মান আপনারে।
অবজ্ঞা করিলে কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবেরে॥
প্রাতঃকালে উঠি তার সম্মান করিবে।
স্তবন করিয়া অপরাধ মানাইবে॥
যুক্তি যে কহিবে তেঁহো তাহাই করিবে।
সর্ব্ব সিদ্ধ সেই যাহে (গ) কল্যাণ হইবে॥
স্বপন দেখিয়া রাজা ভয়েতে কাতর।
কি দেখিনু বলিয়া চিন্তয়ে গাঢ়তর॥
প্রাতে উঠি গিয়া সেই বৈষ্ণব-চরণে।
অষ্টাঙ্গ হইয়া সব কহে বিবরণে॥
চরণে ধরিয়া কহে কি আজ্ঞা করহ।
অপরাধ ক্ষেম আর করি যে (ঘ) বলহ॥
যে আজ্ঞা করহ তাহা করি শিরে ধরি।
বুঝিলাম বৈষ্ণবের মহিমা যে ভারি॥

পাঠান্তর—(ক) রহিলা—বসিলা।
(খ) দেবী-বরে—সেবা করে।
(গ) যাহে—যাথে।
(ঘ) করি যে—কি করি।

বৈষ্ণব কহেন রাজা তুমি ভাগ্যবান।
এতাদৃশ দেবী যে তোমারে কৃপাবান॥
আমি যে মানস কৈনু তাহাতে সম্মতি।
হইয়া করিলা আজ্ঞা দিয়া অনুমতি॥
বড় কৃপা কৈল দেবী কৃষ্ণভক্তি দিল।
জগতের সার অর্থ বিতরণ কৈল॥
অতএব মহারাজ মোর মনকথা।
কৃষ্ণভক্ত হও যাবে তাপত্রয়-ব্যথা॥
কৃষ্ণপ্রেম-সুখোল্লাস আস্বাদ করহ (ক)।
সুধাপান কর আর বন্ধন ছুটাহ॥
ইহার অধিক নহে রাজধর্ম্ম অর্থ।
আর যত দেখ হয় সকলি অনর্থ॥
এতেক শুনিঞা রাজা ভাবিতে লাগিলা।
দেবীর আশায় এই সিদ্ধান্ত বুঝিলা॥
বৈষ্ণবেরে কহে রাজা কর্ত্তব্য হইলা।
তথাচ দেবীরে কিছু নিবেদিতে গেলা॥
তবে রাজা দেবীরে কহয়ে স্তুতি করি।
এবে বুঝিলাম যে নিতান্ত সেব্য হরি॥
তাহাতে বুঝিনু মোরে বড় কৃপা কৈলে।
সারাৎসার যেই অর্থ সেই ধন দিলে॥
রাজ্য ধন পাইয়া যে (খ) মানিলাম অর্থ।
এবে বুঝিলাম সেই সকলি অনর্থ॥
অতএব সার ধন দিতে ইচ্ছা কৈলা।
আশ্রয় করি যে কোথা তাহা না কহিলা॥
গুরুপদ আশ্রয় করিব কোথা গিয়া।
তাহা আজ্ঞা কর মোরে করুণা করিয়া॥
এতেক শুনিঞা দেবী আদেশ করয়ে।
গুরু রামানন্দ-পদ করহ আশ্রয়ে॥
কাশীতে শ্রীরামানন্দ নিকটে চলিলা।
শিষ্যগণ নিকটে যাইতে নাহি দিলা॥
অবৈষ্ণব পিপারাজা পূর্ব্বেতে জানয়।
অতএব স্বামী শুনি উপেক্ষা করয়॥

বাহিরে রহিয়া রাজা যোড়হাথ করি।
বিনয় করয়ে বহু দন্তে তৃণ ধরি॥
দেবীর আজ্ঞায় সব বৃত্তান্ত কহিল।
শরণ লইনু বলি কান্দিতে লাগিল॥
তবে স্বামী নিশ্চয় জানিঞা মনোবৃত্তি।
আনন্দ জন্মিল দয়া উপজিল অতি॥
তারকব্রহ্ম রামনাম উপদেশ দিয়া।
বড় কৃপা কৈলা তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
অভিমান তেজি রাজা কথোক দিবস।
সেবা কৈল গুরুর করিয়া অভিলাষ॥
গুরুর আজ্ঞাতে গৃহে আসিয়া রাজন।
বৎসরেক কৈল হরিভক্তির সাধন॥
বিষয় তেজিয়া বনে করিতে গমন।
হরি-অনুরাগে দৃঢ়তর হৈল মন (ক)॥
বিবেচনা করি কিছু অন্তরে চিন্তিলা।
স্ত্রীগণের হিত করিবারে বিচারিলা॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ইহা সভার মতি হয়।
অবশ্য আমার ইহা করিতে যুয়ায়॥
এতেক চিন্তিয়া স্বামী-রামানন্দ স্থানে।
পত্রী পাঠাইলা ইহা (খ) অস্ফুট বচনে॥
একবার হেথা পদার্পণ যদি হয়।
নিবেদন করিব বিশেষ সর্ব্ববিষয় (গ)॥
পাইয়া রাজার পত্রী স্বামী চলি আইলা।
রুইদাস-আদি শিষ্যসঙ্গে করি মেলা (ঘ)॥
সম্যক্-প্রকারে রাজা পূজিলা স্বামীরে।
দীক্ষা করাইল রাণীগণ সভাকারে॥
রাজ্য তেয়াগিয়া রাজা বৈরাগ্য করিয়া।
যাইবারে চাহে গুরু স্থানে নিবেদিয়া॥
স্বামী তাহে পরম-সন্তোষ চিত্তে হৈলা।
এইক্ষণে শুভ বলি অনুমতি দিলা॥
রাজ্য তেজি বৈরাগ্য করিয়া রাজা চলে।
যাইবার কালে সাত রাণী আসি মিলে॥

পাঠান্তর—(ক) আস্বাদ করহ—তাহা আস্বাদহ।
(খ) পাইয়া যে—আদি পাইয়া।

পাঠান্তর—(ক) হৈল মন—কৈল পণ।
(খ) ইহা—এক।
(গ) সর্ব্ববিষয়—কিছু হয়।
(ঘ) মেলা—গেলা।

মোরা সমিভ্যারে যাব সভে মেলি যজে।
বিঘ্ন এক উপস্থিত (ক) পড়িল জঞ্জালে॥
নাহি ছাড়ে কেহো রাজা আপদে পড়িলা।
স্বামীজী স্ত্রীগণেরে (খ) অনেক বুঝাইলা॥
না মানিল যদি তবে রাজা কিছু কহে।
যে জন আসিতে যোগ্য হবে মোর সহে॥
অলঙ্কার বস্ত্র আদি দূরে তেয়াগিয়া।
নগ্নবেশে সভামধ্যে আসিব (গ) ফিরিয়া॥
কহিবামাত্রেতে সীতা নাম ছোট রাণী।
টান মারি ফেলি দিলা হার হীরা মণি॥
হাথ যোড় করি কহে উলঙ্গ হইতে।
অপরাধ হবে এই গুরুর সাক্ষাতে॥
এতো কহি ছিন্ডা এক কম্বল ফাড়িয়া।
পরিয়া লইল জরিবস্ত্র তেয়াগিয়া॥
রাজা চমকিয়া স্বামি-মুখপানে চাহে।
এেহারে সঙ্গেতে (ঘ) লহ গুরুদেব কহে॥
হরি-অনুরাগী যেই সেই গ্রাহ্য হয়।
যদি বল রমণীর সঙ্গ না জুয়ায়॥
উভয়ের রীত রাগ (ঙ) যদ্যপি জন্ময়।
দৈহিক সম্বন্ধে অভিমান নাহি রয় (চ)॥
তবে যে পুরুষ স্ত্রী-ভেদ কি রহিল।
সভাই সমান তাহে (ছ) হরিভক্তি হৈল॥
ভক্তিপক্ষে বন্ধু (জ) সম অবশ্য যে গ্রাহ্য।
রাগ পক্ষে রিপু তুল্য যাথে যায় ধৈর্য্য॥
পিপাজীর রাণীর অধিকার অনুরাগ।
উভয় সমান-রীতি বিষয়-বিরাগ॥
উপযুক্ত বুঝি স্বামী অনুমতি দিলা।
অযোগ্য কোথায় যাথে স্বামী কৃপা কৈলা (ঝ)॥

তাহে বিশেষত হরিভক্তের আশ্রম (ক)।
শ্রীমদ্ভাগবতে কহে নাহিক নিয়ম (খ)॥

টীকা শ্রীশ্রীধরস্বামিচরণ—

'স্বভক্তস্য আশ্রমনিয়মাভাবস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ' ইত্যাদি।

অনুবাদ নিজ ভক্তের আশ্রম নিয়ম নাই এই বিষয় পরে বলা হইবে।

শ্রীমান্ রামানন্দ হন (গ) দ্বিতীয় শ্রীরাম।
তাঁর কৃপা-কটাক্ষেতে পূরে সর্ব্ব কাম॥
তাহে তাঁর পূর্ণ কৃপা তাথে কি সংশয়।
দুর্ঘটঘটন যার কটাক্ষেতে হয় (ঘ)॥
জগতে যে না মিলয়ে সর্ব্ব ধর্ম্ম করি।
সর্ব্বদেব সেবি মহা তপস্যা আচরি॥
হেন যে দুর্লভ হরিভক্তি যেই দাতা।
তাঁহার কৃপায় রাগনিবৃত্তি (ঙ) কা কথা॥
রাগ-নিবর্ত্তন আদি (চ) ভক্তি-অঙ্গ নহে।
তথাচ নিবর্ত্ত চাহি বাধা জন্মে যাহে॥
আরো আছে তাতপর্য্য ঐকান্তিক মতে।
রাগোদ্দেশ (ছ) নাহি থাকে একান্তী ভকতে॥
যেমন জ্ঞানীর মতে বৈরাগ্য প্রধান।
ভক্তিমার্গে তেমন অবশ্য নাহি হন॥
তথাচ ভক্তির গুণ এমতি স্বভাব।
আপনি জন্ময়ে আসি সুনির্ব্বিণ্ন ভাব (জ)॥
অতঃপর পিপাজীর নানা লীলা কর্ম্ম।
সকল কহা না যায় কিছু কহি মর্ম্ম॥
সীতা সঙ্গে চলে রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া।
মৃত্তিকার করোয়া ছিন্ডা কম্বল উড়িয়া (ঝ)॥
বদনে শ্রীরামনাম ভিক্ষাটন করি।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা দ্বারকানগরী॥

পাঠান্তর—(ক) বিঘ্ন এক উপস্থিত—বিঘ্ন উপস্থিত রাজা।
(খ) স্বামীজী স্ত্রীগণেরে—স্বামী তার স্ত্রীগণে।
(গ) আসিব—আইসহ।
(ঘ) সঙ্গেতে—সঙ্গতি।
(ঙ) রীত রাগ—বীত রাগ।
(চ) নাহি রয়—না রহয়।
(ছ) তাহে—তাতে।
(জ) বন্ধু—বুদ্ধি।
(ঝ) কৃপা কৈলা—আজ্ঞা দিলা।

পাঠান্তর—(ক) আশ্রম—আশ্রয়।
(খ) নাহিক নিয়ম—করিয়া নিশ্চয়।
(গ) রামানন্দ হন—গুরু রামানন্দ।
(ঘ) দুর্ঘটনা যার কটাক্ষেতে লয় হয়।
(ঙ) রাগনিবৃত্তি—রাগ নিবর্ত্ত।
(চ) আদি—হরি।
(ছ) রাগোদ্দেশ—রাগদোষ।
(জ) সুনির্ব্বিণ্ন ভাব—সুনির্ব্বেদ ভাব।
(ঝ) উড়িয়া—উড়াইয়া।

নিত্য শ্রীদ্বারকাধাম (ক) নিত্য-লীলা হয়।
মনেতে প্রতীত আছে দেখিতে না পায়॥
না দেখিয়া মনে কিছু (খ) দুঃখ উপজিল।
আশপাশ লোকে সাধু পুছিতে লাগিল॥
এইখানে দ্বারকাপুরী কৃষ্ণ বিরাজয় (গ)।
দেখিতে না পাই কেনে গেলেন কোথায়॥
হাসিয়া কহয়ে লোক এবে কি দেখিবে।
কলিকালে এখন দেখিতে কোথা পাবে॥
লীলা-অন্তে সপ্তরাত্রি পরে দ্বারাবতী।
সাগরে ডুবিলা কৃষ্ণ বিরাজয় তথি॥
এতো শুনি উৎকণ্ঠাতে (ঘ) সীতার সহিতে।
দরশন হেতু ঝাঁপ দিল সাগরেতে॥
টাবু টুবু করিয়া ডুবিয়া (ঙ) রহে দোঁহে।
তা দেখি রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণেরে কহে (চ)॥
কেমন নির্দ্দয় তুমি দয়ালেশ নাঞি।
এ কলঙ্ক তোমার জগতে রবে ছাই[১]॥
ভক্তদুটি ডুবিয়া মরয়ে সিন্ধু-জলে।
কৃপা করি দোঁহারে আনহ নিজ স্থলে॥
তবে কৃষ্ণ গরুড়ে কহিয়া আনাইলা।
যুগলমোহন-রূপ-দরশন দিলা॥
হেরিয়া পরমানন্দ পাইয়া দুজনে।
চাতক যেমন হয়ে মেঘ বরিষণে (ছ)॥
করিয়া অমৃত পান কথোক দিবস।
রহিলা যে তথায় পাইয়া সেবারস॥
কৃষ্ণ কহে তাঁহা-দোঁহে আমার আজ্ঞাতে।
দ্বারকা প্রকাশ (জ) গিয়া কর উপরেতে॥
নিত্যধাম-দ্বারকা-বিনাশ কভু নহে।
তবে যে সমুদ্রে মগ্ন যাহা লোকে কহে॥

পাঠান্তর—(ক) শ্রীদ্বারকাধাম—শ্রীদ্বারিকাধামে।
(খ) কিছু—বড়।
(গ) এখানে কৃষ্ণের দ্বারকাপুরী হয়।
(ঘ) উৎকণ্ঠাতে—উৎকণ্ঠিতে।
(ঙ) ডুবিয়া—বুড়িয়া।
(চ) হোথা শ্রীরুক্মিণীদেবী কৃষ্ণসনে কহে।
(ছ) মেঘ বরিষণে—মেঘ দরশনে।
(জ) প্রকাশ—প্রবেশ।
১। ছাই—ছাইয়া, জুড়িয়া।

তাহার বৃত্তান্ত কহি শুনহ বিস্তার।
লোকে জানাইতে কৈনু লীলার প্রকার॥
সমুদ্রের স্থানে কিছু স্থান মাগি লৈনু।
অসুর-মোহন (ক) হেতু এ লীলা করিনু॥
অসুর বুঝিবে কৃষ্ণ পলাইয়া গেল।
সাগরের স্থানে গিয়া শরণ লইল॥
নতুবা যে নিত্যধাম উপরে অদ্যাপি।
আছয়ে নাহিক ক্ষয় সদাই চিদ্রূপি॥
তথায় সদাই মুঞি পরিবার সনে।
লীলা-অপ্রকটে থাকি সভে নাহি জানে॥
ভক্তগণে জানে মোর সদা নিত্যলীলা।
অসুর স্বভাব কহে সব মরি গেলা॥
অসুর মোহের হেতু যদুবংশ ক্ষয়।
লীলা কৈনু যাথে বুঝে প্রাকৃতের (খ) ন্যায়॥
সেই ইন্দ্রজালবত যথার্থ না হয়।
ছলে দেবগণে পাঠাইলা স্বস্বালয়[১]॥
সমুদ্রের ভিতরে যে এখন দেখহ।
সমুদ্রেরে কৃপা করি থাকি যে জানিহ॥
যেহেতুক (গ) সর্ব্বতীর্থময় যে সাগর।
যাথে স্নান-আদি হয়ে সর্ব্ব-সিদ্ধকর॥
অতএব তোমরা যাইয়া দ্বারকার।
মহিমা প্রকাশ কর স্থানের প্রচার॥
যথা যেই লীলা তার স্থান নির্দ্দিষ্টিয়া (ঘ)।
আমার চিন্ময়-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া॥
সেবার শৃঙ্খলা কর মুঞি ভোগ করি।
বিরাজ করিব যে প্রতিমারূপ ধরি॥
লোকের নিস্তার হেতু ইহা কর গিয়া।
দেহ-অন্তে মোরে পুন পাইবে আসিয়া॥
এতেক শুনিঞা সাধু চমকিত (ঙ) হৈল।
হা হা মূঢ় লোকে বলে যদুবংশ মৈল॥

পাঠান্তর—(ক) অসুর-মোহন—অসুর মারণ।
(খ) প্রাকৃতের—প্রকৃতের।
(গ) যেহেতুক—সেই হেতু।
(ঘ) নির্দ্দিষ্টিয়া—নির্দ্দেশিয়া।
(ঙ) চমকিত—চমৎকার।
১। স্বস্বালয়—নিজ নিজ স্থানে বা গৃহে।

চিদানন্দময় নিত্য সভার কারণ।
তা-সবার ক্ষয় কোথা কোথায় মরণ॥
বুঝিলাম শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত না জানিঞা।
বিরুদ্ধার্থ করে লোক পণ্ডিত মানিঞা॥
আপনিহ নাশ যায় লোকেরে ডুবায়।
ইহকাল পরকাল দুই যায় ক্ষয়॥
এতেক ভাবিয়া স্তম্ভপ্রায় দোঁহে রহে।
ইঙ্গিত করিয়া কৃষ্ণ গরুড়েরে কহে॥
গরুড় তৎক্ষণে দোঁহে শ্রীপুর হইতে।
উপর উঠাঞা দিলা সমুদ্রবেলাতে (ক)॥
বিচ্ছেদে বিমর্ষ দোঁহে চারিপানে চাহে।
সেরূপ না দেখি পুন বিকল বিরহে॥
দ্বারকা প্রকাশ কৈলা আজ্ঞা-অনুসারে।
যেখানে যে লীলাস্থান সব ব্যক্ত করে॥
রণছোড়জী টীকমজী দুই শ্রীবিগ্রহ।
স্বয়ম্ভুব আসি তাহে কৈল অনুগ্রহ॥
নির্ম্মাণ করিয়া পুরী (খ) ঠাকুর প্রকাশি।
সেবায় মজিল মন দোঁহা দিবানিশি॥
মুদ্রা বিনে নাহি হয় ভক্তে অধিকারী।
তপ্তমুদ্রা (গ) ব্যবস্থিল স্থান-নিয়ম করি॥
কথোক দিবস পরে সেবক স্থাপিয়া।
বেড়ান নানান তীর্থ ভ্রমণ করিয়া॥
একদিন এক অতি গভীর বনেতে (ঘ)।
বিকরাল ব্যাঘ্র এক আইসে খাইতে॥
তাহার জটেতে ধরি তিলক নাসায়।
আর তুলসীর মালা কণ্ঠেতে পরায়॥
কৃষ্ণনাম মন্ত্র কর্ণে (ঙ) উপদেশ দিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ব্যাঘ্র বনেতে চলিল॥
পর-হিতকারী সাধু সভাতে সমান।
সভারে নিস্তারে নর-পশু নাহি জ্ঞান॥

পাঠান্তর—(ক) সমুদ্রবেলাতে—সমুদ্রতীরেতে।
(খ) পুরী—পুরে।
(গ) তপ্তমুদ্রা—গুপ্তমুদ্রা।
(ঘ) অতি গভীর বনেতে—গভীর বনেতে যাইতে।
(ঙ) মন্ত্র কর্ণে—কর্ণে তার

ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা শ্রীবৃন্দাবন (ক)।
যথা শেষশায়ি-গৃহে (খ) শ্রীধর ব্রাহ্মণ॥
সর্ব্বস্ব ক্ষেপণ করে বৈষ্ণব-সেবায়।
বৈষ্ণবেতে প্রীতি তার অসাধার হয়॥
পিপাজী সীতার সহ অতিথি হইল।
শ্রীধর পাইয়া বহু সমাদর কৈল॥
পাদ ধোয়াইয়া স্তব করি বসাইল।
ঘরে কিছু নাহি বিপ্র ভাবিতে লাগিল॥
স্ত্রী কহে মোর পরিধেয় লেঙ্গা বস্ত্র।
বেচিয়া আনহ খাদ্যদ্রব্য পাকপাত্র॥
এত কহি উলঙ্গ হইয়া বস্ত্র দিয়া।
গোধূমের কুঠি-মধ্যে রহিল বসিয়া॥
এতাদৃশ অনুরাগ বৈষ্ণব-সেবাতে (গ)।
উলঙ্গ হইয়া দিলা বসন বেচিতে (ঘ)॥
শ্রীধর সে বস্ত্র নিঞা (ঙ) বাজারে বেচিয়া।
সামগ্রী আনিল কিনি বৈষ্ণব লাগিয়া॥
রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া (চ)।
পিপা আর সীতা দোঁহায় আনিল ডাকিয়া (ছ)॥
পিপা কহে সভে মিলি একত্রে বসিব।
প্রসাদের আস্বাদন একত্রে করিব॥
তাঁহাদের আগ্রহে শ্রীধরতো বসিলা।
তাঁহার ঘরণী হেতু অপেক্ষা করিলা॥
সীতা গৃহমধ্যে তাঁরে ডাকিতে যাইয়া।
দেখয়ে ডোলের মধ্যে উলঙ্গ বসিয়া॥
হাথে ধরি উঠাইয়া জিজ্ঞাসেন তাঁরে।
উলঙ্গ বসিয়া কেনে হেতু কহ মোরে॥
ঘরে কিছু নাহি তাহে বসন বেচিয়া।
সামগ্রী আনিল তথ্য কহে বিবরিয়া॥

পাঠান্তর—(ক) ভ্রমিতে ভ্রমিতে দোঁহে গেলা বৃন্দাবন।
(খ) শেষশায়ি-গৃহে—শেষশায়ি-ঘরে।
(গ) সেবাতে—সেবায়।
(ঘ) দিলা বসন বেচিতে—বস্ত্র বেচিবারে দেয়।
(ঙ) সে বস্ত্র নিঞা—লইয়া বস্ত্র।
(চ) লাগাইয়া—লাগাইল।
(ছ) দোঁহায় আনিল ডাকিয়া—দোঁহে ডাকিয়া আনিল।

সীতা চমৎকার হৈয়া আলিঙ্গন কৈল।
বৈষ্ণবে এতেক (ক) প্রীত কোথা না দেখিল॥
ধন্য ধন্য করি সীতা প্রশংসা করিল।
মো-হেন জনার হেন রতি না জন্মিল॥
এতেক কহিয়া নিজ অঙ্গ বস্ত্র ফাড়ি।
পরাইয়া দিল যেঙ-তেঙ[১] কটি-বেড়ি॥
ভোজন করিয়া সীতা পরামর্শ কৈলা।
হেন ব্যক্তি ঘরে প্রভু কিছুই না দিলা॥
মুঞি কিছু ইহার বিহিত চেষ্টা করি।
এতো কহি বাহিরিলা অনুরাগে ভরি॥
বাজারে যাইয়া এক বণিকের স্থানে।
হাব-ভাব কটাক্ষ করয়ে কত ভাণে॥
বণিক ডাকিয়া নিজ স্থানে বসাইলা।
চৌদিগে অনেক লোক আসিয়া ঘেরিলা॥
হাস্য কৌতুক করি মুগধ হইলা (খ)।
তণ্ডুল গোধুম বহু সবে মেলি দিলা॥
স্ত্রীর স্বাভিযোগের যে এমতি বিক্রম।
ব্রজলোক ভ্রষ্ট নহে তভু হৈল ভ্রম॥
ঠাকুরাণীর অনুরাগ বৈষ্ণবে এমতি।
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম নাহি দেখয়ে সুমতি॥
কৃষ্ণের জনেরে পাপ নাহিক ঘটায়।
পাপ পুণ্য দুই কাছে আসিতে নারয়॥
শ্রীধরের গৃহে সেই গোধুমাদি যত।
রাশি করিলেন আনি হৈয়া আনন্দিত॥
ইহার বিস্তার আর অনেক আছয়।
সংক্ষেপে কহিল মাত্র স্থূল যে আশয়॥
একদিন সীতা যমুনায় স্নানে গেলা।
তীরে বৃক্ষতলে স্বর্ণভাণ্ড নিরখিলা॥
রাত্রে পিপাজীর স্থানে কহিতে লাগিলা।
প্রাতে যমুনায় স্নানে মুঞি যবে গেলা॥
স্বর্ণমুদ্রা একভাণ্ড (গ) যমুনার তীরে।
দেখিনু আনিতে কহ শ্রীধর বিপ্রেরে॥

দৈবাৎ যে চোর চুরি করিতে আসিয়া।
সে বৃত্তান্ত শুনে সব আড়ালে থাকিয়া॥
শুনিঞা ঐমনি চোর ছুটিয়া চলিলা।
সেই স্থানে সেই ভাণ্ড গিয়া উঠাইলা॥
দেখে তার মধ্যে এক কালসর্প হয়।
তেমতি ঢাকনা (ক) দিয়া লইয়া চলয়॥
ক্রোধ করি সেই ভাণ্ড তথায় আনিঞা।
সীতাজীর অঙ্গোপরি দিল ফেলাইয়া॥
ঝনৎকার করি স্বর্ণ মোহর ছাপিল (খ)।
সর্পেতে দংশিল বলি চোর চলি গেল॥
ভক্ত যে করিল বাঞ্ছা প্রভু পুরাইল।
ছল করি মোহরের ভাণ্ড আনি দিল॥
ঠাকুরাণী তাহা নিঞা শ্রীধরকে দিল।
বৈষ্ণব সেবার হেতু আনন্দ জন্মিল (গ)॥
শ্রীধরের বৈষ্ণব সেবার যে উল্লাস।
দেখি পিপাজীর মনে হৈল অভিলাষ॥
এক নদীতীরে টোটা বান্ধি কৈল স্থান।
রাজা এক করি দিল সেবার সন্ধান॥
সীতা মাতা উল্লাসেতে করেন রন্ধন।
ভোজন করান আইসে যায় সাধুগণ॥
একদিন সামগ্রী যে ছিল ফুরাইল।
হেনকালে কথোগুলি বৈষ্ণব আইল॥
চিন্তায় মগন সাধু কি করি উপায়।
ভিক্ষা করিবারে ঠাকুরাণী বাহিরায়॥
নদীতে অলপ (ঘ) জল পারেতে যাইয়া।
বাজারে ভিক্ষার লাগি বেড়ান ফিরিয়া॥
এক যে বণিক তাঁরে সুন্দরী দেখিয়া।
স্বাভিযোগ[১] করে দুষ্ট আঁখি মটকিয়া॥
সীতা কহে গৃহে মোর আইলা অতিথ।
সেবার সামগ্রী ঘরে কিছু নাহি স্থিত॥

পাঠান্তর—(ক) বৈষ্ণবে এতেক—বৈষ্ণবেতে এত।
(খ) মুগধ হইলা—সবে মুগ্ধ কৈলা।
(গ) স্বর্ণমুদ্রা একভাণ্ড—স্বর্ণভাণ্ড মুদ্রাসহ।
১। যেঙ-তেঙ—কোনও প্রকারে।

পাঠান্তর—(ক) তেমতি ঢাকনা—তেমন ঢাকনী।
(খ) ছাপিল—পড়িল।
(গ) আনন্দ জন্মিল—আনন্দিত হৈল।
(ঘ) অলপ—যে অল্প।
১। স্বাভিযোগ—নিজের (মন্দ) অভিপ্রায় প্রকাশ।

সেবা-উপযুক্ত যে সামগ্রী দেহ মোরে।
যাহা আজ্ঞা কর তাহা করিব অদূরে॥
তাহা শুনি অনেক সামগ্রী তারে দিয়া।
সন্ধ্যা অন্তে আসিহ কহিল দুষ্টধিয়া (ক)॥
ঠাকুরাণী হৃষ্টমনে সাধু সেবা কৈলা।
পিপাজী কহেন দ্রব্য কোথায় পাইলা॥
তেঁহো পূর্ব্বাপর সব বৃত্তান্ত কহিল।
ভাল ভাল বলি সাধু প্রশংসা করিল॥
সন্ধ্যাকালে পিপাজী কহেন সীতাজীরে।
সত্যে বদ্ধ হৈলে তথা হয়ে যাইবারে॥
অপূর্ব্ব সামগ্রী হয় সৌন্দর্য্য যৌবন।
নিজসুখহেতু বৃথা করয়ে ক্ষেপণ॥
ধন্য তুমি তোমার যে যৌবন সফল।
বৈষ্ণবার্থে বেচিলা না হইল বিফল॥
অতএব শীঘ্র করি যাহ তুমি তথা।
প্রতিশ্রুত হইলে বণিক স্থানে যথা॥
যে আজ্ঞা বলিয়া মাতা চলয়ে তথায়।
সাধু দেখে নদীজলে বসন ভিতয় (খ)॥
উঠাইয়া আপনি যে পার করি দিলা।
বণিকের গৃহে গিয়া উপনীত হৈলা॥
সত্যবাদী নিৰ্ম্মৎসর তা দেখ এই দোঁহ (গ)।
বৈষ্ণবেতে অনুরাগ ভক্তির প্রবাহ॥
আশ্চর্য কথন এই অলৌকিক হয়।
অনুরাগে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কিছু না জানয়॥
তবে ঠাকুরাণী বণিকের ঘরে গিয়া।
একভিতে বসি রহে মন কৃষ্ণে দিয়া॥
বণিক চাহয়ে অঙ্গস্পর্শ করিবারে।
আগুনের উল্কা যেন লাগয়ে শরীরে॥

পাঠান্তর—(ক) দুষ্টধিয়া—তুষ্ট হৈয়া।
(খ) ভিতয়—ভিজয়।
(গ) তা দেখ এই দোঁহ—দেখহ দুহুঁহ।

নিকটে যাইতে নারে পোড়য়ে শরীর।
দূরে পলাইলা মূঢ় হইয়া অস্থির॥
তখন বুঝিল এতো প্রাকৃতিক নহে।
ঘৃণা হৈল আপনা ধিক্কার করি কহে॥
ছি ছি মোরে ধিক্ ধিক্ কি ধৰ্ম্ম করিনু।
হেন জনে হেন কৰ্ম্মে আশয় করিনু (ক)॥
আর্ত্তনাদ করে তাঁর চরণে পড়িয়া।
অনেক মিনতি কৈল কাতর হইয়া॥
জগন্মাতা তুমি মোর লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
অপরাধ ক্ষেম মোর মূঢ় অজ্ঞ জানি॥
চল মাতা গৃহে তব রাখি গিয়া আসি।
কৃপা করি খোল মোর নরকের ফাঁসি॥
তবে মাতা চলি গেলা আপন আশ্রমে।
বণিক যাইয়া তথা পড়য়ে সম্ভ্রমে॥
সাধুর চরণ ধরি (খ) কাকুবাদ কৈল।
সদাই প্রসন্ন তেঁহো আশ্বাস করিল॥
বৈষ্ণব সেবার যত সামগ্রী লাগয়।
নিতি নিতি বণিক লইয়া তথা যায়॥
পিপাজীর লীলাকথা অনেক রহিল।
সংক্ষেপে বর্ণিল যে সকল না লিখিল॥
ইহার শ্রবণে হরিভক্তিতে আগ্রহ।
অবশ্য অবশ্য জন্মে নাহিক সন্দেহ॥
মূঢ় জন (গ) শুনে যদি প্রবৃত্তি জনমে।
হরিভক্তি মহাদেবী তার হৃদে রমে॥
অতএব যার বাঞ্ছা হরিভক্তি ধনে।
ভক্তমাল কথা পুনঃপুন শুন ভক্তগণে (ঘ)॥
হে হে শ্রীমান্ পিপাজীউ সীতা ঠাকুরাণী।
লালদাসে কর কৃপা দাসমধ্যে গণি॥

পাঠান্তর—(ক) আশয় করিনু—আসক্ত হইনু।
(খ) চরণ ধরি—চরণে পড়ি।
(গ) জন—লোক।
(ঘ) ভক্তমাল কথা পুন শুনহ শ্রবণে।

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীরুইদাস-আদি-ভক্ত-চরিত্র-বর্ণনং নাম ষোড়শ-মালা ॥১৬॥

সপ্তদশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥
অন্যদেব উপাসনা ছাড়ি বহুজন।
আশ্রয় করিয়া ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
এমত অসংখ্য জন সকল কহিতে।
না পারিয়া কিছু কহি প্রসঙ্গ ক্রমেতে॥

চরিত্র শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিবাস বুধুরি।
উপাসনা মহামায়া শক্তি শ্রীশঙ্করী॥
সাক্ষাত প্রত্যক্ষ দেবী হন কবিরাজে।
প্রতিমা-রূপেতে এক মূর্ত্তিতে বিরাজে॥
একদিন এক বিপ্র বৈষ্ণব আসিয়া।
অতিথি হইলা তাঁর মত না জানিঞা॥
সমাদর করি বিপ্রে স্নান করাইলা।
দেবী-গৃহে সন্ধ্যাপূজা করিতে কহিলা॥
দেবীর মন্ডপে বিপ্র যাইয়া দেখয়।
মুক্তকেশী এক কালী-মূর্ত্তি বিরাজয়॥
তাঁহার সেবার যে নৈবেদ্য পুষ্প আদি।
কতেক প্রকার তার নাহিক অবধি॥
সেই গৃহমধ্যে এক শালগ্রাম দেখি।
পূজা আদি কৈল তাঁর হৈয়া (ক) বড় সুখী॥
সামগ্রী পুষ্পাদি দেখি আনন্দ জন্মিল।
সব দ্রব্য শালগ্রামে সমর্পণ (খ) কৈল॥
পূজা আদি করি দ্বিজ (গ) রন্ধনেতে গেলা।
দেবীর পূজারি পূজা করিতে আইলা॥
নিত্য নিয়মিত পূজা করিল ব্রাহ্মণ।
সেই যে প্রসাদি সব (ক) কৈল নিবেদন॥
ব্রাহ্মণ নাহিক জানে প্রসাদ বলিয়া।
কিন্তু দেবী তুষ্ট হৈলা প্রসাদ পাইয়া॥
রাত্রে দেবী গোবিন্দেরে কহে কুতূহলে।
আজি কিছু তুমি মোরে নাহি খাওয়াইলে॥
তোমার যে নিয়মিত কিছু না খাইনু।
আজি মুঞি মহাপ্রসাদ বিষ্ণুর পাইনু॥
গোবিন্দ কহেন মাতা কোথায় পাইলে।
দেবী কহে মোর ঘরে (খ) যতেক আনিলে॥
যে কিছু সামগ্রী অই অতিথি ব্রাহ্মণ।
সকলি শ্রীশালগ্রামে কৈল নিবেদন॥
পূজারি আসিয়া সেই প্রসাদ যতেক।
মোরে নিবেদন কৈল সামগ্রী প্রত্যেক॥
গোবিন্দ কহেন মাতা তুমিতো ঈশ্বরী।
তোমার ঈশ্বর কে তো বুঝিতে না পারি॥
তুমি কার প্রসাদ পাইয়া তুষ্ট হৈলে।
সংশয় ছেদন মোর কর কি কহিলে॥
দেবী কহেন গোবিন্দ মূলতত্ত্ব নাহি জানো।
আপনারে পন্ডিত করিয়া মাত্র মানো॥
পরম ঈশ্বর যেই পরাৎপর হরি।
নির্গুণ পরমব্রহ্ম সর্ব্ব-অধিকারী॥
নিরাকার ব্রহ্মের যে পরম আশ্রয়।
সুন্দর-বিগ্রহ সৎ-চিদানন্দময়॥
তাঁহার প্রধান শক্তি তিন শক্তি হয়।
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি মায়া এই হয় (গ)॥
চিন্ময়-স্বরূপ-শক্তি জীব যে তটস্থা।
মায়া বহিরঙ্গা শক্তি বিকারি-অবস্থা॥
সেই যে স্বরূপ-শক্তি চিৎ-শক্তির বৃত্তি।
হ্লাদিনী-সন্ধিনী আর সম্বিত-শকতি॥

পাঠান্তর—(ক) কৈল তাঁর হৈয়া—করিলা হইয়া।
(খ) সমর্পণ—নিবেদন।
(গ) দ্বিজ—বিপ্র।

পাঠান্তর—(ক) সেই যে প্রসাদি সব—সেই প্রসাদাদি দ্রব্য।
(খ) ঘরে—গৃহে।
(গ) মায়া এই হয়—মহামায়া ত্রয় হয়।

হ্লাদিনী-স্বরূপা তাঁর প্রেয়সীর গণ (ক)।
সন্ধিনীর বৃত্তি মাতা পিতা বন্ধু হন (খ)॥
বসন ভূষণ গৃহ আদি বৃক্ষ ধাম।
খাদ্য-সামগ্রী আদি যত লীলা-কাম॥
সম্বিত-শক্তির বৃত্তি কৃষ্ণভক্তি জ্ঞান।
ব্রহ্মজ্ঞান-আদি যত তাঁর পরিজন॥
জীব যে তটস্থা শক্তি কৃষ্ণের নিত্যদাস।
শক্তির বিশেষ হেতু (গ) তাঁহার আভাষ॥
তেঁহো স্বতঃসিদ্ধ জীব তাঁহার অধীন।
অতএব দাস ইহা সিদ্ধান্ত প্রবীণ॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা ত্রিগুণ-আত্মিকা।
স্বাভাবিক জড় হন বিকারি অস্তিকা (ঘ)॥
প্রভু ভগবানের ঈক্ষণে শক্তি হয়।
নানা বস্তু জন্মে তাহে ব্রহ্মাণ্ড রচয় (ঙ)॥
প্রভুর ইচ্ছায় তাঁর এমতি শকতি।
ভুলাইলা আব্রহ্ম যে সভাকার মতি॥
অনিত্যেতে নিত্যবুদ্ধি সংসার-রচন।
সদাই করয়ে নাহি বুঝে কোন জন॥
মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার পঞ্চ মহাভূত।
পঞ্চতন্মাত্র-আদি চরাচর যত॥
যতো দেখ সকলি প্রাকৃত মায়ামই।
এমতি শকতি তাঁর (চ) ত্রিভুবন জই॥
হেন মায়া-মহিমা যে মন-অগোচর।
যোগমায়া যেঁহো তাঁর কোট্যংশের কর॥
যোগমায়া স্বরূপ-শকতি ঠাকুরাণী।
তাঁর দাসী অভিমান করয়ে আপনি॥
সেই মায়া-শক্তি হয়ে আমার অংশিনী।
মুক্তি যাঁর অংশ তোমায় কহিনু (ছ) বাখানি॥

পাঠান্তর—(ক) প্রেয়সীর গণ—প্রেয়সী রতন।
(খ) বন্ধু হন—বন্ধুগণ এবং বন্ধু জন।
** হন—পাঠভেদ।
(গ) হেতু—হয়।
(ঘ) স্বাভাবিক জড় হন বিকারি আত্মিকা।
(ঙ) ব্রহ্মাণ্ড রচয়—ব্রহ্মাণ্ডের চয়।
(চ) তাঁর—তবে।
(ছ) তোমায় কহিনু—তাহা কহিনু।

অতএব সেই যে স্বরূপ-শক্তি যেঁহো।
শক্তিবান্ সহিত অভেদ হন তেঁহো॥
তত্ত্ববিবরণ তোমায় কহিলাম সার।
অতএব বুঝ কৃষ্ণ প্রভু যে আমার॥
তাঁহার অধরামৃত পূজ্যতম মোর।
ইহাতে সংশয় নাহি কহিলাম সার॥
শ্রীপুরুষোত্তমে আমি সদা করি বাসে।
বিমলারূপেতে কেবল (ক) প্রসাদের আশে॥
গোবিন্দ এতেক শুনি মৌনেতে রহয়।
ভাবিয়া ইহার কিছু পার নাহি পায়॥

পাদ্মে তথা স্কান্দে—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ (খ)।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং (গ) তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

অনুবাদ—বিষ্ণুকে নিবেদিত অন্ন দ্বারা সকল দেবতার পূজা করিতে হয়। পিতৃগণের উদ্দেশেও তাহাই দেওয়া হয়। সেই পূজা দান অনন্তকালের জন্য ফলপ্রদ হয়।

ভগবতী যে কহিল সব সত্য হয়।
বিষ্ণুর প্রসাদ অন্য (ঘ) দেবতা বাঞ্ছয়॥
শাস্ত্রের সহিত দেখ একবাক্য হৈল।
সভার প্রতীত হেতু প্রমাণ যে দিল॥
বিষ্ণুর প্রসাদ যেই অন্য দেবে দেয়।
অসংখ্য অনন্ত ফল তাহাতে জন্ময়॥
গোবিন্দের মনে কিছু উদ্বেগ (ঙ) জন্মিয়া।
কথোক দিবস যায় ভাবিয়া গণিঞা॥
দৈবাত্ত শরীরে হৈল গৃহিণী অস্বাস্থ্য।
মরণ সময় আসি হৈল উপনীত॥
কণ্ঠাগত প্রাণ মাত্র শ্বাস উর্দ্ধ্ব বহে।
কাতর হইয়া ইষ্টদেবী প্রতি কহে॥
এইতো আমার হৈল অবশেষ কাল।
কৃপাবলোকনে ছিণ্ড সংসারের জাল॥

পাঠান্তর—(ক) কেবল—মাত্র।
(খ) যষ্টব্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ—যজন্তে দেবতান্তরম্।
(গ) তদ্দেয়ং—দীয়ন্তে।
(ঘ) অন্য—অন্ন।
(ঙ) উদ্বেগ—উদ্বিগ্ন।

আকাশবাণীতে দেবী কহে বারবার।
গোবিন্দ-শরণ লও (ক) হইবে নিস্তার॥
জিজ্ঞাসে তাহাতে গুরু বসি সেই স্থানে (খ)।
তেঁহো কহে গতি নাঞি নারায়ণ বিনে॥
এতেক শুনিল যবে দোঁহার বচন।
কি হবে বলিয়া তবে করয়ে রোদন॥
কে আছে আমার, লব কাহার শরণ।
আমি হেন দুরাচারে কে করয়ে ত্রাণ (গ)॥
দেবী যে কহিল পূর্ব্বে তাহা না বুঝিনু (ঘ)।
না ভজিয়া কৃষ্ণপদ আপনা খাইনু॥
ভাই মোর রামচন্দ্র সুবিচার কৈল।
শ্রীকৃষ্ণচরণ-পদ্ম আশ্রয় করিল॥
সেই মোরে পূর্ব্বে পুনঃপুন যুক্তি দিল।
তাহা না শুনিয়া পুন ভর্ৎসনা করিল॥
আচার্য্য প্রভুর পদ সে কৈল আশ্রয়।
এবে বুঝি ভাল কৈল সাধু সেই হয়॥
এতেক চিন্তিয়া নিজ উপায় সৃজিল।
রামচন্দ্রে মোর দুঃখ লিখিতে হইল (ঙ)॥
শ্রীল শ্রীনিবাস প্রভু আচার্য্য ঠাকুর।
তাঁহা বিনে আমার উপায় (চ) দেখি দূর॥
এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া নিজ মনে।
শীঘ্র পত্রী পাঠাইলা রামচন্দ্র-স্থানে॥
পত্রীতে লিখিলা সেই যত বিবরণ।
ভেয়ের সাহায্য ভাই করহ এখন॥
না বুঝিয়া তব বাক্য করিনু হেলন।
এবে বুঝিলাম সেই বাক্যে প্রয়োজন॥
আমার আসন্নকাল যদি দয়া কর।
এ সময় আসি যদি একবার হের॥
আমার উদ্ধার যদি বিচার করহ।
প্রভুরে যতনে যদি আনিতে পারহ॥

পাঠান্তর—(ক) গোবিন্দশরণ লও—গোবিন্দ স্মরণ কর।
(খ) গুরু সেইখানে বসি জিজ্ঞাসে তাহারে।
(গ) করয়ে ত্রাণ—করে তারণ।
(ঘ) বুঝিনু—শুনিনু।
(ঙ) লিখিতে হইল—নিবেদিত হৈল।
(চ) উপায়—উদ্ধার।

তবে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া।
পবিত্র হইয়া যাই সংসার তরিয়া॥
যত অপরাধ মোর এবে ক্ষেমা কর।
এ সময়ে মোর কিছু উপকার কর॥
অনেক কাকুতি করি পত্রীতে (ক) লিখিল।
রাতি-বিরাতি চারি লোক পাঠাইল॥
উদ্ধশ্বাসে লোক সব ছুটিয়া যাইয়া (খ)।
রামচন্দ্র কবিরাজে পত্রী দিল নিঞা (গ)॥
পত্রী পাঠ করি সাধু উল্লাসিত হৈলা (ঘ)।
আচার্য্য প্রভুর পদ ধরিয়া পড়িলা॥
প্রভু তুমি মোদিগের কুলের দেবতা।
তোমা বিনে কেহ নাহি মো-সভার ত্রাতা॥
মোর জ্যেষ্ঠ ভাই তব সরণ লইল।
কাতর হইয়া মোরে পত্রী পাঠাইল॥
কৃপা করি একবার যদি যান তথা।
তবে আমা-সভার ঘুচয়ে মনোব্যথা॥
আসন্ন সময় তার গৌণ নাহি আর।
কৃতার্থ করিতে মনে যে হয় বিচার॥
প্রভু কহে চল তবে (ঙ) এইক্ষণে যাব।
অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ তার মঙ্গল করিব॥
এত কহি প্রভু তবে করিলা গমন।
রামচন্দ্র চলে সাথে আনন্দিত মন॥
কবিরাজ-গৃহে গিয়া উত্তরিলা প্রভু।
এমন দয়াল আর না হইবে কভু॥
গোবিন্দ শুইয়া যথা তথায় যাইয়া।
নিরখয়ে কৃপাদৃষ্ট্যে দয়ার্দ্র হইয়া॥
গোবিন্দের শক্তি নাঞি যে প্রণাম করয়ে।
কৃচ্ছ্রে (চ) দুটি হাথ মাত্র শিরেতে উঠায়ে॥
মৃদু মৃদু (ছ) স্বরে কিছু স্তবন করয়।
দুনয়ানে ধারা বহে, বুক বাহি যায়॥

পাঠান্তর—(ক) পত্রীতে—পত্রী যে।
(খ) ছুটিয়া যাইয়া—ছুটাছুটি যায়ে।
(গ) নিঞা—লয়ে।
(গ) উল্লাসিত হৈলা—উল্লাস পাইলা।
(ঘ) তবে—সবে।
(ঙ) কৃচ্ছে—কষ্টে।
(ছ) মৃদু মৃদু—গদগদ।

এবার আমারে প্রভু যদি রক্ষা কর।
তবে জানি পতিত-পাবন নাম ধর॥
ত্রিজগতে কেহো নাহি মোর রক্ষাকর্ত্তা।
একা তোমা বিনে আর নাহি কেহো ভর্ত্তা॥
এ আসন্নকালে মোর নিস্তারক হও (ক)।
পতিতপাবন খ্যাতি জগতে বাঢ়াও (খ)॥
এতেক করুণা শুনি প্রভু দয়াময়।
আশ্বাস করিয়া কিছু কহেন তাহায়॥
অচিরাত প্রভু কৃপা তোমারে করিব।
সর্ব্ববিঘ্ন দূরে যাবে, মঙ্গল হইব॥
এতো কহি হরিনাম-মহামন্ত্র দিলা।
স্নেহ করি শ্রীচরণ মস্তকে অর্পিলা॥
তৎক্ষণাত তাঁর সর্ব্ব-রোগ-শান্তি হৈল।
স্বচ্ছন্দ পাইয়া তবে উঠিয়া বসিল॥
প্রভুর সেবার নানা আয়োজন করি।
মহামহোৎসব কৈল মঙ্গল আচরি॥
পরদিনে গোবিন্দেরে প্রভুর আজ্ঞায়।
স্নান করাইয়া নৌতুন বস্ত্র (গ) পরায়॥
প্রভু রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র কর্ণেতে অর্পিলা।
হরিধ্বনি শঙ্খধ্বনি গগনে উঠিলা॥
নানাবাদ্য মহোৎসব সংকীর্ত্তন হৈল।
গ্রামের যতেক (ঘ) লোক দেখিতে আইল॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব ভজন প্রক্রিয়া।
সকলি কহিলা প্রভু প্রসন্ন হইয়া॥
জনম সফল কৃতকৃতার্থ মানিঞা।
শ্রীচরণে গোবিন্দ পড়য়ে লোটাইয়া॥
উঠিয়া গোবিন্দ এক পদ যে বর্ণিল।
শুনিঞা প্রভুর মনে আনন্দ হইল (ঙ)॥

পাঠান্তর—(ক) মোর নিস্তারক হও—মোরে নিস্তার করহ।
(খ) বাঢ়াও—বাঢ়াহ।
(গ) নৌতুন বস্ত্র—নব্য বসন।
(ঘ) যতেক—সকল।
(ঙ) হইল—বাঢ়িল।

তথাহি পদম্—

ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে।
মনুষ্য দুর্লভ দেহ, সৎসঙ্গে সেবহ,
হরিপদ নিতি (ক) রে॥
শীত আতপ, বাত বরীখণ,
এ দিন যামিনী জাগি রে।
বৃথায় (খ) সেবিনু, কৃপণ দুরুজন (গ),
চপল সুখলব (ঘ) লাগি রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন,
পাদসেবন দাস্য রে।
পূজন সখীগণ (ঙ), আত্ম-নিবেদন,
গোবিন্দদাস অভিলাষ রে † ॥
পদ শুনি প্রভুর নয়ানে বহে বারি।
আলিঙ্গন কৈল গোবিন্দেরে হৃদে ধরি॥
প্রভু ভৃত্য দোঁহে কান্দে প্রেমানন্দ-রসে।
রামচন্দ্র দেখি নাচে আনন্দ-উল্লাসে॥

পাঠান্তর—(ক) নিতি—নিত্য এবং নিত।
(খ) বৃথায়—বিফলে।
(গ) দুরুজন—দুরজন।
(ঘ সুখলব—সুখসব।
(ঙ সখীগণ—ধেয়ান।

† সাহিত্য পরিষদ-প্রকাশিত পদকল্পতরু হইতে গোবিন্দ দাসের পদটি উদ্ধৃত হইল।

ভজ হুঁ রে মন নন্দ নন্দন
অভয় চরণারবিন্দরে।
দুলহ মানুষ জনম সতসঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধুরে॥
শীত আতপ বাত বরিখণ
এ দিন যামিনি জাগিরে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগিরে॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমল দল জল জীবন টলমল
ভজ হুঁ হরিপদ নীত রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদ সেবন দাসি (দাস্য রে)।
পূজন সখিজন আত্মনিবেদন
গোবিন্দ দাস অভিলাষি (অভিলাষা রে)॥

প্রভু চলি গেলা তবে আপন স্বধাম।
শ্রীগোবিন্দদাস ঠাকুর হৈল নাম॥
তাঁহার মহিমা-গুণ কে কহিতে (ক) পারে।
সর্ব্বলোকে গায় যশ প্রসিদ্ধ সংসারে॥
কৃষ্ণ-কৃপা পাএ (খ) যাহা ব্রহ্মার দুর্লভ।
মহান্তস্বভাব স্নিগ্ধ মহা-অনুভব॥
নানারস পদ পদাবলি প্রকাশিলা।
প্রভুর চরণস্পর্শ সর্ব্বাংশে ফলিলা (গ)॥
রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর শ্রীগোবিন্দ।
দোঁহে দোঁহা তুলনা কেবল প্রেমানন্দ॥
কিঞ্চিত কহিব আগে নাহি যার সীমা।
রামচন্দ্র গুণগান করিয়া গরিমা॥
শ্রীআচার্য্য-প্রভু পদ স্মরণ (ঘ) করিয়া।
তাঁর ভক্তগণ গাই' (ঙ) কৃপা আকাঙ্ক্ষিয়া॥

চরিত্র শ্রীচান্দ রায়

রাজমহলেতে স্থিতি চান্দরায় নাম।
জমিদার অতি আঢ্য[১] দস্যুবৃত্তি কাম॥
বিশ লক্ষ (চ) মুদ্রা খায়, কর নাহি দেয়।
নবাব আসোয়ার[২] আইলে মারিয়া ভাগায়॥
লস্কর বন্দুক তোপ অনেক আছয়।
নবাব তাহার সনে যুদ্ধে না আঁটয়॥
দেশে দেশে দস্যুপনা করিয়া লুঠয়।
ঘাটে মাঠে পথে লোক ভয়ে না চলয়॥
পরের রমণী আনি বলাৎকার করে।
কে কোথা সুন্দরী খুঁজি ফিরে (ছ) ঘরে ঘরে॥

শক্তিমন্ত্র-উপাসক দুর্গোৎসব করি।
প্রজাদণ্ড করি লয় পূজা ছল করি॥
ছাগল মহিষ বধ লক্ষ লক্ষ করে।
গো-ব্রাহ্মণ-আদি বধ করিতে না ডরে॥
কত যে করয়ে পাপ (ক) সীমা নাহি হয়।
চিত্রগুপ্ত লিখিবারে নাহিক পারয়॥
পাপের শরীরে হয় পেরেতের (খ) ভোগ।
ব্রহ্মদৈত্য আশ্রয় করিয়া হৈল রোগ॥
মহাবাই প্রচণ্ড হইয়া জ্ঞানহত।
হইল উন্মাদপ্রায় প্রলপয়ে কত॥
ভাই যে সন্তোষ রায় উদ্বিগ্ন হইয়া।
নানা তৈল ঔষধ করয়ে বৈদ্য দিয়া॥
ওঝা কত শত আসি মন্ত্রেতে ঝাড়য়।
কিছুতেই তাহার সোয়াস্ত নাহি হয়॥
একদিন এক সাধু বৈষ্ণব আসিয়া।
অতিথি হইয়া (গ) আসি গেলেন ফিরিয়া॥
বাটীর বাহিরে কোন লোকেরে (ঘ) কহিল।
বৈষ্ণব আশ্রয় বিনে না হইবে ভাল॥
সে কথা লোকেতে আসি রায়েরে (ঙ) কহিলা
দৈবাত্ত তথায় এক গণক আইলা॥
সেই খড়ি পাতি গণি ঐমতি কহিলা।
কৃষ্ণ-কৃপাবলে বাক্য হৃদয়ে গাছিলা॥
দুই বাক্য ঐক্য হৈতে রায়ের হৃদয়।
গাছিল সে কথা বুঝি তার ভাগ্যোদয়॥
পরামর্শ স্থির কৈল শ্রীকৃষ্ণ ভজন।
জন্মান্তরে কি সুকৃতি আছিল কল্যাণ॥
গড়ের-হাট নাম স্থানে তাঁহা বাস হয়।
শ্রীল নরোত্তম যে ঠাকুর মহাশয়॥
তাঁহার মহিমা যে সন্তোষ-রায় জানে।
শীঘ্রগতি চলি গেলা তাঁহার চরণে (চ)॥

পাঠান্তর—(ক) কহিতে—বর্ণিতে।
(খ) পাএ—পায়।
(গ) সর্ব্বাংশে ফলিলা—সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা।
(ঘ) স্মরণ—শরণ।
(ঙ) গাই—গান।
(চ) বিশ লক্ষ—তিন লক্ষ।
(ছ) ফিরে—প্রতি।
১। আঢ্য—সমৃদ্ধ, ধনী।
২। আসোয়ার—অশ্বারোহী, সিপাই।

পাঠান্তর—(ক) কত যে করয়ে পাপ—কত পাপ করে তার।
(খ) পেরেতের—প্রেতের যে।
(গ) হইয়া—হইলা।
(ঘ) লোকেরে—লোকেতে।
(ঙ) লোকেতে আসি রায়েরে—রায়েরে গিয় লোকেতে।
(চ) চরণে—সদনে।

নানা দ্রব্য ভেট শ্রীচরণ আগে রাখি।
চরণে পড়িল রায় ঝরে দুটি আঁখি॥
কৃপা কর মহাশয় লইনু শরণ।
মো-সভায় আশ্রয় দিতে হবে শ্রীচরণ॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে মোরা নিশ্চয় করিনু।
কায়মনে তোমার চরণে বিকাইনু॥
একবার মোর গৃহে চরণ অর্পিয়া।
আমা-সভায় সবংশে আইস উদ্ধারিয়া॥
এত শুনি শ্রীমান্ ঠাকুর মহাশয়।
হরিষ বিষাদ দুই জন্মিল হৃদয়॥
এ-হেন পাপীর হেন মতি কি হইব।
মদ্যপ ইহার বাটী কেমতে যাইব॥
আশ্বাস করিয়া বাসাস্থান দিয়া তারে।
গেলেন ঠাকুর মহাপ্রভুর মন্দিরে॥
এ সব বৃত্তান্ত নিবেদন কৈল তথা।
রাত্রে পড়ি রহিলেন দ্বারে দিয়া মাথা॥
নিদ্রাকালে প্রভু কহে শুন নরোত্তম।
পর-উপকার যেই সেই সে উত্তম॥
অতএব শীঘ্র যাহ ইথে কি বিচার।
লোকের নিস্তার এই শ্রেষ্ঠ সদাচার॥
প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা আনন্দ জন্মিল।
রায়ের সহিত তার গৃহেতে চলিল॥
রায়ের বাটীতে মঙ্গলাচরণ কৈল।
দ্বারে দ্বারে ঘট পাতি নহবত বসাইল॥
ঠাকুরের আগমন হইবা মাত্রেতে।
শঙ্খধ্বনি করে হুলু হুলু স্ত্রীলোকেতে (ক)॥
ঠাকুরের পদার্পণ গৃহে হবামাত্র।
চান্দরায় নির্ব্ব্যাধি হইলা সুপবিত্র॥
পরিবার সহ আসি (খ) চরণে পড়িল।
ক্ষিতি লোটাইয়া কৃত-কৃতার্থ মানিল॥
চান্দরায় কহে প্রভু অস্বাস্থ্যে বিকল।
তোমার (গ) আগমনমাত্রে হইল নির্ম্মল॥

পাঠান্তর—(ক) করে হুলু হুলু স্ত্রীলোকেতে—করি হুলু দেয় স্ত্রীগণেতে।
(খ) সহ আসি—আসি সব।
(গ) তোমার—তব।

হেন পদ ছাড়ি হায় হায় কি করিনু।
কেবল পাপের কূপে পড়িয়া মজিনু॥
আমা সম পাতকী এ ত্রিভুবনে নাঞি।
লক্ষ অংশে নাহি হবে জগাই মাধাই॥
অতএব কৃপা করি আমারে উদ্ধার।
চান্দরায়-ত্রাতা করি এক নাম ধর॥
কাকুবাদ শুনি ঠাকুরের দয়া হৈল।
অঙ্গে হাথ বুলাইয়া আশ্বাস করিল॥
হরিনাম কর্ণে দিয়া রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র।
দীক্ষা (ক) দিয়া শিখাইলা ভক্তিমার্গ-তন্ত্র॥
শুদ্ধমাধুর্য্যভক্তি প্রসন্ন হইয়া।
দীক্ষা দিলা ঠাকুর যে স্বচ্ছন্দ জানিঞা॥
কহেন ঠাকুর বহু হিত উপদেশ।
সদাচারময় বাক্য সাধনবিশেষ॥
শুন শুন বাপু চান্দরায় মোর বাক্য।
এ কথা যে রাখিবে হৃদয়ে করি সৌখ্য (খ)॥
পরের অনিষ্ট কভু কায়মনোবাক্যে।
কোনো জীবে নাহি করো কিবা পশুপক্ষে॥
বিবেচনা করি দেখ আপনার দেহে।
ক্ষুদ্র যে কন্টক বিন্ধে তাহাও না সহে॥
তেমতিহ জানিবে যে অন্যের শরীরে।
অলপ দুখেতে হয় কাতর অন্তরে॥
ধন জন সুহৃদাদি বিয়োগে তেমতি।
আপনার সমান জানিবে অন্য প্রতি॥
প্রাণিবধ পশু-হিংসা নির্দ্দয়ের কায।
অতি নিন্দনীয় সেই সাধুর সমাজ॥
আসুরিক ধর্ম্ম সেই তামসের মধ্যে।
কখন সে শ্রেয় নহে পর-শিরচ্ছেদে॥
বিচারিয়া দেখ ইহ বড় বিপর্য্যয়।
এমন কোথাও বা যে হইতে পারয়॥
আত্যন্তিক শ্রেয় মাত্র হরিভক্তি বিনে।
হয় নাহি, হবার নহে কভু কোনো জনে॥
অতএব পরদুঃখ নিজ দুঃখ মানি।
সভারে করিবে দয়া পুত্রবত জানি॥

পাঠান্তর—(ক) দীক্ষা—শিক্ষা।
(খ) সৌখ্য—ঐক্য।

পরের মস্তক কাটি আপন মঙ্গল।
কভু নাহি হয়, হয় নরকেতে স্থল॥
অধর্ম্মে না কর্য মতি কায়বাক্যমনে।
সদাচারে বিরোধী অধর্ম্ম আচরণে॥
অন্তর মলিন হয় রজ তম মর্ম্মে।
বুদ্ধিনাশ যায় তার, ভক্তি কোথা রমে॥
পুণ্য যে বাখানে লোক তাহা না কর্ত্তব্য।
ভক্তি ব্যভিচার হয়, অনন্যতা খর্ব্ব॥
পতিব্রতা স্বামী প্রতি একনিষ্ঠ যথা।
কৃষ্ণ-কৃপা নহে বিনা অনন্যথা তথা॥
ঐকান্তিক নহে শাস্ত্রে কহয়ে বিচিত্রা।
অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই হেয় মতা॥

মনঃশিক্ষায়াং—

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিকুল নিরুক্তং (ক) কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।"†

অনুবাদ—শ্রুতি অর্থাৎ বেদ ও উপনিষদ্‌সমূহ যাহা ধর্ম্ম বলিয়া বিহিত এবং অধর্ম্ম বলিয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন, তাহার কোনটাই করিও না। শুধু ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যার বিস্তার কর।

একাদশে—

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ইত্যাদি।"‡

চান্দরায় কহে প্রভু তোমার চরণ।
আশ্রয় করিনু যবে শুদ্ধ হৈল মন॥
অধর্ম্ম সে দূরে রহু অন্য যে ধরম।
এবে জ্ঞান হইতেছে অধর্ম্মের সম॥

এক কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে সকলি অনর্থ।
এবে বুঝিলাম (ক) প্রভু যত সব ব্যর্থ॥
হেন মহাপাপী মুঞি মূঢ় দুরাচার।
হেন মোহ গেল মোর এ কর্ম্ম তোমার॥
তবে গোষ্ঠিবর্গেতে সন্তোষ রায়-আদি।
প্রভুর আশ্রয় কৈল বালক অবধি॥
বিদায় হইয়া তবে চলিলেন গৃহে (খ)।
বিরলে কহিলা কিছু চান্দরায় সহে (গ)॥
এক কথা কহি তব হিতের কারণ।
দেবস্ব ব্রহ্মস্ব আর রাজস্ব হরণ॥
কদাচ না করিবে এ তিন পাপ সম।
রাজস্ব-হরণে বাপু সদাই বিরম'॥
তবে নৌকা আনিঞা ঠাকুরে (ঘ) চঢ়াইয়া।
বহু অর্থ বস্ত্র অলংকার সমর্পিয়া॥
ঠাকুরের সহিত সন্তোষ রায় গিয়া।
গৃহে পহুঁছিয়া আইলা বিমর্ষ হইয়া॥
প্রভুর আজ্ঞায় রাজকর বুঝি দিল।
সেই হৈতে শিষ্ট শান্ত সুস্বভাব হৈল (ঙ)॥
শ্রীমান্ ঠাকুর মহাশয়ের চরণ।
স্পর্শমণি সহ নাহি করিল তুলন (চ)॥
তুলনা করিতে যার স্থান কোথা নাঞি।
অতএব হায় হায় বলিহারি যাই॥
যার পর্শমাত্রে হেন পাপী চান্দরায়।
ভুবন-পাবন হৈল মহান্ আশয়॥
ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণ করি আশ।
তাঁহার ভক্তের গুণ গায় লালদাস॥
অন্য উপাসনা তেজি কৃষ্ণাশ্রিত ইদানীন্তু পুনঃ÷।

পাঠান্তর—(ক) শ্রুতিকুলানিরুক্তম্—শ্রুতিগণনিরুক্তম্।

† শ্লোকার্দ্ধটি শ্রীরঘুনাথ দাসকৃত স্তবাবলী হইতে উদ্ধৃত। দ্বিতীয়ার্দ্ধ এইরূপ—

শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং।
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥

‡ সম্পূর্ণ শ্লোক এবং অনুবাদ দেওয়া হইল।

আজ্ঞায়ৈবং (য়ৈব) গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ॥

অনুবাদ।—আমার আদিষ্ট হইলেও ধর্ম্মের গুণ এবং অধর্ম্মের দোষ সকল জানিয়াও যিনি নিজের সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শুধু আমাকে ভজনা করেন তিনিই সাধুত্তম।

পাঠান্তর—(ক) বুঝিলাম—জানিলাম।
(খ) চলিলেন গৃহে—চলেন গৃহেতে।
(গ) সহে—প্রীতে।
(ঘ) আনিঞা ঠাকুরে—আনি ঠাকুরেরে।
(ঙ) সুস্বভাব হৈল—স্বভাব হইল।
(চ) পরশমণির সহ না করি তুলন।

÷ এই অংশটুকুর পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বুঝা যায় না।





চরিত্র শ্রীভাইয়া দেবকী-নন্দন রায়

দেবকীনন্দন নাম ভাইয়া করি বাখানি (ক)।
নিবাস জালালপুর আঢ্য মহাধনী॥
কাটোয়ার ফৌজদার নবাব সরকারে।
শক্তি-উপাসনা (খ) হয় ভজে বামাচারে॥
প্রথম সংসারে এক পুত্র জনমিল।
পুত্রটি রহিল স্ত্রীর বিয়োগ হইল॥
যমুনার তীরে ঘর নিত্যানি যমুনা।
স্নান-আদি করে সদা সন্ধ্যাদি-বন্দনা॥
হস্তী যে বৃহত এক বৃহত দশন।
দশন উপরে করি চৌকির আসন॥
জলে দাঁড় করাইয়া তাহাতে বসিয়া।
দেবীপূজা করে এক বড়াই করিয়া॥
রক্তচন্দনের পঙ্ক (গ) সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া।
মহা ভৈরবের ন্যায় (ঘ) আকার হইয়া॥
রকতচন্দন জবাপুষ্প তাম্রশংখ।
পূজয়ে বসিয়া করিদন্ত পরিযংক[১]॥
দ্বিতীয় বিবাহ কৈল তার শুন কথা।
বিধির ঘটনা এক আশ্চর্য্য বারতা॥
ভাইয়ার সুকৃতি বহু পূর্ব্বের আছিল।
কিংবা হঠাৎকার কোন সাধু কৃপা হৈল (ঙ)॥
বিবাহ করিল এক বৈষ্ণবের কন্যা।
বাপঘরে থাকি দীক্ষা করি হৈল ধন্যা॥
শ্রীআচার্য্য-প্রভুর ঘরের হয়ে শিষ্যা।
ভক্তিমতে জ্ঞানবান দৃঢ় সুরহস্যা॥
লিখন পঠন জানে গ্রন্থের বিচার।
সুন্দর ভকতি মতে বোধ অধিকার॥
সদাচার-রত সাধুসঙ্গে অভিলাষ।
সদাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে মনের বিলাস॥
বিবাহের পরে যবে নববধূাগমনে।
ব্যবহার মতে আইলা (ক) স্বামীর ভবনে॥
আসিয়া দেখয়ে সব বিপর্য্যয়-ভাব।
তমগুণময় মাত্র প্রচণ্ড স্বভাব॥
রকতচন্দন অঙ্গে জবাপুষ্প-মাল।
দুম্‌দুম্ করি চলে দেখিতে করাল॥
কাটা ছেঁড়া মদ্যমাংস সদা ব্যবহার।
যোগিনীচক্রেতে বসি করয়ে আহার॥
এতেক দেখিয়া কন্যা চমকিয়া চায়।
এই বুঝি হয় মোর শ্বশুর-আলয়॥
হা হা বিধি হেন বিড়ম্বন কেনে কৈল।
কি দোষে আমারে হেন পঙ্কেতে ডারিল॥
পিতা মাতা না জানি কতেক ধন পাইয়া।
অবলা আমারে দিল কূপেতে ডারিয়া॥
কোন অপরাধে কৃষ্ণ হইলা নির্দ্দয়।
কিংবা কোন সাধুর করিনু অপচয়॥
বিলাপ করিয়া কান্দি ভূমে গড়ি যায়।
এখন আমার তবে কি হবে উপায়॥
এ সঙ্গে এ ভোজনেতে কিছু (খ) না রহিব।
কৃষ্ণভক্তি হেন ধন হঠাতে হারাব॥
মনুষ্য দুর্লভ হেন জনম (গ) পাইয়ে।
সদ্‌গুরু চরণ পাইনু পিতার আশ্রয়ে॥
কৃষ্ণভক্তি নিধি পাব সাধ কৈনু চিতে।
আমার করমে শিরে হৈল বজ্রাঘাতে॥
সমুদ্রে ডুবিনু রত্ন আকাঙ্ক্ষা করিয়া।
রত্ন হাথে নাহি আইল মরিনু বুড়িয়া॥
হায় হায় কি করিব কি হবে উপায় (ঘ)।
দাসীরে কহয়ে তুঞি বিষ লঞা আয়॥
বিষ পান করি আজি পরাণ তেজিব।
কিংবা জলে প্রবেশিয়া ডুবিয়া মরিব॥

পাঠান্তর (ক) বাখানি—মানি।
(খ) উপাসনা—উপাসক।
(গ) পঙ্ক ফোঁটা।
(ঘ) মহা ভৈরবের ন্যায়—সদা ভৈরবের প্রায়।
(ঙ) হৈল—কৈল।
১। করিদন্ত-পরিযংক—হাতীর দাঁতের খাট বা আসন।

পাঠান্তর—(ক) মতে আইলা—মত আইসে।
(খ) ভোজনেতে কিছু—ভজনেতে কভু।
(গ) দুর্লভ হেন জনম—হেন যে জন্ম দুর্লভ।
(ঘ) হায় হায় এখন কি করিব উপায়।

দাসী কান্দি কহে বিষ খাইয়া মরিবে।
আত্মঘাতী হইয়া কি (ক) নরকে যাইবে॥
তেঁহো কহে সত্য বটে এ কথা নিশ্চয়।
আত্মঘাতীরে কৃষ্ণ না হয় সদয়॥
তবে কি আমার গতি হইবে এখন।
পলাইতে পথ নাহি অবলা জনম॥
উপায় আছয়ে এই মাত্র দেখি তবে (খ)।
অনাহার করিয়া শরীর তেজি তবে॥
এতেক ভাবিয়া ভূমে কান্দি গড়ি যায়।
হেন সাধু জনে কভু বিঘ্ন কি জন্মায়॥
কৃষ্ণ যার একনাথ তার কোথা বিঘ্ন।
বিঘ্নের মস্তকে পাদ দিয়া রহে মগ্ন॥
ভোজন করিতে ডাকে শাশুড়ী ননদে।
কিছু নাহি কহে মাত্র ফুকারিয়া কান্দে॥
পড়সীর নারীগণ আসিয়া মিলয়।
সভে কহে মায়েরে না দেখিয়া কান্দায়॥
তুষিয়া কহয়ে শাশ খাও আইস মাতা।
কেহো তো না জানে তার মনের যে ব্যথা (গ)॥
এই মত দুই দিন (ঘ) উপবাস গেল।
অনেক সাধিল কিছু আহার না কৈল॥
তবে তাঁর শাশুড়ী ননদ পুন কহে।
কি তোমার ইচ্ছা কহ তাহি করি নহে॥
তবে ধীরে ধীরে কহে যদি খাইতে কহ।
এক মুষ্টি চাউল একটি পাকমাত্র দেহ (ঙ)॥
জল মোর এই দাসী যাইয়া আনিব।
আপন হস্তেতে পাক করিয়া খাইব॥
নহিলে না খাব প্রাণ তেজিব নিশ্চয়।
প্রাণপণ যাথে কৈনু তাথে কারে ভয়॥
এত শুনি নারীগুলা হাসিয়া কহয়।
কেন গো ইহারা কিছু হাড়ি-ডোম নয়॥

পাঠান্তর—(ক) হইয়া কি—হয়ে কেন।
(খ) তবে—এবে।
(গ) কেহ নাহি জানে তার মরমের ব্যথা।
(ঘ) দুই দিন—দুই তিন।
(ঙ) এক মুষ্টি চাউল একটি পাত্র আর দেহ।

অন্ন নাহি খাবে, ঘর করিবে কেমনে।
এ তো বড় তুষ্টি দেখি অসঙ্গত মেনে॥
কেহ কহে অগো উনি বৈষ্ণবের ঝি।
না খাবে শাক্তের অন্ন এই হবে (ক) বুঝি॥
ইহা কহি হাসিয়া নিন্দয়ে (খ) নারীগুলা।
শাশুড়ী ননদ বহু তিরস্কার কৈলা॥
তুষ্টি কৈল প্রাণত্যাগ সেহতো না ভাল।
হাঁড়ী চাউল আদি আনি যথাযোগ্য দিল॥
স্বপাক করিয়া কন্যা (গ) কৃষ্ণে নিবেদিয়া।
খাইল কিঞ্চিত প্রাণ ধারণ লাগিয়া॥
প্রতিদিন এই মত কথো দিন যায়।
বৈষ্ণব হইতে সদা স্বামীরে কহয়॥
সোয়ামী শুনিয়া তাহা (ঘ) ভর্ৎসনা করয়ে।
তুঞি মোর গুরু হইলি কহিয়া কহয়ে॥
তথাচ নাহিক চুকে পুনঃপুন কহে।
নাহি শুনে ভাইয়া মুখ টেড়া (ঙ) করি রহে।
কিন্তু কৃষ্ণভক্তের সঙ্গের দেখ গুণ।
ক্রমে ক্রমে তাঁর কিছু তম হৈল ন্যূন॥
স্ত্রীর ভজন-রীত চরিত্র দেখিয়া।
মনে প্রশংসয়ে কিছু দ্রবীভূত হিয়া (চ)॥
কথোক দিবস পরে পুত্রটি মরিল।
শোকেতে-কাতর ভাইয়া আকুল হইল॥
স্ত্রী কহে কান্দ কেনে কি করিবে আর।
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ যেই এই গতি তার॥
শোক রোগ জন্ম মৃত্যু সদাই তাহার।
কৃষ্ণের কিঙ্কর যে সে ভবনিধি (ছ) পার॥
দুঃখের সময় বিনে যথার্থ না বুঝে।
কৃষ্ণে নাহি গছে মন শুনিলে না রিঝে॥

পাঠান্তর—(ক) এই হবে হেনইবা।
(খ) হাসিয়া নিন্দয়ে—হাসি নিন্দা করে।
(গ) কন্যা—অন্ন।
(ঘ) সোয়ামী শুনিয়া তাহা—স্বামী তাহা শুনি সহু।
(ঙ) টেড়া—হেঁট।
(চ) মনেতে প্রশংসা করে দ্রবীভূত হিয়া।
(ছ) ভবনিধি—ভবনদী।

তখন ভাইয়ার কিছু চিত্ত নরমিল।
স্ত্রীর বচন কিছু মনে বিচারিল॥
তারে কহে তুমি অনুযোগ যে করহ।
তোমার মনস্থ কিবা কি করিতে কহ॥
তেঁহো কহে কৃষ্ণপদ আশ্রয় করহ।
নতুবা যে ব্যর্থ এই অর্থ আর দেহ॥
ভাইয়া কহে যে আশ্রয় (ক) করিয়াছি আমি।
স্ত্রী কহে মর্ম্ম তার নাহি জান তুমি॥
গণেশ পার্ব্বতী শিব ব্রহ্মার ভজন।
বহু জন্ম কৈলে কৃষ্ণে অধিকারী হ'ন॥
কৃষ্ণ বিনে সংসারতারণে কার শক্তি।
কদাচ না হয় ইহা সর্ব্বশাস্ত্র-উক্তি॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্"॥

অনুবাদ।—যাঁহার বিস্ময়ের কিছু নাই (অর্থাৎ যাঁহা অপেক্ষা অপূর্ব্ব বস্তু নাই), যিনি নিজ লাভে পরিপূর্ণকাম, যিনি সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন এবং প্রশান্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া যে অপরকে আশ্রয় করে, সে কুকুরের লেজ ধরিয়া সমুদ্র পার হইতে চায়।

অতএব হরি ভজ, সর্ব্ব সিদ্ধি হবে।
দেবীর তাহাতে অতি সন্তোষ হইবে॥
ভাইয়া কহে ভাল তবে বিচার করিয়া।
কর্ত্তব্য যে হয় তাহা করিব বুঝিয়া॥
স্ত্রী কহে তবে যদি করহ বিচার।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্থানে না পাইবে সার॥
গোসাঞি মহান্ত আর শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব।
লইয়া বিচারো পাবে সিদ্ধান্ত-আসব॥
তবে ভাইয়া সব (খ) গোসাঞি মহান্ত লইয়া।
বিচার করিল বহু আগ্রহ করিয়া॥
তাহাতে সিদ্ধান্ত স্থির প্রতীত হইল।
কৃষ্ণ ভজিবারে মনে সার নিরূপিল॥

পাঠান্তর—(ক) যে আশ্রয়—একাশ্রয়।
(খ) তবে ভাইয়া সব—তবেঃ ভাইয়া।

পরিবার হৈল শ্রীমান্ আচার্য্য-প্রভুর।
আশ্রয় করিল মালিহাটির ঠাকুর॥
আপনার পরিজন যে কেহ আছিল।
সকল সহিত হরি আশ্রয় (ক) করিল॥
শুদ্ধসত্ত্ব সদাচার পরম পবিত্র।
আশ্রয়মাত্রেতে হৈল মহাযোগ্যপাত্র॥
যাত্রা মহোৎসব সদা বৈষ্ণবসেবন।
মহাভাগবত হৈল অনন্যশরণ॥
গরিফার বাটী সেবা প্রকাশ করিল।
নন্দদুলাল (খ) নাম তাঁহার হইল॥
সেবার শৃঙ্খলা আর বৈষ্ণবসেবন।
প্রেমানন্দে করে সেই আশ্চর্য্য কথন॥
অদ্যাপি বিরাজমান ঠাকুর তথায়।
সুঠাম দেখিয়া চিত্তে আনন্দ জন্মায়॥
তবে শুন ভাইয়া মহাশয়ের চরিত্র।
আশ্চর্য্য-কথন যেই পরম পবিত্র॥
চমৎকার দেখ হরিভক্তির মহিমা।
ভাইয়ার জন্মিল তাহে (গ) বৈরাগের সীমা॥
ঠাকুর সেবার আর স্ত্রীর কারণ।
গ্রাম ভূম রাখি আর কৈল বিতরণ॥
দৌলত লোটায়্যা দিয়া ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে।
বৃন্দাবন গেলা কৃষ্ণ-অনুরাগ-ভাবে॥
যমুনার তীরে বসি কৃষ্ণনাম করে।
অযাচকবৃত্তিমাত্র[১] রহে অনাহারে॥
কথোক দিবসে কৃষ্ণ-চরণ পাইলা।
কহা নাহি যায় কৃষ্ণভক্তির কি লীলা॥
যেই স্ত্রীর সঙ্গে মহামোহ উপজয়।
সেই স্ত্রী হইতে হৈল ভক্তির উদয়॥
অন্য আশ্রয় (ঘ) জীব-হিংসা তেয়াগিয়া।
ভাগবত হৈল কৃষ্ণময় হৈল হিয়া॥

পাঠান্তর—(ক) আশ্রয়—আশ্রম।
(খ) নন্দদুলাল—শ্রীনন্দদুলাল।
(গ) তাহে—তবে।
(ঘ) আশ্রয়—আশয়।

১। অযাচকবৃত্তিমাত্র—কাহারও নিকট না চাহিলেও লোকে দয়া করিয়া যাহা দেয় তাহা দ্বারা জীবন ধারণ।

সেই ঠাকুরাণীর গুণ কতেক কহিব।
কহিতে তাঁহার গুণ সীমা না হইব॥
বহুকাল প্রকট থাকিয়া বৃদ্ধ হৈল।
দিবানিশি শ্রীগৌরাঙ্গ জিহ্বায় বর্ত্তিল॥
আঁখে প্রেমধারা বহে গঙ্গাস্রোত ন্যায়।
দুটি আঁখি বাহি দিবা-রজনী বহয়॥
অপ্রকট-সময় শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া।
নামের সহিত গেলা স্বধাম (ক) চলিয়া॥

তাঁহার চরণে যদি শরণ লইতে।
কোনো জন্মে কভু পাই কেনো ভাগ্য হৈতে॥
তবে এই সংসারের যাতনা এড়াই।
পরম রতন কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি পাই॥
তাঁহা দোঁহার চরণ-সেবন-অনুরাগে।
অনুক্ষণ লালদাস অভাগিয়া মাগে॥

পাঠান্তর—(ক) স্বধাম—শ্রীধামে।

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ-আদি-ভক্তচরিত্র-বর্ণনং নাম সপ্তদশ মালা॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ রায়

পদ্মা-পারের রাজা পুঁটিয়া রাজধানী।
রবীন্দ্রনারায়ণ নাম বুদ্ধিমান্ ধনী॥
ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্যদিগের (ক) সেবক।
শাক্ত শিবশক্তি মহামায়া-উপাসক॥
দুর্গামূর্ত্তি প্রতিমা গৃহেতে সেবা হয়।
বামাচার-মত পঞ্চমকার করয়॥
পরে তার যে অবস্থা শুন তার কথা।
কর্ণপেয়[১] চমৎকার আশ্চর্য্য বারতা॥
শ্রীপাট মাল্যাটি শ্রীমান্ আচার্য্য-সন্তান।
পদ্মাপার পাঠাইলা বৈষ্ণব দুজন॥
বিলাত সাধিতে আর কোন প্রয়োজন।
তার মধ্যে পণ্ডিত হয়েন এক জন॥
কয়েক দিবস মধ্যে (খ) কার্য্য উদ্ধারিয়া।
ফিরিয়া আইসে দোঁহে একত্রে মিলিয়া॥
পুঁটিয়া মোকামে আসি সন্ধ্যাকাল হৈলা।
রজনী যাপন হেতু রাজগৃহে গেলা॥
অতিথি জানিয়া তবে রাজভৃত্যগণ।
থাকিবারে স্থান দিলা বসিতে আসন॥
দুই দন্ড রাত্রি পরে দুই থালী ভরি।
নানান মিষ্টান্ন আর সামগ্রী লুচি পুরী (গ)॥
কালীর প্রসাদ এক বিপ্র আনি দিলা।
কোথাকার দ্রব্য বলি বৈষ্ণব পুছিলা॥
বিপ্র কহে বৈকালীয় কালীর প্রসাদ।
বৈষ্ণব কহেন হয়ে ব্যবস্থা-বিবাদ॥
বিষ্ণুর প্রসাদ বিনে আমরা না খাই।
বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ইহা জানয়ে সভাই॥
অজ্ঞান ব্রাহ্মণ ইহা শুনিঞা কোপিল।
বৈষ্ণবেরে বিপ্র বহু ভর্ৎসনা করিল॥
কালীর প্রসাদ যেমন না খাইলি তুঞি।
ইহার সাজাই কালি দিব তোরে মুঞি॥
বৈষ্ণব কহেন ভাল ভাল সাজা দিহ।
আজি যাহ মহাশয় যে হয় করিহ॥
তবে বিপ্র দ্রুত গিয়া রাজারে (ক) কহিল।
রাজা তাহা শুনি কোপে অগ্নিবত (খ) হৈল॥
দুয়ারী লোকেরে তবে কহিল কহিতে।
প্রাতে দুই বৈরাগীকে না দেয় যাইতে॥
প্রভাতে বৈষ্ণব চলি (গ) যাইবার কালে।
রাজার হুকুম নাঞি যাইতে দ্বারী বলে॥
বৈষ্ণব বুঝিলা সেই প্রসাদ-কারণ।
রাজা শুনি ক্রোধে কৈল এই প্রকরণ॥
ভাল ভাল খেতি নাঞি দেখি কি করয়।
আমিহ করিব ইহার বিহিত যে হয় (ঘ)॥
পণ্ডিত বৈষ্ণব যে সাধনে তেজীয়ান্।
তাহাতে গোস্বামীদের হেমাত প্রধান॥
রায়-রেঞে মহারাজ (ঙ) শ্রীনন্দকুমার।
কালদন্ডসম রুদ্র প্রতাপ তাঁহার॥
রাজ-রাজোড়া যত যাহার অধীন (চ)।
চাহে রাখে চাহে মারে চাহে (ছ) লহে ছিন॥

পাঠান্তর—(ক) ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্যদিগের—ভাটপাড়া ভট্টাচার্য্যঘরের।
(খ) দিবস মধ্যে—দিবসে নিজ।
(গ) আর সামগ্রী লুচি পুরী—সামগ্রী আর পুরি।
১। কর্ণপেয়—শুনিতে অতি মধুর।

পাঠান্তর—(ক) দ্রুত গিয়া রাজারে—রাজারে এ বারতা।
(খ) অগ্নিবত—অগ্নিসম।
(গ) চলি—দুই।
(ঘ) বিহিত যে হয়—উচিত নিশ্চয়।
(ঙ) রায়-রেঞে মহারাজ—রায় মহারাজ শ্রীল।
(চ) যতেক আছয়ে রাজা তাঁহার অধীন।
(ছ) চাহে—কিংবা।

শ্রীপাট মালিহাটির যে দাস তেঁহো হয়।
যে হেতুক রাজারে বৈষ্ণব না ডরায়॥
দারোয়ান যদি (ক) নাহি দিলেক যাইতে।
বসিয়া রহিলা কোন ক্ষোভ নাহি চিতে॥
কথোক্ষণে রাজা তবে বাহিরে আইলা।
বৈষ্ণব দোঁহারে লোক দিয়া ডাকাইলা॥
ডাকিয়া কহয়ে হাঁরে বৈরাগী বেটারা।
কালীর প্রসাদ নাকি না খাইস তোরা॥
বৈষ্ণব কহেন মহারাজ বটে সত্য।
কর্ত্তব্য যে বৈষ্ণবের এই ধর্ম্ম নিত্য॥
অন্যদেব-পূজা আদি প্রসাদভোজন।
অকর্ত্তব্য ইহা হয়ে শাস্ত্র-নিরূপণ॥
সাহজিক দুই দোষ প্রসাদভোজন।
বৈষ্ণবতা যায় আর দেবস্বহরণ॥
বিশেষে ব্রাহ্মণপর অধিক নিষেধে।
চান্দ্রায়ণ করিবারে হয় কহে বেদে॥
ইহা শুনি রাজা কটু কহিয়া কহয়।
হাঁরে মূঢ় বৈরাগী এ (খ) কোন্ শাস্ত্রে কয়॥
রাজা যদি কটুকথা কহিতে লাগিলা।
তবে কিছু বৈষ্ণব তাহারে শুনাইলা॥
থাক থাক মহারাজ পাচাল না পাড়।
ভাল না হইবে ইথে কহিলাম দঢ়॥
ভয় কি দেখাও তুমি হেন জমিদার।
শত শত রাজা নন্দকুমারের সেবাপর॥
তাঁহার ঠাকুর-বাটীর ভৃত্য আমি।
আমারেহ মানে বহু রাজা যথা তুমি॥
এতেক শুনিয়া রাজা চমকিত হৈল।
অন্তঃকরণেতে কিছু ভয় উপজিল॥
তখন শিথিল হৈয়া বিনয়পূর্ব্বক।
জিজ্ঞাসে শাস্ত্রীয় কথা হইয়া সম্মুখ॥
আপনি কহিলে যেই কথোপকথন।
তাহার ব্যবস্থা কহ কোথায় প্রমাণ॥

পাঠান্তর—(ক) দারোয়ান যদি—দুয়ারী যদ্যপি।
(খ) বৈরাগী এ—এ বিধান।

বৈষ্ণব কহেন মহারাজ যদি শুন।
বিশেষ ইহার ক্রমে কহি তবে পুন॥
ইহার প্রমাণ ভাগবতশাস্ত্রে হয়।
অন্যান্য শাস্ত্রেও বহু নিষেধ আছয়॥
হরিভক্তিবিলাসেতে সিদ্ধান্ত কহিলা।
অনেক শাস্ত্রের প্রমাণ তাঁহা (ক) দিলা॥
স্মার্ত্তবাগীশের মত তোমা-সভাকার।
তাহার সিদ্ধান্ত এই করহ বিচার॥
বৈষ্ণব হইয়া অন্য দেবের প্রসাদ।
না খাইব যাথে নিজ ধর্ম্ম যায় বাদ (খ)॥

স্কান্দে—

"পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতম্ (গ)।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং (ঘ) ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥"

অনুবাদ।—দেবগণ, সিদ্ধগণ এবং ঋষিগণ বিষ্ণুর নৈবেদ্যকেই পবিত্র বলিয়া মনে করেন। অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ আচরণ করিতে হয় (অর্থাৎ চান্দ্রায়ণ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়)।

রাজার সে ক্রোধ অংশ যবে দূর গেলা।
বৈষ্ণবের বাক্য কিছু লইতে লাগিলা॥
সাধুসঙ্গের দেখহ কিবা রঙ্গের প্রভাব (ঙ)।
আছিল কি রাজা পুন উঠে কোন ভাব॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে শততম অধ্যায়ে—

কৃষ্ণভুক্তেন ভোক্তব্যং নান্যনির্ম্মাল্যমেব চ।
অন্যদেবস্য নির্ম্মাল্যং ভক্ষ্যপেয়াদিকং দ্বিজ॥
সাত্বৈস্তু ন তদ্গ্রাহ্যং সুরাতুল্যং ন সংশয়ঃ।
নৈবেদ্যগ্রহণস্পর্শদর্শনং ভক্ষণং তথা॥
দেবতানাঞ্চ যৎ পেয়ং ন কুর্য্যাৎ বৈষ্ণবঃ সুধীঃ।
নাশ্নীয়াদন্যদেবস্য নির্ম্মাল্যং বৈষ্ণবঃ সদা॥
নান্যস্যোপাসনা কার্য্যা প্রাণাঃ কণ্ঠাগতা যদি।
দেবান্তরস্য নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্॥

পাঠান্তর—(ক) প্রমাণ তাঁহা—মতে প্রমাণ যে।
(খ) এই দুই লাইন বটতলার পুস্তক হইতে গৃহীত।
(গ) সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতম্—সর্ব্বপাপহরং পরম্
(ঘ) নৈবেদ্যম্—নির্ম্মাল্যম্।
(ঙ) সাধুর সঙ্গের দেখ কি রঙ্গ প্রভাব।

ন কার্ষ্ণানাং ভক্ষণীয়মগ্রাহ্যং মুনিপুঙ্গব।
যদ্ভক্ষ্যং দেবনির্ম্মাল্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
তদ্ভুঙ্ক্তে যদি মূঢ়াত্মা তৎসর্ব্বং সুরয়া সমম্।
প্রাণত্যাগং বরং কুর্য্যাৎ কালকূটাদিভোজনৈঃ।
তথাপি দেবতোচ্ছিষ্টং নহি ভুঞ্জীত বৈষ্ণবঃ॥

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের ভুক্ত দ্রব্য, অর্থাৎ প্রসাদ দ্বারাই ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে, অন্য দেবতার নির্ম্মাল্য অর্থাৎ প্রসাদ গ্রহণ করিবে না। হে দ্বিজ! অন্য দেবতার নির্ম্মাল্য ভক্ষ্য এবং পানীয় বৈষ্ণবের গ্রহণযোগ্য নয়, তাহা মদ্যের তুল্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুধী বৈষ্ণবগণ অন্যান্য দেবতার পানীয় এবং নৈবেদ্য গ্রহণ, স্পর্শন, দর্শন এবং ভক্ষণ করিবেন না। প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও বৈষ্ণব অন্য দেবতার নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিবেন না, এবং অন্য দেবতার উপাসনা করিবেন না। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণের উপাসকেরা অন্য দেবতার নৈবেদ্য, পত্র, পুষ্প, ফল, জল গ্রহণ বা ভক্ষণ করিবেন না। দেবগণের নির্ম্মাল্যস্বরূপ যে ভক্ষ্য দ্রব্য, পত্র-পুষ্প, ফল ও জল, তাহা যদি কোন মূঢ় ভক্ষণ করে তবে তাহা মদ্যের তুল্য হয়। বৈষ্ণব বরং কালকূট বিষ ইত্যাদি ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, তথাপি দেবতাদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবেন না।

রাজা কহে অন্য-দেব-প্রসাদ খাইলে।
দেবস্ব হরণ হয় ইহা যে কহিলে॥
বিষ্ণুর প্রসাদে সেই দোষ নাহি হয় (ক)।
সাধু কহে নাহি হয় বেদের আজ্ঞায়॥
দেবতার মধ্যে তাঁরে (খ) না হয় গণনা॥
সর্ব্বময় যেহ বস্তু নাহি যাঁহা বিনা॥
সর্ব্বেশ্বর যেঁহো (গ) নাহি নিজ পরকীয়।
তাঁহার উচ্ছিষ্ট যে অবশ্য গ্রহণীয়॥
বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ন-বস্ত্র-আদি যত।
আসন ভূষণ গৃহ দেব অভিমত॥
ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য শাস্ত্রে কহে।
বিষ্ণুর নিবেদন বিনে কিছু গ্রাহ্য নহে॥
গ্রহণ করিলে তাহে অপরাধ হয়।
ভক্তি না স্ফুরয়ে (ঘ) আর নরকে বৈসয়॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ত্বয়োপযুক্ত-(ক)-স্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসা স্তব মায়াং জয়েম হি॥"

অনুবাদ। তোমার উপভুক্ত মালা-চন্দন-বস্ত্র-অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া, তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা তোমার মায়াকে জয় করিতে পারি।

স্কান্দে—

"শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥"

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ শুষ্ক হউক, বাসি হউক, দূর স্থান হইতে নীত হউক, তাহা পাওয়া মাত্রই কাল বিচার না করিয়া ভক্ষণ করিতে হয়।

অপরাধা যথা—

"শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিত-ভক্ষণম্।
তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণম্॥"

অনুবাদ।—সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গৌণ উপচারে পূজা করা, শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন না করিয়া খাদ্য গ্রহণ, যে সময়ের যে ফল তাহা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন না করা—এইগুলি সেবাপরাধ।

আর কহি মহারাজ নিগূঢ় যে কথা।
হরি বিনে উপায় নাহিক যাহ যথা॥
প্রেমভক্তি সুখদ যে কহিব পশ্চাতে।
আত্যন্তিক শ্রেয় নাহি কহি শুন যাতে॥
মুক্তিদাতৃ শক্তি আর কারু নাঞি।
ত্রিবর্গ যে দাতা আর জানিহ সভাই॥
হরির অধীন সব আব্রহ্ম-স্থাবর।
হরি সভাকার প্রভু সকলি কিঙ্কর॥
নানার্থগতিক শাস্ত্র লোক বিড়ম্বিতে।
কহয়ে লোকেতে তাহা না পারে বুঝিতে॥
কাল্পনিক শাস্ত্র কথোগুলি প্রকাশিল।
তমগুণী লোক তাহে প্রামাণ্য করিল॥
মহামায়া তুমি যাঁরে কহিছ ঈশ্বরী।
ত্রিগুণ-আত্মিকা তেঁহো হরির কিঙ্করী॥

পাঠান্তর—(ক) সেই দোষ নাহি হয়—কেন সে দোষ না হয়।
(খ) তাঁরে—তাঁর।
(গ) যেঁহো—যাঁর।
(ঘ) না স্ফুরয়ে—নাহি স্ফুরে।

পাঠান্তর—(ক) ত্বয়োপযুক্ত—ত্বয়োপভুক্ত।

রজতম বিষয় যে দেন সভাকার।
যে বিষয়-মোহমদে ভুলিছে সংসার॥
অতএব মহারাজ হরি বিনে গতি।
ত্রিজগতে নাহি, আর কোনো যে যুগতি (ক)॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষঃ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ,
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥"

অনুবাদ।—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। একই পরমপুরুষ এই তিন গুণে মিলিত হইয়া স্থিতি প্রভৃতির জন্য (অর্থাৎ স্থিতি সৃষ্টি লয়ের জন্য) হরি, বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) ও হর এই তিন নাম ধারণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সত্ত্বতনু বাসুদেব হইতে মানবের প্রকৃত কল্যাণসমূহ লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীগীতায়াং—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

অনুবাদ।—হে অর্জ্জুন, যাহারা অন্যান্য দেবতার ভক্ত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করে, তাহারাও আমারই অর্চ্চনা করে, তবে ঐ অর্চ্চনা বিধিপূর্ব্বক নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠেঽপি—

"অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥

অনুবাদ।—পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

প্রথমে সূতস্য—

"মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণ-কলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥"

অনুবাদ।—যাহারা মোক্ষলাভে ইচ্ছুক তাঁহারা ঘোররূপ ভৈরবাদি ভূতপতিগণকে বাদ দিয়া, এবং অন্যান্য দেবতার প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া নারায়ণের শান্তমূর্ত্তি সকলের ভজনা করেন।

পাঠান্তর—(ক) যুগতি—যুকতি।

বহু শাস্ত্রে অনেক তো আছয়ে প্রমাণ।
গীতা ভাগবত দুই হয় যে প্রধান॥
তাহার প্রমাণ এই কহিল নিশ্চয়।
তবে যে যতেক শুন আগমাদিচয়॥
তাহার বৃত্তান্ত শুন বিবরিয়া কহি।
এ সব কারণ কেহ অজ্ঞে বুঝে নাহি॥
শ্রীমান্ ভগবান্ আজ্ঞা দিলা মহাদেবে।
কল্পিত আগম করি মোহ কর জীবে॥
আমাতে বিমুখ যাহা দেখি লোক হয়।
তাহে মোর তোষ যাথে সৃষ্টি বৃদ্ধি হয়॥
তবে মহাদেব সৃষ্টি করিলা আগম।
দেখাইলা ফল আপাতত মনোরম॥
সহজে লোকের রজতমের স্বভাব।
তাহাতে দেখিল শাস্ত্র সেই-অনুভব॥
সেই পথে গমন করিয়া লোক রিঝে।
হরি যে পরম গতি তাহা নাহি বুঝে॥

পাদ্মে—

"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥"

অনুবাদ।—(মহাদেবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি) হে মহেশ্বর, যাহাতে এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বজায় থাকে (অর্থাৎ সৃষ্টিপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকে) সেই জন্য নিজ কল্পিত আগম (অর্থাৎ শাস্ত্রসমূহ) দ্বারা তুমি জনগণকে আমার প্রতি বিমুখ কর, এবং তাহাদের নিকট হইতে আমাকে গোপন করিয়া রাখ।

প্রকৃতি-খণ্ডেতে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে।
ভগবান কহিলা ঐমত পঞ্চাননে॥
তোমার শক্তির আরাধনা আদি মন্ত্র।
আমারে গোপন করি কর নানা তন্ত্র॥
সংসার মোচন কাহো হৈতে নাহি হয়।
তার এক ইতিহাস শুন মহাশয়॥
পদ্মপুরাণেতে ইহা প্রচরদ্রূপ হয়।
কাশীতে যে হৈল (ক) রাম নামের উদয়॥

পাঠান্তর—(ক) হৈল—হেতু।

শ্রীমান্ কাশীনাথের যে ভক্ত কথোগুলি।
তুষ্ট কৈল মহাদেবে ভজি সভে মেলি॥
বর মাগিল ফল সংসার-মুকতি।
দেব কহে মোর নাহি মুক্তি দিতে শক্তি॥
পুনঃপুন তারা নাহি চাহে মুক্তি বিনে।
মহাদেব বিচার করিলা কিছু মনে॥
হরির ধেয়ান করি প্রসন্ন করিলা।
নিজ ভক্তগণ হেতু মুকতি প্রার্থিলা (ক)॥
ভগবান্ নিজ ব্রহ্ম রামনাম দিলা।
কাশীর রতন এই হইল কহিলা॥
কাশীপুরে যার দেহ পতন হইবে।
তৎকালীন এই নাম তার কর্ণে দিবে॥
নিশ্চয় হইবে মুক্তি নাহিক সন্দেহ।
বৈকুণ্ঠ পাইবে সেই নিজগণ সহ॥
গদগদ ভাবে মহাদেব রাম-নাম।
পাইয়া ধারণ কৈল কণ্ঠে অবিরাম॥
কাশীতে মরয়ে যেই পশু কীট নর।
রামনাম দিয়া তারে করেন উদ্ধার॥
প্রসিদ্ধ এ প্রকরণ জগতে জানয়।
অতএব হরি বিনে নাহিক উপায়॥
অন্যশাস্ত্রে যদি কোথাও অন্যদেব হৈতে।
মুক্তিফল কহে তাহা না যাও প্রতীতে॥
রজ তম শাস্ত্র বিনে সাত্ত্বিকে না কহে।
লোক-বিড়ম্বন হেতু যথার্থ সে নহে॥
যদি কহ অযথার্থ শাস্ত্রেরে কহিলে।
তাহার কারণ শুন শাস্ত্রেতেই বলে (খ)॥
পরোক্ষবাদ যে শব্দ শাস্ত্রেতে কহয়ে।
হরি তুষ্ট তাহে ষট্সন্দর্ভে বলয়ে॥
সন্দর্ভ শব্দের অর্থে গূঢ়ার্থপ্রকাশ।
অতএব সন্দর্ভে যে সিদ্ধান্ত-নির্য্যাস॥
তাহাতে যে সিদ্ধান্ত কহিল তাহা শুন।
যাহার অধিক (গ) যে বিচার নাহি পুন॥

শাস্ত্রের স্বভাব তাতে বিচার করিল।
সর্ব্বশাস্ত্রে ঐক্য করি সমাধান কৈল॥
এক শব্দে আর অর্থ নানার্থে কহয়।
রোচকার্থে শব্দান্তর লোকে না বুঝয়॥
কোথাও লক্ষণা-গৌণ-আদি শব্দে কহে।
লোকে আর বুঝে শাস্ত্রে ঐক্য না করয়ে॥
না বুঝিয়া কহে শাস্ত্রে নানা মত কহে।
সব এক-ঐক্য নানা মত কভু নহে॥
নানা মত শাস্ত্রে কভু ব্যভিচার নহে।
তাহা হৈলে কিছু সত্য কিছু মিথ্যা হয়ে॥
তবে যে বিরোধ মত কল্পিত আগম।
তামসিক সেই শুন তাহার মরম॥
যথা যথা সাত্ত্বিক শাস্ত্রের যে বিরোধী।
তামস করিয়া তাহা জানিবে যে সুধী (ক)॥
সন্দর্ভে যে ইহার বিচার কৈল শুন।
যাথে মনে সন্দেহ না হইবেক পুন॥
দশধা প্রমাণ মধ্যে চারি যে প্রধান।
প্রত্যক্ষ ঐতিহ্য শব্দ আর অনুমান॥
তার মধ্যে অনুমান প্রত্যক্ষ যে দুই।
ব্যভিচার দেখি তাতে সুপ্রতীত নাঞি॥
জল-বরিষণ-অন্তে ধূম-দরশন।
মায়ামুণ্ড দরশনে করয়ে ক্রন্দন॥
শব্দমাত্র শাস্ত্রে যে নাহিক ব্যভিচার।
ঐতিহ্য যে সাধু-পরম্পরা সেহ সার॥
তবে বাদী কহে শাস্ত্রে ব্যভিচার হয়।
তুমি কহ এক বাক্য এ বড় সংশয়॥
নানামত নানা বিধি (খ) নানা শাস্ত্রে দেখি।
আচার্য্য কহেন যার নাহি সূক্ষ্ম আঁখি॥
সেই দেখে নানামত বিচারিতে নারে।
ব্যভিচার বলি নানা বিধান আচরে॥
কিন্তু যে ইহার শুন সিদ্ধান্তনিদান।
মূলশ্রুতি বিচার যে ইহার প্রমাণ॥

পাঠান্তর (ক) মুকতি প্রার্থিলা—প্রার্থনা করিলা।
(খ) কারণ তাহার শুন শাস্ত্রে যেই বলে।
(গ) যাহার অধিক—যাহা হৈতে অধিক।

পাঠান্তর—(ক) তামসিক করিয়া জানিবে সেই সুধী।
(খ) নানা বিধি—নানাবিধ।

সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মত ব্যাভিচারি (ক) যথা।
তামস করিয়া সেই জানিহ যে তথা॥
সাদাচার-বিপর্য্যয় মকরাদি যত।
হরিমাল জটাভস্ম বিষ্ণুতে বিরত॥
বিষ্ণু তেজি উপাসনা দেবতা-অন্তর।
একাদশী জন্মাষ্টমী আর (খ) মতান্তর॥
অন্যদেব-উপাসক-স্থানে বিষ্ণুমন্ত্র।
দীক্ষা-শিক্ষা করেন (গ) পূজন তন্ত্র-যন্ত্র (ঘ)॥
কেশ অবতার (ঙ) আর ঈশ্বর নিঃশক্তি।
মায়াবাদ-মত যাহা নিন্দনীয় অতি॥
বিষ্ণুর বিগ্রহ ধাম কর্ম্ম পারিষদ।
সগুণ কহয়ে যাথে বড়ই প্রমাদ॥
সেই শাস্ত্র না শুনিবে, কর্ণে দিবে হাথ।
যে তাহা আদরে নাহি বৈস তার সাথ॥
ভগবত-আজ্ঞায় শিব বিপ্ররূপ ধরি।
বেদার্থ কল্পিত কৈল মায়াবাদ করি॥
শাঙ্করি ভাষ্য যে তাহা (চ) অজ্ঞে প্রশংসয়।
এ বৃত্তান্ত স্বয়ং শিব গৌরীরে কহয়॥

পাদ্মে—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥"

অনুবাদ।—হে দেবি! মায়াবাদ অসৎ শাস্ত্র; ইহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মতবাদ ছাড়া কিছুই নয়। আমি কলিকালে ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইহার প্রচার করিয়াছি।

সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মতে বিরোধি যতেক।
অসুর মোহের হেতু কহে পরতেক॥
মনুর্যোই দেবাসুর দুইমত জন্মে।
কৃষ্ণভক্ত দেব-অংশে অন্য অন্যে রমে॥

পাঠান্তর—(ক) মত ব্যাভিচারি—মতে ব্যাভিচার।
(খ) আর—আদি।
(গ) করেন—করণ।
(ঘ) তন্ত্র-যন্ত্র—তন্ত্র-মন্ত্র।
(ঙ) কেশ অবতার—কেশাবতার।
(চ) শাঙ্করি ভাষ্য যে তাহা—শাঙ্করিক ভাষ্য তাহা।

পাদ্মে—

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈবো হ্যাসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈবো (ক) হ্যাসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥"

অনুবাদ।—সংসারে জীবসৃষ্টি দুই প্রকার দৈবী ও আসুরী। বিষ্ণুভক্ত দৈবী সৃষ্টি, আর তাহার বিপরীত আসুরী সৃষ্টি।

তামস পুরাণ ছয় ইহা যদি কহ।
তামস যে কহে তার কারণ শুনহ॥
তামস কল্পেতে তার উদ্ভব হইল।
যে হেতু তামস মত কিছু সঞ্চারিল॥
সেই সেই মত তাহা গ্রাহ্য নাহি হয়।
অসুর মোহের (খ) হেতু জানিহ নিশ্চয়॥
নতুবা পুরাণ শুদ্ধ তামস না হয়।
যে হয় তামস-মত তাহি গ্রাহ্য নয়॥
অতএব আগম-পুরাণ-শ্রুতি মতে।
নির্গুণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শরণ্য (গ) জগতে॥
বেদের সিদ্ধান্ত এই কৃষ্ণে ভক্তি কর।
আর যত ধর্ম্মাধর্ম্ম সব পরিহর॥
সংসারমোচন যাহা হৈতে নাহি হয়।
সেই গুরু ইষ্ট দেব বন্ধু কেহো নয়॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্ জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥"

অনুবাদ।—যে মৃত্যুকে অর্থাৎ মরণস্বরূপ সংসারকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে যিনি ঐ মৃত্যু হইতে উদ্ধার না করেন, তিনি প্রকৃত গুরু, স্বজন, পিতা, মাতা, দেবতা বা পতি নহেন।

ইহাতে দৃষ্টান্ত দেখ প্রত্যক্ষ আছয়।
পূর্ব্বে সাধুগণ (ঘ) হেন সকলি তেজয়॥

পাঠান্তর—(ক) বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈবো—বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈবো।
(খ) অসুরে মোহের—অসুর-মোহন।
(গ) শরণ্য—জানিহ।
(ঘ) সাধুগণ—সাধুজন।

হরিভক্তি-প্রতিকূল গুরু বলিরাজ।
উপেক্ষা করিয়া সাধু সাধে নিজ কায॥

পাদ্মে—

"বামনায় মহীদানে বলিঃ পরমবৈষ্ণবঃ।
লঙ্ঘয়িত্বা গুরোরুক্তিং ত্যাগ এব বিধীয়তে॥"

অনুবাদ। দৈত্যরাজ বলি গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও বামন দেবকে ভূমি দান করিয়া পরম বৈষ্ণব হইয়াছেন। অতএব ত্যাগই যে বৈধ ইহাই প্রতিপন্ন হইল।

স্বজন তেজিলা মহারাজ বিভীষণ।
উপেক্ষিলা বন্ধুবর্গ ভাই যে রাবণ॥
পিতা ত্যাগ কৈলা ভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদ।
যে হেতুক ভক্তিপথে করিল বিবাদ॥
শ্রীমান্ ভরত নিজ কৈকেয়ী মাতারে (ক)।
ত্যাগ করি মস্তক চাহিলা কাটিবারে (খ)॥
দেবতা তেজিলা শ্রীমান্ বশিষ্ঠ দেবর্ষি।
কোনো কালে ছিলা তেঁহো শক্তির উপাসী॥
মহামায়া-স্থানে তেঁহো চাহিলেন মুক্তি।
তেঁহো কহে আমার নাহিক নিজ শক্তি॥
সংসার মোচন হেতু এক হরিভক্তি।
তাহা বিনু কাহার নাহিক সেই শক্তি॥
এত শুনি তাঁহারে তেজিয়া দ্বিজমণি।
বিচারিয়া হরিপদে লইল শরণি॥
পতি-পুত্র-আদি ত্যাগ কৈল বহুজন।
কৃষ্ণভক্তি-অনুকূল সেই বন্ধুজন॥

আগমে—

"বিষ্ণুভক্তিং বিনা রাজন্ যশ্চান্যমুপাদিশতি।
আত্মনা সহিতং তস্য পিতরং নরকং নয়েৎ॥"

অনুবাদ। হে রাজন্, বিষ্ণুভক্তি বাদ দিয়া যে অন্য উপদেশ দেয় সে নিজের সহিত নিজের পিতাকে (অর্থাৎ পিতৃপুরুষকে) নরকে লইয়া যায়।

রাজা কহে তবে কেনে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।
সকলি সমান কহে বিষ্ণুর সহিত॥
সাধু কহে তারা তত্ত্ব না বুঝিয়া কহে।
বিষ্ণু সর্ব্বেশ্বর তাঁর সম কেহো নহে॥
তাঁহার বিভূতি ব্রহ্মা রুদ্র-আদি করি।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ঈশ্বর শ্রীহরি॥
ব্রহ্মা মায়াধীন, রুদ্র ঈষত আবৃত।
নির্গুণ শ্রীহরি সর্ব্বশাস্ত্রের সম্মত॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥"

অনুবাদ।—মহাদেব শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত সর্ব্বদাই মিলিত, ত্রিগুণবিশিষ্ট এবং গুণদ্বারা সংবৃত (শক্তি=গুণসমূহের সাম্যাবস্থারূপিণী স্বেচ্ছাগৃহীতা প্রকৃতি; ত্রিলিঙ্গ=গুণক্ষোভের পর ত্রিগুণযুক্ত; গুণসংবৃত =গুণসমূহের প্রকাশাবস্থা প্রাপ্তির পর দূর হইতে তদ্দ্বারা সংবৃত)। শ্রীহরি অবশ্যই নির্গুণ (ত্রিগুণের অতীত) এবং সাক্ষাৎ অর্থাৎ অনাবৃত। তিনিই প্রকৃতির অতীত পুরুষ।

বিষ্ণু সহ অন্য দেব যে করে সমান।
পাষণ্ডীর মধ্যে সেই শাস্ত্রের প্রমাণ॥

পাদ্মে—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনাপি বীক্ষেত (ক) স পাষণ্ডী ভবেদ্
ধ্রুবম্ (খ)॥

অনুবাদ।—যে নারায়ণ দেবকে ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সমান বলিয়া মনে করে সে অবশ্যই পাষণ্ডী হয়।

বিষ্ণু বিনে শিব যে পৃথক না মন্তব্য।
বিষ্ণুর অংশাংশ করি মানিতে কর্ত্তব্য॥
অথবা হরির ভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম।
বৈষ্ণবের মধ্যে যে নাহিক যাঁহা-সম॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥"

অনুবাদ।—নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবগণের মধ্যে

পাঠান্তর—(ক) মাতারে—মাতাকে।
(খ) মস্তক চাহিলা কাটিবারে—চাহিলেন কাটিতে মস্তকে।

পাঠান্তর—(ক) সমত্বেনাপি বীক্ষেত—সমত্বেনৈব পশ্যতি।
(খ) ধ্রুবম্—সদা।

যেমন বিষ্ণু, বৈষ্ণবগণমধ্যে যেমন মহাদেব, পুরাণ সকলের মধ্যে তেমনি এই শ্রীমদ্ভাগবত।

অতএব সর্ব্বধর্ম্ম ত্যেজি হরি ভজ।
সংসার-নিগড় দৃঢ় চরণের তেজ॥

শ্রীগীতায়াম্—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

অনুবাদ।—(হে অর্জ্জুন), তুমি সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি দুঃখ করিও না।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়া দিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ॥"

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মসংহিতায়াম্—

ধর্ম্মাননন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্।
যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥ (ক)

অনুবাদ।—অন্য সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাস সহকারে একমাত্র আমার ভজনা কর। শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস যেমন যেমন হয় সিদ্ধিও সেইরূপই হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেৎ ততো যদি।
যত্র ক্ব বাঽভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কোবার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥"

অনুবাদ।—স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরির চরণকমল ভজনা করিতে করিতে, কেহ অপক্ব অর্থাৎ অসিদ্ধ অবস্থায় তাহা হইতে পতিত হইলে তাহার কোন জন্মে কোনরূপ অমঙ্গল হইয়াছে কি? আর যে তাহার ভজন না করিয়া অধর্ম্ম লইয়াই আছে সে কোন পুরুষার্থ লাভ করিয়াছে কি?

সর্ব্বধর্ম্মপদে কৃষ্ণভক্তির ইতর।
কর্ম্ম যোগ জ্ঞান অন্য উপাসনা আর॥

পাঠান্তর—(ক) "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কৃষ্ণকং শরণং ব্রজ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥"

পরিত্যজ্য-পদে যত কৃত যে সাফল্যে।
ত্যেজিয়া ভজহ হরি পাবে সর্ব্বফলে॥
কতি যে প্রত্যয় করি ত্যাগের অন্তর।
কৃত না হইলে নহে ত্যাগের বিচার॥
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-দোষ-গুণ বিচার করহ।
সকল ত্যেজিয়া হরি-চরণ ভজহ॥
শান্তমতি যার সেই কারে না ভজয়ে।
হরির কলাকে ভজে অন্যেরে ত্যেজিয়ে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

মুমুক্ষবো ঘোররূপান হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

যে-তক (ক) জীবের মোহ বুদ্ধির ব্যত্যয়।
আছয়ে সে-তক নাহি বুঝয়ে নিশ্চয়॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে যবে নির্ব্বেদ জন্ময়।
শ্রোতব্য যে আর (খ) শ্রুত সকলি তেজয়॥
শ্রোতব্য যে যত ধর্ম্মশাস্ত্র-অভিমত।
শ্রুত যাহা কৃত গুরু-উপদেশ যত॥
কৃত করণীয় যত সকলি ত্যেজিয়া।
তখন শ্রীকৃষ্ণ ভজে নির্ব্বেদ পাইয়া॥
কৃষ্ণ-উপদেষ্টা গুরু আশ্রয় করিয়া।
কৃষ্ণভক্তি পরাৎপর মহত্ত্ব জানিঞা॥
চক্ষুষ্মান্ হয় তবে দেখিবারে পায়।
পরম-নির্বৃতি তবে তখন জন্ময়॥

শ্রীগীতায়াম্—

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥

অনুবাদ।—তোমার বুদ্ধি যখন অজ্ঞানরূপ গহন (অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ মোহময় দুর্গ) অতিক্রম করিবে তখনই তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয়ের নির্ব্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্য লাভ করিবে।

পাঠান্তর—(ক) যে-তক—যাবৎ ও যতেক।
(খ) যে আর—যতেক।

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে—

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ॥
তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥

অনুবাদ।—[অবতারকালে শ্রীভগবানের লীলাশক্তি দ্বারা রসপুষ্টির জন্য শ্রীকৃষ্ণই যে প্রকৃত পতি এই বুদ্ধি এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান, গোপীদের নিকট আবৃত থাকে, তাহাতেই গোপীদের মনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপপতি ভাব হয়] অবলা ব্রজ-গোপীগণ আমার স্বরূপ না জানিয়া আমাতে অনুরাগযুক্ত হইয়া পরম ব্রহ্ম আমাকে উপপতি মনে হইলেও পতিরূপেই পাইয়াছিল। অপর শত সহস্র জন তাঁহাদের সঙ্গ মাত্র লাভে আমাকে সেই ভাবেই লাভ করিয়াছে। সুতরাং হে উদ্ধব! তুমিও স্মৃতি (বিধি ও নিষেধ), প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত এবং শ্রোতব্য ও শ্রুত—এই সকল পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বাত্মভাবে সর্ব্বজীবের আত্মা একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। আমার দ্বারা অবশ্যই তুমি অকুতোভয় হইবে।

অষ্টম স্কন্ধের শেষে রাজা সত্যব্রত।
মৎস্যদেব প্রতি সাধু কহে এই মত॥
অন্য উপদেষ্টা উপদেশ-আদি ত্যাজ্য।
টীকাতে বাখানে চক্রবর্ত্তী যে আচার্য্য॥ †
অতেব অন্যেরে ছাড়ি (ক) হরির আশ্রয়।
অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা নাহিক সংশয়॥
কর্ম্ম জ্ঞান দুই যে তাহাতে নাহি শ্রেয়।
সেহমাত্র কেবল জীবের ভ্রমময়॥

শ্রীভাগবতে—

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥

অনুবাদ।—দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ এবং ব্রতসমূহ শ্রীহরির প্রীতির কারণ হয় না। একমাত্র নিষ্কাম ভক্তিই তাঁহার প্রীতি জন্মায় অন্য সকলই বিড়ম্বনা মাত্র।

অতএব কর্ম্ম কভু নাহি হয় শ্রেয়।
সংসার ভ্রমণ মাত্র তাহাতে নিশ্চয়॥
হরিভক্তি মিশ্র বিনে সেই সিদ্ধ নহে।
প্রসিদ্ধ ব্যবস্থা ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
কেবল যে জ্ঞান হরি-ভাবেতে বর্জ্জিত।
তাহাতেও শ্রেয় নাহি, বিশেষে অনর্হিত (ক)॥

শ্রীদশমে—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

অনুবাদ।—হে কমলাক্ষ! অন্য যাহারা [ভক্তির পথ বাদ দিয়া জ্ঞানমার্গের আশ্রয়ে] নিজেদের বিমুক্ত বলিয়া মনে করে, তাহাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধ নয়, কারণ সেই বুদ্ধি তোমার প্রতি ভাব বা ভক্তি বিহীন। তাহারা তোমার শ্রীচরণে অনাদরবশতঃ পরম পদে অতিকষ্টে আরোহণ করিয়া তাহা হইতে অধঃপতিত হয়।

শুদ্ধ ভক্তি বিনে কৃষ্ণ কভু নাহি পায়।
জ্ঞানকর্ম্ম আদি তেজি ভজন যে শ্রেয়॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়াধ্যায়ে—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

পাঠান্তর—(ক) অতেব অন্যেরে ছাড়ি—অতএব অন্য ছাড়ি।

† বটতলার পুস্তকে ইহার পর তিন লাইন উদ্ধৃত শ্লোক আছে তাহার অপপাঠ যথাসম্ভব সংস্কার করিয়া সানুবাদ প্রদত্ত হইল। যথা—

পাদ্মোত্তর খণ্ডে:

শৈবঃ শাক্তো গাণপত্যঃ সৌরশ্চ দেবপূজকঃ।
গোবিন্দ শরণং পশ্চাদ্ ভবেদ্ যদি স বৈষ্ণবঃ॥
শাক্তস্তু বৈষ্ণবো ভূত্বা দুর্গতেস্ত্রান মুদ্ধরেৎ॥

অনুবাদ।—শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য বা অন্য দেবতার পূজক পরে শ্রীগোবিন্দের স্মরণ লইলে বৈষ্ণব হন। শাক্তও বৈষ্ণব হইলে নিজে দুর্গতি হইতে ত্রাণ লাভ করেন।

পাঠান্তর—(ক) বিশেষে অনর্হিত—বিশেষ অহিত।

অনুবাদ।—কামনাশূন্য অথবা সর্ব্বপ্রকার কামনা-বিশিষ্ট, অথবা মোক্ষলাভে ইচ্ছুক যে ব্যক্তি উদার-বুদ্ধি-সম্পন্ন, তিনি তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা পরম পুরুষ ভগবানেরই অর্চ্চনা করেন।

তীব্রভক্তি-পদে জ্ঞানকর্ম্ম-অনাবৃত।
টীকাকার-চক্রবর্ত্তি-আচার্য্য-সম্মত॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছুর অভিলাষ যাহাতে নাই, যাহা জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা আবৃত নহে (অর্থাৎ যাহাতে ব্রহ্মানুসন্ধান রূপ জ্ঞান বা নিত্য নৈমিত্তিক স্মার্ত্ত কর্ম্ম এবং বৈরাগ্য যোগাদির সম্বন্ধ নাই) আনুকূল্যের সহিত এইরূপ যে শ্রীকৃষ্ণানুশীলন তাহাই উত্তমা ভক্তি।

জ্ঞানমিশ্রা ভকতি যে আশ্রয় করয়।
নির্ব্বাণের হেতু কিন্তু কৃষ্ণ নাহি পায়॥
ভক্তিহীন জ্ঞান-কর্ম্ম বিফল কেবল।
অধঃপতন মাত্র হয় তার ফল॥
নিষ্কাম যে কর্ম্ম করে বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ (ক)।
তাহার যে ফল তাহা শুনহ যথার্থ (খ)॥
অন্তর-শুদ্ধির প্রতি কারণ সে হয়।
মনঃশুদ্ধি হৈলে তাহে বৈরাগ্য জন্ময়॥
সেই যে বৈরাগ্য শুদ্ধ জ্ঞানের কারণ।
ভক্তি প্রতি কভু কর্ম্ম কারণ না হন॥
কর্ম্মার্পণ ভক্তি যে কেচিত মতে কন।
পরম্পরারূপে কষ্টে মুক্তি প্রতি হন॥
শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কাহা হৈতে না মিলয়।
বিনে সাধু-সঙ্গ আর নাহিক উপায়॥

শ্রীভাগবতে—

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্॥

অনুবাদ।—হে উদ্ধব, আমি সাধুদের পরম আশ্রয়। ভক্তিযোগ ও সাধুসঙ্গ বিনা (সংসার মুক্তির) অন্য কোন উৎকৃষ্ট উপায় নাই। (সাধুসঙ্গই ভক্তিযোগ লাভের উপায়)।

জ্ঞানকর্ম্ম তেজি ভজে অনন্যভাবেতে।
প্রশংসা তাহার সেই পায় ব্রজনাথে॥
সদাচার-হীন যদি দুরাচার হয়।
কৃষ্ণপ্রিয় সেই সাধু করি মানি তায়॥

শ্রীগীতায়াম্—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥"

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণভক্ত চতুর্ব্বর্গ নাহিক মাগয় (ক)।
মুমুক্ষু যে কৃষ্ণভক্তি-যোগ্য নাহি হয়॥
নিষ্কাম অনন্যাশুদ্ধমাধুর্য্য ভকতি।
এইমাত্র সার যার ফল প্রেমরতি (খ)॥
অন্য অন্য যোগধর্ম্মে সিদ্ধি অষ্টাদশ।
শ্রীকৃষ্ণভজনে সিদ্ধ হয় প্রেমরস॥
অন্য যোগ-ধর্ম্মে সিদ্ধি ধর্ম্ম অর্থ কাম।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে মিলে ব্রজ প্রেমধাম॥
প্রাকৃত যে সিদ্ধি ভক্ত দৃক্‌পাত না করে।
মুক্তি চতুষ্টয় নাম নাহি লয় ডরে॥
প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ মাত্রে চাহে।
দিলেও না লয় সে অনর্থ মানে তাহে॥
শ্রীমদ্ভাগবতে—সালোক্য সার্ষ্টি-সমীপ্য ইত্যাদি।

পূর্ণশ্লোক ও অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণ যে আনন্দময় তাঁহার ভকত।
সেহ মগ্ন সদা (গ) তাঁর তুচ্ছ ত্রিজগত॥
অতএব মহারাজ সদা ভজ হরি।
পরাৎপর পরমব্রহ্ম (ঘ) সভার উপরি॥
সচ্চিৎ আনন্দময় শ্যামল-বিগ্রহ।
স্বরূপ শকতি ধাম পরিকর সহ॥

পাঠান্তর—(ক) প্রীত্যর্থ—প্রীতৰ্থে।
(খ) যথার্থ—যথার্থে।

পাঠান্তর—(ক) নাহিক মাগয়—ফল নাহি চায়।
(খ) প্রেমরতি প্রেমভক্তি।
(গ) সেহ মগ্ন সদা—প্রেমানন্দে মগ্ন।
(ঘ) পরমব্রহ্ম—পূর্ণ ব্রহ্ম।

বেদের তাৎপর্য্য শ্যামসুন্দর-ভজন।
আর যত (ক) কহে সেই ত্রিবর্গ-সাধন॥
পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণ প্রেম প্রয়োজন।
বার বার ভজ গোপীনাথের চরণ॥

শ্রীমধুসূদনাচার্য্যস্য ভাষ্যে—

চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং
ব্রজস্ত্রীণাং হারং ভবজলধিপারং কৃতধিয়াম্।
বিহন্তুং ভূভারাং বিদধদবতারং মুহুরহো
হরিং বারং বারং ভজত কুশলারম্ভকৃতিনঃ॥
বংশীবিভূষিতকরাৎ নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥

অনুবাদ। হে মঙ্গলজনক কার্য্যের অনুষ্ঠাতৃগণ! যিনি বেদবাণীসমূহের চিদানন্দস্বরূপ, এবং জলদ-কান্তিসারস্বরূপ, ব্রজরমণীদের কণ্ঠের হারস্বরূপ, কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিদের ভবসমুদ্র-পারস্বরূপ, যিনি পৃথিবীর ভার বিনাশ করিবার জন্য বারবার অবতীর্ণ হইয়া থাকেন (অবতার বিধান করেন), অহো সেই শ্রীহরিকে তোমরা বারবার ভজনা কর।

যাঁহার করযুগল বংশীবিভূষিত, যাঁহার কান্তি-নবজলধরের ন্যায়, যাঁহার পরিধানে পীতবসন, যাঁহার অধরোষ্ঠের শোভা অরুণবর্ণ বিম্বফল সদৃশ, যাঁহার বদন পূর্ণচন্দ্রের মত সুন্দর, যাঁহার নয়নযুগল কমলসদৃশ সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ কোন তত্ত্বই আমি জানি না।

ব্রহ্মসংহিতায়াম্—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

অনুবাদ। সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, তিনিই আদি ও অনাদি, তিনিই সর্ব্ব কারণের কারণস্বরূপ গোবিন্দ।

কৃষ্ণের চিন্ময় রূপ মায়িক করিয়া।
যে অধম কহে সেই জন মন্দধিয়া॥
তার মুখ-দরশনে মহাপাপ জন্মে।
সে জনার অধিকার নাহি কোন কর্ম্মে॥

পাঠান্তর (ক) যত—মত।

তার স্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত করিতে জুয়ায়।
শ্রীমান্ মধ্বাচার্য্য রামানুজ স্বামী কয়॥
বস্ত্রের সহিত জলে পড়ি স্নান করি।
স্মরণ করিব উঠি নাম বিষ্ণু হরি॥
মায়াবাদ ভাষ্য কল্পনার্থ মধ্বাচার্য্য।
দূষিলা শতেক মতে মত শঙ্করাচার্য্য॥
শত দোষ দিয়া শতদূষণী নামেতে।
গ্রন্থশূর প্রকাশিলা প্রসিদ্ধ জগতে॥
কুসঙ্গ সদাই ত্যাগ সৎসঙ্গ-করণ।
নিতান্ত শ্রেয়াংশ এই বেদের বচন॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবে যাহার নাহি (ক) রতি।
নিন্দুক পাষণ্ড সে (খ) বিরোধী ভক্তি প্রতি॥
বিষয়-আত্মক অবৈষ্ণব স্ত্রিয়াবিট (গ)।
সে সকল জানিবে যে সংসারের কীট॥
তার সঙ্গ না করিব সদা সাবধান।
আপনা রাখিতে এই পরম বিধান॥
কর্ম্মী জ্ঞানী নানাদেবসেবী যেই নর।
তার সঙ্গ বিশেষত সদা নিন্দাস্কর (ঘ)॥

কাত্যায়নসংহিতায়াম্—

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখ-জন-সংবাসবৈশসম্॥

অনুবাদ। অগ্নিশিখাপরিবেষ্টিত পিঞ্জরে চির-অবস্থানও বরং ভাল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তাবিমুখ জনের সঙ্গে বাসরূপ জ্বালা অসহ্য।

বিষ্ণুরহস্যে—

আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালব্যাঘ্রজলৌকসাম্।
ন সঙ্গঃ শল্যযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাম্॥

অনুবাদ।—সর্প, ব্যাঘ্র বা জলোকার (জলচর হিংস্র প্রাণীর) আলিঙ্গনও বরং ভাল মনে করি; কিন্তু যাহারা (শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন) বিভিন্ন দেবতার একমাত্র সেবাকারী সুতরাং যাহারা বিভিন্ন দেবসেবা-সংস্কাররূপ শেলযুক্ত, তাহাদের সঙ্গ ভাল মনে করি না।

পাঠান্তর—(ক) যাহার নাহি—নাহিক যার।
(খ) পাষণ্ড সে—পাষণ্ডী সেই।
(গ) স্ত্রিয়াবিট—স্ত্রিয়াবিষ্ট।
(ঘ) নিন্দাস্কর—নিন্দাকর।

তাঁহা সভার অন্ন-জল-গ্রহণ নিন্দিত।
বৈষ্ণবের অন্ন খাইতে হয় যে উচিত॥
অভাবে কিঞ্চিত জল মাগিয়া খাইব।
শাক্তাদির অন্ন জল অবশ্য বর্জ্জিব॥

পাদ্মে—

প্রার্থয়েদ্ বৈষ্ণবাদন্নং তদভাবে জলং পিবেৎ।
সঙ্গং বিবর্জ্জয়েচ্চৈব শাক্তাদীনান্তু বৈষ্ণবঃ॥

অনুবাদ।—বৈষ্ণব বৈষ্ণবের নিকটেই অন্ন প্রার্থনা করিবে। তাহা না পাইলে শুধু জলপান করিবে, বৈষ্ণব শাক্ত প্রভৃতির সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে।

ন কার্য্যা প্রার্থনা তেভ্যস্তেষাং দ্রব্যমমেধ্যবৎ।
নান্নং লভেত শাক্তানাং শৈবাদীনাঞ্চ বেশ্মনি॥

অনুবাদ।—বৈষ্ণব শাক্ত প্রভৃতির নিকট কিছু প্রার্থনা করিবে না, তাহাদের দ্রব্যসমূহ অমেধ্য অর্থাৎ অপবিত্র বলিয়া শাক্ত শৈব প্রভৃতির গৃহে অন্ন গ্রহণ করিবে না।

বিশেষত বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট পাদোদক।
পরম পদার্থ সেই কহিব কি-তক॥
তাহার মহিমা কিছু কহা নাহি যায়।
যাতে চতুর্ব্বর্গ মিলে কৃষ্ণভক্তি (ক) হয়॥

নারদ-পঞ্চরাত্রে—

বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ পরং নির্ব্বাণহেতুনা।
পরং নির্ব্বাণহেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজনম্॥

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে চ—

উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ ইত্যাদি।

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

শ্রীবিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ পাবনং চরণোদকম্।
সর্ব্বতীর্থময়ং পীত্বা কুর্য্যাদাচমনং নহি॥

অনুবাদ।—শ্রীবিষ্ণুর এবং বৈষ্ণবগণের পবিত্র ও সর্ব্বতীর্থময় চরণামৃত পান করিয়া কখনও আচমন করিবে না।

নীচ উচ্চ (খ) জাতি বলি নাহি বিচারিব।
জাতি-বুদ্ধি করিলে নরকে যায় ধ্রুব॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবের পূজা বিষ্ণুসহিত সমান।
অবশ্য কর্ত্তব্য এই বেদের বিধান॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্।
পরিচর্য্যাঞ্চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু॥

অনুবাদ।—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের আত্মার প্রভু তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব, স্থাবর ও জঙ্গম উভয়ের পরিচর্য্যা বিশেষতঃ মনুষ্যগণের মধ্যে ধার্ম্মিকদের, তাঁহাদের মধ্যে মহৎ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তদের পরিচর্য্যা (শিক্ষা করিবেন)।

যে জনার গৃহে নাহি বৈষ্ণব-সেবন।
সেই গৃহ হয় তার শ্মশান সমান॥
পণ্ডিত সমান সেই গাধার সমান।
কুকুরের তুল্য কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জন॥

পাদ্মে—

যদাগারেঽকৃষ্ণসেবা কার্ষ্ণসেবা তথৈব চ।
শ্মশানতুল্যং তদ্বিপ্রঃ স এব শ্বপচাধমঃ॥
তন্মন্দিরং চিতাতুল্যং তদ্বর্ণনং-খরোপমম্।
শুনস্তুল্যং তদাস্যং যঃ কার্ষ্ণ-কৃষ্ণবহির্ম্মুখঃ॥

অনুবাদ।—যে গৃহে শ্রীকৃষ্ণের বা তাঁহার ভক্তের সেবা হয় না তাহা শ্মশানতুল্য। সেই গৃহস্বামী বিপ্র হইলেও চণ্ডাল হইতে অধম। যে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ ভক্তের প্রতি বিমুখ তাহার গৃহ চিতা সদৃশ, তাহার বর্ণনা গর্দ্দভের মত, তাহার মুখ কুকুরের মুখের মত।

বৈষ্ণব-সেবন বিনে কৃষ্ণভক্ত নহে।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে শ্রীঅর্জ্জুনেরে কহে॥

আদিপুরাণে—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

প্রাতঃকালে করে বৈষ্ণবের নাম গান।
ভাগবতোত্তম (ক) সেই কৃষ্ণের সমান॥

পাঠান্তর—(ক) কৃষ্ণভক্তি—কৃষ্ণে রতি।
(খ) নীচ উচ্চ—নীচোত্তম।

পাঠান্তর—(ক) ভাগবতোত্তম—ভাগবত তুল্য।

দ্বারকামাহাত্ম্যে—

নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানান্তু কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে (ক)॥

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের মহিমা অপার।
শুন মহারাজ এক ইতিহাস তার॥
কিছু দূর আচার্য্য প্রভুর গৃহ হৈতে।
একঘর কামার আছয়ে সে গ্রামেতে॥
প্রভুর বাটীতে এক বিড়াল আছয়ে।
রোঙা বলি সভে তারে কৌতুকে ডাকয়ে॥
প্রভুগৃহে বৈষ্ণবের ভোজনের শেষে।
উচ্ছিষ্ট খাইল গিয়া সভার বিশেষে॥
বিড়াল-স্বভাব যে সভার গৃহে (খ) যায়।
কামারের গৃহে গেল খাইয়া হেথায়॥
দৈবাত্ত তাহার মুখে এক কণা ছিল।
কামারের বধূর অন্নেতে মুখ দিল॥
সেই কণা মুখে হৈতে অন্নে রহি গেলা।
না জানি অন্নের সহ বধূ তাহা খাইলা॥
খাইতেই মাত্র কৃষ্ণ-উন্মাদ হইল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি (গ) উঠি নাচিতে লাগিল॥
হাসে কান্দে নাচে গায় হরি হরি বলে।
ভূত ঘাড়ে চাপিল কামারগুলা বলে॥
ওঝা আনি ঝাড়ায় কতেক (ঘ) তুক করে।
কান্দয়ে সগোষ্ঠী বুক চাপড়িয়া মরে॥
শ্রীআচার্য্য প্রভু সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া।
ইতর লোকের মুখে কামার শুনিঞা॥
কান্দিয়া পড়িল গিয়া ধরি প্রভুর পায়।
রক্ষা কর প্রভু মোর বধূটি মরয়॥
প্রভু কহে কহ তার কি ব্যাধি হইল।
কামার বলয়ে ভূত ঘাড়েতে চাপিল॥
হাসে কান্দে নাচে গায় হরি হরি বলে।
দুই চক্ষে জল পড়ে ঘর ভেস্যে চলে॥

পাঠান্তর—(ক) বলে—যুগে।
(খ) যে সভার গৃহে—সকলের ঘরে।
(গ) কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া।
(ঘ) ঝাড়ায় কতেক—ঝাড়ে আর কত।

সর্ব্বজ্ঞ আচার্য্য প্রভু বুঝিলেন মনে।
এদশা হইল বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের গুণে॥
কামারকে কহেন প্রভু আরে মূর্খ শুন।
ভূত নহে, কৃষ্ণ প্রেম হৈল বড় গুণ॥
কামার কান্দিয়া কহে তাহে কায নাঞি।
ভাল যাথে হয় প্রভু করহ তাহাই (ক)॥
হাসিয়া কহেন তবে প্রভু কামারেরে।
ইহার ঔষধ তবে কহি যে তোমারে॥
যাজক ব্রাহ্মণ এক তার ঘরে গিয়া (খ)।
এক মুষ্টি অন্ন আনি দেহ খাওয়াইয়া (গ)॥
ইহা শুনি কামার গলে বস্ত্র জড়াইয়া (ঘ)।
দণ্ডবত করি হর্ষে চলিল ধাইয়া॥
অনেক যজমান যার হেন বিপ্র জানি।
এক মুষ্টি অন্ন মাগি খাওয়াইলা আনি॥
খাওয়াইবামাত্র বধূ পূর্ব্বমত হৈল।
হরিভক্তি উড়ি গেল (ঙ) আপনা নিন্দিল॥
অতএব বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের যে মহিমা (চ)।
এমতি জানিবে যার নাহিক উপমা॥
যদি কহ এমত যে দেখিতে না পাই।
তাহা শুন যে হেতু তৎক্ষণে ফলে নাঞি॥
বৈষ্ণবেতে অপরাধ যাহার প্রচুর।
তার ফল প্রাপ্ত হৈতে হয় বহু দূর॥
বৈষ্ণব-অধরামৃত খাইতে খাইতে।
অপরাধ ক্ষয় পায় প্রকাশে পশ্চাতে॥
বৈষ্ণব নিকটে অপরাধ তীক্ষ্ণবিষে।
সর্ব্বনাশ হয়ে নরকেতে বাস শেষে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

পাঠান্তর—(ক) প্রভু করহ তাহাই—তাহে করহ গোসাঞি।
(খ) যজমানিঞা এক বিপ্র ব্রাহ্মণের ঘরে।
(গ) দেহ খাওয়াইয়া—খাওয়াও তাহারে।
(ঘ) শুনিয়া কামারগণ গলে বস্ত্র দিয়া।
(ঙ) উড়ি গেল—বহু দূরে।
(চ) বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের যে মহিমা—বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট মহিমা।

অপরাধে সাবধান যেই সুধী (ক) হয়।
অতি শীঘ্র কৃষ্ণে তার প্রেম উপজয়॥
রাজা কহে যজমানিঞা ব্রাহ্মণের অন্নে।
হরিভক্তি নাশ যায় কহ কি কারণে॥
সাধু কহে বিপ্র যজমানেরে যজিয়া।
নানাদেবপ্রসাদ শ্রাদ্ধ-আদি অন্ন লৈয়া॥
পাক আদি করি খায় যাথে ভক্তি যায়।
যে হেতু বৈষ্ণবে তাহা কভু নাহি খায়॥
সেবা-অপরাধ নামাপরাধ কহি শুন।
যেহেতুক সাধন করিলে পুনঃপুন॥
প্রেম নাহি জন্মে, কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি (খ) নাহি হয়।
নহে এক কৃষ্ণনামে প্রেম উপজয়॥
সেবা-অপরাধ নাম-গ্রহণেতে যায়।
নাম-অপরাধে নরে নরক ভুঞ্জয়॥
তবে যদি বল তার উপায় কি নাঞি।
উপায় আছয়ে কিন্তু অতিকৃচ্ছ্র তাই॥
একান্ত জিহ্বায় যার সদা নাম বৈসে।
কৃপা করি অপরাধ ক্ষেমেন তবে সে॥
কোটি কোটি মহাপাপ নামাভাসে যায়।
অপরাধমাত্রে ভক্তিবাধাকে (গ) জন্মায়॥
সেবা-অপরাধ করি শুনহ প্রথমে।
সদা সাবধান ইথে না জন্ময়ে প্রেমে॥

সেবা-অপরাধ—

ভাগবত-শাস্ত্রেতে করিয়া অনাদর।
অন্য অন্য শাস্ত্র শ্রবণাদিতে (ঘ) আদর॥
ভগবত-বিগ্রহ অগ্রে তাম্বুলচর্ব্বণ।
এরণ্ড পত্রেতে পুষ্প রাখিয়া অর্চ্চন॥
আসুর-কালেতে পূজা পীঠে তথা ভূমে।
বসিয়া পূজন নাহি করিবেক ভ্রমে॥
স্নানকালে বাম হস্তে স্পর্শ না করিব।
পর্য্যুষিত যাচিত বা পুষ্পে না পূজিব॥

পাঠান্তর—(ক) সাবধান যেই সুধী—যেই সাধু সাবধান।
(খ) কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্তি।
(গ) ভক্তিবাধাকে—ভক্তিবাধকে।
(ঘ) অন্য অন্য শাস্ত্র শ্রবণাদিতে—অন্যশাস্ত্র শ্রবণেতে (বা শুনিবারে) করয়ে।

পূজাকালে ষ্ঠীবন[১] নিজ গর্ব্ব-প্রকাশন।
না করিব অর্দ্ধচন্দ্র-তিলক-ধারণ॥
পাদ ধৌত বিনে নাহি মন্দিরে গমন।
না করিবে অবৈষ্ণব-পক্ক নিবেদন॥
কাপালিক কিংবা অবৈষ্ণব দরশন।
না করিবে পূজাকালে হবে সাবধান॥
নখাম্বু-জলেতে[২] স্নান নাহিক করাবে।
ঘর্ম্মাক্ত-দেহেতে তথা পূজা না করিবে॥
রাজান্ন-ভক্ষণ, অন্ধকারে হরি-স্পর্শ।
বিধি বিনে ভোজন পানীয় দান অর্শ॥
বাদ্য বিনে শ্রীমন্দিরদ্বার-উদ্ঘাটন।
কুক্কুরদৃষ্ট ভক্ষণীয়-সামগ্রী অর্পণ॥
পূজাকালে মৌনভঙ্গ অন্যবাক্য-ব্যয়।
বিড়্মূত্র-ত্যাগ[৩] তৎকালীন না জুয়ায়॥
গন্ধ-মাল্যাদিক-দান-পূর্ব্বে ধূপদান।
অনর্হ[৪] পুষ্পেতে পূজা অদন্তধাবন॥
স্ত্রীসঙ্গ করিয়া দেহ-সংস্কারাদি বিনে।
রজস্বলা স্ত্রীর স্পর্শ সামগ্রী অর্চ্চনে॥
মৃতকস্পর্শ যে তথা সামগ্রী অদেয়।
রক্ত নীল মলিন অধৌত পরকীয়॥
বস্ত্র পরিধানে পূজাদিক না করিব।
পূজাকালে মৃতক-শরীর না হেরিব॥
অধিক-উদ্বেগ কালে অর্চ্চনকরণ।
পূজাকালে নহে অপান-মারুত-মোচন[৫] (ক)॥
ক্রোধ কর্‌য্যা (খ) আর শ্মশান হৈতে আগমন।
কুসুম্ভ পিণ্যাক জ্বালপাদ (গ) করিয়া ভোজন॥
তৈলাভ্যঙ্গ[৬] শরীরেতে অর্চ্চনকরণ।
হরির স্পর্শ হরির কর্ম্ম পাতক বহন (ঘ)॥

পাঠান্তর—(ক) অপান-মারুত-মোচন—পান মারুত গ্রহণ।
(খ) কর্‌য্যা—কৃষা।
(গ) জ্বালপাদ—মুক।
(ঘ) হরিস্পর্শ হরি কর্ম্ম পাতক মহান।
১। ষ্ঠীবন—থুথু ফেলা।
২। নখাম্বু-জলেতে—যাহাতে নখ ডুবিয়াছে এমন জলে।
৩। বিড়্মূত্র ত্যাগ—মলমূত্র ত্যাগ।
৪। অনর্হ—অনুচিত, অবিহিত।
৫। অপান-মারুত-মোচন—বাত কর্ম্ম।
৬। তৈলাভ্যঙ্গ—তেলমাখা।

যানে চড়ি কিংবা পদে পাদুকাসহিত।
গমন ভগবত-গৃহে না হয় উচিত॥
উৎসব অদর্শন অপ্রণাম তদগ্রত[১]।
উচ্ছিষ্টে বা অশৌচে বা বন্দনাদি কৃত॥
একহস্তে প্রণাম বামে রাখি প্রদক্ষিণ।
পাদ-প্রসারণ অগ্রে পর্য্যঙ্ক-বন্ধন[২]॥
শয়ন ভোজন মিথ্যাভাষা উচ্চভাষা।
রোদনাদি অগ্রে যুদ্ধ অন্যজল্প মৃষা[৩]॥
নিগ্রহানুগ্রহ নরে ক্রূরভাষণ।
কম্বলাবরণ পর-নিন্দাদি-স্তবন
অশ্লীলভাষণ অধোবায়ু-বিমোক্ষণ।
মুখ্যকাল ত্যজি শক্তে পূজাদিক গৌণ॥
ভোজন-পানাদি পর্ণ ঔষধসেবন।
যৎকিঞ্চ অনিবেদিতমাত্রেতে ভক্ষণ॥
যে কালে যে ফল-মূল-আদি-অনর্পণ।
বিনিয়ুক্তাবশিষ্ট[৪] (ক) ব্যঞ্জনাদিক প্রদান॥
পশ্চাত করিয়া বৈসে, অন্যের বন্দন।
তদগ্রেতে ইহা না করিব কদাচন॥
গুরুর অগ্রেতে শিষ্য মৌনে না থাকিব।
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিব॥
নিজ যশ-কথন অন্যদেবতানিন্দন।
বত্রিশ অপরাধ এই শাস্ত্রের বচন॥

নামাপরাধ—

সেবা-অপরাধ হয় নামেতে ভঞ্জন।
নামাপরাধেতে (খ) ধ্রুব নরকে গমন॥
তবে যদি একান্ত শরণ লয় নামে।
তবে ক্ষমা হইতে পারে কভু কালক্রমে॥

অপরাধ যথা—

বিষ্ণু আর শিবে করে পৃথক ঈশজ্ঞান।
গুরুদেবে মানে যথা মনুষ্যসমান॥
বেদ-পুরাণাদি-শাস্ত্র-আগম-নিন্দন।
নামে অর্থবাদ[১] আর কুব্যাখ্যা-করণ॥
নামবলে পাপকর্ম্মে করয়ে (ক) প্রবৃত্তি।
নাম ন্যূন জ্ঞানে অন্য শুভ কর্ম্মে মতি॥
অশ্রদ্ধালু জনে করে নাম-উপদেশ।
নামের মাহাত্ম্য শুনি না করে বিশ্বাস॥
বৈষ্ণবের নিন্দা আদি কিঞ্চিত-করণ।
নামে দশ অপরাধ এই বিবরণ॥
নামে ভগবানে হয় একুই সমান।
তথাপিহ শীঘ্র নাম করে ফলদান॥
এই দশ নাম-অপরাধের কারণ।
নাম কৃপা করি নাহি দেন প্রেমধন॥
অতএব অপরাধে হও সাবধান।
হরির নামেতে শীঘ্র লহগা (খ) শরণ॥
নাম মন্ত্রে অভেদ জানিঞা জপ (গ) ভাই।
কলিকালে বিশেষত আর গতি নাঞি॥
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব যে ইত্যাদি করিয়া।
অনেক প্রমাণ হয় জগত ভরিয়া॥
লালদাসের মাত্র এই এক গতি হয়!
নাম বিনে আর কিছু নাহিক উপায়॥

অথ চৌষট্টি-অঙ্গ ভক্তি।

গুরুপাদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা শিক্ষা সৎমার্গে গমন॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস।
দেহরক্ষামাত্র ত্যাগ অন্য অভিলাষ॥
একাদশী ব্রত, ধাত্রী-অশ্বত্থ-সেবন।
বিপ্র-গো-বৈষ্ণব-সেবা অপরাধ-বর্জ্জন॥
অবৈষ্ণবসঙ্গ আর বহুশিষ্য (ঘ) ত্যাগ।
বহু শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, হানি-লাভেতে বিরাগ॥

পাঠান্তর—(ক) বিনিয়ুক্তাবশিষ্ট—আয়ুক্তাবশিষ্ট।
(খ) নামাপরাধেতে—নাম অপরাধে।
১। তদগ্রত—তাঁহার সম্মুখে।
২। পর্য্যঙ্ক-বন্ধন—বীরাসনে বসা।
৩। অন্যজল্প মৃষা—বাজে কথা ও মিথ্যা।
৪। বিনিয়ুক্তাবশিষ্ট—খরচ করিবার পর অবশিষ্ট।

পাঠান্তর—(ক) পাপকর্ম্মে করয়ে—পাপকর্ম্ম করণে।
(খ) শীঘ্র লহগা—লও একান্ত।
(গ) জানিঞা জপ—করিয়া জান।
(ঘ) বহুশিষ্য—বহুসঙ্গ।
১। অর্থবাদ—অতিশয়িত উক্তি বলিয়া মনে করা বা বলা।

অন্যদেব অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব।
শোক মোহ ক্রোধাদির বশ না হইব॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-গুরু-নিন্দা না শুনিব।
গ্রাম্যকথা প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দিব॥
শ্রবণ কীর্ত্তন পূজা স্মরণ বন্দন।
পরিচর্য্যা সখ্য দাস্য আত্মনিবেদন॥
নৃত্য গীত দণ্ডবত নতি অভ্যুত্থান।
অনুব্রজ্যা (ক) ভগবানের গৃহেতে গমন॥
পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ-সংকীর্ত্তন।
ধূপ মাল্য গন্ধ-আদি প্রসাদসেবন॥
আরাত্রিক-মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তিদর্শন।
প্রিয়বস্তুদান, ধ্যান, তদীয়-সেবন॥
তদীয় যে চারি হয়ে শ্রেষ্ঠ-ভক্তি অঙ্গ।
তুলসীসেবন-আদি বৈষ্ণব-সেবা-সঙ্গ॥
মথুরামণ্ডলে বাস শ্রীমদ্ভাগবত।
শ্রবণ কর্ত্তব্য সহ সজাতীয় সত॥

রসামৃতসিন্ধৌ—

শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে॥

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্মযাত্রামহোৎসব একান্তশরণ॥
কার্ত্তিকেয়ব্রত দৃঢ়নিয়ম কর্ত্তব্য।
যতেক কহিল সারাৎসার হয় সর্ব্ব॥
তার মধ্যে বিশেষ মহিমা পাঁচ অঙ্গে।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে যার অতি-অল্পসঙ্গে॥
সাধুসঙ্গ, শ্রীল ভাগবত-আস্বাদন।
মথুরামণ্ডলে বাস, নাম-সংকীর্ত্তন॥
শ্রীমূর্ত্তি সেবন শ্রদ্ধা-পিরীতি-পূর্ব্বক।
পঞ্চসহ চতুঃষষ্টি ত্রৈলোক্য-তারক॥
চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে নব অঙ্গ শ্রেষ্ঠ।
নব-অঙ্গ আস্বাদন অধিক সুমিষ্ট॥

যথা-

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

অনুবাদ।—শ্রীবিষ্ণুর নাম-গুণ-লীলা প্রভৃতির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তাঁহার চরণ-সেবা ও পূজা, তাঁহার বন্দনা, তাঁহার দাস্য ও সখ্য, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ—এই নবলক্ষণ যুক্ত ভক্তি যদি কোন পুরুষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবানে অর্পণ করেন, তবে তাহাকেই উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া মনে করি। (প্রহ্লাদের উক্তি)।

শ্রবণ কীর্ত্তন পূজন স্মরণ বন্দন।
পরিচর্য্যা সখ্য দাস্য আত্মনিবেদন॥
আশ্রয় করিয়া এই নববিধা ভক্তি।
শ্রীকৃষ্ণে শরণ লও পরম যুগতি॥
কৃষ্ণ বিনে গতি নাঞি এ তিন জগতে।
বেদ বিধি সর্ব্বশাস্ত্র সাধুর সম্মতে॥

শ্রীধরস্বামিপাদানাম্—

তপস্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতা-
দটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যাগৈর্বিবদন্তু বাদিভি-
র্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি॥

অনুবাদ।—তপস্যা করিয়া নানা তাপে নিজেদের তাপিতই করুক, পর্ব্বত হইতে পতিতই হউক, তীর্থ-সমূহে ভ্রমণই করুক, আগম বা বেদাদি শাস্ত্র পাঠই করুক, নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠানই করুক, নানা মতবাদ লইয়া তর্ক-বিতর্কই করুক, শ্রীহরিকে বাদ দিয়া কেহ মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে না।

নানা সিদ্ধি ঋদ্ধ্যাদি (ক) তাবত চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেমগন্ধ না হৃদয়ে পৈশে (খ) যার॥

মহাজনস্য—

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্ণাং মধুরিপুবশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি॥

পাঠান্তর—(ক) অনুব্রজ্যা—অনুব্রজে।

পাঠান্তর—(ক) সিদ্ধি ঋদ্ধ্যাদি—সিদ্ধ বিদ্যাদি।
(খ) পৈশে—বৈসে।

অনুবাদ।—অণিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া সম্বন্ধ বা বিজয়ি ভাব, ব্রহ্মানন্দ প্রদায়ক সত্যধর্ম্ম-বিশিষ্ট সমাধি, সেই সমাধির ফলস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ—সেই পর্য্যন্তই চমৎকারিত্ব জন্মাইতে পারে, যে পর্য্যন্ত মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের বশীকরণের সিদ্ধৌষধিস্বরূপ শাস্ত, দাস্য প্রভৃতি প্রেমের গন্ধলেশও অন্তঃকরণ পথের পথিকত্ব প্রাপ্ত না হয়। (পথিক না হয়)।

গুণের সাগর হরি রূপের অবধি।
লীলা-রসময় প্রেমানন্দ-রসনিধি॥
তাহারে না ভজি আর কাহারে ভজিবে।
কাহারে ভজিয়া আর কি ধন পাইবে॥
প্রেমরত্ন-ধন রাখ হৃদয়ে ভরিয়া।
কাহারে ভজিবে আর কি ধন লাগিয়া॥
এ হেন রতন ধন তাহা তেয়াগিয়া।
কাহারে ভজিবে আর কি ধন লাগিয়া॥
ভজ ভজ কিশোর-কিশোরী সুখময় (ক)।
ইহার অধিক ধন আর কি আছয় (খ)॥
প্রেমের সম্পুটে ভরি রাখহ দোঁহায়।
ইহার অধিক আর কি ধন আছয়॥
দেহ গেহ জীবনের আশা তেয়াগিয়া।
প্রাণ কর পণ সেই ধনের লাগিয়া॥
দয়াল শ্রীকৃষ্ণ একবার যেই কহে।
'প্রপন্নোঽস্মি' তব কায়মনবাক্য সহে (গ)॥
তারে কৃষ্ণ নাহি তেজে প্রতিজ্ঞা করিল।
বড়ই ভরসা নিজ ভক্তগণে দিল॥

শ্রীরামায়ণে—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি (ঘ) চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ (ঙ) দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥

অনুবাদ।—আমার ব্রতই হইল এই যে—যে আমার শরণ লইয়া একবার মাত্রও "আমি তোমারই" এই বলিয়া প্রার্থনা জানায় আমি সর্ব্বদা তাহাকে অভয় দান করিয়া থাকি।

পাঠান্তর—(ক) সুখময়—রসময়।
(খ) ধন আর কি আছয়—বল কি আর আছয়।
(গ) প্রপন্নোঽস্মি পদে তব কায়মনোবাক্য সহে।
(ঘ) প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি—প্রপন্নায় তবাস্মীতি।
(ঙ) সর্ব্বদা তস্মৈ—সর্ব্বভূতেভ্যঃ।

শ্রীগীতায়াম্—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

অনুবাদ।—আমার এই মায়া দৈবী অর্থাৎ অলৌকিকী এবং গুণময়ী। ইহাকে সহজে অতিক্রম করা যায় না। যাহারা আমার শরণ গ্রহণ করে তাহারাই এই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে।

দুর্ল্লঙ্ঘ্য দুরূহ মায়া দুষ্কর-তরণ।
হরির আশ্রয় মাত্রে করয়ে লঙ্ঘন॥
এমন দয়াল ত্রিজগতে নাহি আন।
পুতনারে দিলা যেই মাতৃগতি-দান॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥

অনুবাদ।—অহো, অসাধ্বী পুতনা যাঁহাকে বধ করিবার জন্য স্তনযুগলে মাখান কালকূট পান করাইয়াছিল, এবং তথাপি মাতার (বা ধাত্রীর) যোগ্য গতিলাভ করিয়াছিল, তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়া আর কোন্ দয়ালুর শরণ লইব?

তাহাতে যে দেখহ বড়ই চমৎকার।
নীচ-উচ্চ-জাতি-ভেদ না করে বিচার॥
যেই ভজে সেই পায় চণ্ডাল কি যবনে।
সর্ব্বে অধিকারী হয় কৃষ্ণের ভজনে (ক)॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

কিরাতহূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কসা
আভীরকঙ্কা যবনাঃ শকাদয়ঃ (খ)।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়া
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

অনুবাদ।—কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, কঙ্ক, যবন ও শক প্রভৃতি এবং অন্যান্য পাপজাতি বা পাপী যাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ হয়, সেই মহাপ্রভাবশালী ভগবান্‌কে নমস্কার।

পাঠান্তর—(ক) কৃষ্ণের ভজনে—শ্রীকৃষ্ণভজনে।
(খ) শকাদয়ঃ—খশাদয়ঃ।

নীরব হইয়া রাজা শুনিতে শুনিতে।
নয়ানে গলয়ে ধারা চমকিত চিতে॥
গদগদ ভাবে (ক) বৈষ্ণবের পদ (খ) ধরি।
লোটাইয়া কান্দে (গ) রাজা ফুকরি ফুকরি॥
বৈষ্ণব-হৃদয়ে লঞা আলিঙ্গন করি।
দোঁহে গলাগলি কান্দে সঙরি সঙরি॥
তবে রাজা সম্বরণ করিয়া বৈষ্ণবে।
করযোড়ে (ঘ) করে স্তুতি গদগদ ভাবে॥
বুঝিলাম আমার উদ্ধার হেতু হরি।
তোমা পাঠাইলা ভব-সাগরের তরি॥
আমি মূঢ় না বুঝিয়া করিনু উপেক্ষা।
তুমি দয়াময় না ছাড়িয়া কৈলে রক্ষা॥
সাধুর স্বভাব হয় দয়ালু হৃদয়।
দীনহীন জন প্রতি সদাই সদয়॥
অপরাধ যত সব ক্ষেম মহাশয়।
এবে মোর গতি তার করহ উপায়॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ মুঞি আশ্রয় করিব।
একান্ত করিনু পণ এবে না ভুলিব॥
বৈষ্ণব কহেন তব পরম উপায়।
কহি তবে শুন যাথে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
শ্রীপাট মালিহাটী শ্রীমান্ আচার্য্য সন্তান।
তাঁ-সভার পাদাশ্রয় পরম কল্যাণ॥
সৎ-সম্প্রদা নিত্যসিদ্ধ তেঁহো সব হন।
আবির্ভাব মাত্র লোক-নিস্তার-কারণ (ঙ)॥
শ্রীচৈতন্যের নিত্যপারিষদ ঞিহো সব।
আশ্রয় করিলে সব হবে অনুভব॥
গুরুপদ আশ্রয় কর্ত্তব্য সম্প্রদায়।
সম্প্রদা-বিহীন দীক্ষা নিষ্ফলতা হয়॥
শ্রীমাধ্বী রুদ্র সনক চারি হন ব্যূহ।
বৈষ্ণব-সম্প্রদা কৃষ্ণনিষ্ঠ-ভক্তিবহ॥

পাঠান্তর—(ক) ভাবে—চিতে।
(খ) পদ—পায়।
(গ) কান্দে—কহে।
(ঘ) করযোড়ে—করযুড়ি।
(ঙ) লোক নিস্তার-কারণ—লোকে নিস্তার কারণ।

পাদ্মে—

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ॥

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

ভক্তি-অধিকারী নহে সম্প্রদায়ী বিনে।
সম্প্রদায়ী বিনে যত দেখহ ভুবনে॥
কৃষ্ণনিষ্ঠ কেহো নহে ব্যভিচারী হয়।
কর্ম্ম জ্ঞান বিনে ভক্তি মর্ম্ম না বুঝয়॥
অন্য-উপাসক-স্থানে কৃষ্ণদীক্ষা করে।
বিপর্য্যয় হয় সেই সংসার না তরে॥
পাদ্মে তথা নারদপঞ্চরাত্রে হরিভক্তিবিলাসোক্তিঃ
অবৈষ্ণবোপাদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ইত্যাদি।

অনুবাদ ও সম্পূর্ণশ্লোক পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

সম্প্রদা সর্ব্বত্র পূর্ব্বাপর যে প্রসিদ্ধ।
যোগে জ্ঞানে ভক্তিমার্গে সাধুশাস্ত্রে সিদ্ধ॥
শ্রুতি-প্রবর্ত্তক ভাগবত-প্রবর্ত্তক।
যতিপ্রবর্ত্তক হরিভক্তির সাধক॥
ইত্যাদি করিয়া সর্ব্বমতের সম্প্রদা।
সর্ব্বত্র প্রকট হয় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা॥
শ্রীধরগোস্বামী (ক) ভাগবতের টীকায়।
সম্প্রদায়-অনুরোধ করিয়া লিখয়॥
সম্প্রদায়-রক্ষা হেতু আচার্য্যের প্রতি।
স্থানে স্থানে হয়ে শিষ্য-করণের বিধি॥
শ্রীমান মধ্বাচার্য্য স্বামী ভাষ্যে স্থানে স্থানে।
সম্প্রদায়-অনুরোধ করিয়া বাখানে॥
অন্যপরে কা কথা যে (খ) ব্রাহ্মণ ভোজন।
সম্প্রদায়ী বিপ্র করাইব যে বিধান॥
অতএব যার যেই নিজ সম্প্রদায়।
দীক্ষা আদি করিব শ্রুতির বিধি হয়॥

পাঠান্তর (ক) শ্রীধরগোস্বামী—শ্রীধর স্বামী।
(খ) অন্যপরে কা কথা—অন্যপর কিবা কথা।
১। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের প্রথম শ্লোকের টীকা উপক্রমণিকাস্বরূপ শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন—

সম্প্রদায়ানুরোধেন পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারতঃ।
শ্রীভাগবতভাবার্থদীপিকেয়ং প্রতন্যতে॥

ব্যত্যয় হইলে সেই কাযে না কুলায়।
পরিশ্রমমাত্র হিতে বিপরীত (ক) হয়॥
মহারাজ জয়সিংহ শ্রীবৃন্দাবনে।
ঠাকুর ছিনাইয়া লৈলা অসম্প্রদায়ি-স্থানে॥
এ সকল বিবরণ বিশেষ বিস্তার।
মনেতে আগ্রহ যদি হয় জানিবার॥
জয়সিংহ রাজার সংগ্রহ-গ্রন্থশূরে।
জয়সিংহ নাম গ্রন্থ অতি সুমধুর॥
প্রাচীন আর গ্রন্থ ভক্তিসিদ্ধান্তদীপিকা।
দেখিলে সন্দেহ যাবে অন্তর-করকা (খ)॥
বৈষ্ণবের উপদেশ পাইয়া রাজন।
আশ্রয় করিলা শ্রীমান্ আচার্য্য-সন্তান॥
রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্ররত্ন পাইয়া রাজার।
মন ডুবি গেল হৈল ভক্তি চমৎকার॥
যে চরণস্পর্শ হৈল তাহে কি আশ্চর্য্য।
কত কত মূঢ় যাহে হৈল মুনিবর্য্য॥
অচিরাতে হৈল রাজা মহাভাগবত।
গোবিন্দ-বিগ্রহ সেবা কৈল নিজমাথ॥
এতেক যে রাজকর্ম্ম তথাচ যে মতি।
এক তিল শ্রীচরণে নাহিক বিরতি॥

যথা—

"ধীরো মুহ্যতি মুকুন্দনিবিষ্টচেতাঃ (গ)
পুঙ্খানুপুঙ্খ-বিষয়েক্ষণ তৎপরোঽপি।
সঙ্গীত-বাদ্যলয় তালবশংগতাপি
মৌলিস্থকুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব॥"

॥। নর্ত্তকী যেমন গীত, বাদ্য, লয় ও তালের বশে থাকিয়াও মস্তকে অবস্থিত কলসীর রক্ষায় নিজের ধী অর্থাৎ বুদ্ধিকে নিযুক্ত রাখে সেইরূপ শ্রীমুকুন্দের প্রতি নিবিষ্টমনা ধীর ব্যক্তিও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণে তৎপর থাকিয়াও কখনও মোহগ্রস্ত হন না।

যে দেশে পণ্ডিত বিপ্র অবৈষ্ণব হন।
রাজা অবৈষ্ণব আর অনর্থ কারণ॥
সে দেশ পাষণ্ডী হয় দানব-সমান।
কৃষ্ণভক্তি নাহি হয় যাহাতে কল্যাণ॥
যে দেশে বৈষ্ণব রাজা প্রজার সৌভাগ্য।
নতুবা পাষণ্ডী হয় পাইয়া কুমার্গ॥

তথাচ পাদ্মে—

যদ্রাজ্যে ন নৃপঃ কার্ষ্ণো বিদ্বান্ বিপ্রস্তথৈব চ।
তত্র পার্ষণ্ডিনো লোকা ভবন্তি নাত্র সংশয়ঃ॥
যদ্দেশে বৈষ্ণবো রাজা শাস্ত্রঞ্চ ভূসুরস্তথা।
স দেশঃ পরমশ্লাঘ্যঃ জনাশ্চ সুখিনঃ সদা॥ †

অনুবাদ।—যে দেশের রাজা এবং বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণভক্ত নহে সেই দেশের লোকেরা পাষণ্ডী (অর্থাৎ পাপাচারী হয়), এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যে দেশের রাজা বৈষ্ণব, শাস্ত্র বিষ্ণুর ভক্তির অনুকূল এবং ব্রাহ্মণও সেইরূপ সেই দেশ অতীব শ্লাঘ্য এবং প্রজারা সর্ব্বদাই সুখী।

কথোক দিবস পরে বৃন্দাবনে গেলা।
সর্ব্ববৈষ্ণবের সেবা সম্মান করিলা॥
জয়পুরে গোবিন্দের পোষাক যে দিলা।
রাজা তাহা দেখিয়া অনেক প্রশংসিলা॥
অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবনে যশ অতিশয়।
ঘোষয়ে সকল লোক বালবৃদ্ধচয়॥
পরে ব্রজভূম দয়া করিলেন তাঁরে।
সফল হইল শুভ (ক) আশা-তরুবরে॥
তাঁহার চরণযুগে করি এই আশ।
লালদাস কহে যেন না হয় নৈরাশ॥

পাঠান্তর—(ক) হিতে বিপরীত—ইথে বিপর্য্যয়।
(খ) অন্তর-করকা—অন্তর কারিকা।
(গ) ধীরো ন মুহ্যতি মুকুন্দ-পদারবিন্দম্।

পাঠান্তর—(ক) শুভ—শুদ্ধ।
† "যে দেশে পণ্ডিত বিপ্র..... সুখিনঃ সদা।"
এই অংশটুকু বটতলার গ্রন্থ হইতে গৃহীত। অপপাঠবহুল শ্লোক দুইটির যথা সম্ভব সংস্কার করা হইয়াছে।

ইতি শ্রীভক্তমালে রাজা রবীন্দ্র নারায়ণ রায়স্য চরিত্র-বর্ণনং নাম অষ্টাদশ-মালা॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর

বুধুরি নিবাস (ক) রামচন্দ্র কবিরাজ।
শাস্ত্রজ্ঞে (খ) প্রশংসনীয় পণ্ডিত-সমাঝ॥
শ্রীআচার্য্য প্রভু নিজ গৃহের সম্মুখে।
দুই চারি ভক্ত সহ কৃষ্ণকথা-সুখে॥
বৃক্ষতলাতে বসি আছেন ঠাকুর।
বিভা করি রামচন্দ্র যান নিজ পুর॥
প্রভুর সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে।
শিবিকা রাখিল সেই বৃক্ষের তলাতে॥
বহু লোকজন নানা বাদ্যকর যত।
বিশ্রাম করিতে বৈসে সকল-সহিত॥
রামচন্দ্র কবিরাজ গউরবরণ।
সদৃশ্য সৌন্দর্য্য যথা জিনিঞা মদন॥
প্রভুর নিকট হয়ে শিবিকায়ে বসি (গ)।
প্রভু হেরি নিজগণে কহে হাসি হাসি॥
এই যে পুরুষ হেনে সৌন্দর্য্য যে হয়।
কৃষ্ণদাস হয় যদি তবে (ঘ) সে শোভয়॥
পুন কিছু খেদ-উক্তি কহেন ঠাকুর।
হাহা কি আশ্চর্য্য এই ভব মায়াপুর॥
যে স্ত্রীর সঙ্গ হয়ে নরক-দুয়ার।
সেই স্ত্রীর লাগি লোক করে হাহাকার॥
মহামহোৎসব করি মঙ্গল আচরে।
শুদ্ধ অমঙ্গলে মঙ্গলাচরণ করে (ঙ)॥

পাঠান্তর—(ক) নিবাস—নিবাসী।
(খ) শাস্ত্রজ্ঞে—শাস্ত্রজ্ঞ।
(গ) প্রভুর যে নিকটস্থ শিবিকাতে বসি।
(ঘ) তবে—তবে।
(ঙ) শুদ্ধ যেই অমঙ্গলে মঙ্গল বিচারে।

স্ত্রী-সঙ্গে মহামত্ত আসক্ত হইয়া।
সংসারে ভ্রমিয়া বুলে কৃষ্ণ না ভজিয়া (ক)॥
একেলা আছিল পুন দুই জন হৈল।
সন্তান জন্মিয়া ক্রমে বাড়িতে লাগিল॥
ভরণ পোষণ হেতু নানা ব্যবসায়।
নানা দুঃখে ফিরিয়া তাহাতে কাল যায়॥
সুখের লাগিয়া ফিরে দুঃখে কাল যায়।
কভু অপমান কভু রাজদণ্ড হয়॥
ধনলোভে নানা পাপ সঞ্চয় করিয়া।
সংসার ভ্রময়ে আর নরক ভুঞ্জিয়া॥ †
এই দেখ বিভাহের এতেক উৎসাহ।
অর্থব্যয় করি কিনে মায়ার কলহ॥
লাগিল মায়ার ফাঁস তাহা না ভাবিয়া (খ)।
মঙ্গলাচরণ করে কৌতুক করিয়া॥
অমঙ্গলে শুভ জ্ঞান সদাই করিয়া।
উৎসাহ (গ) করয়ে জীব কৃতার্থ মানিঞা॥
কন্যা-সম্প্রদানকালে বরণ-অঙ্গুরী।
অঙ্গুলিতে পরাইয়া দেয় কর ধরি॥
অঙ্গুরী সে নহে মায়া-অধিকার ছাড়ি।
যায় পাছে দিল তার হাথে হাথকড়ি॥
বর-কন্যা করে দোঁহে মালা যে বদল।
মাল্য সেই নহে গলে দিল দৃঢ় জেল॥
শুভদৃষ্টি করে করি বস্ত্র আবরণ।
শুভ নহে সেই হয়ে পিশাচী ঈক্ষণ (ঘ)॥
হস্তে হস্ত সঁপে সেই মায়া-অধিকারি।
রাক্ষসী মহাসিল দিল নিজ অনুচরী॥

পাঠান্তর—(ক) কৃষ্ণ না ভজিয়া বুলে সংসার ভ্রমিয়া।
(খ) গলে ফাঁসি দিল মায়া তাহা না বুঝিয়া।
(গ) উৎসাহ—উৎসব।
(ঘ) ঈক্ষণ—সেইক্ষণ।

† বটতলার সংস্করণে—সুখের লাগিয়া...যায়। এই পঙ্‌ক্তি নাই। কিন্তু এখানে অতিরিক্ত এক পঙ্‌ক্তি আছে—কভু কৃষ্ণ নাহি ভজে মায়ার লাগিয়া।

মায়া নিজ অধিকার করিয়া জীবেরে।
নানা বাদ্যোদ্যম করি মঙ্গল আচরে॥
শিবিকায় বসি রামচন্দ্র সব শুনি।
ঘৃণায় ধিৎকার করে আপনা আপনি॥
পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র বিবেক জন্মিল।
ঘরে গেলা কিন্তু মনে উৎসাহ না হৈল॥
দুই তিন দিন পরে কারে না কহিয়া।
প্রভুর নিকটে গেলা মনে বিচারিয়া॥
কান্দিয়া শ্রীআচার্য্য যে প্রভুর চরণে।
পড়িয়া কহেন কিছু কাতর-বচনে॥
প্রভু মোরে কৃপা কর লইনু শরণ।
বিষয় কুসঙ্গে মোর জড়িত জীবন॥
অধম দুর্গতি মো দুঃশীল পাপাচার।
আমারে করহ দয়া ঘুষুক সংসার॥
এতেক কাকুতি তবে শুনি দয়াময়।
দয়া উপজিল তুলি লইল হৃদয়॥
প্রভু কহে চিন্তা নাহিঞ কৃষ্ণ কৃপাময়।
অবশ্য করিব দয়া নাহিক সংশয়॥
তবে প্রভু তার সহ আলাপ করিতে।
পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র বুঝিলেন চিতে॥
শাস্ত্রীয় বিচার প্রভু অনেক করিলা।
রামচন্দ্র তাহাতে সুপ্রতিপন্ন হৈলা॥
তুষ্ট হৈয়া প্রভু মনে করিলা বিচার।
যোগ্যপাত্র বটে ভক্তিশাস্ত্র পঢ়াবার॥
এতেক ভাবিয়া প্রভু প্রসন্ন হইয়া।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিলা শক্তি সঞ্চারিয়া॥
তৎক্ষণাৎ প্রেমানন্দে ভাসি মহাশয়।
ভাগবতশ্রেষ্ঠ হৈল মহান্ আশয়॥
প্রভু অতি প্রীত কৈলা নিজ আত্মা তুল্য।
রামচন্দ্র জানে যেন রতন অমূল্য॥
গুরুভক্ত এমন জগতে নাহি কোথা।
পরম আশ্চর্য্য তার শুন এক কথা॥
একদিন প্রভু রাত্রে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।
আঙ্গিনায় ফিরিতেছেন রামচন্দ্র সঙ্গে॥
এক যে খড়ের বড় আছে আঙ্গিনায়।
প্রভু কহে রামচন্দ্র সর্প বুঝি হয়॥
খড় বড় বলি রামচন্দ্র তা জানেন।
প্রভুর আজ্ঞায় তাহা সর্পই দেখেন॥
কহে বটে বটে প্রভু বড় সর্প হয়।
পুন প্রভু কহে নাহি খড় বড় হয়॥
সর্প ঘুচি পুন রামচন্দ্র দেখে বড়।
অর্জ্জুন যেমন পক্ষি-চক্ষে মারে শর॥
আর এক কহি শুন অপূর্ব্ব কথনে।
শ্রীরাধার কুণ্ডল খুঁজি দিলেন যেমনে॥
একদিন প্রভু বৈসেন স্মরণ মননে।
দেখে জলকেলি কৃষ্ণ করে গোপীসনে॥
আপনিহ নিত্য নিজ গোপীদেহে মেলি।
আনন্দে দেখয়ে রাধাকৃষ্ণ-জলকেলি॥
হেনকালে শ্রীমতীর কর্ণের কুণ্ডল।
খসিয়া পড়িল জলে হেরিয়া বিকল॥
আর আর সখীগণে খুঁজিয়া না পাইলা।
প্রভু তবে খুঁজিবারে যমুনা নাম্বিলা॥ (ক)
খুঁজিতে খুঁজিতে হেথা সপ্তরাত্রি গেলা।
বাহ্য নাহি একাসনে বসিয়া রহিলা॥
শ্রীমতী-গৌরাঙ্গ-প্রিয়া ঠাকুরাণী আদি।
কান্দিয়া আকুল চক্ষে (খ) বহে জল নদী॥
ভক্তবৃন্দ শতেক বীরহাম্বীর রাজন।
ব্যস্ত সমস্ত সভে করয়ে ক্রন্দন॥
সাত দিন-রাত্রি ধ্যান ভঙ্গ না হইলা।
সভে কণে প্রভু বুঝি লীলা সম্বরিলা॥
কান্দিয়া কহেন ঠাকুরাণী সভা-স্থানে।
প্রভুর অন্তর রামচন্দ্র ভাল জানে॥
অতি প্রিয়তম রামচন্দ্র কবিরাজ।
শীঘ্র তাঁহাকে ডাক নাহি কর ব্যাজ॥
এইকালে রামচন্দ্র আসি উপনীত।
তাঁহারে দেখিয়া সভে হৈলা হরষিত॥
তেঁহো কহে ব্যস্ত সভে হেতু কি ইহার।
সভে কহে প্রভুর আদ্যন্ত ব্যবহার॥

পাঠান্তর—(ক) খুঁজিবারে যমুনা নাম্বিলা—যমুনায় খুঁজিতে লাগিলা।
(খ) চক্ষে—বক্ষে।

রামচন্দ্র অষ্টাঙ্গ করিয়া প্রভু-পদে।
বুঝিয়া যে অন্তর্বৃত্তি ভাসয়ে আনন্দে॥
প্রভুর নিকটে বস্ত্র-আবৃত হইয়া।
ধ্যানস্থ হইলা বসি সমাধি করিয়া॥
দেখেন যে প্রভু তবে যমুনার জলে।
শ্রীমতীর কর্ণের কুণ্ডল খুঁজি বুলে॥
আপনিহ নিজ সিদ্ধ দেহ আরোপিয়া।
প্রভু-সখীরূপা-সঙ্গে বেড়ান খুঁজিয়া॥
খুঁজিতে খুঁজিতে এক পদ্মপত্র তলে।
পাইলেন সেই কৃষ্ণপ্রিয় যে (ক) কুণ্ডলে॥
দুই সখী কোলাকুলি পাইয়া আনন্দে।
পরাইলা গিয়া শ্রীমতীর গণ্ডচন্দ্রে॥
প্রসন্ন হইয়া প্যারী তাম্বুল-চর্ব্বিত।
দোঁহা-হস্তে দিলেন হইয়া আনন্দিত॥
চর্ব্বিত তাম্বুল সেই দোঁহে হস্তে ধরি।
এ দেহেতে স্ফূর্ত্তি হৈল চমৎকারকারী॥
বাহ্য হৈল দোঁহাকার তাম্বুল-সহিত।
চারিদিগে ভক্তবৃন্দ দেখি চমকিত॥
তাম্বুলের সৌরভেতে আমোদ করিল।
সকলেই প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইল॥
তাম্বুল বাঁটিয়া সভাকারে প্রভু দিল।
প্রসাদ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইল॥
ত্রিজগতে পরম দুর্ল্লভ যে অমৃত।
যে অমৃত লাগি ব্রহ্মা আদি ধরে ব্রত॥
শ্রীআচার্য্য প্রভু শুভ চরণ আশ্রয়।
অনায়াসে হৈল সভাকার শুভোদয়॥
অতএব শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ।
আচার্য্য-প্রভুর প্রিয় ভক্তরাজ রাজ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুরের উক্তি।
অপূর্ব্ব শুনহ এক সুসিদ্ধান্ত যুক্তি॥
রামচন্দ্র কবিরাজ গঙ্গাস্নানে যান।
স্নান পূজা করিয়া চলিয়া আইসেন॥
একত্র (খ) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেই গঙ্গাঘাটে।
স্নান করি শিবপূজা করে বসি তটে॥

পাঠান্তর—(ক) কৃষ্ণপ্রিয় যে—কৃষ্ণপ্রিয়ার।
(খ) একত্র—এত যে।

কবিরাজে তাঁহারা কহেন ক্রোধ মনে।
পূজা কর শিবপূজা নাহি কর কেনে॥
কবিরাজ কহেন শ্রীকৃষ্ণ বিনে আর।
কাহারে না পূজি এই হয়ে সদাচার॥
অনন্যভাগেতে (ক) কৃষ্ণ ভজিতে উচিত।
গীতা ভাগবতে ইহা আছয়ে বিদিত॥
তথাচ ব্রাহ্মণগণ মর্ম্ম না বুঝিয়া।
রুষ্টভাবে কহে পুন হাথ চালাইয়া॥
তোমার যে কৃষ্ণ শিব-আরাধনা করে।
শিব-আরাধনা নাহি করি সেব কারে॥
মহাত্মস্বভাব ব্রাহ্মণগণে হেরি।
কবিরাজ কহে কিছু যোড়হাথ করি॥
মহাশয় শুন কিছু নিবেদন করি।
আমি মূর্খ শাস্ত্র কিছু বিচারিতে নারি॥
স্বাভাবিক এক ক্রম দেখি বিচারিনু।
উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ জানি শরণ লইনু॥
এতেক কহিয়া চারি শ্লোক পাঠ কৈলা।
ব্রাহ্মণগণেরা শুনি মউন রহিলা॥

শ্লোকঃ

শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিতোঽপি শৈবঃ স্বয়ং
তথা সমতয়াস্তু বা (খ) বিধিহরাদিমূর্ত্তিত্রয়ম্।
বিলোক্য ভববেধসোঃ কিমপি ভক্তবর্গক্রমং
প্রণম্য শিরসা হি তৌ বয়মুপেন্দ্রদাস্যংশ্রিতাঃ॥ (গ)
প্রহ্লাদ-ধ্রুবরাবণানুজ-বলিব্যাসাম্বরীষাদয়-
স্তে বৈ বিষ্ণুপরায়ণা বিধি-ভব-প্রেষ্ঠা জগন্মঙ্গলাঃ।
যেঽন্যে রাবণবাণ-পৌণ্ড্রক-বৃকাঃ
ক্রৌঞ্চান্ধকাদ্যা অমী (ঘ)
যদ্ভক্তা (ঙ) ন চ তৎপ্রিয়া ন চ
হরেস্তস্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ॥

পাঠান্তর—(ক) অনন্যভাগেতে—অনন্যভাবেতে।
(খ) সমতয়াস্তু বা—সমতয়াথবা।
(গ) প্রণম্য শিরসাপি তান্ বয়মুপেন্দ্রদাসান্ শ্রিতাঃ।
(ঘ) অমী—অহো।
(ঙ) যদ্ভক্তা—যদ্ভক্তা।

অনুবাদ। শিব বিষ্ণুর উপাসক বা স্বয়ং বিষ্ণু শিবের উপাসক হউন অথবা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তি সমান হউন, কিন্তু শিব ও ব্রহ্মার ভক্তদের কি এক ক্রম দেখিয়া সেই শিব ও ব্রহ্মাকে নত মস্তকে প্রণাম করিয়া আমরা বিষ্ণুরেই দাস্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ, বলি, ব্যাস ও অম্বরীষ প্রভৃতি বিষ্ণুপরায়ণ, সুতরাং ব্রহ্মা ও শিবের প্রিয় এবং জগতের মঙ্গল স্বরূপ। কিন্তু রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক, বৃক, ক্রৌঞ্চ, অন্ধক প্রভৃতি ব্রহ্মা ও শিবের ভক্ত অথচ তাঁহাদেরও প্রিয় নহে, শ্রীহরিরও প্রিয় নহে। সুতরাং তাহারা জগতের শত্রু।

অস্যার্থঃ।

শিব বিষ্ণু ভজু কিংবা বিষ্ণু শৈব হন।
কিংবা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হন বা সমান॥
আমি নাহি জানি কিন্তু ঞিহা সভাকার।
ভক্তের যে ক্রম দেখি করিনু বিচার॥
বিষ্ণু ভজনীয় বলি লইনু শরণ।
ভক্তের যে ক্রম তার শুন বিবরণ॥
হরির ভকত ধ্রুব ব্যাস বিভীষণ।
প্রহ্লাদাম্বরীষ বলি আদি যত জন॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব সভাকার প্রিয়তম।
সর্ব্বদেবতার মান্য প্রিয়মাণ সম (ক)॥
সর্ব্বগুণালয় সর্ব্ব জন হিতকারী।
মঙ্গলস্বরূপ ভবসাগরের তরি॥
ব্রহ্মা শিব ভক্ত বাণ রাবণ পৌণ্ড্রক।
বৃকাসুর আদি করি নরক ক্রৌঞ্চক॥
কেহ যুদ্ধ চাহে নিজ ইষ্টদেব সনে।
কেহ নিজ বল হৈতে তুচ্ছ করি মানে॥
কেহ শিরে হস্ত দিয়া ভস্ম করিবারে।
ত্রিলোক ভ্রমায় নিজ ইষ্ট দেবতারে॥
কেহ তো কৈলাসপ্রভু হইতে (খ) চাহিল।
কেহ অনোচিত বাক্য গৌরীকে কহিল॥
কি আশ্চর্য্য যার ভক্ত তার নহে প্রিয়।
দমন করিলা বিষ্ণু করিয়া অসীয়॥
জগতের বৈরী সর্ব্বজন বিঘ্নকারী।
ইহা দেখি আশ্রয় করিনু মুঞি হরি॥

অতএব হরি বিনে না দেখি উপায়।
মুকতি যে দূরে থাকু তমো নাহি যায়॥
হরির ভকত মুক্তিপর্য্যন্ত না চাহে।
কেবল প্রভুর প্রেমানন্দে ভাসি রহে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

অনুবাদ।—যাঁহাদের মনে কামনা বাসনা নাই ও যাঁহারা আত্মানন্দে বিভোর, সেই মুনিরাও বিপুলবিক্রম শ্রীকৃষ্ণকে নিষ্কামভাবে ভক্তি করেন—শ্রীহরির এমনই গুণ!

রামচন্দ্র কবিরাজ গুণের সাগর।
রসিক ভকত যাঁহা সম নাহি আর॥
তাঁর শ্রীচরণপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
বড় আশা লালদাস আছয়ে করিয়া॥

চরিত্র শ্রীজগন্নাথী মাধবদাস

জগন্নাথী মাধবদাস কৃষ্ণ-অনুরাগে।
অর্থ দারা পুত্র গৃহ (ক) সকলি তেয়াগে॥
নীলগিরি ধামে সিন্ধুতীরে বাস কৈল।
একান্তী হইয়া (খ) সুখ বাঞ্ছা তেয়াগিল॥
ভিক্ষা নাহি করে অযাচক-বৃত্তি কৈল।
তিন দিন উপবাসে ঐমনি রহিল॥
দয়ালু শ্রীজগন্নাথ উৎকণ্ঠা হইয়া।
লক্ষ্মীরে পাঠায় প্রভু যতন করিয়া॥
রাত্রে শয়নের কালে সোণার থালীতে।
নিত্যানি লাগয়ে ভোগ আছে নিয়মিতে॥
সেই অন্ন-থাল হাথে ত্রৈলোক্যসুন্দরী।
গেলেন লইয়া মাধবদাসের কোঠরি॥
ঝলমল অঙ্গে নানা মণি-আভরণ।
ঝম্ ঝম্ শব্দ তাহে (গ) কর্ণ-রসায়ণ॥
বিদ্যুতের ন্যায় সাধু দেখি চমকিত।
থালী রাখি ঠাকুরাণী হৈলা অন্তর্হিত॥

পাঠান্তর- (ক) প্রিয়মাণ সম—প্রিয় প্রাণসম।
(খ) কৈলাসপ্রভু হইতে- কৈলাস সহ লইতে।

পাঠান্তর- (ক) গৃহ—সহ।
(খ) একান্তী হইয়া—ঐকান্তিক হৈয়া।
(গ) তাহে—অতি

ক্ষণেক ভাবিয়া সাধু স্থির কৈল মন।
বুঝিলাম ইহ (ক) জগন্নাথের করণ॥
স্বর্ণথালী প্রসাদ শ্রীলক্ষ্মী-ঠাকুরাণী।
আনিলেন কৃপা করি উপবাসী জানি॥
ভাবাবেশে সাধু মহাপ্রসাদ পাইয়া।
থালীখানি বাহিরেতে রাখিলা ধুইয়া॥
হোথা প্রাতঃকালে স্বর্ণথালী না পাইয়া।
পান্ডাগণ চতুর্দ্দিগে না পায় (খ) খুঁজিয়া॥
পরস্পর চোর বলি কলহ করিয়া।
মাধবদাসের স্থানে পাইল যাইয়া॥
এই চোর কেমতে আনিল চুরি করি।
ইহা কহি বান্ধি আনে বেত্রাঘাত করি॥
সাধু চুপ করি রহে কিছু না কহয়।
যতেক নিগ্রহ প্রভু (গ) পিঠ পাতি লয়॥
আদেশ করিলা প্রভু সেবকগণেরে।
উহারে যে মারিলে সে লাগিল আমারে॥
মোর পিঠ ফুলিয়া রহিল বেত্রাঘাতে।
থালী পাঠাইনু মুই অন্নের সহিতে॥
পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত কহিলা জগন্নাথ।
শুনি হাহাকার করি শিরে হানে হাথ॥
হেন প্রিয়পাত্রে যত নিগ্রহ করিনু।
জগন্নাথে বাজিল যে ইহা না জানিনু॥
পরিহার[1] করিল অনেক সাধু স্থানে।
নিন্দা আর স্তুতি তাঁর (ঘ) একুই সমানে॥
সেই হৈতে মাধবদাসের যে প্রভাব।
প্রকাশ হইল কৈল লোকে অনুভব॥
মাধবদাসের পীড়া হৈল আমাশয়।
বালুর উপর গিয়া পড়িয়া রহয়॥
জল আনিবারে শক্তি নাহিক শরীরে।
জগন্নাথ দেখি দুঃখ হইল অন্তরে॥

ছদ্মরূপে জলপাত্র লইলা আপনি।
জল উঠাইয়া দেন দয়াল গুণমণি॥
মাধব কহেন তুমি কে বট আপনি।
কাঙ্গালেরে এত দয়া কিবা স্বার্থ মানি (ক)॥
তেঁহো কহে অন্য নহে মুঞি জগন্নাথ।
দুঃখ দেখি আইনু তব ধোয়াইতে হাথ॥
মাধব কহেন তব এ তো অনোচিত।
হেন কর্ম্ম কেনে কর যাহাতে অনীত॥
রত্নসিংহাসনে বৈস দেব-নরে সেবে।
কত রাজা দ্বারে খাড়া রহে ভৃত্যভাবে॥
আমি নীচ কাঙ্গাল যে আমারে সেবিতে।
কেমতে আইলা নিজ ঈশ খোয়াইতে॥
লোকে শুনি পরিহাস ইহাতে করিবে।
লক্ষ্মী ঠাকুরাণী যে এখনি লজ্জা দিবে॥
জগন্নাথ কহে নিন্দা লজ্জা হয় হব।
তথাপি তোমার দুঃখ দেখিতে নারিব॥
সাধু কহে নিন্দা কেন স্বীকার করহ।
পীড়াই আমার নহে ভাল করি দেহ॥
পীড়াশান্তি সাধুর যে তাৎপর্য্য নহে।
পাছে জগন্নাথে কেহ নিন্দাবাক্য কহে॥
এই ভয়ে (খ) সাধুর প্রেমের রীত হয়।
শুদ্ধ মাধুর্য্য তার নিষ্কাম ভাবাশয়॥
পুরীর ভিতরে এক দিন মাধোদাস।
রাত্রিযোগে রহে শীতকাল মাঘ মাস॥
শীত লাগে বুঝিয়া (গ) স্নেহেতে জগন্নাথ।
অঙ্গ হৈতে উড়াইয়া দিল সকলাত॥
প্রাতঃকালে দেখে সভে মাধবের গায়।
সকলাত বহুমুল্য শ্রীঅঙ্গের হয়॥
বুঝিল সভাই জগন্নাথ পরাইল।
ভয়ে পান্ডাগণ কেহো কিছু না কহিল॥
উঠিয়া দেখয়ে গায় অপূর্ব্ব বসন।
টানমারি ফেলিলা না কৈলা বস্তুজ্ঞান॥

পাঠান্তর—(ক) বুঝিলাম ইহ—মনেতে বুঝিলা।
(খ) না পায়—বেড়ায়।
(গ) প্রভু—করে।
(ঘ) তাঁর—যাঁর।

১। পরিহার—ক্ষমাপ্রার্থনা।

পাঠান্তর—(ক) মানি—জানি।
(খ) ভয়ে—ভাব।
(গ) বুঝিয়া—দেখিয়া।

যদি বল কেহ অপ্রাকৃত সে বসন।
টানমারি ফেলি দিলা হইল কেমন॥
শুদ্ধ মাধুর্য্য ভাব প্রেমাকারাকার।
হেন দশা যার সে বিচার কোথা তার॥
মাধোদাস জগন্নাথে শুদ্ধ সখ্যভাব।
সমতা কৌতুক সদা যাথে অনুভাব॥
একদিন বড়ই কৌতুক হৈল শুন।
জগন্নাথ মাধোদাসে কহে পুনঃপুন॥
সত্যবাদী গোপালের বাগে চল যাই।
চুরি করি দুজনে কাঁঠাল গিয়া খাই॥
মাধব কহেন ভাই আমি তো না যাব।
যাইতে হয় তুমি যাহ মানা না করিব॥
স্বাভাবিক স্বভাব মাধব সাধুত্তম।
উহাঁরে আইসে বহু রকম সকম॥
মাধব একান্ত নাহি যাইতে চাহিলা।
চল চল বলি তাঁরে ধরি নিয়া গেলা (ক)॥
সলাপ মারিয়া দোঁহে বাগিচাতে গেলা।
বড় এক সুপক্ব কাঁঠাল নাম্বাইলা॥
খাইবার উদ্যোগ করিতে দুই জনে।
চোর আইল বাগানে জানিল মালিগণে॥
ধর ধর করি (খ) সভে ছুটিয়া চলিল।
তাহা শুনি জগন্নাথ আগে পলাইল॥
মাধব উদার রীত বসিয়া রহিলা।
তাঁরে গিয়া মালিগণ ধরিয়া বান্ধিলা॥
মালিগণ তাঁহার মহিমা নাহি জানে।
কাঁঠাল সহিত তাঁরে পাকড়িয়া (গ) আনে॥
তেঁহো কহে মুঞি চোর কভু নহি ভাই।
চোর যে তাঁহারে চল দেখাইয়া দেই (ঘ)॥
জগন্নাথ জোরাবরি (ঙ) আনিল আমারে।
দেখাইয়া দেই চল বান্ধি আন তাঁরে॥

সঙ্গেতে আনিয়া মোরে শঠতা করিয়া।
আপনি পলায়্যা (ক) গেল মোরে বান্ধাইয়া॥
ধৃষ্ট শঠের কর্ম্ম দেখ দেখি ভাই।
আপনি হইল সাধু আমারে বান্ধাই॥
দেখাইয়া দেই চল আনহ বান্ধিয়া।
কাঁঠালের দাম লহ তাঁহারে ধরিয়া॥
প্রতীত না হয় যদি তবে দেখসিয়া।
পলাইতে তাঁর বস্ত্র রহিল পড়িয়া॥
কাঁটাঝোড়ে পীতাম্বর বসন পাইবে।
জগন্নাথ চোর কিনা প্রতীত হইবে॥
মালিগণ কহে এ কি প্রলাপ কহয়।
চুরি করি চোর জগন্নাথেরে দেখায়॥
প্রাতে পাণ্ডাগণ সব আসিয়া দেখিয়া।
হাহাকার করি দিলা বন্ধন খুলিয়া॥
সাধুস্থানে পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত শুনিঞা।
চমকিত হৈলা সভে আশ্চর্য্য মানিঞা॥
শ্রীঅঙ্গের উত্তরীয় বস্ত্র কিছু দূরে।
পড়ি গেলা পলাইয়া যাইতে সত্বরে॥
উঠাইয়া নিঞা আসি পুলক-অন্তরে।
অনেক কাঁঠাল নারিকেল ভারে ভারে॥
পাঠাইয়া দিলা জগন্নাথের নিকটে।
তৎক্ষণাত এ কৌতুক গ্রামে গ্রামে রটে॥
ক্রোধান্বিতে হইয়া মাধব শীঘ্র (খ) গিয়া।
জগন্নাথে কহে বহু ভর্ৎসনা করিয়া॥
হাঁরে চোরা ধৃষ্ট দুষ্ট শঠ লম্পটিয়া।
তুঞি চুরি করি আইলি মোরে বান্ধাইয়া॥
চোরা যে স্বভাব তোর আছে পূর্ব্ব হৈতে।
ননীচোর বলি খ্যাতি (গ) আছয়ে জগতে॥
নারীচোর মনচোর প্রসিদ্ধ যে হয়।
কাঁঠাল-তস্কর বলি আর হৈল তায়॥
হায় হায় কি সহজ সুমাধুর্য্য ভাব।
গাঢ় প্রেম যথা তথা এই মিষ্ট স্তব॥

পাঠান্তর—(ক) তাঁরে ধরি নিয়া গেলা—তাঁর হাত ধরি নিলা।
(খ) করি—বলি।
(গ) পাকড়িয়া—বান্ধিয়া যে।
(ঘ) চোর যেই চল তুই তাহারে দেখাই।
(ঙ) জোরাবরি—জোর করি।

পাঠান্তর—(ক)—পলায়্যা—ভাগিয়া।
(খ) হইয়া মাধব শীঘ্র—হৈয়া মাধব শীঘ্রগতি
(গ) খ্যাতি—খ্যাত।

গালি নহে সেই বেদস্তুতি হৈতে শ্রেষ্ঠ।
বেদস্তুতি আপনারে মানয়ে কনিষ্ঠ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যথা—

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥"
এতেক ভর্ৎসন শুনি হাসে জগন্নাথ।
আনন্দে মগন হরি উল্লসিত গাত॥
কথোক দিবস পরে মনে কিছু হৈল।
বৃন্দাবন-দরশনে উৎকণ্ঠা জন্মিল॥
শ্রীমন্ জগন্নাথ-আজ্ঞা লইয়া চলিলা।
পথে নির্জ্জশিষ্য এক স্ত্রীর গৃহে গেলা॥
ভক্তিপূর্ব্বক নারী বহু সেবা কৈলা।
পরে তথা হৈতে উঠি গমন করিলা॥
জগন্নাথ সুকুমার চলে সাধুসনে।
পাছে পাছে চলে সদা তেঁহো নাহি জানে॥
উঠিয়া যাওন (ক) কালে নারী তা দেখিল।
অপূর্ব্ব বালক দেখি চমৎকার হৈল॥
গুরুকে পুছয়ে আহা হেন সুকুমার।
কোথা হৈতে আনিলে এ ছাওয়াল (খ) কাহার॥
আহা মরি হেন রূপ হেন সুকুমার।
হাঁটাইয়া কেমনে আনিলে সমিভব্যার॥
মাধব শুনিয়া কিছু চমকিত হৈলা।
অন্তরে বুঝিয়া কিছু বাক্য না কহিলা॥
চলিলেন পথে লৈতে লৈতে কৃষ্ণনাম (গ)।
কথোদিনে উত্তরিলা বৃন্দাবন ধাম॥
বৃন্দাবন দরশনে ভাসে প্রেমানন্দে।
হাসে গায় নাচে সাধু ভূমে পড়ি কান্দে॥
সর্ব্বলীলাস্থান মদনমোহন গোবিন্দ।
দরশন করিয়া বাড়য়ে প্রেমানন্দ॥
শ্রীল নিধুবনে শ্রীমান্ বঙ্কবিহারী।
হেরিয়া মোহিত হৈল রূপের মাধুরী॥
বিরক্ত শ্রীস্বামি হরিদাস সেবা করে।
কত বা প্রণয় আর কত বা আদরে॥
হেরিয়া মাধব দাস চমকিত হৈলা।
প্রেমানন্দে মগ্ন সাধু নাচিতে লাগিলা॥
কথোক্ষণ নৃত্য-গীত-আদি তথা করি।
যমুনার তীরে গেলা প্রেমাব্ধি সম্বরি॥
কিছুই না (ক) মিলে সাধু রহে উপবাসী।
পরদিন যমুনার তীরে আছে বসি॥
কথোগুলি চানাভাজা কেহ আনি দিলা।
বঙ্কবিহারীকে তাহা ভোগ লাগাইলা॥
প্রসাদ পাইয়া তাঁহা (খ) বসিয়া আছেন।
কৃষ্ণনাম উচ্চস্বরে গান করিছেন॥
হেথা নিধুবনে বঙ্কবিহারীর ভোগ।
স্বামী হরিদাস কৈল নানা উপযোগ॥
মিষ্টান্ন পক্বান্ন নানা ব্যঞ্জনাদি কত।
দশদণ্ড মধ্যেতে প্রস্তুত হৈল যত॥
সম্মুখে বিহারী জীর ধরিলেন আনি।
দুয়ার মুদিয়া দিলা যেমন নিৰ্ব্বাণি॥
নিয়মিত দুই দণ্ড ভোজন করেন।
তবে দ্বার খুলি দিয়া আচমনী দেন॥
ভোজন করিলে পরে শ্রীহস্ত-পরশে।
পরিপূর্ণ হয় পুন সভাই দরশে॥
কিন্তু নিতি (গ) ভোজনের চিহ্ন কিছু থাকে।
আর কেহ নাহি বুঝে স্বামী মাত্র দেখে॥
সে দিন না দেখি তাহা মনে হৈল দ্বিধা।
বড়ই উদ্বিগ্ন চিত্তে জন্মিল বাধা॥
করযোড় করিয়া বিহারী-জীর আগে।
পুছেন শ্রীহরিদাস অতি অনুরাগে॥
কেনে আজি নাহি খাও, কি বিঘ্ন হইল।
বিহারী কহেন মোর ক্ষুধা না জন্মিল॥
জগন্নাথী মাধোদাস যমুনার তীরে।
খাওয়াইলা চানাভাজা অপূর্ব্ব আমারে॥

পাঠান্তর—(ক) যাওন—যাওয়ার।
(খ) ছাওয়াল—সন্তান।
(গ) চলিয়া গেলেন পথে লয়ে কৃষ্ণনাম।

পাঠান্তর—(ক) কিছুই না—কিছু নাই।
(খ) তাঁহা—তথা।
(গ) নিতি—নিজ।

তাহাতে ভরিল পেট ক্ষুধা নাহি লেশ।
উদরস্পন্দন তাথে হইল বিশেষ॥
এতো শুনি স্বামী তবে মুচকি হাসিলা।
বাহিরে আইলা আর কিছু না কহিলা॥
হরিষ বিষাদ দুই মনে উপজিল।
না খাইল বলি তাহে বিষাদ জন্মিল॥
হর্ষ হৈল দেখিতে কেমন ভক্ত সেই।
চানা খাওয়াইয়া তৃপ্তি জন্মাইল যেই॥
অন্তরে আনন্দ বাড়ে বাহ্যে ক্রোধ ন্যায় (ক)।
চেলাগণে স্বামী তবে ডাকিয়া কহয়॥
ধীর-সমীরে মাধবদাস যে কে বটে।
ধেয়ান করয়ে বসি যমুনার তটে॥
শীঘ্র আনহ তারে বিহারী কহিলা।
চানা খাওয়াইয়া তেঁহো পেট ফুলাইলা॥
এতো শুনি চেলাগণ ধাইয়া চলয়।
সাধুরে যাইয়া সভে (খ) ঘিরিয়া পুছয়॥
জগন্নাথী মাধোদাস কার নাম হয়।
তেঁহো কহে মাধোদাস মুঞি হয় হয়॥
চেলাগণে কহে তবে এখনি উঠহ।
আজ্ঞা শ্রীবিহারী-জীর শীঘ্র চলহ॥
এতেক শুনিঞা সাধু আনন্দিত হিয়া।
পুলক হইল অঙ্গ চলিল ধাইয়া॥
নিধুবন গিয়া হেরি মধুর মুরতি।
প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসয়ে মহামতি॥
হরিদাস স্বামী বহু সম্মান করিয়া।
বসাইলা সম্মুখেতে আনন্দিত হিয়া॥
অনিমিখে আপাদমস্তক নিরখয়।
এই যে মহানুভব ঞেহার হৃদয়॥
কৃষ্ণ নিরন্তর বাস করেন নিতান্ত।
কৃষ্ণ বশীভূত হন ঞেহার একান্ত॥
এতেক ভাবিয়া সাধু মুচকি (গ) হাসিয়া।
কহেন শ্রীমাধোদাসে শেলেষ (ঘ) করিয়া॥

পাঠান্তর—(ক) অন্তরে আনন্দ বাহোতে ক্রোধের ন্যায়।
(খ) সভে—তবে।
(গ) মুচকি—চমকি।
(ঘ) শেলেষ—বিশেষ।

চানা খাওয়াইয়া তুমি পেটু ফুলাইলে।
মিষ্টান্ন পক্কান্ন কিছু খাইতে না দিলে॥
পীড়া জন্মাইলা দেহে উদ্গার উঠিছে।
অই দেখ মিষ্টান্নাদি পড়িয়া রহিছে॥
সেই চনা-ভাজাতে বা না জানি কতেক।
আস্বাদ আছিলা যাতে পিরীতি এতেক॥
তোমার গুণেতে চনা অমৃত হইল।
এতেক মিষ্টান্ন দ্রব্য যে হেতু তেজিল॥
শুনিতে শুনিতে তবে শ্রীমাধব দাসে।
ফ্যাল ফ্যাল করি চাহে অদভুত রসে॥
একবার চাহে শ্রীবিহারি-জীর পানে।
আরবার নিরখয়ে স্বামিজী-বদনে॥
চনা ভোগ দিল প্রাতে স্মরণ হইল।
সেই অনুসারে সাধু চিন্তিতে লাগিল॥
বুঝিলা যে সেই চনা খাইয়া বিহারী।
প্রকাশ করিয়া (ক) কহে হৈল পেট ভারি॥
শুনিঞা কাহিনী সাধু মূর্চ্ছাগত হৈল।
আপনারে ধিৎকার যে করিতে লাগিল॥
ধিক্ ধিক্ মোরে হেন কমল-বদনে।
চনা খাওয়াইনু কিছু দয়া নৈল মনে॥
ক্ষীর সর ননী যেই মুখে না রোচয়।
সে বদনে চনা খাওয়াইতে কি জুয়ায়॥
দর দর ধারা বহি পড়ে দুনয়ানে।
হরিদাস ঠাকুর প্রশংসেন মনে মনে॥
এই যে মহান্ত ঞিহো বড় অধিকারী।
ঞিহার সমান নাহি দেখি জগভরি॥
পুলক হইয়া স্বামী (খ) আলিঙ্গন করি।
দোঁহে প্রেমানন্দে কান্দে দোঁহ কণ্ঠ ধরি॥
তবে স্বামী তাঁরে রাখি দিন দুই তিন।
কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠী করে রাত্রি দিন॥
শ্রীমান্ মাধব দাস তথা হৈতে গিয়া।
শ্রীমন্-ভাণ্ডীর বট দর্শন করিয়া॥
ভাণ্ডীর বনেতে এক উচ্চ টিলা হয়।
তাহার উপরে ঘর দ্বারাদি আছয়॥

পাঠান্তর—(ক) করিয়া—করিলা।
(খ) স্বামী—সাধু।

তথায় আছয়ে এক ব্রহ্মচারী বেশে।
নিকৃষ্ট স্বভাব নাহি জানে ভক্তিলেশে॥
তণ্ডুল গোধূম ঘৃত গুড় চিনি আদি।
ঘরভরা আছয়ে যেমন রাখে মুদি॥
অতিথি বৈষ্ণবে এক রতি নাহি দেয়।
চাহিলে মারিতে ধায় আপনি না খায়॥
দড়ির শিকলি সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া।
উপর হইতে পুন উঠায় টানিঞা॥
সেই টিলা তলে সাধু রহিলা পড়িয়া।
কৃষ্ণনামপ্রেমরসে পুলকিত হিয়া॥
উপর হইতে সেই ব্যক্তি ফুকারয়।
কেরে বেটা উঠিয়া যা না রহ হেথায়॥
পুনঃপুন যদি গালি পাড়িতে লাগিলা।
সর্ব্বজ্ঞ মাধব তার স্বভাব বুঝিলা॥
সাধুর স্বভাব হয় দয়ার সাগর।
প্রতিজ্ঞা একান্ত যার পর উপকার॥
মনেতে চিন্তিলা এই মূঢ় অভাজন।
ইহার মঙ্গল কিছু করিব সৃজন॥
এতো ভাবি হঠাৎকার চঢ়িলা উপরে।
দেখে নানা সামগ্রী আছয়ে থরে থরে॥
তারে প্রীতবাক্যে (ক) সাধু বুঝাইতে চাহে।
নাহি শুনে তাহা গালি পাড়ি (খ) যাইতে কহে॥
দেখিলেন সাধু পাত্র নহে বুঝাবার।
বিচারিলা আর কিছু উপায় তাহার॥
টিলা হৈতে নাম্বিয়া চলিলা মহাশয়।
যতেক সামগ্রী তার ঘরেতে আছয়॥
কীড়াময় হইল সব ব্যাপে ঘরদ্বার।
হেরিয়া কান্দয়ে সেই করিয়া ফুৎকার (গ)॥
ধাইয়া যাইয়া পড়ে সাধুর চরণে।
মহাশয় মোর সর্ব্বনাশ কৈলে কেনে॥
খাইতে আমার ঘরে কিছু না পাইলে।
বুঝি সেই কোপে সব কীড়া পাড়াইলে॥

আইস ফিরিয়া (ক) পুন ভাল করাসয়ে।
অর্দ্ধেক তোমায় দিব কহিনু নিশ্চয়ে॥
মহাশয় শুনি তাহা মুচকি হাসয়।
বিনয় করিয়া পুন তাহাকে কহয় (খ)॥
ভাল হবে তবে যদি শুন মোর কথা।
তেঁহো কহে অবশ্য যে নাহিক অন্যথা॥
সাধু কহে তুমি নিজে হও একামাত্র।
নাহি তব পিতা মাতা নাহি কন্যা পুত্র॥
সঞ্চয় করহ তুমি কাহার লাগিয়া।
অতিথি বৈষ্ণবে কেন না দাও বাঁটিয়া॥
বৃথা কেনে কালক্ষেপ বসিয়া করহ।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ কেনে নাহিক ভজহ॥
সাংখ্য আধ্যাত্মিক যোগ-আদি শুনাইলা।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনতত্ত্ব পশ্চাতে কহিলা॥
প্রথম বৈরাগ্য জন্মাইয়া ভক্তিতত্ত্ব।
পশ্চাত কহিলা যাতে পরম মহত্ত্ব॥
যদ্যপি বৈরাগ্য ভক্তি-অঙ্গ নাহি হয়।
তথাপিহ ঈষত (গ) উপযোগিতা সহায়॥
যে হেতুক প্রথম বৈরাগ্য জন্মাইলা।
পশ্চাত শ্রীকৃষ্ণভক্তি হৃদয়ে পশিলা (ঘ)॥
শুনিতে শুনিতে তার মন ফিরি গেল।
সাধুসঙ্গ কল্পবৃক্ষ তৎক্ষণে ফলিল॥
সেইক্ষণে জন্মিল শ্রীকৃষ্ণ-অনুরাগ।
তদ্‌গত মানস (ঙ) হৈল সব করি ত্যাগ॥
মহাজন যে কহিল ইহার প্রমাণ।
তাহা কহি শুন ইথে কর অবধান (চ)॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবামাত্র (ছ) সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

পাঠান্তর—(ক) প্রীতবাক্যে—হিতবাক্য।
(খ) পাড়ি—পাড়ে।
(গ) ফুৎকার—ফুকার।

পাঠান্তর—(ক) আইস ফিরিয়া—আইস আইস।
(খ) মুচকি হাসিয়া।
কহে তার প্রতি অতি বিনয় করিয়া॥
(গ) ঈষত—শত।
(ঘ) পশিলা—প্রেরিলা।
(ঙ) তদ্‌গত মানস—গদ্‌গদ মন।
(চ) অবধান—অনুমান।
(ছ) লবামাত্র—লবমাত্র।

তবে শ্রীমাধবদাস (ক) শ্রীবৃন্দাবন (খ)।
পুন চলে নীলাচলচন্দ্রের চরণ॥
কথোক দূরেতে তার আছে এক শিষ্য।
কৃষ্ণ-পরায়ণ সেই পরমরহস্য॥
সেই গ্রামে গিয়া পরম্পরা লোক দ্বারে।
শুনিয়া তাহার যশ আনন্দ অন্তরে॥
শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবানন্দে কাল যায়।
রাত্রে সব বৈষ্ণব (গ) গিয়া তথাই মিলয়॥
হরি-সংকীর্ত্তন নৃত্যগীত গ্রন্থপাঠে।
প্রতিদিন এইমত করি নিশি কাটে॥
এতেক শুনিঞা সাধু তাহা দেখিবারে।
উৎসাহ হইল কিন্তু মনেতে বিচারে॥
প্রকাশ রূপেতে গেলে আমারে লইয়া।
উৎসব করিবে নানা সে সব ছাড়িয়া॥
অতএব মুঞি কোন ছন্নভাব করি।
যাইয়া তাহার গৃহে সে আনন্দ হেরি॥
এতেক ভাবিয়া সাধু গেলা সন্ধ্যা-অন্তে।
সে সময় সংকীর্ত্তন করে সব সন্তে (ঘ)॥
কিছু দূরে আঙ্গিনাতে বসি মহাশয়।
কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন-রঙ্গ আনন্দে শুনয়॥
সে সব সুরঙ্গ দেখি লোভ জনমিল।
প্রতিদিন শুনিবার উপায় সৃজিল॥
সংকীর্ত্তন বিরামেতে বিশ্রামের কালে।
নিজ সেই শিষ্যস্থানে গিয়া কিছু বলে॥
কাঙ্গাল হও যে মুঞি কেহ মোর নাঞি।
পেটের নিমিত্ত মাত্র ফিরিয়া বেড়াই॥
আপনে যদ্যপি রাখ তবে থাকি হেথা।
কিছুই না চাহি মাত্র চাহি পেটভাতা॥
গরুর সেবায় মোরে নিযুক্ত করহ।
অনুগ্রহ করি মোরে যদ্যপি রাখহ॥
তেঁহো কহে ভাল ভাল তবেতো থাকহ।
কেবল যে পেটভাতে যদ্যপিহ রহ॥

তবে তারে গো-সেবায় অন্য যে মহলে।
নিযুক্ত করিয়া তবে রাখে কুতূহলে॥
মহা-অনুভব সিদ্ধ শ্রীমাধব দাস।
ছন্নরূপে শিষ্যগৃহে করি (ক) অপ্রকাশ॥
রহিলেন ভক্তিরঙ্গ দেখিবার আশে।
যাহা শুনি সাধুগণের হৃদয় উল্লাসে॥
হাহা কিবা আর্ত্তি তার বলিহারি যাই।
না জানি বা কৃষ্ণ-রস কেমনি বা সেই॥
তাঁহার যে শিষ্য সেই কেমনি বা হয়।
যাহার সদ্‌গুণেতে মজিলা মহাশয়॥
মো-সভার সে গুণের বিন্দু না স্পর্শিল।
ধিৎকার এ দেহ কোন্ বিধি সিরজিল (খ)॥
হায় হায় ধিক্ ধিক্ ছিছি থুথু থুথু।
আমা হেন মহাপাতকীর মুখে গু (গ)॥
বরঞ্চ যে পশুজন্ম আমা হৈতে ভাল।
কে মোর পাষাণ দিয়া হিয়া নিরমিল॥
পশু যে অজ্ঞান কিন্তু অপরাধহীন।
কৃষ্ণনাম শুনি বস্তুশক্ত্যে হয় ত্রাণ॥
অপরাধী জানিঞা যে মো-হেন পশুরে।
প্রেমদান দূরে বহু সংসার না তরে (ঘ)॥
কিছু না বুঝিনু ভক্তিমর্ম্ম না জানিনু।
হেন যে সুধার সিন্ধু কণা না স্পর্শিনু॥
কেমন কঠিন করি কেমন বিধাতা।
নিরমিল এই দেহ সৃষ্টির অন্যথা॥
ইহার উপায় নাহি দেখি ত্রিভুবনে।
এক দয়াময় মাত্র শ্রীচৈতন্য বিনে॥
তাঁহার অভয় পদ করিলাম সার।
তেঁহো বিনে নাহি দেখি এ দুঃখের পার॥
তেঁহো কি করিবে দয়া হেরি মুঞি ছার।
যে করুন তাঁহার চরণে দিনু ভার॥
ভরসা করিনু তাঁর যে করে বিচার।
হইবে কপালে তবে যে থাকে আমার॥

পাঠান্তর—(ক) শ্রীমাধবদাস—সে মাধবদাস।
(খ) শ্রীবৃন্দাবন—ভ্রমি বৃন্দাবন।
(গ) সব বৈষ্ণব—সর্ব্বজন।
(ঘ) সন্তে—শান্তে।

পাঠান্তর—(ক) করি—রহে।
(খ) বিধি সিরজিল—বিধাতা সৃজিল।
(গ) আমা হেন পাতকীর মুখে পড়ুক গু।
(ঘ) তরে—তারে।

তবে শ্রীমাধব দাস গো-সেবার ছলে।
একমাস রহি সেই কৌতুক (ক) নেহালে॥
আর এক শিষ্য তথা আইল মাধবের।
দুই পরমার্থ ভাই মিলে বের বের (খ)॥
দুই তিন দিন সাধু রহি তাঁর ঘরে।
একদিন গেলা সাধু গোহাল-দুয়ারে॥
দেখে গিয়া এক ব্যক্তি মুদ্রিত নয়ান।
দর দর ধারা চক্ষে করয়ে ধেয়ান॥
কৃশাঙ্গ মলিন যেন কাঙ্গালের প্রায়।
অন্ধকার গোহালেতে বসিয়া ধেয়ায়॥
বিস্ময় হইয়া তথা পুছে কোন লোকে।
সে কহয়ে হেথায় রাখাল মিন্‌সা থাকে (গ)॥
মনে ভাবে রাখালের হেন কি চরিত্র।
বাহ্য নাহি প্রেমজলে পূরিত দুনেত্র॥
ঘনাইয়া ধীরে ধীরে নিকটে যাইয়া।
মুখে নাহি সরে বাণী আকৃতি দেখিয়া॥
নিজ গুরু শ্রীমাধব দাসের আকৃতি।
যেমন আকৃতি দেখে তেমন প্রকৃতি॥
অথচ রাখাল হেথা আছে গো-সেবায়।
বড়ই হইল ভ্রম স্থির নাহি হয়॥
তটস্থ হইয়া গিয়া কহয়ে ভায়েরে।
হের আইস দেখ দেখি কে গোহালি-ঘরে॥
তেঁহো কহে কহ বেটা দেখিলে কাহারে।
বড় যে চঞ্চল তুমি কি হেতু কহ মোরে (ঘ)॥
তেঁহো কহে ভাল তাহা কহিব পশ্চাতে।
আগে নিরীখহ আসি গোহালি-ঘরেতে॥
চমকিত হইয়া ধাইয়া তথা গেল।
দেখিয়া তাহারে গিয়া কাষ্ঠবত হৈল॥
মুখে নাহি সরে বাণী মনে ধকধকি।
গুরু যে আমার একি চমৎকার দেখি॥

গোলমাল দেখি সব লোক জমা হৈল।
পরস্পর কি কি বলি ফুকার পড়িল॥
তবে সাধু নিজ গুরু শ্রীমাধব দাস।
জানিঞা কহয়ে হা হা একি সর্ব্বনাশ॥
ছন্নরূপে কেনে হেন করিলে এ কর্ম্ম।
ইহার কারণ কিছু নাহি জানি (ক) মর্ম্ম॥
এতো কহি মহাশয়ের চরণ ধরিয়া।
দাবিতেই বাহ্য হৈল চাহে চমকিয়া॥
দেখে শিষ্যগণ কাছে বহু জনরব।
লজ্জিত হইলা সাধু মুখে নাহি রব॥
শিষ্য চরণেতে পড়ি অষ্টাঙ্গ হইয়া।
কান্দে উচ্চনাদ করি ভূমে গড়ি দিয়া॥
কেনে প্রভু এতো বিড়ম্বন কৈলে মোরে।
হেনকর্ম্ম কেনে কৈলে কি তব অন্তরে॥
যদি ভৃত্য অপরাধী হয় শ্রীচরণে।
দন্ড করি তবে কেনে না কৈলে শোধনে (খ)॥
অপরাধ ক্ষম প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হের।
ঘরে আইস তবে শ্রীচরণ ধৌত কর॥
তবে উঠি মহাশয় হৃদয়েতে ধরি।
অঙ্গে হস্ত বুলায় নয়ানে বহে বারি॥
তব অপরাধ নাহি না করিহ খেদ।
ইহার কারণ শুন তবে কহি ভেদ॥
তুমি মোর অতিপ্রিয় গুণের সাগর।
ভুবনে নাহিক দেখি সমান তোমার॥
তোমার যে ভক্তিরস-রঙ্গ দেখিবারে।
ছাপাইয়া আসিয়া রহিনু তব ঘরে॥
আমারে দেখিলে তুমি কুণ্ঠিত হইবে।
রসভঙ্গ হবে হেতু রহি ছন্নভাবে (গ)॥
তবে সাধু ঘরে লইয়া শুশ্রূষা করিয়া।
প্রেমানন্দে মগ্ন হৈল নিজ পাসরিয়া॥
মহামহোৎসব কৈল মঙ্গলাচরণ।
যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় কথন॥

পাঠান্তর—(ক) কৌতুক—কৌতুকে।
(খ) বের বের—দেয় বের।
(গ) সে কহয়ে রাখাল এখানে এক থাকে।
(ঘ) বড়ই চঞ্চল কি হেতুক কহ মোরে এবং বড় যে চঞ্চল দেখি কিন্তু কহ মোরে।

পাঠান্তর—(ক) নাহি জানি—না বুঝিনু।
(খ) শোধনে—শাসনে।
(গ) ছন্নভাবে—ছদ্ম ভাবে।

কথোক দিবস সাধু থাকিয়া তথায়।
চলিলেন জগন্নাথ ধরিয়া হৃদয়॥
কথোক দূরেতে আর এক শিষ্য হয়।
বণিক সে জাত্যাংশে বাণিজ্য ব্যবসায়॥
বণিক শ্রীপুরুষোত্তম যবে গিয়াছিল।
মোর গৃহে যাবে বলি প্রার্থনা করিল॥
তাথে অঙ্গীকার কৈল সেই অনুসারে।
বণিকের গৃহে গেলা কৃপা করি তারে॥
গৃহে গিয়া দেখেন বণিক নাহি ঘরে।
তাঁর স্ত্রী সম্মান করিলা সাধুবরে॥
পদ ধোয়াইয়া দিলা বসিতে আসন।
ব্যস্তসমস্ত হৈলা ভোজন-কারণ॥
এক বিপ্র অন্তরঙ্গ কোঠরি (ক) উপরে।
পাকের উদ্যোগে আছে (খ) আপনার তরে॥
স্ত্রী গিয়া বিনয় করিয়া বিপ্রে কহে।
অতিথি বৈষ্ণব এক আইলা মোর (গ) গৃহে॥
এক মুষ্টি তণ্ডুল দিই তোমার হাণ্ডিতে।
দুজনার হবে তাঁরে না হবে রান্ধিতে॥
এতেক কহিতে বিপ্র রাগত হইয়া।
কহেন তোমার হেন কে আছে রসুয়্যা॥
আমি তো নারিব তুমি তাহারে রান্ধাও।
নহে চাহ এ সব সামগ্রী নিঞা যাও॥
তাহা শুনি স্ত্রী ভয়ে নাম্বিয়া আইল।
সে সব বৃত্তান্ত সাধু শুনিতে পাইল॥
মাধবের শিষ্য হন সেহ যে ব্রাহ্মণ।
গুরু আসিয়াছেন বলি না জানে তখন॥
বণিকের স্ত্রী তবে দুগ্ধাদি আনিঞা।
সাধুরে ভোজন করাইল আউটিয়া॥
সাধু দুগ্ধ পান করি উঠিয়া চলিল।
যাইতে বণিক সহ পথে দেখা হৈল॥
বণিক চরণে ধরি পুনশ্চ আনিলা।
বড় ভক্তিভাব করি গৃহে বসাইলা॥

পাঠান্তর—(ক) অন্তরঙ্গ কোঠরি—থাকে অন্য কোঠায়।
(খ) উদ্যোগে আছে—উদ্যোগ করে।
(গ) আইলা মোর—আইলেন।

তখন যে সেই বিপ্র নাম্বিয়া আসিয়া।
দণ্ডবত কৈল নিজ অভীষ্ট জানিঞা॥
সাধু কহে তব মুখ মুঞি না দেখিব।
মোর আগে রহ যদি হেথা না রহিব॥
বণিকের স্ত্রী এক বৈষ্ণবের অর্থে।
একমুষ্টি তণ্ডুল্ল তোমার পাকপাত্রে॥
চাহিল দিবারে তুমি তাহা না পারিলে।
উপেক্ষা করিলে আর রাগত হইলে॥
আমি ইহা নাহি কহি স্বার্থে আপনার।
বৈষ্ণবের প্রতি তব এই ব্যবহার॥
বুঝিনু বৈষ্ণবে তুমি বহির্ম্মুখ হও।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে কভু অধিকারী নও॥
তবে বিপ্র কাকুবাদ করিতে লাগিলা।
কাতর দেখিয়া সাধু প্রসন্ন হইলা॥
শাসন করিয়া শিষ্যে শোধন করিলা।
দয়ার্দ্র হইলা কিছু কোপ না রহিলা॥
তবে শ্রীমাধব দাস তথা হৈতে গিয়া।
পূর্ব্বাশ্রমে গেলা মাতা-দর্শন লাগিয়া॥
পরিক্রমা করি কৈলা দণ্ডবত নতি।
মাতা-অঙ্গে হস্ত দিয়া স্নেহ কৈলা অতি॥
মাতাও ভজনানন্দ ভাগবতোত্তম।
পূর্ব্বাশ্রমে আইলা বলি মানিলা বিষম॥
অনুযোগ করি পুত্রে ভর্ৎসন করিলা।
এখানে আসিতে তব উচিত না ছিলা॥
স্ত্রী পুত্র গৃহ তব পূর্ব্বের আছয়।
হঠাত জন্মিবে মোহ কি তাহে বিস্ময়॥
অতএব শীঘ্র বাপু স্থানান্তর যাহ।
পুন একক্ষণ এই স্থানে নাহি রহ॥
মাতার সে উপদেশ প্রশংসা করিয়া।
দণ্ডবত করি মাত্র গেলেন চলিয়া॥
শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীমন্ জগন্নাথ স্থানে।
যাইয়া দর্শন করি ভাসে প্রেম-বানে॥
জগন্নাথ তাঁরে দেখি হৈলা আনন্দিত।
পূর্ব্বে যে সখ্যতাভাব (ক) হইল উদিত॥

পাঠান্তর—(ক) পূর্ব্বে যে সখ্যতাভাব—পূর্ব্বের যে সখ্যভাব।

শ্রীমন্ মাধবদাসের গুণগান।
গাইয়া মাগয়ে লালদাস শ্রীচরণ॥

চরিত্র শ্রীসুরদাস

শ্রীল সুরদাস সাধু জগতে বিখ্যাত।
পরম-রসিক কৃষ্ণনিষ্ঠ দৃঢ়ব্রত (ক)॥
যাহার কবিত্ব শুনি হেন কে আছয়।
অন্তর-পুলক-ভাবে শির না চালয় (খ)॥
মহা-অনুভব হয় বিরক্ত মহাপ্রেমী।
শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাত বাস বৃন্দাবনভূমি॥
অষ্টাদশ সিদ্ধি (গ) যেহ উপেক্ষা করিল।
চারি মুক্তি-আদি চতুর্ব্বর্গ তেয়াগিল॥
শিষ্য অনুশিষ্যক্রমে জগৎ তারিল।
যার নাম-ভেলা লোকে আশ্রয় করিল॥
শ্রীমান্ সুরদাস সাধু ত্রিজগত-শুরে।
জগতের আরাধ্য মনুষ্য সুরাসুরে॥

চরিত্র শ্রীকেশবভট্ট

শ্রীকেশবভট্ট শান্ত শিষ্ট কৃষ্ণভক্ত।
সিদ্ধ শক্তিবান পরম বিরক্ত॥
মোছলমান সদা দ্বেষ্টা হিন্দুর ধরমে।
মথুরায় কৈল বাধা তীর্থ যে বিশ্রামে॥
যেই হিন্দু স্নানে যায় জোরাবরি করি।
মোছলমানগণ ভ্রষ্ট করে ধরি ধরি (ঘ)॥
শ্রীমান্ ভট্টজীউ দেখি বড়ই অনর্থ।
আপনি চলিয়া গেলা শ্রীবিশ্রাম তীর্থ॥
ভট্টজীর উপরে যতেক মোছলমান।
উদ্যুক্ত হইল (ঙ) সভে করিতে আক্রমণ॥
সেইকালে ভট্টজীউ হুংকার করিল।
যতেক যবনগণ পঙ্গুপ্রায় হৈল॥
অঙ্গেতে বিষের জ্বালা হইতে লাগিল।
ছটফট করি সব মূর্চ্ছিত হৈল॥
প্রধান যে পীর তেঁহো দেখি সভার গতি।
ভট্টজীর চরণে পড়িয়া কৈল নতি॥
তবে মহাশয় তারে প্রসন্ন হইয়া।
সভাকারে সুস্থ কৈল কৃপাদৃষ্টি দিয়া॥
সেই হৈতে দৌরাত্ম্য না করে মোছলমান।
নির্ব্বিঘ্ন হইয়া লোক করে তীর্থে স্নান॥
কেশব ভট্টের গুণ কহা নাহি যায়।
কিঞ্চিত আভাস মাত্র কহিল ইহায়॥

চরিত্র শ্রীহরি-ব্যাসজী

শ্রীহরি-ব্যাস নাম (ক) পরম মহান্ত।
যার গুণগান করি নাহি হয় অন্ত॥
দেবী মহামায়া যাঁরে গৌরব করিয়া।
কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা কৈল যাঁর স্থানে গিয়া॥
গ্রামশুদ্ধ যত লোক দেবীর শাসনে।
বৈষ্ণব হইল দীক্ষা কৈল যাঁর স্থানে॥
তাঁহার বিশেষ কিছু কহিব বিস্তারি।
ইথে অবিশ্বাস নাহি কর হেলা করি॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বজ্ঞ নিস্পৃহ।
নাভাজী কহিল যাহা অতি সত্যবহ॥
চটথাবলী নাম এক গ্রাম হয় (খ)।
ভ্রমিয়া শ্রীহরি-ব্যাস গেলেন তথায়॥
এক বাগিচায় দেবী-মণ্ডপ আছয়।
সেই খানে গিয়া সাধু বিশ্রাম করয়॥
হেনকালে গ্রামী কোন ইতর যে লোকে।
ছাগ বলিদান কৈল দেবীর সম্মুখে॥
দেখিয়া শ্রীহরি-ব্যাস চমকিত হৈলা।
জীবহিংসা দেখি বড় কাতর হইলা॥
রুষ্ট হইয়া কিছু দেবীরে কহয়।
এ যে কর্ম্ম তোমার উচিত কভু নয়॥

পাঠান্তর—(ক) দৃঢ়ব্রত—সদাব্রত।
(খ) চালয়—চলায়।
(গ) সিদ্ধি—সিদ্ধ।
(ঘ) ধরি ধরি—ধরাধরি।
(ঙ) উদ্যুক্ত হইল—উদ্যোগ করিল।

পাঠান্তর—(ক) নাম - হয় যে।
(খ) 'চন্দ্রথাবল' নামে যে এক গ্রাম আছয়। নাভাজীর মূল গ্রন্থ মতে চন্দ্রথাবল।

এতো ইতরের কর্ম্ম নির্দ্দয় যে হয়।
জগন্মাতা বলি সভে তোমারে পূজয়॥
জগন্মাতা কেমতে হইতে চাহ তুমি।
বিষ দৃষ্টি (ক) না করে যে সভাকার স্বামী॥
তোমারে দেখি যে কারো অনুগ্রহ কর।
মাথা কারো কাটিয়া রকত পান কর॥
এতেক শুনিঞা দেবী লজ্জিত হইলা।
সাধু দুঃখ ভাবিয়া অন্যত্র উঠি গেলা (খ)॥
উপবাস করি সাধু রহিল পড়িয়া।
দেবীর উচিত আজি করিব বলিয়া॥
দেবী জমিদারের কন্যার রূপ ধরি।
রন্ধনের সামগ্রী তণ্ডুল-আদি করি॥
লইয়া গেলেন যথা সাধু আছে পড়ি।
রন্ধন করিয়া খাও বলে হাথ যুড়ি॥
শরণ লইনু মোরে কর অনুগ্রহ।
কৃপা করি মোরে কৃষ্ণ মন্ত্রদীক্ষা দেহ॥
তাহার অমৃত (গ) বাক্য আর সুচরিতে।
পরিতোষ হৈল সাধু তুষ্ট হৈল চিতে॥
কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিয়া রসুই করিয়া।
ভোজন করিলা অঃ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া (ঘ)॥
রাত্রে দেবী গ্রামে ভয়ঙ্কর রূপ ধরি।
গিয়া উপদ্রব করে হুহুঙ্কার করি॥
কাহারে ধরিয়া আছাড়য়ে ভূমিতল।
কাহারে চাপড় চড় কারে মারে কীল॥
কারো ঘর ভাঙ্গি পাড়ে কারো হাঁড়ি কুঁড়ি।
স্তুতিনতি করয়ে সভেই হাথ যুড়ি॥
কে তুমি কি আজ্ঞা কর কহ তাহা করি।
ক্ষম অপরাধ কেনে মার অবিচারি॥
তবে দেবী কহে যদি পরাণে বাঁচিবে।
মোর আজ্ঞামত প্রাতে সভাই করিবে॥

পাঠান্তর—(ক) বিষ দৃষ্টি—বিবসদৃষ্টি ও বিষমদৃষ্টি।
(খ) সাধু দুঃখ ভাবি মনে স্থানান্তরে গেলা।
(গ) অমৃত — মধুর।
(ঘ) শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া — কৃষ্ণে নিবেদিয়া।

সভে কহে যেই আজ্ঞা আপনি করিব।
প্রাতঃকালে সেই আজ্ঞা অবশ্য (ক) পালিব॥
তবে কহে মুঞি দেবী গ্রামের তোমার।
মুঞি তুষ্ট হব ভাল হবে সভাকার॥
বাগিচায় অই যে বৈষ্ণব উত্তরিল।
মুঞি তাঁর স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা কৈল॥
তাঁর স্থানে গ্রামের সহিত সভে গিয়া (খ)॥
কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা কর উৎসব করিয়া॥
সভেই বৈষ্ণব হও শ্রীকৃষ্ণ ভজহ।
মুঞি যাঁর দাসী মোর ইষ্টদেব যে'হ (গ)॥
প্রকারে ঈশ্বর-তত্ত্ব চুম্বকে কহিল।
অজ্ঞ বিজ্ঞ সভাকার শ্রদ্ধা উপজিল॥
আর কহে দেবী আজি হৈতে যেই জনে।
জীবহিংসা করিবেক আমার সদনে॥
তাহার উচিত ফল তৎক্ষণাতে দিব।
পরিবার সহ তারে সবংশে মারিব॥
দেবীর যে আজ্ঞা সভে নিশ্চয় করিলা।
দেবী যথা সাধু বসি তথা চলি গেলা (ঘ)॥
যোড়হস্ত করি কিছু কহিতে লাগিলা।
মুঞি তব স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা কৈলা॥
মোর অপরাধ কিছু না লইবে আর।
জীবহিংসা আর নাহি হবে গৃহে মোর॥
কল্য এই গ্রামশুদ্ধা বৈষ্ণব হইবে।
তোমার চরণ আসি আশ্রয় করিবে॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরি-ব্যাস অনুভব কৈলা।
দেবীর বাক্যেতে অতি সন্তুষ্ট হইলা॥
দেবীর সম্মান করি তথা বসাইয়া।
কৃষ্ণকথা-রসে নিশি পোহায় জাগিয়া॥
প্রাতঃকালে গ্রামের বাল-বৃদ্ধ বনিতে।
সাধুর নিকটে গেলা কৃষ্ণমন্ত্র লৈতে॥
দীক্ষা করি গ্রামশুদ্ধ হইল বৈষ্ণব।
হুলাহুলি পড়ি গেল মহাকলরব॥

পাঠান্তর- (ক) অবশ্য—সকলে।
(খ) তাঁহার স্থানেতে গ্রাম সহিত যাইয়া।
(গ) যে'হ—সেহ।
(ঘ) তথা চলি গেলা—তথায় চলিলা।

তুলসীর মালা কণ্ঠে ললাটে তিলক।
দেখিতে সুন্দর দেশ করিলা আলোক॥
সাক্ষাত কি ভক্তিদেবী মূর্ত্তিমান হৈল।
অথবা বৈকুণ্ঠে আসি আবির্ভাব কৈল॥
মহামহোৎসব চটথাবল নগরে।
কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের সেবা যে হৈল ঘরে ঘরে॥
ইথে যদি কেহ কর কুতর্ক বিশেষ।
দেবী বৈষ্ণবের স্থানে কৈল উপদেশ॥
ইথে কি বিস্ময় এ তো সুসম্ভব হয়।
কৃষ্ণভক্ত দেবতাগণের পূজ্য হয়॥
কৃষ্ণভক্ত-সমান দেবতাগণ নহে।
ইহার সন্দেহ কিবা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥

যথা—

বিবুধাঃ কিং পুনঃ সর্ব্বে অজঃ শক্রো ভবেদ্ যদি।
ন কেঽপি সমতাং যান্তি (ক) কৃষ্ণভক্তস্য নারদ॥

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

সে বিচার দূরে রহু সাক্ষাতে দেখহ।
কৃষ্ণের স্বরূপ হন বৈষ্ণব বিগ্রহ॥
চৌষট্টি-ভজন-অঙ্গ-মধ্যে উত্তসেবা (খ)।
পরম রহস্য আর ছাড়ি দেবীদেবা॥
কৃষ্ণের সেবন হৈতে অধিক বৈষ্ণবে।
সাধুশাস্ত্রমতসিদ্ধ সেবন করিবে॥

তথা—

"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" ইত্যাদি।

পূর্ণ শ্লোক ও অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

অতএব বৈষ্ণব কৃষ্ণের মূর্ত্তি হয়।
নর-সুর সর্ব্বারাধ্য ইথে কি বিস্ময়॥
ছোট বড় বৈষ্ণবের সেবা আরাধনে।
সর্ব্বফল পাই আর সংসার মোচনে॥
সেই ফল অল্পে কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি মিলে।
এ ফল মিলয়ে কোন্ দেবতা পূজিলে॥
কৃষ্ণভক্তি দূরে থাকু (ক) সংসার না যায়।
ত্রিবর্গের ফল-সাধ্য দেবগণ হয়॥
দেবগণ মুক্ত নহে যে মুক্তি প্রার্থয়ে।
হরিভক্ত সেই মুক্তি বিষম দেখয়ে॥
স্বভাবে জীবনমুক্ত মুক্তি না চাহিয়ে (খ)।
শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণ কহে দিলেও না লয়ে (গ)॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য" ইত্যাদি।

পূর্ণ শ্লোক ও অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

অতএব দেবগণ হৈতে হরিভক্ত।
শ্রেষ্ঠতম পরাৎপর সার বেদ উক্ত॥
হরিভক্তগণে যেই সামান্য গণয়।
নিজ গলে ছুরি দিল কে রাখিবে তায়॥
হরিদাস ঠাকুরেরে মায়া প্রণময় (ঘ)।
চৈতন্য-চরিতামৃতে প্রসিদ্ধ আছয়॥
অতএব সংশয় ইহাতে কিছু নাঞি।
বৈষ্ণব পরম পূজ্য সভাকার ঠাঞি॥
শ্রীল হরি-ব্যাসপ্রভু পতিতপাবন।
শুনি লালদাস চাহে চরণে শরণ॥

পাঠান্তর—(ক) ন কেঽপি সমতাং যান্তি—ন কোঽপি সমতাং যাতি।
(খ) উত্ত সেবা—সাধুসেবা।

পাঠান্তর—(ক) থাকু—রহু।
(খ) না চাহিয়ে—নাহি চায়।
(গ) লয়ে—লয়।
(ঘ) হরিদাস ঠাকুরের কাছে প্রণময়।

ইতি শ্রীভক্তমালে রামচন্দ্র-আদি-ভক্তগণ-বর্ণনং নাম ঊনবিংশ মালা॥ ১৯॥

বিংশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীত্রিপুর দাস

শ্রীমান্ ত্রিপুর-দাস নামেতে কায়স্থ।
একান্ত শ্রীনাথজীর পদে মন ন্যস্ত॥
মোহরের (ক) পাতসা-সরকারে ধনবান।
শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণব-অর্থে সকলি লোটান॥
শীতকাল হৈলে গোবর্দ্ধনে নাথজীর।
জাড়াও অনেক বস্ত্র দেন ভক্ত ধীর॥
সাল পট্টু বনাৎ রেজাই নানামত।
প্রতিদিন নূতন পরান অভিমত॥
কথোদিন পরে সেই ত্রিপুর কায়স্থ।
ধনশূন্য হইয়া হইল অসমর্থ॥
কিছুমাত্র নাহি অর্থ খাইতে না পান।
তথাচ জাড়াও নাথজীর অঙ্গে দেন॥
পরে এক বৎসর যে শীতের সময়।
কিছুই সঙ্গতি নাঞি ভাবেন উপায়॥
গৃহে গিয়া নিজ ঘরে চৌদিগ নেহারে।
কিছু না দেখিয়া সাধু ফাঁফর অন্তরে॥
পিত্তলের দোয়াতি একটি মাত্র ছিল (খ)।
তাহাই লইয়া হস্তে বাজারে চলিল॥
একটি যে মুদ্রা তাহা বেচিয়া পাইল।
তাহে একখানি মোটা বসন কিনিল॥
কিঞ্চিত কুসুমি রং করিয়া তাহাতে।
লইয়া চলিল সাধু কান্দিতে কান্দিতে॥

পাঠান্তর—(ক) মোহরের—মুহুরিয়া।
(খ) একটি মাত্র ছিল—একটি আছিল।

সুকুমার সুন্দর নাথজী আমার।
কেমনে এমন বস্ত্র অঙ্গে দিব তাঁর॥
ক্ষোভিত হইয়া বস্ত্রখানি নিঞা দিলা।
ঠাকুরের ভাণ্ডারী তা লইয়া রাখিলা॥
আর আর বড় বড় মনুষ্য অনেক।
জাড়াও আনিয়া দিছে সালাদি যতেক॥
তাহার বেষ্টন করি বান্ধিয়া রাখিল।
ভাল ভাল বস্ত্র নাথজীকে পরাইল॥
সেবাইত যে গোসাঞি তাঁরে নাথজী কহিল (ক)
মোর অঙ্গে শীত নিবারণ নাহি হৈল॥
তা শুনি গোসাঞি সাল পাগড়ি যতেক।
পরাইলা শ্রীঅঙ্গেতে যতেক কতেক (খ)॥
তথাচ না যায় শীত পুনরপি কহে।
শত বস্ত্র দিলে শীত-নিবারণ নহে॥
ত্রিপুর দাসের বস্ত্র আনি দেহ কহে।
তাহা বিনে মোর (গ) শীত নিবারণ নহে॥
এতেক শুনিঞা তবে গোসাঞি চিন্তিয়া।
ভাণ্ডার গোমস্তা স্থানে গেলেন ধাইয়া॥
যাইয়া কহেন এ বৎসর ঠাকুরের।
জাড়াও না পঁহুছে কি ত্রিপুর-দাসের॥
ত্রিপুর-দাসের বস্ত্র বিনে নাথজীর।
শীত নিবারণ নহে হইলা অস্থির॥
গোমস্তা শুনিঞা ভাণ্ডারীকে জিজ্ঞাসিলা।
ভাণ্ডারী কহেন এই মোটা বস্ত্র দিলা॥
লজ্জায় তোমার স্থানে নাহি দেখাইল।
আমি তাহা অন্য বস্ত্রে বেটন (ঘ) করিল॥
শ্রীমান্ ত্রিপুরদাস প্রিয়ভক্ত হয়।
মহান-মহিম তারে সকলে কহয় (ঙ)॥

পাঠান্তর—(ক) সে রাত্রে গোসাঞিজীকে নাথজী কহিল।
(খ) পরাইল যতনেতে শ্রীঅঙ্গে কতেক।
(গ) তাহা বিনে মোর—সে বস্ত্র নাহিলে।
(ঘ) বেটন—বেষ্টন।
(ঙ) মহামহিমা যে তাঁর সভাই জানয়।

দন্তে জিহ্বা কাটি তবে গোমস্তা কহয়।
হা হা কি করেছ কর্ম্ম অনোচিত হয়॥
শীঘ্র লইয়া আইস তাহাতেই কাম।
সেই সে সকল সার সেই অনুপাম॥
মোটা যে বসন সেই জগতে উৎকৃষ্ট।
সাল পাগড়ি হৈতে সেই অতিশ্রেষ্ঠ॥
শ্রদ্ধায় বিনাট সিঙ্গে দিয়া ভক্তি-ধাগা।
প্রেমরসে কষায়িত অনুরাগে রাঙ্গা॥
নয়ান-জলেতে ধোয়া উৎকণ্ঠা আতপে।
শুষ্ক হইল যার কিরণের তাপে॥
এক সেই বস্ত্র আর গোপী-স্তনদ্বয়ে।
তাহা বিনে শীত নিবারণ নাহি হয়ে॥
তবে সেই বস্ত্রখানি আনিঞা ঝাড়িয়া।
নাথজীর শ্রীঅঙ্গে দিলেন উড়াইয়া॥
তখন যতেক শীত নিবারণ হৈল।
মহামহোৎসব মঙ্গলাচরণ কৈল॥
সেই যে ত্রিপুরদাসের অনুদাস।
জন্মে জন্মে হৈতে লালদাস করে আশ॥

চরিত্র শ্রীকৃষ্ণদাস মহানুভব

শ্রীমান্ কৃষ্ণদাস সাধু মহা-অনুভব।
প্রেমানন্দে সদা মগ্ন উদারস্বভাব॥
নৃত্য-গীত-বাদ্যরসে সদাই মগন।
কৃষ্ণগুণগান বিনে নাহিক কথন॥
নৃত্য-গান-রসে কৃষ্ণ বশীভূত হৈল।
ভক্ত-বাৎসল্যে হরি আপনা সোঁপিল॥
একদিন দেখে সাধু দিল্লীর বাজারে।
অপূর্ব্ব জিলাপি করি রাখে থরে থরে॥
দেখিয়া উৎসাহ হৈল এ হেন সামিগ্র।
বৃথা অন্যে খাবে এ তো নাথজীর যোগ্য॥
এতেক চিন্তিয়া কারে কিছু না কহিলা।
দোকানে বাইয়া মনে মনে ভোগ দিলা॥
থালীর সহিত সেই জিলাপির রাশি।
তৎক্ষণাত গোবর্দ্ধনে পঁহুছিল আসি॥
নাথজী খাইয়া তাহা অতিতৃপ্ত হৈল।
হোথা দোকানদার কহে জিলাপি কি হৈল॥
চমকিত হইয়া ভাবয়ে সভে মেলি।
নাথজী খাইল বলি সভে (ক) কুতূহলী॥
দোকানদারেরে কহে চিন্তা না করিহ।
নাথজীর স্থানে থালী জিলাপির সহ॥
গোবর্দ্ধনে গেল তথা ঠাকুর খাইল।
থালী শূন্য (খ) আন গিয়া বিশেষ কহিল॥
এতেক শুনিঞা তবে হালোয়াইগণ।
উৎসাহ করিল অতি আনন্দিত মন॥
দিল্লী আর গোবর্দ্ধনে পাঁচ দিনের পথ।
হালোয়াই আইল তথা (গ) চড়ি মনোরথ॥
নানান সামগ্রী অতি উত্তম উত্তম।
করিয়া লইয়া আইল করি বাদ্যোদম॥
নাথজীর ভোগ দিয়া নিজ থালী লঞা।
চলিয়া গেলেন সভে আনন্দিত হিয়া (ঘ)॥
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার।
শ্রীকৃষ্ণে ভকতি মাগে লালদাস তার॥

চরিত্র শ্রীবিঠ্ঠলদাস

মথুরা-নিবাসী শ্রীবিঠ্ঠলদাস নাম।
বালা রাজার পুরোহিত ভক্ত অভিরাম॥
শ্রীকৃষ্ণে আটক চিত্ত সর্ব্বারম্ভত্যাগী (ঙ)।
সদাই বিরলে থাকে প্রেমরসরাগী॥
রাজা তাহা শুনি নিজ পুরোহিত-রীত।
দেখিতে করিল বাঞ্ছা ভিজি গেল চিত॥
একদিন একাদশী-জাগরণ-রাত্রে।
ডাকিয়া আনিল সেই প্রেমী মহাপাত্রে॥
দো-মহলা ছাতের উপরে রাজা বৈসে।
অনেক বৈষ্ণব তথা জাগরণে আইসে॥

পাঠান্তর—(ক) সভে—সাধু।
(খ) শূন্য—মূল্য।
(গ) হালোয়াই আইল তথা—হালুইগণ আইল।
(ঘ) হিয়া হৈয়া।
(ঙ) শ্রীকৃষ্ণে অচলচিত্ত সর্ব্বসুখত্যাগী।

কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠী কীর্ত্তন নর্ত্তন।
করিতে লাগিলা মেলি বৈষ্ণবের গণ॥
শ্রীমান বিঠ্ঠলদাস শুনিতে শুনিতে।
প্রেমানন্দে অচেতন নাহিক সম্বিতে॥
কথোক রাত্রের পর উঠি বাহ্যহীন।
নাচিতে লাগিলা মাত্র প্রেমের অধীন॥
কোথায় পড়য়ে পদ কাহার উপরে।
স্মৃতিমাত্র নাহি ভাসে আনন্দ সাগরে॥
হুঙ্কার উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে।
ছাতের উপর হইতে পড়িলা নাবোতে (ক)॥
কৃষ্ণের করুণা কিছুমাত্র না লাগিল।
রাজা-আদি হাহাকার করিয়া উঠিল॥
শীঘ্র আসি নাম্বি সবে ধরিয়া দেখয়।
কিঞ্চিত বেদনা দেহে নাহিক লাগয়॥
যতন করিয়া রাজা গৃহে পাঠাইল।
নিত্যানি খরচ যে সম্প্রদান করি দিল॥
সাধু গৃহ ছাড়ি মাঠঘরেতে রহিলা।
তাহারে আদেশে শ্রীগোবিন্দ আজ্ঞা দিলা॥
গোবিন্দ আজ্ঞাতে পুনঃ গৃহেতে যাইয়া।
দিবস যাপন করে বৈষ্ণব সেবিয়া॥
কথোক দিবসে এক পুত্র জনমিল।
রঙ্গিরায় বলি নাম করণ করিল (খ)॥
অষ্টাদশ বর্ষ যবে বয়স হইল।
পিতার সমান কৃষ্ণে ভক্তি উপার্জিল॥
দৈবাধীন মৃত্তিকাভিতরে কিছু ধন।
আর এক শ্রীবিগ্রহ অতি সুগঠন॥
পাইয়া আনন্দে সেবা করিলা প্রকাশ।
পিতা তাহা দেখি অতি হইল (গ) উল্লাস॥
পিতা পুত্রে সেবা নৃত্য-গীত প্রেমে করি।
আনন্দে কাটায় কাল দিবস শর্ব্বরী॥
রাজার তনয়া রঙ্গিরায়ের চরিত।
দেখিয়া অন্তরে বড় হৈল শ্রদ্ধান্বিত॥

পাঠান্তর—(ক) নাবোতে—ভূমিতে বা নীচেতে।
(খ) নাম করণ করিল—নাম তাহার রাখিল।
(গ) অতি হইল—হৈল পরম

কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা তাঁর স্থানেতে করিল।
তাহাতে পরম প্রেম-ভকতি জন্মিল॥
বিঠ্ঠলের গৃহে এক নটিনী আইল।
ঠাকুরের গৃহে গান আরম্ভ করিল॥
রাসলীলা গান করে মধুর স্বরেতে।
বিঠ্ঠল শুনিয়া প্রেমে নারে সম্বরিতে॥
ঘরে যত অলংকার অর্থবস্ত্র (ক) ছিল।
সকল আনিঞা নটিনীর আগে দিল॥
শেষে আর কোথাও কিছু যদি না পাইল।
রঙ্গিরায় পুত্রের হাত ধরি সমর্পিল॥
নটিনী তাহার হাথ ধরি বসাইল।
গান-অন্তে হস্তে ধরি লইয়া চলিল॥
তখন বিঠ্ঠলদাস কহে নটিনীরে।
বহু অর্থ দেই লহ পুত্র দেহ মোরে॥
রঙ্গিরায় কহে পিতা অনোচিত হয়।
কৃষ্ণের সম্বন্ধে দান করেছ আমায়॥
এখন উচিত নহে পুন লইবারে।
বিঠ্ঠল শুনিঞা লজ্জা পাইল অন্তরে॥
নটী রঙ্গিরায়ে লৈয়া পুত্রভাব করি।
লইয়া চলয়ে তবে আপন নগরী॥
হেনকালে রাজকন্যা বৃত্তান্ত শুনিয়া।
তৎক্ষণাত গুরুগৃহে আইল ধাইয়া॥
কহেন নটিনী আগে বিনয় করিয়া।
গুরু দেবের ভিক্ষা দেহ করুণা করিয়া॥
নটী কহে তবে দিব ইহার সমান।
স্বর্ণ যদি দেহ তুলে করিয়া প্রমাণ॥
রাজকন্যা কহে ধিক্ স্বর্ণ কিবা কহ।
সরবস অর্থ গৃহ প্রাণ চাহ লহ॥
রাজার কন্যার ভাব-ভকতি দেখিয়া।
পুলক হইয়া নটী কহয়ে রিঝিয়া (খ)॥
কিছু নাহি চাহি মুঞি গুরু তব লহ।
সুখে থাক মোর বাছা ঘরে চলি যাহ॥

পাঠান্তর—(ক) অর্থবস্ত্র—বস্ত্র আদি।
(খ) রিঝিয়া—বুঝিয়া।

তথাচ যে রাজকন্যা নিজ অঙ্গ হৈতে।
সর্ব্ব অলঙ্কার খুলি দিল সুচারিতে॥
গুরুকে লইয়া নিজ গৃহে চলি গেল।
পিতার স্থানেতে দিতে বিশ্বাস নহিল॥
পুন কোন দিনে কারে দিবে প্রেমাবেশে।
প্রাণধন প্রভু মুঞি (ক) হারাইব শেষে॥
অপূর্ব্ব মন্দিরে রাখি সেবা আরম্ভিল।
অলৌকিক কেহ কভু হেন না দেখিল॥
পূজা গন্ধমাল্য অলঙ্কার বস্ত্রদান।
ত্রিসন্ধ্যা আরতি পাদসেবন স্তবন॥
বিবিধ সেবন করি দিবসযাপন।
ইথে কি বিচিত্র পাইতে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
গুরুরূপ-কৃষ্ণ-ভজনের যে মহত্ত্ব।
বেদ-বিধি কহিতে না পারে তার তত্ত্ব॥
গুরুর চরণ ভজি কৃষ্ণচন্দ্র পাই।
গুরু ছাড়ি গোবিন্দ ভজিলে পাই নাঞি॥
অতএব রাজকন্যা ধন্য ধন্য হয়।
কৃষ্ণভজনের তত্ত্ব সেই সে জানয়॥
শ্রীমান্ বিঠ্ঠল দাস আর রঙ্গিরায়।
আর রাজকন্যা শুভমতি মহাশয়॥
সভাকার শ্রীচরণে করিয়া মিনতি।
লালদাস মাগে কৃষ্ণচরণে ভকতি॥

চরিত্র শ্রীনারায়ণ ভট্ট

শ্রীমন্-নারায়ণ ভট্ট বড় অধিকারী।
যাঁহার আশ্রয় শ্রীল বলদেব হরি॥
শ্রীমন্ বৃন্দাবনে উঠাগ্রামে হয় বাস।
দাউজীর সেবা রসে বড়ই উল্লাস॥
নিরীহ নিশ্চেষ্ট (খ) মহাবিরক্ত উদার।
সর্ব্বগুণাকর সদাচার ব্যবহার॥
পর্ব্বত উপরে স্থিতি নিতি শত শত।
বৈষ্ণব-সেবন হয় লেখা নাই কত॥

নানান্ সামগ্রী পরিপূর্ণ যে ভাণ্ডারে।
কোথা হৈতে আইসে কেহো কহিতে না পারে॥
অপ্রকট সময় হইল যবে আসি।
এক ধনী অজ্ঞ কহে নিকটেতে বসি॥
শেষকাল হৈল এবে প্রয়াগে চলহ।
তীর্থরাজ ত্রিবেণীর আশ্রয় করহ॥
এতেক শুনিঞা সাধু দুঃখ পাইল মনে।
ব্রজ ছাড়ি আশ্রয় করিতে কহে আনে॥
বৃন্দাবন-ধামের যে মহিমা না জানে।
নাহি জানাইলে নাহি জানে অজ্ঞজনে॥
আমিতো শ্রীব্রজধামের অনুচর হই।
অজ্ঞ যে লোকের কিছু হিত করি মুঞি॥
এতেক ভাবিয়া শ্রীপ্রয়াগ তীর্থরাজে।
স্মরণ করিল সেই অজ্ঞের সমাজে॥
স্মরণ করিবামাত্র প্রকট হইল।
মহাকোলাহল করি তরঙ্গ চলিল॥
শ্রীগঙ্গা যমুনা সরস্বতী তিন ধারা।
তিনবর্ণে সুন্দর বহয়ে বেণীপারা॥
সর্ব্বতীর্থ মথুরামণ্ডলে করে বাস।
হরিভক্ত-অনুরোধে হইল প্রকাশ॥
পর্ব্বত উপর হৈতে দেখি অজ্ঞগণ।
পুছয়ে সাধুরে তবে করিয়া যতন॥
একি আচম্বিতে দেখি নদীর প্রবাহ।
তিনবর্ণ অপূর্ব্বে যে শোভা একি কহ॥
ভট্টজী কহেন শুন এই ব্রজধাম।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইঁহো হন সর্ব্ব অভিরাম॥
যতেক তীর্থের তীর্থ সভার উপাস্য।
সর্ব্বতীর্থ শ্রীল-মথুরার করে দাস্য॥
তুমি কহ বৃন্দাবন ছাড়িয়া প্রয়াগ।
যাইতে আমারে ইহা বড়ই বিরাগ॥
এতেক শুনিঞা সেই ধনী মহাজন।
অপরাধ মানি তাঁর ধরিল চরণ॥
আমি অজ্ঞ মূঢ় মূর্খ ইহা জানি নাঞি।
এবে বুঝিলাম শিখিলাম তুয়া ঠাঞি॥
অপরাধ ক্ষেম মোর লইনু শরণ।
প্রসন্ন হইয়া সাধু কৈল আশ্বাসন॥

পাঠান্তর—(ক) মুঞি—মোব।
(খ) নিশ্চেষ্ট—নিস্পৃহ।

অদ্যাপিহ উঠাগ্রামে পর্ব্বতের তলে।
নিম্ন খাল আছয়ে প্রয়াগ লোকে (ক) বলে॥
হরিভক্তজনের অনুরোধ কে না করে।
হরি নিজ-ভক্ত-পদ-রজ বাঞ্ছা করে॥
ইহার অধিক আর কি আছে মহিমা।
শ্রীমন্ ভাগবতে কহে মহিমার সীমা॥
শ্রীল নারায়ণ-ভট্ট-মহান্ত-চরণ।
কৃপা আকাঙ্ক্ষিত লালদাস অজ্ঞজন॥

পুনশ্চ শ্রীরূপ-সনাতন চরিত্র

শ্রীব্রজবল্লভ বল্লভ সুদুর্লভ সুখ নৈনা নদিয়ে॥
ইত্যাদি।

কলিভব সংসারের তারণ-কারণ।
তরণী সৃজিলা বিধি রূপ সনাতন॥
সর্ব্ববেদশাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিলা।
অমৃত শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ভক্তি উদ্ধারিলা॥
মীমাংসক মায়াবাদী অসুর বঞ্চিয়া।
কৃষ্ণভক্ত দেবে দিলা অমৃত বাঁটিয়া॥
শ্রীল রূপ সনাতন কৃত যত গ্রন্থ।
নাভাজী দেখিয়া হৈল চমৎকারবন্ত॥
সুমিষ্ট সুচ্ছন্দ সে বিচিত্র অলংকার।
পরম পাণ্ডিত্য সিদ্ধান্ত বেদসার॥
শব্দে নানা অর্থ অথচ একভাব।
পরম প্রসাদগুণ বড়ই প্রভাব॥
নন্দগ্রামে একদিন শ্রীল সনাতন।
শ্রীরূপের স্থানে গেলা করিতে মিলন॥
শ্রীরূপ গোস্বামী করি দণ্ডবত নতি।
আসনাদি অর্পিয়া সম্মান কৈল অতি॥
ভোজন কারণ দুগ্ধ শর্করাদি আনি।
পরমান্ন আদি পাক করিলা আপনি॥
সনাতন কিছু কিছু আভাস দেখেন।
শ্রীমতী কিশোরীজীউ টহল করেন॥
দেখিয়া নয়ানে প্রেমধারা বহি যায়।
না কহে কাহারে কিছু বসিয়া দেখয়॥
শ্রীরূপ রন্ধন করি যুগলকিশোরে।
ক্ষীরভোগ লাগাইলা পুলক-অন্তরে॥
কিশোর-কিশোরী দোঁহে ভোজন করেন।
তাহাও শ্রীসনাতন আভাসে দেখেন॥
ভোজ করিয়া যবে দোঁহে চলি গেলা।
শ্রীরূপের কণ্ঠ ধরি কান্দিতে লাগিলা॥
তুমি ধন্য ধন্য তব বলিহারি যাই।
শ্যাম-শ্যামায় (ক) খাওয়াইলে করিয়া রসুই॥
কিন্তু এক দেখিয়া যে দুঃখ হৈল মনে।
টহল করিলা প্যারী তোমার রন্ধনে॥
তুমি বেনে (খ) কভু যে রন্ধন না করিহ।
সুকুমারী প্যারীজীকে দুঃখ নাহি দিহ॥
তবে সেই প্রসাদ যে গোস্বামী পাইয়া।
কুটীরে চলিয়া গেলা প্রেমানন্দ-হিয়া॥
অবশেষে শ্রীল-রূপ গোস্বামী পাইলা।
স্বাদু আস্বাদন করি আপনা ভুলিলা॥
যে প্রসাদ-কণায় মহাদেব মত্ত হৈল।
যে প্রসাদ লাগিয়া পার্ব্বতী তপ কৈল॥
যে প্রসাদ লাগি পুরুষোত্তমে শ্রীবিমলা (গ)।
অদ্যাপি করেন বাস অতি কুতূহলা॥
হেন যে প্রসাদ শ্রীল-রূপ-সনাতন।
অনায়াসে নিতি পান হেরে শ্রীবদন॥
অতএব গোসাঞি শ্রীরূপ-সনাতন।
সম নাহি গণি ব্রহ্মা আদি দেবগণ॥
আর এক কথা শুন অপূর্ব্ব কাহিনী।
যাহা শুনি সাধুগণ না ধরে পরাণি॥
শ্রীরূপ গোসাঞি শ্রীমান্ রাধিকার রূপ।
বর্ণন করিলা সে যে অতি অপরূপ॥
বেণীর তুলনা দিল ফণীর সহিতে।
শ্রীসনাতনের তাহে দুখ হৈল চিতে॥

পাঠান্তর—(ক) লোকে সাং

পাঠান্তর—(ক) শ্যাম-শ্যামায়—রাধা শ্যামে।
(খ) বেনে—মেনে।
(গ) শ্রীবিমলা—বিমলা।

বিষধর সহ সুধাধরের তুলনা।
না পাইল সুখ তাহে মনের বেদনা (ক)॥
ফণীর স্বরূপ বেণী আকৃতির অংশে।
শ্রীকৃষ্ণের মনোবৃত্তি নহে রসাভাসে॥
সনাতনে জানাইতে কৈলা এক লীলা।
ছলে শ্রীমতীর বেণী তাঁরে দেখাইলা॥
একদিন রাধাকুণ্ড-তীরে বৃক্ষডালে।
ঝুলনায় প্যারীরে লইয়া কৃষ্ণ ঝুলে॥
কিছু দূরে হৈতে শ্রীমান্ সনাতন দেখে।
প্যারীজীর বেণী যেন ফণী লকলকে॥
কৃষ্ণসর্পাকৃতি বেণী দেখি সনাতন।
তখন প্রশংসে তবে রূপের বর্ণন॥
অন্য ফণি-দর্শনে উপজে মনে ভয়।
সে ফণি-দর্শনে হৈল আনন্দ উদয়॥
প্রেমানন্দে জাড্য হৈল বিবর্ণ (খ) শরীর।
সর্পাঘাতে যেন হয় বিবর্ণ অস্থির॥
হেন বুঝি বেণীফণি দংশন করিল।
গরল আকৃতে দেহে অমৃতে ব্যাপিল॥
প্রেমামৃতে ব্যাপি দেহে শ্রীল-সনাতন।
ভূমে পড়ি গড়ি (গ) যায় নাহিক চেতন॥
প্যারী-পীতাম্বর (ঘ) হেরি আনন্দে ভাসিলা।
চকিতমাত্রেতে দেখা দিয়া দোঁহে গেলা॥
শ্রীল-সনাতনের মহাপ্রভাব শুনিয়া।
আকব্বর (ঙ) পাৎসা আইল দর্শন লাগিয়া॥
যোড়হস্তে রাজা দাণ্ডাইয়া তাঁর আগে।
বাক্য শুনিবারে প্রশ্ন করে অনুরাগে॥
সনাতন রাজ দরশন নিন্দা মানি।
হেঁটমাথে রহিলা না কহে কিছু বাণী॥
পুন আকব্বর শাহা কৃষ্ণভক্ত সঙরিয়া।
আলাপ করিলা তবে সম্মান করিয়া॥

রাজা বহু স্তুতি নতি করিয়া চলিলা।
যাওন কালেতে রাজা (ক) কহিতে লাগিলা॥
গোসাঞি তোমার কিছু আকাঙ্ক্ষা যে থাকে
ব্যক্ত করিয়া তাহা কহ তো আমাকে॥
যে আজ্ঞা করহ তাহা জাহের (খ) করিব।
যাহা চাবে তাহি দিব ব্যর্থ না হইব॥
সনাতন কহেন আকাঙ্ক্ষা কিছু নাহি।
পুন রাজা কহে পুন কহে নাহি নাহি॥
একান্ত যদ্যপি রাজা পুনঃপুন কহে।
তবে সনাতন কিছু ভঙ্গি করি চাহে॥
অর্থ তো তোমার স্থানে কিছু নাহি চাহি।
এক যে বাসনা তবে যদি শুন কহি॥
এই যে যমুনাতীরে আমার আশ্রয়।
ভাঙ্গিয়া পড়িল জলে অল্প স্থান হয়॥
এই স্থানটুকু মোর বান্ধাইয়া দেহ।
আর কিছু মুঞি তব স্থানে নাহি চাহোঁ॥
এতেক শুনিয়া রাজা কহে ভৃত্যগণে।
দাণ্ডাইয়া দেখেন আপনি সেই খানে॥
দেখে নানা মণি মুক্তা পরশ রতনে (গ)।
যমুনার তীর বান্ধা কতেক ভাঙনে॥
মনোহর অলৌকিক পরম মোহন।
যাহা হেরি মোহ যায় ব্রহ্মা আদিগণ॥
শোভা দেখি রাজা তবে বিহ্বল হইল।
দেখিতে দেখিতে তেন আর না দেখিল॥
বিচার করিল মনে এই বৃন্দাবন।
স্বরূপ যে হয়ে এই পরম-মোহন॥
আমি কিছু সনাতনে দিতে যে চাহিল।
তাহারি উত্তর মোরে ছল করি দিল॥
তুমি কিবা (ঘ) দিবে মুঞি পাইল যে ধন।
তার এক কণার কোটি কোটির যে কণ॥
তোমা হেন লক্ষ কোটি রাজার যে ধন।
অধিক নাহিক হবে না হবে সমান॥

পাঠান্তর—(ক) না ভাইল মনে তাথে পাইল বেদনা।
(খ) বিবর্ণ—বৈবর্ণ্য।
(গ) পড়ি গড়ি—গড়াগড়ি।
(ঘ) প্যারী-পীতাম্বর—প্যারি প্রিয়তমে।
(ঙ) আকব্বর—একব্বর।

পাঠান্তর—(ক) রাজা কিছু।
(খ) জাহের হাজির।
(গ) পরশ রতনে—পরম রতনে।
(ঘ) কিবা যাহা।

এই ভাবে সনাতন যমুনার তীর।
বান্ধিতে কহিল এই আশয় গম্ভীর॥
এতেক চিন্তিয়া রাজা মুচকি হাসিয়া।
গোসাঞিঞর আগে কহে স্তবন করিয়া॥
এবে বুঝিলাম তুমি এক (ক) ত্রিজগতের।
মহা আঢ্য ধনী জন নাহি তোমা হৈতে॥
ত্রিজগত নাথ সেই পরম দুর্লভ।
দুরারাধ্য যেঁহো তেঁহো তোমাতে (খ) সুলভ॥
অতএব তোমারে যে আমি দিব কি।
আমি যে পাৎসাহা অভিমান কর্য্যেছি॥
এতেক কহিয়া তবে রাজা চলি গেল।
কিঞ্চিত মহিমা সনাতনের কহিল॥
শ্রীরূপ সনাতন-চরণের আশ।
জন্মে জন্মে দৃঢ় আশা করে লালদাস॥

চরিত্র শ্রীহরিবংশ গোস্বামী

শ্রীমন্ হরিবংশ গোস্বামি চরিত্র।
জগতে ব্যাপিত হয় পরম পবিত্র॥
শ্রীমন্ গোপালভট্টজীর শিষ্য তেঁহো।
মহাভক্তিবান্ তেঁহো রাধাকৃষ্ণ প্রেমবহ॥
এক একাদশী দিনে তাম্বূল প্রসাদি।
খাইলা বলিয়া গুরু কৈলা অপরাধী॥
অন্তরে গোসাঞিঞ রুষ্ট নাহি তো হইলা।
তাহো লোকশিক্ষা হেতু শাসন করিলা॥
হরিবংশ গোসাঞিঞর শিষ্য-অনুক্রমে।
এবে রাধাবল্লভ-গোসাঞিঞ ব্রজধামে॥
শ্রীমন গোপাল ভট্ট (গ) শাসন করিল।
তাহাতে কিছুইমাত্র দোষ নাহি ছিল॥
আচার্য্য শ্রীগোপালভট্ট তাহাতে প্রণালী।
ফিরাইলা কি হেতুক না জানি কি বলি॥

যেহেতুক অন্য অন্য সম্প্রদায় (ক) সনে।
ব্যবহার আহার পরমার্থে নাহি বনে॥
বিচ্ছেদ হইল এই সঙ্গত না হয়।
রাজা জয়সিংহ (খ) বহু বিচার করয়॥
সে সব কহাতে এবে ফল কিছু নাঞি।
কোটি কোটি দণ্ডবত সভাকার ঠাঞি॥

চরিত্র শ্রীহরিদাস স্বামী

শ্রীমন্ হরিদাস-স্বামী প্রসিদ্ধ জগতে।
শ্রীমন্ বঙ্কবিহারীর কৃপাপাত্র-মতে॥
শ্রীমন্-বৃন্দাবন-ধামে নিধুবনে বাস।
বিরক্ত উদার প্রেমভক্তি-রসরাস॥
শ্রীবঙ্কবিহারী কৃপা করিলা যেমনে।
আশ্চর্য্য কথন সেই শুনহ শ্রবণে॥
স্বতপ্রকাশিত চিদানন্দ শ্রীবিহারী।
নিধুবনে আছিলেন যে মৃত্তিকা ভিতরি॥
হরিদাস স্বামী প্রতি প্রত্যাদেশ কৈলা।
স্বামী যত্ন করি মাটি খুদি উঠাইলা॥
পরম সৌন্দর্য্য মণিময় অপ্রাকৃত।
ভুবনমোহন রূপ অতি চমৎকৃত॥
অভিষেক করি সিংহাসনে বসাইয়া।
সেবায় নিযুক্ত হৈলা আনন্দিত হিয়া (গ)॥
অলঙ্কার বস্ত্র নানা সেবার সামিগ্র।
রাজা রাজোড়া (ঘ) সব আনে করি ব্যগ্র॥
সেবার শৃঙ্খলা অতি সুন্দর হইল।
স্বামী প্রেমানন্দে অই রসেতে মাতিল॥
শিষ্য হইবারে এক ব্যক্তি নিবেদয়।
তার স্থানে গুপ্ত এক পর্শমণি হয়॥
স্বামী সর্ব্বজ্ঞ তাহা জানিঞা কহয়।
এক পর্শমণি তব গাঁটিতে আছয়॥

পাঠান্তর—(ক) এক—এই।
(খ) তোমাতে—পরম।
(গ) শ্রীমন্ গোপালভট শ্রীমন্ গোসাঞিজীকে।

পাঠান্তর—(ক) সম্প্রদায়—সম্প্রদায়ীর।
(খ) জয়সিংহ—রাজসিংহ।
(গ) হিয়া—হৈয়া।
(ঘ) রাজা রাজোড়া—জমীদার রাজা।

রজগুণ শক্তি তার তাহা তো থাকিতে।
শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্ব না পশিবে চিতে॥
তাহা যদি দূর কর তবে যে কহিবে।
করিতে যে পারি যাথে কৃষ্ণভক্তি পাবে॥
নতুবা যাইয়া কর বিষয়-সেবন।
গতায়াত পুনঃপুন সংসার ভ্রমণ॥
এতেক শুনিঞা সেই ব্যক্তি পুন কহে।
তবে হেন বস্তুতে কি কাজ রাখি মোহে॥
পুন সাধু কহে যদি আমার সাক্ষাতে।
যমুনার দূরে জলে পারহ ডারিতে॥
তবে মোর স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র আসি লও।
শ্রীমন্ বিহারিজীর টহলিয়া হও॥
তবে সেই ব্যক্তি স্পর্শমণিকে লইয়া।
যমুনায় টান মারি দিল ফেলাইয়া॥
দেখি হরিদাস স্বামী আলিঙ্গন করি।
কৃষ্ণদীক্ষা দিলা প্রশংসিয়া বেরি বেরি॥ (ক)
সেবায় বিহারিজীর নিযুক্ত করিল।
অলৌকিক চমৎকার রঙ্গ চাঢ়ি গেল (খ)॥
এক মহাজন যে বিহারিজীর তরে।
বহুমূল্য আতর পাঠায় লোক দ্বারে॥
স্বামী যে বালুকাপরি আছেন বসিয়া।
হেনকালে লোক দিল আতর লইয়া॥
তখন বিহারিজীউ শয়নে আছয়।
দ্বার বন্ধ অঙ্গে দিতে না হয় সময়॥
স্বামী হস্তে করি সেই আতরের শিশি।
ভূমে ডারি দিলা সব সেইখানে বসি॥
লোক কহে মহাশয় কি হেতু ইহার।
হেনবস্তু ডারিলে উপরে বালুকার॥
স্বামী কহে বিহারীর অঙ্গে পরাইনু।
বরঞ্চ দেখহ চল ঠাকুরের তনু॥
গাত্রোত্থানের তবে সময় হইল।
লোকেরে যাইয়া তবে অঙ্গ দেখাইল॥
শ্রীঅঙ্গ বাহিয়া সেই আতর পড়িছে।
সদ্গন্ধেতে দশদিগ আমোদ করিছে॥

পাঠান্তর—(ক) কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিয়া প্রশংসিলা বেরি।
(খ) ঐকান্তিকে সেইজন হরিপ্রাপ্ত হৈল।

আশ্চর্য্য মানিঞা সেই লোক চলি গেলা।
শ্রীকৃষ্ণভক্তের কেবা জানে কোন্ লীলা॥
শ্রীমন্ শ্রীহরিদাস স্বামীর চরণ।
কৃপা লাগি লালদাস করয়ে বরণ॥

চরিত্র শ্রীহরিরাম ব্যাসজী

†শ্রীমন্ হরিরাম নাম ব্যাস গোস্বামী।
মহা অনুভাব ভক্তিবান্ মহাপ্রেমী॥
ঝন্নাপন্না নামে দেশ তথায় নিবাস।
সর্ব্বত্যাগ করি (ক) যেই ব্রজে কৈলা বাস॥
শ্রীমন্-মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর।
শিষ্য শ্রীমাধব নাম (খ) শিষ্ট শান্ত ধীর॥
তাঁর শিষ্য শ্রীল হরিরাম যে গোসাঞি।
অতএব তাঁর বংশ মাধবী সম্প্রদাই॥
শ্রীমন্ ব্যাস (গ) কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবন।
বিনে নাহি ভায় জ্ঞাতি-কুটুম্ব-ভোজন॥
একদিন গৃহে কোন বিবাহ-উৎসাহ।
ভাই ভাতিজায় করে পক্কান্ন সমূহ॥
মিষ্টান্নাদি সামগ্রীর ভাণ্ডারে ভাণ্ডারী।
আপনি হইল মনে পরামর্শ করি॥
অপূর্ব্ব সামগ্রী সব ইতরে খাইবে।
বৈষ্ণবের যোগ্য যাথে কৃষ্ণ তৃপ্ত হবে॥
এতেক ভাবিয়া কারো কিছু না কহিয়া।
বৈষ্ণব নিমন্ত্রি সব দিল খাওয়াইয়া॥
ভ্রাতা-আদিগণ গালি পাড়িয়া কহয়।
বিবাহের কার্য্যে এবে কি হবে উপায়॥
তেঁহো কহে অনর্থক কেনে কর এত।
বৈষ্ণব খাওয়াও যাহা সাধুর সম্মত॥

পাঠান্তর—(ক) সর্ব্বত্যাগ করি—সর্ব্বত্যাগী সাধু।
(খ) শ্রীমাধব নাম—যেই শ্রীমাধব।
(গ) শ্রীমন্ ব্যাস—শ্রীমন্ হরিরাম।
† ইহার পূর্ব্বে কোন কোন্ সংস্করণে অতিরিক্ত দুই পঙ্ক্তি আছে। যথা—
শ্রীহরিরাম ব্যাস বৈষ্ণব-প্রধান।
করি তাঁর গুণগান লভিবারে ত্রাণ॥

ব্যাসজীর চরিত্র যে অপূর্ব্ব কথন।
পরম নৈষ্ঠিক নাহি যাহার সমান॥
একদিন মহোৎসব হৈল কোন স্থানে।
উচ্ছিষ্ট যে অন্ন নিঞা যায় হাড়িগণে॥
ব্যাসজীউ জিজ্ঞাসিলা সেই হাড়িগণে।
কোথায় পাইলি অন্ন ভোজ কোন্ স্থানে॥
হাড়িগণ কহে আজি অমুকের স্থানে।
মহোৎসব হইল খাইল সাধুগণে॥
তাহা শুনি ব্যাসজীউ আনন্দিত হৈল।
তাহা হইতে একমুষ্টি লইয়া খাইল॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট এমতি গুণ তার।
খাইবামাত্রেতে হৈল প্রেমের বিকার॥
জ্ঞাতি গোষ্ঠী তাহা দেখি কৈল অসংগ্রহ।
ব্যাসজীর তাহে কিছু না হৈল অসহ॥
ঠাকুরাণী সহ সব বৃন্দাবনে গেলা।
মহিমা দেখিয়া সভে চমৎকার হৈলা॥
সেই জ্ঞাতি গোষ্ঠী আসি চরণে পড়িলা।
প্রার্থনা করিয়া খাওয়াইতে না পারিলা॥
গৃহ ছাড়ি সাধু বৃন্দাবনে কৈল বাস।
তথায় নর্ত্তকগণ করে লীলা রাস॥
নাচিতে নাচিতে রাধিকার যে নূপুর।
খসিয়া পড়িল ছিণ্ডি (ক) অঙ্গুলির ডোর॥
ব্যাসজী উঠিয়া ছিণ্ডি যজ্ঞ-উপবীত (খ)।
নূপুর বান্ধিয়া দিলা গদগদ চিত॥
কহে সাধু আজি মোর এ-যজ্ঞোপবীত।
সফল হইল কর্ম্মে লাগিল উচিত॥ †
তিন পুত্রে ব্যাসজীউ আপনার ধন।
বাঁটোয়ারা করিয়া দিবারে হৈল (গ) মন॥

পাঠান্তর—(ক) খসিয়া পড়িল ছিণ্ডি—ছিণ্ডিয়া পড়িল খসি।
(খ) যজ্ঞ-উপবীত—যজ্ঞো যে পবীত।
(গ) দিবারে হৈল—দিবার কৈলা।

† ইহার পর কোন কোন সংস্করণে অতিরিক্ত চার পঙ্‌ক্তি আছে। যথা—
শ্রীহরিরাম ব্যাস হন তিন সহোদর।
সকলেই সাধু তাঁরা গুণে শ্রেষ্ঠতর॥
যাইবারে বৃন্দাবন করিয়া মনন।
সংসারের সুখ সব দিলা বিসর্জ্জন॥

পুন বিচারিল অর্থ পাইয়া সভাই।
কৃষ্ণ না ভজিবে কেহো হইয়া বিষই॥
বৈরাগ্য জন্মায় কারো (ক) শ্রীকৃষ্ণ ভজয়
পরামর্শ করি মনে চিন্তিল উপায়॥
এক বাট কৈল ধনে ধান্য বাটী ঘর (খ)।
একবাট ঠাকুর শ্রীকিশোরী কিশোর॥
একবাটে মালা শ্যামবন্ধনী তিলক।
তিন বাটে কৈল এক শুনিতে কৌতুক॥
গুলি বাঁট করি উঠাইলা তিন জন।
তিন জনে তিন বস্তু করিলা গ্রহণ॥
ব্যাসজীর স্ত্রী অতি পতিব্রতা সতী।
বৃন্দাবনে আইলেন লইবারে পতি॥
ব্যাসজী তাঁহারে গৃহে যাইতে কহেন।
তেঁহো নাহি যান বনে পড়িয়া রহেন॥
তবে সাধু দূরে থাকি বৈষ্ণব-সেবনে।
রাখিলেন নিজ স্ত্রী জ্ঞান নাহি মনে॥
একদিন ব্যাসজীউ বৈষ্ণবের সহ।
প্রসাদ পাইতে বৈসে করিয়া উৎসাহ॥
ঠাকুরাণী দুগ্ধ পরিবেষণ করিতে।
সরখানা কাড়ি (গ) দিল ব্যাসজীর পাতে॥
ব্যাসজী কহেন হাঁরে দুষ্টিনী কুমতি।
বড় সরখানা দিলে মোরে জানি পতি॥
আজি হৈতে মুখ নাহি দেখিব তোমার।
এতো কহি তাঁহারে করিল বেরেস্তর (ঘ)॥
সুবোধ সুশীলা তেঁহো পরামর্শ কৈল।
নিজ অলঙ্কার দশ সহস্রের ছিল॥
লইয়া শ্রীব্যাসজীর (ঙ) নিকটে ধরিয়া।
করযোড়ে কহে কিছু মিনতি (চ) করিয়া॥
শ্রীমন্ কিশোরজীর মন্দির যে নাঞি।
মন্দির বানাও এই গুলিকে ভাঙ্গাই॥

পাঠান্তর—(ক) বৈরাগ্য জন্মায় কারো—বৈরাগ্য জন্ময়ে যাহে।
(খ) ধন ধান্য আদি করি আর গৃহ ঘর।
(গ) কাড়ি—ডারি।
(ঘ) বেরেস্তর—তিরস্কার।
(ঙ) লইয়া শ্রীব্যাসজীর—তাহা সব ব্যাসজীর।
(চ) মিনতি—বিনয়।

তাহার চরিত্র দেখি প্রসন্ন (ক) হইল।
তাহাতে কিশোরীজীর মন্দির বনিল (খ)॥
ব্যাসজীর প্রভাব কতেক কহা যায়।
যুগলের প্রেমানন্দে দিবানিশি যায়॥
হরিরাম ব্যাস আর শ্রীআনন্দঘন।
আর হরিদাস স্বামী এই তিনজন॥
মহা-অনুভব সিদ্ধ শুনিয়া পাতসা।
দেখিবারে মনে বড় হইল তিরিষা॥
লইয়া যাইতে রাজা এই তিনজনে।
যান পাঠাইয়া দিলা শ্রীবৃন্দাবনে॥
ঞেহারা যাইতে কেহো সম্মত নহিলা।
তথাপিহ একান্ত করিয়া নিঞা গেলা॥
তিনই বিরক্ত অবধূত-বেশ হয়।
অর্দ্ধ-উন্মীলিত দৃষ্টি উন্মত্তের প্রায়॥
পাতসা লইয়া বহু সম্মান করিল।
নির্জ্জন পবিত্র স্থানে সভারে রাখিল॥
কৃষ্ণকথা পুছে রাজা সুসন্দর্ভ মতে (গ)।
সাধুগণ অতি তুষ্ট হইলা তাহাতে॥
দুই তিন দিন পুঁক উৎকণ্ঠিত হৈলা।
বৃন্দাবনে যাইবারে রাজারে কহিলা॥
রাজা কহে এতেক উৎকণ্ঠা কেনে হও।
কার কোন্ সেবা তোমা-সভাকার কও।
এতেক শুনিঞা সভে আনন্দিত হৈলা।
তিনজন প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসিলা (ঘ)॥
ব্যাসজীর সেবা সদা পীকদানি হাথে।
থাকেন যুগল-পার্শ্বে রঙ্গমহলেতে॥

দোহা হিন্দী।

নবকুমার চন্দ্রচূড়া নৃপতি সামরো
শ্রীরাধিকা তবন মন পট্টরাণী।
শেষগৃহ আদি বৈকুণ্ঠ পরয়ন্ত
সব লোক থানে তবন রাজধানী॥
মেঘ ছাপ্পান্ন কোট রাগ সীঁচত যাঁহা
মুক্তি চারো যাঁহা ভরত পাণি।
সুর শশী পাহরু পবন জল ইন্দ্রা
চরণ-দাসী ভট্ট নিগম্বাণী॥
ধর্ম্ম কোতোয়াল শুক সুত নারদ যাঁহা
করত চরাচর সনকাদি জ্ঞানী।
সত্ত্বগুণ পহরিয়া কাল বঁদুয়া যাঁহা
দাঁড়ি এত কর্ম্ম কামরতি সুখ নিশানি॥
কনক মরকত ধর নিকুঞ্জ কুসুমিত মহল
মধ্য কমনীয সেনি আটানি।
পলন বিরত দোউ যাঁহা না পোঁছে কোউ
শ্রীব্যাসমহলন নিয়া পীকদানি॥ ইতি

হরিদাস ঠাকুরের চামরসেবন।
আনন্দঘনের সেবা পাদসম্বাহন॥
এতেক শুনিঞা রাজা আনন্দিত হৈল।
কিছু ভাব উদয় হইয়া বিচারিল॥
ব্যাসজীকে অতি শীঘ্র কহিলা যাইতে।
সদা কার্য্য পীকদানির পীকাদি ডারিতে॥
আর দুই জনাকে কহেন স্তুতি করি।
তোমরা চামর পাদসেবা অধিকারী॥
তাহাতে কিঞ্চিত গৌন হৈল ক্ষতি নাঞি।
কৃপা করি রহ দিন দুই এই ঠাঁই॥
ব্যাসজী চলিয়া গেলা তাঁহারা রহিলা।
দিন দুই তিন বাদে তাঁহারাও গেলা॥
অতএব ব্যাসজীর অলৌকিক লীলা।
কিঞ্চিত কহিল সব কহিতে নারিলা॥

চরিত্র শ্রীঅলি-ভগবান

শ্রীল-অলি ভগবান নাম বড় সাধু।
কৃষ্ণরসে মত্ত পান করে প্রেমমধু॥
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে মাতোয়ার প্রায় (ক)।
বৃন্দাবন দরশনে (খ) হইল আশয়॥

পাঠান্তর—(ক) প্রসন্ন—সন্তোষ।
(খ) বনিল—হইল।
(গ) রাজা সুসন্দর্ভ মতে—বড় সন্দর্ভের মতে।
(ঘ) তিন দোঁহা তিনজনে প্রেমেতে পড়িলা।

পাঠান্তর—(ক) ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে মাতোয়াল প্রায়।
(খ) দরশনে—দেখিবারে।

বৃন্দাবনে গেলা বহুকৃচ্ছ্রে (ক) মহাশয়।
অশ্রুধারা অবিরাম দেখিতে না পায়॥
বৃন্দাবনে গিয়া দেখে রতন-জড়িত।
ভূমি গৃহ বৃক্ষ স্তম্ভ যমুনার ভিত॥
কল্পবৃক্ষময় কল্পলতা সুশোভিত।
যে দিগে নেহারে হেরি হয় চমকিত॥
যমুনা-পুলিনে দেখে শ্রীরাসমণ্ডল।
ত্রিজগমোহন শোভা পরম বিরল॥
তথায় যাইবামাত্র স্ত্রীরূপ হইল।
গোপী অভিমান হৈল সে দেহ ভুলিল॥
গোপীসহ রাধাকৃষ্ণ হেরিয়া মোহিত।
চারিপানে (খ) চাহে হয়ে চমকিত-চিত॥
গোপীগণ হাথে ধরি নিকটে আনিঞা।
হাস্য পরিহাস্য করে প্রণয় ভরিয়া॥
রাসরসে কৃষ্ণরসে হইল মগন।
ক্ষণেক বেয়াজে আর দেখিতে না পান॥
বিরহে কাতর যে কথোক দিন পরে।
সে দেহ ছাড়িয়া সেই রসে নৃত্য করে॥
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার।
সর্ব্বসিদ্ধি পাইল যেঁহো জিতিল (গ) সংসার॥

চরিত্র শ্রীরসিক-মুরারি

শ্রীমান্ রসিক মুরারি মহাভাগ।
সিদ্ধ মহান্ত কৃষ্ণে মহা-অনুরাগ॥
সহস্রেক চেলা সকলেই শক্তিবন্ত।
সকলেই ভক্তিবন্ত সকলেই শান্ত॥
ঠাকুর-সেবার আর বৈষ্ণব-সেবার।
গ্রাম ভূম আছে ভার চেলার উপর॥
গোমস্তা স্বরূপ এক চেলা গ্রামে থাকে।
শুদ্ধমতি গুরু আজ্ঞা সাবধানে রাখে॥
দৈবাত্ত যে সেই গ্রামে রাজার আজ্ঞাতে।
অন্য কেহ আইলেক দখল করিতে॥

পাঠান্তর—(ক) বহুকৃচ্ছ্রে—বহুক্লেশে।
(খ) চারিপানে—চারুপানে বা চারিদিগে।
(গ) পাইল যেঁহো জিতিলে—পাইল যে এ তিন।

শিষ্য সেই সমাচার গুরুকে লিখিলা।
রসিক মুরারি ভাল বুঝিতে নারিলা॥
শিষ্যকে লিখিলা তেঁহো পত্রপাঠ হেথা।
চলিয়া আসিবে তুমি শুনিব কি কথা॥
ভোজন করিতে বসি ছিলা সেই চেলা।
হেনই সময়ে পত্র লোকে নিঞা দিলা॥
খাইতে খাইতে সেই লিখন পড়িয়া।
ঐমনি উঠিল তবে অন্ন তেয়াগিয়া॥
আচমন নাহি করে সকড়া মুখেতে।
হস্তে বস্ত্র জড়াইয়া চলিলা তুরিতে (ক)॥
গুরুর অগ্রেতে গিয়া দণ্ডবত করি।
দাণ্ডাইল সঙ্কোচিত চক্ষে বহে বারি॥
রসিক-মুরারি জীউ প্রসন্নবদনে।
পুছেন হস্তেতে বস্ত্র জড়াইলে কেনে॥
শিষ্য কহে পাঠমাত্র আসিতে লিখিলা।
ভোজন রাখিয়া ঐমনি চলি আইলা॥
আচমন করিতে যে হইবে গউন।
এ কারণ আইনু হস্তে লপটি (খ) বসন॥
শিষ্যের এ রীত শুনি রসিক-মুরারি।
প্রসন্ন হইয়া কন যাও ত্বরা করি॥
আচমন করিয়া আইস শীঘ্র করি (গ)।
তবে তারে বিশেষ পুছেন যে মুরারি (ঘ)॥
গ্রাম [illegible] করিল রাজার লোক আসি।
বিশেষ কহিলা তবে গুরুস্থানে বসি॥
রসিক মুরারি তবে সহস্রেক চেলা।
তার সমিভব্যারে দিয়া আজ্ঞা করি দিলা॥
রাজার যে লোক সব (ঙ) দূর করি দেহ।
গ্রাম গিয়া আপন দখল করি লহ॥
তবে তেঁহো পরমার্থ-ভ্রাতাগণ সঙ্গে।
গিয়া রাজভৃত্য সব দূর কৈল রঙ্গে॥

পাঠান্তর—(ক) তুরিতে—ত্বরিতে।
(খ) লপটি—ঢাকিয়া।
(গ) শীঘ্র করি—শীঘ্রগতি।
(ঘ) যে মুরারি—মহামতি।
(ঙ) যে লোক সব—যতেক লোক।

রাজা শুনি ক্রোধ করি ফৌজ (ক) পাঠাইলা।
এক মত্তহস্তী তার সমিভব্যার দিলা॥
স্নেহাদিগের প্রতাপে সে ফৌজ পলাইল।
মত্তহস্তী আক্রমণ করিয়া আইল॥
গুরুভক্ত সেই শিষ্য হস্তীর শ্রবণে।
কৃষ্ণনাম দীক্ষা দিলা ধরিয়া তৎক্ষণে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি হস্তী নাচিতে লাগিলা।
মাহুতেরে দূরে টানমারি ফেলি দিলা॥
নাম গোপাল দাস বলিয়া রাখিলা।
নাসে (খ) টীকা দিলা গলে তুলসীর মালা॥
গ্রামে গ্রামে ফিরে হস্তী সভে প্রীতি করে।
শান্ত স্বভাব কারো অনিষ্ট না করে॥
রাজার লোকেতে যবে ধরিবারে যায়।
সে সব লোকেরে তবে মারিয়া ভাগায়॥
রসিক-মুরারিজীর আশ্রমে যখন।
বৈষ্ণব ভোজন করে যায় সে তখন॥
দুয়ারে পড়িয়া (গ) থাকে বৈষ্ণব খাইলে।
উচ্ছিষ্ট পত্রাদি নিঞা বাহিরে ডারিলে॥
তাহাই খাইয়া যায় আর নাহি চায়।
রসিক-মুরারি জীউ কৃপা করে তায়॥
একদিন মহোৎসবে অনেক বৈষ্ণব।
প্রসাদ পাইতে বৈসে দেখিতে সৌষ্ঠব॥
রসিক মুরারি জীউ শিষ্যে আজ্ঞা দিলা।
বৈষ্ণবের পাদোদক লইতে বলিলা॥
তার মধ্যে এক জনার অঙ্গে কুষ্ঠ (ঘ) ছিল।
তার পাদোদক ঘৃণা করি না লইল॥
গুরু-আগে আনি দিল তেঁহো পান করি।
না পাইল স্বাদ কহে শিষ্যপানে হেরি॥
কেহ তথা কহে পাদোদক যে আনিল।
কুষ্ঠ অঙ্গে দেখি এক বৈষ্ণবের না লৈল॥
এতেক শুনিঞা সাধু শিষ্যেরে ভর্ৎসয়।
পাদোদক আন সেই বৈষ্ণব যথায়॥
পুনর্ব্বার গিয়া তাঁর পাদোদক আনি।
দিলা তবে সাধু পান করিলা তখনি॥
পঙ্গতের মধ্যে এক বৈষ্ণবের মতি।
বাতিক স্বভাবে কিছু চঞ্চল প্রকৃতি॥
খাইতে খাইতে কহে সভাই পাইলা।
পঙ্গতের মধ্যে এক সাধু রহি গেলা॥
আমার হস্তের এই সোঁটা না পাইলা।
সোঁটারে আমার সাধুমধ্যে না গণিলা॥
অতএব শীঘ্র এক পানোড়া আনহ।
সে কথায় মনোযোগ না করিল কেহ॥
তবে ক্রোধ করি নিজ পত্র উঠাইয়া (ক)।
উচ্ছিষ্ট অন্নের সহ মারিল ফেলিয়া॥
রসিক-মুরারি-জীর মুখে গিয়া লাগে।
সাধু মৃদু হাসি তাহা খায় অনুরাগে॥
কহে মুঞি বৈষ্ণবের অধর-অমৃতে।
চেষ্টা না করিনু নাহি শ্রদ্ধা কৈনু চিতে॥
বৈষ্ণব-গোসাঞি মোরে করুণা করিয়া।
অধর-অমৃত দিলা মুখেতে ডারিয়া॥
সাধুর স্বভাব দেখ কৃতার্থ মানিলা।
সেই বৈষ্ণবের বহু সম্মান করিলা॥
শ্রীমন্-রসিক-বিহারি-শ্রীচরণে।
কোটী পরণাম করি লালদাস ভণে॥

চরিত্র শ্রীসধনা

জাত্যংশে কসাই সে সধনা নাম হয়।
যাহার স্মরণে যায় অন্তর-কষায়॥
কৃষ্ণগুণ গান সদা বৈষ্ণব-সেবক।
জাতিধর্ম্ম (খ) নাহি হয়ে জীবের হিংসক (গ)॥
কিনিঞা আনিঞা মাংস বেচি গুজরান।
বাটখারা তার এক শালগ্রাম হন॥
তেঁহো নাহি জানে কারে বলে শালগ্রাম।
বাটখারা বলি জানে পাথরের থুম (ঘ)॥

পাঠান্তর—(ক) ক্রোধ করি ফৌজ—ক্রোধে বহু সৈন্য।
(খ) নাসে—নাকে।
(গ) পড়িয়া—দাঁড়ায়ে।
(ঘ) এক জনার অঙ্গে কুষ্ঠ—একজন কুষ্ঠব্যাধি।

পাঠান্তর (ক) উঠাইয়া—কুড়াইয়া।
(খ) জাতিধর্ম্ম—জাতিকর্ম্ম।
(গ) হিংসক—হিংস্রক।
(ঘ) থুম—থাম।

পথের কিনারে বসি বিকি-কিনি করে।
দৈবাত্ত বৈষ্ণব এক যাইতে তাহারে (ক)॥
দাণ্ডাইয়া দেখিলা যে শালগ্রাম হয়।
মাংসের বাটখারা দেখি দুঃখ উপজয়॥
তথা হৈতে লইবার মনস্থ করিলা।
ধীরে ধীরে সধনারে কহিতে লাগিলা॥
এই যে পাথর খানি মোরে তুমি দেহ।
আর এক বাটখারা দেই তাহা লহ॥
এখানি তো দিতে নারি সধনা কহয়।
যতেক ওজন করি ইহাতেই হয়॥
সের-পোয়া-আদিক ওজন করি যত।
ইহার এমতি গুণ পুরা হয় তত॥
বৈষ্ণব কহয়ে ভাই অবশ্য আমারে।
অই যে পাথরখানি দিতে হবে তোরে (খ)॥
বৈষ্ণবের একান্ত আগ্রহ দেখি দিলা।
তেঁহো নিজ গৃহে লৈয়া অভিষেক কৈলা॥
চন্দন তুলসী পুষ্প আদি করি দিয়া।
ভক্তিতে করিলা পুজা ভোগ লাগাইয়া॥
রাত্রিযোগে কহে তারে ঠাকুর স্বপনে।
তুমি কেনে আমারে যে আনিলে এখানে॥
সধনার স্থানে মুঞি সুখে আছিলাম।
তার মুখে মোর গুণগান শুনিতাম॥
তাহাতে আমার বড় সুখ জনময়।
অতএব শীঘ্র নিঞা রাখহ তথায়॥
বৈষ্ণব চেতন পাই করয়ে বিচার।
কসাইর স্থানে যাইতে চাহে (গ) পুনর্ব্বার॥
ইহাতেই বুঝি সেই বড় ভাগ্যবান্।
প্রাকৃত না হবে সেই ভক্তির নিধান॥
এতেক বিচারি তবে ঠাকুর লইয়া।
প্রাতঃকালে সধনার বাটী গিয়া দিয়া॥
নিরখিয়া তার সাধু অন্তর বাহির।
অনুভব কৈলা এই মহান্ গম্ভীর॥
দণ্ডবত প্রণাম করিয়া তাঁরে কহে।
এই বাটখারা তব প্রাকৃতিক নহে॥
শালগ্রাম ঞিহো তুমি ভজহ যাহারে।
সাক্ষাত সে ঞিহো কৃপা করিল তোমারে॥
আমি ছল করিয়া লইয়া গেনু ঘরে।
মোরে কৃপা নাহি কৈহ সম্মত তোমারে॥
এতেক শুনিঞা সধনার চিত্ত (ক) দ্রবে।
প্রাণের অধিক মানি রাখিলেন তবে॥
গৃহ পরিবার কুলাচার তেয়াগিয়া।
ভিন্ন একস্থানে রহে ঠাকুর লইয়া॥
ভিক্ষা করি ঠাকুরের সেবন করয়ে।
নাহি কোন ব্যবসা না যাচয়ে কোথায়ে॥
কথোক দিবস পরে বাঞ্ছা হৈল মনে।
শ্রীপুরুষোত্তমে জগন্নাথ দরশনে॥
প্রেমাবেশে জগন্নাথ দর্শনে চলিল।
সে-দেশীয় যাত্রী বহু পথেতে মিলিল॥
তণ্ডুল গোধুম সভে দেয় খাইবারে।
কসাই বলিয়া কেহো স্পর্শ নাহি করে॥
কথোক দূরেতে গিয়া সঙ্গছাড়া হৈলা (খ)।
ভিক্ষা করিবারে এক গ্রাম মধ্যে গেলা॥
সেই গ্রামে এক গৃহস্থের বধূ ভ্রষ্টা।
সধনা সুন্দর দেখি হৈল কামচেষ্টা॥
খাইবারে দিব বলি গৃহে লৈয়া গেলা।
দ্বাররোধ করি ভ্রষ্টাচার প্রকাশিলা॥
তেঁহো কহে মুঞি স্ত্রীর সঙ্গ নাহি করি।
বহু কহে মুঞি হৈনু নিশ্চয় তোমারি॥
বরঞ্চ স্বামীর মুঞি মস্তক কাটিয়া।
তোমার সাক্ষাতে আনি প্রত্যয় লাগিয়া॥
অন্য ঘরে স্বামী তার নিদ্রিত আছিলা।
ছুটিয়া যাইয়া তার মস্তক কাটিলা॥
কাটামুণ্ড আনিঞা সাধুর আগে ধরে।
কহয়ে তোমার হৈনু থাক মোর ঘরে॥

পাঠান্তর - (ক) এক যাইতে তাহারে—একজন তাহা হেরে।
(খ) তোরে—মোরে।
(গ) চাহে—চাহ।

পাঠান্তর—(ক) চিত্ত—মন।
(খ) গিয়া সঙ্গছাড়া হৈলা—তার সঙ্গ ছাড়াইলা।

তাহাতেও যদ্যপি সম্মত না দেখিল।
ক্রোধে তবে (ক) ভ্রষ্টা এক তুফান করিল॥
চীৎকার করিয়া কহে ওহে পাড়াপড়সী।
চোরে ধরিয়াছি সভে আগুয়াও (খ) আসি॥
আমার স্বামীর এই মস্তক কাটিল।
ধন লইবারে দ্বার রুদ্ধ যে করিল (গ)॥
এতেক শুনিয়া পাড়ার লোক যে আইল।
হাকিম আসিয়া সধনারে নিঞা গেল॥
হাকিম পুছয়ে তুমি মানুষ মারিলে।
তেঁহো মনে ভাবে (ঘ) ইহা স্বীকার না কৈলে॥
কি জানি স্ত্রীটাকে পাছে নিঞা দেয় শূলে।
তারে তো বাঁচাই মোর যে থাকে কপালে॥
যে হয়ে সে হবে মুঞি স্বীকার করিব।
পর-উপকার ইহা অবশ্য-কর্ত্তব্য॥
এতো ভাবি সাধু কহে আমি মারিয়াছি।
অর্থগুলি বটে মুঞি চুরি করিয়াছি॥
কৃষ্ণের ভক্তের কভু হিংসা নাহি হয়।
দেখহ যাহারি পাপ তাহার ফলয়॥
সেই ভ্রষ্টা স্ত্রী হেথা দম্ভ প্রকাশিয়া।
নিজ-মত স্ত্রীগণেরে কহে ফুকারিয়া॥
পতির মাথা তো মুঞি স্বহস্তে কাটিল।
তথাপিহ দুষ্ট মোর মুখ না চাহিল॥
তাহার উচিত সাজা দিনু ভালমতে।
এখন গর্দ্দান মারিবেক হাকিমেতে॥
পরস্পর সেই কথা প্রচার হইয়া।
ধরিয়া লইয়া গেলা হাকিম শুনিঞা॥
সধনারে সাধু জানি বিদায় করিল।
দুষ্ট যে রাঁড়ের (ঙ) সাজা উচিত করিল॥
সধনা শ্রীকৃষ্ণগুণ গাইতে গাইতে।
গিয়া উত্তরিল কটকের নিকটেতে॥

হোথা জগন্নাথ পাণ্ডাগণে আজ্ঞা দিলা।
সধনা নামেতে মোর ভক্ত এক আইলা॥
পালকিতে চড়াইয়া আনহ তাহারে।
আজ্ঞামাত্রে সভে গেলা তারে আনিবারে॥
পালকিতে চড়াইয়া চামর করিয়া।
প্রভুর সম্মুখে তারে দিলেন আনিঞা॥
প্রভু-ভৃত্য দরশনে আনন্দ হইল।
সধনা শ্রীমুখ হেরি আপনা ভুলিল॥
যাহারা কসাই বলি পথে ঘৃণা কৈল।
তাহারা দেখিয়া সভে চমকিত (ক) হৈল॥
তখন তাহারা সেই সধনা-চরণ।
ধূলী পাদোদক শিরে ধ'রে করে পান॥
সহস্র জন্মের পুণ্য দিয়া যদি মুঞি।
সে চরণ-রজ পাই তবে কিনে লই॥
কৃষ্ণভক্তি-সুধার সাগরে অবগাই।
তাপ পাপজ্বালা (খ) মোহ (গ) সংসার এড়াই॥

চরিত্র শ্রীকাশীশ্বর গোসাঞি

শ্রীমন্ ঈশ্বরপুরী গোস্বামীর (ঘ) শিষ্য।
প্রভুর সতীর্থ হন (ঙ) জগতে উপাস্য॥
স্বভাব উদার অতি পণ্ডিত গম্ভীর।
নিরীহ নিস্পৃহ অতি মৌনী সে সুধীর (চ)॥
মহাপ্রেম-ভব শ্রীমন্-বৃন্দাবন-ধামে।
বাতুলের প্রায় কৃষ্ণ-অন্বেষণে ভ্রমে॥
কভু উপবাস কভু শাক মূল ফল।
কভু মাধুকরী কভু পান মাত্র জল॥
যমুনার তীরে পড়ি ডাকে উচ্চস্বরে।
হাহা রাধা কৃষ্ণ বলি সদাই ফুকারে॥
যেই তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করিল।
অনায়াসে রাধাকৃষ্ণ-চরণ পাইল॥

পাঠান্তর—(ক) ক্রোধে তবে—ক্রোধভরে।
(খ) আগুয়াও—আগু হও।
(গ) ধন নিঞা যাইতে কপাট দ্বারে দিল॥
(ঘ) ভাবে—করে।
(ঙ) যে রাঁড়ের—সে ভ্রষ্টার।

পাঠান্তর—(ক) চমকিত—চমৎকার।
(খ) পাপজ্বালা—পাপজাল।
(গ) মোহ—ঘোর।
(ঘ) গোস্বামীর—গোসাঞির।
(ঙ) সতীর্থ হন—পরমার্থ ভাই।
(চ) নিরীহ নিশ্চেষ্ট মৌনী অতি সে সুধীর।

বেণুকূপ নিকটে যে সমাঝ তাঁহার।
অদ্যাপি বিরাজমান কুঞ্জের ভিতর॥
নিত্যসিদ্ধ হন দেহত্যাগ মাত্র ছল।
নানালীলা করি জীবে দেন ভক্তিবল॥
তাঁহার চরণে ভক্তি রহুক সদাই।
আমা সভার (ক) আশ্রয় যে আর কেহো নাঞি॥

চরিত্র শ্রীখোজেজী

খোজে-জীউ মহাভাগবত হন সিদ্ধ।
বয়েস অনেক কাল (খ) হইলেন বৃদ্ধ॥
শিষ্যগণে কহে মোর কালপ্রাপ্ত হৈল।
বৈকুণ্ঠের দূত মোরে লইতে আইল॥
চলিলাম মুঞি তবে শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী।
কিন্তু এক কথা কহি শুন মন করি॥
যে সময় শ্রীবৈকুণ্ঠপুরীতে যাইব।
সেইকালে এখানেতে ঘণ্টাবাদ্য হব॥
ইহা কহি সাধু তবে দেহত্যাগ কৈল।
কিন্তু যে হেথায় ঘণ্টাবাদ্য না হইল॥
না বাজিল জানি (গ) শিষ্যগণ চিন্তা করে।
কারণ কিছুই কেহো বুঝিতে না পারে॥
আর এক শিষ্য কোন দূর গ্রামে আছে।
সমাচার ঞেহারা দিলেন তাঁর কাছে॥
তেঁহ সিদ্ধ ভক্তিমন্ত দৃঢ় ভক্তিবান্ (ঘ)।
চলিয়া আইল শুনি গুরুর পয়ান[১]॥
পরমার্থ-ভ্রাতাগণ সম্মান করিলা।
গুরুর যে বাক্য তাহা তাঁরে শুনাইলা॥
বৈকুণ্ঠ যাইবামাত্র ঘণ্টাবাদ্য হবে।
শ্রীচরণ পাইলাম তাহাতে জানিবে॥

পাঠান্তর—(ক) আমা সভার- মো সভার।
(খ) অনেক কাল—অধিক এবে।
(গ) জানি—ঘণ্টা।
(ঘ) ভক্তিমন্ত দৃঢ় ভক্তিবান্—শক্তিমন্ত দৃঢ় ভক্তিমান্।
১। পয়ান—প্রস্থান মৃত্যু।

কিন্তু তাহা না বাজিল বড়ই সন্দেহ (ক)।
ইহার কারণ কিবা বিচারিয়া কহ (খ)॥
ইহা শুনি তেঁহো কহে কারণ আছয় (গ)।
যার যে বাসনা মনে ভোগ ইচ্ছা হয়॥
কৃষ্ণ তাহা পুরাইয়া নিজ ধামে লয়।
ইহার প্রমাণ ধ্রুব-আদি করি হয় (ঘ)॥
স্বামী এই আম্রতলে দেহ তেজিয়াছে।
আম্রবৃক্ষে মিষ্ট আম্র পাকি রহিয়াছে॥
দেহত্যাগ কালে আম্র খাইতে হৈল মন।
আম্রভোগহেতু নহে বৈকুণ্ঠে গমন॥
আম্রভোগ করাইয়া কৃষ্ণ দয়াময়।
লইবেন তবে তাঁরে আপন আলয়॥
ইহা কহি তবে ভ্রাতাগণেরে কহয়।
আম্রবৃক্ষে অই যে সুপক্ক আম্র হয়॥
অইটি পাড়িয়া আন বুঝিবে নিশ্চয়।
যে কারণে স্বামিজী বৈকুণ্ঠে নাহি যায়॥
তবে বৃক্ষে উঠি সেই আম্রটি আনিল।
অস্ত্রের দ্বারায় তাহা দোফাঁক (ঙ) করিল॥
ভিতর হইতে এক কীট নিকশিল (চ)।
নিকলিয়া মাত্র কীট দেহত্যাগ কৈল॥
দেহ তেজি দিব্যরূপ শ্যাম কলেবর।
চতুর্ভুজ বনমালা-শঙ্খ-চক্রধর॥
হইয়া চলিলা স্বর্ণ বিমানে (ছ) চড়িয়া।
দেখিয়া হইলা সভে চমকিত-হিয়া॥
ভোগ করাইয়া কৃষ্ণ লয় নিজ ধাম।
পাছে কেহ মনে কর প্রারব্ধাদি কাম[১]॥

পাঠান্তর—(ক) সন্দেহ—সংশয়।
(খ) কিবা বিচারিয়া কহ—কিছু বুঝা নাহি যয়।
(গ) ইহা শুনি তেঁহো কহে—শুনিয়া কহেন তেঁহো।
(ঘ) করি হয়—মহাশয়।
(ঙ) দোফাঁক—দ্বিখণ্ড।
(চ) নিকশিল—নিকলিল (তাহা ছাড়া—এক-কীট নিকশিল স্থলে একটি পীপলি খসিল)।
(ছ) স্বর্ণ বিমানে—স্বর্গ বিমানে।
১। প্রারব্ধাদি কাম—পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল।

প্রারব্ধাদি কর্ম্ম সে তো প্রথমেতে যায় (ক)।
কৃষ্ণভক্তে বাধা জন্মাইতে না পারয়॥
এই যে সাধুর আত্মভোগ যে করিল।
সুদামা বিপ্রের আর ধ্রুবে যথা হৈল॥

পাঠান্তর—(ক) প্রথমেতে যায়—প্রথমে তেজায়।

ভক্তেতে বুঝিবে কুতার্কিকে না বুঝিবে
প্রারব্ধের ভোগ বলি কুতর্কে কহিবে॥
খোজেজীর শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া।
বাসনা ত্যজিতে চাহে লালদাস হিয়া॥

ইতি শ্রীভক্তমালগ্রন্থে ত্রিপুরদাসাদি- ভক্তগণ-বর্ণনং নাম বিংশ-মালা ॥ ২০

একবিংশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীবাঁকা পতি রাঁকা স্ত্রী

বাঁকা নামে পতি তাঁর রাঁকা নামে স্তিরী (ক)।
পাণ্ডুর পুরেতে বাস বড় অধিকারী॥
কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে অনন্যশরণ।
তৃণ কাষ্ঠ বেচি করে দিন গুজরান॥
নারদ-গোসাঞি তাহা অন্তরীক্ষ হৈতে।
কৃষ্ণের ভকত বলি দয়া হৈল চিতে॥
বৈকুণ্ঠে যাইয়া ভগবানেরে কহেন।
তোমার হৃদয় প্রভু বড়ই কঠিন॥
তোমার একান্ত ভক্ত বাঁকা-রাঁকা হয়ে।
কাষ্ঠ বেচি খায় তাহা পুরা না পড়য়ে (খ)॥
এত দুঃখ কেনে দেহ তোমার (গ) ভকতে।
ভগবান্ কহে মোর দোষ নাহি তাথে॥
আমি দিতে চাহি ধন সে তাহা না লয়।
ধনে পাছে মোরে ভুলে এই তার ভয়॥
সাক্ষাতে দেখহ মুঞি দেখাই তোমারে।
যবে বাঁকা রাঁকা যায় কাষ্ঠ আনিবারে॥
সেই কালে হরি এক স্বর্ণমুদ্রা-থলি।
রাখিলেন বনের বাহিরে পথে ফেলি॥
বাঁকা আগে চলি গেল তাহা না দেখিল।
পশ্চাতে যাইতে রাঁকা দেখিতে পাইল॥
দেখি মোহরের তোড়া (ক) মনে মনে ভাবে।
স্বামী মোর জানিলে তো লইতে না দিবে॥
ধূলা মাটি চাপা দিয়া এখন তো রাখি।
পাছে কি বিচার করে তেঁহো তাহা দেখি॥
এতো ভাবি ধূলা চাপা দিয়া রাখি গেলা।
দুইজনে দুই বোঝা কাষ্ঠ বান্ধি নিলা॥
ফিরিয়া আসিতে সেইখানে রাঁকা রহি।
স্বামীরে কহয়ে এক কথা শুন কহি॥
এক থলি স্বর্ণমুদ্রা আছয়ে পড়িয়া।
আমি রাখিয়াছি ধূলা মাটি চাপা দিয়া॥
বাঁকা তাহা শুনি কহে ভাল করিয়াছ।
অর্থের উপরে ধূলা মাটি যে দিয়াছ॥
উহার পানেতে আর ফিরে না তাকাও।
হেথা হৈতে চলহ ত্বরায় পার হও॥
এত শুনি রাঁকা কিছু লজ্জিত হইয়া।
কাষ্ঠ নিঞা চলে তার আশা তেয়াগিয়া॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া শ্রীনারদ কহেন।
তব ভক্ত চরিত্র যে না যায় কথন॥
তোমার যে প্রেম-সুধারস আস্বাদিল।
প্রাকৃত বিষয়ে তার গ্রাহ্য না হইল (খ)॥
পুন নাহি কেহো তারে আটকিতে পারে।
প্রাকৃত বিষয় দিয়া এ তিন সংসারে॥
তবে শ্রীনারদ সহ প্রভু চলি গেলা।
লালদাস মূঢ়পানে (গ) ফিরে না চাহিলা॥

চরিত্র শ্রীলড্ডুভক্ত

লড্ডু নামে ভক্ত অতিশয় চমৎকার।
বাহ্যবৃত্তি নাহিক অন্তরে প্রেমাকার॥

পাঠান্তর—(ক) স্তিরী—স্ত্রী।
(খ) তাহা পুরা না পড়য়ে—তাহে বড় দুঃখ পায়ে।
(গ) তোমার—আপন।

পাঠান্তর—(ক) দেখি মোহরের তোড়া—দেখিয়া মোহর তোড়া।
(খ) তার মন প্রকৃত-বিষয়-বাহ্য হৈল॥
(গ) মূঢ়পানে—ভূতাপানে।

প্রেমাবেশে অচেতন রাত্রে কোন স্থানে।
পড়িয়া আছেন যেন মত্ত মদপানে (ক)॥
অন্য গ্রামে চোরগণ দেবীপূজা করে।
নরপশু খুঁজি বুলে বলি দিবার তরে॥
সম্মুখে দেখয়ে সেই মহাভাগবতে।
নরপশু বলি নিঞা গেলা বলি দিতে॥
পশুতুল্য চোরগুলো না চিনিল তাঁরে।
কাটিবার উদ্‌যোগ দেবীর আগে করে॥
কৃষ্ণের ভকতে হিংসা করয়ে জানিঞা।
ক্রোধে নিকশিলা দেবী প্রতিমা ফাটিয়া॥
খড়্গ হস্তে করি দেবী কাটি চোরগুলা।
মস্তক লইয়া হস্তে লুফিতে লাগিলা॥
জড়ভরতের অনুরাগে (খ) চোরগণে।
মস্তক কাটিয়া যথা করিল ক্রীড়নে॥
তেমতি মস্তক নিঞা কন্দুক খেলিলা।
ভক্তরাজে সম্মান করিয়া পাঠাইলা॥
কৃষ্ণভক্ত পক্ষপাত যেই জন করে।
তাহার চরণে করি কোটি নমস্কারে॥

চরিত্র শ্রীসন্ত ভক্ত

শ্রীল সন্ত ভক্ত নাম পরম সুজন।
বৈষ্ণব-সেবনমাত্র তাঁহার ভজন॥
কোথা হৈতে আইসে দ্রব্য কেহো নাহি জানে।
মাঙ্গিয়া আনিনু কহে গোপন-কারণে॥
একদিন সন্ত ভক্ত বাজারে গিয়াছে।
আর কোনো বৈষ্ণব গৃহেতে আসি পুছে॥
সাধু ঘরে দেখি নাঞি গিয়াছে কোথায়।
সাধুর ঘরণী কহে গিয়াছে চুলায়॥
এতেক শুনিঞা সে বৈষ্ণব ফিরি গেলা।
যাইতে পথে তাহার সনে দেখা হৈলা॥
সন্ত কহে কি কারণে ফিরিয়া চলিলে।
বুঝি মোর গৃহেতে সম্মান না পাইলে॥

পাঠান্তর—(ক) যেন মত্ত মদপানে—যথা মত্ত মধুপানে।
(খ) অনুরাগে—অনুরাগে যত।

বৈষ্ণব কহেন তব গৃহেতে যাইয়ে।
পুছিলাম সন্ত ইঁহ গেলেন কোথায়ে॥
তোমার ঘরণী কহে গিয়াছে চুলায়।
শুনিঞা চলিনু মুঞি কি বলিব তায়॥
ইহা শুনি সন্ত তাঁর চরণে ধরিয়া।
গৃহে আনি সেবা কৈলা ভকতি করিয়া॥
তৎক্ষণাত গৃহাশ্রম তেজিয়া চলিলা।
একান্ত হইয়া গিয়া (ক) বনেতে বসিলা॥
কালে কৃষ্ণপদদ্বন্দ্ব (খ) পাইলেন সাধু।
আস্বাদয় মহাশয় সেবানন্দ-মধু॥
তাঁহার চরণে করি (গ) কোটি নমস্কার।
বৈষ্ণবের পদে মতি রহুক আমার॥

চরিত্র শ্রীত্রিলোক সোণার

ত্রিলোক নামেতে এক স্বর্ণকার হয়।
একান্ত ভকতি তাঁর বৈষ্ণব সেবায়॥
রাজার কন্যার বিভা-কারণ তাঁহারে।
সোণার কলস দুই দিল গাড়িবারে॥
ওজন করিয়া সোণা ঘরে নিঞা গেলা।
বৈষ্ণব-সেবনে বড় উৎসাহ হইলা॥
সেই স্বর্ণ সমুদায় বিক্রয় করিয়া।
মহামহোৎসব কৈলা বৈষ্ণব লইয়া॥
এমতি উৎসাহ হৈল বৈষ্ণব সেবনে।
পশ্চাত কি হবে ইহা নাহি গণে (ঘ) মনে॥
হোথা বিবাহের তিন দিবস থাকিতে।
রাজদূত আইল স্বর্ণকলস লইতে॥
ত্রিলোক কহেন তাহা তৈয়ার না হয়।
তৈয়ার হইলে দিয়া আসিব তথায়॥
এতেক শুনিঞা লোক (ঙ) যাইয়া কহিলা।
ত্রিলোক ভাগিয়া (চ) এক বনে লুকাইলা॥

পাঠান্তর (ক) গিয়া—সাধু।
(খ) কৃষ্ণপদদ্বন্দ্ব—কৃষ্ণপদদ্বয়।
(গ) করি—মোর।
(ঘ) গণে—জানে।
(ঙ) লোক—দূত।
(চ) ভাগিয়া—যাইয়া।

বিবাহের পূর্ব্বদিন পুন লোক আইল।
লাগ না পাইয়া গিয়া রাজারে কহিল (ক)॥
রাজা শুনি নিজ (খ) ভৃত্যগণেরে কহয়।
স্বর্ণকারে বান্ধি আন যেখানে থাকয়॥
কৃষ্ণচন্দ্র দেখি নিজ ভক্তের উপর।
আপদ পড়িল বলি হইলা কাতর॥
ভকতবৎসল ভক্তরক্ষার কারণ।
দুই স্বর্ণকলস যে অপূর্ব্ব গঠন॥
ত্রিলোকের রূপ ধরি আপনি লইয়া।
রাজার নিকটে প্রভু আইলা ধাইয়া॥
রাজার সভায় নিঞা (গ) সম্মুখে রাখিলা।
রাজা সভ্যসদ্ সহ আনন্দ হইলা (ঘ)॥
সভাই প্রশংসে অতি সুগঠন হেরি।
পুনঃপুন দেখে রাজা নিজ হস্তে ধরি॥
রাজা কহে এতেক গঢ়ন হৈল কেনে।
তেঁহো কহে বনাইতে করি সুগঠনে (ঙ)॥
মার্জ্জন করিতে গেনু সুমিষ্ট জলেতে।
পলাইল বলি মোর যাইয়া গৃহেতে॥
ঘেরঘার করি মহা উৎপাত করিল।
খেজমত করি তার এই ফল হৈল॥
এতেক কহিয়া প্রভু ভঙ্গি উঠাইলা।
ক্রোধ করিয়া (চ) চারি পাঁচ পদ গেলা॥
ফিরাইয়া রাজা অতি লজ্জিত হইয়া।
নিজলোকে কহে ত্রিলোকের বাটী গিয়া॥
পদাতিকগণে শীঘ্র উঠাইয়া আন।
কোন উপদ্রব তথা নাহি করে যেন॥
ত্রিলোক জ্ঞানেতে রাজা শিরপা করিল।
বহু অর্থ দিয়া পুন তাহারে তোষিল॥
প্রভু সেই অর্থ আদি ত্রিলোকের ঘরে।
লইয়া যাইয়া রাখি ধরি রূপান্তরে॥

পাঠান্তর- (ক) গিয়া রাজারে কহিল—কহে পলাইয়া গেং
(খ) নিজ -যত।
(গ) সভায় নিঞা—নিকটে গিয়া।
(ঘ) আনন্দ হইলা—আনন্দিত হৈলা।
(ঙ) বনাইতে করি সুগঠনে—সুগঠন বানান কারণে।
(চ) ক্রোধ করিয়া—ক্রো. গত হইয়া।

বনেতে ত্রিলোক যথা আছেন বসিয়া।
খাদ্য সামগ্রী নিঞা গেলেন চলিয়া॥
সামগ্রী সম্মুখে দিয়া কহে দ্রুততর।
রাজা বহু অর্থ দিলা শীঘ্র যাহ ঘর॥
সোণার কলস পাই অতি তুষ্ট হৈল।
শাল শিরপা বহু পুরস্কার কৈল॥
কহিতে কহিতে হরি অন্তর্দ্ধান হৈল।
ত্রিলোক অন্তরে অনুমানেতে বুঝিল (ক)॥
জানিলাম কৃষ্ণ এই মায়া প্রকটিল।
খাইয়া (খ) চলিল কারে কিছু না কহিল॥
ঘরে গিয়া দেখে নানা দ্রব্য কত মত।
কৃষ্ণের ইচ্ছায় আরো হৈল শত শত॥
অর্থ পাইয়া সাধু করে কৃষ্ণসেবা।
প্রেমানন্দে রহে মগ্ন সদা (গ) রাত্রি দিবা॥
সোণার কলস আনে যেই কারিগর।
তাহার সহিত যে ত্রিলোক স্বর্ণকার॥
আমার হৃদয় রহু সেই দুজনার।
অভয় চরণ যাহা বিনে নাহি আর॥

চরিত্র শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজার

শ্রীপুরুষোত্তমবাসী রাজা প্রতাপরুদ্র।
যাঁহার স্মরণে নাশে সকল অভদ্র॥
প্রতাপ প্রচণ্ড যাঁর প্রতিজ্ঞা-দৃঢ়তা।
অন্য ক্ষত্রিয়ে তাঁরে আগে মানি কাপুরুষতা (ঘ)॥
ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা যে দৃঢ়তর হয়।
তুচ্ছ প্রতিজ্ঞা সাধি শ্লাঘা করয়॥
মহারাজ প্রতাপরুদ্রের যে প্রতিজ্ঞে।
যে প্রতিজ্ঞা ত্রিভুবনে প্রশংসয় বিজ্ঞে॥
মুনি ঋষি তপস্বী বেধস ভব শেষ।
কোটিকল্প তপে যার না পায় উদ্দেশ॥

পাঠান্তর—(ক) বুঝিল—জানিল।
(খ) খাইয়া—ধাইয়া।
(গ) রহে মগ্ন সদা—সতত জাগয়ে।
(ঘ) অন্য ক্ষত্রি যাঁর আগে মানে কাপুরুষতা।

তাহার প্রতিজ্ঞা দঢ় রদ করি তাহা।
সাধিল আপন পণ নিজ সাধ্য যাহা॥
ত্রৈলোক্যের নাথ শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র হরি।
তাঁহারে জিনিল তাঁর সনে হঠ করি॥
গৌরচন্দ্র কহয়ে যে রাজদরশন।
কদাচ না করিব করিল দঢ় পণ॥
মহারাজা কহে মুঞি অবশ্য মিলিব।
শ্রীচরণে দঢ় মন আত্ম সমর্পিব॥
রাজ্য ধন দেহ প্রাণ গণনা না কৈলা।
ধন্য মহারাজ সেই প্রতিজ্ঞা রাখিলা॥
অভয় পরম নিধি শ্রীচরণপদ্ম।
জিনিঞা লইয়া হৃদে করিলেন বদ্ধ॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা খর্ব্ব হইয়া তখন।
বশীভূত হইলেন বিক্রীত যেমন॥
মহারাজা শ্রীচৈতন্য সাধিল যেমনে।
কি আশ্চর্য্য (ক) কথা সেই সুখদ শ্রবণে॥
পণ্ডিত গম্ভীর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
যতেক পুরুষোত্তমে দণ্ডীর আচার্য্য॥
সভাসদ্ প্রধান শ্রীপ্রতাপরুদ্রের।
ব্যবস্থা প্রামাণ্য যাঁর স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের॥
মহাপ্রভু প্রথমে শ্রীমন্দিরে যবে গেলা।
প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পড়িলা॥
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য অষ্ট সাত্ত্বিক দেখিয়া।
কোলে করি নিঞা গেলা বিস্মিত হইয়া॥
নিজ গৃহে নিঞা তবে শুশ্রূষা করিয়া।
গোপীনাথ-আচার্য্যেরে কহেন পুছিয়া (খ)॥
রূপ দেখি চমৎকার অলৌকিক প্রেম।
কেটা বটে কহ ইঁহো কোথা পূর্ব্বাশ্রম॥
পরিচয় দিয়া পরে কহেন আচার্য্য।
ইঁহো শ্রীমান্ ভগবান্ অবতার-বর্য্য॥
তাহা শুনি ভট্টাচার্য্য উপহাস কৈল।
আচার্য্য পাইয়া ক্ষোভ প্রহুড়ি করিল॥
অনেক বিচার কৈল সার্ব্বভৌম-সনে।
ঈশ্বর করিয়া সার্ব্বভৌম নাহি মানে॥
তবে শ্রীআচার্য্য সার্ব্বভৌমেরে কহিল।
আমি এই ভিতে আঁক কাটিয়া রাখিল॥
প্রভুর করুণা যবে তোমারে হইবে।
তোমার বুদ্ধির মোহ যবে দূর যাবে॥
তুমিতো তখন এই সিদ্ধান্ত করিবে।
এই মহাপুরুষের শরণ লইবে॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভাল ভাল তা পারিবে।
এখন স্বকার্য্যে যাহ পশ্চাত শিখাবে॥
ইহা কহি ভট্টাচার্য্য উড়াইয়া দিলা।
আচার্য্য তখন তবে কিছু না বলিলা (ক)॥
স্থূলে স্থূলে কহি কিছু সংক্ষেপ কথনে।
এ সকল লীলা প্রত্যক্ষ (খ) ত্রিভুবনে॥
যেমতে পাইল রাজা প্রভুর চরণ।
তাহার প্রসঙ্গে কহি এ সব কথন॥
তবে ভট্টাচার্য্য পুন কহয়ে প্রভুরে।
বেদান্ত শুনহ নাচ-কাচ করি (গ) দূরে॥
প্রভু কহে যে আজ্ঞা যাহাতে মোর হিত।
হয় তাই কর কৃপা করি যে উচিত॥
মূর্খ মুঞি মোর নাহি দিগ পাশ (ঘ) জ্ঞান।
দয়া করি কর যাথে মোর পরিত্রাণ॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভাল তাহাই হইবে।
ঈশ্বর তোমার অর্থে ভালই করিবে॥
এতো কহি ভট্টাচার্য্য বেদান্ত বাখানে।
সাত দিন ধরি প্রভু বসিমাত্র শুনে॥
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম আর তত্ত্বমসি জ্ঞান।
মায়াবাদময় (ঙ) যাহা পাষণ্ডী বিধান॥
এই সব মত ব্যাখ্যা করে ভট্টাচার্য্য।
কিছু নাহি কহে প্রভু করি রহে ধৈর্য্য॥

পাঠান্তর—(ক) কি আশ্চর্য্য—কিমাশ্চর্য্য।
(খ) পুছিয়া—পুজিয়া।

পাঠান্তর—(ক) বলিলা—কহিলা।
(খ) প্রত্যক্ষ—প্রচরূপ।
(গ) করি—তেজি।
(ঘ) দিগ পাশ—দিশ পাশ।
(ঙ) মায়াবাদময়—মায়াময় বাদ।

ভট্টাচার্য্য কহে তুমি মৌন করি রহ।
বুঝ কি না বুঝ তাহা কিছুই না কহ॥
প্রভু কহে কি কহিব যে করিছ অর্থ।
সকলি যে বিপর্য্যয়-ব্যাখান অনর্থ॥
সৎ-চিৎ আনন্দময় রূপ ভগবান্।
অনন্ত স্বরূপশক্তি যোগমায়া হন॥
জীব নিত্যদাস সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ।
ইহার অন্যথা কর বড়ই এ ধন্দ॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া (ক) কর গৌণার্থ ব্যাখ্যান।
লক্ষণা[১] করিয়া সব কহ (খ) অবিধান॥
ঈশ্বর নিঃশক্তি আর বিগ্রহ অনিত্য।
অশ্রোতব্য এই বাক্য বড়ই অনর্থ॥
শুনি দগ্ধ হয় কর্ণ না সহে পরাণে।
ভট্টাচার্য্য ইহা শুনি ক্রোধ হইল মনে॥
কহয়ে তুমি যে বড় আমারে শিখাও।
কি শিখেছ তুমি তবে শুনি দেখি কও॥
প্রভু কহে তবে যদি আজ্ঞা কর তুমি।
কিছু ব্যাখ্যা করি তবে যাহা জানি আমি॥
তবে প্রভু সেই সূত্র ব্যাখ্যা আরম্ভিল।
ষাইট প্রকার তার সদর্থ করিল॥
শুনি ভট্টাচার্য্য তবে চমকিয়া কহে।
ইহা তো সামান্য মনুষ্যের সাধ্য নহে॥
ভট্টাচার্য্যের যে ছিল পাণ্ডিত্য-অভিমান।
গেল যদি তবে প্রভু হৈল কৃপাবান্॥
আচম্বিতে ভট্টাচার্য্য দেখয়ে প্রভুরে।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করে॥
শ্যামল-সুন্দর বনমালা পীতবাস।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ স্বর্ণরেখা শ্রীনিবাস॥
দেখি চমৎকার ভট্ট অনিমিখে চাহে (গ)।
প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত সম্বিত নাহি দেহে॥

পাঠান্তর—(ক) মুখ্যার্থ ছাড়িয়া—মুখ্য অর্থ ছাড়ি।
(খ) কহ—কর।
(গ) দেখি অনিমেষ চমৎকার ভট্ট চাহে।

১। লক্ষণা—শব্দের প্রধান অর্থ ছাড়িয়া গৌণ অর্থ গ্রহণ। যেমন—গঙ্গায় ঘোষেরা থাকে, এখানে লক্ষণা দ্বারা গঙ্গার অর্থ গঙ্গাতীর।

দেখিতে দেখিতে আর সে রূপ না দেখে।
পূর্ণব্রহ্ম রূপ পুন গৌরাঙ্গ নিরখে॥
তখন যে গোপীনাথ আচার্য্যের বাক্য।
স্মরণ হইল তাহা হইল (ক) প্রত্যক্ষ॥
পরম ভকতি ভাবে যতন করিয়া।
রাখিল আপন গৃহে (খ) সেবা নিরূপিয়া॥
গুহ্যভাবেতে গিয়া কহে রাজস্থানে।
এক মহাপুরুষ আইলা শ্রীপুরুষোত্তমে॥
শ্রীচৈতন্য নাম শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
চতুর্ভুজ রূপ মোর হইল গোচর॥
অনির্ব্বচনীয় সেই অলৌকিক রূপ।
ত্রৈলোক্য জিনিঞা কান্তি পরম অনুপ॥
রাজা শুনি চিত্তে কিছু আশ্চর্য্য মানিল।
অনেক বিতর্ক করি ভাবিতে লাগিল॥
পুরুষোত্তম মধ্যে চতুর্ভুজ হয় সভে।
তার মধ্যে বিশেষ প্রকার কিছু হবে॥
রাজা মনে এত যদি বিতর্ক করিলা।
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি প্রভু তা জানিলা॥
আর দিন ভট্টাচার্য্য দেখে আচম্বিতে।
ষড়ভুজ প্রভু তিন-অবতার-মতে॥
শ্যামবর্ণ দুই হস্ত মুরলীবদন।
দূর্ব্বাদলশ্যাম দুই হস্তে ধনুর্ব্বাণ॥
হেমবর্ণ দুই হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু।
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য রূপ স্নিগ্ধ সুনির্ম্মল (গ)॥
ভট্টাচার্য্য (ঘ) দেখি পুন রাজারে কহিল।
অন্তস্পটে প্রভু নৃপে কৃপাবান্ হৈল॥
রাজার জন্মিল মহাপ্রেম অনুরাগ।
শ্রীচৈতন্যে হইল রাগ সর্ব্বত্র বিরাগ॥
শ্রীচৈতন্য ধ্যান জ্ঞান শ্রীচৈতন্য প্রাণ।
শ্রীচৈতন্য ব্যতীত আর নাহি সুজে আন॥
শিষ্টলোক পাঠায় শ্রীচৈতন্য-চরণে।
একান্ত মিলিয়া চাহে লইতে শরণে॥

পাঠান্তর—(ক) হইল—দেখিল।
(খ) গৃহে—ঘরে।
(গ) অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হেরি জুড়ায় নয়ান।
(ঘ) ভট্টাচার্য্য—দ্বিজবর।

প্রভু তাহা নাহি শুনে উপেক্ষা করয়।
কহে সন্ন্যাসীর রাজভেট না জুয়ায়॥
তবে রাজা ভক্তবৃন্দগণের চরণে।
ধরিয়া পড়িল মিলিবারে প্রভুসনে॥
ভক্তগণ যোগ্যপাত্র জানিঞা রাজারে।
যোড়হাত করি সভে কহয়ে প্রভুরে॥
রাজা তব চরণে শরণ লইবারে।
কাতর হইল একবার হের তারে॥
প্রভু কহে হেন বাক্য পুন না কহিবে।
পুন যদি কহ তবে হেথা না দেখিবে॥
সন্ন্যাসীর অনোচিত রাজ-দরশন।
স্ত্রী দরশন সম বিষের ভক্ষণ॥
এতো শুনি ভক্তবৃন্দ আর না কহিলা।
রাজা তাহা শুনি অতি খেদিত হইলা॥
আর্ত্তনাদ করি কহে তাপিত হইয়া।
আইলা প্রভু ত্রিভুবন নিস্তার লাগিয়া॥
একান্ত যে এই কি প্রতিজ্ঞা কৈল মনে।
জগত তারিব একা প্রতাপরুদ্র বিনে॥
শুনিলাম জগাই মাধাই তরাইল।
আমি তো পাতকী তবে কি দোষ করিল॥
তবে (ক) যদি উপেক্ষিলা কি কায বাঁচিয়া।
প্রাণত্যাগ করি তবে তাঁরে সঙরিয়া॥
রায় রামানন্দ তবে আশ্বাস করিয়া।
রাখয়ে রাজার প্রাণ মরিতে না দিয়া॥
পুনর্ব্বার ভক্তবৃন্দ প্রভুস্থানে কহে।
তোমা বিনে রাজা প্রাণ তেজিবারে চাহে॥
অন্তরে রাজার প্রতি প্রভু (খ) কৃপাবান্।
বাহ্যে কিছু লোক-শিক্ষা-হেতু করে ভাণ॥
কপট করিয়া পুন কহে ভক্তগণে।
নারায়ণ বলি দুই হস্ত দিয়া কাণে॥
মহাবিষয়ী যে রাজা তাহার মিলনে।
পুন যদি কহ তবে না রব এখানে॥

পাঠান্তর—(ক) তবে—তোহো।
(খ) প্রভু—কভু।

ভয়ে ভক্তবৃন্দ তবে পুন না কহিলা।
রাজার আগ্রহ দেখি চিন্তিত হইলা॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা নাহি করিব মিলন।
রাজার প্রতিজ্ঞা তবে ছাড়িব জীবন॥
তবে ভক্তবৃন্দ এক উপায় সৃজিলা।
রায় রামানন্দ নৃপে উপদেশ দিলা॥
প্রভু যবে প্রেমাবিষ্ট হইয়া রহিবে।
অর্দ্ধ-বাহ্যদশা-ভাব যখন জানিবে (ক)॥
সেই কালে রাসপঞ্চাধ্যায়ের এক শ্লোক।
করিতে করিতে পাঠ যাইবে সম্মুখ॥
আনন্দে ধরিয়া প্রভু আলিঙ্গন দিবে।
কৃপা করিবেন তবে বাঞ্ছাপূর্ণ হবে॥
ইহা শুনি রাজা বড় আনন্দিত হৈল (খ)।
সেই শুভকাল লক্ষ্য করিয়া রহিল॥
রথাগ্রে নর্ত্তন প্রভুর মহা চমৎকার (গ)।
প্রসিদ্ধ সে ধ্যান হৃদে আছে সভাকার॥
নর্ত্তনের পরে ভক্তবৃন্দের সহিতে।
বিশ্রাম করিলা জগন্নাথের বাগিচাতে॥
অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রভু প্রেমানন্দে ভাসে।
অল্পে অল্পে রাজা গিয়া দাণ্ডাইলা পাশে॥
রাসপঞ্চাধ্যায়ের এক শ্লোক পাঠ করি।
উচ্চ করি গায় তাহা শুনি গৌরহরি॥
প্রেমানন্দ-সুখে কহে কে তুমি হে বন্ধু।
কর্ণেতে ঢালিলে মোর সুধা-রস-সিন্ধু॥

শ্লোক শ্রীগোপীগীতা—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে (ঘ) ভূরিদা জনাঃ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, তাপিত জনের জীবনস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মা প্রভৃতিরও পরমাদৃত, পাপনাশন, কর্ণরসায়ন (বা শুনিলে মঙ্গলপ্রদ), সর্ব্বোৎকর্ষযুক্ত, সর্ব্বব্যাপী

পাঠান্তর—(ক) জানিবে—দেখিবে।
(খ) বড় আনন্দিত হৈল—অতি আনন্দ পাইল।
(গ) মহা চমৎকার—অতি চমৎকার।
(ঘ) যে—হে।

তোমার কথামৃতের যাঁহারা জগতে কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সর্ব্ব অভীষ্ট দান করিয়া থাকেন।

এতো কহি (ক) প্রেমাবেশে উঠিয়া রাজারে।
গাঢ় আলিঙ্গন করি দুনয়ান ঝুরে॥
দোঁহে ভূমে পড়ি কান্দে দৃঢ় (খ) আলিঙ্গনে।
আনন্দেতে (গ) জয় জয় করে ভক্তগণে॥
কথোক্ষণে মহাপ্রভু সম্বিত পাইল।
উঠিয়া সম্ভ্রমে দেখে নৃপে আলিঙ্গিল॥
যদ্যপি রাজারে প্রভু দৃঢ়কৃপা কৈল।
ভক্তগণশিক্ষাহেতু ভঙ্গি উঠাইল॥
ছি ছি বিষয়ীর সঙ্গ হইল আমার।
নারায়ণ নারায়ণ এ কি তিরস্কার॥
শ্রীমান্ প্রতাপরুদ্র মহারাজ ধীর।
যতেক ক্ষত্রিয় মধ্যে এক মহাবীর॥
যত দৃঢ়ব্রত মধ্যে শ্রেষ্ঠ দৃঢ়ব্রত।
গৌরাঙ্গ জিতিল যাথে অদ্ভুত চরিত॥
তুচ্ছ রাজাগণ গ্রাম জিতি করে শ্লাঘ্য।
চৈতন্যে নাহিক রতি অতি সে দুর্ভাগ্য॥
ধন্য ধন্য ধন্য রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র।
যার পদরজে যায় সংসার অভদ্র (ঘ)॥
প্রভুর পার্ষদ হৈল প্রেমানন্দে ভাসে।
দেবগণ জয় শব্দ করয়ে আকাশে॥
সংক্ষেপে কিঞ্চিত স্থূল করিনু কীর্ত্তন।
আমার শকতি নহে বাহুল্য-লিখন॥
তাঁহার শ্রীচরণ-রজের এক কণ।
আশা করি লালদাস করে নিরীক্ষণ॥

চরিত্র শ্রীগোবিন্দদাস গোস্বামী

গোবর্দ্ধন গ্রামে বাস শ্রীগোবিন্দ দাস।
নাথজী গোপাল গোবর্দ্ধনে যাঁর বাস॥
তাঁর সহ সখ্যভাব সদা কেলি করে।
শুদ্ধভাবাক্রান্ত যাথে ঐশ্বর্য্য না স্ফুরে॥
গোবিন্দদাসের দেখ সৌভাগ্যের সীমা।
চমৎকারকারী (ক) যার নাহিক উপমা॥
অলপ বয়স হয় গোবিন্দ দাসের।
পরিপাক সাধন প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের॥
গোবর্দ্ধনবাসী শ্রীনাথজীর সহ।
খেলাইতে যান মাঠে করিয়া উৎসাহ॥
একদিন দাণ্ডাগুলি খেলে দুইজনে।
গোবিন্দের দাণ্ডা হৈল নাথজীর সনে॥
খেলা ছাড়ি নাথজী আইলা পলাইয়া।
পাছু পাছু গোবিন্দ ধরিতে যায় ধাঞা॥
নাথজী মন্দিরে গিয়া সিংহাসনোপরি।
দাণ্ডাইলা নিজ গিরিধারি-ভঙ্গি করি॥
গোবিন্দ যাইয়া নাথজীর শিরোপরি।
তাকিয়া মারিল এক গুলি দম্ভ করি॥
পূজারি সেবকগণ তাহারা (খ) দেখিয়া।
সোর-সার করি সভে আইল হাঁকিয়া॥
ধরিয়া তাহারে চড়চাপড় মারিয়া।
বাহির করিয়া দিলা গলে হাথ দিয়া॥
ক্রোধ করি গোবিন্দ কহয়ে নাথজীরে।
মোর দাণ্ডা ভাঙ্গি গিয়া রহিলি মন্দিরে॥
আর মোরে লোক দিয়া নিগ্রহ করিলি।
ভাল অবে দুষ্ট ছোঁড়া শিখাব যে কালি॥
ইহার সাজাই তোরে ভালমতে দিব।
সাজাই না দিয়া তোরে জল না খাইব॥
এতো কহি গোবিন্দ গৃহেতে নাহি গেলা।
গোবিন্দকুণ্ডের তীরে বসিয়া রহিলা॥
হেথা নাথজীর ভোগ প্রস্তুত হইল।
গোসাঞিরে নাথজীউ ক্রোধে জানাইল॥
গোবিন্দ আমার সহ খেলিতে (গ) আইল।
নিগ্রহ করিয়া তারে নিকালিয়া (ঘ) দিল॥
যতেক মারিল মোর শরীরে বাজিল।
সব অঙ্গে অঙ্গে মোর বেদনা হইল॥

পাঠান্তর—(ক) কহি—শুনি।
(খ) দৃঢ়—গাঢ়।
(গ) আনন্দেতে—প্রেমানন্দ।
(ঘ) সংসার অভদ্র—সংসার সমুদ্র।

পাঠান্তর—(ক) চমৎকারকারী—অতি চমৎকার।
(খ) তাহারা—তাহারে।
(গ) খেলিতে—খেলাতে।
(ঘ) নিকালিয়া—নিকাশিয়া।

নিগ্রহ খাইয়া গিয়া গোবিন্দকুণ্ডের।
তীরে বসি আছে নাহি যায় নিজ ঘর॥
অন্ন জল নাহি খায় উপবাসী হয় (ক)।
আমি না খাইব (খ) সে না আইলে হেথায়॥
এতেক শুনিঞা যে চমক (গ) পড়ি গেলা।
পরস্পর সভে ব্যস্তসমস্ত হইলা॥
এতো যে মহিমা গোবিন্দের জানি নাঞি।
হাহাকার করি মূর্চ্ছা হইলা গোসাঞি॥
গোবিন্দের তলাসে চলিলা সভে ধাই।
ঘরে বনে মাঠে খুঁজি কোথাও না পাই॥
গোবিন্দকুণ্ডের তীরে দেখে বসি আছে।
রাগান্বিত হাতে এক ছড়ি নাচাইছে (ঘ)॥
নিকটে যাইয়া কহে বিনতি (ঙ) করিয়া।
নাথজী তোমার স্থানে দিল পাঠাইয়া॥
তোমা না দেখিয়া তেঁহো কিছু না খাইলা।
তুমি রুষ্ট হৈলে বলি উপবাস কৈলা॥
গোবিন্দ কহয়ে আঁধি হইয়া (চ) পলাইল।
আর মোরে নিগ্রহ করিয়া নিকাশিল॥
তারে আমি এই ছড়ি দিয়া যে পিটিব।
যেমন সে তার আজি উচিত করিব॥
গোবিন্দের ভাব ভক্তি তাঁহারা বুঝিয়া।
কহেন শ্রীনাথজীর আশয় জানিয়া॥
হারি মানি নাথজীউ তোমার নিকটে।
কহি পাঠাইল পুন খেলিবেক মাঠে॥
তা শুনি গোবিন্দ হর্ষ হইয়া কহয়।
হারি মানি নিল (ছ) তবে যাইব তথায়॥
ইহা কহি উঠিয়া চলিলা শ্রীমন্দিরে।
কটিতে লেঙ্গটি এক ধূলায় ধূসরে॥
হাতে দাণ্ডা-গুলি ভাঁটা খেলার সামিগ্র।
হাসিতে হাসিতে গিয়া নাথজীর অগ্র॥

পাঠান্তর—(ক) হয়—রয়।
(খ) না খাইব—নাহি খাব।
(গ) যে চমক—চমৎকার।
(ঘ) রাগত হইয়া একলা চাহিতেছে।
(ঙ) বিনতি—মিনতি।
(চ) আঁধি হইয়া—হাসি হেরে।
(ছ) হারি মানি নিল—হারি সে মানিল।

টিটকারী দিয়া কহে এখন কেমন।
হারি মানি মোর ঠাঞি বাঁচিলে যে ধন॥
মন্দিরে যাইয়া দেখে শ্রীমুখ মলিন।
না খাইল জানিঞা হৃদয় হৈল ক্ষীণ॥
গোবিন্দ কহয়ে ভাই খাও নাহি কেনে।
বদন মলিন দেখি দগধে পরাণে॥
মন্দিরে কপাট দিয়া দোঁহে বসি খায়।
হাসিতে খেলিতে মহা-আনন্দ উদয়॥
তখন সকল লোক গোবিন্দ দাসের।
মহিমা জানিঞা ধূলি লয় চরণের॥
একদিন শ্রীগোবিন্দ শৌচ ফিরিতে।
বসিয়াছে মাঠে কিন্তু মন নাথজীতে॥
নাথজী দেখিয়া তারে মুচকি হাসিয়া।
আকন্দের ফলাগুলা উঠাইয়া নিঞা॥
কোঁচড়ে করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে।
রঙ্গ ভঙ্গি করি যায় নাচিতে নাচিতে॥
মৃদু মৃদু স্বরে গান করিতে করিতে (ক)।
কভু গাল-বাদ্য কভু তুড়ি দিতে দিতে॥
হেলিয়া দুলিয়া নানা ভঙ্গি করি চলে।
নূপুর ঘুঙ্গুর বাজে (খ) চরণ-কমলে॥
ঝলমল করে অঙ্গে নানা আভরণ।
ঝম্ ঝম্ করি বাজে কিঙ্কিণী কঙ্কণ॥
নাসায় নোলক দোলে যেন পূর্ণশশী।
গোবিন্দের সম্মুখে যাইয়া হাসি হাসি॥
কোঁচড় হইতে আকন্দের ফল নিঞা।
গোবিন্দের অঙ্গে মারে তাকিয়া তাকিয়া (গ)॥
রূপ দেখি শ্রীগোবিন্দ প্রেমানন্দে চাহে।
বাহ্য বিস্মৃত সাধু জড়-বত রহে॥
পুনঃপুন নাথজীউ মারিতে মারিতে।
বাহ্য হৈল গোবিন্দের উঠিল ত্বরিতে॥
জলশৌচ না করিয়া অমনি উঠিয়া।
নাথজীর পাছে পাছে (ঘ) চলয়ে ধাইয়া॥

পাঠান্তর—(ক) মৃদু স্বরে যান তবে গাহিতে গাহিতে।
(খ) নূপুর ঘুঙ্গুর বাজে—ঘুঙ্গুর বাজয়ে তাঁর।
(গ) তাকিয়া তাকিয়া—ডারিয়া ডারিয়া।
(ঘ) পাছে পাছে—পিছে পিছে।

আকন্দের ফল তুলি তুলি ফিঁক (ক) মারে।
হাসি হাসি নাথজী ছুটিয়া যায় দূরে॥
হায় হায় সে রূপ সে হাস্য সে গমন।
সে ভঙ্গি সে রঙ্গি নাট সে চন্দ্রবদন॥
দেখ্যে কি পরাণ কেহো ধরিবারে পারে।
গোপীর কি দোষ কেবা সম্বরিতে পারে॥
আকাশে দেবতাগণ হেরে অনিমিখে।
দেবকন্যা গন্ধর্ব্বাদি স্ত্রী লাখে লাখে॥
পলাইয়া গিয়া নিজ মন্দিরে রহিলা।
গোবিন্দ গোবিন্দকুন্ড-তীরেতে বসিলা॥
মাতা তাঁর আসি বহু ভর্ৎসনা করিয়া।
ঘরেতে লইয়া গেলা ভোজন লাগিয়া॥
ভোজন করিতে বসি মনেতে পড়িল।
শৌচ করিয়া জলশৌচ না করিল॥
মাতারে কহিয়ে মুঞি নাহি ছোঁচাইল (খ)।
মাতা তাহা শুনি পুন ভর্ৎসনা করিল॥
অন্ন তেয়াগিয়া উঠি ছোঁচাইল গিয়া।
ভোজন না হৈল হোথা নাথজী জানিঞা॥
গোসাঞিরে আজ্ঞা দিল গোবিন্দ লাগিয়া।
প্রসাদ সামগ্রী পাঠাও প্রচুর করিয়া॥
নানামত সামগ্রী নানা প্রসাদ উপচয় (গ)।
থালি ভরি গোবিন্দের গৃহেতে পাঠায়॥
গোবিন্দ কহয়ে হাসি মারি খাবার ভয়ে।
নাথজী আমার তরে সামগ্রী পাঠায়ে॥
মাতা শুনি কহে দূর দূর দুষ্ট ছোঁড়া।
বিশেষ না বুঝে তেঁহো (ঘ) ব্রজবাসী ভোরা॥
নাথজীর সহ নিজ পুত্রের যে সম্বন্ধ।
না বুঝি পুত্রের ভাব পাড়ে গালি মন্দ॥
গোবিন্দ-চরিত্র হয় সুধার সদন।
সর্ব্বমন-রঞ্জন (ঙ) বিশেষে সাধুজন॥

পাঠান্তর—(ক) তুলি তুলি ফিঁক—লৈয়া ফিরি ফিরি।
(খ) মুঞি নাহি ছোঁচাইল—আমি নাহি শৌচ হৈল।
(গ) উপচয়—উপাদেয়।
(ঘ) না বুঝে তেঁহো- নাহিক জানে।
(ঙ) সর্ব্বমন-রঞ্জন—সর্ব্বজন রঞ্জন।

গাইয়া তাঁহার আগে প্রেমের অঙ্কুর।
লালদাস মাগে এই কলির অসুর॥

চরিত্র শ্রীকৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী

কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণ-কুমার।
পঞ্চাল (ক) লাহোর দেশে উদ্ভব তাঁহার॥
বয়েস সপ্তম বর্ষ আচম্বিতে তার।
গৌরাঙ্গ উদয় হৈল হৃদয়-মাঝার॥
গৌরাঙ্গ নাহিক দেখে নাম নাহি শুনে।
প্রভুর কি ভঙ্গি যে উদয় হৈল মনে॥
গৌড়দেশ আর যে দক্ষিণ উদ্ধারিলা।
পশ্চিম উদ্ধার-হেতু এক ভঙ্গি কৈলা॥
ভাগ্যবান অই বিপ্র-বালক অন্তরে।
প্রকাশ হইয়া কৈলা উদাস তাহারে॥
নিত্যসিদ্ধ তেঁহো গৌরাঙ্গের অনুচর।
জন্মাইলা পশ্চিমে (খ) লোক করিতে উদ্ধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি কান্দেন বালক।
কিছু নাহি ভায় চিত্তে করে ধক ধক॥
গৃহ হৈতে বাহির হইয়া পূর্ব্বমুখে।
ধাইয়া চলিলা শ্রীচৈতন্য বলি ডাকে॥
দুনয়নে বহে ধারা উন্মত্তের ন্যায়।
ফল জল গব্য মাত্র আহার করয়॥
উপনীত হৈল আসি শ্রীবৃন্দাবন।
দরশন করিলেন শ্রীমন্ গোবর্দ্ধন॥
গোবর্দ্ধন-উপরে গোপাল-দরশন।
করিয়া হইলা শিশু আনন্দিত মন (গ)॥
শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোসাঞির সেবক।
গোপালের পূজারি দেখে অপূর্ব্ব বালক॥
গোপালে হেরিয়া যে নয়নজলে ভাসে।
গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে প্রেমের আবেশে॥
দেখিয়া আনন্দ হৈল পরম যতনে।
নিকটে রাখিয়া অতি প্রেমের বিধানে॥

পাঠান্তর—(ক) পঞ্চাল—পঞ্জাব।
(খ) জন্মাইলা পশ্চিমে—জন্মিলা পশ্চিমে।
(গ) আনন্দিত মন—আনন্দে মগন।

সেবক হইলা শিশু পূজারির স্থানে।
উৎকণ্ঠা হইল শ্রীগৌরাঙ্গ-দরশনে॥
গৌড়দেশে যাইবার উৎযুটি (ক) হৈলা।
সেইকালে শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন আইলা॥
দরশন করি শ্রীগৌরাঙ্গ বলি (খ) কান্দে।
বামন যেমন হাথে পাইলেক চান্দে॥
শিশু কহে মোর হৃদে প্রবেশিলা যেই।
দেখিয়া জানিনু প্রভু তুমি হও সেই॥
শরণ লইনু প্রভু কৃপা কর মোরে।
নিজ দাস বলিয়া করহ (গ) অঙ্গীকারে॥
মুচকি হাসিয়া প্রভু দয়ার্দ্র হইলা।
নিজ কণ্ঠ হৈতে গুঞ্জামালা তাঁরে দিলা॥
অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া বহু স্নেহ কৈলা।
গুঞ্জামালী বলিয়া আখ্যান তাঁর দিলা॥
সেই হৈতে গুঞ্জামালী নাম তাঁর হৈল।
গুঞ্জামালী ব'লে নাম ভুবনে ব্যাপিল॥
শক্তি সঞ্চারিয়া প্রভু আজ্ঞা কৈলা তাঁরে।
পশ্চিম দেশেতে কর ভক্তির প্রচারে॥
পঞ্জাব লাহোর আর মুলতানাদি করি।
শাসন করগা কৃষ্ণভক্তি দান করি॥
তেঁহো কহে প্রভু মোর আছে কি শকতি।
আমার শাসনে কেনে লইবে ভকতি॥
প্রভু কহে আমার বিভূতি তুমি হও।
মোর শক্ত্যে শাসন হইবে তুমি যাও॥
প্রথমে মুলতান গিয়া সেবা প্রকাশিয়া।
লোক নিস্তারিলা কৃষ্ণভক্তি প্রচারিয়া॥
বড়ই প্রতাপ হৈল লোকে চমৎকার।
অলৌকিক দরশন আকার প্রকার॥
যারে কৃপা করে সেই কৃষ্ণভক্ত হয়।
শ্রীচৈতন্যপদে তার মতি উপজয়॥
চৈতন্য ভজয়ে লোক তার উপদেশে।
প্রভুর দোহাই যে ফিরিল দেশে দেশে॥

পরম্পরা সম্প্রদায়-ক্রমে সব লোক।
বৈষ্ণব হইল গেল সংসারের রোগ॥
তথা নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বনয়ারি চন্দ্র।
তাঁরে শিষ্য করি দিলা ভক্তি প্রেমানন্দ॥
গাদির মহান্ত করি তাঁরে বসাইয়া।
আপনি চলিয়া পুন গুজরাট যাইয়া॥
সেবায় শৃঙ্খলা তথা বড়ই করিলা।
শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহ তথা প্রকাশিলা॥
তথাকার লোক ধর্ম্ম-কর্ম্ম নাহি জানে।
শিশ্নোদর-পরায়ণ ধনী সবজনে॥
গুঞ্জামালী গোসাঞি দেখিয়া মূঢ় লোক।
দয়ার্দ্র হইয়া মনে পাইল অতি দুখ॥
কৃপা করি নিজ শক্তি ভক্তি প্রকাশিয়া।
উদ্ধারিল সব লোক কৃষ্ণমন্ত্র দিয়া॥
বৈষ্ণব হইল সভে বলে হরি হরি।
প্রেমানন্দে নাচয়ে যতেক নর নারী॥
প্রভুর যে গাদি বড় গৌড়িয়া আখ্যান।
ছোট গৌড়িয়ার তথা শুন বিবরণ (ক)॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু-শাখা চক্রপাণি নাম।
পরম বিদগ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তি-ধাম॥
প্রভুর প্রেরিতে গেলা পশ্চিম দিশাতে (খ)
কৃষ্ণভক্তি প্রচারিতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে॥
গুজরাট গেলেন গুঞ্জামালী নাম শুনি।
যাইয়া তাঁহার সঙ্গে হইল মেলানি॥
পরিচয় হইয়া মিলিয়া দুই জনে।
বহয়ে আনন্দধারা দোঁহার নয়নে॥
কথোক দিবস পরে শ্রীল চক্রপাণি।
আর এক স্থানে সেবা প্রকাশে আপনি॥
যাত্রা মহোৎসব সদা বৈষ্ণব-সেবন।
শিষ্য প্রশিষ্য কৈলা ভক্তি বিতরণ॥
অদ্বৈত প্রভুর দায় দিল বহুজন।
চৈতন্যের (গ) জয় বলি নাচে সর্ব্বজন॥

পাঠান্তর—(ক) উৎযুটি—উদযুক্ত।
(খ) শ্রীগৌরাঙ্গ বলি—শ্রীচরণে পড়ি।
(গ) বলিয়া করহ—বলি মোরে কর।

পাঠান্তর—(ক) ছোট গৌড়িয়া তার শুনহ কথন।
(খ) দিশাতে—দেশেতে।
(গ) চৈতন্যের—শ্রীচৈতন্যের।

ছোট গৌড়িয়া বলি গাদির খেয়াতি।
আচার্য্যের গাদি সেই সভার সম্মতি॥
ছোট গৌড়িয়া আর বড় যে গৌড়িয়া।
অদ্যাপি আছয়ে খ্যাতি জগত ব্যাপিয়া॥
পরে গুঞ্জামালী গোসাঞি পঞ্জাবে আসিয়া।
ওলম্বা নামেতে গ্রাম তথায় বসিয়া॥
সেবা প্রকাশিল বহু সেবক করিয়া।
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি প্রচারিয়া॥
জনার্দ্দন নামে বিপ্র-কুলোদ্ভব শান্ত।
শিষ্য করি তাঁরে কৈলা গাদির মহান্ত॥
তেঁহো নিজ ছোট ভাই শ্যামজী গোসাঞি।
তাহারে করিয়া শিষ্য গাদিতে বসাই॥
পঞ্জাবের পশ্চিমেতে সিন্ধু নামে দেশ।
উদ্ধার করিতে জীব করিলা প্রবেশ॥
হিন্দু তো যতেক ছিলা বৈষ্ণব করিলা।
মুসলমান যত ছিল হরিভক্ত হৈলা॥
গোসাঞির সংকীর্ত্তন শুনিয়া যবন।
দীক্ষাভাবে সেই নাম করিলা গ্রহণ॥
হরিনাম জপে মালা তিলক ধারণ।
যবনের আচার তেজিল (ক) সর্ব্বজন॥
বৈষ্ণব আচার করে নাম সংকীর্ত্তন।
অদ্যাবধি সেই রাজ্যে মোছলমানগণ॥
সেহ পঞ্চাত্তম হয় শাস্ত্র অভিমতে (খ)।
কৃষ্ণভক্ত পবিত্র সন্দেহ নাহি ইথে॥

তথাহি -

"ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে" ইত্যাদি।

পূর্ণশ্লোক ও অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

তার পর পঞ্জাব মুলতান গুজরাত।
সুরত্যাদি দেশে প্রভু চৈতন্য-ভকত॥
ক্রমে ক্রমে দিল সব শ্রীচৈতন্য দায় (গ)।
নিত্যানন্দ প্রভুর সন্তানের শিষ্য হয়॥

পাঠান্তর- (ক) তেজিল তাজিয়া।
(খ) শাস্ত্র-অভিমতে -শাস্ত্র বিধিমতে।
(গ) সব শ্রীচৈতন্য দায় - সবে চৈতন্যের দায়।

কথোক শ্রীপণ্ডিত গোস্বামি-পরিবার।
শ্রীঅদ্বৈত-পরিবার হয়ে বহুতর॥
তবে গুঞ্জামালী সর্ব্ব বিষয় তেজিয়া।
বৃন্দাবনে বাস কৈলা একাকী (ক) হইয়া॥
চৈতন্য-পার্ষদ গুঞ্জামালী মহামতি।
তাঁর শ্রীচরণে লালদাসের মুকতি॥

কীর্ত্তন শ্রীমথুরাবাসী বৈষ্ণবগণ।

আর যত মথুরা-মণ্ডলবাসী সাধু।
কথোকগুলিনের করি নামগান-সীধু॥
রঘুনাথ গোপীনাথ রামদাস দাসু।
গুঞ্জামালী বিঠ্ঠল শ্রীরামানন্দ জসু॥
গোবিন্দ মুরলী সোতি শ্রীযদুনন্দন।
হরিদাস মিশ্র আর মুকুন্দ ভগবান্॥
চতুর্ভুজ বিষ্ণুদাস আর রঘুনাথ।
মহা-অনুভব সভে কৃষ্ণ যার নাথ॥
ইত্যাদি করিয়া বহু ব্রজের বৈষ্ণব।
লালদাস মাগে ইঞহা সভার (খ) কৃপালব॥

চরিত্র শ্রীস্ত্রীসাধুগণ

কলিযুগে ভক্তরাজ যত নারীগণ।
তার মধ্যে কথোগুলি করিব গণন॥
সীতাঝালি গঙ্গা আর উমা ভাটিয়ানী।
সুমতি কুমারী গৌরী গণেশদেরাণী॥
কলা লখা মানবতী শুচি সত্যভামা।
যমুনা কমলা মৃগা দেবী কোলী রামা॥
যুগো যেবা হীরা হরিচেড়ী আর দেবকী
লালদাস-শিরে পদ দিয়া কর সুখী॥

চরিত্র শ্রীগণেশদেরাণী

ওড়ছো বলিয়া দেশ রাজা তথাকার।
মধুকর সাহানাম পাটরাণী তার॥

পাঠান্তর—(ক) একাকী—একান্ত।
(খ) ইঞহা সভার—সকলের।

গণেশদেরাণী নাম সাধুসেবী হয়।
বৈষ্ণবের ভেক দেখি চরণে লুটয়॥
অবারি দুয়ার (ক) গৃহে বৈষ্ণব যাইতে।
অন্দরে লইয়া রাণী সেবে বিধিমতে॥
একদিন চোর এক বৈষ্ণবের বেশে।
অন্দরেতে গেলা চুরি করিবার আশে॥
রাণী দেখি দণ্ডবত প্রণাম করিয়া।
অতি সমাদর কৈল সৌভাগ্য মানিঞা॥
নানামত সেবা কৈল ভকতি করিয়া।
চরণ সেবন কৈল গদগদ হিয়া॥
নির্জ্জন পাইয়া চোর নিজ মূর্ত্তি ধরি।
কহে মোহরের থলি দেহ বাহির করি॥
আনন্দিত হৈয়া রাণী এক থলি দিল।
আরো দেহ বলি চোর রাগত হইল॥
আর দিব বলি রাণী সম্মত হইল।
তথাচ স্বভাবদুষ্ট দৌরাত্ম্য করিল॥
রাণীর উরুতে তীক্ষ্ম কাটারি মারিয়া।
মোহরের তোড়া নিঞা গেল পলাইয়া॥
রক্ত বহি যায় অতি দুঃসহ বেদনা।
তথাচ প্রকাশ নাহি করিল সুমনা॥
বৈষ্ণবের নিন্দা পাছে করে লোকে (খ) শুনি।
এ কারণে প্রকাশ না করিলেক ধনি॥
পটি বান্ধি উরুরে মৌনেতে পড়ি রহে।
রাজা জিজ্ঞাসিলে রজোযোগ বলি কহে॥
দুই তিন দিন পরে পুন রাজা কহে।
কি হইল এ তো তব রজোযোগ নহে॥
পীড়া কিছু হৈল কিংবা কারণ কি কও।
পীড়া দেখি দেহে তব অথচ ছাপাও॥
তবে রাণী পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত কহিল।
অপরাধ লাগি কোন বৈষ্ণবে মারিল॥
না বুঝিয়া পাছে লোক (গ) বৈষ্ণব নিন্দয়।
এ কারণে না কহিনু রাখিনু হৃদয়॥

এতেক শুনিঞা রাজা চমৎকার হৈল।
সাধু সাধু বলিয়া রাণীরে প্রশংসিল॥
এতেক বিশ্বাস তব বৈষ্ণবের প্রতি।
মুঞি না জানিনু মর্ম্ম মোর ধিক্ মতি॥
অতএব বৈষ্ণবের ভেক দেখি মাত্র।
আদর কর্ত্তব্য না বিচারো পাত্রাপাত্র॥
গণেশ-দেরাণী-রাণী-পাদধৌত পানি।
লালদাস বাঞ্ছয়ে পরম ত্রাতা জানি॥

চরিত্র শ্রীলাখাজীর

লাখা নামে ভক্ত লোকে ডোমজাতি কহে।
কিন্তু দেব-পিতৃ তাহে পূজিবারে চাহে॥
সাধুর সম্বন্ধে তেঁহো ভুবনপাবন।
অভক্তের সম্বন্ধে নীচজাতি অভাজন॥
নাভাজী কহেন মোর মাথার মুকুট।
বৈষ্ণব-সেবনে যার ভকতি অটুট॥
আকাল-সময়ে মালা-তিলক-ধারণ।
করিয়া আইসে যে ইতর যত জন (ক)॥
বৈষ্ণবের বেশ দেখি বিষ্ণুর (খ) সমান।
সেবা-পূজা করে, নাহি করে হেয় জ্ঞান॥
তাহে পরিতোষ কৃষ্ণ ছদ্মরূপ ধরি।
বলদে বলদে বহু গম যব ভরি॥
আনিঞা ঢালিয়া দিলা আঙ্গিনার মাঝে।
দুগ্ধবতী দুটি গরু (গ) আনে দুগ্ধ কাযে॥
আঙ্গিনাতে রাখি প্রভু অন্তর্দ্ধান কৈল।
কে আনিল কে রাখিল কেহো না জানিল॥
রাত্রে স্বপ্নে কহে হরি লাখা ভকতেরে।
কুঠি ভরি রাখ গম গাই দুটি ঘরে॥
যত গম নিতি নিতি খরচ করিবে।
ফুরাবে না দুগ্ধ ঐ মত নিত্য পাবে (ঘ)॥

পাঠান্তর—(ক) অবারি দুয়ার—অবারিত দ্বার।
(খ) লোকে—কেহ।
(গ) লোক—কেহ।

পাঠান্তর—(ক) যে ইতর যত জন—যত ইতরের জন।
(খ) বিষ্ণুর—বৈষ্ণব।
(গ) দুটি গরু—দুই গাই।
(ঘ) নাহি ফুরাইবে দুগ্ধ ঐ মত পাবে।

এতেক শুনিঞা সাধু বড় হর্ষ হৈল।
বৈষ্ণব-সেবায় বড় ঘটা আরম্ভিল॥
তবে পুরুষোত্তমে জগন্নাথ দেখিবারে।
প্রেমাবেশে উৎকণ্ঠিত হইল অন্তরে॥
মাড়োয়ার দেশ হৈতে অষ্টাঙ্গ করিয়া।
চলিলেন মহাশয় গদ গদ হিয়া॥
বহু দিন পরে যবে নিকট হইলা।
জগন্নাথ তবে পান্ডাগণে আজ্ঞা দিলা॥
লাখা নামে ভক্ত এক আমার আসিছে।
যানে চঢ়াইয়া তারে আন মোর কাছে॥
আজ্ঞা পাইয়া তারে পালকীতে করি।
আনিঞা দিলেন তারে প্রভু-বরাবরি॥
প্রভু ভৃত্যে দরশনে আনন্দ হইল।
ভকতবৎসল হরি লোকেতে দেখিল॥
কথোক দিবস থাকি লাখাজি চলিলা।
পথে পথে (ক) একদিন ভাবিতে লাগিলা॥
বিবাহের যোগ্য এক কন্যা ঘরে হয়।
ঘরে অর্থ কিছু মাত্র নাহিক সঞ্চয়॥
বিবাহ কিমতে (খ) হবে নাহিক উপায়।
যাহা হয় হইবেক কৃষ্ণের ইচ্ছায়॥

পাঠান্তর--(ক) পথে পথে--পথে যেতে।
(খ) কিমতে--কেমনে।

ভক্তাধীন জগন্নাথ জানিঞা অন্তরে।
এক মহাজনে স্বপ্নে কহে মাড়োয়ারে॥
লাখা নামে ভক্ত মোর শীঘ্র তার ঘরে।
সহস্রেক মুদ্রা দিবে না চাহিবে পরে॥
মহাজন স্বপ্ন দেখি বিচার করিয়া।
লাখার ঘরণী স্থানে টাকা দিল নিঞা॥
কি হেতুক টাকা দিলে কহে ঠাকুরাণী।
তেঁহো কহে মুঞি কিছু হেতু নাহি জানি॥
শ্রীপুরুষোত্তম (ক) জগন্নাথের আজ্ঞা হৈলা।
ইহা কহি মহাজন গৃহে চলি গেলা॥
কথোক দিবসে গৃহে (খ) লাখাজী আইলা।
টাকার প্রসঙ্গ শুনি চমকিত হৈলা॥
বিচার করিয়া সাধু অন্তরে বুঝিলা।
শ্রীমান জগন্নাথের হয়ে এ সকল লীলা (গ)॥
লাখাজীর শ্রীচরণ করিয়া ধেয়ান।
লালাদাস তাঁর কিছু করে গুণগান॥

পাঠান্তর--(ক) শ্রীপুরুষোত্তম--পুরুষোত্তমের।
(খ) দিবসে গৃহে--দিবস পরে।
(গ) হয়ে এ সকল লীলা--এই এক লীলা।

ইতি শ্রীভক্তমালে রাকা বাঁকা-আদিভক্ত-গুণ-বর্ণনং নাম একবিংশ-মালা ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীনরসী ভক্ত

জুনাগড় (ক) বাস হয় কৃষ্ণে ভক্তিমন্ত।
নরসী ভকত নাম স্বভাব সুশান্ত॥
শক্তি নাহি করিবারে অর্থ উপার্জ্জন।
ভাই অপমানে করে ভরণ পোষণ॥
সে নরসী তৃষ্ণাতুর হৈয়া একদিনে (খ)।
জল চাহে গিয়া নিজ ভাউজের স্থানে॥
বেজার হইয়া কহে ভাউজ মুখরা।
খাইতে আছহ মাত্র অতিথির পারা॥
যোগ্যতা নাহিক কিছু আশিস্ করিয়া।
খাইতে অনেক আছে শিরে হস্ত দিয়া॥
এই মত ফজিয়ৎ অনেক করিল।
বাহির করিয়া দিল জল নাহি দিল॥
ভাউজ এতেক যদি অপমান কৈল।
অভিমানে তৎক্ষণাত (গ) বাহির হৈল॥
প্রাণ তেয়াগিব বলি বনে প্রবেশিল।
ব্যাঘ্রেতে খাউক বলি সংকল্প করিল॥
প্রবেশ করিল গিয়া বহু দূর বনে।
এক শিবালয় হয় তথা সুনির্জ্জনে॥
শিবের আলয়ে গিয়া পড়িয়া রহিল।
সাতদিন অনাহার কিছু না খাইল॥
আশুতোষ মহাদেব প্রসন্ন হইয়া।
বর মাগ কহে (ঘ) নিজ মূর্ত্তি প্রকাশিয়া॥

নরসী কহয়ে দণ্ডবত ভক্তি (ক) করি।
কি বর মাগিব মুঞি বুঝিতে না পারি॥
সর্ব্বোত্তম যাহা হয় তাহি মোরে দেহ।
আপনি সকল জান বিচার করহ॥
চিন্তিয়া দেখিলা দেব কৃষ্ণভক্তি বিনে।
সর্ব্বোত্তম কিছু (খ) নাঞি এ তিন ভুবনে॥
নরসী বৈষ্ণব কৃষ্ণ-চরণ আশ্রিত।
কৃষ্ণপ্রেম-দান হয় ইহারে উচিত॥
কৃষ্ণপ্রেম-দাতামধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীশংকর।
বড় কৃপা কৈল প্রভু নরসী উপর॥
কৃষ্ণ প্রেমভক্তি দিয়া তাহারে লইয়া।
বৃন্দাবন গেল দেব হরষিত হৈয়া॥
যথা নিত্য রাসলীলা কৃষ্ণচন্দ্র করে।
ভক্তির প্রভাবে দোঁহে গোপীরূপ ধরে॥
গোপীরূপে শ্রীরাসমণ্ডলে যবে গেলা।
মুচকিয়া কৃষ্ণচন্দ্র দেখিতে লাগিলা॥
গোপীগণ ঠরে-ঠোরে হাসিয়া কহয়।
কোথা হৈতে আইল এ নূতন সখীদ্বয়॥
নরসী দেখিয়া শ্রীমন্ রাধাকৃষ্ণ রূপ।
গোপীগণ শোভা রাসমণ্ডল অনুপ॥
বিভোল (গ) হইলা মুখে নাহি সরে বাণী।
গোপীগণ হাসেন ধরিয়া তাঁর পাণি॥
এইরূপে অনেক যে কৌতুক হইল।
ক্ষণেক বেয়াজে আর দেখিতে না পাইল॥
হাহাকার করি মূর্চ্ছা হইয়া পড়য়।
যাহা দেখিবারে চাহে দেখিতে না পায়॥ (ঘ)
সেই রূপ সদাই হৃদয় বদ্ধ হৈল।
অন্য চেষ্টা বাসনা সকল দূরে গেল॥

পাঠান্তর—(ক) জুনাগড়—জুলাগড়।
(খ) নরসী যে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া একদিনে।
(গ) অভিমানে তৎক্ষণাত—অভিমান উৎকণ্ঠাতে।
(ঘ) কহে—বলে।

পাঠান্তর—(ক) ভক্তি—নতি।
(খ) কিছু—আন।
(গ) বিভোল—বিভোর।
(ঘ) হাহাকার করিয়া হইল মূর্চ্ছাগত।
দেখিয়া না দেখে আর হইল বিস্মিত॥

পরে নিজ দেশে আসি গৃহে বসি থাকে।
পাগল বলিয়া উপহাস করে লোকে॥
এক যে বৈষ্ণব যান দ্বারকা দর্শনে।
হুণ্ডি করিবারে গেলা মহাজন স্থানে॥
হুণ্ডি নাহি দিল কহে বিদ্রূপ করিয়া।
নরসী-ভকত-স্থানে হুণ্ডি লহ গিয়া॥
উদার (ক) বৈষ্ণব তাহা সত্য করি মানে।
ছুটিতে ছুটিতে (খ) গেল নরসীর স্থানে॥
তাহারে কহেন এক শত টাকা লহ।
দ্বারকা মোকামে মোরে হুণ্ডি লিখি দেহ॥
তেঁহো কহে ভাল ভাল শও টাকা দেহ।
হাজার টাকার হুণ্ডি লিখি দেই লেহ॥
হুণ্ডি লিখি দিলেন শ্যামল সাহার নামে।
কহে সে তুখর বড় (গ) শ্রীদ্বারিকাধামে॥
যার হুণ্ডি চলে সর্ব্ব দেশ বেয়াপিয়া (ঘ)।
যাবামাত্র পাবে টাকা হুণ্ডি সমর্পিয়া॥
উদার স্বভাব সাহজিক বৈষ্ণবের।
না বুঝে নরসীজীর কথা অন্তরের॥
প্রতীত করিয়া হুণ্ডি লইয়া চলিলা।
দ্বারকা যাইয়া কথো দিনে উত্তরিলা॥
শ্যামল-সাহা কে বলিয়া সহরে খুঁজিয়া।
বেড়ায় বৈষ্ণব সব লোকে জিজ্ঞাসিয়া॥
সভে বলে শ্যামল সাহাকে জানি নাঞি।
হেনকালে সম্মুখেতে দেখে এক ঠাঞি॥
একজন এক থলি টাকা স্কন্ধে করি।
আসিয়া কহয়ে বৈষ্ণবের বরাবরি॥
জুনাগড় হৈতে এক চিঠি আসিয়াছে।
মোর নামে নরসী এক হুণ্ডি লিখিয়াছে॥
তাহা শুনি হর্ষে তবে বৈষ্ণব কহেন।
হাজার টাকার হুণ্ডি মোরে দিয়াছেন॥
শ্যামল সাহা কি তবে হয় তব নাম।
তেঁহো কহে হয় হয় আমারি আখ্যান॥

হুণ্ডি লইয়া তবে টাকা গণি দিল।
ভক্ত অনুরোধে বোঝা বহিয়া আনিল॥
শ্যামল সাহা যে কৃষ্ণ যথার্থ লিখিল।
বৈষ্ণব সরল তাহা কিছু না বুঝিল॥
আর এক বড়ই কৌতুক শুন কহি।
নরসীর সম যে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি॥
কন্যা নরসীর হয় তাহার পুত্রের (ক)।
বিবাহ দিবার ইচ্ছা হইল মায়ের॥
পিতারে কহয়ে মোর পুত্রের বিবাহ।
কন্যা ঠাহরিয়া তার উদ্‌যোগ করহ॥
তেঁহো কহে কৃষ্ণ দিবে আমি কি করিব।
জগতে যে করে সেই সম্পন্ন করিব॥
এতো শুনি কন্যা তার আপনি উদ্‌যোগী।
হইয়া ঘটক ডাকি কহে কন্যা লাগি॥
ঘটক যাইয়া এক কন্যা স্থির কৈল।
সম্বন্ধ করিয়া বিভা লগ্ন স্থির হৈল (খ)॥
তখন শুনিল সব কন্যাকর্ত্তাগণ।
নরসী কাঙ্গাল সদা করয়ে ভজন॥
তাহার দৌহিত্র তার অন্ন নাহি ঘরে।
ইহা শুনি সভে মেলি (গ) আর্ত্তনাদ করে॥
বিবাহের দুই এক দিন যবে রহে।
নরসীর তনয়া নিজ পিতা-স্থানে কহে॥
বিবাহের উদ্যোগ করহ শীঘ্র তবে।
নরসী কহে যার ভার সেই বিভা দিবে॥
কন্যা তার চিত্তে অতি ভাবিত হইল।
লগ্নপত্র দিয়া গেল লজ্জাস্কর হৈল।
পিতা মনোযোগ না করিল কি হইবে।
ইহার সম্পন্ন তবে আর কে করিবে॥
এতেক ভাবিয়া মনে দুঃখিত হইল।
বিবাহের দিনে অতি কৌতুক জন্মিল॥
নরসী নিজ প্রিয়ভক্ত লজ্জা-নিন্দা-ভয়।
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী সহ আইলা তথায়॥

পাঠান্তর—(ক) উদার—উদাস।
(খ) ছুটিতে ছুটিতে—দৌড়িতে দৌড়িতে।
(গ) কহে সে তুখর বড়—বড়ই সজ্জন সেই।
(ঘ) বেয়াপিয়া—যে ব্যাপিয়া।

পাঠান্তর—(ক) দুই কন্যা নরসীর তার একের পুত্রের।
(খ) সম্বন্ধ করিয়া তার বিভা স্থির কৈল।
(গ) সভে মেলি—সকলেতে।

ছন্নরূপে (ক) আসি বিবাহের আয়োজন।
করিলা সকলি সঙ্গে নিঞা বহুজন॥
সন্ধ্যাকালে হাতী ঘোড়া মশাল দীপক।
লইয়া আইলা তথা শত শত লোক॥
কোথা হৈতে আইসে তাহা কেহ না সমুঝে।
নরসী আনিল বলি সব লোক বুঝে॥
বরসজ্জা বড়ই অতুল করি হরি।
নরসীকে কহে আইস ভাল বস্ত্র পরি॥
তেঁহো কহে ভাল বস্ত্র পরিলে কি হবে।
চলহ আমারে নিঞা যথায় যাইবে (খ)॥
ছিণ্ডা কটিবেঢ়া বস্ত্র করতাল হাথে।
উঠিয়া চলিলা নাম গাইতে গাইতে॥
কৃষ্ণ মুচকিয়া হাসেন দেখিয়া দেখিয়া (গ)।
এক হস্তিপৃষ্ঠে তাঁরে দিল চঢ়াইয়া॥
হস্তিপর চঢ়ি করতাল বাজাইয়া।
হরেকৃষ্ণ হরিনাম চলিল গাইয়া॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অধ্যক্ষ হইয়া।
চলিলা সমৃদ্ধি করি বরেরে লইয়া॥
কন্যাকর্ত্তা-গৃহে গিয়া সভে পঁহুছিলা।
সমৃদ্ধি দেখিয়া তারা বিস্মিত হইলা॥
পূর্ব্বে যে দারিদ্র্য বলি উপহাস কৈল।
বরের সমৃদ্ধি দেখি চমক লাগিল (ঘ)॥
লোক জনে খাইতে দিবার নাহি যোত্র।
অহঙ্কার চূর্ণ হৈল দেখিয়া বিচিত্র॥
বিবাহ কালীন নরসী সভাতে বসিয়া।
নাম গান করে করতাল বাজাইয়া॥
চারিদিকে ঘেরি লোক দেখিতে আইল।
বাউল দেখিয়া লোক হাসিতে লাগিল॥
ভকতবৎসল কৃষ্ণ যতন করিয়া।
এতেক করিল ভক্ত-যশের লাগিয়া॥
ভক্ত সেই-যশ-আদি দৃক্‌পাত না করে।
তথাপিহ মহোৎসাহ কৃষ্ণের অন্তরে॥

পাঠান্তর—(ক) ছন্নরূপে—ছদ্মরূপে।
(খ) চলহ যাইব মোরে যথা নিঞা যাবে।
(গ) কৃষ্ণচন্দ্র মুচকিয়া হাসেন দেখিয়া।
(ঘ) চমক লাগিল—বিস্ময় হইল।

পরদিন বর নিঞা ঘরেতে আইলা।
লোকজন কোথা গেল কেহো না জানিলা॥
আর এক নরসীর কাহিনী যে শুন।
ভক্তপক্ষপাত কৃষ্ণ করিলা যে পুন॥
নরসীর সেই কন্যা স্বামি-গৃহে গেলা।
তাহারা দারিদ্র্য অতি অন্নের (ক) বিকলা॥
শ্বশুর শাশুড়ী কহে তোমার পিতারে।
কহিয়া পাঠাও কিছু উপকার তরে॥
তাহা শুনি বার বার নিজ পিতা স্থানে।
মানুষ (খ) পাঠায় কিছু অর্থের কারণে॥
নরসী তাহা নাহি শুনি মনে নাহি ভায় (গ)
পুনর্ব্বার বহু কান্দি কহিয়া পাঠায়॥
বরঞ্চ আমারে তেঁহো কিছু নাহি দেন।
একবার আসি মাত্র দেখা দিয়া যান॥
এতেক শুনিঞা সাধু (ঘ) কন্যার বাটীতে।
সেই ছিণ্ডাবস্ত্র বেশে করতাল হাথে॥
চলিলেন সংকীর্ত্তন করিতে করিতে (ঙ)।
উত্তরিল গিয়া তথা হরষিত চিতে॥
বেহাই বেহানী তারা হাল যে (চ) দেখিয়া।
নিরাশা হইল অর্থ-আশা তেয়াগিয়া॥
অনাদর করি হাসি বিদ্রূপ করিয়া।
বাসা দিল ভাঙ্গা এক চালাতে লইয়া॥
পুষ্প তুলসী নিঞা পূজাতে বসিল।
হেনকালে বড়বৃষ্টি (ছ) হইতে লাগিল॥
ভাঙ্গা ছাপরেতে জল পড়িতে লাগিল।
পুষ্প তুলসীগুলি ভাসিয়া চলিল॥
তবে সাধু হাথে যুড়ি ইন্দ্রেরে কহয় (জ)।
কৃষ্ণপূজা দ্রব্য কেনে কর অপচয়॥

পাঠান্তর—(ক) অন্নের—অন্নার্থে।
(খ) মানুষ—মনুষ্য।
(গ) নরসী সে কথা নাহি শুনে আপনায়।
(ঘ) সাধু—সেই।
(ঙ) চলিলেন পথে পথে কীর্ত্তন করিতে।
(চ) তারা হাল যে—তার অবস্থা।
(ছ) বড়বৃষ্টি—ঝড়বৃষ্টি।
(জ) ইন্দ্রেরে কহয়—ইন্দ্র প্রতি কয়।

এতেক কহিতে জল নাহি পড়ে তথা।
চতুর্দ্দিগে বর্ষে মুষলের ধার যথা॥
বিহাই দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য মানিল।
কারণ কি তার কিছু বুঝিতে নারিল॥
তবে তার কন্যা তার পাকের সামিগ্র।
যথাশক্তি আনি দিল হইয়া অতি ব্যগ্র॥
পাক না করিয়া সাধু গব্য কিছু খাইল।
দুহিতা নিকটে বসি কহিতে লাগিল॥
শ্বশুর শাশুড়ী আদি ঞেহারা দারিদ্র।
অন্ন না খাইতে মিলে সদাই অভদ্র॥
তুমি কিছু উপকার করিবে বলিয়ে।
শ্বশুর শাশের মোর (ক) আছিল আশয়ে॥
তুমি যদি শূন্য হস্তে আইলে দেখিয়া।
মোরে উপহাস করে গঞ্জনা করিয়া॥
ইহা শুনি সাধু তবে কন্যারে কহয়।
শাশুড়ীরে কহ তুমি কি তেঁহো চাহয়॥
যাহা চাহে তাহি দিব নাহিক সংশয়।
আমার প্রভুর ঘরে কিবা না আছয়॥
এতো শুনি কন্যা তবে আনন্দিত-হিয়া।
শাশুড়ীর স্থানে তবে কহে দ্রুত গিয়া (খ)॥
পিতা মোরে কহে যাহা চাহ তাহা দিব।
অতএব কহ তাঁর স্থানে কি চাহিব॥
শাশুড়ী এ কথা শুনি ক্রোধাবেশে কহে।
যাহা চাব তাহি দিবে কল্পতরু নহে॥
কটিতে কেবল এক টেনামাত্র হেরি।
ছাই না পাথর দিবে বুঝিতে না পারি॥
পনিহারায় দিতে হবে দুইটা পাথর।
তাহি গিয়া চাহ তব পিতার গোচর॥
এতো শুনি দুঃখ ভাবি ফিরিয়া আইল।
পিতার নিকটে সব বৃত্তান্ত কহিল॥
পিতা কহে মাতা তুমি দুঃখ না ভাবিহ।
দিয়া যাব আমি কিবা চাহি তাহা কহ॥
স্ত্রীর স্বভাব অন্য অন্য স্ত্রীর স্থানে।
শেলাঘা হইবে বড় শ্রেষ্ঠ করি মানে॥

পাঠান্তর—(ক) শাশের মোর—শাশুড়ী কিছু।
(খ) শাশড়ীকে সকল কহিল তবে গিয়া।

পিতৃস্থানে কহে তবে পাড়ার যতেক।
স্ত্রীলোকেরে বস্ত্র দেহ প্রত্যেক প্রত্যেক॥
সাধু কহে ভাল ভাল তাহাই করিব।
পাথর যে চাহে শাশ (ক) তাহা আনি দিব॥
তবে সাধু শ্যামল সাহার স্থানে কহে।
গাড়ী ভরি বস্ত্র নানা আইসে তার গৃহে॥
আর স্বর্ণময় এক আর রৌপ্যময়।
দুইখানা পাথর যে আনিঞা ডারয় (খ)॥
গ্রামে গ্রামে পাড়া পাড়া প্রতি ঘরে ঘরে।
বহুমূল্য বস্ত্র বিলাইলা সভাকারে॥
ঘরে তাঁর রহিল পাথর দুইখান।
সাধু তবে নিজস্থানে করিলা পয়ান॥
কন্যা নিজ (গ) পিতার যে মহিমা দেখিয়া।
ভক্তিতে জন্মিল লোভ একান্ত হইয়া॥
শ্বশুর-আলয় ছাড়ি পিতৃগৃহে গেলা।
শ্রীকৃষ্ণ ভজিব বলি তাঁহারে কহিলা॥
শ্বশুর-আলয় মুঞি কভু নাহি যাব।
তোমার চরণে থাকি ভজন করিব॥
তাঁর ছোট ভগ্নী তার (ঘ) বিবাহ না হয়।
তেঁহো কহে আমার যে ঐ আশা হয়॥
আমার প্রতিজ্ঞা এই (ঙ) বিভা না করিব।
শ্যামল সাহারে মুঞি একান্ত ভজিব॥
সেই প্রভু পতি সেই বন্ধু যে বান্ধব।
মায়ার স্বভাব মাত্র অন্যে পতি ভাব॥
এতেক বিচার করি বহিনী যে দুই।
হৃদয় উঘাড়ি কহে পিতার স্থানে যাই॥
পিতা শুনি বড় তুষ্ট হইল অন্তরে।
ভাল ভাল বলি প্রশংসয়ে (চ) দোঁহাকারে॥
দুই কন্যা তম্বুরা লইয়া কৃষ্ণগুণ।
গান করে প্রেমানন্দে ভাসি তিন জন॥

পাঠান্তর—(ক) শাশ—বাস।
(খ) ডারয়—যোগায়।
(গ) নিজ—তবে।
(ঘ) তার—এক।
(ঙ) এই—কভু।
(চ) প্রশংসয়ে—প্রশংসিলা।

গ্রামে-গ্রামে বনে বনে নগর বাজারে (ক)।
বাহ্য স্ফূর্ত্তি নাহি কৃষ্ণ গান করি ফিরে (খ)॥
নগরিয়া লোক তার মর্ম্ম নাহি জানি।
নিন্দা করে দুষ্ট বাক্য করে কাণাকাণি॥
জ্ঞাতি-কুটুম্ব নিমন্ত্রণ নাহি করে।
তাহাতেও ক্ষোভ কিছু নাহিক অন্তরে॥
সালঙ্গ নামেতে রাজা স্থানে দুষ্ট গিয়া।
ঠকাম করিল দুষ্ট (গ) অপবাদ দিয়া॥
রাজা পদাতিক দ্বারে তলব করিলা।
তিন জন গাইতে গাইতে চলি গেলা॥
ক্রোধাবেশে রাজা কিছু কহিবারে চাহে।
কটু নাহি আইসে মুখে মৌন করি রহে॥
তেজঃপুঞ্জ দেখিয়া সঙ্কোচ হৈল চিতে।
স্তব স্তোত্র করে রাজা করি যোড়হাতে॥
ঠাকুরের সন্ধ্যা-আরতি-সময় হইল।
তা সভারে লয়ে রাজা মন্দিরেতে গেল (ঘ)॥
তিন জনে নৃত্য গীত অরম্ভ করিল।
প্রেমাবেশে সাধুগণ উন্মত্ত হইল॥
রাজা পাত্র মিত্র আদি চৌদিগে বেড়িয়া।
গানেতে মগন হৈল প্রেমাবিষ্ট হিয়া॥
হেনকালে ঠাকুরের কণ্ঠেতে হইতে (ঙ)।
এক পুষ্পহার (চ) আসি নরসীর গলেতে॥
আচম্বিতে পড়িল যে সভেই দেখিল।
রাজার অন্তরে কিছু (ছ) চমৎকার হৈল॥
ভকতি করিয়া রাজা পাদ ধোয়াইয়া (জ)।
নানা মিষ্ট-অন্ন তাঁহা-সভা খাওয়াইয়া (ঝ)॥
অধর-অমৃত-পাদোদক পান করি।
ঢেঁড়্ড়া ফিরায়্যা দিহ নগরী নগরী॥

নরসী সাধুরে উপহাস যে করিব।
অপযশ কহি দুষ্ট করি যে মানিব॥
তার দণ্ড হবে ঘর সর্ব্বস্ব (ক) লুটিয়া।
মস্তক মুণ্ডন করি দিব খেদাড়িয়া॥
তখন জানিল লোক নরসীর মহিমা।
দুই কন্যা আর তেঁহো নিষ্পাপের সীমা (খ)॥
তাঁ-সভা দর্শনে জগৎ পবিত্র হইল।
একা লালদাস মাত্র বঞ্চিত রহিল॥

চরিত্র শ্রীঅঙ্গদ ভক্ত

রায়সেনগড় রামে দেশপতি রাজা।
তাঁর জ্ঞাতি খুড়া হন যুদ্ধে মহাতেজা॥
রাজার চাকর সেনাপতির প্রধান।
রাজা খুড়া বলি তাঁরে করে বহু মান॥
অঙ্গদ তাঁহার নাম অতি মূঢ়মতি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জানে নাহি কৃষ্ণে রতি॥
স্ত্রীবাধ্য হন তেঁহো অত্যন্ত স্ত্রীজিত।
কিন্তু তাঁর স্ত্রী হন শ্রীকৃষ্ণ-আশ্রিত॥
পরম বৈষ্ণব তেঁহো (গ) দৃঢ়ভক্তিমতী।
সুশীল সুশান্ত দান্ত সাধুর প্রকৃতি॥
স্বামীরে কহেন সদা কৃষ্ণ ভজিবারে।
মূঢ়ের স্বভাব তেঁহো গ্রাহ্য নাহি করে॥
এক দিন স্ত্রীর গুরুদেব গৃহে (ঘ) আইলা।
অন্দরে লইয়া সতী সেবন করিলা॥
অঙ্গদ তাঁহার স্বামী তাহা তো দেখিয়া।
স্ত্রীকে কহয়ে কিছু ভর্ৎসনা করিয়া॥
গৃহমধ্যে কেনে পরপুরুষ আনিলে।
বুঝি নারী হইয়া যে স্বতন্ত্রা হইলে॥
ইহার কি ভাব কিছু (ঙ) বুঝিতে না পারি।
বুঝি ভ্রষ্টা হইলে ইহা অনুমান করি॥ (চ)

পাঠান্তর—(ক) নগর বাজারে—নগরে নগরে।
(খ) কৃষ্ণ গান করি ফিরে—কৃষ্ণগুণ গান করে।
(গ) দুষ্ট—স্পষ্ট।
(ঘ) তা সভারে রাজা দরশনে নিঞা গেল।
(ঙ) কণ্ঠেতে হইতে—কণ্ঠদেশ হৈতে।
(চ) পুষ্পহার—ফুলহার।
(ছ) কিছু—অতি।
(জ) পাদ ধোয়াইয়া—পাদোদক লয়।
(ঝ) সভা খাওয়াইয়া—সভার খাওয়ায়।

পাঠান্তর—(ক) সর্ব্বস্ব—সম্বল।
(খ) নিষ্পাপের সীমা—নিষ্পাপ গরিমা।
(গ) বৈষ্ণব তেঁহো—বৈষ্ণবী হন।
(ঘ) স্ত্রীর গুরুদেব গৃহে—শ্রীগুরুদেব গৃহেতে।
(ঙ) কিছু—তাহা।
(চ) বুঝিনু হইলে ভ্রষ্টা অনুমান করি।

এই মত রমণীরে ভর্ৎসনা করিল।
তাঁর (ক) গুরুকেও কিছু দুর্ব্বাক্য কহিল॥
তাহা শুনি স্ত্রীর মনে দুঃখ উপজিল।
হায় হায় বিধি মোর হেন সঙ্গ দিল॥
নির্ব্বোধ সুমূঢ় স্বামী নাহি বুঝে ধর্ম্ম (খ)।
বুঝিলাম মোর ভাগ্যে বিধির এ কর্ম্ম॥
সহজে স্ত্রীলোক মুঞি নাহিক উপায়।
ইহার প্রায়শ্চিত্ত প্রাণ-তেয়াগ যুয়ায়॥
এতো ভাবি অনাহারে পড়িয়া রহিল।
পরাণ ছাড়িব বলি নিশ্চয় জানিল॥
স্বামী তাঁর অঙ্গদ সে স্বভাবে স্ত্রীজিত।
মানিনী দেখিয়া তবে হৈল পদানত॥
কাতর হইয়া বহু সাধনা করিল।
কহে এবে তাহি যে (গ) করিব যাহা বল॥
নারী কহে তবে আমি পরাণ রাখিব।
অন্ন জল তবে আমি গ্রহণ করিব॥
যদি মোর এক কথা করহ শ্রবণ।
যাহা বলি তাহা যদি করহ গ্রহণ॥
অঙ্গদ কহয়ে তুমি যে আজ্ঞা করিবে।
অবশ্য করিব তাহা অন্যথা না হবে॥
স্ত্রী কহে তবে তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভজহ।
আমার গুরুর স্থানে দীক্ষা যে করহ॥
অঙ্গদ কহয়ে আমি অবশ্য করিব।
মরিতেও কহ যদি তাহায় মরিব॥
অঙ্গদ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত-মহিমা না জানে। (ঘ)
নারীর সোহাগ হেতু করিবারে মানে॥
তবে সেই নারীর গুরুর স্থানে হৈতে।
মন্ত্রদীক্ষা কৈল স্ত্রীর অনুরোধ-মতে॥
নিমাত-সম্প্রদা হন গুরু অপ্রাকৃত।
তাঁহার স্পর্শের গুণ দেখ চমৎকৃত॥
আশ্রয় মাত্রেতে তাঁর চক্ষু খুলি গেল।
অজ্ঞান-তিমির নাশ প্রকাশ হইল (ক)॥
ক্রমে ক্রমে মন যদি গাছিল (খ) কৃষ্ণেতে।
স্বাদু বোধ হৈল যত্ন লাগিল হইতে (গ)॥
পরাৎপর পরম পদার্থ মহানিধি।
জানিঞা তাহাতে তবে ডুবে নিরবধি॥
কায়মনোবাক্যে তবে স্ত্রীরে প্রশংসে।
তোমা হৈতে মোর ভব-দুর্গতি বিনাশে॥
তোমা হৈতে পাইনু মুঞি শ্রীকৃষ্ণ ভকতি।
তোমারে যে গুরু সম মানিতে যুগতি॥
স্ত্রী কিবা পুত্র কিবা পশু কেনে নয়।
কৃষ্ণে মতি যাহা হৈতে সেই গুরু হয়॥
বিপ্র কিংবা ন্যাসী কিংবা শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

পদ্যাবল্যাম্—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং (ঘ) সুমহতামুচ্চাটনং (ঙ)
চাংহসা-মাচাণ্ডাল-মমূকলোক-সুলভো
বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ (চ)।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং (ছ) ন চ
পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি
শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক॥ †

অনুবাদ—যাঁহারা স্থিরসঙ্কল্প (অর্থাৎ গ্রহণ বা সেবার জন্য কৃতনিশ্চয়) সেই মহান্‌দিগের আকর্ষণ-স্বরূপ, সকল পাপ মোচনকারী, মূক ভিন্ন আচণ্ডাল সকলের পক্ষে সহজলভ্য, মোক্ষরূপ সম্পদের বশীকরণে সমর্থ, দীক্ষা, দক্ষিণা ও পুরশ্চরণের সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষাকারী, সেই এই শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মক মন্ত্র জিহ্বা স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ফলদান করিয়া থাকে।

পাঠান্তর—(ক) তাঁর—আর।
(খ) ধর্ম্ম—মর্ম্ম।
(গ) তাহি যে—তাহাই।
(ঘ) অঙ্গদ কৃষ্ণভক্তির গ মর্ম্ম নাহি জানে।

পাঠান্তর—(ক) প্রকাশ হইল—জ্ঞান প্রকাশিল।
(খ) যদি গাছিল—তার হইল।
(গ) হইতে—বাড়িতে।
(ঘ) আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং—আকৃষ্টী-কৃতচেতসাং।
(ঙ) সুমহতামুচ্চাটনং—সুমনসামুচ্চাটনং।
(চ) মুক্তিশ্রিয়ঃ—মোক্ষাশ্রয়ঃ অথবা মোক্ষপ্রিয়ঃ।
(ছ) সৎক্রিয়াং—দক্ষিণাং অথবা সংক্রিয়াম্।
† "বিপ্র কিংবা.. শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ"—এই অংশ বটতলা সংস্করণ হইতে গৃহীত।

কৃতার্থ মানিঞা রমণীরে প্রশংসয়।
কি আশ্চর্য্য দেখহ সদ্‌গুরুর আশ্রয়॥
দুর্ঘট ঘটন সদ্‌গুরুর চরণ।
অদ্যাপিহ কর ইহা সাক্ষাতে দর্শন॥
অসম্প্রদায়-উপদিষ্ট তার মতি গতি।
সম্প্রদায়-নিষ্ঠ যেই তাহার প্রকৃতি॥
সুবোধ যে হয় সেই অনুভব করে।
বর্ব্বর যে কিছু তার না হয় গোচরে॥
তবে শ্রীঅঙ্গদ রাজ-বিষয় ছাড়িয়া।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করে গৃহেতে বসিয়া॥
রাজা বোলাইলা যুদ্ধে যাইতে হইবে।
তেঁহো কহে আমা হৈতে তাহা না চলিবে॥
বহু-জীব-হিংসা হয় যুদ্ধের আড়ম্বে।
অন্যেরে পাঠাও আমা হৈতে না হইবে॥
তথাচ না শুনি রাজা যুদ্ধে পাঠাইল।
কি করিবে রাজ-আজ্ঞা যাইতে হইল॥
যুদ্ধে গিয়া প্রতিযোগী রাজারে জিতিল।
রাজার পাগেতে বহুমূল্য হীরা ছিল॥
নির্ম্মল সুন্দর স্থূল সুদুর্ল্লভ হীরে।
পাইয়া অঙ্গদ সাধু অন্তরে বিচারে॥
এই যে অপূর্ব্ব দ্রব্য অন্যে যোগ্য নহে।
পরাইব পুরুষোত্তমে জগন্নাথ-দেহে॥
এতেক ভাবিয়া হীরা যতনে রাখিল।
নিজপ্রভু রাজার নিকটে তবে আইল (ক)॥
লুটিয়া আনিল যত সব দ্রব্য দিল।
হীরাখানি নাহি দিল গোপনে (খ) রাখিল॥
পরে পরম্পরা রাজা হীরার কথন।
শুনিয়া অন্তরে তবে হৈল ক্রোধমন॥
অঙ্গদের স্থানে হীরা মাগিল রাজন।
তেঁহো কহে নাহি দিব থাকিতে জীবন॥
অন্য কারো যোগ্য নহে সে হীরারতন।
জগন্নাথ-অঙ্গ-যোগ্য হইবে ভূষণ॥

পাঠান্তর—(ক) আইল—গেল।
(খ) গোপনে—যতনে।

এতেক শুনিঞা রাজা ক্রোধাবিষ্ট হৈল।
খুড়া বলি তখন যে কিছু না কহিল (ক)॥
পুনঃপুন চাহিতেও যদ্যপি না দিলা।
রাজা তাঁর ঘর দ্বার সকলি ঘেরিলা॥
সাধুর একান্ত মন জগন্নাথে দিব।
পরাণ তেজিতে হয় তাহাও তেজিব (খ)॥
এতো ভাবি হীরাখানি বান্ধি পাগড়িতে।
কথোগুলি সওয়ার লইল নিজ সাথে॥
পলাইয়া চলিল শ্রীপুরুষোত্তম-পথে।
রাজা শুনি পাত্রে কহে ধরিয়া আনিতে॥
পাঁচশ সওয়ার পাত্র পাঠায় অমনি।
অঙ্গদ দুষ্টেরে ধরি আনহ এখনি॥
হীরাখানি যদি দেয় আপন ইচ্ছায়।
লইয়া আসিবে তবে ছাড়িয়া তাহায়॥
লড়িতে প্রবর্ত্ত দুষ্ট যদি হয় তবে।
হীরা (গ) যে লইবে আর মস্তক ছেদিবে॥
এতেক শুনিঞা সব সওয়ার চলিল।
কথো দূরে লাগ পাই তাঁহারে (ঘ) ঘেরিল॥
তাঁরে কহে হীরা দেহ নতুবা তোমার।
মস্তক ছেদিব ইহা হুকুম রাজার॥
ফাঁফর হইয়া তেঁহো ভাবে মনে মনে।
ইহার যে উপায় কি করিব এখনে॥
এক পরামর্শ ঠাহরিব নিজ মনে (ঙ)।
সওয়ারগণেরে বলে (চ) বৈস এইখানে॥
এই পুষ্কণীতে আমি স্নান-পূজা করি।
পশ্চাতে তোমার হস্তে হীরা দিব ধরি॥
এতো কহি স্নান পূজা করিয়া অঙ্গদ।
হীরা খুলি (ছ) হস্তে লৈল ভাবিয়া বিপদ॥
ধ্যান করি জগন্নাথ-চরণ-কমল।
স্তুতি করি কহে কিছু হইয়া বিকল॥

পাঠান্তর—(ক) কহিল—বলিল।
(খ) তেজিব—করিব।
(গ) হীরা—মণি।
(ঘ) তাঁহারে—তাঁদের।
(ঙ) নিজ মনে—মনে মনে।
(চ) বলে—কহে।
(ছ) হীরা খুলি—হীরাখানি।

তোমার কারণে প্রভু হীরা রেখেছিনু।
দুর্ভাগ্য যে আমি হীরা পরাইতে নারিনু॥
এ হেন সামগ্রী পরিবেক কোন ছার।
ইহা পরাইতে যোগ্য কপালে তোমার॥
তোমার উদ্দেশে এই জলে সমর্পিনু।
যে ইচ্ছা তোমার কর পদে নিবেদিনু॥
এতো কহি (ক) অগাধ জলেতে দিল ডারি।
দেখিয়া সওয়ারগণ উঠে হাহা করি॥
পুনশ্চ সওয়ারগণ মনে হৃষ্ট হৈল।
ভাল ভাল হীরা মো সভার হাথে আইল॥
জল হৈতে তলাসি এখনি উঠাইব।
যায় যাকু অঙ্গদের পিছে না করিব (খ)॥
অঙ্গদ শ্রীপুরুষোত্তম পথে চলি গেলা।
সওয়ারগণেতে হীরা তলাসে লাগিলা॥
শীঘ্র জল সেঁচাইয়া পঙ্ক উঠাইলা (গ)।
অনেক যতন কৈলা হীরা না পাইলা॥
রাজার সাক্ষাতে গিয়া বৃত্তান্ত কহিলা।
উপায় না দেখি রাজা নিরস্ত হইলা॥
হোথা শ্রীপুরুষোত্তমে অঙ্গদ যাইয়া।
দেখে শ্রীবদনে হীরা শোভে ঝলকিয়া॥
পাণ্ডাগণ পরস্পর চমকিয়া বলে।
কোথা হৈতে আইল হীরা প্রভুর কপালে॥
জগন্নাথ আদেশ করিলা পাণ্ডাগণে।
কপালেতে হীরা মোর পরায় যে জনে॥
অঙ্গদ তাহার নাম ক্ষেত্রে মোর আইল।
তাহারে জানাও মুঞি হীরা যে পরিল॥
তবে পাণ্ডাগণ তাঁর তল্লাস করিয়া।
বহু সমাদর করি আনে সম্মানিঞা॥
জগন্নাথ-আজ্ঞা সেই হীরার বৃত্তান্ত।
কহিল তাঁহারে যে সকল আদ্যোপান্ত (ঘ)॥

পাঠান্তর—(ক) কহি—বলি।
(খ) করিব—হইব।
(গ) উঠাইলা—উদ্ধারিলা।
(ঘ) কহিলেন সকল তাঁহারে আদ্য-অন্ত।

দরশন করাইলা নিঞা শ্রীবদন।
হীরা ভালে শোভে দেখি উল্লসিত (ক) মন॥
প্রেমানন্দে গদগদ পুলক শরীর।
দয়াল প্রভুর গুণ দেখিয়া অস্থির॥
জগন্নাথ-শ্রীবদনে মন্দ মন্দ হাস।
প্রভু-ভৃত্য দোঁহাকারে অন্তরে উল্লাস॥
সেই হীরা অদ্যাবধি কপালে শোভয়।
পর্ব্বে পর্ব্বে পরেন সদত না পরয়॥
সেই শ্রীঅঙ্গদের যে পদধূলি-কণ।
বহু পুণ্যফলে যদি পাই সে রতন॥
তবে এই তাপত্রয় সংসার এড়াই।
কৃষ্ণভক্তি অমূল্য রতন-ধন পাই॥

চরিত্র শ্রীকরুরির রাজা শ্রীচতুর্ভুজ

চতুর্ভুজ নাম করুরির মহারাজা।
মহাভাগবত দুই অংশে মহাতেজা॥
বৈষ্ণব-সেবায় প্রীত কায়মনোবাক্যে।
গৃহ হৈতে চারি-ক্রোশ-তক চৌকি রাখে॥
বৈষ্ণব দেখিয়ামাত্র যতন করিয়া।
একান্ত করিয়া আনে চরণে ধরিয়া॥
সুবিধি বিবিধরূপে (খ) করয়ে সেবন।
যাওন কালেতে (গ) তাঁরে দেয় বহুধন॥
এই ব্রত (ঘ) রাজার অন্যধর্ম্মেতে বিরত।
প্রতিদিন বৈষ্ণব আইসে শত শত॥
সব বৈষ্ণবের পাদোদক ভুক্তশেষে।
খাইয়া ভকতিপূর্ণ অশেষ বিশেষে॥
আর এক কোন রাজা পশ্চিম-দেশীয়।
এ সব বৃত্তান্ত শুনি জ্ঞান কৈল হেয়॥
বৈষ্ণবের বেশ ধরি যেই জন যায়।
তাহারে পূজয়ে আর উচ্ছিষ্ট ভুঞ্জয়॥

পাঠান্তর—(ক) উল্লসিত—আনন্দিত।
(খ) সুবিধি-বিবিধরূপে—সুবিধি-বোধিতরূপে।
(গ) যাওন কালেতে—যাবার সময়।
(ঘ) ব্রত—ধর্ম্ম।

জানিঞা শুনিঞা নাহি বৈষ্ণবে সেবয়ে।
ভাঁড় এক পাঠাই মুঞি দেখি কি করয়ে॥
এতো কহি ডোম এক ভাঁড় আনাইয়া।
পাঠাইল বৈষ্ণবের ভেক বানাইয়া॥
কর্ণুরের রাজার গৃহে (ক) উপনীত হৈল।
বৈষ্ণব দেখিয়া রাজা সমাদর কৈল॥
কৃত্রিম বৈষ্ণব ভাঁড় ডোম জাতি হয়।
অন্য রাজা তারে পাঠাইল অসূয়ায়॥
এ কথা শুনিয়া রাজা কোনো পরম্পরা (খ)।
তথাচ ভকতি কৈলা করিয়া সুধারা॥
বৈষ্ণবের ভেক মাত্র দেখিয়া ভকতি।
অবশ্যকর্ত্তব্য বিচারিলা মহামতি॥
বহু স্তুতি নতি সেবা ভকতি করিল (গ)।
অর্থ দিয়া তাহার সন্তোষ জন্মাইল॥
ভাঁড় মনে ভাবে মুঞি ঠকাইয়া লৈনু।
রাজা মনে ভাবে মুঞি কৃতার্থ হইনু॥
ভাঁড় যে বৈষ্ণব তবে বিদায় মাগিল।
ভাল ভাল বলি রাজা বিশেষ কহিল॥
শুনিলাম অমুক যে রাজা কৃপা করি।
তোমা পাঠাইল মোরে পবিত্র বিচারি॥
তেঁহো বড় দয়ালু আমার হিতকারী (ঘ)।
তাঁরে এক দ্রব্য আমি দিব মূল্য ভারি॥
যতন করিয়া নিঞা (ঙ) দিবে তাঁর স্থানে।
পহুঁছ সমাচার যেন পাঠান এখানে॥
ইহা শুনি ভাঁড় কিছু কুণ্ঠিত হইল।
আমি যে কপট বুঝি রাজা তা জানিল॥
তবে রাজা সাঁচ্চা এক জরির ফালিতে।
এককড়া কাণাকড়ি বান্ধিয়া তাহাতে॥
মোহর করিয়া (চ) দিল যতন করিয়া।
ভাঁড়ের হস্তেতে দিলা চলিল লইয়া॥

সেই রাজাস্থানে গিয়া কহিল হাসিয়া।
মোরে বহু ভক্তি কৈল বৈষ্ণব জানিঞা॥
তুমি মোরে পাঠাইলা জানিল কেমনে।
তোমারেও বহুস্তুতি কৈল কায়-মনে (ক)॥
আরো কি অপূর্ব্ব দ্রব্য তোমার কারণে।
মোর হস্তে দিয়া পাঠাইলেন যতনে॥
এতো বলি জরির ফালির পুটলি।
রাজার হস্তেতে দিল অতি শ্লাঘ্য করি॥
রাজা খুলি দেখে কাণাকড়ি এক কড়া।
সুন্দর জরির ফালি তাহাতেই মোড়া॥
দেখিয়া রাজন তবে ভাবে মনে মনে।
পাঠাইল কাণাকড়ি কড়া কি (খ) কারণে॥
পাত্র মিত্র সভাসদ্ সভারে পুছিল।
আদ্যোপান্ত সব বিবরণ জানাইল॥
পূর্ব্বাপর শুনি সভে বিচার করিল।
তাহার সিদ্ধান্ত তবে নিশ্চয় কহিল (গ)॥
ভাঁড় যে বৈষ্ণবে তুমি (ঘ) পাঠাইলা তথা।
তারি উদাহরণ যে পাঠাইলা হেথা॥
ভাঁড় যে সে কাণাকড়ি ভেক যে সে জরি।
কাণাকড়ি লঘু কিন্তু জরি দীপ্ত করি (ঙ)॥
জরির আদর কাণাকড়ির কি মূল।
জরি আচ্ছাদিত হেতু জরি সমতুল॥
অতএব পূজনীয় ভেক-আচ্ছাদিত।
ভাঁড় পূজনীয় হৈল তাহার সহিত॥
ভেকের মহিমা-গুণ এমতি যে হয়।
চণ্ডাল হইলে তবে (চ) পূজিতে জুয়ায়॥
রাজা কহে ইহার প্রমাণ কোথা হয়ে।
সভাসদ কহে আদি পুরাণাদি কয়ে॥
চোর ভেক করি চুরি করিবারে গেল।
জানিয়াও রাজা তার সম্মান করিল॥

পাঠান্তর—(ক) রাজার গৃহে—রাজগৃহে।
(খ) কোনো পরম্পরা—লোক পরম্পরা।
(গ) নতি সেবা ভকতি করিল—করি সেবা ভক্তি কৈল।
(ঘ) তেঁহো যে দয়াল হন মোর হিতকারী।
(ঙ) নিঞা—তুমি।
(চ) করিয়া—বান্ধিয়া।

পাঠান্তর—(ক) তোমারেও ভক্তি কৈল কায়মনোবাক্যে
(খ) কড়া কি—কিসের।
(গ) কহিল হইল।
(ঘ) বৈষ্ণবে তুমি বৈষ্ণব বেশে।
(ঙ) দীপ্ত করি—দীপ্তিকারী।
(চ) তবে—তারে।

বিস্তার করিয়া সভাসদ শুনাইল।
প্রতীত হইয়া রাজা চমকিত (ক) হৈল॥
এতো শুনি রাজা বহু প্রশংসা করিল।
আপনারে অপরাধী করিয়া মানিল॥
আপনি চলিল করুরির রাজ-পাশ।
চরণে পড়িয়া ক্ষেমাইল নিজ-দোষ॥
দুইজনে মেলামেলি করি (খ) কৃষ্ণকথা।
কহিয়া আনন্দ হৈল দুই বন্ধু যথা॥
করুরির রাজা এক প্রার্থনা করিয়া।
কহেন তাঁহারে দুটি হস্তেতে ধরিয়া॥
শুনি এক পড়া শুয়া[১] আছয়ে তোমার।
কৃষ্ণ-গুণ-গান করে অতি চমৎকার॥
পক্ষীটি আমাকে যদি দেহ কৃপা করি।
তেঁহো কহে ক্ষেম মোরে তাহা তো না পারি॥
রাজ্য ধন প্রাণ আদি লও দিতে পারি (গ)।
শুয়া যে আমার প্রিয় তাহা দিতে নারি॥
আমার সুসঙ্গ সেই উপদেশকর্ত্তা।
গুরু করি মানি তারে সেই মোর ত্রাতা॥
বিষয়ে উন্মত্ত মুঞি যবে থাকি ভুলি।
চেতন করায় সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি॥
তাহার প্রসাদে মুঞি কৃষ্ণনাম শুনি।
স্মরণ করায় বুঝি (ঘ) মোরে মূঢ় জানি॥
তুলসীর মালা গলে তিলক শোভয়।
কৃষ্ণের অধরামৃত বিনে নাহি খায়॥
অপ্রাকৃত হয় সেই অসম্ভব-গুণ।
কৃষ্ণভক্তি-মতে তার কিছু নাহি ন্যূন॥
করুরির রাজা শুনি চমৎকার হৈল।
এতেক আসক্তি শুনি পুন না চাহিল॥
পুন সেই রাজা কহে গদগদ ভাবে।
তোমা হৈতে মোর এক রোগ গেল এবে॥

পাঠান্তর—(ক) চমকিত—চমৎকার।
(খ) মেলামেলি করি—একত্রে বসিয়া।
(গ) রাজ্য লও ধন লও প্রাণ দিতে পারি।
(ঘ) বুঝি—সেই।

১। পড়া শুয়া—বুলি-শিখান শুকপাখী।

বৈষ্ণবেরে ছোট বড় করিয়া মানিত।
ভজন আছয়ে কি না পরখ করিত॥
এবে মোর সে চণ্ডাল রোগ শান্তি হৈল।
তোমার শরণমাত্রে পবিত্র হইল॥
এবে মুঞি বৈষ্ণবের দেখি ভেকমাত্র।
শরণ লইব পদে দেখিয়া (ক) পবিত্র॥
রাজা কহে তোমার অপেক্ষা আছে কিবা।
যাথে গুরু করি মানি শুয়া কর সেবা॥
এতাদৃশ মতি যদি শত জন্মে হয়।
তবে মুঞি ধন্য হই তোমার কৃপায়॥
তবে সেই রাজা নিজগৃহে চলি গেলা।
করুরির রাজা বহু সওগাত ধরিলা॥
করুরির রাজা চতুর্ভুজ নৃপমণি।
আর সেই অন্য রাজা মহা ভক্তিধনী॥ (খ)
আর সেই শুয়াপক্ষী মহাপূজ্যতম।
লালদাস হৃদয়েতে করুন বিশ্রাম॥

চরিত্র শ্রীমীরা বাঈ

মেরতা গ্রামেতে জন্ম মীরা বাঈ নাম।
রাণা যে রাজার বধু গুণে অনুপাম॥
একান্ত শ্রীকৃষ্ণভক্ত অনন্য-মানস।
প্রেমভক্তি চমৎকৃত কৃষ্ণ যাতে বশ॥
অন্যকথা অন্য চেষ্টা অন্যসঙ্গহীন।
কাম-ক্রোধ-লোভ-আদি আপনা-অধীন॥
অন্দরে শ্রীমূর্ত্তি এক প্রকাশ করিয়া।
যতনে সেবন করে ভাবাবিষ্ট হিয়া (গ)॥
অষ্টকাল যখন যে সেবার নিয়ম।
পিরীতে করয়ে শুদ্ধহৃদয় নিষ্কাম॥
বৈষ্ণব অবারি দ্বার সদা আইসে যায়।
যথা কৃষ্ণ সেবা তথা বৈষ্ণব সেবায়॥
নৃত্য-গীত বাদ্য করে বৈষ্ণব-সহিত।
কৃষ্ণরসরঙ্গে বাঈ সদা আনন্দিত॥

পাঠান্তর—(ক) দেখিয়া—জানিয়া।
(খ) আর সেই মহাযোগ্য রাজা ভক্তিধনী।
(গ) হিয়া—হৈয়া।

গানশক্তি অসম্ভব অমৃত নিন্দিত।
যাতে দ্রবীভূত হৈল শ্রীকৃষ্ণের চিত॥
বাঈজীর গানশক্তি আকবর সাহা।
পাতসা শুনিতে মনে করিলা উৎসাহা॥
তানসেন সঙ্গে করি বৈষ্ণবের বেশে।
বাঈজীর গৃহে গেলা হইয়া উল্লাসে॥
বৈষ্ণব জানিঞা বাঈ সমাদর কৈল।
গান শুনাবারে তারে পাৎসাহা কহিল॥
ঠাকুরের আগে বাঈ গাইতে লাগিলা।
গান শুনি তানসেন আপনা নিন্দিলা॥
পাতসা শুনিয়া তবে চমৎকার হৈল।
প্রেমাবেশে দুই জনা অধৈর্য্য হইল॥
পাতসা চলিয়া গেলা তবে রাজা রাণা।
অন্দরে বৈষ্ণব যাওয়া করি দিল মানা॥
বধূ ভ্রষ্টা হৈল বলি ক্রোধাবিষ্ট হৈয়া।
ছুটিয়া কাটিতে গেলা তলওয়ার নিঞা॥
বাঈজীর উপরে গিয়া তলোয়ার (ক) হানিল।
কাটিবার থাকু কাজ অঙ্গে না ফুটিল॥
বিষ আদি খাওয়াইলা কিছুই না হয়।
হরির ভকত জনে বিঘ্ন কে করয়॥
বৈষ্ণব আসিতে যবে বারণ করিল।
বাঈজী অন্তরে কিছু ক্ষোভিত হইল॥
গৃহ হৈতে নির্কশিয়া গেলা বৃন্দাবন।
রাজা পাছে পাছে পাঠাইলা নিজ জন (খ)॥
ধরিয়া আনিতে চাহে ছুঁইতে না পারে।
আগুনের শিখা যেন দেহ দগ্ধ করে॥
ফিরিয়া চলিল সভে যত পাছে আইল (গ)।
তখন চমকি রাজা মরম বুঝিল॥
অপরাধ মানি আর কিছু না কহিল।
কৃষ্ণ-প্রিয়জন এই নিশ্চয় জানিল॥
বৃন্দাবনে গিয়া বাঈ আনন্দে মগন।
বাঞ্ছা হৈল শ্রীরূপ-গোস্বামি-দরশন॥

পাঠান্তর—(ক) তলোয়ার—অস্ত্র যে।
(খ) নিজ জন—নিজগণ।
(গ) ফিরিয়া আইল সবে যত গিয়াছিল।

কহি পাঠাইল শ্রীরূপেরে কারো দ্বারে।
দরশন করি যদি কৃপা করে মোরে॥
গোসাঞি কহেন মুঞি করি বনে বাস।
নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ॥
এ কথা শুনিয়া বাঈ ক্ষোভ পাই মনে।
পুন কহি পাঠাইল গোসাঞির স্থানে॥
এত দিন শুনি নাই শ্রীমন্ বৃন্দাবনে।
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে॥
পুরুষ কোকিল ভ্রমরাদির অগম্য।
তেঁহো যে আইল তাথে নাহি বুঝি (ক) মর্ম্ম॥
প্যারীজীর প্রিয়সখী ললিতা জানিলে।
কেমনে রহিবে তেঁহো অন্তঃপুর স্থলে॥
এতেক প্রহেলী যদি কহি পাঠাইলা।
শুনিঞা শ্রীরূপ কিছু (খ) লজ্জিত হইলা॥
কহিতে কহিলা পুন বাঈজীর স্থানে।
কৃপা করি আসি যেন দেন দরশনে॥
তবে বাঈ হৃষ্টমনে গোসাঞির স্থানে।
যাইয়া অষ্টাঙ্গ করি পড়িলা চরণে॥
পরমা সুন্দরী বাঈ অলপ বয়েস।
গোপী উদ্দীপনে রূপের হৈল প্রেমাবেশ॥
দুইজনে পরস্পর কৃষ্ণকথা রসে।
মগন হইল প্রেম-আনন্দ-উল্লাসে॥
বাঈজীর কত গুণ কহা বাহি যায়।
লালদাস মাগে তাঁর চরণে সহায়॥

চরিত্র শ্রীপৃথ্বীনাথ রাজা

পৃথ্বীনাথ নাম রাজা গুরুভক্ত অতি।
সর্ব্বস্ব গুরুকে দিলা সুপ্রসন্ন-মতি॥
গুরু নাহি লৈলা তাঁরে পুন সমর্পিলা।
গুরু-আজ্ঞা হেতু কষ্টে গ্রহণ করিলা॥
গুরু শ্রীদ্বারকানাথ-দর্শনে চলিলা।
তাঁহার সহিত রাজা গমন করিলা॥

পাঠান্তর—(ক) বুঝি—জানি।
(খ) কিছু—তবে।

দৃঢ়ভক্তি-ভাবে করে গুরুর সেবন।
নীচসেবা করে তেজি রাজ-অভিমান॥
গুরুসেবা হৈতে কৃষ্ণ প্রসন্ন হইলা।
কথো দূর যাইতে তাঁরে আদেশ করিলা॥
পৃথ্বীনাথ রাজা তুমি ঘরে ফিরি যাহ।
ঘরেতে বসিয়া গিয়া (ক) মোর নাম লহ॥
প্রসন্ন হইনু আমি তোমার উপর।
গৃহে বসি দরশন পাইবে আমার॥
দ্বারকা দর্শন আর গোমতীতে স্নান।
দ্বারকা-সম্বন্ধে তপ্তমুদ্রা যে ধারণ॥
গৃহেতে বসিয়া গিয়া করহ স্বচ্ছন্দে।
গৃহেতে যাইবে সব তোমার সম্বন্ধে॥
স্বপন দেখিয়া রাজা চেতন পাইয়া।
অন্তরে বিচার করে তটস্থ হইয়া॥
কৃষ্ণ মোরে আজ্ঞা দিল গৃহেতে যাইতে।
কি করি ইহার কিছু না পারি বুঝিতে॥
কৃষ্ণ কৃপা হৈল যেই গুরুসেবা হৈতে।
তাঁর সেবা ছাড়ি গৃহে না পারি যাইতে॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা অপালনে নাহি মোর দোষ।
গুরুরূপে তেঁহো যদি থাকেন সন্তোষ॥
অতএব গুরুসেবা ছাড়িতে নারিব।
নরকে যাইতে হয় বরঞ্চ যাইব॥
এতো ভাবি গুরুসেবা করিয়া চলিলা।
অন্তরে রহিল কারে কিছু না কহিলা॥
পুনর্ব্বার কৃষ্ণ কহে পৃথ্বীনাথ তুমি।
ঘরে ফিরি যাও সুপ্রসন্ন হৈনু আমি॥
গুরু যে তোমার সে তো আমার মূরতি।
মোর বাক্য রাখ যাথে আমার পিরীতি॥
পুনর্ব্বার স্বপন দেখিয়া বিচারয়।
পুন আজ্ঞা কৈল কৃষ্ণ কি করি উপায়॥
গুরুর সাক্ষাতে তবে বিবরি (খ) কহিলা।
গুরু শুনি (গ) চমকিয়া কহিতে লাগিলা॥

পাঠান্তর—(ক) গিয়া—তুমি।
(খ) তবে বিবরি—সব বৃত্তান্ত।
(গ) শুনি—জানি।

আহা মরি বাপু তব বলিহারি যাই।
তুমি ধন্য তোমার জগতে সম নাঞি॥
কৃষ্ণ কৃপামৃত এতো তোমার উপর।
ঘরে যাহ বাপু সেই আজ্ঞা কর সার (ক)॥
গুরু যদি উপদেশ এতেক কহিলা।
তবে মহারাজ ঘরে ফিরিয়া চলিলা॥
গুরুর বিচ্ছেদে রাজা ক্ষোভিত হইল।
গুরুসেবা ছাড়ি চিত্ত প্রসন্ন নহিল॥
দুই চারি দিন পাছে দেখে রাত্রিযোগে।
গোমতী পাবন নদী আইলেন বেগে॥
শ্রীদ্বারকনাথ শ্রীমান টিকম রণছোড়।
দুই যে ঠাকুর দেখে ঘরের ভিতর॥
দ্বারকার অনুচর তপ্তমুদ্রা দিয়া।
বাহুমূলে রাজার বরিল ছাবা দিয়া॥
বহু সাধু সন্ত আনি রাজা (খ) দেখাইল।
দেখিয়া সকলে নিজ কৃতার্থ মানিল॥
আনন্দে গোমতী-নদী-স্নান সভে কৈল।
দ্বারকনাথের পদে প্রণাম করিল॥
রাজার মহিমা দেখি আশ্চর্য্য মানিল।
স্তব স্তুতি করি বহু সৎকার (গ) করিল॥
বৈদ্যনাথ দেব-স্থানে এক অন্ধ নিজ।
চক্ষু লাগি কৈল বহু তপ ব্রত পূজ॥
মহাদেব আজ্ঞা দিলা অমুক যে দেশে।
পৃথ্বীনাথ নাম এক সাধু রাজা বৈসে॥
তাহার গামছা-বস্ত্রে আঁখি মুছ গিয়া।
চক্ষুস্মান্ হবে সব শান্তিকে পাইয়া॥
ব্রাহ্মণ যাইয়া তাঁর গামছা লইয়া।
চক্ষুস্মান্ (ঘ) হৈল চক্ষু তাহাতে মুছিয়া॥
কৃষ্ণের করুণা যারে তাহার মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেব যার নাহি পায় সীমা॥

পাঠান্তর—(ক) সেই আজ্ঞা কর সার—কৃষ্ণ আজ্ঞা অনুসার।
(খ) রাজা—নৃপে।
(গ) সৎকার—প্রশংসা।
(ঘ) চক্ষুস্মান্—চক্ষু ধন।

ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে পারে কটাক্ষ কিরণে (ক)।
তাহে কি আশ্চর্য্য কারো অন্ধচক্ষুদানে (খ)॥
গুরুভক্তি বিনে কভু কৃষ্ণ নাহি পাই।
ইথে বুঝি আমা সভার অধিকার নাঞি॥
মহারাজ পৃথ্বীনাথ-চরণে পড়িয়া।
গুরুভক্তি মাগে লালদাস অভাগিয়া॥

চরিত্র শ্রীমধুকর সাহা

ওড়ছো নামেতে গ্রাম মধুকর সাহা।
বৈষ্ণবে যে কত প্রীত নাহি যায় কহা॥
যথানাম সারগ্রাহী মধুকর তুল্য।
অনন্যশরণ কৃষ্ণে ভক্তি যে অমূল্য॥
বৈষ্ণবের নাম গান বৈষ্ণব স্মরণ (গ)।
ত্রিসন্ধ্যা বৈষ্ণব পূজা চরণ সেবন॥
বিদূষক লোক যত পাষণ্ড নিন্দুক।
তমের স্বভাবে (ঘ) তারা দেখি পায় দুখ॥
দ্বেষ করি তারা এক গাধার গলায়।
তুলসীর মালা দিয়া তিলক নাসায়॥
মধুকর সাহা গৃহে হাঁকাইয়া দিল।
মধুকর তাহা দেখি বিচার করিল॥
ভগবদ্ভক্তের ভেক (ঙ) ইহার যে হয়।
ইহ পূজ্য হয় পূজা করিতে জুয়ায়॥
ইহাকে অবজ্ঞা কৈলে অপরাধ হয়।
সাধকের ধর্ম্মহানি শাস্ত্রেতে কহয়॥
কৃষ্ণের ভকত ইহ মোর প্রভুর দাস।
মোর মিত্র কৃপা করি আইল মোর বাস॥
এত চিন্তি আদর করিয়া গৃহে আনি।
চরণ-ক্ষালন করি কহি মিষ্ট বাণী॥
গন্ধপুষ্প আদি দিয়া করিলা পূজন।
রন্ধন করিয়া করাইলেন ভোজন॥
দণ্ডবত প্রণাম গদগদ ভাবে কৈল।
সেবন সম্মান করি বিদায় করিল॥
অতএব ধন্য ধন্য তাঁর মতি রীতি।
ধন্য যে স্বভাব তাঁর ধন্য কৃষ্ণে রতি॥
রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীরূপ গোসাঞি।
বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য যে কহিল তাহাই॥
বৈষ্ণব দুর্বৃত্ত মতি সেহ পূজ্যতম।
পশু পক্ষী সেহ যদি লয় কৃষ্ণনাম॥
সেই তো পরম পূজ্য দূরে থাকু সেহ।
গাধার শরীরে যদি ভেখ দেখি কেহ॥
দণ্ডবত প্রণাম সম্মান নাহি করে।
কেমন ভরসা তার কি সাহস ধরে॥
অপরাধে ভয় নাহি নরকে না ডরে।
কৃষ্ণভক্তি-ধনে বুঝি আকাঙ্ক্ষা না করে॥
সর্ব্ব অর্থে বহিষ্কৃত বুঝি হৈতে চাহে।
এই যে আশয়ে শ্রীল গোস্বামিজী কহে॥
অতএব বৈষ্ণবের সাধন ভজন।
বিচার কর্ত্তব্য নহে ভেখ দরশন॥
মাত্রেতে আদর পূজা সৎকার কর্ত্তব্য।
ইহাতে সন্দেহ নাহি অবশ্য সুসেব্য॥
অতএব মধুকর সাহা যে করিল।
ধন্য বটে আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মিলিল॥
তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।
কুমতি যাউক লালদাস অভাগার॥

চরিত্র শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী

প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীপুরে বাস।
জ্ঞানযোগ-মার্গে স্থিতি চিন্তয়ে আকাশ॥
বেদান্তে পণ্ডিত যে শাঙ্করি-ভাষ্যমতে।
শ্রীবিগ্রহ নাহি মানে দুই নাশ যাথে॥
যতেক দণ্ডীর গুরু কাশীতে প্রামাণ্য।
আপনারে মানে ইষ্ট ব্রহ্মেতে অভিন্ন॥
মায়াবাদী ঈশ্বরের স্বরূপ-শকতি।
যোগমায়া নাহি মানে ব্যতিক্রম-মতি॥

পাঠান্তর—(ক) কিরণে—করিলে।
(খ) কারো অন্ধচক্ষুদানে—অন্ধজনে চক্ষু মিলে।
(গ) বৈষ্ণব স্মরণ—বৈষ্ণবে শরণ।
(ঘ) স্বভাবে—প্রভাবে।
(ঙ) ভেক—বেশ।





ভক্তি যে পদার্থ তার মর্ম্ম নাহি জানে।
প্রেমভাব দেখি কহে কান্দে কি কারণে॥
বেদের তাৎপর্য-অর্থ প্রেম যে পর্য্যন্ত।
কল্পিতার্থ বাদে তার নাহি জানে অন্ত॥

প্রমাণতন্ত্রে—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

সেই কালে মহাপ্রভু প্রকট শ্রীক্ষেত্রে।
প্রচণ্ড প্রতাপ গুণ ব্যক্ত ত্রিজগতে॥
প্রভুর যে প্রেমভক্তি অলৌকিক ক্রিয়া।
কাশীতে প্রকাশানন্দ বিশেষ শুনিঞা॥
প্রসন্ন না হৈল তাহে (ক) লোক-প্রতারক।
ভাবকালি দেখি ভুলে ইতর যে লোক॥
এতো কহি এক শ্লোক আপনি রচিয়া।
পাঠাইলা মহাপ্রভু স্থানে লোক দিয়া॥

শ্লোকঃ—

যত্রাস্তে মণিকর্ণিকাঽমলসরঃ স্বর্দীর্ঘিকা দীর্ঘিকা,
রত্নং তারকমক্ষরং তনুভৃতে শম্ভুঃ স্বয়ং যচ্ছতি।
তস্মিন্নদ্ভুতধামনি স্মররিপোর্নির্ব্বাণমার্গে স্থিতে,
মূঢ়োঽন্যত্র মরীচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি॥

অনুবাদ।—যেখানে মণিকর্ণিকা নামে অমল সরোবর এবং স্বরদীর্ঘিকা নামক দীর্ঘ বর্ত্তমান, যেখানে স্বয়ং শম্ভু জীবকে "তারক" এই অক্ষর রত্ন প্রদান করেন, স্মররিপু মহাদেবের সেই নির্ব্বাণস্বরূপ অদ্ভুত ধাম থাকিতে মূঢ়গণ প্রত্যাশাবশে মরীচিকায় পশুর ন্যায় অন্যত্র ধাবিত হয়।

শ্লোক পড়িয়া প্রভু মুচকি হাসিলা।
তাহার উত্তর শ্লোক লিখি পাঠাইলা॥

শ্লোকঃ—

ঘর্ম্মাম্ভো মণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদাম্বু ভাগীরথী,
কাশীনাং পতিরর্দ্ধমস্য ভজতে শ্রীবিশ্বনাথঃ স্বয়ম্।
এতস্যৈব হি নাম শম্ভুনগরে নিস্তারকং তারকং,
তস্মাৎ কৃষ্ণপদাম্বুজং ভজ সখে শ্রীপাদ নির্ব্বাণদম্॥

পাঠান্তর—(ক) তাহে—কহে।

অনুবাদ।—যে ভগবানের ঘর্ম্মজলে মণিকর্ণিকা ও চরণজলে ভাগীরথীর উদ্ভব, স্বয়ং কাশীপতি শ্রীবিশ্বনাথ যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ ভজনা করিতেছেন, শিবের নগরে (কাশীতে) যে ভগবানের নিস্তারকারী তারক নাম বিরাজমান, হে সখে শ্রীপাদ, তুমি সেই নির্ব্বাণপ্রদায়ক শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল ভজনা কর।

পুন এক শ্লোক তেঁহো লিখি পাঠাইলা।
প্রভু দেখি ফল্গু বলি আদর না কৈলা॥

শ্লোকঃ—

বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশনা-
স্তেঽপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা-
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেৎ পঙ্গুস্তরেৎ সাগরম্॥

অনুবাদ।—বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি শুধু বায়ু, জল এবং বৃক্ষপত্র আহার করিতেন, তাঁহারাও নারীর সুললিত মুখকমল দেখিয়াই মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (সুতরাং) যে সকল লোক দধি-দুগ্ধ-ঘৃত যুক্ত শ্যাল্যন্ন ভোজন করে তাহাদের ইন্দ্রিয়-দমন সম্ভবপর হইলে, পঙ্গুও সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারিবে।

ভক্তবৃন্দ দেখি তার উত্তর লিখিলা।
শ্লোক লিখি পাঠাইলা প্রভু না জানিলা॥

শ্লোকঃ—

সিংহো বলী দ্বিরদশূকরমাংসভোগী,
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারম্।
পারাবতঃ খলু শিলাকণমাত্রভোগী,
কামী ভবেদনুদিনং বদ কোঽত্র হেতুঃ॥

অনুবাদ।—বলবান্ সিংহ হস্তী ও শূকরের মাংস ভক্ষণ করে, অথচ বৎসরে একবার মাত্র রতিক্রিয়া করে; আর পায়রা শিলাকণা মাত্র ভক্ষণ করিলেও সর্ব্বদা (অনুদিন) কামভোগপরায়ণ হয়—ইহার কারণ কি বল।

তবে মহাপ্রভু যবে বৃন্দাবনে গেলা।
প্রকাশানন্দের তবে মতি ফিরাইলা॥
কাশীপুরে প্রভু তবে থাকি দুইমাস।
যত বহির্ম্মুখ ছিল কৈলা নিজ দাস॥

প্রকাশানন্দের সহ বিচার করিয়া।
মায়াবাদ-পাণ্ডিত্য দিলেন ঘুচাইয়া॥
কল্পিত বেদান্ত-অর্থ তখন বুঝিলা।
প্রভুর আশ্চর্য্য (ক) তেজ দেখিতে পাইলা॥
শিষ্য সমিভ্যারে সব বৈষ্ণব হইল।
প্রভুর চরণতলে (খ) শরণ লইল॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিনু যেন শকতি আমার॥
কৃষ্ণসেবানন্দ ভক্তি প্রধান মানিল।
আর যে যতেক মত হেয়বুদ্ধি হৈল॥
সেই মুখে পূর্ণব্রহ্মসনাতন করি।
স্তুতি কৈল প্রভুর অভয়পদ ধরি॥
মূর্খ মুঞি সে বিচার স্তুতি যে করিল।
বুঝিতে না পারি তাহা বর্ণিতে নারিল॥
প্রকাশানন্দ সরস্বতী নাম তাঁর ছিল।
প্রভুহ প্রবোধানন্দ বলিয়া রাখিল॥
অতঃপর তাঁহার মহিমা কি পর্য্যন্ত।
মহাভাগবত হৈলা পরম-সুশান্ত॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য বিনে নাহি জানে আন।
চৈতন্য পরম ধর্ম্ম চৈতন্য গেয়ান॥
চৈতন্য ভজন সদা চৈতন্য ধেয়ান।
চৈতন্য পরমতত্ত্ব করয়ে বাখান॥
চৈতন্য শয়নে দেখে চৈতন্য স্বপনে।
যে দিগে ফিরায় আঁখি শ্রীচৈতন্য মানে॥

ক্ষণে ক্ষণে কহে প্রভু বড় দয়াময়।
কুতার্কিক মুঞি মোর ঘুচালে সংশয়॥
বড় দয়াময় প্রভু বড় দয়াময়।
শুষ্ক তার্কিকে দিলে ভক্তির আশ্রয়॥
তবে অনুরাগে লীলা গুণ যে প্রভুর।
বর্ণন করিলা এক গ্রন্থ মহাশূর॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত নাম সুমধুর।
মধুর বর্ণন চমৎকার রসপুর॥
আস্বাদে অমৃত আর শ্রবণে মঙ্গল।
শুনিয়াছে যেই সেই জানে তার বল (ক)॥
শুনিতে শুনিতে আরো বাড়ায়ে পিয়াস (খ)
প্রেমদান করিয়া হৃদয়ে করে বাস॥
শ্রীমান্ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর গুণ।
সংক্ষেপে কহিনু কিছু শোধিতে আপন॥
মূর্খ মুঞি বিস্তার করিতে নাহি জানি।
সাধ করে মনে বলি করি টানাটানি॥
শ্রীমান্ প্রকাশানন্দ (গ) নিত্য সিদ্ধ হ'ন।
লীলা লাগি এই এক প্রভুর গঠন॥
যতেক শ্রীআচার্য্য প্রভুর পরিবার।
শ্রীমান্ প্রবোধানন্দ আরাধ্য সভার॥
তাঁহার চরণে মুঞি শরণ লইনু।
বৈষ্ণবের স্থানে এই উপদেশ পাইনু॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণের কৃপা-আশ।
করিয়া আছয়ে দীনহীন লালদাস॥

পাঠান্তর—(ক) আশ্চর্য্য—ঐশ্বর্য্য।
(খ) চরণতলে—চরণে তবে।

পাঠান্তর—(ক) বল—ফল।
(খ) পিয়াস—প্রয়াস।
(গ) প্রকাশানন্দ- প্রবোধানন্দ

ইতি শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থে নরসীভক্ত-আদিভক্তগণ-গুণবর্ণনং নাম দ্বাবিংশ-মালা ॥ ২২

ত্রয়োবিংশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

চরিত্র নিবাই গ্রামের
কোন সাধু

নিবাই নামেতে গ্রামে একজন চোর।
আজন্ম করয়ে চুরি পাপাচারে (ক) ভোর॥
হাজার টাকার এক থলি চুরি করি।
আনিল কাহার (খ) তাথে তুল (গ) হৈল ভারি॥
প্রসিদ্ধ যে চোর যত ধরি নিঞা যায়।
হাকিম তা সভাকারে পরীক্ষা করায়॥
তাহা জানি সেই চোর চিন্তিত হইল।
কি করি উপায় বলি ভাবিতে লাগিল॥
আমারে ধরিয়া নিঞা পরীক্ষা করাবে।
ঠেকিলে গর্দ্দান লবে কিংবা শালে দিবে॥
সেই গ্রামে কোথাও হয় পুরাণের কথা।
দৈবাত্ত শুনিতে সেই চোর গেল তথা॥
যাইয়া শুনয়ে কৃষ্ণমন্ত্রের গ্রহণ।
হইতেছে সেই ক্ষণে মহিমাকথন॥
কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ মাত্রেতে পুনর্জ্জন্ম।
হয়ে ক্ষয় পায় যত প্রারব্ধাদি কর্ম্ম॥
দ্বিজ শব্দ হয় তার দুর্জ্জাতিত্ব যায়।
গায়ত্রীদীক্ষাতে যথা বিপ্র দ্বিজ হয়॥

তথাচ—

পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা স্বামিগোত্রেণ গোত্রিকা।
তথা দীক্ষাপ্রভাবেণ দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

বসিয়া শুনিল চোর এ সব কথন।
ঘরে গিয়া হর্ষ হৈয়া ভাবে মনে মন॥
টাকা চুরি করিয়াছি আমি তো নিশ্চয়।
পরীক্ষা করাবে কালি ধরিয়া আমায়॥ †
পুরাণে কহিল কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষামাত্র।
সে জনম যায় হয় দ্বিজ মহাপাত্র॥
অতএব শীঘ্র আমি কৃষ্ণমন্ত্র লই।
পরীক্ষাতে উত্তরিব (ক) জন্মান্তর হই॥
এতো ভাবি এক যে বৈষ্ণব স্থানে গেলা।
কৃষ্ণমন্ত্র দেহ বলি বিনতি করিলা (খ)॥
বৈষ্ণব কহেন আজি নহে কালি দিব।
তেঁহো কহে নহি নহি (গ) এখনি লইব॥
একান্ত আগ্রহ দেখি সাধু দীক্ষা দিলা।
দীক্ষা করি মনে মনে আনন্দিত হৈলা (ঘ)॥
পরদিনে হাকিমের পদাতি আসিয়া।
ধরিয়া লইয়া গেল তস্কর বলিয়া॥
গোইন্দা কহয়ে এই চোর চুরি কৈল।
রাজা তাহা শুনি তম্বি করিতে লাগিল॥
তেঁহো (ঙ) বলে মহারাজ চোর কভু নহি।
এ জন্মেতে আমি চুরি কভু করি নাহি॥
বরঞ্চ আমারে কোন পরীক্ষা করাও।
ঠেকি যদি তবে মোর ধন প্রাণ লও॥
তবে তাহে কহে রাজা পরীক্ষা করাতে।
তপত (চ) সাবল কহে হস্তেতে লইতে॥

পাঠান্তর—(ক) পাপাচারে—পাপ কর্ম্মে।
(খ) কাহার—কাহারো।
(গ) তুল—ভুল।

পাঠান্তর—(ক) উত্তরিব—উতরিব।
(খ) বিনতি করিলা—বিনয়ে কহিলা।
(গ) নহি নহি—কালি নহে।
(ঘ) আনন্দিত হৈলা—আনন্দ জন্মিলা।
(ঙ) তেঁহো—চোর। (চ) তপত—উত্তপ্ত।

† ইহার পর বটতলা সংস্করণে অতিরিক্ত দুই পঙ্ক্তি আছে। যথা—
চোর ধরা নিশ্চয় পড়িব পরীক্ষায়।
অতএব যে শুনিলাম পরম উপায়॥

সুদৃঢ় বিশ্বাস তার অন্তরে আছয়ে।
কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা কৈলে পুনর্জ্জন্ম হয়ে॥
অতএব কহে মুঞি এ জন্মে কখনো।
চুরি করে থাকি কিংবা পাপাদিক (ক) কোনো॥
তবে এই হস্ত মোর সাবলে জ্বলিবে (খ)।
নতুবা আমার হিংসা কিছু না হইবে॥
এতেক কহিয়া হস্তে সাবল লইল।
অগ্নিবত লৌহ হস্তে শীতল ঠেকিল॥
শুদ্ধ জানিঞা তারে রাজা প্রীত কৈল (গ)।
গোইন্দার গর্দ্দন মারিতে আজ্ঞা দিল॥
তবে সাধু গোইন্দার প্রাণ যায় জানি।
দয়ার্দ্র হইয়া কহে যুড়ি দুই পাণি॥
মহারাজ উঁহার অপরাধ কিছু নাঞি।
মিথ্যা না কহিল সত্য চুরি কৈনু মুঞি॥
এ জন্মে না কৈনু পূর্ব্ব জন্মেতে করিনু।
যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণমন্ত্র আশ্রয় না কৈনু (ঘ)॥
এতো কহি আদ্যোপান্ত সকলি কহিল।
শুনিঞা সকল লোক চমৎকার হৈল॥
তবে রাজা তারে বহু সম্মান করিল।
গোয়েন্দার প্রাণদান করি ছাড়ি দিল (ঙ)॥
অতএব কৃষ্ণমন্ত্র-মহিমা এমতি।
অপরাধী জনে কভু না হয়ে প্রতীতি (চ)॥
গুরু-কৃপামন্ত্র বলে সেই যে তস্কর।
ভাগবতোত্তম হৈল কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
মূল সহ পাপে মতি তৎক্ষণে ছুটিল।
অনন্যভাবেতে কৃষ্ণশরণ লইল॥
ভুবনপালন তাঁর চরণের রজ।
আমা সভা পাতকীর যাহা নিঞা কায॥
সেই শ্রীচরণরজ বাঞ্ছে লালদাস।
জনমে জনমে করে দাস হৈতে আশ॥

পাঠান্তর—(ক) পাপাদিক—পাপ অন্য।
(খ) জ্বলিবে—দাহিবে।
(গ) শুদ্ধসত্ত্ব জানি রাজা তারে প্রীত কৈল।
(ঘ) যদবধি কৃষ্ণমন্ত্র-আশ্রয় না হৈনু।
(ঙ) গোইন্দার গর্দ্দান রাখিতে আজ্ঞা দিল।
(চ) না হয়ে প্রতীতি—নাহি হয় প্রীতি।

চরিত্র শ্রীঅন্য সুরদাস

পরগণে সাঁড়িলা নাম তাহাতে বৈসয়।
বিষয় করেন কিন্তু কৃষ্ণের আশ্রয়॥
পাৎসার চাকর তেরো লক্ষের তসিল (ক)।
করেন, কিন্তু যে মন শ্রীকৃষ্ণের শীল॥
সুরদাস নাম কিন্তু কমললোচন।
রূপে গুণে শীলে সর্ব্বলোকের রঞ্জন॥
মহাজন-লোক গুড়-বেপারের তরে।
শত মোন গাড়ী ভরি আনিল বাজারে॥
অতি চমৎকার গুড় মিছরির প্রায়।
নজরে দেখিয়া সুরদাস মহাশয়॥
মনেতে বাসনা হৈল উৎসাহ সহিত।
হেন বস্তু শ্রীমদনমোহন-উচিত॥
এতো ভাবি সব (খ) গুড় আটক করিয়া।
যতন করিয়া নিল দুনা দাম দিয়া॥
সেইক্ষণে গাড়ী-সহ শ্রীবৃন্দাবন (গ)।
চালান করিলা যথা মদনমোহন॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিকালে আসি গাড়ী।
পহুঁছিল বৃন্দাবনে শ্রীজীয়ের বাড়ী॥
দুয়ারে কপাট দিয়া শুইয়াছে সভে।
গাড়োয়ান ফুকারয় করি উচ্চরবে॥
সাঁড়িলা হইতে গুড় আইল শত মোন।
ভাণ্ডারে উঠাও আসি দেহ লোকজন॥
ভিতর হইতে কেহ ডাকি কহিলেক।
আজি রহ প্রাতঃকালে (ঘ) উঠান যাবেক॥
দ্বার না খুলিল হোথা মদনমোহন।
তখনি যে পুজারিরে কহেন স্বপন॥
সুরদাস গুড় পাঠাইলা মোর তরে।
সন্ধ্যায় যে খাইনু তাহে পেট নাহি ভরে॥
অতএব গুড় যে ভাণ্ডারে উঠাইয়া।
মালপুয়া কর কিছু আমার লাগিয়া॥

পাঠান্তর—(ক) তসিল—তহশীল।
(খ) সব—সেই।
(গ) শ্রীবৃন্দাবন—শ্রীধাম বৃন্দাবন।
(ঘ) প্রাতঃকালে—কালি প্রাতে।

এখনি করহ যাহে না হয় গউন।
ক্ষুধা মোর হইয়াছে অতি অসহন॥
স্বপন দেখিয়া শীঘ্র উঠিয়া পূজারি।
দ্বার খুলি বাহিরে আইলা ত্বরা করি॥
তটস্থ হইয়া গুড় ভাণ্ডারে উঠায়।
স্থান চৌকা করি তবে কড়াই চড়ায়॥
অতি শীঘ্র মালপুয়া প্রচুর করিল।
মদন মোহন আগে ভোগ লাগাইল॥
আস্বাদন করিয়া শ্রীমদনমোহন (ক)।
প্রসাদ রাখিলা ভক্তগণের কারণ॥
যথা সুরদাস তাঁর স্থানে সেই রাত্রে।
মালপুয়া প্রসাদ পঁহুছিল এক পাত্রে॥
স্বপন দেখিয়া সুরদাস চমকিয়া।
উঠিয়া প্রসাদ পাইল আনন্দিত হিয়া॥
গদগদ প্রেমভাবে প্রসাদ পাইল।
নিজ জন্ম তনু ধন্য করিয়া মানিল॥
সেই সুরদাস সেই পূজারি ঠাকুর।
সেই গুড় মালপুয়া সুস্বাদু (খ) মধুর॥
তাঁহা সভা-স্থানে মোর একান্ত প্রার্থনা।
ভক্তি দিয়া নিস্তারুন করিয়া করুণা॥

চরিত্র শ্রীমুরারি দাস ভক্ত

শ্রীমুরারিদাস নামে পরম বৈষ্ণব।
লোকাপেক্ষা চামারের কুলেতে উদ্ভব॥
অতি শান্ত শিষ্ট মৃদু প্রিয়ংবদ ধীর।
গ্রাম্যবার্ত্তাহীন বুদ্ধিমান মতি (গ) স্থির॥
আপনাতে নীচ-দৈন্য-বুদ্ধি দম্ভহীন।
জিতেন্দ্রিয় সদাচার ভক্তিতে প্রবীণ॥
রসিক-মুরারি-জীউ মহান্ত প্রধান।
তাঁরে দেখি হৈল কিছু চমৎকার জ্ঞান॥
প্রসন্ন হইয়া সাধু চিত্ত পুলকিত।
হঠাত তাঁহার ঘরে গিয়া উপস্থিত (ঘ)॥

পাঠান্তর—(ক) শ্রীমদনমোহন—যে মদনমোহন।
(খ) সুস্বাদু—স্বাদ যে, অথবা আস্বাদ।
(গ) মতি—অতি।
(ঘ) উপস্থিত—উপনীত।

মুরারি তাঁহারে দেখি কুণ্ঠিত হইয়া।
মুখে না আইসে বাণী ভয়ে ভীত হিয়া॥
হাথ কচালিয়া পাছু পাছু হাঁটি (ক) যায়।
করিবে কি হইবে কি কিছু না জুয়ায়॥
আসন দিবার উপযুক্ত নাহি ঘরে।
বসিতেও (খ) কহিতে নাহিক পারে ডরে॥
অষ্টাঙ্গ হইয়া পড়ে দূরেতে থাকিয়া।
রসিক-মুরারি কোলে করিলা (গ) ধাইয়া॥
তেঁহো কহে মোরে স্পর্শ না কর ঠাকুর।
হীনজাতি মুঞি সম না হও কুকুর॥
রসিক-মুরারি কহে তুমি সাধুত্তম।
তোমারে স্পর্শিয়া (ঘ) মুঞি হইব উত্তম।
এতো কহি বসি তাঁহা করি কোন ছল।
পান কৈলা মুরারিদাসের পাদজল॥
স্তুতি নতি করি বহু উঠিয়া আইলা।
পাদোদক পান করি কৃতার্থ মানিলা॥
তাঁর শিষ্য রাজা সব বৃত্তান্ত শুনিল।
মুরারিদাসের পাদোদক গুরু খাইল॥
শুনিঞা রাজার কিছু অবজ্ঞা জন্মিল।
মুচির চরণোদক (ঙ) কেমতে খাইল॥
রসিক মুরারিজীউ জানিঞা অন্তরে।
রাজার অজ্ঞতা (চ) নাশ করিবার তরে॥
রাজার নিকটে তবে আপনি চলিলা।
দেখিয়াও রাজা সমাদর নাহি কৈলা॥
মুচকি হাসিয়া সাধু নিকটে বসিয়া।
কহিতে লাগিলা নৃপে অজ্ঞতা (ছ) বুঝিয়া॥
আমি গুরু আইনু যে (জ) নিকটে তোমার।
প্রসন্ন না হৈলে কহ কি হেতু ইহার॥

পাঠান্তর—(ক) হাঁটি—হাঁটি।
(খ) বসিতেও—বসিবারে।
(গ) করিলা—লইল।
(ঘ) তোমারে স্পর্শিয়া—তোমার পরশে।
(ঙ) চরণোদক—চরণজল।
(চ) অজ্ঞতা—অবজ্ঞা।
(ছ) অজ্ঞতা—অজ্ঞান।
(জ) আমি গুরু আইনু যে—মুঞি গুরু আইলাম।

রাজা ক্রোধে কহে কি কায আছয়।
মুরারি মুচির বাটী যাহ মহাশয়॥
শুনিলাম তার পাদোদক পান কৈলে।
লোকে লজ্জা দিতে কেনে এখানে আইলে॥
এত শুনি সাধু মনে বিচার করিল (ক)।
ইহার কুমতি শাস্তি করিতে হইল॥
রসিক-মুরারি তবে কহেন রাজারে।
আরে মূর্খ শোন্ কিছু হিত কহি তোরে॥
বুঝিলাম পাদোদক মুরারি দাসের।
পান কৈনু জানি তব উদয় তমের॥
বড় মূর্খ তুমি, তব নাহি কিছু জ্ঞান।
কেবল করহ মাত্র বিষয়ের ধ্যান॥
বৈষ্ণব যে কি পদার্থ তাহা নাহি জান (খ)।
হরিভক্ত বলি তুমি আপনারে মান॥
বৈষ্ণবেতে রতি বিনে ভক্ত নাহি হয়।
কৃষ্ণ-কৃপা নাহি হয়, ভক্তি না জন্ময়॥
বৈষ্ণবেতে নীচবুদ্ধি বড় অপরাধ।
সর্ব্বনাশ হয়, সর্ব্ব ধর্ম্ম যায় বাদ॥
চণ্ডালের বংশে জন্মি হরিভক্ত হয়।
পরম পাবন সেই বেদে দৃঢ় কয়॥
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র যবন বা হয়।
সেব্যতম হয় সেই অবশ্য (গ) নিশ্চয়॥
উত্তম ভর্ৎসিত এই শাস্ত্রের প্রমাণ।
লোকশাস্ত্র ধর্ম্মমার্গে (ক) করয়ে বাখান॥
এতো কহি শাস্ত্রের প্রমাণ বহু দিলা।
তোর মুখ না দেখিব রাজারে কহিলা॥
এতেক শুনিঞা রাজা চমকিত হৈলা।
গুরুর উপেক্ষা শুনি (ঙ) ভয়েতে কাঁপিলা॥
তখন গুরুর পদে পড়িয়া কান্দয়।
শরণ লইনু প্রভু না তেজ আমায়॥

আমি মূর্খ নাহি জানি এবে বুঝিলাম।
নীচ যে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ দৃঢ় জানিলাম॥
বৈষ্ণবের সেবা মুঞি একান্ত করিব।
পাদোদক অধর-অমৃত যে খাইব॥
তোমার চরণে যেই অপরাধ কৈনু (ক)।
সে সকল ক্ষেম মোর শরণ লইনু॥
তখন প্রসন্ন হৈলা রসিক-মুরারি।
রাজার মস্তকে শ্রীচরণ দিলা ধরি॥
রাজা সেই হৈতে করে বৈষ্ণবসেবন।
বৈষ্ণবে অনন্যরতি একান্ত শরণ (খ)॥
কৃষ্ণের করুণা তবে হঠাত হইল।
রাজ্যত্যাগ করি বনে গমন করিল॥
রসিক-মুরারি আর শ্রীমুরারিদাস।
আর মহারাজ মোরে করহ আশ্বাস॥
শ্রীচরণ ধর মোর মস্তক-উপরে।
তবে সে নিস্তার পাই এ দুঃখ-সাগরে॥

চরিত্র শ্রীতুলসীদাসজীর

শ্রীমান্ তুলসীদাস জগতে বিখ্যাত।
অলৌকিক অদ্ভুত যাহার চরিত॥
পূর্ব্বে তেঁহো আছিলা (গ) বাল্মীকি মুনিবর।
লোকের নিস্তার হেতু কৈলা অবতার॥
লৌকিক লীলাতে এক ব্রাহ্মণের ঘরে।
জন্মিলেন মহাশয় লোক-ব্যবহারে॥
কালেতে বিবাহ করি গৃহস্থালি কৈল।
স্ত্রীর বশীভূত বিপ্র একান্ত হইল॥
একক্ষণ স্ত্রীর সঙ্গ বিনে নাহি রহে।
যথা তথা স্ত্রীর প্রশংসাই গিয়া কহে॥
বসিতে কহিলে বৈসে, উঠিতে উঠয়।
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়॥
স্ত্রীর বাপের বাটী হইতে লইতে (ঘ)।
পুনঃপুন আইসে লোক না দেয় যাইতে॥

পাঠান্তর—(ক) এতেক শুনিয়া সাধু মনে বিচারিল।
(খ) বৈষ্ণবেতে রতি বিনে ভক্ত নাহি জান।
(গ) অবশ্য—জানিহ।
(ঘ) ধর্ম্মমার্গে—সাধুমার্গে।
(ঙ) গুরুর উপেক্ষা শুনি—গুরু উপেক্ষিল বলি।

পাঠান্তর—(ক) যেই অপরাধ তব চরণে করিনু।
(খ) বৈষ্ণবে একান্ত মতি অনন্য শরণ।
(গ) আছিলা—ছিলেন।
(ঘ) স্ত্রীর বাপের বাটী লোক আইসে লৈতে।

অনেক কষ্টেতে যদি পাঠাইয়া দিলা।
স্ত্রীর বিচ্ছেদে ঘরে রহিতে নারিলা॥
কান্দিয়া ডুলির পাছে পাছে চলি গেলা।
স্ত্রী তাহা দেখি অতি লজ্জিত হইলা॥
ভর্ৎসন করিলা বহু স্বামীর উপর।
হাঁরে মূঢ় হতভাগা নির্লজ্জ বর্ব্বর॥
স্ত্রীর আঁচল ধরি সদাই বেড়াও।
ছি ছি ধিক্ ধিক্ লজ্জা তুমি (ক) নাহি পাও॥
লোকে উপহাস করে ঘৃণা নাহি হয়।
গলায় রসুড়ি[১] দিয়া মরিতে জুয়ায়॥
এতো আর্ত্তি যদি তব ঈশ্বরে হইত।
না জানি ভাগ্যের ফল তবে কিনা হৈত (খ)॥
এতেক ভর্ৎসন যদ্যপি স্ত্রী করিল (গ)।
শুনিয়া বিপ্রের কিছু ধিৎকার (ঘ) জন্মিল॥
তৎক্ষণে হইল মনে বিবেক উদয়। (ঙ)
ঐমনি ফিরিয়া চলিল ঘরেও না যায়॥
সর্ব্বত্যাগ করি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ।
আশ্রয় করিয়া লৈল একান্ত শরণ॥
বিগ্রহ প্রকাশি কৈলা সেবা চমৎকার।
অদভুত হইল তবে প্রেমের বিকার॥
অল্পকালে রামচন্দ্রের অনুকম্পা হৈল।
অনেক সংসার সাধু পবিত্র করিল॥
শ্রীমন্ রঘুনাথ লীলা-চরিত্র বর্ণন।
ভাষাছন্দে করি কৈলা ভুবন পাবন॥
তাঁহার মহিমা কিছু কহি শুন আর।
যাঁর পদজলে ভূত পাইল নিস্তার॥
কাশীর অন্যত্র সাধু আর কোন স্থানে।
কোন প্রয়োজনে গেলা করিয়া ভ্রমণে॥
এক বৃক্ষতলে গিয়া বিশ্রাম করিলা।
পাক করি খাইবারে উদ্‌যোগ করিলা (চ)॥

পাঠান্তর—(ক) লজ্জা তুমি—ইথে লজ্জা।
(খ) কিনা হৈত—কি ফলিত।
(গ) এতেক ভর্ৎসনা যদি স্ত্রী তারে কৈল।
(ঘ) কিছু ধিৎকার—মনে বিবেক।
(ঙ) আপনার মনে মনে ধিৎকার করয়।
(চ) উদ্‌যোগ করিলা—উদ্‌যোগী হইলা।

১। রসুড়ি—দড়ি।

সেই বৃক্ষে এক ভূত বহুকাল রহে।
যাতনা-শরীর দিবানিশি দুঃখে দহে॥
সাধু সেই বৃক্ষতলে পাদ ধোত কৈল।
পাদধোত ছিটা গিয়া (ক) বৃক্ষেতে লাগিল॥
তৎক্ষণাত সেই ভূত নিস্তার হইলা।
দিব্য দেহ ধরিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে চলিলা॥
দেখিয়া তুলসীদাস কহেন তাহারে।
কে তুমি স্বরূপে কহ কৃপা করি মোরে॥
তেঁহো কহে ভূতযোনি আছিলাম আমি (খ)।
চরণ অমৃত দিয়া তরাইলে তুমি (গ)॥
স্তুতি নতি করি নিজ বৃত্তান্ত কহিলা।
বুঝিয়া তুলসীদাস কহিতে লাগিলা॥
বৈকুণ্ঠের পারিষদ এবে হৈলে তুমি।
এক যে প্রার্থনা তব ঠাঞি করি আমি॥
শ্রীরাম দর্শন আমি কি উপায়ে (ঘ) পাই।
কৃপা করি কর মোর নিবেদন এই॥
তেঁহো কহে তুমি সাধু যোগ্যপাত্র হও।
তথাপিহ এক যুক্তি কহি তাহা লও॥
শ্রীল হনুমান রামচন্দ্র-প্রিয়তম।
তাঁহার কৃপাতে অতি পাইতে সুগম॥
তুলসী কহেন তাঁর লাগ পাব কোথা।
তেঁহো কহে কহি শুন লাগ পাবে যথা॥
এই গ্রামে অমুক যে ব্রাহ্মণ-গৃহেতে (ঙ)।
নিতি আইসেন রামায়ণ শ্রবণেতে॥ (চ)
মনুষ্যবেশেতে অবধূত-বেশধারী।
অমুক দিগেতে বৈসেন ছন্নরূপ করি॥
পাঠ অন্তে তাঁহার চরণ দৃঢ় করি।
ধরিয়া কহিবে মোরে দেখাও শ্রীহরি॥
তুমি যোগ্যপাত্র শ্রীমান্ হনুমান জানি।
দেখাইবে অবশ্য তোমারে রঘুমণি॥

পাঠান্তর—(ক) পাদধোত ছিটা গিয়া—পাদোদক ছিটা সেই।
(খ) আছিলাম আমি—আছিল আমার।
(গ) চরণামৃত ছিটা দিয়া করিলা উদ্ধার॥
(ঘ) উপায়ে—রূপেতে।
(ঙ) ব্রাহ্মণ-গৃহেতে—ব্রাহ্মণের ঘরে।
(চ) নিতি আসি রামায়ণ শ্রবণ যে করে॥

এতো কহি তেঁহো পরব্যোম চলি গেলা।
রামায়ণ যথা ইঁহো তথাই চলিলা॥ (ক)
দেখেন সহস্র লোক চারিভিতে হয়।
অবধৌত-বেশ কোন্ জন নিরখয়॥
সেইরূপ এক ব্যক্তি দেখেন বসিয়া।
শ্রীরাম-চরিত্র শুনি পুলকিত হিয়া॥
তথায় বসিয়া সাধু শ্রবণ করয়।
মধ্যে মধ্যে দোঁহে দোঁহা পানে নিরখয়॥ (খ)
দোঁহার অন্তর-কথা দোঁহাতো বুঝিয়া। (গ)
ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে হাসয়ে মুচকিয়া॥
পাঠ-অন্তে লোক সব উঠিয়া চলিলা।
ঐমনি যে হনুমান গমন করিলা॥
তুলসী সম্মুখে গিয়া অষ্টাঙ্গ হইয়া।
পড়িলা প্রণাম করি চরণে ধরিয়া॥
মৃদু হাসি হনুমান আলিঙ্গন কৈল।
তুলসী অভীষ্ট আপনার যে কহিল॥
তব প্রিয় রামচন্দ্র আমারে দেখাও।
অকপটে তোমার স্বরূপ দরশাও॥
প্রসন্ন হইয়া তবে নিজরূপ ধরি।
বর দিলা অচিরাতে দেখা দিবে হরি॥
হনুমানে বহু তবে স্তুতি নতি কৈলা।
তেঁহো চলি গেলা ইঁহো নিজ স্থানে আইলা॥
সহজেই রামচন্দ্র তাহে কৃপাবান্।
তবে যে এতেক চেষ্টা উৎকণ্ঠা-কারণ॥
তুলসীদাসের প্রভু শ্রীরঘুনন্দন।
প্রসিদ্ধ জগতে ইহা জানে সর্ব্বজন॥
এক যে ব্রাহ্মণ সেই গোহত্যা করিয়া।
তীর্থ-ভ্রমণ করি বেড়ায় ফিরিয়া॥
কাশীতে গেলেন বিপ্র তীর্থের রটনে।
রামনাম মহামন্ত্র জপয়ে বদনে॥
তুলসীদাসের স্থানে গিয়া প্রণমিয়া।
পূর্ব্বাপর কহে নিজ কর্ম্ম বিবরিয়া॥

পাঠান্তর—(ক) যথা রামায়ণ তথা তুলসী চলিলা।
(খ) মধ্যে মধ্যে সর্ব্বদিক সদা নিরখয়।
(গ) অন্তর-কথা উভয়ে বুঝিয়া।

মুঞি দুষ্ট অধম যে গোহত্যা করিনু।
সো হেতুক তীর্থ-ভ্রমণেত নিকশিনু॥
শ্রীমান্ তুলসীদাস আশ্চর্য্য মানিয়া।
তার মুখপানে চাহে চকিত (ক) হইয়া॥
রামনাম জপে আর ক্ষুদ্র (খ) পাপ জন্য।
তীর্থ-ভ্রমণ করে আর কহে অন্য॥
তবে সাধু ক্রোধাবেশে কহে ব্রাহ্মণেরে।
হাঁরে (গ) দুষ্ট কুমতি দেখিতে নারি তোরে॥
রামনাম জপিতেছ আর প্রায়শ্চিত্ত।
কারণ ভাবিছ আর ভ্রমিতেছ তীর্থ॥
আনুষঙ্গে এক নামে যত পাপ হরয়।
কোটি কল্পে পাপী তাহা করিতে নারয়॥
শ্রীমন্নাম-উচ্চারণ-উপক্রম হৈতে।
পাপ যায় শুভ হয় সর্ব্ব তৎক্ষণাতে॥

প্রমাণ—

অংহঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং
জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

অনুবাদ। সূর্য্য যেমন উদিত হইয়াই অন্ধকার সমুদ্রের সংহার করে, সেইরূপ জগন্মঙ্গল হরিনাম একবার উচ্চারিত হইয়াই সকল পাপ নাশ করেন। সেই নাম সর্ব্বদা জয়লাভ করিতেছেন।

হেন পরাৎপর যে তারকব্রহ্ম নাম।
তাহে অল্প বুদ্ধি করি করে অন্য কাম॥
অন্য ধর্ম্ম বড় বড় যজ্ঞ দান করে।
নাম অঙ্গ যজ্ঞ অঙ্গী করিয়া আচরে (ঘ)॥
সেই অপরাধে (ঙ) তার নিস্তার না হয়।
নানা যোনি নরকাদি ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্তি-অধিকারী নহে।
তমময় হয় দম্ভ-অহঙ্কার সহে॥

পাঠান্তর—(ক) চকিত—আশ্চর্য্য।
(খ) আর ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্র এই।
(গ) হাঁরে—যারে।
(ঘ) আচরে—বিচারে।
(ঙ) অপরাধে—অপরাধী।

অতএব যদি মোর বাক্য এবে ধর।
যদি আত্যন্তিক নিজ হিত চেষ্টা (ক) কর॥
সর্ব্ব-ধর্ম্ম ত্যেজি তবে রামচন্দ্র ভজ।
অন্য অভিলাষ খুটিনাটি সব তেজ॥
প্রায়শ্চিত্ত করিতেও না হইবে আর।
আনুষঙ্গ্য পাপ আর যাইবে সংসার॥
প্রেমানন্দ মহোৎসব অনাসে পাইবে।
ইহার অধিক লাভ আর কোথা পাবে (খ)॥
এতেক শুনিঞা বিপ্র চমকিত হৈলা।
সাধুর চরণে তবে শরণ লইলা॥
তবে (গ) কৃপা করিলেন প্রসন্ন হইয়া।
বিপ্র ভাগবত হৈল সকল ছাড়িয়া॥
বিপ্র কহে মহাশয় কৃপা করি মোরে।
নামের মহিমা যদি কিঞ্চিত আমারে॥
শুনাও জনম মোর হউক সফল। (ঘ)
তোমার প্রসাদে পাইনু ভক্তি জ্ঞান বল॥
তবে সাধু প্রেমাবেশে প্রশংসা করিয়া।
নামের মহিমা কিছু কহে হৃষ্ট হৈয়া॥

নামের মহিমা কথন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রস-বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্নাম (ঙ) চিন্তামণি সর্ব্বফল-দাতা।
পূর্ণ চৈতন্যরস কৃষ্ণে অভিন্নাত্মা॥
নিত্যমুক্ত নির্গুণ পরাৎপর বিভু।
নাম নামী (চ) অভেদ ত্রিজগতের প্রভু॥

তথাচ—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং,
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা,
ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

পাঠান্তর—(ক) হিত চেষ্টা—শ্রেয়ঃ চিন্তা।
(খ) কোথা পাবে—কিসে হবে।
(গ) তবে—তারে।
(ঘ) শুনারে জনম মোর করহ সফল।
(ঙ) শ্রীমন্নাম—কৃষ্ণনাম।
(চ) নাম নামী—নাম নাম্নি।

অনুবাদ।—হে ভৃগুবর শৌনক, মধুর হইতেও মধুর, মঙ্গলসমূহেরও মঙ্গল, সকল নিগমরূপ লতার উপাদেয় ফল এই চিৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রদ্ধায় বা হেলায় একবার মাত্র উচ্চারণেই যে-কোন লোককে পরিত্রাণ করেন।

মধুর মধুর মঙ্গলের যে মঙ্গল।
সহস্রবল্লী যে বেদ তাহার সৎফল॥
চিৎস্বরূপ সেই কৃষ্ণনাম একবার।
হেলা কিংবা শ্রদ্ধাক্রমে করয়ে উচ্চার॥
নর মাত্র কেহ হয় তারয়ে (ক) সংসার।
নাহিক করয়ে পাত্রাপাত্রের বিচার॥
নর মাত্র (খ) কহেন যে তার বিবরণ।
শুনহ বিস্তার তার অপূর্ব্ব কথন॥
যবন চণ্ডাল আদি যত নীচগণে।
অধিকারী নহে কোন কর্ম্ম যজ্ঞ দানে॥
এবং মহাপাতকাদিকৃত যেই নর।
তাহার নাহিক কোন কর্ম্মে অধিকার॥
এ সব অনধিকারী যজ্ঞাদি করিলে।
ব্যর্থ হয়, তার কিছু ফল নাহি মিলে॥
কৃষ্ণনাম তেমন দুর্ব্বল নাহি হ'ন।
সকল ধর্ম্মের প্রভু মহাবলবান্॥
সকল ধর্ম্মের ফলদাতা মহাবিভু।
কেহো ফল দিতে নারে নাম বিনে কভু॥
চণ্ডাল যবন খস ম্লেচ্ছ-আদিগণ।
একবার হেলায় যদ্যপি করে গান॥
নিশ্চয় সে হয় ত্রাণ, নাহিক সন্দেহ।
জীবন মুকতি হয় আত্ম কুল সহ॥
অতএব কৃষ্ণনাম জগতের সার।
সকলের ত্রাতা সেই সভার অধিকার॥
এমন মহিমা কার আছয়ে ভুবনে।
হেলা করি একবার গায় যেই জনে॥
নীচ উচ্চ না বাছে পাতকী শ্রদ্ধাহীন। (গ)
পবিত্র করয়ে তারে কহয়ে প্রবীণ॥

পাঠান্তর—(ক) নর মাত্র কেহ হয় তারয়ে—স্মরণ মাত্র সেই নর তরয়ে।
(খ) নর মাত্র—নব মাত্র।
(গ) উচ্চ নীচ পাতক না বাছে শ্রদ্ধাহীন।

তথাহি—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্॥

অনুবাদ।—যাহা চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী (যাহাতে শ্রীভগবানের রূপ প্রতিফলিত হইতে পারে), যাহা ভব অর্থাৎ সংসাররূপ ভীষণ দাবানলের নির্ব্বাপণকারী, যাহা কল্যাণরূপ যে কুমুদ তাহার উপর চন্দ্রিকা অর্থাৎ চন্দ্রকিরণ বিতরণ করিয়া তাহার উল্লাস-বর্দ্ধনকারী, যাহা বেদবিদ্যারূপ বধূর জীবনস্বরূপ, যাহা আনন্দ-সমুদ্রের উচ্ছ্বাসজনক, যাহা প্রতি পদে অমৃতরসের আস্বাদজনক, যাহা সমস্ত আত্মাকে বা ইন্দ্রিয়সমূহকে রসে স্নান করাইয়া তাহার স্নিগ্ধতাসম্পাদক, সেই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন বিজয়ী হইতেছেন (অর্থাৎ সর্ব্বোপরি বিরাজ করিতেছেন)।

মার্জ্জন করেন চিত্তরূপ যে দর্পণ।
ভব-মহাদাবাগ্নি করেন নির্ব্বাপণ॥
শ্রেয়োরূপ কৈরব যে চন্দ্রিমা তাহার।
অমঙ্গল নাশি করে মঙ্গল বিস্তার॥
অবিদ্যা-নাশক বিদ্যাবধূর জীবন।
যাহা বিনে বিদ্যানাশ হয় অনুক্ষণ॥
প্রতিপদে আনন্দ-অম্বুধিকে বর্দ্ধন।
প্রেম-অমৃত-রস করান আস্বাদন॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় স্নিগ্ধ করি নির্বৃতি করায়।
অতএত কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে জয়॥

তথাহি পঞ্চমে—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ,
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে,
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

যে করে ভগবন্নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন।
ম্লেচ্ছ-আদি করি খস চণ্ডাল-যবন॥
তৎক্ষণাৎ নীচ সেই যজ্ঞ-অর্হ হয়।
দুর্জ্জাতিত্ব যায় বিপ্র হৈতে শ্রেষ্ঠ হয়॥

তথাহি—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ (ক) স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

অনুবাদ।—হে ভগবান, তোমার বহু নাম প্রচারিত হইয়াছে। সেই সকল নামের ভিতরে তুমি নিজের সর্ব্বশক্তি নিহিত করিয়া রাখিয়াছ, সেই সকল নাম স্মরণ করিবার কোন কালাকালের নিয়ম নাই—তোমার এমনই দয়া; অথচ আমার এমন দুর্ভাগ্য যে তাহাতে আমার অনুরাগ হইল না।

কৃষ্ণতুল্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণশক্তি যত।
অপ্রাকৃত সর্ব্বশক্তি নামেতে অর্পিত॥
তাহে কালাকাল নাহি কীর্ত্তনে বিচার।
এতো কৃপা ঈশ্বরের জীবের উপর॥
তথাপি দুর্দ্দৈব জীবের হেন যে পদার্থে।
অনুরাগ না জন্মিয়া মজয়ে অনর্থে॥
নাম সংকীর্ত্তনে দেখ (খ) কালাকাল নাস্তি।
সর্ব্বদা লইবে নাম দৃঢ় করি আস্তি॥

যথা—

ন দেশ-নিয়মস্তস্মিন্ন কাল-নিয়মস্তথা। (গ)
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥

অনুবাদ।—হে ব্যাধ, শ্রীহরির নামে দেশ কালের কোন নিয়ম বা উচ্ছিষ্টাদিরও কোন নিয়ম নাই।

নারদ গোস্বামী উপদেশ দিলা ব্যাধে।
নাম সংকীর্ত্তন শুচি অশৌচে না বাধে॥
স্থানের নিয়ম নাহি কালের নিয়ম।
উচ্ছিষ্ট মুখেতে জপ বেদের বচন॥
অতএব হরির নামেতে সদাচার।
জিহ্বায় ধারণ কর কাল না বিচার॥

পাঠান্তর—(ক) স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ—স্তত্রার্পিতাখিলগুরোঃ।
(খ) দেখ—কভু।
(গ) ন কালনিয়মঃ কশ্চিন্ন দেশ-নিয়মস্তথা।

যথা -

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং
শ্রোত্রমূলং গতং বা।
শুদ্ধং বা শুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং
তারয়ত্যেব সত্যম্॥

অনুবাদ। যাঁহার কোন একটি নাম বাক্যে উচ্চারিত, স্মরণপথে উদিত বা কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই, তাহার বানান শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হউক, মধ্যে অন্যবর্ণ দ্বারা ব্যবহিত হউক, কোন একটি বর্ণ তাহাতে না থাকুক, তাহা হইলেও অবশ্যই তাহা পরিত্রাণকারী হয়।

এক কৃষ্ণনাম যেই মুখে উচ্চারয়।
কিংবা যে সঙরণ করে, কর্ণে বা শুনয়॥
শুদ্ধাশুদ্ধ বর্ণের অপেক্ষা তাথে নাঞি।
আশ্চর্য্য মহিমা হেন ত্রিজগতে নাঞি (ক)॥
মধ্য অক্ষরে কিন্তু ব্যবধান বিনে।
ধ্রুব ত্রাণ করে দেখ সত্য করি ভণে॥
এব-কারে অন্য ব্যবচ্ছেদ করি কহে।
এতাদৃশ সত্য (খ) কোনো ধর্ম্ম হৈতে নহে॥

যথা—

অংহঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং
জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

এক নাম উচ্চারণ-উন্মুখ হইতে।
অখিল পাতক হরে, তরে ভব হৈতে॥
ঘোর-তিমির-ভব সংসারের তরি।
জয় জয় জগন্মঙ্গল নাম হরি॥
অতএব সর্ব্বধর্ম্ম তেজিয়া আমার।
হে জিহ্বা কেবল হরিনাম কর সার॥

তথাহি—

স্বর্গার্থীয়া ব্যবসিতিরসৌ দীনয়ত্যেব লোকান্,
মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং ক্লেশভাজম্।
যোগাভ্যাসঃ পরমবিরসস্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ,
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মম তু রসনা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি রৌতু॥

অনুবাদ।—স্বর্গলাভের সঙ্কল্প মানুষকে দীনহীন করে, মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে শুধুই ক্লেশভাগী করে, যোগাভ্যাস অত্যন্ত বিরস, সুতরাং সেইরূপ চেষ্টায় কি লাভ? আমার জিহ্বা সকল ছাড়িয়া শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলুক।

স্বর্গার্থী হইয়া নানা কর্ম্ম যেই করে।
দীন হীন সেই জন ভ্রময়ে সংসারে॥
মুমুক্ষু যে জ্ঞানযোগ করয়ে আস্থান।
ক্লেশমাত্র তার যে হারায় প্রেমধন॥
যোগীর যে যোগ সেহ পরম-বিরস।
অরে মন সব তেজি হও মোর বশ॥
কর্ম্মজ্ঞান যোগ তপ যতনে তেজহ।
অ মোর (ক) রসনা মাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ॥
এক স্ত্রী স্বামীর সহ সতী হৈতে যায়।
সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করয়॥
এই স্ত্রী এই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যে মানিঞা।
প্রাণান্তিক দেহে দণ্ড করে জানাইয়া॥
স্বর্গভোগ ফল অতি তুচ্ছ না বুঝিয়া।
পরম যে ধর্ম্ম করি (খ) অন্তরে জানিঞা॥
আত্যন্তিক ক্লেশ দেহ দগধ করিয়া।
ফল্গু[১] অর্থ পায় পরিণাম না বুঝিয়া॥
সম্মুখে দারুণ কাল সংসার-অনল।
ফল্গু সুখ-লোভে নাহি বুঝে তার বল॥
দয়াল-হৃদয় সাধু এতেক চিন্তিয়া।
স্ত্রীর নিকটে গেলা করুণা করিয়া॥
মহান্ত তুলসীদাস জানয়ে সে নারী।
প্রণাম করিলা অতি ভক্তিভাব করি॥
সেই যে সুকৃত তার সাক্ষাতে ফলিল।
শুনি তার কথা সাধু যে কৃপা করিল॥
আগে তো নারীকে অতি প্রশংসা করিলা।
শেষে ক্রমে ক্রমে তত্ত্ব কহিতে লাগিলা॥

পাঠান্তর—(ক) নাঞি—গাই।
(খ) সত্য—অন্য।

পাঠান্তর—(ক) অ মোর—আমার।
(খ) করি—বলি।
১। ফল্গু—তুচ্ছ।

শুন দেখি মাতা তুমি সতী যে হইবে।
ইহাতে বা পরলোকে কি গতি পাইবে॥
নারী কহে স্বামিসঙ্গে স্বর্গেতে যাইব।
চৌদ্দ মহেন্দ্র-কাল বিষয় ভুঞ্জিব॥
সাধু কহে তাহার অন্তেতে কি হইবে।
তেঁহো কহে কর্ম্মবশে যে হয় হইবে॥
সাধু কহে কর্ম্মক্ষয় ইথে তো না হৈল।
দারুণ সংসার-জ্বালা তবে তো (ক) না গেল॥
যদি কহ বহুকাল সুখ-আস্বাদন।
বহু জ্ঞান করিতেছ মোহের কারণ॥
বহু নহে সেই অতি অল্প কাল হয়।
কালের প্রবাহে কতো ইন্দ্র বহি যায়॥
লক্ষ লক্ষ ইন্দ্রপাত কালে হইতেছে।
চৌদ্দ ইন্দ্র ব্রহ্মার একদিনে যাইতেছে॥
স্বর্গ সেই স্বাভাবিক অনিত্য যে হয়।
সেই থাকু ব্রহ্মাণ্ড যে ইহা নাশ যায়॥
জীব কত কত ব্রহ্মার আয়ু (খ) যে পর্য্যন্ত।
ভ্রমণ করিছে তাঁর নাহি হয় অন্ত॥
অতএব অল্পসুখ বিষয় লাগিয়া।
মিথ্যা মায়া-মোহে মরে (গ) দেহ জ্বালাইয়া॥
নারী কহে মহাশয় কি কর্ত্তব্য হয়।
জন্ম-মৃত্যু মায়া-মোহ কি করিলে যায়॥
সাধু কহে মাতা তব শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে কিছু কহি শুন তাহার উপায়॥
জীয়ন্ত শরীর পোড়াইয়া যাহা নহে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম আচরিয়া বেদে যত কহে॥
সুন্দর-বিধানে করিলেও যা না হয়।
শ্রীরামচরণাশ্রয়মাত্র সুখে পায়॥
রামনাম মহামন্ত্র যে জন জপয়।
সেই ধন্য ধন্য সেই ত্রৈলোক্যবিজয় (ঘ)॥
এক নামে কোটি মহাপাতক নাশিয়া।
জীবন মুকত হয় নির্ম্মল হইয়া॥

পুনঃপুন সাধনেতে কি হয় না জানি।
চতুর্ব্বর্গ নাহি চাহে অতি তুচ্ছ মানি॥
যে স্বর্গ লাগিয়া তুমি দেহ কৈলে পণ (ক)
তার নাম শুনিতেহ (খ) কর্ণে হস্ত দেন॥
তাঁহার দর্শনে লোক পবিত্র হইয়া।
সেই রামচন্দ্রে ভজে শরণ লইয়া॥
দেবগণ পিতৃগণ ধন্য ধন্য করে।
সর্ব্বগুণ সহ বৈসে তাঁহার শরীরে॥

তথা—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা ইত্যাদি।

(পূর্ণ শ্লোক ও অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।)

তুমি দেহ পোড়াইতেছ ক্ষুদ্র ফল আশে।
সেই মহাফল পায় সুখে অনায়াসে॥
প্রেমভক্তি মহাফল সর্ব্ব ফলের ফল।
সর্ব্ব সুখময় সর্ব্বশুভের (গ) মঙ্গল॥
নিত্যসুখ যেই তার নাহিক বিনাশ।
চিদানন্দ শ্রীবৈকুণ্ঠে হয় তার বাস॥ (ঘ)
স্বর্গ যে অনিত্য তাহে দুঃখেতে মিশ্রিত।
ঈর্ষাদি-মাৎসর্য্য-ভয়-বিচ্ছেদ-বিব্রত॥
বৈকুণ্ঠ পরম ধাম নিত্য চিদানন্দ।
ঈর্ষা (ঙ) রাগ দ্বেষ মোহ নাহি মায়া-গন্ধ॥
অতেব শ্রীরামপদে শরণ যে লয়।
তাঁহার মহিমা কিছু কহা নাহি যায়॥
এতেক শুনিঞা স্ত্রীর মন ফিরি গেল।
স্বামী-সহ গমনেতে নিবর্ত্ত হইল॥
তুলসীদাসের পদে শরণ লইল।
মোহ দূরে গেল, চিত্ত প্রকাশ হইল॥
কহে মোর কর্ত্তব্য কি কহ মহাশয়।
কৃপা করি কহ যাথে মোর হিত হয়॥

পাঠান্তর—(ক) তবে তো—তাহাতে।
(খ) আয়ু—আই।
(গ) মায়া-মোহে মরে—মায়া মোহকর।
(ঘ) ত্রৈলোক্যবিজয়—ত্রিলোকবিজয়।

পাঠান্তর—(ক) দেহ কৈলে পণ—যে কৈল মনন।
(খ) শুনিতেহ—শুনি তেঁহ।
(গ) সর্ব্বশুভের—সর্ব্বসুখের।
(ঘ) চিদানন্দ বৈকুণ্ঠ ধামে হয় বাস।
(ঙ) ঈর্ষা—হর্ষ।

তবে সাধু রামচন্দ্র (ক) উপদেশ দিল।
তাঁহার কৃপাতে তাঁর রং (খ) ফিরি গেল॥
তৎক্ষণাত প্রেমভক্তি উদয় হইল।
জন্ম-অন্ধ জন যেন চক্ষুষ্মান্ হৈল (গ)॥
শ্রীমান তুলসীদাস নিজ ভক্তিবলে।
শক্তি-সঞ্চারণ কৈল ভাসে প্রেমজলে॥
কৃপা করি স্বামীরেহ বাঁচাইয়া দিলা।
তাঁহারেও রামচন্দ্র-চরণে সঁপিলা॥
এ কথা শুনিঞা তবে আকব্বর সাহা।
সাধুর দর্শনে তাঁর হইলা উৎসাহা॥
যতন করিয়া তবে নিঞা গেলা তাঁরে।
সম্মান করিয়া কিছু কহে মৃদুস্বরে॥
তোমার জহুবা (ঘ) যে শুনিনু পরম্পরা।
সতীর স্বামীরে তুমি বাঁচাইলা মরা॥
আমি কিছু চাহি তব জহুরা দেখিতে।
সাধু কহে জহুরা কি না পারি বুঝিতে॥
কাঙ্গাল ভিক্ষুক মুই উদর লাগিয়া।
দ্বারে দ্বারে ফিরি বুলি যাচিঞা করিয়া॥
এই মাত্র জানি মুঞি জহুরা না জানি।
রাজা কহে কপট কহিলে (ঙ) এই বাণী॥
পুনঃপুন পাৎসা কহে সাধু দৈন্য করে।
তাহাতে সক্রোধ হৈল পাৎসা অন্তরে॥ (চ)
সাধুরে লইয়া তবে কয়েদ রাখিল।
ভকতবৎসল রাম সহিতে নারিল॥
হনুমানে আজ্ঞা দিল কুবুদ্ধি রাজার।
উচিত করিয়া কর ভক্তের উদ্ধার॥
হনুমান নিজ অনুচর কপিগণ।
পাঠাইলা রাজপুরী-ভঞ্জন-কারণ॥
সহস্র সহস্র কপি আসিয়া পশিল।
রাজার পুরীতে আসি আক্রমণ কৈল॥
অট্টালিকা গৃহ সব ভাঙ্গিতে লাগিল।
স্তম্ভ উপাড়িয়া দ্বারে (ক) ক্ষেপণ করিল॥
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ লোক ধরিয়া ধরিয়া।
দূরে টান মারি ফেলে আছাড় মারিয়া॥
ঘর দ্বার লুটি অর্থ নদীতে ফেলায়।
হুঙ্কার করিয়া সভে লম্ফে লম্ফে ধায়॥
বিপদ পড়িলা রাজা ভাবয়ে অপার।
যুক্তি করি কোনো মতে নাহি প্রতিকার॥
সহরে লোকের হৈল ক্রন্দনের রোল।
পরস্পর ডাকাডাকি পড়ি গেল গোল॥
রাজার সভায় এক হিন্দু প্রামাণিক।
শিষ্ট শান্ত ধর্ম্মভীত বুদ্ধিতে অধিক॥
করযোড় করি তেঁহো রাজারে কহেন।
এ অনর্থ হেতু কহি যদ্যপি শুনেন॥ (খ)
তুলসীদাস সাধু যেই কয়েদ হইল। (গ)
যে-হেতুক এ দুরন্ত বিপদ পড়িল॥
তাহা শুনি রাজা শীঘ্র তুলসীদাসেরে।
কয়েদ হইতে আনাইয়া স্তুতি করে॥
বুঝিলাম তুমি মহাপুরুষ সুজন।
প্রিয়তম প্রভুর ভকতে শ্রেষ্ঠজন॥
অপরাধ হৈতে মোরে বাঁচাইয়া লহ।
প্রসন্ন হইয়া শ্রীচরণ মাথে দেহ॥
সাধুর স্বভাব সুখে দুঃখ অপমানে।
সমান কিঞ্চিত নাহি ক্ষোভ গ্লানি মনে॥
প্রসন্ন হইয়া নৃপে আশিষ করিলা।
সকল আপদ সেইক্ষণে দূরে গেলা (ঘ)॥
যদ্যপি ভকত মনে ক্ষোভ নাহি হয়ে।
ভকতবৎসল হরি তেঁহো না সহয়ে॥
ভক্তে অপরাধ যেই মূঢ় জন করে।
পক্ষপাত করি হরি দণ্ড দেন তারে॥
শান্তি দিয়া রাজারে চলিয়া গেল সাধু।
মঙ্গল হইল যথা তম নাশে বিধু॥

[illegible] (ক) রামচন্দ্র—রামমন্ত্র।
(খ) রং—মন।
(গ) চক্ষুষ্মান হৈল—চক্ষুধন পাইল।
(ঘ) জহুরা—মহিমা।
(ঙ) কহিলে—কহিলা, [illegible] তোমার।
(চ) তাহাতে হইল ক্রোধ পাৎসার অন্তরে।

পাঠান্তর—(ক) দ্বারে—দূরে।
(খ) এই যে অনর্থ ইহার আছয়ে কারণ।
(গ) তুলসীদাসের যাথে অপমান হৈল।
(ঘ) সেইক্ষণে দূরে গেলা—শান্তি তৎক্ষণাত হৈলা

তাঁর শ্রীচরণ-গুণ কীর্ত্তন করিয়া।
লালদাস প্রেম মাগে দন্তে তৃণ লৈয়া (ক)॥

চরিত্র শ্রীকরমানন্দ

করমানন্দ নামে সাধু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় (খ)।
শান্ত শিষ্ট যাঁর সম নাহিক দ্বিতীয়॥
কৃষ্ণ দরশন করি বহু স্তব কৈলা।
নিজ দোষ মানি দৈন্য করিতে লাগিলা॥
অধম যে আমি মোর নাম যেই লয়।
নরকে গমন করে, পুণ্য যায় ক্ষয়॥
হরি কহে—তুমি কেনে অধম হইবে।
তোমার যে নাম লয় সে বৈকুণ্ঠে যাবে॥
বিশেষ কহিনু মুঞি আজি যে হইতে।
তব নাম যেই লবে প্রীতিপূর্ব্ব চিতে॥
সেই মতে (গ) প্রেমভক্তি পাইবে নিশ্চিতে।
অচিরাত মুক্ত হবে সংসার হইতে॥
অতএব যে করে (ঘ সন্ধান বড় হয়।
পরম উপায় যার প্রেমভিক্ষাশয়॥
করমানন্দ (ঙ) করমানন্দ জপ সভে ভাই।
প্রেম-অমৃত (চ) পাইতে ইহা-সম (ছ) নাঞি॥
আমি তো বান্ধিনু গলে কবচ করিয়া।
কৃষ্ণনাম-নিধি পার্শ্বে রাখিনু ধরিয়া॥
ঊষর ভূমি যে মোর হৃদি তীক্ষ্ম ক্ষারে।
রূপিলাম (জ) বীজ দেখি বিধাতা কি করে॥
ভাগ্যহীন করে কল্পতরুর আশ্রয়।
তথাচ তাহার দরিদ্রতা নাহি যায়॥
সমুদ্রে ডুবয়ে যদি রত্নের লাগিয়ে।
রত্ন নাহি হাথে আইসে গুগলি উঠয়ে॥

[দোহা হিন্দী]

ভাগ্যহীন জন সমুদ্রে ডুবে যাঁহা রত্ন কি ঢেরি।
কর লাগে ঘুঙ্গা উঠে উহ করমকি ফেরি॥
লালদাস অভাগিয়া বড় ভাগ্যহীন।
শরণ না দেয় কেহো দেখি দীন-হীন॥

চরিত্র শ্রীকালা ভক্ত

গোবর্দ্ধনে নাথজীর পুরীর বাহির।
ঝাড়ু কসি করিয়া ছিটায় সদা নীর॥
মন্দিরের পাছে এক আছয়ে ঝরকা।
নাথজীর চরণ তাহাতে (ক) যায় দেখা॥
সেই খান হৈতে হাড়ি দরশন করে।
আনন্দে মগন হয় (খ) পুলকেতে ভরে॥
নিতি নিতি হাড়ি দরশন করি যায়।
গোসাঞি দেখিয়া তাহা মনে দুঃখ পায়॥
ঝরকার পথে হাড়ি উঁকি মারি দেখে।
খাদ্য পানীয় ঠাকুরের আগে থাকে॥
অনোচিত হয় বলি মন্দির-পশ্চাত।
এক ভীত বানাইয়া দিল হাথাহাথ (গ)॥
পরদিন হাড়ি দরশন না পাইয়া।
অনেক করুণা কৈল শিরে হাথ দিয়া॥
রাত্রিযোগে নাথজী গোসাঞি স্থানে (ঘ) কহে।
মুঞি বড় দুঃখ পাইনু পরাণে না সহে॥
ঝরকা করিয়া রোধ দেওয়াল গাঁথিয়া।
হাড়ির যে দরশন দিলে ছুটাইয়া॥
তাহে মোর বড় দুঃখ হইল অন্তরে।
দেয়াল পাতিলে মোর বুকের উপরে॥
এতেক স্বপন দেখি চমকি গোসাঞি।
দেওয়াল ভাঙ্গিয়া দিলা সেই রাত্রে যাই॥
হাড়ির বাটীতে গিয়া স্তুতি নতি করি।
চরণে ধরিয়া আনে অতি সমাদরি॥

পাঠান্তর—(ক) লৈয়া—দিয়া।
(খ) শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়—বড় কৃষ্ণপ্রিয়।
(গ) সেই মতে—সেই জন।
(ঘ) যে করে—এই এক।
(ঙ) করমানন্দ—পরমানন্দে।
(চ) প্রেম-অমৃত—প্রেমানন্দে।
(ছ) ইহা-সম—ইহার সম।
(জ) রূপিলাম।—রোপিলাম।

পাঠান্তর—(ক) চরণ তাহাতে—শ্রীচরণ তাতে।
(খ) হয়—হৈয়া।
(গ) হাথাহাথ—সাত হাত।
(ঘ) স্থানে—আগে

নাথজীর মন্দিরের দুয়ারে আনিঞা।
দরশন করাইলা সভাই বেড়িয়া॥
হাড্ডি-ঠাকুর বলি তাঁর নাম হৈল। (ক)
ভাগবত বলি সবে পূজিতে লাগিল॥
জীবিকা বাড়ায়্যা দিলা প্রসাদে বন্ধান।
নাথজী সন্তুষ্ট হৈলা দেখি তাঁর মান॥
সেই হড্ডি (খ) ঠাকুরের বিষ্ঠায় জনম।
লালদাস মাগে ক্ষয় করিতে করম॥

চরিত্র শ্রীপরশুরাম রাজগুরু

পরশুরাম নাম এক রাজগুরু হন।
মহাভাগবত কৃষ্ণভক্তের প্রধান॥
কৃষ্ণে মন নিবেশিয়া উৎকণ্ঠা সদাই।
বহু ধন জন, কিন্তু তাতে মন নাঞি॥
তথাচ জন্মেয়ে বাধা রক্ষানুপ্রেক্ষণে।
নিরপেক্ষ হইয়া যে না হয় ভজনে॥
তাহাতে ক্ষোভিত অতি উৎকণ্ঠিত মন।
উপায় কি করি কার লইব শরণ॥
দৈবাত বৈষ্ণব এক গৃহেতে আইলা।
ভক্তি করিয়া তাঁর আতিথ্য করিলা॥
তেঁহো অতি বিজ্ঞতম পণ্ডিত সুজন।
সুখ হৈল তাঁর সনে করি আলাপন॥
তাঁহারে কহেন কিছু নিবেদন করি।
এ দুস্তর মায়া (গ) হৈতে কি উপায়ে তরি॥
অর্থ-পরিবার-রক্ষা-মতে কাল যায়।
কৃষ্ণে নাহি মন গছে, ভজন না হয়॥
তাহার উপায় কিছু কহ মহাশয়।
কৃপা কর মোরে যাথে মোর হিত হয়॥ (ঘ)
তবে সেই বৈষ্ণব কহেন উপদেশ।
অপূর্ব্ব সুগুহ্য (ঙ) কথা পরম উদ্দেশ॥

মহাশয় তব মন কৃষ্ণে লাগিয়াছে।
কিন্তু যে বিষয়-রিপু বাধা করিতেছে॥
সম্যক প্রকারে মন ধারণ না হয়।
উষ্ণ অন্নে ফিরি যেন বিড়াল বেড়ায়॥
এতেক বিষয় যার এতো পরিবার।
শ্রীকৃষ্ণে অনন্যচিত্ত কোথা হয় তার॥
মন নিরপেক্ষ বিনে স্থির নাহি হয়ে।
অন্য চেষ্টা থাকিতে কি নিরপেক্ষ হয়ে॥
এক মন সূক্ষ্ম কীট কতেক বিষয়।
গ্রহণ করিতে তার কি শকতি হয়॥
স্বাভাবিক বিষয় লালসাযুক্ত মন।
বিশেষ হইয়া আছে তাহাতে পতন (ক)॥
সূক্ষ্ম (খ) তৃণ অগ্নি যথা একত্র সংযোগে।
দাহ বিনে নাহি থাকে উভয় বিভাগে॥
অতএব মহাশয় বিষয় তেজিয়া।
এইক্ষণে চল বন বিহিত জানিঞা॥
তেঁহো কহে মহাশয় যে কহিলে সত্য।
যোগভ্রষ্টকারী এই সংসার অনিত্য॥
অতএব কৃপা করি সঙ্গে মোরে লহ।
মায়াবন্ধ হৈতে মোর উদ্ধার করহ॥
এতেক বিচার করি (গ) সর্ব্বত্যাগ করি।
পর্ব্বত-কন্দরে গেলা ইন্দ্রিয় সম্বরি॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণপদ্মে মন নিয়োজিয়া।
আছেন কথোক দিন নিবৃতি পাইয়া॥
রাজা হেথা শুনিলা যে বৈরাগ্য করিয়া।
অমুক পর্ব্বতে গুরু বসিলেন গিয়া॥
সেবা হেতু দুই হাজার মুদ্রা পাঠাইল।
তেঁহো তাহা দেখি অতি বিষণ্ণ হইল॥
যেই মায়া ছাড়াইতে (ঘ) বৈরাগ্য করিল।
সেই মায়া পুন পাছে পাছে গোড়াইল॥
বৈষ্ণবেরে কহে এবে উদ্ধার করহ।
ইহা হৈতে নিঞা মোরে পুনশ্চ পলাহ॥

পাঠান্তর—(ক) হাড়ির ঠাকুর নাম তাঁহার হইল।
(খ) হড্ডি—হাড়ি।
(গ) মায়া—কায়া।
(ঘ) কৃপা করি কহিবে যাহাতে হিত হয়।
(ঙ) সুগুহ্য—শুনহ।

পাঠান্তর—(ক) পতন—মগন।
(খ) সূক্ষ্ম—শুষ্ক।
(গ) বিচার করি—বিচারি মনে।
(ঘ) ছাড়াইতে—ছুটাইতে।

বৈষ্ণব কহেন বটে যে কহিলে সত্য।
পলাইতে উচিত যে বাঁচাইতে আত্ম॥
টাকা সহ সেই লোক তথায় রহিলা।
না কহিয়া দুই জনে পলাইয়া গেলা॥
কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠী করি দুই জন।
আনন্দে মগন দিবা নিশি নাহি জ্ঞান॥
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া দুজন।
পরম-নিবৃতি হৈল পাইলা বৃন্দাবন॥
তাঁহা দোঁহার শ্রীচরণ করিয়া স্মরণ।
লালদাস মাগে প্রেমভক্তি রতন (ক)॥

চরিত্র শ্রীগদাধর ভট্ট

গদাধর ভট্ট নাম রসিক ভকত।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-রসে উনমত॥
এক পদ বানাইয়া ভট্ট মহাশয়।
শ্রীজীব গোস্বামী স্থানে আনন্দে পাঠায়॥
বৃন্দাবনে গোস্বামী পাইয়া সেই পদ।
উথলিল গোস্বামীর প্রেমানন্দমদ॥
গোস্বামী ভট্টজীকে লিখি পাঠাইলা।
পদ পাঠাইলা সে যে সুধায় সিঞ্চিলা॥
পদের সে স্বাদ আস্বাদিতে বৃন্দাবনে।
বিনে নাহি রঙ্গ চঢ়ে গৃহের অঙ্গনে॥
ভট্টজী পাইয়া লিপি মস্তকে ধরিয়া।
দু-নয়ানে গলে ধারা (খ) পড়য়ে বাহিয়া॥
পত্রী পাঠ করি ভট্ট চলিলা ত্রৈমনি।
শ্রীবৃন্দাবনে যথা শ্রীজীব গোস্বামী॥
ধাইয়া পড়িলা পদে গোস্বামী তুলিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন হৃদয় ধরিয়া॥
পরস্পর প্রেমানন্দে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।
রজনী দিবস যায় রসের প্রসঙ্গে॥
ভট্টজী কহেন মোরে কৃপাবলোকন।
করিয়া বিস্তারি কহ রস-প্রকরণ॥

পাঠান্তর—(ক) প্রেমভক্তি রতন—প্রেমভক্তি এক কণ।
(খ) গলে ধারা—গদগদ্।

গোসাঞি শ্রীজীব তবে আনন্দ পাইয়া।
রাধাকৃষ্ণ রসলীলা (ক) কহে বিস্তারিয়া॥
শুন শুন ভট্ট তবে অপূর্ব্ব কথন।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা রস-প্রকরণ॥

রস-প্রকরণ।

নাভাজীউ রসতত্ত্ব স্পষ্ট না বর্ণিলা।
কেবল কহিলা মাত্র ভট্টে শুনাইলা॥
অতএব নাভাজীর আশয়-অমৃত।
বুঝিয়া যে লিখি কিছু শুচি (খ) রসরীত॥
কর্ণ-রসায়ন রাধাকৃষ্ণের চরিত।
শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামীর শ্রীমুখগলিত॥
রস-প্রকরণ অন্য সাধুর চরিত।
দোঁহা আদি লিখিয়া বর্ণিব মনোনীত॥

[দোঁহা হিন্দী]

রসময়মূরতি যো গোকুল নিত্যবিহার।
মনমে উপজি বাসনা গোর ভেয় অবতার॥
রাধাপ্রেম নিজমাধুরী ঔর আপনেহি সীত।
ইহ আস্বাদন-হেতবে মনমে উপজে প্রীত॥
নিশিদিন রাধাভাব ধরি শ্যাম ভেয় দ্যুতি গোর।
মন ঔর আনন-নয়নমে রাধা বিনু নাহি ঔর॥
মনমে রাধাভাব ধরি আস্বাদত নিজ প্রীত।
হিয় বসি রূপগোঞিকে প্রকটিয়ে রসরীত॥
তিনি করি উজ্জ্বলনীলমণি নিজগণকে হিয়-হার
দরশায়ে সব রসিকোকো রসসাগরকে পার॥
সো অনুমতি লয় যথাশকতি তিহি পদপঙ্কজ আশ
যুগলপ্রেমরসবোধিকা রচতু হৈ হরিদাস॥
রস যে কেমন কি বিধানে কিবা নাম।
কিঞ্চিত লিখিব যুগলের পদকাম॥
শ্রীল রূপ-গোস্বামীর চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া যাথে হইবে সফল॥

অথ রসভেদ লক্ষণ।

গৌণ মুখ্য দুই ভেদ রস যে দ্বাদশ।
তার মধ্যে পাঁচ মুখ্য, সপ্ত গৌণ রস॥

পাঠান্তর—(ক) রসলীলা—লীলারস।
(খ) শুচি—শুদ্ধ।

অথ গৌণরস[১]।

হাস্য অদ্ভুত বীর করুণ আর রৌদ্র।
ভয়ানক বীভৎস এই সাত ভদ্রাভদ্র॥
অভদ্র যে সেহ ভদ্ররূপে প্রকাশয়।
পাত্র-বিশেষে চমৎকার রস হয়॥

মুখ্য পঞ্চ[১]।

শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য শৃঙ্গার।
পঞ্চমুখ্য মধ্যে যে শৃঙ্গার-রস সার॥
সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ যে মধুর রস হয়।
তাহাই কহিব কিছু শক্তি-অনুযায়॥

অথ রস-উৎপত্তি-লক্ষণ[২]।

বিভাব অনুভাবে মেলি সাত্ত্বিক সঞ্চারী।
স্থায়ী ভাব রস হয় চমৎকারকারী॥

তত্র বিভাব[৩]।

বিভাব যে দুই আলম্বন উদ্দীপন।
আশ্রয় বিষয় দুই বিধি (ক) আলম্বন॥

পাঠান্তর—(ক) দ্বিবিধ—প্রকার।

১। রস সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলা হইয়াছে—
ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥
ভবেদ্ ভক্তিরসোঽপ্যেষ মুখ্য-গৌণতয়া দ্বিধা।
মুখ্যস্তু পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতঃ প্রেয়াংশ্চ বৎসলঃ॥
মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়া যথাপূর্ব্বমনুত্তমম্।
হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি॥
ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা।
এবং ভক্তিরসো ভেদাদ্ দ্বয়োর্দ্বাদশধোচ্যতে॥

২। রসের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে আছে—
বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ীভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥

৩। তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ।
তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে॥
বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে।
বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ॥
(অগ্নিপুরাণম্)
কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ।
রত্যাদের্বিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপি চ॥

বিষয়ালম্বন কৃষ্ণ রসময়-রূপ।
রসিক-শেখর সর্ব্ব (ক) নায়কের ভূপ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণ যথা—

মন-মোহন সুন্দর চরণ-
কমলদ্যুতি হেরিয়া যুবতি।
কুল-গৌরব- লাজ বুহাতি
তেজিয়া করে কাননে বসতি॥
কেলি-কলানিধি দুর্লভ শ্যামরু,
যুবতীগণমে জাক মিলে।
ধন্য ধন্য সেই পুণ্যপুঞ্জকৃত
ধরণি জনমে অতি ভাগ্যফলে॥
অতি রমণীয় মধুর দেহ
সকল সুলক্ষণ অতি বলবন্ত।
নবযুবা নীল- লাবণ্য প্রিয়ংবদ
মধুর হাস বদনে রসবন্ত॥
বহু প্রতিভা অতি বিদগধ চতুরক-
শিরোমণি ললিত সুধীর।
করুণাময় দক্ষিণ প্রেমবশ্য সুখী
সুবাবদূক গভীর॥
সুন্দর বুদ্ধি প্রতিক্ষণ নৌতুন
ত্রিভুবন-মোহন পুরুষবর।
অনুপম সুন্দর মোহন মুরলী
কর-কমলে শোভিত মনোহর॥
সকলকীর্ত্তিধর অতুলিত ত্রিভুবনে
সবগুণসাগর নায়কনিধি।
নিত্য বেহারত শ্রীবৃন্দাবন-
ভুবি উজ্জ্বল-সরসে নিরবধি॥

অথ নায়কভেদ[১]।

ব্রজ আর মথুরা, দ্বারকা তিন ধামে।
পূর্ণতম পূর্ণতর পূর্ণ হরি ক্রমে॥

পাঠান্তর—(ক) সর্ব্ব—কৃষ্ণ।

১। হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥
স পুনশ্চতুর্ব্বিধঃ স্যাদ্ ধীরোদাত্তশ্চ ধীরললিতশ্চ।
ধীরপ্রশান্তনামা তথৈব ধীরোদ্ধতঃ কথিতঃ॥

লীলার মাধুরী আর রূপের মাধুরী।
রসের মাধুরী, বংশী-মাধুরীর ধুরী॥
বন্যবেশ রসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দনে।
বিনে আর এ চারি নাহিক কোনো স্থানে॥
অতএব পূর্ণতম শ্যাম নটরাজ।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ব্রজেতে বিরাজ॥
ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরশান্ত আর।
ধীরললিত এই চারি যে প্রকার॥
এ চারি স্বভাব কৃষ্ণচন্দ্রে একা বর্ত্তে।
সাহজিক কিন্তু ধীরললিত কৃষ্ণেতে॥
দ্বাদশ রস আর চারি যে স্বভাব।
আগে আর কহিব কৃষ্ণের রসভাব॥

অথ ধীরোদাত্ত লক্ষণ¹॥

স্বভাব বিনয়ী মৃদু করুণা (ক) গভীর।
নির্দ্দাম্ভিক শীলযুক্ত অত্যুদাত্ত ধীর॥

ধীরশান্ত²।

সর্ব্বত্র সমান ভাব আত্মা-পরকীয়ে।
সহিষ্ণুতা বিনয়ী বিবেকী শান্তাশয়ে॥

ধীরোদ্ধত³।

অহঙ্কার মৎসর কপট ক্রোধ বল।
সভায় প্রকাশ স্পর্দ্ধা ব্যাপক চপল॥
ধীরোদ্ধত স্বভাবের লক্ষণ যে এহি।
ললিত কৃষ্ণের যে সহজ ভাব কহি॥

পাঠান্তর—(ক) করুণা—কারুণ্য।

১। গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষন্তা করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
অকত্থনো গূঢ়গর্ব্বো ধীরোদাত্তঃ সুসত্ত্বভৃৎ॥
(ভ. র. সি.)

২। সমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ।
বিনয়াদিগুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে॥
(ভ. র. সি.)

৩। মাৎসর্য্যবান অহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ।
বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদীর্য্যতে॥
(ভ. র. সি.)

ললিত¹।

প্রেয়সী-অধীন নবযুবা বিদগ্ধতা।
নিশ্চিন্ত সদাই পরিহাস চঞ্চলতা॥
পতি-উপপতি-ভাবে দ্বাদশ যে রস।
পুন যে দ্বিগুণ হৈয়া করয়ে প্রকাশ॥
কন্যাকা-বিবাহ আর অন্যের উপপতি।
ভাবভেদে অই যে চব্বিশ রস-রীতি॥
পুন চারিগুণ করি হয় ছেয়ানই (ক)।
অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট আর শঠ তাই॥
এই সব নামভেদে নায়কের ভেদ।
পুন কহি তাহার লক্ষণ যে বিভেদ॥

তত্র অনুকূল লক্ষণ²।

অন্যাপেক্ষা অতি অনুরাগ যে একেতে।
অনুকূল সেই তার সাক্ষী রাধিকাতে॥

তস্য উদাহরণ

শ্রীরাধা-প্রতি সখী-উক্তি।

গোকুল নগরে অনেক রূপসী
আছয়ে নবযৌবনী।
কেলি-কলারসে রূপে গুণে ধনি
তোমা সম নাহি গণি॥
যে হেতু নাগর সে সব নাগরী
হেরিয়া নাহিক (খ) ভুলে।
ফিরে নাহি চায় তোমারে চিন্তয়
কর দিয়া শ্রুতিমূলে॥
কি গুণে বেন্ধেছ কি গুণ করেছ
কি রসেতে ভুলায়েছ।
তোমা বিনে নাহি জানে দিবা নিশি
কি ভাগ্য তুমি করেছ॥

পাঠান্তর—(ক) ছেয়ানই—ছিয়ানব্বই।
(খ) নাহিক—না কিছু।

১। বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥
(ভ. র. সি.)

২। অতিরক্ততয়া নার্য্যাং ত্যক্তান্যললনাস্পৃহঃ।
সীতায়াং রামবৎ সোঽয়মনুকূলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
(উজ্জ্বলনীলমণি)

অথ দক্ষিণ[১]।

অনেক রমণী-সনে বিহার করয়।
সভাতে সমান ভাব দক্ষিণ কহয়॥

তদ্‌যথা।

বহু গোপীসনে কৃষ্ণ বিহার করিতে।
সমান আদর ভাব (ক) দেখিয়া সভাতে॥
রাধার হইল মান নিজ উৎকর্ষতা।
স্বাভাবিক পূর্ব্ববত হেরিয়া খর্ব্বতা॥

অথ শঠ[২]।

সম্মুখেতে অতি প্রিয় কহয়ে বচন।
অসাক্ষাতে নিন্দয়ে যে শঠের লক্ষণ॥

তদ্‌যথা—

একদিন নিশিযোগে, শ্রীরাধার অনুরাগে,
কৃষ্ণচন্দ্র করি অভিসার।
যাইতে কুঞ্জ বিপিনে, চন্দ্রাবলী-সখীসনে,
দেখা হৈল পথের মাঝার॥
হাসিয়া কহয়ে সখী, বড় যে কৌতুক দেখি,
এনা (খ) বেশে গমন কোথারে।
কোন্ রমণীর প্রেমে, বাধিত হৈয়াছ (গ) কামে,
দ্রুতগতি যাইছ তথারে॥
যাইতে নারিবে তথা, পাও পাবে মনে বেথা,
আজি তোমায় না দিব ছাড়িয়া। (ঘ)
মো-সভার প্রিয়সখী, চন্দ্রাবলী বিধুমুখী,
তোমায় তথায় যাব লইয়া॥ (ঙ)

এতো কহি মুচকিয়া, বসন ধরিলাসিয়া (ক),
কৃষ্ণ কিছু কহয়ে চাতুরী।
আমিতো তাহাই চাই, চন্দ্রাবলী-স্থানে যাই,
কিন্তু মুঞিও আসি শীঘ্র করি॥
সখী কহে তা না হবে, কি কাযে কোথায় যাবে,
বল আমি যাইয়া করিব।
যেখানে যে কাযে কবে (খ), তখনি করিব লবে (গ),
যাহা চাহ তাহা আনি দিব॥
কৃষ্ণ মনে ভাবে তবে, চাতুরী তো না লাগিবে,
নিশ্চয় যে যাইতে হইল।
শঠতা করিয়া তবে, কহয়ে পুলকভাবে,
তবে সখি শীঘ্র করি চল॥
চন্দ্রাবলী-চন্দ্রানন, সুধা-আশে মোর মন,
চকোর পিয়াসে উৎকণ্ঠিত।
মিলাইয়া তাহা সনে, অমিয়ার সিঞ্চনে,
প্রাণদান দিয়া কর হিত॥
তবে চন্দ্রাবলী স্থানে, লইয়া শ্রীকৃষ্ণ সনে,
মিলাইলা শৈব্যা আদি সখী।
চন্দ্রাবলী বিধুমুখী, আনন্দে পরমসুখী,
প্রাণনাথ-বদন নিরখি॥
কৃষ্ণ চন্দ্রাবলী প্রতি, প্রিয়বাক্য নানা ভাতি (ঘ),
কহে কিন্তু মন রাধিকাতে।
কৃষ্ণ কহে চন্দ্রাননি, রূপে গুণে তুমি ধনি,
তোমা সম না দেখি জগতে॥
বিদগ্ধার শিরোমণি, প্রেমরসে রসখনি (ঙ),
রসময়ী সুরমণী-মণি।
যতেক প্রেয়সী রামা, তুমি মোর শ্রেষ্ঠতমা,
তোমা বিনে আর নাহি জানি॥

বিনয় পূর্ব্বক বহু রজনী বঞ্চিয়া।
প্রভাতে শ্রীরাধাস্থানে আসি দেখা দিয়া॥

পাঠান্তর—(ক) আদর ভাব—আদর ভাও।
(খ) এনা—হেন।
(গ) হৈয়াছ—হইয়া।
(ঘ) আজি তোমা ছাড়িয়া না দিব।
(ঙ) তোমাকে লইয়া তথা যাব।

১। যো গৌরবং ভয়ং প্রেম দাক্ষিণ্যং পূর্ব্বযোষিতি।
ন মুঞ্চত্যন্যচিত্তোঽপি জ্ঞেয়োঽসৌ খলু দক্ষিণঃ॥
অথবা
নায়িকাস্বপ্যনেকাসু তুল্যো দক্ষিণ উচ্যতে॥
(উ. নী.)

২। প্রিয়ং বক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশম্।
নিগূঢ়মপরাধঞ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ॥
(উ. নী.)

পাঠান্তর—(ক) ধরিলাসিয়া—ধরিল গিয়া।
(খ) কাযে কবে—কজে হবে।
(গ) লবে—সভে।
(ঘ) ভাতি—জাতি।
(ঙ) প্রেমরসে রসখনি—প্রেমের রসের খনি।

চন্দ্রাবলীর নিন্দা কহে ভঙ্গি করি।
শঠের লক্ষণ এই ইহাতে বিচারি॥

অথ ধৃষ্ট[১]।

অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন দেহে হয় (ক)।
প্রত্যক্ষ দর্শন, তথাপিহ করে নয় (খ)॥
বস্ত্রেতে মুছয়ে আর কহে চিহ্ন কোথা।
লাজভয় (গ) নাহি, মিথ্যা কহয়ে ধৃষ্ট তা॥
শ্রীনন্দকিশোরে ইহ ভেদ ছেয়ানব্বই।
বিষয়ালম্বন হরি কহিলা যে এই॥

অথ আশ্রয়ালম্বন[২]।

আশ্রয়ালম্বন কৃষ্ণবল্লভা নায়িকা (ঘ)।
কৃষ্ণের সমান গুণ জগতে অধিকা॥
দেব-নর-আদি ত্রিভুবনে যত নারী।
সভার মুকুটমণি ব্রজের সুন্দরী (ঙ)॥
রূপে গুণে বিদগ্ধাতে (চ) চমৎকারকারী।
হেরিয়া লজ্জিত সব জগতের নারী॥
সফল যৌবন কৃষ্ণসনে স্মরকেলি[৩]।
ধন্য রূপ যৌবন ধন্য ধন্য ভালি ভালি॥

পাঠান্তর—(ক) হয়—রহে।
(খ) করে নয়—কহে নহে।
(গ) লাজভয়—লাজভয়ে।
(ঘ) নায়িকা—রাধিকা।
(ঙ) ব্রজের সুন্দরী—ব্রজেন্দ্রসুন্দরী।
(চ) বিদগ্ধাতে—বৈদগ্ধীতে।

১। অভিব্যক্তানাতন্বীভোগলক্ষ্মাপি নির্ভয়ঃ।
মিথ্যাবচনদক্ষশ্চ ধৃষ্টোঽয়ং খলু কথ্যতে॥

২। বিভাব বলিতে রসের উৎপত্তির প্রধান অবলম্বনকে বুঝায়। তাহা আবার দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন বলিতে রসোৎপত্তির পাত্র পাত্রীকে বুঝায়। যেমন বাৎসল্য রস মাতা-পিতা এবং সন্তানকে বা সেইরূপ কোন স্নেহভাজনকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়। সেই জন্য যশোদা-শ্রীকৃষ্ণ, শচীদেবী-নিমাই ইত্যাদি বাৎসল্য রসের আলম্বন বিভাব। যাহা দ্বারা রস উদ্দীপিত হয় তাহা উদ্দীপন বিভাব, যেমন শৃঙ্গার রসে চন্দ্র, কোকিলরব ইত্যাদি। আলম্বন আবার দুই প্রকার—আশ্রয়ালম্বন ও বিষয়ালম্বন। যেমন বাৎসল্য রসের আশ্রয়ালম্বন মাতা-পিতা প্রভৃতি, মধুর রসের আশ্রয়ালম্বন শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি। বাৎসল্য মধুর ইত্যাদি রসের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বিষয়ালম্বন, যেমন যশোদার বাৎসল্যের এবং শ্রীরাধার প্রণয়রসের উদ্দিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন।

৩। স্মরকেলি—কামকেলি।

প্রথমে নায়িকা হয় দ্বিবিধ-প্রকার।
স্বকীয়া যে বিবাহিতা, পরকীয়া আর॥
স্বকীয়া যে ধর্ম্মপরা পতিব্রতা হয়।
পতি-শুশ্রূষণে রত পতিসুখময়॥
দ্বারকায় শ্রীরুক্মিণী-আদি যতগণ (ক)।
পতিব্রতা সতী লক্ষ্মী জানে জগজন॥
ব্রজে পরকীয়া ভাব শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণেতে।
লোক বেদ ধর্ম্ম ছাড়ি মজিলা পিরীতে॥
কুল শীল গৌরব সব (খ) লোকলাজভয়।
কৃষ্ণ-প্রেম-অনুরাগে গোপিকা ছাড়য়॥
অনেক আপদ যে সম্পদ করি মানে।
কৃষ্ণচন্দ্রে কোটি কোটি প্রাণতুল্য জানে॥
যদ্যপিহ কৃষ্ণচন্দ্রে জার-ভাব[১] হয়।
সতীগণ পদ সেবে লক্ষ্মী প্রশংসয়॥
পরকীয়া দুই মত পরোঢ়া (গ) কন্যকা।
কন্যকা যে বিবাহিতা, অন্য যে পরোঢ়িকা (ঘ)॥
ধন্যা-আদি নাম গোপকন্যা সহস্রেক।
মুগ্ধা-স্বভাব বিবাহিতা সভে পরতেক॥
কাত্যায়নী-ব্রতপরা ইঁহো সব হন।
কৃষ্ণসনে বিভা নাহি জানে গুরুজন॥
লুকাছাপা কৃষ্ণসনে বনেতে বিহার।
স্বকীয়া হইয়া পরকীয়া-ব্যবহার॥
কৃষ্ণ-অনুরাগে পিতামাতারে ছাপায়।
কৃষ্ণসঙ্গে পাছে কোন বাধা জনমায়॥
পরোঢ়ার (ঙ) লক্ষণ কহি শুন তার কথা।
গোপের রমণী নব-যৌবন-অবস্থা॥
বয়সে কিশোরী রাধাদিক শত শত।
পরমমাধুরী রূপে গুণে সুচরিত॥
নিত্যসিদ্ধ অসংখ্য সাধনসিদ্ধ আর।
তাহার মধ্যেতে ভাব কত যে (ঙ) প্রকার॥

পাঠান্তর—(ক) যতগণ—নারীগণ।
(খ) গৌরব সব—গৌরবাদি।
(গ) পরোঢ়া—প্রৌঢ়া।
(ঘ) পরোঢ়িকা—প্রৌঢ়িকা।
(ঙ) পরোঢ়ার—প্রৌঢ়ার।
(চ) কত যে—যতেক।

১। জার-ভাব—উপপতিভাব।

সকল গোপিনী-মোহনের সম্মোহিনী (ক)।
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠা শ্রীলরাধা-ঠাকুরাণী॥
রূপে গুণে প্রেমরসে পরমমাধুরী।
সভার মুকুটমণি হরি-মন-হারি¹॥

অমিত ত্রিপদী ছন্দ।

নবীন কিশোরী হেম, বরণ সু-উজ্জ্বল,
অতি কমনীয় শরীর।
কুচ-কলস-যুগ, কঠিন সুচিক্কণ,
শ্যাম মন যাহাতে সুথির (খ)॥
লোল দৃগঞ্চল², হাস্য বদন মৃদু,
নিন্দি সুধা-রসধার।
কর-পদ-নখ-মণি-, অগ্রে রতনভূষা,
আপনারে করয়ে ধিক্কার॥
সহজ (গ) অঙ্গেতে ষোল, শিঙ্গার³ যে শোভয়ে,
তাহার শুনহ ষোল নাম।
যাহাতে কৃষ্ণের মন, সদাই মোহন করে,
উদ্দীপন করে হিয়া-কাম॥
মঞ্জন রঞ্জন, অঞ্জন মোহন (ঘ),
দীর্ঘ সুলোচনে সাজে।
নাসিকা অগ্রে, সুশোভিত গজমতি,
বক্ষে যে হার বিরাজে॥
কটিতটে নীল পট্ট, নীবি-বন্ধ সুশোভিত,
বেণি রচিত কুচভারে।
মল্লিকা মাল (ঙ), প্রফুল্লিত বেষ্টিত
কুচ'পরি কুমকুম-সারে॥
মণিময় ভূষণ, শ্রবণ'পরি লোলিত,
মৃগমদ তিলক সুনাসে।
ইন্দুমুখে চিবুকে, নীলবিন্দু প্রকাশিত,
শ্যাম-মন বন্ধ যেই ফাঁসে॥

পাঠান্তর—(ক) সম্মোহিনী—মনমোহিনী।
(খ) সুথির—সুধীর।
(গ) সহজ—সেহ।
(ঘ) মর্দ্দন অঞ্জন রঞ্জন মোহন।
(ঙ) মল্লিকা মাল—মল্লিকা মালতী।

১। তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥ (উ. নী.)
২। দৃগঞ্চল—নয়নকোণ, কটাক্ষ।
৩। শিঙ্গার—বেশভূষা ইত্যাদি।

লীলা-কমল, কমল-করে সুশোভিত,
তাম্বুলে লোহিত লোহিত অধরে।
কপোল দৃগঞ্চলে, বল্লি সুচিত্রিত,
পদযুগে মহারব-সারে॥

অথ দ্বাদশ আভরণ।

শিরে রত্নফুল শোভে কণ্ঠে চাঁপকলি।
পদক-মুকুতা মালা লম্বি হালি হালি॥
করেতে কঙ্কণ চুড়ি (ক) নিতম্বে রসনা¹।
বাহুযুগে বাজুবন্ধ রতনে জোটনা॥
চরণ-অঙ্গুলে শোভে রতন-চুটুকি।
নূপুর সুন্দর বোলে বাজয়ে ঝুমুকি॥
দ্বাদশ আভরণ হয় (খ) প্যারীজীর অঙ্গে।
পরম শোভিত ভূষা প্যারী-অঙ্গ-সঙ্গে॥

অথ শ্রীরাধিকার গুণ।

নবযৌবনি ধনি, মধুরস-লাবণি (গ),
অতি চঞ্চল দৃগভঙ্গী।
মৃদু মৃদু হাসত, সুধারস বরিখত,
হেরিয়া মোহন মন রঙ্গি (ঘ)॥
গীত-বাদ্য আদি, বিদগধতা-নিধি,
বচন-চাতুরী কত ছান্দে।
কৌতুক-কলারসে, ভঙ্গিম সুবিলাসে,
রসময়-হরি-মন বান্ধে॥
বিনয়-করুণা-ধীর, লাজশীল সুগম্ভীর,
মর্য্যাদক পর-উপকারি।
মহাভাব-প্রেমবতী, অঙ্গে অনুভাব-জ্যোতি,
শুদ্ধ সমর্থা রতি ভারি॥
ব্রজে সকলের মান্য, রূপে গুণে ধন্য ধন্য,
সকল লোকেতে প্রশংসয়।
গুরুজন ঘরে ঘরে, আদর সভাই করে,
প্রাণ-সম সকলে মানয়॥

পাঠান্তর—(ক) চুড়ি—শোভে।
(খ) হয়—রয়।
(গ) মধুরস-লাবণি—মধুর সুলাবণী।
(ঘ) মন রঙ্গি—মনোভঙ্গি।

১। রসনা—কাঞ্চী, কোমরে পরিবার চন্দ্রহার বা গোট।

সখীর প্রণয়ে, আনন্দ হৃদয়ে,
প্রিয়াগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা।
কৃষ্ণ বশীভূত, প্রণয়-সহিত,
প্রাণের অধিক প্রেষ্ঠা॥
শ্রীরাধিকা যত, গুণে অলংকৃত,
কৃষ্ণেতে অতেক নহে।
যে হেতু মোহন, শ্রীরাধিকা বিন,
ক্ষণেক সুখে না রহে॥

সেই পরকীয়া আর স্বকীয়াতে দুই।
তিন তিন ভেদে নায়িকার গুণ কই (ক)॥
মুগ্ধা আর মধ্যা, প্রগল্ভা তিন নাম।
পৃথক পৃথক কহি অতি অনুপাম॥

তত্র মুগ্ধালক্ষণ[১]।

নবীন বয়েসে নব-মন্মথ উদয়।
রতিতে বামতা অতি লজ্জাযুতা (খ) হয়॥
অন্তরে বাসনা, বাহ্যে লাজেতে (গ) ছাপায়।
প্রিয় অঙ্গে হস্ত দিতে ঠেলিয়া ফেলায়॥
মান-বিদগ্ধতা নাহি জানে মুগ্ধামতি।
কান্দয়ে কেবল মান করি প্রিয় প্রতি॥
প্রিয়-প্রীত বাক্যেতে হইয়া অতি সুখি।
মান দূরে যায়, হয় প্রফুল্লিতমুখী॥
প্রিয় অঙ্গে হস্ত দিতে মুচকি হাসিয়া।
পুনঃপুন উরজ ঝাঁপয়ে বস্ত্র দিয়া॥
বসনে ঝাঁপিয়া পুন বদন ফিরায়।
প্রিয়ে প্রিয়বাক্যে হয় আনন্দ-হৃদয়॥
ছল-ছুতা করি প্রিয়-বদন হেরয়।
রতি-সঙ্গ-প্রসঙ্গে অন্তরে ডর হয়॥

মুগ্ধা সঙ্গ-বিশেষ-রসেতে হরি সুখী।
সে রস দেখিয়া আনন্দিত সব সখী॥

অথ মধ্যা-লক্ষণ[১]।

প্রিয়ের সহিত, যব মিলনে ঈষত
লজ্জিত কিঞ্চিত পরখর[২] বচনে।
কহয়ে প্রিয়ের সনে, সুরত প্রসঙ্গমে,
অন্তরে সম্মতি রমণে॥
তরুণ বয়স কুচ, সুন্দর সুবলিত,
পুষ্ট হইতে কিছু নীন (ক)।
অঙ্গ সুজ্যোতি, ভাষ-হাস-যুত,
বিদগ্ধতা কটি খীণ॥
প্রিয়ের সহিত, নয়ানে নয়ানে,
বচন কহিতে আঁখি। (খ)
কিঞ্চিত কুঞ্চিত, করিয়া নয়ান,
লাজে হয় হেটমুখী॥
রসিক নাগর, হৃদয়েতে যবে,
কর চালাইতে চাহে।
দুই বাহু দিয়া, হৃদয় চাপিয়া,
হাসিয়া হাসিয়া কহে॥
পুনঃপুন মোর, হৃদয়ে চালাও,
কর করি জোরাজোরি। (গ)
তোমার কি কিছু, থাতি ধন মোর,
হৃদয়ে রেখেছ ধরি॥
নাগর কহয়ে, তোমার হৃদয়ে,
রতন গাগর হয়।
আমি সুন্দরি, উহাই দেখিয়া,
লোভ মোর উপজয়॥

পাঠান্তর—(ক) কই—পাই।
(খ) লজ্জাযুতা—লজ্জা যুত।
(গ) লাজেতে—লোকেরে।

১। মুগ্ধা নববয়ঃ কামা রতৌ বামা সখীবশা।
রতিচেষ্টাসু সব্রীড়চারুগূঢ়প্রযত্নভাক্॥
কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা।
প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা॥
(উ. নী.)

পাঠান্তর—(ক) নীন—দীন।
(খ) প্রিয়ের সহিত বচন কহিতে, নয়নে নয়ন দেখি।
(গ) করি বড় জোর জারি।

১। সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী।
কিঞ্চিৎ প্রগল্ভবচনা মোহান্তসুরতক্ষমা।
মধ্যা স্যাৎ কোমলা কাপি মানে কুত্রাপি কর্কশা॥
(উ. নী.)

২। পরখর প্রখর কর্কশ।

| দোঁহা সওইয়া হিন্দী |

জবহী' প্রিয়নয়নসোঁ, নয়নে ন জোড়ত,
নেক নেহারি ফিরি হসিকে।
জব করকঞ্জ চলে, হরিকে তব বাঁধত,
হেয় চকত্তা কুচকসিকে'॥
পুনি বোলত হেয় মন, মোহনজী অরু হেয়,
জগমে তুমসে' রসিকে'।
কেলি কলোলমে, লোল ত্রিয়া সুধী,
ভুলি রহি ভুজবন্ধন খসিকে'॥

ধীরা অধীরা আর ধীরাধীরা নাম।
মান-বিদগ্ধ তা তিন অতি অনুপাম॥

তত্র ধীর-মধ্যা-লক্ষণ'।

ধীর-মধ্যা প্রিয় যদি অপরাধ করে।
বক্র উক্তিতে ভৎসে শ্লেষবাক্য (ক) দ্বারে॥

ত্রিপদী

আহা মরো যাই, কভু দেখি নাঞি,
এমন বেশ তোমার।
হরি ছাড়ি আজু, হর হইয়াছ,
অপরূপ রূপসার॥
ভালেতে যাবক, অঞ্জনের তাহে,
লেখা (খ) ত্রিলোচন ভাল।
প্রেয়সীর অঙ্গে, অঙ্গ ঘরিষণে,
চন্দন বিভূতি মাল॥
চন্দনের বিন্দু আধো মিশিয়াছে,
আধা শশী শোভিয়াছে।
সহজে তুমি তো, পশুপতি হও,
শীঘ্র যাও সতী কাছে॥

নাগর কহয়ে, এ গোপ-নগরে,
তোমা সম সতী কে বা।
পশুপতি মুঞি, করিতে আইনু,
তোমারি চরণসেবা'॥

অথ অধীরা মধ্যা'।

অধীরা মধ্যা যে রামা (ক) মানিনী হইয়া।
কঠোর উক্তিতে কহে প্রিয়েরে ভৎর্সিয়া॥

তদ্যথা—

উচ-কুচ পুষ্ট কঠোরস্তনী কোন্ (খ)।
রসিক রমণী হরি' নিল তব মন॥
সে সুখ ছাড়িয়া হেথা আইলা কি কারণে।
শীঘ্র যাও, দুঃখ সে যে পাইবেক (গ) মনে॥
তোমা হেন নাগর পাইয়া সে রমণী।
কেমন করেছে টোনা, ধন্য সেই ধনী॥
গুণহীন কুরূপিণী আমি অরসজ্ঞ।
হেথা তব যোগ্য নহে (ঘ) যাহ যথাযোগ্য॥
ভুলিয়া এসেছ কিংবা গ্রহ (ঙ) লাগিয়াছে।
শীঘ্র গমন কর ধনী জানে পাছে॥

অথ ধীরাধীর-মধ্যা'।

ধীরাধীর-মধ্যার লক্ষণ সেই হয়।
বক্র-উক্তিতে মানে প্রিয়কে ভৎর্সয়॥

তদ্যথা—

হেথা কেন হে নাগর, কি কায হেথায়।
কে কহিল আসিবারে, নিজ (চ) অভিপ্রায়॥

পাঠান্তর (ক) শ্লেষবাক্য—স্নেহবাক্য।
(খ) লেখা রেখা।
১। ত্রিধাসৌ মানবৃত্তেঃ স্যাদ্ ধীরাধীরোভয়াত্মিকা।
ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ম্॥
(উ. নী.)

পাঠান্তর- (ক) রামা—বামা।
(খ) উচ-কুচ পুষ্ট-স্তনী নারী কোন জন।
(গ) পাইবেক—পাইতেছে।
(ঘ) হেথা তব যোগ্য নহে—এথা তব কিবা কাজ।
(ঙ) গ্রহ—দিশা।
(চ) নিজ—কিবা।
১। এই প্রসঙ্গে শ্রীল গোবিন্দদাসের "আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক" এবং "সহজই গোরি রোখে তিনলোচন" এই দুই পদ দ্রষ্টব্য।
২। অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈ র্নিরস্যেদ্ বল্লভং রুষা।
(উ. নী.)
৩। ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম্।
(উ. নী.)

কান্দাইতে আমারে তোমারে পাঠাইল।
এবে যাহ, কহ গিয়া কার্য্য সিদ্ধ হৈল॥
চরণ-যাবক শিরে ধর তুমি যার।
তাহার চরণ গিয়া পূজ বারবার॥
সেই দেবী প্রসন্ন হইয়া বর দিবে।
রসের সাগরে ডুবি বড় সুখ পাবে॥

অথ প্রগল্ভা[১]।

সর্ব্বোপরি মধ্যাতে সরস রস হয়।
মুগ্ধা-প্রগল্ভা-গুণ তাহাতে বর্ত্তয়[২]॥
প্রগল্ভা-লক্ষণ এবে কহি কিছু শুন।
শ্রীরাধিকাতে বর্ত্তে সকল এ গুণ॥
পূর্ণ-যৌবন-মদ-অন্ধ রতিরসে।
উৎসাহ সদাই স্বাভিযোগ পরকাশে॥
প্রৌঢ় বচন ক্রিয়া হাস, পরিহাস।
প্রগল্ভতা-রীত এই যাথে প্রিয় বশ॥ (ক)

তদ্‌যথা—

প্রিয়ের সহিত, কৌতুক চরিত,
হাস পরিহাস সদা।
হিয়া হিয়া মিলি রঙ্গে রসকেলি,
করয়ে হইয়া মুদা॥
প্রিয়ে রতি যবে, চাহে ধনি তবে,
মুখ ঝাঁপে মুচকিয়া।
অভিলাষ মনে, জানায় যতনে,
স্বাভিযোগ প্রকাশিয়া॥
রতি-রস-রঙ্গে, মাতি প্রিয় সঙ্গে,
বিহরে নিলজ্জ প্রায়।
বিপরীত রতি, বিপরীত রীতি,
করি প্রিয়ে সুখ দেয়॥

মানিনী যখন, হয়েন তখন,
তাড়ন ভর্ৎসন করে।
ধীরাধীরা আর, অধীরা প্রকার,
আর ধীরা পরচারে॥

অথ ধীর-প্রগল্ভা[১]।

ধীর-প্রগল্ভা রতি-রসেতে উদাস।
মানের সময়ে কহে প্রিয়বত ভাষ॥

তদ্‌যথা—

রসিক নায়ক (ক) অপরাধী যবে হরি (খ)।
আগমন কালে দূরে হইতে নেহারি॥
আইস আইস বলি আদর করিয়া।
বসনে বীজন করে কাছে বসাইয়া॥
অন্তরে উদাস, বাহ্যে প্রসন্নের (গ) প্রায়।
বিরস বদন, কিন্তু রুক্ষ না কহয়॥
প্রিয় কুচে কর দিতে কর না রোখয়।
চুম্বন করিতে মুখ বাড়াইয়া দেয়॥
আলিঙ্গন করিতে আপনি আলিঙ্গয়।
হৈল তো এখন বলি উদাস কহয়॥

অথ অধীর-প্রগল্ভা[২]।

অধীর-প্রগল্ভা যবে মানবতী হয়।
নিস্নেহের ন্যায় বাক্য কঠোর কহয়॥
তাড়ন ভর্ৎসন করে, নয়নের ভঙ্গি।
মালায় বন্ধন করে গর্জ্জে যেন ভৃঙ্গী॥
কর্ণোৎপলে তাড়ন করয়ে কোপ করি।
গালি দেয় ক্রূর শঠ বলিয়া সুন্দরী॥
রসিক নাগর তাহে আনন্দিত-হিয়া।
বাহ্যেতে বিনয় করে (ঘ) ভয় প্রকাশিয়া॥

পাঠান্তর—(ক) প্রগল্ভার রীতি ইহ প্রিয় যাথে বশ।

১। প্রগল্ভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসুকা।
ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্তবল্লভা।
অতিপ্রৌঢ়োক্তিচেষ্টাসৌ মানে চাত্যন্তকর্কশা॥
(উ. নী.)

২। সর্ব্ব এব রসোৎকর্ষো মধ্যায়ামেব যুজ্যতে।
যদস্যাং বর্ত্ততে ব্যক্তা মৌগ্ধ্যপ্রাগল্ভ্যয়োর্যুতিঃ॥
(উ. নী.)

পাঠান্তর—(ক) নায়ক—নাগর।
(খ) হরি—হেরি।
(গ) প্রসন্নের—ইতরের।
(ঘ) বাহ্যেতে বিনয় করে—বিনয় কহয়ে বাহ্যে।

১। উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থা চ সাদরা।
২। সভ্রূভঙ্গং নিষ্ঠুরং রোষাদধীরা তাড়য়েৎ প্রিয়ম্।

অথ ধীরাধীর প্রগল্‌ভা[১]।

অধীরা ধীরার গুণ দুই যাতে বর্ত্তে।
ধীরাধীর-প্রগল্‌ভা যে জানিহ তাহাতে॥

তদ্‌যথা –

মানের পোষণ করে আদর ভাবেতে।
বাহ্যেতে সহজপ্রায় উদাস রীতিতে॥
কখন নিস্নেহবত রুষ্টবাক্য কহে।
কর্ণোৎপলে তাড়ন করয়ে মৌনে রহে॥
মধ্যা প্রগল্‌ভা এই তিন তিন মত (ক)।
ছয় আর মুগ্ধা একের সহ সাত॥
স্বকীয়া (খ) পরকীয়া মতে তাহার দ্বিগুণ।
কন্যকা মিলিয়া যে পোনর হয় পুন॥
সেই পোনর আর অষ্ট প্রকার গণন।
অষ্ট নায়িকা মতে (গ) কহে বিজ্ঞজন॥
তবে কহি শুন সেই আটের লক্ষণ।
লালদাস চিত্তে যাহা করয়ে ধারণ॥

অথ অষ্ট-নায়িকা-ব্যবস্থা[২]।

প্রথম নায়িকা অভিসারিকা অবস্থা।
দ্বিতীয়া বাসকসজ্জা তিন উৎকণ্ঠিতা॥
চতুর্থ যে বিপ্রলব্ধা পঞ্চম খণ্ডিতা।
ষষ্ঠ বিরহাবস্থা কলহান্তরিতা॥
স্বাধীনভর্ত্তৃকা সাত প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা।
সহিত গণনা অষ্ট রসময়ী টীকা॥

পাঠান্তর—(ক) এই তিন তিন মত—হয় এই তিন মত।
(খ) স্বকীয়া—স্বীয়া।
(গ) অষ্ট-নায়িকা মতে—অষ্টনায়িকার মধ্যে।

১। ধীরাধীরগুণোপেতা ধীরাধীরেতি কথ্যতে।
(উ. নী.)

২। অভিসারিকা বাসসজ্জা চোৎকণ্ঠিতা তথা।
খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধ চ কলহান্তরিতাপি চ।
প্রোষিতপ্রেয়সী চৈব তথা স্বাধীনভর্ত্তৃকা॥
(উ. নী.)

অথ অভিসারিকা-লক্ষণ[১]।

প্রিয়ের মিলন-আশে কুঞ্জেতে গমন।
সঙ্কোচপূর্ব্বক অভিসারের লক্ষণ॥
তাহাতে যে বেশ-ভূষা দুই তো প্রকার।
শুভ্র বস্ত্র শুক্ল পক্ষে শুভ্র মণিহার॥
নীলবস্ত্র কৃষ্ণপক্ষে নীল অভরণ।
মৃগমদ-আদি করি (ক) অঙ্গেতে লেপন॥
দূর হৈতে লোকে পাছে দেখিয়া জানয়।
যে হেতুক (খ) শুক্ল-কৃষ্ণ বেশে বাহিরায়॥

অথ বাসকসজ্জা[২]।

প্রিয়ের সহিত বিলাসের আশ করি।
গৃহশয্যা মাল্য তাম্বুল স্নিগ্ধ বারি॥
চন্দনাদি নানা গন্ধ বসন ভূষণ।
সাজায় করিয়া সাধ প্রিয়ের কারণ॥

অথ উৎকণ্ঠিতা[৩]।

প্রিয় আগমন যবে শীঘ্র না করয়।
পথপানে চাহি রহে উৎকণ্ঠা-হৃদয়॥
বিরহে তাপিত অতি করয়ে বিলাপ।
নয়নে গলয়ে বারি কহয়ে প্রলাপ॥

পাঠান্তর—(ক) করি—করে।
(খ) যে হেতুক—এই হেতু।

১। যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যান-যোগ্যবেশাভিসারিকা॥
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈক সখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ॥
(উ. নী.)
কান্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা
(সাহিত্যদর্পণ)।

২। স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা॥
চেষ্টা চাস্যাঃ স্মরক্রীড়া সংকল্পো বর্ত্মবীক্ষণম্॥
সখী বিনোদবার্ত্তা চ মুহুর্দূতীক্ষণাদয়ঃ॥ (উ. নী.)

৩। অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা॥
অস্যাস্তু চেষ্টা হৃত্তাপো বেপথুর্হেতুতর্কণম্।
অরতির্বাষ্পমোক্ষশ্চ স্বাবস্থাকথনাদয়ঃ॥
(উ. নী.)

সখীগণ আশ্বাস করয়ে কতমতে।
এখনি আসিবে প্রিয় স্থির কর (ক) চিতে॥
হোথা প্রিয় আগমন সঙ্কেত-কুঞ্জেতে।
করিতেই দেখা চন্দ্রাবলী-সখী-সাথে॥
ধরি নিঞা গেলা চন্দ্রাবলীর সমীপে।
রজনী বঞ্চিলা তথা রসের আলাপে॥

অথ বিপ্রলব্ধা[১]।

সখীর আশ্বাসে ধনী স্থির করি মন।
প্রিয়-আগমন পথ করে নিরীক্ষণ॥
বৃক্ষের যে পত্রে পত্রে যদি শব্দ হয়।
ঐ আইল প্রিয় বলি উঠিয়া বৈঠয়॥
দূতী পাঠাইয়া দিলা প্রিয়ের কারণে।
ফিরিয়া আইলা দূতী বজ্র হেন মানে॥
এইরূপ বিচ্ছেদ-বিষাদে নিশি যায়।
না আইলা যবে তবে মানবতী হয়॥ (খ)

অথ খণ্ডিতা[২]।

অন্য নায়িকা ভোগ করিয়া নায়ক।
আইসে অঙ্গেতে নখ চিহ্নাদি যাবক॥
দেখিয়া কোপিতা মনে ভর্ৎসনাদি করি।
উপেক্ষা করয়ে যে খণ্ডিতাবতী নারী॥

তদ্‌যথা—

প্রভাত সময়ে, বনশোভা অতি,
নানাফুল বিকশিত।
প্রফুল্লিত লতা, পরম শোভিতা,
বৃক্ষ ফল-ফুল যুত॥
কোকিল কুহরে, নাচয়ে ময়ূরে,
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে।
রতনে জড়িত, অতি সুললিত,
বেদী হয় স্থানে স্থানে॥
হেনই সময়, বিদগধ-রাজ
মদনমোহন হরি।
চন্দ্রাবলী-সহ, বিহার করিয়া,
সঙরি আইসে প্যারী॥
সংকেত করিয়া, না আইনু ভাবিয়া,
ভয়েতে কম্পিত হিয়া।
ধৃষ্টমতি অতি, চাতুরি যুগতি,
চলে ভিতে (ক) ভাণ্ডাইয়া॥
ভালেতে সিন্দুর, বয়ানে কাজর,
হৃদয়ে নখের রেখা।
কঙ্কণের দাগ, রহে বাহুভাগ,
রতিচিহ্ন দিছে দেখা॥
অন্তরসংকোচে (খ), নিজ দেহে তাহা,
অনুভব কিছু নাঞি।
অপরাধ জানি, পাছে সুবদনী,
উপেখয়ে মোরে রাই॥
ভাবিতে ভাবিতে, ধীরে ধীরে পথে,
চলয়ে নাগর রায়।
রজনী জাগিয়া, ঢুলু ঢুলু আঁখি,
লোহিত নয়ান তায়॥
যথায়ে মানিনী, রাই সুবদনী,
কুঞ্জের ভিতরে বসি।
ধীরে ধীরে গিয়া, দেখা দিলা তথা,
নাগর গোকুল-শশী॥
সব সখীগণে, বিরস বদনে,
হেরিয়া নয়ান-কোণে।
কোপ করি কহে, কে বট তুমি হে,
হোথা যাহ কি কারণে॥

পাঠান্তর—(ক) স্থির কর—না ভাবিহ।
(খ) আইসে না আইসে যবে মানবতী হয়।

১। কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ।
নির্বেদচিন্তাখেদাশ্রুমূর্চ্ছানিঃশ্বাসতাদিভাক্॥
(উ. নী.)

২। উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিতা হি সা।
এষা তু রোষনিঃশ্বাসতূষ্ণীম্ভাবাদিভাক্ ভবেৎ॥
(উ. নী.)

পাঠান্তর—(ক) ভিতে—চিত্তে।
(খ) অন্তরসংকোচে—অন্তরে সংকোচ।

নিজ মরিযাদ, রাখিবারে সাধ,
যদি থাকে তব মনে। (ক)
বচন রাখহ, শীঘ্র চলি যাহ,
ফিরিয়া নিজ ভবনে॥
হরি ডরি চিতে, দাণ্ডাইয়া ভিতে,
যোড় করি দুটি কর।
নয়ান-যুগল, করে ছল ছল,
কম্পিত দুটি অধর॥
প্যারী সুবদনী, মানিনী ভামিনী,
হেরিয়া পিয়ার (খ) বেশ।
দ্বিগুণ কোপেতে, ভরি গেলা চিতে,
কহয়ে কিছু শেলেষ॥
আইস আইস পিয়া, এ বেশ করিয়া,
সাজায়া কে দিল তোমা।
বড় সাধ করি, রসিকা নাগরী,
কোন যে সুন্দরী রামা (গ)॥
নয়নে কজ্জল, আলতা সুন্দর,
ভালে পরায়্যাছে ভাল।
দেখাইতে মোরে, আইলা নিশিভোরে,
দেখিনু এখন চল॥
কিবা কায আর, এখানে তোমার,
এখন চলিয়া যাহ।
আমরা দুখিনী, কুরূপা রমণী,
মোদিগে কেনে কান্দাহ॥
শঠের শিখর, তুমি যে নাগর,
তোমারে বিশেষে জানি।
ভালমতে আর, জানিনু তোমার,
ভাল হৈল এবে মানি॥
কুলের গৌরব, রহি গেল সব,
সদয়-হৃদয় বিধি।
কথায় তোমার, না ভুলিব আর,
যাবত জীবনাবধি॥

তবে কর যোড়, কিছু কহে হরি,
বিরস বদন করি।
তোমা বিনে মুঞি, আর জানি নাঞি,
ত্রিজগতে কোনো নারী॥
আলতা সিন্দুর, কোথা ভালে মোর,
কি দেখিয়া কি কহিলে।
তবে বুঝি হবে (ক), ফাগুয়ার গুঁড়ি,
লেগেছে (খ) মোর কপালে॥
পুন প্যারী কহে, বটে বটে অহে,
ধৃষ্টের মুকুটমণি (গ)।
হাথের কঙ্কণ, দেখিতে দর্পণ,
চাহে বা কোন্ নয়নী॥
হেথা হৈতে যাহ, মিছে কেনে কহ,
চাতুরী করিয়া বাত।
তুমি যে আমার, যেমন সুজন,
সকলি হইনু (ঘ) জ্ঞাত॥
চন্দ্রাবলী-সুধা, পান কর গিয়া,
পরম সুখে ভাসিবে।
সব দুখ যাবে, আনন্দ পাইবে,
যুগে যুগে জীয়ে রবে॥

পুন হরি স্তুতি যত করে বারবার।
তত দেখে মানের গৌরব বাঢ়ে আর॥
রসিক নাগর তবে মরম বুঝিয়া।
পীতাম্বর গলে ডারি কাতর হইয়া॥
চরণে ধরিয়া কহে ক্ষম মোরে রাই।
নিশ্চয় কহিনু তোমা বিনে কারু নই॥
দুর্জ্জয় মানের সিন্ধু তরঙ্গে ব্যাপিল।
কৃপা না করিল ধনি ফিরিয়া বসিল॥
নাগর বুঝিয়া (ঙ) যে রাইয়ের অনাদর।
অভিমানে গমন করিলা বনান্তর॥

পাঠান্তর—(ক) নিজ পরিবাদ, থাকে যদি সাধ, রাখিবার তব মনে।
(খ) পিয়ার—প্রিয়ের।
(গ) রামা—বামা।

পাঠান্তর—(ক) হবে—হয়ে।
(খ) লেগেছে—লাগিছে।
(গ) মুকুটমণি—ঠাকুরমণি।
(ঘ) হইনু—হইল।
(ঙ) বুঝিয়া—বুঝিলা।

অথ কলহান্তরিতা[১]।

মান-অন্তে পিয়ার (ক) বিচ্ছেদের সূচন।
অনুতাপে সেই কলহান্তরিতার লক্ষণ॥

তদ্‌যথা—

পিয়ার (খ) বিচ্ছেদে, তাপিত হইয়া,
কুঞ্জ হৈতে নিকশিয়া।
উৎফুল্ল বদন, করয়ে রোদন,
সখীমুখ নিরখিয়া॥
হারে সখি মোর, প্রাণনাথ কোথা,
কোন্ পথে গেল কহ।
আমার পরাণ, রাখহ যদ্যপি,
সেই পথে মোরে লেহ॥
আহা মরি মরি, কমল নয়ানে,
কত বা ঝরিল বারি।
চরণে ধরিয়া, সাধন (গ) কত বা,
কত বা যতন করি॥
মোর মুখে আগি, ফিরে না চাহিনু,
কঠিন হৃদয় মোর।
সে চান্দ বদন, মলিন হেরিয়া,
দয়া না হইল থোর (ঘ)॥
সখী কহে রাই, এ হেন যুগতি (ঙ),
তোমার হইল কেনে।
যারে না দেখিলে, পরাণে মরহ,
তারে মান কি কারণে॥
এখন পোড়হ, বিরহ-আনলে,
মোরা কি করিব বল।
স্বর্ণ ফেলি দিলে, আঁচলেতে গিরা,
মান শিখেছিলে (চ) ভাল॥

পাঠান্তর—(ক) (খ) পিয়ার—প্রিয়ের।
(গ) সাধন—সাধিল।
(ঘ) থোর—মোর।
(ঙ) যুগতি—কুমতি।
(চ) শিখেছিলে—শিখিয়াছ।
১। যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাৎ তপতি কলহান্তরিতা হি সা।
অস্যাঃ প্রলাপ-সন্তাপ-গ্লানি-নিশ্বাসভাদয়ঃ॥
(উ. নী.)

রাই কহে সখি, একে (ক) কৃষ্ণ-হারা,
হইয়া পরাণ যায়।
আর তাহে তোরা, গঞ্জনা-বচনে,
আনল হানিছ প্রায়॥
যাবার সময়, তোরা তো গো সখি,
সভাই এখানে ছিলি।
আমি মৈলে তোরা, ভালবাস নহে,
ফিরায়্যা কেন না রাখিলি॥
তবে সখীগণ, যুগতি করিয়া,
কৃষ্ণ-অন্বেষণে গেলা।
বেতসীর কুঞ্জ, হইতে তখন,
নাগর আনিঞা দিলা॥

[কবিত্ত হিন্দী]

তেজো মৃগাক্ষী তোতো পুজি পুজি দেয়ন কোঁ
কান্তপদ সেওন কো সাধন মরতু হেয়।
সোই কাহ্নদাসনকী পায়নকে ধুর নেয়
নেয় কীয়োজু মিনতি মেরে জীয়তে ন টরতু হেয়॥
দশন তনকা করি হাহা খায় ফেরি ফেরি
নওল চিতয়ে অব নয়নু ঝুরতু হেয়।
হরি মেরি বামতামে বাম ভেয়ো ভাগ আনি
কাহ্ন বিন মান হিয়ে আগ সিবরতু হেয়॥

অথ স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা-লক্ষণ[১]।

নায়িকার অধীন-মতে বেশাদি রচন।
নায়ক করয়ে স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা-লক্ষণ॥
আলুয়াইয়া কেশ (খ) করে বেণীর রচন।
কুচযুগে করে পত্রাবলির লিখন॥
চিবুকে কস্তুরী-বিন্দু নাসায় তিলক।
গলে মণিহার দেয় চরণে যাবক॥

পাঠান্তর—(ক) একে—এবে।
(খ) কেশ—কেশ।
১। স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা।
সলীলারণ্যবনক্রীড়াকুসুমানচয়াদিকৃৎ॥

চুম্ব আলিঙ্গন করে আনন্দিত হিয়া (ক)।
আজ্ঞাকারিবত থাকে কর পসারিয়া॥

অথ প্রোষিতভর্ত্তৃকা[১]।

প্রোষিতভর্ত্তৃকা যার প্রিয় দূরদেশ।
বিরহিণী অঙ্গ মলিন নাহি বান্ধে কেশ॥
চিন্তায় আকুল দীনমনা (খ) অঙ্গ ক্ষীণ।
হায় হায় হুতাশ (গ) করয়ে রাত্রি দিন॥

তদ্‌যথা—

হরি গেল মধুপুরী আমারে ছাড়িয়া।
প্রবোধিয়া গেলা কালি আসিব বলিয়া॥
না আইল প্রিয় চিত রহিল আশায়।
না জানি সে কালের আর কদিন আছয়॥
নখ গেল দিন লিখি, আঁখি পথ হেরি।
চরণ অবশ ঘর-বাহির করি করি॥
চন্দ্রের কিরণ বিষ সম জ্ঞান হয়।
কোকিলের ধ্বনি শেল হানয়ে (ঘ) হৃদয়॥
কি করিব হারে সখি কোথায় যাইব।
কোথা গেলে মোর প্রাণনাথ বন্ধু পাব॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা স্ত্রী অনেক প্রকার।
শ্রীল রাধিকাতে বৈসে সকল বিকার॥

অথ দূতী

স্বয়ংদূতী আপ্তদূতী দুই ভেদ হয়।
শুনহ তাহার রীত ভেদের বিষয়॥

পাঠান্তর—(ক) হিয়া হৈয়া।
(খ) দীনমনা—হীনমনা।
(গ) হায় হায় হুতাশ—হা হুতাশ সতত।
(ঘ) হানয়ে—প্রবেশে।

১। দূরদেশং গতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা।
প্রিয়সংকীর্ত্তনং দৈন্যমস্যাস্তানবজাগরৌ।
মালিন্যমনবস্থানং জাড্যাচিন্তাদয়ো মতাঃ॥
(উ. নী.)

অথ স্বয়ংদূতী[১]।

অতি-অনুরাগে লাজ ত্যজি প্রিয়সনে।
মিলিবারে চাহে স্বাভিযোগের কারণে (ক)॥
স্বয়ংদূতী সেই স্বয়ং দূত্যপনা করি।
প্রিয়সনে মিলে গিয়া আপনি সুন্দরী॥
তাহাতে যে তিন ভেদ বাক্য কায় নয়ন (খ)।
বাক্যের অনেক ভেদ না যায় বর্ণন॥

অথ আঙ্গিক।

অঙ্গুলের ধ্বনি করে মুখে দেয় হাথ।
অন্যমনা ভুলবাক্য কহে সখীসাথ॥
চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলে ধরণী খোদয়।
কর্ণ-কণ্ডূয়ন করি স্তন দরশায়॥
সখীর কণ্ঠেতে ধরি করে আলিঙ্গন।
পুনর্ব্বার ছাড়ি করে তাড়ন-ভর্ৎসন॥
চঞ্চল-নয়ানে (গ) পুন ইথি উথি চাহে।
স্তম্ভপ্রায় রহে অকারণ বাক্য কহে॥
অধর দংশন করে সখীর কর্ণেতে।
মিছামিছি কহে কথা ধরিয়া কণ্ঠেতে॥

অথ চাক্ষুষ।

ঈষত নয়নে হেরি বদন ফিরায়।
হাসি হাসি চাহি পুন নয়ান (ঘ) ঢুলায়॥
মুদিত নয়ান পুন আধ আধ হেরি।
কটাক্ষ করয়ে বামনয়ন পসারি॥

পাঠান্তর—(ক) কারণে—বিধানে।
(খ) নয়ন—মন।
(গ) চঞ্চল-নয়ানে—চপল নয়নে।
(ঘ) চাহি পুন নয়ান—চাহে পুন বদন।

১। অত্যোৎসুক্যকৃতদ্‌ব্রীড়া যা চ রাগার্তিমোহিতা।
স্বয়মেবাভিযুঙ্‌ক্তে সা স্বয়ংদূতী ভজ্ঞঃ স্মৃতা॥
(উ. নী)

২। স্বাভিযোগা ইতি প্রোক্তাশ্চেদমী বুদ্ধিপূর্ব্বকাঃ।
স্বভাবজাস্তু ভাবীজৈরনুভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
[প্রিয়সন্দর্শনাদি হেতু নায়িকার স্বভাবতঃ উৎপন্ন কায়িক, বাচিক ও চাক্ষুষ বিশেষ বিশেষ বিকারের নাম অনুভাব, আর ঐগুলি প্রিয়মিলনাভিলাষে স্বেচ্ছাকৃত হইলে তাহার নাম স্বাভিযোগ।]

অথ আপ্তদূতী[১]।

অতি অন্তরঙ্গা মন বুঝি কার্য্য করে।
প্রিয়ংবদ চতুর আপ্তদূতী কহে তারে॥
সেই আপ্তদূতী হয় তিন-প্রকারিণী।
অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা, পত্রীহারিণী॥

তত্র অমিতার্থা।

দোঁহ-মনকথা বুঝি শীঘ্র যে মিলায়।
সুন্দর চতুর অমিতার্থা সে কহয়॥

তদ্ যথা—

প্রিয়ের সাক্ষাতে দূতী যাইয়া কহয়।
কেমন হে তুমি তব কঠিন-হৃদয়॥
কামময় বিষাক্ত কটাক্ষশর হানি।
বিন্ধিলে হৃদয়েতে অবলা কমলিনী॥
তাহাতে ব্যথিত হৈয়া লাজ-ভয় তেজি।
বনে বনে ফিরয়ে তোমার প্রেমে মজি॥
ত্বরিতে চলহ রাখ অবলার প্রাণ।
বিরহ-অনল হৈতে কর পরিত্রাণ॥

• • •

অথ পত্রহারী।

পত্রী লইয়া যেঁহো জানায় সন্দেশ।
ভর্ৎসনের সহ কহে (ক) বিনয়-বিশেষ॥
অনেক কৌশল করি আনয়ে নাগর।
পত্রহারী দূতী ঐছে পরম চতুর॥

অথ উদ্দীপন-বিভাব লক্ষণ[১]।

যাহাতে প্রতিম ভাব (ক) হৃদে উপজয়।
উদ্দীপন ভাব সেই জানিহ নিশ্চয়॥
দোঁহ গুণ রূপ আর চরিত্র ভূষণ।
এই সব উদ্দীপন-বিভাবের গুণ॥

তত্র গুণ।

কায়মনবাক্য তিন গুণ অসাধার।
তার মধ্যে কায়-গুণ অনেক প্রকার॥
বয়েস লাবণ্য রূপ (খ) সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য।
অভিরূপ কোমলতা সাত কায়-কার্য্য॥

বয়েস।

বয়েস প্রকার চারি পরম-মোহন।
বয়ঃ-সন্ধি নবযুবা সুব্যক্তযৌবন॥
পূর্ণযৌবন আর এ চারি প্রকার।
পরম মধুর আস্বাদয়ে বিধি হর॥

বয়ঃসন্ধি[২]।

শৈশবতা তরুণতা একত্র মিলয়।
লাজ চপলতা শোভা গুণ প্রকাশয়॥

নবযৌবন।

সৌন্দর্য্য-বিশেষ বক্ষস্থলে প্রকাশয়।
দৃষ্টের (গ) চঞ্চল মন্দ হাস্য মুখে হয়॥
সদাই আনন্দভাব কৌতুক বাঢ়য়।
নবযৌবনের এই লক্ষণ কহয়॥

ব্যক্তযৌবন।

চক্ষের দুই ভাগ পুষ্ট অঙ্গ সুচিক্কণ।
ত্রিবলী প্রকট হয় বেকত যৌবন॥

পাঠান্তর—(ক) কহে—করে।

১। ন বিস্রম্ভস্য ভঙ্গং যা কুর্য্যাৎ প্রাণাত্যয়েঽপি।
স্নিগ্ধা চ বাগ্মিনী চাসৌ দূতী স্যাদ্ গোপসুভ্রুবাম্।
অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারীতি সা ত্রিধা॥
আর্ত্তেঙ্গিতেন যা ভাবং দ্বয়োরেকতরস্য বা।
উপায়ৈর্মেলয়েৎ তৌ যাব অমিতার্থা ভবেদিয়ম্॥
বিন্যস্তকার্য্যভারা স্যাদ্ দ্বয়োরেকতরেণ যা।
যুক্ত্যা চ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে॥
সন্দেশমাত্রং যা যুনোর্নয়েৎ সা পত্রহারিকা॥

• • • এইখানে নিসৃষ্টার্থা দূতী অর্থাৎ নায়ক বা নায়িকার নিয়োগক্রমে মিলন ঘটনকারিণী দূতীর বর্ণনা বাদ পড়িয়াছে।

পাঠান্তর—(ক) যাহাতে প্রতিম ভাব—যাহে প্রিয়তম ভাব।
(খ) রূপ—গুণ।
(গ) দৃষ্টের—দৃষ্টির।

১। উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে।
(অর্থাৎ, নাম, গুণ চরিত্র, বেশভূষা, মলয়, পবন ইত্যাদি।)

২। বাল্য-যৌবনয়োঃ সন্ধি বয়ঃসন্ধিরিতীর্য্যতে॥

পূর্ণযৌবন।

নিবিড় নিতম্ব খীণ কটি অঙ্গে জ্যোতি।
পুষ্ট কুচ উরুযুগ কদলীর ভাতি॥
পূর্ণ যৌবন কৃষ্ণচন্দ্রে না সম্ভবে।
কোন কোন প্রেয়সীর গণেতে উদ্ভবে॥

লাবণ্য১।

মণি-মুক্তা জিনি অঙ্গে করে ঝলমলাট।
যাহার বৈভবে হয় মন্মথের নাট॥

রূপ২।

সুস্নিগ্ধ (ক) উজ্জ্বল বর্ণ যাহার পরশে।
নারীগণ মূর্চ্ছা যায় মদন-হুতাশে॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-আদি ইত্যাদি করিয়া।
কিঞ্চিত কিঞ্চিত ভেদ জানে রসধিয়া॥
বিভাব-লক্ষণ কিছু সংক্ষেপে কহিল।
লালদাসের বুদ্ধে যাহা উপজিল॥

অথ অনুভাব-লক্ষণ৩।

অন্তরের ভাব বাহ্যদেশ (খ) প্রকাশয়।
হরিপ্রেমরসে সেই অনুভাব হয়॥
অলঙ্কার উদ্ভাস্বর বাচিক এ তিন।
প্রকারে অনুভাব-রস শৃঙ্গারের চিন॥

পাঠান্তর—(ক) সুস্নিগ্ধ—সুগন্ধি।
(খ) বাহ্যদেশ—বাহ্যদেহ।

১। মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে॥

২। অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ভূষণাদিনা।
যেন ভূষিতবদ্ভান্তি তদ্রূপমিতি কথ্যতে॥

[ভূষণ ছাড়াও অঙ্গসমূহের ভূষিতবদ্ভাবের নাম রূপ। রূপ, সৌন্দর্য্য, অভিরূপতা, মাধুর্য্য ও মার্দ্দবের মধ্যে একটু একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সৌন্দর্য্য বলিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সন্নিবেশ-সৌষ্ঠব (সুন্দর গড়ন); অভিরূপতা বলিতে নিকটস্থ বস্তুকেও সুন্দর করিয়া তোলার ক্ষমতা, মাধুর্য্য বলিতে রূপের অনির্ব্বচনীয়তা এবং মার্দ্দব বলিতে অতি কোমল বস্তুরও স্পর্শ সহিবার অক্ষমতা বুঝায়।]

৩। অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ।

তত্র অলঙ্কার১।

যৌবনের তেজে উপজয়ে অলঙ্কার।
বিংশতি প্রকার সেই আশ্চর্য্য বিকার॥
প্রিয়ে তাহা হেরি ভাসে সুখের সাগরে।
রসিকা রমণী ধনি রাধাতে সঞ্চারে॥
অঙ্গজ প্রথম তিন ভাব-হাব-হেলা।
আপন-অধীন তিন রসময় লীলা॥
শোভা কান্তি দীপ্তি মাধুর্য্যভাব আর।
প্রাগল্ভ্য ঔদাস্য (ক) ধৈর্য্য-সপ্ত অলঙ্কার।
অযত্নজ স্বতঃসিদ্ধ করয়ে প্রকাশ।
যাহা হেরি মাধবের পরম উল্লাস॥
লীলা বিলাস বিভ্রম কিলকিঞ্চিত।
বিচ্ছিত্তি বিব্বোক মোট্টায়িত কুট্টমিত॥
ললিত বিকৃতি আর এই দশ প্রকার।
স্বভাবজ, বিংশতি এই তো অলঙ্কার॥

অথ ভাবলক্ষণ২।

উজ্জ্বলের প্রসঙ্গে পহিলা (খ) কহি ভাব।
ক্ষোভিত করয়ে চিত্ত চঞ্চল স্বভাব॥

তদ্‌যথা—

রতির প্রসঙ্গে অতি-লজ্জাশীল-মতি।
নিকটে নায়ক যায় সভয় (গ) প্রকৃতি॥

পাঠান্তর—(ক) ঔদাস্য—ঔদার্য্য।
(খ) পহিলা—পহিলে বা প্রথমে।
(গ) সভয়—সুন্দর।

১। যৌবনে সত্ত্বজাস্তাসামলঙ্কারাস্তু বিংশতিঃ।
উদ্যত্যদ্ভুতা কান্তে সর্ব্বথাভিনিবেশতঃ॥
ভাবো হাবশ্চ হেলা চ প্রোক্তাস্তত্র ত্রয়োঙ্গজাঃ।
শোভা কান্তিশ্চ দীপ্তিশ্চ মাধুর্য্যঞ্চ প্রগল্ভতা॥
ঔদার্য্যং ধৈর্য্যমিত্যেতে সপ্তৈব স্যুরযত্নজাঃ।
লীলা বিলাসো বিচ্ছিত্তির্বিভ্রমঃ কিলকিঞ্চিতম্।
মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিব্বোকো ললিতং তথা।
বিকৃতং চেতি বিজ্ঞেয়া দশ তাসাং স্বভাবজাঃ॥
(উ. নী.)

২। নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাব প্রথমবিক্রিয়া।
অথবা
চিত্তস্যাবিকৃতিঃ সত্ত্বং বিকৃতেঃ কারণে সতি।
তত্রাদ্যাবিক্রিয়া ভাবো বীজস্যাদিবিকারবৎ॥

অঙ্গে হস্ত দিতে অঙ্গ বসন ঝাঁপয়।
সখীর অঞ্চল ধরে ছাড়িয়া না দেয়॥
সখী কহে তুমি তো হে রসিকশেখর।
নবীন বয়স হয় সখীর আমার॥
রসের বিভেদ নাহি জানয়ে রমণী।
এতেক চঞ্চল কেনে হও যে আপনি॥
ধীরে ধীরে সর্ব্বকার্য্য সাধিবারে হয়।
অসাধনে কোনো কার্য্য হস্তে না মিলয়॥

অথ হাব১।

ভাব হৈতে হাব কিছু অধিক-প্রকাশ।
গ্রীবা বক্রে থাকে, কিন্তু নয়ন-বিকাশ॥

হেলা ও শোভা২।

হাব হৈতে হেলা আরো কিছু প্রকাশয়।
শৃঙ্গার বিষয়ে দেহে শোভা প্রকাশয়॥

তদ্‌যথা—

সখীগণ বেঢ়ি, মুচকি হাসয়ে (ক),
বদনে বসন দিয়া।
কেনে লো সখিরি, বদন তোমার,
মলিন কিবা লাগিয়া॥
আনছান (খ) বেশ, অঙ্গেতে অলস,
কাঁপিছে কুচযুগল।
স্বেদ বহি যায়, নয়ান ঘুমায়,
উঠিতে নাহিক বল॥
অঙ্গে রোমাবলি, উকসি উঠিছে,
হৃদে দেখি নখ-চিন (গ)।
না জানিঞা কিবা, বিপদে পড়িলে,
শরীর হয়েছে খীণ॥

তাহা শুনি ধনি, সুধাংশু বদনী,
লাজেতে ঝাঁপিল মুখ।
সে শোভা দেখিয়া, রসিক নাগর,
বড়ই পাইল সুখ॥

সেই শোভা জানিহ যে পরম সোহাগ।
রসিক নাগর জানে অতি রসভাগ॥

অথ কান্তি১।

শোভা হৈতে হয় যবে মদনপ্রভাব।
কান্তি কহায় সেই শ্রেষ্ঠ রসভাব॥

অথ দীপ্তি২।

দেশ-কাল-বয়ভোগে কান্তি যে উজ্জ্বল।
তাহাতে বিস্তারে দীপ্তি শরীরে প্রবল॥

অথ মাধুর্য্য৩।

নানা রঙ্গ-ভঙ্গি যবে প্রিয়-সনে করে।
অঙ্গে হেলাহেলি করি কৌতুকে বিহরে॥
পরম মাধুর্য্য সেই সর্ব্ব-রস-সীমা।
ভাব-অলঙ্কার মধ্যে পরম-গরিমা॥

অথ প্রগল্‌ভতা৪।

সঙ্কোচ তেজিয়া প্রিয় সনে ক্রীড়া করে।
নানারসরঙ্গে প্রগল্‌ভতা বলি তারে॥
প্রিয় সঙ্গে বদাবদি হাথাহাথি করি।
উচ্চ বাক্য কহয়ে করিয়া জোরাবরি॥
পরিহাস-বাক্যেতে করয়ে পরাভব।
ভর্ৎসনা করয়ে কিছু কহি মিষ্ট রব॥
অঙ্গে অঙ্গহেলা (ক) দিয়া বদন চুম্বয়।
মোহন মদনমোহে পুলকিত হয়॥

পাঠান্তর—(ক) হাসয়ে—কহয়ে।
(খ) আনছান—আলুথালু।
(গ) নখ-চিন—নখচিহ্ন।

১। গ্রীবা-রেচকসংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদিবিকাশকৃৎ।
ভাবাদীষৎ প্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে॥
২। হাব এব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তঃ শৃঙ্গারসূচকঃ।
সা শোভা রূপ ভোগাদ্যৈ র্যৎ স্যাদঙ্গবিভূষণম্॥

পাঠান্তর—(ক) অঙ্গহেলা—অঙ্গ হেলান।

১। শোভৈব কান্তিরাখ্যাতা মন্মথাপ্যায়নোজ্জ্বলা।
২। কান্তিরেব বয়োভোগদেশকালগুণাদিভিঃ।
উদ্দীপিতাতিবিস্তারং প্রাপ্তা চেদ্দীপ্তিরুচ্যতে॥
৩। মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা।
৪। নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্‌ভতা।

অথ ঔদার্য্য[1]।

কামরসে (ক) হরি যবে করয়ে মিনতি।
গমন করয়ে প্যারী ঔদার্য্যের রীতি॥

অথ ধৈর্য্য[2]।

প্রিয়ের বিচ্ছেদে যদ্যপি হয় বহু দুখ।
তথাপিহ প্রিয়সুখে মানে নিজ সুখ॥
অতএব সুখে দুখে সমান থাকয়।
ধৈরজ করিয়া তাহে রসিকে কহয়॥

অথ লীলা[3]।

বিপর্য্যয় বেশ করি প্রিয়ের সহিত।
বিহার করয়ে বিপর্য্যয় রসরীত॥
চূড়া বংশী বনমালা পীতাম্বর পরি।
মৃগমদে গৌর অঙ্গ শ্যামবর্ণ করি॥
হাস্য পরিহাস অনুকরণ করয়।
লীলা-অলঙ্কার ইহা রসিকে জানয়॥

অথ বিলাস[4]।

প্রিয় প্রেয়সীর মুখ-চন্দ্রিকা হেরিয়া।
অঙ্গে অঙ্গে পুলকিত আনন্দিত হিয়া (খ)॥
অনিমিখে চাহিয়া করিয়া রহে ভঙ্গি।
ঈষত লজ্জিত তাহে প্যারী রসরঙ্গি॥
হাসে সহচরীগণ বদন ঝাঁপিয়া।
রসজ্ঞ কহয়ে ইহা বিলাস করিয়া॥

অথ বিচ্ছিত্তি[5]।

অল্প-বিশেষ ভূষা শ্রীঅঙ্গে পরিতে।
পরম অদ্ভুত শোভে হেরি মাতে যাথে॥
মাধবীলতার গুচ্ছা সিঁথিতে শোভয়।
শ্রুতিমূলে আম্রের মুকুল লটকায়॥

অন্য অন্য ঋতু কিংবা বসন্ত-উচিত।
কিংবা অলংকারেতে বিচ্ছিত্তি ভাব-রীত॥

অথ বিভ্রম[1]।

প্রিয়ের মিলন আশে উৎকণ্ঠিত মন।
প্রেমাবেশে ভুলিয়া যে পরয়ে ভূষণ (ক)॥
চরণের ভূষা করে, করের ভূষণ।
চরণে পরিয়ে শীঘ্র করয়ে গমন॥
বসন-অঞ্জন-আদি বিপর্য্যয় হয়।
ভাব-অলংকার ইহ বিভ্রম কহয়॥

অথ কিলকিঞ্চিত[2]।

গর্ব্ব অভিলাষ আর ঈষত রোদন।
কিঞ্চিত হাস্যের সহ অসূয়া কোপন॥
একত্রে উদয় হয় হাস্যের সহিত।
তবে সেই হয় কিলকিঞ্চিতের রীত॥ (খ)

তদ্‌যথা—

এক দিন প্যারী, রাধিকা সুন্দরী,
যমুনা-সিনানে যায়।
পথের মাঝারে, নাগর হইয়া (গ),
বাহু পসারিয়া ধায়॥
চুম্বন করিয়া, কুচে কর দিতে,
ধনি মুখ অঙ্গ মোড়ি।
যাও যাও করি, করে কর ঠেলে,
ঝমকে কঙ্কণ চুড়ি॥

পাঠান্তর—(ক) কামরসে—কামশরে।
(খ) হিয়া—হৈয়া।
১। ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাগতং বুধঃ।
২। স্থিরা চিত্তোন্নতির্যা তু তদ্ ধৈর্য্যমিতি কীর্ত্ত্যতে।
৩। প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ।
৪। গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্॥
৫। আকল্পকল্পনাল্পাপি বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ।

পাঠান্তর—(ক) ভূষণ—বসন।
(খ) একত্রে উদয়. রীত—একত্র উদয় হয় কিলকিঞ্চিতের রীত। (এক পঙ্‌ক্তি)। 'হাস্যের' স্থলে 'হর্ষের' সুসঙ্গত হয়।
(গ) হইয়া—যাইয়া।
১। বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ।
বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ॥
অথবা
অধীনস্যাপি সেবায়াং কান্তস্যানভিনন্দনম্।
বিভ্রমো বামতোদ্রেকাৎ স্যাদিত্যাখ্যাতি কশ্চন॥
২। গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সংকরীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্॥

নয়ন ভ্রূকুটি, করিয়া চাহয়ে,
রোদনের সহ হাস।
গর্ব্ব অভিলাষ, আদি যে করিয়া,
সাতমত পরকাশ॥
তাহা তো হেরিয়া, রসিক নাগর,
ভাসয়ে সুখসাগরে।
অঙ্গ পুলকিত, সখীর সহিত,
তাহার বাখান করে॥

অথ মোট্টায়িত[1]।

প্রিয়ের স্মরণ করি ভাবেতে ভাবিত।
মিলনে যে অভিলাষ সেই মোট্টায়িত॥

তদ্‌যথা--

প্রিয়ের মিলন, লাগিয়া সুন্দরী,
রস-অভিলাষে ভরি।
সময় নিরখে, উৎকণ্ঠ হইয়া,
সখীর বদন হেরি॥
খেণে খেণে ধনি, ঝমকি উঠিয়া,
বাহির যাইয়া দেখে।
ক্ষণেক পিয়ার, সহিত বিহার,
মনোরথ করি থাকে॥
খেণে অঙ্গ মুড়ি, আলিস তেজয়ে,
পড়য়ে সখীর কোলে।
নিন্দ্রা যাও সখি, প্রাণনাথ যথা,
আমারে সদাই বলে॥

অথ কুট্টমিত[2]।

কুচে কর দিতে প্রিয়ে ধনি অঙ্গ মোড়ি।
না না না না কহে স্তব করে কর যোড়ি॥
বাহ্যে আহা উহু করে বেদনার ন্যায়।
মনে অভিলাষ ইহ কুট্টমিত হয়॥ (ক)

তদ্‌যথা—

ক্ষেম হে নাগর, ঠেঁটাই (ক) না কর,
কর যুড়ি তব পায়।
পুনঃপুন কর, চালাহ আমার,
হৃদয়ে কিবা আছয়॥
তোমার কি কিছু, থাতি ধন আছে,
লইতে আইস তাহা।
কিংবা কিছু খাদ্য, লাড়ু কি মোদক,
আছয়ে তা কর চাহা॥
হুরু যাহ মেনে, বেদনা লাগয়ে,
কাঁচলি ছিঁড়িয়া গেল।
টুটি (খ) গেল হার, শিল্প যে তোমার,
কস্তুরী চিত্র মোছিল (গ)॥
আহা উহু মরি, কিঞ্চিত তোমার,
হৃদয়ে নাহিক দয়া।
এখন ক্ষমহ, পরে যাহা কহ,
তুষিব তোমারে দিয়া॥

অথ বিব্বোক[1]।

অনাদর করি মান-গরবে করে রোখ।
তাহারে কহিয়ে যে অলঙ্কার বিব্বোক॥

তদ্‌যথা—

কুঞ্জে বসি প্যারী কৃষ্ণ-সহ সখী-সঙ্গে।
কৌতুক করিয়া কৃষ্ণরচিত (ক) প্রসঙ্গে॥
হাসিয়া হাসিয়া সখীগণেরে কহয়।
এই যে কালিয়া ইঁহার কুটিল আশয়॥
অন্য রমণীর সনে বিহার করিয়া।
তোমা বই কারু নই কহেন আসিয়া॥
ইঁহার প্রেয়সীগণে দেখ্যাছো গো তোরা।
পরমরূপসী নাকি সুরসিকাবরা॥

পাঠান্তর—(ক) মনে বাড়ে অভিলাষ কুট্টমিত হয়।
১। কান্তস্মরণবার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবতঃ।
প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমুদীর্য্যতে॥
২। স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ॥

পাঠান্তর—(ক) ঠেঁটাই—ঢিটাই।
(খ) টুটি—ছিণ্ড।
(গ) মোছিল—মিটিল।
(ঘ) কৃষ্ণরচিত—কৃষ্ণচরিত।
১। ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ॥

এতেক কহিতে সেই নয়ানের ভঙ্গি।
হেরিয়া শুনিঞা আর সেই বাক্য-ব্যঙ্গি (ক)॥
আনন্দে মগন কৃষ্ণ নিজ কণ্ঠহারে।
খুলি পরাইলা প্যারী-গলে নিজ করে॥
প্যারীজী সে হার ধরি নাসায় শুঙ্গিয়া।
মোর কায নাঞি বলি নাক সিঁটকিয়া (খ)॥
কহয়ে ইহাতে তব প্রেয়সীগণের।
অঙ্গগন্ধ আছয়ে কুঙ্কুম যে স্তনের॥
তোমারে সে ভাল লাগে, মোরে নাহি ভায়।
এতো বলি হার খুলি টানিঞা ফেলায়॥
কৃষ্ণচন্দ্র তাহা দেখি আনন্দিত হৈলা।
বাহ্যে কিছু সংকোচিত ভঙ্গি প্রকাশিলা॥

অথ ললিত[1]।

প্রিয়সনে সন্দর্শনে যে অঙ্গভঙ্গিমা।
ললিত কহয়ে তারে রসময়সীমা॥

তদ্ যথা—

প্রিয় সনে দর্শন হইতে হঠাৎকার।
দাণ্ডায় সুভঙ্গি (গ) করি অতি চমৎকার॥
আড়ঘোমটা টানি ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া।
চাহয়ে প্রিয়ের পানে ঈষত হাসিয়া॥
বামপদে অঙ্গভার অর্পিয়া দাণ্ডায়।
অঙ্গের সৌগন্ধে (ঘ) অলিকুল বেঢ়ি ধায়॥

অথ বিকৃতি[2]।

কহিতে বিরল কথা সলজ্জিত হয়।
ক্রীড়া-উপযুক্ত আদি বিকৃতি কহয়॥

পাঠান্তর—(ক) বাক্য-ব্যঙ্গি—বাক্য-ভঙ্গি।
(খ) সিঁটকিয়া—সেকোটিয়া।
(গ) সুভঙ্গি—ভ্রূভঙ্গি।
(ঘ) সৌগন্ধে—সৌরভে।

১। বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্॥
২। হ্রীমানের্ষ্যাদিভির্যত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্।
ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥

অথ উদ্ভাস্বর[1]।

ক্রীড়ারসে মনোবৃত্তে অলস তেজয়।
জৃম্ভা ত্যাগ করে শ্বাস নাসায় বহয়॥
এ সকল অনুভাবে শোভা যে উদয়।
উদ্ভাস্বর নাম সেই লালদাস কয়॥ †

অথ সাত্ত্বিক লক্ষণ[2]।

প্রিয়েতে যে রতিপ্রেমে উপজে বিকার।
সাত্ত্বিক কহিয়ে তারে সে অষ্ট-প্রকার॥
স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ আর স্বরভেদ।
কম্প বৈবর্ণ্য (ক) অশ্রু প্রলয় বিভেদ॥

অথ সঞ্চারী[3]।

রতির (খ) বিকারে হয় তেত্রিশ যে ভাব।
স্থায়ী হৈতে সঞ্চারে সঞ্চারী অনুভব॥

পাঠান্তর—(ক) বৈবর্ণ্য—বিবর্ণ।
(খ) রতির—প্রেমের।

† এখানে ১২ রকমের বাচিক অনুভাবের কথা বলা হয় নাই। সেগুলি আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দ্দেশ, ব্যপদেশ।

১। উদ্ভাসন্তে স্বধাম্নীতি প্রোক্তা উদ্ভাস্বরা বুধৈঃ।
নীব্যুত্তরীয়ধম্মিল্ল স্রংসনং গাত্রমোটনম্।
জৃম্ভা ঘ্রাণস্য ফুল্লত্বং নিশ্বাসাদ্যশ্চ তে মতাঃ॥
২। কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্ বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ।
তে স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাঃ* স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥
(ভ. র. সি.)
* স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ (সা. দ.)।
৩। অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ।
বিশেষেণ ভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি॥
বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ।
সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে॥
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যম্বুনিধাবিব।
ঊর্ম্মিবদ্ বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাং চ তে॥
(ভ. র. সি.)

৩৩টি সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য বা জড়তা, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি বোধ।

নির্ব্বেদ বিষাদ আর বিনীতি-দৈন্যভাষ।
দুর্ব্বলতা শ্রম (ক) মদ গর্ব্ব শঙ্কা ত্রাস॥
আবেগ উন্মাদ অপস্মার ব্যাধি প্রায়।
মোহ জাড্য মৃতি (খ) লাজ অলসতা হয়॥
বিতর্ক চিন্তা আর ঔৎসুক্য (গ) সুমতি।
স্মৃতি ঔগ্র্য অমর্ষ অসূয়া সুপ্তি ধৃতি॥
চপলতা নিদ্রা আর নিশি-জাগরণ।
ভাবের গোপন অবহিত্থা হর্ষ মন॥
এই যে তেত্রিশ ভাব মিলি রস হয়।
প্রত্যেকে বর্ণিতে অতি পুস্তক বাড়য়॥
সঞ্চারী মিলিয়া ব্যভিচারীর উদয়।
সকলের মূল রতি স্থায়ী ভাব হয়॥

অথ স্থায়িভাব লক্ষণ[১]।

স্থায়ী যে শৃঙ্গার রসে তিন মত হয়।
তিন ধামে (ঘ) ব্যক্ত সেই তিন (ঙ) গুণোদয়॥
সমর্থা, সমঞ্জসা আর সাধারণী।
মধুর রতির শুন অপূর্ব্ব কাহিনী॥
কুব্জার সামান্য রতি সাধারণী তেঁহো।
দ্বারকা-মহিষীগণ সমঞ্জসা যেঁহো॥
ব্রজ-গোপীগণের সমর্থা রতি হয়।
অতি চমৎকার শুকদেব প্রশংসয়॥
সম্ভোগেচ্ছাময়ী আত্মসুখের তাৎপর্য্য।
সাধারণী লক্ষণ সাধয়ে নিজ কার্য্য॥

স্বকীয়া মহিষীগণে নিজ নিজ কাম।
অলপ বাসনা যাথে সমঞ্জসা নাম॥
সমর্থ (ক) শ্রীব্রজগোপী কামগন্ধহীন।
প্রিয়-সুখ-তাৎপর্য্য শুদ্ধপ্রেম-চিন॥
তাহাতে প্রণয় মান স্নেহ রাগ অনুরাগ (খ)।
মহাভাব জন্মে যথা ইক্ষু রসভাগ॥
ক্রমে যথা জন্মে গুড় শর্করা মিছরি।
তেমতি বাড়য়ে প্রেম-রসের মাধুরী॥

অথ প্রেম-লক্ষণ[১]।

অনেক বিপদে মন কিঞ্চিত না টলে।
প্রেমের লক্ষণ সেহ সাধু শাস্ত্রে বলে॥

অথ স্নেহের লক্ষণ[২]।

সেই প্রেম পরিপাক হৃদয়েতে হয়।
স্নেহ নাম ধরি সুখ অধিক বাড়য়॥
স্নেহের স্বভাব হেরি আশা না পুরেয়।
উৎকণ্ঠিত চিত্ত সদা বিষয় না ভায়॥
সেই স্নেহ দুই মত ঘৃত-মধু প্রায়।
মধু সদা দ্রব রহে, ঘৃত জমি যায়॥
সহজে সুদৃশ্য মধু অধিক আস্বাদ।
ঘৃতের মধুর মতান্তর কিছু ভেদ॥
মধু-স্নেহ শ্রীরাধার, চন্দ্রাবলী ঘৃত।
অতেব দৃষ্টান্ত হয় বিশেষ সম্মত॥

অথ মান-লক্ষণ[৩]।

স্নেহ-পরিণামে তবে মান নাম হয়।
বক্রগতি শোভা হয়ে রস সুখময়॥

পাঠান্তর—(ক) শ্রম—বিভ্রম
(খ) মৃতি—মৃত্যু।
(গ) ঔৎসুক্য—উৎসুক।
(ঘ) ধামে—নামে।
(ঙ) তিন—রতি।

১ স্থায়ী ভাব বলিতে রসোৎপত্তির হেতুভূত হৃদয়ের রতি, হাস, শোক, হর্ষ ক্রোধ ইত্যাদিকে বুঝায়। শৃঙ্গার রস রতি হইতে সঞ্জাত।

অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ যো ভাবান্ বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে॥
(ভ. র. সি.)
রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেত্থম্ অষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোঽপি চ॥
(সা. দ.)
স্থায়ী ভাবোঽত্র শৃঙ্গারে কথ্যতে মধুরা রতিঃ।
(উ. নী.)

পাঠান্তর—(ক) সমর্থ—সমর্থা।
(খ) স্নেহ রাগ অনুরাগ—স্নেহ অনুরাগ।

১। সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥
(উ. নী.)
২ আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনঃ।
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে॥
৩। স্নেহস্তূৎকৃষ্টতাব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কথ্যতে॥

অথ প্রণয়-লক্ষণ[১]।

মান-পরিপাকেতে বিশ্বাস মিত্রবৃত্তি।
সখ্য দুই ভাত (ক) হয়ে সুখের উন্নতি॥
প্রণয় বলিয়া তবে (খ) হয়ে তো আখ্যান।
প্রণয়ের পরিপাকে রাগের লক্ষণ॥

অথ রাগ[২]।

বহু যে দুঃখেতে সুখ করিয়া মানয় (গ)।
ঈষত না টলে মন রাগ সেই হয়॥

অথ অনুরাগ[৩]।

প্রিয়-মুখকমল যে যখন দেখয়ে।
নূতন নূতন বুদ্ধি প্রতিক্ষণে হয়ে॥
দেখিয়াও দেখি নাই মনে উপজয়।
তৃপ্তি নাহি হয় অনুরাগের বিষয় (ঘ)॥

যথা—

সখীর সহিত, কহয়ে সুন্দরী,
কিশোরী অনুরাগিণী।
কি করিব সখি, কহ না উপায়
কেমন করে পরাণি॥
এক তিল প্রিয়- বদন-মাধুরী,
না দেখিলে প্রাণে মরি।
হেরিয়াও মোর, না পূরয়ে আশা,
বাসনা নয়ানে ভরি॥
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, নৌতুন যে (ঙ) হেরি,
যেন কভু দেখি নাঞি।
কি দিয়া বান্ধিল, পরাণ আমার,
ভাবিয়া কিছু না পাই॥

পাঠান্তর—(ক) ভাত—ভাব।
(খ) তবে—তার।
(গ) মানয়—জানয়।
(ঘ) বিষয়—আশয়।
(ঙ) নৌতুন যে—নূতন কভু।

১। মানো দধানো বিশ্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
২। দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব রজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥
৩। সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবং নবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন নবো নবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥

যে দিকে নিরখি, শ্যামল সুন্দর,
মোহন মাধুরী দেখি।
শ্যাম বহি আর, কিছু দেখি নাঞি,
একি জ্বালা হৈল সখি॥

অথ পরস্পর বশীভাব।

দোঁহার রূপেতে, দোঁহার নয়ান,
ভুলিয়া সদাই ঝুরয়ে।
দোঁহার গুণেতে, দোঁহার হৃদয়,
আকর্ষণ সদা করয়ে॥
দোঁহার পিরীতে, দোঁহে মাতিয়াছে,
একত্রেতে হৈয়া চিত। (ক)
দোঁহার মাধুরী, দোঁহে পান করি,
ভুলিয়াছে লোকরীত॥
দোঁহার মরম, দোঁহে সে জানয়ে,
অন্যে নাহি কেহ বুঝে।
দোঁহার তুলনা, দোঁহো বিনু আর,
নাহিক ভুবন মাঝে॥
কিশোর কিশোরী, রসের মাধুরী,
তুলনা দিবারে নাঞি।
কোটি কোটি সুধা, নিছনি যাউক,
লালদাস গুণ গাই॥

বিপ্রলম্ভ মহাভাব দিব্যোন্মাদ আদি।
অনেক প্রকার হয় মোহন অবধি॥
বিস্তারিত বহু মানি বর্ণিতে নারিল।
বুদ্ধির প্রবেশ গ্রন্থে সুন্দর না হৈল॥
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ যে এ দুই প্রকার।
তাহার অন্তর-গর্ভ অনেক বিচার (খ)॥
সংক্ষেপে কিঞ্চিত কহি দিগ-দরশন।
বাহুল্য করিতে হয় বহু প্রকরণ॥

পাঠান্তর—(ক) একত্রে হইয়া চিত।
(খ) বিচার—প্রকার।

তত্র বিপ্রলম্ভ।[১]

পূর্ব্বরাগ মান প্রেমবৈচিত্ত্য প্রবাস।
চারি-ভেদ হয় বিপ্রলম্ভের প্রকাশ॥

তত্র পূর্ব্বরাগ-লক্ষণ[২]।

সঙ্গমের পূর্ব্বে যেই দেখিয়া শুনিঞা।
জনময়ে রাগ লোভ হৃদয়ে পশিয়া॥
সেই পূর্ব্বরাগ তার বিষয় যে শুন (ক)।
দর্শন শ্রবণ বহু ভেদ কহি পুন॥

তত্র দর্শন যথা—

চিত্রপট স্বপ্ন আর সাক্ষাৎ তিন ভাঁতি।
দরশন-ভেদ পূর্ব্বরাগের উৎপতি॥

অথ সাক্ষাত।

যমুনার জলে যাইতে কদম্বের তলে।
হেরিয়া নাগর কানু পরাণ বিকলে॥
ঘরে গিয়া সুন্দরী স্তম্ভের ন্যায় রহে।
ধীরে ধীরে নির্জ্জনে সখীরে কিছু কহে॥
যমুনার তীরে সখি! কাহারে দেখিনু (খ)।
প্রাণ মন দেহ সুঁপিঞা সোঁপিয়া আইনু॥
না দেখিলে সখি তারে প্রাণ বাহিরায়।
বুঝি ধর্ম্ম কুল শীল সব নাশ যায়॥

অথ চিত্রপট দর্শন।

কৃষ্ণের মূরতি চিত্রপটেতে লিখিয়া।
দেখাইলা যবে সখী বিশাখা আনিঞা॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত রাই হৃদয়ে ধরিয়া।
হাহাকার করি কান্দে ক্ষিতি লোটাইয়া॥

অথ স্বপ্নদর্শন।

আজু সখি নিশিতে কি স্বপন দেখিনু।
অতি অপরূপ রূপ জলধর-তনু॥
অঙ্গে অঙ্গে সখি তার অনঙ্গ নিছনি।
কিশোর-বয়েস একজন কে না জানি॥
তাহারে দেখিতে পুন লালসা জন্ময়।
না দেখিয়া প্রাণ মোর বাহিরাতে চায়॥

অথ শ্রবণ যথা।

বন্দি-স্তুতি দূতীমুখে সখীমুখে আর।
পূর্ব্বরাগে শ্রবণ এই তিন পরকার॥
এ সভার মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ।
শুনিঞা শ্রীরাধা করে ধূলায় লুণ্ঠন॥

তত্র বংশী দূতী।

পরম আনন্দে রাই পুষ্পের কাননে।
ফুল তুলি তুলি ফিরে সখীগণ সনে॥
হেনকালে বংশীধ্বনি কদম্ব কাননে।
হইতে আসিয়া তথা লাগিল শ্রবণে॥
হৃদয় পশিয়া তবে উঠিল তরঙ্গ।
অঙ্গ অবশ হইল উছলিল অনঙ্গ॥ (ক)

অথ বন্দিস্তুতি।

বৃষভানু রাজার সভায় বন্দিগণ।
শ্রীনন্দ-নন্দনরূপ-গুণ করে গান (খ)॥
গোপতে থাকিয়া তাহা শুনিঞা শ্রীমতী।
অধৈর্য্য হইয়া মজি গেল বুদ্ধি-মতি॥

অথ মান[১]।

প্রেমের আশ্চর্য্য গতি মান স্বাভাবিক।
জনমে কখন স্বল্প কখন অধিক॥
সেই দুই মত হেতু নির্হেতু উপজে।
কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে পরম সুখ ভুঞ্জে॥

পাঠান্তর—(ক) বিষয় যে শুন—বিশেষ যে গুণ।
(খ) দেখিনু—হেরিনু।

১। যূনোর্যুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ।
ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে॥
পূর্ব্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যমিত্যপি।
প্রবাসশ্চেতি কথিতো বিপ্রলম্ভশ্চতুর্বিধঃ॥

২। রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥

পাঠান্তর (ক) অঙ্গ অবশ হৈল উথলিল অনঙ্গ।
(খ) করে গান—করেন গায়ন।

১। দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥
অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি॥

তত্র সহেতুক।

কৃষ্ণ অন্য নায়িকার সনে বিহারাদি।
করয়ে দেখয়ে শুনয়ে ধনি যদি॥
কোপ করি মান করে প্রিয়ের উপর।
সহেতুক মান (ক) সেই অপূর্ব্ব মধুর॥
স্নেহ বিনে ভয় ঈর্ষা বিনা যে প্রণয়। (খ)
নাহি হয় যাথে মান প্রেম প্রকাশয়॥
শ্রবণ দর্শন আর এক অনুমান।
তার মধ্যে শ্রবণ হয় দ্বিবিধ-বিধান॥
সখীমুখে শুনি আর শুকমুখে শুনি।
মানিনী যে হয় তবে (গ) বিদগ্ধ রমণী॥

অনুমিতি যথা।

ভোগ-চিহ্ন বাক্য স্খলন আর স্বপ্ন তিন।
মানের কারণ ইহ অনুমান চিন॥
অন্যনায়িকা-ভোগচিহ্ন প্রিয়দেহে।
দেখিয়া করয়ে মান ঈর্ষায় না সহে॥
নিকটে বসিয়া ভ্রমে সতিনীর নাম।
যবে লয় প্রিয় সেই বাক্যের স্খলন॥
স্বপনে দেখিয়া প্রিয় অন্যরামা সনে।
বিহার করয়ে হেরি বিরসয়ে মানে॥

অথ নির্হেতুক মানলক্ষণ।

অকারণে উঠে যেই মানের তরঙ্গ।
নির্হেতুক হয় সেই এক রসরঙ্গ॥
প্রেমের কুটিল গতি সাহজিক হয়।
বঙ্কগতি (ঘ) সদাই প্রকাশে সর্প প্রায়॥
হাসিয়া হাসিয়া হরি সখীর সহিত।
সাধন করিতে মানভঙ্গ হয় দ্রুত॥

অথ প্রেম-বৈচিত্ত্য-লক্ষণ[১]।

প্রিয়ের নিকটে বসি প্রেমময়ী ধনি।
প্রেমের বিহ্বলে প্রিয় কোথা মনে গণি॥
চৌদিগে হেরিয়া (ক) কান্দে বিরহ হুতাশে।
প্রেম-বৈচিত্ত্য ইহা হেরি হরি হাসে (খ)॥

তদ্‌যথা—

শ্যামের নিকটে বসি, রঙ্গরসে হাসি হাসি,
বিবিধ কৌতুকে শশিমুখী।
বিহরয় প্রিয় সনে, চারুপাশে (গ) সখীগণে
আনন্দিত সে কৌতুক দেখি॥
হেনই সময় চিতে, প্রেম-উদ্দীপন-রীতে,
প্রিয়ের বিচ্ছেদ স্ফূর্ত্তি-ভাবে।
কান্দিয়া সখীর স্থানে, কহয়ে কাতর-মনে,
বিরহ-উৎকণ্ঠা মৃদুরবে॥
কহ সখি প্রিয় কোথা, আমার অন্তর বেথা,
ঘুচাও আনিঞা মিলাইয়া।
নতুবা না বাঁচে প্রাণ, এ দুঃখে করহ ত্রাণ,
নহে চল আমারে লইয়া॥
তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, হাস্যমুখে মন্দ মন্দ,
নিরখয়ে (ঘ) প্রফুল্ল বদনে।
সখীগণ চারি পাশে, মুচকি মুচকি হাসে,
কহে কিছু মধুর বচনে॥
কহ সখি কি কারণে, বিরহিণী হৈলে কেনে,
প্রিয়ে তব গেল কোথাকারে।
কে ইহ (ঙ) শ্যামল-শশী, তোমার দক্ষিণে বসি,
রসের মাধুরী তব হেরে॥

পাঠান্তর—(ক) মান—নাম।
(খ) নির্হেতুক বিনা ভয় ঈর্ষা যে প্রণয়।
(গ) মানিনী যে হয় তবে—যেই হয় তাঁর নাম।
(ঘ) বঙ্কগতি—বক্রগতি

পাঠান্তর—(ক) হেরিয়া—নেহারি।
(খ) হরি হাসে—ইতিহাসে।
(গ) চারুপাশে—চারিদিকে।
(ঘ) নিরখয়ে—চলিলেন।
(ঙ) ইহ—হই।

১। প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥

নয়ন পশারি চাহ, এই তব প্রিয়ে লহ,
তেজ সখী বিরহ-বেদনা।
তাহা শুনি সুধামুখী, চেতন পাইয়া আঁখি,
কুঞ্চিত করিয়া সুবদনা॥
লজ্জিত সহাস্যমুখে, তর্জ্জনী অর্পিয়া নাকে,
যৎকিঞ্চিত টানিঞা ঘোমটা।
হেঁটবদনে রহে, সখীর পানেতে চাহে,
হেরি হরি সে ভাবের ছটা॥
পরম আনন্দ মনে, ধরি প্যারী চন্দ্রাননে,
চুম্বন করয়ে ঘনে ঘন।
পুনঃপুন আলিঙ্গয়, অশ্রু নয়নেতে বয়,
এই প্রেম-বৈচিত্ত্যলক্ষণ॥

অথ প্রবাস১।

প্রেয়সী ছাড়িয়া প্রিয় দূরদেশে যায়।
তাহাতে যে রীত সেই প্রবাস কহায়॥
সেই সে প্রবাস সেহ দুইতো প্রকার।
এক যে কিঞ্চিত-দূর দেশান্তর আর॥
নিকট প্রবাস গোচারণের কারণ।
দূর-দেশান্তর হয় পুনরাগমন॥
নিকটে প্রবাসে হয় নিকটে মিলন। (ক)
সব দুখ দূরে যায় করি দরশন॥
সুদূর গমনে হয় দুরন্তবেদনা।
তিন যে প্রকার সেহ অশোচ্য সূচনা॥
ভাবী ভবন্ ভূত এই তিন হয়।
সংক্ষেপে কহিনু বিপ্রলম্ভ অভিপ্রায়॥
ইহাতে যে দশ দশা বিরহ-উন্মাদ।
শুনিতেই জন্মে ভক্তের অন্তরে (খ) বিষাদ॥

অথ দশ দশা২।

চিন্তা জাগরোদ্বেগ ক্ষীণ আর মলিন।
প্রলাপ ব্যাধি উন্মাদ মূর্চ্ছা মরণ॥

এই দশ দশা হয় ক্রমেতে উদয়।
শুনিতে বিদরে লালদাসের হৃদয়॥

অথ সম্ভোগ-লক্ষণ১।

দরশন আলিঙ্গন চুম্বনাদি করি।
তাহে যে উপজে সুখ সম্ভোগ বিচারি॥
তাহাতে যে ভেদ দুই মুখ্য আর গৌণ।
মুখ্য চেতন আর গউণ স্বপন॥

তত্র মুখ্য।

মুখ্য পুন চারি-ভেদ সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ।
সম্পন্ন, সমৃদ্ধিমান চারি মুখ্য গণ্য॥

অথ সংক্ষিপ্ত২।

পূর্ব্বরাগ অন্তে কৃষ্ণ সনে যে মিলন।
সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ বলি তাহার গণন॥

তদ্‌যথা --

প্রথম মিলনে কৃষ্ণ সনে সুবদনী।
অঙ্গভঙ্গি করি হয় সুলজ্জ বদনী॥
চুম্বন করিতে মুখ বস্ত্রেতে ঝাঁপয় (ক)।
কুচে কর দিতে হস্ত ঠেলিয়া ফেলয়॥
সঙ্গম-প্রসঙ্গে অঙ্গ মুড়িয়া হেলায়।
সভয় অন্তর দেহে কম্প প্রকাশয়॥

অথ সংকীর্ণ সম্ভোগ৩।

মানের পশ্চাতে যে সম্ভোগ উপচার।
সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ বলি গণনা তাহার॥
নির্ভয় সংকোচহীন কিন্তু যে মানের।
ঈষত গর্ভিতে হয় ভঙ্গি সু-অঙ্গের॥
সঙ্গমপ্রসঙ্গে করে বাক্যের (খ) তাড়ন।
বদন ফিরায় মুখ করিতে চুম্বন॥

পাঠান্তর—(ক) নিকট প্রবাস বটে নিকট মিলন।
(খ) ভক্তের অন্তরে—ভক্তগণের।

১। পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্ দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে॥

২। চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥

পাঠান্তর—(ক) ঝাঁপয়—ঢাকয়।
(খ) বাক্যের—বাক্যেতে।

১। দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে॥

২। যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বসব্রীড়িতাদিভিঃ।
উপচারান্ নিষেবেতে স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ॥

৩। যত্র সংকীর্য্যমাণাঃ স্যুর্ব্যলীকস্মরণাদিভিঃ।
উপচারাঃ স সংকীর্ণঃ কিঞ্চিৎ তপ্তেক্ষুপেশলঃ॥

কোপদৃষ্টি করিয়া চাহয়ে প্রিয় পানে।
আনন্দে ভাসয়ে হরি অন্তরে বাখানে॥

অথ সম্পন্ন সম্ভোগ[১]।

প্রবাস হইতে প্রিয় আসি যে সম্ভোগ।
সম্পন্ন যে সেই যাতে সর্ব্ব উপযোগ (ক)॥
ফিরিয়া আসিব সে যে হয় দুই মত।
এক প্রাদুর্ভাব আর আগমন লোকবত॥

প্রাদুর্ভাব যথা।

বিরহিণী প্রিয়সীর রাখিতে পরাণ।
আচানক দেখা দিয়া হয় অদর্শন॥
রতি-কেলি আদি নানাক্রীড়া যায় করি।
স্বপনের ন্যায় তাহা মানয়ে সুন্দরী॥

অথ সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ[২]।

পরবশ বাধা হইতে ছুটি যে দর্শন।
দুর্লভ দর্শন সে সম্ভোগ বিচক্ষণ॥
রসময় উপচার সব তাহে হয়।
সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান করিয়া কহয়॥

অথ গৌণ সম্ভোগ লক্ষণ[৩]।

স্বপনেতে নানা রঙ্গ রসের সংযোগ।
তাহাতে যে সুখ সেই গৌণ সম্ভোগ॥
স্বপন দেখিয়া ধনি অতি প্রমোদিত।
সখীর সহিত কহে করিয়া বিদিত॥

তদ্যথা—

আজু সখি মোর, হিয়ার আনন্দ,
কিছু যে কহিব তোরে।
স্বপনে দেখিনু, প্রিয়তম আসি,
বসিয়া মোর শিয়রে॥
বদন চুম্বন, করয়ে আমার,
মুচকি মুচকি হাসি।
নাসায় মুকুতা, নোলক দুলিছে,
তাহে শোভে মুখশশী॥
উরজে কমল, করযুগ দিতে,
বাহু পসারিয়া তারে।
ধরিতে চাহিনু, করে না পাইনু,
ছুটি পলাইল দূরে॥
ঘুমের ঘোরেতে, শয্যায় হাথাড়ি,
এ পাশ ও পাশ করি।
না পাইয়া বধু, ক্ষোভিত হইনু,
নয়নে ঝরয়ে (ক) বারি॥
তখন বুঝিনু, স্বপন দেখিনু,
চেতন পাইয়া মনে।
উঠিয়া বসিয়া, স্থির কৈনু হিয়া,
লালদাসে রস ভণে॥

সংক্ষেপে বর্ণিনু এই রস-প্রকরণ।
কিশোর কিশোরী দোঁহে (খ) ইহার শোভন॥
দেব-নর-গন্ধর্ব্বাদি যতেক আছয়।
কোথাও না সম্ভবে ইহ রসের বিষয়॥
রসিক করিয়া অভিমানী যত হয়।
বৃথা অভিমানমাত্র শোভা নাহি পায়॥
রাধাকৃষ্ণ বিনে রস না করে উদয়।
সুধাকর বিনে সুধা নাহি বরিষয়॥
যতনে গোপন করি হৃদয়ে রাখিবে।
মূঢ়-কামুক-স্থানে কভু না কহিবে॥

পাঠান্তর—(ক) উপযোগ—উপভোগ।

১। প্রবাসাৎ সঙ্গতে কান্তে ভোগঃ সম্পন্ন ঈরিতঃ।
দ্বিধা স্যাদাগতিঃ প্রাদুর্ভাবশ্চেতি স সম্ভবঃ॥
[আগতি লৌকিক ব্যবহারে সাধারণ ভাবে আগমন প্রাদুর্ভাব প্রেমবিহ্বল কান্তের নিকট সহসা আবির্ভাব।]

২। দুর্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্ বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥
[সহজ কথায় অদূর প্রবাস হইতে আসিয়া মিলনে সম্পন্ন সম্ভোগ হয় আর সুদূর প্রবাস হইতে বহু কাল পরে আগমনে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হয়।]

৩। স্বপ্নে প্রাপ্তির্বিশেষোঽস্য ভেদো গৌণ ইতীর্যতে॥

পাঠান্তর—(ক) ঝরয়ে—বহয়ে।
(খ) দোঁহে—দেহে।

অধিকারী বিনে যেহ ইহ লীলারস।
আস্বাদিতে চায় সেই জন যায় নাশ॥
ইহা শুনি ভট্টজীউ আনন্দ-সাগরে।
ভাসয়ে করয়ে পান অমৃতের ধারে॥
ধোরেরা গ্রামের শ্রীকল্যাণ সিংহ নাম।
কৃষ্ণভক্ত শুদ্ধমতি অতি অনুপাম॥
গৃহ ছাড়ি ভট্টজী গেলেন ইহা শুনি।
কৌতুক দেখিতে তথা গেলেন আপনি॥
যাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে তথায় বসিয়া।
উদাস হইল চিত্ত সে রস শুনিঞা॥
তেঁহো গৃহ ত্যাগ করি ভট্টজীর সঙ্গে।
মাতিলেন দুইজন কৃষ্ণ-রস-রঙ্গে (ক)॥
স্ত্রী তাঁর দুঃখ মানি ভট্টজীর পাশ।
কহি পাঠাইলা শুনি স্বামীর উদাস॥
স্বামী মোর ছাড়ি গেলা আমার পালন (খ)।
কে করিবে তাঁরে কহ পাঠাইয়া দেন (গ)॥
ভট্টজী কহেন তেঁহো অজ্ঞ মূর্খ হন।
স্বামী কেটা অদ্যাবধি নাহিক জানেন॥
নিত্যস্বামী যেই তাঁরে কহ ভজিবারে।
পালন করিবে সেই ভার লাগে যাঁরে॥
জগতের পতি কৃষ্ণ তাঁহারে ছাড়িয়া।
ভ্রষ্টভাবে ফিরে কেনে অন্যেরে চাহিয়া॥
এ কথা যাইয়া সেই লোক শুনাইল।
বুঝিতে নারিল (ঘ) স্ত্রী প্রসন্ন নাহিল॥
কোন গুণি-জন দ্বারে যাদু করিবারে।
পাঠাইলা কোনোরূপে স্বামী আইসে ঘরে॥
গুণী গিয়া ছিটা-ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র ছলে।
করিল অনেক সব হইল বিফলে॥
সাধুসঙ্গ-ছিটাফোঁটা যাহারে লাগিল।
কৃষ্ণের পিরীতিরসে যে জন ভুলিল (ঙ)॥

তাহারে প্রাকৃত ছিটাফোঁটায় ভুলাতে।
অন্যে কি কখনো পারে উৎপথে লইতে॥
রাজার আগে নাহি হয় প্রজার দোহাই।
মত্তহস্তী পোয়ালেতে (ক) বান্ধা যায় নাঞি॥
জগত যাহার বশ তারে বশীকার।
যে জন করিল তারে ঔষধি কি ছার॥
ভট্টজীর স্থানে গ্রন্থপাঠ শুনিবারে।
ত্রিবিধ মনুষ্য চারিভিতে বৈসে ঘিরে॥
বৈষ্ণবগণের দেহে (খ) পুলকাশ্রু হয়।
এক যে তাঁহার দেহে প্রেম না জন্মায়॥
লজ্জিত হয়েন তেঁহো বৈষ্ণব-সভায়।
মনে মনে তার (গ) এক সৃজিল উপায়॥
গোপতে মুঠায় (ঘ) এক মরিচ রাখিয়া।
কথার সময়ে কান্দে চক্ষে বুলাইয়া॥
কোন ব্যক্তি জানি তাহা ভট্টেরে কহিলা।
ভট্টজী মুচকি হাসি কহিতে লাগিলা॥
সাধু সাধু সেই ব্যক্তি ভাল বুঝিয়াছে।
সেই দুষ্টচক্ষের উচিত করিয়াছে॥
কৃষ্ণকথা শুনি যেই চক্ষু নাহি ঝুরে।
লঙ্কা মরিচ দিতে উপযুক্ত হয় তারে॥
ভট্টজীর কত গুণ কহা নাহি যায়।
নির্ম্মৎসর লাভালাভে সমান হৃদয়॥
গৃহেতে থাকিতে চোর সিন্ধ কাটি ঘরে।
দ্রব্য নিকাশিয়া মোট বান্ধে সিন্ধদ্বারে॥
উঠাইতে নাহি পারে শিরের উপরে।
ভট্টজী দেখিয়া তাহা খরকার দ্বারে॥
দয়া উপজিল ধীরে ধীরে তথা যাই।
চোরের মস্তকে মোট দিবারে উঠাই॥
চোর ভয়ে পলাইতে চাহয়ে ছুটিয়া (ঙ)।
ভট্টজী আশ্বাস করি রাখয়ে ধরিয়া॥

পাঠান্তর—(ক) কৃষ্ণ-রস-রঙ্গে—কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
(খ) পালন—কপাল।
(গ) তাঁরে কহ পাঠাইয়া দেন—আর মোর জীবন সম্বল।
(ঘ) নারিল—না পারি।
(ঙ) ভুলিল—ডুবিল।

পাঠান্তর—(ক) পোয়ালেতে—গোয়ালেতে।
(খ) দেহে—শুনি।
(গ) তার—ভাবি।
(ঘ) মুঠায়—গামছায়।
(ঙ) ছুটিয়া—ছাড়িয়া।

ভয় নাহি আমি কিছু না কহিব তোরে।
সামগ্রী লইয়া যাও বেচিকিনি ঘরে॥
চোর কুণ্ঠভাবে অতি লজ্জিত হইল।
ভট্টজীর আগ্রহে লইয়া ঘরে গেল॥
ভট্টের পরশে তার চিত্তশুদ্ধি হৈল।
সেই মোট সহ পরদিন তথা আইল॥
ভট্টজীর শ্রীচরণে সমর্পণ করি।
কান্দিয়া পড়িল নিজ উদ্ধারে বিচারি॥
কৃপা করি ভট্ট (ক) তারে নিজ শিষ্য কৈল।
শুদ্ধসত্ত্ব পরম যে ভাগবত হৈল॥
অপচয়ে তুষ্ট তার কহিনু বিশেষ।
এবে শুন লাভেও নাহিক পরিতোষ॥

পাঠান্তর (ক) ভট্ট—স্বচ্ছ।

একদিন ঠাকুরের মন্দির-মার্জ্জন।
করিছেন ভট্টজীউ আনন্দিত মন॥
সেইকালে এক ধনী শিষ্য হইবারে।
লইয়া আইল বহু ধন-অলঙ্কারে॥
ভট্টজীকে এক শিষ্য যাইয়া কহিল।
শিষ্য না করিব বলি তারে উপেক্ষিল॥
অতএব কৃষ্ণে প্রীতি তাৎপর্য্য মাত্র।
ত্রৈলোক্য-ঐশ্বর্য্য মুক্তি না মানে বিচিত্র (ক)॥
তাঁহার চরণ-পদ্ম-রজে অধিকার।
কহে হেন শুভ ভাগ্য (খ) হইবে আমার॥
কবে তাঁর কৃপালেশ লালসে হবে।
এ দেহে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ঈষত পর্শিবে॥

পাঠান্তর (ক) বিচিত্র—স্বতন্ত্র।
(খ) শুভ ভাগ্য—ভাগ্যলাভ।

ইতি শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থে নিবাই-গ্রামীয়-সাধু-আদি-ভক্তগণ-বর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশ-মালা ॥ ২৩॥

চতুস্ত্রিংশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীমাধব সিংহের রাণী

জয়পুরের রাজা মানসিংহের কনিষ্ঠ।
মাধো সিংহ নাম রাজ্যশাসনে (ক) বরিষ্ঠ॥
তাঁর পাটরাণী অতি সুন্দরী সুশীলা।
সুবুদ্ধি সুমতি সতী শুন তাঁর লীলা॥
একদিন রাণী গৃহে শয়নে আছয়ে।
দাসী তাঁর পাদসেবা করয়ে বসিয়ে॥ (খ)
দাসী সেই কৃষ্ণভক্ত ভাবযুক্ত-মতি।
সদা মুখে কৃষ্ণনাম জপে দিবারাতি॥
রাণীজীর পাদসেবা করিতে করিতে।
নাম উচ্চারিয়া দাসী লাগিলা কান্দিতে॥
নূতন-কিশোর হে হে শ্রীনন্দকিশোর।
বলিয়া ফুৎকার করে প্রেমানন্দে ভোর॥
অপূর্ব্ব ফুৎকার করে প্রেমের সহিতে।
অমৃতের ধারা যেন বহে বদনেতে॥
রাণীর শুনিঞা তাহা হৃদয় দ্রবিল।
কহে পুনঃ পুন কহ আহা বল বল॥
শুনিতে শুনিতে রাণী মগন হইল।
দাসীরে প্রশংসা করি কহিতে লাগিল॥
তুমি তো আমার পাদসেবা-যোগ্য নহ।
দাসী যে তোমারে বলি অপরাধ সেহ॥
বিচার করিলে তব দাসীর যে দাসী।
হৈতে যোগ্য না হইব (গ) বিনে ভাগ্যরাশি॥

অতএব তুমি মোর পাদ ছাড়ি দেহ।
শিয়রে আইস শিরে চরণ ধরহ॥
এতেক বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন কৈল।
দুইজনে প্রেমাবেশে (ক) বিহ্বল হইল॥
দাসী কহে ঠাকুরাণী দেখহ ভাবিয়া।
ভুলিলে বিষয়-সুখ মোহিত হইয়া॥
অনিত্য সে সুখ তাথে কতো বা আস্বাদ।
কৃষ্ণ ভকতি বা কি জাতীয় স্বাদ॥ (খ)
অনিত্য বিষয় সুখ হৈল আর গেল।
কৃষ্ণপ্রেম পরাৎপর নিত্য করে আলো॥
রাণী কহে তোমার সঙ্গেতে তা বুঝিনু।
আজি হৈতে গুরু করি তোমারে মানিনু॥
আজি হৈতে বিষয় যে সুখ তেয়াগিনু।
কৃষ্ণপ্রেম ধন লাগি জীবন সোঁপিনু (গ)॥
এতো কহি কৃষ্ণ বলি লুঠয়ে ধরণী।
মহোৎকণ্ঠা হৈল (ঘ) চিন্তি ইন্দ্রনীলমণি॥
তবে সর্ব্ব বিষয় বাসনা ভোগ ত্যজি।
নূতন-কিশোর-প্রেমে মন গেল মজি॥
ইন্দ্র-নীলমণি-ছবি মূর্ত্তি প্রকাশিয়া।
নির্জ্জন মহলে থাকে তাঁহারে সেবিয়া॥
নানান শিঙ্গার (ঙ) ভোগ মনের সহিতে।
কত মত প্রকার যে করে আনন্দিতে॥
সাজাইয়া কাছাইয়া আপনি দেখয়।
খাওয়াইয়া শোয়াইয়া বাতাস করয়॥
নিজ হস্তে পুষ্পমালা গাঁথিয়া পরায়।
চুয়া-চন্দনাদি গন্ধ অঙ্গেতে লেপয়॥
শ্রীমতীর মানভঙ্গ করিয়া বসায়।
পক্ষপাত করি নিজ কিশোরে ভর্ৎসয়॥

পাঠান্তর—(ক) রাজ্যশাসনে—তার শাসনে।
(খ) বসিয়া তাঁহার দাসী চরণ সেবয়ে॥
(গ) হৈতে যোগ্য না হইব—হইতে নারিব যোগ্য।

পাঠান্তর—(ক) প্রেমাবেশে—প্রেমানন্দে।
(খ) কৃষ্ণপ্রেম-ভকতিতে কি সুন্দর স্বাদ।
(গ) জীবন সোঁপিনু—দিবস অর্পিনু।
(ঘ) মহোৎকণ্ঠা হৈল—উৎকণ্ঠা হৈল।
(ঙ) শিঙ্গার—প্রকার।

পুনর্ব্বার শ্রীবদন মলিন দেখিয়া।
প্যারীরে সাধয়ে সুকুমারের লইয়া॥
তাহে যদি মানভঙ্গ না হৈল বুঝিয়া।
চরণে ধরিতে কৃষ্ণ কহেন ঠারিয়া॥
গলেতে বসন দিয়া চরণে ধরায় (ক)।
তা দেখি পরমানন্দসাগরে ডুবয়॥
এইরূপ রসরঙ্গ কিশোর-কিশোরী।
লইয়া করয়ে রাণী দিবস শর্ব্বরী॥
আনন্দ-সাগরে ডুবি হাসে কান্দে নাচে।
কিশোর-কিশোরী দোঁহার নানালীলা রচে॥
দিনে দিনে সেবানন্দে আনন্দ বাঢ়িল।
একদিন মনে কিছু উৎসাহ হইল॥
দুয়ারের ফাঁকে আড়ি পাতিয়া রহয়।
যুগলকিশোর কিবা সুখে বিহরয়॥
কতেক আদর করে প্যারীজীর প্রীত।
যাহাতে পরমানন্দ নিজ মনোবৃত্ত॥
মনে হৈল এই যে পরম সুখ সার।
একেলা যে আস্বাদিতে নহে চমৎকার॥
বৈষ্ণব সহিত রস আস্বাদিতে সুখ।
নতুবা অন্তরে গুমরিয়া হয় দুখ॥
বৈষ্ণব সেবন বিনে কৃষ্ণের পিরীতি।
নাহি হয় শুনিঞাছি ভক্তমান প্রীত॥
ইহা বলি (খ) আরম্ভিল বৈষ্ণব সেবন।
যুথে যুথে আসিতে লাগিল সাধুগণ॥
নানান-জাতীয় লাড়ু পোড়া মিষ্ট অন্ন।
পাকোয়ান করি নিজহস্তে ভিন্ন ভিন্ন॥
কৃষ্ণে নিবেদয়ে সাধুগণেরে খাওয়ায়।
ভুক্তশেষ চরণ অমৃত শেষে পায়॥ (গ)
নূতন-কিশোর আগে বৈষ্ণব সহিত।
নৃত্য গীত ইষ্টগোষ্ঠী করে মনোনীত॥
মাল্য ও চন্দন দিয়া পূজয় বৈষ্ণবে।
চরণ সেবয়ে নিজ হস্তে ভক্তিভাবে॥

অন্দরে বৈষ্ণবগণ সদা আইসে যায়।
বেপর্দ্দা দেখিয়া দেওয়ানাদি ক্ষোভ পায়॥
দেওয়ান রাণীর স্থানে কহি পাঠাইলা (ক)।
রাজরাণী হৈয়া কেনে পর্দ্দা ঘুচাইলা॥ (খ)
রাণী কহে রাণী নাম না কহিও মোরে।
দাসী নাম লিখি দিনু যুগল-কিশোরে॥
পরদা উঠাইয়া নূতন কিশোরের সঙ্গে।
রঙ্গ সমর্পিনু ঢাক বাজাইয়া রঙ্গে॥
জাতি পাঁতি তেয়াগিনু বৈষ্ণব-সমাজে।
চতুর্ব্বর্গ তেয়াগিনু পিরীতের কাজে॥
জীবনের আশা তেয়াগিনু পাইবারে।
যুগলের সেবা-দরশন ব্রজপুরে॥
সরম ভরম মান ধন জন প্রাণ (গ)।
যুগলের বালাইয়ের সনে ভেজিলাম॥
এসব রিপুর হাথ যদি ছাড়াইনু।
তবে আর কারে ভয় নির্ব্বিঘ্ন হইনু॥
অতএব বিবরণ দেওয়ানেরে কহ।
শ্রীচরণে সোঁপিয়াছি দেহ-পর্দ্দাসহ॥
এ সব কাহিনী তবে দেওয়ান শুনিঞা।
মউন হইল তবে ক্ষোভিত হইয়া॥
রাজা মাধোসিংহ পুত্র প্রেমসিংহ সনে।
কাবেল গিয়াছে রাজ্য-শাসন কারণে॥
রাণীর বেপর্দ্দা আর বাক্য-বিবরণ।
বিস্তারিত লিখি পাঠাইলেন দেওয়ান॥ (ঘ)
রাজা পত্র পাইয়া পুত্রেরে কহে ডাকি।
তব মাতা নাভা সঙ্গে নাড়া হৈল নাকি॥
বেপর্দ্দা হইয়া স্বেচ্ছাময় (ঙ) আচরিল।
ইহা কহি দেওয়ানের পত্র দেখাইল॥
প্রেমসিংহ পত্র পড়ি আনন্দিত হৈল।
বুঝিলাম মাতা মোর পদে আরোহিল॥

পাঠান্তর (ক) ধরায়--ধরয়।
(খ) বলি—ডাকি।
(গ) ভুক্তশেষ আর যে চরণামৃত পায়।

পাঠান্তর (ক) কহি পাঠাইলা—কহি পাঠাইল।
(খ) পরদা ঘুচালে কেন রাজরাণী হৈয়া॥
(গ) প্রাণ—কম।
(ঘ) বিস্তারি দেওয়ান পত্র লিখিল তখন॥
(ঙ) স্বেচ্ছাময়—স্বেচ্ছামত।

পিতারে কহয়ে এ তো বুঝিলাম ভাল।
মাতা মোর তিন কুল উজ্জ্বল (ক) করিল॥
কৃষ্ণ বৈষ্ণবের সেবাব্রত ধরিয়াছে।
ইহা বিনা ভাগ্য আর জগতে কি আছে॥
প্রেমসিংহ কৃষ্ণভক্ত সাধু মতে কহে।
রাজা বিপর্য্যয় বুঝি ক্রোধানলে দহে॥
রাগত হইয়া রাজা পুত্রেরে ভর্ৎসিল।
রাণীর মস্তক ছেদ করিতে কহিল॥
প্রেমসিংহ কহে মোর মস্তক থাকিতে।
কার সাধ্য আছে মোর মাতাকে হিংসিতে॥
এতো কহি প্রেমসিংহ সৈন্য সাজাইয়া।
উদ্যুক্ত হইল যুদ্ধ প্রতাপ করিয়া॥
রাজাও করিতে যুদ্ধ প্রবর্ত্ত হইল।
শিষ্ট লোক মধ্যে থাকি দোঁহে থামাইল॥
ক্রোধে রাজা রাণীর মস্তক ছেদিবারে।
গৃহেতে চলিল দ্রুত ঘাড়িনী সওয়ারে॥
গৃহে যাই মন্ত্রী সহ পরামর্শ কৈল।
হঠাত স্ত্রী-হত্যা করা উচিত নহিল॥
বৃহত যে ব্যাঘ্র পাল আছে পিঁজিরাতে।
তাহা নিঞা ছাড়ি দিল রাণীর গৃহেতে॥
ব্যাঘ্রে খাইবেক বলি উদ্যম করিল।
কৃষ্ণভক্ত প্রতি সে উদ্যম ব্যর্থ হৈল॥
খাইবে কি সেই ব্যাঘ্র বৈষ্ণব হইল।
রাণীর চরণস্পর্শে নাচিতে লাগিল॥
কৃষ্ণসেবা পূজা রাণী করিতেছে বসি।
সেই কালে ব্যাঘ্র তথা দাণ্ডাইল আসি॥
রাণী দেখি স্নেহ করি তাহারে ডাকিল।
আইস আইস বাপু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল॥
পুলক হইয়া ব্যাঘ্র অষ্টাঙ্গ হইল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি উঠি নাচিতে লাগিল॥
কণ্ঠে তুলসীর মালা তিলক নাসায়।
রচিয়া দিলেন রাণী আনন্দ হিয়ায়॥
তখন বুঝিল রাজা প্রাকৃত না হবে।
আমার দৌরাত্ম্য এতো কৃষ্ণ না সহিবে॥

পাঠান্তর—(ক) উজ্জ্বল—উদ্ধার।

এই অপরাধে মোর না জানি কি হয়।
বিচারিলা অপরাধ-ভঞ্জন-উপায়॥
পাত্র মিত্র সভাসদ সমিভব্যার (ক)।
রাণীর নিকটে গেলা করি পরিহার (খ)॥
নিকটে যাইয়া রাজা অষ্টাঙ্গে পড়িল।
নিজ স্ত্রী বলিয়া অভিমান নাহি কৈল॥
যোড়হস্তে স্তব-স্তোত্র অনেক করিল।
অপরাধ ক্ষম বলি কাকুবাদ কৈল॥
রাণী কহে মোরে এত পরিহার কেনে।
অপরাধ কি করিলে মুঞি তো না জানে॥
যাহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মঙ্গল হইবে।
মুঞি তব অধীনা দয়া অবশ্য রাখিবে॥
রাজা কহে তুমি তো অধীন কারো নহ।
সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ তুমি করিতে পারহ॥
যাহার অধীন এই জগত-সংসার।
সে তব অধীন তাহে বিচিত্র কি তার॥
অতএব যে ইচ্ছা তোমার তাহা কর।
তোমারে সহায় করি রাজ্য মুঞি ধরোঁ॥
এতো পরিহার করি রাজা চলি গেলা।
অর্থে (গ) সামর্থ্যে রাজা অনুকূল হৈলা॥
একদিন মানসিংহ মাধোসিংহ দুই।
নৌকায় সয়াল করে (ঘ) দরিয়ায় যাই॥
হেনকালে প্রচণ্ড বাতাস ঝড় হৈল।
দরিয়াতে বড় ঢেউ তুফান উঠিল॥
ঝলকে ঝলকে জল নৌকায় উঠয়।
নৌকা ডুবি যায় প্রায় হইল সংশয়॥
ভয়েতে অসাড় ভাব (ঙ) রাজা দুই জন।
ভাবে এ সময় লব কাহার শরণ॥
বিচারিয়া রাণীজীরে স্মরণ করিল।
চক্ষের নিমিষে সর্ব্ব আপদ ঘুচিল॥

পাঠান্তর—(ক) সমিভব্যার—সমভিব্যাহারে।
(খ) পরিহার—পরিহারে।
(গ) অর্থে—অর্থেঁর।
(ঘ) সয়াল করে—সওয়ার করি।
(ঙ) অসাড় ভাব—অসার ভাবি।

ঝড় বাতাস নাহি দরিয়া সুস্থির।
অনায়াসে তরণী লাগিল গিয়া তীর॥
গৃহেতে আসিয়া রাজা রাণীরে প্রণতি।
করিয়া কহিল হাথ যুড়ি বহু স্তুতি॥
বিপদনাশের হেতু সম্পদের দাতা।
ভুক্তি-মুক্তি-আদি-কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি-প্রদা॥
হরিভক্তি বিনে আর হেন কেহ নাঞি।
ত্রিজগতে এমন কদাচ নাঞি নাঞি (ক)॥
অতএব সেই সে রাণীর পদযুগে।
হরি অনুরাগ অর্থ লালদাস মাগে॥

অথ শ্রীবিদুর-নাম ভক্ত

বিদুর নামেতে ভক্ত ক্ষেতারণ গ্রামে।
নিরন্তর সাধুসেবা করয়ে নিষ্কামে॥
বৈষ্ণবেতে প্রীতি তার একান্ত ভাবেতে।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন তাঁরে হৈলা তাহা হৈতে॥
বরিষা না হৈল হৈল অকাল বৎসর।
বৈষ্ণব সেবার হেতু উদ্বিগ্ন অন্তর॥
ভূমি চাস করিবারে করিল যুগতি।
জল নাহি বীজ নাহি কিসে হবে ক্ষেতি॥
ভাবিয়া ইহার কিছু পার নাহি পায়।
কৃষ্ণচন্দ্র রাত্রিযোগে স্বপনে কহয়॥
চাষ গিয়া চষ তুমি অন্ন উপার্জিবে।
বিনা জল বিনা বীজ ধান্যাদি ফলিবে॥
আদেশ পাইয়া সাধু ভূমে চাষ দিল।
দুই চারি দিনে ভূম (খ) অংকুরিত হৈল॥
ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিষ্ঠ হইয়া ফল হৈল।
বহু অন্ন হৈল ঘরে আনি স্তূপ কৈল॥
পাড়ার সকল লোক দেখি চমকিত (গ)।
জানিল কৃষ্ণের কৃপা হইল বিদিত (ঘ)॥

পাঠান্তর—(ক) নাঞি নাঞি—দেখি নাঞি।
(খ) দিনে ভূম—দিন পরে।
(গ) চমকিত—চমৎকার।
(ঘ) হইল বিদিত—ইহার উপর।

বৈষ্ণবসেবার হেন মহিমা অপার।
কৃষ্ণকৃপা অনায়াসে হয় হঠাৎকার॥
হেন যে বৈষ্ণব-পাদপদ্মে রতি মতি।
বিধাতা বঞ্চিত লালদাস পাপ প্রতি॥

চরিত্র শ্রীচতুর স্বামী

চতুর স্বামী নাম এক (ক) ভকত প্রধান।
তুল্য নিন্দা স্তুতি আর মান অপমান॥
কৃষ্ণৈকতাৎপর্য্য আর সকল বিষয়।
অনাসক্ত যথা পদ্মপত্র জলাশয়॥
গৃহেতে আইলা গুরু আনন্দিত হৈল।
কায়মনোবাক্যে সেবা করিতে লাগিল॥
গৃহেতে যুবতী ভার্য্যা গুরুর সেবায়।
নিযুক্ত করিলে পাছে ত্রুটি কিছু হয়॥
শয়ন করিলে গুরু চরণ সেবয়।
দৈবাত্ত মনেতে কিছু হৈল অপচয়॥
স্ত্রীর সহিত তার অঙ্গসঙ্গ হৈল।
চতুর স্বামী তাহা বিশেষ জানিল॥
ক্ষোভ না করিল কিছু প্রকাশ না কৈল।
মনে মনে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিল॥
এই স্ত্রী মোর স্পর্শযোগ্য না হইল।
গুরুদেব যার অঙ্গ পরশ করিল॥
এতেক ভাবিয়া গুরুস্থানে নিবেদয়।
এই স্ত্রী গৃহ অর্থ যে মোর আছয়॥
সকল অর্পিনু মুঞি ওই শ্রীচরণে।
গ্রহণ করিয়া কর যাহা লয় মনে॥
গুরু নিজ দোষ ভাবি লজ্জিত হইলা।
মাথা হেঁট করি লাজে মউনে (খ) রহিলা॥
চতুর স্বামী তবে নিজ গুরুর চরণে।
সর্ব্বস্ব অর্পণ করি গেল বৃন্দাবনে॥
বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণ-চরণারবিন্দে।
সঁপিলা মানস নিজ পরম-আনন্দে॥

পাঠান্তর—(ক) চতুর স্বামী নাম এক—চতুর স্বামীর নাম।
(খ) মউনে—মৌনেতে।

দেখিয়া সে সব ব্যবহার কোপে জ্বলি।
সেবকগণেরে গালি দিল কটু বলি॥
তাহা শুনি কেবলের সংকুতা না হৈল (ক)।
ঝাঁটি ধরি স্ত্রীকে তবে বাহির করিল॥
অসতী যে সেই স্ত্রী রাগে চলি গেলা।
তখনি যাইয়া এক উপপতি কৈলা॥
তাহাতে জন্মিল দুই তিন কন্যা পুত্র।
দারিদ্রতা তাহার সহিত হইল মিত্র॥
আকাল সময় হৈল খাইতে না পায়।
কাঙ্গাল হইয়া ফিরে ভিক্ষা না মিলয়॥
কেবলের বাটী নিত্য মহোৎসব হয়।
গরীব কাঙ্গাল যেই যায় সেই খায়॥
খাইতে না পাইয়া বালকগণ সাথে।
তথায় যাইয়া বসিলা দরজাতে॥
কেবল-কুবার এক শিষ্য শান্ত-মতি।
গুরুর সাক্ষাতে কহে করিয়া বিনতি (খ)॥
মোর মাতা-গুরু অতি কেলেশ পাইয়া।
দুয়ারে আইলা রাখ পালন করিয়া॥
কেবল কহেন সে তো নহে মোর ভার্য্যা।
ব্যভিচারি সেই মোর বহুকাল তেজ্যা॥ (গ)
দুঃখে পড়ি আসিয়াছে দেহ খাইবারে।
অন্ন দিতে উপযুক্ত হয় সভাকারে॥
বাহিরে রাখিয়া তারে আকাল পর্য্যন্ত।
পালন করিলা সাধু যাতে (ঘ) দয়াবন্ত॥
আকাল অতীতে তারে বিদায় করিল।
মাগি গিয়া খাও এবে তাহারে কহিল॥
আর কিছু কহিলেন অপূর্ব্ব কথন।
যাহাতে তাহার মনে হইল চেতন॥
তোমার যে (ঙ) স্বামী হৈতে হৈল কি তোমার।
এক মুষ্টি অন্ন দিতে শক্তি নৈল তার॥

পাঠান্তর—(ক) সংকুতো না হৈল—সহিষ্ণুতা নৈল।
(খ) বিনতি—মিনতি।
(গ) ব্যভিচারী সেতো বহুকাল হৈল তেজ্যা।
(ঘ) যাতে—অতি।
(ঙ) তোমার যে—কহ দেখি।

আমার যে স্বামী তাঁর দেখহ মহিমা।
ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা সে গৃহিণী যাঁর রমা॥
মোরে পালিতেছে আর মোর পরিবার।
আর নিজ জন কত হাজার হাজার॥
এতেক শুনিঞা তার বিবেক জন্মিল।
অপনা ধিৎকার করি মন দৃঢ় কৈল॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণপদ্মে মন সমর্পিয়া।
পাইল নিবৃতি সব জঞ্জাল তেজিয়া॥
কেবল কুবার পায় কোটী পরণাম।
পরম সুশান্ত যেঁহো কৃষ্ণভক্তিধাম॥

চরিত্র শ্রীহরিদাস বণিক

হরিদাস বণিক যে কাশীর নিকট।
নিবাস সুশান্ত কৃষ্ণভক্ত নিষ্কপট॥
বহু কালাবধি আশা করিয়াছে মনে।
বৃন্দাবন ধামে গিয়া শরীর তেজনে॥ (ক)
পীড়িত হইয়া অতি সংকট হইলা।
ডুলি চড়ি শীঘ্রগতি শ্রীধাম চলিলা॥
যাইতে যাইতে পথে কালপ্রাপ্ত হৈলা।
সেই স্থানে বৃন্দাবন দরশন দিলা॥
শ্রীকৃষ্ণ গোপিকা সহ শ্রীরাসমণ্ডলে।
দরশন পাইলা জীবতে সেইকালে॥
দেহত্যাগ করিয়া পাইয়া গোপীদেহ।
বিহারে মাতিলা বৃন্দাবনে কৃষ্ণসহ॥
তাঁহার চরণপদ্ম করিয়া স্মরণ।
লালদাস মাগে কৃষ্ণভকতি রতন॥

চরিত্র শ্রীকরমেতি বাঈ

খড়েল্যা গ্রামেতে বাস রাজপুরোহিত
পরশুরাম নাম তাঁর কন্যা সুচরিত॥

পাঠান্তর—(ক) শরীর ত্যজিব আমি গিয়া বৃন্দাবনে॥

করমৈতি তাঁর নাম অলপ বয়েস।
স্বামি ঘর নাহি যায় বিবাহের শেষ॥ †
তাঁহার চরিত্র কথা অতি চমৎকার।
এমত আশ্চর্য্য কিছু নাহি শুনি আর॥
একে স্ত্রী তাহাতে হয় বালিকা বয়েস। †
বড়ই আশ্চর্য্য কৃষ্ণে এতেক আবেশ॥
মহা অনুরাগ-পরাকাষ্ঠা ঐকান্তিক।
দেহ অনুরোধ নাহি কি কব অধিক॥
প্রাক্তনিক মতি কৃষ্ণে হঠাত লাগিয়া।
কৃষ্ণরূপ-গুণ রসে মন ডুবি গেলা॥
দশদিগে কৃষ্ণময় দেখয়ে সকল।
কৃষ্ণ লাগি সদা মন বিরহে বিকল॥
নিৰ্জ্জনে বসিয়া সদা অন্তরে চিন্তয়।
প্রেমাবেশে হাসে কান্দে পাগলীর প্রায় (ক)॥
কৃষ্ণলীলা প্রফুল্লিত কমল দেখিয়া।
মন মত্ত মধুকর পড়িল মাতিয়া॥
কৃষ্ণরূপ অমৃতের সাগরে পড়িল।
উঠিতে না পারে সুখে ডুবিয়া রহিল॥
কৃষ্ণগুণ কল্প লতা জড়াইয়া অঙ্গে।
চালাইতে নারে অঙ্গ স্তম্ভ রসরঙ্গে॥
কৃষ্ণনাম কল্পবৃক্ষ হৃদয়ে রোপিয়া।
প্রেম নাম ফল খায় বুকিয়া বুকিয়া (খ)॥
কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে ত্রিজগতে আর।
কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ সুখসার॥
এইরূপ রসে থাকে কথোদিন পরে।
লইতে আইল যাইতে হবে স্বামি ঘরে॥
স্বামিসঙ্গ বিষতুল্য করিয়া মানয়।
বিশেষে বিষয়ী সেই অবৈষ্ণব হয়॥
বড়ই হইল শোকে চিন্তায় আকুল।
উপায় কি হইবে ইহার অনুকূল॥
ওথায় যাইলে মোর কুসঙ্গ সঞ্চারে।
মন বুদ্ধি হরি লবে বিষয়-তস্করে॥

পাঠান্তর—(ক) পাগলীর প্রায়—পাগলিনী প্রায়।
(খ) বুকিয়া বুকিয়া—চুষিয়া চুষিয়া।

† স্বামি-ঘর — বালিকা বয়েস।
এই চার পঙক্তি বটতলার পুস্তক হইতে গৃহীত।

কৃষ্ণভক্তি পরশ-রতন হারাইব।
হায় হায় মোর তবে কি দশা হইব॥
রজনী প্রভাতে মোরে লইয়া যাইবে।
ইহার যুগতি মুঞি কি করি কি হবে॥
বিলাপ করিয়া কান্দে ভূমেতে পড়িয়া।
স্থির কৈল চিত্তে তবে যাই পলাইয়া॥
বৃন্দাবন যাই তথা যুগলকিশোর।
নিত্যসখীসঙ্গে রঙ্গে করয়ে বিহার॥
পুনঃপুনঃ মন বুঝাইয়া ধনী কহে।
কাতর হইয়া দুটি চক্ষে ধারা বহে॥
আরে মন মোর কিছু অনুকূল হও।
কৃষ্ণ অন্বেষণে মোরে শীঘ্র নিঞা যাও॥
কমলবদন শুভ সুখময় ধাম।
রসের সাগর রূপে গুণে অনুপাম॥
তাহারে মিলাও মোর এই হিত কর।
চল তবে এই অভাগীর করে ধর॥
লইয়া যাইয়া পাছে আছাড় মারহ।
পুনর্ব্বার গৃহ ফাঁসে (ক) ফিরিয়া আনহ॥
তেজ্য যেই ঘৃণাস্পদ বিষয়ের সহ।
মিলাইয়া পাছে পুন বাস্তাসি করহ॥
তোমার চরণ ধরি নিবেদন করি।
হে মন মোর সহে (খ) পাছে করহ চাতুরী॥
যে পথে চলিবে দৃঢ় সেই পথে যাবে।
পুন পাছু পানে আর ফিরি নাহি চাবে॥
সুখ মান অর্থ আর জীবনের আশা।
তেজিয়া করহ কৃষ্ণ-আশালতা-বাসা॥
প্রাণ সমর্পণ কর কৃষ্ণ-অন্বেষণে।
কৃষ্ণ বিনে অনর্থক কি কাজ জীবনে॥
দৃঢ় কর প্রতিজ্ঞা যে যে পর্য্যন্ত শ্বাস।
যে সাধনে পাই সেই যোগে কর আশ॥
এতেক চিন্তিয়া ধনী অৰ্দ্ধ নিশিযোগে।
ঘর হৈতে বাহির হইল অনুরাগে॥
বাটী হৈতে বাহির হইতে না পারিয়া।
কোঠার উপর হৈতে পড়ে লম্ফ দিয়া॥

পাঠান্তর—(ক) গৃহ-ফাঁসে—গৃহ-ফাঁদে।
(খ) মোর সহে—আমারে।

কৃষ্ণ-অনুরাগ-বন্ধু ধরি নাম্বাইল।
কিঞ্চিত শরীরে নাহি বেদনা লাগিল॥ (ক)
পড়িয়া চলিল ধনী বৃন্দাবন পথে।
তল্লাস পড়িয়া গেল গৃহেতে প্রভাতে॥
হাহাকার করে সভে কন্যা কোথা গেল।
লোকধর্ম্মভয়ে সভে অধোমুখ হৈল॥
রাজার নিকটে গিয়া ব্রাহ্মণ কহিল।
মহারাজ মোর নাককাণ কাটা গেল॥
কন্যা মোর রাত্রিযোগে কোথাকারে গেল।
কি জানি কি দুঃখ ভাবি বনে প্রবেশিল॥ (খ)
রাজা শুনি তৎক্ষণে চতুর্দ্দিগে লোক।
পাঠাইল তলাসে পাইয়া মনদুখ (গ)॥
ষাঁড়নী উটেতে চড়ি চলিল খুঁজিতে।
দূর হৈতে বাঈ তাহা পাইল দেখিতে॥
বুঝিল আমার তত্ত্বে লোক আসিতেছে।
দ্রুত চলি যায় ক্ষণে ক্ষণে চায় পিছে॥
ময়দানের মধ্যে (ঘ) লুকাইতে নাহি স্থান।
মড়া এক উট তথা দেখে বিদ্যমান॥ (ঙ)
উদর ভিতর তার সড়িয়া গিয়াছে।
গহ্বরের মত চর্ম্ম শুকাইয়া আছে॥
দুর্গন্ধি কেলেদ তাতে অতিশয় হয়।
ভিতরেতে পাশ গিয়া লুকাইয়া রয়॥
বিষয়ের দুর্গন্ধ সংস্কৃতা নাহি হৈল।
উটে যে দুর্গন্ধি সেহ সুগন্ধি মানিল॥
কৃষ্ণ-অনুরাগের এমতি রীতি হয়।
পরম যে দুঃখ তাহে বাধা না জন্ময়॥
তিন দিন উপবাসী তাহার ভিতরে।
রহিয়া কেবল কৃষ্ণনামে প্রাণ ধরে॥
লোক জন ফিরি গেল দেখা না পাইয়া।
বাহির হইয়া বাঈ গঙ্গাতে যাইয়া॥

গঙ্গাস্নান করি শ্রীমন্ বৃন্দাবনে গেলা।
দরশন করিয়া পরমানন্দ হৈলা (ক)॥
ব্রহ্মকুণ্ড তীরে ঘোর বনের ভিতর।
বসিয়া চিন্তয়ে কৃষ্ণ আনন্দ অন্তর॥
পিতা তাঁর পরশুরাম ঢুঁড়িতে ঢুঁড়িতে (খ)।
বৃন্দাবনে গেলা দুই চারি লোক সাথে॥
বনে বনে ফিরি বহু অন্বেষণ করি।
না দেখিয়া উঠে এক উচ্চ বৃক্ষোপরি॥
বৃক্ষ হৈতে নিরখয়ে চারি দিগপানে।
দেখে বসি আছে বনে ধ্যান-পরায়ণে॥
নাম্বিয়া নিকটে গিয়া দেখে চমৎকার।
বাহ্যবৃত্তি নাহি চক্ষে বহে গঙ্গাধার॥
তেজে করিয়াছে আলো চৌদিগ ব্যাপিয়া।
মুখে না আইসে বাণী আশ্চর্য্য দেখিয়া॥
অষ্টাঙ্গ হইয়া দ্বিজ কৈল নমস্কার।
পিতা হৈয়া করিলেন শিষ্য-ব্যবহার॥
কিবা পুত্র কিবা কন্যা নীচ কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণভক্ত সেই পুজোত্তম হয়॥
বহুক্ষণ পরে বাঈজীর বাহ্য হৈল।
আঁখি মেলি সম্মুখেতে পিতারে দেখিল॥
নমস্কার করি হেটমাথে বসি রহে।
বিনয়-পূর্ব্বকে তবে পিতা কিছু কহে॥
মাতা মোর গৃহে চল বনেতে কি কাজ।
ঘরে বসি কৃষ্ণ ভজ করিয়া বিবাজ॥
তুমি মোর কুলের দীপক গৃহলক্ষ্মী।
অমৃতাভিষিক্ত হৈনু (গ) তোমারে নিরখি॥
তেঁহো কহে পিতা কেনে এত স্তুতি কর।
মোর লাগি এতো কেনে আগ্রহ বিস্তর॥
শ্যামলসুন্দর-সিন্ধু-তরঙ্গ-পাথারে।
ডুবিয়াছে মন মোর উঠিতে না পারে॥
দেহ নিঞা গিয়া মোর কি কাজ আছয়।
বৃথা কেনে আগ্রহ করহ মো বিষয়॥

পাঠান্তর—(ক) কিছুমাত্র অঙ্গে তার বেদনা নহিল।
(খ) কি জানি কি দুঃখে বনে জলে বা পশিল।
(গ) মনদুখ—নানা শোক।
(ঘ) ময়দানের মধ্যে—মাঠের মধ্যেতে।
(ঙ) মৃত এক উট পড়ি আছয়ে দেখেন॥

পাঠান্তর—(ক) পরমানন্দ হৈলা—আনন্দ মনে পাইল।
(খ) ঢুঁড়িতে ঢুঁড়িতে—খোজ করিতে।
(গ) অমৃতাভিষিক্ত হৈনু—অমৃতে ডুবিনু সিক্ত

মোর আশা ত্যাগ করি গৃহে চলি যাও।
মরিল যে জন তার পাছে কেনে ধাও॥
কালিয়া-পাথারে যেই ডুবিয়া মরিল।
সংসারের কর্ম্মে সেই অযোগ্য হইল॥
অতএব শুন পিতা ঘরে চলি যাহ।
ঘরে গিয়া কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদ করহ॥
বিষয়-বিষমে (ক) বৃথা ইন্দ্রিও চরাও।
দূরে তেজি তাহা সুধাসাগরে ডুবাও॥
বড় সুখ পাবে, দুঃখ যাইবেক দূর।
দিনে দিনে প্রেমানন্দ বাড়িবে প্রচুর॥
কহিতে কহিতে ধনী নয়নের জলে।
ভাসিয়া হইল মূর্চ্ছা পড়িলা ভূতলে॥
পরশুরাম দেখিয়া কন্যার ব্যবহার।
চমৎকৃত আপনারে করয়ে ধিৎকার॥
কান্দিতে কান্দিতে নৃপ ঘরে চলি গেলা।
রাজার সাক্ষাতে সব বৃত্তান্ত কহিলা॥
রাজা শুনি প্রশংসিয়া দেখিতে তাহারে।
বৃন্দাবনে গেল যথা বাঈজী বিহরে॥
দেখে যমুনার তীরে বসিয়া একাকি।
কৃষ্ণনাম জপিছে ঝুরিছে দুটি আঁখি॥
অষ্টাঙ্গ হইয়া রাজা প্রণাম করিল।
ঈষৎ নামাইয়া মাথা বাঈ প্রণমিল॥
রাজা বহু বাক্যে স্তুতি কতক্ষণ কৈল।
বাঈজীউ একবার দৃষ্টি না করিল॥
তবে রাজা ব্রহ্মকুণ্ডতীরে কিছু দূরে।
কুটীর করিতে আরম্ভিল তাঁর তরে॥
তেঁহো কহে অকর্ত্তব্য কুটীর বানাইতে।
বহু জীবহিংসা হবে মৃত্তিকা খনিতে॥
তথাচ রাজন (খ) পাকা কুটীর বানাঞা।
দিলেন তাঁহার দেহ রক্ষার লাগিয়া॥
বনমধ্যে তাহাতে রহিলা সতী ধনী।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে দিবস রজনী॥
শাক ফল মূল কভু চানা চিবাইয়া।
প্রাণরক্ষা হেতু মাত্র থাকেন খাইয়া॥

পাঠান্তর (ক) বিষয়-বিষমে—বিষয়-বিষে গ।
(খ) তথাচ রাজন—তথাপিহ রাজা।

কৃষ্ণের প্রেয়সী তেঁহো প্রেয়সীত্ব পাইলা।
যাঁর গুণ নাভাজীউ পুলকে বর্ণিলা॥
তাঁর সেই কুঠরী অদ্যাপি বর্ত্তমান।
না ভাঙ্গে না টুটে সদা আছয়ে সমান॥
করমেতি বাঈর কুটীর খ্যাত হয়।
তাহাতে কখন কোন বৈষ্ণব রহয়॥
তাঁর শ্রীচরণ-গুণ বর্ণিতে বর্ণিতে।
ক্ষণমাত্র শান্তি হৈল লালদাস চিতে॥
কিঞ্চিত দ্রবিল চিত্ত পূর্ব্ববত পুন।
কুঞ্জর-শৌচ[১] বিনে তৈল বাতি যেন॥

চরিত্র শ্রীখড়্গসেন

গোয়ালিয়র স্থানে এক বসতি কায়স্থ।
কৃষ্ণ-অনুরাগে সাধু সদা মনে ব্যস্ত॥
বড়ই উৎকণ্ঠা চিত্ত কৃষ্ণ-দরশনে।
হাহাকার করয়ে সদাই রাত্রি-দিনে॥
রাসযাত্রা পর্ব্ব সাধু ঠাকুরের আগে।
উন্মত্তের প্রায় নৃত্য করে অনুরাগে॥
করিতে করিতে নৃত্য বিরহ আবেশে।
পড়িলা ভূমেতে প্রাণ অমনি নিকশে॥
ঐমনি শ্রীনিত্যরাসলীলায় প্রবেশ।
শ্রীকৃষ্ণ সহিত নৃত্য হাস-পরিহাস॥
ভক্তির মহিমা মহা-অপার-সমুদ্র।
বঞ্চিত সুমূঢ় লালদাসিয়া অভদ্র॥

চরিত্র শ্রীপ্রেমনিধি

প্রেমনিধি নাম সাধু আগরা নিবাস।
শুদ্ধাচার অতি মতি শুদ্ধ সুপ্রকাশ॥
কৃষ্ণসেবা-রসে মন মগন সদাই।
অষ্টযাম যখন যে সেবার ত্রুটি নাঞি॥
আগরা সহর স্থান অনেক যবন।
জল আনিবারে নারে পরশ-কারণ॥

১। কুঞ্জর-শৌচ—হাতীর স্নান, ইহাতে কাদা দূর হয় না।

লোকভিড় নাহি থাকে অনেক নিশিতে।
সেইকালে জল হেতু যায় যমুনাতে॥
একদিন ঘোর মেঘ বর্ষে অতিশয়।
মহা অন্ধকার পথ দেখা নাহি যায়॥
কলসী লইয়া সাধু চলিলা যমুনা।
মশাল লইয়া যায় দেখে এক জনা॥
যে পথে চলয়ে সাধু আগে আগে যায়।
কে যায় মশাল ধরি সাধু না জানয়॥
যমুনায় জল ভরি ফিরিয়া আসিতে।
আগে আগে আইসে পুন সেই সেই পথে (ক)॥
প্রেমনিধি নিজ গৃহে প্রবেশ করিল।
মশালজী কোথায় গেল আর না দেখিল।†
ঘরে আসি চিন্তায় আকুল সাধুবর।
মশাল ধরিয়া আগে কে চলিল মোর॥
ঠাকুরের ঘরে যবে প্রবেশ করিল।†
সেই সে মশাল সিংহাসনেতে দেখিল॥
শ্রীহস্তে মশাল-গুল তৈল লাগিয়াছে।
চরণেতে কাদা অঙ্গে ঘর্ম্ম হইয়াছে॥
আর্ত্তনাদ করি সাধু মুছাইয়া দিলা।
সেই হৈতে রাত্রে আর যমুনা না গেলা॥
বৈকালে শ্রীভাগবত নিতি পাঠ করে।
গ্রামস্থ যে স্ত্রী পুরুষ আইসে শুনিবারে॥
দুষ্ট দ্বেষ্টা লোক গিয়া কহে পাৎসারে।
প্রেমনিধি পরস্ত্রী নিঞা আইসে ঘরে॥
ক্রোধ করি পাৎসা ধরি আনিতে কহিল।
চারি চোবদার (খ) ধরি আনিবারে গেল॥
বৈকালিক জলপান ঠাকুরেরে দিয়া।
পানার্থক জল পাছে দিবার লাগিয়া॥
যাইবার কালে সেই সমে চোবদার।
ধরিয়া লইয়া গেল নিকটে পাৎসার॥
পাৎসা হুকুম দিল কয়েদ করিতে।
কয়েদ করিল নিঞা পঞ্চতখানাতে॥

অন্তরে বড়ই দুঃখ রহিল সাধুর।
জল না পাইয়া রহে তৃষ্ণায় ঠাকুর॥
রাত্রিযোগে (ক) পাৎসা নিদ্রা সময় স্বপনে।
ক্রোধান্বিত বক্ষোপরি বসি একজনে॥
ঘাড় মুচড়িয়া ধরি কহে বার বার।
প্রেমনিধি সাধু প্রিয় ভক্ত যে আমার॥
তৃষ্ণাসমে জল দিতেছিল যে আমার।
জল দিতে নাহি দিল তুড়ুক তোমার॥
তৃষ্ণার্ত্ত রহিনু মুঞি জল না পাইয়া।
এ দুঃখ মিটাব আজি তোমায় মারিয়া॥
এখনো ছাড়ায়্যা (খ) ঘরে পাঠাও তাহারে।
নতুবা এখনি বধ করিব তোমারে॥
এতেক স্বপন দেখি জাগিয়া বিচারে।
তখনি ডাকিয়া নিজগণ-অনুচরে॥
প্রেমনিধি সাধুকে তখনি আনাইয়া।
স্তুতি-নতি করে বহু চরণে পড়িয়া॥
কহয়ে ঠাকুর তব তৃষ্ণার্ত্ত (গ) আছয়।
জলপান করাও এখনি গিয়া তায়॥
দুই চারি মশাল সহিত দিল তাঁর (ঘ)।
আনন্দিত হিয়া সাধু গিয়া শান্তিতর (ঙ)॥
স্নান করি পুন ভোগ রাগ-অর্পি দিল।
কর্পূর-বাসিত জল পান করাইল॥
লোকে ধন্য ধন্য সভে কহিতে লাগিলা।
তাঁহার প্রসাদে কত বৈষ্ণব হইলা॥
বিষয়-বিষম-তৃষ্ণা শান্তির কারণে।
লালদাস নিবেদয় তাঁহার চরণে॥

চরিত্র শ্রীকেশবরাম ভক্ত

ভক্ত শ্রীকেশবরাম সাধু সদাচারে।
তাঁহার সমান কেহো নাহিক সংসারে (চ)॥

পাঠান্তর—(ক) সেই সেই পথে—সেই পথে পথে।
(খ) চোবদার—চাপরাশি।
† মশালজী কোথায় .... প্রবেশ করিল।
এই চার পঙ্‌ক্তি বটতলার পুস্তক হইতে গৃহীত।

পাঠান্তর (ক) রাত্রিযোগে—রাত্রিতে।
(খ) ছাড়ায়্যা—ছাড়িয়া।
(গ) তৃষ্ণার্ত্ত—তৃষ্ণায়।
(ঘ) সহিত দিল তাঁর—সহিতে তাঁর দিল।
(ঙ) গিয়া শান্তিতর—ঘরেতে আইল।
(চ) কেহো নাহিক সংসারে—নাহি ত্রিসংসারে।

পরম দয়ালু পরদুঃখেতে কাতর।
কৃষ্ণভক্তি জানয়ে করিয়া রত্নসার॥
যারে দেখে তারে কহে—কৃষ্ণপদ ভজ।
বিষয়-বিষম-বিষ এইক্ষণে তেজ॥
সাম-দান-দণ্ড-ভেদ উপায় করয়।
কোনোমতে কৃষ্ণভক্তি লওয়াইতে চায়॥
চরণে ধরিয়া পড়ে ছাড়িয়া না দেয়।
যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণপদ নাহিক ভজয়॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া উন্মত্তবত ফিরে।
সব লোক ত্রাণ কৈল গ্রামে ঘরে ঘরে॥
তাঁহার প্রসাদে লোক বৈষ্ণব হইল।
দারুণ সংসার-সিন্ধু উদ্ধার করিল॥
কৃষ্ণনাম ঘরে ঘরে উচ্চস্বরে গায়।
ভবনদীতীরে যেন খেয়ারি বৈসয়॥
পার হওনের কালে বহু লোক মিলি।
কোলাহল করে যেন (ক) হৈয়া কুতূহলী॥
দয়ার সাগর গুণনিধি মহাশয়।
জীবের দেখিয়া দুঃখ দুঃখিত হৃদয়॥
পথে কোন লোক এক বলদের দেহে।
বেত্রাঘাত কৈল দেখি সাধু পুন (খ) কহে॥
কেনে ভাই আমারে করিলা বেত্রাঘাত।
সেই কহে কেন কহ হেন মিথ্যা বাত॥
সাধু কহে হয় নয় দেখ ভাই সভে।
বেত্রাঘাত চিহ্ন পৃষ্ঠে দেখে সভে তবে॥
গো-বিপ্র বৈষ্ণব অপমান মহাশয়।
সহিতে না পারে দেখি দহয়ে হৃদয়॥
তাঁহার সদ্গুণ-দয়া ভক্তির কণিকা।
লালদাস মাগে মানি প্রাণের অধিকা॥

চরিত্র শ্রীনরবরের রাজা

নরবর-দেশের রাজা মহাভাগবত।
সাধন-নিয়ম পাষাণের রেখাবত॥
স্মরণ মনন পূজা দণ্ডবত নতি।
আর যে নিয়ম কত আছে নিতি নিতি॥

পাঠান্তর—(ক) যেন—সবে।
(খ) পুন—তারে।

তাহার অন্যথা এক তিল নাহি হয়।
রাজ্য ধন পুত্র দারা প্রাণ যদি যায়॥
একদিন নিয়মিত পূজায় বসিয়া।
আছেন রাজন কৃষ্ণে মন আরোপিয়া॥
হেনকালে পাৎসা তার নগরে আসিয়া।
বোলাইলা কার্য্য লাগি লোক পাঠাইয়া॥
তাহে না আইলা রাজা উত্তর না দিলা।
ফিরিয়া আসিয়া লোক পাৎসারে কহিলা॥
শুনিয়া পাৎসা তবে ক্রোধ যে করিয়া।
আপনি চলিলা সঙ্গে ফউজ লইয়া॥
রাজা যথা পূজা করে তথা যে যাইয়া।
কটু কহি ডাকে হাতে তলওয়ার নিঞা॥
তথাচ উত্তর নাহি দিলা নৃপবর।
ক্রোধাবেশে পাৎসা তবে করিলা ওয়ার॥
এক পদ কাটিয়া ডারিল (ক) তথাপিহ।
বাহ্য নাহি কৃষ্ণে মন সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ॥
পাৎসার মনেতে কিছু (খ) চমৎকার হৈল।
দুই দণ্ড নিরখিয়া ভাবিতে লাগিল॥
এই যে পুরুষ এ তো সামান্য না হয়।
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র হইবে নিশ্চয়॥
রাজার (গ) নিয়ম তবে সমাপন কৈল।
ঠাকুরেরে দণ্ডবত উঠিয়া করিল॥
চরণে বেদনা তবে অনুভব হৈল।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা ভূমিতে পড়িল॥
লজ্জিত হইয়া তবে পাৎসা আপনি।
ধরিয়া তুলিয়ে তাঁরে কহে স্তুতি-বাণী॥
শুশ্রূষা করিয়া তাঁর পীড়া শান্তি কৈল।
গ্রাম-ভূম-আদি বহু ইনাম করিল॥
সেই ঠাকুরের সেবা নানাবিধি মতে।
অদ্যাপি বরাদ্দ আছে সরকার হৈতে॥
অলৌকিক সেই মহারাজার চরিত্র।
কৃষ্ণকৃপা যারে তারে এ কোন্ বিচিত্র॥

পাঠান্তর—(ক) ডারিল—ফেলিল।
(খ) মনেতে কিছু—মনে তবে।
(গ) রাজার—পূজার।

তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।
ধন্য হও যদি পদরজ পাও তাঁর॥

চরিত্র শ্রীজগদেব পমার

জগদেব নাম তাঁর খেয়াতি পমার।
কৃষ্ণভক্ত-সমাঝে তুলনা নাহি যাঁর॥
সে দেশের রাজার তনয়া ভাগ্যবতী।
কৃষ্ণভক্তা তেঁহো অতি সুশীলা সুমতি॥
বিবাহ দিবারে রাজা উদ্‌যুক্ত হইল (ক)।
কন্যা কারো দ্বারে নিজ মত জানাইল॥
জগদেব পমার যদি মোর স্বামী হয়। (খ)
নতুবা কাটারি দিব গলাতে নিশ্চয়॥
রাজা শুনি মনে কিছু বিচার করিল।
কন্যার চরিত্র বুঝি আনন্দ হইল॥
জগদেব সাধু কৃষ্ণভক্ত মহাশয়।
এই হেতু কন্যা মোর বরিতে চাহয় (গ)॥
ভাল ভাল আমার ভাগ্যের সীমা নাঞি।
হেন ভাগবত মোর হইবে জামাই॥
এতেক চিন্তিয় রাজা ডাকি জগদেবে।
বিনয়পূর্ব্বক কিছু কহে মৃদুভাবে॥
তুমি মম কন্যা অঙ্গীকর কৃপা করি।
যে প্রসাদে এ দুস্তর ভবসিন্ধু তরি॥
পমার কহেন মুঞি বিভা না করিব।
বনেতে গমন করি শ্রীকৃষ্ণ ভজিব॥
বহু যত্ন কৈলা রাজা নহিল সম্মত।
কন্যারে বিশেষ তবে কহিল পরত॥
কন্যা শুনি বড়ই ক্ষোভিত হৈল মনে।
অন্ন জল তেয়াগিল তাহার কারণে॥
রাজা রাণী শোকাকুলি উপায় না দেখি।
কন্যার আগ্রহে (ঘ) অতিশয় মনোদুঃখী॥
এক দিন রাজার সভায় নাচে নটী।
কৃষ্ণলীলা গায় নটী অতি পরিপাটী॥

পাঠান্তর—(ক) উদ্‌যুক্ত হইল—উদ্‌যোগ করিল।
(খ) কন্যা কহে জগদেব যেন স্বামী হয়।
(গ) মোর বরিতে চাহয়—বিভা করিবারে চায়।
(ঘ) আগ্রহে—কারণ।

পমারে করিল নিমন্ত্রণ শুনিবারে।
পমার শুনিতে আইল আনন্দ অন্তরে॥
সম্মান করিয়া রাজা বসাইল তাঁরে।
গান শুনি মহাভাব সাধুর সঞ্চারে॥
আনন্দসাগরে ভাসি কহে নটিনীরে।
অমৃত করালো পান কি দিব তোমারে॥
ধন কিছু নাহি মোর দেহ মাত্র এই।
কি দিয়া শুধিব ঋণ প্রাণ চাহ দিই॥
হাসিয়া নটিনী কহে প্রাণ চাহি দেহ।
শুনিঞা কহয়ে সাধু এই দিই লহ॥
এতো কহি নিজ মাথা কাটিয়া তৎক্ষণে।
ঐমনি ডারিয়া দিল নটিনী চরণে॥
চিকের ভিতর হৈতে রাজকন্যা দেখি।
কান্দিয়া আকুল হৈল ঝরে দুটি আঁখি॥
পমার আমার স্বামী মরিল বলিয়া।
কান্দে ধনী দুই কর বুকেতে হানিঞা॥
রাজারাণী আদি সভে সান্ত্বনা করিতে।
কহে মোর প্রাণ চাহে বাহির হইতে॥
যদি মোর এই প্রাণ রাখিবারে চাহ।
পমারের কাটা মুণ্ড আনি মোরে দেহ॥
তবে সেই কাটা মুণ্ড তারে আনি দিল।
রাজকন্যা তাহা এক পাশেতে রাখিল॥
সম্মুখ হইয়া যবে দেখয়ে নয়নে।
পশ্চাত হইয়া মুণ্ড ফিরয়ে আপনে॥
পুন থালী ফিরাইয়া সম্মুখ করয়।
পুন মুণ্ড আপনিহ পশ্চাত সে হয়॥
স্ত্রীসঙ্গ না করিব যে প্রতিজ্ঞা আছিল।
মরিলেও সেই সমস্কার প্রকাশিল॥
পুন রাজকন্যা সেই ধড় আনাইয়া।
মুণ্ড স্কন্ধোপরি ধরি দিল বসাইয়া॥
বসাইবামাত্র যোড় লাগি পূর্ব্বমত
হইল শরীর যাথে (ক) কৃষ্ণের ভকত॥
চেতন পাইয়া পুন ফিরিয়া বসিল।
রাজকন্যা বহু স্তুতি করিতে লাগিল॥

পাঠান্তর (ক) হইল শরীর যাথে—জীয়াই হইল সেই

অঙ্গসঙ্গ তোমারে করিতে নাহি কহি।
দাসী অঙ্গীকার মোরে কর মাত্র এহি॥
তোমার সেবাতে মুঞি কৃতার্থ হইব।
কৃষ্ণনাম লীলা-গুণ সদাই শুনিব॥
এই বাঞ্ছামাত্র মোর কৃপা কর মোরে।
নতুবা তেজিব প্রাণ কহিল তোমারে॥
এতেক শুনিঞা সাধু আনন্দিত হৈল (ক)।
কৃষ্ণ-অনুরাগি রাজকন্যারে বুঝিল (খ)॥
হৃদয়ে জন্মিল সুখ প্রসন্ন হইয়া।
অঙ্গীকার কৈল তাঁর প্রীতি মানিঞা॥
চতুর্দ্দিগে লোক সব দেখি চমৎকার।
প্রশংসা করয়ে (গ) করে জয়-জয়কার॥
তবে দুই জনে তেজি বিষয় বিভোগ।
নিভৃতে থাকয়ে সদা ছাড়ি অন্য যোগ॥
কৃষ্ণকথা আলাপন বিনে অন্যকথা।
যথায় প্রসঙ্গ হয় নাহি যান তথা॥
পুন কৃষ্ণকৃপা হৈল দোঁহার উপরে।
ডুবিল দোঁহার মন প্রেমের পাথারে॥
প্রেমামৃতসিন্ধু-নীরে দোঁহে ক্রীড়া করে।
পরম নির্বৃত হৈল মায়া গেল দূরে॥
রাজার বৈষ্ণবে রীত হয় অসাধার।
কৃষ্ণভক্ত শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠা-শান্ত নির্ম্মৎসর॥
আর এক কন্যা তাঁর আছয়ে যুবতী।
ধর্ম্মেতে নাহিক মতি স্বভাব অসতী॥
এক যে বৈষ্ণব গৃহে কথোক দিবস।
থাকয়ে অন্দরে যায় আছয়ে বিশ্বাস॥
কিন্তু অন্তস্পটে সেই কন্যার সহিত।
আসক্তি জন্মিয়া দোঁহে হইল পিরীত (ঘ)॥
রাজা প্রাতঃকালে উঠি বাহির যাইতে।
দোঁহে মেলি ক্রীড়া করে ছাতে সেই পথে॥

দৈবাত অলসে নিদ্রা গেল দুই জনে।
উলঙ্গ হইয়া দোঁহে করি আলিঙ্গনে॥
রজনী প্রভাত হৈল তাহা নাহি জানে।
হেনকালে রাজা আইল মুখ প্রক্ষালনে॥
আগে গিয়া দেখে কন্যা বৈষ্ণব সহিত।
শুতিয়া (ক) আছয়ে কিছু নাহিক সম্বিত॥
দেখিয়া রাজন কিছু বিচার করিল।
যদ্যপি বৈষ্ণব হেন অতিক্রম কৈল॥
তথাপি আমার ইঁহো দন্ড-অর্হ নহে।
বৈষ্ণবের দন্ডকর্ত্তা কভু রাজা নহে (খ)॥
কৃষ্ণের ভকত হয়, কৃষ্ণ যার প্রভু।
অন্যের শাসন-অর্হ নহে সেই কভু॥
এতেক বিচার করি কিছু না কহিয়া।
নিজ উত্তরীয় বস্ত্র উড়নি লইয়া॥
তাহা-দোঁহার (গ) অঙ্গ ঢাকি গেলেন চলিয়া।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল দোঁহে উঠে চমকিয়া॥
রাজার উড়নি (ঘ) অঙ্গে দেখিয়া ভাবয়।
কম্পিত হইয়া উঠি গেলা নিজালয়॥
বৈষ্ণব সভায় অতি কম্পিত অন্তরে।
রাজা তাহা দেখি অতি সম্মান আচরে॥
পূর্ব্ব হৈতে অধিক ভক্তি আচরিল।
বৈষ্ণব অন্তরে তবে আনন্দ পাইল (ঙ)॥
বৈষ্ণব এতেক ভক্তি অতএব ধন্য।
সাধু সাধু সেই এক ত্রিজগতে মান্য॥
নির্ম্মৎসর মধ্যে (চ) তারে মানি শ্রেষ্ঠ করি।
তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কারি॥

পাঠান্তর (ক) আনন্দিত হৈল—আনন্দ অন্তরে।
(খ) রাজকন্যারে বুঝিল—বটে বুঝিয়া বিচারে।
(গ) প্রশংসা করয়ে—প্রশংসি সকলে।
(ঘ) দোঁহে হইল পিরীত—উভে হৈল বিপরীত।

পাঠান্তর—(ক) শুতিয়া—শয়নে।
(খ) কভু রাজা নহে—প্রভু, অন্য নহে।
(গ) তাহা-দোঁহার—উভয়ের।
(ঘ) উড়নি—উত্তরী।
(ঙ) পাইল—হইল।
(চ) নির্ম্মৎসর মধ্যে—সকলের মধ্যে।

ইতি শ্রীভক্তমাল শ্রীমাধবসিংহ-রাজরাণী-আদি-ভক্তগুণ-বর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশ-মালা ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

চরিত্র শ্রীকৃষ্ণদাস সোণার

কৃষ্ণদাস নাম হয় সোণার বৈষ্ণব।
কৃষ্ণসেবা-পরায়ণ (ক) শুদ্ধ প্রেমভাব॥
দিবা রাত্রি নাহি জানে প্রেমসেবানন্দে। (খ)
চকোর যেমন সুধা পান করে চন্দ্রে॥
প্রাতঃকাল অবধি গঙ্গার স্রোত ন্যায়।
যখন যে সেবা তার ত্রুটি নাহি হয়॥
মধ্যে মধ্যে নিয়মিত নৃত্য গীতবাদ্য।
করেন নিতানি সাধু অনুরাগ-সিদ্ধ॥
একদিন নৃত্য গীত করিতে করিতে।
পায়ের নূপুর খসি পড়িল ভূমেতে॥
নৃত্য দেখি ঠাকুরের আনন্দ জন্মিল।
কিন্তু রসান্তর হৈল নূপুর খসিল॥
আপনি সামান্য বালকের রূপ ধরি।
নূপুর চরণে পরাইল যত্ন করি॥
কে তুমি কহিতে সাধু আর দেখা নাঞি।
সংশয় সাধুর মনে হইল বড়ই॥
স্নেহাবেশে অনুযোগ অনেক করিল।
প্রণয় কলহেতে ধিৎকার বহু দিল॥
ভৃত্যের চরণ ধরি নূপুর পরাল্যে।
ছি ছি তব লাজ নাঞি ঘৃণা না করিলে॥
ঠাকুর শুনিয়া তাহা চমকিয়া (গ) হাসে।
তাহার মরম নাহি বুঝে লালদাসে॥

চরিত্র শ্রীকৃষ্ণদাস সাধু

গোবর্দ্ধনবাসী কৃষ্ণদাস মহাশয়।
গোফাতে থাকেন কৃষ্ণভক্তির আলয়॥
দিবানিশি কৃষ্ণনাম উচ্চস্বরে গায়।
আহার বিহার ক্ষুধা তৃষ্ণা না বাধয় (ক)॥
কৃষ্ণ বলি সদাই করুণা করি ডাকে।
উন্মত্ত সদাই সাধু প্রেমানন্দ সুখে॥
এক দিন গোফার দুয়ারে এক ব্যাঘ্র।
আসি দাণ্ডাইল ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি উগ্র॥
সাধু তারে দেখি বহু সম্মান করিল।
অতিথি বলিয়া আনি আসন অর্পিল॥
খাইতে কি দিব বলি করয়ে চিন্তন।
মাংসভোগী হয় ব্যাঘ্র আদি পশুগণ॥
মাংস আর কোথা পাব নিজ অঙ্গ বিনা।
এতো ভাবি নিজ পদ কাটিয়া আপনা॥
ব্যাঘ্রেরে ভোজন করিবারে সাধু দিল।
ব্যাঘ্র তো ভোজন করি উঠিয়া চলিল॥
কর্ম্মীর আকার পাছে কেহ করে মনে।
সাধুর আশয় গূঢ় কেহ নাহি জানে॥
পরদুঃখে দুঃখী কৃষ্ণভক্তের স্বভাব।
নাহি দেখে নিজ সুখ-দুঃখ লাভালাভ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে রতি করিয়া কামনা।
তাঁহার চরণে চাহি সোঁপিতে (খ) আপনা॥

চরিত্র শ্রীগদাধর ভট্ট

বরহানপুরের সন্নিকটে এক গ্রাম।
তাহাতে বসতি হয় গদাধর নাম॥
অপূর্ব্ব মন্দিরে কৃষ্ণসেবা অনুপাম।
লালবিহারী হয়েন শ্রীঠাকুরের নাম॥

পাঠান্তর—(ক) কৃষ্ণসেবা-পরায়ণ—কৃষ্ণপ্রেম-পরায়ণ।
(খ) দিবানিশি জানি প্রেম সেই প্রেমানন্দে।
(গ) চমকিয়া—মূর্চ্ছাকিয়া।

পাঠান্তর—(ক) বাধয়—বাধয়।
(খ) সোঁপিতে—অর্পিতে।

দিবানিশি নানা উপচারে সেবা করে।
বৈষ্ণবে পীরিত সেবা কতেক প্রকারে॥
কিন্তু যে সঞ্চয় অর্থ অন্ন-আদি করি।
কিছু মাত্র নাহিক রাখয় ঘরে ধরি॥
অন্ন জল ফল-মূল (ক) যখন যা পায়।
সংস্কার করিয়া ভোগ তখনি লাগায়॥
তথাপিহ নিত্য হয় মহামহোৎসব।
নানা ভোগ লাগে খায় (খ) শতেক বৈষ্ণব॥
কৃষ্ণেতে প্রসন্ন যেই (গ) তার কি অভাব।
না চাহিতে হয় তার চতুর্ব্বর্গলাভ॥
এক দিবস যে প্রহর দুই হৈল।
সেবা নাহি হয় দ্রব্য কিছু না মিলিল॥
আনন্দে বসিয়া সাধু হরিগুণ গায়।
ঠাকুর আনিবে মনে আছয়ে নিশ্চয়॥
হেনকালে এক মহাজন দুই শত।
টাকা দিয়া ঠাকুরের করিল প্রণিপাত॥
সেই দুই শত টাকা তখনি লইয়া।
সামগ্রী আনিয়া নানা পাকাদি করিয়া॥
ভোগরাগ দিয়া মহামহোৎসব কৈল।
কল্য কি হইবে বলি কিছু না রাখিল॥
নিতি নিতি এই মত করে মহোৎসব।
প্রেমানন্দে কাটে কাল নাহি কোন ক্ষোভ॥
কোন সে বিষয়সার মস্তকে ধরিল।
ইঁহারা সেই বিষয়ের মাঝে পদ দিল॥
বিষয় লাথাইয়া ভুকে তাঁর পদদ্বয়।
মস্তকে ধরণ (ঘ) করি শক্তি নাহি হয়॥
যে হেতুক মহতের যে চরণ-আঘাতে।
মরি না বাঁচি সদা মগন যাতনাতে॥
বৈষ্ণব গোসাঁঞি বিনে ইহার উপায়।
এই ভক্তি লালদাস না দেখয়॥

পাঠান্তর—(ক) জল মূল ফল ফুল।
(খ) লাগে খায় খায় নিত্য।
(গ) কৃষ্ণেতে প্রসন্ন যেই—শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন যারে।
(ঘ) ধরণ ধরিব।

চরিত্র শ্রীভগবান দাস

ভগবান দাস নাম একান্ত নৈষ্ঠিক।
ভজন নিয়ম যেন পাষাণের রেখ॥
রাজা ছল করি তাঁর নিষ্ঠা বুঝিবারে।
সহরে ঢেঁড়রা দিল নিজ ভৃত্যদ্বারে॥
তিলক তুলসী মালা যে জন ধরিব।
তৃতীয় দিবসে তার মস্তক ছেদিব॥
অনৈষ্ঠিক যাহারা তাহারা তাহা শুনি।
কণ্ঠী তিলকহীন হইল অমনি॥ (ক)
ভগবান দাস কহে এ বড় প্রমাদ।
কণ্ঠি তিলক ছাড়ি জীবনে কি সাধ॥
যায় যাবে পরাণ বাঁচিয়া কিবা ফল।
যদ্যপি ছাড়িতে হয় তুলসীর মাল॥
পরাণ থাকিতে এতো না পারি ছাড়িতে।
মৃত্যু তো নিশ্চয় আছে কি ভয় তাহাতে॥
এতো কহি সর্ব্বাঙ্গে তিলক ছাপা কৈল।
কণ্ঠ-ভরিয়া কণ্ঠী ধারণ করিল॥
দুই তিন দিন পরে রাজা বোলাইল।
ভক্তিনিষ্ঠা জানি তাঁরে পরিতোষ হৈল॥
যাহারা ভয়েতে মালা তিলক ছাড়িল।
তাহাদিগে লজ্জা দিয়া ভক্তি শিখাইল॥
রাজার চরণে করি কোটি পরণাম।
আমা সবাকারে যদি শিখান ধরম॥

চরিত্র শ্রীসুবার দেওয়ান

সুবার দেওয়ান এক বড় ভক্তিমান।
বিষয় করেন কিন্তু কৃষ্ণপদে মন॥
স্বভাব সুশান্ত নির্ম্মৎসর দয়াশীল।
কৃষ্ণ বিনে মিথ্যাকার (খ) দেখয়ে অখিল॥
স্ত্রী তাঁর তেমতি সুবিজ্ঞা (গ) কৃষ্ণভক্তা।
গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবে সমান অনুরক্তা॥

পাঠান্তর—(ক) তিলক তুলসী মালা তেজিলা তখন॥
(খ) মিথ্যাকার—মিথ্যা সব।
(গ) তেমতি সুবিজ্ঞা—সুবিজ্ঞা সুশীলা।

গুরু গৃহে আইলেন অতি ভক্তিভাবে।
স্ত্রীপুরুষ মিলি কায়মনবাক্যে সেবে॥ (ক)
গুরুর গমন-কালে বিদায়-কারণ।
কি দিব স্ত্রীকে তবে পুছেন দেওয়ান॥
স্ত্রী কহে যদ্যপি আমারে জিজ্ঞাসহ।
তবে যে উচিত (খ) যদি মোর বাক্য লহ॥
'সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ' এইত প্রমাণ।
যাঁরে সমর্পণ যে (গ) করিলে দেহ প্রাণ॥
অতএব গৃহ অর্থ সকলি সঁপিয়া।
চলহ বাহির হই এক বস্ত্র নিঞা॥
কৃষ্ণ পাইবার পথ বড়ই সুগম।
পরম উপায় যে পাইতে প্রেমধন॥
যাঁর দ্রব্য তাঁরে দিয়া পাবে রত্নসার।
ইহাতে কি পরামর্শ কিবা সে (ঘ) বিচার॥
স্ত্রীর সুন্দর বাক্য সাধুর সম্মত।
বেদের নিগূঢ় সার পরম সিদ্ধান্ত॥
শুনিঞা দেওয়ান তাঁরে প্রশংসিয়া কহে।
গদগদ স্বরে দুটি চক্ষে ধারা বহে॥ (ঙ)
ধন্য তুমি তোমার বালাই নিঞা মরি।
স্ত্রীর এমতি মতি কভু নাহি হেরি॥
তোমার মায়ায় আমি হইয়া মোহিত।
সঞ্চয় করি যে মুঞি অর্থে মোর প্রীত॥
সেই তুমি তাতে যদি অনাসক্ত হৈয়া।
গুরুকে সর্ব্বস্ব দিতে হৃষ্ট হৈল হিয়া॥
ইহার অধিক আর সুখ কিবা আছে।
এ মোহে তরিনু যাথে কৃষ্ণ পাব পাছে॥
ভাল ভাল তবে সেই অবশ্য-কর্ত্তব্য।
চল নিকশিয়া যাই দিয়া সব দ্রব্য॥
তবে স্ত্রী নিজ অঙ্গ-ভূষণ যতেক।
খুলিয়া ধরিল অঙ্গ (চ) অঙ্গের প্রত্যেক॥

পাঠান্তর—(ক) কায়মনোবাক্যে স্ত্রী পুরুষে দোঁহে সেবে।
(খ) তবে যে উচিত—উচিত কহিব।
(গ) যাঁরে সমর্পণ যে—সমর্পণ যাঁহারে।
(ঘ) কিবা সে—কি আছে।
(ঙ) গদগদ বাক্যেতে নয়নে ধারা বহে।
(চ) অঙ্গ—সর্ব্ব।

দুই হস্তে দুই গাছি বান্ধি রাঙ্গা সূত্র।
স্বামী বর্ত্তমান চিহ্ন রাখিলেন মাত্র॥
দুই বস্ত্র দুজনার পরিধান হয়।
তাহাই লইয়া মাত্র দোঁহে নিকশয়॥
গুরুকে সর্ব্বস্ব সাধু সমর্পণ কৈল।
গুরু তাহা নাহি নিল দোঁহে হেঁট হৈল॥
সাধু স্ত্রী পুরুষে মেলি চাহে সমর্পিতে।
গুরু শিষ্য প্রীতি স্নেহে না চাহেন নিতে॥
গুরু আজ্ঞা করি তবে গৃহে চলি গেলা।
আজ্ঞাক্রমে সেই গৃহে বসতি করিলা॥
গুরু সেই অর্থ কিছু গ্রহণ না কৈলা।
কিন্তু ছলে বলে পাছে তাঁরি সাৎ কৈলা॥
তাঁহার চরণরজঃ হৃদয়ে অর্পিয়া।
ভকতির কণা মাগে এ লালদাসিয়া॥

চরিত্র শ্রীলালমতি বাই

লালমতি বাই নাম শুন তাঁর কথা।
ভক্তিপথে নাহি বুঝি তাঁহার সমতা॥
বুঝি তেঁহো ভকতি দেবীর প্রিয় ধন।
অথবা দেবীর তাঁর অঙ্কেতে বিশ্রম॥
কিংবা তাঁর অঙ্কের কিরণ লালমতি।
কিংবা তেঁহো স্বয়ং প্রকাশরূপে স্থিতি॥
গুরু কৃষ্ণ ভক্ত ভক্তি এক করি জানে।
অন্য সেবা দেবী কর্ম্ম জ্ঞান নাহি মানে।
অনন্যমাধুর্য্য দৃঢ় অচলা ভকতি।
অষ্ট সাত্ত্বিক মহাপ্রেমময় রতি॥
দিবা নিশি জ্ঞান নাহি কৃষ্ণময় দেখে।
কৃষ্ণনাম বিনে অন্য শব্দ নাহি মুখে॥
আহার বিহার নিদ্রা কোনো চেষ্টা নাহি।
হা হা কৃষ্ণ বলিয়া ফুৎকারে (ক) রহি রহি॥
বৈষ্ণব দেখিয়া শ্রীল কৃষ্ণবুদ্ধি করি।
প্রেমাবেশে কান্দয়ে চরণযুগ (খ) ধরি॥

পাঠান্তর (ক) ফুৎকারে ফুকারে।
(খ) চরণযুগ চরণদুটি।

বৈষ্ণব অধরামৃত-পাদোদক রজ।
সেবন করেন সদা ধরেন হৃদিমাঝ॥
বৈষ্ণবের গুণগান ছন্দ গাঁথা গীত।
দুর্ব্বাসাকে ভগবান কহে যেই নীত॥
নাম-গুণ-লীলা সদা উচ্চস্বরে গায়।
দুই চক্ষে যেন গঙ্গাধারা বহি যায়॥
কৃষ্ণকৃপা পূর্ণ যাতে চারি তত্ত্বে সম।
চেন্যে এক একে চারি নাহিক বিষম॥

দোঁহা—হিন্দী

ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু চতুর নাম বপু এক।
ইনকে পদ বন্দন করৈ নাশৈ বিঘন অনেক॥ ইতি
অতএব উপদেশ সাধুর সিদ্ধান্ত।
উপনিষদের মতে সিদ্ধান্ত নিতান্ত॥
চারি এক একে চারি জানিঞা নিশ্চয়।
শরণ লইতে তবে লালদাস ধায়॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীকৃষ্ণদাস সোণার-আদি-ভক্তগণ-গুণ কথনং নাম **পঞ্চবিংশ-মালা** ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

শ্রীকৃষ্ণলীলা সহ শ্রীবৃন্দাবন
মহিমা কথনম্

এবে কহি বৃন্দাবন ধামের মহিমা।
পরম অদ্ভুত যার নাহি হয় সীমা॥
মথুরা-মণ্ডল ব্যাপি লীলা অনুকূল।
গিরি নদী বৃক্ষ বন মহিমা অতুল॥
কূপ সরোবর আদি ভুবনপাবন।
প্রধান প্রধান কিছু করিব বর্ণন॥
সপ্ত গিরি, চারি ধাম, দ্বাদশ (ক) বন।
দ্বাদশ উপবন হয় পরম মোহন॥ (খ)
ত্রিসপ্ত কদম্বখণ্ডি, সপ্ত বট হয়।
সপ্ত নদী, সপ্ত সরোবর বিরাজয়॥
চৌরাশীতি কুণ্ড হয়, চৌরাশীতি কূপ।
অসংখ্য লীলার স্থান লীলা-অনুরূপ॥
তা-সবার নাম সঙ্কীর্ত্তন পুনঃ করি।
মহিমা গুণের কথা কহিবারে নারি॥
বর্ষানের গিরি নন্দীশ্বর গিরিবর।
কাম্যবনে গিরি কৃষ্ণপদ-চিহ্ন ধর॥
চরণপাহাড়ী বলি খ্যাত ত্রিজগতে।
অদ্যাপি দর্শন শ্রীচরণ-চিহ্ন তাতে॥
কদম্বখণ্ডির গিরি পরম মোহন।
যথা গূঢ় রাসলীলা সহ গোপীগণ॥
আদিবদ্রি গিরিবর পরম সুরম্য।
বদ্রিনাথ রূপে তথা কানন সুরম্য॥

চরণ পাহাড়ি যথা চরণ-গঙ্গা হয়।
গো মহিষ আদি তথা পদচিহ্নচয় (ক)॥
সপ্তম শ্রীগোবর্দ্ধন যাহার মহিমা।
বেদ বিধি-অগোচর না হয় বর্ণিমা॥
ইহার সভার মহিমা যে প্রত্যেকে বর্ণিতে।
নারিব বর্ণিতে তাহা যে আইসে বুদ্ধিতে॥
প্রথমে শ্রীনন্দীশ্বর গুণগান করি।
চিদানন্দময় নিত্য ব্রহ্মময় গিরি॥
যোগপীঠ যোগেশ্বর জগত-আরাধ্য।
পরাৎপর কৃষ্ণ-ক্রীড়া ধাম নিত্যসিদ্ধ॥
পিতা শ্রীল-নন্দরাজ মাতা শ্রীযশোদা।
গো গোপ গোপিকা সহ যথা লীলা সদা॥
প্রাতঃকালে মাতা গাত্রোত্থান করাইয়া।
ক্রোড়ে করি শত শত চুম্বন করিয়া॥
অশ্রুজলে ভাসি যায়, স্তনে ক্ষীর বহে।
স্নেহে মাতা নাহি ছাড়ে, কোলে করি রহে॥
স্বর্ণ অলঙ্কার কৃষ্ণ অঙ্গেতে শোভিত।
নীলরতন যেন সোনায় জড়িত॥
যশোদা মাতার কোলে তার শোভা কত।
ত্রৈলোক্যে উপমা তার নাহিক নিবারে॥
মায়ের অঙ্গনে কৃষ্ণ আলাইয়া গা।
নাচায় নূপুর পদ আধ আধ বা॥
বদন মায়ের স্কন্ধে করে কণ্ঠ ধরি।
মন্দ হাস্য শ্রীবদনে চমৎকারকারী॥
নাসায় দোলক গজমতি আন্দোলিত।
কি আশ্চর্য্য তাহা হেরি ভুবন মোহিত॥
লালন করয়ে মাতা ছাড়িতে না পারে।
ভুমেতে বসিতে মাতা অঙ্গনা বিহারে॥
কতক্ষণ পরে তারে দাসগণ দ্বারে।
মুখপ্রক্ষালন আদি করান সাদরে॥

পাঠান্তর—(ক) দ্বাদশ—দ্বাদশ যে।
(খ) দ্বাদশ উপবন হয় পরমমোহন।

পাঠান্তর—(ক) পদচিহ্নচয় পদচিহ্ন যার বা পদচিহ্ন হয়।

অলঙ্কার-বস্ত্র তবে পরাইয়া দিলা।
বলরাম সহ গো-দোহন হেতু গেলা॥
গো-দোহন করে মধুমঙ্গল সহিতে।
হেনকালে শ্রীরাধিকা সখীর সহিতে॥
কৃষ্ণ লাগি অন্ন আদি পাক করিবারে।
আইলেন শ্রীযশোদা-মাতার আগারে॥
নব গোরোচনা মিশা সোনার পুতলী।
ক্ষীণ মধ্যভাগ তাহে শোভয়ে ত্রিবলী॥
অঙ্গের ছটায় দশদিক আলোকিত।
সুস্থিরচপলা যেন বেড়িয়া উদিত॥
সুন্দর কুটিল নব কাদম্বিনী জিনি।
স্থূল গাফা (ক) কেশ পৃষ্ঠে লোঠন দুলনি॥
অপূর্ব্ব লোহিত কটি-বসন ঘাগরা।
ঝালর তাহার প্রান্তে দোলে মণি-হীরা॥
সূক্ষ্ম নীল বস্ত্র অঙ্গে উড়ুনি শোভয়।
মণি মুক্তা হীরা ভরি খচিত তাহায়॥
চরণে মঞ্জীর হেমনূপুর পঞ্চম।
চলাইতে চরণ বাজিছে ঝম ঝম॥
কটিতে কিঙ্কিণী কণ্ঠে মুকুতার হারি।
মণি চন্দ্রহার শোভে উরোজ উপরি॥
অমূল্য (খ) রতন মণি সোনায় জড়িত।
বক্ষস্থলে শোভা করে কৃষ্ণ মনোনীত॥
কর্ণে রত্ন চৌড়ি তাহে ঝুমুকা লটকে।
নাসাতলে মুক্তা দোলে বিজুরি (গ) চমকে॥
নাসায় তিলক মৃগমদ সুশোভন।
চিবুকে কস্তুরী-বিন্দু শ্রীকৃষ্ণমোহন॥
সিন্দূরের বিন্দু ভালে অলক-কুন্তল।
অর্দ্ধকুণ্ডলী-রূপে করে ঝলমল॥
সোণার কমলে যেন ভ্রমরার পাঁতি।
হেমচন্দ্রোপরি যেন নবঘন কাঁতি॥
তাহার উপরে শোভে মণিময় সিঁথি।
হেম জড়াওনে আন্দোলিত মুক্তাপাঁতি॥

তাহে লগ্ন মধ্যে মণি (ক) মাণিক্যে রচিত।
চৌদিগে মুকুতা গাঁথা পরম শোভিত॥
টীকা আন্দোলায়মান সুচিক্কণ ভালে।
তাহে চমৎকার শোভা বদন-কমলে॥
বাহুযুগে বাজবন্ধ রতনে জড়িত।
তাটংক তাবিজ তাহে ঝাঁপা সুলম্বিত॥
নীলমণি চুড়ি করে কঙ্কণ বলয়া।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী হীরা-মাণিক-কলয়া॥
গজেন্দ্র-গমনে আইসে সঙ্গে সহচরী।
সমান বয়স বেশ পরম সুন্দরী॥
কৃষ্ণকথা-আলাপনে হাসিতে খেলিতে।
লোহিত পুষ্পের গেন্ডু লুফিতে লুফিতে॥
গোষ্ঠের খিড়কে আসি উপনীত হৈল।
কৃষ্ণে হেরি হৃদয়-কমল বিকশিল॥
সখীসহ পরম আনন্দে মগন হৈলা।
আড়নয়নে হেরি চমকিত ভেলা (খ)॥
প্রেমের বিকার লোকভয়ে সাম্ভালিয়া (গ)
সুবদনে দিলা আড়ঘোমটা টানিয়া॥
সেই যে গ্রীবার ভঙ্গি শ্রীহস্তের শোভা।
করতল রক্ত করপৃষ্ঠ স্বর্ণ-আভা॥
তাহাতে রতনাঙ্গুরী পরম মোহন।
হেরিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইলা মগন॥
আরো তাহে ছলক্রমে বসন উঘারি।
ঘোমটা খুলিয়া চাহে নয়ন পশারি॥
কৃষ্ণচন্দ্র তাহা হেরি পুলক-হৃদয়।
নিজানুসন্ধান ভুলি চমকিয়া চায়॥
প্রফুল্ল কমল হেরি যেমন ভ্রমর।
পূর্ণচন্দ্র হেরি যেন লোভিত চকোর॥
নবঘন পানে যেন চাতক চাহয়।
চন্দ্রের উদয়ে যেন সিন্ধু উথলয়॥
তেমনি কৃষ্ণের হৃদ-নয়ান উন্মত্ত।
রসলোভী জানিঞা রসের পরতত্ত্ব॥

পাঠান্তর (ক) গাফা—গাথা।
(খ) অমূল্য—অপূর্ব্ব।
(গ) বিজুরি—বিজলি।

পাঠান্তর—(ক) মধ্যে মণি—মধ্যমণি।
(খ) চমকিত ভেলা—সুখেতে ভাসিলা।
(গ) সাম্ভালিয়া—সম্ভালিয়া বা সাভালিয়া

ডুবিয়া রসের সিন্ধু (ক) উঠিতে নারয়।
আঁখি-মন-হীন কৃষ্ণ করাদি চালায়॥
দোহন করয়ে বাঁটে দুগ্ধ নাহি ক্ষরে।
শুধুই চালায় হস্ত বাহ্য নাহি স্ফুরে॥
ধবলীর ভরমে বর্দ্ধনপদ ছান্দি।
ভ্রমচেষ্টা দোহন করয়ে মুষ্টি বান্ধি॥
দোঁহ-মন দোঁহো-প্রেম সাগরে মগন।
দোঁহাকার ভ্রমচেষ্টা আত্ম-বিস্মারণ॥
প্রমাদ হেরিয়া ললিতাদি সখীগণ।
উপায় চিন্তিয়া তার কৈল সমাধান॥
প্যারীজীর সম্মুখ করিয়া আচ্ছাদন।
ঘেরিয়া চলিলা সভে করি আবরণ॥
নন্দালয়ে যাইয়া শ্রীযশোদা-চরণে।
প্রণাম করিলা সভে সুনম্রবদনে॥
মাতা শ্রীরাধিকা হেরি আনন্দিতা হৈলা।
ক্রোড়ে করি শত শত বদন চুম্বিলা (খ)॥
আহা বৎস তোমার বালাই লয়ে মরি।
তোমা সম গুণবতী ব্রজে নাহি হেরি॥
রূপে গুণে শীলে কর্ম্মে কুশল (গ) রন্ধনে।
এমন বালিকা আর না দেখি ভুবনে॥
আহা মরি কোন্ বিধি সিরজিল (ঘ) তোমা।
ত্রিভুবনে তোমা সম নাহিক উপমা॥
আমার কৃষ্ণের রূপ যেমন সুন্দর।
তাহার সহিত হয় তুলনা তোমার॥
বিধাতা বিমুখ মোরে বঞ্চনা করিল।
হেন যে রূপসী বধূ মোর না হইল॥
তথাচ আমার স্বাভাবিক হয় জ্ঞান।
তোমারে দেখিয়ে (ঙ) মোর বধূর সমান॥
এতো কহি বক্ষস্থলে (চ) স্নেহাবেশে রাখি।
বদন চুম্বয়ে মাতা (ছ) ছল ছল আঁখি॥

পাঠান্তর—(ক) ডুবিয়া রসের সিন্ধু—রসসিন্ধু মাঝে ডুবি।
(খ) বদন চুম্বিলা—চুম্বন করিলা।
(গ) কর্ম্মে কুশল—কর্ম্মকুশল।
(ঘ) সিরজিল—নিরমিল।
(ঙ) দেখিয়ে—দেখি যে।
(চ) বক্ষস্থলে—বক্ষোপরে।
(ছ) চুম্বয়ে মাতা—চুম্বন করে।

তবে আজ্ঞা দিলা মাতা রন্ধনে যাইতে।
লইয়া রোহিণী মাতা চলিলা ত্বরিতে॥
অনুগতা দাসী শ্রীচরণ ধোয়াইলা।
সোণার পুতলি গৌরী রন্ধনে চলিলা॥
যোগাইয়া দেন তবে শ্রীরোহিণী মাতা।
ক্ষণমাত্রে পাক কৈলা অমৃত-নিন্দিতা॥
কতেক ব্যঞ্জন তার না যায় বর্ণন।
শালায় পিষ্টক ক্ষীর স্বাদু বিলক্ষণ॥
অন্য গোপীগণ জলপানীয় সামগ্র।
বনাইলা সুন্দর হইয়া চিত্তব্যগ্র॥
উৎকণ্ঠা হইয়া মাতা কৃষ্ণে বোলাইয়া।
স্নান করাইয়া জলপান করাইয়া॥
শ্রীমধুমঙ্গল আর শ্রীদামাদি গণ।
কৃষ্ণের যতেক সখা প্রণয়-ভাজন॥
কৃষ্ণ বলরামে মাতা সভার সহিত।
ভোজন করায় অতিস্নেহে আর্দ্রচিত॥
ভোজনকালীন কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে।
কত বা কৌতুক করে হাসে কত রঙ্গে॥
বর্ণিতে নারিনু তাহা বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিনু কিছু ভোজনের ক্রিয়া॥
সমাপন করিয়া ভোজন আচমন।
শয়ন করিলা করি তাম্বুল চর্ব্বণ॥
দুই দণ্ড শয়ন করিয়া উঠি তবে।
গোচারণে গেলা দশ দণ্ড বেলা যবে॥
স্নেহেতে কাতর মাতা সাজাইয়া দিলা।
গোধন লইয়া সখাসঙ্গে গোষ্ঠে গেলা॥
কৃষ্ণের অধরামৃত ধনিষ্ঠা আনিঞা।
প্যারীজীরে দিল অতি গোপন করিয়া॥
সখীসঙ্গে মেলি প্যারী ভোজন করিলা।
কৃষ্ণ দরশন হেতু উৎকণ্ঠা হইলা॥
যশোমতি মাতা বহু আদর করিয়া।
মণি (ক) অলঙ্কার বস্ত্র দিলা পরাইয়া॥
কুন্দলতা সহ গৃহে দিলা পাঠাইয়া।
ঘরে গিয়া অট্টালিকা-উপরে চড়িয়া॥

পাঠান্তর—(ক) মণি—স্বর্ণ।

কৃষ্ণ দরশন করে উৎকণ্ঠিত হইয়া।
প্রেমেতে মূর্চ্ছিতা সখী রাখয়ে ধরিয়া॥
কৃষ্ণ চলি গেলা বনে (ক) না মিলে দর্শন।
বিরহে কাতর হেরি মিলি সখীগণ॥
গুরুজন-অনুমতি লইয়া আসিলা।
সূর্য্যপূজা ছলে বনে লইয়া চলিলা॥
বৃন্দাবনে গিয়া রাধাকুণ্ডতীর-কুঞ্জে।
অতি প্রিয় স্থান যাতে কৃষ্ণ মন রঞ্জে॥
তথায় মিলন হৈল কৃষ্ণের সহিত।
বাসনা পূরিল নিজ নিজ মনোনীত॥
অতএব শ্রীল নন্দীশ্বরে নিত্যলীলা।
অনাদ্যন্ত অখণ্ডিত পরম-রসিলা॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণের ধাম।
ত্রিজগতে একপূজ্য মান্য অভিরাম॥
তাঁহার চরণে করি কোটি কোটি নতি।
মরণে জীবনে মো সভার যেঁহো গতি॥

অথ কাম্যবনে চরণপাহাড়ির মহিমা-বর্ণন।

কাম্যবনে বহু লীলা কহিতে নারিব।
চরণপাহাড়ি গুণ কিঞ্চিত বর্ণিব॥
লুকালুকি কুণ্ড হয় তাহার পার্শ্বেতে।
গোপীসহ কৃষ্ণ জলক্রীড়া করে তাতে॥
জল ফেলাফেলি করি (খ) পিচকারী কেলি।
করিতে করিতে কহে গোপীগণ মেলি॥
জলে ডুবি থাকিতে কে কতক্ষণ পারে।
আইস সকলে ডুবি কহেন কৃষ্ণেরে॥
ইহা কহি গোপীগণ আপনে আপনে।
আঁখি ঠারাঠারি করে হসিত (গ) বদনে॥
ছল করি হারাইব ইহাতে কৃষ্ণেরে।
কেমন চতুর আছি বুঝিব ইহারে॥
কৃষ্ণ সহ এককালে সভাই ডুবিব।
চতুরাই করি মোরা উঠিয়া রহিব॥

কৃষ্ণ উঠিবার সমে জানি ডুব দিব।
আগেতে উঠিল বলি ছলে হারাইব॥
পাছে হাথতালি দিয়া টিটকারি দিব।
পণ করি চূড়া বাঁশী ছিনিঞা লইব॥
এতেক যুগতি করি ডুবে কৃষ্ণসহ।
খেলিতে খেলিতে হৈল প্রেমের কলহ॥
কৃষ্ণ কহে জিনিলাম তোমরা হারিলে।
গোপীগণ কহে তুমি লাজ না মানিলে॥
হারিয়া জিনিতে চাহ করিয়া অন্যায়।
বংশী কাড়িয়া লব দেখি কে রাখয়॥
কৃষ্ণ কহে পুন আইস ডুবি পণ করি।
তোমরা যদ্যপি হার কিংবা আমি হারি॥
তোমরা শতেক চুম্ব আলিঙ্গন দিবে।
নতুবা যে মোর স্থানে বুঝিয়া লইবে॥
কৃষ্ণের চাতুরী আর (ক) বাক্যের কৌশল।
দুই পক্ষে হয় নিজ প্রয়োজন ফল॥
গোপী তাহা না বুঝিয়া অঙ্গীকার কৈল।
পুন বুঝি মুচকিয়া মুখ ফিরাইল॥
পুনর্ব্বার এককালে ডুবিলা সবাই।
গোপীগণ উঠি দেখে (খ) কৃষ্ণ উঠে নাঞি॥
বহুক্ষণ হৈল যদি কৃষ্ণ না উঠিল।
মুখম্লানি হৈল সভার ভয় জন্মাইল॥ (গ)
কৃষ্ণ কেনে না উঠিল, কি হেতু ইহার।
আঁখি ছল ছল সভে কহে পরস্পর॥
খুঁজিয়া বুলয়ে সভে জলের ভিতরে।
কান্দিয়া আকুল সভে বিকল অন্তরে॥
মণিহারা ফণী যেন প্রাণ বিনে দেহ।
তেমনি না মিলে কৃষ্ণ স্থির নহে কেহ॥
ব্যাধের বাণেতে যেন চঞ্চল হরিণী।
ইতি উতি ধায় কান্দে করি উচ্চ ধ্বনি॥
কৃষ্ণচন্দ্র ডুবি জলের ভিতর হইয়া।
গমন করিয়া গিয়া পর্ব্বতে চঢ়িয়া॥

পাঠান্তর (ক) [illegible]।
(খ) করি কর।
(গ) হসিত হর্ষিত।

পাঠান্তর—(ক) কৃষ্ণের চাতুরী আর—শ্রীকৃষ্ণের চতুরাই।
(খ) গোপীগণ উঠি দেখে—গোপিকা উঠিয়া দেখে।
(গ) মুখ ম্লান হৈল সভার ভয় জন্মিল।

গোপীগণে কাতর দেখিয়া দুঃখ হৈল।
পর্ব্বত-শিখর হৈতে বংশী বাজাইল॥
সে যে বংশীধ্বনি তার উপমা না হয়।
অন্য পর কার কথা পাষাণ দ্রবয়॥ (ক)
পর্ব্বত সহিত দ্রবি মোহবত হৈল।
শ্রীচরণ-পদ্মচিহ্ন তাহাতে হইল॥
সুমধুর কোটি কোটি অমৃত নিন্দিত।
শুনি চমৎকার গোপী হইল মোহিত॥
সর্ব্ব তাপ গেল দূরে আনন্দসাগরে।
ভাসিল জানিঞা কৃষ্ণ পর্ব্বত উপরে॥
সুখের সাগর (খ) কৃষ্ণ রূপের মাধুরী।
হেরিয়া গোপীকা দেহ ধরিতে না পারি॥
কৃষ্ণ সঙ্গে মেলি তবে সুরঙ্গ কৌতুকে।
বিহার করয়ে দিবা নিশি নাহি দেখে॥
অতএব চরণপাহাড়ি ধন্য ধন্য।
মস্তকে বিরাজে যার শ্রীচরণ-চিহ্ন॥
কদম্বখণ্ডির গিরি যাঁহা রাসলীলা।
শোভা করে ফলে ফুলে গিরি ধাতু শিলা॥
আদিবদ্রি গিরিবর পরম মহত্ত্ব।
নর-নারায়ণ রূপে যথা কহে তত্ত্ব॥
অদ্যাপি বিরাজমান চতুর্ভুজ-রূপে।
নিজ নাম (গ) ধ্যান করে নিজ নাম জপে॥
ঐশ্বর্য্যমার্গের ভক্তি-অধিকারিগণ (ঘ)।
মুনি যোগী ঋষিগণের আশ্রয়ের স্থান॥
চরণপাহাড়ি খ্যাত অন্য গিরিবর।
কৃষ্ণ-বলরাম গো-মহিষ অনুচর॥
সভাকার পদচিহ্ন অদ্যাপি প্রকাশ।
কৃষ্ণপদ-চিহ্নোদ্ভব গঙ্গা তার পাশ॥
শ্রীচরণ-গঙ্গা বলি তাঁহার খেয়াতি।
ভুবনপাবনী তেঁহো সর্ব্বলোকগতি॥
একদিন কৃষ্ণ-বলরাম সখাসঙ্গে।
গো-মহিষ চারণ করয়ে রসরঙ্গে॥

পাঠান্তর—(ক) অন্যপরে কা কথা যে পাষাণ দ্রবয়।
(খ) সাগর—আগর।
(গ) নাম—রূপ।
(ঘ) ভক্তি-অধিকারিগণ—স্থলে অধিকারী-জন।

কৌতুকী হইয়া কৃষ্ণ বংশীধ্বনি কৈল।
মধুর ধ্বনিতে গিরি দ্রবীভূত হৈল॥
যেখানে যে সখাগণ গো মহিষ ছিল।
সভাকার পদচিহ্ন পর্ব্বতে হইল॥
কৃষ্ণ-বলরাম পদচিহ্ন স্থানে স্থানে।
হাটু গাড়ি বসেছিল সখা কোনখানে॥
তাঁহার যে চিহ্ন-দরশন অদ্যাপিহ।
অলৌকিক দুর্ল্লভ জগতে শুভাবহ (ক)॥
চরণপাহাড়ি-গিরিবর-পদছায়া।
আশ্রয় করিয়া হর তাপ পাপ মায়া॥
শ্রীমান্ যে গোবর্দ্ধন গিরিবর-রাজ।
তাঁহার তুলনা নাঞি ত্রিজগত মাঝ॥
অন্য পর কা কথা শ্রীবৈকুণ্ঠের সনে।
না হয় তুলনা যাঁর মহিমা কে জানে॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় কলেবর গোবর্দ্ধন।
গোবর্দ্ধন বিনে নাহি শোভে বৃন্দাবন॥
মথুরামণ্ডলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন।
বৃন্দাবন সর্ব্বোত্তম গিরি গোবর্দ্ধন॥ (খ)

তথাহি—

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো (গ) বরা মধুপুরী তত্রাপি
রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাৎ তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মধুপুরী বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ। মধুপুরীতে আবার বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহাতে রাসলীলা হইয়াছিল। তাহাতে গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহা বিশালভুজ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসভূমি। সেখানে আবার রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহাতে গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের প্লাবন। অতএব গিরিতটে বিরাজিত এই রাধাকুণ্ডের সেবা কোন্ বুদ্ধিমান্ জন না করিবেন?

গোবর্দ্ধন দরশনে কৃষ্ণ দরশন।
গোবর্দ্ধন-শিলা-পূজা কৃষ্ণের পূজন॥

পাঠান্তর—(ক) শুভাবহ—সুখাবহ।
(খ) বৃন্দাবন মধ্যে সর্ব্বোত্তম গোবর্দ্ধন।
(গ) বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো—বৈকুণ্ঠাদপি বা।

গোবৰ্দ্ধন-শিলা-রূপে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
ইহাতে কুতর্ক যার সেই অন্ধজন (ক)॥
গোবৰ্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য যে লীলা।
রাধা সহ নানা কেলি পরম-রসিলা॥
কন্দ মূল ফল জল পুষ্প মুক্তা মণি।
অজস্র সুখদ স্বাদ কতেক ভাগুনি॥
মণিময় স্থান গৃহ উচ্চ নীচ স্থানে।
কল্পলতা-তরু শোভে তোরণ গঠনে॥
পনস খৰ্জ্জুর তাল গুবাক পিয়াল।
লতা আম্র (খ) বৃক্ষ-আম্র বেল বংশ শাল॥
নানা বৃক্ষ শ্রেণীমত পরমশোভিত।
বৃক্ষমূলে স্তম্ভবদ্ধ রতনে জড়িত॥
কৃষ্ণের পরম প্রিয় প্রেয়সী সহিত।
রাসলীলা সদা করে বসন্ত-উচিত॥
গোবৰ্দ্ধন নামের মহিমা পরাৎপর।
স্মরণ (গ) মাত্রেতে হয় কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
স্পর্শন দর্শন আদি পরম সাধন।
অল্প সঙ্গে মিলে ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
গিরিরাজ গোবৰ্দ্ধন চরণে শরণ।
লইনু করিনু নিজ দেহ সমর্পণ॥

সপ্ত সরোবর।

সপ্ত সরোবর হয় পরমমোহন।
তাহার মহিমা গুণ না যায় কথন॥
নয়ন নামেতে সরোবর রমণীয়।
নারায়ণ সরোবর মহামহোদয়॥
চন্দ্রসরোবর চন্দ্রাবলীজীর হয়।
পরম সৌন্দর্য্য তীরে কল্পবৃক্ষময়॥
কুসুম সরোবর তীরে কুসুমবিহার।
নন্দগ্রামে পাবন সরোবর মনোহর॥
বিশাখা সখীর পিতা পাবন আভীর (ঘ)।
তাহার নির্ম্মিত হয় সুধাসম নীর॥

প্রেম-সরোবর যবে কিশোরী-কিশোর।
সংকেত-মিলন হৈল গোপতে (ক) দোঁহার॥
বিচ্ছেদ কালে যে দোঁহার নয়ন ঝরিল।
তাহাতে সুন্দর সরোবর জনমিল (খ)॥
মান-সরোবর যার পরম মাধুরী।
মান করি যথা গিয়া বসিলেন প্যারী (গ)॥
কৃষ্ণের সুখদ অতি আনন্দজনক।
অতিশয় মহিমা পাবন সৰ্ব্বলোক॥

সপ্ত বট।

সপ্ত বটবৃক্ষ কৃষ্ণলীলা অনুকূল।
অতিশয় উচ্চ হন অতিশয় স্থূল॥
ভাণ্ডাবী নামে যে বট কৃষ্ণ যার তলে। (ঘ)
সখাগণ-সনে নিত্য নানা খেলা খেলে॥
শিঙ্গার নামেতে বট রাধা প্রেয়সীরে।
যার তলে বসি বেশ কৈল নিজ করে॥
বংশীবট নামে তার তলে দাণ্ডাইয়া।
বংশীধ্বনি কৈলা গোপীগণে আকর্ষিয়া॥
অক্ষয়-বটের তলে রাসাদিক করে।
সঙ্কেত যে বট প্যারী সহিত বিহরে॥
প্রথম মিলন (ঙ) যবে রাধা সনে হৈল।
দূতীগণ বটতলে সঙ্কেত করিল॥
সন্ধ্যা-অন্ধ কৃষ্ণ আসি তথায় রহিল।
দূতীগণ কিশোরীকে আনি মিলাইল॥
মুগ্ধাবস্থা নবীন যে নায়ক সহিত।
কখন মিলন নাহি ভয়েতে কম্পিত॥
কুঞ্জের ভিতর ধনি না যায় চলিয়া।
রহয়ে সখীর কটি ধরি জড়াইয়া॥
না না সখি চল আমি হেথা না রহিব।
উহার নিকটে মুঞি কি করিতে যাব॥
আধ আধ রোদন কিঞ্চিত রোষ করি।
টানয়ে সখীর কর করি জোরাবরি॥

পাঠান্তর (ক) অন্ধজন- অজ্ঞজন।
(খ) লতা আম্র--লতা নম্র।
(গ) স্মরণ--শরণ।
(ঘ) আভীর—আহীর।

পাঠান্তর—(ক) গোপতে—গোপনে।
(খ) জনমিল—নিরমিল।
(গ) বসিলেন প্যারী—বসিলা কিশোরী।
(ঘ) ভাণ্ডীর নামেতে বটবৃক্ষ যার তলে।
(ঙ) মিলন—শিঙ্গার।

সখীগণ কহে কেনে ভীত প্রায় সখি (ক)।
কৃষ্ণ যে সুখের নিধি হেরি হও সুখী॥
পরম বাঞ্ছিত অভিলাষের রতন।
বহু দুঃখে মিলে কৃষ্ণচন্দ্র হেন ধন॥
রসের সাগর কৃষ্ণ রূপের অবধি।
হৃদয়ে ধারণ কর হেন গুণনিধি॥
রসময় হেন যে উরজ চক্রবাকে।
চরাও অমিয়া-সুখ-হ্রদ কৃষ্ণবক্ষে॥
হেম-পদ্মমুখ কৃষ্ণ-নীলপদ্ম মুখে।
সখ্যতা করিয়া মিল প্রেমানন্দ-সুখে॥
কৃষ্ণ ইন্দ্রনীলমণি স্বর্ণকান্তি দিয়া।
অধিক শোভিত কর হেমে জড়াইয়া॥
হেমভুজ মৃণাল গ্রীবায় সমর্পিয়া।
মধুকর তৃপ্ত কর মুখ-মধু দিয়া॥
কৃষ্ণ-কাদম্বিনী পার্শ্বে রাকা-চন্দ্রানন।
উদয় করাও হবে পরম-মোহন॥
রসময় কৃষ্ণচন্দ্র, তুমি রসময়ী।
দোঁহে রসপান দোঁহে করহ অধ্যায়ী (খ)॥
তাহা শুনি কিশোরীর আনন্দ অপার।
অন্তরে বাসনা কিন্তু বাহ্যে ভাবান্তর॥
তবে সখী (গ) পৃষ্ঠে কর দিয়া বাহু ধরি।
কৃষ্ণ-আগে লইয়া যায়েন (ঘ) সভে ঘেরি॥
নহি নহি পুনঃপুন বলিয়া চলেন।
দুই পদ আগে যান, এক পা পিছেন॥
উহার নিকটে কেনে মোরে নিঞা যাহ।
কি কায আছয়ে তোমা-সভার তা কহ॥
কৃষ্ণরূপ হেরিয়া অন্তরে রসোল্লাস।
লজ্জা ভয় হেতু বাহ্যে অন্যথা প্রকাশ॥
অন্তর-আশয় চাহে উড়িয়া পড়িতে।
লজ্জা যে বৃহতী রাধা রাখে সঙ্কোচিতে॥

কৃষ্ণচন্দ্র (ক) হেরিয়া যে পরমরূপসী।
চমকিয়া চাহয়ে অনঙ্গরসে ভাসি॥
হেন চমৎকার রূপ কভু নাহি হেরি।
এ কি (খ) অপরূপ কান্তি ভুবন-সুন্দরী॥
সোনার লতিকা কিবা তাড়িতে জড়িত।
হেম-রাকা-চন্দ্র কিবা ভূমেতে (গ) উদিত॥
স্বর্ণ-কমলিনী কিবা পুঞ্জ সৌদামিনী।
কোন্ বিধি নিরমিল এ-হেন রমণী॥
অন্তরে না সহে ব্যাজ উরু (ঘ) দুরু দুরু।
অনিমিষে চাহিয়া রহয়ে তুলি ভুরু॥
সখীগণ ধরাধরি নিকটে আনিতে।
আগুসরি কৃষ্ণ কর ধরিতে চাহিতে॥
ঝঙ্কার করিয়া করে (ঙ) কর ফেলে ঠেলি।
শপথ কতেক দেয়, রসময় গালি॥
দুষ্ট লম্পট ধৃষ্ট মানা কর সই।
মোর অঙ্গস্পর্শ যেন কভু করে নাঞি॥
যে মোর অঙ্গেতে হাথ দিবে জোরাবরি (চ)।
গোধন শপথ তার বংশী যাবে চুরি॥
সখীগণ কর্ণে কর্ণে প্রবোধ জন্মায়।
শির হেলাইয়া পুন উলটিয়া ধায়॥
সখীগণ ধরি পুন অনেক তুষিয়া।
কৃষ্ণের নিকটে দিলা বামে বসাইয়া॥
যদ্যপিহ পরম উৎকণ্ঠা হৃদিমাঝ।
তথাপিহ না না না না কহে করি লাজ॥
কৃষ্ণচন্দ্র ধরি তবে আলিঙ্গিতে চাহে।
ঈষত রোদন মুখে না না না না কহে॥
উঠিয়া যাইতে পুন উদ্যম করিল।
কৃষ্ণচন্দ্র বক্ষস্থলে ধরি আগলিল॥
ঈষত রোদন করি করেতে ঠেলয়।
লম্ফ ঝম্ফ দিয়া সখীগণেরে ধরয়॥

পাঠান্তর—(ক) ভীত প্রায় সখি—ভীত প্রিয় সখী।
(খ) অধ্যায়ী—অঘাই।
(গ) তবে সখী—সখীগণ।
(ঘ) যায়েন—চলেন।

পাঠান্তর—(ক) কৃষ্ণচন্দ্র—কৃষ্ণরূপ।
(খ) এ কি—এ কে।
(গ) ভূমেতে—ভূতলে।
(ঘ) উরু—হিয়া।
(ঙ) করে—কহে।
(চ) জোরাবরি—জোর করি।

তাহাতে যে অভরণ-শবদ ঝমকে।
শুনিঞা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হৃদয় চমকে॥
অনিমিখে চাহে হৃদি করে দুরু দুরু।
হাথ যুড়ে সখী আগে নাচাইয়া ভুরু॥
মুচকি হাসিয়া সখীগণ আশ্বাসয়।
স্থির হও, বৈস তব পুরিব (ক) আশয়॥
তবে কৃষ্ণ ভ্রমে বসিলেন ভূমিতলে।
হাসিয়া (খ) রমণীগণ শ্লেষে কিছু বলে॥
এতো কেনে দিশাহারা হইলে নাগর।
আকাশের চান্দ কি হঠাত মিলে কর॥
ক্ষুধার্ত্ত হইলে কিবা গৌণ নাহি সহে।
অমৃতের আশয় কি মুখ মেলি রহে॥
এতো কহি বদনে বসন দিয়া হাসে।
চেতন পাইয়া কৃষ্ণ আসনেতে বৈসে॥
পুনর্ব্বার ধরি সঙে আনি কৃষ্ণ বামে।
বসাইলা সখীগণ দুঁহ ক্রমে ক্রমে॥ (গ)
বসিলেন কৃষ্ণচন্দ্রে পশ্চাত করিয়া।
সখীর বস্ত্র (ঘ) ধরি আড়-ঘোমটা টানিঞা॥
কৃষ্ণচন্দ্র সখীগণে কহে আঁখি ঠারি।
তোমরা বাহিরে যাহ দ্বার রুদ্ধ করি॥
মুচকি হাসিয়া সখীগণ উঠি যায়।
অঞ্চল ধরিয়া রহে নাহিক ছাড়য়॥
কৃষ্ণ কথাছলে অন্যমনা করাইয়া।
ছুটিয়া বাহির গেলা দ্বার লাগাইয়া॥
কৃষ্ণের কম্পিত অঙ্গ মদন-হুতাশে।
কমলে ভ্রমর যেন মধুর পিয়াসে॥
দুরু দুরু হিয়া অতি চঞ্চল হইল।
আলিঙ্গন করিবারে উদ্যম করিল॥
প্যারী করে কর ঠেলি উঠি একভিতে।
দাণ্ডাইলা কাঁপে অঙ্গ লজ্জা-ভয়-রীতে॥

পাঠান্তর (ক) পুরিব পুরাও।
(খ) হাসিয়া হাঁকিয়া।
(গ) পুন ধরাধরি করি আনি কৃষ্ণ আগে।
বসাইল সখীগণ কৃষ্ণ বামভাগে॥
(ঘ) বস্ত্র - বসন।

কৃষ্ণচন্দ্র যাই বহু মিনতি করয়ে।
মদনে মোহিত হৈয়া চরণে পড়য়ে॥
চরণে পড়িয়া কহে প্রসন্ন যে হও।
স্মর খরতর (ক) হৈতে আমারে তরাও॥
কৃষ্ণের করুণা শুনি দ্রবিল অন্তরে।
মনেতে বাসনা কিন্তু লাজে ভঙ্গি করে॥
তবে উন্মত্তের ন্যায় অধৈর্য্য হইয়া।
গাঢ় আলিঙ্গন কৃষ্ণ করে ধরি হিয়া॥
কৃষ্ণ-আলিঙ্গনে প্যারী বিবশ হইলা।
লোমাঞ্চ শরীর বক্ষে লটকি রহিলা॥
লজ্জা-ভয় গেল নিজদেহ পাসরিলা।
কৃষ্ণচন্দ্র বক্ষে ধরি শয্যায় লইলা॥
আলিঙ্গন চুম্বন করয়ে বারে বারে।
আকাশের চান্দ যেন মিলে গেল করে॥
চাতকেরে মিলে যেন মেঘ-বরিষণ।
শতাব্দ ক্ষুধিতে যেন মিলে সুধাপান॥
কত বা আদর করে কত বা তোষয়ে।
চিবুক ধরিয়া পুন বদন হেরয়ে (খ)॥
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে কপোলে কপোলে।
মিলিয়া চুম্বয়ে পুন বদন-কমলে॥
গিরিধর হেমগিরি হৃদয়ে ধরিয়া।
সহিতে না পারে ভার পড়ে আলুয়াইয়া॥
অঙ্গুলি অগ্রেতে যেঁহো পূর্ব্বে ধরে গিরি।
এবে হেমগিরি ধরে হৃদয় পসারি॥
তথাচ না পারে তার ভার সহিবারে।
ভূমে রাখি কোপে পুন উঠয়ে উপরে॥
বক্ষ দিয়া চূর্ণ করিবারে চাহে গিরি।
ভ্রমাইয়া উপাড়িতে চাহে করে ধরি॥
ক্রীড়ারস বিশেষ অমৃত পান করি।
হাস্য উপজিল তবে হেরিয়া সুন্দরী॥
সুন্দরী তখন লজ্জা পাইয়া উঠিয়া।
বিমুখ হইয়া বৈসে বস্ত্র সম্বরিয়া॥

পাঠান্তর—(ক) স্মর খরতর—খর স্মরশর।
(খ) হেরয়ে—চুম্বয়ে।

কৃষ্ণচন্দ্র পবন (ক) করয়ে বস্ত্র দিয়া।
মিষ্টবাক্য কহি মুখ দেয় মুছাইয়া॥
ধনী করপদ্মে কর ঝঙ্কার করিয়া।
উৎফুল্ল বদন কোপে ফেলায় ঠেলিয়া॥
পুন কৃষ্ণ-অঙ্গ-স্পর্শে লজ্জা দূরে গেল।
রসের উল্লাসে দোঁহে রজনী বঞ্চিল॥
প্রভাত সময়ে সখীগণ কুঞ্জে আসি।
বদনে বসন দিয়া কহে হাসি হাসি॥
কি করহ সখি হেথা কুঞ্জের ভিতর।
গৃহে না যাইতে চাহ পাইয়া নাগর॥
আহা মরি অঙ্গে ক্ষত বেশ ছিন্ন ভিন্ন।
মুখ ম্লান দেখি তাহে তাম্বুলের চিহ্ন॥
কৃষ্ণেরে কহয়ে তুমি কেমন গোঙার।
ছি ছি তব কেমন নিষ্ঠুর ব্যবহার॥
সোণার লতিকা রাই নব কমলিনী।
দলন করিলে করী মাতোয়ারা জিনি (খ)॥
পীড়া দিলে সর্ব্ব অঙ্গে পেষণ করিয়া।
উঠিতে নারয়ে (গ) রাই ধরণী ধরিয়া॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ হাসে মুচকিয়া।
লজ্জায় উঠয়ে রাই বস্ত্র সম্বরিয়া॥
ঝমকিয়া তুরিতে সখীর আড়ে গিয়া।
তর্জ্জন করয়ে সখীগণেরে ভর্ৎসিয়া॥
মিছা ইকি বলিস গো কিসের বা চিহ্ন।
অঙ্গ বা দলিল কেটা কিবা ছিন্নভিন্ন॥
তোদের সহিত আর কোথাও না যাব।
মিথ্যা অপবাদ এতো সহিতে নারিব॥
কবাট মুদিয়া মোরে রাখি গেলা কুঞ্জে।
পুন নানা কথা কহ মিছামিছি গঞ্জে॥
আমি ঘরে যাই বলি ক্রোধভরে ধায়।
খরতর করি দুই চারি পদ যায়॥
বিপর্য্যয় বস্ত্র গৌরী অঙ্গেতে আছয়।
তাহা দেখি সখীগণ হাসিয়া কহয়॥
সখি তুমি ঘরে যাও তার নাহি দায়।
পরের বসন কেনে উড়ি যাও গায়॥
তাহ শুনি নিজ অঙ্গ বস্ত্রপানে চায়।
লজ্জিত হইয়া এক পার্শ্বে গা (ক) দাঁড়ায়॥
সখীগণ পরস্পর মুচকি হাসয়।
সে কৌতুক দেখি কৃষ্ণ আনন্দে ভাসয়॥
তবে রাই ঈষত রোদন মৃদু হাস্য।
লজ্জার সহিত সে যে পরম রহস্য॥
আঁখি কচালিয়া পাছু (খ) গ্রীবা ফিরাইয়া।
ঈষৎ কুঞ্চিত আড়নয়নে চাহিয়া॥
সখীগণে কহে মোর বস্ত্র দেহ আনি।
দেহে মোর উড়াইলি (গ) কাহার উড়ানি॥
সখীগণ কহে তবে হাসিয়া হাসিয়া।
আমরা কখন দিনু উড়ানি আনিঞা॥
কাহার সহিত তুমি পরিবর্ত্ত কৈলে।
পুরুষের বস্ত্র কোথা কি জানি পাইলে॥ (ঘ)
তাহা শুনি ক্রোধমনে বঙ্কিম নয়ানে।
চাহিয়া ভর্ৎসন তবে করে সখীগণে॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ হৈতে তবে সখীগণ রঙ্গে।
নীল বস্ত্র নিঞা পরাইল রাই-অঙ্গে॥
নিজ অঙ্গ হৈতে রাই পীতবস্ত্র খুলি।
ঝঙ্কার করিয়া টানমারি দিল ফেলি॥
সে ভঙ্গি দেখিয়া কৃষ্ণ অনঙ্গ-সাগরে (ঙ)।
ভাসিয়া না পায় কূল তরঙ্গে সাঁতারে॥
তবে নিশি অবসান সূর্য্যের উদয়।
বুঝিয়া ত্রস্ত হৈল সখীগণচয়॥
রাই লইয়া যাইতে সভে উদাম করিলা।
কৃষ্ণচন্দ্র তাহে অতি নিরুৎসাহ হইলা॥
রাই মুখ ম্লান হৈল অন্তরে কাতর।
ছল করি কৃষ্ণ পানে চাহে বারে বার॥

পাঠান্তর—(ক) পবন—ব্যজন।
(খ) করী মাতোয়ার জিনি—যেন করি সরোজিনী।
(গ) নারয়ে—না পারে।

পাঠান্তর—(ক) পার্শ্বে গা—পার্শ্বেতে।
(খ) পাছু—পুন।
(গ) উড়াইলি—উড়াই দিল।
(ঘ) পুরুষের বস্ত্রখানি কোথায় পাইলে।
(ঙ) অনঙ্গ-সাগরে—আনন্দ সাগরে।

অতএব হেন রাসলীলা যে সংকেতে।
তাহার তুলনা দিতে কি আছে জগতে॥
সঙ্কেত-বটের পদে শরণ লইতে।
বড়ই বাসনা হয় লালদাস চিতে॥
নন্দবট নন্দ মহাশয়ের কীরিতি।
গোচারণ কালে স্নিগ্ধচ্ছায়ে বৈসে তথি॥
বন্ধুগণ সহ নানা কথোপকথনে।
বৈসেন করেন (ক) মিষ্ট অন্ন জলপানে॥
শ্রীমন্নন্দরাজ-মহাসুখ-অনুকূল।
ধন্য যে পরম শ্রেষ্ঠ সেই বটমূল॥
অতএব তাঁহার চরণে নমস্কার।
উপাস্য পরম ইষ্ট তেঁহো যে আমার॥

অথ যাবট—

যাবট কিশোরীজীর গ্রামের ভূষণ।
যাবট বলিয়া সেই গ্রামের আখ্যান॥
অভিমন্যালয় মণি-মাণিক্য-নির্ম্মাণ।
ঐশ্বর্য্য গোধন আদি নাহিক গণন॥
শ্রীমতীর পতি-অভিমানী অভিমন্য।
নপুংসক দৃষ্টিমাত্র পুরুষের চিহ্ন॥
জটিলা শাশুড়ী আর ননন্দা কুটিলা।
দেবর দুর্ম্মুখ নামে গোষ্ঠে সদা মেলা॥
অনঙ্গমঞ্জরী ভগিনীর তেঁহো পতি।
ভগিনীর সহ এক ঘরেতে বসতি॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী তেঁহো পরম রূপসী।
তুলনা নাহিক যাঁর জিনি কোটি শশী॥
সহজে মঞ্জরী সখী পরম প্রেয়সী।
শ্রীমতীর ভগ্নী তাহে অধিক সরসী (খ)॥
শ্রীমতীর মহল নির্জ্জন মণিময়।
সুন্দর তাহার শোভা বর্ণনা না হয়॥
গৃহ সব হেমময় জড়াও মণিতে।
তাহাতে রচনা লতাবৃটা চারিভিতে॥
মুক্তার ঝালর ক্ষুদ্র হীরার সহিত।
পাটের থোপনা তাহে অতি সুললিত॥

স্ফটিক মণির থাম্বা ঝলমল করে।
অপূর্ব্ব তোরণ শোভে হেরি মনোহরে॥
পদ্মরাগ চন্দ্রকান্তি মণির গঠন।
নানা চিত্ররেখা হয় স্বর্ণেতে জোটন (ক)॥
অপূর্ব্ব পালঙ্ক করিদন্তেতে নির্ম্মিত।
দুগ্ধফেণবত শয্যা তাহাতে শোভিত॥
পালঙ্কের অধো হয় কমল বিছানা। (খ)
তাহাতে বালিশ পার্শ্বে পাটের থোপনা॥
স্নান-ভোজনের বেশ-রচনের স্থান।
পৃথক্ পৃথক্ হয়ে অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ॥
সখী আর সেবাপরা মঞ্জরীর গণ।
দাসী-আদি করি তার না হয় গণন॥
প্রেমে সেবা করে সভে পরম উৎসাহে।
তাঁহার সুখের লাগি প্রাণ দিতে চাহে॥
শ্রীমতীর সুখের সুখি দুখের দুখি।
কিসে বা জন্ময়ে সুখ থাকয়ে নিরখি॥ (গ)
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে রাই সদা পুলকিত।
কৃষ্ণগুণকথা-রসে সদাই পিরীত॥
কৃষ্ণসনে আলিঙ্গন (ঘ) সঙ্গম কারণ।
সদা সখীগণ করে উপায় চিন্তন॥
অভিসার করিবার গোপত দুয়ার।
আছয়ে উদ্দেশ কেহ না পায় তাহার॥
অন্ধকার ঘরের ভিতর দিয়া দ্বার।
বাহিরেতে বন আচ্ছাদন ছত্রাকার॥
তাহার কিঞ্চিত দূরে হয় গড়খাঞি।
তাহার তুলনা দিতে স্থান আর নাঞি॥
দুই পাড়ে রত্নময় কেতকীর বন।
নানাজাতি বৃক্ষ শোভে পরম নির্জ্জন॥
জলে শোভে কুমুদ কহ্লার কুবলয়।
প্রফুল্লিত তাহে মত্ত মধুকরচয়॥

পাঠান্তর—(ক) বৈসেন করেন—সঁসম্ভ্র করয়ে।
(খ) সরসী রূপসী।

পাঠান্তর—(ক) জোটন—গঠন।
(খ) পালঙ্কের মধ্যে হয় কোমল বিছানা।
(গ) শ্রীমতীর সুখের সুখী দুঃখের দুঃখিনী।
যাহে জন্মে সুখ থাকে আজ্ঞানুবর্ত্তিনী॥
(ঘ) কৃষ্ণসনে আলিঙ্গন—কৃষ্ণে আলিঙ্গনানন্দ।

তাহা পার যাবার যে পথ সুনির্ম্মিত।
জলমধ্যে মণি-স্তম্ভোপরি রত্নভিত॥
তাহার উপরে হয় প্রবালের পাটা।
আলিসা দুধারি তার স্বর্ণ-মণি-জটা॥
সাঁকো বলি লৌকিক ভাষায় যারে কহে।
পরম সুন্দর সেই প্রাকৃতিক নহে॥
অভিসার-সময়ে সখীগণ আসি মিলি।
পরম আনন্দ করে কৌতুক হুলাহুলি॥
কেহ নানা মিষ্ট অন্ন বানাইয়া আনে।
কেহ বা চন্দন মাল্য কেহ পানদানে॥
কেহ নানা গন্ধ নানা দ্রব্য (ক) উপহার।
কৃষ্ণের নিমিত্তে হেতু কুঞ্জে লইবার॥
শ্রীমতীর বেশ বানাইয়া সভে দেন।
মধ্যে মধ্যে পরিহাস রহস্য বচন (খ)॥
কৃষ্ণসুখ হেতু কৃষ্ণ মনোবৃত্তি জানি।
প্যারীজীর বেশ করে সকল রমণী॥
বেণীর রচনা কেহ করেন কৌতুকে।
মণিগুচ্ছা দেন তার মধ্যে থাকে থাকে॥
অগ্রে লটকিয়া দেন স্বর্ণময় ঝাঁপা।
মূলভাগে বেঁ দিল মল্লিকার থোপা॥
নাসায় তিলক কেহ কপালে সিন্দুর।
অঙ্গ মোছাইয়া লেপে কুংকুম কর্পূর॥
কর্ণভূষা নানা মণি-মুক্তায় জড়িত।
নাসায় নোলক গজমতি সুললিত॥
কেহ তো পরায় কণ্ঠে মণিমুক্তা হার (গ)।
রতন ধুকধুকি মরকত মণিসার॥
চরণে নূপুর মণি-ঘুঙ্গুর পঞ্চম।
যাহার মধুরধ্বনি কৃষ্ণ-মনোরম॥
কটিতে কিঙ্কিণী করে বলয়া-কঙ্কণ।
যাহাতে কৃষ্ণের মত্ত শ্রবণ নয়ন॥
ইত্যাদি করিয়া ভূষা মাল্য বস্ত্র গন্ধে।
সাজাইলা সভে মেলি পরম আনন্দে॥

কিবা অপরূপরূপ ত্রৈলোক্য-সুন্দরী।
কিশোর সহিত মাত্র উপমা কিশোরী॥
তবে অভিসার করি প্যারীকে লইয়া।
চলিলেন সব সখী হরষিত হৈয়া॥
সেবাপরা সখীগণ উৎসাহ করিয়া।
পরস্পর ঝকোড়েন হাসিয়া হাসিয়া॥
খাদ্য দ্রব্য ঝাড়ি মাল্যগন্ধাদি যতেক।
সভে কহে আমি নিব গোপিকা শতেক॥
যাহার যে সেবা উপযুক্তমতে নিলা।
নানা বাদ্যযন্ত্র বীণা আদিক লইলা॥ (ক)
চুপে চুপে ধীরি ধীরি খিড়কি দুয়ার (খ)।
খুলিয়া বাহির হৈল সভয়-অন্তর (গ)॥
সংকেতকুঞ্জেতে গিয়া পিয়া সনে মিলি।
পরানন্দ-কৌতুকে রসের হুলাহুলি॥
কিশোর-কিশোরী দোঁহে দোঁহা দরশনে।
উপজিল মৃদুহাস দোঁহার বদনে॥
চক্ষে চক্ষে চাহি প্যারী ঈষত লজ্জায়।
কুঞ্চিত নয়নে কিছু হেটদৃষ্ট্যে চায়॥
তবে কৃষ্ণ করে ধরি বামে বসাইয়া।
কত না আদর করে বদন চুম্বিয়া (ঘ)॥
নানা রস-কৌতুকেতে রজনী বঞ্চয়।
কত যে কাহিনী তাহা কহা নাহি যায়॥
যাবট যে বট যথা শ্রীমতীর গৃহ।
কে কহিতে পারে তার মহিমাসমূহ॥
কিঞ্চিত কহিনু মাত্র মন বুঝাইতে।
তাঁর কৃপামৃত আশা লালদাস চিতে॥

ইতি সপ্তবট বর্ণন।

অথ সপ্তনদী।

সপ্তনদী হয় মহামহিমা অপার।
প্রত্যেকে কহিতে নারি মূলের (ঙ) বিস্তার॥

পাঠান্তর—(ক) গন্ধ নানা দ্রব্য—গন্ধদ্রব্য আদি।
(খ) রহস্য বচন—বচন কহেন।
(গ) মণিমুক্তা হার—মুকুতার হার।

পাঠান্তর—(ক) বীণা আদি নানা যন্ত্র লইয়া চলিলা॥
(খ) খিড়কি দুয়ার—খিড়কির দ্বারে।
(গ) সভয় অন্তর—সভয় অন্তরে।
(ঘ) বদন চুম্বিয়া—চুম্বন করিয়া।
(ঙ) মূলের—গুণের।

কৃষ্ণগঙ্গা পাতাল-জাহ্নবী সরস্বতী।
মানসগঙ্গা অলকনন্দা যমুনা গোমতী॥
মানসগঙ্গা যিনি গোবর্দ্ধনে স্রোত-নদী।
যমুনার সঙ্গ মিলি রহে নিরবধি॥
অতুল মহিমা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অতি।
নৌকাখণ্ডলীলা কৈলা লইয়া যুবতী॥
দধি ঘৃত বিকি ছলে রাধিকা সুন্দরী।
কৃষ্ণ দরশনে যায় সঙ্গে সহচরী॥
দধির পসরা মাথে সব গোপীগণে।
উত্তরিলা মানসগঙ্গার তীর-বনে॥
হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র রসিক-শেখর।
নৌকা এক চাপি আইসে অতি খরতর॥
দেখিয়া রমণীগণ যেন নাহি দেখে।
পারে রাখি নৌকা অন্য দিগেতে নিরখে॥
নাবিকস্বরূপ কৃষ্ণে দেখে গোপীগণ (ক)।
অনিমিখে চাহে রহে আনন্দে মগন॥
হাসিয়া কহয়ে (খ) রাই তবে (গ) ললিতারে।
ডাকহ নাবিকে সখি পার করিবারে॥
ললিতা সুন্দরী তবে ঈষৎ হাসিয়া।
ডাকয়ে নাবিকে তবে মধুর করিয়া॥
কে তুমি নেয়ারি ওহে পার করি দেহ।
নৌকা নিঞা আইস উপযুক্ত (ঘ) কড়ি লহ॥
কৃষ্ণ তাহা শুনিঞাও নাহি দেয় কাণ।
ইথি উথি চাহে তালি দিয়া করে গান॥
পুনঃপুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ফিরিয়া ডাকয়ে।
কে ডাকে কে ডাকে বলি হাঁকিয়া কহয়ে॥
পার হইবার সময় এখন যে নয়।
বাকিয়া যদ্যপি দান দেহ তবে হয়॥
ইহা কহি মুখ ফিরাইয়া বসি রহে।
মুচকিয়া সখীগণ পুনর্ব্বার কহে॥
আইস বুঝিয়া দিব বেতন তোমার।
যাহা চাহ তাহি দিব শীঘ্র কর পার॥

পাঠান্তর—(ক) গোপীগণ—জনগণ।
(খ) কহয়ে—কহেন।
(গ) তবে—সখী।
(ঘ) উপযুক্ত—উচিত।

তবে কৃষ্ণ কহে পুন ধর্ম্ম সাক্ষী করি।
যাহা চাহি তাহা দিবে তবে আনি তরি (ক)॥
বদনে বসন দিয়া হাসে সখীগণ।
প্রিয়সখী পানে সভে চাহে ঘনে ঘন॥
নাবিকেরে কহে আইস যা চাহ তা (খ) দিব।
শীঘ্র পার কর মোরা ত্বরায় যাইব॥
শ্রীমতী কহেন সখি যা চাহ তা দিব।
তা কেনে কহিলি বড় জঞ্জাল হইব॥
তাহা শুনি সখীগণ হাসিয়া উঠিল।
তোমার কি ভয় সখি এতেক হইল॥
রঙ্গদেবী কহে তবে নানা রঙ্গ করি।
ভয় নাঞি কেনে সখি দেখহ বিচারি॥
বেতন দিবার দায় বিচার তো (গ) যার।
হৃদয়েতে জাগে তার দায় আপনার॥
অতএব এবে এড়াইতে পথ নাঞি।
পড়ি গেলা শুয়া-ফান্দে যা করে গোসাঞি॥
রাহু মুখে পড়ি গেলা পূর্ণ শশধর।
কমলিনী হেরিয়া কি ছাড়য়ে ভ্রমর॥
ভাবিলে কি হবে হেম-সুধাঘটদ্বয়।
আজি লুঠ গেল তার নাহিক সংশয়॥
তবে সুবদনী লাজে বদন ঝাঁপিয়া।
রুষ্টপ্রায় কহে কিছু ঝঙ্কার করিয়া॥
ভুরুভঙ্গি করি (ঘ) কহে দূর লো পামরি।
নিজ মনোবৃত্তি কহে পরের উপরি॥
বেতন দিবার সাধ যদি থাকে তোর।
দে গে লো যাইয়া তুঞি তাহার কি ঘোর (ঙ)॥
হাস পরিহাসে বড় কৌতুক হইল।
অন্তরে কিশোরীজীর আনন্দে পূরিল॥
প্রফুল্ল-বদনে কৃষ্ণ নৌকা ধীরে ধীরে।
বাহিয়া আইলা গোপিকার (চ) বরাবরে॥

পাঠান্তর—(ক) আনি তরি—আমি পারি।
(খ) যা চাহ তা—যাহা চাহ।
(গ) দায় বিচার তো—ভার বিচারিতে।
(ঘ) ভুরুভঙ্গি করি—ভ্রূভঙ্গি করিয়া।
(ঙ) ঘোর—ওর।
(চ) গোপিকার—তবে গোপী।

হেমে জড়া সুবিচিত্র মনোহর তরি।
রত্ন-কেরোয়াল তাহে স্বর্ণময় ঝুরি॥
বক্ষে কেরোয়াল শোভে চরণে চরণ।
হেরিয়া গোপিকাগণ প্রেমেতে মগন॥
পরস্পর কহে সভে ছল ছল আঁখি।
কিবা অপরূপ রূপ দেখ দেখি সখি॥
যমুনা করেছে আলো নবীন কাণ্ডারী।
শ্যাম-অঙ্গ জলধর সৌদামিনী তরি॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপে অমিয়া খেরিছে (ক)।
হাসির হিল্লোলে কত মুকুতা ঝরিছে॥
শ্রীঅঙ্গ-লাবণ্য নদীতরঙ্গ চলিছে।
রূপের মাধুরীরসে স্রোত বহিতেছে॥
প্রতিবিম্ব জলমধ্যে তরঙ্গ সচল।
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি পরম উজ্জ্বল॥
তবে গোপী কহে ওহে সুন্দর কাণ্ডারি।
মোরা পারে যাব শীঘ্র দেহ পার করি॥
কৃষ্ণ কহে পার করি তার নাহি দায়।
বেতন কি দিবে তাহা করহ নিশ্চয়॥
ললিতা কহেন যোগ্য বেতন যে লহ।
আট কৌড়ি পাবে দধি পসারের সহ॥
কৃষ্ণ কহে তোমার উচিত কথা নহে।
বিচার করিয়া কহ রহে সহে যাহে॥
পরম সুন্দরী তাহে নবীন যুবতী।
ভূষণে শোভিত (খ) কত হার হীরা মতি॥
আর তাহে রসের হিল্লোলে মৃদু হাসি।
হৃদয়ে শোভয়ে কিবা রতন কলসী॥
তোমা সভা সম আঢ্য কে আছয়ে আর।
ছোট কথা উপযুক্ত না হয় তোমার॥
অতএব তোমা সভায় পার যে করিতে।
কোটি স্বর্ণমুদ্রা চাহি বিচার-সম্মতে॥
তাহা শুনি ললিতা কহেন রহ রহ।
আপনা সমুঝি মুখ সামালিয়া কহ॥
কুলবতী সতীগণে ইঙ্গিত করহ।
বুঝিবে পশ্চাত যদি পুনরায় কহ॥

পাঠান্তর—(ক) অমিয়া খেরিছে—সুধা খরিতেছে।
(খ) শোভিত—ভূষিত।

কৃষ্ণ কহে স্বরূপ কহিতে যদি রুঠ (ক)।
না কহিব বরঞ্চ নৌকায় আসি উঠ॥
অর্থ রতন মুদ্রা কিছুই না লব।
তোমা-সভার ব্যয় নাহি তাহাই লইব॥
তোমার (খ) পশ্চাতে কেউ নবীন কিশোরী।
তড়িত-লতিকা কিংবা সোণার গাগরি॥
অমিয়া নিন্দিয়া মৃদু মৃদু মন্দ হাসি।
বদন-সৌন্দর্য্য হেরি কান্দে কোটি শশী॥
আহা মরি এমন রূপসী (গ) ত্রিভুবনে।
কভু দেখি নাঞি, কভু না শুনি শ্রবণে॥
উহার সহিত একবার আলিঙ্গন।
ইহা মাত্র চাহি, নাহি চাহি কোনো ধন॥
ইহাতে যে তোমা সভার ব্যয় কিছু নাহি। (ঘ)
শপথ করিয়ে যদি আর কিছু চাহি॥
অনায়াসে পার হৈয়া যাও বিনি অর্থে।
মোর যশ গাইতে গাইতে যাবে পথে॥
ললিতা কহেন পুন নির্লজ্জ যে তুমি।
ভর্ৎসন করিয়া তোমায় হারিলাম আমি॥
পুন যদি কটু কহ তবে সাজা পাবে।
মাথায় ঢালিব দধি পশ্চাতে জানিবে॥
তবে কৃষ্ণ যেন তাহা শুনে শুনে নাঞি।
কহে যে কহিলাম ভাল দেও যে তাহাই॥
ত্বরায় নৌকায় চড় উঁহায় অগ্রেতে।
চড়াইয়া বসাও আনি আমার পার্শ্বেতে॥
গোপীগণ মুচকিয়া হাসিয়া কহয়।
হাসি পায়, দুঃখ ধরে, না কহিলে নয়॥
গ্রামে নাহি মানে হৈলে আপনি মণ্ডল।
পরের রমণী দেখি হইলে চঞ্চল॥
আজ্ঞা করিতেছ নিজ বামে (ঙ) বসাইতে।
ভয় লজ্জা কিঞ্চিত নাহিক তব চিতে॥

পাঠান্তর—(ক) রুঠ—রুষ্ঠ।
(খ) তোমার তোমা সভার।
(গ) রূপসী সুন্দরী।
(ঘ) ইহাতে কিছুই তোমাদের ব্যয় নাহি।
(ঙ) বামে পার্শ্বে।

পুনঃ কৃষ্ণ বলে ভাল যে ইচ্ছা তোমার।
যেখানে বসাও সেই সৌভাগ্য আমার॥
মুচকিয়া গোপীগণ নৌকায় চাড়িলা।
শ্রীমতীকে ঘেরি সভে চৌদিগে বসিলা॥
রাধাকৃষ্ণ মিলনে মনে (ক) সবার আনন্দ।
বাহ্যে কিছু প্রকাশয় রসের প্রবন্ধ॥
কৃষ্ণ দরশনে প্যারীর নয়ান চঞ্চল।
যতনে নিবারে তভু করয়ে উছল॥
আনমনা হইয়া বসিলা সভে নায়।
আন কথা কহে সভে কৃষ্ণে না তাকায়॥
চঞ্চল হইয়া কৃষ্ণ প্যারীকে দেখিতে।
ইথি উথি ফিরে কেরোয়াল করি হাতে॥
মাঝগঙ্গা (খ) পাথারে লইয়া যবে তরি।
মন্দ মন্দ হাসিতে খেলিতে গেলা হরি॥
হেনকালে ঘোর অন্ধকার করি মেঘে।
চারিদিগ ঘেরিয়া ধাইল মহাবেগে॥
প্রচণ্ড বহয়ে বায়ু উছলে তরঙ্গ।
কৃষ্ণের তাহাতে কিছু নাহি ভুরুভঙ্গ॥
নৌকায় ঝলকে জল উঠিয়া ভরিল। (গ)
মন্দ মন্দ বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল॥
উছল পাছল হয় নৌকা না ঠাহরে।
গোপীগণ স্থির হৈয়া বসিতে না পারে॥
উলটিয়া পড়ে পুড়া জড়াইয়া ধরে।
পরস্পর জড়াজড়ি কাঁদি ধরে ডরে (ঘ)॥
দধি ঘৃত উলটিয়া সব পড়ি গেল।
অঙ্গের উড়ানি খসি কোথায় পড়িল॥
উড়াইয়া বায়ুবেগে নিঞা গেল দূর।
সর্ব্বাঙ্গ উদাস হৈল সুন্দরীগণের॥
কৃষ্ণের যে মনোরথ বিধি ঘটাইল।
দুর্লভ দর্শন অনায়াসে যে হইল॥
উরজ উদর পৃষ্ঠ আদি কেশপাশ।
অনিমিখে হেরে কৃষ্ণ পরম উল্লাস॥

পাঠান্তর (ক) মিলনে মন মিলনেতে।
(খ) মধ্যগঙ্গা মধ্যস্থলে।
(গ) ঝলকে ঝলকে জল নৌকায় ভরিল।
(ঘ) কাঁপি ধরে ডরে পরস্পর করে।

কিশোরীর পানে চাহে ভঙ্গি প্রকাশিয়া।
মুচকি মুচকি হাসে আঁখি মটকিয়া॥
ঈর্ষা-ক্রোধ-ভাবে নেত্র আড় দৃষ্টি করি।
কৃষ্ণপানে চাহে রাই সুন্দরী নাগরী॥
ভ্রূভঙ্গি করিয়া গালি পাড়ে মৃদু মৃদু।
তাহাতে যে শোভা সুধা উগারয়ে বিধু॥
সে ভঙ্গি দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দ-হৃদয়।
স্মর-খরতর-শরে আপনা ভুলয়॥
তবে গোপীগণ ঝড় তুফান দেখিয়া।
তরঙ্গে অস্থির নৌকা প্রমাদ গণিঞা॥
কৃষ্ণের অনিষ্ট চিন্তা হৃদয়ে ভাবিয়া।
কৃষ্ণমুখ-পানে চাহে উদ্বিগ্ন হইয়া॥
কাতর হইয়া তবে যোড়পাণি করি।
কহয়ে কৃষ্ণেরে কিছু চক্ষে বহে বারি॥
হেদে হে নাগর কানু সুন্দর কাণ্ডারী।
ভয়েতে কাতর মোরা দেহ পার করি॥
প্রচণ্ড পবন তাহে নদী বেগবান।
উছলিছে তরঙ্গ যে প্রলয় সমান॥
তাহে ঘোর মেঘারম্ভ বিন্দু পড়িতেছে।
বেলা অবসান সূর্য্য অস্ত হইতেছে॥
আমরা হে মরি তার লাগি ভাবি নাঞি।
তোমার অনিষ্ট পাছে হয় ভয় পাই॥
তথাপিহ পরিহাস করে রসরাজ।
ঘনাইয়া গিয়া বৈসে গোপীর সমাজ॥
অধিক টলমল নৌকা করিতে লাগিল। (ক)
ভয়েতে কিশোরী কৃষ্ণের কণ্ঠেতে ধরিল॥
পরম আনন্দে কৃষ্ণ বক্ষেতে রাখিয়া।
শত শত চুম্ব দিল চিবুকে ধরিয়া॥
তবে তরি শ্রীকৃষ্ণ পারে লইয়া গেল।
প্রণয় ভর্ৎসন গোপী করিতে লাগিল॥
দধি দুগ্ধ মাখনাদি কৃষ্ণে খাওয়াইয়া।
কষ্টে নিজ নিজ গৃহে গেলেন চলিয়া॥
হেন রসরঙ্গ যে মানসগঙ্গোপরি।
আনন্দে করয়ে সদা কিশোর-কিশোরী॥

পাঠান্তর- (ক) তবে ত অধিক নৌকা টলিতে লাগিল।

তাহার মহিমা গুণ কে কহিতে পারে।
জীবের শকতি নহে এ তিন সংসারে॥
শ্রীমন্মানসগঙ্গা কৃপাদৃষ্ট্যে হের।
লালদাস পরিহার করে অঙ্গীকর॥

তত্র শ্রীকালিন্দী—

শ্রীমতী কালিন্দী জলে সদা কৃষ্ণ-রঙ্গ।
জলকেলি-আদি করে গোপিকার সঙ্গ॥
অদ্যাপিহ গো-গোপ-গোপীগণ (ক) সঙ্গে।
যমুনার জলে বিহরয়ে নানা রঙ্গে॥
অহো কি দুর্ভাগ্য ভাগ্যহীন এই জন।
যমুনার জল যেই না করিল পান॥

শ্লোক ঃ—

অহো অভাগ্যং লোকস্য (খ) ন পীতং যমুনাজলম্।
গো-গোপ-গোপিকাসঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা॥

অনুবাদ। যেখানে কংসবধকারী শ্রীকৃষ্ণ গো, গোপ ও গোপিকার সঙ্গে ক্রীড়া করেন, সেই যমুনার জল যে পান করে নাই, হায় সেই লোকের কি দুর্ভাগ্য!

অতএব যমুনার মহিমা বর্ণন।
নরে কি করিবে, নাহি পারে দেবগণ॥
যমুনায় জলক্রীড়া গোপিকা সহিত।
চমৎকার কৃষ্ণচন্দ্র লীলার উচিত॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঠাকুর বর্ণিলা।
ত্রিভুবন জন মন মোহিত করিলা॥
আমি কি বর্ণিব তাহে মূর্খ বুদ্ধিহত।
বর্ণিতে বিজ্ঞের মুখ কৈলা আচ্ছাদিত॥
অতএব সংক্ষেপে শ্রীযমুনা-মহিমা।
কহিল কিঞ্চিত তার না পাইয়া সীমা॥

অথ শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড।

চৌরাশীতি কূপ আর চৌরাশীতি কুণ্ড।
সর্ব্বতীর্থ-শিরোমণি জিনিঞা ব্রহ্মাণ্ড॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড পরাৎপরসার।
ত্রিজগত মধ্যেতে উপমা নাহি আর॥

তার মধ্যে শ্রীল রাধাকুণ্ডের মহত্ত্ব।
ব্রহ্মা শিব আদি যার নাহি জানে তত্ত্ব॥
ব্রহ্মাণ্ডের (ক) মধ্যে আর বাহ্যে পরব্যোম।
যাহার অধিক সম নাহি কোন ধাম॥
বৃন্দাবন পরাৎপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম।
তাহার মধ্যেতে সর্ব্বোত্তম অনুপম॥

যথা—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্য কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

অনুবাদ।—শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, তাঁহার কুণ্ড অর্থাৎ রাধাকুণ্ডও তাঁহার তেমনি প্রিয়। সমস্ত গোপীর মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রেয়সী।

রাধাকুণ্ডে স্নান যেই করে একবার।
রাধিকা-সমান প্রেম জনমে তাহার॥
স্নান পান মাত্র ছুটে সংসারের ফাঁসি।
তৎক্ষণাতে হয় সেই রাধিকার দাসী॥
কুণ্ডের প্রকট কিছু কহিব সংক্ষেপে।
আর শ্যামকুণ্ড প্রকটিল যেই রূপে॥ (খ)
শ্যামকুণ্ড-স্নানে শ্রীরাধিকা প্রীত (গ) হন।
রাধাকুণ্ড-স্নানে কৃষ্ণ বিক্রীত মানেন॥
একদিন শ্রীরাধিকা সহ গোপীগণ।
কৌতুকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে দেন ওলাহন॥
বৎসাসুর বধ তুমি স্বেচ্ছায় করিলে।
অতএব মহাপাপী গোবধী হইলে॥
তাহার যে প্রায়শ্চিত্ত যদ্যপি করিবে।
তবে তুমি আমা সভা স্পর্শযোগ্য হবে॥
পৃথিবীর সর্ব্বতীর্থে স্নান যদি কর।
তবে মহাপাপ হৈতে মুক্ত হৈতে পার॥
অতএব আমা সভাকারে না ছুঁইহ।
মো-সভার নিকট হইতে দূরে যাহ॥

পাঠান্তর—(ক) গোপীগণ—গোপিকাগণ।
(খ) অভাগ্যং লোকস্য—দুর্ভাগ্যং লোকানাম্।

পাঠান্তর (ক) ব্রহ্মাণ্ডের—বৈকুণ্ঠের।
(খ) "শুন সব ভক্তগণ আনন্দিত রূপে" এবং "আর শ্রীল শ্যামকুণ্ড প্রকাশ যে রূপে"।
(গ) প্রীত—প্রীতি।

তাহা শুনি ফাঁপর হইয়া কৃষ্ণ (ক) কহে।
ভাল ভাল প্রায়শ্চিত্ত যে করিব নহে॥ (খ)
তবে কৃষ্ণ মুরলীর প্রান্তভাগ দিয়া।
কুণ্ড এক করিলেন মৃত্তিকা খুদিয়া (গ)॥
ব্রহ্মাণ্ডে যতেক তীর্থ গঙ্গা আদি করি।
স্মরণ করিলা সভাকার প্রভু (ঘ) হরি॥
তৎক্ষণাত আইলা সকলে (ঙ) মূর্ত্তি ধরি।
দাণ্ডাইলা কৃষ্ণ আগে যোড় হস্ত করি॥
গোপীগণ দেখি তাহা চমৎকার হইল।
এ সব অপূর্ব্ব রূপ কোথা হৈতে আইল॥
কৃষ্ণ কহে এঁহ হন সব তীর্থগণ।
এঁহা সভা এই কুণ্ডে করিয়ে স্থাপন॥
স্নান করি পাপ দূর এখনি করিব।
তোমা সভার অঙ্গ আলিঙ্গনে যোগ্য হব॥
মুচকি হাসিয়া গোপী কহে পরস্পর।
কি কুহক জানে এই কালিয়া কিশোর॥
তীর্থগণ ইহার আজ্ঞায় সব আইল।
কিবা মন্ত্র জানে কিবা যোগসিদ্ধ কৈল॥
তবে কৃষ্ণ তীর্থগণে কুণ্ডেতে স্থাপিয়া।
স্নান কৈল গোপিকার সম্মুখে রহিয়া॥
অপূর্ব্ব কুণ্ডের শোভা ঝলঝল করে।
সর্ব্বতীর্থময় মহামহিমা বিস্তারে॥
দেখিয়া বাসনা হৈল রাধিকা অন্তরে।
আমিহ ঐমনি কুণ্ড করিব সত্বরে॥
এতো ভাবি সখীগণ সহিত কিশোরী।
খোদয়ে তাহার পার্শ্বে কৃষ্ণে (চ) ঈর্ষা করি॥
পরস্পর কহে সভে উহার উত্তম।
খুদিব (ছ) যে কুণ্ড মোবা পরম মোহন॥
তীর্থগণে বোলাইয়া আমরা আনিব।
কৃষ্ণের কুণ্ডের জল ছেঁচিয়া লইব॥

এত কহি কেহ নিল শুখুনা (ক) লকড়ি।
কেহ নিল শিলাটুক কেহ নিল খড়ি॥
খুদিতে (খ) লাগিল সভে কুণ্ড করিবারে।
রাধিকা সুন্দরী নিজ কঙ্কণে আঁচড়ে॥
খুদিতে খুদিতে এক কুণ্ড প্রায় হৈল।
কিন্তু জল না হইল তীর্থ না আইল॥
সভার বদন পানে সভাই চাহয়।
বদনে বসন ঝাঁপি মুচকি হাসয়॥
ঈষৎ ফিরাইয়া মুখ কৃষ্ণ পানে চাহে।
লজ্জিত হইয়া সভে ঠারাঠারি কহে॥
লজ্জার বিষয় সখি কি করি উপায়।
তীর্থ দূরে থাকু (গ) কুণ্ডে জল নাহি হয়॥
কৃষ্ণ দূরে থাকি দেখি মৃদু মৃদু হাসে।
কিশোরীর দেখি রঙ্গ প্রেমানন্দে ভাসে॥
তবে সব সখীগণ যুগতি করিল।
লাজ খাইয়া কৃষ্ণ স্থানে যাইতে হইল॥
কৃষ্ণের নিকটে গিয়া সুকুমারীগণ।
ভঙ্গি করিয়া কিছু হাসিয়া কহেন॥ (ঘ)
তুমি যে খুদিলে কুণ্ডে তীর্থ যে আনিলে।
বুঝিতে নারিনু কিবা কুহক করিলে॥
আমা সবা নারীগণে কিংবা ভুলাইলে।
প্রায়শ্চিত্ত করি বলি মিথ্যা যে কহিলে (ঙ)॥
অতএব মোরা এই কুণ্ড যে খুদিনু।
ইথে তীর্থগণ আনি স্নান পান বিনু॥
প্রতীতি (চ) না হবে আমা সভাকার মনে।
গেল কি না গেল পাপ জানিব কেমনে॥
অতএব তীর্থগণ তব কুণ্ড হৈতে।
মো-সভার কুণ্ডে আনি স্নান কর তাতে॥
তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দিত হৈল।
সে ভঙ্গি দেখিয়া সুখসাগরে ভাসিল॥

পাঠান্তর—(ক) হইয়া কৃষ্ণ—হৈয়া কৃষ্ণচন্দ্র।
(খ) প্রায়শ্চিত্ত করিব সংশয় কিবা তাহে॥
(গ) খুদিয়া—খনিয়া।
(ঘ) সভাকার প্রভু—সভাকারে তবে।
(ঙ) সকলে—সব তীর্থ।
(চ) কৃষ্ণে—শ্যামে।
(ছ) খুদিব—খনিব।

পাঠান্তর—(ক) শুখুনা—হাতেতে।
(খ) খুদিতে—খনিতে।
(গ) থাকু—বহু।
(ঘ) ভঙ্গি করি কৃষ্ণ প্রতি কহয়ে বচন।
(ঙ) যে কহিলে—বিড়ম্বিলে।
(চ) প্রতীতি—প্রত্যয়।

তবে (ক) কহে ভাল ভাল তাহাই করিব।
যাহা হৈতে তোমা সভার প্রতীতি হইব॥ (খ)
এতো কহি সর্ব্বতীর্থ সেই কুণ্ডে আনি।
স্নান কৈল কৃষ্ণ যে পাবন-শিরোমণি॥
শ্রীরাধিকা মনে বড় আনন্দিত হৈলা।
সখীগণে ঠারেঠোরে কহিতে লাগিলা॥
কৃষ্ণ সনে চতুরাই কেমন করিনু।
ছলে কলে (গ) নিজ কুণ্ডে তীর্থে আনাইনু॥
হাসিয়া কৃষ্ণেরে সভে টিটকারি দেন।
কৃষ্ণ তাহে প্রেমানন্দসাগরে ভাসেন॥
তবে কৃষ্ণ প্যারী সঙ্গে জলকেলি কৈল।
রাধাকুণ্ড নাম তার সাদরে রাখিল॥
নিজ সর্ব্বশক্তি রাধিকার সর্ব্বশক্তি।
সম্যক প্রকারে যে অর্পিলা প্রেমরতি॥
রাধিকা স্বরূপ হন কৃষ্ণের স্বরূপ।
ত্রৈলোক্যের মধ্যে এক পরম অনূপ॥
নির্গুণ সচ্চিদানন্দ প্রকৃতির পর।
ত্রিজগতে যার সম উর্দ্ধ নাহি আর॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী যথা রাধিকা সুন্দরী।
তৈছে শ্রীরাধাকুণ্ড অতি প্রিয়ঙ্করী॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দুই দোঁহা মূর্ত্তি।
দুঁহু কুণ্ড-সঙ্গমে দোঁহার মনবৃত্তি॥
রত্ন সিংহাসন সেই সঙ্গম উপরে।
তমালের তরুতলে সদাই বিহরে॥
রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড-তীরের যে শোভা।
বর্ণন না হয় যাথে রাধাকৃষ্ণ লোভা (ঘ)॥
অষ্ট-সখী-কুঞ্জ-কুণ্ড তাহাতে বেষ্টিত।
মহিমা সমান রাধাকুণ্ডের উচিত॥
শ্রীল রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড কৃপা কর।
লালদাস মস্তকে চরণ-ছায়া ধর॥

পাঠান্তর—(ক) তবে—কৃষ্ণ।
(খ) যাতে তোমা সবকার প্রতীতি হইব।
(গ) ছলে কলে—ছল করে।
(ঘ) রাধাকৃষ্ণ লোভা—রাধাকুণ্ড-লোভা, অথবা রাধাকৃষ্ণ শোভা।

চারিধাম।

চারি ধাম হয় শ্রীমন্-মথুরা-মণ্ডলে।
যাহার প্রকাশ-রূপ অন্য অন্য স্থলে॥
রামনাথ বদ্রীনাথ জগন্নাথ-ক্ষেত্র।
শ্রীল দ্বারকানাথ পরমমহত্ত্ব॥
যাঁহার স্মরণে হয় সংসার-মোচন।
দর্শনের গুণ তাহা না যায় বর্ণন॥
অতঃপর অন্য লীলাস্থান যে বর্ণিব।
কিঞ্চিত বর্ণিব মাত্র সকল নারিব॥
সাধুগণ কহিতে পারেন সর্ব্বস্থান।
মো সভার অন্তর অগম্য যে সন্ধান॥

শ্রীগোবর্দ্ধন কদম্বখণ্ডি।

গোবর্দ্ধন নিকট কদম্বখণ্ডি হয়।
তথা পাশাক্রীড়া দোঁহে জয় পরাজয়॥
পণ করি খেলে রাধা কৃষ্ণ দোঁহু জনে।
চৌদিগে বেষ্টিত ললিতাদি সখীগণে॥
শ্রীমধুমঙ্গল সুবলাদি নর্ম্মসখা।
কৃষ্ণ-পক্ষপাত করি করে লেখাজোখা॥
চতুর শ্রীমতীপক্ষ যত সখীগণে।
হারিলেও অন্যায় করিয়া সভে জিনে॥
কৃষ্ণের মুরলী হার চূড়া গুঞ্জামালা।
গোলমাল করি হারাইয়া কাড়ি নিলা॥
কৃষ্ণের বয়স্য সব আঁটিতে না পারি।
ললিতার ডরে সব রহে চুপ করি॥
কৃষ্ণের পরম সুখ প্যারীজীর জয়ে।
ভঙ্গি করি হারি সেই কৌতুক দেখয়ে॥
চুম্ব আলিঙ্গন পণ হয়ে তো যখন।
যতনে জিনিতে চাহে শ্রীকৃষ্ণ তখন॥
তিনবার পণে হারি তবে কৃষ্ণ কহে।
পুন যে খেলিব পণ রাখ মোর সহে॥
আমি যদি হারি মধুমঙ্গলেরে লবে।
আপন জোরেতে বান্ধি নিঞা যাবে সভে॥
তুমি যদি হার প্যারি প্রিয়সখী তব।
ললিতা সুন্দরীকে আমারে সোঁপি দিব॥

এ কথা শুনিঞা রাই ভ্রূকুটি করিয়া।
ক্রোধাবেশে কৃষ্ণে কিছু কহয়ে ভর্ৎসিয়া॥ (ক)
মুখ সামালিয়া কথা কহ বিচারিয়া।
নিজ মরিযাদ গোপী-সমাঝে রাখিয়া॥
তোমার যে বটু মধুমঙ্গল যেমন।
তেমন সহস্র বিপ্র আনিঞা এখন॥
করাইয়া ভোজন দক্ষিণা কৌড়ি কৌড়ি।
বিদায় করিতে পারি দিয়া দশ বুড়ি॥
আমার ললিতা সখী রূপে গুণে শীলে।
এমন একটি নাকি ত্রিভুবনে মিলে॥
ইহার সহিত তব (খ) বটু ব্রাহ্মণেরে।
কোন অংশে সমান করিলে কি বিচারে॥
কৃষ্ণ কহে ভাল ভাল খেল তো এবার।
যে উচিত হয় পাছে করিব (গ) বিচার॥
এত কহি পুন দোঁহে খেলিতে লাগিলা।
ললিতা মুচকি হাসি মউনে রহিলা॥
খেলিতে খেলিতে তবে কৃষ্ণ হারি গেলা।
নিজ দায় পাইয়া শ্রীললিতা উঠিলা॥
তা দেখিয়া বটু তবে পলাইয়া যায়।
ঝমকিয়া ললিতা সম্মুখ আগুলায়॥
গলায় বসন দিয়া ধরিলা বটুরে।
বিকাইলে পণে বান্ধি নিঞা যাব তোরে॥
প্যারীজীর আগে আনি বসাইলা তারে।
গলায় বসন আর (ঘ) চাহে বান্ধিবারে॥
বটু কহে মোরে বান্ধ করি কি বিচার।
কৃষ্ণ মোরে বেচিবেক কি শক্তি উহার॥
উহায় বা কেবা মানে ও তো গোয়ালিয়া।
মুঞি বিপ্র মোরে পূজে আদর করিয়া॥
গোপীগণ কহে মোরা তাহা না শুনিব।
কৃষ্ণ পণে হারিয়াছে বান্ধি নিঞা যাব॥
তবে বটু কৃষ্ণ বলি ডাকে উচ্চনাদে।
রক্ষা কর বলিয়া কপট করি কান্দে॥ (ক)
কৃষ্ণ কহে ছাড়ি দেহ বটুরে আমার।
আর যাহা কহ দিব যে ইচ্ছা তোমার॥
ললিতা কহেন বংশী বন্ধক রাখহ।
ভাল ভাল বটুরে লইয়া তবে যাহ॥
তবে কৃষ্ণ বংশী বান্ধা রাখিয়া বটুরে।
খালাস করিয়া পুনর্ব্বার খেলা করে॥
কৃষ্ণেরে ভর্ৎসয়ে তবে শ্রীমধুমঙ্গল।
কর চালাইয়া মহা হইয়া চঞ্চল॥
তোঁহার সহিত আর কোথাও না যাব।
কালি হৈতে গৃহমধ্যে বসিয়া থাকিব (খ)॥
খেলাতে করিয়া পণ বান্ধাও আমারে।
কোনদিন কোথাও বেচিয়া যাবে মোরে॥
ঘরে গিয়া আজি কব ব্রজেশ্বরী স্থানে।
কৃষ্ণ যে তোমার মিথ্যা (গ) যায় গোচারণে॥
গোপের রমণী নিঞা বনে বিহরয়।
তার মধ্যে এই যে ললিতা গোপী হয়॥
ইহার সহিত যে পিরীতি অতিশয়।
কুঞ্জে কুঞ্জে বনে বনে সদাই ফিরয়॥
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে সভারে কহিব।
কালি হৈতে বনেতে আসিবা ঘুচাইব॥
তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র সহ গোপীগণ।
কৌতুকে হাসয়ে সভে ঝাঁপিয়া বদন॥
সেই পাশালীলা (ঘ) স্থানে কোটি নমস্কার।
পরম শরণ্য এক জগত-ভিতর॥

অথ বহু লীলাস্থান-বর্ণন।

গোবর্দ্ধন বেড়ি হয় বহু লীলাস্থান।
অসংখ্য গণন সব না হয় বর্ণন॥

পাঠান্তর—(ক) ক্রোধাবেশে কহে কৃষ্ণে ভর্ৎসনা করিয়া।
(খ) তব—পণ।
(গ) করিব—করিহ।
(ঘ) আর—দিয়া।

পাঠান্তর—(ক) রক্ষা কর কপট করিয়া মিছা কান্দে।
(খ) থাকিব—রহিব।
(গ) কৃষ্ণ যে তোমার মিথ্যা—কৃষ্ণ তোমার মিথ্যা কহি।
(ঘ) পাশালীলা—পাশক্রীড়া।

শ্রীকুন্ড-পশ্চিমে মুখরাই নামে গ্রাম।
শ্রীমতীর অনুকূল শ্রীমুখরা ধাম॥
নিকটে সুমন সরোবর মনোহর।
কুসুম-সরোবর বলি খেয়াতি যাহার॥
গোবর্দ্ধন উত্তরে শ্রীকেলি-কুঞ্জবন।
যথা শঙ্খচূড় দৈত্য পাইল মরণ॥
সিংহাসন সহিত শ্রীরাধিকা লইয়া।
যাইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কেশেতে ধরিয়া॥
মুষ্ট্যাঘাত মারি তার মস্তক হইতে।
স্যমন্তক মণি দিল দাওজীর[১] (ক) হাথে॥
বলদেব বিচার করিয়া কিছু মনে।
পাঠাইলা কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার স্থানে॥
বিলাসবদন-নাম স্থান কিছু দূর।
রাসলীলা রসকেলি তথায় প্রচুর॥
দানঘাটি গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণ দানী হৈলা।
শ্রীরাধিকা সনে রসকেলি বিস্তারিলা॥
যে স্থানে বসিলা কৃষ্ণ সেই যে প্রস্তর।
ধরিয়া যে মহাপ্রভু কান্দিলা বিস্তর॥ (খ)
দান-নিবর্ত্তন কুন্ড নিকটে তাহার।
দানছলে রাধাকৃষ্ণের যথায় বিহার॥
কুন্ডাষ্টকে দাস-গোসাঞি বর্ণন করিলা।
দান-নিবর্ত্তন কুন্ড তাহাতে কহিলা॥
তাহার নিকটে হয় শোকরাই নাম।
মহিমা অপার চন্দ্রাবলীজীর গ্রাম॥
পরে নিম্নগাও (গ) যথা মিলে গোপীগণ।
কৃষ্ণচন্দ্রে প্রেমাবেশে কৈল নির্ম্মঞ্ছন[২]॥
গোবর্দ্ধন হৈতে এক ক্রোশ হয় দূর।
গাঁঠলি নামেতে গ্রাম লীলা চমৎকার॥
প্যারী সহ কৃষ্ণ বন বিহার করয়।
হাস পরিহাসে চলে সঙ্গে সখীচয়॥

পাঠান্তর—(ক) দাওজীর—দাদাজীর।
(খ) অতি অপরূপ স্থান দেখিতে সুন্দর।
(গ) নিম্নগাও—নিম্বগাও ও নিমগাও।

১। দাওজীর—দাদাজীর, বলরামের।
২। নির্ম্মঞ্ছন—আদরে মুখ ইত্যাদি মোছান বা আরতি করা।

পশ্চাত হইতে তবে ললিতা সুন্দরী।
দোঁহার উড়নি বস্ত্র ধরি চুপ করি॥
মুচকি হাসিয়া গাঁঠিছড়া বান্ধি দিল।
ঠারাঠারি করি তবে হাসিতে লাগিল॥
বদনে বসন দিয়া পরস্পর হাসে।
হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে (ক) কেহ না প্রকাশে॥
ঈষত নয়ানে প্রিয়সখী পানে চাহে।
অঙ্গে ঠেসাঠেসি কাণে কাণে কথা কহে॥
প্রিয়াজী দেখিয়া তাহা চকিত-নয়ানে।
পুছয়ে সভারে কহ সখি হাস কেনে॥
কেহ নাহি কহে কিছু করতালি পিটি।
হুলু হুলু ধ্বনি করে ভূমে পড়ে লুঠি॥
কৃষ্ণচন্দ্র যে-হেতুক বিশেষ জানিঞা।
না প্রকাশে আনন্দে হাসয়ে মুচকিয়া॥
ফাঁফর হইয়া রাই চারি পানে চাহে।
কি হেতু হাসয়ে সভে কেহ নাহি কহে॥
আকাশ পাতাল ভাবি না হয় নিশ্চয়।
সভার বদন পানে ফেল ফেল (খ) চায়॥
আজি শুভলগ্ন হয় কহে সখীগণে।
কিশোরীর বিভা হৈল কিশোরের সনে॥
তবে বস্ত্র সামটিয়া পরিতে শ্রীরাধা।
টান পড়ি গেল বস্ত্রে দেখে গাঁঠি বান্ধা॥
তখন বুঝিয়া রাই লজ্জিত হইয়া।
সখীগণে ভর্ৎসে বহু ভ্রূকুটি করিয়া॥
বস্ত্র আকর্ষিয়া গাঁঠি খুলিবারে চাহে।
কৃষ্ণ চতুরাই করি টানিয়া রাখয়ে॥
হাসির সহিত রাই ঈষত রোদন।
করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে করয়ে ভর্ৎসন॥
তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র উল্লাসিত মন।
ভর্ৎসন সে নহে মানে সুধা-বরিষণ॥
এইমত নানা রঙ্গ-রস-কুতূহলে।
গেঁঠেলায় রাধাকৃষ্ণ বনে ভ্রমি বুলে॥
সেই যে গেঁঠেলা গ্রাম তার ধূলিকণ।
জন্মে জন্মে হউ মোর মস্তকে ভূষণ॥

পাঠান্তর—(ক) ঢলিয়া পড়ে—চলিলা পথে।
(খ) ফেল ফেল—ফিরি ফিরি।





গোলাব-কুণ্ড যে হয় শ্রীকৃষ্ণ-নির্ম্মিত।
কদম্বের বৃক্ষ চারি পাশে সুললিত (ক)॥
শোভার নাহিক সীমা অতি সুনির্জ্জন।
হোরি খেলায় যথা লৈয়া প্রিয়াগণ॥ (খ)
নারদ গোস্বামি-জীর পরে স্নানকুণ্ড।
তাহার পশ্চিমে হয় মুনিশীর্য-কুণ্ড॥
পরে প্রমোদনাকুণ্ড বিহারের স্থান।
প্রমোদে মগন হৈলা তথা গোপীগণ॥
পশ্চিমে কিঞ্চিত দূরে নয়ন-সরোবর।
সেতুকন্দরাখ্য স্থান পশ্চিমে তাহার॥
পরে আদি বদ্রীনাথ (গ) নর-নারায়ণ।
তথা শিব-গৌরী দোঁহে বিরাজ করেন॥
তথাই অলকনন্দা সুনির্জ্জন স্থান।
নিকটেতে গন্ধর্শিলা পরমমোহন॥
পরে দিগ-নামে গ্রাম রাজার আলয়।
সেই রূপ (ঘ) সরোবর নাটাবন হয়॥
সাঙরি শিখর নাম ধবলা পর্ব্বত।
শ্রীমতী হিন্দোলা দুলে সহ সখীযূথ॥
পর্ব্বত-গহ্বরে কৃষ্ণকুণ্ড সুনির্জ্জন।
পরে ইন্দুলিকা গ্রাম ইন্দ্রদেবস্থান॥
কনয়ারে কণ্বমুনি ধ্যান করিলেন।
যার অন্ন তিনবার কৃষ্ণ খাইলেন॥
কাম্যবনে বহু লীলাস্থান যে অনন্ত।
কিঞ্চিত বর্ণিব আর নাহি পাই অন্ত॥ (ঙ)
বিমল-কুণ্ডের শোভা পরম মোহন।
মহিমা অপার যার না হয় বর্ণন॥
পরে শ্রীযশোদাকুণ্ড পর সেতুবন্ধ।
সাগর আনিলা ইচ্ছায় আপনি (চ) কৃষ্ণচন্দ্র॥
তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্ব্ব কথন।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি ভুলে গোপীগণ॥

একদিন কৃষ্ণ গোপীগণ সহ তথা।
বিহরয়ে কহে হাস-পরিহাস কথা॥
হেনকালে তথা এক বানর আইল।
হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ কহিতে লাগিল॥
এই যে বানরদ্বারে রাম অবতারে।
রাবণ বধিতে সেতু বাঁধিনু সাগরে॥
তাহা শুনি গোপী হাসি লুঠিয়া পড়িল।
পরস্পর শ্লেষ করি কহিতে লাগিল॥
শুন্যেছ গো অপরূপ আর এক কথা।
ইনি নাকি রামরূপে পঞ্চবটী যথা॥
বানর ভাল্লুক নিঞা সাগর বাঁধিয়া।
সীতার উদ্ধার কৈল রাবণ বধিয়া॥
ঈশ্বর হয়েন ঞিহায় (ক) প্রণাম করহ।
পূজা পাতি আনিঞা (খ) যে বর মাগি লহ॥
এই মত কহি সভে শেলেষ করিয়া।
নমস্কার করে গোপী হাসিয়া হাসিয়া॥
কৃষ্ণ সেই (গ) রঙ্গভঙ্গি দেখি আনন্দিত।
পুলক হইলা যেন অমৃতে সিঞ্চিত॥
পুন কৃষ্ণ কহে সত্য মিথ্যা না কহিনু।
রামরূপে সাগরেতে সেতুবন্ধ কৈনু॥
বরঞ্চ দেখাই যদি দেখিবারে চাহ।
এখানে সমুদ্র আনি যদ্যপিহ কহ॥
সাগর বন্ধন করি সাক্ষাত দেখহ।
তবে মোর বচনে যে প্রত্যয় যাইহ॥
তাহা শুনি গোপী কহে গ্রীবা হেলাইয়া (ঘ)।
ভাল ভাল বান্ধ দেখি সমুদ্র আনিঞা॥
তবে কৃষ্ণ সমুদ্রেরে স্মরণ করিলা।
আজ্ঞাকারী সিন্ধু তথা (ঙ) তৎক্ষণে আইলা॥
মহা কোলাহল শব্দ প্রচণ্ড তরঙ্গ।
ব্যাপক হইয়া আইসে করি নানা রঙ্গ॥

পাঠান্তর—(ক) সুললিত—সুশোভিত।
(খ) হোরি খেলায় যথা পলাইল প্রিয়গণ।
(গ) বদ্রীনাথ—বৈদ্যনাথ।
(ঘ) সেই রূপ—যথা রূপ।
(ঙ) কিঞ্চিত বর্ণিব আর নাহি হয় অন্ত।
(চ) আনিলা ইচ্ছায় আপনি—আইলা সঞ্চারিতে।

পাঠান্তর—(ক) ঞিহায়—ঞিহো।
(খ) পূজা পাতি আনিঞা—পূজা আদি মানিয়া।
(গ) সেই—গোপী।
(ঘ) হেলাইয়া—ফিরাইয়া।
(ঙ) আজ্ঞাকারী সিন্ধু তথা—স্মরণ করিতে সিন্ধু।

গোপিকা দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হইয়া।
ধরিলেন কৃষ্ণকণ্ঠ বাহু পসারিয়া॥
কৃষ্ণ সুখী হইয়া কৌতুক করি কহে।
সেতুবন্ধ করি তবে আইস মোর সহে॥
পাথর বহিয়া আন তোমরা সভাই।
মোর হস্তে দেহ মুঞি জলেতে বসাই (ক)॥
তবে গোপীগণ সভে মাথায় করিয়া।
পাথর বহিয়া আনে হরষিত হৈয়া॥
পাথর লইয়া কৃষ্ণ জলেতে রাখয়।
নাহিক ডুবয়ে শিলা ভাসিয়া রহয়॥
এই মত সাগর বন্ধন কৈলা হরি।
রামেশ্বর মহাদেবে আনয়ে সঙরি॥
সেতুবন্ধোপরি মহাদেব যে বসিলা।
পূর্ব্বে সেতুবন্ধোপরি যথা বাস কৈলা॥
গোপীগণ দেখিয়া সে সব বিবরণ।
চমৎকার হৈল, মুখে না সরে বচন॥
ভাবিয়া করিল স্থির সভাই মেলিয়া।
কৃষ্ণ কি কুহক জানে তাহা প্রকাশিয়া॥
এ সব করিয়া মো-সভারে দেখাইল।
নতুবা সাগর এথা কেমনে আইল॥
অতএব গোপীগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য।
দেখিয়া না মানে, মানে ইন্দ্রজাল-কার্য্য॥
সেই যে সাগর সেতুবন্ধ রামেশ্বর।
কৃপা কর হই যেন গোপিকা-কিঙ্কর॥
পোঁদ-পিছেলি খেলিলেন সঙ্গে সখাগণ।
পর্ব্বতে তাহার চিহ্ন অদ্যাপি দর্শন॥ (খ)
শিশু-বৎস সহ বনে করিলা ভোজন।
তাহার যে থালী দুই আছে বর্ত্তমান॥
কাম্যবনে অসংখ্য লীলার স্থান হয়।
অধিক লিখিতে নারি পুস্তক বাড়য়॥
পরে বৃষভানুপুর বর্ষান আখ্যান।
চৌদিগে প্রাচীর হয় অতি শোভাবান্॥
বর্ষান পর্ব্বতোপরি রাজার আলয়।
ত্রৈলোক্যের পূজ্য বৃষভানু মহাশয়॥

পাঠান্তর—(ক) বসাই—ভাসাই।
(খ) খেলিলা পর্ব্বতে তার আছে দরশন।

লাললাড়িনী জীউ তথাই বিরাজে।
বিচিত্র দেউল কুঞ্জে নানা বাদ্য বাজে॥
গ্রামে অষ্ট সখী সহ প্যারী যে (ক) বৈসয়।
নিকটে শ্রীবৃষভানু মহারাজ হয়॥
বামে শ্রীকীর্ত্তিদা-মাতা (খ) সম্মুখে শ্রীদাম।
তাঁর গুণ কে কহিবে কৃষ্ণ-প্রিয়তম॥
পূর্ব্বে বৃষভানুকুণ্ড ভানুখোর নামে।
কীর্ত্তিদা-মাতার (গ) কুণ্ড শোভে তার বামে॥
বিলাস নামেতে বন ধূলি খেলার স্থান।
যথা বর পাইলা প্যারী দুর্ব্বাসার স্থান॥
সখীসঙ্গে সুধামুখী বসি ধূলি খেলে।
তথা দিয়া শ্রীদুর্ব্বাসা যান হেনকালে॥
আর যত বালিকা যে কেহ না উঠিলা।
রাধিকা উঠিয়া দণ্ডবত নতি কৈলা॥
পরম রূপসী তাতে সৌজন্য তা দেখি।
মুনিবর অন্তরে হইলা বড় সুখী॥
প্রসন্ন হইয়া মুনি বর দিতে চাহে।
কহিতে না জানে (ঘ) বালা চুপ করি রহে॥
বুঝিয়া তো মুনিবর বিচার করিল।
স্ত্রী জাতির উচিত যেই বরদান কৈল॥
তুমি যে করিবে পাক অমৃত সমান।
হইবেক, যেই তাহা করিবে ভোজন॥
পরমায়ু বুদ্ধি তার হইবে বিস্তর।
কান্তি পুষ্টি হইবে নির্ব্যাধি কলেবর॥
পরে শ্রীসঙ্কেত-বট সঙ্কেত-বিহারী।
প্রেম-সরোবর আর অনেক (ঙ) মাধুরী॥
পরেতে শ্রীনন্দীশ্বর নন্দের আলয়।
কৃষ্ণের শ্রীচন্দ্রশালা অতি উচ্চ হয়॥
বর্ষানে শ্রীকিশোরীর গৃহের (চ) দুয়ার।
নন্দীশ্বরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচন্দ্রশালার॥

পাঠান্তর—(ক) প্যারী যে—প্যারীজী।
(খ) শ্রীকীর্ত্তিদা-মাতা—শ্রীকীর্ত্তিকামাতা।
(গ) কীর্ত্তিদা-মাতার—কীর্ত্তিকা-মাতার।
(ঘ) জানে—পারে।
(ঙ) আর অনেক—আদি যতেক।
(চ) গৃহের—ঘরের।

দুয়ার সমান দোঁহে দোঁহা দৃষ্টি হয়।
দোঁহে দোঁহা হেরি সুধাসাগরে ভাসয়॥
শ্রীনৃসিংহদেব হন গ্রামের দক্ষিণে।
পূর্ব্বে শ্রীললিতাকুণ্ড তার পূর্ব্ব স্থানে॥
কৃষ্ণপদ-চিহ্ন এক পাষাণে শোভয়।
ললিতাকুণ্ডের যাম্যে[১] সূর্য্যকুণ্ড হয়॥
বিশাখার কুণ্ড তার অগ্নিকোণ-স্থানে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় পরম শোভনে॥
তাহার নৈর্ঋতে পৌর্ণমাসীর ভবন।
তাহাই শ্রীনান্দীমুখী-ঠাকুরাণী-স্থান॥
পশ্চিমে শ্রীযশোদাকুণ্ড পরম কানন (ক)।
কৃষ্ণের সান্ত্বনা হেতু রহে হাউগণ॥
স্নান করেন মাতা জলেতে নাম্বিয়া।
ততক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্রে ঘাটে বসাইয়া॥
কান্দিলে সান্ত্বনা করে হাউ দেখাইয়া।
ভয়েতে না কান্দে কৃষ্ণ থাকেন বসিয়া॥
শ্রীমন্‌-সনাতন-প্রভু গোস্বামি-জীউর।
অতুল মহিমা স্থান ভজন-কুটীর (খ)॥
অনন্ত লীলার স্থান নন্দগ্রামে হয়।
অধিক কহিতে নারি পুস্তক বাড়য়॥
যাবট আখ্যান গ্রাম শুভ সুখময়।
গোপ-গোপপুত্র অভিমন্যের আলয়॥
শ্রীমতীর গৃহে অভিমন্যু পতিম্মন্য[২]।
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে অন্য॥
অতি উচ্চ রত্ন-অট্টালিকাতে বসিয়া।
সখীসঙ্গে কৃষ্ণ-কথা-রসসঙ্গ-হিয়া॥
লালসা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমাত্র মনবৃত্তি।
দেহ গেহ ধন জন সর্ব্বত্র বিরক্তি॥
পূর্ব্বেতে কিশোরী বট পরমমোহন।
কৌতুকে ঝুলয়ে রাই সঙ্গে সখীগণ॥
সিদ্ধি-সরোবর আদি বহু লীলাস্থান।
সংক্ষেপে কহিল কিছু যাবট আখ্যান॥

পাঠান্তর—(ক) পরম কানন—কদম্ব কানন।
(খ) ভজন-কুটীর—ভজন কোটির।

১। যাম্যে—দক্ষিণে।
২। পতিম্মন্য—যে নিজেকে পতি মনে করে।

পরে শ্রীমালিনীকুণ্ড মালিনী-আলয়।
মালিনী সহিত প্যারী অন্তর-আশয়॥
নির্জ্জনে বসিয়া কহে আনন্দ-উল্লাসে।
মালিনী জিজ্ঞাসে কহে প্রেমানন্দে ভাসে॥
ক্রোশেক পরেতে শ্রীকোকিলাবন হয়।
তথা হৈতে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্কেত করয়॥
কুহুকুহু ধ্বনি কোকিলের রব করে।
রাই তাহা শুনি তথা করে অভিসারে॥
শ্রীনন্দীশ্বরের পূর্ব্বে আজনক-গ্রাম।
কৃষ্ণ রাই-চক্ষে পরাইলেন অঞ্জন॥
দক্ষিণ-করেলা চন্দ্রাবলীর নগর।
রাসকেলি-স্থান তথা ঝুলনা সুন্দর॥
সাহার বলিয়া গ্রাম উপনন্দ-স্থান।
মর্ণানামেতে গ্রামে সূর্য্যকুণ্ড হন॥
সূর্য্যের মূরতি তথা তীরে বিরাজয়।
সূর্য্যপূজা ছলে রাই কৃষ্ণেরে মিলয়॥
সাহারের পূর্ব্বে রাধাকুণ্ডের ঈশান।
শঙ্খচূড় বধ আদি বহু লীলা-স্থান॥
সাঁথির ঈশানকোণে উমরাই গ্রাম।
প্যারী যাঁহা রাজা হৈল রাজপট্ট ধাম॥
বৃন্দাবনেশ্বরী রাজা সখীগণ জানি।
রাজ-অভিষেক কৈল কৃষ্ণে নাহি গণি॥
তাহা শুনি সখাগণ কৃষ্ণে কৈল রাজা।
বৃন্দাবনে মানিঞা কৃষ্ণের সব প্রজা॥
তাহা দেখি জোরাবরি কৃষ্ণে উঠাইয়া।
ছলে আনি দিলা প্যারী সনে মিলাইয়া॥
কৃষ্ণ যথা রাজা হৈল ছত্রবন নাম।
বজ্রনাভ তথা কৈল জলাশয় গ্রাম॥
কৃষ্ণেরে করিয়া প্রজা হাসি সখীগণে।
প্যারীকে করিল তবে রাজা বৃন্দাবনে॥
সখীগণে কহেন শ্রীললিতা সুন্দরী।
বৃন্দাবনে রাজা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী॥
শুনিলাম আর কেটা রাজা নাকি (ক) হৈল।
প্যারীজীর রাজ্যে আসি অধিকার কৈল॥

পাঠান্তর—(ক) নাকি—যেন।

ধরিয়া আনহ শীঘ্র যাইয়া তাহারে।
দণ্ড করি বদ্ধ কর কুঞ্জ-কারাগারে॥
তবে দুই চারি সখী যাইয়া কহয়ে।
প্যারীজীর রাজ্যে কেটা রাজা নাকি হয়ে॥
এত বড় যোগ্যতা যে আছয়ে কাহার।
উঠিয়া চলহ শীঘ্র হুকুম রাজার॥
ইহা কহি হাথ পাকড়িয়া উঠাইয়া।
ছলে আনি দিলা প্যারী সনে মিলাইয়া॥
প্যারীর সম্মুখে খাড়া করিয়া রাখিলা।
ঘোমটা টানিঞা প্যারী ঈষত হাসিলা॥
যোড়হস্ত করি কৃষ্ণ দাণ্ডাইলা আগে।
পাত্র শ্রীললিতা বসি প্যারীর বামভাগে॥
প্রতাপ করিয়া তেঁহো কহে সখীগণে।
এই কি নৃপতি হৈল শ্রীল-বৃন্দাবনে॥
ভাল মতে দেহ সভে ইহার সাজাই।
কৃষ্ণ কহে মোর কিছু অপরাধ নাঞি॥
আজ্ঞামাত্রে আইলাম মহারাজার স্থানে।
যে দণ্ড করিতে হয় করহ এখনে॥
ললিতা কহেন নিজ হস্তে তুমি রাই।
যে উচিত হয় দেহ ইহার সাজাই॥
কুঞ্জ-কারাগারে নিঞা (ক) লইয়া নির্জ্জনে।
বাহুযুগ-লতা দিয়া করিয়া বন্ধনে॥
হেমগিরিদ্বয় বক্ষস্থলে চাপাইয়া।
দশনে বদন ক্ষত করহ দাবিয়া (খ)॥
ইহা শুনি বদনে বসন দিয়া ধনী।
লাজে অধোমুখ হৈল কমলবদনী (গ)॥
ললিতার চতুরাই বাক্য শুনি রাই।
ক্রোধভাব করি ভর্ৎসে ভ্রূভঙ্গি চরাই॥
সে ভঙ্গি দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দ-অন্তর।
দোঁহার দর্শনে হৃষ্ট মন দোঁহাকার॥
দোঁহে দোঁহা মিলি সুখসাগরে ভাসিল।
সখীগণ হেরি মহাকৌতুকি হইল॥

পাঠান্তর—(ক) নিঞা—গিয়া।
(খ) করহ দাবিয়া—কর বিদারিয়া।
(গ) কমলবদনী—কমলনয়নী।

কুশস্থলী দ্বারকা-লীলার প্রকরণ।
যাবট নিকট হয় বকথরা (ক) গ্রাম॥
হারোয়াল নামে গ্রাম পাশাক্রীড়া যথা।
কৃষ্ণ হারিলেন রাধিকার স্থানে তথা॥
কৃষ্ণের ময়ূর-মৃগ বান্ধিয়া লইয়া।
সখীগণ চলিলেন পণেতে জিনিঞা॥
দাইগ্রামে কৃষ্ণ দধি খাইলা যথায়।
বটবৃক্ষ-পত্রে দোনা অদ্যাপিহ হয় (খ)॥
শেষশায়ী গ্রামে বিরাজয়ে শেষশায়ী।
অনন্ত-শয্যায় প্রভু আছেন সদাই॥
ক্ষীরসিন্ধু পুষ্পোদ্যান তাহার অগ্রেতে।
ব্রজের সীমানা খাম্বা আছয়ে তথাতে॥
উজানি-নগর হয় খয়ের-গ্রামের পূর্ব্বে।
যমুনা উজান বহে মুরলীর রবে॥
রামঘাট যথা বলদেব রাস কৈল।
বায়ুকোণে বৎসাসুর দৈত্য বধ হৈল॥
গো-বৎস-হরণ আসি ব্রহ্মা যথা কৈল।
পূর্ব্বেতে ভূষণ বন নানা লীলা হৈল॥
সুন্দর রতন-ভূষা আনি সখীগণ।
পরাইল শ্রীকৃষ্ণেরে করিয়া যতন॥
আগিয়ারা গ্রাম যথা মুঞ্জাটবী বন।
তথাই অক্ষয় বট দাবাগ্নি-মোচন॥
পূর্ব্বে তপবন যথা কন্যা গোপীগণ।
কাত্যায়নী পূজা করি পাইল বরদান॥
যথা যমুনার চীরঘাট কৃষ্ণ যথা।
বসন হরিল গোপিকার করি নতা (গ)॥
নিকটেতে গোপীঘাট (ঘ) যথা গোপীসঙ্গে।
ছল করি কৃষ্ণচন্দ্র বিহরিল রঙ্গে॥
নন্দঘাট পরে হয় শ্রীনন্দ রাজেরে।
যথা হৈতে লৈয়া যায় বরুণের চরে॥

পাঠান্তর—(ক) বকথরা—বকরথা।
(খ) অদ্যাপিহ হয়—অদ্যাপি আছয়।
(গ) নতা—লতা।
(ঘ) নিকটেতে গোপীঘাট—নিকটে গোপিকাঘাট।

তাহার পশ্চিমে ব্রহ্মমোহন পুলিন।
সখা সঙ্গে কৃষ্ণ চন্দ্র (ক) করিলা ভোজন॥
সেহালা নামেতে যে দ্বিতীয় শেষশায়ী।
রূপের তুলনা দিতে ত্রিজগতে (খ) নাঞি॥
শ্রীনন্দঘাটের পূর্ব্বপারে অগ্নিকোণে।
ভদ্রবন কৃষ্ণে ভদ্র করাইলা সেই স্থানে॥
বাহুযুদ্ধ আদি খেলা সখাগণ সনে।
সুন্দর ভাণ্ডারী বন তাহার দক্ষিণে॥
সখাগণ সনে তথা সদাই ক্রীড়ন।
ভাণ্ডীর নামেতে বট একাদশ বন॥
পরে বিল্ববনে সখা সনে নানারঙ্গে।
লক্ষ্মী তপ করে তথা অদ্যাপি না ভঙ্গে॥
রাসে কৃষ্ণ সনে লক্ষ্মী রাস ইচ্ছা কৈল।
ব্রজের অনুগা নহে, কৃষ্ণ না লইল॥
তেকারণে লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করয়ে।
রাস না পাইলা, তভু ক্ষান্ত নাহি হয়ে॥
অষ্টম শ্রীমহাবন কৃষ্ণ-জন্মস্থান।
অনন্ত লীলার স্থান তথায় যে হন॥
মথুরামণ্ডল মধ্যে চব্বিশ কানন।
নিত্যলীলা শ্রীকৃষ্ণের পরমমোহন॥
দুয়াদশ বন দুয়াদশ উপবন।
তা সভার নাম শুন করিব কীর্ত্তন॥
যাহার স্মরণে (গ) মিলে কৃষ্ণ-প্রেমধন।
আশ্চর্য্য তাহাতে কিবা সংসার-মোচন॥
যমুনার পশ্চিমে যে হয় সপ্ত বন।
মধু তাল কুমুদ বহুলা কাম্যবন॥
বৃন্দাবন আর যে খদির (ঘ) নামে বন।
এই সপ্ত আর পঞ্চ পূর্ব্বপারে হন॥
ভদ্র ভাণ্ডীর (ঙ) বেল লোহ মহাবন।
এই পঞ্চ একত্রেতে দ্বাদশ গণন॥

পাঠান্তর—(ক) কৃষ্ণ চন্দ্র—কৃষ্ণ যথা।
(খ) ত্রিজগতে—ত্রিভুবনে।
(গ) স্মরণে—শরণে।
(ঘ) খদির—তমাল বা অমলা।
(ঙ) ভাণ্ডীর—ভাণ্ডীল।

আর উপবন সেহ হয় যে দ্বাদশ।
পরম মহিমা সর্ব্ববেদে গায় যশ॥
অম্বিকা কানন কোট আর যে খেলন।
নেওছাক জেওলাই ছত্র তপ বন॥
কোকিল ভূখণ বচ্ছ মুঞ্জাটবী বন।
আর যে বিলাস-বন দ্বাদশ গণন॥
এই যে চব্বিশ বন ভুবন-পাবন।
কৃষ্ণ-ক্রীড়া স্থান পূজ্য স্মরণীয় (ক) হন॥
এ সব বনের মধ্যে কোন কোন স্থান।
মহিমা উদ্দেশে করি কৃষ্ণলীলা গান॥
বৃন্দাবন মধ্যে নিধুবন আদি করি।
অষ্ট কুঞ্জ আর রাসস্থলী-সুমাধুরী॥
কিঞ্চিত মহিমা গান করিব মানস।
ক্ষুদ্রজনে যেন সিন্ধু-লঙ্ঘনে সাহস॥
শ্রীমন্মথুরামণ্ডল হয় মূলধাম।
পরম-মহত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অভিরাম॥
পরমসৌন্দর্য্য মহিমায় পরাৎপর।
ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে (খ) সম নাহি আর॥
মথুরা নামের যে মহিমা চমৎকার।
স্কন্দপুরাণাদি শাস্ত্রে করয়ে ফুৎকার॥
পরম পদার্থ হয় মথুরা এই নাম।
কোটিপ্রণব-তুল্য সর্ব্বকাম ধাম॥
ব্রহ্মময় ধাম শ্রুতিগণ গুণ গায়।
গোপাল-তাপনী শ্রুতি দেখ হয় নয়॥

তথাচ শ্রুতিঃ—

"ব্রহ্ম গোপালপুরী হীতি"

অনুবাদ।—গোপালপুরী মথুরা ব্রহ্মস্বরূপা।

আরো বহু শাস্ত্রে বহু মহিমা কহয়।
শ্রুতির শাসনে আর অপেক্ষা না রয়॥
সাধুমার্গে মহাজন-উক্তি (গ) যে শুনহ।
অপূর্ব্ব বারতা যাহা কর্ণ-সুখাবহ॥

পাঠান্তর—(ক) স্মরণীয়—রমণীয়।
(খ) ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে—ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বাহ্য।
(গ) মহাজন উক্তি—মহাজন ভক্তি।

সর্ব্বগ (ক) অনন্ত বিভু কৃষ্ণতন্ু সম।
উপর্য্যধ ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম॥
এই যে অপূর্ব্ব কথা সর্ব্বশাস্ত্র-সার।
মথিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস করিলা উদ্ধার॥
সর্ব্বত্র গমন আর অনন্ত অপার।
সর্ব্বশক্তিযুক্ত যার নাহি পারাপার (খ)॥
অধিক কি আর কৃষ্ণ-তনুর সমান।
উপর (গ) কি অধ ব্যাপি সর্ব্বত্র নিধান॥
সীমা যার নাহি যাহা প্রত্যক্ষ দেখহ।
অন্যের কা কথা ব্রহ্মার হৈল মোহ॥
ব্রজের একদেশে কোটি বৈকুণ্ঠ দেখিল।
অপার মহিমা দেখি ফাঁপর হইল॥
তাহাতে কাহার সাধ্য মহিমা-কথন।
সম্যক কহিতে চাহে সেই মূর্খ জন॥
মথুরার মধ্যে বৃন্দাবন অতি শ্রেষ্ঠ।
তার মধ্যে রাধা-শ্যামকুণ্ড হন জ্যেষ্ঠ॥
তাহার অধিক শ্রীমন্ গিরিগোবর্দ্ধন।
তাহার অধিক নাই তাহার সমান॥
"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী" ইত্যাদি।

অনুবাদ ও পূর্ণ শ্লোক পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য

যদ্যপি কৃষ্ণের দেহ শ্রীল বৃন্দাবন।
তথাপিহ সেব্য-সেবক-রূপ হন॥
সম্যক প্রকারে শ্রীমন্ বৃন্দাবনধাম।
কৃষ্ণসুখ-তাতপর্য্য মাত্র মনস্কাম॥
ফলে ফুলে জলে নানামতে কৃষ্ণে সেবে।
হৃদয়ে চরণ ধরে (ঘ) আনন্দ-উৎসবে॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম-চিহ্ন ধরি।
পরম-শোভিত অঙ্গ ত্রৈলোক্য-সুন্দরী॥
শ্রীরাধার প্রিয়সখী রাধার অনুগা।
রাধার শ্রীবৃন্দাবন কহে শাস্ত্রান্তগা (ঙ)॥

পাঠান্তর—(ক) সর্ব্বগ—সর্ব্বজ্ঞ।
(খ) পারাপার—পারাবার।
(গ) উপর—অপর।
(ঘ) চরণ ধরে—ধারণ করে।
(ঙ) শাস্ত্রান্তগা—শাস্ত্রানুগা।

রাধা বিনে শোভা নাহি, নাহিক আনন্দ।
কৃষ্ণের নাহিক সুখ যেহ সর্ব্বানন্দ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

"কৃষ্ণা বৃন্দাবনী বৃন্দা বৃন্দাবন-বিনোদিনী।" †

অনুবাদ।—শ্রীরাধার এক নাম কৃষ্ণা, এক নাম বৃন্দাবনী, এক নাম বৃন্দা, আর এক নাম বৃন্দাবন-বিনোদিনী।

রাধার শ্রীবৃন্দাবন (ক) কৃষ্ণে সুখ দিতে।
দেহ সোঁপি (খ) সেবয়ে পরম আনন্দেতে॥
অতএব তদীয় সম্ভব বৃন্দাবন।
ভাগবতগণ-চূড়ামণিতে গণন॥

শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ—

"তদীয়াস্তুলসী-শাস্ত্র-মথুরা-বৈষ্ণবাদয়ঃ।"

অনুবাদ।—তুলসী, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র, মথুরা এবং বৈষ্ণব প্রভৃতি তাঁহারই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ।

আর কথোগুলি স্থান-মহিমা কহিব।
অধিক বর্ণিতে মোর শকতি নহিব॥

পাঠান্তর—(ক) রাধার শ্রীবৃন্দাবন—শ্রীরাধার বৃন্দাবন।
(খ) দেহ সোঁপি—গোপীদেহে।

† ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীরাধার উক্ত চারিটি নামের ব্যুৎপত্তি বা নির্ব্বচন প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—

(১) কৃষি মোক্ষার্থবচনো ণ সর্বোৎকৃষ্টবাচকঃ।
আকারো দাতৃবচনস্তেন কৃষ্ণা চ কীর্ত্তিতা॥
কৃষি-মোক্ষ, ণ-উৎকৃষ্ট, অ-দাত্রী।
কৃষ্ণা=উৎকৃষ্ট মোক্ষদাত্রী।

(২) অস্তি বৃন্দাবনং যস্যাস্তেন বৃন্দাবনী স্মৃতা।
বৃন্দাবনস্যাধিদেবী তেন বাথ প্রকীর্ত্তিতা॥
বৃন্দাবনী—বৃন্দাবন যাঁহার আছে বা যিনি বৃন্দাবনের অধিদেবী।

(৩) বৃন্দঃ সংঘবচঃ সখ্যেরকারোঽপ্যস্তিবাচকঃ।
সখীবৃন্দোঽস্তি যস্যাশ্চ সা বৃন্দা পরিকীর্ত্তিতা॥
বৃন্দ (সখীসংঘ বা সখীসমূহ)+অচ্ অস্ত্যর্থে+আপ্
বৃন্দা=যাঁহার সখীবৃন্দ আছে।

(৪) মুদ্‌বাচকো বিনোদশ্চ সা অস্যা অস্তি তত্র চ।
বেদা বদন্তি তাং তেন বৃন্দাবনবিনোদিনীম্॥
বিনোদ মুদ অর্থাৎ আনন্দ। বিনোদ+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্।
বৃন্দাবনবিনোদিনী—বৃন্দাবনে যাঁহার আনন্দ আছে॥

যে যে লীলা যে যে স্থানে লীলার সহিত।
কিঞ্চিত বর্ণিব যথা শকতি উচিত॥
ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন প্রিয় স্থান হয়।
যথা মাতা পিতা বন্ধু প্রেয়সীর চয় (ক)॥
বিশেষ পরম-প্রেষ্ঠ বন কুঞ্জ-আদি।
রাধা সহ মিলনের সুখের অবধি॥
বৃন্দাবন ভূমি হয় চিন্তামণি-ময়।
কল্পবৃক্ষময় যত বৃক্ষলতাচয়॥
সুরভী যতেক লক্ষ লক্ষ গাবীগণ।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মী কৃষ্ণ-সেবাপরায়ণ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াম্‌—

চিন্তামণি-প্রকর-সদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লতাবৃতেষু (খ) সুরভীরভিপালয়ন্তম্‌।
লক্ষ্মীসহস্র-শত-সম্ভ্রম-সেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অনুবাদ।—সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি, যিনি চিন্তামণিসমূহের নিধান স্বরূপ, কল্পবৃক্ষ ও কল্পলতায় আবৃত স্থানসমূহে সুরভি গাভীসমূহ পালন করেন, এবং শত সহস্র লক্ষ্মী সম্ভ্রম সহকারে যাঁহার সেবা করেন।

সৎ চিৎ আনন্দময় শ্রীলবৃন্দাবন।
রাধাকৃষ্ণ-বিহারের পরম মোহন॥
মহারাসস্থলী হয় যমুনাপুলিনে।
যাঁহা রাসক্রীড়া শতকোটি গোপীসনে॥
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা পরমপ্রেয়সী।
তাহার রহস্য শুন শ্রবণ-সরসি॥
বৃন্দাবন-সৌভাগ্য শ্রীরাধিকার গুণ।
শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা পরমমোহন॥
শরত-পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্রের উদয়। (গ)
বৃন্দাবনশোভা যে তা কহনে না যায়॥
চন্দ্রের কিরণে তরু ঝলমল করে।
ছায়া-মধ্যে-মধ্যে শাখা-চন্দ্র উজিয়ারে॥

মল্লিকা মালতী যূথী অশোক চম্পক।
কুন্দ করবীর নবমল্লী কুরুবক॥
নানা পুষ্প প্রফুল্লিত শ্রেণীবন্ধ মতে।
ঝামরিয়া রহে (ক) তাতে ভৃঙ্গ যূথে যূথে॥
সৌগন্ধি তাহাতে হয় কাম-উদ্দীপন।
আনন্দ-কৌতুক তাহে চন্দ্রের কিরণ॥
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে অশ্রু মধুবিন্দু ক্ষরে।
নানাবর্ণ নানাজাতি শোভে থরে থরে॥
নানা পক্ষ নানা বৃক্ষ নানামত শ্রেণী।
ময়ূর কোকিল ভৃঙ্গ আদি করে ধ্বনি॥
শুক-শারি কৃষ্ণগুণ গায় প্রেমানন্দে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে নানা ছন্দে বন্ধে॥
স্বর্ণবর্ণ বৃক্ষ নীললতায় বেষ্টিত।
নীলব[illegible] বৃক্ষ স্বর্ণলতায় শোভিত॥
রতনের পুষ্পগুচ্ছা-সমূহ তাহায়।
মণিবত ফল তাহে অপূর্ব্ব শোভয়॥
নানারত্নময়-বৃক্ষশ্রেণী দুই দিগে।
রতনে জড়িত পথ হয় মধ্যভাগে॥
দুই পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে সরোবর হয়।
চারিদিগে ঘাট নানা বর্ণ মণিময় (খ)॥
রতনের বৃক্ষ চারিদিগেতে হিন্দোলা।
হেম মণিময় তাহে চমকে চপলা॥
সরোবরে প্রফুল্লিত কুমুদ কমল।
স্বর্ণ নী[illegible] রক্ত শ্বেত পরম বিরল (গ)॥
ভ্রমর গুঞ্জরে তাতে শ্রবণ-সুখদ।
নানাজাতি পক্ষী মেলি করয়ে শবদ॥
রাধাকৃষ্ণ সখীসঙ্গে বিহরে কৌতুকে।
হেরিয়া বৃক্ষাদি পশু পক্ষী পায় সুখে॥
যমুনার তীরে হেমমণিতে জড়িত।
মণিময় ঘাট স্থানে স্থানে মনোনীত॥
দুই পার্শ্বে ঘাটের শোভয়ে রত্নবেদি।
কতেক শোভা যে তাহে নাহিক (ঘ) অবধি॥

পাঠান্তর—(ক) প্রেয়সীর চয়—প্রিয় সখীচয়।
(খ) কল্পবৃক্ষলতাবৃতেষু—কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু।
(গ) শরত পূর্ণিমাচন্দ্র চন্দ্রের উদয়।

পাঠান্তর—(ক) ঝামরিয়া রহে—ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে।
(খ) নানাবর্ণ মণিময়—বান্ধা রত্নমণিময়।
(গ) বিরল—উজ্জ্বল।
(ঘ) তাহে নাহিক—তার না হয়।

স্নানকালে শ্রীরাধিকা সখীর সহিতে।
তেলগন্ধ মর্দ্দন করেন বসি সাথে॥
কৃষ্ণ সনে জলক্রীড়া করেন যখন।
সখী সহ জল-ফেলাফেলি হয় রণ॥
তথা দাণ্ডাইয়া সেবাপরা সখীগণ।
রহস্য দেখেন কহে ইঙ্গিত-বচন॥
যমুনার দুই তটে নম্রমান বৃক্ষ।
নানা-ফলফুলে শোভে ডাকে নানা পক্ষ॥
কুমুদ কহ্লার পদ্ম প্রফুল্লিত জলে।
নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ (ক) জলে হংস আদি বুলে[১]॥
পুষ্পের সৌরভে দশদিগ আমোদিত।
ঝাঁকে ঝাঁকে আইসে যায় অলি মধুমিত (খ)॥
তীরে নানা লতা বৃক্ষ কুঞ্জ শোভা করে।
যাথে রাধা-শ্যাম নিত্য আনন্দে বিহরে॥
কেতকী চম্পক নাগকেশর বকুল।
অশোক কিংশুক নীপ কদম্ব পারুল॥
নানাজাতি বৃক্ষ লতা মিলিয়া (গ) সুন্দর।
পৃথক পৃথক কুঞ্জ শোভয়ে বিস্তর॥
তাহার যে শোভা তার (ঘ) বর্ণন না হয়।
অন্যের কা কথা ব্রহ্মা শিব না পারয়॥
লতায় নির্ম্মিত গৃহ লতা থাম খুঁটি।
দালান তেওয়ারি ঘর অতি পরিপাটি॥
লতার তোরণ তাহে পুষ্প প্রফুল্লিত।
স্বয়ং গঠন তাহে নানা শ্রীনির্ম্মিত (ঙ)॥
কমল কহ্লার পারিজাত জাতি যূথী।
রঙ্গণ-মল্লিকা-আদি নানা পুষ্পপাঁতি॥
সুন্দর যে লতা স্নিগ্ধ পত্রের সহিত।
গৃহের ভিতরে উচ্চ-অধতে শোভিত॥
নানা রঙ্গ ভঙ্গিতে দেওয়ালপ্রায় রূপে।
সুন্দর গঠনে রহে চারিদিগ ব্যাপে॥

পাঠান্তর—(ক) সুস্নিগ্ধ—সুগন্ধি।
(খ) অলি মধুমিত্ত—মধুপ ক্ষুধিত।
(গ) মিলিয়া—পরম।
(ঘ) যে শোভা তার—আশ্চর্য্য শোভা।
(ঙ) শ্রীনির্ম্মিত—বিচিত্রিত।
১। বুলে—বিচরণ করে।

স্বর্ণেতে জড়াও মণি-মুকুতার ন্যায়।
শোভা করে হেরি চিত্ত চমৎকার হয়॥
লতাময় পুষ্পযুক্ত শোভে নানাবর্ণে।
তোরণ কবাট দ্বার যথা মণি-স্বর্ণে॥
উপরেতে লতাময় শত শত চূড়া।
চৌদিগেতে বিকসিত নানাপুষ্পে বেড়া॥
অপূর্ব্ব গঠন অলৌকিক শোভা তায়।
পুষ্পের কলস প্রতি চূড়াতে শোভয়॥
নানা পক্ষিগণ বসি ডাকয়ে মধুর।
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে মধু-পিয়াসে (ক) ভ্রমর॥
কুঞ্জের ভিতর স্থল মণি-রত্নময়।
তার মধ্যে সিংহাসন পদ্মাকৃতি হয়॥
চতুর্দ্দিগে অষ্টদল রতন-নির্ম্মাণ।
ললিতাদি অষ্ট সখী বসিবার স্থান॥
মধ্য কিঞ্জল্কেতে (খ) রাধাকৃষ্ণ বিরাজয়।
ত্রৈলোক্য মোহন শোভা চমৎকারময়॥
কুঞ্জ-আদি-শোভা দেবে বর্ণিতে না পারে।
বিনে প্রেমী ভক্ত (গ) রাধাকৃষ্ণের কিঙ্করে॥
মো-হেন ভক্তিহীন জনার দুর্গম।
তাহাতে অবোধ মূর্খ সুমন্দ-করম॥
শরদ জ্যোৎস্না নিশি বনশোভা হেরি।
উৎসাহ হইল কেলি সহ ব্রজনারী॥
শরত পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্রমা হেরিয়া।
উদ্দীপন রাধামুখ-চন্দ্রিমা হইয়া॥
বংশীবট-তটে গিয়া মুরলী বাজায়।
লক্ষ্য করি ব্রজের রমণীগণচয় (ঘ)॥
মোহন মধুর কলধ্বনি রসময়।
কুলের রমণী যাথে অনঙ্গে মাতয়॥
কুলধর্ম্ম-রজ্জু ছিঁড়ি বাহির করয়।
লজ্জা ভয় অভিমান গৌরব ছাড়য়॥
দুস্ত্যজ স্বজন বন্ধুবান্ধব স্বগণ।
তৃণতুল্য করাইয়া করে আকর্ষণ॥

পাঠান্তর—(ক) পিয়াসে—লোভেতে।
(খ) মধ্য কিঞ্জল্কেতে—মধ্যেতে কিঞ্জল্কে।
(গ) প্রেমী ভক্ত—প্রেমভক্তি।
(ঘ) রমণীগণচয়—রমণীগণ চায়।

মুরলীর ধ্বনি শুনি ব্রজবধূগণ।
কন্যাকা আদি যে (ক) গোপী কোটি অগণন॥
মোহিত হইয়া সভে ছুটিয়া ধাইল।
গুরুভয় লোকলজ্জা(খ) গণন না কৈল॥
কেহ বা রন্ধনে কেহ দুগ্ধ-আবর্ত্তনে।
কেহ ছিল নিজ গুরু-জনার সেবনে॥
অন্ন-পরিবেষণে আছিলা কেহ কেহ।
ভোজনে আছিলা (গ) কেহ গুরুজন সহ॥
অন্যের বালকে দুগ্ধ পান করাইতে।
আছিলা কেহ বা নিজ বেষ-রচনাতে॥
যেই যেই যেই মত (ঘ) যেখানে আছিলা॥
ঐমনি চলিলা কোন অপেক্ষা না কৈলা॥
ভোজনে আছিলা আচমন না করিলা।
পরিবেষণের থালী ঐমনি (ঙ) রাখিলা॥
বালকে ভূমেতে ডারি গুরুসেবা তেজি।
ইত্যাদি করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে মজি॥
উৎকণ্ঠায় বেষ বিপর্য্যয় কারো হৈল।
ভ্রমে চরণের ভূষা করেতে পরিল॥
কণ্ঠের যে হার মতি চরণে পরিলা।
চক্ষে না অঞ্জন দিয়া (চ) হৃদয়ে মাখিলা॥
অঙ্গ-আবরণ বস্ত্র কটিতে পরিলা।
কটির ঘাগরা বস্ত্র মস্তকে উঢ়িলা॥
ছুটিয়া যাইতে উন্মত্তের ন্যায় ত্রস্ত।
পদ-আভরণে জড়াইয়া গেল বস্ত্র॥
খসাইয়া লইতে সে ব্যাজ না সহিল।
হিঁচাড়িয়া টানি লৈতে ছিণ্ডিয়া রহিল॥
এই মত প্রতি ঘরে ঘরে গোপীগণ।
ধাইয়া চলিলা (ছ) লক্ষ্য করি বংশীগান॥

পাঠান্তর—(ক) কন্যাকা আদি যে—কন্যাকাদি যত।
(খ) লোকলজ্জা—লোকলাজ।
(গ) ভোজনে আছিলা—ভোজনেতে ছিল।
(ঘ) যেই যেই যেই মত—যেই জন যেই মত।
(ঙ) থালী ঐমনি—পাত্র সেখানে।
(চ) চক্ষে না অঞ্জন দিয়া—চক্ষের অঞ্জন দিয়া।
(ছ) ধাইয়া চলিলা—ধেয়ে চলিলেন।

যথা কৃষ্ণচন্দ্র রহে বংশীবট-তটে।
ঘেরিলা যাইয়া সভে তাঁহার নিকটে॥
হেথা কোন কোন গোপ কোন গোপীগণে।
যাইতে না দিলা ধরি রাখিলা সদনে॥
গৃহের ভিতর রাখে দ্বার রুদ্ধ করি।
তাঁহারা সভার পূর্ব্বে পাইলেন হরি॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তাঁরা প্রাণ তেয়াগিলা।
তৎক্ষণে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে যাইয়া মিলিলা॥
বিচ্ছেদেতে তীব্র তাপ অশুভ নাশিয়া।
পরম নির্বৃতি হৈল শ্রীকৃষ্ণে পাইয়া॥
কিঞ্চিত সাধনে তাঁ সবার ন্যূন ছিল।
তে কারণে ঈদৃক যে (ক) বাধা জনমিল॥
উৎকণ্ঠাতে প্রেম-পরাকাষ্ঠা জনমিল।
যে হেতুক (খ) বিরহেতে প্রাণত্যাগ কৈল॥
যদি বল ব্রজে জন্ম স্বভাবত সিদ্ধ।
সাধনেতে ন্যূন ইহা বড়ই বিরুদ্ধ॥
তাহার সিদ্ধান্ত শুন আচার্য্য টীকাতে।
যে যুক্তি কহিলা সে বিরুদ্ধ নহে তাতে॥
প্রেম-পরাকাষ্ঠা সাধনের সিদ্ধদশা।
ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তি যোগ্য সেই মহাযশা॥
সেই প্রেম হৈতে যদি কিঞ্চিত ন্যূনতা।
থাকিতে শরীর তার পড়ে যথা তথা॥
তথাপিহ ব্রজে তেঁহো জনম লভিয়া।
যে অপেক্ষা থাকে সেই স্থানে পূর্ণ হৈয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ পায় নিজ নিজ ভাবে।
ইহা অসম্ভব নহে বিচারি বুঝিবে॥
প্রেমভাব পক্ক আর কিঞ্চিত ন্যূনতা।
আমাম্র পকাম্র স্বাদু বিশেষেতে যথা॥
বস্তু এক কিন্তু মাত্র স্বাদুর বিশেষ।
তথা যে অপক্ক প্রেম আর পরিশেষ॥
সেই আম্র পাকিয়া সুস্বাদু সেই হয়।
তথা যে অপক্ক প্রেম পক্কতাকে পায়॥
আর এক যুক্তি টীকা আচার্য্য কহয়।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা-প্রকটসময়॥

পাঠান্তর—(ক) ঈদৃক যে—এতাদৃশ।
(খ) যে হেতুক—এই হেতু।

প্রাকৃতিক ব্যক্তি ব্রজে করিতে গমন।
পারয়ে তাহার সাক্ষী যায় দৈত্যগণ॥
অতএব অন্য যে দেশীয় (ক) গোপকন্যা।
ব্রজেগোপে-বিবাহিতা যে হেতুক (খ) ধন্যা॥
ব্রজগোপ-বনিতা শ্রীকৃষ্ণ ভোগ্যা যোগ্য।
অতএব দেহ তেজি গোপী সম শ্লাঘ্য॥
চিদানন্দময় দেহ কৃষ্ণপ্রেমানন্দ।
পরম পুরুষার্থ পরাকাষ্ঠা সুখকন্দ॥
পাইলা শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ সর্ব্বগোপীসহ।
মিলিয়া ঘেরিলা সভে করিয়া উৎসাহ॥
কৃষ্ণসঙ্গে রঙ্গ অঙ্গসঙ্গ-অভিলাষে।
হাব-ভাব-লীলা-কলা-বিলাস প্রকাশে॥
গোপিকার প্রেম-আর্ত্তি আগ্রহ বুঝিতে।
করুণা-বিলাপ-আদি কৌতুক দেখিতে॥
ভঙ্গি করি কৃষ্ণচন্দ্র উদাসীন-ন্যায়।
উপেক্ষা-বচন কহে অরসজ্ঞ প্রায়॥
এ ঘোর রজনী কুলরমণী হইয়া।
বনে কেনে আগমন কিসের লাগিয়া॥
বনশোভা দেখিতে (গ) কি আমারে দেখিতে।
দেখিলে চলিয়া যাহ স্বগৃহে তুরিতে॥
এ নহে উচিত কুলবতী নারীগণে।
রজনীতে গৃহ তেজি যাইতে (ঘ) বিপিনে॥
স্বামি-আদি-গুরুসেবা স্ত্রীগণের ধর্ম্ম।
অতএব ঘরে গিয়া সাধ নিজ কর্ম্ম॥
কৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাক্য শুনি গোপীগণ।
ঈষত হইল ক্রোধ মানি অপমান॥
কহে অহে ধৃষ্ট মোরা তোমার নিকটে।
না আসি, আইনু মোরা যমুনার তটে॥
কুসুম টোটন (ঙ) করি যাইব গৃহেতে।
তুমি কেনে এতো হৈলে উৎকণ্ঠিত চিতে॥

তবে কৃষ্ণ কহে ভাল ভাল পুষ্প তুলি।
লইয়া গৃহেতে যাও, আমি তাহি বলি॥
মানভরে গোপীগণ ফিরে যাইতে চাহে।
না চলে চরণ কিছু ইঙ্গিতেতে কহে॥
অবিদগ্ধ কেমন তুমি হে নিঠুরাই।
তোমার নিকটে মোরা কভু আসি নাঞি॥
নবীন যুবতিবৃন্দ বিদগ্ধা রূপসী।
কুলবতী নারী মোরা বনমধ্যে আসি॥
নির্জ্জনে নবীন যুবা তুমি হে আছহ।
দেখিয়া ফাঁফর হৈনু এবে যাই গৃহ॥
পুন কৃষ্ণ কহে—শীঘ্র যাহ নিজ গৃহে।
তবে গোপী দুঃখেতে কান্দিয়া (ক) কিছু কহে॥
বংশী ধ্বনিতে আকর্ষিয়া মো-সভারে।
কুল-গৃহ স্বামী আদি করাইয়া দূরে॥
আনিঞা এখন কহ নিষ্ঠুর বচন।
গৃহেতে না যাব, আর (খ) ত্যজিব জীবন॥
মন্মথ-অনলে তপ্ত দেহ মো-সভার।
জুড়াও তাপিত অঙ্গ শিরে দিয়া কর॥
গোপিকার অনুরাগ দেখি কৃষ্ণচন্দ্র।
প্রেমের উৎকর্ষ বুঝি হইল আনন্দ॥
আপনাকে সাপরাধি (গ) মানি পুন কহে।
তোমা সভার উপেক্ষা আমার (ঘ) কভু নহে॥
যতেক কহিনু যে বুঝিতে পার নাহি।
এতো কহি সেই বাক্য ফিরাইয়া কহি॥
প্রতিকূল অর্থ (ঙ) অনুকূল ব্যাখ্যা করি।
গোপিকারে শুনাঞিয়া তুষিলা শ্রীহরি॥
তাহা শুনি গোপীগণ আনন্দিত হৈয়া।
মুচকি হাসিয়া দিলা ঘোমটা টানিয়া॥
তবে কৃষ্ণ প্রত্যেকে সভারে আলিঙ্গিয়া।
পুলিনে লইয়া গেলা বিহার লাগিয়া॥

পাঠান্তর—(ক) দেশীয়—দেশের।
(খ) যে হেতুক—সে হউক।
(গ) দেখিতে—হেরিতে।
(ঘ) যাইতে—আসিতে।
(ঙ) টোটন—চয়ন।

পাঠান্তর—(ক) দুঃখেতে কান্দিয়া—দুঃখভাবে কান্দি।
(খ) আর—মোরা।
(গ) সাপরাধি—অপরাধী।
(ঘ) সভার উপেক্ষা আমার—সবে উপেক্ষি এমত।
(ঙ) অর্থ—বাক্য।

পরম উৎসাহে গোপীগণ প্রেমানন্দে।
মত্ত হৈল কৃষ্ণ সনে কলা-রস-মদে॥
হেনকালে শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠ যে প্রেয়সী।
তাঁরে নিঞা অন্তর্দ্ধান হৈলা ব্রজশশী॥
কৃষ্ণে না দেখিয়া গোপী চারিপানে (ক) চায়।
আচম্বিতে বজ্র যেন পড়িল মাথায়॥
হাহাকার করি সভে লোটায় ধরণী।
বিরহে কাতর কান্দে যতেক রমণী॥
কৃষ্ণ অন্বেষণে ফিরে বিহ্বল হইয়া।
বৃক্ষ-আদি-গণে পুছে প্রলাপ করিয়া॥
আম্র পনস জম্বু কপিত্থ পিয়াল।
কৃষ্ণ দেখিয়াছ কোথা তোমরা সকল॥
উত্তর নাহিক যদি (খ) দিলা বৃক্ষগণ।
তবে কহে তোমরা না কবে বিবরণ॥
তুমি সব হও কৃষ্ণ-সখার সমান।
তেকারণে মো-সভারে করিলে গোপন॥
আগে গিয়া কহে পুন তুলসি কল্যাণি।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-প্রিয়া সৌভাগ্যের ধনী (গ)॥
তুমি মো-সভার হও সখীর সমান।
কৃষ্ণ কোথা কহি দুঃখে কর পরিত্রাণ॥
তেঁহো যদি না কহিলা আগে (ঘ) চলি যায়।
কৃষ্ণ-পদচিহ্ন তথা দেখিবারে পায়॥
মধ্যে মধ্যে কোন রমণীর পদচিহ্ন।
হেরি ঈর্ষা-শোক-মানে মতি হৈল দৈন্য॥
ললিতাদি সখী পুন বুঝিলা মরম (ঙ)।
ইঞহ রাধা মো-সভার সখী প্রিয়তম॥
হরিষ হইল তাহে (চ) বিমর্ষ বিচ্ছেদে।
সৌভাগ্য তাহার সভে প্রশংসে আহ্লাদে॥
প্রতিপক্ষগণ নিন্দে সপত্নীর ভাবে।
যার যেই ভাবে নিন্দাস্তুতি করে সভে॥

পাঠান্তর—(ক) চারিপানে—চারিদিকে।
(খ) নাহিক যদি—যদ্যপি নাহি।
(গ) ধনী—খনি।
(ঘ) আগে—রাগে।
(ঙ) সখী পুন বুঝিলা মরম—সখীগণ বুঝিলা বিষম।
(চ) হরিষ হইল তাহে—ঈর্ষ্যা হৈল তাহে যে।

আগে দেখে কুসুমিত বৃক্ষের তলাতে।
ছিন্ন ভিন্ন পুষ্প বিতরিয়া চারিভিতে॥
তাহা দেখি বিতর্ক করয়ে সভে মেলি।
এই পুষ্পতরু (ক) হৈতে কৃষ্ণ পুষ্প তুলি॥
সেই ভাগ্যবতী প্রেয়সীর বেষ কৈল।
প্রণয়ে তাঁহার মনোরথ পুরাইল॥
প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে।
ডাল ভাঙ্গি নিল পুষ্প গুচ্ছের সহিতে॥
উন্মত্তের প্রায় পুন কহে লতাগণে।
তোমরা যে হও মোর সখীর সমানে॥
কৃষ্ণকে দেখ্যেছ কহ এ পথে যাইতে।
এক যে পরম প্রেষ্ঠা প্রেয়সী সহিতে॥
তোমা-সভে সনে ক্রীড়া কৈল এই স্থানে।
যে হেতুক স্নিগ্ধ প্রফুল্লিত পুষ্পসনে॥
বনমধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র মনে বিচারিল।
গোপীসহ রাস-বিহারের বাঞ্ছা হৈল॥
কিন্তু সকলেরে বঞ্চি রাধিকা লইয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈনু (খ) সভাকারে দুঃখ দিয়া॥
পুন গিয়া মিলিলেও রাধিকা সহিত।
ঈর্ষাদি করিবে রস না হবে উচিত॥
অতএব ইঞহারেও ছাড়ি অন্তর্দ্ধান।
করি যে সভার প্রতি হইবে সমান॥
এতো ভাবি স্কন্ধে চঢ়া দোষ ছল করি।
অন্তর্দ্ধান কৈল তাঁরে বনে ছাড়ি হরি (গ)॥
কৃষ্ণ-বিরহেতে তেঁহো কাতর হইয়া।
কান্দয়ে বিহ্বল-চিত্ত ভূমেতে পড়িয়া॥
হেথা গোপীগণ সভে যাইতে যাইতে।
বিরহিণী তাঁহারে (ঘ) দেখেন সম্মুখেতে॥
শঠতা বুঝিয়া (ঙ) কৃষ্ণে সভাই নিন্দয়ে।
মুখ মুছাইয়া গলে ধরিয়া কান্দয়ে॥

পাঠান্তর—(ক) পুষ্পতরু—তরুবর।
(খ) কৈনু—হৈনু।
(গ) ছাড়ি হরি—পরিহরি।
(ঘ) তাঁহারে—রাধারে।
(ঙ) বুঝিয়া—জানিয়া।

তাঁহারে লইয়া পুন কৃষ্ণে অন্বেষিতে।
চলিলা পাগলপ্রায় কান্দিতে কান্দিতে॥
যাবত আছিল জ্যোৎস্না তাবত চলিলা।
ঘোর অন্ধকার বন দেখিয়া ফিরিলা॥
পুন যমুনার চর-পুলিনে আসিয়া।
লীলানুকরণ করেন তাদাত্ম্য পাইয়া[১]॥
কেহ তো পূতনা-বধ শকট-ভঞ্জন।
কেহ বস্ত্র তুলি ধরে গিরি গোবর্দ্ধন॥
ইত্যাদি করিয়া লীলা কথোক্ষণ করি।
কৃষ্ণ-বিরহের বেগ সহিতে না পারি॥
উচ্চস্বরে কান্দে বহু বিলাপ করিয়া।
উর্দ্ধমুখে কৃষ্ণচন্দ্র মুখ সঙরিয়া॥
হে কৃষ্ণ হে গোপীনাথ মদন-মোহন।
অবিলম্বে দেখা দিয়া রাখহ জীবন॥
নবঘন জিনি রূপ শ্রীচন্দ্রবদন।
না দেখিয়া এই দেখ নিকশে জীবন (ক)॥
আমরা সুহৃদ তব ব্রজের রমণী।
গোপিকা-নন্দন (খ) ব্রজে নহ কি আপনি॥
অতএব মো-সভার মুখ (গ) নিরখিয়া।
দরশন দেহ নাথ করুণা করিয়া॥
গোপিকার ক্রন্দন করুণা শুনি হরি।
আপনারে অপরাধী (ঘ) মানি শীঘ্র করি॥
আইলা তথায় যথা গোপী প্রলাপয়ে।
সে যে চমৎকার রূপ বর্ণন না হয়ে॥

ত্রিপদীছন্দ

মন্থর গমনে আইসে, অঙ্গভঙ্গি রঙ্গরসে,
মন্দ মন্দ হসিত বদন।
পীতাম্বর বনমালা, বর্ণ সুচিক্কণ কালা,
শোভা মনমথের মদন॥
পরম সুন্দর রূপ, সুবিদগ্ধ রসকূপ,
নারীগণ-মন-মোহনিঞা।
চরণে নূপুর বাজে, নানা আভরণ সাজে,
রূপ কোটি মদন জিনিঞা॥
দূরে হৈতে গোপীগণ, হেরি চমকিত মন,
চঞ্চল নয়ানে সভে চাহে।
দারিদ্রের হারা ধন, পাইলে যথা হৃষ্ট মন (ক),
প্রাণ যথা আইসে মৃতদেহে॥
তেমতি শ্রীকৃষ্ণধন, পাইয়া গোপিকাগণ,
ধাইয়া চলিলা উর্দ্ধশ্বাসে।
কার আলুয়াইল কেশ, কার (খ) ছিন্ন ভিন্ন বেশ,
পড়ি গেল উত্তরীয় বাসে॥
উন্মত্ত পাগলী-প্রায়, শ্রীকৃষ্ণ নিকটে যায়,
প্রেমানন্দে বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাঞি।
কেহ গিয়া কণ্ঠ ধরে, কেহ ধরে গিয়া করে,
কেহ তো বসন ধরে যাই॥
কেহ আলিঙ্গন করে, কেহ পদ ধরি করে,
হৃদয়ে ধরিয়া জুড়াইল।
করপদমে (গ) চুম্বন, করে কেহ ঘনে ঘন,
চর্ব্বিত তাম্বূল কেহ লৈল॥
কোন শ্রেষ্ঠ প্রেয়সী, ক্রোধাবেশে মুখশশী,
ভ্রূকুটি করিয়া ভুরু ভঙ্গি (ঘ)।
নাসায় অঙ্গুলি দিয়া, শ্রীমুখে নয়নার্পিয়া,
দূরে থাকি সহ নিজ সঙ্গি॥
বনে যে তেজিয়া গেলা, দুঃখ অপমান দিলা,
তাহা মনে স্মরণ করিয়া।
সহজে স্বভাব বামা (ঙ), উৎকট-কুটিল-প্রেমা,
মানাবেশে রহে দাণ্ডাইয়া॥

পাঠান্তর—(ক) জীবন—পরাণ।
(খ) গোপিকা-নন্দন—গোপী অনুকূল।
(গ) মুখ—দুঃখ।
(ঘ) আপনারে অপরাধী—আপনার অপরাধ।

১। তাদাত্ম্য পাইয়া—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করিতে করিতে যেন শ্রীকৃষ্ণই হইয়া গেলেন এইভাব।

পাঠান্তর—(ক) পাইলে যথা হৃষ্ট মন—পাইলে হরিষ মন।
(খ) কার—কেহ।
(গ) করপদমে—করপদ্মেতে।
(ঘ) ভুরু ভঙ্গি—করি ভঙ্গি।
(ঙ) বামা—রামা।

ললিতা সুন্দরী সখী, তাহার পার্শ্বেতে থাকি,
কৃষ্ণরূপ সুখময় নিধি।
নয়ন দ্বারায় (ক) করি, হৃদয় মাঝারে ভরি,
অন্তরে হেরয়ে আঁখি মুদি॥
নিজ দেহ পাসরিলা, সুধাসিন্ধু ডুবি গেলা,
ধ্যানে তদাকার বৃত্তি হৈলা।
বিশাখাদি সখীগণ, নিরখি শ্রীচন্দ্রানন,
চিত্র-পুত্তলিকা-প্রায় ভেলা॥
স্বভাব যেমন যার, মধ্যা প্রগল্‌ভা আর,
ধীরমধ্যা আদি করি যত।
তেমতি সভার রীতি, স্বভাবতঃ কৃষ্ণ-প্রীতি,
প্রকাশিল সভার সেই মত॥
তার মধ্যে বামা অতি, সুমধ্যা-স্বভাব-মতি,
যেঁহো দূরে ভ্রূকুটি করিয়া।
নয়ান অর্পিয়া রহে, মানে কিছু নাহি কহে,
তাঁর ভাবে সুখী কৃষ্ণ-হিয়া॥
অন্তরে আনন্দ মতি, বাহ্যে তার কিছু রীতি (খ),
প্রকাশিয়া অপরাধ মানি।
যোড়করে স্তুতি করি, আলিঙ্গিয়ে হৃদে ধরি,
কৃষ্ণস্পর্শে জুড়াইল পরাণি॥
সর্ব্বদুঃখ গেল দূরে ভাসি সুখসিন্ধু নীরে,
কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়া রহিল।
ললিতাদি নিজ গণ, হেরিয়া আনন্দ মন,
প্রিয়সখী-সৌভাগ্য জানিল॥
তবে কৃষ্ণ হর্ষ মনে, যতেক গোপিনীগণে,
রাস-বিলাস হেতু লৈয়া।
চৌদিগে রমণীবৃন্দ, হেমময় যেন ইন্দু,
তার মধ্যে চলয়ে বসিয়া॥
পুলিন সুরম্য স্থান, বালুকার যত ভাণ,
তাহে পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ।
ঝলমল শোভা করে, যাথে কৃষ্ণমন হরে,
তথা চলে হইয়া উল্লাস॥

পাঠান্তর—(ক) নয়ন দ্বারায়—নয়ন দুয়ারি।
(খ) তার কিছু রীতি—কিছু লজ্জা রীতি।

গোপীগণ সভে মিলি, পুন ছাড়ি যাবে বলি,
কেহ বস্ত্র ধরে কেহ কর।
কেহ কেহ করে করে, মণ্ডলী করিয়া ধরে,
পাছে হারা হই পুনর্ব্বার॥

তবে কৃষ্ণ গোপীসহ পুলিনে যাইয়া।
অদভুত রাসলীলা রচনা করিয়া॥
নাচয়ে গোপিকা সহ ত্রিমণ্ডলী করি।
মধ্যে এক মূর্ত্ত্যে (ক) নাচে রাধা সহ হরি॥
ত্রিমণ্ডলী পংক্তি তার অদ্ভুত কথন।
অতি চমৎকার তার না হয় বর্ণন॥
দুই দুই গোপী মধ্যে কৃষ্ণ এক এক।
সর্ব্ব-গোপী-মধ্যে (খ) কৃষ্ণ প্রত্যেকে প্রত্যেক॥
অসংখ্য গোপিকা শতকোটি শব্দমাত্র।
অসংখ্য প্রকাশে কৃষ্ণ বিহরে (গ) সর্ব্বত্র॥
এই মত ত্রিমণ্ডলী প্রিয়াগণ সনে।
মণ্ডলীর মধ্যে হয় মঞ্জরীর গণে॥
দাসিকাদি করি নানা বাদ্যযন্ত্র লৈয়া।
বাজায় সুতাল (ঘ) বাদ্য আনন্দিত হিয়া (ঙ)॥
এইমত চমৎকৃত মণ্ডলী বান্ধিয়া।
আলাত-চক্রের[১] ন্যায় নাচয়ে ভ্রমিয়া॥
বর্ত্তুল আকার তিন মণ্ডলীতে হরি।
গোপীসঙ্গে নাচে নানা রঙ্গরস ভরি॥

লঘু ত্রিপদী ছন্দ

গোপী মাঝে মাঝে (চ), শ্রীকৃষ্ণ বিরাজে,
সে শোভা কহা নাহি (ছ) যায়।
হেমেতে জড়িত, মহা মরকত,
যথা শোভে মণিচয়॥

পাঠান্তর—(ক) মূর্ত্ত্যে—মূর্ত্তি।
(খ) সর্ব্ব-গোপী-মধ্যে—সর্ব্ব-গোপী-পার্শ্বে।
(গ) বিহরে—বিহার।
(ঘ) সুতাল—সুতান।
(ঙ) হিয়া—হইয়া।
(চ) মাঝে মাঝে—বামে মাঝে।
(ছ) কহা নাহি—কহনে না।

১। আলাত-চক্র—ঘূর্ণায়মান জ্বলন্ত অঙ্গার বা কুমারের চাক।

নাগরী সমূহ, নাগরের সহ,
বাহু দিয়া বাহুমূলে।
নাচে নানা রঙ্গে, রসের তরঙ্গে,
মুরুজ মৃদঙ্গ তালে॥
নূপুর কিঙ্কিণী, বলয়ার ধ্বনি,
সুমধুর কোলাহলে।
বীণা বেণু গান, শ্রুতি-রসায়ন,
তুমুল রাসমণ্ডলে॥
স্বর্ণ-পদমিনী, নাগরী রঙ্গিণী,
স্বাভিযোগ-রঙ্গ-রসে।
ভুরুভঙ্গি করি, নাচয়ে সুন্দরী,
বদনে মুচকি হাসে॥
ছলছুতা করি, রসিক নাগরী (ক),
দেখায় উরজ পাশ।
রসিক নাগরে, লুবধ ভ্রমরে,
করয়ে আপন বশ॥
হরি সুখ দিতে, মন্দ মন্দ বাতে,
উড়য়ে (খ) উরজ-বাস।
সে সব হেরিয়া, নাগরের হিয়া,
উঠয়ে মদন-ত্রাস॥
চুম্ব-আলিঙ্গন, বদনে বদন,
অর্পিয়া পুলক হিয়া।
চিবুক ধরিয়া, নাগর রসিয়া,
চর্ব্বিত তাম্বুল দিয়া॥
নাচিতে নাগরী- গণের কবরী,
আলুয়াইয়া পড়িতেছে।
যতন করিয়া, মুঠেতে (গ) ধরিয়া,
সাপটিয়া বান্ধি দিছে॥
হাস পরিহাস, রসের উল্লাস,
আনন্দে মগন হিয়া।
মধ্যে রাধা-শ্যাম, অতি অনুপাম,
নাচয়ে কর ধরিয়া॥

পাঠান্তর—(ক) রসিক নাগরী—বরজ নাগরী।
(খ) উড়য়ে—উতরে।
(গ) মুঠেতে—মুষ্টিতে।

গৌরাঙ্গী সুন্দরী, সোনার গাগরি (ক),
রসময়ী ইন্দুমুখী।
পরম রসিলা, হাব-ভাব লীলা,
করি শ্যামে করে সুখী॥
যত দেবগণ, পুষ্প বরিষণ,
আকাশ হইতে করে।
দেবীগণ যত, হেরিয়া (খ) মূর্চ্ছিত,
দগধ মদন শরে॥
স্বয়ং লক্ষ্মী আসি, সে লীলা (গ) প্রশংসি,
মদনমোহন সনে।
বিহার করিতে, উৎকণ্ঠিত চিতে,
প্রার্থয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্থানে (ঘ)॥
ব্রজে স্বমাধুর্য্য (ঙ), কিঞ্চিত ঐশ্বর্য্য,
নাহি ব্রজবাসিগণে।
যাথে গোপীগণ, হরে কৃষ্ণমন,
নাহিক ঐশ্বর্য্য-কণে॥
ব্রজের অনুগা, ভাব যে সুভগ।
বিনা ব্রজে অধিকার।
কখন না হয়, ব্রজ নাহি পায়,
সে রস না মিলে তার॥
অতএব হরি, বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরী,
লক্ষ্মীরে উপেক্ষা কৈল।
অভিমানে দেবী, মনে দুঃখ ভাবি,
তাহে (চ) তপ আরম্ভিল॥
অদ্যাপি শ্রীবনে, অতি সুনির্জ্জনে,
তপ করে লক্ষ্মীদেবী।
নয়ান যুগলে, ভাসে প্রেমজলে,
শ্রীকৃষ্ণের রূপ ভাবি॥

পাঠান্তর—(ক) গাগরি—নাগরী।
(খ) হেরিয়া—হইয়া।
(গ) সে লীলা—সোবিলা।
(ঘ) শ্রীকৃষ্ণ স্থানে—কৃষ্ণের স্থানে।
(ঙ) স্বমাধুর্য্য—সুমাধুর্য্য।
(চ) তাহে—তবে।

ইহাতে বুঝহ, গোপিকার সহ,
কতেক পিরীতি (ক) হরি।
বিহার করয়, সুখ আস্বাদয়,
প্রেমময় রসে ভরি॥
অতি অনুপাম, বৃন্দাবন ধাম,
ত্রিজগতে এক সার।
তার মধ্যে অতি, পুলিন খেয়াতি,
যথায় রাসবিহার (খ)॥
পরম মহিমা, নাহি হয় সীমা,
শ্রীকৃষ্ণ-সুখদ স্থান।
কল্পাবধি রাস, করিলা বিলাস,
জানিলা নিশি-সমান॥
লালদাস চিতে, শরণ লইতে,
চাহে শ্রীপুলিন-রজে।
দুরন্ত কষায়, লৈতে নাহি দেয়,
দৃঢ় দেহাসক্তি কাযে॥

নিকটে শ্রীনিধুবন পরম নির্জ্জন।
তাহার মহিমাগুণ (গ) শ্রবণ-রঞ্জন॥
কল্পলতা-মণ্ডপ শোভিত চারি পাশে।
মধ্যে রত্নগৃহ কোটি সূর্য্যের প্রকাশে॥
দুয়ার-অষ্টক তাহে তোরণ সুন্দর।
মণিতে নির্ম্মিত শোভে মুকুতা-ঝালর॥
জরির বিছানা মনোহর সুদর্শন।
স্বর্ণের লতিকা ফুল পরম মোহন॥
কমল বালিশ মণি-স্বর্ণেতে জড়িত।
ঝাম্পা লটকিছে তাহে হেরি হরে চিত॥
গৃহমধ্যে (ঘ) শোভয়ে পরম চমৎকার।
রাধাকৃষ্ণ সখী সঙ্গে করয়ে বিহার॥
রাধিকার বেশ বনাইলা কৃষ্ণচন্দ্র।
তাহা হেরি সখীগণ পাইয়া আনন্দ॥
চিরুণী লইয়া করে কেশ আঁচড়িল।
লোটন বান্ধিয়া মল্লিকার মালা দিল॥

কস্তুরীর পত্রবল্লী হৃদয়ে লিখিল।
মণি-মুক্তাহার হীরা কণ্ঠে পরাইল॥
নয়ানে কজ্জল নাসে তিলক সুন্দর।
চিবুকে কস্তুরীবিন্দু দিল মনোহর॥
সিঁথায় সিন্দুর নাসে মতি পরাইয়া।
পুনঃপুন হেরে মুখ মোহিত হইয়া॥
করেতে কঙ্কণ-আদি চরণে নূপুর।
পরাইয়া অঙ্গে লেপে চন্দন কর্পূর (ক)॥
আপনি সাজায় পুন আপনি হেরয়।
চন্দ্রসুধা পানে যেন চকোর মাতয়॥
সখীগণ বদনে বসন দিয়া হাসে।
সুধামুখী সুলজ্জিত মুখ ঝাঁপে বাসে॥
ঈষত হাসিয়া সখীগণ-পানে চাহে।
সে শোভা দেখিয়া কৃষ্ণ অনিমিখে রহে॥
দুজনার ভঙ্গি হেরি দুজনে মোহিত।
সখীগণ তাহা হেরি হৈল চমকিত॥
সখী সব আনন্দ উল্লাস রসে ভরি।
উঠায় কৌতুক এক সুরঙ্গ মাধুরী॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহ বিবাহ-যোটন।
হাসি হাসি করে সভে পরম মোহন॥
মস্তকে টোপর কৃষ্ণে বর সাজাইয়ে।
দাঁড় করাইলা আনি ছাওনিতলায়ে॥ (খ)
গাঁঠি-ছড়া বান্ধি দেয় দোঁহার বসনে।
হুলু হুলু ধ্বনি করে কোন গোপীগণে॥
মাল্য বদল করি দোঁহা গলে দেয়।
হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে কেহ কার গায়॥
অন্তরে কিশোরীজীর পরম আনন্দ।
বাহ্যে রোষ করি সখীগণে কহে মন্দ॥
হাঁরে ছার পামরি পর-পুরুষচারিণি।
কলঙ্কিনি নির্লজ্জা কুলের খাঁকারিণি॥
তোরা গিয়া বিভা পর-পুরুষেতে কর।
মুঞি কুলবতী হও যাই নিজ ঘর॥

পাঠান্তর—(ক) পিরীতি—পিরিতে।
(খ) রাসবিহার—রসবিহার।
(গ) মহিমাগুণ—মহিমা শুন।
(ঘ) গৃহমধ্যে—দুঁহু মধ্যে।

পাঠান্তর—(ক) কর্পূর—অগুরু।
(খ) ছাওনিতলায় দোঁহে দাঁড় করাইয়া।

বসনের গাঁঠি মোর খসাইয়া দে (ক)।
ধর্ম্ম বাঁচাইয়া মুঞি গৃহে যাই যে (খ)॥
বনে আনি নিজ মনস্কাম পূরাইলি।
কুলের রমণী মোর কুলে দিলি কালি॥
আর তো তোদের সঙ্গে কোথাও না যাব।
তোমা সভার রীত ঘরে যাইয়া কহিব॥ (গ)
এতো শুনি সখীগণ কহয়ে মুচকি।
তুমি কুলবতী সতী বটে বটে সখি॥
কালিয়ার অঙ্গ-সঙ্গে পতিব্রতা হৈলে।
এখনি করিয়া ব্রত কুঞ্জে হৈতে আইলে॥
লজ্জিত হইয়া প্যারী বদন ফিরায়ে।
কৃষ্ণ পরানন্দিত সেই ভঙ্গি দেখিয়ে॥
বর সাজি সখীমাঝে দাঁড়াঞা আপনে।
কৌতুকী হইয়া চাহে বঙ্কিম নয়নে॥
প্রণয় কোন্দল শুনি সখীগণ সহ।
প্রেমানন্দে অশ্রু কম্প পুলকিত দেহ॥
রাধাকৃষ্ণ বিবাহ মঙ্গল গান করি।
সখীগণ নাচয়ে চৌদিগে ফিরি ফিরি॥
ক্রোধ ভঙ্গি করি ঘরে চলি যায় প্যারী।
ফিরাইয়া আনে কেহ গিয়া আগুসারি॥
ললিতা ভর্ৎসয়ে ভঙ্গি করি সখীগণে।
মুচকি হাসিয়া কহে মটকি নয়ানে (ঘ)॥
মোর প্রিয়সখীর সহিত করি বাদ।
শ্রীনন্দ-নন্দন সাথে (ঙ) দেহ পরিবাদ॥
এতো কহি গাঢ় আলিঙ্গন সখীগণে।
করি প্রেমানন্দে দোঁহে হৈলা অচেতনে॥
কুঞ্জগৃহে কৃষ্ণসনে প্যারীরে লইয়া।
আনন্দিত হৈলা সঙ্গে বামে বসাইয়া॥
পরম আনন্দ নিধুবনেতে হইল।
বিবাহ-কৌতুক এক বড় রস হৈল (চ)॥

পাঠান্তর—(ক) খসাইয়া দে—খসাইয়া দেহ।
(খ) গৃহে যাই যে—যাই নিজ গৃহ।
(গ) তোমা সভাকার রীতি ঘরেতে কহিব।
(ঘ) মটকি নয়ানে—কৌতুক নয়নে।
(ঙ) সাথে—সহ।
(চ) এক বড় রস হৈল—এক রস প্রকাশিল।

সেই নিধুবন মোরে কৃপাদৃষ্টি কর।
স্বরূপ প্রকাশি মোর হৃদয়ে বিহর॥
বৃন্দাবনে গহ্বর-বন (ক) রাধা-রাগ।
পরম শোভিত হেরি জন্মে অনুরাগ॥
পরে দাবানল-কুণ্ড দাব-অগ্নি পান (খ)।
করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজগণে কৈল ত্রাণ॥ (গ)
উত্তরে বরাহদেব গরুড় সহিত।
পরে (ঘ) শ্রীসৌভরি মুনির আশ্রম শোভিত॥
কালিহ্রদ হয়ে তো পরম মহাতীর্থ।
পূর্ব্বতীরে কদম্বের বৃক্ষ স্থিত নিত্য॥
যে কদম্ব বৃক্ষ হৈতে কৃষ্ণ ঝাঁপ দিয়া।
নৃত্য কৈল কালিনাগের মাথায় (ঙ) চাঢ়িয়া॥
রাত্রে যেই বনমধ্যে নন্দরাজ আদি।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল কৈল কূপ খুদি॥
নন্দকূপ নাম তার অদ্যাপি বিরাজে।
সর্প হৈতে কৃষ্ণ ছাড়াইলা নন্দরাজে॥
প্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীগৌরাঙ্গ (চ) গুণ।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের বর্ণন॥
আর শ্রীল বৃন্দাবনশতক যে নামে।
করিলেন যেঁহ যাথে সাধু মনরমে॥
সেই সরস্বতী গোস্বামীর যে সমাধ।
তথা কালিদমন লীলা করেন আস্বাদ॥
কালিয়দমনমূর্ত্তি তথাই প্রকাশ।
শ্রীঅঙ্গে বেষ্টিত হয় কালিনাগ পাশ॥
হেরিয়া বন্ধন সেই বিদরয়ে হিয়া।
নাগপত্নী স্তুতি করে চৌদিগ বেঢ়িয়া॥
দ্বাদশ আদিত্যটিলা তাহার নিকটে।
দ্বাদশ আদিত্য আইলা যমুনার তটে॥
হ্রদে হৈতে কৃষ্ণ যবে উঠিলা টিলাতে (ছ)।
অতিশয় শীতে অঙ্গ লাগিল কাঁপিতে॥

পাঠান্তর—(ক) গহ্বর-বন—গম্ভীর বন।
(খ) দাব-অগ্নি পান—দাবাগ্নি কাননে।
(গ) পান করি শ্রীকৃষ্ণ রাখিলা নিজগণে।
(ঘ) পরে—পূর্ব্বে।
(ঙ) মাথায়—মস্তকে।
(চ) শ্রীগৌরাঙ্গ—গৌরচন্দ্র।
(ছ) টিলাতে—ডাঙ্গাতে।

দ্বাদশ সূর্য্য (ক) কৃষ্ণ-সেবার কারণ।
আসি তাপ দিয়া কৈল শীত নিবারণ॥
দ্বাদশ-আদিত্য-টিলা তাহাতে খেয়াতি।
দ্বাদশ-আদিত্য-ঘাট যমুনার তথি॥
আদিত্যের তাপে পুন ঘর্ম্ম যে হইল।
স্রোতে বহি ঘর্ম্ম গিয়া (খ) যমুনায় মিলিল॥
প্রস্কন্দন নামে মহাতীর্থ হৈল সেই।
জবাটবী তাহার কিঞ্চিত দূরে যাই॥ (গ)
শ্রীমতীর সূর্য্যপূজা-জবা-পুষ্পোদ্যান।
কৃষ্ণ সহ তথা হয় নবীন মিলন॥
দ্বাদশ-আদিত্য-টিলা-উপরি গোস্বামী।
শ্রীল-সনাতন স্থান যেই লোকস্বামী॥
মহাপ্রভু তথা জগদানন্দেরে পাঠাইলা।
প্রভুর কারণ স্থান তথায় (ঘ) করিলা॥
তথা শ্রীমন্ মদনমোহন প্রকটিলা।
শ্রীমন্ সনাতনে মহাকৃপা প্রকাশিলা॥
গোসাঞির সমাঝ (ঙ) হয় নিকটে তাহার।
কৃষ্ণপ্রেম-স্ফূর্ত্তি হয় দর্শনে যাঁহার॥
টিলার পূর্ব্বেতে যে অদ্বৈতবট নাম।
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যথা করিলা বিশ্রাম॥
তথায় অদ্বৈত-প্রভুর মূর্ত্তির প্রকাশ।
ভাগবতগণ যথা অনেকের বাস॥ (চ)
যুগল ঘাট নাম তার পূর্ব্বদিগে হয়।
যুগলকিশোর শ্রীমন্দিরে বিরাজয়॥
পরেতে বিহার ঘাট বনভূমি (ছ) আসি।
গোপী সহ বিহরিল বৃন্দাবনশশী॥
পূর্ব্বেতে ধূসরঘাট তপস্বীর বেশে।
সখাসঙ্গে ক্রীড়া কৈল কৌতুক আবেশে॥

পাঠান্তর—(ক) দ্বাদশ সূর্য্য—দ্বাদশ আদিত্য।
(খ) স্রোতে বহি ঘর্ম্ম গিয়া—স্রোতবৎ সেই ঘর্ম্ম
(গ) পুরন্দর নামে সেই মহাতীর্থ হৈল।
পরম নির্ম্মল তীর্থ তাহে নির্বামল॥
(ঘ) তথায়—তথাই।
(ঙ) সমাঝ—সমাধ।
(চ) অনেক করেন ভাগবতগণ বাস।
(ছ) বনভূমি—বন ভ্রমি।

তীরে আমলির বৃক্ষ পুরাতন হয়।
তলে বসি রাধানাম শ্রীকৃষ্ণ জপয়॥
দূরেতে ভ্রমরঘাট তীরে পুষ্পোদ্যান।
ভ্রমর ঝঙ্কারে বহু কদম্বের বন॥
বনবিহারের সমে[১] রাধাঙ্গ-সৌরভে।
অলিগণ পুষ্পজ্ঞানে পড়ে মধুলোভে॥
পাণিতল দিয়া ধনি নিবারিতে চাহে।
কমল বলিয়া পুন বৈসে গিয়া তাহে॥
ভয়ে ভীত অলিগণে নিবারিতে নারি।
কৃষ্ণের বসনাঞ্চলে লুকাইল গৌরী॥
তাহে আনন্দিত হৈল কৃষ্ণচন্দ্র হিয়া (ক)।
চুম্বন করিল কত চিবুক ধরিয়া॥
ভ্রমরঘাটেতে প্যারী সঙ্গে কত রঙ্গে।
রসের লতিকা সব সখীগণ সঙ্গে॥
পরে কেশিঘাট তথা কেশিদৈত্য মারি।
অঙ্গমার্জ্জনাদি কৈল যে ঘাটে উতারি॥
ধীর-সমীরণ তস্য পরে সুশোভন।
শীতল সুস্নিগ্ধ বহে মলয়া পবন॥
রাধাকৃষ্ণ বিহারের অতি প্রিয়স্থান।
মণিকর্ণিকার ঘাট কদম্বের বন॥
শ্রীমন্ গৌরীদাস যেঁহো পণ্ডিত গোসাঞি।
যাঁর বশীভূত শ্রীমন্ গৌরাঙ্গ নিতাই॥
তাঁহার সমাঝ (খ) আর শ্যামরায়জীর।
বিরাজয়ে সেই শুভ শ্রীধীরসমীর॥
তথা আন্ধারিয়া বট লুকলুকানি (গ) খেলা।
ছলে রাধা কৃষ্ণ সনে বিহার করিলা॥
শ্রীমন্ আচার্য্য প্রভু চৈতন্যে অভেদ।
যাহার আশ্রয়ে ভবগ্রন্থি হয় ছেদ॥
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ অবশ্য মিলয়।
বৃন্দাবনে গোবিন্দের পূর্ব্ব আজ্ঞা হয়॥

পাঠান্তর—(ক) কৃষ্ণচন্দ্র হিয়া—শ্রীকৃষ্ণের হিয়া।
(খ) সমাঝ—সমাধ।
(গ) লুকলুকানি—লুকালুকি।
১। সমে—সময়ে।

যে'হ লক্ষ গ্রন্থ লৈয়া গৌড়দেশে গেলা।
স্বমাধ্র্য্য (ক) প্রেমভক্তি লোকে প্রচারিলা॥
তাঁহার সমাঝ তথা স্ন্দর বিরাজে।
আর ছয় চক্রবর্ত্তী সেই প্রীমাঝে॥
শ্রীরাধামাধব জীউ কৈশোর ম্রতি (খ)।
জয়দেব ঠাকুরের পরম পিরীতি॥
আসিতে চাহিলা তে'হ ব্রজে নিজধাম (গ)।
ছোট হৈলা সেবকের প্রাইতে (ঘ) কাম॥
জয়দেব ঝ্লির ভিতর করি নিঞা।
ব্ন্দাবনে আসি ধীরসমীরে স্থাপিয়া॥
জয়প্রের রাজা নিঞা গেলা নিজস্থলে।
সেবা কৈলা পরে তাঁর সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈলে॥
তাঁহার মন্দির ধীরসমীরে আছয়।
প্রতিবিম্ব ম্র্ত্তি সে মন্দিরে বিরাজয়॥
অগ্রে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর।
সমাঝ (ঙ) তথায় রহে সাধ্গণ ধীর॥
পরে শ্রীল বংশীবট পরম মহিমা।
যাঁর গ্ণকীর্ত্তনে নাহিক হয় সীমা॥
মণিকর্ণিকার ঘাট তাহার নিকটে।
ম্নিকন্যাগণ স্নান করি বৈসে তটে॥
উপরে গোবিন্দবট কৃষ্ণ সখাসঙ্গে।
ক্রীড়া-রস-কৌতুক করয়ে নানা রঙ্গে॥
ঈশানে শ্রীমহাদেব গোপেশ্বর নাম।
যাঁহার দর্শন মাত্রে প্রে সর্ব্ব কাম॥
কৃষ্ণ সনে সখাভাবে ন্ত্য যে'হো কৈলা।
গোস্বামীরে কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে কহিলা॥
পরেতে প্লিনে হয় মহারাসস্থলী।
শত্ শত সাধ্ সন্ত রহে কুত্হলী॥
তথায় গমন মাত্র জন্ময়ে (চ) বিরতি।
তৎক্ষণাৎ পায় সেই কৃষ্ণভক্তি শক্তি॥

দিবানিশি স্থানে স্থানে হরি সঙ্কীর্ত্তন।
হইতেছে শ্রীমদ্ভাগবতের পঠন॥
চৌদিকে বেঢ়িয়া কৃষ্ণসেবা দেবালয়।
নানা মহোৎসব-যাত্রা নিতি নিতি হয়॥
জ্ঞানগ্দড়ি নাম করি কেহ কহে।
নিকটে গভ্বর (ক) বন মন হরে তাহে॥
দ্বাপর য্গের ব্ক্ষ নোতুনের ন্যায়।
বনশোভা চমৎকার নানা পক্ষ তায়॥
দরশন মাত্র হয় কৃষ্ণ উদ্দীপন।
সাধ্কৃপা বিনে তাহা নহে দরশন॥
পরে রাধাবাগ প্র্ব্বে পাণিঘাট (খ) দ্রে।
কত দেবালয় তথা গ্রামের ভিতরে॥
অনন্ত অপার সব কহা নাহি যায়।
কিঞ্চিত কহিব যাহা স্ফ্রয়ে জিহ্বায় (গ)॥
গদাধর চৈতন্য স্ন্দর দরশন।
অতি চমৎকাররূ্প পাষণ্ডদলন॥
শ্রীন্সিংহদেব আর শ্রীনয়নানন্দ।
জানকী-রমণ রাধা-গোকুল-আনন্দ॥
শ্রীরাধাবিনোদ দ্ই সেবা গোস্বামীর।
শ্রীল লোকনাথ যে'ই পরম স্ধীর॥
মহাপ্রভু কৃপা করি দাস গোস্বামীরে।
গোবর্দ্ধন শিলা দিলা সেবা করিবারে॥
সেই শিলা অদ্যাপি গোকুলানন্দে হয়।
বংশীবদন র্পে দেখা দিলা তায়॥
লোকনাথ গোস্বামীর সমাঝ (ঘ) তথায়।
যাঁর শিষ্য শ্রীমন্ ঠাকুর মহাশয়[১]॥
শ্রীরাধারমণ জীউ ভুবনমোহন।
অলৌকিক র্প চমৎকার দরশন॥
শ্রীমন্‌গোপাল ভট্ট গোস্বামীর গ্ণে। (ঙ)
শালগ্রাম হৈতে র্প প্রকাশে আপনে॥

পাঠান্তর—(ক) স্বমাধ্র্য্য—স্মাধ্র্য্য।
(খ) কৈশোর ম্রতি—কেশব ম্রতি।
(গ) ব্রজে নিজধাম—নিজ ব্রজধাম।
(ঘ) প্রাইতে—করাইতে।
(ঙ) সমাঝ—সমাধ।
(চ) জন্ময়ে—জনমে।

পাঠান্তর—(ক) গভ্বর—গভীর।
(খ) পাণিঘাট—পাণিবট।
(গ) জিহ্বায়—জিভায়।
(ঘ) সমাঝ—সমাধ।
(ঙ) শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর প্রেমগ্ণে।
১। ঠাকুর মহাশয়—নরোত্তম দাস।

শ্রীল গোপীনাথ জীউ বৃন্দাবনাধীশ।
শ্রীরাধা (ক) জাহ্নবাজীর জীবনের ঈশ॥
শ্রীমধু পণ্ডিত গোস্বামীর যে সমাধ।
তথাই দর্শনে (খ) ঘুচে মনের বিবাদ (গ)॥
জগদীশ পণ্ডিত গোস্বামিজীর কুঞ্জ।
প্রভুর পার্ষদ যেঁহো মহিমাতে পুঞ্জ॥
বিল্বমঙ্গলজীর আমলিতলা স্থান।
যথায় পাইল সাধু কৃষ্ণ দরশন॥
ব্রহ্মকুণ্ড যথা ব্রহ্মা তপস্যা করিলা।
চৌদিগ বেড়িয়া সাধুগণ বাস কৈলা॥
দক্ষিণে কিঞ্চিত দূরে গৌরাঙ্গ নিতাই।
কাঙ্গালের প্রভু করি কহয়ে সভাই॥
কুণ্ডের উত্তরে এক অশোকের বৃক্ষ।
বৈশাখ মাসের যে দ্বাদশী শুক্লপক্ষ॥
বহু পুষ্পগুচ্ছ তাহে হয় বিকসিত।
সাধুর প্রত্যক্ষ হয়, অন্যে অবিদিত॥
ব্রহ্মকুণ্ড হইতে শ্রীবৃন্দাজী উঠিলা।
এবে কাম্যবনে যেঁহো যাইয়া রহিলা॥
রাজা জয়সিংহ জয়পুরে লৈয়া যায়।
কাম্যবনে গিয়া তথা বিশ্রাম করয়॥
রাত্রে রহি প্রাতঃকালে গমন উদ্‌যোগে।
লইয়া যাইতে চাহে তুলি রথযোগে (ঘ)॥
উঠাইতে না পারিল দশজনে ধরি।
যাবার (ঙ) বাসনা নহে হইলেন ভারি॥
আশয় বুঝিয়া রাজা নিরস্ত হইল।
তথাই মন্দির আদি বানাইয়া দিল॥
সেই হৈতে বৃন্দাজীউ রহে কাম্যবনে।
গৌরাঙ্গী সুন্দরী চাঁদ ঝলকে বদনে॥
যোগপীঠ উত্তরে শ্রীগোপাল আছিলা।
ছোট বিপ্রে কৃপা করি সাক্ষী দিতে গেলা॥
ওড্রদেশে অদ্যাবধি বিরাজ করয়।
সাক্ষীগোপাল বলি খ্যাতি তাঁর হয়॥
যোগপীঠে তাঁহার যে মন্দির অদ্যাপি।
আছয়ে বৈষ্ণবগণ তাহে (ক) সেবা স্থাপি॥
দক্ষিণে শ্রীহনুমান গোবিন্দের দ্বারী।
তাঁহার মহিমা অতি চমৎকারকারী॥
একদিন অঙ্গে ঘর্ম্ম বাহিয়া চলিল।
তাহা দেখি ভয়ে লোক কম্পান্বিত হৈল॥
পরে বৃন্দাবনে কাল-যবন আইল।
কতল করিয়া লোক মারিতে লাগিল॥
দুর্বৃত্তদমন (খ) শ্রীল বীর হনুমান।
পরম দয়ালু সাধুস্বভাব মহান্॥
ব্রজবাসিজনে হিংসা করে দুরাচার।
দেখিয়া করিল এক শবদ (গ) চীৎকার॥
প্রচণ্ড চীৎকার সিংহনাদ শব্দ শুনি।
যবন কথোকগুলা মরিল ঐমনি॥
পলাইয়া কথোগুলা গেল দেশান্তর।
ব্রজবাসী সুস্থ হৈল গেল বিঘ্ন ডর॥
পূর্ব্বেতে সমাধি-কুঞ্জ সুন্দর প্রাচীর।
সমাঝ (ঘ) শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর॥
যার নামে মিলে কৃষ্ণ-ভকতি-রতন।
পরম দয়ালু যেঁহো পতিত পাবন॥
কাশীশ্বর গোস্বামিজী তাহার বামেতে।
প্রভুর সতীর্থ যেঁহো পিরীতি প্রভুতে॥
মুখ্য (ঙ) হরিদাস-গোসাঞি তাহার দক্ষিণে।
এবং যে সমাঝ (চ) বহু গোস্বামীর গণে॥
পূর্ব্বে বেণুকূপে সখীগণের সহিতে।
তৃষ্ণাতুর হইল কৃষ্ণ খেলিতে খেলিতে॥ (ছ)
বেণুর কৌশলধ্বনি করিলা তখন।
কূপ প্রকাশিয়া তথা কৈল জল পান॥

পাঠান্তর—(ক) শ্রীরাধা—শ্রীমতী।
(খ) তথাই দর্শনে—যাহা দরশনে।
(গ) বিবাদ—বিষাদ।
(ঘ) তুলি রথযোগে—রথের সংযোগে।
(ঙ) যাবার—যাইতে।

পাঠান্তর—(ক) তাহে—তথা।
(খ) দুর্বৃত্তদমন—দুর্দ্দণ্ড দমন।
(গ) শবদ—বিকট।
(ঘ) (চ) সমাঝ—সমাধ।
(ঙ) মুখ্য—মোক্ষ।
(ছ) খেলিতে খেলিতে—হাসিতে খেলিতে।

বেণুকূপ তার নাম রহয়ে প্রকটি।
তাহার দক্ষিণে স্থান নাম রঙ্গবাটী॥
সখা সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করি তথা গেলা।
নিকটে চরণকূপ চরণে খুদিলা॥
তথায় গুলালডাঙ্গা করি খ্যাত স্থান।
গুলাল খেলিলা তথা সহ (ক) গোপীগণ॥
তাহার কিঞ্চিত দূরে এক বৃক্ষ হয়।
কাটিবার হেতু কেহ চোট দিল তায়॥
অস্ত্রের আঘাতে রক্ত খেরিতে (খ) লাগিল॥
ভয়ে না কাটিল আর বিস্ময় হইল॥
রাত্রে স্বপ্নে কহে বৃক্ষ মুঞি বহু জন্মে।
আরাধনা করি বাস কৈনু ব্রজভূমে॥
হিংসা না করিহ মোরে করিনু মিনতি।
এমতি জানিবে ব্রজে যত বৃক্ষ জাতি॥
দক্ষিণে গোবিন্দকুণ্ড মহিমা অপার।
রাধাকৃষ্ণ বিহারের স্থান মনোহর॥
নারদ ঠাকুর তাহে বৃন্দাজীর আজ্ঞায়।
স্নান করি গোপীরূপ হইলা তথায়॥
গোপীর আবেশে নিজ পূর্ব্ব পাসরিলা।
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দেখিতে পাইলা॥
নিভৃত নিকুঞ্জ দূরে অতি রমণীয়।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই স্থান অতি প্রিয়॥
নিত্যানি বিহার তাহে অনুভব হয়।
প্রাতে পুষ্পশয্যা ছিন্ন ভিন্ন দেখা যায়॥
তার পূর্ব্বে ব্যাসঘেরা নির্জ্জন কানন।
তদুত্তরে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু-দরশন॥
নিকটে শ্রীপৌর্ণমাসী যোগমায়া হন।
কৃষ্ণলীলা অনুকূল অপূর্ব্ব দর্শন॥
তথায় চিড়িয়া-কুঞ্জ শ্রীনন্দনন্দন।
সাধ করি সখা সহ চিড়িয়া পালন॥
কুঞ্জবিহারিজীউ অপূর্ব্ব দর্শন।
পরে শ্রীগোবিন্দকুঞ্জ পরম মোহন॥

পাঠান্তর—(ক) সহ—লয়ে।
(খ) খেরিতে—ঝরিতে।

গোলকুঞ্জে রঘুনাথ ভট্ট যে গোসাঞি।
শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন সদাই॥
উত্তরে শৃঙ্গার-বট পূর্ব্বে যে কথিত।
পার্শ্বে শ্রীলোটনকুঞ্জ পরম মহত্ত্ব॥
শ্রীরাধিকা মান করি তথায় আসিয়া।
পড়িয়া রহিল ভূমে কেশ (ক) আলুয়াইয়া।
কৃষ্ণ আসি আদর করিয়া উঠাইয়া।
আপন হস্তেতে দিলা লোটন বান্ধিয়া॥
নিকটে শ্রীজীব গোস্বামীর প্রাণধন।
রাধা-দামোদর রূপ পরমমোহন॥
গোস্বামীরে কৃষ্ণচন্দ্র করুণা করিয়া।
নিজ পদচিহ্ন দিলা শিলাতে ধরিয়া॥
অদ্যাপি তাঁহার সেবা শ্রীমন্দিরে হয়।
ভাগ্যবান লোক সব যাইয়া দেখয়॥
শ্রীরূপ শ্রীজীব-গোসাঞি গুরু-শিষ্যে।
দুই পার্শ্বে দোঁহাকার সমাঝ (খ) প্রকাশে॥
রূপ-গোস্বামীর পাদধৌত স্থান হয়।
তার রজস্পর্শ অতি ভাগ্যেতে মিলয়॥
নিকটে আছেন চেক্‌লা (গ) শ্রীরাধামাধব।
বৃন্দাবনচন্দ্রজীর বড়ই প্রভাব॥
পরে আম্‌লিতলা যথা (ঘ) পতিতপাবন।
গৌরাঙ্গ বলিয়া যবে আইলা বৃন্দাবন॥
অদ্যাপি সে আম্‌লি বৃক্ষ আছে বর্ত্তমান।
মহাপ্রভু তার তলে পরম শোভন॥
ষড়্‌ভুজ মহাপ্রভু তথায় বিরাজে।
দূরে শ্যামসুন্দর কিশোরী (ঙ) সহ রাজে॥
নৈঋর্তে শ্রীমহাদেব বনখণ্ডি স্থান।
বৃন্দাবনে বাস করি আনন্দে মগন॥
দূরে গিয়া যোগপীঠ গোবিন্দ-আলয়।
মন্ত্রময়ী ধ্যান যথা সাধকে কয়॥

পাঠান্তর—(ক) কেশ—বেশ।
(খ) সমাঝ—সমাধ।
(গ) আছেন চেক্‌লা—শ্রীছেন চেকনা ও শ্রীছেন চেকনা।
(ঘ) পরে আম্‌লিতলা যথা—পরেতে আম্‌লিতলা।
(ঙ) কিশোরী—কিশোর।

চতুর-শিরোমণি-আদি বহু দেবালয়।
অসংখ্য গণন সব কহা নাহি যায়॥
নিভৃত নিকুঞ্জ বন পরমমোহন।
একদিন কৃষ্ণ তথা করি আগমন॥
প্যারী-আগমন-পথ করি নিরীক্ষণ।
বৃন্দার সহিত কহে কথোপকথন॥
কথায় কথায় নিদ্রা আকর্ষণ হৈল।
অলসে বালিসে হেলি তথা ঘুমাইল॥
হেনকালে সখী সঙ্গে প্যারীজী আইলা।
কৃষ্ণমুখচন্দ্র হেরি আনন্দিত হৈলা॥
নিঃশব্দ করিয়া কৃষ্ণপার্শ্বেতে বসিয়া।
সখী সহ মৃদু মৃদু মুচকি হাসিয়া॥ (ক)
কৃষ্ণের করেতে (খ) হৈতে মুরলী লইল।
হৃদয়ে রাখিয়া প্রেম-আনন্দে (গ) ভাসিল॥
পুন করে ধরি দেখে উলটি পালটি।
স্মরণ করিয়া তাঁর গান পরিপাটি॥
যে মধুর গানে কুলবতীর কুল নাশে।
আমা সভা রহিতে না দেয় মো সভারে গৃহবাসে॥ (ঘ)
লোকলজ্জা ছাড়াইয়া বনে আকর্ষয়।
তোমারি এ গুণ তুমি ভুবনবিজয়॥
এতেক ভাবিয়া কিছু কহয়ে সুন্দরী।
তুষ্ট হৈনু তোমার এ সব গুণ হেরি॥
অতেব তোমার কিছু আশীর্ব্বাদ করি।
যাহা হৈতে আমা সবার মঙ্গল বিচারি॥
যশবন্ত (ঙ) হও তুমি নিশ্ছিদ্র (চ) হইয়া।
আর মৃদুস্বর হও মুখর ঘুচিয়া॥
হৃদয় তোমার পুর হউক ঝটিতি।
অন্তরের কোর যাউ সুখে কর স্থিতি॥

পাঠান্তর (ক) নিঃশব্দ হইয়া কৃষ্ণপাশেতে বসিলা। মুচকিয়া সখী সনে হাসিতে লাগিলা॥
(খ) করেতে—শ্রীকর।
(গ) প্রেম-আনন্দে—প্রেম-সমুদ্রে।
(ঘ) আমা সভা রহিতে না দেয় গৃহবাসে।
(ঙ) যশবন্ত—যশোমন্ত।
(চ) নিশ্ছিদ্র—নিচ্ছিদ্র।

অচিরাত এ সব মঙ্গল যে হউক।
সর্ব্বচ্ছিদ্র নাশি বিধি প্রসন্ন হউক॥
তোমার হৃদয় পুর হৈল সভাকার।
মঙ্গল যে হয় (ক) থাকে ধর্ম্মের বিচার॥
তাহা শুনি বৃন্দাজীউ হাসিয়া কহয়।
বড় তো করিলে তুমি আশিস্ উহায়॥
হৃদি পুর ছিদ্র নাশ মৃদু স্বর হৈলে।
তবে কি উহার তুমি বংশীত্ব রাখিলে॥
জাগিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহা শুনি আনন্দিত।
প্যারী-মুখচন্দ্র হেরি পুলকিত-চিত॥
হাস পরিহাসে বড় কৌতুক হইল।
রাধাকৃষ্ণ মিলি প্রেম-সাগরে ভাসিল॥
নিভৃত নিকুঞ্জবনে সদাই বিহার।
অতএব তাহার যে মহিমা অপার॥
সংক্ষেপে কহিল বৃন্দাবন গুণ গান।
কিঞ্চিত মহিমা আর করিব বর্ণন॥
শাস্ত্রের শাসন কথোগুলি (খ) এবে লিখি।
বিজ্ঞতম জন ইহা বুঝিবে নিরখি॥
ভাষা অর্থ লিখিতে যে পুস্তকে বাঢ়য়।
যে হেতুক (গ) কেবল লিখিনু শ্লোকচয়॥

শ্লোকাঃ—

বৈকুণ্ঠং কোটিকোটি-প্রগুণিতমপি নো যদ্রজোলেশমাত্রং
প্রোম্মীলংসৌভগং তল্লবমপি লভতে শুদ্ধ-ভাবোজ্জ্বলায়াঃ।
কুর্ব্বীরন্ ভক্তিকোটীর্ভগবতি নু তথাপ্যদ্ভুত-প্রেমমূর্ত্তেঃ
শ্রীরাধারা অভক্তৈরতিদুরধিগমাং (ঘ) নৌমি বৃন্দাটবীং তাম্॥ ১

অনুবাদ।—বৈকুণ্ঠকে কোটি কোটি গুণে গুণিত করিলেও যাহার অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্যপ্রকাশক ধূলিকণার

পাঠান্তর—(ক) মঙ্গল যে হয়—সকল মঙ্গল যে হয়।
(খ) শাসন কথোগুলি—শাসন-কথাগুলি।
(গ) যে হেতুক—সেই হেতু।
(ঘ) অভক্তৈ...—অরক্তৈ...।

কণাও লাভ করিতে পারে না, যাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোটি কোটি অঙ্গযুক্ত ভক্তির অনুষ্ঠানকারী হইয়াও অদ্ভুত প্রেমমূর্ত্তি ও শুদ্ধভাবোজ্জ্বলা শ্রীরাধার প্রতি ভক্তিহীন ব্যক্তিদের পক্ষে অতি দুর্লভ, সেই বৃন্দাবনকে আমি প্রণাম করি।

রে রে সংসারমগ্নাঢ্য! শিক্ষামেকান্ততঃ (ক) শৃণু।
যদীচ্ছসি সুখং সান্দ্রং বাসং কুরু মধোঃ পুরে॥ ২

অনুবাদ।—হে সংসারনিমগ্ন ধনী, মন দিয়া আমার একটি উপদেশ শোন। যদি তুমি নিবিড় আনন্দের আকাঙ্ক্ষা কর তবে মধুপুরে বাস কর।

যদীচ্ছেঃ পারসংসারং বহিত্রং মাথুরং কুরু।
নৌকা সা প্রেরকঃ কৃষ্ণো ভোঃ শিবে। পারকারকঃ। ৩

অনুবাদ।—যদি সংসার পার হইতে ইচ্ছা কর তবে মথুরা পুরীকে নৌকা কর। হে শিবে, মথুরাপুরীই নৌকা আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উহার কর্ণধার।

অহো লোকো মহানন্ধো নেত্রযুক্তো ন পশ্যতি।
মাথুরে বিদ্যমানেঽপি সংসৃতিং ভজতে সদা॥ ৪

অনুবাদ।—অহো, লোক অত্যন্ত অন্ধ, চক্ষু থাকিতেও দেখে না। মথুরাপুরী থাকিতেও সে সর্ব্বদা সংসারকেই ভজনা করে।

মানুষীং যোনিমতুলাং লব্ধ্বা ভাগ্যস্য যোগতঃ।
বৃথৈবায়ুর্গতং তেষাং ন দৃষ্টা মথুরাপুরী॥ ৫

অনুবাদ।—ভাগ্যবশে অতুলনীয় মানুষজন্ম লাভ করিয়া যাহারা মথুরাপুরী না দেখিয়াছে, তাহাদের আয়ু বৃথাই কাটিল।

তীর্থে চৈব গৃহে বাপি চত্বরে পথি চৈব হি।
যত্র তত্র মৃতা দেবি! মুক্তিং যান্তি ন চান্যথা॥ ৬

অনুবাদ।—হে দেবি, মথুরার যে কোন তীর্থ বা গৃহ অঙ্গন বা পথ, এমন কি যে-কোন স্থানে প্রাণত্যাগ করিলেও জীব মুক্তিলাভ করে, ইহার অন্যথা হয় না।

বিনা সাংখ্যেন যোগেন বিনা স্বাত্মবিচিন্তনম্।
বিনা ব্রততপোদানৈঃ শ্রেয়ো বৈ প্রাণিনামিহ॥ ৭

অনুবাদ।—সাংখ্য যোগ ভিন্ন, আত্মার চিন্তা ভিন্ন এবং ব্রতদান ও তপস্যা ভিন্ন, মথুরায় প্রাণীদের অবশ্যই শ্রেয়োলাভ হয়।

মথুরায়াং নিবৎস্যামি যাস্যামি মথুরামহম্ (ক)।
ইতি যস্য ভবেদ্‌বুদ্ধিঃ সোঽপি বন্ধাদ্‌বিমুচ্যতে॥ ৮

অনুবাদ।—"আমি মথুরায় বাস করিব, মথুরায় যাইব"—এই বুদ্ধি যাহার হয় সেও সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

সর্পদষ্টাঃ পশুহতাঃ পাবকাম্বুবিনাশিতাঃ।
লব্ধাপমৃত্যবো যে চ মাথুরে হরিলোকগাঃ॥ ৯

অনুবাদ।—সর্পদষ্ট হইয়া, পশুদ্বারা নিহত হইয়া, আগুনে পুড়িয়া বা জলে ডুবিয়া মথুরায় যাহাদের অপমৃত্যু হয় তাহারা বিষ্ণুলোকে গমন করে।

ত্রৈলোক্যবর্ত্তি-তীর্থানাং সেবনাদ্ দুর্লভা হি যা।
পরানন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ॥ ১০

অনুবাদ।—ত্রিভুবনে যত তীর্থ আছে, সেই সব তীর্থের সেবা করিয়াও যাহা দুর্লভ, মথুরার স্পর্শমাত্র সেই পরম আনন্দময়ী প্রেমসিদ্ধি লাভ হয়।

শ্রুতা স্মৃতা কীর্ত্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা।
স্পৃষ্টাশ্রিতা সেবিতা চ মথুরাঽভীষ্টদা নৃণাম্॥ ১১

অনুবাদ।—মথুরার কথা শুনিলে, স্মরণ করিলে, কীর্ত্তন করিলে, মথুরাকে বাঞ্ছা করিলে, দর্শন করিলে, সেখানে গমন করিলে, তাহাকে স্পর্শ করিলে, আশ্রয় করিলে এবং সেবা করিলে, সেই মথুরা মানুষকে তাহার (সকল) অভীষ্ট প্রদান করেন।

অহো অভাগ্যং লোকস্য ন পীতং যমুনাজলম্।
গো-গোপ-গোপিকা-সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা॥

অনুবাদ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য

বৃন্দাবনে নিত্যলীলা শ্রীলভাগবতে (খ)।
শ্রীল-শুকদেব কহে গদগদ চিতে॥
এবং শ্রীল-কৃষ্ণ ব্রজ ছাড়ি অন্যন্তরে।
কভু একপাদ নাহি যান ধামান্তরে॥

পাঠান্তর—(ক) শিক্ষামেকান্ততঃ—শিক্ষা মেকান্তু মে অথবা শিক্ষামেকান্তিকীম্।

পাঠান্তর—(ক) মথুরামহম্—মথুরাপুরীম্।
(খ) শ্রীলভাগবতে—শ্রীমদ্ভাগবতে।

তবে যে মথুরা দ্বারাবতীতে গমন।
প্রকাশ রূপেতে নয় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ (ক)

শ্রীভাগবতে—

"জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচর-বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত-শ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥" ইতি

অনুবাদ।—যিনি জনগণের আশ্রয়স্বরূপ, যাঁহার জন্ম দেবকীর গর্ভে বলিয়া প্রসিদ্ধ, যদুবংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাঁহার পারিষদ, নিজ বাহুবলে (অথবা বাহুতুল্য শ্রীদাম সাত্যকি প্রভৃতি দ্বারা) অধর্ম্ম বিদূরিত করেন, যিনি স্থাবর জঙ্গমে পাপ নাশ করেন, যিনি সুমধুর হাস্যযুক্ত শ্রীমুখ দ্বারা ব্রজবধূ ও পুরবধূগণের কাম বর্দ্ধন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়লাভ করুন অর্থাৎ সর্ব্বোৎকর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক বিরাজ করুন।

তন্ত্রে চ—

"কৃষ্ণোহন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ (খ)।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি (গ)॥" ইতি

পাঠান্তর—(ক) প্রকাশ্য রূপেতে নতু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
(খ) যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ—যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যা-তৎপরঃ।
(গ) পাদমেকং ন গচ্ছতি—স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি।

অনুবাদ।—যদুবংশজাত শ্রীকৃষ্ণ পৃথক্, কিন্তু যিনি গোপরাজ নন্দের নন্দন তিনি বৃন্দাবন ছাড়িয়া একপদও গমন করেন না।

মনুষ্য জনমে স্বার্থ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন।
অন্য-আশ্রয়-আদি (ক) সব অকারণ॥
যশ শ্রী বর্ণাশ্রমাচার আদি যত।
পরিশ্রম-মাত্র সর্ব্বধর্ম্ম-তপ-ব্রত॥
হরিগুণ-শ্রবণাদি-বিস্মৃত যে জন।
আশ্রয় নাহিক যার শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥

স্কান্দে—

যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমং পরে
বর্ণাশ্রমাচার তপঃশ্রুতাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়ো—
র্গুণানুবাদ শ্রবণাদরাদিভিঃ॥

অনুবাদ।—বর্ণাশ্রমের বিবিধ আচার, তপস্যা ও শাস্ত্র-পাঠ ইত্যাদির বিষয়ে যে কঠোর পরিশ্রম তাহা কেবল যশ ও সম্পদ্ লাভের জন্য। কিন্তু শ্রীভগবানের গুণশ্রবণ ও গুণকীর্ত্তনে যে অনুরাগ তাহা দ্বারা লভ হয় শ্রীধরের পাদপদ্ম যুগলের অবিস্মৃতি (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিরকাল অন্তরে বিরাজ করে)॥

পাঠান্তর (ক) অন্য-আশ্রয়-আদি—অন্য শাস্ত্র জপ আদি।

ইতি শ্রীভক্তমালে বৃন্দাবন-মহিমা-বর্ণনংনাম ষড়্‌বিংশ-মালা॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

এবে গ্রন্থ-অনুযায়ী বৈষ্ণবের নাম।
কীর্ত্তন করিব সর্ব্বমঙ্গলের ধাম॥
যাহার শ্রবণে সর্ব্বগ্রন্থের (ক) শ্রবণ (খ)।
ফল মিলে শুভ কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ॥
প্রথম মালায় হয় গুর্ব্বাদি বন্দন।
মঙ্গলাচরণ গ্রন্থ-মহিমা বর্ণন॥
নাভাজীর প্রথম অবস্থা যে কাহিনী।
গুরুকৃপা হৈতে হৈলা কৃষ্ণভক্তি খনি॥
দ্বিতীয় মালায় মহাপ্রভুর চরণ।
স্মরণ করিয়া কৈল ভক্তগুণ-গান॥
শ্রীদাস গোস্বামী শ্রীল-রূপ সনাতন।
ভট্ট গোস্বামীর মধু-পণ্ডিতের গুণ॥
যথাক্রম আছে শ্রীল-নাভাজী-বর্ণন।
তেমতি বর্ণিনু নাহি জানি দোষগুণ॥
তৃতীয়ে শ্রীল গৌরচন্দ্রের পার্ষদ।
স্বরূপ বর্ণন যাথে নাহিক বিবাদ॥
চতুর্থ মালায় দ্বাদশ (গ) ভাগবত।
অজামিল আর শ্রীল-বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ॥
জয়-বিজয়-আদি কমলা গরুড়।
ষোল মহাভাগবত প্রিয় নিজপুর॥
হনুমান বিভিষণ সুভগা শবরী।
জটায়ু শ্রীঅম্বরীষ তাঁর লক্ষ নারী॥
সুদামা ব্রাহ্মণ আর চন্দ্রহাস রাজা।
প্রধান ভকতগণ ভক্ত্যে মহাতেজা॥

পাঠান্তর—(ক) গ্রন্থের—শাস্ত্রের।
(খ) শ্রবণ—স্মরণ।
(গ) দ্বাদশ—যে দ্বাদশ।

পঞ্চম মালায় শ্রীল-কুন্তীজী দ্রৌপদী।
শ্রুতদেব মহাপাত্র সত্যব্রত আদি॥
রাজা শ্রীপ্রাচীনবর্হি বালমীকি-দ্বয়।
রুক্মাঙ্গদ রাজা হরিশ্চন্দ্র মহাশয়॥
বিন্ধ্যাবলী ময়ূরধ্বজ অলর্ক রাজন।
রন্তিদেব রাজা যেঁহো রহে অনশন॥
ষষ্ঠ মালাতে পুরু ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি।
গুহরাজ চর্চ্চা মধ্যে বৈষ্ণব-ভকতি॥
নিমি নব যোগেন্দ্রের গুণের বর্ণন।
পরীক্ষিত-আদি নব-ভক্ত্যঙ্গ-যাজন॥
পুন মহারাজা পরীক্ষিতের কথন।
শুকদেব গোস্বামীর গুণের বর্ণন॥
সপ্তম মালায় শ্রীল-প্রহ্লাদ-চরিত্র।
অষ্টমে অক্রূর বলি যশ যে পবিত্র॥
অগস্ত্য পুলহ আদি মহর্ষি-চরণ।
আর শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রগুণগান॥
অষ্টাদশ স্মৃতি আর পুরাণ কথন।
রামচন্দ্র পারিষদগণ গুণগান॥ (ক)
নবমে শ্রীনন্দরাজ শ্রীযশোদা মাতা।
আর ব্রজ-পরিকর গোপ-গোপী যথা (খ)।
দশমেতে সপ্তদ্বীপে যত ভক্ত হয়।
নমস্কার কায়-মনে সভাকার পায়॥
বৈকুণ্ঠের অষ্ট ফণী শ্রীজয়-বিজয়।
চারি সম্প্রদায় গুরু (গ) চারি মহাশয়॥
'শ্রী' সম্প্রদায় তথা মাধ্বী সম্প্রদায়।
আদ্যোপান্ত যত গুরু প্রণালী বিস্তার॥
পুন রামানুজ স্বামীর চরিত্র-বর্ণন।
মন্ত্র প্রকাশিয়া কৈলা জীব-নিস্তারণ॥
শিষ্য প্রশিষ্য তাঁর দেবাচার্য্য-আদি।
আর নিম্বাচার্য্য যাঁর প্রতাপ অবধি॥

পাঠান্তর—(ক) শ্রীরামচন্দ্রের পার্ষদাদি গুণগান।
(খ) গোপ-গোপী যথা—গোপীগণ তথা।
(গ) গুরু—গুণ।

রামানুজ স্বামীর জামাতা লালাচার্য্য।
মৃত বৈষ্ণবের যেঁহো করিলা সৎকার্য্য॥
একাদশে গুরুভক্ত এক শিষ্য যাঁর।
কমল ফুটিল পাদতলে বারবার॥
শ্রীরঙ্গ-বণিক পুত্র মরিবে জানিঞা।
বাঁচাইল বৈষ্ণব-চরণোদক দিয়া॥
কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের স্ত্রীর উদরে।
জন্মে যে বালক তাহারেও পূজা করে॥
কিহ্নজী আপন পিতা সুমেরু সাধুরে।
বৈকুণ্ঠ যাইতে দেখি স্তুতি নতি করে॥
অগ্রদাস স্থানে রাজা মানসিংহ আইল।
নিজ প্রয়োজন ছাড়ি দৃকপাত না কৈল॥
শংকর-আচার্য্য শ্রুতি-অর্থ আচ্ছাদিলা।
লোক বিড়ম্বিয়া পাছে কৃষ্ণভক্ত হৈলা॥
নামদেব ছাঁপি (ক) অতি মহান্ আশয়।
যাঁহার অনেক লীলা লোকাতীত হয়॥
দ্বাদশ মালায় শ্রীল-জয়দেব ঠাকুর।
শ্রীঅর্জ্জুন-মিশ্র আর স্বামী (খ) শ্রীধর॥
শ্রীবিল্বমঙ্গল এই চারি মহাশয়।
চারি সমতুল গুণ জগতে ঘোষয়॥
ত্রয়োদশে বর্ণন শ্রীভাবুক ব্রাহ্মণ।
বাৎসল্যে শ্রীকৃষ্ণে কৈলা লালন-পালন॥
সুবুদ্ধি নামেতে বিপ্র কৃষ্ণে বশ কৈল।
প্রতিমা হইয়া অন্ন ভোজন করিল॥
এক রাজপুত্র কভু বাক্য না কহিল।
বোলাতোমুয়া বলি লোকে জ্ঞান দিল॥
হরিদাস-বৈরাগী যে ব্রাহ্মণগণেরে।
বৈষ্ণব করিল গ্রামশুদ্ধ (গ) সভাকরে॥
বিষ্ণুপুরী গোস্বামী শ্রীজগন্নাথ যাঁরে।
শ্লেষবাক্য (ঘ) কহিয়া আনিল নিজ পুরে॥
জ্ঞানদাস বণিক ভাগ্নেরে ভেখ দিয়া।
বেদপাঠ করাইল অজ্ঞে বুঝাইয়া॥

ত্রিলোক-বণিক-প্রেমে বশীভূত হৈয়া।
আপনি আইলা হরি বনি (ক) টহলিয়া॥
বল্লভ আচার্য্য যাঁর দর্প চূর্ণ করি।
পশ্চাত করিলা কৃপা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
ভক্তদাস রাজা সীতা-হরণ শুনিঞা।
রাবণে মারিব বলি চলিল ধাইয়া॥
লীলা অনুকরণ শ্রীপুরুষোত্তমে কেহ।
করিতে নৃসিংহাবেশ ফাঁড়ে তার দেহ॥
রতিবন্ত বাঈ কৃষ্ণের বন্ধন শুনিঞা।
প্রাণ তেয়াগিল যাই অসহ্য হইয়া॥
পুরুষোত্তমবাসী রাজা অপরাধী মানি।
কাটিলেন কোন ছলে আপনার পাণি॥
কর্ম্মাবাঈ নাম (খ) যাঁর অপূর্ব্ব খিচুড়ি।
খাইলা শ্রীজগন্নাথ পরম আদরি॥
চতুর্দ্দশ মালায় শিলপিল্লার বর্ণন।
ভক্তে ভক্তিনিষ্ঠ এক রাজার কথন॥
অন্য এক ভক্তিনিষ্ঠ রাজার মহিলা।
বৈষ্ণবের অনুরাগে পুত্রে বিষ দিলা॥
মামা আর ভাগিনা মিলিয়া দুই জন।
রঙ্গনাথ ঠাকুরের মন্দির বানান॥
এক যে রাজার অঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি ছিল।
ছন্নরূপে (গ) হরি তার ব্যাধি ভাল কৈল॥
মীননাথ রাজ্যলোভে আসক্ত হইল।
গোরখনাথ শিষ্য তাঁরে উদ্ধার করিল॥
মহাজন সদাব্রতী ভাগবত ছিল।
পুত্রে মারি হরি তারে পরীক্ষা করিল॥
ভুবন-চৌহানে হরি কৃপাবান হৈলা।
তলোয়ার বিষয়েতে (ঘ) লজ্জা নিবারিলা॥
রূপ-চতুর্ভুজ-পূজারির অনুরোধে।
পাকা চুল শিরে ধরে রাজার বিবাদে॥
কমধ্বজ নামে সাধু বনেতে আছিল।
মৃত্যু হৈলে হনুমান যাঁর গতি কৈল॥

পাঠান্তর—(ক) ছাঁপি ছিল।
(খ) স্বামী স্বামিজী।
(গ) গ্রামশুদ্ধ—গ্রামসহ।
(ঘ) শ্লেষবাক্য—স্নেহবাক্য।

পাঠান্তর—(ক) বনি—হয়ে।
(খ) কর্ম্মাবাঈ নাম—করমেতি বাঈ।
(গ) ছন্নরূপে—ছদ্মরূপে।
(ঘ) বিষয়েতে—পরীক্ষিতে।

জয়মল রাজন দৃঢ় ভক্তি-নিয়মেতে।
কিঞ্চিত খর্ব্বতা নৈল আপদ-কালেতে॥
গোপ ভক্ত চুরি গেল মহিষ যাঁহার।
হরি পুন আনি দিলা গৃহেতে তাঁহার॥
নিষ্কিঞ্চন বিপ্র বৈষ্ণবের সেবা (ক) কৈলা।
দস্যুবৃত্তি করি তারে (খ) হরি দেখা দিলা॥
পঞ্চদেশে শ্রীল সাক্ষি-গোপাল-প্রসঙ্গ।
ছোট বিপ্র বড় বিপ্র দোঁহাকার রঙ্গ॥
গোপালের নাকে মুক্তা পরাইলা রাণী।
তাঁহার বাৎসল্য ভাব অপূর্ব্ব কাহিনী॥
রামদাস রণছোড় ঠাকুর লইয়া।
পলাইলা ঠাকুরের সম্মতি পাইয়া॥
নন্দদাস-গৃহে মৃত বাছুর ডারিল।
তুড়ি দিয়া সাধু তারে জিয়াইয়া দিল॥
অহ্রজীউ বৈষ্ণবেরে আম্র খাওয়াইল।
রাজ-বাগিচার আম্র আপনে পড়িল॥
বারমুখী বেশ্যা বৈষ্ণবের দরশনে।
বৈষ্ণব হইল লোঠাইয়া নিজ ধনে॥
ভক্তপ্রিয় রাজা ডোম-ভাঁড় যে বৈষ্ণবে।
পূজিলা অনেক অর্থে বড় ভক্তিভাবে॥
ভক্তরাণী স্বামীর গোপন কৃষ্ণভক্তি।
প্রচার করিয়া প্রকাশিলা নিজশক্তি॥
গুরুনিষ্ঠ গুরুদুষ্টো মরিয়া বাঁচিল।
কবীরজী ছলে রামনাম মন্ত্র নৈল॥
ষোড়শ মালায় রুইদাসের কথন।
গুরু (গ) রামানন্দ যাঁরে করিলা মোচন॥
পিপাজীউ শক্তি-উপাসনা করি দূরে।
স্ত্রী-সহ মহাভাগবত হৈলা পরে॥
সপ্তদশ মালায় গোবিন্দ কবিরাজ।
চান্দরায় দেবকীনন্দন ভক্তরাজ॥
এঁহারা ছাড়িয়া শক্তি-উপাসনাতত্ত্ব।
বৈষ্ণব হইয়া হৈল বড়ই মহত্ত্ব॥

অষ্টাদশে রবীন্দ্র-নারায়ণ মহারাজ।
বৈষ্ণব হইয়া কৈল অলৌকিক কায॥
ঊনবিংশতি মালায় শ্রীল-শ্রীরামচন্দ্র।
কবিরাজ আচার্য্য-প্রভুর সম্বন্ধ॥
জগন্নাথী মধোদাস জগন্নাথে সখ্য।
সুরদাস ভাগবত গানশক্তি মুখ্য॥
শ্রীকেশব ভট্ট জীউ (ক) বড় কার্য্য কৈল।
প্রতিকূল যবনের দমন করিল॥
হরিব্যাসজীউ দীক্ষা দেবীরে যে দিল।
বলিদান জীবহত্যা বারণ করিল॥
বিংশতি মালায় শ্রীল-ত্রিপুর দাসের।
বড়ই মহিমা যার জাড়াও বস্ত্রের॥
নাথজীর শীত নিবারণ যাথে হৈল।
কৃষ্ণদাস দিল্লী হৈতে জিলাপি খাওয়াইল॥
শ্রীবিঠ্ঠলদাস কৃষ্ণপ্রেমের বিভ্বোলে।
ছাত হৈতে লম্ফ দিয়া (খ) পড়ে ভূমিতলে॥
নারায়ণ-ভট্ট তীর্থরাজ বৃন্দাবনে।
দেখাইলা ত্রিবেণী প্রকট অজ্ঞ জনে॥
পুনশ্চ শ্রীরূপ-সনাতন গুণগান।
ফণীর আকার বেণী শ্রীমতী দেখান॥
ভট্ট-গোস্বামীর শিষ্য হরিবংশ নাম।
রাধাবল্লভীর আদি গুরু অভিরাম॥
হরিদাস স্বামী যেঁহো নিধুবনবাসী।
বঙ্কবেহারীর যাঁরে হৈল কৃপারাশি॥
হরিরাম ব্যাস যেঁহো বড় অধিকারী।
যাঁর যশ গায় অদ্যাপিহ (গ) ব্রজ ভরি॥
অলি ভগবান নিত্য রাস যে দেখিল।
সধনা যাহারে জগন্নাথ কৃপা কৈল॥
কাশীশ্বর গোস্বামিজী ভুবনপাবন।
খোজেজীউ জিনি আম্র করিলা ভোজন॥
একবিংশতি মালায় রাঁকা বাঁকা দোঁহে।
ভগবান দিল অর্থ ধূলে দিল তাহে॥

পাঠান্তর—(ক) বিপ্র বৈষ্ণবের সেবা—বিপ্র সেই বৈষ্ণব সেবা।
(খ) তারে—তাহে।
(গ) গুরু—ভক্ত।

পাঠান্তর—(ক) জীউ—তেঁহ।
(খ) ছাদ হৈতে লম্ফ দিয়া—নৃত্যকালে ছাত হৈতে।
(গ) অদ্যাপিহ—অদ্যাবধি।

লড়ুভক্ত-রক্ষাহেতু দেবী মহামায়া।
চোরগণে নষ্ট কৈল প্রতিমা ফাটিয়া॥
ত্রিলোক-সোণার রূপে শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
সোণার কলস নিঞা দিল রাজ-স্থানে॥
প্রতাপরুদ্রের গুণ অমৃতের সার।
প্রভুতে যে অনুরাগ নাহি পারাপার॥
শ্রীগোবিন্দদাস স্বামী নাথজী সহিত।
সখ্য যে পরম ভাব ব্রজের উচিত॥
কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী গুজরাদি দেশে (ক)।
ভক্তি প্রকাশিলা শ্রীচৈতন্য উপদেশে॥
মথুরামণ্ডলে রঘুনাথ গোপীনাথ।
রামদাস-আদি করি অনেক মহত॥
স্ত্রী-সাধুগণ সীতাঝালী আর গঙ্গা।
উমা ভাটিয়ানী আদি বহু প্রেমে রাঙ্গা (খ)॥
গণেশ-দেরানী যার উরুতেতে (গ) ছুরি।
মারিয়া বৈষ্ণব বেষে আসি কৈল চুরি॥
লাখাজীউ জগত পবিত্র যে করিলা।
জগন্নাথ যারে পূর্ণকৃপা প্রকাশিলা॥
দ্বাবিংশতি মালে নরসী-ভক্ত-উপাখ্যান।
শ্রীরাসমণ্ডল যেঁহো করিলা দর্শন॥
অঙ্গদ-ভকত হঠ করি রাজা-সনে।
হীরা পরাইলা জগন্নাথে প্রাণপণে॥
করুরির রাজা-মহাশয়ের বর্ণন।
ভাঁড়-বৈষ্ণবের যেঁহো পূজিলা চরণ॥
মীরাবাঈ শ্রীরূপ সহিত ভেট কৈল।
রণছোড়জী পৃথ্বীনাথ নৃপে কৃপা কৈল॥
মধুকর-সাহা গাধা-অঙ্গে দেখি ভেখ।
পূজা করিলেন তার করিয়া বিবেক॥
প্রকাশানন্দ সরস্বতী ভক্তিমার্গে আইলা।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থ যে বর্ণিলা॥
ত্রয়োবিংশে চোর কৃষ্ণমন্ত্রের প্রভাবে।
পরীক্ষায় জিতিল প্রশংসে পাছে সভে॥ (ঘ)

মুরারি চামার জাতি বৈষ্ণব জানিঞা।
রসিক-মুরারি-জীউ কৃতার্থ মানিঞা॥
তাহার চরণোদক করিলেন পান।
শ্রীতুলসীদাস যেঁহো প্রেতে কৈল ত্রাণ॥
করমানন্দ যার নামে প্রেমভক্তি হয়।
কালাভক্তে নাথজীর কৃপার উদয়॥
পরশুরাম বিপ্র সর্ব্বত্যাগ যে করিলা।
গদাধর-ভট্ট জীব গোস্বামীকে (ক) মিলিলা॥
চতুর্ব্বিংশতি মালে এক ব্যাঘ্র ভক্ত হৈল।
মাধবসিংহের রাণী উপদেশ দিল॥
বিদুর নামেতে ভক্ত বিনে বীজ জল।
ক্ষেতে জন্মাইলা শস্য মহিমা বিরল॥
চতুর সোয়ামী নাম সাধু মহামতি।
গুরুকে সর্ব্বস্ব দিয়া বৃন্দাবনে স্থিতি॥
পুন শ্রীকবীর-জীর মহিমা কথন।
পর-উপকার কৈল ব্যাধি-উপশম॥
কেবলকুবা যে সাধু কূপের ভিতর।
এক মাস থাকিয়া আইলা পুন ঘর॥
হরিদাস বণিক বৃন্দাবন-গমনেতে।
পথেই শ্রীবৃন্দাবন পাইলা দেখিতে॥
করমৈতি বাঈ বৃন্দাবন পাইলেন।
প্রেমনিধি আগে হরি দিয়া ধরিলেন॥
ভক্ত কেবলরাম বহু উদ্ধারিল।
নরবর-রাজার পাৎসা চরণ কাটিল (খ)॥
জগদেব পামারেরে কৃষ্ণভক্ত জানি।
রাজকন্যা একান্ত করিয়া কৈল স্বামী॥
পঞ্চবিংশতি মালে কৃষ্ণদাস নাম।
কৃষ্ণ-আগে নাচিতে নাচিতে অবিরাম॥
নূপুর খসিল জানি শ্রীকৃষ্ণ আপনি।
পরাইয়া দিলা নৃত্য রসভঙ্গ (গ) জানি॥
অন্য কৃষ্ণদাস ব্যাঘ্রে আতিথ্য করিলা।
নিজ পাদ কাটিয়া খাইতে তারে দিলা॥

পাঠান্তর—(ক) গুজরাদি দেশে—গুজরাট দেশেতে।
(খ) প্রেমে রাঙ্গা—প্রেমরঙ্গা।
(গ) উরুতেতে—উরুদেশে।
(ঘ) পরীক্ষায় উত্তরিল প্রশংসয়ে সভে।

পাঠান্তর—(ক) জীব গোস্বামীকে—রূপ গোস্বামীকে।
(খ) নরবরের চরণ পাতসা কাটিল॥
(গ) নৃত্য রসভঙ্গ—পদে রসভঙ্গ।

গদাধর ভক্ত কিছু না করে সঞ্চয়।
কৃষ্ণের লাগায় ভোগ যখন যা পায় (ক)॥
ভগবান ভক্তিনিষ্ঠ রাজার শাসনে।
বিরাম না কৈল মালা-তিলক-ধারণে॥
সর্ব্বস্ব গুরুকে দিয়া সুবার দেওয়ান।
বাহির হইল স্ত্রী-পুরুষ দুইজন॥
লালমতি বাঈ ভক্তি অধিকারী বড়।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবেতে একভাব দৃঢ়॥

পাঠান্তর—(ক) তখনি লাগায় ভোগ কৃষ্ণে যাহা পায়।

ষড়বিংশ মালায় শ্রীল-বৃন্দাবন ধাম।
সহিত শ্রীকৃষ্ণলীলা অমৃত সমান (ক)॥
মহিমা-বর্ণন শুভ সুখদ মধুর।
মধুরেতে (খ) সমাপন রসময় পুর॥
ঞিঁহা সভার শ্রীচরণে লইয়া শরণ।
লালদাস ভক্তি মাগে করিয়া কীর্ত্তন॥

পাঠান্তর—(ক) অমৃত সমান—অমৃত-উপাম।
(খ) মধুরেতে—মধুবেণ।

ইতি শ্রীভক্তমালে ভক্তগণনামকীর্ত্তনং নাম সপ্তবিংশ-মালা ॥ ২৭ ॥

উপসংহার

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

ত্রিপদীচ্ছন্দ

ভক্তমাল রত্নমালে, মনসূত্রে পরি গলে,
ভূষণ করহ নিজদেহে।
যে রত্নকিরণ ছবি, আগে কোটি শশী রবি,
শোভাগুণ কান্তি সম নহে॥
রবি বাহ্যে আলো করে, অন্তর শুধিতে নারে,
আনন্দজনক শশিগুণ।
প্রাকৃত (ক) আনন্দলেশ, দরশন মাত্র শেষ,
ত্রিক্ষণে (খ) অস্থায়ী অতি ন্যূন॥
ভক্তমাল রত্নবরে, অন্তর উজ্জ্বল করে,
নিত্যানন্দ সাগরে ভাসায়।
হেন ভক্তমাল পরি, হৃদয় উজ্জ্বল করি,
সুসৌন্দর্য্য করহ আশয়॥

পাঠান্তর—(ক) প্রাকৃত—সেহ যে।
(খ) ত্রিক্ষণে—তাহাতে।

যে রতন স্বর্গ মর্ত্ত্য, পাতালে নাহি যে অর্থ,
যাহা লাগি দেব-নাগ ঝুরে।
হেন যে রতন ধন, নাভাজী করিয়া পণ,
প্রকাশিয়া দিল মর্ত্ত্য নরে॥
অতএব ভক্তমাল, কর্ণের করি কুণ্ডল,
নিরবধি রাখহ ধরিয়া।
এ-হেন (ক) রতন আগে, চিন্তামণি দাস্য মাগে,
নাহি পায় মরমে ঝুরিয়া (খ)॥
অতএব যাহা চাহ, চতুর্ব্বর্গ মাগি লহ,
খেনেমাত্রে পাইবে হেলায়।
কৃষ্ণপ্রেম মহাধন, সকল ধনের ধন,
যদি পাবে করহ আশ্রয়॥
তাপত্রয় যাবে দূরে, এড়াবে সংসার ঘোরে,
পরম নিবৃত্তি (গ) হবে চিতে।
সকল অনর্থ যাবে, প্রেমানন্দ সুখ পাবে,
ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ যাহা হৈতে॥

পাঠান্তর—(ক) এ-হেন—হেন যে।
(খ) ঝুরিয়া—ঝুরিয়া।
(গ) নিবৃত্তি—নিবৃত্তি।

সুন্দর বিচার কর, প্রবেশ করিয়া হের,
ভক্তমালে কি অর্থ মিলয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত ভক্তি, জগত-দুর্লভ শক্তি,
মিলে লালদাস গুণ গায়॥

ভক্তমাল শ্রবণেতে যথার্থ যে ফল।
হরিভক্তি মিলে মন করিয়া নির্ম্মল॥
ইহার সন্দেহ নাহি (ক) দেখহ ভাবিয়া।
বিচার করহ ভাই গাঢ় চিত্ত দিয়া॥
ভক্তগণের গুণ কর্ম্ম বিবেক স্বভাব।
ভক্তি-আচরণ অনুরাগ প্রেমভাব॥
শুনিঞা মাত্রতো চিত্ত নির্ম্মল হইয়া।
লোভে জন্মে হরিপদ ভজন লাগিয়া॥
বিষয়বিরাগ জন্মে অনিত্য সংসার।
এই সব সদ্বোধ তার জন্মে হঠাৎকার॥
নিষ্কাম-ভকতি হয় শুদ্ধ যে পিরীতি।
ক্রমে বাঢ়ি যায় ভক্তি রাগ প্রেম রতি॥
সকল জঞ্জাল যায় আনন্দ জনমে।
সর্ব্বগুণ সদাচার তার দেহে রমে॥
আনুষঙ্গ্য গ্রন্থে সর্ব্বতত্ত্ব বিরাজয়।
অতএব সর্ব্বতত্ত্ব ইথে বেদ্য হয়॥
বৈষ্ণবের গুণগান স্মরণ (খ) মনন।
বৈষ্ণবের মান-দান চরণ-সেবন॥
এই সে পরম কৃষ্ণভক্তির প্রধান।
বৈষ্ণবে পূজিলে হয় কৃষ্ণের সম্মান॥
বিনা ভক্তপূজা কৃষ্ণপূজা নহে সিদ্ধ।
ভক্ত পূজা কৈলে কৃষ্ণ হৃদে হয় বদ্ধ॥
ইহার প্রমাণ বহু পূর্ব্বেতে বর্ণিল।
দৃঢ়তর বিধিমতে শাস্ত্রে যে কহিল॥
অতএব একান্ত যে শরণ্য জানিঞা।
লালদাস গুণ গায় ভরসা করিয়া॥
ভক্তমাল নাভাজীউ গ্রন্থন করিল।
চারিযুগের ভক্তনাম-গুণ প্রকাশিল॥

অসংখ্য ভক্তের নামমালা যে গাঁথিয়া।
পতিত জনার গলে দিল পরাইয়া॥
তাহার বিস্তর টীকা প্রিয়দাস সাধু।
বর্ণন করিলা অতি সুমধুর স্বাদু॥
তার মধ্যে কথোগুলি ভক্তের মহিমা।
গাইলাম সর্ব্বারম্ভে না পাইয়া সীমা॥
অগ্র-পশ্চাত-ক্রম-মত নাহি জানি।
বৈষ্ণবের গুণ গান এই মাত্র মানি॥
গুণ-লীলা বর্ণনে যে অধিকন্তু কম।
নাহি জানি কিছু মুঞি সমান বিষম॥
ইহাতে যে অপরাধ বৈষ্ণব গোসাঁঞি।
না লবে ঠাকুর মোর নিবেদন এই॥
জিহ্বায় কহাও যাহা তাহি মুঞি কহি।
তোমার অধীন প্রভু স্বতন্তর (ক) নহি॥
বৈষ্ণব গোসাঁঞি মোর কুলের ঠাকুর।
কবে মুঞি হব তব নাছের কুক্কুর॥
হে প্রভু করুণাদৃষ্টি কর অধমেরে।
দন্তে তৃণ ধরি কৃপা করহ পামরে॥
চরণে ভকতি দেহ নিবেদন করি।
নিজ-গুণলেশ দেহ দয়াদৃষ্ট্যে হেরি॥
অনন্ত অপার কোটি বৈষ্ণবের গণ (খ)।
ছোট বড় বন্দো মুঞি সভার চরণ॥
বৈষ্ণব চরণ-ধূলি মস্তকে ধারণ।
করি মুঞি এই মোর ভজন-সাধন॥
বৈষ্ণবের মূরতি যে কৃষ্ণের মূর্ত্তি হয়।
বেদশাস্ত্রে সাধুমার্গে ফুকারিয়া কয়॥
বৈষ্ণবের প্রতি যেই অসূয়া করয়।
সর্ব্ব-অমঙ্গল ধাম (গ) যায় সেই ক্ষয়॥
হরির চরণ আশ যে জন করিবে।
অর্পণ করহ মতি একান্ত বৈষ্ণবে॥
বৈষ্ণবে উপেক্ষা করি কৃষ্ণেরে ভজয়।
কৃষ্ণ তারে কোপ করি উপেক্ষা করয়॥

পাঠান্তর—(ক) নাহি নাস্তি।
(খ) স্মরণ—শরণ।

পাঠান্তর—(ক) স্বতন্তর—স্বতন্ত্র যে।
(খ) গণ—গুণ।
(গ) ধাম—ধরে।

কুপুত্র যেমন পিতৃধনে অর্হ নহে।
সেই ভক্ত তেমতি শ্রীমুখে কৃষ্ণ কহে (ক)॥
অতএব ভক্তমাল ভক্ত কথা সার।
পরম ঐশ্বর্য্য হৃদয়মাণিক (খ) আমার॥
কারো যজ্ঞ তপ যোগ কারো জ্ঞান বল।
ভক্তমাল মহাবল আমার কেবল॥
ভক্তমাল গৌড়ভাখা ছন্দে কৈনু গান।
নাভাজীর শ্রীচরণ হৃদে করি ধ্যান॥
বর্ণনের দোষ গুণ বিচার করিতে।
গ্রাহ্য নাহি হইবেক বিজ্ঞের সভাতে॥
তথাচ আদর করিবেন সাধুগণ।
যে-হেতুক বৈষ্ণবের মহিমা-বর্ণন॥
অদোষ-দরশী সাধুগন মাত্র হন (গ)।
সহস্র যে দোষ করে গুণেতে গণন॥
অতএব সাধুগণ নিন্দা না করিব।
সাধুর সম্বন্ধে লোক গ্রহণ করিব॥
নাভাজীর আজ্ঞা ইহ ভক্তমাল গ্রন্থ।
নিন্দুক পাষণ্ড আর যে জন বিপন্থ॥
অবৈষ্ণব নাস্তিক বৈষ্ণবে অবিশ্বাস।
তারে না শুনাবে নাহি কহিবে আভাস॥
তাহাতে যে অপরাধ হইবে প্রচুর।
তার সঙ্গ আলাপ প্রসঙ্গ কর দূর॥
হে কৃষ্ণ হে জগন্নাথ শ্রীমধুসূদন।
দন্তে তৃণ করি করোঁ (ঘ) এই নিবেদন॥
বরঞ্চ অগ্নিতে পুড়ে মরি সেই সুখ।
সর্পে দংশে ব্যাঘ্রে খায়, তাহে নাহি দুখ॥
বরঞ্চ কুম্ভীরে খাউ জলে ডুবাইয়া।
তথাপিহ ভয় নাহি এই মোর হিয়া॥
কিন্তু যে বৈষ্ণব প্রতি বিমুখ যে জন।
যে অধম বৈষ্ণবের করয়ে নিন্দন॥
বৈষ্ণবের অপমান ভ্রমে যেই করে।
অপরাধ করি যে না করে পরিহারে॥

পাঠান্তর—(ক) শ্রীমুখে কৃষ্ণ কহে—শ্রীকৃষ্ণ মুখে কহে।
(খ) হৃদয়মাণিক—হৃদিমাণিক্য।
(গ) সাধুগণ মাত্র হন—সাধু গুণমাত্র লন।
(ঘ) করি করোঁ—ধরি করি।

তার সঙ্গে সঙ্গ যেন কভু নাহি হয়ে।
তার অন্ন জল যেন খাইতে না হয়ে॥
বৈষ্ণব গোসাঞি কৃষ্ণ-রসে আনন্দিত।
অতএব গাই কিছু মধুরসগীত (ক)॥
শ্রবণ করিয়া ইহা মোরে প্রীত হও।
অঙ্গীকার করি মোরে দাস করি লও॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রস-গীত

রাধাকুণ্ড তীরে কুঞ্জ, কলপ-লতিকা-পুঞ্জ,
পুষ্পশ্রেণী পরম সুন্দর।
সৌরভে আমোদ অতি, নানাবর্ণে নানাজ্যোতি (খ),
ঝাঁকে ঝাঁকে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
তার মধ্যে রাধাশ্যাম, দুহুঁ রূপ অনুপাম,
ত্রিভুবন যাহার নিছনি।
শ্যাম নবকাদম্বিনী, রাই তাহে সৌদামিনী,
কিংবা হেমজড়া নীলমণি॥
কিংবা স্বর্ণ-কুবলয়, ভ্রমর পশিয়ে তায়,
মধুপান করয়ে উল্লাসে।
কিংবা পূর্ণ সুধাকর, উগারি অমৃতধার,
প্রকাশয়ে নবঘন পাশে॥
হাসির অমৃতধার, দোঁহে দোঁহা পরস্পর,
পান করি আনন্দিত হিয়া।
রসিক নাগর হরি, রসিকা কিশোরী গোরী,
মত্ত রস-সাগরে ডুবিয়া॥
শ্যাম-শ্রীঅঙ্গের শোভা, রাই-শ্রীবদনে আভা,
রাই-প্রতিবিম্ব শ্যাম-অঙ্গে।
পরম আশ্চর্য্য হেরি, সখীগণ ঠারাঠারি,
করিয়া দেখয়ে রসরঙ্গে॥
কিশোর বয়েস শ্যাম, কিশোরী রূপের ধাম,
দোঁহারূপে করিয়াছে আলো।
পরম আনন্দে রমে, কিশোরী কিশোর-বামে,
অপরূপ সাজিয়াছে ভালো (গ)॥

পাঠান্তর—(ক) মধুরসগীত—মধুর সঙ্গীত।
(খ) নানাবর্ণে নানাজ্যোতি—নানাবর্ণে নানাভাতি।
(গ) ভালো—ভাল।

পরিহাস-রসরঙ্গ, নানা রঙ্গ অঙ্গভঙ্গ,
প্রিয়া সঙ্গে আনন্দ-হিল্লোলে।
হাসি হাসি কহে বাণী, কি শোভা তাহাতে জানি,
গজমতি দোলে নাসাতলে॥
তা দেখি নাগরবরে, দেহ না ধরিতে পারে,
রসে ডুবি আপনা পাসরে।
শত শত চুম্বে মুখ, পাইয়া পরম সুখ,
লালদাস আনন্দ অন্তরে॥

মধুরেতে (ক) সমাপন ভক্তমাল গ্রন্থ।
যথাশক্তি বর্ণিল জানিঞা সাধু-পন্থ॥
রাধাকৃষ্ণ-মাধুরী যে গাইয়া কিঞ্চিত।
ভক্তমাল গ্রন্থোত্তম করিল পূরিত॥
ভক্তমাল মহামন্ত্র কৃষ্ণপ্রেমহেতু।
সর্ব্ববিঘ্নহন্তা আর সংসারের সেতু॥

পাঠান্তর—(ক) মধুরেতে—মধুরেণ।

চতুর যে হবে গাঢ় চিত্তে বিচারিবে।
ভক্তমাল পাঠাদিতে প্রেমধন পাবে॥
ভক্তের চরিত্র শুনি কষায় যাইবে।
সর্ব্ব অপরাধ ছুটি ভক্তি সঞ্চারিবে॥
প্রলোভ জন্মিবে কৃষ্ণ-চরণারবিন্দে।
প্রেমময়-সিন্ধুনীরে ভাসিবে আনন্দে॥
অতএব ভক্তমাল অবশ্য যে পাঠ্য।
সেবা পূজা ইষ্টতম শ্রোতব্য বরিষ্ঠ (ক)॥
পদে পদে চমৎকার কৃষ্ণরসায়ন (খ)।
মহিমা অতুল যাথে ভুবনপাবন॥
শ্রীল-কৃষ্ণচৈতন্য চরণ করি আশ।
ভক্তমাল প্রতিবিম্ব কহে লালদাস॥

পাঠান্তর—(ক) বরিষ্ঠ—গরিষ্ঠ।
(খ) কৃষ্ণরসায়ন—কর্ণরসায়ন।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ সমাপ্ত

প্রার্থনা

হরি হরি, বড় দুখ রহল মরমে।
গৌর কীর্ত্তন রসে জগজন মাতল
বঞ্চিত মো হেন অধমে॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই
বলরাম হইল নিতাই।
দীনহীন যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥
হেন প্রভুর শ্রীচরণে রতি না জন্মিল কেনে
না ভজিলাম হেন অবতার।
দারুণ বিষয় বিষে সতত মজিয়া রইনু
মুখে দিনু জ্বলন্ত অঙ্গার॥
এমন দয়াল দাতা আর না পাইব কোথা
পাইয়া হেলায় হারাইনু।
গোবিন্দ দাসিয়া কয় অনলে পুড়িনু নয়
সহজেই আত্মঘাতী হৈনু॥

রাধানাথ, করুণা করহ আমা।
সাধন ভজন কিছু না করিনু
ব্রজে বা না পাই তোমা॥
রাধানাথ, এ লাগি আকুল চিত।
রহি রহি মোর সংশয় হইছে
ভাবিতে হইনু ভীত॥
রাধানাথ, সময় হইল শেষ।
তব দয়া মোরে নিশ্চয় হইবে
কিছু না দেখিয়ে লেশ॥

রাধানাথ, তোমায় সঁপিত কায়।
রমণী যদি বা কুপথে চলয়ে
পতি নামে সে বিকায়॥
রাধানাথ, লোকে বা হাসয়ে তোমা।
যে কহে তোমার তারে না তারিলে
অযশ রবে ঘোষণা॥
রাধানাথ, এড়াইতে নারিবে তুমি।
তুয়া পদে যদি রতি না থাকয়ে
সবে জানে তোমার আমি॥
রাধানাথ, এ কথার করিবে কি।
পতিত-পাবন তুয়া এক নাম
সাধু মুখে শুনেছি॥
রাধানাথ, অতয়ে করিয়ে আশ।
ব্রজে তোমা দোঁহা পদে দাসী কর
গৌর সুন্দর দাস॥

রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥
কালিন্দীর কূলে কেলি কদম্বের বন।
রতন বেদীর পরে বসাব দুজন॥
শ্যাম গোরী অঙ্গে দিব চুয়া চন্দন গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরব মুখচন্দ॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস॥

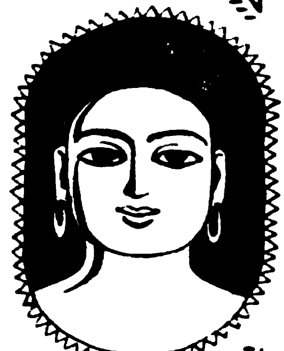
নামসংকীর্ত্তন

হরি-হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ-যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত-গীতা॥
জয়রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলেন বাস।
ব্রজে, রাধাকৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ॥
এই ছয় গোসাঞি যার তার মুঞি দাস।
তা সভার পদরেণু মোর পঞ্চ গ্রাস॥
ঐ ছয় গোসাঞি সেবি ভক্ত সনে বাস।
জনমে জনমে মোর এই অভিলাষ॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
নাম সংকীর্ত্তন করে নরোত্তম দাস॥

গৌর-ভক্ত পদে কোটি নমস্কার

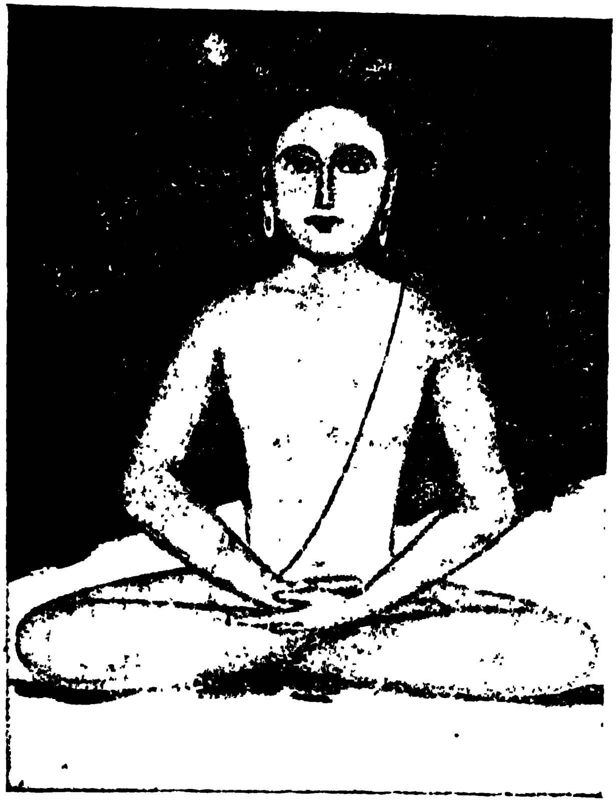



সার্থক মহাপুরুষদের জীবন কথা



মহাবীর জিন



ছোটবেলা থেকেই মহাবীর ছিলেন শক্তিমান্ ও সাহসী।

একবার তিনি সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলা করছিলেন। হঠাৎ সেখানে এক বিরাট সাপ এসে উপস্থিত। চারদিকে মহা হৈ-চৈ পড়ে গেল। ছেলেমেয়েরা যে যেদিকে পারল ছুটে পালালো। মহাবীর কিন্তু মোটেই ভয় পেলেন না। বরং তিনি এগিয়ে এসে হঠাৎ খপ্ করে সাপের লেজটি ধরে ফেললেন। তারপর সেটিকে কয়েকবার জোরে ঘুরিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর আবার মন দিলেন খেলাধূলায়। যেন কিছুই ঘটেনি।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দের চৈত্র মাসে শুক্লা ত্রয়োদশীতে মহাবীরের জন্ম। বর্তমান বিহার রাজ্যের উত্তরে বৈশালী নামে এক নগর ছিল। ঐ বৈশালী নগরই মহাবীরের জন্মস্থান। জাতিতে তিনি ক্ষত্রিয়। পিতার নাম সিদ্ধার্থ ও মাতার নাম ত্রিশলা। ছেলেবেলায় তাঁর নাম ছিল বর্ধমান।

সাধারণ জ্ঞানোন্মেষ হওয়ার পরই ধর্মের প্রতি বর্ধমানের অনুরাগ দেখা দেয়। উত্তরোত্তর সেই অনুরাগ বাড়তে থাকে। সন্ন্যাসীদের দেখা পেলেই তিনি ব্যাকুল হয়ে তাঁদের শরণ নেন। উৎকর্ণ হয়ে শোনেন তাঁদের ধর্মোপদেশ। মনে মনে ভাবেন কবে কর্মের বন্ধন ক্ষয় পাবে, কিভাবে হবে পরমপ্রাপ্তি ও নির্বাণ লাভ?

ত্রিশ বছর বয়সে বর্ধমান ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। ষণ্ডবনের এক সন্ন্যাসীর কাছে নিলেন সন্ন্যাস-দীক্ষা। পরিব্রাজন ও তপস্যার কালে যে অসামান্য সংযম ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় তিনি দিলেন তার তুলনা মেলা ভার।

প্রচণ্ড শীতের দিনে অন্য সাধকেরা যখন আগুন জ্বালিয়ে আত্মরক্ষা করতে ব্যস্ত, তিনি তখন নগ্নদেহে উন্মুক্ত আকাশের নিচে ধ্যান করতে বসেন। গ্রীষ্মের দুঃসহ তাপের মধ্যেও তিনি থাকেন নির্বিকার। এই সাধনার ফলেই তিনি ভাবীকালে 'মহাবীর' নামে অভিষিক্ত হয়ে এক পরম সাধক ও ধর্মপ্রচারক রূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

যে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর মহাপুরুষ জৈনধর্মের প্রবর্তন ও প্রচার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমজন হলেন ঋষভদেব—এ কথা অনেকে অনুমান করেন। ত্রয়োদশ তীর্থঙ্কর হলেন পার্শ্বনাথ আর চতুর্দশ তীর্থঙ্কর এই মহাবীর।

মহাবীর একবার এলেন নালন্দায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আওতার বাইরে পূর্বভারতের এই অঞ্চলটিতে তখন নূতন নূতন ধর্মমত ও আদর্শ প্রচারিত হচ্ছে। বিশিষ্ট ধর্মনেতা ও দার্শনিকের আনাগোনা তখন নালন্দায়। তরুণ সন্ন্যাসী মহাবীরের খ্যাতি তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর শুভাগমনে নালন্দায় সাড়া পড়ে গেল। বিশিষ্ট নাগরিকেরা এই ত্যাগব্রতী নবীন সাধকের

সামনে এসে ভিড় করলেন। পরম সাধক গোঁসালও সেদিন এলেন মহাবীরকে দর্শন করতে। সঙ্গে সঙ্গে এক দুর্নিবার আকর্ষণে তিনি বাঁধা পড়ে গেলেন। গোঁসাল মহাবীরকে গ্রহণ করলেন শিষ্যরূপে।

সাধক হিসাবে গোসালের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। কোন কিছু চাওয়া-পাওয়ার ধার ধারেন না, নগ্ন অবস্থায় থাকেন, স্বেচ্ছামত যত্রতত্র বিচরণ করেন। অপরিগ্রহের এই পরিপূর্ণ রূপটি মহাবীরকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে মহাবীর। তাই বুঝি সংস্কারে তাঁর সন্ন্যাসী হয়েও উলঙ্গ হতে বাধে। অবশেষে মনস্থির করে কোমরে জড়ানো বসনখানি এক ভিখারীকে দান করে ফেললেন। সন্ন্যাসী মহাবীর হলেন দিগম্বর।

তারপর মৌনব্রত অবলম্বন করে মহাবীর পরিক্রমায় বহির্গত হলেন। প্রাণসংশয় হলেও এ সময়ে কখনও তাঁকে ব্রতভঙ্গ করতে দেখা যায়নি।

একবার এক অচেনা রাজ্যের মধ্যে দিয়ে তিনি পরিক্রমা করছেন। সামনেই পড়ল সেখানকার রাজধানী। রাত্রি হওয়ায় সেখানেই বিশ্রামের উদ্দেশ্যে শুলেন। কিন্তু ভোর না হতেই নগররক্ষীরা তাঁকে ধরে ফেলল। চোর বলে সন্দেহ করে তারা মহাবীরকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করল কিন্তু মহাবীর নিরুত্তর। কিছুতেই তিনি তাঁর মৌন থাকার সংকল্প ত্যাগ করলেন না।

নগররক্ষীরা তাঁকে নগরপালের কাছে নিয়ে গেল। নগরপাল আদেশ দিলেন—লোকটির গলায় ফাঁস চড়াও, পেটের কথা সব বেরিয়ে আসবে। প্রহরীরা বড় বিপদে পড়ল। যতবারই তারা মহাবীরের গলায় ফাঁস লাগাতে যায় ততবারই তা খসে যায়। এ রকম সাত বার হল। তখন মহাবীরকে ছেড়ে দেওয়া হল।

মহাবীর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় জয় করেছিলেন বলে তাঁর উপাধি হয় 'জিন'। যাঁরা তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, তাঁরা জৈন নামে পরিচিত। আর তিনি যে ধর্ম প্রচার করেন, তার নাম জৈনধর্ম।

পার্শ্বনাথ বলেছিলেন চার সংযমের কথা—অহিংসা, সত্য, অচৌর্য আর অপ্রতিগ্রহ, অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় দান গ্রহণ না করা। মহাবীর এর সঙ্গে পঞ্চম সংযম যোগ করলেন—ব্রহ্মচর্য। মহাবীরের অনুগামীদের বলা হয় 'নির্গ্রন্থ' অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত। জৈনধর্ম অনুসারে মানুষ তার নিজ কর্মফলের হাত থেকে নিস্তার পেলেই মুক্তি লাভ করে। জীবে অহিংসা, আত্মপীড়ন ও কৃচ্ছ্রসাধন—এগুলিকেই জৈনরা ধর্মলাভের প্রধান সোপান বলে জ্ঞান করেন।

শুধু সংসারত্যাগী সাধননিষ্ঠ নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসীদেরই নয়, সংসারধর্মী ভক্তদেরও মহাবীর শুনিয়েছেন আশ্বাসবাণী। বলেছেন, "নিষ্ঠাভরে আমার উপদেশ মেনে চল, তা হলে গৃহী হয়েও তোমরা পাবে অলৌকিক দৃষ্টি ও সাধনৈশ্বর্য, ক্ষয় হবে তোমাদের সব কর্মবন্ধন।" পরবর্তীকালে মহাবীরের প্রধান শিষ্য ইন্দ্রভূতি গোতম তাঁকে প্রশ্ন করেনঃ "প্রভু, আপনি এ কী করেছেন? সন্ন্যাসী আর গৃহস্থ ভক্তের মধ্যে কোন প্রভেদই যে আপনি রাখতে চান না! এ কিন্তু আপনার মহা অবিচার। সমস্ত ভোগসুখ ছেড়ে কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে যে সব সন্ন্যাসী দুশ্চর তপস্যাকে জীবনের ব্রত হিসাবে বেছে নেন তাঁদের জন্য বিশেষ সাধনপন্থা থাকবে না? সন্ন্যাসী আর গৃহীর আসন হবে সমপর্যায়ভুক্ত? এ কেমন কথা?" অবিচল কণ্ঠে মহাবীর উত্তর দেনঃ "না ইন্দ্রভূতি, আমার প্রচারিত সার্বজনীন ধর্মে বৈষম্যের কোন স্থান নেই। এ ধর্মের দৃষ্টিতে সন্ন্যাসী ও গৃহীর মান, মর্যাদা ও অধিকার সমান সমান।"

আত্মার চরম শান্তি বা নির্বাণ লাভই জৈনধর্মের আদর্শ। জৈন ধর্মমতে নির্বাণ অর্থাৎ পুনর্জন্ম থেকে আত্মার সম্পূর্ণ মুক্তিলাভের তিনটি পন্থা আছে: সৎ জ্ঞান, সৎ কর্ম ও সৎ ব্যবহার। জৈন ধর্মমতে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, বেদকে ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী বলেও মনে করে না। জাতিভেদও জৈনেরা মানে না।

মহাবীর উপদেশ দিলেন জীবহিংসা করো না, মিথ্যা কথা বলো না, চুরি করো না, পবিত্র জীবন যাপন করো। এই উপদেশগুলিই হল জৈনধর্মের মূলনীতি। মহাবীরের উপদেশগুলি পরে বারোটি ভাগে সংকলিত হয়েছিল 'অংগ' নামে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে জৈনরা দুটি সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে যানঃ একটি 'দিগম্বর', অপরটি 'শ্বেতাম্বর'। জৈনধর্ম পূর্বভারত থেকে ধীরে ধীরে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। আজও গুজরাট ও রাজস্থানে বহু জৈন বাস করেন।

বাহাত্তর বৎসর বয়সে মহাবীর পাটনার নিকট পাবা নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন।

গৌতম বুদ্ধ



খ্রীষ্টজন্মের ৫৬৪ বৎসর পূর্বের ঘটনা। নেপালের কপিলাবস্তু নগরীতে আনন্দোৎসব। বৈশাখী পূর্ণিমা লগ্নে রানী মায়াদেবীর একটি পুত্র-সন্তান হয়েছে। শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোদনের সর্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। তাই পুত্রের নাম রেখেছেন সর্বার্থ-সিদ্ধ বা সিদ্ধার্থ। অপর নাম গৌতম। কিন্তু সাতদিনের মধ্যেই আনন্দের কোলাহল থেমে গেল। রাজপুরীতে নেমে এল নিরানন্দের ছায়া। রানীর হঠাৎ মৃত্যু হল।

রানীর ভগ্নী মহাপ্রজাপতি গৌতমীর হাতে শিশুর প্রতিপালনের ভার পড়ল। রাজ-জ্যোতিষী এলেন, পুত্রের জাতকোষ্ঠী তৈরি করা হল। কিন্তু একি! রাজার ছেলের রাজা হওয়ার ভাগ্য নেই। সে হবে গৃহত্যাগী। রাজা শুদ্ধোদনের বুক কেঁপে উঠল। রাজার ছেলে হবে গৃহছাড়া? কেন? কোন্ দুঃখে?

ভোগবিলাস ও প্রাচুর্যের মধ্যে রাজা পুত্রকে ভুলিয়ে রাখলেন। যৌবনে পদার্পণ করতেই তার বিবাহ দিলেন পরমা রূপসী যশোধরার সঙ্গে।

কিন্তু সব বৃথা। সিদ্ধার্থ একদিন রথে চড়ে নগর ভ্রমণে বেরুলেন। রাজপথে দেখলেন এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে। বয়সের ভারে নত, লাঠিতে ভর করে অতি কষ্টে হাঁটছে। সারথিকে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করলেন—"ঐ লোকটির এ অবস্থা কেন?" সারথি বলল—"শেষ জীবনে সব মানুষেরই এমনি অবস্থা হয়ে থাকে।"

"আমারও তা হলে এমন হবে?" চমকে উঠলেন রাজপুত্র সিদ্ধার্থ।

আর একদিন দেখলেন একটি রোগপীড়িত লোককে। যন্ত্রণায় সে চিৎকার করছে। সিদ্ধার্থ কারণ জানতে চাইলেন। সারথি জবাব দিল—"লোকটির রোগ হয়েছে।" "আমারও কি রোগ হতে পারে?" - কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন সিদ্ধার্থ। সারথির জবাব—"শরীর থাকলে রোগ হবেই।"

তারও কয়েকদিন পরে দেখলেন—কয়েকটি লোক একটি শব বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কৌতূহলী সিদ্ধার্থের প্রশ্নের জবাবে সারথি বলল—"লোকটির মৃত্যু হয়েছে। তাই তাকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে পোড়াবার জন্য।" "সেকি! সব মানুষেরই কি এ অবস্থা হবে?" সিদ্ধার্থের মনে আকুল জিজ্ঞাসা। জবাব দেয় সারথি—"মানুষ এ সবের হাত থেকে নিস্তার পেতে পারে না। জরা রোগ মৃত্যু মানুষের অবশ্যম্ভাবী।"

এই সব দেখবার পরই সিদ্ধার্থ অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। ভাবলেন—সবই মায়া, সংসার অসার। তাই একদিন গভীর রাত্রে পিতা, পত্নী, সদ্যোজাত সন্তান এবং বিপুল বিভব ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন পথে। সত্যের সন্ধানে রাজকুমারের এই সংসারত্যাগ 'মহাভি-নিষ্ক্রমণ' নামে পরিচিত।

সত্য পথের অভিযাত্রী সিদ্ধার্থ প্রথমে আড়ার কালাম নামে সে যুগের পরমসাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। তারপর সন্ন্যাসীর বেশে নানাদেশ ঘুরে সিদ্ধার্থ এলেন বৈশালী নগরে। মহর্ষি

রুদ্রকের কাছে নিলেন দীক্ষা। কিছুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর রুদ্রক বললেন—"উরুবিল্ব গ্রামে গিয়ে কঠোর তপস্যা কর। তবেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।"

সিদ্ধার্থ গয়ার নিকটে উরুবিল্ব গ্রামের এক বনে গিয়ে শুরু করলেন কঠোর তপস্যা। কেটে গেল বৎসরের পর বৎসর। মোহিনী মায়া সিদ্ধার্থের তপস্যা ভাঙতে চেষ্টা করল। ভয়াবহ মাররূপে ভয় দেখাল। কিন্তু এতেও সিদ্ধার্থের তপস্যা ভঙ্গ হল না। এর পর সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করলেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত চির সত্যকে। আনন্দে সারা অন্তর ভরে গেল। তখন তাঁর বয়স ৩৫ বৎসর।

সিদ্ধার্থ যেদিন সিদ্ধিলাভ করেন সেদিনও ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা—তাঁর জন্মও এই বৈশাখী পূর্ণিমা লগ্নে।

গৌতম এবার 'বুদ্ধ' (জ্ঞানী) হলেন। এবার শুরু হল দেশ-পরিক্রমা। বারাণসীর অনতিদূরে অবস্থিত সারনাথের ইসিপতন মৃগদাবে তিনি পঞ্চশিষ্যের নিকট সর্বপ্রথম তাঁর ধর্মমত ব্যক্ত করেন। এটি ধর্মচক্র-প্রবর্তন নামে খ্যাত। জনগণের কাছে বুদ্ধদেব প্রচার করলেন নিজের সাধনালব্ধ জ্ঞান। তার নাম 'সদ্ধর্ম' বা বৌদ্ধধর্ম। দিকে দিকে প্রচারিত হল তাঁর বাণী। বুদ্ধের মতে, জন্মালে কষ্ট পেতেই হবে; তাই যাতে বার বার জন্ম না হয় তাই করতে হবে। ভাল কাজ করলেই এবং কামনা-বাসনা ত্যাগ করলেই মানুষ পুনর্জন্ম ও দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। এই অবস্থাকে বলে 'নির্বাণ'। নির্বাণলাভের উপায়ও বুদ্ধ বলে দিয়েছিলেন। মুক্তি সাধনার আটটি মার্গ বা উপায়ের কথা তিনি বললেন—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবন, সম্যক্ চেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি। তাঁর বাণীর মূল কথা হলঃ অবিদ্যাই দুঃখের মূল। কাজেই অবিদ্যাকে জয় করা চাই। হিন্দুধর্মের প্রচলিত গোঁড়া আচার-অনুষ্ঠান আর জৈনধর্মের প্রচণ্ড কৃচ্ছ্র-সাধনের পথ—এ দুই-ই পরিত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর গল্প আছে। একবার এক শিষ্য বুদ্ধদেবের কাছে এসে জানতে চাইলেন জীবনে কোন্ পথ অবলম্বন করা শ্রেয়। বুদ্ধ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, বীণার তার ঢিলে করে বাঁধলে কি বীণা ঠিক সুরে বাজে? উত্তর দিলেন শিষ্য—না। বুদ্ধ আবার প্রশ্ন করলেন—বীণার তার চড়া পর্দায় বাঁধলে কি বীণা ঠিক সুরে বাজে? উত্তর এল—তার ছিঁড়ে যায়। তখন বুদ্ধ উপদেশ দিলেন—জীবনেও তেমনি মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করবে।

বহুলোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। মগধের রাজা বিম্বিসার, লিচ্ছবীদের রাজা এবং আরও অনেক ধনী ও পণ্ডিত ব্যক্তি বুদ্ধদেবের নূতন ধর্ম গ্রহণ করলেন।

শাক্যবংশধরেরা ক্রমে ক্রমে বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগলেন। আবার শুরু হল বুদ্ধদেবের ধর্ম-প্রচারের পরিক্রমা। সারা পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে প্রচারিত হল বৌদ্ধধর্ম—'আজিও জুড়িয়া অর্ধ-জগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর।'

আশি বৎসর বয়সে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে কুশীনগরে বুদ্ধদেব লাভ করলেন মহানির্বাণ। বুদ্ধের দেহাবসানের পর তাঁর অমূল্য বাণীগুলিকে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম—এই 'ত্রিপিটক' গ্রন্থে সংকলিত করেন তাঁর শিষ্যেরা। পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্ম 'মহাযান' ও 'হীনযান' এই দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

বৌদ্ধধর্মে মুক্তি মানুষের স্বোপার্জিত পরম সম্পদ। বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ রিস্ ডেভিডস্ বলেছেনঃ 'বিশ্বের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মে সর্বপ্রথম এমন এক মুক্তির বাণী ঘোষিত হয়েছে, যে মুক্তি প্রত্যেক মানুষ ইহলোকে জীবদ্দশাতেই অর্জন করতে সক্ষম। এর জন্য ঈশ্বর কিংবা ছোট-বড় কোন দেবতার সাহায্য বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই।' রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বুদ্ধ 'সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নঙর্থক নয়, সদর্থক; যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে; যে মুক্তি রাগদ্বেষবর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়।'

রাবেয়া



তুর্কীর বসোরা নগরের এক প্রান্তে এক গরিব মুসলমানের ঘরে আজ বড্ড অন্ধকার। তেলের অভাবে প্রদীপ জ্বালাবার সামর্থ্যটুকুও নেই। একটু আগে এক শিশুকন্যা ভূমিষ্ঠ হয়েছে; মা তাকে কোলে তুলে নেবেন এমন একটু ছেঁড়া কাপড়ও সম্বল নেই।

স্বামীকে ডেকে বললেন, "কোন পড়শির বাড়িতে গিয়ে আজকের মত একটু ছেঁড়া কাপড় আনতে পার কি না দেখ।" স্বামী কিন্তু স্ত্রীর কথা রাখতে পারলেন না। দুনিয়ায় খোদা ছাড়া আর কারও কাছে তিনি কোনকিছু ভিক্ষা চাইবেন না—এই ছিল তাঁর জীবনের প্রতিজ্ঞা।

সন্তানের জন্মমুহূর্তেও তার জন্য একটু আরামের ব্যবস্থা করতে না পেরে মা প্রাণে ব্যথা পেলেন। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন; গভীর রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন—স্বয়ং পয়গম্বর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন -'দুঃখ করো না; তোমার এই নবজাত কন্যা সাধারণ মেয়ে নয়। এ বড় পুণ্যবতী। একদিন আমার ভক্তেরা এর পায়ে শরণ নেবেন।'

মেয়ের জন্ম হয়েছিল ৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে। তিন কন্যার পর চতুর্থটিও মেয়ে। নাম রাখা হল রাবেয়া। রাবেয়া যখন কিশোরী তখন সংসারে দুর্যোগ এল ঘনিয়ে। অল্প কিছুদিন আগে-পরে বাবা ও মা দুজনেই মারা গেলেন। অসহায় অনাথ চার বোন অকূল সমুদ্রে পড়ল।

কিছুকাল পরে একদিন বসোরা নগরে দেখা দিল ভীষণ দুর্ভিক্ষ। চারদিকে হাহাকার পড়ে গেল, না খেতে পেয়ে লোক মরতে শুরু করল। একদিন খাবারের খোঁজে বেরিয়ে রাবেয়া হাঁটতে হাঁটতে একটু দূরে গিয়ে পড়েছেন এমন সময় এক দুর্বৃত্ত তাঁকে ধরে নিয়ে গেল। লোকটা তাঁকে এক ধনীর কাছে বেচে দিল ছয় দারহাম মূল্যে।

ক্রীতদাসী রাবেয়ার জীবনে নেমে এল দুঃখের অভিশাপ। সংসারের হাড়ভাঙা খাটুনি। দিনরাত খেটেও রাবেয়া শেষ করতে পারেন না কাজ। তার ওপর মনিবের অত্যাচার আর মারধোর। নীরবে চোখের জল ফেলেন রাবেয়া, প্রতিবাদ করার উপায় নেই কোন। একদিন এক অচেনা লোককে দেখে ভয় পেয়ে রাবেয়া দৌড়তে আরম্ভ করলেন। খানিক ছুটবার পর তিনি হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। একটা হাত গেল ভেঙে। কেঁদে কেঁদে রাবেয়া দুঃখ জানাতে থাকেন ঈশ্বরকে। অন্তরের মধ্যে শুনতে পান কার বাণীঃ 'কেঁদো না বাছা, তোমার দুঃখের দিন শেষ হয়ে আসছে, সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ!'

রাবেয়া শান্ত হলেন, শরীরে বল ফিরে পেলেন। মনিবের ঘরে এলেন ফিরে। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের শেষে গভীর রাত্রে রোজ ঈশ্বরের কাছে উপাসনা করতেন আর ধর্মের বই পড়তেন।

এমনি এক গভীর রাত্রে মনিবের ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। কোথা থেকে অপূর্ব প্রার্থনার সুর ভেসে আসছে। আস্তে আস্তে সে এগিয়ে যায়, রাবেয়ার ঘরের জানলা দিয়ে ক্ষীণ আলোকরেখা দেখা যাচ্ছে। মেঝেতে বসে রাবেয়া উপাসনা করছেনঃ "তুমি তো জান খোদা, আমার কত ইচ্ছে প্রাণভরে তোমার উপাসনা

করি। কিন্তু আমি যে পরাধীন, তাই তো এত দেরি করে আসি তোমার কাছে।"

এক অপরূপ জ্যোতি ছড়িয়ে পড়েছে রাবেয়ার মুখমণ্ডলে। সে মুখে সংসারের নির্যাতনের বা পরিশ্রমের কোন ছাপ নেই। মনিবের সমস্ত মন ভরে গেল আত্মধিক্কারে। এমন পুণ্যাত্মা মেয়েকে সে এতদিন চিনতে পারেনি, কত লাঞ্ছনা দিয়েছে তাঁকে, খাটিয়েছে দাসীর মত!

পরদিন সকালে রাবেয়াকে ডেকে মনিব ক্ষমা চাইল। বললঃ "তোমাকে মুক্তি দিলাম মা। তুমি আমার গৃহেই থাক—তোমার সেবা করে আমরা ধন্য হব।"

দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলেন রাবেয়া। কিন্তু মনিবের গৃহে আর নয়। প্রাণমন যার ছুটে চলেছে ঈশ্বরের সন্ধানে, তার কাছে ঘরের আরাম তুচ্ছ।

সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভক্তিমতী রাবেয়া নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। বেশি ঘুরতে হল না মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই খুঁজে পেতে।

এক বনের ধারে একটি ছোট্ট কুটিরে রাবেয়া থাকেন। সারাদিন শুধু উপাসনা, ঈশ্বরচিন্তা আর ধর্মের বই পড়া। তাঁর বয়স তখনও খুবই অল্প। অনেক ধনী সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক, এমনকি বসোরার সুলতান পর্যন্ত তাঁকে বিবাহ করতে চাইলেন। রাবেয়া বিবাহের প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন।

এরপর তিনি চলে গেলেন পবিত্র তীর্থ মক্কা শহরে। রাবেয়ার একনিষ্ঠ ধর্মাচরণের কথা সকলের মুখে-মুখে। হাজার হাজার ভক্তপ্রাণ মুসলমান প্রত্যহ এসে তাঁর কাছে ভিড় করেন, তাঁর মুখ থেকে শুনতে চান ঈশ্বরের প্রেমময় বাণী।

বহু বৎসর পূর্বে কন্যার জন্মের শুভক্ষণে মা স্বপ্নে শুনেছিলেন প্রভু মহম্মদের আশ্বাসবাণী। তা-ই বুঝি আজ সত্য হতে চলেছে!

হোসেন বাসোরী ছিলেন মক্কার প্রসিদ্ধ ধার্মিক ব্যক্তি। তিনিও রাবেয়ার মুখে ধর্মকথা শুনতে প্রায়ই যেতেন তাঁর কাছে। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ "রাবেয়া, কী করে তুমি ধর্মের পরম বস্তু পেলে?" রাবেয়ার উত্তরঃ "সংসারে যা কিছু পাবার, সবই আমি ত্যাগ করেছি, তাই!"

রাবেয়ার জবাবটি খুব ছোট; কিন্তু তার মাঝে অনেকখানি গভীর অর্থ রয়েছে। সংসারে ঐহিক সুখ-ভোগ-ধন-মান এসব নিয়েই তো মানুষ দিনরাত ব্যস্ত থাকে। রাবেয়ার কাছে এসব জিনিস অত্যন্ত তুচ্ছ। পরমকারুণিক খোদাকেই তিনি তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে কামনা করেছিলেন।

এক ভক্ত তাঁকে প্রশ্ন করলেনঃ "আপনি ঈশ্বরকে তো ভালবাসেন?"

- হ্যাঁ, বাসি।

- আপনি শয়তানকে শত্রু বলে মনে করেন?

—না।

—সে কী করে হয়?

রাবেয়া উত্তর দিলেনঃ "ঈশ্বরকে আমি এত ভালবাসি যে শয়তানকে ঘৃণা করবারও স্থানটুকু আমার মনে নেই!"

অত্যন্ত সাধারণ মানুষের জীবন যাপন করতেন রাবেয়া। ছেঁড়া মাদুর তাঁর বিছানা, একখানা ইট ছিল মাথার বালিশ, ভাঙা মাটির ঘটে থাকত খাবার জল। বলতেনঃ "নিজের অভাবের কথা কাউকে বলতে আমার লজ্জা করে। এ দুনিয়া ভগবানের রাজ্য। যদি কিছু চাইতে হয়, তাঁরই কাছে চাইব।"

৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে, মাত্র ৩৫ বছর বয়সে রাবেয়ার নশ্বর দেহ লীন হয়ে গেল ঈশ্বরের সঙ্গে। তাঁর পবিত্র দেহখানিকে ভক্তেরা সমাধিস্থ করলেন জেরুজালেম শহরের পূর্বপ্রান্তে টর পর্বতের চূড়ায়। আজও লক্ষ লক্ষ মুসলমান যাত্রীর কাছে সেই সমাধি তীর্থস্থান হয়ে আছে।

শঙ্করাচার্য



লোকের মুখে ছেলের প্রশংসা আর ধরে না। পিতা শিবগুরু আর মাতা বিশিষ্টা দেবীর আনন্দ ও গর্বের তাই সীমা নেই।

৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী। শুভক্ষণে জন্ম নিল এই শিশু শঙ্কর। মাত্র আট বৎসর বয়সের মধ্যেই সে হয়ে উঠল সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। কেরলের অখ্যাত গ্রাম কালাড়ি তার জন্যই বিখ্যাত হয়ে উঠল।

শঙ্করের অলৌকিক প্রতিভার খ্যাতি শুনে কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত কালাড়িতে এলেন। ছেলেটির সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করে মুগ্ধ হয়ে গেলেন—কী আশ্চর্য শ্রুতিধর এই বালক!

কৌতূহলী হয়ে পণ্ডিতেরা শঙ্করের জন্মকুণ্ডলী দেখতে চাইলেন। জননী বিশিষ্টা দেবী পুত্রের জন্মপত্রিকা বের করলেন। পিতা আচার্য শিবগুরু তখন পরলোকে। পুত্রের এই অসামান্য খ্যাতি তিনি দেখে যেতে পারেননি।

জন্মকুণ্ডলী দেখে পণ্ডিতেরা শিউরে উঠলেন। এই বালক যে স্বল্পায়ু। ষোল আর বত্রিশ বৎসর বয়সে তার জীবনহানির যোগ রয়েছে।

বিধবা জননী কেঁদে আকুল হলেন। শঙ্করের মনে জেগে উঠল সংসার-ত্যাগের বাসনা। ক্ষণস্থায়ী এই জীবনকে সংসারের মায়ায় আবদ্ধ করে লাভ কী!

একদিন প্রত্যুষে শঙ্কর গৃহত্যাগ করে চলে গেলেন।

দুমাস অবিরাম চলার পর শঙ্কর উপস্থিত হলেন ওঙ্কারনাথ গিরিগুহায়। মহাযোগী গোবিন্দপাদের শরণাপন্ন হলেন। গুরুর আশ্রয়ে থেকে তরুণ সাধক তিন বৎসর কঠোর সাধনা করলেন। এই সময়ের মধ্যেই অসামান্য যোগসিদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান তাঁর আয়ত্ত হয়ে গেল। সেই সময়ে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখে আশ্রমের সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

গুরু গোবিন্দপাদ কয়েকদিন যাবৎ গুহায় সমাধিতে মগ্ন। আকাশ ভেঙে অবিরাম বৃষ্টিধারা। নর্মদা নদী ফুলে ফেঁপে দুপাড় ভাসিয়ে দিয়েছে। প্লাবনের জল ক্রমে গুহার দ্বারে এসে পৌঁছল। শিষ্যেরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। জল গুহার ভিতরে ঢুকলে গুরুর জীবন বিপন্ন হবে।

শঙ্কর তখন বললেন—"ভয় নেই। আমাদের গুরুদেব পরম ব্রহ্মজ্ঞানী। কোন কিছুতেই তাঁর অনিষ্ট হবে না।" এই বলে একটি মাটির ঘড়া এনে কাত করে রেখে দিলেন। এদিকে জল কলকল শব্দে গুহার দিকে ছুটে আসতে লাগল। কিন্তু কী আশ্চর্য! জল বেগে গুহার দ্বারে এসে ঐ মাটির ঘড়ার ভিতর ঢোকে আর কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে শিষ্যদের মনে ধারণা হল—শঙ্কর সাধারণ মানুষ নন।

কিছুদিন পর গুরুদেব মহাসমাধিতে নিমগ্ন হওয়ার

আগে শঙ্করকে বললেন—"অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান তোমাকে প্রচার করতে হবে। করতে হবে লুপ্ত তীর্থগুলির উদ্ধার। মানুষ ঈশ্বরবিমুখ হয়ে পড়ছে, তাদের মনকে জাগাতে হবে। তুমি কাশীতে যাও।"

গুরুদেবের আদেশে শঙ্কর কাশীতে পৌঁছলেন। গঙ্গার তীরে বসে শুরু করলেন অদ্বৈতবাদ প্রচার। উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেনঃ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এ জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নের মতই অলীক। জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়।

একদিন মণিকর্ণিকার ঘাটে শঙ্কর স্নান করতে যাচ্ছিলেন। পথে দেখলেন এক অতিকায় চণ্ডাল, তার সঙ্গে কয়েকটি কুকুর। শঙ্কর বললেন—"এক ধারে একটু সরে দাঁড়া বাবা।" কিন্তু চণ্ডাল শ্লোক আবৃত্তি করে বলল—"আচার্য, আপনি কাকে সরে যেতে বলছেন? আমার আত্মাকে না দেহকে? আত্মা সর্বব্যাপী, সে সরে যাবে কোথায়? যদি দেহকে বলে থাকেন, তবে সে তা পালন করবে কিভাবে? সে তো জড়।"

চণ্ডালের মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনে শঙ্কর স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মুহূর্তের মধ্যেই দেখলেন—চণ্ডাল নেই, দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রশান্ত-মধুর কণ্ঠে বললেন—"বৎস, সর্বসংস্কারের ঊর্ধ্বে ওঠ। জগতের কল্যাণের জন্য তুমি অদ্বৈতজ্ঞানের প্রচারে অগ্রসর হও। তার আগে উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা কর।"

বিশ্বেশ্বরের আদেশ পাওয়ার পর শঙ্কর স্থির করলেন, হিমাচলের কোলে বসে আদিষ্ট গ্রন্থ রচনা করবেন। কয়েকজন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রওনা হলেন। হৃষীকেশে গিয়ে হারানো শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহকে উদ্ধার করলেন। বদ্রিধামে এসে গভীর জলকুণ্ড থেকে উদ্ধার করলেন নারায়ণের প্রাচীন মূর্তি। অবশেষে এলেন ব্যাসতীর্থে। সেখানে চার বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে রচনা করলেন ষোলখানি শাস্ত্রগ্রন্থের মহাভাষ্য।

উত্তরাখণ্ডের দুর্গম তীর্থগুলি দর্শনের পর সদলবলে তিনি উত্তর কাশীতে পৌঁছলেন। সেখানে অলৌকিকভাবে ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। ব্যাসদেব বললেন—"অদ্বৈতবাদের ভিতর দিয়ে তুমি শাস্ত্রীয় ভিত্তি রচনা করলেও তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদের তোমার স্বমতে আনতে হবে।"

এবারে শঙ্কর বেরুলেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদের বিজয় অভিযানে। দিকে দিকে তাঁর বিজয়পতাকা উড়তে থাকল। বেদান্তের ত্যাগমাধুর্যময় ভাবধারা প্রবাহিত হতে লাগল অবিরত ধারায়।

শঙ্করাচার্য রচিত 'মোহমুদ্গর' থেকে কয়েকটি প্রসিদ্ধ পংক্তিঃ

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারো অয়ম্ অতীব বিচিত্রঃ।
নলিনীদলগত-জলমতিতরলং
তদ্বৎ জীবনম্ অতিশয়চপলম্॥

অর্থাৎ, কে তোমার পত্নী, কেই-বা তোমার পুত্র? এ সংসার অতি বিচিত্র স্থান। পদ্মপত্রে জল যেমন মোটেই স্থির থাকে না, মানুষের জীবনও তেমনি অতিশয় ক্ষণস্থায়ী।

মাত্র বত্রিশ বৎসরের সীমায়িত জীবনে তিনি ভারতের চারদিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চারিটি ধর্মদুর্গ শৃঙ্গেরী, গোবর্ধন, সারদা ও জ্যোতির্মঠ।

শঙ্করাচার্যের প্রধান চারজন শিষ্য ছিলেন সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, হস্তামলক ও তোটক। তাঁরা প্রত্যেকেই আচার্যের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। গুরুর প্রতি অবিচল ভক্তিতে তাঁরাও দীপ্তিমান্।

একদা শঙ্করের আহ্বানে প্রিয়শিষ্য সনন্দন তরঙ্গমুখর নদী পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে এসেছিলেন। দেবরক্ষিত এই শিষ্যের প্রতিটি পদক্ষেপে নদীবক্ষে লীলাকমল প্রস্ফুটিত হয়েছিল।

গোরখনাথ



ভাঁড়ারে চাল বাড়ন্ত, ঘরে পয়সাকড়ি কিছুই নেই। কী উপায় হবে? বাড়ির গৃহিণী উঠানে একরাশ গোবর নিয়ে ঘুঁটে তৈরি করতে বসলেন, বাজারে বেচে যদি কিছু পয়সা পাওয়া যায়।

তাঁর ছেলের বয়স বারো বছর। সেও পাশে বসে ঘুঁটে তৈরি করে মাকে সাহায্য করছে। এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলেন এক জটাধারী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী এসেই দূর থেকে বালককে প্রণাম করলেন। বললেন—"মাগো, তোমার এই গোময় স্তূপের মাঝ থেকে আজ আমি আবিষ্কার করে গেলাম এক পদ্মফুল। তোমার কুল পবিত্র, সারা দেশ ধন্য। কিন্তু মাগো, এ ছেলে ঘরে থাকবে না।"

সে কথাই সত্য হল। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে মা ছেলেকে আর দেখতে পেলেন না। চিরতরে সে সংসার ত্যাগ করে কোথায় চলে গিয়েছে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছেলেটি সাধুসন্ন্যাসীদের দলে ভিড়ে পড়ল। কয়েক বছর কাটল নানা তীর্থে ও দেশ-দেশান্তরে। উত্তর ভারতে তখন যোগিনী কৌলসিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথের খুব নামডাক। নবীন যুবক সংকল্প করল সেই মহাসাধকের আশ্রয় গ্রহণ করবে। শিব-চতুর্দশীর পুণ্যদিনে পশুপতিনাথ দর্শন করার পরই মৎস্যেন্দ্রনাথেরও দর্শন পাওয়া গেল। সিদ্ধ হল তার মনস্কামনা।

দীক্ষার পর গুরু নতুন শিষ্যের নামকরণ করলেন—গোরক্ষনাথ। এই নামই পরে গোরখনাথ বলে পরিচিত হল।

মৎস্যেন্দ্রনাথ শিষ্যকে ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক, নৌলিক ও কপালভাতি এই ষট্‌কর্ম সাধন শিক্ষা দিলেন। এতে সাধকের দেহে প্রকাশ পায় নানা ধরনের শক্তি। জরা মরণ তাঁর আয়ত্ত হয়। এর পর আরও দশটি মুদ্রা গুরু তাঁকে সযত্নে শেখালেন।

গোরখনাথ গুরুর সঙ্গে পর্যটনে বেরুলেন। কাশী, বৃন্দাবন, কেদার-বদরী প্রভৃতি দেখার পর রামেশ্বর, ত্র্যম্বক, পুষ্কর, দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থদর্শনও শেষ হল। এবার বাকি রইল হিংলাজ। নাথ যোগীদের কাছে হিংলাজ তীর্থের গুরুত্ব অনেক বেশি। কিন্তু যেমন দুর্গম সেই তীর্থের পথ, তেমনি বিপদসংকুল। বহু কষ্ট সহ্য করে গোরখনাথ গুরুসহ মকরাণ উপকূলে মরুপ্রান্তরে সেই তীর্থে গিয়ে পৌঁছলেন। মহাশক্তির জাগ্রত বিগ্রহ হিংগুলা দেবীর দর্শন ও পূজা হোম করে তাঁর মন আনন্দে ভরে গেল।

গুরুদেবের নির্দেশ অনুযায়ী গোরখনাথ মন্দিরে ঢুকে ধ্যানস্থ হলেন। শেষ রাত্রে চিন্ময়ী মূর্তিতে দর্শন দিলেন দেবী হিংগুলা। বর দিলেন—"বৎস, তোমার ত্যাগ বৈরাগ্য ও সাধননিষ্ঠায় আমি প্রীত হয়েছি। আশীর্বাদ করি, তুমি আজ থেকে অষ্ট সিদ্ধির অধিকারী হবে। তুমি মহাতীর্থ অমরনাথে গিয়ে

বিগ্রহীভূত পরম শিবকে স্পর্শ করে ধন্য হও।"

পদব্রজে পথ চলতে চলতে গুরু ও শিষ্য উভয়ে এসে উপস্থিত হলেন কাশ্মীরের অমরনাথে। দেবাদিদেবের অত্যাশ্চর্য প্রতীক তুষারলিঙ্গ দর্শন ও স্পর্শন করে ধন্য হলেন।

এর পর বিচ্ছেদের পালা। গুরুদেব বললেন—"তুমি নিজের পথে অগ্রসর হও।" অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে গোরখনাথ একা পথ চলতে লাগলেন। খ্যাত অখ্যাত বহু তীর্থ ও সিদ্ধপীঠ দর্শন করবার পর হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে এক নিবিড় বনে মানস সরোবরের তীরে এসে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন অলক্ষ্যে গুরুর কণ্ঠস্বর—"বৎস, এইটিই তোমার নির্দিষ্ট সাধনস্থল। এখানেই সাধনভজন কর।"

এই সরোবরের তীরে বারো বছর কঠোর সাধনের পর গোরখনাথ দেবাদিদেব মহাদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন। মহাদেব বলেন—"বৎস গোরখনাথ, আমি বর দিলুম, কায়াসিদ্ধি ও নাথত্ব তুমি অর্জন কর।"

যোগিবর গোরখনাথের একাগ্র সাধনার খ্যাতি অল্পকালের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাঁর সাধনপীঠে ধীরে ধীরে জড়ো হতে থাকে মুক্তিকামী নরনারী ও যোগী সন্ন্যাসীর দল। ক্রমে ক্রমে এই অঞ্চলটি সিদ্ধসাধক গোরখনাথের নামানুসারে গোরখপুর নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

পূর্বভারত পর্যটন করার সময় গোরখনাথ এলেন ত্রিপুরা রাজ্যে। ত্রিপুরারাজ তিলকচন্দ্র তাঁকে মহাসমাদরে প্রাসাদে নিয়ে এলেন। কিশোরী রাজকন্যা শিশুমতীকে দেখে গোরখনাথ চমকে গেলেন। এ তো সামান্য মেয়ে নয়—সিদ্ধা যোগিনীর লক্ষণ রয়েছে এর দেহে। মহাযোগীর প্রবল ইচ্ছায় শিশুমতীর দীক্ষা সম্পন্ন হল। তার নতুন নামকরণ হল—ময়নামতী। অল্পকাল মধ্যে কিশোরী ময়নামতী যোগসাধনায় পারদর্শিনী হয়ে উঠলেন। তাঁর বিবাহ হয় বঙ্গালরাজ মানিকচন্দ্রের সঙ্গে। এঁদেরই পুত্র গোপীচাঁদ—যিনি রাজপুত্র হয়েও মাত্র আঠার বছর বয়সে রাজ্য-সুখসম্পদ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন।

গোরখনাথ শুধু ভারতের অন্যতম সিদ্ধাচার্য ও শৈবযোগী বলেই পরিচিত নন, এদেশের সাধক ও সাধারণ ভক্ত নরনারীর দৃষ্টিতে তিনি এক আরাধ্য দেবতারূপে অধিষ্ঠিত। শিবের অবতাররূপে তিনি বহু স্থানে পূজিত হয়ে থাকেন। তবে কানফাটা নাথযোগীদের মঠ মন্দিরেই তাঁর বিগ্রহ বিশেষ ভক্তি-সহকারে অর্চিত হয়।

গোরখনাথ যে ধর্মসংস্কার করেন তার বৈশিষ্ট্য—এতে জাতি বা বর্ণের বিচার নেই। ইষ্টদেব শিবের উপাসনা সবাই অবাধে করতে পারে। অবধূত ও নাথ হওয়ার যোগ্যতা এবং জীবন্মুক্ত হওয়ার অধিকার যে-কোন সাধকেরই রয়েছে।

মহাযোগী গোরখনাথের মূল্যবান উপদেশ সকলের পক্ষেই অনুসরণযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "শুধু মুণ্ডন হয়, জটাভার মাথায় নিয়ে ভিক্ষা করে বেড়ালেই কি যোগ হয়? বুকের মাঝে জ্বালিয়ে নাও বিশ্বাসের জ্বলন্ত আগুন, আর এই আগুনই তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে কৃচ্ছ্রসাধনের পথে, ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথে। দেহমনের চরম নির্যাতন ও লাঞ্ছনা হাসিমুখে সইতে হবে, মরণকে শিব সমান মনে করতে হবে, তবেই ঘটবে প্রকৃত যোগপ্রাপ্তি। সাধকের মনের সংকল্প ও ইচ্ছার বিলয় আর মনের বিয়োগ হলেই পরমশিবের সঙ্গে যোগস্থাপন ঘটবে। এই ভগবৎ সম্পদ, দেহটিকে বাজাও একতারার মতন, তাতে ফুটিয়ে তোল [illegible] এক অনাহত সুর। সাধকের সমগ্র জীবন ও সমগ্র সত্তাকে [illegible] দেখো, [illegible] এই [illegible] দেহের সাধনার মাধ্যমেই সম্ভব [illegible] আবির্ভাব।"

পণ্ডিতদের এক অধ্যায় [illegible] পূর্ব-ভারতের [illegible] গোরখনাথের আবির্ভাব। [illegible] ও গঙ্গাসাগরে তাঁর শিষ্য গ্রহণ, [illegible] নানা কাহিনী শোনা যায়। সেই সব শিষ্যদের অধিষ্ঠানকাল [illegible] থেকে একাদশ শতক। তাই গোরখনাথকেও সেই কালের লোক বলে অনায়াসে গণ্য করা যায়।

রামানুজ



দাক্ষিণাত্যের পার্থসারথির মন্দিরে এসেছেন শ্রীপেরেম্বুদুরের নামজাদা পণ্ডিত কেশবাচার্য। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী কান্তিমতীও আছেন। ঈশ্বরের কাছে তাঁরা প্রার্থনা জানালেন "একটি সন্তান দাও প্রভু! সন্তানের অভাবে আমাদের সংসার নিরানন্দময়।"

ভগবান্ পার্থসারথির কাছে তাঁদের প্রার্থনা বিফল হল না। ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে কেশবাচার্যের ঘর আলো করে এক দিব্যকান্তি শিশুর জন্ম হল। এই শিশুই পরবর্তী কালের ভুবনবিখ্যাত পুরুষ আচার্য রামানুজ।

ছোটবেলা থেকেই রামানুজ বিষ্ণুভক্ত। শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে অনুরাগ তার প্রবল। পিতার নিকট বহুদিন সে শাস্ত্র পাঠ করে। এক সন্ধ্যায় সে একজন সাধুকে আমন্ত্রণ করে বাড়িতে নিয়ে এল—অতিথি-সৎকার করবে বলে। বালকের দিব্যকান্তি চেহারা দেখে সাধু তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। রামানুজ জানাল, সে সাধুর পদসেবা করতে চায়। সাধু বললেন, তিনি শূদ্র ব্রাহ্মণসন্তানের হাতে পদসেবা কী করে নেবেন? রামানুজ উত্তর দিল—"পৈতে নিলেই কি ব্রাহ্মণ হয়? বিষ্ণুকে যে ভক্তি করে সে-ই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।" বালকের মুখে এই উক্তি শুনে সাধুপুরুষটি মুগ্ধ হলেন। ইনি সাধকপ্রবর কাঞ্চীপূর্ণ। তাঁর শুধু এক রাত্রি, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করে রামানুজের জীবন ধন্য হয়ে গেল।

পিতার মৃত্যুর পর রামানুজ কাঞ্চীর বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী আচার্য যাদবপ্রকাশের কাছে গেলেন শাস্ত্র বিষয়ে আরও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য। কিছুকালের মধ্যেই বোঝা গেল রামানুজ শুধু মেধাবীই নন—শাস্ত্রেও তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে। একদিন ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা নিয়ে গোল বাধল। তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী—এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা করলেন যাদবপ্রকাশ—সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষের স্বর্ণবর্ণ চোখদুটি যেন বানরের (কপি) গুহ্যদ্বারের ন্যায় রক্তবর্ণের যে পদ্ম তারই মত। ঈশ্বরের নয়নকমলের উপমা বানরের গুহ্যদ্বারের রঙের সঙ্গে! এরকম ব্যাখ্যা শুনে রামানুজের অন্তর ব্যথিত হল। তিনি সবিনয়ে গুরুর নিকট ঐ মন্ত্রাংশের অন্য ব্যাখ্যা দিলেন—কপ্যাস শব্দের কং পদের অর্থ জল। পিবতি অর্থ—যে পান বা আকর্ষণ করে, অর্থাৎ সূর্য। আস্ শব্দের অর্থ—বিকশিত। তা হলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় সূর্যের দ্বারা যা বিকশিত হয়, অর্থাৎ পদ্ম। সুতরাং সমগ্র মন্ত্রটির মানে হল—সেই সূর্য-মণ্ডলস্থ পুরুষের নয়নদ্বয় সূর্যবিকশিত পদ্মের ন্যায়। শিষ্যের অসামান্য মেধা দেখে গুরু যেমন চমৎকৃত হলেন, তেমনি ঈর্ষান্বিতও হলেন। পাছে যাদবপ্রকাশের খ্যাতি ম্লান হয়ে যায় সেই আশঙ্কায় তিনি রামানুজকে তাঁর আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়,

তাঁকে গোপনে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করলেন। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হল।

রামানুজের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা শ্রীরঙ্গমের প্রসিদ্ধ ভক্তসাধক শ্রীরঙ্গনাথের পূজারী যামুনাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ। যামুনাচার্য রামানুজকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন এই তরুণ সাধক ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যামুনাচার্যের যখন জীবনের শেষ অবস্থা তখন তিনি রামানুজকে শ্রীরঙ্গমে আসার জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু রামানুজ যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছেন তখন তিনি দেহরক্ষা করেছেন। রামানুজ তখন যামুনাচার্যের মরদেহের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর আরব্ধ কাজ সার্থক করবার ব্রত গ্রহণ করেন, প্রতিজ্ঞা করেন—"বৈষ্ণবধর্মে দৃঢ়নিষ্ঠ থেকে অজ্ঞানমোহিত জনগণকে আমি সংস্কারমুক্ত করব।"

রামানুজ এরপর বেদান্তভাষ্য, গীতাভাষ্য প্রভৃতি রচনার দিকে মন দেন। শঙ্করাচার্যের মতবাদ খণ্ডন করে তিনি অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। ক্রমে ক্রমে বহু লোক তাঁর অনুগামী ভক্ত হয়।

সেই সময়ে ত্রিশিরাপল্লীর রাজা রামানুজের কার্যকলাপে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হন। এই নবীন সাধক মানুষকে উত্তেজিত করে তাদের পূর্বের ধর্মমত পাল্টে দিচ্ছেন, এই ধারণা রাজার মনে বদ্ধমূল হয়। তিনি রামানুজকে হত্যা করবার জন্য লোক নিযুক্ত করেন। রামানুজ তখন আত্মরক্ষার্থে মহীশূরের অন্তর্গত মেলকোটে চলে যান। সেখানকার অধিপতি বল্লালরাজ ছিলেন জৈনধর্মাবলম্বী পরম সাধুভক্ত। এখানে দৈব রামানুজের সহায় হল।

সেই সময়ে বল্লালরাজের মেয়ের উপর ব্রহ্মদৈত্য ভর করে। রাজকন্যা ঘর ছেড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। দেশ-দেশান্তর থেকে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, গুণী প্রভৃতি এসে নানারকম প্রক্রিয়া ও দৈবকার্য করেও কেউই তাকে সুস্থ করতে পারেনি। রাজা অবশেষে কন্যার আশা পরিত্যাগ করেন। রামানুজ এই সংবাদ শুনে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন—"আমি আপনার কন্যাকে একবার দেখতে চাই।"

রাজকন্যাকে তাঁর সামনে আনা হল। রামানুজ কন্যার দিকে তাকিয়ে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। কী আশ্চর্য! কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রহ্মদৈত্য রাজকন্যার শরীর ছেড়ে চলে গেল এবং ধীরে ধীরে কন্যা সুস্থ হয়ে উঠল।

বল্লালরাজ রামানুজের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর বল্লালরাজের নাম হল বিষ্ণুবর্ধন। এর ফলে জৈনধর্মাবলম্বীরা রাজার উপর ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। রাজা তখন নিরুপায় হয়ে রামানুজের শরণাপন্ন হলেন।

রামানুজ বললেন—"জৈনগুরু ও পণ্ডিতদের ডাকুন। তাঁরা যদি তর্কে আমাকে হারাতে পারেন তবেই আমি তাঁদের মতবাদ মেনে নেব।" অবিলম্বে জৈনগুরু ও পণ্ডিতদের ডাকা হল। আরম্ভ হল তর্কযুদ্ধ। একের পর এক সকলেই রামানুজের নিকট যুক্তিতে পরাস্ত হলেন। তখন অনেকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। কেউ কেউ নিজেদের অপমানিত বোধ করে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন।

শেষ জীবনে রামানুজ শ্রীরঙ্গমে বাস করেন। ভক্ত ও সন্ন্যাসীরা বিনা দ্বিধায় তাঁকে 'সমাধীশ' নিযুক্ত করেন। তাঁর উপরেই রঙ্গনাথদেবের সেবার ভার দেওয়া হয়। কথিত আছে, শ্রীরঙ্গনাথ রামানুজের প্রতি প্রসন্ন হয়ে স্বপ্নযোগে দুটি বিশেষ বিভূতির অধিকার দান করেন। একটি, মানুষের সন্তাপ নিবারণের ক্ষমতা; অপরটি, ভক্ত প্রতিপালনের উপযুক্ত ঐশীশক্তি। শক্তিমান মহাবৈষ্ণব রামানুজ এবার ভক্তি প্রেমের অবতাররূপে গণ্য হলেন। দেশবিদেশ থেকে বিষ্ণুভক্ত নরনারী দলে দলে এই মহাপুরুষের কৃপালাভের আশায় ছুটে আসতে থাকে। জনসাধারণ তাঁকে দেবাংশসম্ভূত বলে মনে করতে থাকে। বহু ভক্তের দৃষ্টিতে তিনি প্রতিভাত হন শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ, লক্ষ্মণের দ্বিতীয় অবতার রূপে।

১১৩৭ খ্রীঃ (১০৫৯ শকাব্দে) মাঘী শুক্লা দশমীতে এই মহাপুরুষ নির্বাণলাভ করেন।

জয়দেব



বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামের ভোজদেব ও বামাদেবী নামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর ছেলে জয়দেব। পিতা মৃত্যুর সময় বলে গেলেন "বাছা, তোমার জন্য তো কিছুই রেখে যেতে পারলাম না। নিজে কষ্ট করেও তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছি, সঙ্গীতে পারদর্শী করিয়েছি। আমার বিশ্বাস, সাহিত্যে আর সঙ্গীতে তুমি বিশ্বে অমর কীর্তি রেখে যেতে পারবে। তবে রাধাগোবিন্দের নাম কখনও তুমি ভুলে যেয়ো না।"

সন্ধ্যাবেলায় অজয়ের তীরে পিতার সৎকার করে জয়দেব ঘরে ফিরলেন। পিতৃশোকে তিনি কাতর। এমন সময় গ্রামের মাতব্বর নিরঞ্জন চাটুয্যে এসে হাজির হলেন। বললেন- "তোমার বাবা শেষসময়ে আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলেন। সুদে আসলে তা এখন বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। টাকাটা আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ হয়ে গেলে গ্রামের পাঁচজন বিশিষ্ট লোকের সামনে জয়দেব নিরঞ্জনের ঋণের খতে নিজের নাম লিখে দিলেন। পৈতৃক ভিটা ছেড়ে সেদিন থেকে তিনি হলেন আশ্রয়হীন। রওনা হলেন পুরীর পথে।

এক ব্রাহ্মণ-দম্পতি পুরীর মন্দিরে এসেছেন। জগন্নাথদেবের বরে তাঁদের এক কন্যা হয়েছে, সেই মেয়েকে মন্দিরে এনে দেবতার চরণে সঁপে দিতে তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই মেয়েটিকেও নিয়ে এসেছেন সঙ্গে।

কন্যা পদ্মাবতী সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণা। মন্দিরে বসে সে বীণা বাজিয়ে ঠাকুরকে গান শোনায়। জয়দেব মন্দিরে এসে পদ্মাবতীর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু অচিরেই কেন্দুবিল্বে ফিরে আসতে হল। জয়দেবকে প্রভু স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন--"আমার প্রেমলীলা বর্ণনা করে গ্রন্থ রচনা কর এবং কেন্দুবিল্ব গ্রামে ফিরে যাও।"

জয়দেব কেন্দুবিল্ব গ্রামে এসে 'গীতগোবিন্দ' রচনা করতে আরম্ভ করলেন। ওদিকে পদ্মাবতীর পিতা রাতে স্বপ্ন দেখলেন, প্রভু তাঁকে বলছেন, "পদ্মাবতীকে নিয়ে কেন্দুবিল্বে যাও, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাকে সমর্পণ কর।

জয়দেব প্রথমে এই বিবাহে সম্মত ছিলেন না; কিন্তু পদ্মাবতী তাঁকে জানালেন—পিতা তাঁরই হাতে কন্যাকে তুলে দিয়ে গেছেন, কাজেই তাঁকে ছাড়া আর কাউকে পদ্মাবতী পতিরূপে বরণ করতে পারবেন না।

এই ভাবেই পদ্মাবতী আর জয়দেবের মিলন হল। জয়দেব সংসার পেতে নতুন উৎসাহে গীতগোবিন্দ রচনায় মন দিলেন। ছন্দের পর ছন্দ মিলিয়ে রচনা করেন ভগবানের আদিষ্ট গ্রন্থ—রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী। কিন্তু লিখতে লিখতে এক জায়গায় এসে বড় মুশকিলে পড়লেন। ভাবের আবেগে তিনি লিখলেন, রাধা অভিমান করে বসে আছেন, কিছুতেই তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলবেন না। কিন্তু কৃষ্ণ নিজেই এলেন মান ভাঙাবার

জন্য। রাধার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলেন। জয়দেবের কবি-মন এ কথা লিখতে সায় দিল না।

স্মরগরল হি খন্ডনং, মম শিরসি মন্ডনম্...এই পর্যন্ত লিখেই হাত গুটালেন। পরদিন দুপুর পর্যন্তও ভাবতে ভাবতেই কাটিয়ে দিলেন। স্নান খাওয়ার সময় হল। পদ্মাবতী অনেক বলে কয়ে জয়দেবকে স্নান করবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য! কিছুক্ষণ পরই পদ্মাবতী দেখলেন, জয়দেব ফিরে এসেছেন। জয়দেব বললেন, "রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ নতুন পদের কথা মনে পড়ল, এখুনি না লিখে রাখলে হয়ত পরে ভুলে যাব।" লেখা শেষ করে জয়দেব বললেন, "আজ আর স্নান করব না, তুমি আমার খাবার নিয়ে এস।"

খাওয়া শেষ হলে বিশ্রাম করবার জন্য জয়দেব ঘরে ঢুকলেন। পদ্মাবতী আহারে বসেছেন, এমন সময় বাইরে তাকিয়ে দেখেন জয়দেব স্নান সেরে এসে দাঁড়িয়ে আছেন।

পদ্মাবতী এর রহস্য কিছুই বুঝতে পারলেন না। সব কথা শুনে জয়দেবও বিস্মিত হলেন। তাড়তাড়ি গেলেন নিজের পুঁথি দেখতে। দেখলেন তাতে নিজের লেখা পংক্তির নিচে লেখা রয়েছে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'। জয়দেবের আর বুঝতে বাকি রইল না যে স্বয়ং কৃষ্ণই নিজের হাতে তা লিখে গিয়েছেন। ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে জয়দেব বললেন, "পদ্মাবতী, তুমি অতি ভাগ্যবতী; তাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আজ সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছ, তাঁর প্রসাদ খাচ্ছ। আমিও আজ তোমার প্রসাদ পাব।" এই বলে জয়দেব তাঁর পত্নীর পাতের ভুক্তাবশেষ ভক্ষণ করে পরিতৃপ্ত হলেন।

প্রতিবছর মকর-সংক্রান্তিতে জয়দেব গঙ্গাস্নানে যেতেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গঙ্গাস্নানে যেতে পারলেন না বলে মন ভয়ানক খারাপ হয়ে পড়ল। সারারাত ধরে কেবল মা গঙ্গার চিন্তা করতে লাগলেন। মকর-সংক্রান্তিতে ভোরে উঠে দেখেন সমস্ত অজয় ভরে গিয়েছে গঙ্গার লাল জলে। জয়দেব বুঝতে পারলেন মা মকরবাহিনী গঙ্গা তাঁর কাতর ডাক শুনে ছুটে এসেছেন। আনন্দের আর সীমা রইল না। বহুক্ষণ ধরে অবগাহন করে তিনি পরিতুষ্ট হলেন।

জয়দেব ছিলেন গৌড়বঙ্গের সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের (১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত) সভাকবি। তুর্কী সেনাপতি বখ্তিয়ার খিলজী ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে অতর্কিতে আক্রমণ করেন লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নবদ্বীপ। লক্ষ্মণ সেন তখন বৃদ্ধ। তিনি সপরিবারে পূর্ববঙ্গে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জয়দেব গোস্বামীর রচনায় এই ম্লেচ্ছ আক্রমণের ঘটনা উল্লেখ করে তাই ম্লেচ্ছবাহিনী বিনাশের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা দেখিঃ

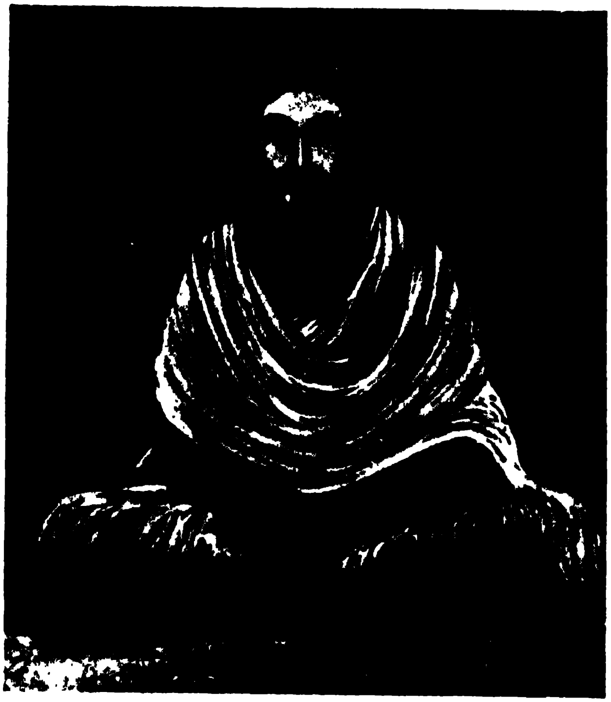
"ম্লেচ্ছনিবহ নিধনে কলয়সি করবালং।"

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র কবি জয়দেবের সাহিত্য-প্রতিভার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেনঃ 'জয়দেব রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। জয়দেবের গীত রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ। জয়দেব সুখ, জয়দেব বসন্ত। জয়দেবের কবিতা উৎফুল্ল-কমলজাল-শোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, জয়দেবের গান মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি।'

আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা এই কবির শেষ জীবনে কী ঘটেছিল তা জানতে পারি না। কেউ বলেন শেষজীবনে জয়দেব বৃন্দাবনে বাস করেন, কেউ বলেন কেঁদুলি গ্রামেই তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলেন।

যুগে যুগে মানুষ অমর গ্রন্থ 'গীতগোবিন্দ' পাঠ করে ধন্য হবে আর শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করবে ভক্তকবি জয়দেবকে।

জ্ঞানদেব



সুন্দর স্বাস্থ্যবান মারাঠী যুবক বিঠ্ঠলপন্ত। বিবাহের পরেই সংসারমায়া ত্যাগ করে কাশীধামে চলে গেলেন। সেখানে তিনি দীক্ষা পেলেন রামানন্দ স্বামীর কাছে। একদিন রামানন্দ স্বামী তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে দৈবযোগে বিঠ্ঠলপন্তের জন্মস্থান আনান্দি গ্রামে উপস্থিত হলেন। রামানন্দ স্বামী গ্রামে এসেছেন জানতে পেরে গ্রামের মানুষেরা তাঁকে দেখতে চলল। বিঠ্ঠলপন্তের পত্নী রখুমাবাঈও তাদের সঙ্গে চললেন।

রখুমাবাঈ রামানন্দ স্বামীকে প্রণাম করে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। স্বামিজী তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন -"তুমি সুসন্তানের জননী হও।"

এ কথা শুনে রমণী দুঃখে হেসে উঠলেন. রামানন্দ স্বামী জানতে পারলেন এই নারীর কোন সন্তান নেই; তাঁর স্বামী সন্তান হওয়ার আগেই সংসার ত্যাগ করেছেন। শুধু তাই নয় - আরও জানতে পারলেন যে, তাঁরই শিষ্য বিঠ্ঠলপন্ত এই নারীর স্বামী। তৎক্ষণাৎ রামানন্দ আদেশ দিলন—"বিঠ্ঠলপন্ত, সন্তান জন্মাবার আগে স্ত্রীর অনুমতি না নিয়ে সংসার ত্যাগ করা সঙ্গত নয়। যাও—আবার গার্হস্থ্যধর্ম পালন কর।"

গুরুর আদেশ পেয়ে শিষ্য পুনরায় সংসারে ফিরে এলেন। ক্রমে বিঠ্ঠলপন্তের তিনটি পুত্র-সন্তান এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করল। তিন পুত্রের নাম যথাক্রমে—নিবৃত্তিনাথ, জ্ঞানদেব ও সোপানদেব এবং কন্যার নাম মুক্তাবাঈ।

বিঠ্ঠলপন্তের দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞানদেব বা জ্ঞানেশ্বর। তাঁর জন্ম ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে। ভাই বোন সবাই ছোটবেলা থেকে জ্ঞান, উপাসনা ও যোগ-বিদ্যার যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। নিবৃত্তি-নাথ বাল্যকালে গৈবিনাথ (বা গহিনীনাথ) নামে এক সাধুর সঙ্গে পর্বতগুহায় যান এবং ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করেন। নিবৃত্তিনাথ এই ব্রহ্মবিদ্যা তাঁর দুই-ভাই ও বোন মুক্তাবাঈকে শেখালেন।

বিঠ্ঠলপন্ত সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেছিলেন, পুনরায় সংসারে প্রবেশ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয়েছিল। তার ফলে তাঁর পুত্রদের উপবীত ধারণের সময় খুব অসুবিধা দেখা দিল, গোলমালের সৃষ্টি হল। বিঠ্ঠলপন্ত তখন স্থানীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। পণ্ডিতেরা তাঁকে জানালেন, "এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করা।"

বিঠ্ঠলপন্ত সেই সিদ্ধান্তই মেনে নিলেন। তিনি প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে নশ্বর দেহ ত্যাগ করলেন।

জ্ঞানদেব সংকল্প করলেন তিনি উপবীত ধারণ করবেন। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে জানতে পারলেন যে—যদি কোন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী পুনরায় সংসারে প্রবেশ করেন, তা হলে তাঁর পুত্রেরা শাস্ত্রীয় বিধানমতে উপবীত ধারণ করতে পারেন না। জ্ঞানদেব তখন অলৌকিক ক্ষমতা দেখালেন। তা দেখে ব্রাহ্মণেরা ভাবতে লাগলেন- জ্ঞানদেব সাধারণ মানুষ নন—তিনি ভগবানের

প্রেরিত পুরুষ। তখন তাঁর উপবীত ধারণের ব্যাপারে কেউই বাধা দিলেন না। শোনা যায়, উপবীত গ্রহণের সময় জ্ঞানদেব পূর্বপুরুষদের আহ্বান করলে তাঁরা সশরীরে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

তার পর জ্ঞানদেব আনান্দি গ্রামে ফিরে এলেন। পুরাণ, বেদান্ত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্মানুষ্ঠানে তাঁর সময় কাটতে লাগল। রামায়ণ, ভগবদ্‌গীতা, যোগবাশিষ্ঠ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত জ্ঞানদেবের প্রিয় গ্রন্থ ছিল। ক্রমে তাঁর অনেক শিষ্য জুটল।

মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে (১২৯০ সালে) জ্ঞানেশ্বর গীতার টীকা লিখেছিলেন। এই গ্রন্থ 'জ্ঞানেশ্বরী' নামে প্রসিদ্ধ। ন'হাজার শ্লোক নিয়ে এই বিরাট গ্রন্থখানি রচিত। বাংলাভাষাতেও জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। গুরু নিবৃত্তিনাথের আদেশে তিনি রচনা করেন আর একখানি অমূল্য গ্রন্থ—'অমৃতানুভব'। ভক্তিরসে স্নিগ্ধ অনেকগুলি অভঙ্ পদও লিখেছিলেন জ্ঞানদেব।

প্রভু শ্রীবিঠোবার চৈতন্যময় রূপের বর্ণনা পাই জ্ঞানদেবের আর একটি অভঙ পদে: "আমি দেখেছি সেই মহালিঙ্গ যাঁর আধার হচ্ছে অসীম আকাশ, জলরেখা মহাসাগরে, শেষনাগের মত যা বহন করে আছে বিশ্বজগৎ; মেঘলোক থেকে এঁর ওপর বর্ষিত হচ্ছে বারিরাশি, আকাশের নক্ষত্ররাজি সেই পুষ্পদল যা দিয়ে হচ্ছে এঁর অর্চনা, ফলরূপে এঁর নিকট নিবেদিত হচ্ছে চন্দ্রমা, প্রদীপ্ত সূর্য করছে এঁর আরতি। এঁরই কাছে সাধকের ব্যক্তিসত্তাকে নিবেদন করতে হবে অর্ঘ্যরূপে। আমার হৃদয়াসনে আরাধ্যরূপে স্থাপন করেছি এই জ্যোতির্ময় মহালিঙ্গকে।"

জ্ঞানদেবের দার্শনিক মত একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে দীপ্তিমান। এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টিকে তিনি অদ্বিতীয় সত্তা থেকে আলাদা বলে মনে করতেন না। 'অমৃতানুভব' গ্রন্থে এই দার্শনিক তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা পাই: "ব্রহ্ম যদিও নিজে এই দৃশ্যমান জগতে হন রূপান্তরিত, নিজেকে করেন দর্শন ও উপভোগ—তবু তাঁর একত্ব বা অদ্বিতীয়ত্ব কখনও হয় না নষ্ট। এ যেন নিজেকে আয়নার ভেতরে দেখা—বাস্তব মুখমণ্ডলটি থাকে একেবারে অপরিবর্তিত। জল যেমন তরঙ্গ হয়ে আপনাকে নিয়ে খেলা করে তেমনি অদ্বিতীয় সত্তাও নিজের সঙ্গেই খেলা করছেন নিজেই এই জগৎরূপ ধারণ করে। আগুন যখন মাথায় শিখার মালা ধারণ করে সে কি তখন কোন পৃথক বস্তু হয়ে দাঁড়ায়? সূর্য যখন সৌর-করে থাকে পরিবেষ্টিত, তখন সূর্য আর সৌরকরে দ্বৈতসত্তা থাকে না কিছু। সহস্র দলে বিকশিত হয়ে উঠলেও কমলের একত্ব হয় না খণ্ডিত।"

জ্ঞানেশ্বরী ও অমৃতানুভব গ্রন্থ দুখানি জ্ঞানদেবকে মহারাষ্ট্রের ধর্মসাহিত্যের অঙ্গনে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

অসামান্য যোগবলের অধিকারী ছিলেন জ্ঞানদেব। এ সম্পর্কে অনেক গল্পও প্রচলিত আছে। একবার জ্ঞানদেব এক মুমূর্ষু বৃদ্ধের মাথায় করস্পর্শ করতেই তার দেহে নতুন করে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয়। আর একবার এক কুখ্যাত দস্যু জ্ঞানদেবের সংস্পর্শে এসে, তাঁরই চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে রূপান্তরিত হন পরম সাধক নামদেব নামে।

পঁচিশ বছর বয়সেই এই মহাসাধক চির সমাধি লাভ করেন।

তাঁর শ্মশানের ব্যবস্থাও হয়েছিল অদ্ভুত রকমে। তুলসী ও বেলপাতা দিয়ে একটি আসন তৈরি করা হয়, সেই আসনের উপর স্থাপন করা হয় তাঁর শব। এ শব ভূমিতে স্থাপন করেই তাঁর উপর মন্দির নির্মাণ করা হয়—দেহ দাহ করা হয় না।

কথিত আছে যে অদ্যাবধি জ্ঞানদেবের শব বর্তমান রয়েছে। মধ্যে মধ্যে তিনি নাকি তাঁর প্রিয়তম ভক্তদের সঙ্গে কথা বলে থাকেন।

জ্ঞানদেবের একজন অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন গোলাবরাও। গোলাবরাওকে জ্ঞানদেব সশরীরে দেখা দিয়েছিলেন। শুধু দেখাই দেননি, একজোড়া পাদুকাও গোলাবরাওকে দান করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত এই ভক্ত পরম শ্রদ্ধাভরে সেই পাদুকা পূজো করে গিয়েছেন।

এখনও নাগপুরে মারাঠীগণ এই পাদুকা পূজো করে থাকেন।

নামদেব



আম্বোধিয়ার দেবীমন্দিরের উদ্দেশে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল এক দস্যুসর্দার। হঠাৎ মন্দিরের কাছে সে থমকে দাঁড়াল। গাছের নিচে বসে কাঁদছে এক বিধবা রমণী -কোলে তার এক শিশুসন্তান।

দস্যুসর্দার ঘোড়া থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করল--"তোমার ছেলে এত কাঁদছে কেন? তোমার এত কান্নারই বা কারণ কী?"

বিধবা রমণী জবাব দিল--"একমাস আগে পোধনার জঙ্গলে চুরাশী জন সৈনিকের সাথে আমার স্বামীও এক ডাকাতদলের হাতে মারা যায়। সেই থেকে আমার কপাল ভাঙে। আত্মীয়স্বজনরা চক্রান্ত করে আমাকে স্বামীর ভিটা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। দুদিন ধরে ছেলেটির পেটে কোন দানাপানি পড়েনি, তাই সে কাঁদছে। ছেলের কষ্ট দেখে আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

দস্যুসর্দারের মুখ পান্ডুর হয়ে উঠল; হাত পা থরথর করে কাঁপতে লাগল। বুঝতে পারল তারই চালিত দস্যুদল এই হত্যাকাণ্ড করেছে। এই রমণীর চরম দুর্ভাগ্যের জন্য সে-ই দায়ী।

দস্যু ছুটে যায় আম্বোধিয়ার মন্দিরে। দেবীমূর্তির দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবে কিছুক্ষণ। তারপর দেয়ালের গায়ে ঝুলানো খড়্গ নিয়ে বসিয়ে দেয় নিজের গলায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। ছুটে আসে মন্দিরের পুরোহিত ও সেবকেরা। ক্ষত তেমন গভীর হয়নি--তাই লোকটি সে যাত্রা বেঁচে গেল।

অনুশোচনার আগুন জ্বলে ওঠে দস্যুর জীবনে। আম্বোধিয়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে পন্ধারপুরের পথে। কোথায় তুমি কলুষহারী প্রভু?...কাঁদতে কাঁদতে প্রভু বিঠ্ঠল দেবের চরণতলে গ্রহণ করে আশ্রয়। এই দস্যুই পরবর্তী কালে পরিচিত হয়ে ওঠেন ভক্তশ্রেষ্ঠ নামদেব রূপে।

সাধকপ্রবর জ্ঞানদেব ছিলেন মারাঠার ভক্তি-আন্দোলনের পথিকৃৎ, পন্ধারপুরের বিঠ্ঠল সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা। জ্ঞানদেবের অকালমৃত্যুর পর নামদেব হন দাক্ষিণাত্যের ভক্তিধর্মের উৎস, আর এই ধর্ম প্রায় চুয়ান্ন বছর তিনি প্রচার করে যান। পন্ধারপুরের বিঠ্ঠল সম্প্রদায়কে তিনি শক্তিশালী করে তোলেন।

১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের এক ক্ষুদ্র গ্রাম নরসিংহপুরে নামদেবের জন্ম হয়। পিতা দামাশেট ছিলেন একজন দরিদ্র দরজী; দেবদ্বিজে ভক্তিমান। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নামদেব হয়ে ওঠেন দস্যুসর্দার। আবার বিধাতার কী বিচিত্র লীলা। দস্যু রত্নাকর যেমন হয়েছিলেন বাল্মীকি, নরসিংহপুরের দস্যুও তেমনি রূপান্তরিত হলেন পরম বৈষ্ণবে।

তখনকার দিনে পন্ধারপুর ছিল মহারাষ্ট্রের দেওগিরি রাজ্যের অন্তর্গত। নামদেবের অভ্যুদয়কালে এই দেওগিরির রাষ্ট্রজীবনে দেখা দেয় বিষম দুর্যোগ। ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর এই রাজ্য আক্রমণ করেন। খিলজী বাহিনীর আক্রমণে সমগ্র দেওগিরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, রাজা রামদেব রাও বন্দী হন, সর্বত্র দেখা দেয়

হাহাকার। এই ঘটনার তিন বৎসরের মধ্যে দেওগিরি রাজ্য দিল্লীর সুলতানের করায়ত্ত হয়।

এই দুর্যোগের দিনে নামদেবের পুণ্য ভাগবত জীবন আর মধুর নামকীর্তন সাধারণ মানুষের জীবনে বুলিয়ে দেয় সান্ত্বনার প্রলেপ। মানুষের মনে সঞ্চারিত করে নতুন শক্তি ও উদ্দীপনা। মহারাষ্ট্রের পথেঘাটে গীত হতে থাকে তাঁর মধুর অভঙ্গ সঙ্গীত। নামদেব তাঁর রচিত একটি অভঙ্গে গেয়েছেন: 'জ্বলন্ত আগুনের লেলিহান শিখা বেষ্টন করেছিল পাণ্ডবদের পর্ণকুটির; নামরসের গুণে তাঁরা পেয়েছিলেন পরিত্রাণ। হনুমানকে দগ্ধ করা যায়নি আগুনে, কারণ সে নামগানে ছিল ডুবে। ভক্ত প্রহ্লাদ নামজপে ছিলেন মগ্ন, তাই অগ্নি পারেনি তাঁকে গ্রাস করতে। সীতার হৃদয়ে ছিল রঘুমণির স্মৃতি, তাই অগ্নি পারেনি তাঁকে স্পর্শ করতে। লঙ্কাদহনের দুর্ঘটনাতেও বিভীষণের প্রাসাদ পেল রক্ষা, কারণ তাঁর প্রেমের বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল ভগবানের নামের সাথে।' (অভঙ্গ ৫)

ভক্তদের জন্য পথনির্দেশ রয়েছে নামদেবের কয়েকটি অভঙ্গে। তার মধ্যে একটি: 'তোমার বৃত্তি বা কর্ম যা-ই হোক, প্রভুর দিকে লক্ষ্য রাখবে স্থির অচঞ্চল। দেখ না, বালক আকাশে ঘুড়ি ওড়ায়, কিন্তু হাতে ধরা থাকে শক্ত ডুরি। চোখ দুটো তার নিবদ্ধ ঘুড়ির দিকে, ব্যস্ততা নেই ডুরির জন্য। গুজরাটি কন্যাদের মাথায় সাজানো ঘড়ার ওপর ঘড়া, অনায়াস ভঙ্গিতে হাত দুলিয়ে চলেছে হেঁটে—কিন্তু মন রয়েছে ঘড়ার ওপর। ...তুমিও তেমনি কর্মের জালে জড়িয়ে থেকেও অনুধ্যান করতে পার প্রভুর চরণপদ্ম।' (অভঙ্গ ৮৫)

মারাঠী অভঙ্গ-রচয়িতাদের মধ্যে সাধক জ্ঞানদেবের পরেই ভক্ত নামদেবের প্রসিদ্ধি। তাঁর শিষ্যা জনাবাঈ একটি অভঙ্গে ভক্তিসাধনার মূল সূত্রটিকে ধরে রেখেছেন: 'ভক্তির পথ নয়কো মোটেই সহজ। একমুঠো প্রাণনাশী বিষ কিংবা এক তীক্ষ্ম তরবারির ঝকঝকে ফলা যেমন—তেমনি দুর্গম পথ দিয়ে তোমাকে ঢুকতে হবে ভক্তির আনন্দলোকে।'

গুরু নামদেবের অলৌকিক শক্তির কথা জনাবাঈ বলেছেন। একবার পন্ধারপুরে তুমুল বর্ষায় নদীর দুই কূল ছাপিয়ে ছুটে আসে বন্যা। সবাই শঙ্কিত, গোটা গ্রাম বুঝি ভেসে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে প্রভু বিঠোবাজীর মন্দির। এই সংকটসময়ে নামদেব এগিয়ে এসে শুরু করে দিলেন অবিরাম নামকীর্তন। গ্রামবাসীরা সবিস্ময়ে দেখল, পন্ধারপুরের কাছে এসে উগ্রমূর্তি বন্যা হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল, রক্ষা পেল পন্ধারপুর গ্রাম।

মঙ্গলভেদা গ্রামের রাজমিস্ত্রি চোখা জাতিতে অস্পৃশ্য হলেও নামদেবের শরণাগত। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের শেষে সন্ধ্যায় বিঠ্ঠলজীর মন্দিরে বসে কীর্তন গেয়ে ভক্তজনদের তৃপ্ত করত সে। একদিন দুর্ঘটনায় এক প্রাকারের নিচে চাপা পড়ে চোখা আর তার সহকর্মী মজুরেরা প্রাণ হারায়। পন্ধারপুরের ভক্তেরা চোখার দেহের পূতাস্থি স্থাপন করে মন্দির নির্মাণের বাসনা প্রকাশ করল। কিন্তু মৃতদেহগুলির এমন অবস্থা যে কার অস্থি কোনটা তা চেনার উপায় নেই। তখন নামদেব আশ্বস্ত করে বললেন, "গলিত মৃতদেহগুলির হাড়গুলো একটি একটি করে তুলে কানের কাছে ধর। যে হাড়টির মধ্যে শুনবে বিঠ্ঠলজীর নাম অহরহ বাজছে সেটিই জানবে নামসিদ্ধ চোখার অস্থি।" ভক্তেরা এইভাবেই বেছে নিয়েছিল ভক্ত চোখার পূতাস্থি।

দক্ষিণ ভারতের ভক্তিসাধনার ইতিহাসে দুই নামদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল। ফলে দর্জি নামদেব ও ব্রাহ্মণ নামদেব এই দুইজনের অভঙ্গ এক সঙ্গে মিশে গিয়েছে। তবে দুইজনের অভঙ্গ পৃথক করার একমাত্র চিহ্ন ব্রাহ্মণ নামদেবের রচনার শেষে রয়েছে 'বিষ্ণুদাসনামা' এই ভণিতা। এই ব্রাহ্মণবংশীয় নামদেব কিন্তু আমাদের আলোচ্য ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ নামদেবের দুশ বছর পরে আবির্ভূত হন।

১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের এক সন্ধ্যায় আশী বছর বয়সে, এই সাধক পুরুষ চিরনির্বাণ লাভ করেন।

রামানন্দ স্বামী



রামদত্ত কাশীর একটি টোলে থেকে পড়াশোনা করে। গুরুদেবের ভোরবেলাকার পূজার জন্য সে ফুল তুলতে গিয়েছে পাচগংগা মহল্লার প্রাচীর-ঘেরা বাগানে। আশ্রমের অধ্যক্ষের কাছে সে ধরা পড়ে গেল। জলদগম্ভীর কণ্ঠে আশ্রমাধ্যক্ষ প্রশ্ন করেনঃ "এ আশ্রমের ফুল তুমি চুরি করতে এসেছ?" নির্ভীক কণ্ঠে বালক উত্তর দেয়ঃ "চুরি! কী বলছেন আপনি? দেবপূজার জন্য এ কয়টি ফুল নিয়েছি—একে চুরি বলে?" অধ্যক্ষ আবার বলে ওঠেনঃ "বাঃ চমৎকার! চুরির সমর্থনে বেশ সাফাই গাইতে শিখেছ তো হে ছোকরা! দেখি, সামনে এগিয়ে এস!" আদেশ পালন করতেই বালক সবিস্ময়ে দেখে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন অধ্যক্ষ স্বামী রাঘবানন্দ- রামানুজ সম্প্রদায়ের অগ্রণী আচার্য! কিন্তু রামদত্তের দিকে তাকিয়ে রাঘবানন্দ চমকে উঠলেন—বালকের আয়ু মাত্র আর সামান্য কয়েকদিন।

রাঘবানন্দ বললেন—"তুমি এখনি গিয়ে তোমার আচার্যকে সংবাদ দাও, তিনি যেন আজই আমার সংগে দেখা করেন।"

শিক্ষাগুরু সংবাদ পেয়ে রামদত্তকে সংগে নিয়ে রাঘবানন্দজীর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। বালকের স্বল্প আয়ুর কথা তিনি আগেই জানতেন। কাজেই রামদত্তকে সংপে দিয়ে গেলেন রাঘবানন্দ স্বামীর হাতে। পরদিনই এক শুভলগ্নে দীক্ষা সম্পন্ন হয়ে গেল। গুরু রামদত্তের নূতন নাম দিলেন রামানন্দ স্বামী।

কয়েকদিনের মধ্যে রামানন্দের জীবনে সেই নির্ধারিত মৃত্যুলগ্ন ঘনিয়ে আসে। কিন্তু গুরু তাঁর অসামান্য যোগশক্তির বলে সেই মৃত্যুকে প্রতিহত করেন।

প্রয়াগের কাছে, মালকোটে ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম পুণ্যসদন ও মাতার নাম সুশীলা দেবী। শৈশবেই তাঁর তীক্ষ্ন মেধা ও প্রতিভা গ্রামের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাদেরই পরামর্শে পুণ্যসদন তাঁর পুত্রকে কাশীতে পাঠিয়ে দেন শাস্ত্রচর্চা ও বিদ্যাভ্যাসের উদ্দেশ্যে।

গুরু রাঘবানন্দের কৃপা লাভ করে রামানন্দ একান্ত নিষ্ঠায় দিনের পর দিন আত্মিক সাধনার দুরূহ পথে অগ্রসর হতে থাকেন। তারপর গুরুর আজ্ঞাতেই বেরিয়ে পড়েন তীর্থ পর্যটনে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, গুজরাট থেকে গঙ্গাসাগর তিনি এই সময়ে পরিভ্রমণ করেন। গঙ্গানদীর মোহনায় গঙ্গাসাগর তীর্থে পৌঁছে রামানন্দ দিব্যভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়েন। এই ভাবাবেশের মধ্যেই সেখানকার সাগর উপকূলে তিনি আবিষ্কার করেন কপিলমুনির প্রাচীন 'সাধনপীঠ। স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় অচিরে সেখানে এক ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর কালে সেই পুণ্যময় স্থানই হয়ে ওঠে লক্ষ লক্ষ ভক্তের তীর্থস্থান।

রামানন্দের নির্দেশিত সাধনার অন্যতম অঙ্গ

শ্রীভগবানের নাম-জপ। তিনি বলতেন "ভগবানের নামমন্ত্র নিরন্তর জপ কর, তাতেই ঘটবে পরম মুক্তি, সিদ্ধ হবে সর্ব অভীষ্ট।" সমাজ ও ধর্মাচরণের অনাবশ্যক আচার নিয়ম থেকে তাঁর শিষ্যেরা মুক্ত, তাই তাঁরা সাধুসমাজে অভিহিত হতেন 'অবধূত' বা সর্বপাশমুক্ত সাধকরূপে।

রামানন্দের সাধনা ও দার্শনিক তত্ত্বের মূল কথা — ভগবংপ্রেম। পুরুষ বা নারী, ব্রাহ্মণ বা অন্ত্যজ, যে কোন ধরনের ভক্তই হোক না কেন, ভগবানের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। রামানন্দী সম্প্রদায়ে তাই তাদের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবৈষ্ণবদের মত রামানন্দ শুধু ব্রাহ্মণদেরই আচার্যের পদে নিয়োজিত করেননি, অব্রাহ্মণদেরও তিনি সাদর আহ্বান জানান প্রেমভক্তি ধর্মের প্রচারে। তিনি বলেন হরিকে যে করবে ভজন, সে-ই হবে হরির আত্মজন।

রামানন্দের উপাস্য ও ইষ্টদেব বিষ্ণুর অবতার - রামচন্দ্র। এই পরম পুরুষই রামাওয়ং পন্থীদের সাধনার ধন। এখনও রামাওয়ং সম্প্রদায়ে প্রচলিত প্রথার অনুসরণে উত্তর ভারতের জনসাধারণ 'রামরাম' 'জয়রাম' বা 'সীয়া রাম' বলে পরস্পরকে অভিবাদন জানায়, সৌজন্য প্রকাশ করে।

আচার্য-জীবন শুরু হওয়ার পর রামানন্দের শিষ্য-সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। ব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্য, বিদ্বান্ ও নিরক্ষর, নারী ও পুরুষ সকল শ্রেণীর মানুষই একে একে আসতে থাকে। পদ্মাবতী ও সুরেশ্বরী নামে তাঁর দুজন নারী-শিষ্যা ছিলেন। পুরুষ শিষ্যদের মধ্যে কবীর ছিলেন মুসলমান জোলা বংশীয়। ধনানন্দ জাতিতে জাঠ, রুইদাস চর্মকার এবং সেবানন্দ ছিলেন ক্ষৌরকার।

রামানন্দ স্বামীর আর এক শিষ্য গাংড়োনের রাজপুতবংশীয় রাজা পিপাজী। রাজকার্য ও বিলাস-ব্যসন নিয়ে তাঁর সময় কাটলেও এক গভীর অধ্যাত্মরসে ভরে থাকে তাঁর অন্তর। একদিন কুলদেবীর প্রত্যাদেশ পেলেন কাশীধামে রামানন্দ স্বামীর নিকট গিয়ে দীক্ষা-গ্রহণের। রামানন্দ পিপাজীকে দীক্ষা দিতে রাজি হলেন না - পিপাজী শাক্তবংশীয়, যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, ভক্তির রাজ্যে তাঁর মন স্থির থাকবে কেন? পিপাজী জানালেন, গুরুর আদেশে তিনি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। গুরু একটি সুগভীর কূপ দেখিয়ে পিপাজীকে নির্দেশ দিলেন তাতে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে। এতটুকু দ্বিধা না করে পিপাজী ছুটে গেলেন কুয়োর কাছে। ঠিক ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তে রামানন্দ স্বামীর ইঙ্গিতে শিষ্যেরা ধরে ফেলল পিপাজীকে। প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল গুরুর মুখমণ্ডল। তিনি পিপাজীকে দীক্ষা দিতে সম্মত হলেন। তার আগে এক বৎসর তাঁর আশ্রমে বাস করে পিপাজীকে কঠোর তপস্যা পালনের নির্দেশ দিলেন। পিপাজীর নতুন নামকরণ হল পিপানন্দ। তিনি ও তাঁর রানী সমস্ত ভোগৈশ্বর্য ত্যাগ করে আশ্রমবাসের জন্য চলে গেলেন।

বেদান্ত ও শৈবধর্মের মহান পীঠ বারাণসীতে রামানন্দ স্বামী বহু বৎসর অবস্থান করেন। ভারতের দিগ্‌দিগন্ত থেকে অগণিত ভক্তসাধক জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করার জন্য তাঁর কাছে সমাগত হতেন।

রামানন্দ ছিলেন অসাধারণ শাস্ত্রবিদ্। শাস্ত্র-সাগর মন্থন করে তিনি বহু জ্ঞানপিপাসুর জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করতে সমর্থ হন। নানকপন্থীদের গ্রন্থসাহিবেও রামানন্দের রচিত গাথা সন্নিবিষ্ট রয়েছে।

আচার্য রামানন্দ রচিত একটি গাথা:

হে আমার সদ্‌গুরু, হে চিদানন্দময়,
নিজেকে করেছি নিবেদন তোমারি হউক জয়!
সব দ্বিধা সংশয়ের ঘটেছে নিরসন
পরম সত্য উপলব্ধি করেছে আমার মন।
সারা বিশ্বের অণুতে এবং পরমাণুতে
ওতঃপ্রোত রয়েছেন তিনি সকল বিশ্বভূতে।
এ সত্য উদ্‌ভাসিত আমার প্রাণের মূলে
লক্ষ পাপের কালিমা গিয়েছে সরে দূরে।।

(গ্রন্থসাহিব)

যোগসিদ্ধির ফলে রামানন্দ তাঁর জীবনের শতাধিক বর্ষ অতিক্রম করতে সমর্থ হন। ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে ১১১ বৎসর বয়সে তাঁর মরলীলার অবসান ঘটে।

রুইদাস



রুইদাস ছিলেন জাতিস্মর। তিনি জানতে পেরেছিলেন পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ—গুরুর অভিশাপে এ জন্মে চামারের ঘরে জন্ম নিয়েছেন। তাই একদিন তাঁর বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আমার উপনয়নের ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন? উপনয়ন ছাড়া বেদাধ্যয়ন, মন্ত্রদীক্ষা সবই বাকি থেকে যাবে। মৃত্যুর পরপারে গতি হবে না।"

ছেলের মুখে এ সমস্ত কথা শুনে রুইদাসের বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"এসব কথা তুমি জানলে কী করে?" রুইদাস তখন উপনয়ন-সংস্কার সম্বন্ধে মহর্ষি ব্যাসদেবের লেখা কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করে শোনালেন।

এর পর তাঁর বাবা ছেলেকে সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন রামানন্দ স্বামীর আশ্রমে। সব কিছু শুনে রামানন্দ রুইদাসকে রামনামে দীক্ষা দিলেন। এর পরই উপবীত ধারণ করবার বায়না রুইদাসের মন থেকে দূর হল।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্‌ভক্তি যেমন বাড়তে লাগল তেমনি মনে বৈরাগ্যভাব এল। এতে ভয় পেয়ে বাবা মা ছেলের বিবাহ দিলেন। রুইদাস বাবার কাছে চামড়ার কাজ শিখেছিলেন। ঘরে বসে তিনি জুতো তৈরি করতেন আর প্রভু রামচন্দ্রের ভজন গান গাইতেন।

রুইদাসের বাবার মৃত্যুর পর সংসারে অভাব অনটন দেখা দিল। তার উপর সমগ্র বারাণসীতে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। রুইদাসের কারবারে মন্দা পড়ল। লোকের অন্ন জোটে না, জুতো পরবে কিভাবে? অন্নপূর্ণার ভূমিতেও আজ অন্নাভাব। রুইদাসও অন্নসংস্থানে বিব্রত হয়ে পড়লেন।

একদিন এক বণিক্ এসে রুইদাসকে একটি ছোট পাথর দিয়ে বললেন—"এটি পরশপাথর, আমার পূর্ব-পুরুষের সঞ্চিত এই পাথরটি আপনাকে দয়া করে নিতে হবে। কারণ একজন হরিভক্তকে এটি দান করবার আজ্ঞা দিয়ে গেছেন আমার পূর্বপুরুষ।"

রুইদাস কিছুতেই পরশপাথর নিতে রাজী হলেন না। কিন্তু বণিক্‌ও নাছোড়বান্দা। তখন রুইদাস বললেন—"তা হলে আপনি নিজ হাতে ঐ পাথরটি আমার কুটীরের চালের বাতায় গুঁজে রেখে যান।"

এক বৎসর পরে বণিক্ আবার এসে দেখেন—রুইদাস তেমনি বসে জুতো সেলাই করছেন আর রামনাম করছেন। সেই পরশপাথরখানি তেমনই চালের বাতায় গোঁজা রয়েছে। তখন সবার অলক্ষ্যে দুই ঘড়া মোহর বাড়ির উঠানে রেখে বণিক্ চলে গেলেন। সেদিন রাত্রেই রুইদাস স্বপ্ন দেখলেন—স্বয়ং রামজী তাঁকে বলছেন "রুইদাস, তোমার দুয়ারে যে মোহর আছে সেই মোহর দিয়ে মন্দির তৈরি করে সেখানে আমাকে প্রতিষ্ঠা কর। আমি তোমার নিজের হাতে পূজা পেতে চাই।"

রুইদাস মন্দির নির্মাণ করলেন। নারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠিত হল। কাশীর ব্রাহ্মণমণ্ডলী এতে অসন্তুষ্ট হয়ে একদিন চড়াও হলেন সেই মন্দিরে। রুইদাসকে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন—"কোন্ অধিকারে তুমি নারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠা করেছ এবং কোন্ সাহসে নিজের হাতে ভোগ পূজা সমাধান করছ?"

রুইদাস স্বপ্নবৃত্তান্ত তাঁদের কাছে বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, "উপবীত ধারণ করেছেন বলে আপনারা ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমার দেহের ভিতরে সেই যজ্ঞোপবীত রয়েছে।" এ কথা শুনে সকলে রুইদাসকে উপহাস করতে লাগল। রুইদাস বললেন—"আমার গায়ের চামড়া কেটে দেখে নিন আমি সত্যি বলছি কি মিথ্যা বলছি।"

একজন ব্রাহ্মণ চামড়া-কাটা বাটালি দিয়ে সত্যিই রুইদাসের গায়ের চামড়া কাটতে লাগলেন। এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন গুরু রামানন্দ স্বামী। তিনি বললেন—"এই মন্দিরে ব্রাহ্মণের অধিকার তা সত্যি। রুইদাস চামড়া কাটে বলে চামার, কিন্তু আপনারাও তার গায়ের চামড়া কেটে চামার হয়েছেন। কাজেই এ মন্দিরে আপনাদেরও কোন অধিকার নেই।" ব্রাহ্মণরা তখন জব্দ হয়ে চলে গেলেন।

গুরু রামানন্দের প্রদত্ত মন্ত্র চর্মকার রুইদাসের জীবনে অভাবনীয় রূপান্তর ঘটিয়ে দিল। বৈরাগ্যের কঠোরতম সাধনায় তিনি ব্রতী হন, সেই সঙ্গে নিরন্তর চলে ইষ্টমন্ত্রের জপ, ইষ্টধ্যান। অন্ত্যজ এই সাধকের জীবনের যে পরম অমৃতপ্রাপ্তি ঘটে তা তিনি প্রেমভরে বিলিয়ে দেন ব্রাহ্মণ-শূদ্র, উচ্চ-নীচ আপামর সাধারণকে।

চিতোরের ঝালির রানী রুইদাসের কাছে দীক্ষা নেবার জন্য আসেন। তাঁর দীক্ষা নেবার পর চারদিকে আলোড়ন ওঠে, অনেকেই রানীকে পাগল বলে বিদ্রূপ করতে থাকেন। রানী তখন কাশীর ব্রাহ্মণদের আহ্বান করলেন। সকলে এসে উপস্থিত হলে রুইদাস শুরু করেন রামনাম। গণ্ডগোল বাধল পঙ্গতে বসতে গিয়ে। রুইদাস জাতিতে মুচি—তাঁর সঙ্গে পঙ্গতে বসতে ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব ভক্তরা রাজী হলেন না। ঝালির রানী সংকটে পড়লেন—নিমন্ত্রিত সাধুরা আহার না করলে অকল্যাণ হয়, এদিকে সাধক রুইদাসকেও যে রানী আমন্ত্রণ করে এনেছেন। দুদিক রক্ষা করার কোন উপায় রানী খুঁজে পেলেন না। রুইদাস বললেন —"রানী, তুমি কিছু ভেবো না। সাধুদের সবাইকে পঙ্গতে বসিয়ে দাও। তাঁরা ভোজন করলেই আমার তৃপ্তি হবে।" নির্দেশ মত সবাইকে ভোজনের পংক্তিতে বসিয়ে দেওয়া হল। তখন এক অলৌকিক দৃশ্য দেখা গেল। পূজা-বেদীর উপর জীবন্ত রাম শিশুমূর্তি ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর সেই মূর্তি রুইদাসের কোলে এসে বসলেন; পরমুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তখন কারও বুঝতে বাকি রইল না যে রুইদাস জাতিতে নীচ হলেও ব্রাহ্মণের চাইতে নিচু নন সাধক হিসাবে তিনি অনেক বড়।

ভক্তকবি নাভাদাসের মতে রুইদাসের ইষ্টদেবতাই সেদিন সেই চমকপ্রদ ঘটনার রূপকার। চর্মকার মহাসাধকের হৃদয়ের মধ্যে তাঁর সদা অধিষ্ঠান, তাই তিনিই তো প্রাণপ্রিয় ভক্তের মর্যাদাকে সর্বজনসমক্ষে এমন করে তুলে ধরবেন।

রুইদাস একশ কুড়ি বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তারপর ব্রহ্মপদে লীন হয়ে যান। 'রুইদাসী' বা 'রয়দাসী' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা রুইদাস। কেউ বলেন রয়দাস, কেউ বা বলেন রবিদাস।

কবীর



"কে রে তুই? তোর নাম কী?"

"আমি কবীরদাস। জাতে মুসলমান। জোলার ছেলে।"

"কেন এসেছিস আমার কাছে?"

"আপনার কাছে দীক্ষা নিতে চাই।"

কাশীর বিখ্যাত আচার্য রামানন্দ বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়ে যান। রামানুজ সম্প্রদায়ের গুরু তিনি, তাই ইতস্ততঃ করেন। কিন্তু কবীরদাস তাঁর চরণে প্রণাম করে বলে "প্রভু, আপনিই আমার গুরু।"

উত্তর ভারতের এই জোলা সম্প্রদায় একসময়ে ছিল হিন্দু নাথপন্থী যোগী। মাত্র দু'তিন পুরুষ আগে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে রামানন্দ উদার। তাই কবীরকে দীক্ষা দিলেন। সন্তুষ্ট হয়ে কবীরদাস ফিরে এলেন নিজের ঘরে। বৃদ্ধ পিতামাতা নুর আলী বা নিরু এবং নীমা যে তাঁরই প্রতীক্ষায় বসে আছেন। (অনেকের মতে, এঁরা কবীরের আসল পিতামাতা নন—এক সরোবরের পদ্মপাতের বুক থেকে কুড়িয়ে পেয়ে নিজেদের ঘরে এনে প্রতিপালন করেছিলেন তাঁকে।) কিন্তু ঘরে ফিরেও কবীর কাজে মন দিতে পারলেন না। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মন সংসারের প্রতি উদাসীন। সর্বদাই একটি কবিত্ব ভাব যেন তাঁর মনে লুকিয়ে আছে।

তাঁতঘরে গিয়ে কবীরের হাতের মাকু হাতেই থেকে যায়। কাজ এগোয় না। বৃদ্ধ পিতামাতা ভয় পান। সংসারের প্রতি মন নেই দেখে বাবা মা কবীরের বিবাহ দিলেন। যদি সুন্দরী বধূর আকর্ষণে সংসারের দিকে মতিগতি ফিরে আসে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ঘরে থেকেও কবীর হলেন সন্ন্যাসী। দিবানিশি নামগান আর দোঁহা ও ভজনগান করে তাঁর দিন কাটে। কবীর জাতে জোলা বলে সবাই তাঁকে উপহাস করত। তার উত্তরে কবীর বলেছিলেন -

কবীর তেরে জাত্‌কো সব কোই হাসনহার।
বলিহারী ওয়া জাত্‌কো জো সিজয়ে সৃজনহার॥

ওরে কবীর, তোর জাতের জন্য সবাই তোকে ব্যঙ্গ করে। বলিহারী ঐ জাতের যে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে। কারণ ভগবান তো একজন মহাতাঁতী—

ধরণী আকাশ কী কার্‌গাহ্ বানায়ী।
চন্দ্র সূরজ দুই নাল চালায়ী॥

ধরণী ও আকাশকে কারখানা বানিয়ে তিনি চন্দ্র সূর্য দুই মাকু হরদম চালাচ্ছেন।

কবীর প্রতিদিন একখানা মাত্র কাপড় বুনতেন। সেখানা বেচে যা পয়সা পেতেন তা দিয়ে নিজের খাওয়া-পরা মিটিয়ে বাকি অর্থ দরিদ্রসেবায় দান করতেন।

আচার্য রামানন্দের শিষ্য হলেও রামানুজ সম্প্রদায়ে কবীর স্থান পাননি। কোন সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকবার মত লোকও তিনি ছিলেন না। গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে এক সহজসাধ্য ভক্তিবাদের প্রচার তিনি আরম্ভ করেন। কঠিন আচার-নীতির অনুষ্ঠানকে এড়িয়ে তিনি স্থাপন করেন এক উদার সর্বজনীন ধর্মমত যা শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চ এবং নীচ সম্প্রদায়ের সকলেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন।

অচিরেই সাধক কবীরের খ্যাতি উত্তর ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর অমৃতময় দোঁহা শুনবার জন্য জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বহু ভক্তের সমাবেশ ঘটতে লাগল।

রামমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার পর কবীরদাসের জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে। অন্তরের বন্ধ কপাট খুলে যায়। রামনাম রসে ডুবে তিনি ভাবুক সাধকে পরিণত হন।

ভারতের বাদশাহ তখন ইব্রাহিম লোদী। তাঁর কাছে অভিযোগ আসে—মুসলমান সাধক কবীর নিজের ধর্মকে অবহেলা করে এক সর্বজনীন ধর্মের প্রবর্তন করেছেন। কাবা, মসজিদ, মোল্লা কোন কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন না। তিনি বলেন—

জো খোদায় মসজিদমে বসতু হ্যায় আউর মুলুক কেহি কেরা?
তীরথ মুরত রামনিবাসী বাহর করে কো হেরা?

—যদি খোদা কেবল মসজিদেই বাস করেন তবে অন্য দেশগুলো কার? তীর্থ আর মূর্তির মধ্যেই কি শুধু আনন্দময় বাস করেন? তবে বাহিরটাকে দেখে কে?

বাদশাহ কিছুদিন পর জৌনপুরে এলেন। তখনই তাঁর দরবারে কবীরের ডাক পড়ল। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন—"কবীর, মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে তুমি ধর্মের কোন নিয়মই মেনে চলছ না। তুমি কি ধর্ম ত্যাগ করেছ?"

কবীর জবাব দিলেন—"জাঁহাপনা, আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই। আমার কাছে কোন জাতের বিচার নেই।"

একজন সভাসদ্ এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন—"কবীরদাস, তোমার দুঃসাহস সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। বাদশাহের সামনে একথা বলতে তোমার ভয় হচ্ছে না?"

কবির বললেন -

"কবীরা কাঁহাকো ডরে, শিরপর সৃজনহার।
হস্তী চঢ়ী ডরিয়ে নহী, কুতিয়া ভুখে হাজার॥"

অর্থাৎ, "কবীর কাউকে ভয় করে না, তার মাথার উপর রয়েছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। হাতিতে চড়ে যে যায়, কুকুরের ঘেউ ঘেউ রব তার কী করতে পারে?"

বাদশাহ বুঝলেন এই পরম সাধকের মনে আঘাত করা অন্যায়। তিনি সভাসদ্দের উত্তেজিত হতে নিষেধ করে কবীরকে সসম্মানে বিদায় দিলেন।

গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এই সাধকের আদর্শ তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি বটে কিন্তু সাধারণের মনে কবীর পেয়েছিলেন শ্রদ্ধার আসন। পরবর্তী কালে উত্তর ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সমাজের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূর করবার ব্যাপারে কবীরের মতবাদ যে অনেক সাহায্য করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কাশীতে বহুদিন থাকবার পর কবীর গোরক্ষপুর জেলার মগহরে যান। শত শত শিষ্য ও অনুরাগীর দল কবীরদাসের সংগী হয় এবং সেখানেই বাস করতে থাকেন। শত শত সাখী ও শব্দ রচনা করে কবীরদাস স্থাপন করেন এক অমর কীর্তি।

১৫১৮ খ্রিষ্টাব্দে এই মহান জীবনের হয় পরিসমাপ্তি। কবীরের দেহের সৎকার সম্বন্ধে এক চমৎকার কিংবদন্তী শোনা যায়। তাঁর ভক্তদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সংখ্যা ছিল অনেক। হিন্দুরা তাঁর দেহ পোড়াতে চান আর মুসলমানরা চান কবর দিতে। এ ব্যাপারে যখন দু দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধবার উপক্রম হয় তখন শোনা যায় এক দৈববাণী। তখন মৃতদেহের আচ্ছাদিত বস্ত্রটি খুলে দেখা যায় সেখানে কবীরের মৃতদেহ নেই, রয়েছে কতকগুলি ফুল। হিন্দুরা কিছু ফুল কাশীতে নিয়ে গিয়ে যথারীতি সৎকার করেন। মুসলমানরা বাকি ফুলগুলি মগহরে কবর দেন। কাশীর কবীরচৌরা এবং গোরক্ষপুরের মগহর আজও হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীর ভক্তদেরই পবিত্র তীর্থ।

মাধবেন্দ্রপুরী



গোবর্ধন পর্বত পরিক্রমা শেষ করে মাধবেন্দ্রপুরী গোবিন্দকুণ্ডের তীরে বসে আছেন। স্নান ও মধ্যাহ্ন-জপ শেষ। এবার ইষ্টদেবকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করবেন। গত তিনদিন কিছু খাননি। আজও ভিক্ষা কিছু জুটবে বলে মনে হয় না। কোথাও কোন জনমানব নেই।

মাধবেন্দ্র আহারের আশা ছেড়ে দিয়ে গাছের ছায়ায় শুয়ে রইলেন। এমন সময় একটি প্রিয়দর্শন বালক দুধের ভাণ্ড হাতে সেখানে এসে উপস্থিত হল। বলল —"এই দুধটুকু খেয়ে নাও।"

বালক চলে গেল। মাধবেন্দ্র ইষ্টদেবকে নিবেদন করে দুগ্ধপান করলেন। ক্রমে রাত্রি হল। পূজা কীর্তন ও জপ শেষ করে তিনি সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন। রাত্রি শেষে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখলেন দিব্য আলোকে সারা বন আলোকিত হয়ে উঠেছে, আর সেই আলোকের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে সেই গোপবালক। বালক বলল—"এই গ্রামের শেষ-প্রান্তে মাটির নিচে আমার শিলা বিগ্রহ। বিধর্মীর আক্রমণের সময় ভক্তরা ঐখানে লুকিয়ে রেখেছিল। তুমি তা উদ্ধার কর।"

বালকমূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। মাধবেন্দ্র-পুরী গ্রামের লোকজনকে ডেকে অলৌকিক স্বপ্নের কথা প্রচার করলেন।

তখন গোবর্ধনের চূড়ায় রাঙা মাণিকের মত সূর্যকিরণের প্রথম ঝলক ঝিকিমিকি করছে। সজলনেত্রে সন্ন্যাসী বৃন্দাবনের পল্লীতে ছুটে চললেন—সঙ্গে কোদাল ও শাবল হাতে গ্রামবাসীরা। তাঁরা বহুস্থান খুঁজে মাটি খুঁড়ে বের করল সেই সুন্দর গোপাল মূর্তি! মহা ধুমধামে উৎসব হল, গোপাল প্রতিষ্ঠিত হলেন মন্দিরে। বাঙালী পুরোহিত এনে সেই মূর্তি পূজার ব্যবস্থা করলেন মাধবেন্দ্রপুরী।

গোপালের সেবায় মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবন ব্রজমণ্ডলে প্রায় দু বছর কাটান। গোপাল একদিন স্বপ্নে মাধবেন্দ্রপুরীকে দেখা দিয়ে বললেন—"পুরী গোসাঁই! বহুকাল মাটির নিচে থাকায় আমার সারা দেহে দেখা দিয়েছে প্রবল জ্বালা। মলয়জ চন্দন না হলে দেহের এ জ্বালা জুড়াবে না। সে চন্দন পাবে তুমি নীলাচলে। দারুণ গ্রীষ্মে ভক্তরা জগন্নাথদেবকে সেই চন্দন মাখায়। তাই আমার চাই।"

বৃন্দাবন ধাম থেকে মাধবেন্দ্র তার পরদিনই গৌড় হয়ে পদব্রজে উড়িষ্যার দিকে যাত্রা করলেন। অনেক-দিন অক্লান্ত পদযাত্রার পর উপনীত হলেন নীলাচলে।

দিকে দিকে সংবাদ রটে গেল, ভক্তিসিন্ধু মহাপুরুষ মাধবেন্দ্র শ্রীক্ষেত্রে এসেছেন। ভক্তেরা দলে দলে ছুটে আসে, জগন্নাথের পাণ্ডা, রাজকর্মচারী সকলেই এসে ভিড় করে। মাধবেন্দ্র তাদের সাহায্যেই প্রচুর চন্দন কাঠ ও কয়েক ভাঁড় সুগন্ধি কর্পূর সংগ্রহ করেন। এর পর মাধবেন্দ্র বৃন্দাবনের পথে রওনা হন। কিছুদিন চলার

পর এসে পৌঁছান রেমুনায় শ্রীগোপীনাথের মন্দিরে। সেখানে কিছুদিন নামকীর্তন ও সেবাপূজায় রত থাকেন।

এমন সময় রাত্রিবেলায় মাধবেন্দ্র দেখেন এক অপূর্ব স্বপ্ন। গোপাল জ্যোতির্ময় মূর্তিতে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। গোপাল বললেন, "বৎস, তোমাকে আর দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াতে হবে না। তোমার আনা চন্দন কর্পূর আমার কাছে পৌঁছে গেছে।"

মাধবেন্দ্র অবাক্ হয়ে গেলেন। বৃন্দাবন যে এখনও বহু দূরে। প্রভুর একী রহস্যময় কথা! গোপাল আবার বললেন, "গোপীনাথের অঙ্গ আমার অঙ্গ একই। তুমি গোপীনাথের দেহে কর্পূর চন্দন রোজ লেপন করো, তবেই আমার দেহ শীতল হবে।"

মাধবেন্দ্র তাই করলেন। গ্রীষ্মকাল শেষ হলে তিনি চলে গেলেন নীলাচলে।

মাধবেন্দ্র কিছুকাল পরে বসলেন কঠোর তপস্যায়। ঝারিখণ্ডের গহন অরণ্যে দিনের পর দিন চলে তাঁর ধ্যান সাধন।

শ্রীহট্ট জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রাম পূর্নিপাটে এক ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরী। ব্যাকরণ, কাব্য ও ধর্মশাস্ত্র অতি অল্প বয়সেই তিনি আয়ত্ত করে ফেলেন। একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই তাঁর পত্নীর মৃত্যু হয়। এতে সংসারের প্রতি মাধবেন্দ্রের বৈরাগ্য আসে। কিছুকাল পর শিশু-পুত্রকে নিয়ে চলে আসেন কুলিয়া ও কুমারহট্টের মধ্যবর্তী বিষ্ণুপুর গ্রামে। এখানে এসে তিনি কুটির বাঁধেন এবং খুলে বসেন নতুন চতুষ্পাঠী।

কুমারহট্ট থেকে একদিন মাধবেন্দ্রের কাছে এসে উপস্থিত হন এক মেধাবী তরুণ। মাধবেন্দ্রের কাছে তিনি শাস্ত্রজ্ঞান ও দীক্ষা লাভ করে বিশেষ পণ্ডিত হন। উত্তরকালে তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন ঈশ্বরপুরী নামে। এই ঈশ্বরপুরীই গয়াধামে শ্রীচৈতন্যকে গোপালমন্ত্র দান করেন। কয়েক বৎসর পরে মাধবেন্দ্রপুরীর কাছে কমলাক্ষ নামে একটি ছাত্র আসেন শ্রীহট্টের নবগ্রাম থেকে। পরে এই কমলাক্ষ শ্রীচৈতন্যের লীলাপার্ষদরূপে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তিন প্রভুর এক প্রভু—শ্রীঅদ্বৈত-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

শেষ জীবনে গুরুসেবার ভার নেন ঈশ্বরপুরী। মাধবেন্দ্রপুরীর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অক্লান্তভাবে গুরুসেবা করেন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নীলাচলের পথে রেমুনায় অবস্থানকালে পুরী মহারাজের পুণ্যস্মৃতি বার বার স্মরণ করেন:

প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ বিচার।
পুরী সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর।
দুগ্ধদানচ্ছলে কৃষ্ণ যারে কৃপা কৈলা।
যার প্রেমে বশ হঞা প্রকট রহিলা।
সেবা অঙ্গীকার করি জগৎ তারিলা।
যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈলা।
কর্পূর চন্দন যার অঙ্গে চড়াইলা।

[চৈতন্যচরিতামৃত: মধ্যখণ্ড]

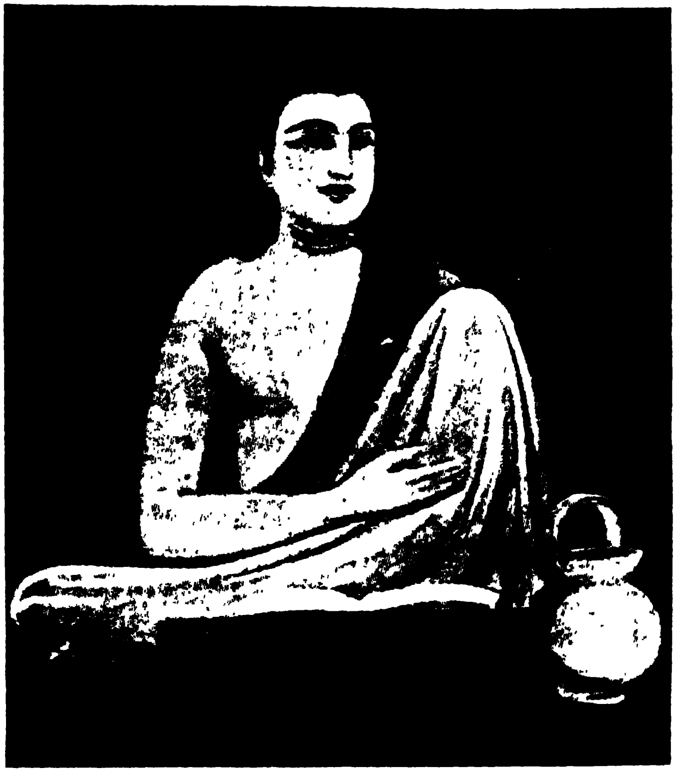
মহাপ্রয়াণের পূর্বদিন। শ্রীপাদ সেবক ভক্তকে নিকটে ডেকে সস্নেহে বললেন, "বৎস, আমি আশীর্বাদ করছি, প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেমে সিক্ত হয়ে তুমি কৃষ্ণলাভ কর।" এই বলে শ্রীপাদ উচ্চারণ করলেন তাঁর চিরপ্রিয় কৃষ্ণবিরহ-শ্লোক:

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদালোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

—তোমার অদর্শনে হৃদয় আমার কাতর হয়েছে, ভ্রান্তদশায় আমি পতিত হয়েছি। এখন আমি কী করি?

পরবর্তী কালে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যও এই কৃষ্ণবিরহের শ্লোকটি আবৃত্তি করতে করতে ভাবোন্মত্ত হয়ে পড়তেন। মহাপ্রভুর জন্মের কিছু পূর্বে বা পরে 'ভক্তিচন্দ্রোদয়' মাধবেন্দ্রপুরী স্বর্গগত হন। অনুমান এই, ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন।

অদ্বৈতাচার্য



দ্বৈত অর্থ দুই—ভগবান্ আর ভক্ত, ঈশ্বর ও জীব। অদ্বৈত মানে যা দুই নয়—অর্থাৎ এক। ব্রহ্মই এক—এবং প্রত্যেক জীবই ব্রহ্মস্বরূপ। এই জ্ঞান যখন হয় তখন মানুষই দেবতা হয়ে যায়। পন্ডিতপ্রবর কমলাক্ষ হলেন তাই অদ্বৈত আচার্য। জনসমাজের তিনি কল্যাণ-পুরোহিত।

বাংলা দেশের এই সংকট দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে।

মাধবেন্দ্রপুরীর সার্থক শিষ্য অদ্বৈতাচার্য।

প্রথম জীবনে শান্তিপুরের শান্ত্যাচার্য নামে এক খ্যাতনামা পন্ডিতের কাছে পাঠ শেষ করে ইনি শান্তিপুরে বাস করতে থাকেন। এঁর দুই পত্নী- সীতা ও শ্রী। যেমন ছিল এঁর পান্ডিত্য, তেমনি এঁর বিত্ত। শান্তিপুরে বাস করতেন রাজপ্রাসাদতুল্য এক অট্টালিকায়—নাম 'উপকারিকা'।

বসতি তাঁর শান্তিপুরে, কিন্তু গঙ্গার অপর পারে নবদ্বীপের এক নিরালা গৃহের কক্ষে তিনি সবাইকে নিয়ে হরিধ্বনি তোলেন।

পাঁচশ বছর আগে বাংলাদেশে শান্তিপুর আর নবদ্বীপ ছিল বিদ্যা ও ধর্মচর্চার প্রধান কেন্দ্র। শান্তিপুর আর নবদ্বীপের ঘরে ঘরে প্রতিভাবান্ পন্ডিতের ছড়াছড়ি। কিন্তু বাংলার সমাজে তখন ভাঙ্গন ধরেছে। ধর্ম অধঃপাতে যেতে বসেছে—ব্যভিচারে দেশ ভরে উঠেছে বিজাতির সংস্পর্শে নিষ্ঠা যেন জাতির জীবন থেকে চলে গিয়েছে। অথচ সমাজ-পতি পন্ডিতেরা পান থেকে চুন খসলে নিষ্ঠুর বিচারে প্রায়শ্চিত্তের নামে সমাজের মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। অনেক মানুষ ভয়ে স্বধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম অবলম্বন করে রেহাই পাবার পথ খুঁজছিল।

পন্ডিত সমাজের চূড়ামণি ছিলেন কমলাক্ষ (মতান্তরে, কমলাকর) ভট্টাচার্য। পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ হলেও তিনি অদ্বৈত আচার্য নামে পরিচিত।

সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে গঙ্গায় আকণ্ঠ জলে ডুবে দু হাত উপরে তুলে তিনি হুংকার ছাড়েন—কাউকে যেন প্রাণের দুঃসহ আবেদন জানান। আবাহন করেন—"এসো, তুমি এসো।"

—"কে আসবে?" স্নানরত পন্ডিতমন্ডলী প্রশ্ন করেন।

অদ্বৈত বলেন—"যাঁর পায়ের মৃদু সঞ্চারণ আমি অন্তরে প্রতিনিয়ত শুনতে পাই—পাই তাঁর ছায়ামূর্তির দর্শন।"

মহাপ্রভু এসেছিলেন, অদ্বৈতকে দর্শন দিয়েছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য শান্তিপুরে একবার এসে 'উপকারিকা' ভবনে দশদিন আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। মহাপ্রভুর শান্তিপুর থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য বালকের মত চিৎকার করে কেঁদেছিলেন।

তখন গৌরাঙ্গ তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি যদি এত ব্যাকুল হও, তা হলে আমার বৃদ্ধা মাকে সান্ত্বনা দেবে কে?"

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর অদ্বৈতাচার্য বুঝতে পারলেন, তাঁর বহুপ্রার্থিত বস্তু পৃথিবীতে এসেছে। নিখিল মানবের বেদনার ভার বুকে নিয়ে, পাপীতাপী উদ্ধারের জন্য ভগবান্ আবির্ভূত হয়েছেন। অদ্বৈত আচার্যের সেই স্বীকৃতি নবদ্বীপের বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীগৌরাঙ্গের এক বিশেষ মর্যাদা এনে দিল।

নবদ্বীপের ভক্তসমাজে শুরু হয়ে গিয়েছে মহাপ্রভুর কীর্তনলীলা। ভক্তিরসের পারাবার শ্রীনিত্যানন্দেরও আগমন হয়েছে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে অদ্বৈত আচার্য না থাকলে কীর্তনরস যেন জমছে না। প্রভু তাই রামাইকে আদেশ করলেন অদ্বৈত আচার্যের ভবনে গিয়ে তাঁকে শীঘ্র নবদ্বীপে আসার অনুরোধ জানাতে। বললেন, "তুমি গোপনে আচার্যকে দেবে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের আগমনবার্তা। আর বলবে আচার্য যেন পূজার সব উপচার সংগ্রহ করে সস্ত্রীক এখানে এসে আমার পূজা করে।"

রামাইর মুখে মহাপ্রভুর আদেশ শুনে প্রাচীন পার্ষদ অদ্বৈত সুকৌশলে জিজ্ঞাসা করেন, "বল তো রামাই শ্রীভগবান কেন বিশ্বের এত স্থান থাকতে নবদ্বীপের মাটিতে নেমে আসবেন? তাঁকে ঘিরে তোমরাই বা এত ভাবোন্মত্ত হও কেন বুঝি না।"

ভক্ত রামাই অদ্বৈতাচার্যের কথার চাতুর্য বুঝতে পেরেছেন। তবু বললেন, "আচার্যদেব, মহাপ্রভু আপনার পথ চেয়ে ব্যাকুল হয়ে বসে আছেন। শীঘ্র চলুন, আমরাও আপনাদের মধুর মিলনদৃশ্য দেখে নয়ন সার্থক করি।"

সস্ত্রীক অদ্বৈতাচার্য শ্রীবাস অঙ্গনে উপস্থিত হয়ে মহাপ্রভুর ঐশ্বরীয় মহাভাব দর্শন করে পুলকিত হলেন।—

জিনিয়া কন্দর্প কোটী-লাবণ্যসুন্দর।
জ্যোতির্ময় কনকসুন্দর কলেবর।
প্রসন্ন বদন কোটী-চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর।

ঠাকুর হরিদাস এই অদ্ভুত মানুষটিকে দেখবার জন্য একবার শান্তিপুরে রওনা হলেন। অদ্বৈতের সেদিন বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ। অদ্বৈতের স্ত্রী সীতাদেবী নিজের হাতে অন্নব্যঞ্জন রান্না করেছেন। ব্রাহ্মণমণ্ডলী পাতা পেতে বসেছেন। অদ্বৈতাচার্য ভাতের থালা হাতে করে সেখানে এসে দাঁড়ালেন। এমন সময় হঠাৎ বাড়ির দরজার কাছে শোনা গেল হরিধ্বনি। অদ্বৈত তাকিয়ে দেখেন সুপুরুষ এক যোগী তাঁর বাড়ির দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছেন। অদ্বৈত তাঁকে সমাদরে ডেকে এনে পরিবেশনের অন্নের থালা তুলে দিলেন তাঁর হাতে। ফুলিয়ার এক পণ্ডিত উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন— "একি করছ অদ্বৈত আচার্য! ও যে হরিদাস ও যে যবন। ওর হাতে ভাতের থালা তুলে দিলে!"

অদ্বৈত সে কথায় কান দেন না। বলেন "হরিদাস! হরির দাস। হরি আসছেন সশরীরে আগে পাঠিয়েছেন তাঁর দাসকে। উঁচু-নিচু, ছুঁত-অছুঁত সবাই এবার উদ্ধার হবে তাই তো ছলনা করে এসেছেন যবনরূপে।"

অদ্বৈতের আঙ্গিনা সেদিন ভরে যায় হরি-সংকীর্তনে। অদ্বৈত আর হরিদাস নাচতে থাকেন নামগান করতে করতে। দেখতে দেখতে সবাই আত্মহারা হয়ে ওঠেন। সবাই মেতে ওঠেন নামগানে।

শ্রীচৈতন্যদেবের তিন প্রধান ভক্তের অন্যতম শ্রীঅদ্বৈত আচার্য। বয়সে মহাপ্রভুর চেয়ে ইনি ৫২ বছরের বড় ছিলেন।

আনুমানিক ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। জন্মস্থান শ্রীহট্ট জেলার নবগ্রাম। পিতা কুবের পঞ্চানন কার্যোপলক্ষে জন্মভূমি ছেড়ে শান্তিপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন।

অধঃপতিত জাতিকে উদ্ধার করে ধর্মের পথে উদ্বুদ্ধ করতে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য যে সাধনা করেছিলেন তা সত্যিই অতুলনীয়। সম্ভবতঃ ১৫৮৪ সালে এই মহাসাধকের তিরোধান ঘটে।

স্বরূপ দামোদর



মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পুণ্যময় মহাজীবনের অন্ত্যভাগ অতিবাহিত হয়েছিল পুরী নীলাচলে। দীর্ঘ একুশ বৎসর কাল তিনি কাটিয়েছেন শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে। গম্ভীরা গৃহে প্রভু বাস করেছেন বারো বছর। মহাপ্রভুকে নিয়ে অন্তরঙ্গ পার্ষদদের হয়েছে মহা বিপদ। দিবারাত্র নামকীর্তন ও কৃষ্ণলীলাবিলাসে আত্মমগ্ন শ্রীচৈতন্য ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যান, আবার সংবিৎ ফিরে পেয়ে পার্ষদদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে বিলাপ করতে থাকেন:

কাহা করোঁ কাহা যাঙ
কাহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ।

সেদিন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত প্রভুর দিব্যোন্মাদের পালা চলছে। তারপর কৃষ্ণনামকীর্তন শুনে শুনে তাঁর উদ্বেল হৃদয় কিছুটা শান্ত হয়েছে। তাঁকে শয্যায় শয়ন করিয়ে সর্বক্ষণের অনুগত পরিকর ঘরের বাইরে শুয়ে রইলেন।

অনুগত নিত্যসঙ্গী কান পেতে শুনছেন অর্গলবন্ধ ঘরের মধ্যে ক্ষীণকণ্ঠে মহাপ্রভু করে চলেছেন অবিরাম কৃষ্ণনাম। রাত্রি আরও গভীর হতে থাকে। এক সময় আর কৃষ্ণনাম শোনা যায় না, প্রভুর কণ্ঠে কোন সাড়া নেই। তবে কি নিদ্রামগ্ন, না কি অচেতন? মনে সংশয় জাগে। সঙ্গী ভক্ত উঠে দেখেন, পর পর তিনটি দরজা বাহির থেকে বন্ধ- অথচ ঘরের ভিতরে মহাপ্রভু নেই।

প্রভুর সন্ধানে লোকজন বেরিয়ে পড়ল। নিত্যসঙ্গী প্রভুকে খুঁজে বের করলেন জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তরদিকে। ভাবোন্মত্ত প্রভু মাটিতে পড়ে আছেন। কিন্তু এ কী চেহারা তাঁর! দেহখানি পাঁচ-ছয় হাত দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে, নাকে শ্বাস বইছে না, মুখে লালা ও ফেনা। এ দৃশ্য দেখে ভক্তেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তখন অনুগত ভক্তপ্রবর মহাপ্রভুর কানের কাছে মুখ নিয়ে শোনাতে লাগলেন কৃষ্ণকীর্তন। বহুক্ষণ পরে প্রভু চোখ মেলে তাকালেন। ধীরে ধীরে তাঁর স্বাভাবিক আকৃতি ফিরে এল।

এই ভক্তবরটির নাম স্বরূপ দামোদর। মহাপ্রভুর দীনাতিদীন সেবক, শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত, ব্রজরসের সুরসার্থক, একনিষ্ঠ সচিব স্বরূপ দামোদর। রাধাভাবে উন্মত্ত শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেমবিলাস দেখে দেখে তাঁর নয়নদুটি সার্থক, পরিতৃপ্ত। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলী ও জয়দেবের গীতগোবিন্দের সংগীতমূর্ছনায় তিনি প্রতিদিন প্রভুর বিরহজ্বালার উপশম করে নিজের জীবন ধন্য করেন। যে সকল ভক্ত মহাপ্রভুকে স্বরচিত শ্লোক ও গীত শোনাতে আসে তাদের আগে রাগানুগা ভক্তির পরীক্ষা দিতে হয় স্বরূপ দামোদরের কাছে। স্বরূপ অনুমোদন না করলে সেই গান প্রভু কখনই শোনেন না। আবার প্রভু নিত্য সংকীর্তন মাধ্যমে নীলাচলে যে ভক্তিরসের বন্যা প্রবাহিত করেছেন তাতে অবগাহন করে যে-সকল ভক্ত পরিতৃপ্ত, তারা

নৃত্যগীতের শেষে স্বরূপের সামনে এসে ভিড় করে প্রভুর লীলামাহাত্ম্যের ব্যাখ্যা শোনার জন্য।

কি জগন্নাথমন্দিরে, কি রাজপথে, কি সাগরসৈকতে —যেখানেই প্রভু বিচরণ করেন সেখানেই তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেন স্বরূপ। আবার গম্ভীরাগর্ভে প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমবিলাসেও স্বরূপ প্রধান আস্বাদনকর্তা। স্বরূপ একাধারে প্রভুর দেহরক্ষী, লীলাসঙ্গী ও মর্মবেত্তা।

মহাপ্রভুর লীলামাধুরীর আস্বাদন অভিলাষে ভক্তসঙ্গে পুরীধামে এসেছেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। বেদবেদান্ত, শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর। জগন্নাথ মন্দিরে দেববিগ্রহের অঙ্গসজ্জায় মাড়যুক্ত নববস্ত্র ব্যবহার করতে দেখে বিদ্যানিধি বিচলিত হলেন, ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তাঁর আপত্তি লক্ষ করে বন্ধু স্বরূপ দামোদর তাঁকে বললেন: "জগন্নাথধামে সবই শুদ্ধসত্ত্ব। নিজস্ব নিয়মবিধি অনুসারে দেবতার পূজা হয়। এখানে তোমার আচার-বিচারের ব্যাকরণ চালাতে এসো না।" স্বরূপের সতর্কবাণী সত্ত্বেও পুণ্ডরীকের মনের খুঁতখুঁতি যায় না। সেইদিনই রাত্রে জগন্নাথ মহাপ্রভু তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। ক্রুদ্ধ স্বরে তিরস্কার করলেন তাঁর অনধিকার চর্চার জন্য। শুধু তাই নয়, প্রহারে জর্জরিত করলেন পুণ্ডরীকের সর্বাঙ্গ। পরদিন প্রভাতে দামোদর এসে বন্ধুর দেহে আঘাতের চিহ্ন দেখে বিস্মিত হলেন। পুণ্ডরীকের মুখে গতরাত্রির স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে স্বরূপ বললেন: 'তুমি ধন্য পুণ্ডরীক! স্বয়ং ভগবানের কৌতুকময় লাঞ্ছনা জুটেছে তোমার শরীরে—তোমার ভাগ্যকে যে-কোন বৈষ্ণব পরম গৌরবের বস্তু বলে মনে করবে।"

সপ্তগ্রামের জমিদার গোবর্ধনদাসের পুত্র রঘুনাথদাস চল্লিশ বৎসর বয়সে ধনসম্পত্তি ও পরিজন পরিত্যাগ করে পুরীধামে এসে শ্রীচৈতন্যের আশ্রয়ভিক্ষা করেন। প্রভু ভাবলেন এই সর্বত্যাগী ভক্তের ভার কার ওপরে দেবেন। স্থির করলেন, ভার নেবার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি স্বরূপ দামোদর। প্রভু নিজেই তো বলেছেন—

> দামোদর স্বরূপ ইহ শুদ্ধ ব্রজবাসী।
> ঐশ্বর্য না জানে রহে শুদ্ধপ্রেমে ভাসি॥
> দামোদর স্বরূপ প্রেমরস মূর্তিমান।
> যার সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুরসজ্ঞান॥

স্বরূপের তত্ত্বাবধানে ও সঙ্গগুণে রঘুনাথদাসের সাধকজীবনের উত্তরণ ঘটতে থাকে। তবু রঘুনাথের মনের কোণে একটু অতৃপ্তির রেশ যেন রয়ে গিয়েছে—মহাপ্রভু নিজে কি তাঁকে কোনদিন উপদেশদানে ধন্য করবেন না? এই মনোবাসনা নিয়ে একদিন প্রভুর কাছে উপস্থিত হতেই—

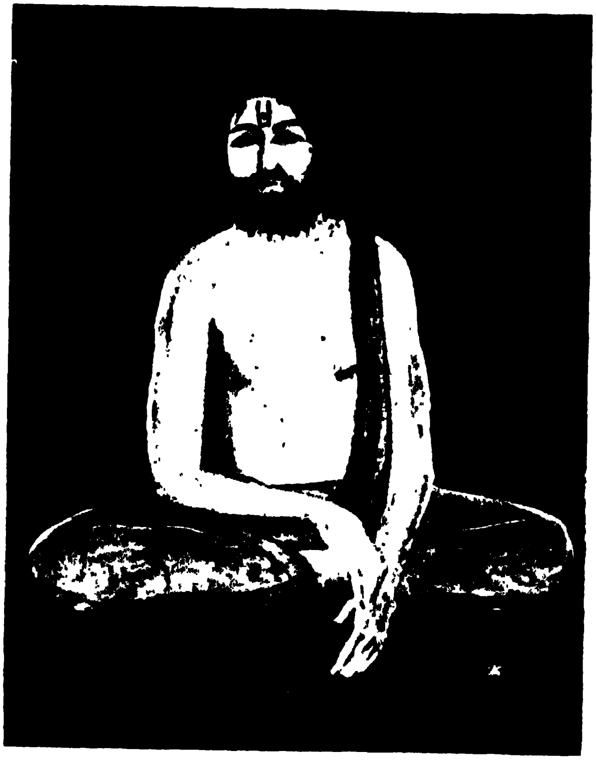
> হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
> তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥
> সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিক্ষ ইহার স্থানে।
> আমি যত নাহি জানি ইহ তত জানে॥

এ কথার পর স্বরূপ দামোদরের সাধনমাহাত্ম্য সম্বন্ধে রঘুনাথের মনে আর কোন দ্বিধা রইল না।

স্বরূপ দামোদরের কড়চা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার মাধুর্যরসস্নিগ্ধ অপরূপ আলেখ্য। পরমহংসদেবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ধন্য হয়ে শ্রীম যেমন রচনা করেছেন পরম মহাকাব্য 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত', শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচললীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা নিত্যসঙ্গী স্বরূপ দামোদরও তেমনি রচনা করেছিলেন পরম জীবনকাব্য শ্রীচৈতন্য-কড়চা। গোদাবরী-তীরে ভক্তপ্রবর রায় রামানন্দ ও মহাপ্রভুর ঐতিহাসিক মহামিলন কালে যে কথোপকথন হয় তার পূর্ণ বিবরণ দামোদর শুনেছিলেন প্রভু ও রামরায় উভয়েরই স্বমুখে। সেই বিবরণ নিহিত আছে তাঁর মহামূল্য কড়চা গ্রন্থে। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা ধ্বনিত হয় রায় রামানন্দের কণ্ঠে, আর শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদের সাঙ্গীতিক মূর্ছনা ঝংকৃত হয়ে ওঠে স্বরূপ দামোদরের দিব্যকণ্ঠে। ছন্দে আর সুরে ভরে যায় নীলাচলের আকাশ-বাতাস আর সমুদ্রসৈকত।

নীলাচলে মহাপ্রভুর আসন্ন জীবনাবসানের ইঙ্গিত পূর্বাহ্নেই পেয়েছিলেন স্বরূপ। প্রভুর দেহরক্ষার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পরমভক্ত দামোদরের মহাপ্রয়াণ ঘটে।

ভক্তরাজ হরিদাস



চব্বিশ পরগণা (উত্তর) জেলার দত্তপুকুর স্টেশনের কাছেই বুড়ন গ্রাম। মনোহর চক্রবর্তী গাঁয়ের নামকরা পণ্ডিত। অনেক পুজোমানতের পর অধিক বয়সে তাঁর ঘর আলো করে এক পুত্রের জন্ম হল—১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে (শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মের ৩৫ বৎসর পূর্বে)। কিন্তু গণ্ডযোগে জন্ম; কাজেই সকলে মনে করল এই ছেলে পিতামাতৃঘাতী হবে।

শেষ পর্যন্ত তা-ই হল। বছর দুই পরে—মনোহর চক্রবর্তী তিন দিনের জ্বরে ভুগে মারা গেলেন। তাঁর সতী সাধ্বী স্ত্রী উজ্জ্বলা দেবী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জন দিলেন।

তাঁদের ভিটা-বাড়ির প্রজা হবিবুল্লা কাজীর স্ত্রীর সঙ্গে মিশ্র মহাশয়ের স্ত্রীর খুব ভাব ছিল। মৃত্যুর আগে শিশুপুত্র হরিদাসকে তার হাতেই দিয়ে গেলেন।

হবিবুল্লার ঘরেই হরিদাস বড় হতে থাকে। বালকের গৌরকান্তি ও লাবণ্যময় মুখশ্রী সকলকেই আকৃষ্ট করে। দশ বছর বয়সে তিনি উর্দু, সংস্কৃত ও বাংলায় অসামান্য পারদর্শিতা লাভ করেন। কাজী দম্পতির মনে আশা ছেলেকে যথাসময়ে বিবাহ করিয়ে বউ ঘরে আনবে। কিন্তু সে আশা সফল হল না। অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ হরিদাস ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

হাঙ্গর নদীর ধারে বেনাপোলের জঙ্গলে হরিদাস আশ্রম তৈরি করে নামজপ করতে লাগলেন। গভীর বনে সাধনা করলেও হরিদাসের হরিভক্তির কথা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল। একজন-দুজন করে ভক্ত আসতে লাগল তাঁর বনের কুটিরে।

সেই সময়ে সেই অঞ্চলে ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র খাঁ নামে এক জমিদার। বাংলার নবাব হুসেন শাহের দয়ায় তিনি বেশ প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করে-ছিলেন। হরিদাসের কথা তাঁর কানে এসে পৌঁছল। তিনি শুনলেন হরিদাস জাতে মুসলমান, বৈষ্ণব হয়ে হিন্দু আচারে হরিনাম করছেন। হিন্দু মহিলারা তাঁকে দেখবার জন্য ভিড় জমায়।

রামচন্দ্র খাঁ বললেন—"এইসব ভণ্ডামি আমার জমিদারীতে চলবে না।" তিনি লক্ষহীরা নামে এক সুন্দরী বারবনিতাকে পাঠালেন হরিদাসকে যাচাই করবার জন্য। কিন্তু কী আশ্চর্য, কোথায় লক্ষহীরা হরিদাসকে বশীভূত করবে, তা নয়, নিজেই বশীভূত হয়ে সন্ন্যাস ধর্ম নিল। রূপোপজীবিনী হীরা নটীর কণ্ঠে আজ হরিনামের মধুমন্ত্র মূর্ছনা তুলেছে।

অসদুপায়ে সঞ্চিত বিপুল অর্থরাশি আজ হীরার জীবনে ভারস্বরূপ মনে হল। সেই অর্থ দিয়ে বেনাপোল থেকে পুরী পর্যন্ত দীর্ঘ রাজপথ নির্মিত হল যা আজও 'হীরার জাঙ্গাল' নামে বিখ্যাত। গুরু হরিদাসের জন্মস্থানে হীরা এক প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করিয়ে দেয়—তার নাম 'নটীর জাঙ্গাল'। সর্বস্ব লোকহিতে উৎসর্গ করে হীরা পুরীধামে গিয়ে বাস করতে থাকে।

বাংলায় তখন মুসলমান রাজত্ব। মুলুকপতি কাজীর কাছে নালিশ গেল 'হবিবুল্লা কাজীর বেটা ব্রহ্ম হরিদাস' ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু হয়েছেন। তাঁর মন্ত্রী গোরাই কাজী ছিলেন একজন গোঁড়া মুসলমান। তিনি আদেশ দিলেন হরিদাসকে ধরে আনার জন্য। হরিদাস এলে তিনি তাঁকে হুকুম দিলেন —তোমাকে কলমা পড়ে মুসলমানের মতই থাকতে হবে আর হরিনাম ছাড়তে হবে। কিন্তু হরিদাস তাতে রাজী হলেন না। তখন গোরাই কাজী জল্লাদকে ডেকে হুকুম দিলেন—"ওকে বাইশ বাজারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেত মারো।"

জল্লাদরা কাজীর হুকুম তামিল করল। এক মাইল জুড়ে বাজার, তার বাইশটি দেউড়ি। তাই তার নাম বাইশ বাজার। সেই বাজারে হরিদাসকে ঘোরাতে লাগল আর বেত মারতে লাগল।

হরিদাস তবু হরিনাম বন্ধ করলেন না। চাবুকের কঠিন আঘাতে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কাজীর দরবারে খবর গেল। হাকিম এসে পরীক্ষা করে বললেন - হরিদাস মৃত। তখন তাঁর দেহ জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু হরিদাস সত্যিই মরেননি। কুম্ভক অবস্থায় ভাসতে ভাসতে তিনি ফুলিয়ার তীরে এসে পৌঁছলেন। ফুলিয়ার সাধন মঠে শুরু করলেন সাধনা।

হরিদাস শান্তিপুরে গেলেন। অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে দেখা হল। দেখা হল শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে। হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপে পূজা করলেন। ভক্ত ও ভগবানের মিলন হল।

শ্রীগৌরাঙ্গ হরিদাস, নিত্যানন্দ আর ভক্তদের নিয়ে নদীয়ার পথে পথে দিগ্‌বিজয়ে বেরোলেন। জগাই মাধাই উদ্ধার হল, উদ্ধার হল মুসলমান চাঁদ কাজী।

শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে যাত্রা করলেন। পিছনে পিছনে চলল ভক্তের দল। নীলাচলে মুসলমানদের স্থান নেই, তাই তিনি গেলেন না। কিন্তু পরে শুনলেন মহাপ্রভু আপামরকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সেখানে জাত নেই, ধর্ম নেই, ভেদ নেই...সব একাকার।

হরিদাস এবার শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু মন্দিরে ঢুকলেন না। অদূরে বকুলতলায় বসে হরিনাম জপ করতে লাগলেন। সেখানেই তাঁর সাধন-কুটির গড়ে উঠল।

প্রভুদর্শনমানসে নীলাচলে এসে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রথমে ঠাকুর হরিদাসের সাধন-কুটিরে উপস্থিত হন। শ্রীচৈতন্য প্রতিদিনই জগন্নাথদর্শন সেরে ভক্ত হরিদাসের উদ্যানকুটিরে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন। শ্রীরূপের সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাৎ করিয়ে দেন হরিদাসই। ভক্তপ্রবর সনাতন গোস্বামীও পুরীধামে এসে হরিদাস ঠাকুরের পাদবন্দনা করে তাঁর কুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীসনাতন পদ্যচ্ছন্দে তাঁর মহিমাকীর্তন করেছেন:

> অবতারকার্য প্রভুর নামের প্রচার,
> সেই নিজ কার্য প্রভু করেন তোমার দ্বার।
> আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার,
> প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার।
> আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য,
> তুমি সর্বগুরু সর্বজগতের আর্য।

হরিদাস বৃদ্ধ হয়েছেন। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবু প্রতিদিন তিন লক্ষবার নাম জপ না করে কিছু আহার করেন না।

মহাপ্রভু একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই হরিদাস বললেন "আমি তোমার শ্রীপাদপদ্ম আমার হৃদয়ে রেখে এবার যেতে চাই। তোমার নাম উচ্চারণ করতে করতেই আমি চোখ বুজতে চাই, প্রভু।"

সত্যই একদিন মহাপ্রভুর পদযুগল বক্ষে ধারণ করে নাম সংকীর্তন শুনতে শুনতে ভক্ত হরিদাস ইহলীলা সংবরণ করলেন।

ভক্ত হরিদাসের নিষ্প্রাণ দেহ তাঁর আপন কাঁধে তুলে নিয়ে স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য উদ্দাম নৃত্যে মেতে উঠলেন। ভক্তবৃন্দগণও অশ্রুধারা [illegible] সেই শোকাশ্রু সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নয়ন সজল করে তুলল। সমুদ্রজলে স্নান করিয়ে হরিদাসের পবিত্র দেহ সমুদ্রতটে সমাহিত করা হল। তাঁর তিরোধান উৎসবের জন্য শ্রীচৈতন্য নীলাচলের জনগণের কুটিরে কুটিরে নিজে ভিক্ষা প্রার্থনা করেছিলেন।

উত্তরকালে চৈতন্যদেব তাঁর এই পরমভক্তের প্রশস্তি গেয়ে বলেছেন:

> হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবতপ্রধান।
> দিনপ্রতি লয় তিঁহ তিন লক্ষ নাম॥
> নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঁই শিখিল।
> তাঁর প্রসাদে নামের মহিমা জানিল॥

গুরু নানক



ভারতীয় সাধক গিয়েছেন মক্কায়। মুসলমান সুফী সাধকদের তাদেরই সংগে তাঁর অন্তরংগতা আছে। তাদের মূল ধর্মস্থান মক্কা মদিনা দেখবার প্রবল ইচ্ছা তাঁর মনে জেগে ওঠে। তা ছাড়া সব ধর্মের ওপরেই তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে। তাই ভক্ত মর্দানাকে সংগে করে একবার তিনি পদব্রজে সারা মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ করে আসেন। সেইসময়ে গিয়ে উপস্থিত হন মক্কায়।

মুসলমানদের প্রধান মসজিদ কাবা-শরীফের চারদিকে খোলা মাঠ। সাধক বিশ্রাম করবার জন্য মাঠের একধারে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন। তাঁর পা রইল মসজিদের দিকে। কাবার মাতোয়ালীর চোখ পড়ল তাঁর দিকে। তিনি গর্জন করে উঠলেন, "ওরে দরবেশ, তোর এত সাহস! খোদার পবিত্রস্থান বলে যে কাবা সবার সম্মান পায়, সেদিকে তুই তোর পা রেখেছিস? ভালো চাস তো এই মুহূর্তে পা সরিয়ে নে।"

সাধক শায়িত অবস্থাতেই উত্তর দিলেন—"তাতে কী হয়েছে?" মাতোয়ালী বললেন—"ওদিকে কাবা-শরীফ, ওদিকে ঈশ্বর রয়েছেন।"

সাধক বললেন—"কোথায় কাবা-শরীফ নেই, কোথায় ঈশ্বর নেই, সেদিকেই আমার পা দুটো সরিয়ে দাও না ভাই!"

মাতোয়ালী রাগে অধীর হয়ে পা দুটি অন্যদিকে টেনে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য! মাতোয়ালী দেখেন যেদিকেই পা দুটি ঘুরিয়ে নেওয়া হয়, সেদিকেই কাবা-মসজিদ স্থান পরিবর্তন করে ঘুরে যায়। সেই অলৌকিক ব্যাপার দেখে মাতোয়ালী বিস্ময়স্তব্ধ। অপরিচিত এই বিদেশী লোকটি যে একজন মহাসাধক সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ রইল না।

এই সাধকের নাম নানক।

১৪৬৯ খ্রীস্টাব্দের বৈশাখ মাসে লাহোরের তালওয়ান্দি গ্রামে নানকের জন্ম। পিতার নাম কালুবেদী। মায়ের নাম তৃপ্তা। তাঁরা জাতিতে ক্ষত্রিয়।

ছোটবেলা থেকেই বুদ্ধির চমৎকারিতায় ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে নানক বাবা-মা ও বন্ধুবান্ধবদের হতবাক করে দিয়েছিল। পাঁচ বছর বয়সেই হিন্দুশাস্ত্রের নানা তত্ত্বে নানক ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করে। সাত বছর যখন বয়স, তখন পিতা তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। শিক্ষককে তার প্রথম প্রশ্ন: 'মশায় আমাকে আপনি কী শেখাবেন?' শিক্ষকের উত্তর: 'কেন? বেদ, শাস্ত্র, পাটিগণিত, হিসাবরক্ষণ প্রভৃতি বিদ্যা তোমাকে শেখাব আমি।' সংগে সংগে নানকের জবাব: 'মশায়, ওসব শিখে কিছু লাভ নেই। পারেন যদি, তাহলে পার্থিব ভালবাসা পুড়িয়ে সেই ছাই দিয়ে কালি তৈরি করুন, বিশ্বাস দিয়ে কাগজ প্রস্তুত করুন, হৃদয়কে করুন কলম, আর জ্ঞানকে করুন লেখক। পরমগুরুকে জিজ্ঞাসা করে বিচার লিখুন। এমন নামগান করুন যার শেষ নেই। পারবেন এভাবে আমাকে শেখাতে?'

ন'বছর বয়সে উপনয়ন অনুষ্ঠান হল। যজ্ঞ হবে, পুরোহিত এসেছেন। বালক নানক তাঁকে বলল: 'পৈতা দিয়ে কী হবে? কোন পৈতাই মানুষকে অন্যায়

আচরণ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে অন্তরের জিনিস। অন্তর শুচি হলে বাহ্য উপবীতের কী প্রয়োজন?' ন' বছরের বালকের মুখে এ কথা শুনে লোকজন বিস্ময়ে হতবাক।

লেখাপড়ার দিকে মনোযোগ নেই দেখে নানকের বাবা তাঁকে কিছু টাকাপয়সা দিয়েছিলেন। নানক পিতার আদেশে ব্যবসায় করবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথে একদল নাগা সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। সাধু-সন্ন্যাসী চিরকালই তাঁর কাছে সম্মানের পাত্র। নিজের কাছে যত টাকা ছিল সব খরচ করে তিনি পরিতৃপ্তির সঙ্গে সাধুদের ভোজন করালেন। তারপর ঘরে ফিরে এলেন খালি হাতে। এ ব্যাপারে নানকের বাবা নানকের ওপর ভয়ানক রেগে গিয়ে তাঁকে যথেষ্ট প্রহার করলেন।

ছোটবেলা থেকেই নানক ছিলেন ধর্মানুরাগী, সংসার-বিরাগী। যাতে মানুষ ধর্মের প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করতে পারে, ভোগবিলাস ত্যাগ করে ঈশ্বরের প্রতি মন দিতে পারে, সেজন্য তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই তিনি বিবাহ করলেও সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে অধ্যাত্ম সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন। সাধ্বী স্ত্রী সুলখনীর দুই চোখ বেয়ে নামে অশ্রুধারা।

নানকের অনেক শিষ্য ছিল। তার মধ্যে বুদ্ধা, লেহনা, মর্দানা প্রমুখ শিষ্যরাই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

নানক ছিলেন নিরংকারী যে নিরাকার প্রভু নিয়েছেন সমগ্র বিশ্বের এই আকার, তাঁরই ধ্যান করেন তিনি। তাঁর কাছে নেই জাতিতে জাতিতে কোন ভেদ নেই উঁচু-নিচুর পার্থক্য। নবাব দৌলত খাঁ মনে করেন, নানকের এটা ঔদ্ধত্য। ডেকে পাঠান তাঁকে। জিজ্ঞেস করেন, "তুমি নাকি বলে বেড়াচ্ছ, হিন্দু-মুসলমান বলে কিছু নেই। তা হলে বলতে চাও আমি বা এই কাজীসাহেব, দুজনের কেউই মুসলমান নই?" নানক উত্তর দিলেন, "অভিমান রাগ আর লোভ যিনি ত্যাগ করেছেন, তিনিই প্রকৃত মুসলমান। এমন লোক কোথায় আছেন, আমায় বলে দিন!" নবাব রেগে আগুন। নানককে নিয়ে মসজিদে গেলেন নমাজ পড়তে। নমাজ শেষ হলে বললেন, "নানক, তুমি তো আমাদের সঙ্গে নমাজ পড়লে না!" উত্তর দিলেন নানক, "কাকে অনুসরণ করে নমাজ পড়ব বলুন। কাজীসাহেবের বাড়িতে ঘোড়ার যে বাচ্চাটা হয়েছে সেটা যাতে উঠোনের কুয়োর মধ্যে পড়ে না যায়, উনি নমাজের সময় কেবল সে কথা ভাবছিলেন। আর আপনিও আসলে নমাজ পড়েননি। সুদূর কান্দাহারে প্রচুর অর্থ দিয়ে ঘোড়া কিনতে পাঠিয়েছেন কর্মচারীদের সে চিন্তাই করছিলেন আপনি।" কাজীসাহেব আর নবাব দেখলেন, সত্যিই তো, নানক হাত গুনতে জানেন নাকি! তাঁদের আত্মাভিমান আজ চূর্ণ হল। পরম শ্রদ্ধাভরে নানককে তাঁরা অভিবাদন জানালেন।

নানক মানুষকে দিয়েছিলেন মানবপ্রেমের শিক্ষা। তাঁর অষ্টাভ্যাস বা অষ্টসাধনার মন্ত্র ছিলঃ (১) দেহ ও পবিত্রতা (২) নিস্তব্ধতা (৩) মনঃসংযোগ (৪) মন্ত্রের অর্থোপলব্ধি (৫) ধৈর্য ও সন্তোষ (৬) শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস (৭) সৎসঙ্গ এবং (৮) প্রাত্যহিক জীবনে মন্ত্রসাধনা। 'গুরু কে?'—এই প্রশ্নের উত্তরে নানক বলেন গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি সেই নামকে জাগিয়ে তোলেন, অন্ধকারের মাঝে যিনি আলোর দিশারী, পরমপিতার সঙ্গে মানুষের মিলনের পথ দেখান তিনি। কৃষক ভক্তদের উদ্দেশে নানকের বাণী ছিলঃ 'তোমার শরীর হোক ক্ষেত্র, সৎকাজের বীজ বপন কর সেই ক্ষেত্রে। ঈশ্বরের নামের দ্বারা সেই ক্ষেত্রে জলসিঞ্চন কর, আর তোমার অন্তর করুক কর্ষণ। তাহলেই ঈশ্বর তোমার হৃদয়ে অংকুরিত হবেন, তুমি মুক্তি পাবে।'

নানক হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মিলন সাধন করে শিখ ধর্মের প্রবর্তন করেন। ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে গুরু নানকের দেহাবসান ঘটে।

তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। নানকের হিন্দু-মুসলমান অনেক শিষ্য ছিল। মৃত্যুর কিছু পূর্বে নানক একখণ্ড কাপড় দিয়ে নিজের সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ঢেকে শুয়ে ছিলেন। মৃত্যুর পর হিন্দু-মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে মৃতদেহ নিয়ে এক দারুণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল। হিন্দুরা বলল, মৃতদেহ দাহ করতে হবে, মুসলমানেরা বলল কবর দিতে হবে। বহুক্ষণ ধরে বাগ্‌বিতণ্ডা চলতে থাকে। কোন মীমাংসার লক্ষণ দেখা গেল না। এই সময় শিষ্যদের মধ্যে একজন হঠাৎ কাপড় তুলে দেখে শবদেহ নেই। তখন কাপড়ের টুকরোটি দু ভাগে ভাগ করে এক ভাগ হিন্দুরা দাহ করল, অপর ভাগ মুসলমানরা কবর দিল।

সনাতন গোস্বামী



গৌড়ের মুকুন্দদেব তাঁর দুই পৌত্র অমর এবং সন্তোষের শিক্ষার সুব্যবস্থাই করেছিলেন। নবদ্বীপে গিয়ে বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে তারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে; পরে তাঁরই ভাই রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির টোলে থেকে অমর ও সন্তোষ নানা শাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বাদি আয়ত্ত করে। আবার সপ্তগ্রামে গিয়ে পিতামহ মুকুন্দদেবের বন্ধু ফকরুদ্দিনের তত্ত্বাবধানে তারা ফার্সী ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করে। পরবর্তীকালে অমর রায় বা সাকর মল্লিক হলেন গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের দরবারের প্রধান মন্ত্রী। দর্শনশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত হলেও ভাগ্যচক্রে তাঁকে চাকুরি নিতে হয়েছে নবাবের দরবারে। ছোট ভাই সন্তোষও দবীর খাস নামে নবাবের অর্থসচিব পদে বৃত হয়েছেন।

তখন উড়িষ্যা ছিল স্বাধীন দেশ। ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজী উড়িষ্যা জয় করতে যান। সেই সময় অমর রায়কেও সঙ্গে যেতে হয়।

পাঠান সৈন্যরা বহু হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করল। অনেক বিগ্রহ ভেঙে ফেলল। এসব দেখে অমর রায়ের মন দুঃখ ও বেদনায় ভরে উঠল। রাজকার্যে এল বিতৃষ্ণা।

বহুদিন আগেই অমর রায় শুনেছিলেন এক আশ্চর্য মানুষ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছেন। ঈশ্বরের অবতার বলে লোকে তাঁকে পূজা করে। অমর রায় মনের আকুলতা জানিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে একখানি পত্র লিখলেন।

চৈতন্যদেব বুঝতে পারলেন অমর রায়ের মনের আগুন সহজে নিভবে না। তিনি নিজেই একদিন যাত্রা করলেন গৌড়ের দিকে। কিন্তু গৌড়ের পথে পৌঁছতেই সে কী ভিড়! হাজার হাজার লোক তাঁকে প্রণাম করে —তাঁর সঙ্গে নামকীর্তনে যোগ দেয়। নবাব ব্যাপার কিছু না বুঝতে পেরে অমর রায়কে পাঠালেন। অমর রায় ছদ্মবেশে দেখা করে এলেন শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে। তাঁর মনের বাসনাও পূর্ণ হল।

ফিরে এসে নবাবকে জানালেন—"জাহাঁপনা ভয়ের কিছু নেই। একজন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী এসেছেন।" কিন্তু সেদিন রাত্রে অমর রায় ঘুমাতে পারলেন না। ছোট ভাই, নবাবের অর্থসচিব দবীর খাস বা সন্তোষ রায় দাদার হাবভাব দেখে চিন্তিত হলেন। কিন্তু সব-কিছু শুনে তাঁর চোখেও ঘুম এল না। গভীর রাত্রে দুজনেই সাধারণ বেশে গিয়ে হাজির হলেন শ্রীচৈতন্যের কাছে। তখন শ্রীচৈতন্য রামকেলি গ্রামে গাছের তলায় নিশিযাপন করছিলেন। তাঁরা এসে মহাপ্রভুর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লেন—"আমাদের মুক্তির পথ দেখাও প্রভু।"

মহাপ্রভু তাঁদের তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—"তোমরা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হয়েও এমন দীনতা যখন বরণ করতে পেরেছ, তখন পতিতপাবন ভগবান তোমাদের উদ্ধার করবেনই।"

অমর রায় ও সন্তোষ রায় কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন —"ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়েছি। কিন্তু অর্থ, নাম ও প্রতিপত্তির মোহে নিজের ধর্ম পর্যন্ত বিসর্জন দিতে বসেছি। আমাদের বাঁচাও প্রভু।" শ্রীচৈতন্য বললেন— "তোমরা আজ নতুন জীবন লাভ করেছ। তাই তোমাদের নতুন নামকরণ করলুম সনাতন আর রূপ। আজ তোমরা ফিরে যাও সময় হলেই তোমাদের কাছে ডেকে নেব।"

গৌড়ে ফিরে রাজকার্যে মন দিলেন সনাতন আর রূপ। কিন্তু মন কিছুতেই বসে না। রূপের মনই যেন বেশি চঞ্চল হয়ে উঠল। দাদার কাছে সেকথা অকপটে প্রকাশ করে চাকুরি ছেড়ে গৌড় ত্যাগ করলেন। যাবার আগে গৌড়ের একজন ধনী শেঠের কাছে রেখে গেলেন দশ হাজার টাকা। কারণ তিনি জানতেন বিপদ একটা আসবেই সনাতনের উপর। তাই শেঠকে বলে গেলেন সময় বুঝে যেন টাকাটা সে সনাতনকে দেয়।

গৌড়ের নবাব কিছুদিন পরই টের পেলেন অর্থ-সচিব সন্তোষ রায় পলাতক। প্রধান মন্ত্রীও কয়েকদিন যাবৎ দরবারে আসেন না। তাঁদের মনে কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে মনে করে নবাব সনাতনকে বন্দী করলেন। বিচারে তাঁর কারাদণ্ড হল।

কিন্তু একদিন রাত্রিবেলায় সনাতন দেখলেন, কারাগারের দরজা খুলে গিয়েছে। সেই শেঠ টাকা দিয়ে গিয়েছে সেই টাকায় বশ করা হয়েছে কারাগারের প্রহরীদের।

পথে বেরিয়ে বিভ্রান্ত হলেন সনাতন। কোথায় যাবেন কিছুই স্থির নেই। অবশেষে কাশীর পথ ধরলেন। বনে জঙ্গলে, গাছতলায়, পাহাড়ের নিচে, পথের ধুলায় সনাতনের দিন আর রাত কাটতে লাগল। কাশীতে যখন এসে পৌঁছলেন, তার কয়েকদিন আগেই চৈতন্যদেব সেখানে পদার্পণ করেছেন।

সনাতনের সঙ্গে চৈতন্যের দেখা হল। চৈতন্যদেব আবেগে জড়িয়ে ধরলেন সনাতনকে। সনাতনের জীবন ধন্য হল।

যমুনার তীরে আদিত্যটিলায় এক কুঁড়ে বেঁধে থাকতেন সনাতন। সামনে যমুনার নীল জল, জলের বুকে নীল আকাশের ছায়া। নীলিমার নীল দেখে দেখে নীলমাধব কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে সনাতনের। নিরন্তর চলে কৃষ্ণনামজপ। ভক্তিরসে প্লাবিত অন্তরের গহীনপ্রদেশ থেকে বেরিয়ে আসে লালিত্যভরা স্তবরাশি। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা অবলম্বনে রচিত এই স্তবগুলিই লীলাস্তব বা 'দশম চরিত' নামে পরিচিত।

বৃন্দাবনে যমুনার তীরে বহুদিন সনাতন যোগমগ্ন হয়ে সাধনা করলেন। দৈবক্রমে একদিন পেলেন একটি পরশপাথর। পাথরটি যাতে ছোঁয়ানো যায় তা ই সোনা হয়ে যায়। কিন্তু সর্বত্যাগী সাধকের কাছে সেই পরশ-পাথরের কোন মূল্য নেই। তিনি কুটিরের চালার নিচে তা রেখে দিলেন। একদিন এক গরীব ব্রাহ্মণ সাহায্যপ্রার্থী হয়ে তাঁর কাছে এলেন। তিনি পরশ-পাথরটি দান করে দিলেন ব্রাহ্মণকে। এতে অবাক হয়ে ব্রাহ্মণ ভাবতে লাগলেন এমন কী অমূল্য ধন আছে সনাতন গোস্বামীর কাছে, যার জন্য মহামূল্য পরশ-পাথরও তাঁর কাছে তুচ্ছ। "আমাকেও সেই ধন দান করুন" বলে ব্রাহ্মণ লুটিয়ে পড়লেন সনাতনের পায়ে।

শ্রীচৈতন্যের আদেশে সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব দর্শন ও সাধনভজনের গ্রন্থ প্রচারে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন। শুধু যে অজস্র ভক্তিশাস্ত্রগ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তা নয়, নিজেও অনেকগুলি শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। তাঁর নিজের লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বৃহৎ ভাগবতামৃত' ও 'বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী টীকা' বিখ্যাত।

বৃন্দাবনে যতদিন ছিলেন সনাতন প্রতি বছর বেরোতেন ব্রজপরিক্রমায়। মহাপ্রভু চৈতন্যের দেহরক্ষার পর ভক্তসনাতন ক্রমশই অন্তর্মুখী হয়ে পড়লেন। আদিত্যটিলা ছেড়ে কখনও তিনি গিরিগোবর্ধনে কখনও মহাবনে বা গোকুলে থেকে নিরালায় সাধনভজনে মগ্ন থাকতেন। শেষকালে থাকতেন এক বৃক্ষতলের কুটিরে। জীবনীশক্তি কমে এসেছে, ৯০ বছর বয়স ক্ষীণদৃষ্টি মুখে শুধু কৃষ্ণনামজপ। পরিপূর্ণ আত্মসমাহিত। 'নাভিনন্দামি মরণং নাভিনন্দামি জীবিতম্।' হে প্রভু! আমি বাঁচতেও চাইনে, মরতেও চাইনে। ইচ্ছে হয় কোলে টেনে নাও ইচ্ছে না হয় রেখে দাও যেমন আছি। দিন দিন নিস্তব্ধ গভীরে ডুবে যান সনাতন।

১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে (১৪৭৬ শকাব্দ) আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিনে মহাসাধক সনাতন দেহরক্ষা করেন।

রূপ গোস্বামী



শ্রাবণের বর্ষণমুখর অন্ধকার নিশীথে গৌড়ের রাজপথ দিয়ে একটি তাঞ্জাম বয়ে নিয়ে চলেছে বাহকেরা। আরোহী দবীর খাস গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের অর্থসচিব। নবাব হঠাৎ জরুরি তলব পাঠিয়েছেন দেখা করার জন্য। রাস্তার একহাঁটু জল ভেঙে বাহকেরা অতিকষ্টে চলেছে। একটি কুটিরের মধ্য থেকে এক দম্পতির কথোপকথন ভেসে এল। "এই দুর্যোগে এত জল ঠেলে কে যাচ্ছে গো? চোর, না কুকুর? নাকি কোন হতভাগা গোলাম রাজার হুকুম পেয়ে চলেছে দেখা করতে!" কঠোর শ্লেষোক্তি শুনে তাঞ্জামে বসা দবীর খাস চমকে উঠলেন। ধিক্কারে ভরে গেল সমস্ত মন। সত্যিই তো, চোর বা কুকুরেরও অধম তিনি। সারা জীবন তো অর্থ উপার্জন কম করেননি। কিন্তু ইষ্টচিন্তা করবার সময় পেলেন কৈ! নবাবের গোলামী করেই জীবন কেটে গেল। জীবনের উপর বীতস্পৃহ হয়ে নবাব দরবারে কিছু না বলেই চাকুরি ছেড়ে দিলেন দবীর খাস। যাঁর আসল নাম সন্তোষ রায়।

সন্তোষ রায় আর অমর রায় সহোদর ভাই। অমরের চেয়ে সন্তোষ ৫/৬ বছরের ছোট। দুজনেই কাজ করেন গৌড়ের দরবারে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমর প্রধান মন্ত্রী আর সন্তোষ অর্থসচিব।

বাকলা চন্দ্রদ্বীপের (বর্তমান বরিশাল জেলা) রাজা ছিলেন পদ্মনাভ রায়। তাঁর পৌত্র কুমারদেবের সন্তান অমর, সন্তোষ আর বল্লভ। এঁরাই সন্ন্যাস জীবনে সনাতন, রূপ আর অনুপম গোস্বামী নামে খ্যাত হন। কিন্তু নবাব দরবারে অমর আর সন্তোষ পরিচিত ছিলেন সাকর মল্লিক আর দবীর খাস রূপে।

রূপ ছিলেন কাব্য ব্যাকরণে অশেষ জ্ঞানী। তা ছাড়া তিনি কবিও ছিলেন। অবসর সময়ে কাব্য রচনা করতেন।

চৈতন্যদেব একবার গৌড়ে পদার্পণ করেন। চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। তাঁকে দেখে সকলে ভক্তিপ্রেমে বিহ্বল হয়ে পড়ে। সাকর মল্লিক এবং দবীর খাসের মনেও আলোড়ন জাগে। গৌড়ের উপকণ্ঠে রামকেলি গ্রামে শ্রীচৈতন্য এলে সাকর ও দবীর দুজনেই প্রভুর চরণে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁদের নামকরণ করেন সনাতন আর রূপ। রূপ সরকারি চাকুরি ছেড়ে চলে যান। সঙ্গে তাঁর সাথী হন ছোট ভাই বল্লভ বা অনুপম।

হরিনাম গাইতে গাইতে দু ভাই পথ চলতে থাকেন। এসে উপস্থিত হন প্রয়াগে। দেখেন হরিনাম সংকীর্তনে চারদিক মুখরিত। কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় চৈতন্যদেব প্রয়াগ ভাসিয়ে দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করে রূপ আর অনুপম যেন জগৎ সংসার ভুলে গেলেন। প্রভুও তাঁদের দেখে উল্লসিত হয়ে বলেন, "কৃষ্ণের কী অপার করুণা তোমাদের ওপর! তোমাদের এবার বিষয়কূপ থেকে উদ্ধার করলেন। মহা ভাগ্যবান তোমরা!"

রূপ বললেন—"প্রভু, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল। তোমার সঙ্গে থেকে তোমার সেবা করব।"

মহাপ্রভু বললেন—"তোমার এ দুর্বলতা ত্যাগ করতে হবে। তোমার কাজ যে এখনো বাকি। তোমাকে লিখতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে।"

রূপ বললেন—"রচনা করবার শক্তি যা ছিল, নিরস রাজকাজের মধ্যে পড়ে তা শুকিয়ে গেছে। আমার দ্বারা কি সৃষ্টি হবে?"

মহাপ্রভু বললেন—"সর্বরসের আকর শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা স্মরণ কর। ভক্তির রস আপনি উথলে উঠবে। তুমি বৃন্দাবনে যাও। যত কষ্টই হোক বৃন্দাবনেই তুমি থাকবে।"

মহাপ্রভু আরও বললেন তাঁকে: "তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি, আচার, ক্রিয়াকলাপ কিছুই আমার অবিদিত নয়। তোমাকে আমি কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছি—এবার তার সূক্ষ্ম মর্ম উপলব্ধি করে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার নিগূঢ় রূপটি ফুটিয়ে তোল কাব্যে আর নাটকে। কৃষ্ণলীলার রূপরহস্য তোমার মাধ্যমেই জানুক সর্বজগৎ। তাই তো তোমার নাম দিয়েছি—রূপ!"

রূপের মস্তকে হস্তস্থাপন করে শক্তিসঞ্চার করলেন চৈতন্যদেব। তারপর তাঁকে বৃন্দাবন পাঠিয়ে দিয়ে স্বয়ং এগিয়ে চললেন কাশীর পথে।

রূপ ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করলেন। ভোগবিলাসের সব বাসনা ত্যাগ করে দুজনেই বাস করতে লাগলেন বৃন্দাবনে। এদিকে সনাতনের খবর জানবার জন্য তাঁরা অস্থির হয়ে উঠলেন। দাদার সন্ধান করবার জন্য তাঁরা একদিন বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু বৃন্দাবন, কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থান ঘুরে কোথাও তাঁর সন্ধান পেলেন না। রূপ ও অনুপম এর পর গৌড়ের রামকেলিতে যাত্রা করলেন বিষয় সম্পত্তির ব্যবস্থা করবার জন্য। কিন্তু সেখানে গিয়ে অনুপমের মৃত্যু হল। শোকে অধীর হয়ে তখন রূপ চিরদিনের জন্য গৌড় ত্যাগ করলেন। শ্রীচৈতন্য নীলাচলে আছেন জানতে পেরে তিনি নীলাচলের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

পুরীধামে এসে শ্রীচৈতন্যের দর্শন পেয়ে রূপ গোস্বামীর কী আনন্দ! রূপ বললেন—"এই নিঃসঙ্গ জীবন আর কেমন করে কাটাবো? বাকি জীবনটা তোমার সেবা করবার অনুমতি দাও।"

মহাপ্রভু বললেন—"তোমার জীবন তো আমার চরণ-সেবার জন্য নয় রূপ। তোমার কাজ কাব্যরচনা।"

রূপ এইবার গভীরভাবে কাব্যসাধনায় মন দিলেন। গৌড়ে থাকতেই তিনি 'হংসদূত' ও 'উদ্ধব সন্দেশ' নামে দুখানি কাব্য লিখেছিলেন। এবার চৈতন্যদেবের নির্দেশে 'বিদগ্ধ মাধব' (শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বিষয়ক) ও 'ললিত মাধব' (শ্রীকৃষ্ণের পুরলীলা বিষয়ক) নাটক দুখানি রচনা করলেন। কাব্য, নাটক, রসগ্রন্থ, স্তোত্র, শাস্ত্রসংগ্রহপুস্তক ইত্যাদি সব মিলিয়ে রূপ গোস্বামী ষোলখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হল 'হরিভক্তি-রসামৃতসিন্ধু' এবং 'উজ্জ্বল-নীলমণি'। ভক্তিসমুদ্র থেকে নীলমণিতুল্য মধুর বা উজ্জ্বল রস আহরণ করেছেন লেখক, তাই এর নাম উজ্জ্বল-নীলমণি। প্রায় দশমাস কাল পুরীতে কাটিয়ে রূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর নির্দেশেই বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। বৃন্দাবনে দেখা হল সনাতনের সঙ্গে। এবার শুরু হল দুজনের কঠোর সাধনা।

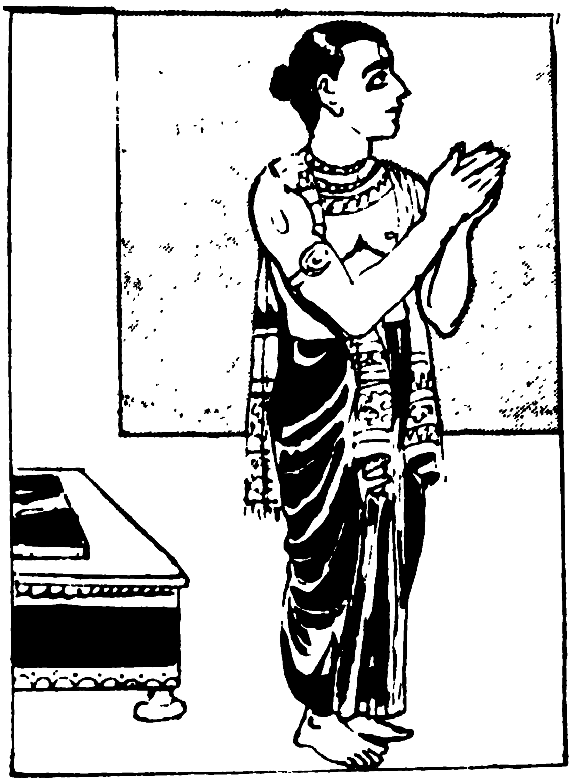
রূপ প্রাচীন শাস্ত্র পাঠ করে জানতে পারলেন যে বৃন্দাবনে যোগপীঠ নামক স্থানে গোবিন্দদেবের বিগ্রহ রয়েছে। যোগমগ্ন হয়ে তিনি গোমাটিলা স্তূপে সেই বিগ্রহের সন্ধান পান। তার পর থেকে গোমাটিলা একটি তীর্থস্থান হয়ে ওঠে।

গোমাটিলাই যে যোগপীঠ, সে খবর পেয়ে ব্রজধামের বৈষ্ণবকুলের আনন্দের সীমা নেই। খবর গেল নীলাচলে মহাপ্রভুরও কাছে। মহাপ্রভু "পুরী পড়ি আনন্দে না পারে স্থির হৈতে।" বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন এক ভক্তকে। মন্দির বানিয়ে দিল সে, গড়িয়ে দিল গহনা, বাঁশি, নানা আভরণ। কুটির থেকে মন্দিরে অধিষ্ঠিত হলেন গোবিন্দদেব; পরে রূপ গোস্বামীর ভাবিন্দশাতেই গোবিন্দমূর্তির পাশে শ্রীরাধিকামূর্তি স্থাপিত হয়।

রূপ এখন অশীতিপর বৃদ্ধ। এখন আর নিজের হাতে কলম ধরতে পারেন না; সাধন-ভজনে অহোরাত্র মগ্ন থাকেন, ভাব যখন উদ্বেল হয়ে ওঠে তখন কণ্ঠ থেকে সহস্রধারায় নির্গত হয় স্তবলহরী সযত্নে সেগুলো লিখে রাখেন ভক্তপ্রবর শ্রীজীব।

১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সনাতনের দেহরক্ষার কয়েক মাস পরে রূপ গোস্বামীও মরদেহ ত্যাগ করে অমর ধামে যাত্রা করেন।

রায় রামানন্দ



পুণ্যতোয়া গোদাবরীতে স্নান সেরে চৈতন্যদেব কৃষ্ণনাম কীর্তন করছেন। এমন সময় দোলায় এক রাজপুরুষ এলেন। ভৃত্য, রক্ষী বাদ্যকর ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ রয়েছে তাঁর সঙ্গে। প্রভুর অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠল রাজপুরুষটির সঙ্গে আলাপ করবার জন্য। তিনিও বিস্মিত হয়ে ভাবছেন, কে এই সুদর্শন সন্ন্যাসী? নিজেই এগিয়ে এলেন সন্ন্যাসীর দিকে। পরস্পরের পরিচয় পেয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন উভয়ে। এই ঐতিহাসিক মিলনের কথা ভক্তকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে:

স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূতলে পড়িলা॥
স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য।
দোঁহার মুখেতে শুনি গদ্গদ কৃষ্ণবর্ণ॥

এই রাজপুরুষের নাম রায় রামানন্দ। প্রভু বললেন: "দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণে আসার সময় বাসুদেব সার্বভৌম আমায় বলেছিলেন, তোমার সঙ্গে একবার যেন অবশ্যই মিলিত হই। আজ তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে আনন্দিত হলাম।"

রামানন্দ উত্তর দিলেন: "সার্বভৌম মশায় আমায় অত্যন্ত কৃপা করেন; নইলে আমার মত দীন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কখনও আপনার মত মহাত্মাকে অনুরোধ করেন! আমি এক রাজভৃত্য, আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ– আপনার দর্শনে আমার জীবন আজ ধন্য।"

শ্রীচৈতন্য বললেন: "তুমি পরম ভাগবত। দেখ রামানন্দ দেখ, তোমার সংস্পর্শে আমার শরীর পুলকিত হচ্ছে। সার্বভৌম অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি—আমার হৃদয়ের যাতে শোধন হয় সেজন্যই তোমার কাছে আমায় পাঠিয়েছেন।"

সেদিন সন্ধ্যায় রাজমহেন্দ্রীতে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন রায় রামানন্দ। উভয়ের মধ্যে ভক্তিসাধনার তত্ত্ব নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা হল। রামরায়ের বক্তব্যের মধ্যে এমনই জাদু আছে যে মহাপ্রভুর কৌতূহল ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। বার বার বলছেন: "এহ বাহ্য আগে কহ আর। আরও গভীর তত্ত্ব শোনাও আমায়।" কৃষ্ণ-আরাধনা, কৃষ্ণে কর্মার্পণ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞানশূন্যা ভক্তি, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, কান্তাপ্রেম, রাধাপ্রেম, কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ—সমস্ত তত্ত্বই পর পর ব্যাখ্যা করলেন রামরায়। তাঁর মুখে অমৃতময়ী ভাগবতকথা শুনে চৈতন্যদেব আনন্দিত, পুলকিত। থর থর করে দেহ কাঁপছে, দুই নয়নে আনন্দাশ্রু। এবার রামানন্দ প্রভুকে শোনালেন স্বরচিত রাধাকৃষ্ণ-মিলনগীতি যেখানে দ্বৈতসত্তা মিশে গিয়েছে অদ্বৈতসত্তায়:

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল॥
ন সো রমণ ন হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভাব পেষল জানি॥
এ সখি! সো সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥

শ্রীভগবান ও শ্রীরাধিকার লীলাবিলাসের চরম পরাকাষ্ঠা ঘটেছে। এই মাধুর্যময় প্রেমমিলনের আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। "কিন্তু রামানন্দ, বল তো কোন্ সাধনপন্থার মাধ্যমে সেই পরমবস্তুর নিকট পৌঁছান যায়।" রামানন্দের সহজ উত্তরঃ "সখী-বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।" গোপীভাবে কৃষ্ণ-ভজনা করলেই ভগবানকে পাওয়া যাবে।

বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই কৃষ্ণতত্ত্বালোচনায় বিভোর। একে অপরকে আলিঙ্গন করছেন। ভাবোন্মত্ত অবস্থায় উভয়ে সে রাত্রি কৃষ্ণকথাসুখে কাটালেন।

মহাপ্রভুর পুণ্যসঙ্গের লোভ রামরায় ছাড়তে পারছেন না। বিনীতভাবে বললেনঃ "প্রভু, তুমি যেচে আমায় কৃপা করতে এসেছ, তা হলে এখানে দিন দশেক থেকে যাও। তোমার শ্রীমুখে কৃষ্ণতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনে আমার হৃদয়মন জুড়িয়ে যাক।" মহাপ্রভু উত্তর দেনঃ "তা নয় রামরায়। আমি এসেছি তোমার মত কৃষ্ণভক্তের মুখে লীলামাহাত্ম্য শুনে জীবন ধন্য করব বলে। দশ-দিনের কথা কী বলছ, তোমাকে আমি আজীবন সঙ্গী হিসেবে চাই। বিষয়কর্ম ত্যাগ করে তুমি নীলাচলে চলে এস, আমিও তীর্থপরিক্রমা শেষ করে সেখানে তোমার সঙ্গে মিলিত হব। অহোরাত্র কৃষ্ণকথামৃত পান করে দুজনে পরিতৃপ্ত হব।"

প্রভু ও রামরায়ের এই মধুর মিলনকাহিনী কী সুন্দরভাবেই না চিত্রিত হয়েছে ভক্ত স্বরূপ দামোদরের চৈতন্য-কড়চায়।

উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের বিশ্বস্ত সচিব ভবানন্দ রায়ের পুত্র রামানন্দ। জন্ম ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে। অল্প বয়সে রামানন্দ উড়িষ্যা সরকারের অধীনে রাজকর্ম গ্রহণ করেন, পরে কর্মদক্ষতার গুণে রাজমহেন্দ্রী পরগনার শাসনকর্তা হন। শ্রীচৈতন্যের দর্শন পাওয়ার পর রামরায়ের জীবনে ঘটল পরম পরিবর্তন। প্রভু তাঁকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন নীলাচল পুরীধামে গিয়ে বসবাস করতে—সেখানেই প্রভু তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন। এ নির্দেশ কি অমান্য করা যায়! রাজা প্রতাপরুদ্রকে আপন মনোবাসনা জানাতেই রাজা তাঁকে সানন্দ সম্মতি দিলেন। শুধু তাই নয়—রাজকোষাগার থেকে তিনি যে বেতন পেতেন তা নীলাচল-বাসকালেও পাবেন—এই নির্দেশও রাজা দিলেন।

দাক্ষিণাত্য পরিব্রাজন সাঙ্গ করে মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরে এসেছেন। রামানন্দ রায়ও এসে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন।

বৈষ্ণব ভক্ত প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে প্রভু পাঠিয়েছেন রামরায়ের কাছে। কৃষ্ণকথা শুনবেন মিশ্র। গিয়ে শুনলেন, রামরায় তাঁর 'জগন্নাথবল্লভম্' নাটকের অভিনয় উপলক্ষে মহড়া দিতে ব্যস্ত, দুই কিশোরী দেবদাসীকে নৃত্যগীতের তালিম দিচ্ছেন, তাদের নিজের হাতে স্নান করিয়ে শাড়ি পরিয়ে দিচ্ছেন। এ কথা শুনে প্রদ্যুম্ন মিশ্র ফিরে এলেন। এ কেমন বৈষ্ণব? স্বহস্তে সুন্দরী তরুণীদের স্নানকালে গাত্রমার্জনা করেন, তাদের প্রসাধন করান, হাতে ধরে নাচগান শেখান! কোন উচ্চকোটির বৈষ্ণবের পক্ষে এটা কি উচিতকার্য? প্রদ্যুম্ন মিশ্র বড় ধোঁকায় পড়লেন। প্রভুকে সব কথা জানাতেই চৈতন্যদেব বললেনঃ "রামানন্দ রায় সমস্ত চিত্তবিকারের ঊর্ধ্বে। তুমি তাঁর কাছেই গিয়ে কৃষ্ণকথা শ্রবণ কর।" প্রদ্যুম্ন তো জানেন না ব্রজরস সাধনার সিদ্ধপুরুষ এই রামানন্দ রায়, রাধাকৃষ্ণের লীলাধ্যানে সদা আবিষ্ট রামানন্দ রায়—তাঁর মধ্যে প্রাকৃতজনের মানসিক বিকার বা চাঞ্চল্য কখনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেদিন রামানন্দ রায়ের সাধন-মাহাত্ম্যটি ভক্তদের সামনে তুলে ধরলেন মহাপ্রভুঃ

রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্বজন।
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য কথন॥
একে দেবদাসী আরো সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গসেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গের হয় তাহা দর্শন স্পর্শন॥
তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ॥
নির্বিকার দেহমন কাষ্ঠ-পাষাণ সম।
আশ্চর্য তরুণীস্পর্শে নির্বিকার মন॥ ......
রাগানুগা মার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধদেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন॥

প্রদ্যুম্ন নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলেন।

ব্রজরস-সাধনার তত্ত্ব বর্ণনায় রামরায় ছিলেন অদ্বিতীয়। দীর্ঘ আঠার বৎসরকাল নীলাচলে মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন তিনি, সঙ্গে স্বরূপ দামোদর। ১৫৩৪ সালে রায় রামানন্দের তিরোভাব ঘটে।

শ্রীনিত্যানন্দ



শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারের প্রধান পার্ষদ হলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। ব্রজের কানাই-বলাই যে নিমাই-নিতাই এই সহজ সরল তত্ত্বই বৈষ্ণব ভক্তদের প্রাণে জাগরিত।

বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে এক দিব্যকান্তি শিশু—কুবের। পিতার নাম হাড়াই পন্ডিত, মাতা পদ্মাবতী। ছোটবেলা থেকেই কুবের খুব শান্ত ও ধর্মানুরাগী। মাত্র বার বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ায়। এইভাবে একদিন বৃন্দাবনে এসে পৌঁছায়। সেখানে পরমসাধক মাধবেন্দ্রপুরীর দর্শনলাভে সে ধন্য হয়। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে সেই 'প্রেমময় কলেবর...কৃষ্ণরস বিনে আর নাহিক আহার' মাধবেন্দ্রপুরীর চরণে আশ্রয় ভিক্ষা করে কুবের বলেঃ "প্রভু, কৃষ্ণপ্রেমে আমায় দীক্ষা দিন, এ অভাজনকে উদ্ধার করুন।" দীক্ষালাভের পর কুবেরের নতুন নামকরণ হল নিত্যানন্দ। এরপর তিনি আবার বেরোলেন তীর্থ পর্যটনে। স্বেচ্ছাবিহারী অবধূত একদিন কৃষ্ণের আহ্বান শুনতে পেলেন—"নবদ্বীপে গিয়ে নিমাই পন্ডিতের ভগবৎপ্রেম-প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ কর।"

সুদূর বৃন্দাবন থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে পৌঁচেছেন। সর্বজ্ঞ শ্রীগৌরাংগ তাঁর আবির্ভাব জ্ঞাত হয়েছেন। ভক্তদের বললেন, "কাল রাত্রে এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখেছি আমি। অনিন্দ্য-সুন্দর এক অবধূত পুরুষ জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, তিনি আর আমি নাকি অভিন্নহৃদয়। আজই নাকি তিনি আমায় দর্শন দেবেন। তোমরা বেরিয়ে পড় দেখ, কোথায় সে মহাপুরুষ রয়েছেন। তাঁকে দেখবার জন্য আমার মনপ্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে।"

ভক্তপার্ষদেরা নবদ্বীপের কোথাও খুঁজে পেলেন না নিত্যানন্দকে। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেই বেরিয়ে পড়লেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সখার অনুসন্ধানে।

নবদ্বীপের রাজপথে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের মিলনদৃশ্য বড় মধুর। একে যেন অপরের জনাই যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করছিলেন। নিতাই ছিলেন নিমাই অপেক্ষা নয় বছরের বড়।

পরের দিন শ্রীবাস পন্ডিতের গৃহে ব্যাসপূজা করবেন শ্রীনিত্যানন্দ। সন্ধ্যাবেলা শ্রীগৌরাঙ্গ উপস্থিত হয়েছেন শ্রীবাস অঙ্গনে। প্রেমাবেশে আজ তিনি উন্মত্ত। সমস্ত দেহ ভাবাবেগে থর থর করে কাঁপছে। অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারের চরম প্রকাশ তাঁর সর্বাঙ্গে—তাই দেখে বিস্ময়াভিভূত ভক্তমন্ডলী। নৃত্য-শেষে নিত্যানন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করে মহাপ্রভু চলে গেলেন নিজভবনে। সে রাত্রিতে শ্রীনিত্যানন্দ রয়ে গেলেন শ্রীবাস-গৃহে।

প্রভাতে উঠে শ্রীবাস দেখেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সংবিৎশূন্য, সন্ন্যাসদন্ড ও কমন্ডলু ভগ্ন। সংবাদ পেয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ ছুটে এলেন। স্নেহভরে ভাবাবিষ্ট

নিত্যানন্দের হাত ধরে নিয়ে এলেন গঙ্গার ঘাটে। সযত্নে স্নান করালেন তাঁকে। এদিকে ব্যাসপূজার সময় আসন্ন। শ্রীবাসের অঙ্গনে ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন প্রস্তুত। মহাপ্রভু পার্ষদ্‌সহ সংকীর্তনে বিভোর। ঘটের ভিতরে নিত্যানন্দ ব্যাসপূজার আসনে সমাসীন। পূজা শেষে ব্যাসদেবের উদ্দেশে মাল্য অর্পণ করতে হবে; কিন্তু নিত্যানন্দের সেদিকে হুঁশ নেই, ভাববিহ্বল হয়ে নিশ্চুপ বসে আছেন। খবর পেয়ে মহাপ্রভু ঘরের মধ্যে এসে বললেন, "শ্রীপাদ, কী করছ তুমি? ব্যাসদেবের উদ্দেশে মালা নিবেদন কর।" অকস্মাৎ নিত্যানন্দের চোখে-মুখে এক অপূর্ব ভাব-লহরী খেলে গেল। তাকিয়ে দেখেন, বহুবাঞ্ছিত ভগবান নয়নবিমোহন রূপ ধারণ করে গৌরসুন্দর বেশে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। পরমানন্দে শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্ঠে সেই পুষ্পমাল্যটি তিনি পরিয়ে দিলেন।

দীর্ঘকাল নবদ্বীপ শহরে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে বিবিধ লীলা করেছেন। সেই সময়ে তাঁর কৃপাপ্রকাশ ও প্রেমদানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ জগাই-মাধাই উদ্ধার। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তিনি ঠাকুর হরিদাস সহ নদীয়ার সর্বত্র প্রচার করছেন—

ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র জপ অবিরাম।

পথে নদীয়ার দুই দস্যুতুল্য কোতোয়াল জগাই-মাধাই তাঁর কণ্ঠে হরিভজনা শুনে রেগে আগুন। মাধাই একটি ভাঙা কলসির কানা ছুঁড়ে মারল নিত্যানন্দ প্রভুর মাথায়। মাথা কেটে রক্তের ধারা প্রবাহিত হল। শ্রীনিত্যানন্দের এই রক্তপাতের কথা শুনে মহাপ্রভু ছুটে এলেন এবং পাপিষ্ঠ মাধাইকে হত্যা করবার জন্য 'চক্র' 'চক্র' বলে বিষ্ণুচক্রকে আহ্বান করলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর চরণে পড়ে নিবেদন করলেন—"প্রভো, তুমি তো এবার প্রেম দিয়ে জগৎ ভাসাবে, চক্র আহ্বান করলে কেন? তোমার পায়ে পড়ি—এদের ক্ষমা কর।"

মহাপ্রভু শান্ত হয়ে দুই ভাই জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করেন। এটিই নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেম-প্রচারের সর্বপ্রথম করুণার দৃষ্টান্ত। এর পর নিত্যানন্দ প্রভু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকতেন এবং প্রেম-প্রচারে সহায়তা করতেন। তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর নিত্য সঙ্গী। শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তনে এবং মহাপ্রভুর কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ কালেও নিত্যানন্দ তাঁর সঙ্গী ছিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে নীলাচল যাত্রায়ও শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন মহাপ্রভুর সঙ্গী।

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বললেন—"নিত্যানন্দ, জীবোদ্ধার তো হল না। তুমি নদীয়ায় যাও; বাংলাকে উদ্ধার কর। আমি মাতৃ-আজ্ঞায় নীলাচলে আছি। বাংলাকে উদ্ধার করে কে? তুমি জীবকে প্রেমদান কর।"

নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর আজ্ঞা পেয়ে সমগ্র বাংলাদেশে নাম-প্রেম প্রচার করলেন। নদীয়া, শান্তিপুর তথা সমগ্র বাংলাদেশ প্লাবিত হয়ে গেল।

"অধম পতিত জনার ঘরে ঘরে গিয়া রে।
ব্রহ্মারও দুর্লভ ধন দেয় বিলাইয়া রে॥
যে না লয় তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি।"

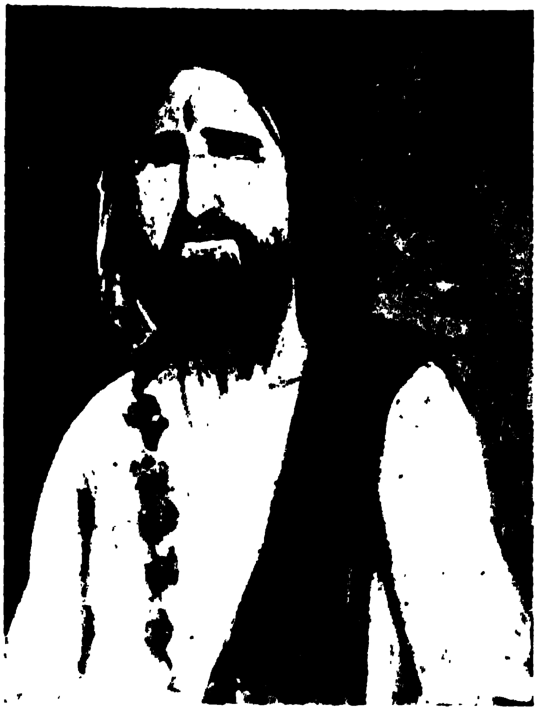
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমবার্তা-প্রচারক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমহাপ্রভুর অভিন্ন কলেবর। তাই মহাপ্রভু একদিন শ্রীপাট পানিহাটিতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে মাধবী-কুঞ্জের তলায় বসে বলেছেন -

"শুন রাঘব, তোমারে গোপ্য কথা কই।
আমার দ্বিতীয় নাই, নিত্যানন্দ বই।"

এত বড় মর্যাদা মহাপ্রভু আর কাউকে দেননি। তখন থেকে রাঘব পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দকে শ্রীগৌরাঙ্গের তুল্য মর্যাদা দিয়ে সেবা করতেন। এখানেই গঙ্গাতীরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীকে দণ্ডপ্রদানের ছলে তাঁকে দিয়ে বিপুল আয়োজনে চিড়া-দধি মহোৎসব করিয়ে তাঁকে কৃতার্থ করেছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ সম্বন্ধে জানা যায়ঃ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তাঁর জননী শচীদেবীর কাছে পুত্র-রূপে অবস্থান করেন শ্রীনিত্যানন্দ। এঁর আগমনে নবদ্বীপ আবার হরিনামের বন্যায় উদ্বেল হয়ে উঠল। গোবর্ধন নামক বৈষ্ণবের অনুরোধে তিনি শালিগ্রামের পণ্ডিত সূর্যদাসের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর ইনি সস্ত্রীক খড়দহ গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন। বীরভদ্র ও গঙ্গা নামে তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। চৈতন্যদেবের লীলাসংবরণের পর ১৫৩২ সালে নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোধান ঘটে।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী



সাধুদের পরিত্রাণের জন্য ও দুষ্কৃতীদের বিনাশের জন্য ভগবান্ যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি এসেছেন মানুষের রূপ ধারণ করে। এই ধরণীর মাটিতেই তাঁর লীলাখেলা চলেছে যুগে যুগে। তাঁকেও মানুষের মত সুখদুঃখের জীবন যাপন করতে হয়েছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও তেমনি এসেছিলেন ভগবানের মাহাত্ম্য প্রচার ও পাপী-তাপী উদ্ধারের জন্য। কিন্তু তাঁকেও দীক্ষাগ্রহণ করতে হয়েছিল। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে তিনি দীক্ষাগুরুরূপে বরণ করেছিলেন।

পুরীপাদের জন্মভূমি কুমারহট্ট। শ্রীচৈতন্যের চরণস্পর্শে সে কুমারহট্ট হয়েছে আরও পবিত্র। ভগবদ্-ভাগবত-চরণধূলি রঞ্জিত সেই স্থান। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, ভক্তচূড়ামণি শ্রীবাস পণ্ডিতের পুণ্য মহিমায় কুমারহট্ট ধন্য। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীধাম মায়াপুর থেকে সেখানে গিয়ে বসবাস করেন।

শ্রীশ্যামসুন্দর আচার্য ছিলেন কুমারহট্ট গ্রামের একজন ধর্মনিষ্ঠ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন বহুগুণ-সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। শুধু কুমারহট্ট নয়, পার্শ্ববর্তী এবং দূরবর্তী বহু স্থানের অধিবাসীরা তাঁকে শ্রদ্ধা করত। সেই ঘর আলো করে একদিন জন্মগ্রহণ করে এক শিশু। সেই শিশুই পরবর্তী জীবনে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীরূপে বৈষ্ণবজগতে খ্যাতিলাভ করেন।

জানা যায়, ১৪০০ শকাব্দের মধ্যে (১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীপাদপুরীর আবির্ভাব ঘটে। প্রথম জীবনে সংস্কৃত বিদ্যা অর্জন করে অল্পদিনের ভিতরেই সর্ব ভক্তিশাস্ত্রে লাভ করেন গভীর পাণ্ডিত্য।

এই ঈশ্বরপুরীর জীবন বড় বৈচিত্র্যময়। তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর নিকটে। গুরুদেবের অভয় চরণে আশ্রয় নিয়ে তিনি তাঁর সেবাকার্যে ব্রতী হন।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গিরি-গোবর্ধনে গোপালের সেবায় নিরত হন। তখন একদিন তাঁর প্রতি গোপালের আদেশ হয় নীলাচল থেকে মলয়জ চন্দন এনে তাঁর গায়ে লেপন করতে হবে।

এই আদেশটি বড় অদ্ভুতভাবে এসেছিল মাধবেন্দ্র-পুরীর কাছে। সেদিন স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দিলেন গোপাল। বললেন, "খুব ঘটা করে তো আমার নিত্য-পূজা করছ পুরী-গোসাঁই! এদিকে প্রচণ্ড গরমে আমি যে আর তিষ্ঠোতে পারছি না। দেহে অসহ্য জ্বালা। এ জ্বালা দূর করার জন্য কী ব্যবস্থা করেছ শুনি?"

পরম প্রভুর কণ্ঠে এ কী অদ্ভুত অভিযোগ! নিখিল মানুষের শোক-দুঃখ যিনি নিবারণ করছেন, যিনি সন্তাপহারক পতিতপাবন, তাঁর দেহযন্ত্রণা!

বিস্মিত মাধবেন্দ্রপুরীর উপর এবার গোপালের আদেশ বর্ষিত হলঃ "আর কাউকে পাঠিও না, নিজে নীলাচলে গিয়ে নিয়ে এস সেই চন্দন।"

প্রভুর এ আদেশ অলঙ্ঘ্য। বৃন্দাবন ত্যাগ করে মাধবেন্দ্রপুরী নীলাচলের পথ ধরলেন। তখনকার দিনে গৌড় হয়ে যেতে হত নীলাচলে। সেই পথে যাত্রা করে শান্তিপুরে এলেন পুরীগোসাঁই। তাঁর প্রিয় ছাত্র অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে মিলিত হলেন তিনি। এক শুভলগ্নে পুরীগোসাঁইর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন অদ্বৈতাচার্য। ভক্তিধর্মের ক্ষেত্রে অংকুরিত হল এক বিরাট বনস্পতির সম্ভাবনা। শান্তিপুর ও নবদ্বীপে কিছুদিন কাটিয়ে মাধবেন্দ্র এগিয়ে চললেন উড়িষ্যার পথে। উপস্থিত হলেন রেমুনায়।

মলয়জ চন্দন নিয়ে রেমুনায় শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথের স্থানে অবস্থানকালে মাধবেন্দ্রপুরী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। শ্রীঈশ্বরপুরী গুরুদেবের এই অসুস্থতায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন। তখন তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে গুরুর সেবা শুশ্রূষা করতে থাকেন। প্রিয় শিষ্যের এই নিঃস্বার্থ সেবায় মাধবেন্দ্রপুরী খুবই সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর সমস্ত কৃষ্ণপ্রেম তিনি উজাড় করে দিয়ে গেলেন ঈশ্বরপুরীকে।

মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময় কলেবর,
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর।
কৃষ্ণরস বিনে আর নাহিক আহার,
মাধবেন্দ্রপুরী-দেহে কৃষ্ণের বিহার।

* *

যত প্রেম মাধবেন্দ্রপুরীর শরীরে।
সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বরপুরীরে॥

সেই কৃষ্ণপ্রেমে ঈশ্বরপুরীও হলেন শক্তিধর। গুরুর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঈশ্বরপুরী কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা করেছিলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী লীলা-সংবরণ করলে ঈশ্বরপুরী আহার নিদ্রা প্রায় ভুলে যান। শোক সংবরণের জন্য তিনি উন্মত্ত অবস্থায় নানাদেশ পরিভ্রমণ করতে থাকেন।

গয়াধামে বিখ্যাত বিষ্ণুপাদপদ্ম-মন্দিরগর্ভে উপস্থিত রয়েছেন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী। সেখানে এসেছেন নিমাই পণ্ডিত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করবার জন্য। বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে ভাবাবিষ্ট হলেন নিমাই। ভাবলেন, অনিত্য সংসারসমুদ্রে বিক্ষুব্ধ ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে চিরভাসমান এই চরণপদ্মই হল একমাত্র সত্য ও অক্ষয় সম্পদ। নিমাই পণ্ডিতের এই ভাবতন্ময় দিব্যমূর্তি দেখে চমৎকৃত হলেন ঈশ্বরপুরী। এগিয়ে এলেন তিনি। চিনতে পারলেন, নবদ্বীপে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নিমাই পণ্ডিতও এই মহাসাধককে দর্শন করে পুলকিত চিত্তে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, "আমার কী সৌভাগ্য! গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পরম বিষ্ণুভক্তেরও সাক্ষাৎ পেলাম। আমাকে দয়া করে দীক্ষা দান করে কৃতার্থ করুন।"

গয়াধামে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শুভক্ষণে ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের কানে মন্ত্র দিলেন। আলিঙ্গন করলেন নিমাই পণ্ডিতকে। সেখানেই পুরীপাদের সঙ্গে মহাপ্রভুর শেষ দেখা। এর পর প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে দক্ষিণদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। দু'বছর ধরে তিনি দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করেন। তারপর আবার প্রভু নীলাচলে ফিরে আসেন। নীলাচলে তিনমাস কাটিয়ে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রার উদ্দেশ্যে গৌড়দেশের দিকে যাত্রা করেন।

ভুবনেশ্বর, কটক, যাজপুর হয়ে শ্রীগৌরচন্দ্র পানিহাটি এসে পৌঁছান এবং সেখান থেকে শান্তিপুরের পথে রওনা হন। গৌরাঙ্গসুন্দর এসে পৌঁছলেন কুমারহট্টে। সেই ভূমিকে প্রণাম করে বললেন "এই মাটি আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়, যেহেতু আমার গুরুদেবের জন্মস্থান এই কুমারহট্ট।"

এর কিছুকাল পূর্বেই শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী দেহরক্ষা করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব এলেন তাঁর জন্মভিটা দর্শনে। জন্মভিটায় এসে তিনি শ্রীপাদের বিচ্ছেদে কাতর হয়ে পড়লেন। অবোধ বালকের মত 'হা গুরুদেব, হা গুরুদেব' বলতে বলতে শ্রীপাদের চরণস্পৃষ্ট কুমারহট্টের পবিত্র ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। এরপর নিজের বহির্বাসে বেঁধে নিলেন গুরুর জন্মভিটার মাটি।

প্রভুকে শ্রীপাদের জন্মভিটার মাটি নিতে দেখে লক্ষ লক্ষ ভক্ত পার্ষদ সেখান থেকে এক ঝুলি মাটি গ্রহণ করতে লাগলেন। এইভাবে মাটি নেবার ফলে সৃষ্টি হল একটি ছোট ডোবা। সেই ডোবা আজও 'শ্রীচৈতন্য ডোবা' নামে বিরাজিত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণধূলি-ধন্য কুমারহট্ট এভাবেই তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে। সেদিনের কুমারহট্ট আজ হালিশহর নামে পরিচিত। তবু কুমারহট্টের নাম বৈষ্ণব সমাজের কাছে অতি পবিত্র।



শ্রীচৈতন্য



নিমাই তাঁর বন্ধু গদাধরকে নিয়ে এসেছেন অদ্বৈত আচার্যের ভবনে।

তখনকার দিনে বাংলার বৈষ্ণবদের মধ্যে অদ্বৈত আচার্য ছিলেন নেতৃস্থানীয়। প্রেমিকশ্রেষ্ঠ মাধবেন্দ্র-পুরীর ইনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য।

আদি নিবাস শ্রীহট্ট হলেও অদ্বৈত স্থায়িভাবে শান্তিপুরেই বাস করছিলেন প্রাসাদোপম 'উপকারিকা' ভবনে। নবদ্বীপেও তাঁর একটি বাড়ি রয়েছে। সেখানেও তিনি মাঝে মাঝে অবস্থান করেন। সেই বাড়িতেই নিমাই এসেছেন।

নিমাইকে দেখে আচার্যের প্রাণে আনন্দের জোয়ার উঠল। তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে কে যেন ডেকে বলে—"ওরে, এই যে তোর বহুপ্রার্থিত ধন। নিখিল মানবের বেদনা-ভার বুকে নিয়ে, পাপীতাপী উদ্ধারের জন্য ইনি আবির্ভূত হয়েছেন।"

বৃদ্ধ আচার্য ভাবাবেগে অধীর হয়ে উঠলেন। তাকিয়ে দেখেন, নিমাই সংবিৎ হারিয়ে পড়ে রয়েছেন মাটিতে। তিনি সেই সংবিৎহীন দেহের সামনে বসে, পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করলেন। শ্রীঅদ্বৈতের এই স্বীকৃতি নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজে নিমাইর এক বিশেষ মর্যাদা এনে দিল। তিনি হয়ে উঠলেন ভক্তজনের হৃদয়প্রভু—শ্রীগৌরাঙ্গ।

১৪০৭ শকাব্দে (১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) এক ফাল্গুনী পূর্ণিমার তিথিতে নবদ্বীপের মায়াপুর পল্লীতে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম। পিতা পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী।

অনিন্দ্যসুন্দর এই শিশু। মিশ্রের প্রথম পুত্রের নাম বিশ্বরূপ। পর পর কয়েকটি পুত্রকন্যার মৃত্যুর পর এবার এই পুত্রের জন্ম। তাই এই পুত্রের নাম রাখা হল নিমাই।

নিমাইর বয়স তখন সাত বছর, হঠাৎ বিশ্বরূপ একদিন গৃহত্যাগ করে চলে যায়। কয়েক বছর পর পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র অকালে মারা যান।

নিমাই দেখতে দেখতে বড় হয়ে ওঠেন। পণ্ডিত-রূপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে! টোল খুলে তখন তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন। মা ব্যস্ত হয়ে পড়েন ছেলের বিয়ের জন্য। বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে তাঁর বধূরূপে ঘরে আনা হয়। কিছুকাল পরে সাপের কামড়ে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হলে শচীদেবী পুত্রের আবার বিবাহ দেন বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে।

আচার্য কেশব কাশ্মীরের এক নামকরা পণ্ডিত। ভারতের প্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্রগুলিতে তিনি ঘুরে বেড়ান আর তর্কযুদ্ধে সকলকে পরাস্ত করেন। নবদ্বীপে এসে তিনি নিমাইর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর পরাজয় ঘটে।

নিমাই গয়াধামে গেলেন পিতার পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেখানে যেতেই তাঁর জীবনে এক পরিবর্তন এল। গয়াধামে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন করে তাঁর হৃদয় অভিভূত হয়ে গেল। দুচোখ বেয়ে নেমে এল অশ্রুর বন্যা। গয়াধামে আকস্মিকভাবে

আবির্ভূত হলেন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী। ঈশ্বরনির্দিষ্ট কর্ম সমাপ্ত করে আবার তেমনি আকস্মিকভাবে সেই সন্ন্যাসী অদৃশ্য হয়ে যান। যে নামমন্ত্রটি নিমাইর কানে দিয়ে যান তাতেই নিমাই ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

সঙ্গীরা বহুকষ্টে নিমাইকে নবদ্বীপে ফিরিয়ে নিয়ে এল। কিন্তু এবার নিমাই নতুন মানুষ। টোল উঠে গেল। দলবল নিয়ে নামকীর্তন করে বেড়াতে লাগলেন। অচিরেই তিনি চিহ্নিত হয়ে উঠলেন প্রেম-ভক্তি-ধর্মের নেতারূপে।

দেখতে দেখতে এসে জুটল তাঁর চিহ্নিত পার্ষদগণ—নিত্যানন্দ, হরিদাস এবং আরও অনেকে। গৌরকান্তি নিমাই হলেন সকলের বন্দনীয় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু—শ্রীচৈতন্য। হরিনামের বন্যায় দেশ ভেসে গেল।

চাঁদ কাজী তখন নবদ্বীপের শাসক। তিনি ছিলেন হিন্দুবিরোধী। তিনি প্রচার করে দিলেন—নবদ্বীপে সমবেতভাবে ও উচ্চ স্বরে কীর্তন করা চলবে না।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ নির্ভীককণ্ঠে বললেন—"নবদ্বীপের পথে আজ সন্ধ্যায় নগরকীর্তন হবে। হরিনামে কে বাধা দেয়, তা আমি দেখব।"

সন্ধ্যা হতে না হতেই শ্রীবাসের আঙ্গিনা থেকে কীর্তনের বিরাট দল নিয়ে বেরোলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। সঙ্গে তাঁর পার্ষদগণ, কীর্তনকারী সেই বিপুল জনতা কাজীর বাড়ির সামনে গিয়ে থামল। কাজী শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এ কি মর্ত্যের জীব না স্বর্গের দূত? তাঁর সমস্ত অহংকার মুহূর্তে চূর্ণ হয়ে গেল। এর পর কাজী শপথ করলেন—"আমার বংশের কেউ তোমার প্রবর্তিত কীর্তন বন্ধ করবে না।"

কাটোয়ার কেশবভারতী ছিলেন একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ। তিনি একবার নবদ্বীপে এলেন। ভারতী মহাশয়ের সঙ্গে গোপনে নিমাইয়ের সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করবার সব ব্যবস্থা স্থির হয়ে গেল। একদিন রাত্রে যখন শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমে অচেতন, নিমাই গৃহ ছেড়ে চলে গেলেন। মস্তক মুণ্ডন করে গেরুয়া কৌপীন ধারণ করে তিনি হলেন সন্ন্যাসী।

নীলাচলে পুরীরাজের সভাপণ্ডিত সার্বভৌমের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গ হয়। সার্বভৌমের ধারণা ছিল যে, চৈতন্যদেবের জ্ঞানের গভীরতা খুব বেশি নেই। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থ একদিন পাঠ করতে করতে সেই বিখ্যাত "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।/ কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ॥" শ্লোকটির নয় রকম ব্যাখ্যা করলেন পণ্ডিত সার্বভৌম। চৈতন্যদেব ঐ শ্লোকের আঠার রকম ব্যাখ্যা করে শোনালেন। সার্বভৌম বিস্মিত হয়ে শ্রীচৈতন্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করে তাঁর মতের অনুবর্তী হলেন।

পুরীতে কিছুদিন অবস্থানের পর বৈশাখের শেষ-ভাগে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যাত্রা করলেন শ্রীচৈতন্য।

দক্ষিণ ভারত পর্যটন শেষে পুরী ফিরে আসেন চৈতন্যদেব। পুরী থেকে তিনি আর একবার বাংলায় এসেছিলেন। নবদ্বীপে এসে শচীমাতাকে দর্শন দিয়ে এবং পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিজের পাদুকাদুটি দান করে তিনি পুনরায় তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। বৃন্দাবনে অবস্থানের সময়ই শ্রীচৈতন্যের ভাবভক্তির পরাকাষ্ঠা ঘটেছিল। প্রয়াগে তাঁর কৃপা লাভ করেন শ্রীরূপ, কাশীতে তিনি আশ্রয় দেন শ্রীসনাতন গোস্বামীকে। উভয়কেই বৃন্দাবনে গিয়ে সাধনভজনের উপদেশ দেন মহাপ্রভু।

কাশী ও বৃন্দাবনে শত সহস্র লোককে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করে শ্রীচৈতন্য ফিরে আসেন নীলাচলে। জীবনের শেষ বারো বছর পুরী ছেড়ে আর কোথাও যাননি।

সাধনভজন বা শাস্ত্রবিচারের জন্য শ্রীচৈতন্য কোন বই লিখে যাননি। শুধু অন্তরঙ্গ ভক্তদের শিক্ষার জন্য কয়টি সংস্কৃত শ্লোক লিখে গেছেন। এর মধ্যে আটটি শ্লোক শিক্ষাষ্টক নামে প্রসিদ্ধ। যেমন

'ন ধনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥'

—হে ঈশ্বর, ধনরত্ন, লোকজন, সুন্দরী নারী, কবিত্ব বা পাণ্ডিত্য কিছুই চাইনে প্রভু, শুধু জন্মে জন্মে তোমার চরণে আমার নিষ্কাম ভক্তি যেন থাকে।

বহু পাপীতাপী উদ্ধার করে ও মধুর হরিনাম প্রচার করে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে লীলাবসান করলেন ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৪৮ বছর।

মীরাবাঈ



যোধপুর রাজ্যে এক সম্ভ্রান্ত রাজপুত গৃহে বিবাহের অনুষ্ঠান চলছে। নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের মধ্যে রাঠোর বংশীয় এক রাজা, তাঁর রানী ও শিশুকন্যা আছেন। বর আর কনেকে দেখে ছোট মেয়েটি মাকে জিজ্ঞাসা করে: "মা, আমার বর কে?" মেয়ের প্রশ্ন শুনে মা তো হেসেই আকুল। মেয়ে কিন্তু নাছোড়বান্দা; বার বার একই প্রশ্ন করে মাকে উত্যক্ত করে তোলে। মা বিরক্ত হয়ে গৃহস্বামী রাজপুতের কুলবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি দেখিয়ে মেয়েকে সান্ত্বনা দেন: "ঐ যে তোর বর!" মেয়ের কচি মন মায়ের কথাই বিশ্বাস করে। সেইদিন থেকে সে গিরিধারীলাল কৃষ্ণের সেবায় নিজেকে সঁপে দেয়।

মেয়েটির নাম মীরা। ষোড়শ শতাব্দীতে—সম্ভবতঃ ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে তার জন্ম। মায়ের সযত্ন লালনে সে বড় হয়ে ওঠে।

মীরার রূপে-গুণে সকলেই মুগ্ধ। যেমন অসামান্য রূপলাবণ্যবতী, তেমনি অসাধারণ গুণে তিনি বিভূষিতা। কুড়ি বছর বয়সে মেবারের রানা সংগ্রামসিংহের পুত্র ভোজের সঙ্গে মীরার বিবাহ হয়। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হয়েও মীরার কিন্তু ধনসম্পদে বা ভোগবিলাসে এতটুকু আসক্তি নেই। গিরিধারীলালের চরণপ্রান্তে তিনি যে নিবেদিতা। সমস্তটা দিন কৃষ্ণনাম আর ভজন-গানেই কেটে যায়, তাতেই তাঁর তৃপ্তি। রাজরানী হয়েও মীরা সন্ন্যাসিনীর মত অতি সাধারণ ভাবে জীবনযাপন করেন।

রাজমাতা পুত্রবধূর এরকম আচরণ পছন্দ করেন না। তা ছাড়া, মেবারের রাজবংশ চির-দিনই শক্তির উপাসক, আর মেবারের নতুন রানী বৈষ্ণবী, একতারা বাজিয়ে কৃষ্ণভজন করেন—এ দৃশ্য কারও সহ্য হয় না। শুধু রাজান্তঃপুরের আত্মীয়রাই নন—রাজ্যের প্রজারাও এ নিয়ে কানাকানি করে।

একদিন ভোজরাজ নিভৃতে পত্নীকে ডেকে বললেন, "তোমার প্রাণের ব্যথা কী, আমায় খুলে বল তো। কী চাও তুমি, কী পেলে তুমি শান্তিলাভও করবে বল।" মধুর কণ্ঠে একটি ভজন গেয়ে মীরা উত্তর দিলেন:

'মেরে ত গিরিধর গোপাল, দুসরো ন কোই
জাতে শির মোর-মুকুট মেরে পতি সোই।'

—গিরিধারী গোপাল ছাড়া আমার কেউ নেই। যাঁর মাথায় ময়ূরমুকুট তিনিই আমার পতি। ভজনটির শেষ দিকে:

'ভাবই মৈ ভগতি কাজ, জগত দেখ মোহী
দাসী মীরা গিরিধর প্রভু, তারো তার মেনী।'

—ভক্তির জন্য এসেছি আমি, ভক্তিই আমার একমাত্র কাজ, জগৎ মোহিত হয়ে তাই দেখছে। হে গিরিধারী, মীরা তোমার দাসী, হে প্রভু, তুমি তাকে তরাও।

রাজমাতা পুত্র ভোজকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন, বধূর আচরণ সম্পর্কে কটাক্ষ করেন। রাজা ভোজ পড়েছেন সমস্যায়। একদিকে পত্নীর ভক্তিভাবমুগ্ধ অবস্থা, অন্যদিকে মায়ের কঠোরতা। দুপক্ষে ভারসাম্য আনতে গিয়ে ভোজ পড়লেন বিপদে।

বিরোধ একদিন চরমে উঠল। পুত্রবধূকে কিছুতেই বাগে আনতে না পেরে রাজমাতা তাঁকে বিষ্ণুপূজা ত্যাগ করে শক্তিপূজা গ্রহণ করতে বললেন। মীরা উত্তর দিলেনঃ "আপনাকে তো বহুবার জানিয়েছি মা, গিরিধারীলালই আমার একমাত্র উপাস্য—তাঁকে পরিত্যাগ করে আমি কিছুতেই শক্তিপূজা গ্রহণ করতে পারব না।"

উত্তর শুনে রাজমাতা ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তিনি মীরাকে শেষবারের মত বললেনঃ "হয় তুমি বিষ্ণুপূজা ত্যাগ কর, নতুবা এ রাজপুরী তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে।" বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা সাধ্বী মীরা রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করলেন।

এদিকে মীরার জীবনে নেমে এল একের পর এক চরম বিপর্যয়। হঠাৎ একদিন মারা গেলেন ভোজরাজ। সংসারজীবনের শেষ বন্ধনটুকু ছিন্ন হয়ে গেল, এখন থেকে প্রাণমন দিয়ে গিরিধারীলালের পূজার্চনা করতে লাগলেন মীরা। এদিকে রানা সংগ্রামসিংহেরও মৃত্যু হল। মেবারের সিংহাসনে বসলেন মীরার পিতা রত্নসিংহ। কিন্তু তিন বছর পরে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তখন তাঁর ছোট ভাই দুষ্টস্বভাব বিক্রমজিৎ মেবারের শাসনভার গ্রহণ করলেন। তাঁর অত্যাচারে প্রজাগণ যেমন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, মীরার জীবনটাকেও তিনি করে তুললেন দুর্বিষহ।

মীরার সাধনভজনে যোগ দিল বহু ভক্তজন। বিক্রমজিৎ এসব পছন্দ করতেন না। সম্পর্কে কাকা হলেও তাঁর লালসা ছিল যুবতী মীরার প্রতি। যে কোন উপায়েই হোক, তিনি চাইলেন সুন্দরী মীরাকে হাতের মুঠোয় পেতে। তাঁর এই দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তিনি নিযুক্ত করলেন তাঁর ভগ্নী উদাবাঈকে এবং দেওয়ান দয়ারামকে। উদাবাঈয়ের লক্ষ ছিল মীরার সঙ্গে মেলামেশা করে তাঁর মনটাকে বিক্রমজিতের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। কিন্তু গোপাল-গোবিন্দের ভজন-সঙ্গীতের মাধ্যমে মীরাবাঈয়ের প্রাণের তীব্র আকুতি এবং কৃষ্ণবিরহ-বেদনা লক্ষ করে উদাবাঈ তার অসৎ উদ্দেশ্যের কথা বিস্মৃত হল। সে জিজ্ঞাসা করল, মীরা, কার জন্য তোমার এই কান্না, কার রূপ-মাধুর্য তোমাকে এমন পাগলিনী করে তুলেছে? একটি অপূর্ব ভজনের মাধ্যমে মীরা তার উত্তর দিলেনঃ হে নন্দলাল, তুমি আমার নয়নে এসে বিরাজ কর। ময়ূর-মুকুট ও মকরকুন্ডলে শোভিত, ভালে বিলেপিত তরুণ তিলক, মোহন মূর্তির শ্যামলশোভা, হে মোর সুন্দর! কণ্ঠে তোমার বৈজয়ন্তী মালা, চরণনূপুরে ধ্বনিত মধুর ঝংকার। হে মীরার প্রভু, সাধুসন্তদের তুমি আনন্দরস বিতরণ কর।

বিক্রমজিৎ বহু চেষ্টা করলেন মীরাকে মেরে ফেলতে; কিন্তু গিরিধারীলাল তাঁর ভক্তকে প্রতিবারই রক্ষা করলেন।

রাজরানী দীনা ভিখারিনী বেশে মেবারপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। হাতে একতারা, কণ্ঠে কৃষ্ণনাম। স্বামীর দেওয়া কিছু অর্থ সঙ্গে ছিল তাই দিয়ে অনাথ দীনহীনের জন্য ধর্মশালা স্থাপন করলেন। পরোপকার ও আতুরসেবায় উৎসর্গ করে দিলেন জীবন।

এইভাবে কয়েক বছর গেল কেটে। এরপর তিনি তীর্থপর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন। ঘুরতে ঘুরতে এলেন বৃন্দাবনধামে। সেখানে তখন মহাসাধক রূপ গোস্বামী বিরাজ করছেন। মীরাবাঈ স্ত্রীলোক বলে রূপ গোস্বামী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাননি। মীরাবাঈ বলে পাঠালেনঃ "বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সকলেই সেই পুরুষের দাসী। গোস্বামীর পুরুষ-অভিমান করা কি ঠিক হয়েছে?"

এরপর রূপ গোস্বামী মীরাবাঈকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন।

মীরাবাঈ এরপর শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র দ্বারকায় এসে রণছোড়জীর মন্দিরে উপস্থিত হলেন। এখানে কৃষ্ণের ভজন আর নামগান করে তাঁর বাকি জীবন কেটে যায়। কথিত আছে, রণছোড়জীর মন্দিরেই ভজন গাইতে গাইতে সাধিকা মীরা ১৫৭৩ সালে দেবমূর্তির সঙ্গে মিশে যান।

মীরার রচিত শত শত ভজন আজও শোনা যায় লক্ষ লক্ষ ভক্তের কণ্ঠে।

গোপাল ভট্ট



শ্রীরঙ্গম্-এ বাস করেন বেংকট ভট্ট। অতি সাধু সজ্জন ব্যক্তি। দেবদেবীর প্রতি তাঁর অপার ভক্তি। তাঁর স্ত্রীও সতী সাধ্বী এবং ভক্তিপরায়ণা।

গৃহদেবতার পূজা এবং নানা ধর্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ দম্পতির দিন পরম সুখেই কাটে। তাঁদের ঘর আলো করে ১৫০০ সালে জন্ম নেয় রূপলাবণ্যময় মনোহর এক পুত্রসন্তান। সন্তান লাভ করবার পর ব্রাহ্মণ দম্পতির গৃহে যেন আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়!

বেঙ্কট ভট্ট আদর করে পুত্রের নাম রাখেন গোপাল। বৃন্দাবনের নওলকিশোর গোপাল যেন এসেছেন—তাঁদের নিরানন্দময় গৃহকে আনন্দে ভরে তুলতে।

গোপাল বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর শরীরে নানা দিব্য ভাব প্রকাশ পেতে থাকে। কালে যে তিনি একজন পরম সাধক মহাপুরুষ হয়ে উঠবেন তাতে কারও মনে সংশয় থাকে না।

দেবতার প্রতি ভক্তি, নির্জনতার প্রতি আসক্তি, ধর্মশাস্ত্র পাঠের প্রতি গভীর আগ্রহ গোপালকে যেন প্রতিনিয়তই এক নতুন আধ্যাত্মিক পথের সন্ধান দিতে থাকে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী যেন এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনকে আন্দোলিত করতে থাকে।

আশ্চর্যভাবে একদিন গোপালের মনের আশা পূর্ণ হয়। তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আসেন শ্রীরঙ্গমে। অতিথিবৎসল বেঙ্কট ভট্ট পরম আদরে মহাপ্রভুকে তাঁর বাড়িতে স্থান দেন। এখানেই মহাপ্রভু চারমাস কাল অবস্থান করেন।

শ্রীচৈতন্যদেব বেঙ্কট ভট্টের পুত্রকে দেখেই বুঝতে পারলেন তাঁর ভিতর এক ঐশী শক্তি নিহিত আছে। তিনি তাঁর মনের ভক্তিভাবকে উজ্জ্বলতর করলেন এবং তাঁকে দান করলেন হরিনাম মন্ত্র।

মহাপ্রভু চলে গেলেন তাঁর তীর্থপরিক্রমায়। এদিকে শুরু হল গোপাল ভট্টের শিক্ষা ও সাধনা। চৈতন্যদেব যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, ছেলেকে পণ্ডিত করে তুলতেই হবে। পিতার তত্ত্বাবধানে গোপাল অধিগত করেন শাস্ত্রের পর শাস্ত্র। মহাপ্রভু আরও বলে গেছেন, বিবাহ না করে বাবা-মায়ের সেবা করে যেতে, তারপর বৃন্দাবনে গিয়ে সাধনা করতে। এমনি করে কাটে কুড়ি বছর। তারপর বেঙ্কট ভট্ট ও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হলে গোপালের সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তি হল।

ক্রমে বিষয়ের প্রতি গোপাল ভট্টের আকর্ষণ কমতে লাগল। তারপর একদিন গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন বৃন্দাবনধামে।

বৃন্দাবনে রূপ ও সনাতন গোস্বামী সাদরে গ্রহণ করলেন গোপাল ভট্টকে। নীলাচলে মহাপ্রভুর কাছেও সংবাদ পাঠানো হয়েছে। গোপালের মনে ক্ষীণ আশা, প্রভু হয়ত তাঁকে ডেকে পাঠাবেন শ্রীক্ষেত্রে, বহু-আকাঙ্ক্ষিত দর্শনের সুযোগ ঘটবে এবার। না, তা হল না। মহাপ্রভু কাছে ডাকলেন না তাঁকে। কিন্তু নিজের

কাষ্ঠাসন, ডোর, কৌপীন আর বহির্বাস পাঠিয়ে দিলেন ভক্ত গোপালের জন্য। ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন রূপ-সনাতন। নিজের আসন পাঠিয়ে প্রভু গোপালকেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন। গোপালই এখন বৃন্দাবনে বৈষ্ণব সমাজের কর্তা। সকলের আগ্রহে, নিজেকে মহাপ্রভুর প্রতিনিধি জ্ঞানে, গোপাল ভট্ট উপবেশন করলেন সেই পবিত্র আসনে।

মহাপ্রভু স্বহস্তে লিখে একটি চিঠিও পাঠিয়েছিলেন রূপ-সনাতনকে। বলেছিলেন, গোপালকে ভাই-জ্ঞানে সমাদর করো। গোপাল সেই চিঠি বার বার মাথায় ঠেকিয়ে কেঁদে ফেললেন—তাঁর মত সামান্য ভক্তকে প্রভুর এত কৃপা! নিজের আসন-বসন পাঠিয়ে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁকে অন্তরঙ্গ বলে! এ আনন্দ রাখবার জায়গা কই?

বৃন্দাবনে নতুন জীবন শুরু হল শ্রীগোপাল ভট্টের। সংসারের চিন্তা অনেকদিন আগেই মন থেকে দূর হয়েছে। এখন ভজনসাধন ও শালগ্রামশিলার সেবাই তাঁর জীবনে মুখ্য হয়ে দাঁড়াল।

গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে আসার কিছুদিন পরেই মহাপ্রভুর তিরোধান ঘটে। বৃন্দাবনের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। কিন্তু রূপ-সনাতন গোপাল এই তিন গোস্বামী শক্ত হাতে হাল ধরলেন। একসাথে আলোচনা করে পরস্পরের অভিমত নিয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিতেন, পরিচালনা করতেন। বৈষ্ণবদের আচরণীয় যে সব সিদ্ধান্ত ও নির্দেশিকা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয় তার সবই এই তিন গোস্বামীর সমবেত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। দীক্ষা দানের দায়িত্বও বর্তায় গোপাল ভট্টের উপর। স্বয়ং মহাপ্রভু যাঁর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে নিজের আসন পাঠিয়েছিলেন, তিনিই তো দীক্ষাদানের যোগ্যতম ব্যক্তি।

বৃন্দাবনে মাঝে মাঝেই অনেক ধনী ব্যক্তি দেবতার মন্দির ও বিগ্রহ দর্শনের জন্য আসেন। তাঁরা দান ধ্যানও করেন প্রচুর। একবার এক ধনী ভক্ত সাধুদের বিগ্রহ-সেবা দেখে দেবতাদের জন্য অনেক দামী কাপড় ও অলংকার দান করলেন। সেই ধনী ব্যক্তি গোপাল ভট্টের শালগ্রামকেও বস্ত্র ও অলংকার দান করে গেলেন।

গোপাল ভট্টের মনে বড় দুঃখ হল। হায়রে, আমার ঠাকুরের হাত পা নেই। যদি থাকত কতই না ভালো হত—তাঁকে মনের আনন্দে বস্ত্র ও অলংকার পরাতাম।

মনে এই দুঃখ নিয়েই গোপাল ভট্ট সেদিন শালগ্রামের সেবা করলেন। মনে মনে প্রার্থনা করলেন—"প্রভু, এই বস্ত্র ও অলংকার কি তোমার অঙ্গে শোভা পাবে না? তোমার ভুবনমোহন রূপ দেখে কি আমার জীবন ধন্য হবে না?"

পূজার্চনা সেরে ও প্রসাদ গ্রহণ করে গোপাল ভট্ট শয়ন করলেন। রাত্রিবেলায় স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর শালগ্রামশিলা দেবতার মূর্তি ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন। জীবন্ত সেই মূর্তি। তাঁর দিকে তাকিয়ে মধুর হাসি হাসছেন।

গোপাল ভট্টের ঘুম ভেঙে গেল। কী আশ্চর্য স্বপ্ন! বাকি রাত আর তিনি ঘুমাতে পারলেন না। আকাশের আলো ফুটে উঠতেই তিনি প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নান করে উপস্থিত হলেন পূজার ঘরে। কিন্তু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

দেখলেন ভক্তাধীন ভগবান্ সত্যিই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছেন। রাতে তিনি যে স্বপ্ন দেখেছেন সেই স্বপ্ন সত্যিকার রূপ ধারণ করেছে। শালগ্রামশিলা গ্রহণ করেছেন দেবতার মূর্তি। শুধু তাই নয়, ভগবান্ নিজেই বস্ত্র ও অলংকার তাঁর অঙ্গে ধারণ করেছেন।

দরিদ্র যেন মহাধন লাভ করল। গোপাল ভট্ট আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর সব সাধ পূর্ণ হল। তিনি বিগ্রহের নাম রাখলেন 'শ্রীরাধারমণ'।

ভট্ট গোস্বামীর অলৌকিক মহিমার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেদিন থেকে তিনি চিহ্নিত হলেন পরম সাধকরূপে। বহু ভক্ত ও অনুরাগী দলে দলে এসে বৃন্দাবনে ভিড় করতে লাগলেন।

গোস্বামী গোপাল ভট্ট কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের টীকা ও 'বৃন্দাবন মঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করলেন। সংকলন করলেন 'হরিভক্তিবিলাস' নামক একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

১৫৮৫ সালে পঁচাশী বছর বয়সে তাঁর তিরোধান ঘটে। শ্রীরাধারমণের বিগ্রহ আজও বৃন্দাবনে সগৌরবে বিরাজ করছে। ভট্ট গোস্বামী তাঁর প্রিয় শিষ্য গোপীনাথ দাসকে বিগ্রহসেবার ভার দিয়েছিলেন। তার পর থেকে তাঁর বংশধররাই বৃন্দাবনধামে শ্রীরাধারমণের সেবাকার্য চালিয়ে আসছেন।

রঘুনাথদাস গোস্বামী



পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবাব হোসেন শাহের আমলে হুগলী জেলার সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত সপ্তগ্রাম বাংলার প্রসিদ্ধ বন্দর ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন বিশিষ্ট নগর ছিল। এই নগরেরই এক প্রান্তে ছিল শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রাম। এই গ্রামে হিরণ্য ও গোবর্ধনদাস বহু সম্পত্তির মালিক ছিলেন।

শ্রীহিরণ্য ও গোবর্ধনদাস ছিলেন কায়স্থ কুলোদ্ভব। রাজপ্রদত্ত উপাধি মজুমদার। গোবর্ধন মজুমদারের গৃহ উজ্জ্বল করে শ্রীরঘুনাথদাস আবির্ভূত হন ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে। এই বৈষ্ণব তাপস অন্তর্ধান করেন ১৫৯২ সালে। সেই হিসাবে মোটামুটি ৯১ বৎসর কাল তিনি বেঁচে ছিলেন। তার মধ্যে গৃহে ছিলেন ১৯ বছর, নীলাচলে ছিলেন ১৬ বছর আর ৫৬ বছর বাস করেছিলেন বৃন্দাবনে।

ছোটবেলা থেকেই রঘুনাথদাস ছিলেন ভক্তিমান, বিনয়ী ও প্রতিভাসম্পন্ন। ধর্মে তাঁর গভীর অনুরাগ। হরিদাস বাবাজীর সংকীর্তন শুনে বালকের কোমল প্রাণ ভক্তিতে উদ্বেল হয়ে ওঠে। বাড়ির কাছেই চাঁদপুর গ্রাম; সেখানে বলরাম আচার্যের গৃহে বালক রঘুনাথের অধ্যয়ন শুরু হয়। স্মরণশক্তি প্রবল থাকলেও পাঠ্য-পুস্তকের প্রতি মনোযোগ তাঁর ছিল না। যে মুহূর্তে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনলেন, সেই মুহূর্তেই মনে মনে নিজেকে বিকিয়ে দিলেন তাঁর চরণে। ঘরে আর মন টেঁকে না। গৃহত্যাগের সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

অনেকদিন এমন ঘটনা ঘটেছে যে রঘুনাথ চলে গিয়েছেন অনেক দূরে—এদিকে বাড়িতে খোঁজাখুঁজি পড়ে গিয়েছে। শেষে খুঁজে অনেক কষ্টে রঘুনাথকে বাড়িতে আনা হল।

পিতা গোবর্ধনদাস বুঝতে পারলেন পুত্রের মনে গৃহত্যাগের সংকল্প প্রবল হয়ে উঠেছে। তাই তিনি ছেলেকে কড়া পাহারায় রাখবার ব্যবস্থা করলেন। তার উপর নজর রাখবার জন্য পাঁচজন পাহারাদার রাখা হল —সান্ত্বনা দেওয়া এবং সেবা-শুশ্রূষার জন্য রাখা হল কয়েকজন দাসদাসী।

রঘুনাথ একদিন শুনতে পেলেন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে মহাপ্রভু অবস্থান করছেন। তখন বাবার কাছে রঘুনাথ আবদার ধরে বসলেন—"বাবা, আমাকে অন্ততঃ একবার শান্তিপুরে যেতে দাও। আমি মহাপ্রভুকে দর্শন করব।"

অনেক কাকুতি মিনতির পর গোবর্ধনদাস পুত্রকে শান্তিপুরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

মহাপ্রভুকে দর্শন করে ধন্য হলেন রঘুনাথ। পদতলে পড়ে কেঁদে বললেন—"প্রভু, আমাকে তোমার চরণে আশ্রয় দাও।" মহাপ্রভু রঘুনাথকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—"যাদের অন্তরে বৈরাগ্য জেগেছে, তারা বহিঃসাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্তরের বৈরাগ্য বাইরে প্রকাশ না করে নির্লিপ্তভাবে সাংসারিক দায়িত্ব পালন করলে প্রকৃত ফল পাওয়া যায়। যারা পরকে দেখাবার

জন্য বৈরাগ্য অবলম্বন করে তাদের কখনও ইষ্টলাভ হয় না। তুমি আগের মত সংসারের কর্তব্য পালন করে যাও, ঈশ্বর অবশ্যই তোমাকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেবেন। আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি যখন বৃন্দাবন পরিক্রমা করে নীলাচলে অবস্থান করব, সেই সময়ে তুমি আমার আশ্রয় পাবে।"

ব্যথাভারাক্রান্ত হৃদয়ে রঘুনাথ ঘরে ফিরে এলেন।

দয়াল ঠাকুর নিত্যানন্দ পানিহাটি এসেছেন হরিনাম বিলোবার উদ্দেশ্যে। রঘুনাথ ঠিক করলেন তাঁর কৃপায় বন্ধনদশা ঘোচাবেন। জ্যেঠা ও বাবা—হিরণ্য আর গোবর্ধন আপত্তি করলেন না, কারণ রঘুনাথ তখন বিষয়সম্পত্তির কাজকর্ম ভালোই দেখাশুনা করছেন। সপ্তগ্রাম থেকে পানিহাটি বেশি দূরও নয়, সঙ্গে পাহারাওলাও থাকবে। লোকজন সঙ্গে নিয়ে রঘুনাথ গেলেন নিত্যানন্দ-দর্শনে। পরম স্নেহে নিত্যানন্দ কাছে টেনে নেন তাঁকে। রঘুনাথের মাথায় তুলে দেন দুই পা। সকৌতুকে বললেন, "ওরে চোরা, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলি। এবার ধরে ফেলেছি, তোকে দন্ড দেব!" রঘুনাথ চোর, কেন না তিনি নিজের ভক্তরূপটি সাধারণের নিকট গোপন করে বাপ-জ্যেঠার বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করছেন। এই চুরির শাস্তি তাঁকে পেতেই হবে। কিন্তু শাস্তিটা কী? নিত্যানন্দের সমস্ত ভক্ত-পরিজনদের দই-চিঁড়ে ফলার খাইয়ে খুশি করতে হবে। দন্ডবিধান শুনে রঘুনাথের তো আনন্দ আর ধরে না। তখন লোকজনদের পাঠিয়ে দই-চিঁড়ে-সন্দেশ যোগাড় করে আনালেন, তারপর হাজার হাজার ভক্তমানুষকে ফলার খাইয়ে পরিতৃপ্ত করলেন। নিত্যানন্দ আশ্বাস দিলেন রঘুনাথকে—মহাপ্রভুর ডাক পেতে আর দেরি নেই তার।

রঘুনাথ যথাসময়ে মহাপ্রভুর আশ্রয় লাভ করলেন। তিনি হলেন মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী।

শ্রীচৈতন্যদেব পরম আদরে বুকে তুলে নিয়েছেন। ভক্ত রঘুনাথকে। সদ্যপরিণীতা সুন্দরী স্ত্রী, পিতার বিপুল বিষয়সম্পত্তি—সব আকর্ষণ ত্যাগ করে মহাপ্রভুর শরণ নিয়েছেন রঘুনাথ। প্রভু তাঁর শিক্ষার ভার অর্পণ করলেন প্রিয় শিষ্য স্বরূপ দামোদরের উপর। আহারে-আচরণে শুরু হল কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন।

সন্তুষ্ট হয়ে মহাপ্রভু তাঁকে দান করেন দুটি প্রিয় জিনিস। একটি গোবর্ধন শিলা, আর একটি গুঞ্জা মালা। মালাটি বক্ষে ধারণ করে মহাপ্রভু শিলাখন্ডটির পূজা করতেন আর শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধনলীলা স্মরণ করে ভাবাকুল হতেন। শিক্ষাগুরু স্বরূপ দামোদর এই দুটি দানের অর্থ বুঝিয়ে দিলেন রঘুনাথকে সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য তাঁকে যেতে হবে বৃন্দাবনে আর রাধারানীর চরণই হল তাঁর একমাত্র আশ্রয়।

এমনি করে কাটল দীর্ঘ ষোল বৎসর। তারপর হঠাৎ লীলা সংবরণ করলেন মহাপ্রভু। বিরহ সইতে না পেরে স্বরূপ দামোদরও প্রাণত্যাগ করলেন। শোকে মুহ্যমান রঘুনাথ—চলে গেলেন বৃন্দাবনে। সনাতন ও রূপ গোস্বামী তাঁকে পরম স্নেহে বুকে টেনে নিলেন। বৃন্দাবনে শুরু হল রঘুনাথ গোস্বামীর কঠিন সাধনা।

শ্যামকুন্ড ও রাধাকুন্ড কলিকালে বিলুপ্ত হয়েছিল—শ্রীগৌরাঙ্গ তা পুনরুদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু ঐ কুন্ড দুটিতে অল্পমাত্র জল ছিল। রঘুনাথের ইচ্ছা হল, তাকে জলপূর্ণ করবেন।

কিন্তু কিভাবে তা সফল হবে? কুন্ড দুটি সংস্কার করতে হলে অনেক অর্থের প্রয়োজন। এত অর্থ কোথায় পাওয়া যাবে?

এদিকে এক শ্রেষ্ঠী স্বপ্নে আদেশ পেয়ে ব্রজধামে শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর কাছে হাজির হল। রঘুনাথদাসকে বলল—"আপনি অনুমতি দিন, যত অর্থ লাগে, আমি দেব। ঐ কুন্ড দুটি আমি সংস্কার করতে চাই।"

রঘুনাথ কোন আপত্তি করলেন না। কুন্ডদুটির পঙ্কোদ্ধারের জন্য বহু লোক নিযুক্ত হল। শুরু হল সংস্কারের কাজ। সুনির্মল জলে কুন্ড পূর্ণ হয়ে গেল।

রাধাকুন্ড বাসের সময় রঘুনাথদাসের সংগী ছিলেন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের লেখক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ।

এই পবিত্র রাধাকুন্ডের তীরেই যোগাবলম্বনে রঘুনাথের আত্মা একদিন পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায়। রঘুনাথ-রচিত উপদেশামৃত, মনঃশিক্ষা, শ্রীচৈতন্যস্তব কল্পবৃক্ষ, বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি, শ্রীপ্রেমাম্বুজ-মকরন্দ নামক স্তবরাজ ইত্যাদি ক্ষুদ্রাকার পুস্তকগুলি বৈষ্ণব-সমাজে অতিশয় সমাদৃত।

রঘুনাথ ভট্ট



পদ্মার ওপারে পূর্ববঙ্গের রামপুর গ্রামে বাস করতেন তপন মিশ্র। স্বয়ং নিমাই পণ্ডিত সেই গ্রামে পদার্পণ করে ব্রাহ্মণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কাশীধামে গিয়ে সপরিবারে বাস করতে। সেই থেকে তপন মিশ্র কাশীবাসী। সেখানেই জন্মগ্রহণ করে তাঁর পুত্র—রঘুনাথ। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ।

তারপর কেটে গেছে আরও আট-নয় বছর। তপন মিশ্রের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল। শ্রীচৈতন্য এসেছেন কাশীধামে। দু মাস থাকলেন সেখানে, আহার করতেন তপন মিশ্রের বাড়িতে। মহাপ্রভুর সেবা করত বালক রঘুনাথ। একদিন প্রভু কাশী ছেড়ে চলে গেলেন নীলাচলে। রঘুনাথ লেখাপড়া করে বটে কিন্তু বার বার চোখের সামনে ফুটে ওঠে সেই নবীন সন্ন্যাসীর দিব্যকান্তি রূপ, মনে পড়ে তাঁর সুস্মিত সম্ভাষণ। সেই মন নিয়েই রঘুনাথ ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে, নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়।

যুবক রঘুনাথ, পণ্ডিত রঘুনাথ। কোন্ এক অদৃশ্য মহাপুরুষ কেবলি তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকেন। অন্তরে যে ডাক পেয়েছে মহানের, সে কি বসে থাকতে পারে মহালে! শ্রীধাম পুরীক্ষেত্রে রথযাত্রা হবে। বারাণসী থেকে পায়ে হেঁটে রঘুনাথ গিয়ে উপস্থিত হলেন পুরীধামে। দর্শন পেলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের। প্রায় দেড় যুগ পরে দেখা—তবু দেখামাত্রই প্রভু তাঁকে চিনতে পারলেন। অপার স্নেহভরে আলিঙ্গন দিলেন তাঁকে। তার পরেকার দিনগুলো কাটতে লাগল পরম আনন্দে। প্রত্যহ মহাপ্রভুকে দর্শন করেন, তাঁর শ্রীমুখে উপদেশামৃত শ্রবণ করেন, অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করে খাওয়ান পরিতুষ্টি সহকারে। এইভাবে আট মাস চলার পর প্রভু তাঁকে আদেশ করলেন গৃহে ফিরে গিয়ে বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করতে। আর উপদেশ দিলেন চারটি: 'বিবাহ না করিহ', 'বৃদ্ধ মাতা পিতা করহ সেবন', 'বৈষ্ণবস্থানে ভাগবত করহ অধ্যয়ন' এবং 'পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে'।

চৈতন্যদেব রঘুনাথকে আলিঙ্গন করে নিজের কণ্ঠমালা খুলে ভক্তের গলায় পরিয়ে দিলেন। স্নেহাপ্লুত রঘুনাথ চোখের জলে বিদায় নিলেন নীলাচল থেকে।

বারাণসীতে ফিরে মহাপ্রভুর প্রতিটি নির্দেশ নিষ্ঠাভরে পালন করে চললেন রঘুনাথ। মা-বাবার একনিষ্ঠ সেবা আর নিত্য ভাগবতপাঠ-রসসাগরে অবগাহন—এই নিয়েই থাকেন রঘুনাথ।

একে একে বাবা ও মা গত হলেন। এখন আর কোন বন্ধনই রইল না। মনে পড়ে গেল প্রভুর চতুর্থ উপদেশ: আর একবার এসো নীলাচলে। রঘুনাথ ছুটে গেলেন পুরীধামে।

মহাপ্রভুর সঙ্গে আবার মিলন হল ভক্তের। প্রভু তাঁকে নিত্যসঙ্গ দানে ধন্য করলেন, সাধনতত্ত্বের গভীরে ডুবে যাবার পথ বাতলে দিলেন। রঘুনাথ যেমন সুদর্শন, তেমনি সুকণ্ঠ। কৃষ্ণরসাস্বাদনের উদ্দেশ্যে নিত্য ভাগবত পাঠ ও শ্রবণ করেন। অপূর্ব মধুর কণ্ঠ-সঙ্গীতে কৃষ্ণপাদপদ্মে হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করেন। পুরো আট মাস শ্রীচৈতন্য তাঁর পরম ভক্তকে কাছে রেখে

ভাগবতসাধনার পূর্ণ অধিকারী করে তুললেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু ঠিকই বুঝেছিলেন রঘুনাথের মনটি খাঁটি সোনায় তৈরি—কোন খাদ নেই তাতে।

ভাগবতসাধনার প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত। এবার তার বিস্তার। মহাপ্রভু রঘুনাথকে ডেকে বললেনঃ 'তোমার নীলাচলে অবস্থানের আর প্রয়োজন নেই। এবার যেতে হবে বৃন্দাবন। সেখানে আছে আমার পরম ভক্ত রূপ আর সনাতন। তাদের কাছে গিয়ে থাকো, ভাগবত পড় আর কৃষ্ণকথা শ্রবণ কর, কৃষ্ণনাম কীর্তন কর। তবেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে।'

জগন্নাথদেবের চৌদ্দ হাত লম্বা তুলসীমালা মহাপ্রভু পেয়েছিলেন মহোৎসবে। রঘুনাথকে সেই মালা দিলেন। সেই মালা মাথায় করে বৃন্দাবনে চলে এলেন রঘুনাথ ভট্ট। রূপ-সনাতনের আশ্রয়ে থেকে পরমানন্দে ভাগবত পাঠ করেন আর কৃষ্ণনাম জপ করেন -

রূপ গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় মন॥
অশ্রু কম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র কণ্ঠ রোধে বাষ্প না পারে পড়িতে॥

সেই মধুর ভাগবতপাঠ শুনতে শুনতে শ্রোতাদের নয়ন সজল হয়ে ওঠে।

আত্মপ্রচারবিমুখ ভট্ট রঘুনাথ ভাগবতরসে নিমজ্জিত হয়ে থাকেন। পাণ্ডিত্য দেখাবার লোভ নেই, বিগ্রহ বা কুঞ্জ স্থাপনে অভিলাষ নেই, গ্রন্থরচনায় নেই কোন আগ্রহ। শিষ্য করবারও ইচ্ছা নেই কাউকে। তবু বঙ্গদেশ থেকে কেউ দীক্ষাগ্রহণের অভিলাষে এলে রূপ-সনাতনের নির্দেশে তাকে দীক্ষা দিতেই হয়- 'গৌড়িয়া আইলে রঘুনাথ কৃপাপাত্র'। কিন্তু মন তাঁর নিরন্তর পড়ে থাকে শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে—

গোবিন্দ-চরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ যাহার প্রাণ-ধন॥

নীলাচলে গদাধর পণ্ডিতের ভাগবত-পাঠে বৈষ্ণব ভক্তকুল চোখের জলে ভাসেন। নিজে কেঁদে সবাইকে কাঁদান গদাধর। বৃন্দাবনে এমন প্রাণকাঁদানো মন-ভরানো পাঠক তো কেউ ছিলেন না। রঘুনাথ ভট্ট সেই অভাব পূরণ করলেন। রঘুনাথ প্রিয়দর্শন, সুকণ্ঠ, ভক্তিমান পাঠক। ভক্তিরসে আকণ্ঠ ডুবে তিনি শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে ভক্তিসাগরে অবগাহন করাতে জানেন। হৃদয়ের রস নিঙড়ে তিনি ভাগবতের নির্যাস ব্যাখ্যা করেন ভক্তবৃন্দের কাছে। সেই অপূর্ব ভাগবতপাঠ শুনতে শুনতে চোখের জল আর বাধা মানে না। মহাপণ্ডিত হয়েও রঘুনাথের মনে পাণ্ডিত্যাভিমান নেই, বিনয়ের পূর্ণাবতার তিনি। মহাপ্রভু চৈতন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচারক -রঘুনাথকেই ভাগবতপাঠের যোগ্যতম ব্যক্তি জ্ঞান করে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছেন তাঁকে। রোজ সন্ধ্যায় গোবিন্দজীর মণ্ডপে রঘুনাথ ভাগবত নিয়ে বসেন। সুর করে উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ করেন অমৃতময় কথা

পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥

গোবিন্দমন্দিরের জগমোহনে ভাগবতপাঠ চলে দিনের পর দিন। বাকি সময় কাটে পূজার্চনা, ভজন ও কৃষ্ণকথায়। ভুলেও কখনও পরনিন্দা পরচর্চা করতেন না। সরল মনে বিশ্বাস করতেন, সকলেই কৃষ্ণভজনে ব্যাপৃতঃ

গ্রাম্যবার্তা নাহি শুনে না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়॥
বৈষ্ণবের নিন্দাকর্ম নাহি শুনি কানে।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে এইমাত্র জানে॥

গোবিন্দজীর মন্দিরটি ছিল ছোট। রঘুনাথ নিজ শিষ্যকে বলে গোবিন্দজীর নতুন মন্দির নির্মাণ করালেন আর ঠাকুরের জন্য 'বংশী মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল'। অহোরাত্র কেবল গোবিন্দকথা আর কৃষ্ণগান কীর্তন করেই কাটে ভট্ট রঘুনাথের। সেই অবস্থাতেই ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে, মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে কৃষ্ণচিন্তা করতে করতে মহাসমাধিতে লীন হয়ে গেলেন রঘুনাথ ভট্ট।

জীব গোস্বামী



বি[illegible] মায়ের [illegible] শিশুপুত্রকে নিয়ে [illegible] চন্দ্রদ্বীপে। [illegible] রূপ ও সনাতনের ছোট ভাই অনুপম গোস্বামী তাঁরই ছেলে [illegible] ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে জীবের জন্ম হয়। [illegible] রূপ ও সনাতনের ভক্তিসাধনার কথা শুনে [illegible] অঙ্কুরিত হয়।

ঠাকুর নরহরি চক্রবর্তী রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে জীবের বাল্যজীবনের অতি মনোহর বর্ণনা আছে। কৃষ্ণলীলার অনুকরণে বালক সাথীদের সংগে সে খেলা করে, মনের আনন্দে বসে বসে তৈরি করে কৃষ্ণ বলরামের যুগলমূর্তি। তিলকচন্দন, পুষ্পমাল্যে সেই মূর্তি সাজিয়ে তোলে। ভক্তিতে রসে বালকচিত্ত বিভোর। মায়ের মনে পড়ে যায়, মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ যেবার রামকেলিতে আগমন করে রূপ ও সনাতনকে দর্শনদানে ধন্য করে যান, সেদিন অনুপম-পত্নীও প্রভুকে প্রণাম করে নিজের দু'বছরের শিশুপুত্র জীবকে তাঁর চরণতলে শুইয়ে দিয়েছিলেন। মহাপ্রভু সেদিন পরম স্নেহভরে শিশুটির প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। আজ কিশোর জীবের অন্তরে বৈরাগ্যের রেখাপাত দেখে মায়ের মন অজানা শঙ্কায় ভরে ওঠে।

বিশ বছর বয়সে ত্যাগব্রতের ভিক্ষাঝুলি কাঁধে নিয়ে শ্রীজীব পথে বেরিয়ে পড়েন। আর কখনও সংসারে ফিরে আসেননি।

নবদ্বীপে পৌঁছে তাঁর আনন্দের সীমা নেই। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখতে পেয়ে তাঁর চরণতলে লুটিয়ে পড়লেন। প্রভু নিত্যানন্দ তাঁকে আশীর্বাদ করলেন এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের স্মৃতিজড়িত স্থানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখালেন। শ্রীচৈতন্যের শেষ স্মৃতিচিহ্নজড়িত নীলাচল দেখবার সাধ শ্রীজীবের মনে উগ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু নিত্যানন্দ তাঁকে বলেন—"না জীব, নীলাচলে গিয়ে ভাবোন্মত্ত হয়ে বসে থাকলে তোমার চলবে না। তুমি যাও বৃন্দাবনে। মহাপ্রভু তোমাদের বংশকেই এই বৃন্দাবন ধামের ভার দিয়ে গেছেন। সেখানে গিয়ে তুমি ভক্তিধর্ম প্রচারে ব্রতী হও। তার আগে কাশীতে গিয়ে মধুসূদন বাচস্পতির কাছ থেকে নাও বেদান্তের পাঠ।"

শ্রীজীব তা-ই করলেন। শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করে তরুণ তাপস উপস্থিত হলেন বৃন্দাবনে। সেখানে তাঁর দুই পিতৃব্য সনাতন ও রূপ গোস্বামীর একচ্ছত্র প্রভাব। রূপ শ্রীজীবকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন।

ভারতের নানা অঞ্চল থেকে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরা সেই সময়ে ব্রজমণ্ডলে উপস্থিত হতেন। রূপ গোস্বামী শাস্ত্রবিদ বৈষ্ণব আচার্যদের নেতা। কাজেই পণ্ডিতেরা তাঁরই সামনে এসে দাঁড়াতেন। রূপ গোস্বামী যশের কাঙাল ছিলেন না, কাজেই কেউ তর্কবিচারে তাঁকে আহ্বান করলেও তিনি সাড়া না দিয়ে জয়পত্র লিখে দিতেন।

গুরুগত প্রাণ শ্রীজীবের এটা সহ্য হত না। কাজেই সুযোগ পেলেই পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক করে তাঁদের

পরাস্ত করতেন। এই ভাবে একদিন দাক্ষিণাত্যের বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মহাপণ্ডিত বল্লভ ভট্ট যখন বৃন্দাবনে এসে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তখন শ্রীজীবও সেখানে উপস্থিত। শ্রীরূপ বিনয় সহকারে তাঁর রচিত 'ভক্তিরসামৃত' কিছুটা পড়ে শোনালেন বল্লভাচার্যকে। ইনি মঙ্গলাচরণ শ্লোকের কিছু খুঁত ধরলেন। শ্রীরূপ বিনা দ্বিধায় বিনাতর্কে বল্লভের অভিমত মেনে নিয়ে তাঁকেই লেখা সংশোধন করার অনুরোধ জানিয়ে স্নানে চলে গেলেন। শ্রীজীব দেখলেন এই সুযোগ। গুরুর সামনে মুখ খোলার সাহস হয়নি; কিন্তু এবার তিনি শাস্ত্রের নানা যুক্তি ও প্রমাণ সহযোগে দেখিয়ে দিলেন—শ্রীরূপের রচনায় কোন ভুল হয়নি, ভুল হয়েছে বল্লভাচার্যেরই। হেরে গিয়েও বল্লভ বিস্মিত হলেন তরুণ যুবক শ্রীজীবের পাণ্ডিত্য দেখে। শ্রীরূপের কুটির থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন তিনি; পথে শ্রীরূপের সঙ্গে দেখা। বললেন, "আপনার লেখা আর সংশোধন করতে হল না আমায়। আমারই ভুল হয়েছিল, আর সে ভুলটা ধরিয়ে দিল ঐ প্রতিভাধর যুবকটি।" শুনে শ্রীরূপ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন শ্রীজীবের প্রতি। বৈষ্ণবসুলভ বিনয় ও দৈন্য যার নেই সে তো আদর্শ বৈষ্ণব হতে পারে না। বৈষ্ণবনেতা বল্লভ ভট্টকে পরাজিত করায় রূপ গোস্বামী ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রীজীবকে বিতাড়িত করলেন।

এক গভীর অরণ্যে আশ্রয় নিয়ে শ্রীজীব কঠোর সাধন-ভজন করতে থাকেন।

কৃচ্ছ্রসাধনার পাট শেষ করে শ্রীজীব যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর এক জ্যোতির্ময় রূপ। গুরু রূপ গোস্বামী এবার তাঁকে সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং তাঁর জন্য এক পৃথক্ বিগ্রহ সেবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই বিগ্রহের নাম শ্রীরাধা-দামোদর।

বৃন্দাবনের শৃঙ্গার বটের এক কোণে, রূপ গোস্বামী ও শ্রীজীবের ভজনকুঞ্জের কাছে রাধা-দামোদরের এক সুরম্য মন্দির স্থাপন করা হল। এই বৃন্দাবনভূমিতেই একদিন উপস্থিত হলেন দিল্লীর বাদশাহ আকবর। শ্রীজীবের অসামান্য ভক্তির পরিচয় পেয়ে সম্রাট আকবর তাঁর কিছু মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে চাইলেন। শ্রীজীব বললেন, অনেকে বৃন্দাবনে বেড়াতে এসে বহু প্রাণী শিকার করে—এটা বন্ধ হলে বৈষ্ণবেরা সন্তুষ্ট হবেন। আকবর তারপরেই আদেশ জারি করেন—বৃন্দাবনে মৃগয়া করা চলবে না।

সনাতন গোস্বামী বৃদ্ধ ও অশক্ত হয়ে পড়লে প্রতিদিন গোবর্ধন পরিক্রমা করতে পারতেন না। তাই গোবিন্দজী কৃপা করে তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে 'চরণ পাহাড়ী' শিলা প্রদান করেন। তখন সনাতন এই শিলাখণ্ডকেই পরিক্রমা করতেন। সনাতন গোস্বামীর দেহত্যাগের পর শ্রীজীব সেই শিলাটি নবনির্মিত মন্দিরে স্থাপন করেন। সেই মন্দিরের একটি প্রকোষ্ঠে জীব গোস্বামী গড়ে তোলেন তাঁর বিরাট গ্রন্থশালা। বৈষ্ণব সাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থরাজি তিনি সংগ্রহ করতে থাকেন।

ষট্‌সন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভ, কৃষ্ণার্চনদীপিকা, মাধব-মহোৎসব ইত্যাদি ভক্তিশাস্ত্রের সংকলন ও প্রচার, নব-প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিস্তার—অনেক কিছুই শ্রীজীব নিজের জীবনে করে যান। তাঁরই প্রেরণায় রাজা মানসিংহ নির্মাণ করে দেন গোবিন্দজীর বিরাট মন্দির। বৃন্দাবনের দিকে দিকে রাধাকৃষ্ণের বিশাল মন্দির নির্মিত হতে থাকে। বৈষ্ণবসমাজে গড়ে ওঠে সুসংবদ্ধ ভাব।

গ্রন্থরচনা ও সংকলন তো অনেক হল, কিন্তু এগুলি প্রচারের কী ব্যবস্থা করা যায়? বাংলা থেকে এসেছেন শ্রীনিবাস ও নরোত্তম, উড়িষ্যা থেকে শ্যামানন্দ। এই তিন তরুণ তাপসকে সযত্নে শিক্ষা দেওয়া হল। এঁরাই বৈষ্ণব গ্রন্থাদি নিয়ে যাবেন বঙ্গদেশে। মোমজামায় মুড়ে গ্রন্থগুলো সযত্নে রাখা হল একটা কাঠের সিন্দুকে। গোরুর গাড়িতে সিন্দুক চাপিয়ে তিন শিষ্য বেরিয়ে পড়লেন গৌড়ের পথে। কিন্তু সিন্দুকে ধনরত্ন আছে মনে করে পথের মাঝে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ হাম্বিরের পাইকেরা সে সিন্দুক লুট করে নিল।

এদিকে শ্রীনিবাস কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। তিনি বিষ্ণুপুরের এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় ভাগবতপাঠ শুনতে গেলেন বিষ্ণুপুরের রাজসভায়। ভাগবত ব্যাখ্যার তিনি প্রতিবাদ করেন সেখানে। তাঁর ব্যাখ্যা শুনে রাজা চমৎকৃত হলেন। লুণ্ঠিত সমস্ত বৈষ্ণবগ্রন্থ শ্রীনিবাসকে ফিরিয়ে দিলেন, নিজেও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

১৫৯৬ সালে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর নিত্যলীলা সাঙ্গ করেন।

—

কৃষ্ণদাস কবিরাজ



শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম অক্ষয় হয়ে আছে বৈষ্ণব জগতে। বৈষ্ণব সাহিত্যে বিরাট তাঁর অবদান; কিন্তু আত্মপ্রচারে তিনি ছিলেন পরাঙ্মুখ। তাই তাঁর জীবনবৃত্তান্ত সম্পূর্ণ জানবার কোন উপায় নেই।

এই মহাসাধকের পিতামাতার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে জন্মস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় নৈহাটির নিকট ঝামটপুর গ্রামে। জন্ম ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি জাতিতে বৈদ্য।

শ্রীকৃষ্ণদাসের ছিল শ্রীচৈতন্যগত প্রাণ। মহাপ্রভুকে কোনদিন চোখে দেখেননি; কিন্তু চৈতন্যদেবকেই তিনি জীবনের ধ্যান জ্ঞান মনে করতেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্নভাবে দর্শন করতেন শ্রীচৈতন্যকে। কৃষ্ণনাম গানে বিভোর থাকতেন কৃষ্ণদাস। নামগান করতে করতে তিনি অনেক সময় বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন।

একদিন অবিরাম নামগান করবার পর কৃষ্ণদাস শুয়েছেন। ঘুমের মধ্যে তিনি দেখলেন এক বিচিত্র স্বপ্ন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বলছেন, "তুমি বৃন্দাবনে যাও, সেখানেই স্থায়িভাবে বাস কর।"

স্বপ্ন দেখবার পর থেকে কৃষ্ণদাসের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি জন্মস্থান ঝামটপুর ত্যাগ করলেন।

বহু পথ, বহু স্থান পরিক্রমা করে তিনি উপস্থিত হলেন শ্রীবৃন্দাবনধামে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। তিনি রূপ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নেন এবং সনাতন ও জীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

শ্রীচৈতন্যের লীলাকাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করার বাসনা বহুদিন থেকেই কৃষ্ণদাসের মনে ছিল। বৃন্দাবনে আসবার পর সেই আগ্রহ তাঁর আরও প্রবল হয়ে ওঠে।

এখানকার বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী শ্রীচৈতন্যের অন্তলীলা বর্ণনা করতে তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করেন। কৃষ্ণদাস তখন অশীতিপর বয়স্ক; বিষয়ের গুরুত্ব ও নিজের শারীরিক অবস্থার কথা ভেবে তিনি এ দুরূহ দায়িত্ব গ্রহণে ইতস্ততঃ করেন। এমন সময়ে গোবিন্দজীর মন্দিরের এক পূজারী দেবতার প্রসাদী নির্মাল্য এনে তাঁর হাতে অর্পণ করলে তিনি এটাকে দেবতারই নির্দেশ মনে করলেন। এরপর তিনি চৈতন্যচরিতামৃত রচনার কাজ শুরু করেন ১৬১৫ সালের জুন মাসে। প্রধানতঃ চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় ও মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বনে প্রায় ষাটখানি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে সমার্থক শ্লোকাদি উদ্ধৃত করে নয় বৎসরের সুকঠিন পরিশ্রমে ১২০৫১ শ্লোক সমন্বিত মহাগ্রন্থটি সমাপ্ত করেন।

জানা যায়, ১৬২৪ সালে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। নিভৃত নির্জনে বসে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করতেন আর একমনে গ্রন্থ-রচনা করতেন। বৃন্দাবন বাস কালে কৃষ্ণদাসের প্রধান সঙ্গী ছিলেন গোস্বামী শ্রীরঘুনাথদাস। গ্রন্থ রচনায় রঘুনাথ গোস্বামী তাঁকে অনেক উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং অনেক সাহায্য করেছিলেন।

রঘুনাথ গোস্বামীর অপূর্ব ভজননিষ্ঠা ও কৃচ্ছ্র-সাধনের বিস্তারিত বর্ণনা পাই কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থেঃ

অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
... ...
সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবে নিত্য করেন প্রণাম॥
রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
... ...
সার্ধসপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহো নহে কোন দিনে॥

গিরিগোবর্ধনে রঘুনাথদাস ছিলেন প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর। এই সুদীর্ঘকাল তিনি প্রায়ই থাকতেন ভাবাবেশে, রাধাগোবিন্দের ভজনসাধনায় আত্মমগ্ন। আহারে রুচি নেই, নিদ্রায় আগ্রহ নেই। স্বাস্থ্যের অবনতি আশঙ্কা করে ভক্তপরিজনেরা চিন্তিত হল। এই সময় কৃষ্ণদাসের একমাত্র চিন্তা ছিল কিভাবে শ্রীগোস্বামীকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। তিনি মাঝে মাঝে পাতার ঠোঙায় করে একটু একটু ঘোল ঢেলে দিতেন রঘুনাথদাসের মুখে। দিনরাত যখের মতো তাঁকে আগলে রাখতেন কৃষ্ণদাস। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে রঘুনাথদাসের বাহ্যদশায় তাঁর শ্রীমুখ থেকে শোনেন মহাপ্রভু চৈতন্যের অন্ত্যলীলা কাহিনী, আর সেসব লিপিবদ্ধ করে রাখেন পরম শ্রদ্ধাভরে। এরই ফলশ্রুতি বৈষ্ণবশাস্ত্রের অতুলনীয় গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত'।

বৃন্দাবনধামের বৈষ্ণবাচার্যবৃন্দ অনুমোদন করবার পর গ্রন্থখানি গৌড়ে পাঠানো হল। কিন্তু পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের অনুচরবর্গ মহামূল্য রত্নসম্ভার মনে করে পেটিকাটি অপহরণ করে। এই সংবাদ বৃন্দাবনে এসে পৌঁছলে ভগ্নহৃদয়ে কৃষ্ণদাস প্রাণত্যাগ করেন। পরে অবশ্য গ্রন্থখানি উদ্ধার করা হয়েছিল এবং তার খ্যাতি সমগ্র গৌড়বঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

এই অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে কৃষ্ণদাস ধন্য হয়ে আছেন। জগতে রেখে গিয়েছেন অতুলনীয় কীর্তি।

কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আর।
ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব সার॥
শ্রীভাগবত তত্ত্বরস করিলা প্রচারে॥
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত, জানাইলা সংসারে॥
ভক্তি লাগি বিস্তারিলা আপন বদনে।
কাঁহা ভক্ত মুখে, কাঁহা শুনিলা আপনে।
শ্রীচৈতন্য সম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগৎ অন্য॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্তগণ।
ইহার শ্রবণে পাইবা চৈতন্যচরণ॥
ইহার প্রসাদে পাইবা কৃষ্ণতত্ত্বসার।
সর্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তের ইহাঁ পাইবা পার॥

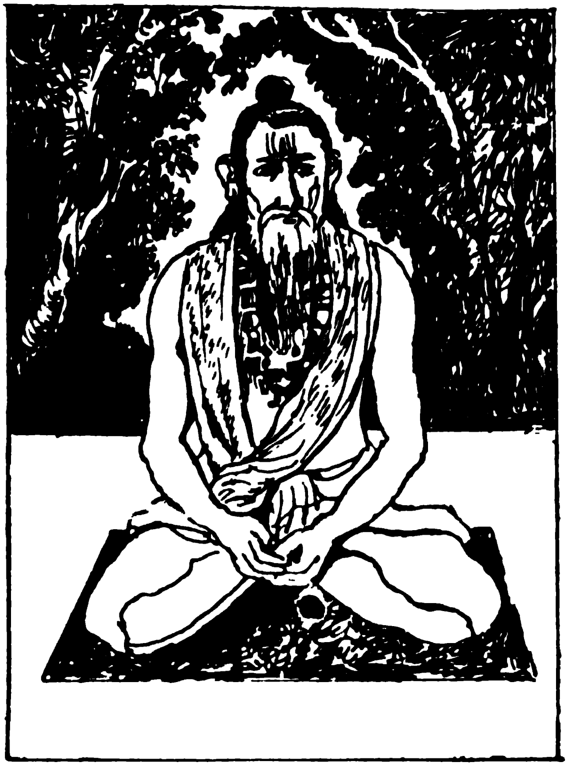
কৃষ্ণদাস তাঁর পারমার্থিক আত্মীয় সমাজে কবিরাজ গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

বৈষ্ণবতত্ত্বের অনেক দুরূহ তথ্যই কৃষ্ণদাস সহজ সাবলীল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। ব্রহ্মপরমাত্মাভেদী ভগবত্তত্ত্বই সমস্ত তত্ত্বের চরম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস গোস্বামী এই তত্ত্বটি এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে, নাহি যাঁর সম॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞান-যোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মরূপে তাঁরে করে অনুভব॥
উপাসনা-ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা।
অতএব সূর্য তাঁর দিয়েত উপমা॥

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদরের দেবালয়ে এখনও কৃষ্ণদাসের সমাধি আছে।

একনাথ স্বামী



গভীর রাত্রির অন্ধকার। দাক্ষিণাত্যের দেবগড় দুর্গের অভ্যন্তরে প্রায় সকলেই নিদ্রাগত। অকস্মাৎ রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করে শত্রুসেনা অতর্কিতে কেল্লা আক্রমণ করে বসে। দুর্গাধিপতি জনার্দন স্বামী নির্জন কক্ষে ধ্যানাসীন। বাধা না পেয়ে সেনাবাহিনী পাহাড়ের গা বেয়ে কেল্লার দিকে উঠে আসছে। সমূহ বিপদ দেখে ভক্ত একনাথ এক মুহূর্তে নিজ কর্তব্য স্থির করে নিলেন। তড়িৎবেগে গুরুদেবের কক্ষে ঢুকে তাঁর অস্ত্র ও বর্ম সজ্জায় নিজেকে সাজিয়ে নিলেন; তারপর দ্রুতবেগে দুর্গের প্রাকারে উঠে দেবগড়ের সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন একযোগে শত্রুসৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। একনাথের অসমসাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে দেবগড় রক্ষা পেল। ধ্যানাসন থেকে উঠে জনার্দন স্বামী সমস্ত ব্যাপার শুনে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন কর্তব্যপরায়ণ ভক্তকে।

এক মহান সাধকের বংশধর এই একনাথ। এ'র প্রপিতামহ ছিলেন প্রতিষ্ঠানপুর বা পৈঠানের সাধক-শ্রেষ্ঠ ভানুদাস যিনি পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মুসলমান রাজাদের অত্যাচার দমন করে পন্ধারপুরে বিঠ্ঠলজী বিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। মারাঠাদের ভক্তি-আন্দোলনের আদি উৎস এই পন্ধারপুর। এখানকার জাগ্রত দেবতা বিঠ্ঠলজীকে কেন্দ্র করেই প্রেমভক্তির প্লাবন বইয়ে দেন দুই সাধক—জ্ঞানদেব ও নামদেব। এ'দের আবির্ভাবের দুই শতাব্দী পরে, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন একনাথ—ভানুদাসের নাতি সূর্যনারায়ণ ও নাতবৌ রুক্মিণী বাঈর ঘরে।

একনাথ যখন শিশু তখন সে হারায় তার বাবা-মাকে। ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার কাছে সে মানুষ হতে থাকে। ছোটবেলা থেকেই অপূর্ব ধীশক্তি একনাথের। গ্রামের শিবমন্দিরে সে পুরাণ ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হয়, ধ্রুব-প্রহ্লাদের পুণ্যজীবন অনুপ্রাণিত করে তাকে। যখন তার বয়স মাত্র বারো, তখন একদিন দৈবাদেশ শুনল দেবগড়ের কেল্লাদার জনার্দন স্বামীই তার অভীষ্ট গুরু, তাঁর কাছেই রয়েছে তার সাধন-পথের চাবিকাঠি।

সেইদিনই, কাউকে কিছু না জানিয়ে বালক একনাথ পদব্রজে রওয়ানা হয় দেবগড়ের উদ্দেশে। পরম যত্নে জনার্দন স্বামী তাকে দীক্ষা দেন, ধন্য করেন ভক্তিসাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটনে।

গুরুগৃহে কেটে গেল আরও ছয় বৎসর। একনাথ এখন যুবক। গুরু তাঁকে একান্তে ডেকে বলেন: "তোমাকে এবার উপলব্ধি করতে হবে শ্রীমদ্ভাগবতের পরমতত্ত্ব' সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুতে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণসেবাই তোমার জীবনের হোক একমাত্র কাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাই আমি স্থির করেছি তোমাকে অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে ব্যবহারিক জীবন-সাধনারও শিক্ষা দেব। এই দুটোকে মিলিয়ে সার্থক করতে হবে তোমার ভাগবতসাধনা।"

জনার্দন স্বামী তাঁর পরমভক্তকে ব্যবহারিক জীবনের কর্তব্য সম্পর্কেও পাঠ দিলেন। বিভিন্ন কর্মসাধনায় একনাথ তাঁর সাফল্যের পরিচয় দিলেন। তারপর

গুরুর নির্দেশে দীর্ঘকাল পথে পথে, তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে পর্যটন করে বেড়ালেন তিনি। অতঃপর দেবগড়ে ফিরে এসে গুরুর সঙ্গে মিলিত হলেন। গুরু সন্তুষ্ট হয়ে বললেনঃ "একনাথ, এবার হবে তোমার অগ্নিপরীক্ষা। তোমাকে গৃহে ফিরে বিবাহ করে সংসারী হতে হবে। হ্যাঁ, বিবাহ করলেও তুমি যাপন করবে অনাসক্ত কৃষ্ণভক্তের জীবন। আমার আরও নির্দেশ—আপামর জনগণের সহজবোধ্য ভাষায় তুমি রচনা করবে ভক্তিগ্রন্থ। তা হলেই ভক্তিসাধনার তত্ত্ব ছড়িয়ে পড়বে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।"

গুরুর আদেশ শিরোধার্য না করে উপায় ছিল না। পৈঠানে ফিরে এলেন একনাথ। ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা তখনও বেঁচে। তিনি গিরিজাবাঈ নামে এক সৎ ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বিবাহ করলেন। একনাথের ভক্তিসাধনা ও ধর্মাচরণে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেন পতিব্রতা গিরিজাবাঈ।

একের পর এক ভক্তিগ্রন্থ রচনা করে যান একনাথ। রচনা করলেন ভাগবতের ব্যাখ্যা—'একনাথী ভাগবত' বলে যার প্রসিদ্ধি। তাঁর আর একটি মহৎ কীর্তি 'ভাবার্থ রামায়ণ'। এ ছাড়া কয়েকশ অভঙ্গ পদও তিনি রচনা করেছেন। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল বহুদূর অঞ্চলে। শত শত লোক এসে ভিড় জমায় একনাথের কীর্তনপ্রাঙ্গণে। একনাথের রচনায় অন্তরের আবেগ ও ভাবরসের সঙ্গে মিশেছে ভক্তিসাধনার পরম তত্ত্ব। এর জন্য তিনি সর্বদাই ঋণ স্বীকার করেছেন তাঁর গুরু জনার্দন স্বামীর কাছে। একটি অভঙ্গ পদে পাইঃ

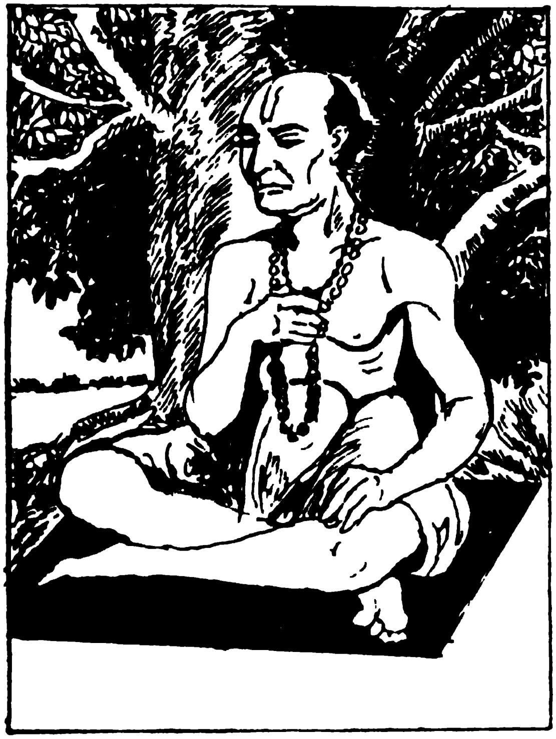
এ কী পরম বিস্ময় গুরু ঘটালেন আমায় দিয়ে—
শ্রীভগবানের রূপদর্শনে মজালেন আমার হিয়ে।
আর এমনি কৃপাময় সেই দয়ালু জগৎপতি,
ত্যাগের চরম মূল্য থেকে দিলেন অব্যাহতি।

[বাংলা অনুবাদ]

নিজের প্রেমভক্তি সাধনার প্রধান উৎস ভাগবত; সে সম্পর্কে চমৎকার একটি উপমা দিয়েছেন একনাথ। তাঁর অভঙ্গপদে বলছেনঃ 'শ্রীভাগবত হচ্ছে একটা বড় ক্ষেত। ব্রহ্মা প্রথমে এর জন্য দেন শস্যবীজ, ক্ষেত্রপতি নারদ ঐ শস্যবীজ বপন করেন নিপুণ হাতে; ব্যাসদেব ঐ ক্ষেতের নিরাপত্তার জন্য দশটি বাঁধ দিয়ে এর চারিদিক বেঁধে দেন—ফলে সেই ক্ষেত ভরে ওঠে দিব্য আনন্দ ও শান্তির ফসলে। ফসল পাহারা দেন শুক—অবিরত হরিনাম নিক্ষেপ করেন তিনি, আর পাপরূপ পাখিরা যায় দূরে পালিয়ে। কেটে-আনা শস্যের ঝাড়-বাছাই করেন ভক্ত উদ্ধব—কৃষ্ণজীর মহাবাণীর মূল্যবান শস্যকণা বার করে রেখেছিলেন তা থেকে। এ থেকে তৈরি হয়েছে দিব্যালোকের সৌরভ-মাখানো কত আহার্য। পরীক্ষিৎ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুকদেবের কাছে বসে তাঁর কণ্ঠে পবিত্র ভাগবতকথা শোনেন আর ভাগবতী আনন্দ-সুধা পান করেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীধর ভাগবতের নিগূঢ় মর্মকথাকে ব্যাখ্যা করেন, দিব্যানন্দ লাভে নিজে হন কৃতকৃতার্থ। জনার্দন স্বামীর প্রিয় মক্ষিকা, একনাথ, তাঁর মারাঠী ভাষার দুটি পাখনা মেলে উড়ে গিয়ে বসেছে সেই লোভনীয় সুধার ওপর, প্রাণ ভরে পান করে ধন্য হয়েছে সে।'

একনাথের মতে, ভক্তিসাধনই ঈশ্বরলাভের প্রশস্ত রাজকীয় পথ শ্রীহরি স্বয়ং এ পথের প্রহরী, চক্র হাতে তিনি আক্রমণকারী শত্রুদের করেন হনন। একনাথের কীর্তনের আসরে শ্রোতাদের কোন জাতিবর্ণ-ভেদ ছিল না- ব্রাহ্মণ হোক যে-কেউ এই কীর্তনে যোগ দিতে পারত। তাঁর রচিত অভঙ্গে তিনি গেয়েছেন—
হো কা বর্ণামাজী অগ্রণী, যো বিমুখ হরিচরণী।
তাহুনি শ্বপচ শ্রেষ্ঠ মানী -যো ভগবদ্ ভজনী প্রেমল।
—'শ্রীহরির চরণকমল থেকে যে বিমুখ, বর্ণের দিক থেকে অগ্রণী হয়েও সে ব্যর্থ। তার থেকে চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ যদি সে প্রেমভরে করে ঈশ্বরভজন।' ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সাধক একনাথ মানবলীলা সংবরণ করেন।

দাদূ



আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। চামারপাড়ার পাশ দিয়ে যেতে যেতে মহাসাধক কবীরের পুত্র সাধক কমাল উঠে পড়লেন এক মুচির ঘরের দাওয়ায়। ঘরের ভেতর বসে একমনে মশক সেলাই করে যাচ্ছে মুচি। অকস্মাৎ আগন্তুককে দেখে সে সসম্ভ্রমে তাকে ঘরে ডেকে এনে বসালো। সামান্য এক চামড়ার আসন পেতে দিল তাঁর জন্য। কমালের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। বললেন: "আমি যেমন আজ তোমার ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ছিলাম তেমনি করেই তো আমার প্রভুও রোজ আমার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন। তুমি আমায় আসন বিছিয়ে দিলে। আমি তো কৈ প্রভুকে ডেকে বসাইনে আমার ঘরে। তিনি ফিরে যান বার বার।"

নিরক্ষর মুচি কমালের কথার অর্থ বোঝে না। জিজ্ঞাসা করে: "কে আপনার প্রভু?"

--সবার যিনি প্রভু তিনিই আমার প্রভু। তোমারও প্রভু তিনি!

--তা হলে আমারও জীবনের দরজায় কি তিনি রোজ দাঁড়িয়ে থাকেন আর রোজ ফিরে যান?

--হ্যাঁ, ভাই। শুদ্ধ মনে প্রেম দিয়ে তাঁকে হৃদয়মন্দিরে ডেকে নাও, তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করবেন।

বৃষ্টি থেমে গেছে। কমাল চলে গেছেন। কিন্তু দরিদ্র অশিক্ষিত চামারের হৃদয়তন্ত্রে এ কী নতুন সংগীতের ধ্বনি জাগিয়ে তুললেন কমাল! ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে চর্মকার। দেশে দেশে করে পর্যটন।

নিরক্ষর এই মুচির নাম দাদু। ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে, শুক্লাষ্টমী তিথিতে তাঁর জন্ম এক গরিব মুসলমান ধুনকরের ঘরে। বাবার নাম লোদী, মা বসীবাঈ। ঘরে আছে সাধ্বী স্ত্রী হবা, আর দুই পুত্র, দুই কন্যা।

সাধক কমালের সঙ্গে সাক্ষাতের পর দাদু ঘুরে বেড়ান কাশী, বিহার, বঙ্গদেশের বহু স্থানে। বাঙালী নাথপন্থী যোগীদের সান্নিধ্যে তিনি বিশেষ উপকৃত হন। এরপর রাজপুতানায় এসে সাংভর গ্রামে তিনি ডেরা বাঁধলেন। নিজের পরিবারবর্গ ছাড়াও অনেক পোষ্য ছিল তাঁর। সকলের ভরণপোষণ হত বহু কষ্টে। কিন্তু অন্তরে ছিল অসীম প্রশান্তি। সারা দিন ভগবানের নামজপেই অতিবাহিত হয়। দাদুর ছিল না কোন সম্প্রদায়। বলতেন, সূর্য চন্দ্র তারকা এরাও তো প্রত্যহ সেবাকর্মে রত; এদের কি কোন দল আছে? ভক্তদের বলতেন: 'অলখ্ ইলাহী জগদ্‌গুরু দুজা কোঈ নাহি'--সেই অলখ্ ঈশ্বরই হচ্ছেন জগদ্‌গুরু, দাদুর কাছে দ্বিতীয় আর কেউ নেই।

দাদুর সাধনপদ্ধতি ছিল খুব সহজ সরল। অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে সঙ্গে নাচগানের তিনি প্রচলন করেছিলেন। তবে অন্তরের আকুতিই ছিল ভক্তিসাধনার মূল কথা। সাংভর ছেড়ে দাদু যখন চৌদ্দ বছর অম্বর শহরে বাস করেন তখন তাঁর অনুগামী ভক্তের সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। বিভিন্ন ধর্মের সাধু ও উলেমারাও তাঁর ধর্মসভায় যোগদান করতেন। দাদুর এই সর্বধর্ম-

মিলনকেন্দ্রটি আখ্যাত হয়েছিল 'অলখ্-দরীবা' নামে—অর্থ, অলখ্ নিরঞ্জনের আনন্দ-নিকেতন।

'দুনু হাথী হৈ রহে, মিলি রস পিয়া ন জাই'—হিন্দু-মুসলমানের দুই হাত, দুহাত একত্র না হলে কেমন করে অমৃতরস পান করব? হিন্দু-মুসলমানের আত্মিক মিলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন সুলতানী যুগের পরম সাধক দাদু: 'সব ঘট একৈ আত্মা, ক্যা হিন্দু মুসলমান'—সকলের আত্মা এক ও অভেদ, হিন্দু ও মুসলমান কোন পার্থক্য নেই।

দাদুর প্রেমসাধনা আত্মনিবেদনের মাধুর্যে মহীয়ান। মধ্যযুগের এই মরমিয়া সাধকের কণ্ঠে তাই ঈশ্বরভজন অনুরণিত হয়:

তুম্হ কু হম্‌সে বহুত হৈঁ হম্‌কু তুম্হ সা নাহি।
দাদ্‌কু জিন পরহরৈ তু রহু নৈনহু মাহি।

—হে রাম! আমার মতো তোমার অনেক আছে, কিন্তু তোমার মতো আমার যে আর কেউ নেই! দাদুকে কখনও করো না পরিত্যাগ—থাকো সদাই নয়ন-সম্মুখে।

দাদুর রচিত একটি ভজনসঙ্গীতে দেখি কবিত্বরসের পরাকাষ্ঠা:

আজ্ঞা অপরংপারকী, বসি অংবর ভরতার।
হরে পটংবর পহিরি করি ধরতী করৈ সিংগার॥

—অনন্তের মহা নির্দেশ এই—আকাশ পরিপূর্ণ করে প্রভু আমার বিরাজমান। তাই তো সবুজ পট্টাম্বরে ধরিত্রী ধরেছে শৃঙ্গারবেশ। সারা বসুধা আজ ফলে ফুলে শোভিত, পৃথিবী অনন্ত অপার—গগনের গর্জনে জলস্থল উঠেছে ভরে। ওই শোন প্রভুর জয়জয়কার। কালের মুখে কালি লেপন করে স্বামী আমার সদা সুকাল রূপে বিরাজমান। তোমার ভবন ভরেছে মেঘপুঞ্জে—ওগো দীনদয়াল, আজ তা করো বর্ষণ।

অতীন্দ্রিয় জীবনসাধনার পথিক, ভক্তপ্রবর দাদুর শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রজ্জব, বখ্‌না, জাইসা, মাধোদাস, পুত্র গরিবদাস, জগজীবন প্রভৃতি। ভারত-সম্রাট আকবর তাঁর ধর্মসাধনার খ্যাতি শুনে ফতেপুর সিক্রির এক নির্জন প্রান্তরে ভক্ত দাদুর সঙ্গে মিলিত হয়ে চল্লিশ দিন ধরে ধর্মালোচনা করেন। দাদুর সহজ সরল ভক্তিসাধনা আকবরকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে।

আকবর প্রশ্ন করেছিলেন, "মহাত্মন্! কৃপা করে আমায় বলুন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ক্রম কী। আল্লা প্রথমে কোন্ বস্তু রচনা করলেন আকাশ, বায়ু, জল, না ভূমি?"

দাদু উত্তর দিলেন, "সে কি সম্রাট! আমার প্রভুর শক্তি কি সীমিত? তিনি যে সর্বশক্তির আধার, তাঁর সৃষ্টিতে কোন্‌টি আগে, কোন্‌টি পরে—সে প্রশ্ন ওঠে না। একটি আনন্দধ্বনিতেই সব কিছু তিনি একযোগে সৃষ্টি করতে পারেন।"

আকবরের পরের প্রশ্ন: "সকলের ধারণা, সাধু কবীর তাঁর সাধনার মধ্যে দিয়ে যতকিছু অধ্যাত্মতত্ত্বের নবনী তুলে নিয়ে গেছেন। একথার অর্থ কী?"

সত্যনিষ্ঠ সাধক দাদুর অন্তর উদ্দীপিত হয়ে উঠল এ প্রশ্ন শুনে। তিনি বললেন, 'এমন কথা আপনি বিশ্বাস করেন সম্রাট? খোদার অনন্ত সৃষ্টি এই রস-সাগরকে ফুরিয়ে ফেলতে পারে এমন সাধকের আজও জন্ম হয়নি। পাখি তার ঠোঁট দিয়ে সাগরজলের কতটুকু গ্রহণ করতে সক্ষম? এসব সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ চিন্তার কথা। কবীরকে আমি গুরুর মত জ্ঞান করি, তিনি কখনই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছি একথা বলেননি।"

নিরক্ষর চর্মকার দাদুর মুখে এমন অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের আদর্শের কথা শুনে দিল্লীর বাদশাহ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন।

১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণাষ্টমী। রাজপুতানার নারায়ণা গ্রামের সাধনকুটিরে পরমসাধক দাদু ৫৯ বছর বয়সে ইষ্টদেবতার সঙ্গে মিলিয়ে গেলেন।

সাধু তুকারাম



স্ত্রী জিজাবাঈ বড় মুখরা। একদিন স্পষ্টভাবেই তুকারামকে বলে বসলেন, "হয় বিঠোদেবকে ছাড়, না হয় আমি সংসার ছেড়ে চলে যাব।"

তুকারাম বড় বিপদে পড়লেন। বিঠোদেব তাঁর প্রাণের দেবতা, পাথরের বিষ্ণুমূর্তি। বিঠোদেবকে তিনি নিত্য পুজো করেন, তাঁর পদপ্রান্তে বসে সাধনা করেন। তাঁকে ছেড়ে কিভাবে থাকবেন? কিন্তু সংসারেও যে নানা ঝামেলা। তাই সংসারের শান্তি বজায় রাখবার জন্যই তুকারাম ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। কাটাতে লাগলেন পাহাড়ের প্রান্তে এক নির্জন স্থানে. সারাদিন সেখানে কাটিয়ে ফিরে আসতেন সন্ধ্যার পরে।

দেহলীতে এক কৃষকের জমি ছিল। সেই চাষী তুকারামকে দেখতে পেয়ে একদিন বলল, "তুকা, তুমি তো এখানে বসে নিষ্কর্মা হয়েই দিন কাটাচ্ছ, আমার ক্ষেতের শস্যগুলো তুমি পাহারা দাও না কেন? এজন্য কিছু অবশ্য তুমি পাবে।"

তুকারাম রাজী হলেন। কিন্তু পাহারা দেবেন কি, পাখির দল যখন শস্যের ওপর উড়ে এসে বসে, তাঁর মন গলে যায়। ভাবেন, "আহা, সৃষ্টিকর্তা তো পৃথিবীর বুকে শস্য ঢেলে দিচ্ছেন তার সৃষ্ট সকল জীবের জন্য। তবে পাখি বেচারারা কেন অনাহারে মরবে?"

একদিন কয়েকটি গরু এসে ক্ষেতের শস্য একেবারে উজাড় করে ফেলল। চাষী তা দেখে গ্রামের পাঁচজনকে ডেকে আনল বিচার করবার জন্য। কিন্তু বিচার করতে এসে অবাক হয়ে গেল। সারা ক্ষেত শস্যে ভরে আছে।

সেদিন থেকে লোকে বুঝতে পারল—তুকারাম সাধারণ মানুষ নয়।

তুকারামের আবির্ভাব হয় আনুমানিক ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৬০৭-৮ সালে)। পুণার আট ক্রোশ দূরে ইন্দ্রায়নী নদীর তীরবর্তী দেহলী বা দেউ নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে তাঁরা বণিক। পিতা বোহ্লাবা, মাতা কনকাবাঈ। তুকারাম তাঁদের দ্বিতীয় পুত্র।

বড় ভাই সাওজী ছিলেন সংসারের প্রতি উদাসীন। মা ও বাবার মৃত্যুর পর তিনিও সন্ন্যাসী হয়ে একদিন ঘর ছেড়ে চলে যান। সংসারে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। তুকারামের ওপর সংসারের ভার পড়ে। ব্যবসায় দেখাশোনার ভারও তাঁর ওপর পড়ে। কিন্তু তুকারামের বৈষয়িক বুদ্ধির অভাবে সেই ব্যবসায়ও নষ্ট হয়ে যায়।

তুকারাম রচিত বহু মারাঠী অভঙ্গ পদে স্ত্রীর গঞ্জনার কথা অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়েছেঃ

"গোণী আলী ঘরা। দাণে খাউ নেদী পোরাঁ॥"
'ঘরে দুটো অন্ন এলে ছেলেদের দেব কোথা খেতে,
হতভাগা তা দেবে না—সকলই পরেরে যান দিতে।'
তুকা বলে, 'অতিথিরে যখনি গো দিতে যাই ভাত,
রাক্ষসীর মত এসে হতভাগী ধরে মোর হাত।'
'না জানি পূর্বজন্মে কতই করিয়াছিলি পাপ'
তুকা বলে, 'এ জনমে তাই এত পেতেছিস তাপ।'

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত অনুবাদ]

আর একটি পদে পারিবারিক কলহের চিত্রঃ

"আতাঁ পোরা কায় খাসী। গোহো ঝালা দেবলসী॥"

'খাবার কোথায় পাবি বাছা, বাপ তোর থাকেন মন্দিরে—
মাথায় জড়ান তিনি মালা, ঘরে আর আসেন না ফিরে।
নিজের হলেই হল খাওয়া, আমাদের দেখেন না চেয়ে।
খর্তাল বাজিয়ে তিনি শুধু মন্দিরে বেড়ান গেয়ে গেয়ে।
কী করিব বল দেখি বাছা, কিছুই তো ভেবে নাহি পাই।
ঘরে না বসেন এক রতি, চলে যান অরণ্যে সদাই।'
তুকা বলে, 'ধৈর্য ধর মনে, এখনো সকল ফুরায় নাই।'

[রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ]

স্ত্রীর গঞ্জনায় তুকারাম প্রায়ই ঘরে থাকতে পারেন না। দেহুলীর কাছেই ভাম্বনাথ পাহাড়ে অথবা ইন্দ্রায়নীর তীরে কোন নির্জন অরণ্যে বসে সময় কাটান। প্রাণপ্রিয় ইষ্ট বিঠোদেবের ধ্যানে বিভোর থাকেন।

ধীরে ধীরে তুকারামের মধ্যে সাধকের অলৌকিক শক্তিগুলি প্রকাশ পেতে থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চবর্ণের অনেকে তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েন।

মম্বাজী গোসাঁই দেউ গ্রামের এক প্রতিপত্তিশালী মোহান্ত। তুকার ওপর তাঁর ভয়ানক আক্রোশ। শূদ্রের এই প্রাধান্য কেন? কোন্ সাহসে সে ব্রাহ্মণকেও শিষ্য করে?

একদিন বিঠোদেবের নাম করতে করতে তুকারাম গ্রামের পথে চলেছেন। সুযোগ বুঝে মম্বাজী এক কাঁটাগাছের ডাল নিয়ে আক্রমণ করলেন। আঘাতের পর আঘাতে তুকার পিঠ বেয়ে রক্ত ঝরতে লাগল।

মম্বাজী প্রায়ই তুকারামের হরিকীর্তনের আসরে উপস্থিত থাকেন। আসল উদ্দেশ্য, এই শূদ্র ধর্ম-নেতার আচরণ ও ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করা। সেদিন সন্ধ্যায় কিন্তু তুকার কীর্তনে তাঁকে দেখা গেল না। তুকারাম রাত্রেই মম্বাজীর গৃহে উপস্থিত হলেন। গিয়ে দেখেন শরীরের ব্যথায় কাতর হয়ে মম্বাজী বিছানায় শুয়ে আছেন। তুকারাম বললেন—"গোসাঁই, দোষ আমারই। বহুক্ষণ ধরে আমাকে প্রহার করে আপনাকে শ্রান্ত হতে হয়েছে। তাই তো আপনার শরীরে এরকম ব্যথা হয়েছে। আমার জন্যই আপনার কষ্ট।"

তুকারাম মম্বাজীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। অমনি তাঁর শরীরের সমস্ত ব্যথা দূর হয়ে গেল। এই ব্যাপার দেখে মম্বাজী কেঁদে ফেললেন। বললেন—"তুকা, তুমি ভক্ত, তুমি মহৎ। তুমি আলোর সন্ধান পেয়েছ। আমাকেও আলো দেখাও ভাই।"

পরশমণির স্পর্শে লোহাও সোনা হয়ে যায়।

মম্বাজী তুকারামের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

চারদিকে তখন সাধু তুকারামের খ্যাতি প্রতিপত্তির অন্ত নেই। অগণিত ভক্ত ও শিষ্য নিয়ে দেউ ও লোহাগাঁও-এ তিনি সর্বদা নামকীর্তন করে বেড়ান।

তুকারামের নামযশ শুনে মারাঠানায়ক শিবাজী তাঁকে ডেকে পাঠালেন। পরে বিনীত ভাবে তাঁকে কিছু মূল্যবান দ্রব্য উপহার স্বরূপ পাঠালেন। সবই তুকারাম প্রত্যাখ্যান করলেন, সাক্ষাৎ করতেও এলেন না। লিখে পাঠালেনঃ "তুম চৈ যের বিত্তধন তেঁমজ মৃত্তিকে সমান!"—তোমার যে টাকাপয়সা তা যে আমার কাছে মাটির সমান! এর পর স্বয়ং শিবাজী তুকারামের গৃহে গিয়ে তাঁকে দর্শন করেন। তুকারামের সাধনা দেখে তিনি এতই মুগ্ধ হন যে রাজকার্য ভুলে তাঁরই সঙ্গে ভজন ও কীর্তনে গা ভাসিয়ে দিলেন। রাজ্যশাসনে ক্ষতি হচ্ছে দেখে শিবাজীর মা জিজাবাঈ তখন এসে তুকারামকে অনুরোধ করলেন। তুকারাম তখন শিবাজীকে বললেনঃ "আমি ভক্তিপথের পথিক, তুমি দেশের রাজা—অতএব তুমি কর্মযোগী হয়ে রাজকার্য কর।" শিবাজী জানতে চাইলেন, তিনি কাকে গুরু করে আদর্শ পালন করবেন। তুকারাম উত্তরে বললেনঃ

"রায়া ছত্রপতি ঐ কাবে বচন
রামদাসী ধ্যান লাবা বেগী।
রামদাস স্বামী সোয়রা সজ্জন
ত্যাসী তুম্হ মন অর্পা বাপা॥"

ছত্রপতি রাজা, শুন হে বচন, রামদাসে লাগাও ধ্যান।
রামদাস স্বামী মিত্র ও সজ্জন, গুরু তাঁরে করিও জ্ঞান॥

তুকারামের এই পরামর্শ মারাঠা জাতির পক্ষে কল্যাণকর হয়ে ওঠে।

তুকারামের বৈরাগ্যময় জীবন, তাঁর ভক্তি ও প্রেমের ভাবৈশ্বর্য সারা মহারাষ্ট্রকে উদ্দীপিত করে তোলে। তুকার রচিত শত শত ভক্তিমূলক 'অভঙ্গ' সমাজের উচ্চনীচ সমস্ত স্তরে প্রচারিত হতে থাকে। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে তুকারামের তিরোধান ঘটে।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী



পথের এক জায়গায় ভয়ানক ভিড় জমে গিয়েছে। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে এক নারীর বুকফাটা কণ্ঠস্বর —"আমার মানিক রে, কোথায় গেলি রে!"

এক বিধবা স্ত্রীলোক তার সাত বছরের ছেলের মড়া কোলে করে আকুলস্বরে বিলাপ করছে। এই ছেলেটিই ছিল তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, নয়নের মণি। আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীরা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

এমন সময় সেখানে দেখা দিলেন এক জ্যোতির্ময় বিরাটকায় সন্ন্যাসী। মানস সরোবর থেকে ফিরছেন। তিনি ধীর পায়ে মৃতদেহের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সন্ন্যাসীকে দেখে স্ত্রীলোকটির মনে আশার সঞ্চার হল। মৃত সন্তানটিকে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে রেখে কাতরকণ্ঠে বলল —"বাবা, আমার এই বুকের নিধিকে বাঁচাও।"

সন্ন্যাসী মৃতদেহের উপর হাত বুলালেন। কী আশ্চর্য! কিছুক্ষণের মধ্যেই বালকের দেহে দেখা দিল প্রাণের স্পন্দন। মৃত বালক চোখ মেলে তাকাল।

মা আনন্দে আত্মহারা। জনতা বিস্ময়ে হতভম্ব। তখন খোঁজ পড়ল সন্ন্যাসীর। কিন্তু সন্ন্যাসী কোথায়? কখন চোখের আড়ালে চলে গিয়েছেন কেউ জানে না।

দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানই এই সন্ন্যাসীর কাজ। আত্মভোলা সন্ন্যাসী। শ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামী।

প্রাচীন মাদ্রাজ প্রদেশে ছিল হোলিয়া নামে একটি গ্রাম। নরসিংহ রাও ও বিদ্যাবতী নামে ছিলেন এক ব্রাহ্মণ-দম্পতি। তাঁদেরই সন্তান শিবরাম। শিবের করুণায় জন্ম –তাই শিশুর এই নামকরণ করা হয়। উত্তরকালে এই শিশুই পরিচিত হন মহাযোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামী রূপে।

ছোটবেলা থেকেই শিবরাম ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির —আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন। খেলাধুলা বা কোন লোকের সঙ্গে মেলামেশা তিনি পছন্দ করতেন না। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আধ্যাত্মিক ভাবগুলি প্রকট হতে থাকে।

শিবরামের ৪০ বছর বয়সে পিতা নরসিংহ রাওয়ের মৃত্যু হয়। মাতা বিদ্যাবতীর যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁর বয়স ৫২। সংসারের প্রতি যেটুকু বন্ধন অবশিষ্ট ছিল তাও ছিঁড়ে গেল। মায়ের সৎকার করবার জন্য সেই যে বেরোলেন আর ঘরে ফিরলেন না। গ্রামের শ্মশানের এক প্রান্তে কুটির বেঁধে যোগসাধনায় ডুবে রইলেন।

দীর্ঘ কুড়ি বছর কেটে গেল। বিধাতার কোন্ অমোঘ বিধানে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন পাঞ্জাবের সাধক ভগীরথানন্দ সরস্বতী। তিনিই হলেন শিবরামের দীক্ষাগুরু।

হোলিয়া গ্রাম চিরদিনের মত ছেড়ে শিবরাম ভগীরথানন্দের সঙ্গে নানা তীর্থ পর্যটনে বেরোলেন। দক্ষিণ ও উত্তর ভারত পর্যটনের পর দুজনে এসে উপস্থিত হলেন পুষ্কর তীর্থে। এখানেই তিনি সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষিত হলেন। সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁর নতুন নামকরণ হল গণপতি সরস্বতী। কিন্তু তেলঙ্গ দেশ

থেকে আগত সন্ন্যাসী বলে কাশীর অধিবাসীরা তাঁকে ত্রৈলঙ্গ স্বামী বলেই ডাকে।

সেতুবন্ধ রামেশ্বরে কিছুদিন থেকে তিনি নেপাল রাজ্যে যান। সেখান থেকে তিব্বত এবং তিব্বত থেকে মানস সরোবরে এসে যোগসাধনায় নিমগ্ন হন। সেখান থেকে আসেন প্রয়াগে।

ত্রিবেণীর ঘাটে একদিন স্বামিজী বসে আছেন। হঠাৎ আকাশ মেঘে কালো হয়ে এল। সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলকানি। পণ্ডিত রামতারণ ভট্টাচার্য শংকিত হয়ে তাঁকে ঘাট থেকে উঠে আসতে অনুরোধ করলেন। স্বামিজী বললেনঃ "আমার জন্য চিন্তা করো না। কিন্তু ঐ নৌকোর যাত্রীদের তো বাঁচাতে হবে।" রামতারণ তাকিয়ে দেখেন, নদীর বুকে একটি যাত্রীবাহী নৌকো বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মধ্যে পড়ে হঠাৎ জলে তলিয়ে গেল। এদিকে ত্রৈলঙ্গস্বামীও মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। রামতারণের বিস্ময়ের আরও বাকি ছিল। দেখলেন, জলের বুকে আবার ভেসে উঠেছে যাত্রীবাহী নৌকো! ঘাটে এসে ভিড়ল। যাত্রীদের সঙ্গে পাড়ে এসে নামলেন স্বয়ং ত্রৈলঙ্গ স্বামী!

১৮৪৪ সালে স্বামিজী আসেন কাশীধামে। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে কিছুকাল বাস করার পর পঞ্চগঙ্গা ঘাটে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী উলঙ্গ অবস্থায় কাশীধামের সর্বত্র বিচরণ করতেন। এরকম উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ আইনবিরুদ্ধ। তার ওপর ইংরেজ রমণীরা ঐ দৃশ্য দেখে লজ্জাবোধ করতেন। তাই পুলিস প্রহরীরা তাঁকে কয়েকবার নিষেধ করে দেয়। কিন্তু তাতেও ত্রৈলঙ্গ স্বামী কর্ণপাত না করায় পুলিস প্রহরীরা তাঁকে গ্রেফতার করে। তাঁর শিষ্যরা গুরুজীকে উদ্ধারের জন্য একজন উকিল নিযুক্ত করেন।

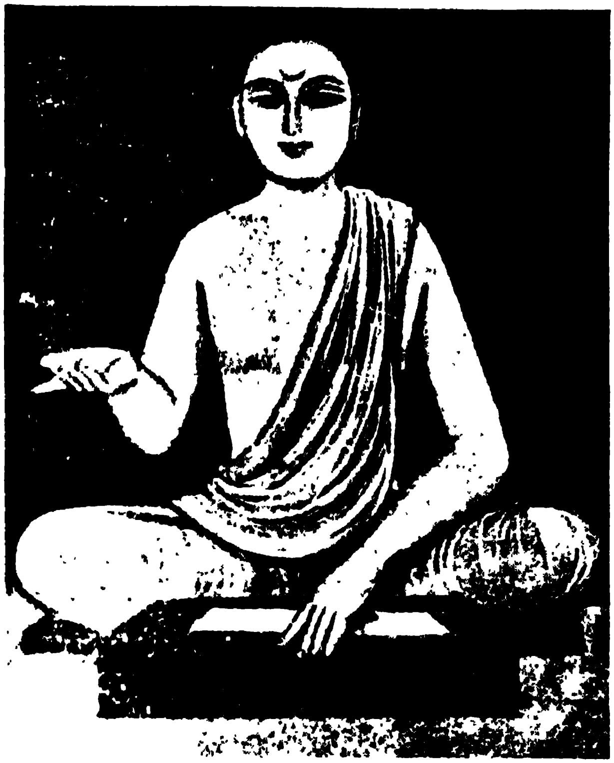
ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে বিচার আরম্ভ হলে স্বামিজীর উকিল বিচারককে বুঝিয়ে বললেন, ইনি কামনাশূন্য যোগী পুরুষ, কাজেই এঁর কাপড় পরবার দরকার হয় না। বিচারপতি ত্রৈলঙ্গ স্বামীর অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের বিষয় জানতে পেরে তাঁকে মুক্তি দিলেন।

১৮৬৮ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীতে এসে 'সচল শিব' ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন করেন। তাঁর সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব ভক্তদের পরে বলেছেনঃ "দেখলাম সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তাঁর শরীরটা আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন। উঁচু জ্ঞানের অবস্থা। শরীরের কোন হুঁশই নেই। রোদে বালি এমনি তেতেছে যে পা দেয় কার সাধ্য। তিনি সেই বালির ওপরেই শুয়ে আছেন।" অতিকায় দেহটি নিয়ে ত্রৈলঙ্গ স্বামী প্রায়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা গঙ্গায় চিৎ হয়ে ভাসমান অবস্থায় থাকতেন। স্বামিজীর কৃপাধন্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলতেনঃ ঐশীশক্তি সমস্ত মানুষের মধ্যেই গুপ্ত রয়েছে তাকে জাগ্রত করে নিতে পারলেই সবকিছু সম্ভবপর হয়।

একদিন উজ্জয়িনীর মহারাজা রামনগর দর্শন শেষে বজরায় চেপে কাশীর ঘাটে আসছিলেন। গঙ্গার বুকে ভাসছিলেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী। তিনি বজরায় উঠে বসলেন। মহারাজার কোমরে ঝোলান ছিল চকচকে তরবারি। স্বামিজী সেটি হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে আচমকা ছুড়ে ফেলে দিলেন গঙ্গার জলে। মহারাজা অগ্নিশর্মা হয়ে অনুচরদের বললেন লোকটিকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। তখন ত্রৈলঙ্গ স্বামী মুচকি হেসে বজরায় বসেই একটি হাত গঙ্গার জলে ডুবিয়ে একখানা নয়—দুখানা চকচকে তরবারি তুলে আনলেন। রাজা তো বিস্ময়ে থ। দুটি তরবারিই দেখতে হুবহু এক-রকম। স্বামিজী নির্দেশ দিলেন তোর তরবারি কোনটি চিনে নে। মহারাজা চিনবেন কী করে। তখন স্বামিজীই রাজার আসল তরবারিটি ওঁকে দান করে অপরটি ছুড়ে ফেলে দিলেন জলে। বিস্ময়াভিভূত মহারাজা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর চরণে লুটিয়ে পড়ে তাঁর হঠকারিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। স্বামিজী তাঁকে বললেন, "মূর্খ তুই, যে জিনিস নিজের বলে দাবি করছিস সেটাকে নিজেই চিনতে পারিসনি। তোর মনটা শুধু মান অহংকারে ভরা। জেনে রাখ, মরণশীল মানুষের নিজের বলে কিছুই থাকে না। যা তুই মৃত্যুর পরে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবিনে তা নিয়ে এত দম্ভ কিসের?"

ত্রৈলঙ্গ স্বামী জীবিত ছিলেন দুশ আশি বছর। জন্ম তাঁর ১৫২৯ শকাব্দে (১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে)। দেহরক্ষা করেন ১৮০৯ শকাব্দে (১৮৮৭ সালে) পৌষ মাসে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি জানতে পেরেছিলেন তাঁর কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে। মৃত্যুর দিনে নির্দিষ্ট সময়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে তিনি দেহরক্ষা করেন।

তুলসীদাস



তু[illegible] বাড়িতে গিয়েছিলেন। আকাশে [illegible] তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন। এসে [illegible] রত্নাবলী ঘরে নেই। ব্যস্ত [illegible] পাশের বাড়িতে গিয়ে [illegible] সেই খবর পেয়ে রত্নাবলী [illegible] তাড়াতাড়ি বাপের বাড়ি চলে গিয়েছেন।

তুলসীদাস ছিলেন স্ত্রী-অন্ত প্রাণ; তাঁকে ছেড়ে একদিনও থাকতে পারেন না। তাই ঝড়বাদল উপেক্ষা করে [illegible] শ্বশুরবাড়ির দিকে। যখন সেখানে পৌঁছালেন তখন তাঁর সমস্ত শরীর জলে ভেজা, [illegible]।

[illegible] এই ব্যাপার দেখে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বিদ্রূপ করতে লাগল। লজ্জা পেয়ে রত্নাবলী বললেন, ছি, ছি আমার এই হাড়মাংসের দেহটার পেছনে তোমার এত আসক্তি! আমার প্রতি তোমার যে অনুরাগ, এই অনুরাগ যদি ভগবান্ রামচন্দ্রের প্রতি দেখাতে পারতে তা হলে এতদিনে তুমি তাঁকে লাভ করতে পারতে।"

সেদিনের এই যুবকই উত্তরকালে পরিচিত হলেন গোস্বামী তুলসীদাস নামে।

তুলসীদাসের আবির্ভাব ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগের নিকট বান্দা জেলার রাজপুর গ্রামে। পিতা আত্মারাম দ্বিবেদী আর মাতা হুলসী দেবী।

স্ত্রীর ধিক্কার-বাণীতে তুলসীদাসের সমস্ত মোহ একদিন ঘুচে গেল। তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বহু কষ্টে এসে পৌঁছলেন কাশীতে। সেখানে আশ্রয় পেলেন বিখ্যাত শাস্ত্রবিদ নৃসিংহ দাসের কাছে। সেখানে থেকেই তুলসীদাস শাস্ত্র পাঠে ব্রতী হলেন এবং সেই সঙ্গে ইষ্টদেব রঘুনাথজীর নামকীর্তন ও লীলা-বিবরণ পাঠ চলতে লাগল।

তুলসীদাসকে তিনি সাধনমার্গের সংকেত দিলেন। কিছুকাল সাধন ভজন করার পর গুরুজী বললেন, "তুলসী, তুমি এবার চিত্রকূট পর্বতে যাও। শ্রীরামের অবতার-লীলার স্থান ঐ পর্বত। সেখানে তুমি কিছুদিন তপস্যা কর। শ্রীরামচন্দ্রের নিশ্চয় দেখা পাবে।"

তুলসী তাই করলেন। পাহাড়ের এক কোণে একটি ছোট ভজনকুটির তৈরি করে বাস করতে লাগলেন। রোজ ভোরে ঝরনার জলে স্নান করে ভজনে বসেন। সারা দিনের শেষে ফলমূলে করেন ক্ষুধার নিবৃত্তি।

একদিন সকালে তুলসী পূজার আয়োজনে ব্যস্ত আছেন। চন্দন ঘষছেন আর গুন-গুন করে রামগান করছেন। এমন সময় সুন্দর ফুটফুটে একটি ছেলে সেখানে এসে বলল, "আমাকে চন্দন পরিয়ে দাও।"

তুলসী ভাবলেন বনবাসী কোন বালক। কিন্তু হাতে তার তীর ধনুক কেন? ভাবলেন, হয়ত পাখি শিকার করতে বেরিয়েছে। তুলসীদাস ছেলেটির কপালে চন্দনের ফোঁটা এঁকে দিলেন।

পুলককম্পিত কণ্ঠে তুলসীদাস জিজ্ঞাসা করলেন - "বালক, তুমি কি শ্রীরামচন্দ্রের কোন দোসর?" বালক হাসতে হাসতে জবাব দিল—"দেখ আমি কে।"

তুলসী তাকিয়ে দেখেন, জ্যোতির্ময় রামমূর্তি! আলোকের ছটায় চারদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ দেখে তুলসীদাস মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন বালক অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। তুলসীদাস কেঁদে আকুল। সে কান্না আর থামে না।

সে কান্নায় আকুল হয়েই বুঝি প্রভু রঘুনাথজী আর একদিন তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন। বললেন—"তুলসীদাস, আমার লীলা-কাহিনীকে তুমি জনমানসের সামনে তুলে ধর। কলিযুগের উপযোগী করে, কলির কলুষ মোচনের জন্য রচনা কর আমার নব রামায়ণ।"

এর পর তুলসীদাস শ্রীরামচন্দ্রের লীলাস্থানগুলি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। প্রচার করতে লাগলেন রামনাম। নিভৃতে বসে অবসর সময়ে রামায়ণ রচনা করেন আর মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন রামনাম প্রচারে।

কাশীর ভাদানিতে গঙ্গাতীরে এক পর্ণকুটিরে রামচন্দ্রের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে তুলসীদাস সাধনভজন করতেন আর বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্যের অনুবাদ করতেন। কাশীর ব্রাহ্মণগণ প্রতিবাদ জানালেন দেব-ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থ, একে ভাষান্তরিত করা মহাপাপ। তুলসীদাস বললেন, 'দেবতার মাহাত্ম্য যে কোন ভাষাতেই রচিত হতে পারে; আমি তো শ্রীরামচন্দ্রের আদেশেই এ কাজে হাত দিয়েছি।'

ব্রাহ্মণেরা সহজে ছাড়লেন না। শেষে ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। প্রত্যূষে গংগাস্নানে যাচ্ছেন তুলসী-দাস। একটি যুবতী এসে তাঁকে প্রণাম করল। তিনি আশীর্বাদ করে বললেন, 'তোমার শাঁখাসিঁদুর অক্ষয় হোক!' মেয়েটির আত্মীয়স্বজন তাঁকে জানাল, মেয়েটির স্বামী সদ্য মারা গেছে, সে তাই সহমরণে যাচ্ছে। তুলসী এ কী আশীর্বাদ করলেন তাকে। তুলসীদাস ঘটনা শুনে বিচলিত হলেন না। আশ্রম থেকে চরণামৃত এনে মৃত ব্যক্তির দেহের উপর ছিটিয়ে দিলেন; সংগে সংগে সে পুনর্জীবন লাভ করল। এ অলৌকিক ঘটনার পর কাশীর ব্রাহ্মণেরা তুলসীদাসের রামায়ণ লেখায় আর কোন বাধা দিলেন না।

তুলসীদাস হিন্দি ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন—যার আসল নাম 'রামচরিত-মানস' হলেও সেই গ্রন্থ 'তুলসী রামায়ণ' নামে খ্যাত। তাঁর রচিত নীতি ও ধর্মবিষয়ক দোঁহাবলী কাব্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর নীতিকথার মূল প্রতিপাদ্য হল: হরিভক্তি হলে আর জাতিবিচার থাকে না। তুলসী একটি দোঁহাতে বলছেন: "চাতক, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়—গংগা যমুনা সরযূ আর কত নদী ও তড়াগ রয়েছে, কিন্তু কোন জল খাবে না; শুধু স্বাতী-নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য হাঁ করে থাকে।" তুলসীদাসের আরেকটি কথা: "অষ্টধাতু পরশমণি ছোঁয়ালে সোনা হয়ে যায়।" তেমনি সব জাতি চণ্ডাল পর্যন্ত হরিনাম করলে শুদ্ধ হয়ে যায়। আবার "বিনা হরনাম চার জাত চামার।" ঈশ্বরের নামে মানুষ পবিত্র হয়।

দক্ষিণেশ্বরে বসে এই কথাটিকেই ব্যাখ্যা করে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ: "যে চামড়া ছুঁতে নেই সেই চামড়া পাট করার পর ঠাকুরঘরে নিয়ে যাওয়া যায়। তাই নাম-কীর্তন অভ্যাস করতে হয়। এই অভ্যাস যদি থাকে, মৃত্যুসময় তাঁরই নাম মুখে আসবে।"

অচিরেই বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ বলে তুলসীদাসের খ্যাতি ছড়িয়ে গেল। বহু মুমুক্ষু ও ভক্ত নরনারী তাঁর কাছে এসে ভিড় করতে লাগল।

রামায়ণ রচনা শেষ করেছেন তুলসীদাস। জীবনের ব্রত তিনি উদ্‌যাপন করেছেন।

ইতনী মিনতি রঘুনন্দনসে
দুঃখদ্বন্দ্ব হামারা মিটাও জী
আপনে পদপঙ্কজ-পিঞ্জরমে
চিত্তহংস হামারা বৈঠাও জী।
তুলসীদাস কহে কর জোড়ি
ভবসাগর-পার উতার জী।

অসিঘাটের আশ্রমকক্ষে তুলসীদাস তাঁর শেষ শয্যায় শুয়ে আছেন। ভক্তরা করছে রামনাম। মহাসাধকের যে রসনা অবিরত রামগানে মুখরিত থাকত আজ তা নীরব। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের এক বর্ষণক্লান্ত দিনে তুলসীদাসের জীবনের উপর যবনিকা নেমে এল। এমন একটি দিনেই তিনি ইষ্টদেবতার সন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন।

রামপ্রসাদ



কলিকাতার গরানহাটার জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র। তাঁর সেরেস্তায় চাকরি নিয়েছেন এক নতুন মুহুরী। নাম রামপ্রসাদ। কিন্তু হিসেবের খাতায় হিসেব লেখার পরিবর্তে তিনি লিখেছেন শ্যামা-সংগীত। তাই হৈচৈ পড়ে গিয়েছে।

নালিশ যেতেই দুর্গাচরণবাবু ডেকে পাঠালেন নতুন মুহুরীকে। দুরু দুরু বক্ষে রামপ্রসাদ খাতা নিয়ে হাজির হলেন। গরিব মানুষ। অতি কষ্টে চাকরিটি যোগাড় করেছেন। এবার বুঝি তাও যায়।

দুর্গাচরণ হিসেবের খাতাটি দেখলেন। দেখেই অবাক হয়ে গেলেন। একি! এ যে অপূর্ব শ্যামা-সংগীত

আমায় দাও মা তবিলদারি,
আমি নিমকহারাম নই শংকরী।
পদরত্ন সদাই লুটে, আমি তাহা সইতে নারি।

পড়তে পড়তে দুর্গাচরণ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বললেন "রামপ্রসাদ, এই হিসেবের অঙ্ক কষতে তোমার জন্ম হয়নি। যে ত্রিশ টাকা এখানকার কাজ করে পেতে, তাই তুমি আমার সরকার থেকে পাবে। দেশে ফিরে গিয়ে মায়ের নাম কর।"

রামপ্রসাদ হালিশহরে ফিরে এলেন। দুর্গাচরণ মিত্রের মাসিক বৃত্তি পেয়ে সংসারের অভাব অনটন কিছুটা কমেছে। তাই একমনে শ্যামা মায়ের নামগান আর জপতপ করতে লাগলেন।

বাড়ির কাছে এক জঙ্গলে এক পঞ্চবটী তৈরি করে তার মধ্যে স্থাপিত হল রামপ্রসাদের পঞ্চমুণ্ডীর আসন। দিনের বেলা গঙ্গার ঘাটে বসে স্বরচিত গানের পদগুলি গাইতে থাকেন; সেই সুমধুর গান শুনে নৌকোর মাঝিদের দাঁড় থেমে যায়। সেদিন নবাব সিরাজউদ্দৌলা গঙ্গার উপর দিয়ে বজরায় চেপে যেতে যেতে কালীভক্ত রামপ্রসাদের প্রাণভরানো গান শুনে অভিভূত হয়ে গেলেন। বজরা থামিয়ে রামপ্রসাদকে ডেকে আনালেন। নবাবের অনুরোধে গান ধরলেন রামপ্রসাদ। কিন্তু তাঁর হিন্দি আর ফার্সি গান শুনতে চাইলেন না নবাব। বললেন, "আপনার নিজের গান শ্যামাসঙ্গীতই আপনি করুন, আমি তাই শুনে খুশি হব।"

নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় রামপ্রসাদের গানের খ্যাতি লোকমুখে শুনে হালিশহরে এসে তাঁকে অনুরোধ করেন নদীয়ার রাজকবি হওয়ার জন্য। রামপ্রসাদ বিনীতভাবে সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে একশ বিঘে নিষ্কর জমি প্রদান করেন। প্রতি-দানে রামপ্রসাদও 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করে মহারাজকে উপহার দেন।

অনুমান ১১২৭ সনের (১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দের) আশ্বিন মাসে হালিশহরে জন্ম হয় রামপ্রসাদের। পিতা রামরাম সেন ছিলেন ঐ অঞ্চলের এক ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। বাপের ইচ্ছা, রামপ্রসাদ তাঁর পৈতৃক বৈদ্য ব্যবসা শিখে ধন ও মান লাভ করুক। ছেলে অসাধারণ মেধাবী। অল্পদিনেই ব্যাকরণ ও কাব্য আয়ত্ত করল। তখনকার দিনে ফারসী ও উর্দু না শিখলে উন্নতি

করা যেত না বলে ঐ দুটি ভাষা শিখতেও তার দেরি হল না।

কিন্তু সংসারের প্রতি ছেলে উদাসীন। তাই বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাবা ব্যস্ত হয়ে রামপ্রসাদের বিবাহ দিলেন।

একদিন হালিশহরে প্রচণ্ড ঝড় হল। ফলে রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া ভেঙে পড়ল। তাড়াতাড়ি বেড়া মেরামত না করলেও নয়। অথচ মজুর লাগিয়ে তা মেরামত করাবেন সে পয়সাও তখন ঘরে নেই। রামপ্রসাদ তাই নিজেই বেড়া বাঁধতে বসলেন। মেয়ে জগদীশ্বরীকে ডাকলেন কাজে সাহায্য করবার জন্য।

রামপ্রসাদ এদিকে বসে বেড়ার ফাঁকে দড়ি ঢুকিয়ে দেন, ওদিক থেকে সেই দড়িটি ফিরিয়ে দিয়ে মেয়ে বাবাকে সাহায্য করে। রামপ্রসাদ গান গাইতে গাইতে আনমনা হয়ে পড়েন। অনেক সময় দড়ি ফিরিয়ে দিতেও দেরি হয়।

চঞ্চলা মেয়ে কতক্ষণ বসে থাকবে? সে এক ফাঁকে চলে যায় খেলাধুলো করার জন্য। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ মনে পড়ল বাবা তার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর হয়ত বেড়া বাঁধাই হচ্ছে না।

কিন্তু মেয়েটি এসে ব্যাপার দেখে অবাক্। বাবার বেড়া বাঁধা প্রায় শেষ। জগদীশ্বরী জিজ্ঞাসা করল "বাবা, তুমি একা কিভাবে এতটা বেড়া বাঁধলে?"

রামপ্রসাদ বললেন—"কেন, তুই তো এতক্ষণ দড়ি ফিরিয়ে দিচ্ছিলি।" মেয়ে বলল "সে কি বাবা, আমি তো অনেকক্ষণ এখান থেকে চলে গেছি।"

রামপ্রসাদের তখন বুঝতে বাকি রইল না, তাঁর আরাধ্যা দেবীই কন্যারূপে এসে তাঁকে সাহায্য করেছেন। একথা ভাবতে ভাবতে হৃদয় রোমাঞ্চিত হল। দুই চোখ বেয়ে পড়তে লাগল আনন্দাশ্রু।

সাধন ভজনের বিরাম নেই রামপ্রসাদের। এবার প্রয়োজন একজন পথপ্রদর্শকের—একজন সদ্‌গুরুর। তাও একদিন মিলে গেল। শ্যামনগরের পথে গঙ্গার ধার দিয়ে চলতে চলতে এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হল। সেই সন্ন্যাসীই রামপ্রসাদকে শবসাধনায় সিদ্ধ হওয়ার পথে সাহায্য করলেন। শক্তি-সাধনার নিগূঢ়তম ক্রিয়াগুলিও শেখালেন।

সেই যৌগিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতে করতে একদিন রামপ্রসাদ দেখতে পেলেন, চারদিক আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, জগন্মাতা অপরূপ রূপে তাঁর সামনে আবির্ভূতা হলেন। মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে, কিন্তু ফুল কোথায়। যে ফুল ছিল তা ফুরিয়ে গিয়েছে। অথচ মায়ের পায়ে দুটি ফুল না দিলেই যে নয়। রামপ্রসাদ ফুলের জন্য এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগলেন। পাশেই ছিল একটি গাব গাছ। রামপ্রসাদ অবাক্ হয়ে দেখলেন, তাতে কয়েকটি রাঙা জবা ফুটে আছে। মায়ের প্রিয় ফুল তুলে রামপ্রসাদ মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অনিন্দিত কণ্ঠে গাওয়া রামপ্রসাদ-রচিত বহু গান অমর হয়ে আছে, সে সব গানের অপূর্ব ব্যাখ্যাও ঠাকুর দিয়েছেন; যেমন ভাব, ভক্তি, এর মানে তাঁকে ভালবাসা। যিনি ব্রহ্ম তাঁকেই মা বলে ডাকছে। মা বড় ভালবাসার জিনিস কিনা। ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাঁকে লাভ করা যায়। ভাব, ভক্তি, ভালবাসা আর বিশ্বাস।

"ভাবিলে ভাবের উদয় হয়
যেমন ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়।
কালীপদ-সুধাহ্রদে চিত্ত যদি রয়
তবে পূজা হোম যাগযজ্ঞ কিছুই কিছু নয়।"

রামপ্রসাদ রচিত আর একটি বিখ্যাত গান

ডুব দে রে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে
আহার লোভে সদাই চলে
তুমি বিবেক হলদি গায়ে মেখে যাও
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।

ডুব দিলে কুমির ধরতে পারে কিন্তু হলুদ মাখলে কুমির ছোঁয় না। হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে কামাদি ছয়টি কুমির আছে; কিন্তু বিবেক বৈরাগ্য রূপ হলুদ মাখলে তারা আর তোমাকে ছোঁবে না। শুধু মুখে ব্রহ্ম বললে কী হবে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে।

শক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ প্রায় ষাট বছর বেঁচে ছিলেন। ১৭৮১ সালে [illegible] গঙ্গায় নেমে [illegible] গঙ্গাবক্ষেই দেহরক্ষা করেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী



পু[illegible]ি গ্রামের একপ্রান্তে নির্জন স্থানে কুটির বেঁধে বাস করেন এক সন্ন্যাসী। গাঁয়ের জমিদারের ছেলের সঙ্গে সন্ন্যাসীর এক শিষ্যের একদিন খুব ঝগড়া বাধল। সেই ঝগড়ার পরিণামে হল ভীষণ মারামারি। তার পর মামলা শুরু হল আদালতে। সেই মামলায় শিষ্যের সপক্ষে সন্ন্যাসী সাক্ষ্য দিতে গেলেন।

আদালতে লোকে লোকারণ্য। জমিদার পক্ষের উকিল জিজ্ঞাসা করলেন "আপনার বয়স কত?"

সন্ন্যাসী জবাব দিলেন "দেড়শো বছর।"

রেগে উঠলেন অপর পক্ষের উকিল। চেঁচিয়ে বললেন "এটা আদালত, ঠাট্টা করবার জায়গা নয়।"

সন্ন্যাসী বললেন "তোমাদের যদি বিশ্বাস না হয় তবে যা খুশি বয়স লিখে নাও।"

আদালতের লোক স্তম্ভিত। বলে কী এই পাগল সন্ন্যাসী! সত্যিই কি তাঁর এত বয়স? অপর পক্ষের উকিল আবার প্রশ্ন করলেন—"মারামারির সময় আপনি কোথায় ছিলেন?" সন্ন্যাসী জবাব দিলেন—"আমার আশ্রমে।"

উকিল বললেন—"আপনার বয়স যদি দেড়শো বছর হয়ে থাকে তবে নিশ্চয় এ বয়সে মানুষের দৃষ্টিশক্তি এত প্রখর থাকতে পারে না। তা ছাড়া মারামারি হয়েছে আশ্রমের খানিকটা দূরে। আপনি আশ্রমে বসে কী করে ঘটনাটি দেখলেন!"

সন্ন্যাসী হাসলেন। দূরের একটি গাছের দিকে আঙুল বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"দেখ তো ঐ গাছে কোন প্রাণী ওঠা নামা করছে কি না।" সকলে বলল—"না কিছু দেখছি না তো!" সন্ন্যাসী বললেন—"তোমাদের বয়স কম, দৃষ্টিশক্তিও বেশি। অথচ কিছুই তোমাদের নজরে পড়ছে না? আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এক সারি পিঁপড়ে উপর দিকে উঠছে, আর এক সারি নিচের দিকে নামছে।"

কৌতূহলী হয়ে অনেকেই ছুটে গিয়ে দেখল সন্ন্যাসী যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আদালতের সমস্ত লোক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। হাকিম বুঝলেন—এই সন্ন্যাসী যেমন তেমন সন্ন্যাসী নন, এঁর আছে ঐশ্বরিক ক্ষমতা। তিনি সন্ন্যাসীর সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করেই মামলার রায় দিলেন।

এই সন্ন্যাসী হলেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী। জন্ম আনুমানিক ১১৩৮ বঙ্গাব্দে (১৭৩১ খ্রীঃ)। চব্বিশ পরগনার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত চাকলা গ্রামের রামকানাই ঘোষাল ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ। কমলা দেবী তাঁর পত্নী। তাঁদের চতুর্থ সন্তান লোকনাথ। রামকানাইয়ের বড় ইচ্ছা তাঁর একটি সন্তান সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করুক—বংশ পবিত্র হোক।

লোকনাথের উপনয়নের সময়েই সেই সুযোগ উপস্থিত হল। ভগবান গাঙ্গুলী আচার্যরূপে বালকের সংস্কার সম্পন্ন করালেন। তার পরেই ব্রহ্মচারী এই বালকটি বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় নামে তার এক

বন্ধুকে নিয়ে চিরতরে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। অরণ্যবাস ও কঠোর ব্রহ্মচর্যের মধ্য দিয়ে প্রায় পঁচিশ বছর কেটে গেল। হিমালয়ে দীর্ঘদিন সাধনা করার পর হিতলাল মিশ্র নামে এক মহাযোগীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হল। আচার্য ভগবান গাঙ্গুলী এই মহাসাধকের হাতে লোকনাথ ও তাঁর বন্ধুকে সমর্পণ করে দেহত্যাগ করলেন। তখন এঁদের বয়স ৯০ বৎসর!

সুদীর্ঘ সাধনার মধ্য দিয়ে লোকনাথ লাভ করলেন পরমপ্রাপ্তি, হলেন অপরিমেয় শক্তি-বিভূতির অধিকারী। অনেক বছর পার হওয়ার পর যোগিবর বললেন—"আমার সঙ্গে থাকবার আর কোন প্রয়োজন নেই। পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়।"

বেণীমাধবকে সঙ্গে নিয়ে লোকনাথের শুরু হল নানা স্থান পরিক্রমা। আফগানিস্তান, মক্কা ও মদিনা ভ্রমণের পর বরফের দেশ পরিক্রমণের সময় তাঁর শরীরে এক অদ্ভুত ধরনের সাদা আবরণ পড়ে। তখন তাঁকে স্বাভাবিক মানুষ বলেই মনে হত না। চীন দেশের ভিতর দিয়ে যখন তাঁরা ফিরে আসছিলেন তখন সেখানকার পুলিস তাঁদের গতিরোধ করে। কিছুকাল জেলে আটক রাখার পর চীনের পুলিস কর্মচারীরা বুঝতে পারে—এঁরা দৈবশক্তি-সম্পন্ন ভারতীয় যোগী। তখন তারা সসম্মানে তাঁদের মুক্তি দেয়।

মাথায় জটা, উলঙ্গ সন্ন্যাসী লোকনাথ। পৃথিবীর নানা জায়গা ঘুরে উপস্থিত হলেন পূর্ববঙ্গের চন্দ্রনাথ তীর্থে। এখান থেকে বেণীমাধব গেলেন কামাখ্যার দিকে, লোকনাথ এলেন ত্রিপুরা জেলার দাউদকান্দি গ্রামে। এক বটগাছের তলায় বসে তিনি ধ্যান করছেন, এমন সময় একটি লোক এসে তাঁর পা জড়িয়ে ধরল। বলল—"বাবা, আমাকে রক্ষা করুন। আমি এক ফৌজদারী মামলায় পড়েছি, রেহাই পাবার কোন উপায় নেই।" সন্ন্যাসী তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—"যা, কোন ভয় নেই। তুই মুক্তি পাবি।"

সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে আশ্চর্যভাবে মুক্তিলাভ করে সে আবার এসে মিনতি করল—"প্রভু, চলুন আমার গাঁয়ে। সেখানে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করব।"

সন্ন্যাসী রাজী হলেন। এলেন মেঘনা তীরবর্তী বারদী গ্রামে। বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী নামে খ্যাতিলাভ করলেন সারা দেশে। তাঁর ক্ষুদ্র কুটিরে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে গুণমুগ্ধ শিষ্যের সমাগম হতে লাগল।

লোকনাথের অলৌকিক যোগশক্তি, সূক্ষ্মদেহে যত্রতত্র গমন ও ভক্তদের কৃপাবিতরণের কথা শুনে সাধকপ্রবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছুটে এসেছেন তাঁকে দর্শন করতে। দুই সাধকের সে এক অপূর্ব মিলন-দৃশ্য। লোকনাথ বললেন: "কি রে বিজয়কৃষ্ণ, চন্দ্রনাথের দাবানলের কথা তোর মনে পড়ে?" বিজয়কৃষ্ণ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। চন্দ্রনাথ তীর্থে এক অরণ্যে তিনি ধ্যানমগ্ন ছিলেন, অকস্মাৎ দেখা দেয় এক ভীষণ দাবানল। প্রাণরক্ষার কোন আশাই ছিল না। এমন সময় কোথা থেকে এক অচেনা সাধু উপস্থিত হয়ে গোস্বামীকে বুকে নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যান। বারদী গ্রামে সাক্ষাৎ লাভ করে বিজয়কৃষ্ণ বুঝলেন, সাধক লোকনাথই সেদিনের সেই পরিত্রাতা সাধু।

পুলিস কর্মচারী গৌরগোপাল রায় এসেছেন বারদী আশ্রমে মহাসাধককে দর্শন করবার উদ্দেশ্যে। এমন সময় একটি স্ত্রীলোক এক বাটি দুধ এনে সামনে রাখল। লোকনাথ অমনি 'আয় আয়!' বলে ডাকতে লাগলেন। গৌরবাবু সভয়ে দেখেন এক বিষধর সাপ ছুটে এসে লোকনাথের কোলের কাছে ফণা তুলে দাঁড়াল। বাটিটা তার মুখের সামনে ধরতেই সাপটি চুমুক দিয়ে দুধটুকু খেয়ে নিল। লোকনাথ তাকে বললেন, যাও এবার চলে যাও। সাপটিও পোষমানা জীবের মত তখনই সে স্থান ত্যাগ করল।

ডাঃ নিশিকান্ত বসু আমেরিকায় চিকিৎসা করতেন। একদিন এক মার্কিন মহিলা তাঁর দীর্ঘদিনের রোগের চিকিৎসা করাবার জন্য ডাঃ বসুর কাছে এলেন। ইচ্ছা প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে রোগের চিকিৎসা হোক। ডাঃ বসু পড়লেন বিপদে- এই পদ্ধতি তাঁর জানা নেই। মহিলাটি হঠাৎ দেখেন ডাক্তারের পিছনে দাঁড়িয়ে এক যোগিপুরুষ, তিনিই মহিলাটির হাতে এক ওষুধ গুঁজে দিয়ে মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়েছেন। পরে ডাঃ বসুর কাছে সাধক লোকনাথের ছবি দেখে মহিলাটি বলেন - ইনিই সেই যোগিপুরুষ।

১৩৯ বছর বয়সে ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ স্বেচ্ছায় জীবনলীলা সাঙ্গ করে এই বিরাট যোগিপুরুষ চলে গেলেন অমৃতলোকে।

কমলাকান্ত



বর্ধমানের ওড়গাঁও এর মাঠটি ছিল এককালে নামকরা ডাকাতদের আড্ডা। একদিন সন্ধ্যার একটু আগে কমলাকান্ত শিষ্যবাড়ি থেকে নিজের গ্রামের দিকে ফিরছিলেন। পথেই একদল ডাকাত তাঁকে ঘিরে ধরল। বলল "ঠাকুর, তোমার কাছে কী আছে শীগগির বের করে দাও।"

কমলাকান্তের হাতে ছিল একটি পুঁটলি, শিষ্যবাড়ি থেকে পাওয়া জিনিসপত্র তাতে বাঁধা। ট্যাঁকে গোঁজা ছিল সামান্য কিছু টাকাপয়সা। সেগুলি ডাকাতদের দিয়ে বললেন—"নে বাবারা, গরিব বামুন আমার কাছে আর কিছু নেই।"

ডাকাতরা এবার বলল—"ঠাকুর, তোমাকে যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। বলতো তুমি কে?"

"আমার নাম কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। কাছেই চান্না গ্রামে বাড়ি।"

"তা হলে তো তোমাকে জ্যান্ত ফিরতে দেব না। তুমি ফিরে গিয়ে আমাদের কথা বলে দেবে। আমাদের মধ্যে দু' একজনকে হয়ত তুমি চিনেও ফেলেছ। তাই তোমাকে আমরা কেটে ফেলব।"

"বেশ, তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর। তবে মরার আগে আমাকে একবার মায়ের নামগান করতে দাও।"

ডাকাতরা তাতে রাজী হল। কমলাকান্ত শ্যামাসঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করলেন। কী আশ্চর্য! গান শুনতে শুনতে দস্যুদের মনের ভাব-পরিবর্তন হল। ডাকাত-সর্দার কমলাকান্তের পা জড়িয়ে ধরে বলল—"ঠাকুর, আমরা মহাপাপী। তোমার চরণে আমাদের আশ্রয় দাও।" সেদিন থেকে ডাকাতরা হল ভক্তসাধক।

কমলাকান্তের জন্ম আনুমানিক ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে। বর্ধমানের অম্বিকা-কালনা তাঁর জন্মস্থান। পিতা মহেশ্বর ভট্টাচার্যের অকালমৃত্যুর পর সংসারের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। মাতা মহাদেবী পুত্রদের নিয়ে চান্না গ্রামে পিত্রালয়ে চলে আসেন।

কমলাকান্ত ছিলেন সুকণ্ঠ। ছোটবেলা থেকেই রামপ্রসাদী গান গাইতে ভালবাসতেন। সংসারে মন বসত না। তবু মহাদেবী ছেলের বিবাহ দিলেন।

কমলাকান্তের তরুণী স্ত্রী বড়ই সুলক্ষণা। কমলাকান্ত একদিন তাঁকে ডেকে বলেন, "আমি মায়ের নামগান করে বেড়াই, কালীমা আমার আরাধ্যা দেবী। তোমাকে দেখতে ঠিক মা কালীর মত। তোমার প্রতি আমি তেমন দৃষ্টি দিতে পারিনে। তুমি এতে কিছু মনে কর না তো?" স্ত্রী উত্তর দিলেন, "মনে আবার কী করব? আমি তো তোমারই সহধর্মিণী; তোমার ধর্মসাধনায় যদি সহায় না হই তা হলে আমার স্ত্রীজন্মই বৃথা। জানো, আমি মায়ের পট প্রণাম না করে কোনদিন জলস্পর্শ করি না।"

স্ত্রীর ধর্মমতি দেখে কমলাকান্ত খুশি হন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে গানের পদ রচনা করেন, স্ত্রী পাশে বসে থাকেন, স্বামীকে উৎসাহ দেন।

এ সুখ বেশিদিন সইল না। কিছুদিন পরই পত্নীর মৃত্যু হল। তাতে মনে দেখা দিল বৈরাগ্য।

এই সময়ে তাঁর সাক্ষাৎ হল তন্ত্রসাধক কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর চরণে কমলাকান্ত আত্মসমর্পণ করলেন। জানালেন গৃহত্যাগের সংকল্প। কেনারাম তাঁকে দীক্ষাদান করে বললেন—"তোমাকে গৃহত্যাগ করতে হবে না। তন্ত্রসাধনায় ব্রতী হও। মহামায়ার গড়া এ সংসারে থেকেই কৌল সাধনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তোমাকে মায়ার বাঁধন কাটাতে হবে।"

কমলাকান্ত ঘরে ফিরে এলেন। মায়ের অনুরোধে আবার বিবাহ করতেও বাধ্য হলেন। গ্রামের প্রান্তে জঙ্গলের মধ্যে বিশালাক্ষী দেবীর একটি ক্ষুদ্র মন্দির। সেখানে সাধন ভজন করেন ও নিজে রচনা করে গান করেন। ওদিকে সংসারের অবস্থা অচল হয়ে পড়ল।

একদিন ঘরে স্ত্রী ও কন্যা নিরুপায় ভাবে বসে তাদের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করছে। এমন সময় ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল এক লাবণ্যবতী শ্যামবর্ণা কিশোরী। সঙ্গে তার দুটি সহচরের মাথায় দুটি বড় ঝুড়িতে নানা খাদ্যসামগ্রী। কিশোরী বলল—"এগুলো তুলে নিন, মা পাঠিয়ে দিয়েছেন।" এত জিনিসপত্র দেখে কমলাকান্তের স্ত্রী তো অবাক্। এদিকে বাহকেরা ঝুড়িদুটি মাথা থেকে নামিয়ে দ্রুত প্রস্থান করল। তরুণীটিও যেন কোথায় অদৃশ্য হল।

অনেক রাত্রে কমলাকান্ত ঘরে ফিরে এসব দেখে চমকে উঠলেন। তারপর স্ত্রীর মুখে সব শুনে বুঝতে পারলেন এ মহামায়ারই অপার করুণা।

কমলাকান্তের সাধনা ও সিদ্ধির কথা ক্রমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র সমাদরের সঙ্গে সাধককে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে গুরুর পদে বরণ করলেন। তারপর বর্ধমান শহরের কিছু দূরে কোটালহাটে কমলাকান্তের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করে দিলেন। তাঁর বিগ্রহ পূজার জন্য একটি মাসিক বৃত্তিও নির্ধারিত হল।

কমলাকান্তের মন বড় অশান্ত—শ্যামা মা তো এখনও দর্শন দিচ্ছেন না! এতদিনের সাধনা সব কি ব্যর্থ হয়ে যাবে! বিষন্ন মনে গান ধরেছেন—'মা, না করি নির্বাণে আশ, না চাহি স্বর্গবাস, নিরখি নয়নদুটি হৃদয়ে রাখিয়ে।' হঠাৎ মন্দিরকোণে এক মহিলা বলে ওঠেন: "বাবা, থামলে কেন, আবার গাও!" কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করেন: "তুমি কে?" মহিলা বলেন: "আমায় চিনতে পারলে না? আমি ধর্মনারায়ণের মা।" কমলাকান্ত হাসিমুখে পর পর কয়েকখানি শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়ে মহিলাকে বিদায় দিলেন। পরদিন গোয়ালা ধর্মনারায়ণ দুধ দিতে এসে বলল তার মা তো অনেক বছর আগেই মারা গিয়েছেন। কমলাকান্ত বুঝলেন, শ্যামা মা-ই তাঁকে দর্শন দিয়ে গান শুনে গিয়েছেন।

কমলাকান্ত বিরচিত 'সাধকরঞ্জন' গ্রন্থে তাঁর গানগুলি সংকলিত। তারই একটি গান—

শ্যামাধন কি সবাই পায়।
অবোধ মন বোঝে না এ কী দায়!...
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়
নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়॥

সাধক-কবি জগন্মাতার নামকীর্তন করেছেন এই গানে:

সদানন্দময়ী কালী (মহাকালের মনোমোহিনী)।
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ মা
আপনি দাও করতালি॥
আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালি।
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন
(তুই) মুণ্ডমালা কোথায় পেলি॥
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি।
যেমন করাও তেমনি করি মা,
যেমন বলাও তেমনি বলি॥

কমলাকান্তের আর একটি বিখ্যাত গান:

মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হল, কামাদি কুসুম সকলে।
চরণ কালো, ভ্রমর কালো,
কালোয় কালো মিশে গেল,
তার পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল।

কমলাকান্ত বৃদ্ধ হয়েছেন। দেহাবসানের সময় ঘনিয়ে এসেছে। মহারাজ তেজচন্দ্র ব্যস্ত হলেন গুরুদেবকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু কমলাকান্ত বললেন—"মহারাজ, ব্যস্ত হবেন না। মায়ের মন্দিরের সামনেই আমি চোখ বুজতে চাই।"

পরের দিন কমলাকান্ত বললেন—"আমার জন্য তৃণশয্যা বিছিয়ে দাও।" তাই করা হল। সকলে অবাক্ হয়ে দেখল, তৃণশয্যা ভেদ করে গঙ্গার পবিত্র ধারা বইছে। সেই বিচিত্র ভাবেই মহাসাধকের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটল।

লালাবাবু



শীতের শেষ। দুপুরের মিঠে রোদ আর স্নিগ্ধ বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যায়। কাছারির কাজ সেরে পাল্কি চেপে লালাবাবু চলেছেন গঙ্গার ধার দিয়ে। এক গাছের ছায়ায় পাল্কি নামিয়ে লালাবাবু বিশ্রাম করে নিচ্ছেন। এমন সময় কানে ভেসে এল এক বালিকার কণ্ঠস্বর: "বেলা যে চলে যায়, বাবা, ঘুম থেকে উঠবে না? দিন যে শেষ হয়ে এল!"

সামান্য কটি কথা। কিন্তু লালাবাবুর হৃদয়মূলে গিয়ে বিঁধে করল। বাংলার গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার প্রতাপান্বিত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নাতি কৃষ্ণচন্দ্র। ঠাকুর্দা আদর করে ডাকেন 'লালা' নামে। সেই থেকে সবার তিনি লালাবাবু। বিত্ত ও মর্যাদায় পূর্বভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই লালাবাবু। আজ এই ঘনায়মান সন্ধ্যাকালে ছোট্ট বালিকার কণ্ঠে বেলাশেষের মধুর সতর্কবাণী শুনে ঐশ্বর্যবান্ জমিদার লালাবাবুর অন্তঃকরণ মথিত হয়ে উঠল। গৃহে পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দজীউর মূর্তি প্রত্যহ পূজিত হন, দেবতার কৃপাও অজস্রধারে বর্ষিত হয়েছে সিংহ-পরিবারের উপর; কিন্তু জীবনের আসল সম্পদ কি সত্যিই পেয়েছেন খুঁজে? অন্তর কি হয়েছে তৃপ্ত? হৃদয়-সিংহাসনে কি চরণস্পর্শ হয়েছে জীবনস্বামীর? বেলা যে সত্যিই চলে যায়! যশ, মান, বিত্ত—পার্থিব ভোগ-বিলাসের যত উপকরণ সমস্ত থাকবে পড়ে, ইষ্টদেবতার সান্নিধ্য পেলাম কই?

প্রাসাদে ফিরে এসে সে এক নতুন লালাবাবু। ভোগবাসনা ত্যাগ করে, কাঙালের বেশ পরে যাত্রা করলেন বৃন্দাবনের পথে—পত্নী-পুত্র-পরিজন ছেড়ে।

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি সিংহ-পরিবারে আনুমানিক ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লালাবাবুর জন্ম হয়। কয়েক বৎসর পর ঠাকুর্দা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মারা যান। পিতা প্রাণকৃষ্ণ পুত্রের লেখাপড়ায় প্রচুর যত্ন নিয়েছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন কৃষ্ণচন্দ্র। তার মধ্যে সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষাতেই তাঁর ব্যুৎপত্তি বেশি। ছেলের স্বভাবটিও চমৎকার। যেমন সত্যনিষ্ঠা ও ঈশ্বরভক্তি, তেমনি তাঁর পরোপকারে উৎসাহ। তরুণ বয়সে চলে আসেন বর্ধমান শহরে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার প্রচেষ্টায়। বর্ধমান কালেকটরীর সেরেস্তাদার রূপে কর্মজীবন শুরু, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দক্ষতার জোরে ক্রমশ পদোন্নতি হতে থাকে। এই সময়ে যুবক কৃষ্ণচন্দ্র বিবাহ করেন; তাঁর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

উনিশ শতকের প্রথম পাদে লালাবাবু উড়িষ্যা প্রদেশের সর্বোচ্চ দেওয়ানের পদ লাভ করেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দেয় বাৎসরিক কর বহুদিন বাকি পড়েছিল কর্তৃপক্ষের অবহেলায়। সরকারী নিয়মে মন্দির নিলামে ওঠার কথা। এ খবর শুনে লালাবাবু হস্তক্ষেপ করলেন। তাঁর নির্দেশে নিলাম বন্ধ হল, পুরীর রাজাও দেয় কর তাড়াতাড়ি শোধ করে দিলেন। মন্দিরের মর্যাদা রক্ষায় লালাবাবুর এই সহানুভূতির সংবাদ উড়িষ্যার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত পুণ্য জগন্নাথধামের সান্নিধ্য পেয়ে লালাবাবুর চিত্তে ভক্তিরসের প্লাবন বয়ে যায়। একদিন সংবাদ পেলেন পিতা ইহলোক ত্যাগ করেছেন। কলকাতায় এসে লালাবাবু দানসাগর শ্রাদ্ধকর্ম করলেন। পিতা বিপুল বিষয়সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন, দেখবার লোক নেই; তাই লালাবাবু উড়িষ্যার দেওয়ানী-কর্মে ইস্তফা দিয়ে কলকাতাতেই থাকা স্থির করলেন। একদিকে চলে বৈষয়িক কাজকর্ম, অপর দিকে চলে ভক্তিসাধনা।

এমনি সময়ে, শীতের সেই প্রশান্ত পড়ন্ত বেলায়, গঙ্গাতীরে ধীবরকন্যার কণ্ঠে শুনতে পেলেন সর্বকালের শাশ্বত চিরসত্যঃ 'বেলা যায়—বেলা যায়!' বালিকার মুখে সে কথা শুনেই লালাবাবু সংসার পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে আসেন।

বৃন্দাবনধামে সারাটা দিন কেটে যায় কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণভজনে। মাধুকরী করেন ভক্তের দ্বারে দ্বারে—তাই দিয়ে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। কলকাতা এস্টেটের দেওয়ানজী তাঁর কাছে এসে নিবেদন করেন রানী কাত্যায়নী দেবী এবং পুত্র নারায়ণচন্দ্রের কাতর অনুরোধঃ "আপনি বৃন্দাবনে বাস করতে চান, করুন। কিন্তু পিতামহ এবং পিতা যে বিপুল সম্পদ রেখে গিয়েছেন তার অংশ নিতে দোষ কী!" লালাবাবু নিজের ব্যয়নির্বাহের জন্য এস্টেটের এক কপর্দকও নিতে রাজী হলেন না; তবে সেই অর্থের কিছু অংশ নিতে সম্মত হলেন বৃন্দাবনের ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার এবং গোবিন্দজীর নিত্যপূজা ও মহাপ্রসাদের ব্যয়নির্বাহ খাতে। দেওয়ানজী ফিরে গেলেন। অল্পকাল মধ্যে কলকাতা ও উড়িষ্যার জমিদারী থেকে পাঁচিশ লক্ষ টাকা লালাবাবুর নামে চলে আসে। তিনিও বৃন্দাবনের ব্রজমণ্ডলে সাধনপীঠ, কুণ্ড, স্নানের ঘাট, মন্দিরাদির সংস্কারে সেই অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন।

লালাবাবুর পরিকল্পিত বিশাল মন্দিরের নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত। বংশীধর কৃষ্ণচন্দ্রমা জীউর যুগলমূর্তি সেখানে হয়েছে সংস্থাপিত। মন্দির-সংলগ্ন অতিথি শালায় প্রতিদিন শত শত সাধুসন্ত ও ভক্ত অন্নগ্রহণ করেন। একদিন আরাধ্য দেবতার অসীম কৃপা প্রত্যক্ষ করলেন লালাবাবু। মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতের বেলা। ঠাকুরের সেবা পূজা হয়ে গিয়েছে ষোড়শোপচারে। হঠাৎ লালাবাবু ভোগরাগের উপকরণ থেকে একতাল মাখন তুলে পূজারীকে বললেন ওই মাখনটুকু কৃষ্ণমূর্তির মাথার তালুর ওপর রেখে দিতে-তাঁর কৃষ্ণচন্দ্রমা মূর্তিতে প্রাণসঞ্চার হয়েছে কি না দেখা যাবে। সত্যিই দেখা গেল, কিছুক্ষণ পরে মূর্তির তালু থেকে মাখনপিণ্ড গলে গিয়ে ঝরে পড়ছে—দেবতার সারা দেহ মাখনলিপ্ত। ভক্তিতে, কৃতজ্ঞতায় লালাবাবুর নয়নে অশ্রু আর বাধ মানে না।

একদিন স্বপ্নে ইষ্টাদেশ পেলেন, গিরিগোবর্ধনে গিয়ে নির্জনতায় নামভজন করবার। আদেশ মেনে লালাবাবু রোজই গোবর্ধন পরিক্রমা করেন, তারপর মাটির গোফার মধ্যে বসে নামজপ করেন। এক ঝড়জলের রাত্রে মন্দিরের পূজারী দেখেন, লালাবাবুর জন্য যে প্রসাদ রাখা ছিল, পাত্রে তা নেই। বিস্মিত পূজারী ঝড় থামার পর কিছু ফলমূল নিয়ে গোফায় গেলে লালাবাবু জানালেন, একটু আগেই তো পূজক নিজে এসে ঠাকুরের প্রসাদ তাঁকে খাইয়ে গেছেন! পূজারী বুঝলেন স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রমাই তাঁর ভক্তকে কৃপাধন্য করে গেছেন। শেষ জীবনে মথুরার কৃষ্ণদাস বাবাজীর কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ভক্তপ্রবর লালাবাবুর অসীম বৈরাগ্য, দুশ্চর তপস্যা ও সিদ্ধি-সাধনার খ্যাতি এখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্রজমণ্ডলে রাজা-মহারাজা, সাধু ভক্ত যারাই উপস্থিত হয় সকলেই কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শন করার জন্য ব্যাকুল। এই খ্যাতির বিড়ম্বনা চিরবৈরাগী লালাবাবুর কাছে অসহ্য বোধ হল। মনে মনে সংকল্প করলেন এবার গোবর্ধন ত্যাগ করে কোন নির্জন অরণ্যে চলে যাবেন, বাকি জীবন কাটাবেন নির্মল সাধনভজনে।

গভীর নিশীথে সকলের অগোচরে লালাবাবু গিরিগোবর্ধন ছেড়ে চলেছেন অজ্ঞাতবাসে। অকস্মাৎ গোফার অনতিদূরে ঘটল এক দুর্ঘটনা। গোয়ালিয়র থেকে একদল যাত্রী অশ্বারোহণে যাচ্ছিল তাঁকেই দর্শন করতে; হঠাৎ অন্ধকারে তাদের একটি ঘোড়া অসাবধানে লালাবাবুর পা মাড়িয়ে দেয়। অশ্বখুরের আঘাতে প্রচণ্ড ক্ষতের সৃষ্টি হল পায়ে। কোন চিকিৎসাতেই তার নিরাময় হল না। তবু তাঁর রোগপাণ্ডুর আননে চিরপ্রশান্তি বিরাজমান। যমুনাপুলিনে এই ভক্ত মহা-সাধক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রামদাস কাঠিয়াবাবা



পূর্ব পাঞ্জাবের লোনাচামারী গ্রামের অধিবাসী রামদাস। পিতা গ্রামের একজন সম্মানিত ব্রাহ্মণ, গুরুগিরি করে সংসার প্রতিপালন করেন। সেই গ্রামের এক পাশে পরমহংস শ্রেণীর এক সন্ন্যাসীর বাস। বালক রামদাস মায়ের সঙ্গে সেই সন্ন্যাসীর আশ্রমে যান। গিয়ে দেখেন অসংখ্য ভক্ত সেই পরমহংসের চরণে প্রণাম করে তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা জানায়। কৌতূহলী রামদাস জিজ্ঞাসা করেন—"মহারাজজী, আপনার কাছে এসে সবাই মাথা নোয়ায় কেন? আপনি কী করে এত বড় হলেন?"

পরমহংসজী হেসে জবাব দেন—"বেটা, আমি যে সদাই রামনাম করি। ঐ নামই আমাকে ছোট থেকে বড় করেছে। তুমিও ঐ নাম জপ কর, আমার মতো হতে পারবে।"

সেই দিন থেকে রামনাম রামদাসের জপমালা হয়ে ওঠে। পিতা আড়ম্বর সহকারে পুত্রের উপনয়ন দেন। শাস্ত্রশিক্ষার জন্য বালককে আচার্যের কাছে পাঠান।

আচার্য-গৃহে পাঠ শেষ হলে পুত্রের বিবাহের জন্য পিতা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু রামদাস পিতাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন—"ছোট ভাইকে বিয়ে করাও, সে-ই সংসার করুক। সংসারধর্ম আমার জন্য নয়।"

গ্রামের সীমানায় এক বিরাট বটগাছ। তারই নিচে রামদাস আসন পেতে বসে পড়লেন। এক লক্ষ বার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার পর তিনি এক দৈববাণী শুনতে পেলেন 'বৎস, অবশিষ্ট পঁচিশ হাজার জপ তুমি জাগ্রত মহাতীর্থ জ্বালামুখীতে গিয়ে সম্পূর্ণ কর।"

এই নির্দেশ পাওয়ার পর রামদাস জ্বালামুখীর দিকে এগোলেন। কিন্তু পথেই দেখা হল জটাধারী দিব্যকান্তি এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। রামদাসের মনে হল এই সন্ন্যাসী যেন তাঁর কত কালের পরিচিত। জ্বালামুখী তীর্থে আর যাওয়া হল না। রামদাস সেই সন্ন্যাসীর নিকটে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নিলেন। এই সন্ন্যাসীই গুরু দেবদাসজী।

আরাম বা বিলাস যাতে রামদাসের তপস্যার পথে কোন বিঘ্নসৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য গুরুজী তাঁর কোমরে ভারী কাঠের একটি আড়বন্ধ বেঁধে দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে ঝোলান থাকত একটি কাঠের লেঙটি। এই সব পরে' রামদাসকে চলতে-বসতে-শুতে হত। খুবই অসুবিধে হত, কিন্তু উপায় নেই। এই কাঠের লেঙটির জন্যই তাঁর উপাধি হয়েছিল 'কাঠিয়াবাবা'।

একদিন গুরু দেবদাসজীর দেহান্তর ঘটল। রামদাসের কৃচ্ছ্রসাধনার তীব্রতা আরও বেড়ে গেল। প্রবল শীতে বরফগলা জলে সারারাত আকণ্ঠ ডুবে থাকতেন; পরদিন সকালে শিষ্যরা জল থেকে তুলে আগুনের তাপ দিয়ে তাঁর দেহে চেতনা আনত ফিরিয়ে।

রামদাস কাঠিয়াবাবার যোগসিদ্ধির খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছে চারিদিকে। একটি সন্ন্যাসী ঈর্ষাবোধ করতে থাকে তাঁর অসীম যোগশক্তি দেখে। গ্রামের প্রান্তে ভগ্ন

দুপুরে ধুনি জ্বালিয়ে ধ্যান করছিলেন রামদাস। ভণ্ড সাধুটি তাঁর চারদিকে ঘুঁটে সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় তাতে। দাউ দাউ করে যখন আগুনের লেলিহান শিখা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠেছে, চারপাশের লোকেরা ও ভক্তজন এসেছে ছুটে। সকলে ভাবল রামদাস নিশ্চয়ই আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছেন। আগুন নেভাবার পর দেখা গেল কাঠিয়াবাবা অক্ষতদেহে যোগাসনে বসে আছেন ধ্যানমগ্ন হয়ে।

এইবার শুরু হল গুরুর নির্দেশে বহু তীর্থ ও জনপদ পরিক্রমা। এক দেশীয় রাজ্যের রানী ছিলেন বিধবা সুন্দরী তরুণী। রামদাসজী তাঁর প্রাসাদে অতিথি হন। রানী ক্রমে এই নবীন সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অন্তরের প্রেম নিবেদন করেন। সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ নারী ও রাজপ্রাসাদের সমস্ত কিছু প্রলোভন ত্যাগ করে রাজপথে বেরিয়ে পড়েন।

তখন সিপাহী বিদ্রোহ চলছে। যমুনা নদীতে গোরা সৈন্যদের একটি জাহাজ নোঙর-করা অবস্থায় ছিল। কাঠিয়াবাবাজী বসে ছিলেন তীরে। একজন গোরা সৈন্য তাঁর অদ্ভুত বেশ দেখে ভয়ানক ক্ষেপে গেল। একজন তাঁকে লক্ষ করে গুলি ছুড়ে বসল। গুলিটি কিন্তু কানের পাশ দিয়ে চলে গেল, তাঁর গায়ে লাগল না। গোরা সৈন্যটি তাতে আরও রেগে গেল। সে আবার বন্দুক তুলল। কাঠিয়াবাবাজী বললেন—“কী জ্বালা! বেটা দেখি কিছুতেই ছাড়বে না।” এই বলে তিনি দুই চোখ বুজে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন। তখনই এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। সৈনিকের হাত থেকে বন্দুকটি যমুনায় পড়ে গেল। এবার গোরা সৈনিকের হুঁস হল। বুঝল ঐ উলঙ্গপ্রায় সাধুটি সামান্য লোক নন। সকলেই জাহাজ থেকে নেমে টুপি খুলে কাঠিয়াবাবাজীকে অভিবাদন জানাল।

শীঘ্রই শ্রীশ্রী১০৮ রামদাস কাঠিয়াবাবা ভারতবিখ্যাত মহাপুরুষ হয়ে উঠলেন। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, এমন অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারতেন কাঠিয়াবাবা। আপন সাধনসত্তার গভীরে লুকিয়ে রাখতেন এক অপরিমেয় শক্তির ভাণ্ডার; অথচ ব্যবহারিক জগতের প্রয়োজন ও পরিবেশ অনুযায়ী অতি সহজ-সাধারণ আচরণই করতেন তিনি। তাঁর শিষ্য সন্তদাস মহারাজকে তিনি বলেন, “বাবা, হাতীকো দো দাঁত রহতা হ্যায়—এক বাহারমে দেখানেকে লিয়ে, দুসরা ভিতরমে খানেকে লিয়ে। ভিতরকা দাঁত দুসরা আদমীকো মালুম নহী পড়তা হ্যায়। সাধুসন্তদেরও তেমনি দুটো বৃত্তিঃ একটি হচ্ছে বহিরঙ্গ বাইরের মানুষকে দেখাবার জন্য, দ্বিতীয়টি তাঁর অন্তরস্থ নিগূঢ় সত্তা—চৈতন্যালোকের অখণ্ড বোধ।” বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ আচরণের এই বৈপরীত্যের মাধ্যমেই বাবাজীর লীলামাধুর্যের বিচিত্র প্রকাশ ঘটত। একবার এক দেশীয় রাজা বৃন্দাবনে আসেন বাবাজীর দর্শন অভিলাষে। রাজার ভক্তির পরিচয় পেয়ে বাবাজী তাঁর অট্টালিকায় গিয়ে অভ্যর্থনা গ্রহণ করলেন। আপ্যায়নাদি শেষে বেরিয়ে আসার সময় কাঠিয়াবাবা দেখেন দ্বারদেশে দারোয়ান দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রণাম করছে। অমনি বাবাজী দরজায় বসে পড়ে দারোয়ানের সঙ্গে হাসিঠাট্টা, খোশগল্প শুরু করলেন। সমদর্শী বাবাজীর কাছে রাজা ও রাজভৃত্যের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না।

বৃন্দাবনে যমুনার তীরে তাঁর আশ্রমটি ছিল খুবই সাধারণ। অগণিত ভক্ত তাঁর সেই আশ্রমে যাতায়াত করত। তাঁর শত্রুও ছিল কয়েকজন। অনেকে মনে করত তাঁর আশ্রমে প্রচুর গুপ্তধন আছে। তাই কয়েকবার তাঁকে মেরে ফেলবার চক্রান্ত হয়।

আশ্রমের রাঁধুনি পুষ্করদাসের ধারণা হয় কাঠিয়াবাবাজীর কোমরে কাঠের আড়বন্ধের মধ্যেই সঞ্চিত ধন লুকানো আছে। তাঁকে হত্যা করলেই সেই ধন হস্তগত হবে। তাই সে একদিন বাবাজীর রুটির সঙ্গে অনেক পরিমাণে আর্সেনিক বিষ মিশিয়ে দিল। এই তীব্র বিষের জ্বালায় কাঠিয়াবাবাজী মাটিতে পড়ে গেলেন। মাথায় গুরুতর আঘাত লাগল এবং পাকস্থলীতে দেখা দিল ভয়ানক গোলযোগ।

পেট ফেঁপে উঠবার ফলে কাঠিয়াবাবা কোমরে কাঠের আড়বন্ধের চাপ সহ্য করতে পারছিলেন না। ভক্তেরা তাঁর অনুমতি নিয়ে করাত দিয়ে ঐ আড়বন্ধটি কেটে ফেলে। কিন্তু তার মধ্যে কোন গুপ্তধন না থাকায় পুষ্করদাস ভয়ানক হতাশ হয়ে পড়ে। কিছুদিন পর কাঠিয়াবাবা সুস্থ হয়ে ওঠেন।

১৩১৬ সনের (১৯০৯ সাল) ৮ই মাঘ। প্রচণ্ড শীত। মধ্যরাত্রিতে উঠে জল চাইলেন। জল খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই নিদ্রাই শেষ নিদ্রা।

যোগী ত্রিপুরলিঙ্গ



কনৌজের বিরাট ধনী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি জীবেশ্বর তেওয়ারী। দেবদ্বিজে তাঁর অশেষ ভক্তি। একদিন সেই বাড়িতে এলেন এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। জীবেশ্বর যত্নসহকারে অতিথি সৎকার করালেন। বিদায়ের সময় তিনি যুক্তকরে বললেন—'বাবা, আমার ইচ্ছা আপনার সেবার জন্যে একটি আশ্রম তৈরি করে দিই।'

সন্ন্যাসী বললেন 'বেটা, আশ্রম বানিয়ে সংসারের ঝামেলা পোহাতে আমি চাই না। সময় এলে আমার যা দরকার তা চাইব। তখন কিন্তু দিতে হবে।'

জীবেশ্বর তেওয়ারী ও তাঁর স্ত্রী হরপিয়ারী দেবী রাজি হলেন। কিছুকাল পরে তাঁদের ঘরে জন্মগ্রহণ করল এক অনিন্দ্যসুন্দর শিশু। ঠিক সেইদিনই আবার সেই সন্ন্যাসী এসে হাজির। বললেন—'বেটা, তোমাদের ঘরে যে জন্ম নিয়েছে, সে হবে অসামান্য যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ। আমার হাতে এই শিশুকে দান কর। পালন কর তোমাদের প্রতিশ্রুতি।'

জননী অশ্রুসজল চোখে শিশুকে সন্ন্যাসীর হাতে তুলে দিলেন। সন্ন্যাসী শিশুটিকে আশীর্বাদ করে ফিরিয়ে দিলেন মায়ের কোলে। বললেন—'আজ থেকে এর ওপর তোমাদের কোন অধিকার রইল না। তবে তোমাদের কাছে একে গচ্ছিত রেখে গেলাম। সময় হলেই আমি নিয়ে যাব।' এই বলে সন্ন্যাসী চলে গেলেন।

ছেলের নাম রাখা হল বেণীপ্রসাদ। পাঁচ বছর হলে জীবেশ্বর ছেলের বিদ্যারম্ভ করালেন। বৈদিক সংস্কার করিয়ে যথাসময়ে তার উপনয়নও দেওয়া হল। কিছুকাল পরেই এসে উপস্থিত হলেন সেই সন্ন্যাসী। বললেন—'জীবেশ্বর, তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণ কর।'

জননী হরপিয়ারী কেঁদেই আকুল। কিন্তু কী আশ্চর্য! হাসতে হাসতে বেণীপ্রসাদ সন্ন্যাসীর সঙ্গে চলে গেল। পাহাড়ী আশ্রমে সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে রইল প্রায় এগার বছর। তারপর সন্ন্যাসীই তাকে নিয়ে এলেন কনৌজের বাড়িতে। জীবেশ্বরের হাতে সঁপে দিয়ে বললেন—'তোমার পুত্রের ব্রহ্মচর্য ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে। এবার তাকে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে হবে। ভাল মেয়ে দেখে তার বিয়ে দাও।'

সন্ন্যাসী চলে গেলেন। বাবা মা সুন্দরী পাত্রী দেখে ছেলের বিবাহ দিলেন। কয়েক বছর পরে একটি ছেলেও হল।

রাত্রে বেণীপ্রসাদ স্বপ্নে দেখলেন সেই সন্ন্যাসী তাঁকে বলছেন—'বেটা আর কতকাল এই ঘুমে কাটাবে? জড়িয়ে পড়বে আরও মায়ার বন্ধনে। এবার বেরিয়ে পড়।'

পরদিন ভোরেই বেণীপ্রসাদ গৃহত্যাগ করলেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষাগুরু সেই সন্ন্যাসী কোথায় আছেন তা বেণীপ্রসাদের জানা নেই। গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর

মাঠ হেঁটে চললেন। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এক গাছের তলায়। হঠাৎ জেগে দেখলেন সেই সন্ন্যাসী সশরীরে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

সন্ন্যাসীর আশ্রমে বেণীপ্রসাদ কিছুকাল থাকলেন। আরম্ভ করলেন নিগূঢ় যোগসাধনার কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি। তারপর সন্ন্যাসীর সঙ্গে তীর্থপর্যটনে বেরোলেন। নানা তীর্থ দর্শন করবার পর দুজনেই এসে উপস্থিত হলেন কানপুরের কাছে বিঠোরে।

সন্ন্যাসী বললেন—'বেটা, আমার অনেক বয়স হয়েছে। এবার আমি নরদেহ ত্যাগ করে যাব।' বেণীপ্রসাদ কেঁদে আকুল হলেন। সন্ন্যাসী তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, 'বেটা, অধীর হয়ো না। রামেশ্বর তীর্থে এক মহাযোগীর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে। তিনিই তোমাকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দেবেন।'

সন্ন্যাসীর মৃত্যুর পর বেণীপ্রসাদ বেরিয়ে পড়লেন দক্ষিণ ভারতের পথে। রামেশ্বর তীর্থে দেখা পেলেন ত্রৈলঙ্গস্বামীর। বুঝতে পারলেন ইনিই তাঁর বিধি-নির্দিষ্ট গুরু। এই মহাযোগীর কাছে মহানন্দে দীক্ষা নিলেন। নতুন নাম হল ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামী।

গুরুর বাক্য শিরোধার্য করে ত্রিপুরলিঙ্গ পরিব্রাজনে বেরোলেন। নানাস্থানে দর্শন করলেন নানা অলৌকিক দৃশ্য। হিমালয় পর্বতের কন্দরে কন্দরে মন্ত্রমুগ্ধ যোগীর ন্যায় প্রব্রজ্যা করে চলেছেন স্বামী ত্রিপুরলিঙ্গ। এখানকার সাধনায় যে চরম দিব্যানুভূতি তিনি লাভ করেন সে প্রসঙ্গে লিখছেন তাঁর এক ভক্তশিষ্য: "পাহাড়ের গায়ে এক বৃক্ষমূলে ত্রিপুরলিঙ্গ বসিয়া আছেন, ভাবতন্ময়তায় একেবারে মগ্ন। যখন চেতনা ফিরিয়া আসিল তখন সমস্তই মধুময় বোধ করিতে লাগিলেন। কাহার মধুর স্পর্শে হৃদয়তন্ত্রী যেন সুমধুর তানে বাজিয়া উঠিল। এক অপূর্ব মধুর সুরতানসমন্বিত সঙ্গীত উত্থিত হইয়া অনন্তাভিমুখে কোথায় যেন ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহার আর শেষ নাই।"

হিমালয় ও তিব্বতের বনপথ হয়ে নেপাল, সিকিম, ভুটান, কামাখ্যা ও জয়ন্তিয়া পাহাড় পেরিয়ে স্বামী ত্রিপুরলিঙ্গ অবশেষে পূর্ববঙ্গে ঢাকায় এসে উপস্থিত হলেন। ঢাকাই হয়ে উঠল মহাযোগী ত্রিপুরলিঙ্গের লীলাভূমি।

বটগাছের নিচে বসে ধুনি জ্বালিয়ে ধ্যানমগ্ন মহাযোগী। হঠাৎ সোরগোল উঠল। একটা বিরাট বাঘ নিশ্চিন্ত আরামে সামনে বসে আছে। শিকারীদের তাড়া খেয়ে বাঘটা এখানে এসেছে। ক্ষণপরেই হাতির পিঠে চড়ে বন্দুকধারী শিকারীর দল এসে উপস্থিত। পুরোভাগে ঢাকার নবাব আবদুল গণি সাহেব। এত লোকজন দেখে বিরক্ত হয়ে বাঘটি পিছনের বনাঞ্চলে অদৃশ্য হয়ে গেল। নবাব হাতি থেকে নেমে এসে ত্রিপুরলিঙ্গজীকে সেলাম করে দাঁড়ালেন। বললেন, যোগিবর অবশ্যই আল্লার আশীর্বাদ পেয়েছেন, নইলে বনের হিংস্র বাঘ তাঁর সামনে শান্ত হয়ে বসে থাকবে কেন। তিনি জনগণের মাঝে এসে বসবাস করার অনুরোধ জানালেন মহাযোগীকে, হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁর কৃপালাভ করে ধন্য হবে।

ঢাকার নবাবের ইচ্ছানুসারে ত্রিপুরলিঙ্গ কুর্মিটোলা এবং শাহবাগে থাকলেন। সেই সময়ে অল্পদিনের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। দারিদ্র্য ও শোকতাপে জর্জরিত নরনারী এসে ভিড় করতে লাগল। মুসলমান ভক্তদের কাছে তিনি রুস্তন-শাহ ফকির এবং হিন্দু ভক্তদের কাছে সিদ্ধাই ঠাকুর নামে পরিচিত হলেন। পরে ত্রিপুরলিঙ্গ স্থায়ী আশ্রম করলেন স্বামীবাগে।

এখানে থাকা কালে রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে বিপ্লবীদেরও পরোক্ষে সাহায্য করতেন স্বামীজী। নারিন্দিয়ার পুরন্দর ঘোষ—দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই লোকটি ছিল নানা পাপকর্মের গুরু। একবার কার্যোপলক্ষে নৌকাযোগে সে যাচ্ছিল মেঘনা নদীর পথে। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবে নৌকাডুবি হল, পুরন্দর নদীর জলে পড়ে গেল। যখন তার প্রাণসংশয় তখন হঠাৎ দেখে নদীবক্ষে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরলিঙ্গ তাকে অভয় দিচ্ছেন। মৃত্যুপথযাত্রী পুরন্দর তার পায়ের নিচে মাটির স্পর্শ পেল। অলৌকিক ভাবে প্রাণ ফিরে পেয়ে পুরন্দর স্বামীবাগের আশ্রমে এসে স্বামী ত্রিপুরলিঙ্গের শরণাপন্ন হল। স্বামীজী তাকে বললেন, প্রয়াগধামে গেলে সে তার গুরুর সাক্ষাৎ পাবে। পুরন্দর প্রয়াগে গিয়ে ইষ্টগুরুর আশ্রয়লাভ করল।

দেড়শ বছরেরও অধিককাল এই মহাযোগী নরদেহে অবস্থান করে নির্বাণ লাভ করেন।

তোতাপুরী



পুরীধামে উলঙ্গ এক সন্ন্যাসীকে ঘিরে বেজায় ভিড়। কত লোক কত কিছু মনের বাসনা নিয়ে বাবার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। এতকাল সাধু কোথায় ছিলেন কে জানে? সাধুবাবার বয়স যে কত তা কেউ সঠিক বলতে পারে না। ১৯৪৯ সালে তাঁর আগমন-বার্তা পুরীধামে ছড়িয়ে পড়ে। সবাই তাঁকে 'নাঙ্গাবাবা' বলে ডাকে। কেউ কেউ বলে—এই নাঙ্গাবাবা হচ্ছেন পাঞ্জাবী সাধক। ইনিই ইতিহাস-বিখ্যাত তোতাপুরী। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ইনিই দীক্ষা দিয়েছিলেন।

তোতা যখন দক্ষিণেশ্বরে এলেন তখন তিনি মধ্যবয়সী প্রৌঢ়। মন্দিরচত্বরে পৌঁছেই প্রথমে গেলেন ঘাটের প্রশস্ত চাঁদনিতে। অনেকেই বসে ছিলেন—রামকৃষ্ণও ছিলেন। তোতার সন্ধানী চোখ তাঁকে ঠিক খুঁজে নিল। বুঝতে পারলেন, এ যুবক আর পাঁচজন সাধারণ থেকে আলাদা। তোতা সোজা তাঁর কাছে এসে বললেন, "তোকে উত্তম অধিকারী মনে হচ্ছে। বেদান্ত সাধনা করবি?"

শান্ত কণ্ঠে রামকৃষ্ণ জবাব দিলেন, "কী করব তার আমি কী জানি? সব জানেন মা। তিনি হ্যাঁ বললে আমি করব।"

—তবে যা, তোর মাকেই জিজ্ঞাসা করে আয়।

তোতা ভেবেছিলেন রামকৃষ্ণ তাঁর মানবী-মায়ের কথা বলছেন। কিন্তু তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন রামকৃষ্ণ গিয়ে ঢুকলেন মা কালীর মন্দিরে। কিছুক্ষণ পরে রামকৃষ্ণ বেরিয়ে এলেন—ভাবে টলমল, বাহ্যচেতনশূন্য অবস্থায়। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তোতাকে বললেন, "মাকে জিজ্ঞেস করলুম। মা বললেন—যা শেখ্; তোকে শেখাবে বলেই তো অতদূর থেকে এসেছে!" রামকৃষ্ণের সরল নিষ্পাপ মুখ দেখে তোতা মুগ্ধ। পঞ্চবটীর পূর্বদিকের একটি চালাঘরে রামকৃষ্ণকে দীক্ষা দিলেন তোতাপুরী। চালাঘরের বর্তমান নাম ধ্যানঘর।

তিন দিন, তিন রাত—বাহ্যজ্ঞানবিলুপ্ত হয়ে রামকৃষ্ণ ধ্যান করে চলেছেন—দেহে সাড়া নেই, মুখে শব্দ নেই, মুখমণ্ডল দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তালা খুলে ঘরে ঢুকে তোতা তাই দেখে স্তম্ভিত। 'য়হ ক্যা দৈবী মায়া!' যেটি লাভ করতে আমায় কয়েক বছর ধরে কঠোর সাধনা করতে হয়েছে, যুবক রামকৃষ্ণ সেটি একদিনে পেয়ে গেলেন! তোতা পরীক্ষা করে দেখলেন, হৃদস্পন্দন হচ্ছে না, সত্যিকারের নির্বিকল্প। তোতা বার বার 'হরি ওঁ' মন্ত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন। অবশেষে সমাধি থেকে রামকৃষ্ণের উত্থান হল। গুরুর সামনে লুটিয়ে পড়লেন রামকৃষ্ণ। তোতাও শিষ্যপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেনঃ "ন্যাংটা আমায় উপদেশ দিত—গীতা দশবার বললে যা হয় তাই গীতার সার। অর্থাৎ 'গীতা' 'গীতা' দশবার বলতে বলতে 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়।" নাঙ্গাবাবা বলতেনঃ "ঘটি একদিন মাজলে কী হবে—ফেলে রাখলে আবার কলংক পড়বে।"

পুরী তীর্থবাসের গোড়ার দিকে নাঙ্গাবাবা থাকতেন সাগরতীরে এক শ্মশানে। সারাদিন ধ্যানস্থ থাকবার পর সন্ধ্যার একটু আগে বাবাজী একসের দুধ ও দুটি ডাব আহার্য হিসেবে গ্রহণ করতেন। মধু গোয়ালা রোজ ভক্তিভরে এই দুধ যোগাত। তার সঙ্গে থাকত বালক পুত্র বংশীধর। রোজ একজোড়া ফুলের মালা নাঙ্গাবাবার গলায় পরিয়ে সে ভক্তিভরে প্রণাম করত। বংশীধর ছিল জন্মান্ধ। মধু গোয়ালা গরিব হলেও একমাত্র পুত্রের চোখের চিকিৎসার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। একদিন মধু ছেলেকে বলে দিল—"আজ মালা দেওয়ার পর বাবাকে প্রণাম করে চোখের দৃষ্টি প্রার্থনা করবি।"

বংশীধর কেঁদে কেঁদে বাবার কাছে মিনতি জানাল—"বাবা, আমি জন্মান্ধ, আপনি আমার ওপর কৃপা করুন।" নাঙ্গাবাবা চোখ মেলে তাকালেন। তাঁর মনে দয়া হল। বললেন—"বাচ্চে, দেখো, আভিসে তুম অন্ধা নাহি, পুরা দৃষ্টি তুমহারা আঁখমে আ গিয়া।" বংশীধরের দৃষ্টিও তখন খুলে গেল। চোখের সামনে সব কিছু দেখতে পেয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

এর পর নাঙ্গাবাবা গির্ণারীর বস্তায় তাঁর আশ্রম স্থাপন করেন। কিন্তু আসন বিছিয়ে কিছুদিন কোথাও অবস্থান করার পরই হঠাৎ একদিন মহাপুরুষ কোথায় অন্তর্ধান করতেন। কিছুদিন পর দেখা যেত কোন বনে, শ্মশানে বা সাগরতটে। যেখানে যেতেন সেখানেই আশ্চর্যভাবে তাঁর সঙ্গী জুটে যেত। কিন্তু কোন সঙ্গীকে তিনি সঙ্গে রাখতে চাইতেন না। বলতেন—"আমি নেংটা মানুষ, কোনরকম কৃচ্ছ্র-সাধনাতেই আমার কষ্ট হয় না। তোমরা কেন আমার সঙ্গে থেকে কষ্ট করবে?"

১৯২১ সালের মাঝামাঝি নাঙ্গাবাবা আবার পুরী অঞ্চলে ফিরে আসেন। অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে আনন্দের সাড়া জেগে ওঠে।

পুরীর অন্যতম জমিদার কৃষ্ণবাবুর স্ত্রী তুলসী দেবী ছিলেন নাঙ্গাবাবার অন্যতম ভক্ত। তিনি অক্লান্ত-ভাবে বাবার সেবা করতেন। একবার নাঙ্গাবাবা কাউকে কিছু না বলে পুরীধাম থেকে অন্তর্হিত হলেন। বাবার অদর্শনে কাতর হয়ে তুলসী দেবী প্রতিজ্ঞা করলেন—যতদিন বাবা পুরীধামে না ফিরবেন, ততদিন তিনি থাকবেন উপবাসী। খুবই আশ্চর্যের কথা, এই মহিলা ভক্তের অনশনব্রত চলে প্রায় দু বছর ধরে। নাঙ্গাবাবার অলৌকিক কৃপাশক্তিই তাঁকে সাহায্য করেছিল।

দু বছর পর ভক্তরা খবর পেলেন, নাঙ্গাবাবা ভাগলপুরের কাছে এক গভীর অরণ্যে তপস্যায় রত আছেন। কৃষ্ণবাবু ছুটে সেখানে গেলেন। স্ত্রীর অনশনের কথা বাবাজীকে জানালেন। তখন বাবাজী আর দেরি না করে ফিরে এলেন পুরীধামের আশ্রমে।

আত্মপ্রচারবিমুখ এই সন্ন্যাসী ভক্তসঙ্গে নিরন্তর বেদান্তপাঠে নিরত থাকতেন। বলতেনঃ "সকল সাধনার মধ্যে বেদান্তবিচারই শ্রেষ্ঠ। বেদান্ত হচ্ছে এক চমৎকার সেতু মানুষ তো বটেই, পিঁপড়েও এর ওপর দিয়ে ভবনদী পার হতে পারে।" তোতাপুরী বাবাজীর আশ্রমে দশনামী বা কবীর পন্থী, উত্তরভারত বা দক্ষিণ ভারত—সমস্ত সম্প্রদায় ও অঞ্চলের সাধকেরাই এসে জুটতেন, সাধনচর্চা করতেন। তোতাপুরী তাঁদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন।

করুণার অমৃতভাণ্ড হাতে নিয়ে এই সাধক মহাপুরুষ নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতেন। বহু দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকে তিনি অসংখ্য মানুষকে রক্ষা করেছেন। অসংখ্য ভক্তের রোগ স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছেন নিজের দেহে।

একবার একটি দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তকে রক্ষা করার পর বাবাজী বললেন "এই আমার তুণে রাখা শেষ বাণ।" এর পরই নাঙ্গাবাবা কালরোগে আক্রান্ত হলেন। প্রায় ১৬০ বছর জীবনযাপনের পর ১৯৬১ সালের ২৮শে আগস্ট তারিখে তাঁর লীলা অবসানের নির্দিষ্ট দিনটি এসে গেল। পুরী তীর্থের এক প্রান্তে যে উজ্জ্বল প্রদীপটি নিভে গেল—তার শিখাটি প্রজ্বলিত রইল অসংখ্য গুণমুগ্ধ ভক্তদের প্রাণে।

ভগবানদাস বাবাজী



কালনার শ্রীপাটে ভক্ত ও বৈষ্ণবজনের ভিড় লেগেই আছে। বৈষ্ণবসাধক ভগবানদাস বাবাজী শ্রীশ্রীনামব্রহ্ম বিগ্রহের সেবা প্রবর্তন করেছেন। একদিন বাবাজী তাঁর ভজন-কুটিরে বসে মালা জপ করছেন এমন সময় বর্ধমানের মহারাজা সেখানে এলেন। হঠাৎ বাবাজী হাতের মালাটি আসনের উপর রেখে চিৎকার করে উঠলেন "ওরে মার্, মার্, তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে।"

তা শুনে মহারাজ ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি বিষয়ী ও ধনী লোক বলেই কি তাঁর উপর সাধুবাবার এত ক্রোধ! কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ভগবানদাস মালাটি আবার হাতে তুলে মহারাজকে বললেন "বাবা, কতক্ষণ আসা হয়েছে?" মহারাজ অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন - "প্রভু, আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইলেন কেন?" ভগবানদাস মৃদু হেসে বললেন "না বাবা, আপনাকে তাড়াব কেন? বৃন্দাবনধামে গোবিন্দজীর মন্দিরে তুলসীমঞ্চের ওপর উঠে একটা ছাগল তুলসীগাছের পাতাগুলো খেয়ে ফেলছিল। প্রভুর সেবায় বিঘ্ন হবে বলে আমি ওটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম।"

বর্ধমানরাজ ভাবলেন, এটা কি সম্ভব? তাই তিনি বৃন্দাবনের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নামে টেলিগ্রাম পাঠালেন। জবাবে জানা গেল যে, ঠিক সেই সময়ে গোবিন্দজীর তুলসীমঞ্চের গাছটি একটি ছাগল খাচ্ছিল। কালনা-নিবাসী ভগবানদাস বাবাজী অকস্মাৎ সেই সময়ে স্থূলদেহে উপস্থিত হয়ে ছাগলটিকে তাড়িয়ে দেন। এই অলৌকিক ঘটনার কথা শুনে বর্ধমানরাজ বিস্মিত হলেন।

মহাবৈষ্ণব ভগবানদাস বাবাজী ছিলেন উড়িষ্যার এক অখ্যাত গ্রামের অধিবাসী। বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী তখন গোবর্ধনে ভজন-নিরত। তরুণ বৈষ্ণব ভগবানদাস একদিন এই মহাপুরুষের পদেই আত্মসমর্পণ করে ভেক গ্রহণ করলেন।

দীর্ঘদিন তিনি গুরুর আশ্রয়ে থেকে সাধন ভজনের নিগূঢ় ক্রিয়াদি আয়ত্ত করেন; তারপর গুরুর নির্দেশেই পরবর্তী কালে বর্ধমানের অম্বিকা-কালনায় এসে বসবাস করতে থাকেন। ভজনসিদ্ধ মহাসাধক একান্ত নিষ্ঠা সহকারে গুরুদেবের আরাধনায় ব্যাপৃত থাকেন—গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাঁর জপতপ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

একবার প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন করতে কালনায় আসেন। গোস্বামীজী তখন ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক। তিনি পথশ্রান্ত, পিপাসার্ত; তাই আশ্রমের এক সেবকের কাছে পানীয় জল চাইলেন। ভগবানদাস বাবাজী তখন কুটির থেকে বেরিয়ে এলেন। নিজের করঙ্গখানি সযত্নে ধুয়ে বিজয়কৃষ্ণের জন্য জল নিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টান্ন প্রসাদেরও ব্যবস্থা হল।

বিজয়কৃষ্ণ অবাক্ হয়ে বললেন—"আমি ব্রাহ্ম, জাতিভেদ মানি না, যার-তার ছোঁয়া খাই, আমাকে আপনার করঙ্গ থেকে জলপান করতে দেবেন?"

দৈন্য ও বিনয়ের জীবন্ত প্রতিমূর্তি এই ভগবানদাস। গোস্বামীর এ কথায় তিনি সংকোচে মরমে মরে গেলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাসানুদাস যিনি, তাঁর এমন কথা কখনও কানে শুনতে নেই।

ভগবানদাস বললেন—"প্রভু, জাতিবুদ্ধি ও ভেদবোধ থাকতে কি আর ভগবানের কৃপা হয়? এ অধমকে আর পরীক্ষা করবেন না। কৃপা করে জলপান করুন।"

বিজয়কৃষ্ণের জল পানের পর ভগবানদাস করঙ্গের অবশিষ্ট জলটুকু পরমানন্দে পান করলেন।

এই দুই মহাসাধকের মিলন সময়ে আশ্রমে আরও কিছু অভ্যাগত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বিজয়কৃষ্ণের উদ্দেশে ব্যঙ্গাত্মক উক্তি করলেন—"গোস্বামী-মশায় দেখছি ব্রাহ্মণ হয়েও গলার উপবীতটি ত্যাগ করেছেন!" বাবাজী মহারাজ তাঁদের বাধা দিয়ে বললেন, "আহা, অমন কথা বলো না। উনি ব্রাহ্ম হলেও মহাসাধক। ব্রাহ্মসমাজেও ইনি আচার্য বলে সম্মানিত। অদ্বৈত সন্তানের কী মহিমা!"

আবার মন্তব্য হল, "কেমন আচার্য তা তো দেখাই যাচ্ছে! জামা-জুতো পরা মডার্ন আচার্য!" ভগবানদাস অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, "এ কথা বলা মহা অপরাধ। এই সাধক মহাপুরুষকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া আমাদের অবশ্যক র্তব্য। আমরা তো কিছুই করতে পারলাম না। ইনি নিজে সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন আপন সাধনার বলে। সেটুকুও আমাদের সহ্য হচ্ছে না!"

অলৌকিক শক্তিসমূহের প্রকাশ সিদ্ধবাবাজীর জীবনে দিনের পর দিন প্রকট হতে লাগল। ভজনসিদ্ধি ও মানসিক শক্তির বলে গৌড়ীয় সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে তিনি পরিচিত হয়ে উঠলেন।

কালনার ভগবানদাসের সমসাময়িককালে নবদ্বীপের চৈতন্যদাস বাবাজীরও খুব নামডাক ছিল। দুজনের বন্ধুত্বও ছিল গভীর। একবার মহাপ্রভুর মন্দিরে বসে নামগান শোনার উদ্দেশ্যে ভগবানদাস নবদ্বীপে এসেছেন। আশ্রম প্রাঙ্গণে তখন চৈতন্যদাস সম্মার্জনী হস্তে ঝাঁট দিচ্ছিলেন। বন্ধুকে মন্দিরে ঢুকতে দেখেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ঝাঁটা হাতে তাঁকে বহিষ্কৃত করতে চাইলেন। বললেন, "তুই মন্দির থেকে আমার প্রভুকে কেড়ে নিতে এসেছিস? ভগবানদাস নম্রকণ্ঠে জবাব দিলেনঃ "ভাই, আমি কেন তোমার প্রভুকে কেড়ে নেব? তবে তোমার প্রভুই যে মাঝে মধ্যে কালনায় আমার কাছে চলে যান। তুমি তাঁর প্রতি আর একটু নজর রেখো।" লজ্জিত হয়ে চৈতন্যদাস বন্ধুর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে মন্দিরমধ্যে সাদরে নিয়ে গেলেন।

একবার আশ্রম থেকে শ্রীনামব্রহ্মের কতকগুলি মূল্যবান অলংকার চুরি যায়। বিগ্রহের পূজারী ব্রাহ্মণ এই কাজ করে পালিয়ে যায়। ভক্তরা পুলিসের সাহায্যে অলংকারগুলি উদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু ভগবানদাস তাদের বাধা দিয়ে বলেন—"তোমরা ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ঠাকুরের অলংকার পরবার হয়ত এখন ইচ্ছে নেই। তাই পূজারীকে এগুলো নিয়ে যেতে দিয়েছেন। যখন তাঁর পরবার ইচ্ছে হবে তখন তিনি আপনি পরবেন।"

কয়েকমাস পরে একদিন ভোরে হঠাৎ দেখা গেল সেই পূজারী ব্রাহ্মণ পুঁটুলি বেঁধে সেই অলংকারগুলি নিয়ে এসেছে। বাবাজীর পায়ের উপর কেঁদে পড়ে সে বলল 'বাবা, লোভে পড়েই আমি এগুলো নিয়ে পালিয়েছিলাম। কিন্তু অনুতাপে ও অশান্তিতে একদিনও স্বস্তিতে কাটাতে পারিনি। তাই এগুলি নিয়ে এসেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

কালনাতে বাবাজীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়েছিল। ঠাকুরের সমাধি অবস্থা দেখে বাবাজী বলেছিলেন "আপনি মহাপুরুষ, চৈতন্যদেবের আসনে বসবার আপনিই উপযুক্ত।"

রাগানুগা ভজনের নিগূঢ় ধারাপথ বেয়ে ভগবানদাস বাবাজীর একনিষ্ঠ সাধনা গোপনে এগিয়ে চলত। বাহ্য আচার-আচরণে ভক্তিরসাবেশের চাঞ্চল্য তাঁর মধ্যে বড় একটা দেখা যেত না। প্রেমোচ্ছ্বাসসিক্ত রসধারাকে বহিরঙ্গ আচরণে উপচে পড়তে ভক্তরা বিশেষ দেখেনি। অন্তরের রসস্নিগ্ধ ভক্তিপ্রেমকে সংহত করে বাহিরে একটি মধুর গাম্ভীর্যভাব বজায় রাখবার শক্তি ছিল তাঁর। হৃদয়ের অপার ভক্তিপ্রবাহকে তিনি সঞ্চালিত করে দিতেন ভক্তজনদের মধ্যে। এটাই ছিল তাঁর সাধনার বৈশিষ্ট্য।

ভগবানদাস নিজে ছিলেন ভক্তনিষ্ঠ। ভক্ত ও শিষ্যদের জীবনেও অকপট ভজননিষ্ঠা ও শুদ্ধাচারী জীবনের আদর্শকে রূপায়িত করার উপরেই তিনি বেশি জোর দিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের অন্যতম বৈষ্ণবসাধক ছিলেন শ্রীভগবানদাস বাবাজী।

তিব্বতী বাবা



শিবচতুর্দশীর পুণ্যতিথিতে ঠাকুরের ভোগনৈবেদ্য সাজিয়ে মা গেছেন স্নান করতে। ছেলেকে বসিয়ে রেখে গেছেন পাহারায়। এসে দেখেন ইঁদুরে নৈবেদ্যের উপচার খেতে শুরু করেছে। পুত্রকে তিরস্কার করতেই সে বলে ওঠে: "যে ঠাকুর নিজের চাল-কলা রক্ষা করতে পারে না, তাকে পুজো করে কী ফল? ভগবানকে এই কুঠুরীতে বসিয়ে চাল-কলা, ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুজো করতে আমার মন চায় না। জলে স্থলে আকাশে সবজায়গায় তিনি আছেন ছড়িয়ে। আমার যে তাঁকেই দেখতে ইচ্ছে করে, মা!"

মা সে কথা শুনে শিউরে ওঠেন। ছেলে কি তার সন্ন্যাসী হতে চায়? জন্মের আগে এক অতিথি সন্ন্যাসী এসে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাই কি সত্য হবে?

সেই শিশু এখন পনের বৎসর বয়সের তরুণ নবীনচন্দ্র। বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। একদিন হঠাৎ মায়ের কাছে বলে—"মা, মানুষ কোথা থেকে আসে, কোথায় চলে যায়? এই সৃষ্টির মূলে কে রয়েছেন? সংসারের সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে না পড়লে আমার জীবনের এই জিজ্ঞাসার উত্তর কোনদিন মিলবে না।"

শ্রীহট্ট শহরের কিছু দূরে এক গণ্ডগ্রামের ক্ষুদ্র জমিদার রাজচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁরই সন্তান নবীনচন্দ্র জন্মগ্রহণ করে আনুমানিক ১৮২০ সালে।

সংসারে কোন অভাব অনটন নেই। ছেলের প্রতি কোন অযত্ন নেই। তবু একদিন ঘর ছেড়ে নবীনচন্দ্র চলে গেল জীবনের পরম পথের সন্ধানে।

দীনদয়াল উপাধ্যায় ছিলেন গয়ার এক বিখ্যাত কবিরাজ ও শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত। খুব সজ্জন ব্যক্তি। নবীনচন্দ্র তিন বৎসর উপাধ্যায়ের গৃহে বাস করেন। দর্শন ও বৈদ্যশাস্ত্রে তাঁর মোটামুটি ভালোই জ্ঞান হয়। স্থির করেন এই বৈদ্যশাস্ত্রের সাহায্যে জীবিকার পথ সন্ধান করবেন। কিন্তু সহসা তাঁর মনে আত্মচেতনা জেগে উঠল। সেই বন্ধন ছিন্ন করে পা বাড়ালেন বারাণসীর পথে। সেখানে তাঁর এক সঙ্গী জুটল। সেই সঙ্গী তাঁকে নিয়ে উপস্থিত হল এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর কাছে।

জঙ্গলের মধ্যে কাপালিকের সেই মন্দিরে বৃহৎ পাত্রে প্রদীপ জ্বলছে। কারণবারি পান করার ফলে কাপালিকের লোচনদ্বয় আরক্ত। পুষ্পডালার ওপর খড়্গ রয়েছে। মন্দিরে গর্ভগৃহের মধ্যে ঢুকে কাপালিক মন্ত্রপাঠ করলেন। একটু পরে এক শব সাময়িকভাবে সঞ্জীবিত হয়ে দুটি সমান্তরাল দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে আসছে নবীন ও তাঁর বন্ধুর দিকে। দুই হাতে তার দুটি খড়্গ। বন্ধুদ্বয় বুঝলেন কাপালিক তাঁদের বলি দেবার চক্রান্ত করেছেন। মৃত্যু আসন্ন। তাঁরা কোনক্রমে মনে সাহস এনে তলার উপরে রাখা খড়্গটি দিয়ে দড়ির উপর কোপ বসিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে শবটি ছিট্‌কে পড়ল। বন্ধুকে নিয়ে নবীনচন্দ্র সেখান থেকে পালিয়ে এলেন।

বৃন্দাবনে কিছুকাল কাটিয়ে নবীনচন্দ্র শুরু করলেন

তীর্থপরিক্রমা। কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, জ্বালামুখী প্রভৃতি পর্যটন শেষ করে উপস্থিত হলেন কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ তুষারতীর্থ অমরনাথে। অমরনাথ থেকে ফেরার পথে ভাগ্যক্রমে এক শক্তিধর যোগীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। যোগিবর তাঁকে নিজের কাছে রেখে যোগসাধনার অনেকগুলি প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিলেন। কিছুদিন পরে যোগী বললেন—"আমি তোমার গুরু নই। তোমার গুরু রয়েছেন তিব্বতে। তুমি সেখানে যাও। তবে তিব্বতে ঢোকা বড় কঠিন, বড় বিপজ্জনক। তুমি প্রথমে নেপালে যাও। সেখানকার প্রধানমন্ত্রী আমার ভক্ত। আমার নাম করলে সে তোমার তিব্বতে যাবার ব্যবস্থা করে দেবে।"

নেপালের প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতায় নবীনচন্দ্র তিব্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানতে পারলেন পাহাড়ের কোলে ভবতগুহায় শৈবতান্ত্রিক এক প্রাচীন শক্তিমান সাধক থাকেন। নবীনচন্দ্র দুর্গম চড়াই পেরিয়ে সেই গুহায় উপস্থিত হলেন। পরমানন্দ ঠক্কর নামে সেই সাধক পরিচিত। যোগবল ও তান্ত্রিক সিদ্ধাইর ইনি অধিকারী। দিব্য-শক্তির সাহায্যে তিনি কয়েকশ বৎসর বেঁচে আছেন। এই ঠক্কর বাবার কাছেই নবীনচন্দ্র দীক্ষা লাভ করেন। দীর্ঘকাল কঠোর সাধনার পর যোগ ও তন্ত্রে করেন সিদ্ধিলাভ। এর পর তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন তিব্বতী বাবা নামে।

তিব্বতে এই শক্তিধর মহাপুরুষ একাদিক্রমে বত্রিশ বছর অবস্থান করেন। তিব্বত বাসের শেষ সাতটি বছর এই মহাপুরুষ ধ্যানের গভীরে সমাহিত হয়ে যান। কখনো বরফমণ্ডিত গিরিগুহায়, কখনো খরস্রোতা নির্ঝরিণীর ধারে, কখনো সর্প-ব্যাঘ্রসংকুল গভীর অরণ্যে দিনের পর দিন অতিবাহিত করতেন সমাধিস্থ অবস্থায়। শক্তিমান লামা এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিকরা তাঁর সংস্পর্শে আসেন এবং তিনি তাঁদের কাছ থেকে সাধনার বহু নিগূঢ় ক্রিয়া শিক্ষা করেন।

এর পর তিব্বতী বাবা পৃথিবীর নানাস্থান পরিক্রমায় বাহির হন। কৈলাসের অদূরস্থিত চ্যাং-টাং অঞ্চল থেকে তাঁর পদযাত্রা শুরু হয়। উত্তর সাইবেরিয়া পেরিয়ে তিনি পূর্ব চীনে আসেন। চীন, মঙ্গোলিয়া ও সাইবেরিয়া ভ্রমণের মধ্য দিয়ে তিব্বতী বাবা প্রায় ছয় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেন। কিভাবে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করেছিলেন এবং কিভাবে নিজের ভরণপোষণ করেছিলেন তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

হিমালয়ের গুহাকন্দরে সুদীর্ঘ তপস্যা সমাপ্ত করে তিব্বতী বাবা নেমে আসেন লোকালয়ে। মাথায় রুক্ষ জটা, পরনে গৈরিক বসন। এক সরাইখানায় তাঁকে দেখে দুটি লোক তাচ্ছিল্যভরে থুথু দিল। তিব্বতী বাবা নির্বিকার। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর দুটি চোখ অগ্নিবর্ষী হয়ে উঠল। লোকদুটি ছটফট করতে করতে মারা গেল। উত্তরপ্রদেশের এক চটিতে গেছেন, বাইশজন লোক তাঁকে দেখে উপহাস করে থুথু ছিটোল, গলায় পরিয়ে দিল চটিজুতোর মালা। তিব্বতী বাবা তখন কিছু না বলে ধ্যানস্থ হলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল বাইশজন লোকই মরে পড়ে আছে। সবসুদ্ধ চব্বিশটি মানুষ অকালে প্রাণ হারাল। তিব্বতী বাবার অন্তর অনুতাপে ভরে গেল। পরদিন সকালে আর এক ঘটনা। এক মুসলমানের একমাত্র সন্তান দশ বছরের ছেলেকে কবর দেওয়া হয়েছে গোরস্থানে। সবাই যখন ফিরে গেল, তিব্বতী বাবা কবরের মাটি সরিয়ে মৃতদেহটি তুলে আনলেন। তারপর তার সামনে স্থির হয়ে বসে প্রাণায়াম শুরু করলেন পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই তিন প্রক্রিয়ার সাহায্যে। ছেলেটি ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল। তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে তিব্বতী বাবা আবার পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন।

তিব্বতী বাবা বলতেন, "আমি হব একাধারে বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক। বৌদ্ধের বোধি হয়ে উঠবে তার কাছে বৈদান্তিকের পরম জ্ঞান যা তাঁকে নিয়ে যাবে ব্রহ্মোপলব্ধির গভীরে। বৌদ্ধদের নির্বাণবাদ ব্রহ্মোপলব্ধির এক বিশুদ্ধ নির্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়।" সর্বজীবে ব্রহ্মজ্ঞানই বুদ্ধ-প্রচারিত অহিংসা, মৈত্রী ও করুণার মহত্তর উপলব্ধির গভীরে নিয়ে গিয়েছিল তিব্বতী বাবাকে।

বর্ধমানে পালিতপুরে কয়েকজন ভক্ত তিব্বতী বাবার জন্য একটি আশ্রম তৈরি করে দেন—তার নাম 'প্রজ্ঞা মন্দির'।

১৯৩০ সালের ১৮ই নভেম্বর ১৮২ বৎসর বয়সে সেই প্রজ্ঞা মন্দিরে এই মহাসাধক চিরনির্বাণ লাভ করেন।

প্রভু জগদ্বন্ধু



মুর্শিদাবাদের ডাহাপাড়া-নিবাসী পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়রত্নের [illegible] পুত্রের ঠিকুজি দেখে নেপালী সন্ন্যাসী প্রশ্ন করে বসলেন, 'এ শিশুটি কোথায়? আমায় একবার দেখাতে পারেন?'

ন্যায়রত্ন ছুটে বাড়ি গিয়ে শিশুটিকে নিয়ে এলেন। সন্ন্যাসী তাকে কোলে নিয়ে তার পরেই তার পা দুখানি বার বার মাথায় ঠেকাতে লাগলেন। বললেন, 'এ শিশু সর্বসুলক্ষণযুক্ত। এ একদিন নিশ্চয় মহাপুরুষ হবে। এঁর দর্শন পেয়ে আমি ধন্য হলাম।' এই বলে নেপালী সাধু অন্তর্হিত হলেন।

ছেলেটির নাম জগৎ। জন্ম ১৮২১ সালের ১৭ই মে। বাবার নাম দীননাথ ন্যায়রত্ন, মায়ের নাম বামাদেবী। এই পরিবারের আদিবাস ফরিদপুর। ন্যায়রত্ন মশায় পৈতৃক ভিটা ছেড়ে মুর্শিদাবাদে এসে অধ্যাপনা বৃত্তি অবলম্বন করেন।

অল্পবয়সেই জগতের বাবা ও মা মারা যান। জগৎ মানুষ হতে থাকে তার আত্মীয়া এক দিদির কাছে।

পাবনায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে জগৎ পড়াশোনা আরম্ভ করে। কিন্তু পড়ায় মন বসে না। কোথাও নামকীর্তন ও মৃদঙ্গের ধ্বনি শুনলেই সে বিহ্বল হয়ে পড়ে। মোহাবিষ্ট অবস্থায় সাধকসুলভ নানারকম ভাব তার দেহে প্রকাশ পেতে থাকে। শহরের উপকণ্ঠে পুরনো বটগাছের তলায় আছে একটি ভাঙাচোরা অন্ধকার ঘর। জগৎ প্রায়ই সেখানে যায়। এক অর্ধ-উলঙ্গ উন্মাদ থাকে সেখানে। শহরের ছোটবড় সবাই তাকে ক্ষ্যাপা বলে ডাকে। জগৎ তাকে বলে বুড়োশিব।

এই বুড়োশিব বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ। এই মহাপুরুষের চোখে জগতের স্বরূপ ধরা পড়ে যায়। তিনি জগৎকে কী শিক্ষা দেন কে জানে। জগতের দিদি গোলোকমণির কাছে তিনি একদিন বলে ফেলেন—'দ্যাখ্‌ দিদি, জগা মানুষ নয়, আমিও মানুষ নই। তবে জগা রাজা, আমরা সব প্রজা।'

এই জগৎই ধীরে ধীরে মানুষের কাছে প্রভু জগদ্বন্ধু রূপে পরিচিত হলেন। ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে বৈষ্ণব মহাপুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল। দূর দূরান্তর থেকে তাঁকে দেখবার জন্যে লোক আসতে লাগল।

তীর্থ পরিক্রমায় বেরোলেন জগদ্বন্ধু। বৃন্দাবনে এসে তাঁর কী আনন্দ! ব্রজের রজে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। মনে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা জাগল রাধারানীকে দর্শন করার। রাধারানীর দর্শন না পেলে জীবন বৃথা!

জগদ্বন্ধু উন্মাদের মতো হয়ে উঠলেন। কখনও আকুলকণ্ঠে ডাকেন, কখনও মাটিতে আছড়ে পড়ে কাঁদেন। রাধাকুণ্ডের তীর ধরে ছুটে চলেন। সেদিন ঘনঘোর অন্ধকারের মাঝে সহসা ঘটেছিল বিদ্যুৎস্ফুরণ। ঝলসে উঠল অত্যুজ্জ্বল আলোর এক স্বর্ণরেখা। বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে জগদ্বন্ধু দেখেন মহাভাবময়ী

শ্রীরাধা তাঁর সম্মুখে স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে রাধামন্ত্র-স্তব শুরু করলেন জগদ্বন্ধুঃ

অমলকমলকান্তি-নীলবস্ত্রাং সুকেশীং
নবীন-হেমগৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীং।

কৃষ্ণের আনন্দশক্তির তিনি পূর্ণ প্রতীক; তাই শ্রীরাধিকা পূর্ণানন্দবতী। চেতনা হারিয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন জগদ্বন্ধু।

প্রকৃতিস্থ হবার পর জগদ্বন্ধুর আনন্দের সীমা নেই। যদি কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'প্রভু, আপনার গুরু কে? প্রেম-সাধনার দীক্ষা আপনাকে কে দিয়েছেন?' জগদ্বন্ধু জবাব দিতেন—'আমার গুরু বৃষভানু-নন্দিনী। তিনিই আমাকে মন্ত্র দিয়েছেন।'

'নিরন্তর কৃষ্ণনাম লিখবে, জপবে, চিন্তা করবে। কৃষ্ণই গতি, কৃষ্ণই পতি—এটাই সার কথা, পরম ধর্ম। মানসে সর্বদা যুগল-সঙ্গ করে নিজেকে দাসী মনে করবে। কৃষ্ণকান্তি সদা নয়নে ও মানসে ভাসবে। কৃষ্ণই জীবনের ব্রত। তাঁকে ছাড়া অন্য কিছু জানবে না, ভাববে না।' এই ছিল প্রভু জগদ্বন্ধুর মূল বাণী। এই বাণী পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে গভীর আলোড়ন তুলেছিল।

বৃন্দাবনে রাধারানীর কৃপালাভ করবার পর জগদ্বন্ধু ফরিদপুরের ব্রাহ্মণকান্দায় নিজের গ্রামে এলেন। তরুণ সাধককে কেন্দ্র করে সারা গ্রামটি কীর্তনানন্দে মুখরিত হয়ে উঠল। বাল্যসাথীরা তাঁকে পেয়ে আনন্দে অধীর—গ্রামের জনসাধারণও ধন্য।

ফরিদপুর শহরের প্রান্তে বুনো বাগদীদের বাস। জগদ্বন্ধু খবর পেলেন, সেই বুনোদের খ্রীষ্টান করে নেবার জন্যে প্রবল চেষ্টা চলছে। একেই হিন্দুসমাজ জরাজীর্ণ, তার ওপর বুনোরা খ্রীষ্টান হলে হিন্দু-সমাজের অনেক ক্ষতি হবে। জগদ্বন্ধু বুনো বাগদীদের মোড়ল রজনী সর্দারকে ডেকে পাঠালেন। রজনী এলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—'রজনী, মনে রেখো, তোমরা বুনো জাতিরা হীন নও। তোমরা শ্রীহরির দাস। কেন তোমরা ধর্মত্যাগ করবে? হরিনাম কর, সকলে ধন্য হও।'

দিব্য দেহের আলিঙ্গনে রজনীর ভাবান্তর ঘটল। তারা খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করবার বাসনা ত্যাগ করে মোহান্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হল। কলকাতার রামবাগানের ডোমদেরও জগদ্বন্ধু রক্ষা করেছিলেন।

ব্রজগোপী-ভাবে ভাবিত ছিল প্রভু জগদ্বন্ধুর হৃদয়। তাই অন্তরে বাহিরে, দেহে মনে সর্বদা তিনি নারীভাব আরোপ করে থাকতেন। কৃষ্ণসাধনায় মধুরা রতির মধ্যে 'সমর্থা' হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। যে কৃষ্ণরতি ভক্তহৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধ, ভগবানের তৃপ্তিসাধনই যার একমাত্র লক্ষ, যার কাছে সমাজ সংসার সব মিথ্যা, তাই হচ্ছে সমর্থা রতি। এই রতির সাধক ছিলেন জগদ্বন্ধু। সর্বাঙ্গ তিনি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতেন। জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানবাড়ীতে কিছুদিন বাস করেছিলেন জগদ্বন্ধু। কাপড়ে শরীর ঢেকে প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানে যেতেন প্রত্যহ। তাই দেখে কালীকৃষ্ণ সন্দেহ করেছিলেন কোন নারী বুঝি ছলনা করে তাঁর বাগানবাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। পরে ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন কালীকৃষ্ণ।

প্রভুর নির্দেশে ভক্ত প্রেমানন্দ ভারতী বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্যে আমেরিকা যান এবং বহু মার্কিন ভক্তকে দীক্ষা দেন। তিনি সেখানে 'শ্রীকৃষ্ণ হোম্' নামে সাধনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

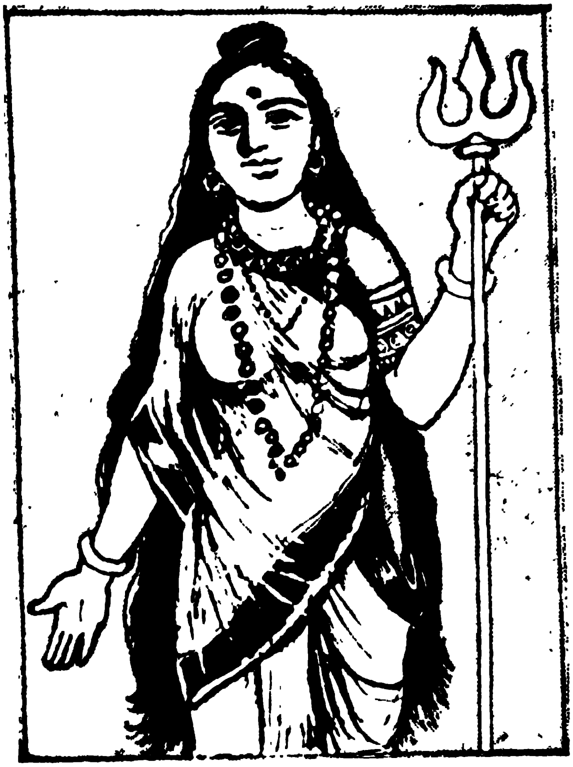
একদিন প্রভু সাঙ্গোপাঙ্গসহ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে এসে বললেন 'এখানেই আমি শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা করব।'

শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হল। হাজার হাজার ভক্ত এল। তাঁর ভক্তদের মধ্যে প্রধান হলেন দম্পতি ঠাকুর ও তাঁর সহধর্মিণী এবং ভক্তপ্রবর মহেন্দ্রজী। রাসপূর্ণিমা, দোল, ঝুলন, রথযাত্রা প্রভৃতি উৎসবে শ্রীঅঙ্গনে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। দলে দলে কীর্তনিয়া ও বাদক ভক্তগণ প্রভু জগদ্বন্ধুর রচিত গান গেয়ে নগর-সংকীর্তন করে—

'নবঘনশ্যাম সুত্রিভঙ্গ বাঁকা ঠাম,
নব নটবর রূপ জিনি কোটি কাম,
চারু চাঁচর চিকুরে চূড়া অধরে বেণু রসাল।'

১৩০৯ সন থেকে প্রভুর মৌনাবলম্বন ও নিভৃতবাস শুরু হয়। বলতেন 'এবার আমি ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়েছি। তার ডুরি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। যখন ডুরি ধরে টান দেব তখন সবাইকে আমার কাছে আসতে হবে।' ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ১লা আশ্বিন (১৯২১ সাল) তিনি অগণিত ভক্তবৃন্দকে কাঁদিয়ে অমরধামে প্রয়াণ করেন।

ভৈরবী যোগেশ্বরী



দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দিরের যুবক পূজারী গদাধর প্রভাতে গঙ্গাতীরের বাগানে পূজার ফুল তুলছেন। হঠাৎ দেখেন, একটি নৌকো এসে ভিড়েছে ঘাটে, আরোহিণী এলোকেশী এক পরমাসুন্দরী ভৈরবী, হাতে ত্রিশূল আর গেরুয়া রঙের ঝুলি। দেখেই বুঝলেন, এই সাধিকার আগমনের জন্যই তাঁকে প্রতীক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বয়ং জগজ্জননী। ভাগ্নেকে ডেকে বললেন, "ওরে হৃদু, শীগ্গির যা— পরমাসুন্দরী ভৈরবীটিকে নিয়ে আয় আমার ঘরে!"

হৃদয় তো অবাক। যে গদাধর সযত্নে স্ত্রীলোক পরিহার করে চলেন তাঁর নিজমুখে 'পরমাসুন্দরী' সম্বোধন! ভৈরবী ঘরে এসে বললেন, "মা জগদম্বা আমায় নির্দেশ দিয়েছিলেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে, তাই এলুম বাবা।"

সন্তুষ্ট হয়ে গদাধর নিজের সাধনার কথা, সাত্ত্বিক বিকারের কথা, দিব্যোন্মাদ অবস্থার কথা সব জানালেন ভৈরবীকে। বলেন, "আমি কি পাগল হয়ে গেলুম মা? আমার কি কঠিন কোন ব্যাধি হল?"

"না বাবা, তুমি পাগল কেন হবে?" আশ্বস্ত করেন ভৈরবী। "তোমার ভেতরে যে মহাভাব জেগেছে এমনটি হয়েছিল কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধারানীর আর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের। আমার ঝুলিতে অনেক পুঁথি আছে, পড়ে শোনাব, তোমায় মহাভাবের কথা বুঝিয়ে দেব।"

ক্রিস্টোফার ইশারউডের রচনা থেকে উদ্ধৃত করিঃ 'সেদিনই বেলার দিকে মন্দিরের ভাঁড়ার থেকে আটা-চাল নিয়ে পঞ্চবটীতে পাক করলেন ভৈরবী। তারপর পাক করা অন্নভোগ রঘুবীর-শিলাখণ্ডের কাছে নিবেদন করলেন। এদিকে তখন অর্ধবাহ্য অবস্থাতে রামকৃষ্ণও পঞ্চবটীতে এলেন। সেই অর্ধচেতন অবস্থায় রঘুবীর-শিলার কাছে নিবেদিত অন্নভোগের অনেকখানি খেয়ে ফেললেন। অন্নভোগ অপবিত্র করে ফেলেছেন দেখে রামকৃষ্ণ ভয় পেয়ে বললেন, "কেন যে আত্মহারা হয়ে এসব করে ফেলি! কেন যে নিজের ওপর সংযম হারিয়ে ফেলি!" কিন্তু ভৈরবী সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "বেশ করেছ বাব কাজটি তো তুমি করনি; তোমার ভেতরে যিনি আছেন তিনি করেছেন। ধ্যান করতে করতে তাঁকে আমি দেখেছি।" এই বলে ভৈরবী রঘুবীর-শিলাটি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিলেন। রামকৃষ্ণের মধ্যেই তিনি আজ রঘুবীরকে জীবন্ত দর্শন করেছেন।'

চব্বিশ বৎসর বয়সী, পূজারী গদাধর সেদিন এই চল্লিশ বৎসর বয়সী স্নেহময়ী ভৈরবীকে ঈশ্বরপ্রেরিত শিক্ষাগুরু রূপে বরণ করেছিলেন। ভৈরবী সাধিকাও নিজ সাধনজীবনের অভিজ্ঞতা ও অপার শাস্ত্রজ্ঞানের আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত করে দিলেন তাঁর পরমশিষ্য গদাধরের প্রাণে। উত্তরকালে যিনি বিশ্বব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস রূপে শ্রদ্ধার্ঘ্য লাভ করবেন তাঁর যৌবনের ভক্তিভূমিটি তিনিই গড়ে দিয়েছিলেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ভৈরবী পদার্পণ করেন দক্ষিণেশ্বরে। দীর্ঘ কয়েক বৎসর দক্ষিণেশ্বর বাগানের

সংলগ্ন মণ্ডলদের ঘাটে বসবাস করে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিত্য সান্নিধ্যদানে তাঁর ভক্তিসাধনায় সহায়তা করেছিলেন। কল্যাণী জননী রূপে নিষ্ঠায় স্নেহে রক্ষা করেছিলেন রামকৃষ্ণকে।

আনুমানিক ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে যশোহরের এক তন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের ঘরে যোগেশ্বরীর জন্ম। ছোটবেলা থেকেই ত্যাগ ও বৈরাগ্য জেগে ওঠে মনে। তরুণ বয়সেই গৃহ পরিত্যাগ করে নানা তীর্থ ও সিদ্ধপীঠ পর্যটন করেন। অমন রূপময় কান্তি, তরুণ বয়স—পথে পথে বিপদের সম্ভাবনা তো ছিলই। অসামান্য চারিত্র্যবলে সে সব বাধা জয় করে অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধা হয়েছিলেন তরুণী সাধিকা। পরে বারাণসীধামে এক কৌল সাধকের কাছে তন্ত্রদীক্ষিতা হয়ে ভৈরবী হন যোগেশ্বরী। তন্ত্রমতে সিদ্ধা হলেও রাগাত্মিকা ভক্তির প্রতিও ভৈরবী যোগেশ্বরীর প্রবল আকর্ষণ ছিল। এই আকর্ষণই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল এক সংস্কারমুক্ত চৈতন্যময় সিদ্ধির উচ্চমার্গে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তশিষ্য অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন:

লিখিতে তাঁহার কথা কী আছে শকতি।
প্রভু বলিতেন চারিবেদ মূর্তিমতী॥
তন্ত্র-গীতা-পুরাণাদি ভক্তিগ্রন্থ যত।
অক্ষরে অক্ষরে তাঁর সব কণ্ঠস্থিত॥

অনেকের মতে, ভৈরবী যোগেশ্বরীই তাঁর সাধনতনয় গদাধরের নামকরণ করেছিলেন 'রামকৃষ্ণ'। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে মাতৃসমা জ্ঞান করতেন, ডাকতেন 'বামনী' বলে।

রানী রাসমণির জামাতা মথুরনাথের কিন্তু ভৈরবী সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধা ছিল। ঈশারউড লিখছেন: 'অমন অসামান্যা রূপসী কি শুদ্ধ নিষ্পাপ থাকতে পারেন? একদিন মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার সময় ঠাট্টা করে মথুর বললেন, "কি ভৈরবী, ভৈরব কোথায়?" মথুর ইঙ্গিত করেছিলেন যে, ভৈরবীর নিশ্চয়ই কোন পুরুষপ্রেমিক কাছাকাছি আছে। কিন্তু পুণ্যবতী নারী একটুও বিচলিত হলেন না। শান্তভাবে কালীপদাশ্রিত শিবমূর্তিটিকে দেখিয়ে দিলেন। "কিন্তু ও-ভৈরব তো নিশ্চল, নড়েচড়ে না" ব্যঙ্গ করলেন মথুর। মহীয়সীর মত তাকিয়ে জবাব দিলেন ভৈরবী, "নিশ্চল ভৈরবকে যদি সচলই না করতে পারলুম তবে আমি কিসের ভৈরবী?" ভৈরবীর উত্তর শুনে লজ্জা পেলেন মথুর। নিজের আচরণের জন্য কুণ্ঠিত হলেন।

রামকৃষ্ণের সাধন-ভজন ও নানা অলৌকিক দর্শনকে সমর্থন করে ভৈরবী বলতেন, "এবার যে নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব! নিতাই আর নিমাই দুটিতে এবার অধিষ্ঠিত তোমার দেহে।" রানী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ একথা সহজে বিশ্বাস করতে চান না—তিনি বলেন রামকৃষ্ণের এটা বায়ুরোগ। ভৈরবী বললেন সাধু-পণ্ডিতদের ডাকা হোক—তাঁদের সামনে শাস্ত্রব্যাখ্যা করে তিনি প্রমাণ করবেন রামকৃষ্ণের দেহে ঈশ্বরের অবতরণ ঘটেছে। সুপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণকে ডাকা হল। ভৈরবীর অকাট্য যুক্তি মেনে নিয়ে ঘোষণা করলেন, রামকৃষ্ণের মধ্যে সত্যই রাধারানী ও চৈতন্যদেবের মহাভাবের প্রকাশ ঘটেছে।

রামকৃষ্ণের দেহে অসহ্য জ্বলুনি হচ্ছে। কত কবিরাজী ওষুধ সেবন করছেন, জ্বলুনি কমে না। মেঝেতে জল ঢেলে তাতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন, তবু গাত্রদাহের উপশম নেই। ভৈরবী নিদান দিলেন, এটা ইষ্টবিরহের ব্যাধি—গলায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে, সারা শরীর চন্দনে লিপ্ত করে থাকলে সেরে যাবে। তিন দিনের মধ্যে গাত্রের জ্বলুনি সম্পূর্ণ তিরোহিত।

আর একবার রামকৃষ্ণের দিনরাত খাই-খাই বাতিক হয়েছে। ভৈরবী জানালেন, সাধনার উন্নত অবস্থায় এরকম হয়। মথুরকে বললেন, বাবার ঘরে ভাঁড়ে ভাঁড়ে চিঁড়ে মুড়কি, সন্দেশ লুচি-মিষ্টি সাজিয়ে রাখ, সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই হল। রাক্ষুসে খিদে মিটিয়েই চলে গেল।

ভৈরবী যোগেশ্বরীর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন তন্ত্রাচার সাধন করেন রামকৃষ্ণ কিন্তু সবই সংক্ষিপ্ত আকারে, কারণবারি বা নারীর স্পর্শ বাঁচিয়ে। অপাপবিদ্ধ শুদ্ধাচারী শিষ্যকে দিয়ে এর বেশি তন্ত্রসাধন প্রয়োজন মনে করেননি যোগেশ্বরী।

এরপর রামকৃষ্ণ বেদান্তসাধনায় ব্রতী হন সাধক তোতাপুরীর তত্ত্বাবধানে। যোগেশ্বরী বুঝলেন, রামকৃষ্ণের অধ্যাত্মজীবনে তাঁর প্রয়োজন এবার ফুরিয়েছে। একদিন সুরভিত পুষ্পমাল্যে তাঁর বালগোপাল রামকৃষ্ণকে সজ্জিত করে ভক্তিসঙ্গীত গাইতে গাইতে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর সন্ধান কেউ আর পায়নি কোনদিন।

গোপালের মা



কামারহাটির বাড়িতে অঘোরমণি একদিন রাত্রি ভোরের সময় জপে বসেছিলেন। জপ শেষ হতেই দেখেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর বাঁদিকে বসে আছেন। ঠাকুর সাধারণতঃ যেভাবে বসেন সেভাবে নয়। হাঁটু গেড়ে ঠিক গোপালের মতো ভঙ্গি করে বসে আছেন।

অঘোরমণি অবাক্! এই সময় ঠাকুর আসবেন কোথা থেকে! এ কথা ভাবতে ভাবতেই তিনি সাহস করে ঠাকুরের বাঁ হাতখানি ধরে ফেললেন। অমনি ঠাকুরের মূর্তি কোথায় মিলিয়ে গেল। সেখানে দেখা দিল এক শিশুগোপালের মূর্তি। হামা দিয়ে একহাত বাড়িয়ে বলল "মা, ননী দাও।"

অঘোরমণি বললেন "বাবা, আমি দুঃখিনী কাঙালিনী। ক্ষীর ননী কোথায় পাব?" কিন্তু গোপাল প্রবোধ মানে না। বলে "দাও, খেতে দাও।"

অবশেষে অঘোরমণি শিকে থেকে শুকনো নারকেল নাড়ু পেড়ে দিলেন। গোপাল সেদিন আর কাছছাড়া হল না। জপের মালা কেড়ে, কাঁধে চড়ে ঘরময় ঘুরে মহা উৎপাত শুরু করে দিল।

ভোর হতে না হতেই অঘোরমণি ছুটে চললেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে। গোপালও তাঁর কোলে উঠে কাঁধে মাথা রেখে সঙ্গে সঙ্গে চলল। অঘোরমণি স্পষ্ট দেখতে পেলেন—গোপালের লাল টুকটুকে পা দুখানি তাঁর বুকের উপর ঝুলছে।

পাগলের মতো মূর্তিতে অঘোরমণি এসে হাজির হলেন দক্ষিণেশ্বরে। 'গোপাল' 'গোপাল' বলে ডাকতে ডাকতে ঠাকুরের ঘরের দিকে এগোলেন। ঐ অবস্থায় অঘোরমণিকে দেখে ঠাকুরেরও মহা ভাব হয়ে গেল। ইতিমধ্যে অঘোরমণি এসে ঠাকুরের কাছে বসে পড়লেন এবং ঠাকুরও ছেলের মতো তাঁর কোলে গিয়ে বসলেন। অঘোরমণির দুচোখ দিয়ে তখন দরদর করে জল পড়তে লাগল আর সঙ্গে করে যে খাবার এনেছিলেন তাই ঠাকুরের মুখে তুলে দিতে লাগলেন।

এই অঘোরমণি ঠাকুরকে দেখেছিলেন গোপালের মূর্তিতে। তাই তিনি সকলের কাছে পরিচিতা হয়ে উঠেছিলেন 'গোপালের মা' রূপে।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই গোপালের মা সম্পর্কে বলছেন (১৩ই জুন ই. ১৮৮৫): "কামারহাটির বামুনী কত কী দেখে! একলাটি গঙ্গার ধারে একটি বাগানে নির্জন ঘরে থাকে আর জপ করে। গোপাল কাছে শোয়! (বলতে বলতে ঠাকুর চমকে উঠলেন) কল্পনায় নয়, সাক্ষাৎ। দেখলে, গোপালের হাত রাঙা! সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়, মাই খায়, কথা কয়! নরেন্দ্র শুনে কাঁদলে।"

কামারহাটির ঠাকুরবাড়ির খুব কাছেই পুরোহিত নীলমাধব ভট্টাচার্যের বাস। 'গোপালের মা' তাঁরই বোন—আসল নাম অঘোরমণি দেবী। আনুমানিক ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কামারহাটি গ্রামে এঁর জন্ম; পিতার নাম কাশীনাথ ভট্টাচার্য (ঘোষাল)। বালিকা বয়সে বিধবা হওয়ায় বাপের বাড়িতেই থাকতেন।

কামারহাটির রাধাকৃষ্ণ মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা কলিকাতার গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। দত্তমশায়ের মৃত্যুর পর

দত্তগৃহিণী এসে কামারহাটিতে বাস করতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে বালতপস্বিনী অঘোরমণির খুব সৌহার্দ্য জন্মে। তার পর থেকে ঠাকুরবাটীর মেয়েমহলের একটি কক্ষেই অঘোরমণি থাকতেন।

অঘোরমণি খুব সদাচারী ও স্বল্পবাক্ ছিলেন। রাত্রি দুটোয় ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে তিনটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত জপে মগ্ন থাকতেন। পরে মন্দির পরিষ্কার করা, বাসনমাজা, ফুলতোলা, মালাগাঁথা, চন্দনবাটা ইত্যাদিতে কিছু সময় কাটিয়ে শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগাদির পর স্বপাক আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। অতঃপর আবার জপসাধনায় বসতেন। সন্ধ্যাসমাগমে মন্দিরে আরতি দর্শনের পর আবার সাধনা চলত। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বে প্রায় ত্রিশ বৎসর এইভাবে ঐ ক্ষুদ্র কক্ষে অঘোরমণির সাধনার একটানা স্রোত চলেছিল। সম্ভবতঃ একবার মাত্র এই প্রাত্যহিক দিনচর্যার ব্যতিক্রম ঘটেছিল। দত্তগৃহিণীর সঙ্গে তিনি সেবার রেলযোগে কাশী, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন ও প্রয়াগাদি তীর্থ দর্শন করে এসেছিলেন।

অঘোরমণি ছিলেন খুব নিষ্ঠাবতী। এজন্য অনেকে তাঁকে কামারহাটির ব্রাহ্মণী বলত। প্রথম দর্শনের দিন থেকেই তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন। তারপর যখনই আসতেন তখনই তাঁর জন্য কিছু খাবার তৈরি করে আনতেন। একবার নাম জপ করতে করতে হঠাৎ ঠাকুরের কাছে আসবার ইচ্ছে হওয়ামাত্র দু' তিন পয়সার দেদো সন্দেশ কিনে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এলেন। ঠাকুর তাঁকে দেখামাত্র বলে উঠলেন "এসেছ? আমার জন্য কী এনেছ দাও।" গোপালের মা তখন সন্দেশগুলি বের করে দিলেন। ঠাকুর মহা আনন্দে খেতে খেতে বলতে লাগলেন—"তুমি পয়সা খরচ করে সন্দেশ আন কেন? নারকেল-নাড়ু করে রাখবে, তাই দুটো-একটা আসবার সময় আনবে। না হয়, যা তুমি নিজের হাতে রাঁধবে, লাউ শাক চচ্চড়ি, আলু বেগুন বড়ি দিয়ে সজনে-খাড়ার তরকারি—তাই নিয়ে আসবে। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ হয়।"

গোপালের মার সেদিন খুব রাগ হল। ধর্মকর্মের কথা নয়, কেবল খাই-খাই। গরিব কাঙাল লোক - কিভাবে এত খাওয়াব? যা হোক, আর কোনদিন এখানে আসব না, আজই শেষ।

কিন্তু গোপালের মা অবাক্ হয়ে গেলেন। দক্ষিণেশ্বর বাগান পার হতে না হতেই কে যেন তাঁকে পেছন থেকে টানছে। কয়েকদিন পরই চচ্চড়ি হাতে করে তিন মাইল হেঁটে তিনি পরমহংসদেবের কাছে উপস্থিত হলেন। ঠাকুরও আগের মতো চেয়ে খেলেন, তারপর "আহা! কী রান্না, যেন সুধা! সুধা!" বলে আনন্দ করতে লাগলেন। গোপালের মার মনের অভিমান ঘুচে গেল।

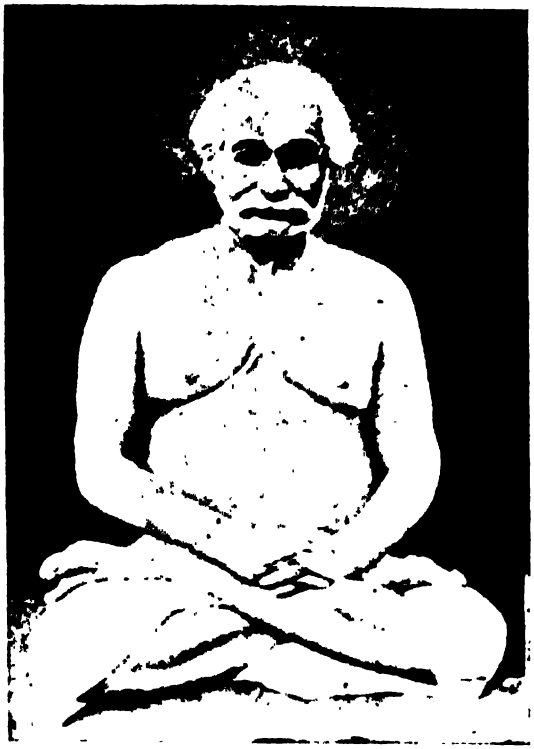
কিছুকাল পর গোপালের মার জপ-তপ সব শেষ হল। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত ঘন ঘন হতে লাগল। রামকৃষ্ণদেবই তাঁর নবজলধরশ্যাম, নবীন গোপাল। কাজেই তাঁকে রেঁধে খাওয়ান, তাঁর প্রসাদ খাওয়াতেও আর কোন দ্বিধা নেই।

গোপালের মার অদ্ভুত জীবনকাহিনী শুনে ভগিনী নিবেদিতা খুবই মুগ্ধ হন। নিবেদিতা তাঁর এক বান্ধবীকে চিঠিতে লিখছেন: "গোপালের মার কাছে থাকলে অন্তরে একটা অদ্ভুত উদ্দীপনা জাগে। সেন্ট এলিজাবেথের কথাগুলি কানে বাজে: 'কী এমন আমি যে, আমার ঠাকুরের মা আমায় দেখতে আসবেন?' গোপালের মার যে পরমহংস অবস্থা, এ আমি বিশ্বাস করি। মনে হয় যদি শুধু ওঁকেই পূজা করতে পারি, তাহলেই যাদের ভালবাসি তাদের পরে বিধাতার আশীর্বাদ অজস্র হয়ে ঝরে পড়বে।"

১৯০৪ সালে যখন গোপালের মা গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়েন তখন তাঁকে নিয়ে আসেন বাগবাজারে নিজের বাড়িতে। নিজের মায়ের মতো তাঁর সেবাযত্ন করতে থাকেন। গোপালের মার যখন গঙ্গাযাত্রার সময় হয়ে আসে, নিবেদিতা নিজের হাতে ফুলচন্দন দিয়ে তাঁকে সাজিয়ে দেন। একদল কীর্তনীয়াকে খবর দেওয়া হয়। নিজে খালি পায়ে গোপালের মায়ের সঙ্গে গঙ্গাতীর পর্যন্ত যান। যে দুদিন গঙ্গাতীরে গোপালের মা জীবিতা ছিলেন, সে দুদিন সেখানেই রাত্রিযাপন করেছিলেন।

১৩১৩ সনের ২৪শে আষাঢ় (১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ) ব্রাহ্মমুহূর্তে পরম সাধিকা গোপালের মা শ্রীভগবানের অভয়পদে মিলিত হলেন।

যোগী শ্যামাচরণ



হিমালয়ের রাণীক্ষেত অঞ্চলে একটি সেনানিবাস তৈরির কাজ চলছে। সামরিক পূর্তবিভাগের এক তরুণ বাঙালী কর্মচারী সেখানে বদলী হয়ে এসেছেন। কিছুদূরে দ্রোণগিরি অঞ্চল। একদিন সেখানে বেড়াতে গিয়ে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন কে যেন গম্ভীর কণ্ঠে ডাকছে "শ্যামাচরণ! শ্যামাচরণ!"

বাঙালী কর্মচারীটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নাম ধরে এই অপরিচিত অঞ্চলে কে তাঁকে ডাকছে! এগিয়ে দেখেন, এক জটাধারী দিব্যকান্তি সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন।

শ্যামাচরণকে দেখে সন্ন্যাসী হিন্দীতে বললেন "শ্যামাচরণ, তুমি তাহলে এসে গিয়েছ? আমি তোমার জন্যই এখানে দাঁড়িয়ে আছি।"

হাতছানি দিয়ে শ্যামাচরণকে সন্ন্যাসী গুহার ভেতর নিয়ে গেলেন। অস্পষ্ট আলোকে দেখা গেল, সেখানে বাঘছাল, ধুনি, দন্ড ও কমন্ডলু প্রভৃতি পড়ে আছে। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন—"এসব তোমারই জিনিস। দেখতো চিনতে পার কি না?"

শ্যামাচরণ কিছুই বুঝতে পারলেন না। কোন কথা মনেও করতে পারলেন না। সন্ন্যাসী তখন তাঁর গায়ে হাত বুলালেন। মুহূর্তের মধ্যে যেন কী ঘটে গেল। পূর্বজন্মের সব কিছুই তাঁর মনে পড়ল। এই দন্ড, কমন্ডলু, বাঘছাল, ধুনি এসব তাঁরই পূর্বজন্মের ব্যবহার করা জিনিস। সামনে দাঁড়ানো ঐ যোগীই তাঁর পূর্বজন্মের গুরু।

শ্যামাচরণ স্তব্ধ। সন্ন্যাসী বললেন—"দানাপুর থেকে তোমাকে এখানে বদলি করার জন্য যে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল তা ওপরওয়ালা সাহেবের ভুলের ফলেই হয়েছে। সেই ভুল আমিই ঘটিয়েছি। আবার সাতদিন পরেই তোমাকে দানাপুরে ফিরে যাবার জন্য আদেশ আসবে। তবে তার আগেই আমি তোমাকে দীক্ষা দেব।" যথাসময়ে দীক্ষা সম্পন্ন হল। সাত দিন পরে সত্যিই এল বদলির আদেশ।

শ্যামাচরণ দানাপুরে ফিরে এসে কাজে যোগ দিলেন।

নদীয়ার ঘূর্ণী নামক গ্রামে শ্যামাচরণের জন্ম। পিতা গৌরমোহন লাহিড়ী ও মাতা মুক্তকেশী দেবী ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ দম্পতি। তাঁদেরই কোল আলো করে ১২২৫ সনের (ইং ১৮২৮) ২৫শে আশ্বিন শ্যামাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে শিশুর মাতৃবিয়োগ ঘটবার পর বাবা তাঁকে নিয়ে স্থায়িভাবে কাশীতে বসবাস করতে থাকেন।

গৌরমোহন শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত হলেও পুত্রকে আধুনিক শিক্ষা দিতে ত্রুটি করেন নি। আঠারো বছর বয়সে শ্যামাচরণের বিবাহ হয়। তেইশ বছর বয়সে সরকারী পূর্তবিভাগের কর্মচারী হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন। দু বছর পরে বাবা মারা গেলে সংসারের গুরুদায়িত্ব তাঁর উপর পড়ে।

দানাপুরে এসে শ্যামাচরণ যেন নতুন মানুষ। অফিসের দৈনন্দিন কাজকর্মের শেষে গোপনে তিনি যোগসাধনায় নিমগ্ন থাকতেন।

দানাপুরে থাকাকালে তাঁর কাছে সর্বপ্রথম দীক্ষা নেয় বৃন্দা ভকত নামে এক নিরক্ষর সেপাই। বাঁকিপুরের জমিদারগৃহে এক বিতর্কসভায় ধর্মালোচনা হচ্ছিল। বৃন্দা ভকতও উপস্থিত ছিল সেখানে। বড় বড় পণ্ডিতদের ভুল ধরিয়ে দিয়ে সেদিন ধর্মের এক সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছিল বৃন্দা। শ্যামাচরণের আশ্রমে বহু দিন ছিল বৃন্দা। পরে সে যোগসিদ্ধি লাভ করে।

শ্যামাচরণের জীবনের ব্রত ছিল গৃহস্থদের সংসারে থেকে যোগসাধনার নির্দেশ দান। তিনি চাইতেন তাঁর শিষ্যরা সংসারে থেকে গৃহধর্ম পালন করে অধ্যাত্মসাধনার পথে এগিয়ে যাক। মাঝে মাঝে দুষ্টপ্রকৃতির নাস্তিক লোকেদের শাস্তি দিয়ে তাদের চৈতন্যোদয় ঘটাতেন তিনি। তাঁর শিষ্য কালিকুমার রায়ের অফিসের বড়কর্তা ছিলেন ঘোর অবিশ্বাসী। সাধু-সন্ন্যাসীদের পছন্দ করতেন না। লাহিড়ী মশায়ের যোগসাধনাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তিনি একদিন কালিকুমারের সঙ্গে এলেন যোগিরাজের ঘরে। ভদ্রলোকের দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝতে পেরে যোগিবর সমবেত ভক্তমণ্ডলীর উদ্দেশে বললেন তিনি আজ এক অদ্ভুত দৃশ্য তাদের দেখাবেন। ঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। দেখা-গেল এক সুন্দরী তরুণী সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামাচরণ ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেখুন তো মশাই, একে চিনতে পারেন কিনা?" ভদ্রলোক লজ্জা পেলেন; কেন না তরুণীটি ছিল তাঁর উপপত্নী। লোকটির পাপাচার এইভাবে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিলেন যোগিরাজ।

একবার অফিসের ওপরওয়ালা সাহেবকে কয়েকদিন যাবৎ বড় বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। মেমসাহেব ইংলণ্ডে কঠিন রোগে পীড়িতা, তাঁর প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন। শ্যামাচরণের মন দুঃখে ভরে উঠল। বললেন—"আজই আমি মেমসাহেবের খবর এনে দেব।"

বিলাত থেকে একদিনে খবর এনে দেওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার। কেউই এটা বিশ্বাস করতে পারল না। শ্যামাচরণ অফিসের এক নির্জন ঘরে গিয়ে ধ্যানাবিষ্ট হলেন। কিছুক্ষণ পরে বাহিরে এসে সাহেবকে বললেন—"আপনার স্ত্রী সুস্থ হয়েছেন। শীগগিরই তিনি নিজের হাতে আপনাকে পত্র দেবেন।" চিঠিতে মেমসাহেব কী কী লিখবেন, তাও শ্যামাচরণ বলে দিলেন। কয়েকদিন পরে সত্যিই মেমসাহেবের চিঠি এল। শ্যামাচরণ যা যা বলেছিলেন মেমসাহেবও চিঠিতে তাই লিখেছেন।

কয়েকমাস পরে সেই সাহেবের স্ত্রী ইংল্যাণ্ড থেকে দানাপুরে এলেন। শ্যামাচরণকে দেখে তিনি চমকে উঠে বললেন—"এই ভদ্রলোকই তো ইংল্যাণ্ডে আমার রোগশয্যার পাশে গিয়েছিলেন। এঁরই কৃপায় আমি সুস্থ হয়েছি।" সাহেব বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

কাশীধামের তৈলঙ্গস্বামীর যোগবিভূতির কথা তখন লোকের মুখে মুখে। একদিন এই খ্যাতিমান স্বামীজী গঙ্গার ঘাটে শুয়ে আছেন, ভক্তেরা নীরবে বসে আছে। এমন সময় শ্যামাচরণ তাঁর দুই সঙ্গী সহ স্বামীজীকে দর্শন করতে এলেন। তাঁকে দেখেই তৈলঙ্গস্বামী দর্শন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। যোগসাধনার মূর্ত মৈনাক পাহাড়টি সানন্দে বিশাল দুই বাহু প্রসারিত করে তাঁর বিশাল বুকে জড়িয়ে ধরলেন যোগিবর শ্যামাচরণকে। ভক্তেরা অবাক।

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে শ্যামাচরণ চাকুরি থেকে অবসর নেন। মহাযোগীর চরণপ্রান্তে এই সময় থেকেই দলে দলে বহু ভক্তের সমাগম হতে থাকে। বহু পাপীতাপী, রোগী, মুমুক্ষু তাঁর কাছে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভের জন্য আসে।

একদিন ভক্তপরিবৃত হয়ে যোগিরাজ বসে গীতাভাষ্য করছেন। হঠাৎ ব্যাখ্যা থামিয়ে কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, "জাপান-সমুদ্রে এক জাহাজ ডুবে যাচ্ছে - অসংখ্য যাত্রীর সঙ্গে মনে হচ্ছে আমিও ডুবে যাচ্ছি।" পরদিন সংবাদপত্রে জানা গেল, পূর্বদিন জাপানের কাছে এক ভয়াবহ জাহাজডুবিতে বহু লোক প্রাণ হারিয়েছে।

১৮৯৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর। শ্যামাচরণকে ঘিরে কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত বসে আছে। শরীর অসুস্থ। ভগবদ্‌গীতার কয়েকটি প্রিয় শ্লোক তিনি আবৃত্তি করে তার ব্যাখ্যা করছেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—"এবার আমাকে যেতে হবে।" ধীরে ধীরে চোখ বুজে এল। মহাসাধন ধামে চলে গেলেন মহাযোগী।

স্বামী অদ্বৈতানন্দ



গোপালচন্দ্র ঘোষ ঠাকুর রামকৃষ্ণের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। তাই ভক্তমহলে তাঁর নাম ছিল 'গোপালদাদা'। ঠাকুর তাঁকে বুড়োগোপাল বা মুরুব্বী আখ্যা দিয়েছিলেন। সন্ন্যাসের পর তাঁর নামকরণ হয় স্বামী অদ্বৈতানন্দ।

গোপালচন্দ্রের পিতার নাম ছিল গোবর্ধন ঘোষ। তাঁরা জাতিতে সদ্গোপ। পৈতৃক ভিটা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার জগদ্দল গ্রামে। জন্ম ১৮২৮ সালে।

গোপালচন্দ্র বেশির ভাগ সময়ই কলকাতার উত্তরে সিঁথিতে বাস করতেন। সিঁথির ব্রাহ্মভক্ত বেণীমাধব পালের চিনাবাজারের দোকানে তিনি ছিলেন কর্মচারী। বেণীমাধব কোন কোন উৎসব উপলক্ষে ('বেণীমাধব বৎসরে দুইবার মহোৎসব করিয়া থাকেন—একবার শরৎকালে, আরেকবার বসন্তে'—রামকৃষ্ণকথামৃত) শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজের মনোরম উদ্যানবাটীতে আমন্ত্রণ করে আনতেন। সেই বাড়িতেই গোপালচন্দ্র ঠাকুরের দর্শন পান এবং ধীরে ধীরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন।

স্ত্রীবিয়োগের পর গোপালচন্দ্র দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের একজন স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে ওঠেন এবং লাটু মহারাজের সহযোগী হয়ে ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত হন।

গোপালচন্দ্রের বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দীক্ষা নেবেন। কিন্তু ঠাকুর কখনও সাধারণ অর্থে গুরুগিরি করতেন না, তাই গোপালচন্দ্র একটা অভাব বোধ করছিলেন। কথামৃতকার শ্রীম নরেন্দ্রনাথকে বলছেন (২৫শে মার্চ, ১৮৮৭): "ঠাকুরের ঘরে ভক্তদের দরবার ভেঙে গেলে ঘরের বাহিরে এসে একদিন দেখি, গোপাল হাঁটু গেড়ে বাগানের লাল সুরকির পথে হাত জোড় করে আছেন—ঠাকুর সেইখানে দাঁড়িয়ে। খুব চাঁদের আলো। সেখানে আর কেউ ছিল না। বোধ হল যেন গোপাল শরণাগত হয়েছেন ও ঠাকুর আশ্বাস দিচ্ছেন।"

গোপালচন্দ্র নিজে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন এবং অপরের জিনিসপত্র পরিপাটী দেখলে আনন্দ প্রকাশ করতেন। ঠাকুর তাই গোপালচন্দ্রের সেবা পছন্দ করতেন। কাশীপুরে ঠাকুরকে ঔষধ খাওয়াবার ভার ছিল গোপালচন্দ্রের উপর। শ্রীমা গোপালচন্দ্রের সঙ্গে নিঃসংকোচে কথা বলতেন; কাজেই গোপালচন্দ্র ডাক্তারের কাছে বিশেষ পথ্য প্রস্তুতির প্রণালী শিখে তা যথাসময়ে শ্রীমাকে শিখিয়ে দিতেন।

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালে একবার তাঁর মনে তীর্থ-ভ্রমণের বাসনা জেগেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি এখন তীর্থে যাওয়ার ইচ্ছা?" গোপালচন্দ্র উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ। ইচ্ছে ছিল একটু ঘুরে-ঘেরে আসি।" ঠাকুর তাঁকে বোঝালেন, "যতক্ষণ বোধ যে, ঈশ্বর সেথা সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান। যা চায় তা তো কাছেই আছে, অথচ লোকে নানা স্থানে ঘোরে।"

কলকাতায় গঙ্গাসাগরযাত্রী অনেক সাধু সমবেত হয়েছেন। গোপালচন্দ্রের অভিলাষ, সাধুদের গেরুয়াবসন, রুদ্রাক্ষমালা ও চন্দন দেবেন। ঠাকুর

নির্দেশ দিলেন এসব জিনিস ত্যাগী ভক্তদের দান করলেই উত্তম কাজ হবে। গোপালচন্দ্র ঠাকুরের কথায় সম্মত হয়ে বারোখানি গেরুয়াবস্ত্র ও বারোখানি রুদ্রাক্ষমালা ঠাকুরের হাতে অর্পণ করলেন। ঠাকুর সেগুলি তাঁর ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করলেন। সেই ত্যাগীরা হলেন নরেন্দ্র, রাখাল, যোগীন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন, তারক, শরৎ, শশী, গোপাল, কালী ও লাটু—এই এগারজন এবং দ্বাদশ ভক্ত হলেন গিরিশচন্দ্র। রামকৃষ্ণ-সংঘে এটি এক স্মরণীয় ঘটনা; কারণ ঐ অনুষ্ঠানের মধ্যেই ভাবী ত্যাগী-সংঘের অমোঘ বীজ নিহিত ছিল।

গোপালচন্দ্র নিম-জল দিয়ে ঠাকুরের গলাব ক্ষত পরিষ্কার করে দিতেন। একদিন তাই করছেন এমন সময় ঠাকুর 'উঃ! উঃ!' করে উঠলেন। ঠাকুরের কষ্ট দেখে গোপালচন্দ্রের নিজেরও কষ্ট হল এবং বললেন - "থাক্, আর ধোয়াব না।" ঠাকুর বললেন—"না না, তুমি ধুইয়ে দাও। এই দেখ, আমার আর কোন কষ্ট হচ্ছে না।"

কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথ একদিন নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হলে তাঁর দেহে মৃতের লক্ষণ প্রকাশ পেল। তখন গোপালচন্দ্র ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঠাকুরের কাছে ছুটে গিয়ে বললেন—"নরেন মরে গেছে।" ঠাকুর শুনে বললেন—"বেশ হয়েছে। আমায় সমাধির জন্য বড় জ্বালিয়েছিল। এখন এভাবে কিছুক্ষণ থাক্।"

ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর গোপালচন্দ্রের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান রইল না। বরাহনগর মঠ স্থাপিত হলে তিনি সেখানেই এলেন।

গোপালচন্দ্র তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে কেদার, বদরিকাশ্রম, হরিদ্বার প্রভৃতি ভ্রমণ করেন। কিছুকাল বাস করেন বৃন্দাবনে। কাশীতে মাধুকরীর দ্বারা যা পেতেন তাতেই তাঁর গ্রাসাচ্ছাদন হত।

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্যবিজয় শেষ করে বেলুড়ে ফিরে গুরুভ্রাতাদের সহায়তায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে মনোনিবেশ করলেন। কাশীতে খবর গেল স্বামী অদ্বৈতানন্দের কাছে, বিবেকানন্দের আহ্বানে অদ্বৈতানন্দ চলে এলেন আলমবাজারের মঠে। স্বামিজীর আদেশে তিনি বৃদ্ধ বয়সেও 'লঘুকৌমুদী' পড়তে আরম্ভ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়ে গঙ্গাতীরে জমি কিনে যখন সেখানে মঠ তৈরি করার সংকল্প করেন তখন এই অদ্বৈতানন্দই ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়। মজুরদের সঙ্গে নিজে খেটে উঁচুনিচু জমিকে সমান করার ব্যাপারে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। মঠ তৈরি হয়ে গেলেও সেখানে সবজির বাগান করা এবং তার তদারক করা ছিল অদ্বৈতানন্দের নিত্যকার কাজ। শ্রীমা অদ্বৈতানন্দের এই কাজের খুব প্রশংসা করতেন। লাটু মহারাজ বলতেন—"আরে, বুড়োগোপালদা না থাকলে মঠের ব্রহ্মচারীদের ভাতের ওপর তরকারি জুটত না।"

এক আদর্শবান পুরুষ ছিলেন অদ্বৈতানন্দ। প্রত্যহ গীতাপাঠ করতেন, সুন্দর হস্তাক্ষরে পঞ্চগীতা লিখে রেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে তাঁর সত্যনিষ্ঠায় তিনি প্রভাবিত হন। 'ভক্তমালিকা' গ্রন্থে আছেঃ 'পেটের অসুখের জন্য একবার জনৈক কবিরাজ ঠাকুরকে তিনটি লেবু খাইতে বলেন। ঠাকুর গোপালদাকে উহা সংগ্রহ করিতে বলিলে তিনি অনেকগুলি লেবু আনিয়া হাজির করিলেন। সত্যের জীবন্ত বিগ্রহ ঠাকুর কিন্তু তিনটিমাত্র লেবু রাখিয়া বাকি সব ফিরাইয়া দিলেন। গোপালদা চাক্ষুষ দেখিতে পাইলেন, তিনি যাঁহাকে জীবনের ধ্রুবতারা-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কথা ও কার্যের মধ্যে বিন্দুমাত্র অসামঞ্জস্য নাই। ইহা স্বতঃই তাঁহার মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল।

শেষ বয়স পর্যন্ত অদ্বৈতানন্দ শরীরের উপযোগী কিছু কিছু ব্যায়াম করতেন। স্বাস্থ্য তাঁর ভালই ছিল। অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা তাঁর মনঃপূত ছিল না। নিজের সমস্ত কাজ নিজেই করতেন এবং কেউ তাঁর সেবা করতে চাইলেও সেবা

একবার খুব পেটের অসুখ হল। প্রতিকারের চেষ্টা করা সত্ত্বেও রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় একদিন ঠাকুরের প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে কাতর কণ্ঠে নিবেদন করলেন 'প্রভু, আমার এই কষ্ট থেকে মুক্তি দাও।" ঠাকুর বুঝি সেই প্রার্থনা শুনলেন। শীঘ্রই তাঁর শেষ দিন ঘনিয়ে এল।

২৮শে ডিসেম্বর ১৯০৯ সাল, অদ্বৈতানন্দের জীবনের শেষ দিন। কয়েকদিন আগে সামান্য জ্বর হয়েছিল। মৃত্যুর সময়েও তাঁর মুখকান্তি ছিল উজ্জ্বল।

হরিহর বাবাজী



কেউ বলে পাগল কেউ বলে যোগিপুরুষ। কেউ বিদ্রূপ করে, কেউ ভক্তি করে। উলঙ্গ অবস্থায় কাশীতে গঙ্গার ঘাটে বসে থাকেন এক সন্ন্যাসী। তাঁর নাম হরিহর বাবা। অনেকেই তাঁকে ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে। যে কেউ পাগলের ঠাট্টায় করে তাঁকে যা খাবার দেয় তাই তিনি খান। একদিন একদল দুরন্ত ছেলে ঠোঙায় করে কিছুটা কাকবিষ্ঠা এনে তাঁর মুখের সামনে ধরতেই তিনি সবটা খেয়ে ফেললেন। সেদিন রাত্রেই দেখা গেল ঐ ছেলের দল মারাত্মক ভেদবমি ও কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ছেলেদের মনে এবার ভয় জাগল। সন্ন্যাসীকে কাকবিষ্ঠা খাওয়াবার ফলেই কি এরকম হল? ছেলেদের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে তাদের অভিভাবকরা হরিহর বাবাজীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর পায়ে ধরে বললেন—"বাবাজী, অবোধ ছেলেরা কিছু জানে না, তাদের ক্ষমা করুন।"

বাবাজী বললেন—"আমার কাছে তো ওরা কোন অন্যায় করেনি, করেছে প্রভু রামজীর কাছে। যে যা দেয় আমার দেহ থেকে প্রভু রামজীই তা গ্রহণ করেন। রামনাম কীর্তন কর। প্রভু নিশ্চয়ই বাচ্চাদের ভালো করে দেবেন।" অভিভাবকরা তখন সকলে মিলে রামনাম কীর্তনের আয়োজন করলেন। তার ফলে সেইদিনই ছেলেরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

ভক্ত মংলু জেলের বড় সঙ্কট। রামনাম কীর্তন শেষে ভক্তেরা বিদায় নিয়েছে। বাবাজী শুতে যাবেন, এমন সময় মংলু এসে জানাল—কিছু দেনার দায়ে পড়েছে; ভেবেছিল গঙ্গায় জাল ফেলে মাছ ধরে দেনা-শোধ করবে; কিন্তু ক'দিন ধরে জালে একদম মাছ পড়ছে না। বাবা যদি এখন কৃপা করেন! হরিহর বাবা বললেন—রামনাম আর গঙ্গামায়ীর নাম করলে নিশ্চয়ই তার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। পরদিন বাবাজীর কথামতো মংলু কাজ করল। প্রচুর মাছ জালে ধরা পড়ল। তার দেনাও শোধ হল।

এই সন্ন্যাসীর পূর্বনাম—সেনাপতি। বিহারের ছাপরা জেলায় জাফরপুর গ্রামে আনুমানিক ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। পিতা ছিলেন তেওয়ারী ব্রাহ্মণ। সংসারে কোন অভাব অনটন ছিল না। কিন্তু অল্পবয়সে পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় সংসারে দুর্যোগ নেমে আসে। আত্মীয়দের সাহায্যে কোন রকমে সংসার চলতে থাকে।

একদিন সেনাপতি দেখতে পায় গ্রামের শেষপ্রান্তে এক গাছের তলায় এক সন্ন্যাসী বসে আছেন। সে তাঁর কাছে সমস্ত দুঃখের কথা জানিয়ে বলল—"আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।"

সন্ন্যাসী বললেন—"সে কি বেটা, এই বয়সে সংসার ছাড়বি কেন?" সেনাপতি বলল—"সংসার আমার আগেই ভেঙে গেছে। দয়া করে আমাকে শান্তিতে বাস করবার সন্ধান দিন।" সন্ন্যাসী বললেন—"আমি হরিহরছত্রের মেলায় চলেছি, চল আমার সঙ্গে।"

সেনাপতি এক বস্ত্রেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে হরিহরছত্রের

মেলায় চলে গেল। হরিহরনাথের মন্দিরের নিকট দেখা হল এক মহাপুরুষের সঙ্গে। সেনাপতি তাঁর কাছে রামমন্ত্রে দীক্ষা নিল। যোগ ও তন্ত্রের নানা গূঢ় সাধন উপদেশও পেল সেই মহাপুরুষের কাছে। সেনাপতির নতুন নাম হল হরিহর।

কয়েকদিন পর গুরু তাঁর নতুন শিষ্যকে বললেন—"বেটা, তুমি অযোধ্যায় চলে যাও। সেখানে সরযূর তীরে বসে শুরু কর সাধন ভজন।"

সরযূর তীরে কিছুকাল কৃচ্ছ্রব্রত সাধন করবার পর হরিহর লছমন গড়্হির দিকে আসছেন, হঠাৎ দেখা হল জটাধারী এক প্রাচীন বৈষ্ণবের সঙ্গে। তিনি বললেন—"বেটা, তুমি এসে গেছ। প্রভু রামচন্দ্রজীর আদেশে আমি তোমাকে দীক্ষামন্ত্র দান করব।"

দীক্ষার অনুষ্ঠান শেষ হল। সাধন ভজনের কতকগুলি উচ্চতর পদ্ধতি হরিহর ভাইয়াকে আয়ত্ত করিয়ে গুরুজী একদিন বললেন—"বেটা, আমার কাজ শেষ হয়েছে। তুমি আমার এই গুম্ফার ভিতরে বসেই ভজন সাধন কর। অচিরেই রামচন্দ্রজীর কৃপা লাভ হবে।" চোখের জলে গুরুদেবকে বিদায় দিয়ে হরিহর ভাইয়া কঠোর সাধনায় ব্রতী হলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই হল তাঁর ইষ্ট দর্শনের পরম সৌভাগ্য। এর পর তিনি স ্ ভারত পরিভ্রমণে বের হলেন।

পরবর্তী কালে হরিহর বাবাজী কাশীর তুলসী-ঘাটে অবস্থান করতে থাকেন। পবিত্র কাশীধামে বিশ্বনাথের নিজ পুরীতে কখনো তিনি মলমূত্র ত্যাগ করতেন না। প্রতিদিন শেষ রাত্রে সাঁতার কেটে ওপারে চলে যেতেন, প্রাতঃকৃত্যাদি সেখানে সেরে আবার ফিরে আসতেন। শীত, বর্ষা, ঝড়জল অগ্রাহ্য করে।

জনসমাজের কল্যাণকারী সাধক রূপে এর পর হরিহরবাবা আত্মপ্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় তিনি বসে থাকতেন। তা নিয়ে নানা সমালোচনা হয়। তবু ভক্ত ও মুমুক্ষু নরনারীদের তাঁর চরণতলে সমবেত হওয়ার বিরাম ছিল না।

একবার কাশীর রাজপথে বড় সোরগোল উপস্থিত হল। কাশীরাজের একটি হাতি ক্ষেপে গিয়ে রামনগরের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গঙ্গা সাঁতরে আসছে, কাশী শহরও বুঝি ধ্বংস করে দেবে। তুলসীঘাটে হরিহর বাবা ইষ্টধ্যানে মগ্ন। গঙ্গা পেরিয়ে ক্ষ্যাপা হাতি এসে পড়েছে তুলসীঘাটের কাছে। লোকজন সবাই ইতস্ততঃ ছুটে পালাচ্ছে। চিৎকার করছে ভয়ে। এই বুঝি বাবাজীর ভবলীলা সাঙ্গ হয়। কিন্তু কী আশ্চর্য! হরিহর বাবার দিকে এগিয়ে এসেই হঠাৎ পাগলা হাতি তার শুঁড় নামিয়ে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতো দাঁড়িয়ে গেল। এমন অলৌকিক দৃশ্যের স্মৃতি বহুদিন কাশীর জনগণের মনে জাগরূক ছিল।

হরিহর বাবার শরীর ক্রমশ প্রাচীন ও অপটু হয়ে পড়ছে দেখে ভক্তেরা চিন্তিত হয়ে তাঁর থাকবার জন্য বজরার ব্যবস্থা করল। এই ভাসমান আশ্রমটি ছিল অহোরাত্র ভজন কীর্তন ও রামায়ণ-গীতার ব্যাখ্যা ও ভাষণের অধ্যাত্মকেন্দ্র। রোগশোক-জর্জরিত মুমুক্ষু মানুষেরা দলে দলে আসত বাবাজীর কাছে—তাঁর কথা, তাঁর গান, তাঁর দোঁহার মধ্যে তারা পেত শান্তির প্রলেপঃ

অসারে খলু সংসারে সারমেতৎ চতুষ্টয়ম্।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গঃ গঙ্গাম্ভঃ শম্ভুপূজনম্॥

বলতেন—তোমাদের ভয় কী? খাস শিবপুরীতে রয়েছ তোমরা। এই মহাধামে বসে নিরন্তর রামনাম জপ কর, সংসারচক্রে থেকেও রামনাম ধরে থাকো, সব অভাব ঘুচে গিয়ে জীবনে ফুটে উঠবে দিব্যজ্যোতি।

নেপালের মহারানা কাশীতে এসে মহাসাধক হরিহরের বজরায় এলেন দেখা করতে। বললেন, "সারা জীবন তো রাজসিক মনোবৃত্তি নিয়ে কাটালাম। এবার ব্যাকুল হয়েছি পারের কড়ির জন্য। কিন্তু সংসারের জালে আবদ্ধ আমি কিভাবে পারানির কড়ি পাব প্রভু?"

সস্নেহে হরিহর বাবাজী বললেন, "রামনাম ছাড়া পরমবস্তু পাবার আর কোন সহজ পথ আমার জানা নেই। বাল্মীকি বল্মীকস্তূপের ভিতর থেকে এই নামসাধন শিখিয়ে গেছেন। আপনিও সংসার বল্মীকে থেকে নামরসে মত্ত হোন, সব বাধা দূর হয়ে যাবে।"

হরিহরবাবার জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য অগণিত নরনারীর মনে রামনামের উৎসাহ জাগিয়েছেন পরম পথের সন্ধান দিয়েছেন, কিন্তু কাউকে দীক্ষামন্ত্র দান করেননি।

১৯৪৯ সালের ১লা জুলাই তারিখ এই মহাসাধকের মহাপ্রয়াণ দিবস। কয়েক দিন আগেই তিনি ভক্তদের নিকট বলেন "গাছ বড় জীর্ণ ও পুরনো হয়ে গেছে, একে আর রাখা ঠিক নয়।"

ভোলানন্দ গিরি



"জয় শঙ্কর!"

দুয়ারে এসে দাঁড়ালেন দণ্ডকমণ্ডলুধারী এক সন্ন্যাসী। গৃহকর্ত্রী বুঝলেন ভিক্ষার জন্য কেউ এসেছেন। নন্দা দেবী তাই ভিক্ষার চাল হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! সন্ন্যাসী নন্দা দেবীর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বসলেন। নন্দা দেবী লজ্জিত হয়ে বললেন—"একী করলেন বাবা! সন্ন্যাসী সকলের প্রণম্য। আপনি আমাকে প্রণাম করলেন!"

"তাতে কোন দোষ নেই মা। মাতৃরূপে আপনাকে প্রণাম করেছি।" বলেই সন্ন্যাসী দ্রুতপদে চলে গেলেন। চমকে উঠলেন নন্দা দেবী। কে এই সন্ন্যাসী! চেহারাটি যেন অনেকটা পরিচিত। তবে কি এই সন্ন্যাসীই তাঁর হারানো ছেলে ভোলাদাস?

সত্যি ভোলাদাসই এসেছিলেন। গুরুদেব তাঁকে দীক্ষা দেবার পরই বলেছিলেন—গর্ভধারিণী জননীর চরণবন্দনা ও মাতৃভূমি দর্শন করে আসতে হবে। ভোলানাথ তাই করে গেলেন।

পাঞ্জাবের এই খুরদা গ্রামই ভোলানাথের জন্মভূমি। বাপ ব্রহ্মদাস ছিলেন সারস্বত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। মায়ের নাম নন্দা দেবী। তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান এই ভোলাদাস। জন্ম, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথম সন্তান রতনদাস একদিন রাত্রে ঘর ছেড়ে কোথায় চলে যায়। তারপর হয় এই ছেলের জন্ম। কিন্তু এই ছেলেও ঘরে রইল না।

ভোলাদাসের নাম এখন ভোলানন্দ গিরি। পস্তানার বিখ্যাত আশ্রমে গুরু গোলাপগিরির আশ্রয়ে তাঁকে বারো বছর কৃচ্ছ্র সাধনায় নিযুক্ত থাকতে হল। তারপর গুরু একদিন বললেন—"ভোলা, তুই অন্য কোথাও গিয়ে নিজের আশ্রম কর্। তোর সাধনা পূর্ণ হবে।"

গুরুর বাক্য লাভ করার পর কয়েকজন গুরুভ্রাতাকে সংগে নিয়ে ভোলানন্দ নতুন তপস্যার পথে যাত্রা করলেন। গিয়ে পৌঁছলেন হিমালয়ে। কখনও হিমালয়ের পর্বতগহ্বরে, কখনও হারিদ্বারের কাছে বিল্বকেশ্বর পর্বতে তিনি যোগসাধনায় ব্যাপৃত রইলেন। শুধু বাধা বিঘ্নেও তাঁর সাধনাভঙ্গ হয়নি।

একবার ভোলানন্দ তাঁর কয়েকজন গুরুভ্রাতার সঙ্গে হিমালয়ে যোগসাধনায় নিমগ্ন রয়েছেন। হঠাৎ এক বিরাট বাঘের আবির্ভাব হল। ভোলানন্দ তাঁর সঙ্গীদের সাহস দিয়ে বললেন—"ভয় কী! এসো প্রত্যেকেই নিজের বীজমন্ত্র জপ করি। জপের অসীম শক্তি, হিংস্র জন্তু আমাদের কিছুই করতে পারবে না।"

একজন সাধু কিন্তু বড় ভয় পেলেন। নিজের আসন ছেড়ে যেই তিনি পালাতে যাবেন অমনি বাঘটা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাঘটা সাধুটির দেহ টেনে জঙ্গলে নিয়ে গেল।

এবার হিমালয়ের অরণ্যে ভোলানন্দ ধ্যান করতে বসলেন। একদিন পর্বতগুহা আলো করে দেবাদিদেব শঙ্কর দেখা দিলেন। ভোলানন্দের সাধনা সফল হল।

এর পর আরম্ভ হল ভোলানন্দের তীর্থ পরিক্রমা ও

দেশপর্যটন। শুধু ভারতবর্ষের দূরদূরান্তের তীর্থস্থানগুলিই নয়, বহির্ভারতের দুর্গম তীর্থগুলিও তিনি পরিভ্রমণ করেন।

বোম্বাই শহরে প্রত্যহ মাধুকরী করে আহার্য সংগ্রহ করছেন ভোলানন্দ। একদিন এক ধনীর প্রাসাদে গিয়ে ভিক্ষা চাইলেন। ধনাঢ্য ব্যক্তিটি ও তাঁর স্ত্রী নবীন সন্ন্যাসীর দিব্যকান্তি দেখে নিজেদের সুন্দরী কন্যার সঙ্গে সন্ন্যাসীর বিবাহ দেবার অভিলাষ জ্ঞাপন করলেন; জানালেন, বিবাহানুষ্ঠানের পরেই তাঁরা দুজনে সংসার ত্যাগ করে তীর্থবাস করবেন এবং সন্ন্যাসী-জামাতা ও কন্যা তাঁদের বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হবেন। ভোলানন্দ প্রস্তাব শুনে ঈষৎ হেসে বললেন, "আপনারাই যখন ধনসম্পদে বীতস্পৃহ হয়ে তীর্থবাসের ইচ্ছা পোষণ করছেন তখন আমার মতো সন্ন্যাসীকে কেন পার্থিব ভোগসুখের প্রলোভন দেখাচ্ছেন? আমাকে ক্ষমা করুন, আমার জীবনের পথ চিরতরে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে, ফেরার পথ নেই!"

১৮৯৩ সালে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় ভোলাগিরি মহারাজ জনমণ্ডলীর সামনে আত্মপ্রকাশ করেন। এই কুম্ভমেলায় সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে নিয়ে সন্ন্যাসীদের মধ্যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। বিজয়কৃষ্ণ সন্ন্যাসীদের নির্দিষ্ট স্থানে তাঁবু ফেলতে গেলে আপত্তি ওঠে। সামাজিক দিক দিয়ে বিচার করলে তিনি গৃহী —তাই একদল সন্ন্যাসী তাঁদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণকে স্থান দিতে অসম্মত হন। কিন্তু ভোলানন্দগিরি সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। বিজয়কৃষ্ণকে তিনি সম্বোধন করেন—'মেরে আশুতোষ!'

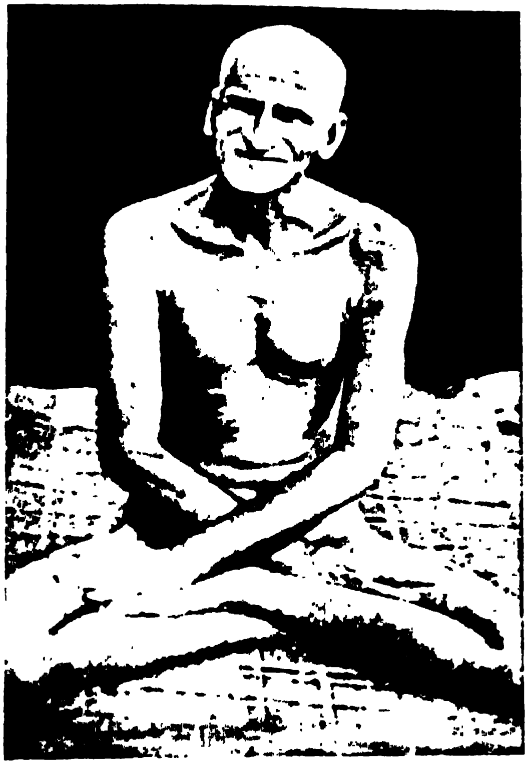
হরিদ্বারের লালতারাবাগ আশ্রমের শান্ত পরিবেশে ভোলাগিরি মহারাজ বাস করতেন। সন্ন্যাসী-শিষ্যদের চরিত্রগঠনে তাঁর অবদান বড় কম নয়। লোকদেখানো বৈরাগ্য থেকে শিষ্যদের শতহস্ত দূরে থাকবার উপদেশ দিতেন তিনি। প্রাত্যহিক কর্তব্যপালনের মাধ্যমে সাধনভজন কর—এই ছিল তাঁর সরল নির্দেশ। বলতেন—"কর্মে আলস্য করতে নেই। কাজ না করে বসে অন্ন খেলে পাপ হয়। গৃহস্থেরা কষ্ট করে নিজেরা না খেয়ে সাধুকে দান করে। তোরাও কর্মকে তপস্যা জ্ঞান করবি। নিষ্ঠাভরে খুব পরিশ্রম করবি আর তপস্যা করবি। মাটি কাটা, ঘাস কাটা, কুয়ো থেকে জল তোলা, গাভীর পরিচর্যা করা, গোয়াল পরিষ্কার রাখা—এসব কাজে লজ্জা কিসের? সংকোচ কিসের? আমার মতো চাষী-গুরুর কাছে থাকলে তোদেরও চাষীগিরিই করতে হবে রে!"

১৯০২ সালের কথা। ভোলানন্দ মহারাজের দুটি চক্ষুই ব্যাধিতে আক্রান্ত। কলকাতায় এনে অনেক চিকিৎসা করানো হল, কিন্তু ফল হল না। ক্রমশ তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললেন। আবার ফিরে গেলেন হরিদ্বারের আশ্রমে। সেখানে এক তরুণ মাড়োয়ারী সন্ন্যাসী মনপ্রাণ ঢেলে গিরিজীর সেবা করে। গিরিজীরও দৃষ্টিশক্তি হারানোর জন্য কোন খেদ নেই মনে-সারাদিন ব্রহ্মানন্দে নিমজ্জিত হয়ে থাকেন। শিষ্যটির কিন্তু মনে বড় দুঃখ—গুরুজীর অন্ধত্ব কেন ঘোচে না। কিছুদিন পর শিষ্যটি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হল। মৃত্যু আসন্ন-তবু সজলনয়নে ঈশ্বরের নিকট তার একমাত্র প্রার্থনা: 'গুরুজীর চোখ ভাল করে দাও প্রভু!' তরুণ সন্ন্যাসীর মৃত্যু হল। কয়েকদিন পর ভোলানন্দ গিরি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দৈববাণী শুনতে পেলেন: 'ভোলা, চেয়ে দেখ্ আমরা কে।' গিরিজী সেদিন হরপার্বতীর যুগলমূর্তি দর্শন করেন। একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি তিনি ফিরে পেয়েছেন।

সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিদ সোমেশচন্দ্র বসুর স্ত্রী অকালে মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সোমেশবাবুর হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। তিনি মনে মনে স্থির করেন, যে-শক্তিধর যোগী তাঁর মৃতা সহধর্মিণীর সঙ্গে একত্রে তাঁকে দীক্ষা দিতে পারবেন, শুধু তাঁর শিষ্যত্বই গ্রহণ করবেন। বহু সাধুসন্ন্যাসীর কাছে ব্যর্থমনোরথ হয়ে সোমেশচন্দ্র এলেন ভোলাগিরির কাছে। সব কিছু শুনেও ভোলানন্দ তাঁকে দীক্ষা দিতে রাজী হলেন। নিভৃত স্থানে তিনটি আসন পাতা হল। ভোলানন্দ ও সোমেশচন্দ্র দুটিতে বসলেন। অনুষ্ঠান শুরু হলে সোমেশচন্দ্র দেখলেন অপর আসনটিতে তাঁর স্ত্রী এসে বসেছেন। দীক্ষা অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীমূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল।

বহু অলৌকিক কার্যকলাপে মানুষকে মুগ্ধ করে এই মহাযোগী ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে অমর ধামে চলে গেলেন।

ভাস্করানন্দ সরস্বতী



মতিরামের ছেলে হয়েছে, কী ভাগ্যের কথা। নাতির মুখ দেখে পণ্ডিত মিশ্রীলালের মনে আনন্দ ধরে না। মিশ্রবাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কান্নার রোল ওঠে বাড়িতে। মতিরাম বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছেন।

পণ্ডিত মিশ্রীলাল মিশ্রের একমাত্র সন্তান মতিরাম। ১৮৩৩ সালের শুক্লসপ্তমী তিথিতে জন্ম। রূপে গুণে অতুলনীয়। মাত্র সাতের বছর বয়সেই পাণিনি ব্যাকরণ সমাপ্ত করেছিলেন কানপুরের মৈথেলালপুরের অধিবাসীদের সেরা পণ্ডিত। কিন্তু হঠাৎ এই বৈরাগ্য। এক বস্ত্রে কপর্দকহীন অবস্থায় গৃহত্যাগ করে উজ্জয়িনীতে চলে গেলেন। সেখানে বহুদিন শ্মশানে বসে যোগসাধনা করলেন। অনেক যোগী, তান্ত্রিক ও বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে তাঁর যোগবিভূতি দিনে দিনে প্রকট হতে লাগল। তারপর গেলেন গুজরাট মালব দেশে। সেখানে কয়েক বছর বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন।

আবার উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন মতিরাম। ভাগ্যক্রমে সেখানে দাক্ষিণাত্যের ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি শ্রীপূর্ণানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। পূর্ণানন্দ মতিরামকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করলেন। মতিরামের নতুন নাম হল ভাস্করানন্দ সরস্বতী। তখন তাঁর বয়স মাত্র সাতাশ।

নানা তীর্থ পরিক্রমার পর ভাস্করানন্দ এলেন কাশীধামে। সেখানে শুরু হল তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনা। গঙ্গার বালুতটে শীতে, গ্রীষ্মে ও বর্ষায় সমভাবে অবস্থান করে বিশ্বনাথজীর আরাধনায় নিমগ্ন হলেন। স্বামীজীর এই যোগসাধনার কথা লোকমুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

এর পর স্বামীজী এলেন দুর্গাবাড়ির নিকটে আনন্দবাগে। মাটির নিচে গর্ত খুঁড়ে সেখানে তাঁর আসন স্থাপন করলেন। একদিন এক রাজার কৌতূহল হল সন্ন্যাসীকে পরীক্ষা করে দেখবেন। এজন্য কয়েকজন রূপসী গণিকাকে তিনি নিযুক্ত করলেন।

গভীর রাত্রে গণিকারা আনন্দবাগে ঢুকল। অজানা ভয়ে তাদের বুক কাঁপতে লাগল। শুধু একজন সাহস করে এগোল সন্ন্যাসীর দিকে। কিন্তু তখনই শোনা গেল সেই নারীটির আর্ত চীৎকার—বাঁচাও! বাঁচাও! অতর্কিতে কোথা থেকে এক বিরাট সাপ এসে তার পা দুটি জড়িয়ে ধরেছে।

সূর্যোদয় হওয়ার পর সাপটি গণিকাকে ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। তখন সেই নারী সন্ন্যাসীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা-ভিক্ষা করল। সন্ন্যাসী তাকে ক্ষমা করলেন। পরে সেই নারীর বিষয়-সম্পত্তির ওপর বিতৃষ্ণা জন্মে; সমস্ত কিছু ত্যাগ করে সাধনভজনে জীবন কাটায়।

কাশীধামে শীতলপ্রসাদ নামে স্বামীজীর এক শিষ্যের পুত্র দোতলার ছাদ থেকে পড়ে মারা যায়। শীতলপ্রসাদ ডাক্তার কবিরাজ না ডেকে গুরুর কাছে

এসে উপস্থিত হন। শিষ্যটি কিছু বলবার আগেই স্বামীজী সমস্ত বুঝতে পারেন। একটু গঙ্গাজল হাতে নিয়ে শিষ্যকে বললেন—"এই গঙ্গাজলটুকু তোমার ছেলেকে খাইয়ে দাও।" স্বামীজীর দেওয়া গঙ্গাজল মুখে দেবার পর শীতলপ্রসাদের পুত্র বেঁচে উঠল। এইরকম অনেক ঘটনা আছে যাতে স্বামীজীর অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ পেতে থাকে।

ভাস্করানন্দ বলতেন, "সাধু সর্বদা থাকবে আকাশ-বৃত্তি অবলম্বন করে—আগামীকালের জন্য কোনকিছু সঞ্চয় করে রাখার অধিকার নেই তার।" এক শিষ্য পরের দিনের জন্য কিছু রন্ধনকাষ্ঠ সংগ্রহ করে রেখেছিল; স্বামিজী তাকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেছিলেন। কাশীর রাজা ঝুড়িভর্তি ফল পাঠিয়েছেন স্বামিজীর জন্য; উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে সেই ফল তিনি বিলিয়ে দিলেন। সেবক রামচরণ লুকিয়ে কয়েকটি ফল রেখে দিয়েছিল পরে স্বামিজীকে খাওয়াবে মনে করে। স্বামিজী সর্বজ্ঞ—রামচরণের কীর্তি বুঝতে পেরে পরিহাস করে তাকে বললেন, "কি হে, তুমি পরমহংসের ভান্ডারা বানাচ্ছ নাকি? আমার খাওয়া হয়েছে, ভক্তদের জিহ্বা দিয়ে আমিও যে ফলগুলোর স্বাদ গ্রহণ করেছি!"

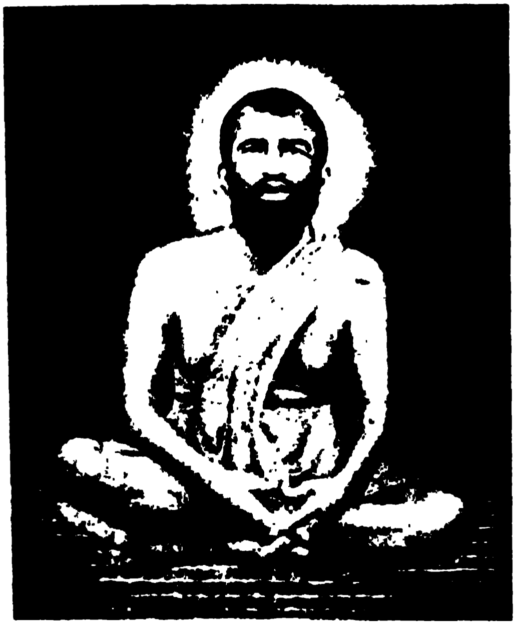
কাশ্মীরের মহারাজা একবার তাঁকে প্রণাম করতে এসে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রণামী দিলেন। ভাস্করানন্দ তা স্পর্শ করে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে দিলেন। বললেন—"কোপীন পরে থাকি, এতসব টাকাকড়ি কোথায় রাখব?"

ভাস্করানন্দ কোপীন পরতেন। ক্রমে তাও ছাড়লেন। অন্তরের বাহিরের সমস্ত ব্যবধান তাঁর ঘুচে গেল। লোকে অবাক হয়ে দেখত নিদারুণ শীতের রাত্রেও এই উলঙ্গ সন্ন্যাসী আনন্দবাগের শিশির-ভেজা ঘাসের উপর পরম আনন্দে শুয়ে আছেন। তাঁর যোগ-বিভূতির মহিমা চারদিকে এত প্রচারিত হয়েছিল যে অসংখ্য দর্শনপ্রার্থী তাঁর কাছে আসত। নানা দেশের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ও অভিজাত ব্যক্তিরা এই উলঙ্গ সন্ন্যাসীর চরণে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। বড়লাট, সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা, দেশবিদেশের রাজরাজড়ার দল প্রভৃতি যেমন তাঁর দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হয়েছেন, সাধারণ পথের ভিখারীও তাঁর কৃপালাভে বঞ্চিত হয়নি। রাশিয়ার অধিপতি জারের পুত্র নিকোলাস বা ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যার উইলিয়ম লকহার্ট অথবা জার্মান পণ্ডিত ডয়সনের মতো মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যেমন এই মহাযোগীর দর্শন ও শুভেচ্ছা লাভ করতেন, তেমনি দীনহীন কাঙাল সহাই তেলী বা দরিদ্র জেলে লছমন মালা প্রভাতে তাঁর সঙ্গে দেখা না করতে এলে স্বামিজীর মন চঞ্চল হয়ে উঠত। আনন্দবাগের দর্শন-দরবারে সর্বপ্রথম ডাক পড়ত সহাই তেলীর। 'আও মেরে বাপ' বলে তাকে সম্ভাষণ করতেন স্বামিজী। ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিদের ভিড়ে গরিব মানুষদের তাঁর দর্শন পেতে অসুবিধা যাতে না হয় সেজন্য সপ্তাহে একটি দিন নির্দিষ্ট ছিল সাধারণ ভক্তদের জন্য। ঐদিন অভিজাত দর্শনাথীরা আনন্দবাগে ঢুকতে পেতেন না।

মার্কিন সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন ভারত-ভ্রমণে এসেছিলেন। কলকাতার এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, 'ভারতে এসে আপনি যা দেখলেন তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কোন্ জিনিসটি?' মার্ক টোয়েন উত্তর দেন, 'বেনারস এবং হোলিম্যান অভ বেনারস।' স্বামী ভাস্করানন্দের প্রতি এই বিনম্রশ্রদ্ধা মার্কের রচিত গ্রন্থেও পরিস্ফুট: 'ভারতের তাজমহল অবশ্যই এক পরম বিস্ময়কর বস্তু যার সুমহান দৃশ্য মানুষকে আনন্দে অভিভূত করে, নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু স্বামীজীর মতো মহান্ ও বিস্ময়কর জীবন্ত বস্তুর সঙ্গে তার তুলনাই চলে না। এ যে জীবন্ত, এতে শ্বাসপ্রশ্বাস বয়, এ যে কথা বলে, লক্ষ লক্ষ লোক এতে আস্থা স্থাপন করে, ঈশ্বর ভেবে ভক্তি করে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে পুজো করে।' খ্রীষ্টান পাদ্রী ডাঃ ফেয়ারবার্ন বলেছিলেন: 'স্বামীজীর সামনে দাঁড়িয়ে আমি পবিত্রতা ও সততার এমন এক ভাবমগ্ন রূপ অন্তরে অনুভব করেছি যার সমতুল্য কিছু সমগ্র খ্রীষ্টজগতে আমি কখনও দেখিনি।'

গরীব জেলে লছমন মালা ছিল স্বামীজীর পরম ভক্ত। বৃহৎ জনসমাগমেও তিনি নিজের আসনের পাশে ডেকে বসিয়েছিলেন তাকে। লছমন মালার কণ্ঠে ভজন শুনতে শুনতে ১৮৯৯ সালে ৬৬ বৎসর বয়সে সমাধি অবস্থাতেই ভাস্করানন্দ সরস্বতী দেহরক্ষা করেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস



'সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস হবে; আমার তখন ছয় কি সাত বছর বয়স। একদিন সকালবেলা টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে খেতে খেতে চলেছি। আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে তাই দেখছি ও খাচ্ছি। দেখতে দেখতে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে, এমন সময় সাদা দুধের মতন বক ঐ কালো মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। সে এমন এক বাহার হল! দেখতে দেখতে অপূর্ব ভাবে তন্ময় এমন এক অবস্থা হল যে, আর হুঁশ রইল না। পড়ে গেলুম—মুড়িগুলো আলের ধারে ছড়িয়ে গেল। কতক্ষণ ঐভাবে পড়ে ছিলুম বলতে পারি না, লোকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে এসেছিল।' নিজের ছেলেবেলার এই প্রথম ভাবসমাধির বিবরণ দিয়েছেন রামকৃষ্ণ স্বয়ং। তখন তাঁর নাম ছিল গদাধর। আর একদিন—পরণের ধুতিখানি ছিঁড়ে তিন টুকরো করে সাধুদের মতন কৌপীন আর বহির্বাস সম্বল করে গদাধর ঘরে ফিরল। সারা গা ভস্মমাখা মা চন্দ্রমণি দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, 'মা! এই দেখ, আমি সাধু হয়েছি।' তাই দেখে মায়ের প্রাণ ভয়ে উড়ে গেল।

গদাধরের জন্ম কামারপুকুরে ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৬ সালে। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর সংসারে দেখা দিল অচল অবস্থা। বড় ভাই রামকুমার কলকাতা ঝামাপুকুরে এসে টোল খুললেন। গদাধরের লেখাপড়ায় মন নেই দেখে তাকেও নিয়ে এলেন।

রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে যে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানে পূজার ভার পেয়েছেন রামকুমার। গদাধরও দাদার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে চলে এল। কখনো মায়ের মন্দিরে ভাবে তন্ময় হয়ে বসে থাকে, কখনও গঙ্গাতীরে ঘুরে বেড়ায়।

কিছুকাল পর হঠাৎ রামকুমারের মৃত্যু হল। তখন মন্দিরের পূজার ভার পড়ল গদাধরের উপর। এই পূজার ভিতর দিয়েই ঘটল তাঁর জীবনে পরিবর্তনের সূচনা। পূজা করতে বসে গদাধর আনমনা হয়ে যান। আকুলকণ্ঠে মাকে ডাকেন। বলেন, 'মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস। আমাকে কেন দেখা দিবি না?'

অনেকে বলে গদাধর পাগল। পূজা করতে গিয়ে নিজের মাথায় ফুল দিয়ে বসেন। ভোগের প্রসাদ মাকে খাওয়াতে যান। পাষাণ-প্রতিমা ভোগ গ্রহণ করে না দেখে বলেন—'ওঃ, আমি না খেলে বুঝি তুই খাবি না? আচ্ছা, আমি আগে খাচ্ছি। এবার তুই খা।' নিজের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভবতারিণীর মুখে গুঁজে দেন।

একদিন সত্যিই দেখা দিলেন মা। গদাধর জীবনের উপর বীতস্পৃহ হয়ে বলির খাঁড়া দিয়ে নিজের গলা কাটতে উদ্যত হলেন, অমনি যেন মা ভবতারিণী তাঁর হাত চেপে ধরলেন। উত্তেজিত গদাধর ভাবাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

এর পর ঘটল গদাধরের উন্মাদ অবস্থা। তাঁকে কামারপুকুরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। অনেকে বলল, বিয়ে করলেই এই দোষ সেরে যাবে।

জননী চন্দ্রমণি পাত্রীর খোঁজ করতে লাগলেন। অবশেষে পাত্রী স্থির হল—জয়রামবাটির রাম মুখুজ্যের

মেয়ে সারদামণি। শুভলগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। সারদামণির বয়স তখন পাঁচ আর গদাধরের বয়স তেইশ। এত অল্প বয়স বলে সারদামণি পিতৃগৃহেই থাকতে লাগল।

একদিন সকালবেলা দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে একটি নৌকো এসে ভিড়ল। নেমে এলেন এক ভৈরবী। ভৈরবী যোগেশ্বরী গদাধরকে নানা সাধন-ভজন প্রক্রিয়া শেখালেন। অধ্যাত্ম-শক্তিতে ক্রমেই বলীয়ান হতে লাগলেন গদাধর।

এদিকে দৈবের বিধানে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন তোতাপুরী নামে এক মহা বৈদান্তিক নাগা সন্ন্যাসী। তিনি গদাধরকে দীক্ষা দিলেন। গদাধরের নতুন নাম হল রামকৃষ্ণ পরমহংস।

অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী তোতাপুরী রামকৃষ্ণের মধ্যে যে বস্তুটি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন তা হল অদ্বৈতসাধনে অপার নিষ্ঠা। অদ্বৈত মতের শেষ লক্ষ যে নির্বিকল্প সমাধি এবং যা অত্যন্ত দুঃসাধ্য বলে পরিচিত, রামকৃষ্ণ তা অবিলম্বে লাভ করলেন। হিন্দুধর্মের সব শাখা-প্রশাখা আয়ত্ত করে রামকৃষ্ণ এবার ইসলাম-সাধনা ও খ্রীষ্ট-সাধনাতেও সিদ্ধিলাভ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষণা করলেন—সব ধর্মেরই লক্ষ এক—যত মত, তত পথ; যার পেটে যা সয়, অর্থাৎ যার যেরূপ রুচি বা সাধ্য, সে সেরূপ ধর্মমত নিয়ে চলবে।

ওদিকে সারদামণি যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তিনিও এসে উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশ্বরে। কিন্তু রামকৃষ্ণ উদাসীন, সংসারবিরাগী। তাই সারদামণিকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কি আমাকে সাধন-ভজনের পথে বাধা দিতে এসেছ?"

সারদামণি জবাব দিলেন,—"না, তোমার সাধনপথে সহায় হবার জন্যেই আমি এসেছি।"

সত্যিই, সারদামণি কখনও রামকৃষ্ণের সাধনপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেননি। পরবর্তী জীবনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন 'শ্রীমা' রূপে।

রামকৃষ্ণের দিব্যভাবের প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর হয়ে উঠল জনসাধারণের তীর্থক্ষেত্র। তাঁর তখন দরকার ছিল বেশ-কিছু সমর্পিতপ্রাণ যুবক ভক্তের, যাদের তিনি যথার্থভাবে তাঁর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করতে পারেন—সংসারের যাবতীয় সুখৈশ্বর্যের মোহ থেকে যারা বেরিয়ে আসতে পারে। সে সময়কার কথা স্মরণ করে নিজেই বলছেন, "সেই দিনগুলিতে আমার ব্যাকুলতার যেন অন্ত ছিল না।... যাদের সঙ্গ চাইতাম তারা কখন আসবে, সেই ভাবনাতেই প্রাণ ব্যাকুল হত। সন্ধ্যের সময় সিঁড়ি বেয়ে কুঠির ছাদে উঠে যেতাম আর অস্থির হয়ে কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে ডাকতাম—ওরে তোরা আয়, আর দূরে থাকিস না—আমি যে তোদের পথ চেয়ে বসে আছি!"

অসংখ্য নরনারী ও ভক্ত এসে ভিড় করতে লাগল। ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তরাও একে একে এসে সমবেত হতে লাগলেন। এলেন বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সারদানন্দ, শিবানন্দ, অভেদানন্দ, অখণ্ডানন্দ, লাটু মহারাজ, আর এলেন বহু গৃহী ভক্ত—বলরাম বসু, শম্ভু মল্লিক ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ। অচিরেই রামকৃষ্ণ যুগাবতার রূপে পরিগণিত হলেন।

এক ভক্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচ্ছা, ভগবান কি সত্যিই আছেন?' রামকৃষ্ণ বললেন, 'নিশ্চয়ই আছেন। দিনের বেলা আকাশের তারা দেখা যায় না, তার অর্থ কি তারা নেই? দুধে মাখন থাকে; কিন্তু দুধের দিকে চাইলেই তা বোঝা যায় না। মাখন পেতে হলে ঠান্ডা জায়গায় দুধ মন্থন করতে হবে। তেমনি ঈশ্বরের দর্শন পেতে হলে তেমনি কিছু সংযম অভ্যাস করতে হবে। মনে করলাম আর ভগবানদর্শন হল এমনটি হয় না।'

১৮৮৫ সালে ঠাকুরের গলায় ক্ষতরোগ দেখা দিল। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বললেন ক্যানসার। চিকিৎসার জন্য ঠাকুরকে কলকাতায় শ্যামপুকুরে একটি বাড়িতে আনা হল। কিন্তু রোগের উপশম হল না। তখন তাঁকে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে স্থানান্তরিত করা হল। সব চেষ্টা নিষ্ফল হল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অগাস্ট ঠাকুর নরলীলার অবসান ঘটিয়ে অমৃতলোকে চলে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পুণ্যজীবন-ব্যাখ্যাতা ক্রিস্টোফার ঈশারউড বলেছেন, 'রামকৃষ্ণের সারা জীবনের সাধনা হল সবরকম একদেশদর্শী সংস্কার ও ধর্মগত কিংবা সম্প্রদায়গত গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা—স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যে ধর্মমত-নির্বিশেষে সবাই মুক্তির পথ, ঈশ্বরোপলব্ধির পথ দেখাতে পারে।'

বামাক্ষেপা



বামাচরণের জন্ম ১২৪৪ সনের ১২ই ফাল্গুন। পাঠশালার পড়া শেষ হয়ে গেল। কিন্তু বামাচরণের ভাগ্যে উচ্চবিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ ঘটল না। বাবা মা যে বড় গরিব।

বাবা সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মা রাজকুমারী দেবী। বীরভূমের আটলা গ্রামের অধিবাসী।

অল্পবয়সেই বাবা মারা গেলেন। বামাচরণ তখন শিশু। পিতৃশোকের কষ্ট এত বুঝবার ক্ষমতা নেই বামাচরণের। সে নিজের খেয়ালে চলে। কাজেই নদীর ওপারে তারাপীঠে। ছুটে যায় তারাদেবীর কাছে। বলে "মা তারা, তুই তো সবার কষ্ট দূর করিস্। আমাদের কষ্ট কি দূর করবি না?"

কেউ বলে পাগল কেউ বলে ক্ষেপা।

দিনে দিনে বয়স বাড়ে বামাচরণের। মা বলেন—"বামা, এখন তো তুই ছোট নস্। পাগলামি ছেড়ে কাজকর্মের খোঁজ কর্। এভাবে কতদিন চলবে?"

মায়ের কথা শুনে বামাচরণের জ্ঞান হল। একদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে বলল—"মা, আমি কাজ করতে যাব।" মা অবাক্ হয়ে বললেন—"কী কাজ করবি তুই? লেখাপড়া তো বেশি শিখলি না। তার চেয়ে ঘরে বসে চাষবাস কর্।"

বামাচরণ বলল—"কেন, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, কোথাও ঠাকুরপুজো করব। তাতে যা পাব তাতেই আমাদের সংসার চলবে।"

মা ছেলেকে দূরে যেতে দিতে চান না। কিন্তু ছেলেও বাড়িতে থাকতে চায় না। শেষে ঠিক হল মলুটিতে গিয়ে বামাচরণ কারও বাড়িতে ঠাকুরপুজোয় নিযুক্ত হবে।

মাত্র পনের বৎসর বয়সে বামাচরণ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। মলুটিতে গিয়ে একটি দেবালয়ে কাজ পেল ফুল তোলার। কিন্তু সেখানকার পুজকের ভক্তিবিশ্বাসে বীতশ্রদ্ধ হয়ে একদিন মন্দিরের মালিককে বলল—"মশায়, আমি ভক্তিহীন পুজার আয়োজন করতে রাজী নই। আমাকে বিদায় দিন।"

মলুটির কাজ ছেড়ে বামাচরণ নানা স্থানে পর্যটন করে বেড়ালেন। সেই সময়ে তাঁর মনে ধারণা হল তারাপীঠই তাঁর উপযুক্ত স্থান। তাই এসে উপস্থিত হলেন তারাপুরে।

মন্দিরের সন্নিকটে এক উঁচু বেদীস্তম্ভের একটি ক্ষুদ্রকক্ষের মধ্যে শিলাসনে স্থাপিত তারাদেবীর পাদপদ্ম। বামাচরণ এই পাদপদ্মের ধ্যান করেন দিবারাত্র, মন্দিরে যাওয়ার কোন অভিলাষ নেই তাঁর। ফুল-বেলপাতার অর্ঘ্য নিবেদন করতে করতে তিনি ভাবেন, তাঁর ইষ্টদেবী তারা-মা যদি বিশ্বময়ী, ত্রিলোকজননী ও ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী হন তাহলে তো তাঁরই মধ্যে বিধৃত রয়েছে এই আকাশ, পৃথিবী, পিতা-মাতা, আত্মীয়-পরিজন সমস্ত। তিনি যদি তাঁকে ত্রিতাপজ্বালা থেকে ত্রাণ করতে না পারেন, কেন তবে সবাই তাঁকে 'তারা' বলে ডাকে?

সহসা তাঁর কণ্ঠ থেকে নির্গত হল মহানির্বাণতন্ত্রের একটি ধ্যানমন্ত্রঃ 'হে পরমাপ্রকৃতি, তুমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, তুমিই পরমাত্মা, তোমাতেই এই নিখিলভুবন জাত হয়েছে। হে শিবানী, তুমিই জগজ্জননী। কে আমার পিতা, কে মাতা আমি জানি না। মন্ত্রতন্ত্র সাধনভজনও জানি না। ঋদ্ধিসিদ্ধি মোক্ষমুক্তি কিছুই চাই না। আমি শুধু চাই তোমার পাদপদ্মে একটু আশ্রয়।' মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে চৈতন্য হারিয়ে ফেললেন বামাচরণ। নিঃসাড় দেহে অপূর্ব দিব্যোন্মাদ অবস্থা।

তারাপীঠে তখন মোক্ষদানন্দ ছিলেন প্রধান কৌলিক। তিনি বামাচরণের কার্যকলাপে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর অফুরন্ত স্নেহ বর্ষিত হল বামাচরণের উপর। কিছুকাল পরে মোক্ষদানন্দ মারা গেলে ঐ পদে নিযুক্ত হলেন বামাচরণ।

প্রথমে বৈরাগ্য তারপর সাধনা। নিশ্চিন্ত ভাবে বামাচরণ এইবার সাধনভজনে নিমগ্ন হলেন। শরীরের দিকে দৃষ্টি নেই, আহার বিহারে তাঁর মন নেই। খোলা আকাশের নিচে তারা মায়ের সিদ্ধপীঠে বসে থাকেন বামাচরণ—বামাক্ষেপা। মাথার উপর দিয়ে শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা চলে যায়। কোন দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই।

ইতিমধ্যে একদিন মা রাজকুমারী দেবীর মৃত্যু হল। তারাপুরে দাহ করবার জন্য শব আনা হল। দ্বারকা নদীর অপর পারেই তারাপুর শ্মশান।

বামাক্ষেপা দেখলেন, ওপারে আত্মীয়-স্বজনদের ভিড়। বর্ষাকালে নদীতে ভয়ানক ঢেউ থাকায় কেউ পার হতে সাহস করছে না। ওপারেই দাহকার্যের আয়োজন হচ্ছে। ক্ষেপা স্থির থাকতে পারলেন না। ব্যাকুলকণ্ঠে বলে উঠলেন—"মা তারা, দেখিস আমার মা যেন তোর এ শ্মশানে ঠাঁই পায়।" বলেই নদীতে ঝাঁপ দিলেন।

মায়ের মৃতদেহ তখন চিতার উপর উঠানো হয়েছে। বামাক্ষেপার ছোট ভাই রামচরণ মুখাগ্নি করতে উদ্যত হয়েছেন। বামাক্ষেপা তাড়াতাড়ি মায়ের দেহটিকে উঠিয়ে এক টুকরো কাপড় দিয়ে নিজের পিঠে বাঁধলেন। তারপর নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে ওপারে চলে গেলেন। তারাপীঠের পবিত্র ভূমিতে মাকে দাহ করা হল।

মাতৃশ্রাদ্ধের দিনেও আবার এক বিঘ্ন উপস্থিত হল। সেদিন মুষলধারে বৃষ্টি। কোনরকমে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হল বটে কিন্তু এত ব্রাহ্মণকে কোথায় বসিয়ে খাওয়াবেন? ক্ষেপা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন—"তারা মা! পাষাণ বাপের মেয়ে বলে তুই-ও কি পাষাণী হয়েছিস? আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবি না?" দেখতে দেখতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ-ভোজনও সম্পন্ন হল।

মায়ের শেষকাজ সম্পন্ন হওয়ায় পর বামাক্ষেপা তারাপীঠে এসে পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসে তারা-নাম জপ করতে লাগলেন। প্রকৃত সাধু না হলে কেউ এই আসনে বসতে পারে না, বসলেও ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। ক্ষেপা দিনের পর দিন সেই আসনে বসে সাধনায় নিরত রইলেন।

ক্ষেপা বলতেন, 'আমি বাপু তোদের শাস্তর-টাস্তর কিছু বুঝিনে। শুধু তারা-মাকেই বুঝি।' ক্ষেপার সমস্ত সত্তায় বিধৃত ছিলেন তারা-মা। সিদ্ধকাম এই মহাসাধকের সমগ্র জীবন ছিল এক অখণ্ড চৈতন্যে সদানন্দ। তাঁর পূজাপদ্ধতিও কোন শাস্ত্র মেনে চলত না। আসনশুদ্ধি নেই, ভূতশুদ্ধি নেই, শাস্ত্রানুষ্ঠান মন্ত্র তন্ত্র নেই—শুধু কম্পিত হস্তে ফুল-বেলপাতা অঞ্জলি দেন, 'এই বেলপাতা নে মা, এই অন্ন নে, জল নে, এই ফুলচন্দন আর বলি নে!' এ তো দেবীর পূজা নয়—যেন মায়ের ওপর ছেলের অবাধ অধিকারের এক বাল্যলীলা। মন্দিরে, শিমুলতলায় ও শ্মশানে সর্বপাশমুক্ত বামাক্ষেপা উলঙ্গভাবে সর্বসমক্ষে পড়ে থাকতেন। বলতেন, 'আমার বাবা নেংটা, আমার মা নেংটা, আমিও তাই অভ্যেস করছি।' অত্যন্ত সংযমী সাধক ছিলেন বামাক্ষেপা। একবার এক রূপলাবণ্যবতী ভৈরবী তারাপীঠে উপস্থিত হলেন। ক্ষেপার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একদিন রাত্রে তিনি শয়নঘরে গিয়ে ক্ষেপাকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেন। বামাক্ষেপা সঙ্গে সঙ্গে সক্রোধে তাঁকে বিতাড়িত করেন। পরে ভৈরবীটি এই মহাসাধকের চরণতলে পড়ে ক্ষমাভিক্ষা করেন।

বামাক্ষেপা ছিলেন বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ। তিনি বহু মানুষের কল্যাণ সাধন করেছেন—বহু মরণাপন্ন রোগীর প্রাণ রক্ষা করেছেন। সাধনভজন ক্ষেত্রে অতুল কীর্তি রেখে বামাক্ষেপা ১৩১৮ সনের ২রা শ্রাবণ অমরধামে চলে গেলেন।

জগন্নাথদাস বাবাজী



বৈষ্ণবগণ প্রণাম করবার সময় এই বলে মন্ত্র উচ্চারণ করেন—

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবসার্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥

ক্ষেত্রমণ্ডল, গৌরমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল—এই তিন-মণ্ডল নিয়েই বৈষ্ণবদের জগৎ।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীগৌরকিশোরদাস বাবাজীর সমসাময়িক হলেন শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী। তিনিও তিন ধামে প্রসিদ্ধ একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ। তবু এই জগন্নাথদাস বাবাজীর কথা একটু স্বতন্ত্রভাবে না বলে পারা যায় না। উপরের শ্লোকটি থেকেই বোঝা যায় বৈষ্ণবেরা তাঁকে কতটা শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেমন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থান আবিষ্কার করেন, জগন্নাথদাস বাবাজী তেমনই সেইস্থান নির্দিষ্ট করে দেন। তাঁর নির্দেশেই শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর বুঝতে পারেন তাঁর আবিষ্কার ভুল হয়নি।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন মায়াপুর আবিষ্কার করেন তখন জগন্নাথদাস বাবাজীর বয়স ছিল একশ-কুড়ি বছর। বাহ্যতঃ তিনি পঙ্গু ছিলেন। তাঁরই এক প্রিয় শিষ্য চুবড়িতে বাবাজীকে বসিয়ে সেই চুবড়ি মাথায় বয়ে নিয়ে চলত।

এইভাবেই বাবাজীর দিন নির্বাহ হত।

কিন্তু যখন শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মায়াপুর আবিষ্কার করেন তখন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। জগন্নাথদাস বাবাজী অথর্ব, চলতে পারেন না অথচ সেই জায়গায় চুবড়িটি নামালে তিনি চুবড়ি থেকে উঠে দাঁড়ালেন। শুধু তাই নয়। হেঁটে তিনি মহাপ্রভুর জন্মভিটায় গিয়ে দাঁড়ান। তারপর নিমগাছের তলায়—যেখানে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়েছিল সেখানে উল্লাসভরে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে থাকেন।

কী সে ভয়ংকর নাচ! সে নাচ আর থামতে চায় না। নাচেন আর মহাপ্রভুর নামকীর্তন করেন। মনের আনন্দে তিনি বিভোর।

শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজীর মুখে একটি কথা শুনে সকলেই বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন—'প্রতি বছর মহাপ্রভুর জন্মতিথিতে আমি এখানে আসি। এই জায়গাটা যে আমার কতকালের চেনা।'

বাহ্যতঃ অথর্ব হলেও জগন্নাথদাস বাবাজী ছিলেন মনে ও প্রাণে সচল। প্রতিনিয়ত তিনি সাধুসঙ্গ করতেন।

সাধু ভক্তদের সঙ্গে যখন ধর্মালোচনা করতেন তখন মনে হত না তিনি বৃদ্ধ অথর্ব।

বেদান্তের সূত্রগুলির প্রেমভক্তিমূলক ব্যাখ্যা করেছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। সে কথা মনে পড়ে যায় শ্রীজগন্নাথদাসের। ভগবদ্ভক্তিই মানুষের পরম সাধন; তাই আত্মজ্ঞানী মুক্তপুরুষ মুনিগণও ভগবানের অহৈতুকী কৃপালাভের জন্য সদাব্যাকুল থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতেরও একটি শ্লোকে আছেঃ

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

ভক্তবৃন্দের কাছে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির তত্ত্ব সহজ করে ব্যাখ্যা করেন শ্রীজগন্নাথদাস।

বাবাজী মনে করতেন—নবদ্বীপই হচ্ছে বৃন্দাবন। নিরন্তর স্মরণ-মনন করতেন শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত শ্লোকঃ

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

—তৃণের চেয়েও নম্র হও, তরুর মতো সহিষ্ণু হও, নিরহংকার হয়ে সকলকে সম্মান কর, সর্বদা ভগবানের নামগান কর।

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎসর্বং গোবিন্দবিরহেন মে॥

—গোবিন্দকে না দেখতে পেয়ে একটি মুহূর্ত আমার কাছে এক যুগ বলে মনে হচ্ছে, দুই চোখ থেকে বর্ষার মতো অজস্র জলধারা ঝরে পড়ছে, সমস্ত জগৎ শূন্য হয়ে গিয়েছে।

যে বয়সেরই হোক না কেন, সাধু বৈষ্ণব দেখলেই তিনি ভক্তিতে গদগদ হতেন—সবাইকেই শ্রদ্ধা দেখাতেন।

সাধুসঙ্গের যে কী সুফল তা তিনি সকলকে বুঝিয়ে বলতেন।

ভগবৎ-অনুগ্রহ পেতে হলে সাধুসঙ্গ অবশ্যকর্তব্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধুসঙ্গ করবার আগে সাধু কে তার বিচার প্রয়োজন। নতুবা সাধু বলে অসাধুসঙ্গ গ্রহণ করলে বিশেষ অমঙ্গল ঘটবার সম্ভাবনা।

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥

অন্তরে শুদ্ধ হরিনাম গ্রহণ ছাড়া সাধুর বাহ্য আচার কীরকম তাও মহাপ্রভু বলেছেন—

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত, আর॥

সাধুসঙ্গের অপার মহিমা কে অবিশ্বাস করবে? কে না জানে, হরিদাস ঠাকুরের সংগবলে পাপাচারী বারনারী কৃষ্ণভক্তি লাভ করবার যোগ্য হয়েছিল? কে না শুনেছে, ভক্তবর নারদের সংগ ও কৃপাবলে নিষ্ঠুর-হৃদয় ব্যাধও হরিভক্তিতে সিক্ত হয়ে সামান্য পিঁপড়ের প্রাণনাশ বিষয়ে কত সতর্ক হয়েছিল? পাষণ্ড জগাই প্রথমতঃ নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গলাভ করেই তো কোমল হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাপাত্র হয়েছিল। পতিতপাবন নিতাইচাঁদের সঙ্গ ও কৃপা ছাড়া কীভাবেই বা জগাইমাধাই উদ্ধার হত?

জগন্নাথ বাবাজী ছিলেন অতি অদ্ভুত ধরনের সাধক। তাঁর সাধন-ভজনের কথা সাধারণ মানুষ জানে না। কিন্তু তিনি যে ভগবানের অনুগ্রহলাভে ধন্য তা বুঝতে কারও দেরি হত না।

আহার-বিহারের প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিল না। নিজের শরীরের প্রতিও তিনি ছিলেন উদাসীন। অথচ তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন।

শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী নবদ্বীপধামকে প্রাণের চাইতেও ভালবাসতেন। তাই সেই পবিত্র ভূমিতেই তাঁর দেহাবসান ঘটে।

আজও কুলিয়ায় তাঁর সমাধিমন্দির বর্তমান। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুলিয়া একটি বিখ্যাত তীর্থ। জনশ্রুতি, এক অঘ্রান মাসের কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে চৈতন্যদেব কুলিয়ায় এসে বিষ্ণুনিন্দক ও বৈষ্ণবনিন্দক লোকেদের অপরাধ মার্জনা করেন। সে কারণেই শ্রীপাট কুলিয়া বৈষ্ণবদের কাছে অপরাধভঞ্জন-পাট নামে পরিচিত। তাঁদের বিশ্বাস, এখানে এসে গোবিন্দের বিগ্রহ দর্শন করলে সমস্ত পাপ-অপরাধ দূর হয়। কুলিয়ার পাটে এখনও প্রতি বছর অঘ্রান মাসের কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে তিনদিনব্যাপী মেলা বসে। তখন অসংখ্য বৈষ্ণব ও ভক্তলোকের সমাগম হয়।

মায়াপুরে জগন্নাথদাস বাবাজীর আখড়া এখনও ভক্তদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু।

সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ



কেদারনাথ দত্ত ছিলেন উড়িষ্যার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। রাশভারী লোক; দুর্দান্ত প্রতাপশালী শাসক হিসেবে তাঁর পরিচয় সর্বত্র।

সেই সময়ে পুরীতে এক সাধুর আবির্ভাব হয়। নাম তাঁর বিষকিষণ (বিষ্ণুকৃষ্ণ?)। তিনি নিজেকে ভগবানের অবতার বলে প্রচার করেন। অবিরত বহুলোক তাঁর কাছে এসে ভিড় করতে থাকে। সাধুকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে বহু অর্থ ও সোনাদানা দান করে। অচিরেই প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক হন সেই সাধু বিষকিষণ।

কেদারনাথের কানে সেই খবর গেল। তিনি নিজেই একদিন উপস্থিত হলেন সাধুর আশ্রমে। সাধুর কথাবার্তায় ও আচরণে কেদারনাথের মনে সন্দেহ হল তিনি বুঝতে পারলেন এটা ভন্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই পরে একদিন পুলিস নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে সাধুকে গ্রেফতার করলেন। শত শত সাধুর শিষ্য ও ভক্তেরা বাধা দিল। কিন্তু তিনি কোন বাধা মানলেন না। সাধুকে গ্রেফতার করে তাঁর শাস্তি বিধান করলেন।

কেদারনাথ পরবর্তী কালে পুরীর রাজার অধীনে জগন্নাথ মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের ভার পেয়েছিলেন। সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধীয় বহু প্রাচীন গ্রন্থ এবং মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্তগণের গ্রন্থ আলোচনা করার সুযোগ পান। এর পর কেদারনাথের মনে অভূতপূর্ব ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়। ক্রমশঃ তাঁর জীবনের ভাবধারা বদলে যেতে থাকে।

শৈশব থেকেই কেদারনাথের মনে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। একদিন কথায় কথায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছিলেন—'ঈশ্বরকে যখন আমরা দেখিনি তখন তাঁর আলোচনা না করাই ভাল।' কেদারনাথ ছাত্র হলেও সত্যকথা বলতে ছাড়লেন না। তিনি বললেন—'পন্ডিতমশাই, আপনি বোধোদয়ে ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ লিখেছেন কেন? ঈশ্বরকে না দেখে তাঁর সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা কি ভাল হয়েছে? ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্; তাঁর সব ক্ষমতাই আছে। তাঁর কি নিজের আকারটি রক্ষা করবার ক্ষমতাটুকু নেই? পরমেশ্বর আমাদের নিত্য প্রভু, আমরা তাঁর নিত্যদাস। তাঁর প্রতি আমাদের হৃদয়ের যে সহজ অনুরাগ, তাকেই বেদ, ভক্তি, ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা বলা হয়েছে। সেই বিদ্যাই আসল বিদ্যা। সেই বিদ্যালাভ করলে কোন জ্ঞানেরই অভাব থাকে না।'

এরকম কথা যিনি কিশোর বয়সে বলতে পারেন তিনি যে পরবর্তী জীবনে সাধক পুরুষ হবেন তাতে বিচিত্র কী? ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল, তাই বলে ধর্মের নামে ধর্মভীরুরা প্রতারিত হবে তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই সাধু বিষকিষণকে তিনি শাস্তি দিয়েছিলেন।

নদীয়া জেলার বীরনগর গ্রামে ১৮৩৮ সালে (১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৮ই ভাদ্র) কেদারনাথের জন্ম। তিনিই পরবর্তী জীবনে বৈষ্ণব শিরোমণি সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামে পরিচিত হন।

কেদারনাথের মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান সঠিকভাবে খুঁজে বার করবেন। কৃষ্ণনগরে বদলি হলেন, কিন্তু চাকুরি তাঁর ভাল লাগল না। চাকুরি ছেড়ে চলে গেলেন বৃন্দাবনে। পরে তারকেশ্বরে এসে হত্যা দিলেন। স্বপ্নাদেশ পেলেন। স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর নবদ্বীপে চলে গেলেন। একজন মাত্র বালককে সঙ্গে নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান অনুসন্ধান করতে লাগলেন। রোদ, বৃষ্টি, পশু এবং সাপের উপদ্রব সহ্য করে দিনের পর দিন কাটাতে লাগলেন জনশূন্য বনে ও প্রান্তরে।

একদিন রাত্রিবেলায় গঙ্গার উত্তরদিকে দেখতে পেলেন একটি আলোময় অট্টালিকা। আর দেখতে পেলেন একটি তালগাছ। সাধকপ্রবর বুঝতে পারলেন ঈশ্বর তাঁকে শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থানের সংকেত জানালেন। কিছুক্ষণ পর আলোময় অট্টালিকা অদৃশ্য হয়ে গেল কিন্তু তালগাছটি সেই অবস্থাতেই রইল। তারপরেও বহুদিন সেই তালগাছটি জীবিত ছিল।

নরহরি চক্রবর্তীর (ঘনশ্যাম দাস) 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে নবদ্বীপমধ্যবর্তী মায়াপুরই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলে উল্লিখিত হয়েছে -

নবদ্বীপমধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান আবিষ্কার করে সচ্চিদানন্দের আনন্দের সীমা রইল না। নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

সচ্চিদানন্দের সর্ব অঙ্গ আনন্দে পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এই কি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্য জন্মভিটা? পরে শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজীও অকাট্য প্রমাণযোগে এই নিম্ববৃক্ষতলাটিকেই গৌরাঙ্গ প্রভুর জন্মভিটা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মনে আর কোন সংশয় রইল না। এখানেই জন্মেছিলেন জীবনের পরমারাধ্য দেবতা শ্রীচৈতন্য। সচ্চিদানন্দ ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে পড়েন। মহাপ্রভুই তো বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিয়েছেন ঈশ্বরের কাছে সব মানুষ সমান, ভগবানের নামগানে জাতিধর্মের বিচার অর্থহীন। সব শ্রেণীর ও সব ধর্মের মানুষ তাঁর কাছে পেয়েছিল প্রেমধর্মের দীক্ষা। উদার মানবতার প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা। ভক্তজনকে বলেছেন: 'চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বোলে।' বলেছেন: 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ'। হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সমান পূজা পাবার যোগ্য। জীবে দয়া ও নামে রুচি এই ছিল তাঁর আদর্শ। বর্ণভেদ অস্বীকার করে আদ্বিজচণ্ডালে তিনি প্রেম বিলিয়ে দিয়েছিলেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর বাণীকে কী সুন্দরভাবেই না মূর্ত করে তুলেছেন তাঁর চরিতামৃতে:

নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥

সাধক সচ্চিদানন্দের মন বলে ওঠে: প্রেম সম্পর্কে সব মানুষের দাবি সমান, এ মহাপ্রভুরই বাণী। তিনিই তো বলেছেন, প্রেমের পথেই ভগবানকে লাভ করা সহজ, হৃদয়ের মুক্ত দ্বারেই মানুষ আপন ক্ষুদ্রতাকে ছাড়িয়ে মহত্ত্বের জীবনে উন্নীত হতে পারে। সচ্চিদানন্দ মনে মনে উচ্চারণ করেন শ্রীচৈতন্যের বিশ্ববন্দিত বাণী:

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ শুধু সাধকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন জ্ঞানী ও মনীষী। কর্মক্ষেত্রে বহাল থাকা অবস্থাতেই তিনি কতিপয় মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলা ছাড়াও সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় তাঁর প্রচুর জ্ঞান ছিল। ইংরেজী ভাষাতেও তিনি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেছেন।

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শুধু বৈষ্ণবভক্ত শিরোমণি হিসাবেই নয়, জ্ঞানী ও কর্মী রূপেও তিনি ছিলেন আদর্শস্থানীয়।

বীরনগর গ্রামের বর্ধিষ্ণু ও ধনশালী মিত্রমুস্তৌফী পরিবারের বংশধর ঈশ্বরচন্দ্র বাবাটি মন্দির সংলগ্ন যে সাতমহলা অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন, সে বাড়িতেই জন্মেছিলেন তাঁর দৌহিত্র কেদারনাথ। পরবর্তী কালে, ১৯২৭ সালে এখানে মন্দিরাদির সংস্কারসাধন করে একটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবমঠ প্রতিষ্ঠা করেন কেদারনাথের পুত্র ললিতাপ্রসাদ দত্ত।

পওহারী বাবা



জৌনপুর জেলার প্রেমাপুর গ্রামে তেওয়ারীরা ভক্তিমান ও নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব বলে সুপরিচিত ছিলেন। সেই বংশেরই অযোধ্যা তেওয়ারীর দ্বিতীয় পুত্র হরভজন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। শৈশবে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে হরভজনের ডান চোখটি নষ্ট হয়ে যায়। তার পিতৃব্য, বৈষ্ণব সাধক লছমীনারায়ণ বলেছিলেন, 'অযোধ্যা, দুঃখ করো না। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং-এরও ডান চোখ ছিল না। দেখে নিও তোমার এই ছেলেও একদিন, দেশের রাজা না হতে পারলেও, লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ের রাজা হবে, সম্মান পাবে।' দশ বছর বয়সে মায়ের সান্নিধ্য হারিয়ে হরভজন চলে আসেন লছমীনারায়ণের আশ্রয়ে—তাঁর আশ্রমেই হরভজনের দিন কাটতে থাকে। তাঁর বয়স যখন ষোল বছর তখন লছমীনারায়ণের মৃত্যু হয়। তাতে হরভজনের মনে বৈরাগ্য জাগে—বেরিয়ে পড়েন তীর্থের পথে।

বহু তীর্থ, বহু বিগ্রহ এবং সাধুসন্ত দর্শন করলেন, কিন্তু মন তৃপ্তি পেল না। সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভের জন্য, নতুন আলো ও নতুন পথের জন্যে তিনি অধীর হয়ে উঠলেন।

দ্বারকা থেকে কয়েক মাইল দূরে অরণ্যময় এক পর্বতের গুহায় একদিন এক শক্তিধর যোগীর সাক্ষাৎ পেলেন। হরভজন সেই যোগীর চরণে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে বললেন—'আমায় কৃপা করুন, আপনার চরণতলে রেখে যোগদীক্ষা দিন।'

যোগিবরের কৃপা হল। তিনি বললেন—'বেটা, দীক্ষা আমি সহজে কাউকে দিই না। তা ছাড়া, তোমার গুরু রয়েছেন অন্যত্র। তবে তোমাকে কিছু যোগসাধন দেব, তাতে তোমার প্রকৃত কল্যাণ হবে।'

সেই মহাযোগীর পদতলে বসে হরভজন কয়েকটি নিগূঢ় যোগসাধন গ্রহণ করলেন। তারপর আরও কয়েকটি বিখ্যাত তীর্থ পরিভ্রমণ করে ফিরে এলেন দেশে।

গাজীপুর ও কুর্থা অঞ্চলে সাধু লছমীনারায়ণের আশ্রমের ভার নিলেন হরভজন। আশৈশব তিনি রামানুজপন্থী বৈষ্ণবসাধনা অনুসরণ করে এসেছেন। তার সঙ্গে মিলিত হল যোগশক্তি। কুর্থার আশ্রমে এক মাটির গুহা নির্মাণ করে হরভজন কঠোরতর ভজনসাধন শুরু করলেন। এইসময় শুধু দু-চারটি বেলপাতা বেটে খেতেন বা একপোয়া দুধ পান করতেন। তাই পরিচিত হলেন তিনি 'পওহারী বাবা' নামে।

সাধন-লোকের দিব্য অনুভূতি ও আনন্দলাভ করার পরও তাঁর মন পরিতৃপ্ত হয়নি। গুরুর সন্ধানে আশ্রম ছেড়ে বেরোলেন। অযোধ্যায় গিয়ে শুনতে পেলেন রামানুজী সম্প্রদায়ের কোন উচ্চকোটি সাধক নদীতীরের এক আশ্রমে নিভৃতে তপস্যারত রয়েছেন। তাঁর মনে হল ইনিই তাঁর বহু-আকাঙ্ক্ষিত দীক্ষাগুরু।

একদিন প্রত্যুষে সেই সাধুর ভজন-গুম্ফায় গিয়ে

তিনি উপস্থিত হলেন; সকাতরে ভিক্ষা করলেন পরম আশ্রয়। ঐ কঠোরতপা বৈষ্ণব-তাপসের কাছে পওহারী বাবা দীক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে থেকে তিনি ফিরে আসেন কুর্থা গাজীপুরের আশ্রমে।

দীর্ঘকাল সূর্যালোকবিহীন কুটিরে ও অন্ধকার গুহায় তপস্যা করার পর সর্বসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করার ফলে বাবাজীর দেহচর্মে ব্যাধি দেখা দিল। প্রবল জ্বরে তিনি আক্রান্ত হন। সেই সঙ্গে স্বরভঙ্গ। সে সময় তিনি মাঘ-মেলা উপলক্ষে প্রয়াগে অবস্থান করছেন। শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণ গলক্ষত রোগের আশঙ্কায় বাবাজীকে ঔষধ-পথ্য আনতে নির্দেশ দিলেন। রাত্রে সেই ঔষধ-পথ্য গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়ে কুটিরে বসে ধ্যানমগ্ন হলেন। পরদিন সকালে ভক্তেরা অনুযোগ করলেন, ঔষধ-পথ্য খাবেন না বললেই হত, এভাবে তিনি পয়সা নষ্ট করলেন কেন। পওহারী বাবা হেসে বললেন, "সবই আমি গ্রহণ করেছি। দেখ তো, জ্বর সেরে গেছে, স্বরভঙ্গ নেই, গায়ের ফোস্কাও মিলিয়ে গিয়েছে!" ঔষধ ছাড়াই আরোগ্যলাভ দেখে ভক্তবৃন্দ বিস্মিত।

একবার অযোধ্যা থেকে এক ভণ্ড সাধু এসে আশ্রয় নিল গাজীপুরের আশ্রমে। যেমন কপট তেমনি দাম্ভিক। কিছুদিন পর দেশ-পর্যটনের অজুহাত দেখিয়ে পওহারী বাবার কাছে প্রচুর টাকা দাবি করে লোকটি। বাবাজী প্রার্থিত অর্থ দিতে না পারায় ভণ্ড সাধুটি বাবাজীকে প্রচণ্ড ভর্ৎসনা করে গাজীপুরের আশ্রম ছেড়ে যেতে বলে। আদেশ শিরোধার্য করে আশ্রম ত্যাগ করে পওহারী বাবা শ্রীক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করেন। স্থির করেন, প্রভু জগন্নাথ দর্শনান্তে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু পথে গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হন। অবশেষে মুর্শিদাবাদ জেলার ব্রহ্মপুর গ্রামে এসে বেশ কিছুদিন তাঁকে থাকতে হয়। ভক্তেরা বহু অনুসন্ধান করে তাঁকে গাজীপুরে ফিরিয়ে আনেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সাধনজীবনের পথে পওহারী বাবার কিছুটা প্রভাব পড়েছিল। উত্তর ভারতের সাধক সমাজে এই মহাত্মার তখন প্রচুর খ্যাতি। রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর স্বামীজী এলেন এই মহাপুরুষের চরণতলে বসে অমৃতময় জীবন লাভ করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করার জন্যে। গাজীপুরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে স্বামীজী এক পত্রে লিখছেন "বহু ভাগ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি অতি মহাপুরুষ - বিচিত্র ব্যাপার এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার নিদর্শন। আমি ইহার শরণাগত হইয়াছি। আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, যাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না।" শেষ পর্যন্ত অবশ্য যোগদীক্ষা গ্রহণ করা হয়নি; কিন্তু পওহারী বাবার পুণ্যময় সঙ্গ ও তাঁর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ তরুণ সাধক বিবেকানন্দের অশান্ত হৃদয়ে এনে দেয় শান্তির প্রলেপ।

একদিন গভীর রাত্রে আশ্রমে একদল চোর সিঁদ কেটে ঢোকে। ঠাকুরঘরের থালাবাসন ঝুলিতে ভরে ফেলেছে, এমন সময় দেখে সামনে পওহারী বাবা দাঁড়িয়ে। চোরের দলকে পালাতে দেখে বাবাজী ডেকে জিনিসপত্র সব নিয়ে যেতে বলেন। বললেন, 'জিনিস না নিয়ে গেলে বুঝব এ দাসের কোন অপরাধ হয়েছে।' অবাক হয়ে চোরের দল বাসনপত্র তুলে নিল; কিন্তু চলে যাবার সময় সমস্তই আশ্রমের বাইরে ফেলে রেখে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। পওহারী বাবা পিছন পিছন দৌড়ে গিয়ে তাদের কত অনুনয় করলেন, কিন্তু তারা পালিয়ে গিয়ে বাঁচে।

একবার কুটিরে বসে পওহারী বাবা ভজন করছেন। হঠাৎ একটি ইঁদুর লাফিয়ে তাঁর কাঁধের ওপর উঠে বসে। সেটিকে কোলে নামিয়ে এনে তিনি সযত্নে আশ্রয় দেন। কিন্তু তখনই এক বিষধর সাপ তাঁকে দংশন করে। সাপটি ঐ ইঁদুরকে তাড়া করেছিল। বাবাজী সেটিকে আশ্রয় দিয়েছেন বলেই ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে কামড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে পওহারী বাবা অচেতন হয়ে পড়েন। আশ্রমে মহা শোরগোল পড়ে যায়। ওঝার চিকিৎসা, পূজা, হোম কোন কিছুতেই ফল হয় না। কিন্তু দুদিন জ্ঞানশূন্য হয়ে থাকবার পর দেখা যায় অলৌকিক দৃশ্য! নিজেই তিনি ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকিয়েছেন তারপর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

পওহারী বাবা ছিলেন একাধারে সিদ্ধযোগী ও প্রেমিক মহাপুরুষ।

১৮৯৮ সালের ঘটনা। পওহারী বাবা একদিন নিজের প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করে জীবন-লীলার উপর যবনিকা টেনে দেন।

পরমেশ্বরী বাঈ



কনকনে শীতের রাত্রি। তার ওপর ঝড় আর বৃষ্টি। বৃন্দাবনের নটবর-কুঞ্জে দামোদরদাস বাবাজীর ঘুম ভেঙে গেল। দুই শিষ্য, নন্দদাস আর মিঠুলাল চেঁচামেচি করছে: গোয়ালঘরের মাটিতে অপূর্ব সুন্দরী এক নারী পড়ে আছে চাদরমুড়ি দিয়ে। শিষ্যরা তাকে ঘরে তুলে নিয়ে এসে গরম দুধ খাইয়ে সুস্থ করে তুলল। পরদিন সকালে বাবাজীকে দেখে মেয়েটি বলে: 'একদিন কলকাতায় আর সেদিন মথুরায় আমি আপনাকেই দর্শন করেছি বাবাজী। হুবহু এই মূর্তি।'

'বড় তাজ্জব কি বাৎ! বাবাজী তো বৃন্দাবনধাম ছেড়ে চল্লিশ বছর কোথাও যান নি!' ফোড়ন কাটে মিঠুলাল।

মেয়েটি বলে, 'সত্যি বলছি বাবাজী। মথুরায় পৌঁছে ক্ষুধাতৃষ্ণায় অবশ হয়ে একটা চালাঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, আপনি নির্দেশ দিচ্ছেন—ঐ যে পাশে দাঁড়িয়ে আছে খড়বিচালিতে ভরা গোরুর গাড়ি—ওটায় উঠে পড়ে বৃন্দাবন চলে যাও। সেইভাবেই আমি চলে এসেছি এখানে।'

'কিন্তু তোমার এত রূপ—এ সন্ন্যাসীর আশ্রমে আমি তোমায় রাখব কেমন করে? যদি পার তোমার দেহ তোমার সৌন্দর্য সব শ্রীকৃষ্ণের পদে সমর্পণ করতে—নিজের বলে কিছু থাকবে না, তা হলেই নটবর-কুঞ্জে তুমি আশ্রয় পাবে মা।' দামোদরদাস বাবাজী যেন সমাধানের ইঙ্গিত দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রাজি মেয়েটি। নাম তার মালতী। জন্ম ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে।

বাবাজীর চরণতলে বসে মালতী তার দুঃখের জীবনকথা বলে যায়। বিধবার কন্যা হলেও পরমাসুন্দরী মালতীর বিবাহ হয়েছিল কলকাতার এক ধনী পরিবারে। একটি পুত্রও জন্মলাভ করেছিল। কিন্তু প্লেগের আক্রমণে তার স্বামী ও শ্বশুর দুজনেই অচিরে মারা যায়। শিশুপুত্রটিকে নিয়ে মালতী অসহায় হয়ে পড়ল। শ্বশুরের অগাধ সম্পত্তির মালিক হওয়া সত্ত্বেও এক কুচক্রী দূর-সম্পর্কিত ভাশুরের কোপদৃষ্টিতে পড়ে গেল মালতী। মদ্যপায়ী পাপাচারী ভাশুর চায় বিধবা মালতীর সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করে তাকেও ভোগ করতে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তার শিশুপুত্রকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলল ভাশুর। এবার রূপবতী মালতীর দিকে তার কুৎসিত নজর। প্রলোভনের হাতছানি দেয় ভাশুর। রাগে, ঘৃণায়, ভয়ে মালতী অস্থির হয়ে ওঠে। রাধামাধবের মূর্তির কাছে বসে কাতর প্রার্থনা জানাতে থাকে বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। এক রাত্রিতে ঘটল এক অলৌকিক কাণ্ড। অন্ধকার ফুঁড়ে এক দিব্যদর্শন জটাধারী বৈষ্ণব দাঁড়িয়ে আছেন জানলার ওপারে। অভয় দিয়ে বলছেন, 'রাধামাধব কৃপা করেছেন তোকে। মনের দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে চলে আয় বৃন্দাবনধামে। তোর দুর্ভাগিনী জীবনের অবসান ঘটবে।' বলেই সাধুমূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

অকূলে কূল পেয়ে গেল মালতী। বাড়ির অ্যাটর্নিকে ডেকে ট্রাস্টদলিল সম্পাদন করে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দেয় রাধামাধবজীউর নামে। লক্ষাধিক টাকা মূল্যের হীরে-মুক্তো-সোনার অলঙ্কার বেচে দিয়ে সমস্ত অর্থ জমা করে দেয় দেবত্র তহবিলে। তারপর কর্মচারীদের কাছে বিদায় নিয়ে একবস্ত্রে রেলগাড়িতে চেপে চলে আসে মথুরায়, সেখান থেকে বৃন্দাবনে—এই দামোদরদাসজীর আখড়ায়।

মালতীকে ধীরে ধীরে পরিশুদ্ধ করে তোলেন দামোদরদাসজী। নটবরজী বিগ্রহের ঐকান্তিক সেবায় নিজেকে ঢেলে দেয় মালতী। নতুন নামকরণ হল—কুঞ্জদাসী। চরম কৃচ্ছ্রসাধন, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় কুঞ্জদাসী। সন্তুষ্ট হয়ে বাবাজী বলেন, 'কৃষ্ণ-ভাবনায় তুই একেবারে ডুবে গেছিস। এ আশ্রমে আর তোর থাকবার প্রয়োজন নেই। এবার তোর অরণ্যবাস। আরও তীব্র বৈরাগ্য, আরও চরম সাধনা চাই। ঠাকুর নটবরজীর নির্দেশেই তোকে আমি বলছি, বৃন্দাবন আর গোবর্ধনগিরির মাঝখানে যে বন আছে সেখানে ঝুপড়ি বেঁধে তোকে সাধন-ভজন করতে হবে। কোন ভয় নেই। তুই একেবারে খাঁটি সোনা।'

কুঞ্জদাসীকে বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাসে দীক্ষিত করলেন দামোদরদাস বাবাজী। তাঁর নতুন নামকরণ হল—পরমেশ্বরী দাসী। তাঁর বয়স তখন ত্রিশ বৎসর মাত্র। ইনিই ভক্তদের কাছে পরিচিতা হয়েছিলেন সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈ রূপে।

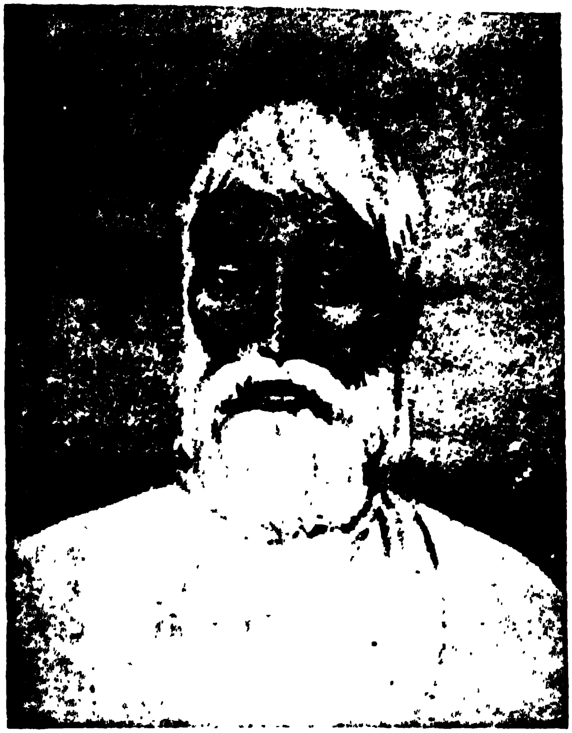
বিহারবনের অভ্যন্তরে লতাপাতার কুটির বেঁধে পরমেশ্বরী শুরু করেন চরম কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যা। গ্রামের গরিব কাঠুরে ভিখনলাল তাঁর প্রথম ভক্ত। ক্রমে অন্যান্য গ্রামবাসীরাও তাঁর ভক্ত হয়ে আনাগোনা শুরু করে বিহারবনের ঝুপড়িতে। এইভাবে কাটল দশ বছর। একদিন গুরু দামোদরদাসজী তাঁর কাছে এসে বললেন, 'মা, তুই প্রেমসিদ্ধা হয়েছিস। লীলাময়ের অপার প্রেমলীলা আস্বাদন করার সৌভাগ্য হয়েছে তোর। আমাকে এবার বিদায় দে। এখন বৃন্দাবন তোর। আমাকে বিদায় দে। এখন বৃন্দাবনে ফিরে নটবরজীর পায়ে এ দেহের খোলাটাকে ফেলে দেব।'

বাবাজীর তিরোধানের পর ভক্তরা সিদ্ধামাঈকে পরমশরণ্যা বলে জ্ঞান করতে থাকে। কত তীর্থযাত্রী আসে এই পরমসাধিকাকে দর্শন করে পুণ্যসঞ্চয় করার অভিলাষে। একদিন গোবর্ধনগিরি পরিক্রমা করে শতাধিক দরিদ্র তীর্থযাত্রী পরমেশ্বরী মাঈকে দর্শন করার জন্য এসে উপস্থিত। পথশ্রমে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত তারা। সিদ্ধামাঈর ঝুপড়িতে এত আহার্য কোথায়? শিষ্যেরা চিন্তিত হয়ে পড়ল। সিদ্ধামাঈ কিন্তু অচঞ্চল। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, নটবরজীর কৃপায় মথুরার এক শেঠ প্রচুর খাদ্যদ্রব্য গাড়িতে বোঝাই করে উপস্থিত হয়েছেন সেখানে। দর্শনার্থী সবাই ভোজনে পরিতুষ্ট হল সেদিন।

উইলিয়াম ফক্‌নার নামে এক তরুণ ইংরেজ মথুরার স্থাপত্যশিল্প ও পুরাকীর্তিগুলো দেখে বেড়াচ্ছে। পাখি শিকারের বাসনায় বিহারবনের কাছে এসে হঠাৎ সে দেখতে পায় পরমেশ্বরী বাঈকে। যুবতী সন্ন্যাসিনীর অতুলনীয় রূপরাশি দেখে সাহেব তো মূর্ছা যাবার যোগাড়। রাত্রে তার তাঁবুতে জোর করে ধরে আনাতে চাইল সিদ্ধামাঈকে। গ্রামপ্রধান কিছুতেই এমন অপকর্ম করতে রাজি হল না। সাবধান করে দিল, সন্ধের পর সিদ্ধবাঈর ভজনকুটিরের চারদিকে যে গণ্ডি আঁকা আছে সেটা পেরিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করলে কিন্তু বিপদ ঘটবে। সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করে ফক্‌নার রাইফেল আর লণ্ঠন হাতে করে উন্মাদের মতো ছুটে চলল পরমেশ্বরীর ঝুপড়ির দিকে। দম্ভভরে যেই সে আঙিনার মধ্যে ঢুকতে যাবে, অমনি এক অদৃশ্য শক্তি প্রচণ্ড আঘাতে ধরাশায়ী করে দিল সাহেবকে। আবার উঠে দাঁড়াতেই সেই অদৃশ্য মহাশক্তিমান্ পুরুষ ফক্‌নারকে শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলল মাটিতে। কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকার পর তাকে গ্রামবাসীরা এসে তুলে নিয়ে যায়। পরদিন সকালে অনুতপ্ত ফক্‌নার ভজনকুটিরে এসে সিদ্ধাবাঈর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে যায় তার গর্হিত আচরণের জন্যে।

বিহারবনের কুটিরে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর সাধনা ও লীলাধ্যানের পর এই মহাসাধিকার জীবনে নেমে আসে পরম বিদায়ের লগ্ন। ১৯১০ সালের শেষভাগে সমস্ত গ্রামবাসীকে শোকসাগরে ভাসিয়ে সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈ চলে গেলেন অমরলোকে।

নাগ মহাশয়



মা-মরা ছেলে। পিসীমার কোলে-পিঠে মানুষ। পিসীমার মুখে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত্রিবেলায় গল্পের নায়ক নায়িকা এসে ভিড় করে চোখের সামনে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে শিশু বলে "পিসীমা, কাল আমি কৃষ্ণকে দেখেছি। মাথায় চূড়া, হাতে বাঁশি, কী সুন্দর দেখতে।" পিসীমা শুনে হাসেন। অবাকও হন।

ছেলেটির নাম দুর্গাচরণ নাগ। ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জের দেওভোগ গ্রামে বাড়ি। জন্ম ১২৫৩ বঙ্গাব্দের ৬ই ভাদ্র; ২১শে অগাস্ট, ১৮৪৬ সাল। পিতার নাম দীনদয়াল। মাতার নাম ত্রিপুরাসুন্দরী।

দুর্গাচরণের লেখাপড়ার দিকে খুব ঝোঁক। কাছাকাছি বড় ইস্কুল নেই। দশ মাইল দূরে শহরে বড় ইস্কুল। অথচ গাড়িঘোড়ার কোন ব্যবস্থা নেই। সেখানে পড়তে হলে রোজ দশ মাইল হেঁটে যেতে হবে আবার হেঁটে আসতে হবে। তবু সেখানেই সে ভর্তি হল। সকাল আটটায় খাওয়া-দাওয়া করে রওনা হত আর ফিরতে রাত হয়ে যেত। ফেরার পথে খেত শুধু এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি।

দুর্গাচরণ বড় হলেন। বাবা তাঁকে কলকাতায় এনে ভর্তি করে দিলেন মেডিক্যাল স্কুলে। কিন্তু এলোপ্যাথি দুর্গাচরণের ভাল লাগল না। হোমিওপ্যাথি পড়তে শুরু করলেন।

ডাক্তারি পাস করে গরিবদের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বিনা পয়সায় ডাক্তারি শুরু করলেন। ছেলের ভাবসাব দেখে বাবা তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন দেশের গাঁয়ে। দেশে গিয়ে দুর্গাচরণ দেখলেন মায়ের মতো স্নেহে যিনি তাঁকে মানুষ করেছেন সেই পিসীমা মৃত্যুশয্যায়। শত চিকিৎসাতেও কোন ফল হল না। পিসীমা মারা গেলেন। দুর্গাচরণ এর পর থেকে যেন কেমন হয়ে গেলেন। ঘুরে বেড়াতে লাগলেন নানা জায়গায়। কোন সাধুকে দেখলেই প্রশ্ন করেন—কোথায় শান্তি কোথায় সুখ?

কলকাতায় এসে দুর্গাচরণ একদিন গেলেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণ তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলেন—এ যুবক একদিন মহাপুরুষ হবে।

দক্ষিণেশ্বরে দুর্গাচরণের তৃতীয়বার রামকৃষ্ণ-দর্শন। ঠাকুর বললেন "ওগো, তুমি না ডাক্তারি কর—দেখ দিকি আমার পায়ে কী হয়েছে।" ডাঃ নাগ পরীক্ষা করে বললেন, "কৈ, কোথাও তো কিছু দেখছি না।" ঠাকুর বললেন, "ভাল করে দেখ না, কী হয়েছে।" নাগ মহাশয় তো এটাই চাইছিলেন। সাধ মিটিয়ে চরণধূলি নেবার আকাঙ্ক্ষা এভাবেই পূর্ণ হল। এখন থেকে তিনি জানলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান। সেই দিনই পরীক্ষাচ্ছলে ঠাকুর যখন নিজের শ্রীঅঙ্গ দেখিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার এটা কী বোধ হয়?" নাগ মহাশয় উত্তর দিলেন, "ঠাকুর, আর আমায় বলতে হবে না। আমি আপনারই কৃপায় জানতে পেরেছি, আপনি সেই।" ঠাকুর অমনি সমাধিস্থ হয়ে তাঁর বুকে শ্রীচরণ অর্পণ করলেন। সহসা নাগ মহাশয়

অন্য এক অনুভূতিরাজ্যে উপস্থিত হয়ে দেখলেন—সর্বত্র এক দিব্যজ্যোতি উছলে উঠছে।

দুর্গাচরণ বললেন—"ঠাকুর, সংসার যে আমার ভাল লাগে না।"

রামকৃষ্ণ বললেন—"ভাল লাগবে। সংসারে থাকবি ঠিক পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে তার পাঁক লাগে না। তেমনি সংসারে থাকবি, কিন্তু সংসারের ময়লা মনে লাগতে দিবি না।"

দুর্গাচরণ সংসারধর্মে মন দিলেন। গাঁয়ে ফিরে গিয়ে শুরু করলেন ডাক্তারি। প্রথমা স্ত্রী বিয়ের অল্পকাল মধ্যেই মারা গিয়েছিল, পিতার একান্ত অনুরোধে দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন। পত্নীকে তিনি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা জ্ঞান করতেন—স্ত্রীও কোনদিন তাঁর কাছে দেহসুখ কামনা করেননি। কিন্তু ডাক্তারি এবং সংসার কোন কিছুতেই তাঁর মন স্থির ভাবে বসল না।

বর্ষাকালে একদিন সারা রাত বৃষ্টি পড়ছে। রাত্রিতে দুজন অতিথি এসে উপস্থিত। চাল ফুটো, সব ঘরেই জল পড়ছে। শুধু শোবার ঘর ছাড়া। অতিথিদের সেই ঘরখানাই ছেড়ে দিয়ে নাগমশাই স্ত্রীকে নিয়ে বারান্দায় ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে ঠাকুরের নাম জপ করতে করতে রাতটা কাটিয়ে দিলেন।

দেওভোগের আশে-পাশে জলাভূমিতে অনেক পাখি ও বুনো হাঁস বাস করত। নারায়ণগঞ্জ থেকে জুটমিলের দুটি সাহেব এসেছে বন্দুক দিয়ে পাখি মারবে বলে। নাগমশাই ছুটে গিয়ে মিনতি জানালেন প্রাণিহত্যা থেকে বিরত হতে। পাগলের মতো বেশভূষা নাগমশাইকে সাহেবরা পাত্তা না দিয়ে বন্দুকে গুলি ভরে প্রস্তুত হল। তখন নাগমশাই ব্যাঘ্রবিক্রমে সাহেবদের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিলেন। তাঁর সাধকজীবনের পরিচয় পেয়ে সাহেবরা লজ্জিত হল।

এমনি ভাবে দিন কাটতে লাগল। একবার অর্ধোদয় যোগের সময় দুর্গাচরণের বাবা বললেন—'কত লোক কলকাতা যাচ্ছে, আমাকেও নিয়ে চল্!'

দুর্গাচরণের মাথায় যেন বাজ পড়ল। এত টাকা খরচ করে কলকাতায় যাতায়াতের সাধ্য তাঁদের নেই। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না। শুধু বললেন—'আচ্ছা, দেখা যাবে।'

এদিকে গঙ্গাস্নানের মাত্র দুদিন বাকি। বাবা হতাশ হয়ে পড়লেন।

স্নানের দিন দুর্গাচরণ বললেন—"বাবা, স্নান করবে এসো।" হাতে একটি কোদাল নিয়ে দুর্গাচরণ বাড়ির উঠোনে গর্ত করতে লাগলেন। হঠাৎ দেখা গেল কোথা থেকে প্রবল বেগে জল উঠোনের দিকে ছুটে আসছে। দেখতে দেখতে সেই জলে সারা উঠোন ভেসে গেল। আনন্দে দিশেহারা হয়ে দুর্গাচরণ বললেন—"মা গঙ্গা এসেছে, মা গঙ্গা এসেছে, এসো সবাই চান কর।"

খবর পেয়ে গ্রামের লোক জড় হল। সবাই মনের আনন্দে অর্ধোদয় যোগের পুণ্য লগ্নে গঙ্গাস্নান করল।

গৃহী হয়েও দুর্গাচরণ ছিলেন পরম সাধক। এজন্য সবাই তাঁকে বলত—সাধু নাগ মহাশয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি পূর্ববঙ্গে গেলে সাধু নাগ মশাইর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—এ যে একেবারে খাঁটী সোনা।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর বেলুড় মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসিভ্রাতাদের বলেছিলেন: 'ঈশ্বরকৃপায় মানুষের যে এমন উচ্চ অবস্থা হতে পারে তা একমাত্র নাগমশাইকে দেখে বুঝতে পারা যায়। কি ত্যাগে, কি ইন্দ্রিয়সংযমে ইনি আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।' ভক্ত গিরিশ ঘোষ বলতেন, 'ঠিক ঠিক দীনতা হলে, যথার্থ অহংবুদ্ধির উচ্ছেদ হলে, মানুষের নাগমশাইয়ের মতো অবস্থা হয়। এসব মহাপুরুষের পাদস্পর্শে ধরণী পবিত্র হয়।'

পিতার মৃত্যুর পর দুর্গাচরণের সংসারের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে ওঠে। ভিটামাটি বন্ধক রেখে মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করলেন।

১৩০৬ বঙ্গাব্দে (১৮৯৯ সালে) দুর্গাচরণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ব্যাধি দিন দিন বাড়তে লাগল। একদিন তিনি কালীপুজো করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ৯ই পৌষ শনিবার রাত্রে পুজো অনুষ্ঠিত হল। প্রতিমা বিসর্জনের পর দুর্গাচরণ বললেন "মা চলে গেলেন, আমারও এবার যাবার পালা।" ১৩ই পৌষ আটটায় তাঁর অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠল। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন—"ওরে, আমাকে রাম নাম শোনা। তোরা সবাই রাম নাম কর্।" ভক্তেরা রাম নাম করতে লাগল। মহাসাধক চলে গেলেন নিজের সাধন-ধামে।

গুরুনাথ



১২৫৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের (১৮৪৭ সালে) এক শুভ দিনে যশোহর জেলার বেন্দানিবাসী সাধু রামনাথের ঘরে এক শিশু ভূমিষ্ঠ হল। শিশুর নাম রাখা হল গুরুনাথ। অল্প বয়সেই বালক নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল।

[illegible] সাধক ভক্ত, তাই সেই গুণটি গুরুনাথের মধ্যেও বিকশিত হতে লাগল। ষোল বছর পার না হতেই দেবদেবীর সংগে কথা বলা ও সূক্ষ্ম জগৎ দর্শন করবার দুর্লভ ক্ষমতা তিনি লাভ করতে পারেন।

তখন ব্রাহ্মধর্ম দেশে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্যে প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। কলকাতায় এসে নর্মাল স্কুলে পড়াশোনার সময়েই গুরুনাথ সেই প্রচারের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। সাকার ঈশ্বরের উপাসনার প্রতি ধীরে ধীরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাকেই জীবনে ব্রতরূপে গ্রহণ করেন।

এই সময়ে মহিমচন্দ্র নামে তাঁর এক সংগী জোটেন। তাঁরা একসংগে জপ, তপ, সাধন ও ভজন করতে থাকেন। একদিন তাঁরা দুজনে শুনলেন আমেরিকায় স্পিরিচুয়ালিস্ট নামে একটি ধর্মসম্প্রদায় আছে। তাঁরা নাকি পরলোকগত আত্মাদের সংগে কথাবার্তা বলেন। একথা শুনে গুরুনাথ মৃত আত্মাদের সংগে কথা বলার জন্যে সাধনা শুরু করে দিলেন।

একদিন মহিমের দেহ আশ্রয় করে একজন পারলৌকিক আত্মার আবির্ভাব হল। আত্মাটি বলল—'আমি একজন ঈশ্বরাদিষ্ট পারলৌকিক আত্মা। আমি যা বলছি কাগজে লিখে রাখ এবং সেই মত কাজ কর।' তারপর গুরুনাথকে লক্ষ করে বলল—'আজ আমি যার দেহ আশ্রয় করেছি তাকে সাধকরূপে প্রস্তুত করে তুমি উত্তরসাধক হয়ে সত্যধর্ম আবিষ্কার কর এবং যারা এখানে আছ তারা সবাই এ কাজে সহায়তা কর। আমরা কয়েকজন ঈশ্বরাদিষ্ট পারলৌকিক আত্মা তোমাদের সাধনার মাত্রা যেদিন পূর্ণ হবে সেদিন আসব। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে যে বেশি উপযুক্ত তার দেহকে আশ্রয় করে এই ধর্মের সারতত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যাব।'

এইভাবে কয়েকজন ঈশ্বরাদিষ্ট আত্মার সাহায্যে সত্যধর্ম সম্বন্ধে যা কিছু জানবার তা গুরুনাথ জানতে লাগলেন। তাঁর দেখাদেখি মহিম ও কয়েকজন বন্ধুও তাই করতে লাগলেন। সাধনার কাজে তাঁরা যতই এগোতে লাগলেন ততই আত্মার উন্নতি সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলেন।

মন্ত্রসাধনা ও যোগসাধনাকে অনাবশ্যক জ্ঞানে পরিহার করে কেবল গুণসাধনাকে অবলম্বন করে এগিয়ে গিয়েছিলেন গুরুনাথ। রিপুগুলি একে একে বশীভূত হল। স্ত্রী ও বন্ধুদের প্রতি অভেদজ্ঞান সঞ্জাত হল, পশুপাখি ও কীটপতংগের উপর থেকে হিংসা দূর হল। এইভাবে প্রেম ভক্তি একাগ্রতা ও অভেদজ্ঞান সহযোগে সাধনা করতে করতে গুরুনাথ একদিন সহসা ব্রহ্মতেজ দর্শন করলেন। দেখলেন

আদিত্যবর্ণ এক মহামহিম পুরুষ তাঁকে আশ্বস্ত করে বলছেন শীঘ্রই তাঁর অভীষ্ট পূর্ণ হবে।

এই আশ্বাসও তৃপ্ত করতে পারল না গুরুনাথকে। ব্রহ্মের নিত্যদর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল হলেন তিনি। আরও কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন গুরুনাথ। এটাই সাধনজীবনের তৃতীয় বা শেষ স্তর। ব্রহ্মের প্রতি অভেদজ্ঞানে সফলকাম হলেন তিনি।

একের পর এক সাধনার নানা স্তর অতিক্রম করে গুরুনাথ পূর্ণসিদ্ধি লাভ করেন। ফলে তিনি বহু অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠেন। এই শক্তিবলে তিনি এক জায়গায় বসে দূরে কোথায় কী ঘটছে তা বলে দিতে পারতেন। দূরের শব্দও শুনতে পেতেন। জাতিস্মরের ক্ষমতা লাভ করেছিলেন গুরুনাথ। গত জন্মের কথা যেমন জানতে পারতেন, তেমনই ভবিষ্যতে কী হবে তাও জানতে পারতেন।

গুরুনাথের বয়স যখন কুড়ি, তখন পিতা রামনাথ তাঁর বিবাহ দিলেন বরিশাল জেলার গৈলানিবাসী রামচন্দ্র দাসের কন্যা আদরিণীর সঙ্গে। গুরুনাথ এই বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন এই ভেবে যে, গার্হস্থ্য আশ্রমে থেকেও সন্ন্যাসধর্ম পালন করা যায়। একদিন গৈলানিবাসী নিবারণ দাস মহাত্মা গুরুনাথের কাছে এসে দূরদর্শন জিনিসটি কী তা বুঝতে চান। মহাত্মা সে সময় ফরিদপুর জেলার সাতপাড় গ্রামে ছিলেন। তিনি গৈলায় দাসেদের বাড়িতে ঠিক সেই সময় কী কী হচ্ছে সব বুঝিয়ে দিলেন এবং সময়-ঘটনা সমস্ত কাগজে লিখে রাখতে বললেন। পরে নিবারণ দাস গৈলা গিয়ে কাগজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন সব ঠিক মিলে গিয়েছে।

মহাত্মা গুরুনাথের এই সব অলৌকিক শক্তির কথা চারদিকে ক্রমেই ছড়াতে থাকে। একদিন বেন্দাগ্রামের গোবিন্দ সেন গুরুনাথের কাছে উপস্থিত হয়ে মৃত আত্মা দেখতে চায়। গুরুনাথ বললেন—মৃত আত্মা দেখলেই তুমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।' লোকটি তবুও যখন মৃত আত্মা দেখবার জন্যে জেদ ধরল তখন তিনি বললেন—'আচ্ছা, তা হলে সেই আত্মাদের কী ক্ষমতা দেখ।'

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এক শূন্য ঘরে একটি ঘটি ঠনঠন শব্দে বাজতে লাগল। তা দেখে গোবিন্দ সেন ভয় পেয়ে গুরুনাথের কাছে সরে বসল।

গুরুনাথ ছিলেন প্রতিভাশালী ও পণ্ডিত। ১৮৬৭ সালে নর্মাল ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত ও দর্শনে তাঁর গভীর জ্ঞান দেখে তাঁকে মাত্র উনিশ বছর বয়সে কবিরত্ন উপাধি দেওয়া হয়। প্রথমে আহেরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে তিনি গণিত শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। পরে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য ও চরিত্রগত মহত্ত্বের গুণে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। বিভিন্ন কলেজ থেকে অধ্যাপনার কাজের ভার নেবার জন্যে তাঁর ডাক আসে। অনুরোধ এড়াতে না পেরে কিছুদিন অস্থায়িভাবে তিনি ডাফ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক রূপে কাজ করেন।

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই ধারণা তাঁর মনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাল্যকালেই কেমন করে গুরুনাথ বুঝেছিলেন এই জগৎসংসার অনিত্য এবং একমাত্র পরমাত্মাই নিত্য ও সারবস্তু। তিনিই হচ্ছেন একমাত্র পরমার্থ যেমন করে হোক তাঁর কাছে পৌঁছাতে হবে। গুরুনাথ ছিলেন সত্যধর্মের আদর্শানুসারী। যা অনন্তকাল বিদ্যমান ছিল, বর্তমানে আছে, চিরকাল থাকবে তাই হচ্ছে সত্যধর্ম। সত্যধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার নিরাকারবাদিতা। সাকার উপাসনা মতে ঈশ্বর জড় বস্তুজগতের সঙ্গে নিজের অংশকে যুক্ত করেছেন, অথচ নিজেকে নির্লিপ্ত পৃথক করে রেখেছেন। তাই যদি হয় তাহলে সাকার জড়বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। যিনি পরমপিতা অনাদি অনন্ত, তিনি কখনই কোন আকারবিশিষ্ট বস্তুর সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে থাকতে পারেন না। তাই সত্যধর্ম সাকার উপাসনার পক্ষপাতী নয়। সত্যধর্ম মতে কর্মযোগ অপেক্ষা ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ। কর্ম-গুণনিধি, আনন্দনিধি, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে হলে ভক্তিযোগ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

উত্তরকালে গুরুনাথ হয়ে উঠেছিলেন এক মুক্ত-পুরুষ মহাসাধক। ১৩২১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই মহাপুরুষ স্বেচ্ছায় মরদেহ ত্যাগ করেন।

সাঁইবাবা



আমেদাবাদ জেলার শিরডি গ্রামের এক মসজিদে আশ্রয় নিয়েছেন সাইবাবা। এই সাধকের কোথায় জন্ম এবং কে তাঁর মা-বাবা, তা জানবার কোন উপায় নেই। ভবঘুরে ফকিরের মতই তিনি একদিন শিরডি গ্রামের নিমগাছের তলায় এসে আশ্রয় নেন। তারপর গিয়ে ওঠেন মসজিদে।

মসজিদে রোজ গ্রামের মানুষেরা দল বেঁধে আসে, সাইবাবার মুখে ধর্মকথা ও গ্রামকথা শোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সঙ্গে থাকে গাঁজা তামাক। বড় বড় সাধকের অত্যাশ্চর্য সিদ্ধাইয়ের কাহিনী, বিখ্যাত ফকিরদের নানা কেরামতির কাহিনী বলতে বলতে সাইবাবা বিভোর হয়ে যান, গ্রামবাসীরা তন্ময় হয়ে তাই শোনে। রাত গভীর হয়। লণ্ঠনের তেল ফুরিয়ে যায়, আলো নিভে আসে। সাইবাবা উঠে গিয়ে খানিকটা জল ঢেলে দেন লণ্ঠনে, বাতি অমনি জ্বলে ওঠে। যতবারই আলো নিভে আসে, ততবারই লোটা থেকে জল ঢালেন সাইবাবা, অমনি আলো জ্বলে ওঠে। গ্রামবাসীরা ভেবে অবাক হয়ে যায়—কোন্ অলৌকিক শক্তিবলে জল এমন করে দাহ্যতেলে রূপান্তরিত হয়? নবীন সাধকের অদ্ভুত সিদ্ধাই দেখে মুগ্ধ হয় গ্রামবাসীরা।

সাইবাবার গুরুর নামও জানার উপায় নেই। তবে জানা যায় তাঁর ছদ্মনাম ছিল ভেনকুশ। অনেক কষ্ট সহ্য করার পর সাইবাবা গুরুদেবের করুণা পেয়েছিলেন। ভেনকুশের আশ্রমের কাছেই ছিল একটি কুয়ো। একদিন গুরুজী মোটা দড়ি দিয়ে তাঁর পা দুটি বেঁধে দিলেন, মাথা নিচের দিকে রইল। সেই ভাবেই কুয়োর মধ্যে তাঁর দেহটি নামিয়ে দিলেন। দড়ির একদিক কুয়োর পাশে এক গাছের ডালে বেঁধে রাখা হল। এই ভাবে সাইবাবাকে রেখে গুরুজী চলে গেলেন। ফিরে এলেন চার-পাঁচ ঘণ্টা পর। এসেই ডাকলেন—'কেমন আছিস?' সাইবাবা জবাব দিলেন—'গুরুজী, আপনার কৃপায় ভালই আছি।'

গুরুজী তাঁকে কুয়ো থেকে টেনে তুললেন। এইবার সাইবাবা লাভ করলেন গুরুর অসীম করুণা। তারপর একাদিক্রমে বার বৎসর গুরুদেবের আশ্রয়ে বাস করলেন। যোগ সাধনায় সিদ্ধি লাভ হল। ১৮৭২ সালে এই সাধকের যোগশক্তির মহিমা সকলেই জেনে গেল। হিন্দু মুসলমান সবাই ক্রমে ক্রমে সাইবাবার ভক্ত হতে লাগল।

এক কুষ্ঠরোগী সাইবাবাকে দর্শন করতে এসেছে। পরনে ময়লা কাপড়, হাতে পুঁটলী। সারা অঙ্গে পচা গলা ঘা, গায়ে দুর্গন্ধ। মিসেস ম্যানেজার্স নামে এক ভক্ত মহিলা ভাবছেন, কুষ্ঠরোগীটি যত শীঘ্র সেখান থেকে চলে যায় তত ভাল। সাইবাবা মনের টেলিপ্যাথি জানেন। লোকটি চলে গিয়েছিল, ডাকিয়ে আনালেন। বললেন, 'তোমার পুঁটলীর মধ্যে কী আছে বার কর।' বেরিয়ে পড়ল কয়েকটা পেঁড়া। একটি হাতে নিয়ে সাইবাবা মিসেস ম্যানেজার্সকে দিয়ে বললেন খেয়ে ফেলতে। আর একটি টুকরো তিনি নিজের মুখে ফেলে দিলেন। ভক্ত মহিলাটি বুঝলেন, এ আচরণের দ্বারা

সাইবাবা তাঁকে জীবে সমদর্শিতা ও সহনশীলতার শিক্ষা দিতে চেয়েছেন।

নাসিকে বাস করেন এক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ। জাত্যভিমান তাঁর বড় প্রবল। সাইবাবার এত নাম ও প্রতিষ্ঠা শুনে শিরডিতে এলেন।

ভোরে ঘুম থেকে উঠেই সাইবাবা তাঁর সেবকদের বললেন, 'ওরে তোরা শীগ্‌গির আমার কৌপীন আর বহির্বাস গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে দে।' একথা শুনে সকলেই অবাক। সাইবাবা তো কখনও গেরুয়া বসন পরেন না। আজ এই খেয়াল কেন? সেবকরা তাঁর কাপড় গৈরিক রঙে রাঙিয়ে দিল। সেটি পরে' সাইবাবা বললেন—'ওরে যা, নাসিক থেকে যে ব্রাহ্মণ পন্ডিতটি এসেছেন, তাঁকে ডেকে নিয়ে আয়। বাইরে তিনি অপেক্ষা করছেন।'

খবর দিতেই শাস্ত্রীজী এসে উপস্থিত হলেন। খুব সাবধানে তিনি চলতে লাগলেন যাতে কোন কিছুর ছোঁয়া না লাগে। এসে দাঁড়ালেন কিছুটা দূরে। কিন্তু কী আশ্চর্য! সাইবাবার দিকে তাকিয়েই শাস্ত্রীজী 'জয় গুরু' বলে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লেন। সাইবাবা বললেন—'দাও পন্ডিত, এবার আমার দক্ষিণা দাও।'

শাস্ত্রীজী ভক্তিভরে তাঁর চরণতলে প্রণামী রেখে বারবার প্রণাম করতে লাগলেন। পরে জানা গেল তিনি গৈরিকবেশধারী সাইবাবাকে নিজের গুরু ধোলাপ মহারাজরূপেই দর্শন করেছিলেন। তাছাড়া মহাপুরুষদের মধ্যে যে সত্যিকার কোন পার্থক্য নেই, আজ তিনি তা উপলব্ধি করলেন।

ভক্ত নানাসাহেব প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'আপনি যা কিছু অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন তা সবই তো আপনার অলৌকিক শক্তির প্রকাশ, তাই না?' সাইবাবা উত্তর দিয়েছিলেন, 'তা নয়, নানা। জ্যোতিষী যেমন আগে থেকেই আগামী ঘটনার কথা গণনা করে বলে দেয়, আমিও তেমনি ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকি। আমার কথা তোমরা অলৌকিক বাণী বলে মনে কর, কারণ তোমরা সব ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে আমার যোগবিভূতি খুঁজতে লেগে যাও, আমার পূজা শুরু কর। আমি কিন্তু তোমাদের এই পূজাকে এগিয়ে দিই ভগবানের দিকে, যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়।'

এই ছিল সাইবাবার জীবনদর্শন। ভক্তবৃন্দ ও দর্শনার্থীদের কাছে তিনি সর্বদাই ঈশ্বরের সর্বময়ত্ব ও সৃষ্টিলীলার রহস্যটি তুলে ধরতেন। বলতেন, 'ঈশ্বর সর্ব সৃষ্টির মূলে—তিনি ভগবান, আল্লা মালেক। সৃষ্টি তিনিই করেছেন, পালনও তিনি করছেন। ধ্বংসও করবেন তিনিই। তাঁর দুর্জ্ঞেয় লীলা বোঝা কার সাধ্য? তিনি যেভাবে আমাদের গড়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থেকে আমাদের সৎপথে পুণ্যপথে থেকে কর্তব্য করে যেতে হবে। আমাদের তো কোন নিজস্ব সত্তা নেই—সব কিছুর নিয়ামক ঈশ্বরই, তিনিই রঙ্গমঞ্চের পরিচালক। তাঁর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস রাখলেই কর্মবন্ধন থেকে ধীরে ধীরে মুক্তি পেয়ে আমাদের ভগবদ্দর্শন ঘটবে।'

সাইবাবা ছিলেন প্রেম, শান্তি ও ঐক্যবোধের প্রতীক স্বরূপ। তাই চারদিকের সম্প্রদায়িক কলহের মধ্যেও হিন্দু ও মুসলমান ভক্তেরা শান্তিতে শিরডিতে দিন কাটিয়েছে। সাইবাবার বাসস্থান ছিল মসজিদে, কিন্তু তিনি ঐটিকে দ্বারকামাঈ নামে অভিহিত করতেন। এক কোণে বেদীতে রাখা ছিল পবিত্র তুলসীর ঝাড়। বাবার সামনে পর্যায়ক্রমে সর্বদাই পাঠ করা হত হিন্দুর শাস্ত্র-গ্রন্থ ও মুসলমানদের কোরান।

মসজিদটি খুব জীর্ণ ও ভগ্ন অবস্থায় ছিল। একজন হিন্দু ভক্ত তার সংস্কারের জন্যে অনেকগুলি মূল্যবান পাথর কাজে লাগালেন। ঐ গ্রামেই একটি হিন্দুমন্দির ভগ্ন অবস্থায় ছিল, তারই মেরামতের জন্যে ঐ পাথরগুলি তিনি দান করে দিলেন। এবার হিন্দু মুসলমান সব মিলে মিলে টাকা সংগ্রহ করতে লাগলেন। সেই টাকায় মসজিদটি নতুন করে গড়ে তোলা হল।

১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে সাইবাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁরই নির্দেশে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তাঁকে রামবিজয় চম্পু পাঠ করে শোনান। সাইবাবা নীরবে শোনেন আর বলেন 'এ পাঠে মহাকল্যাণ হবে, মৃত্যুঞ্জয় শিব এতে প্রসন্ন হবেন।' শিরডির কাছেই বাস করেন এক শক্তিমান ফকির। সাইবাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এক সেবককে দিয়ে সাইবাবা সেই ফকিরকে বলে পাঠালেন—'এ দেহের আধারে আল্লা যে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবার তা তিনি ফিরিয়ে নেবেন।'

১৮ই অক্টোবর সাইবাবা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করে চলে গেলেন।

গম্ভীরনাথ



গোরক্ষপুরের প্রাচীন গোরক্ষনাথ মঠ নাথযোগী সম্প্রদায়ের এক পরম পবিত্র সাধনক্ষেত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মঠের মোহান্ত গোপালনাথজীর খ্যাতি তখন সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত।

একদিন এক সুদর্শন যুবক সেই মঠে এল। পরনে দামী পোশাক, দেখে মনে হয় বড়লোকের ছেলে। মঠ দেখতে এসেছে, কিছুক্ষণ পরেই চলে যাবে। কিন্তু কিসের আকর্ষণে সে বাঁধা পড়ল কে জানে? গোপালনাথজীর চরণে সে আত্মসমর্পণ করল। দীক্ষাদানের পর যুবকের নামকরণ হল গম্ভীরনাথ।

কাশ্মীর-জম্মুর এক ক্ষুদ্র গ্রামে ছিল যুবকের বাড়ি। সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। বিদ্যাচর্চার এবং সঙ্গীতচর্চার সুযোগ তার জীবনে ভালই ঘটেছিল। কিন্তু সব কিছু ফেলে যুবক হল সন্ন্যাসী।

মঠের দৈনন্দিন কাজে গম্ভীরনাথের প্রাণঢালা নিষ্ঠা দেখে সবাই মুগ্ধ। নাথযোগীদের সাম্প্রদায়িক রীতি অনুযায়ী সাধকদের শেষ আনুষ্ঠানিক কাজ হচ্ছে কর্ণবেধ। যোগীশ্বর মহাদেবের প্রতীকরূপে গুরু শিষ্যের কানে ছিদ্র করে তাতে দুটি কুণ্ডল বা দর্শনী পরিয়ে দেন। সে জন্য পশ্চিমাঞ্চলে এই সাধুরা 'কানফাটা যোগী' নামেও পরিচিত। গুরু গোপালনাথের ব্যবস্থাক্রমে যুবক গম্ভীরনাথের কর্ণবেধ দীক্ষা সম্পন্ন হল।

গম্ভীরনাথ তিন বছর গুরুর সান্নিধ্যে বাস করবার পর সুদূর নির্জন স্থানে গিয়ে সাধনায় ব্রতী হতে চাইলেন। গুরুর অনুমতি নিয়ে গম্ভীরনাথ যাত্রা করলেন দাক্ষিণাত্যের দিকে। শুধু একখানি কৌপীন ও কম্বলমাত্র সম্বল। পথ চলতে চলতে গম্ভীরনাথ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। এমন সময় দেখলেন একটি লোক তার দিকে ছুটে আসছে। লোকটি কাছে এসে বলল—'গতকাল রাত্রে শ্রীনাথজী আমাকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন, এখানে এক শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত পরিব্রাজকের আগমন হবে, তুমি তাঁর ভোজন ও সেবাযত্নের ব্যবস্থা করবে।'

খাদ্য ও সেবাযত্ন পেয়ে গম্ভীরনাথ সুস্থ হলেন। কাশীতে পৌঁছে গঙ্গার তীরে একটি নির্জন স্থান বেছে নিলেন যোগসাধনার জন্যে। ক্রমাগত তিন বছর সাধনার পর অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করলেন। তারপর তিনি গেলেন প্রয়াগ ধামে। সেখানে ঝুসি সৈকতের বালির গুহায় কঠোর সাধনা করলেন তিন বছর।

এর পর গম্ভীরনাথ আবার পরিক্রমায় ব্রতী হলেন। গয়ার কাছেই ব্রহ্মযোনি পাহাড়। ঐ পাহাড়ের সানুদেশে আছে কপিলধারা নামে এক মনোরম নির্জন স্থান। যোগিবর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার জন্যে সেখানেই আসন পেতে বসলেন।

যোগিবরের কাছে নানা গূঢ় সাধন লাভে ধন্য হয়েছিলেন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। এই দুই মহাসাধকের মিলনের আলেখ্যটি বড়ই মধুর। শ্বাপদ-সংকুল গয়ার পাহাড়ে নির্জন কপিলধারার চূড়ায় বসে গম্ভীরনাথজী গভীর রাতে সেতার বাজিয়ে মিষ্টিসুরে

করলেন বিজয়কৃষ্ণ। মোহন্ত উত্তর দিলেন, একদিন অতিথির ভোজনের পূর্বেই তিনি আহার করেছিলেন বলে গুরুদেব তাঁকে চামার বলেছিলেন। গুরুবাক্য যাতে মিথ্যা না হয় সেজন্য সেদিন থেকে তিনি চামারি করে জীবিকানির্বাহ করেন। গুরুদেব সন্তুষ্ট হয়ে এই আখড়ার ভার তাঁরই হাতে সঁপে দিয়ে চলে গিয়েছেন।

দীনহীন কাঙালের অন্তরেও যে ভগবানের অধিষ্ঠান—এ সত্য উপলব্ধি করলেন বিজয়কৃষ্ণ।

এর পর নানা জায়গায় ঘুরে তিনি কাশী এলেন। সেখানে দেখা করলেন ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে।

সেখান থেকে গোস্বামী এসে গয়ার কাছে 'আকাশ-গঙ্গা' আশ্রমে বাস করেন। এখানেই পরমহংস ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হল। তিনি বিজয়কৃষ্ণকে দীক্ষা দিলেন। পরামর্শ দিলেন কাশীতে গিয়ে হরিহরানন্দের কাছে সন্ন্যাস নিতে।

বিজয়কৃষ্ণ তাই করলেন। পরে ঢাকা জেলার গেণ্ডারিয়া গ্রামে গিয়ে এক বটগাছের তলায় আসন স্থাপন করে উপাসনা আরম্ভ করলেন। ক্রমশঃই তাঁর দেহে পঞ্চতপার লক্ষণ দেখা দিল। দেহের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠাকেই পঞ্চতপার লক্ষণ বলে। পূর্ব-পূর্ব জন্মের পাপ ঐ আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়। সাধকের জীবনে এ এক দারুণ পরীক্ষা। একদিন গেণ্ডারিয়া গ্রামে তাঁর ব্রহ্মদর্শন হয়। এতদিনে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন।

বিজয়কৃষ্ণ ঢাকায় বহুদিন ছিলেন। পশ্চিমে অনেক তীর্থ ভ্রমণের পর কলকাতায় এসে একদিন (১৮৮৫ সাল) শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে এসেছেন। বললেন, 'দেখছি, যেখানে এখন বসে আছি, এখানেই সব, কেবল মিছে ঘোরা।' এই বলে রামকৃষ্ণের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন ও নিজের বুকে তাঁর চরণ ধারণ করলেন। ঠাকুরও বলেছিলেন, 'ওই (সমাধিস্থ) অবস্থায় ভাবে বিজয়ের বুকে পা দিলুম; এদিকে তো বিজয়কে এত ভক্তি করি, সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম।... (বিজয়) দ্বারে ঘা দিচ্ছে।'

এই সময় একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ। মহর্ষি তাঁকে বলেছিলেন, 'প্রকৃত সত্যবস্তু বা ষোলআনা ধর্ম লাভ করতে গেলে জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা এবং সাধন—এই চারটি একসঙ্গে থাকা চাই। তোমার মধ্যে এই চারটি যথার্থ রয়েছে। তুমি ধন্য। আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি. তোমার জয় হোক।'

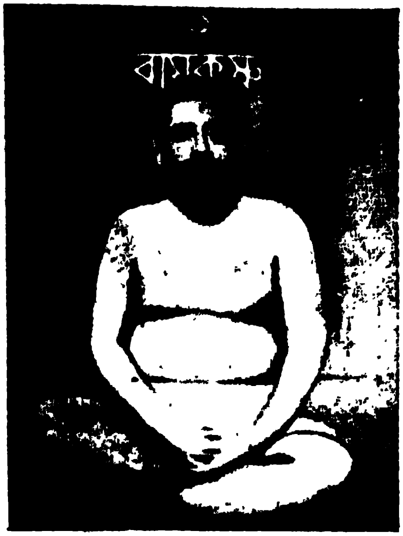
এবার গুরুদেব পরমহংস ব্রহ্মানন্দজীর নির্দেশে বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন বিজয়কৃষ্ণ। বৃন্দাবনে এসে তাঁর ভাবতন্ময়তা বাঁধভাঙা বন্যার আকার ধারণ করে। এই সময় তাঁর পত্নী যোগমায়াদেবী বৃন্দাবনে এসে কিছুকাল স্বামিগৃহে বাস করেন। এই নিয়ে নিন্দকমহলে কিছু সমালোচনা হলেও বিজয়কৃষ্ণ প্রকৃত গৃহীযোগীরূপে শুচিতার আদর্শ স্থাপন করেন। বৃন্দাবনেই দেহত্যাগ করেন যোগমায়া। এরপর কলকাতায় ফিরে এসে বিজয়কৃষ্ণ চৈতন্যদেবের লীলাভূমি নীলাচলধামে যাবার মনস্থ করলেন। তাঁর বিদায়গ্রহণের লগ্নে চোখ পড়ল দ্বারপ্রান্তে এক মেথরের প্রতি। মেথরটি সসংকোচে জোড়হস্ত দাঁড়িয়ে আছে ভক্তদের পিছনে। দেখতে পেয়ে প্রভুপাদ ছুটে গিয়ে মেথরকে প্রণাম করে তার কাছে আশীর্বাদ চাইলেন বিদায়বেলায়। আনন্দে বিস্ময়ে মেথর রুদ্ধবাক। এত বড় বিনয় ও দীনতা খুব কম সাধকের জীবনেই দেখা গিয়েছে।

তখন পুরীতে শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের একটি মঠ ছিল। বহু বাঙালী রাজকর্মচারী সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ পুরীতে যাওয়ার পর তাঁরা মঠের মোহান্তকে ত্যাগ করে বিজয়কৃষ্ণের কাছে আসা-যাওয়া শুরু করলেন। এতে মোহান্তবাবার গোস্বামীজীর ওপর ভয়ানক রাগ হল। এই মোহান্তবাবা পাণ্ডাদের সঙ্গে মিলে প্রভুপাদকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলেন। তীব্র বিষ দিয়ে তাঁরা মিষ্টান্ন তৈরি করে একজন সাধুর হাতে তা পাঠিয়ে দিলেন। সাধু বললেন—'এই মিষ্টান্ন মহাপ্রসাদ, গ্রহণ করুন।' ঐ মিষ্টান্নে বিষ মেশানো আছে তা প্রভুপাদ জানতে পারলেন। তবু তা মহাপ্রসাদ; তাই ভক্ষণ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিষের ক্রিয়া শুরু হল। দিন দিন বিজয়কৃষ্ণ দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। ১৩০৬ সনের (১৮৯৯ সালের) ২২শে জ্যৈষ্ঠ সকাল থেকে সমাধিস্থ থাকার পর রাত্রে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। শিষ্যদের অনেক উপদেশ দেওয়ার পর তিনি অমরধামে মহাপ্রয়াণ করলেন।





রামচন্দ্র দত্ত



মেয়ের অসুখ। নিজে ডাক্তার, তাই চিকিৎসার ত্রুটি হল না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও মেয়েটি মারা গেল। মনে ভয়ানক শোক পেলেন রামচন্দ্র দত্ত।

সারাজীবন বিদেশী অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ও বিজ্ঞানের চর্চা করে ডাক্তার রামচন্দ্র ঘোর নাস্তিক হয়ে উঠেছেন। কন্যার মৃত্যুর ব্যাপারে দোষ দেবেন কাকে—ভগবানকে না নিজেকে? ঈশ্বর কি আছেন? তাঁকে কি দেখা যায়? নিজের কাছে প্রশ্ন করেন, প্রশ্ন করেন বন্ধু-বান্ধবকে। কিন্তু মনের শান্তি কিছুতেই হয় না।

মনের এই অবস্থায় ১৮৭৯ সালের ১৩ই নভেম্বর গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। সংগে মাসতুতো ভাই মনোমোহন মিত্র। রামচন্দ্রকে দেখে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—'হ্যাঁগা, তুমি নাকি ডাক্তার? আমার হাতটা দেখ না।'

চমকে উঠলেন রামচন্দ্র। লোকটি সর্বজ্ঞ নাকি? কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন—'ঈশ্বর আছেন কি? কী করে দেখা যায় তাঁকে?'

পরমহংসদেব বললেন—'দিনে তারা দেখা যায় না, সেজন্য কি তারা নেই বলব? দুধ থেকে মাখন হয়, কিন্তু দুধ দেখে কি মাখনের কোন জ্ঞান জন্মে? সাধুজনের কথা বিশ্বাস করতে হয়, সাধনা করতে হয়, তবে দেখা যায়।'

প্রথম দর্শনেই রামচন্দ্র অত্যন্ত আকৃষ্ট হলেন, তারপর প্রত্যেক রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে যেতে আরম্ভ করলেন। সেখানে গেলে আর বাড়ি ফিরতে মন চাইত না।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রামচন্দ্রের জন্ম। পিতা নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত একজন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। রামচন্দ্রের আড়াই বছর বয়সের সময় জননী তুলসীমণির মৃত্যু হয়।

রামচন্দ্র প্রথমে নারিকেলডাঙ্গা স্কুলে পড়েন এবং পরে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল (বর্তমান নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) থেকে ডাক্তারি পাস করেন। পৈতৃক বাটি বিক্রয় হলে মধ্য-কলকাতায় শিমুলিয়ায় এসে বাস করতে থাকেন। রামচন্দ্রের বাড়ির সকলে নিরামিষাশী ছিলেন। এক সময় তাঁর স্ত্রী এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসক রোগিণীকে মাংসের সুপ খেতে ব্যবস্থা দেন। রামচন্দ্র বলেছিলেন—'আমরা বৈষ্ণব, মাংস এখানে হবে না। স্ত্রীবিয়োগ হয় তো হোক তাতে ক্ষতি নেই।'

সে যাত্রা মাংসের সুপ না খেয়ে স্ত্রী রোগমুক্ত হন। সেকালে ইংরেজী-পড়া একজন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার যে মাংস খেতেন না, এটা বাস্তবিক এক আশ্চর্য ব্যাপার ছিল।

এক রাত্রিতে রামচন্দ্র স্বপ্ন দেখেন যে তিনি এক পুকুর থেকে স্নান করে উঠলেন এবং পরমহংসদেব এসে তাঁকে মন্ত্র দিয়ে জপ করতে বললেন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তিনি সোজা দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরকে এ কথা বললেন। সেদিন ঠাকুরের কাছ থেকে ফিরতে রাত প্রায় দশটা বেজে গেল। বিদায় নিয়ে ঠাকুরের ঘর থেকে যেমন বেরিয়েছেন অমনি ঠাকুর এসে বললেন—'কী চাও?' রামচন্দ্র করজোড়ে নিবেদন করলেন—'কী চাইব তা আপনি বলে দিন।'

রামকৃষ্ণ বললেন—'তুমি স্বপ্নে যে মন্ত্র পেয়েছ তা

ফিরিয়ে দাও। আজ থেকে তোমার সাধন ভজন সব শেষ। কিছু দেখবার ইচ্ছা হয়, আমাকে দেখ।'

এই ঘটনার পর থেকে রামচন্দ্রের মনের সমস্ত গ্লানি ও অশান্তি দূর হয়ে যায় এবং রামকৃষ্ণকে অবতার বলে মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়। রামচন্দ্র দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রসাদ এনে বাড়িতে রাখতেন এবং রোজ স্নানান্তে একটু মুখে দিয়ে পরে আহারে বসতেন। তিনি লিখেছেন, 'রবিবার সন্ধ্যার সময় যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতাম, তখন ঠাকুরের কথামৃত পান করিয়া আমরা একবারে আনন্দে বিভোর হইতাম—ইচ্ছা হইত না যে, গৃহে ফিরিয়া আসি। সংসারকে তখন সংসার বলিয়া বোধ হইত না। তখন আমরা প্রাণের ভাবে প্রায়ই গান করিতাম—

গৃহে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর
ইচ্ছা হয় ঐ চরণতলে পড়ে থাকি অনিবার।'

রাম দত্তের মনের অশান্তি তখন কিছুতেই দূর হচ্ছে না। ঠাকুরের কাছে এসে কেবলই আক্ষেপ করেন, "আমার কিছু হল না।" ঠাকুর গম্ভীরভাবে বললেন, "আমি কারও খাইও না, নিইও না—তোমাদের এখানে আসতে ইচ্ছা হয় এসো, না হয় এসো না।" কী নিদারুণ উপেক্ষা! কিন্তু মহাসাধকেরা এইভাবেই অশান্তমনা ভক্তদের চিত্তপরিশুদ্ধি ঘটান। রামচন্দ্র রাত্রে ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় শুয়ে নামজপ করছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং এসে মধুর সান্ত্বনাবাক্যে তাঁর মনের খেদ দূর করেন।

রামচন্দ্র তাঁর শিমুলিয়াস্থ মধু রায়ের গলির বাড়িতে রোজ সন্ধ্যায় কীর্তন করতেন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত তা চলত। কথামৃতকার শ্রীম লিখেছেন, 'এ স্থানে ঠাকুর কয়েকবার শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাই ভক্তদের কাছে এটি আজ মহাতীর্থস্থান। রামচন্দ্র শ্রীগুরুর করুণাবলে বিদ্যার সংসার করিতে চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর দশমুখে রামের সুখ্যাতি করিতেন—বলিতেন, রাম বাড়িতে ভক্তদের স্থান দেয়, কত সেবা করে, তার বাড়ি ভক্তদের একটি আড্ডা।' এতে প্রতিবেশীদের নিদ্রার ব্যাঘাত হত, এজন্য তিনি ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে মাণিকতলায় কাঁকুরগাছিতে একটি বাগান কিনেছিলেন। বাগানটি যোগোদ্যান নামে পরিচিত। রামকৃষ্ণদেব এখানে আসতেন। ঠাকুর রামচন্দ্রকে 'ক্যাপ্টেন' বলতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তাঁর কিছু অস্থিভস্ম এই বাগানে সমাহিত করা হয়। তাই পরবর্তীকালে রাস্তাটির নাম হয় রামকৃষ্ণ সমাধি রোড।

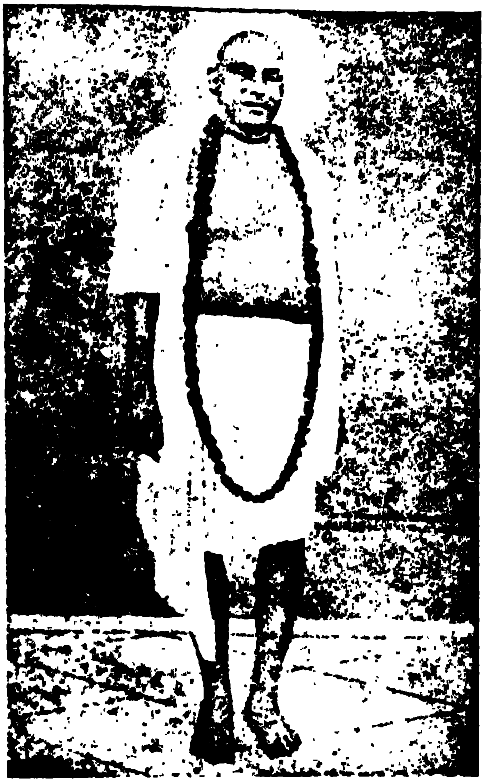
সাধক রামচন্দ্র শেষ জীবনে এই যোগোদ্যানে এসে বাস করেন। বাগানের মধ্যে যে পুকুরটি আছে—যার জল ঠাকুর ব্যবহার করতেন— সেটিকে রামচন্দ্র 'রামকৃষ্ণ কুণ্ড' নামে অভিহিত করেন। রামচন্দ্র এই জলকে গঙ্গাজলের চেয়েও পবিত্র মনে করতেন। তিনি কোন পূজা পার্বণে বা যোগাদি উপলক্ষ্যে গঙ্গাস্নানে যেতেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এই পরমভক্তসাধকের এক সুন্দর সাক্ষাৎকার-সন্ধ্যার বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা গ্রন্থে: "এক সন্ধ্যায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া একদৃষ্টে ঠাকুরকে দেখিতে থাকিলে ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, 'কী দেখছ?' রামবাবু বলিলেন, 'আপনাকে।' আবার প্রশ্ন হইল, 'আমাকে তোমার কী মনে হয়?' রামবাবু বলিলেন, 'আপনাকে আমার চৈতন্যদেব বলে মনে হয়।' তিনি তখন চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেন। উত্তর শ্রবণে ঠাকুর একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'বামনীও (ভৈরবী ব্রাহ্মণী) ঐ কথা বলত বটে।' এই বিশ্বাস রামচন্দ্রের মনে এতই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, একদিন গিরিশচন্দ্রকে ধরিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 'গিরিশ দাদা, বুঝেছ কি? এবারে একে তিন—গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এই তিনের সমষ্টি পরমহংসদেব; একাধারে প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান।'"

রামচন্দ্র ঐশী শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হবার পরও মুখমণ্ডল প্রফুল্ল ও প্রশান্ত দেখা গিয়েছিল। মহাকবি গিরিশচন্দ্র রামচন্দ্রের দেহান্তে একদিন স্বপ্ন দেখতে পান তাঁর সামনে সেই সাধকপ্রবর দাঁড়িয়ে আছেন। দেহ তাঁর তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, শরীর অনাবৃত, পরনে সাদা ধুতি। গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন 'রামচন্দ্র, কী কর এখন?' উত্তর পেলেন,—'যা করতাম, তাই করি। প্রভুর সেবা করি।'

দেহত্যাগের পূর্বে রামচন্দ্র শিষ্যদের বলেছিলেন—'আমি মরলে আমার ভস্ম যোগোদ্যানের প্রবেশদ্বারে পুঁতে রেখো। যে আসবে সে আমার মাথার ওপর দিয়ে আসবে। এতে চিরদিন আমি ভক্ত-পদধূলি পাব!'

চরণদাস বাবাজী



যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার গ্রাম মহিষখোলা। সেই গ্রামের বর্ধিষ্ণু কায়স্থবংশে ১২৬০ বঙ্গাব্দের ১৯শে চৈত্র (১৮৫৩ সাল) রাইচরণের জন্ম। তাঁর পাঁচ বছর বয়সের সময়েই বাবা মোহনচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হয়। মা কনকসুন্দরী। পর পর দুটি সন্তানের মৃত্যুর পর পরম স্নেহে ছেলেকে বেঁধে রাখেন। যৌবনে রাইচরণের বিবাহ হল। কিন্তু তাঁর দুটি পুত্রের মৃত্যুতে সংসারে শোকের ছায়া নেমে আসে। বংশরক্ষার জন্যে রাইচরণকে আরও দুটি বিয়ে করতে হয়েছিল।

যশোহরের জমিদার গোসাইবাবুদের ডাকসাইটে কর্মচারী রাইচরণ ঘোষ। যেমন জবরদস্ত চেহারা, তেমনি তেজ। ভাল বন্দুক চালাতে পারেন।

একবার প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তারা কিছুতেই খেতের ধান জমিদারকে দেবে না। জমিদারের নির্দেশে রাইচরণ বরকন্দাজদল সঙ্গে নিয়ে বন্দুক হাতে এগিয়ে গেলেন। প্রজারা ভয়ে পালিয়ে গেল। জমি থেকে ধান কেটে এনে স্তূপ করা হল কাছারি-বাড়ির প্রাঙ্গণে। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে রাইচরণবাবুর মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। ভাবলেন—হায়, আমি এ কী করলাম! দরিদ্র প্রজাদের মুখের গ্রাস কেড়ে আনলাম?

এদিকে দুপুরে আহার্য প্রস্তুত, স্নান করে তিনি আহারে বসবেন। কিন্তু খাওয়া আর হল না। সেইদিনই তিনি সংসার ত্যাগ করলেন।

উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত শক্তিপীঠ ভবানীপুরে গিয়ে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে রাইচরণ সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। অল্পদিনের সাধনাতেই ইষ্টদেবীর কৃপালাভ হল। মহামায়া তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন—'বৎস, তুমি সরযূতীরে যাও। সেখানেই তোমার অধ্যাত্ম জীবনের গুরু তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

রাইচরণ ভক্তিভরে ইষ্টনাম জপ করতে করতে অযোধ্যায় সরযূতীরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল এক প্রিয়দর্শন বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর দিকে। রাইচরণকে দেখেই সন্ন্যাসী বললেন—'এস বাবা, তোমার জন্যেই যে আমি অপেক্ষা করে আছি।' রাইচরণ বুঝলেন, ইনি মহামায়ার নির্দেশিত সেই মহাপুরুষ।

দীক্ষা গ্রহণের কিছুদিন পর গুরুদেব তাঁকে বললেন—'বাবা চরণদাস, এবার তুমি নামপ্রচারে বেরিয়ে পড়। আমি আশীর্বাদ করছি, বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহ তোমার অধিগত হবে। স্বয়ং মহাপ্রভু তোমার অন্তরে উদিত হয়ে তোমাকে সাহায্য করবেন।'

চরণদাস উত্তর ভারতের বহু তীর্থ দর্শন করবার পর শ্রীধাম নবদ্বীপে এসে পৌঁছলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতি-মাথা পবিত্র স্থানগুলি দর্শন করে তাঁর অন্তরে অপূর্ব পুলকের সঞ্চার হল। ভক্তদের নিয়ে চারণদল গঠন করে ভাবে মাতোয়ারা হয়ে গৌরাঙ্গকীর্তন করে চলেন অহোরাত্র।

সঙ্গিগণ সহ চরণদাসজী একবার শ্রীপাট কালনায় এলেন। সেখানেও তাঁর নামকীর্তন চলতে লাগল। একটি পাঁচ বছরের শিশু নামকীর্তনের তালে তালে নাচতে নাচতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। তারপর ভাবাবেশে বলতে লাগল—'ওগো, তোমরা আর এখানে দেরি করো না, এখুনি নীলাচলের পথে যাত্রা কর।'

এই অলৌকিক ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে ভেবে চরণদাস সেই দিনই কয়েকজন ভক্তসহ পুরীধামের পথে যাত্রা করলেন। পদব্রজে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে তাঁরা সাক্ষীগোপাল-এ পৌঁছলেন। রাত্রিতে আশ্রয় নিলেন মন্দির-চত্বরের কোণে। ঘুমন্ত অবস্থায় চরণদাসজী এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখলেন। শিয়রে তাঁর দুজন দেবতুল্য পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। একজনের গায়ের রং কাঁচা সোনার মতো, দ্বিতীয়জনের গায়ের রং তুষারের মতো শুভ্র। দ্বিতীয় পুরুষটি বললেন—'বাবা, তোমাকে এক নিগূঢ় মন্ত্র দিচ্ছি। নিষ্ঠা সহকারে তুমি এটি জপ করবে। এই মন্ত্র বিতরণ করবার অধিকারও তোমার রইল।'

বারোটি অক্ষরযুক্ত এক গৌরমন্ত্র দান করে পুরুষ-দুটি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। চরণদাস জেগে উঠে আনন্দে চিৎকার করতে লাগলেন—'ওরে তোরা সব ওঠ্। প্রভু নিতাইচাঁদ এখানে এসে আমাকে কৃপা করে গেলেন।'

নীলাচলধামে যাওয়ার পর চরণদাসের ভক্ত সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল। পুরীর রথযাত্রাকে উপলক্ষ করে বাবাজীর সুনিবিড় কৃষ্ণভক্তি অলৌকিক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হত। দারুব্রহ্ম রথে আরোহণ করলেই চরণদাস সাঙ্গোপাঙ্গ সহ উল্লাসে কীর্তন করতে করতে রাজপথে চলতে থাকেন। স্বরচিত কীর্তন তাঁর কণ্ঠে গুঞ্জরিত—

আসিছে কালিয়া হেলিয়া দুলিয়া রসময় গুণধাম
চরণে নূপুর বাজিছে মধুর নবীন নাটুয়া ঠাম।
কটিতে কিঙ্কিনী বাজে কিনিকিনি পীতবাস পরিধান
গলে বনমালা করিয়াছে আলা রসিক নাগর কাহ্নু।

কৃষ্ণনগর থেকে দিগনগর গ্রামে এসেছেন চরণদাসজী। বটবৃক্ষের তলে হিন্দুরা পূজো দেয়, স্থানীয় মুসলমানেরা সেই গাছের শাখা কেটে ফেলে অবিশ্বাসভরে। চরণদাসজী তাঁর নামকীর্তনের দল নিয়ে মুসলমান-পল্লীর মোড়ল হারু মণ্ডলের বাড়ি গেলেন। কীর্তনের প্রভাবে হারু মণ্ডলও প্রেমানন্দে নাচতে শুরু করল। সবাইকে নিয়ে বাবাজী বটবৃক্ষতলে এসে নৃত্যগীত করতে লাগলেন। গাছের ডালপালাও ছন্দে ছন্দে নাচতে লাগল। মুসলমান গ্রামবাসীরা বটবৃক্ষতলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করল।

একবার কলকাতায় থাকাকালে গিরিশ ঘোষের আমন্ত্রণে চরণদাস বাবাজী স্টার থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখতে যান। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে সে কী আনন্দ-শিহরণ, কী ভক্তির লাবণ্য! তারপর যে দৃশ্যে মাধাই কলসির কানা ছুঁড়ে মেরেছে, রাজপথে নিতাই মাথায় হাত দিয়ে রক্তস্রোত বন্ধ করছেন অথচ গৌরপ্রেমে গর্গর মাতোয়ারা, সেই দৃশ্যে নিতাই গান ধরেছেন—

প্রাণ ভরে আয় হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই।
মেরেছ বেশ করেছ, হরি বলে নাচ ভাই॥

এই অভিনয় দেখে প্রেক্ষাগৃহে চরণদাস অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। সম্বিৎহারা হয়ে বাবাজী মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁকে তুলে বসালেন। বললেন, 'নাটকটি লিখে আমার গর্ব ছিল। আপনার কৃপাসঙ্গ পেয়ে আজ দেখছি, আমি এর কিছুই বুঝতে পারিনি।'

যখন তিরোধানের সময় হয়ে আসে তার কিছুদিন আগে থেকেই চরণদাস বাবাজী কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো হয়ে গেলেন। ভক্ত দর্শনার্থীদের সোনার ঘড়ি, চেন, আংটি প্রভৃতি মূল্যবান্ জিনিস নিকটস্থ পুকুরে ফেলে দিতে লাগলেন।

কয়েকজন ভক্ত এতে ক্ষুব্ধ হন। তখন চরণদাস পুকুরে এক ঝাঁপ দিয়ে তৎক্ষণাৎ সবগুলি জিনিস এক সঙ্গে তুলে আনলেন। ব্যাপার দেখে সকলে অবাক্।

একদিন এক ভক্ত বড় বড় অক্ষরে কৃষ্ণনাম-ছাপানো কতকগুলি কাগজ নিয়ে এলেন। চরণদাস তখনই সেগুলি পুকুরের জলে ডুবিয়ে দিলেন। অন্য একজন ভক্ত তা দেখে বললেন—'বাবা, আপনি নাম-মাহাত্ম্যের শ্রেষ্ঠ প্রচারক, আর আপনিই কিনা এই নামকে জলে ডুবিয়ে দিলেন!' চরণদাস হেসে বললেন—'নাম চিন্ময়, সে কি কখনও ডুবতে পারে!' পরদিন সেই শিষ্যটিকে পুকুরপাড়ে দেখে আসবার জন্যে বললেন। শিষ্যটি গিয়ে দেখে সবগুলি কাগজ জলে ভেসে উঠেছে।

সজ্ঞানে এই মহাপুরুষ ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

সারদামণি দেবী



১৮৭২ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় কলকাতায় গঙ্গাতীরে গঙ্গাস্নানের উৎসব। গ্রামের অনেকেই সেই স্নানে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। সারদামণিও গঙ্গাস্নানে যেতে চাইলেন। পিতা রামচন্দ্র কন্যার মনোভাব বুঝতে পারলেন। মেয়ে এখন অষ্টাদশী যুবতী, তাকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাওয়াও একান্ত প্রয়োজন। তিনি তখন নিজেই সহযাত্রী হয়ে সকলকে সঙ্গে নিয়ে পদব্রজে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলেন। দু-তিন দিন পথ চলবার পর পথশ্রমে ও কষ্টে সারদামণির প্রবল জ্বর হল। বাবা অসুস্থা মেয়েকে নিয়ে একটি চটিতে আশ্রয় নিলেন। জ্বরে সারদামণি যখন একেবারে বেহুঁশ, তখন একটি রমণী এসে তাঁর পাশে বসল। মেয়েটির রং কালো, কিন্তু অপরূপ তার রূপলাবণ্য। সারদার গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল রমণী। পরদিন সকালে সারদামণি দেখলেন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বুঝতে বাকি রইল না, মা কালীই ছদ্মবেশে তাঁর কাছে এসেছিলেন।

সারদামণি দক্ষিণেশ্বরে এলেন। এখন তাঁর সংযমের পরীক্ষা। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় এই আগমন ঘটেছে: তাই পরবর্তী আঠারো মাস রামকৃষ্ণ ও সারদা ঘনিষ্ঠভাবে এক ঘরে বাস করেছেন, কিন্তু কখনও সংযম ছিন্ন হয়নি। সারদাদেবী বলতেন যে, তখনকার দিনগুলি ছিল অবিচ্ছিন্ন আনন্দ আর সুখের দিন। কামগন্ধহীন বিবাহিত জীবনের পরিপূর্ণ তৃপ্তির দিন। সারদাদেবী সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—'ও যদি এত ভালো না হত, তা হলে সংযমের বাঁধ ভেঙে আমার দেহবুদ্ধি আসত কি-না, কে বলতে পারে? বিয়ের পর মাকে ব্যাকুল হয়ে বলেছিলাম, যেন সারদার ভেতর থেকে কামভাব এককালে দূর হয়ে যায়। এখন ওর সঙ্গে একত্রে বাস করে বুঝেছি যে, মা আমার প্রার্থনা শুনেছেন।' একদিন সারদাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি তোমার কে?' রামকৃষ্ণ জবাব দিলেন, 'তুমি আমার আনন্দময়ী।'

গদাধর তখনও ঠাকুর রামকৃষ্ণরূপে পরিচিত হননি। জননী চন্দ্রমণি দেবী ছেলের বিবাহের জন্য পাত্রী খুঁজতে লাগলেন। গদাধর বললেন—'আমার জন্যে পাত্রী খোঁজাখুঁজি কী করছ মা? আমার তো কুটাবাধা হয়ে আছে জয়রামবাটিতে রাম মুখুজ্যের বাড়িতে!'

চন্দ্রমণি দেবী জয়রামবাটিতে খোঁজ করে সারদামণির সন্ধান পেলেন। কিন্তু তাঁর বয়স তখন ছয় বছরও পূর্ণ হয়নি। ১৮৫৯ সালের মে মাসে গদাধরের সঙ্গে সারদামণির বিবাহ সম্পন্ন হল। বিবাহের পর বছর দেড়েক কামারপুকুরে বাস করে গদাধর চলে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে আর সারদামণি পিতৃগৃহেই রয়ে গেলেন।

সারদামণি দক্ষিণেশ্বর পবিত্রধামে থেকে ঠাকুর ও তাঁর মা চন্দ্রমণির সেবায় দিনরাত ব্যস্ত থাকতেন। রামকৃষ্ণ হাতে ধরে সারদাকে নিত্যকর্ম শেখাতে লাগলেন। স্থির করলেন, স্ত্রীরূপে ভক্তরূপে সারদাকে তিনিই সবকিছু শেখাবেন। কেমন করে লণ্ঠনে পলতে পরাতে হয়, লোকের বাড়ি গিয়ে ব্যবহার করতে হয়, পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে শিষ্টাচার পালন করতে হয়, ধ্যানে বসতে হয়, ব্রহ্মজ্ঞান পেতে হলে কেমন করে মনকে সংযমী করতে হয়, ইত্যাদি। একদিন রাত্রে দেবীজ্ঞানে সারদাকে অভিষিক্ত করে ষোড়শোপচারে তাঁকে পূজো করলেন। সমস্ত সাধনার ফল সারদার পায়ে বিসর্জন দিলেন। তখন থেকেই তিনি হন 'শ্রীমা'।

সেকালে জয়রামবাটি বা কামারপুকুর থেকে আসতে হলে পায়ে হেঁটে আসতে হত। পথে পড়ত চার-পাঁচ ক্রোশ ব্যাপী ডাকাতের আড্ডা তেলোভেলো ও কৈকালার মাঠ।

শ্রীমা ১৮৭৪ সালে ঠাকুরের ভাইপো ও ভাইঝিকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে আরামবাগ হয়ে দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আসছিলেন। পথে সন্ধ্যা হয়ে গেল। অন্ধকারে সারদাদেবী সঙ্গিদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। এমন সময় পথ আটকে দাঁড়াল এক ডাকাত দলের সর্দার। লোকটি রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করল—'কে রে তুই?' সারদাদেবী বললেন—'বাবা, আমি পথ হারিয়েছি। সঙ্গীরা আমাকে ফেলে চলে গিয়েছে। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে কালী-বাড়িতে থাকেন। আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।'

সারদার কথা শুনে ডাকাতটির ভাবান্তর হল। সে তাঁকে নিয়ে গেল তেলোভেলো গাঁয়ের একটি দোকানে। সেখানে ডাকাতের স্ত্রীও এসে উপস্থিত। ডাকাতের স্ত্রী বিছানা করে দিল, ডাকাত মুড়িমুড়কি কিনে আনল মার জন্যে। পরের দিন মাকে সঙ্গে করে তারা তারকেশ্বরে পোঁছিয়ে দিল।

দক্ষিণেশ্বরে নহবৎখানার ছোট্ট ঘরে সারদামণি থাকতেন। তারই মধ্যে রান্না, থাকা, খাওয়া সব। ঠাকুরের জন্যে আলাদা রান্না করে দিতেন--সিঙি মাছের ঝোল আর ভাত। সারদামণির মতো শ্রীরামকৃষ্ণও ছিলেন পেটরোগা। কোন কোন দিন স্নানের আগে ঠাকুরকে তেল মাখিয়ে দেবার সুযোগও পেতেন শ্রীমা। খাবার সময় ঠাকুরের যাতে ভাবসমাধি না হয় সেজন্যে নানারকম গল্পগাছা করে তাঁর মনটাকে ঘুরিয়ে রাখতেন শ্রীমা। নিজের আহারাদি হয়ে গেলে একটু বিশ্রাম করে আবার কাজে লেগে যেতেন। সন্ধ্যার সময় আবার ধ্যানে বসতেন। তারপর রাত্রির রান্না। সবাইকে খাইয়ে নিজের আহার, তারপর শুয়ে পড়তেন। তবু ঠাকুরের সেবা করেই পরম তৃপ্তি পেতেন তিনি।

ঠাকুরের তিরোধানের পর শোকে অধীর হয়ে পড়লেন শ্রীমা। পরের দিন তিনি হাতের বালা খুলতে যাবেন, এমন সময় ঠাকুর দেখা দিলেন। খপ্ করে তাঁর হাত-ধরে বললেন--'আমি কি কোথাও গেছি গো? এই যেমন এঘর থেকে ওঘর।' কৃষ্ণ যার পতি তার বিধবা হতে নেই—সে চিরসধবা।

কিছুকাল পর শ্রীমা মনে প্রবল অশান্তি ভোগ করতে থাকেন। তখন শান্তি পাবার জন্যে যোগানন্দ মহারাজ তাঁকে পঞ্চতপা ব্রত করবার নির্দেশ দিলেন। পাঁচ হাত অন্তর অন্তর চারদিকে চারটি কুন্ড করা হল। কুন্ডে ঘুঁটের আগুন জ্বলল। ওপরে প্রখর রৌদ্রের তেজ, চতুর্দিকে জ্বলন্ত শিখায় আগুন। এ অবস্থায় ঠাকুরের নাম স্মরণ করে শ্রীমা মাঝখানে ঢুকে পড়লেন। ক্রমাগত পাঁচ দিন ঐ অবস্থায় থাকার পর মনের সেই জ্বালা দূর হল।

শ্রীমার শেষ জীবন কাটে নিবিড় কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে। কৃপাপ্রার্থী ও ভক্তের সংখ্যা দিন দিনই বাড়তে থাকে। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর স্বামী বিবেকানন্দ ও গুরুভ্রাতারা যে রামকৃষ্ণ-সংঘ স্থাপন করেছিলেন তার প্রধান মনে করা হত শ্রীমাকেই। তাঁরা জানতেন যে, শ্রীমা ও জগন্মাতা এক ও অভিন্ন।

শেষজীবনে সারদামণি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। একদিন বললেন, 'আমার এই দেহটি দিয়ে ঠাকুর যা করাতে চেয়েছেন তা করেছি। এবার যাবার পালা। এখন আমার মন শুধু তাঁর কাছে যেতে চাইছে।' একজন ভক্ত কেঁদে ফেললেন, 'আমাদের কী হবে মা?' তিনি বললেন, 'ভয় কী? তোমরা তো ঠাকুরকে দেখেছ!' সেদিন মধ্যরাতের কিছু পরেই শ্রীশ্রীমার মহাসমাধিলাভ হল। সেটি ১৯২০ সালের ২১শে জুলাই, ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ।

শ্রীম



"নরেন্দ্র গান করিতেছেন। মাস্টার গান শুনিতেছেন। ঠাকুরের গান ছাড়া এমন মধুর গান তিনি কখনও কোথাও শুনেন নাই। হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ, চক্ষুর পাতা পড়িতেছে না, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিছে কি না বহিছে! জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, এর নাম সমাধি। মাস্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শুনেন নাই। অবাক হইয়া তিনি ভাবিতেছেন, ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি এত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়? গানটি এই—'চিন্তয় মম মানস-হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।' গানের এই চরণটি গাহিবার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চিত! চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে। মাঝে মাঝে যেন কী দেখিয়া হাসিতেছেন। না জানি কোটি-শশী-বিনিন্দিত কী অনুপম রূপ দর্শন করিতেছেন! এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময়-রূপ-দর্শন? কত সাধন করিলে, কত তপস্যার ফলে, কতখানি ভক্তিবিশ্বাসের বলে এরূপ ঈশ্বরদর্শন হয়?...সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাস্টার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন।"

মহাসাধক রামকৃষ্ণের এই অনুপম রূপবর্ণনা শ্রীম করেছেন তাঁর বিশ্বপ্রসিদ্ধ 'কথামৃত' গ্রন্থে। ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু করে ১৮৮৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে।

মহেন্দ্র গুপ্ত ছিলেন মেট্রোপলিটান স্কুলের শ্যামবাজার শাখার প্রধান শিক্ষক। এক আত্মীয়ের বাড়িতে বরাহনগরে বেড়াতে গেলেন। সেখান থেকে একজন সঙ্গী নিয়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তখন ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করছিলেন। মহেন্দ্র গুপ্তের মনে হল স্বয়ং শ্রীচৈতন্য যেন জগন্নাথক্ষেত্রে রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসে ভগবৎগুণকীর্তন করছেন। ঠাকুরের সঙ্গে সেদিন তাঁর প্রথম আলাপ।

কিছুদিন বরানগরেই অবস্থানের সুযোগে মাস্টার মহাশয় পর পর কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করে অচিরে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সমাজের অঙ্গীভূত হলেন।

১৮৫৪ সালের ১৪ই জুলাই কলকাতার শিবনারায়ণ দাস লেনে মহেন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁর পিতা মধুসূদন গুপ্ত গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে একটি বাড়ি কেনার পর সেটিই হয়ে ওঠে তাঁদের স্থায়ী বাসস্থান। আজও সেই বাড়ি সেই অঞ্চলে ঠাকুরবাড়ি বলে খ্যাত। পিতা মধুসূদন এবং মাতা স্বর্ণময়ী উভয়েই সরলতা, মধুর ব্যবহার এবং ধর্মনিষ্ঠার জন্যে সুপরিচিত ছিলেন। সেই গুণরাশি মহেন্দ্রনাথেরও ভিতর বর্তমান ছিল।

মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ঘন ঘন যেতেন, নীরবে সব দেখতেন ও শুনতেন। সে সব কথা রাত্রিবেলায় বাড়ি ফিরে লিখে রাখতেন তাঁর দিনপঞ্জীতে। এ ভাবেই

মহেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' প্রণয়ন করে বিখ্যাত হন এবং 'শ্রীম' নামে পরিচিত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কাশীপুরে অসুস্থ তখন মহেন্দ্রনাথ কামারপুকুরে গিয়েছিলেন। সঙ্গে গোরুর গাড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি বর্ধমান থেকে অধিকাংশ পথ পদব্রজে গিয়েছিলেন। সেই পথে সে সময় দস্যুর উপদ্রব ছিল—পথিককে সর্বদা শঙ্কিত থাকতে হত। মহেন্দ্রনাথ দূর থেকে ঠাকুরের জন্মস্থান দেখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। কামারপুকুরের পথে যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, তাকেই অভিবাদন জানালেন। মহেন্দ্রনাথ ফিরে এলে ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ঐ ডাকাতের দেশে কেমন করে গেলে? আমি ভাল হলে একসঙ্গে যাব।'

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মহেন্দ্রনাথ তীর্থদর্শন, সাধুসঙ্গ ও তপস্যায় মন দিলেন। এই সময়ে তিনি পুরী, কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিম্বার প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করেন এবং শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী ও রঘুনাথদাস বাবাজীর দর্শনলাভে ধন্য হন। তাঁর সাধনার ইতিহাস বড়ই চমকপ্রদ। এক সময়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী কুটিরে তপস্যায় রত হন। কিন্তু ভিজে ঘরে কঠোর জীবনযাপনের ফলে অসুস্থ ও অচল হয়ে পড়লে স্বামী প্রেমানন্দ তাঁকে গাড়ি করে বাড়িতে নিয়ে যান। কিন্তু সেই অবস্থায়ও তিনি গভীর রাত্রিতে উঠে বিছানা বগলে করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের বারান্দায় গিয়ে সেখানে অনাথ ভিখারীদের পাশে শুয়ে থাকতেন।

এর কারণ সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'ঘর ও পরিবারের ভাব মন থেকে যেতে চায় না, তাই নিজেকে সহায়হীন গৃহশূন্য লোকদের মত ভাবতে চেষ্টা করি।'

কথামৃত রচনা করবার পর দেশ-বিদেশ থেকে অগণিত ভক্ত পিপাসা মেটাতে তাঁর কাছে আসতেন এবং মহেন্দ্রনাথও নিজের মনের ভাণ্ডার উজাড় করে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শোনাতেন। মাস্টার মহাশয়ের বাড়ি প্রাচীন ঋষিদের তপোভূমিতে পরিণত হয়েছিল।

প্রতিটি দর্শনের পরেই রামকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাণীগুলি শ্রীম আদ্যোপান্ত টুকে রাখতেন। তবুও গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে উপকরণগুলি সাজাতেই তাঁর জীবনের শেষ পঁয়ত্রিশ বছর কেটে যায়। শ্রীম প্রথমদিকে গ্রন্থপ্রকাশে মোটেই আগ্রহ দেখাননি। তিনি বলতেন, আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনেই তিনি এই দিনলিপি রচনা করেছেন। কিন্তু পরে তাঁকে মত বদলাতে হয়েছিল। ইতোমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ দেহরক্ষা করেছেন; নবীন সন্ন্যাসীরা নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বরানগরে মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ সময় মাস্টার মহাশয়ই ছিলেন তাঁদের একমাত্র বন্ধু ও পরামর্শদাতা। তখন তিনি দুটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। একটির বেতন দিয়ে নিজের সংসার চালাতেন, অপরটির সবটুকু মাহিনা মঠের ভাইদের প্রতিপালনে ব্যয় করতেন। এরপর একদিন—১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমা সারদামণি দিনলিপিটি শুনতে চাইলেন। সম্পূর্ণ শোনার পর শ্রীশ্রীমা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে মাস্টার মশায়ের পত্নী নিকুঞ্জ দেবীকে লক্ষ করে বলেন, "বৌমা, বোলো আমি হাড়ভাঙা আশীর্বাদ করছি।" তিনিই সম্পূর্ণ দিনলিপিটি ছেপে প্রকাশ করতে আদেশ দেন। শ্রীম সে আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন।

কথামৃত মহাগ্রন্থের প্রশস্তি গেয়েছেন ক্রিস্টোফার ঈশারউড তাঁর অনবদ্য ভাষায়ঃ "কথামৃতের যে কাহিনী তা নিত্যকালের। এ আখ্যায়িকায় অতীত নেই, ভবিষ্যতও নেই। বর্তমানই এর কাল। শ্রীম তাঁর কথামৃতে এমন এক সত্তার কথা বলেছেন, যিনি নিত্যভাবে বর্তমানের মধ্যে বিরাজ করছেন।... আখ্যায়িকার প্রতিটি বর্ণনার মধ্যেই তাই আমরা একজন নগণ্য স্কুলমাস্টারের বিস্ময়মুগ্ধ কৃতার্থ মনের পরিচয় পাই, পাই তাঁর শ্রদ্ধা।...রামকৃষ্ণকে অনেক রূপে, অনেক পরিমণ্ডলে শ্রীম আমাদের দেখিয়েছেন। তাঁকে দিনে দেখিয়েছেন, রাত্রে দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে, বলরাম-ভবনে, গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহারে, কলকাতার রাস্তায় অশ্বশকটে।...পাঠক যদি ধারাবাহিক ভাবে গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন তা হলে প্রত্যহের খুঁটিনাটির মধ্যেই জীবনধারার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহটি তিনি খুঁজে পাবেন।...শ্রীম নিজেকে রামকৃষ্ণের নীতিগল্পের সেই দাসীটির মতো ভাবতেন, যে পরের ঘরে কাজ করলেও মনে মনে জানত তার আসল ঘর অন্যত্র।"

শ্রীম-র প্রয়াণ হয় ৪ঠা জুন, ১৯৩২। যাবার বেলায় তাঁর শেষ কথাটি ছিল, "মা—ঠাকুর, আমাকে তোমাদের কোলে তুলে নাও।"

স্বামী শিবানন্দ



তারকনাথ অফিসে যান, কিন্তু মন পড়ে থাকে রামকৃষ্ণদেবের চরণপ্রান্তে। যত দিন যায়, অফিসের কাজকর্ম করা অসম্ভব মনে হতে লাগল। অথচ বিবাহ হয়েছে, স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্যে তিনিই ধর্মতঃ দায়ী।

সংসারে বন্ধ হয়ে পড়েছি, অথচ সংসারেও মন বসছে না, প্রভু! আমার একী করলে!—প্রায়ই গভীর নিশীথে তারকনাথ ভগবানের উদ্দেশে আকুল প্রাণে কাঁদতেন। গংগায় জোয়ার এলে তারকনাথ আর স্থির থাকতে পারতেন না। অফিসের খাতা ইতস্ততঃ ফেলেই তিনি ছুটতেন বড়বাজারের দিকে। তারপর কোন চলতি নৌকায় চড়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হতেন।

চব্বিশ পরগনার বারাসতের নিকট বড়া গ্রামের অধিবাসী রামকানাই ঘোষাল। তাঁরই সন্তান তারকনাথ—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবী অন্যতম পার্ষদ 'মহাপুরুষ' স্বামী শিবানন্দ। জন্ম ১৮৫৪ সালের ১৬ই নভেম্বর—অতি শুভলগ্নে, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে।

কোষ্ঠী প্রস্তুত করা হলে দেখা গেল—জাতক পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করবে; যদি একান্তই সংসারে থাকে তো রাজসম্মানের অধিকারী হবে।

তারকনাথ বড় হলেন, লেখাপড়া শিখলেন। একটি সর্বগুণসম্পন্না কন্যা দেখে পিতা তাঁর বিবাহ দিলেন। একটি সওদাগরী অফিসে চাকরি পেয়ে চলে এলেন কলকাতায়। সেখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকতে লাগলেন। ঐ বাড়িটি ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের বাড়ি 'লিলি কটেজে'র খুব কাছে ছিল। তারকনাথ নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত ও উপাসনাদিতে যোগদান করতেন। তারপর ভাগ্যচক্রে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এলেন।

কিছুদিন যাতায়াতের পর তারকনাথ একদিন ঠাকুরকে ভাবসমাধির জন্যে ধরে বসলেন। ঠাকুর কিছুক্ষণ মৌন থেকে সস্নেহে বললেন—'হবে রে হবে—এত উতলা হচ্ছিস কেন? মা কৃপা করে সময়ে সব দেবেন। তবে তোর মূর্তিদর্শন এখন হবে না—পরে হবে। তোর ঘর আলাদা।'

একদিন ঠাকুর তারকনাথকে পঞ্চবটি তলায় নিয়ে গিয়ে বললেন—'জিভ বের কর্।' তারক জিভ বের করলেন। ঠাকুর আঙুল দিয়ে তাঁর জিহ্বায় কী যেন লিখে দিলেন! ঐ লেখার সঙ্গে সঙ্গেই তারকনাথ গভীর ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর শরীর-মনের জ্ঞান একেবারে লোপ পেল। অনেকক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকবার পরে ঠাকুর ধীরে ধীরে বুকে হাত বুলিয়ে তাঁকে প্রকৃতিস্থ করলেন এবং সাধন ভজন সম্বন্ধে দিলেন অনেক গুহ্য উপদেশ।

ধীরে ধীরে তারকনাথের সংসারের প্রতি আসক্তি কমে এল। ভগবানই বুঝি মুক্তির পথ খুলে দিলেন। হঠাৎ তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন। সংযমী তারকনাথকে

শ্রীরামকৃষ্ণই দেবরক্ষিত করে গড়ে তুলেছিলেন। প্রয়োজন বুঝে তিনি বাড়ি যেতেন, স্ত্রী অসুস্থ হলে সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করতেন; কিন্তু নিজে সর্বদা অনাসক্ত থাকতেন। পরবর্তীকালে রোমাঁ রোলাঁকে এক পত্রে লিখেছিলেন, জীবনে তিনি কখনও স্ত্রীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করেননি।

১৮৮৩ সালের শেষ ভাগে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ও বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে তারকনাথ গুরুপ্রদর্শিত পথে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন।

তারকনাথ হলেন শিবানন্দ। বরানগর মঠে তাঁর মঠজীবন শুরু হল। ১৮৮৯ সালের প্রথম ভাগে তিনি পরিব্রাজক বেশে কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। হিমালয় ভ্রমণ করে শিবানন্দ এলেন কাশীধামে। সেখানে কিছুকাল থেকে ১৮৮৯ সালের শেষ ভাগে বরানগর মঠে ফিরে এলেন।

দু বছর পরে শিবানন্দ আবার পরিব্রজ্যায় বেরোলেন। কয়েকমাস নানা তীর্থে ভ্রমণের পর হিমালয়ে এসে গভীর সাধনায় মগ্ন হলেন। মঠে ফিরলেন দীর্ঘকাল পরে।

ধীরে ধীরে মঠের অনেক উন্নতি হল। বেলুড়ে স্থাপিত হল নতুন মঠ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগের পর শিবানন্দ বেলুড় মঠের পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। সাধনরত সাধু ও ব্রহ্মচারিগণ 'মহাপুরুষ মহারাজের' আশীর্বাদের জন্যে উদ্‌গ্রীব থাকতেন; তিনিও তাঁদের প্রেরণা যোগাতেন প্রাণস্পর্শী ভাষায়ঃ 'তোমরা সর্বস্ব ছেড়ে ঠাকুরকেই জীবনসর্বস্ব করেছ; তোমাকেও খাটতে হবে। ঠাকুর বলতেন—কৃপাবাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না! ঐ পাল তোলাই হল স্বচেষ্টা। ঐকান্তিক অধ্যবসায় ও পুরুষকার চাই—সৎ কাজের জন্যে, সাধন ভজনের জন্যে। আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্যে সিংহবিক্রম প্রকাশ করতে হবে। উদ্যম ছাড়া, পুরুষকার ছাড়া কিছুই হবার যো নেই। পাল তুলে দিলে তাতে কৃপাবাতাস লাগবেই। যতদিন মানুষের অহংবুদ্ধি আছে ততদিন অধ্যবসায় রাখতেই হবে। তোমরা পূর্বজন্মার্জিত বহু সুকৃতির ফলে, ভগবৎকৃপায় ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে পড়েছ, তাঁর পবিত্র সঙ্ঘে স্থান পেয়েছ। তাঁর পতিতপাবন নাম নিয়ে এ ভবসমুদ্রে পাড়ি দিয়েছ—একটু জোরে ঢেউ দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন? এ সব তো মহামায়ার বিভীষিকা। সাধক যখন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে সুমেরুবৎ অচল অটল থাকে, তখন মহামায়া প্রসন্ন হয়ে মুক্তির দ্বার খুলে দেন।'

জনৈক ভক্তের লেখনীতে মহাপুরুষ মহারাজের শেষ জীবনের ভাবঘন প্রেমময় মূর্তিটি অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছেঃ "কয়েক হাজার ব্যক্তির মানসিক দুঃখ-কষ্টের ভার তিনি বহন করিতেন, যেন একটি ছোটখাট ভালোবাসার রাজ্য চালাইতেন। তিনি প্রকাশ্য কর্মী ছিলেন না, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গ কর্মী। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ হইয়া তাঁর ভালোবাসা ও হৃদ্‌গত শক্তি দিয়া অপরের নিজস্ব কর্মের ভাবটি জাগ্রত করিয়া দিতেন।"

সেবার কাশীধামে এক সন্ন্যাসীকে স্বামী শিবানন্দ বলছেন, 'দেখ, কাল রাতে একটা ভারি মজা হয়েছে। গভীর রাত, শুয়ে আছি। হঠাৎ দেখি যে এক শ্বেতকায় পুরুষ, জটাধারী ত্রিনয়ন—সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দিব্য কান্তিতে চারিদিক আলোকিত হয়ে গেছে। আহা! কী সুন্দর কমনীয় মূর্তি—কী সকরুণ চাহনি। ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লাম, আর খুব আনন্দ। এমন সময় দেখি যে, মূর্তিটি ক্রমে বিলীন হয়ে গেলেন, আর তাঁর স্থানে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন, সহাস্যবদন। আমার হাত ধরে ইশারা করে বললেন—তোর এখন থাকতে হবে, আরও কিছু কাজ আছে। ঠাকুরের এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার নিচের দিকে আসতে লাগল, প্রাণবায়ুর ক্রিয়াও চলতে লাগল।...তিনি আর কেউ নন, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ।'

এক একদিন দেখা যেত তাঁর দিব্য উদ্দীপনা ভাব। আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী ভক্তদের বলতেন, 'ফ্লোয়িং, ফ্লোয়িং, ফ্লোয়িং...আশীর্বাদ তো সর্বদাই বয়ে যাচ্ছে। কিছু ভাবনা নেই। সব হয়ে যাবে। এমনি বলছি যে তা নয়—ঠিক ঠিক।...যে আসবে, কাউকে ফেরাব না। আমি মা গঙ্গা হয়ে গেছি।'

তাঁর লীলাবসানের দিন ঘনিয়ে আসছিল। দুরন্ত পক্ষাঘাতের ফলে শিবানন্দের বাক্‌শক্তি রহিত হল। ১৯৩৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তাঁর জীবনের শেষ লগ্নটি ঘনিয়ে এল। সমবেত সাধুগণ ভজন গানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুললেন।

গৌরীমাতা



পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের আদি নিবাস হাওড়া জেলায় শিবপুরে। পরে তাঁরা ভবানীপুরে এসে বসবাস করেন। মৃড়ানীর মা গিরিবালা দেবী ছিলেন শিক্ষিতা, ধর্মসংগীতরচয়িত্রী ও সংগীতজ্ঞা। মৃড়ানীও তাই লেখাপড়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন।

মৃড়ানীর জন্মকাল অনিশ্চিত; সম্ভবতঃ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে (১২৬৪ বঙ্গাব্দে) তাঁর জন্ম হয়। শৈশব থেকেই মৃড়ানী ছিল অসাধারণ চরিত্রের। কোন কারণে কাঁদিলে, ঠাকুরদেবতার নাম করলেই সে শান্ত হত। একদিন নৌকাভ্রমণে বেরিয়েছিল। হাতে ছিল তার সোনার বালা। একখানি বালা কিছুক্ষণ দাঁতে চিবিয়ে দেখল তাতে কোন ভাল আস্বাদ নেই। তখনই দুহাতের দুখানা বালাই গঙ্গার জলে ফেলে দিল।

একদিন ভবানীপুরের এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বসে কয়েকটি ছেলে-মেয়ের খেলা দেখছিল মৃড়ানী। এমন সময় সেখানে এলেন এক পথিক। আজানুলম্বিত বাহু, গলায় উপবীত। পথিক বললেন—'কী গো খুকি, সবাই খেলছে, আর তুমি যে বড় একলাটি চুপচাপ বসে আছ?' মৃড়ানী জবাব দিল—'ওসব খেলা আমার ভাল লাগে না।' এই বলে পথিকের দিকে তাকাতেই কেমন যেন চেনা মনে হল তাঁকে। বালিকা তাঁকে প্রণাম করল। পথিক মৃড়ানীকে আশীর্বাদ করলেন—'কৃষ্ণে ভক্তি হোক।'

পথিকের ঠিকানা জানতে পেরে কয়েকদিন পর বালিকা একা দক্ষিণেশ্বরের কাছে এক কলাবনে গিয়ে উপস্থিত হল। সেই পথিক মাঝে মাঝে এই নিভৃত স্থানে এসে সাধন-ভজন করতেন। মৃড়ানী অতি সন্তর্পণে কুটিরের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখল—সেই পূর্বপরিচিত পথিক। আসনে বসে তিনি ধ্যান করছেন। কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে সাধক বালিকাকে দেখলেন। বললেন—'তুই এসেছিস?' কাছে এক ব্রাহ্মণবাড়িতে বালিকার থাকবার ব্যবস্থা হল। পরদিন খুব ভোরে গঙ্গাস্নান করে তাঁর কাছে এসে দীক্ষা নিতে বললেন।

পরদিন ভোরে বালিকার দীক্ষা হল। এদিকে মৃড়ানীর দাদা অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেখানে এসে তার দেখা পেলেন। মৃড়ানীর মতিগতি দেখে পরিবারের সকলেই চিন্তিত হলেন। সকলের পরামর্শে জোর করেই তার বিবাহ দেওয়াই স্থির হল।

বিয়ের সব আয়োজন ঠিক। বিয়ের দিন মৃড়ানী রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। গিরিবালা দেবী ভয় পেলেন। মেয়েকে তিনি অসাধারণ বলে মনে করতেন। তাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন—'মা, তোর যদি বৈরাগ্যের ফুল সত্যিই ফুটে থাকে, আমি বাধা দেব না।' সম্প্রদান এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় ক্রিয়া অনুষ্ঠানের পূর্বেই মায়ের সহযোগিতায় মেয়ে গৃহত্যাগ করল। সেই রাত্রেই বিবাহ-লগ্নে গিরিবালা দেবী কন্যাকে নারায়ণে সমর্পণ করলেন।

মৃড়ানীর জীবনে আরম্ভ হল নতুন অধ্যায়। গঙ্গাসাগর থেকে একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করলেন। হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ, দেবপ্রয়াগ হয়ে বদরীনারায়ণ ও কেদারনাথ দর্শন করলেন। গলায় দামোদর-শিলা ঝুলিয়ে গেরুয়া-পরা এই সন্ন্যাসিনী প্রায় দশ বৎসরকাল তীর্থ পর্যটনে ও সাধন ভজনে অতিবাহিত করলেন।

বৃন্দাবন থেকে মৃড়ানী শ্রীক্ষেত্রে এসেছেন। একজন ভক্তিমান বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা। কথাপ্রসঙ্গে বৃদ্ধ বললেন—'মাগো, দক্ষিণেশ্বরে দেখে এলাম এক অসাধারণ মানুষ। অপরূপ রূপ, জ্ঞানে ভরপুর, প্রেমে ঢল ঢল।' জগন্নাথধাম থেকে ফেরার পর মৃড়ানী কিছুকাল ঠাকুরের ভক্ত বলরাম বসুর গৃহে অবস্থান করেন। একদিন দামোদর-শিলা সিংহাসনে রাখতে গিয়ে দেখেন, সেখানে দুখানি জীবন্ত চরণ শোভা পাচ্ছে—দেহের অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই। দামোদরকে তুলসী দিলেন, তুলসী গিয়ে পড়ল ঐ চরণযুগলে। মৃড়ানী সংবিৎ হারালেন। সুস্থ হবার পর তাঁকে দক্ষিণেশ্বর নিয়ে গেলেন বলরাম বসু। ঠাকুর তখন ঘরে বসে আপন মনে সুতো জড়াচ্ছেন আর গান গাইছেন। মৃড়ানী দেখেই অবাক হয়ে গেলেন। এই মহাপুরুষই যে সেই পথিক—তাঁর দীক্ষাগুরু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

মৃড়ানীর নাম হল গৌরীমাতা। এর পর গৌরীমা দক্ষিণেশ্বরে থেকে ঠাকুর এবং শ্রীমার সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। গৌরীমার চোখে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অভেদ। ঠাকুর একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সারদা আর আমার মধ্যে কাকে তুই বেশি ভালোবাসিস?' গৌরীমা উত্তর দিয়েছিলেন গানের ভাষায়—

'রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী;
লোকের বিপদ হলে ডাকে মধুসূদন বলে,
তোমার বিপদ হলে পরে বাঁশিতে বল রাইকিশোরী।'

—গান শুনে শ্রীশ্রীমা সেদিন গৌরীমার হাত চেপে ধরেছিলেন, ঠাকুরও হার মেনে হাসতে হাসতে পালিয়ে বাঁচেন! কিছুকাল পর ঠাকুরের কথায় গৌরীমা বৃন্দাবনে গিয়ে নির্জন স্থানে সাধনা আরম্ভ করলেন। উদয়-অস্ত সাধনা, এরকম কঠোর সাধনা করতে হবে নয় মাস। সাধনা যখন শেষ হল তখন খবর পেলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ লীলা সংবরণ করেছেন। পরে সারদাদেবী যখন বৃন্দাবনে এসে গৌরীমাকে খুঁজে বের করে বললেন, ঠাকুর শ্রীমাকে দর্শন দিয়ে বৈধব্যচিহ্ন ধারণ করতে নিষেধ করেছেন এবং সে বিষয়ে গৌরীমার কাছে শাস্ত্রীয় বচন শুনে নিতে বলেছেন, তখন বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত গৌরীমা বলেন—'ঠাকুর নিত্যবর্তমান, অক্ষয় অব্যয়—আর তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী। তুমি সধবার বেশ ত্যাগ করলে জগতের অকল্যাণ হবে।'

গৌরীমা শুধু ভজনসাধিকা নন—কর্মসাধিকাও ছিলেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দে বারাকপুরে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তিনি বহু কুমারী, সধবা ও বিধবা মহিলাকে স্বাবলম্বনের পথে বাঁচবার পথনির্দেশ করেছিলেন। আদর্শপ্রচার ও জীবনগঠনের উপায় নির্ধারণে গৌরীমার কর্তব্যনিষ্ঠা ও বাগ্মিতা সেকালে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন, একান্তভাবে মাতৃজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারে এমন একটি সন্ন্যাসিনী-সংঘ গড়ে তুলতে না পারলে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে না। কলকাতায়ও ১৩১৮ বঙ্গাব্দে তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন গোয়াবাগানে; পরে ১৩৩১ সনে সেটি স্থানান্তরিত হয় মহারানী হেমন্তকুমারী স্ট্রীটে। তাঁর আশ্রমের লক্ষ ছিল প্রাচীন হিন্দুনারীর আদর্শে মহিলাদের মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ করা। গৌরীমাতার কার্যক্ষমতার প্রশংসা করে সবাই বলতেন—মাতাজী মেয়েমানুষ হয়ে যা করলেন, তা সত্যি আশ্চর্য। কটা পুরুষমানুষ একা অমন কাজ করতে পেরেছে!

আরাধ্যদেবতা দামোদরকে তিনি চিরজীবনের পতি জ্ঞানে সেবাযত্ন করতেন। 'ও মা, কত্তার যে আজ দুধ খাওয়া হয়নি, তাই কত্তার ঘুম আসছে না' এই বলে দামোদরকে দুধ খাওয়াতে চললেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে রান্নাঘরে লুচি ভাজছেন, কারণ 'এক ঘুমের পর কত্তা বললেন, তাঁর ক্ষিদে পেয়েছে'! শ্রীশ্রীমা ভক্তদের কাছে তাই বলতেন, "পাথরের একটা নুড়ি নিয়ে গৌরদাসী কিভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিল!" এই গৌরীমাকেই আবার দেখা যায় পতিগৃহে নির্যাতিতা বধূকে উদ্ধার করে আনতে, গয়াধামে অসহায় মহিলাযাত্রীকে পাণ্ডাদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে।

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ১৬ই ফাল্গুন (১৯৩৮ সাল) গৌরীমায়ের জীবনসন্ধ্যাও ঘনিয়ে এল।

হংসবাবা অবধূত



স্বামী অনুভবদেবের খুব নামডাক। ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষ। থাকেন অমৃতসরে।

পাঞ্জাবের অখ্যাত এক গ্রামের ছেলে নাগা সন্ন্যাসীদের মুখে সে কথা শুনতে পায়। তারপরই তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বাড়িতে কিছু না বলেই হাঁটিতে হাঁটিতে গিয়ে উপস্থিত হয় সেই আশ্রমে। প্রণাম করে বলে—'মহারাজ, আপনার এখানেই আমি থাকতে চাই।'

স্বামী অনুভবদেব সে কথা শুনে অবাক্। মাত্র বারো বছরের ছেলে সন্ন্যাসী হতে চায়! তিনি ছেলেটিকে নিবৃত্ত করবার জন্যে বললেন—'বেটা, এ পথে বড় কষ্ট। বাড়ি ফিরে যা।'

কিন্তু ছেলেটি কিছুতেই বাড়ি ফিরবে না। বাধ্য হয়ে অনুভবদেব তাকে নিজের আশ্রমে রেখে দিলেন।

বালকের প্রকৃত নাম জানা যায় না। উনিশ শতকের মধ্যভাগে সিপাহী যুদ্ধের প্রায় সমকালে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণবংশে তার জন্ম হয়।

নবাগত বালককে আশ্রমে দেওয়া হল অনেক কিছু কাজ। রান্না করা, আশ্রমের গোরু-মহিষ তদারক করা, এমনকি বিগ্রহের পূজার ভারও দেওয়া হল তার উপরে। কয়েক বৎসর পর অনুভবদেব বললেন—'বৎস, আশ্রমের কাজে যে কঠোর পরিশ্রম তুমি করেছ তাতে আমি খুশি হয়েছি। এবার তোমাকে বেদান্তের পাঠ গ্রহণ করতে হবে।'

পণ্ডিত কালা সিং নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের কাছে ছেলেটি কয়েক বছর বেদান্ত অধ্যয়ন করল।

ইতোমধ্যে স্বামী অনুভবদেবের তিরোধান ঘটল। শোকসন্তপ্ত বালক দিশেহারা হয়ে নানা তীর্থস্থানে ও মঠমন্দিরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর এক নির্বাণী আখড়ায় দেখা হল হীরানন্দ অবধূতের সঙ্গে। হীরানন্দ তাকে দীক্ষা দিলেন। সন্ন্যাস-নাম হল হংসদেব অবধূত। পরবর্তীকালে হংসবাবা নামেই তিনি জনসমাজে প্রখ্যাত হন।

দীক্ষা দানের পর হীরানন্দ বললেন—'বেটা, এতকাল নিষ্ঠাভরে ব্রহ্মচর্য পালন করেছ। অনেক এগিয়ে গিয়েছ নিবৃত্তি মার্গের পথে। এবার পরিব্রাজনে বের হও।' গুরুর নির্দেশ অনুসারে হংসবাবা পরিব্রাজনে বেরোলেন। কৌপীন সম্বল করে শীতগ্রীষ্ম কাটাতে লাগলেন জঙ্গলে ও পাহাড়ে। গায়ের চামড়া পুরু ও বিবর্ণ হয়ে গেল। হঠাৎ দেখলে তাঁকে স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হত না। মুখে 'হরিহর' শুধু এই শব্দটি করে গৃহস্থের দরজায় চুপ করে দাঁড়াতেন। কখনও ভিক্ষা মিলত, কখনও মিলত বিদ্রূপ। এই সময়কার বৈরাগ্যজীবন ও কঠিন তপস্যার প্রসঙ্গে পরে অবধূত নিজমুখে বলেছেন—'তখন ছিল আমার—গুজর্ গেই গুজরান্, কেয়া ঝোপড়ি কেয়া ময়দান—এই অবস্থা। প্রায়ই রাত কাটত নক্ষত্রখচিত মহাকাশের

উন্মুক্ত তলে। হিংস্র জীবজন্তুর উপদ্রব বেশি যেখানে, সেখানে রাত কাটাতাম গাছের ডালে। নিচে জ্বলত খড়কুটোর ধুনি দিনের পর দিন। এমনিভাবে গুরু-নির্দিষ্ট সাধন ও ব্রহ্মচর্যা আমায় অনুষ্ঠান করতে হত।...পরিব্রাজনকালে গুরুশক্তি ও আত্মসমর্পণযোগ বরাবর আমাদের রক্ষা করেছে।'

আসমুদ্রহিমাচল প্রায় সবগুলি প্রধান তীর্থ হংস-বাবা তিনবার প্রদক্ষিণ করে বেড়ালেন। একবার গেলেন ভারতের বাইরে আফগানিস্তানে। কাবুল থেকে কিছু দূরে একটি পার্বত্য অঞ্চল তাঁর খুব ভাল লাগল। দেড় বছর সেখানে সাধনভজনে কাটালেন।

বারো বছর পরে হংসবাবা পরিব্রাজন শেষ করে গুরু হীরানন্দের কাছে ফিরে এলেন। এবার গুরুর সান্নিধ্যে থেকে যোগসাধনার অনেক নিগূঢ় অভ্যাস আয়ত্ত করলেন। তার পর স্বামী হীরানন্দ বললেন—'বৎস, তুমি সর্বপাশমুক্ত অবধূত হয়েছ। এবার পাশবন্ধ জীবের কল্যাণে তোমাকে কিছু কাজ করতে হবে।'

হংসবাবা তখন আবার বেরিয়ে পড়লেন। কয়েক বছর নানা স্থানে কাটিয়ে সাঁওতাল পরগনার যশিডিতে এসে স্থাপন করলেন তাঁর সাধন-আশ্রম—পিছনে পরেশনাথ পাহাড়ের কৃষ্ণকায় সিলুয়েট অন্ধকার আকাশের পটভূমিকায় দণ্ডায়মান।

প্রথমে আশ্রমে একটি কাঁচা ঘর ছাড়া আর কিছু ছিল না। হংসবাবা কারও সঙ্গে কুটিরে রাত্রিবাস করতেন না। কখনও কোন সন্ন্যাসী বা অতিথি এলে নিজের কুটির ছেড়ে দিয়ে রাত কাটাতেন বারান্দায়। কিন্তু ভক্তরা ছাড়ল না। দু'তিন বছরের মধ্যেই আশ্রমে একটি দোতলা কুঠি তৈরি হল। যে পাহাড়ী অঞ্চলে হংসবাবার আশ্রম, ভক্তরা তার নাম দিল কৈলাস পাহাড়। প্রতিদিন বহু ভক্ত, মুমুক্ষু, রোগী ও পাপীতাপী এসে ভিড় করত হংসবাবার এই কৈলাস আশ্রমে। তাঁর শ্রীমুখের বাণী শুনে কত মানুষ কৃতার্থ হত।

মানুষের মধ্যে বিরাজিত সচ্চিদানন্দ। তাঁকে অন্বেষণ করতে হয় অবিদ্যার মোহ এড়িয়ে। ধীর বিচারবুদ্ধি দিয়ে পরমাত্মাকে লাভ করতে হয়। এ সম্পর্কে সুন্দর একটি কাহিনী বলতেন হংসবাবা। 'সরোবরে স্নান করে এক মহিলা তাঁর স্বর্ণহার ভুলে ফেলে যান। একটি কাক ঠোঁটে করে সেটি নিয়ে গাছে গিয়ে বসে। বস্তুটি খাদ্য নয় বুঝে সে হারটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে উড়ে যায়। এক স্নানার্থী জলে নেমে হারের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। সে জলে ডুব দিয়ে অনেক খুঁজল, হার পায় না। পরে আর একজন স্নানার্থী জলে রত্নহারের প্রতিবিম্ব দেখে ভাবল, আসল বস্তুটি কোথায়? গাছের দিকে তাকাতেই দেখল রত্নহারটি সেখানে ঝুলছে। অমূল্য বস্তুটি সে-ই লাভ করল।'

কোন ভক্ত কখনও এসে বলত, মুক্তির জন্যে সাধন-ভজন করব, সে সময় কোথায়? সংসারের ঝামেলা একটু না মিটলে ঈশ্বরচিন্তা কেমন করে করব? হংসবাবা তাকে বলতেন, 'বাবা, সমুদ্রে যে স্নান করতে যায় সে কি কখনও তীরে বসে অপেক্ষা করে আর ভাবে—ঢেউ কমে যাক, তবে স্নান করতে নামব? সংসারের ঝঞ্ঝাট কমুক, তারপর সাধনভজন শুরু করব—এ যদি ভেবে থাকো তবে এ জীবনে মুক্তিলাভ আর ঘটবে না। যে যতটুকু পার, কালবিলম্ব না করে কাজ শুরু করে দাও।' ভক্তরা সখেদে বলে, সংসারের মায়া-মোহ-কর্মের জালে আবদ্ধ থাকতে হয়, তাই ভগবানের দিকে মন ফেরানো যায় না। হংসবাবা তাদের সঠিক পথের নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'বদ্ধ জীবের মন তো প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত হবেই। এর প্রতিকার করতে হবে মনের জন্যে আর একটি বিকল্প খাত প্রস্তুত করে। সেই খাতে চালনা কর তোমার ঈশ্বরমুখী মনের প্রবাহকে। তবেই দেখবে বিষয়মুখী মন ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে, মন হয়ে উঠছে অন্তর্মুখী। পরমাত্মার প্রতি মন হবে নিবিষ্ট। একেই বলে আত্মধ্যান।'

কৈলাস পাহাড়ে এক বিশাল মঠ গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয় ভক্তরা। হংসবাবা হেসে দোঁহা আবৃত্তি করেন—

চা গেয়ি চিন্তা গেয়ি, মন্‌মে নেহি প্রবাহ।
যিস মন্‌মে সন্তোষ হ্যায় উয়ো শাহেনশাহ্‌॥

—যাঁর কোন চাওয়া নেই, চিন্তা নেই—অন্তরে যাঁর বিরাজিত চিরসন্তোষ, তিনিই প্রকৃত রাজাধিরাজ।

১৩৬৭ বঙ্গাব্দের ৪ঠা বৈশাখ (ইং ১৯৬০) এই মহাপুরুষের আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায়।

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়



কাশীর তিলভাণ্ডেশ্বর মন্দিরের সামনে পথ দিয়ে চলেছেন শক্তিমান মহাসাধক তিব্বতী বাবা। হঠাৎ তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ালেন ব্রহ্মচারিবেশী এক ভীমকায় পুরুষ। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। তিব্বতী বাবাকে প্রণাম নিবেদন করে যুক্তকরে বললেন—'বাবা, আমি মুক্তির আশায় দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনিই আমার চিহ্নিত সদ্‌গুরু। কৃপা করে আমায় দীক্ষা দিন।'

তিব্বতী বাবা বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কিভাবে জানলে আমি তোমার গুরু?'

ভীমকায় পুরুষ বলল—'কিছুদিন আগে আমি হিমালয় অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, সেখানে দেখা হয়েছিল এক মহাত্মার সঙ্গে। তিনিই বলে দিলেন—তাড়াতাড়ি কাশীধামে যাও। পৌঁছবার পরের দিনই তোমার নির্দিষ্ট গুরুর সন্ধান পাবে। তিনি আপনার চেহারার বর্ণনাও দিয়েছেন। তাই আপনাকে দেখে আমি চিনতে পেরেছি।'

তিব্বতী বাবা এবার হেসে উঠলেন। বললেন—'বেশ! কিন্তু বাঘের সঙ্গে লড়াই করার শখ হঠাৎ তোমার মিটে গেল কেন?'

সেই বলিষ্ঠ পুরুষ বলল—'বাবা, আপনি সর্বজ্ঞ। হিংস্র বাঘের সঙ্গে খালি হাতে দিনের পর দিন লড়াই করেছি নিছক জৈব আনন্দের নেশায়। সে নেশা কেটে গেছে। বনের বাঘ ছেড়ে এখন মনের বাঘকে বশ করতে চাই। কিন্তু তার কৌশল তো আমি জানি না।'

তিব্বতী বাবা বললেন—'মনের বাঘকে বাগ মানানো অনেক বেশি কঠিন। বায়ু জয় করে মনকে বশ করতে হয়। এ যে বাঘের চাইতেও ভয়ংকর। একবার বশে এল তো সিদ্ধির কোঠায় চলে গেলে। বশে না এলে অনেক সময় এর হাতেই প্রাণ দিতে হয়।'

শক্তিমান পুরুষ এবার অবনত হয়ে বলল—'সেজন্যই আপনার মতো শক্তিমান সাধকের শরণাপন্ন হয়েছি।'

—মাঝে মাঝে কিন্তু শিষ্যের কান খুব কষে ধরতে হয়। দেখিস, তখন পালিয়ে যাবি না তো?

—আজ্ঞে না, একবার শ্রীচরণে ঠাঁই দিয়ে দেখুন না বাবা!

তিব্বতী বাবা বললেন—'ভয় নেই, তোর হবে। আর ঠিক জায়গাতেই তুই এসেছিস। আমি জানতাম তুই আসবি। তোর প্রতীক্ষাতেই আমি এখানে ছিলাম।'

মুক্তিকামী এই ভীমকায় পুরুষের নাম শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনায়। জন্ম ১৮৫৮ সালে। পিতা শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ত্রিপুরা আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। অতুলনীয় দৈহিক শক্তি ও সাহস ছিল শ্যামাকান্তের। বুকে পাথর ভেঙেছেন, সার্কাস পার্টিতে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে দেশ-বিদেশের মানুষকে বিস্মিত করেছেন। তখনকার দিনে মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতনে তিনি ফ্রেড কুকের 'ইংলিশ সার্কাস' দলে হিংস্র জন্তুর খেলা দেখাবার জন্যে নিযুক্ত হন। পরে নিজেই সার্কাস দল গঠন করেন। সার্কাসে বুনো বাঘ নিয়ে তাঁর খেলা দেখবার

জন্যে সেকালে হাজার হাজার দর্শকের ভিড় হত। তাঁর দৈহিক শক্তি ও অত্যাশ্চর্য কৌশল দেখে দর্শকেরা মনে করত শ্যামাকান্ত ঐশ্বরিক বলে বলীয়ান। এই ভীমাকৃতি পুরুষের পরাক্রম দেখে জনতা আনন্দে উল্লসিত হয়ে তাঁকে জানাত স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। অবশেষে হঠাৎ তিনি মল্লজীবনে ছেদ টেনে ঘর-সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন মুক্তিসাধনের পথে।

নানাস্থানে পরিব্রাজনের পর শ্যামাকান্ত হিমালয়ের পাদদেশে এক সিদ্ধপীঠে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে দেখা পান এক মহাযোগীর। তাঁর প্রশ্নের জবাবে শ্যামাকান্ত বলেন, সাধারণ মানুষের চাইতে তাঁর দেহে শক্তি কিছু বেশি আছে বৈকি। যোগী একটি চিমটে হাতে নিয়ে সজোরে সেটাকে মাটিতে পুঁতে দিয়ে বললেন, 'দেহের শক্তির গর্ব করছ—বেশ, এই চিমটেটা টেনে তোল দেখি!' ঢাকার বিখ্যাত পালোয়ান অধর ঘোষের আখড়ায় কুস্তি শিখেছেন শ্যামাকান্ত, হিংস্র জন্তুর খাঁচার মধ্যে ঢুকে অবলীলায় তাদের সঙ্গে খেলা করেছেন, ১২-১৪ মণ ওজনের পাথর বুকের ওপর নিয়েছেন অবহেলায়—সেই পালোয়ান শ্যামাকান্ত চিমটেটি কিছুতেই মাটি থেকে তুলতে পারলেন না। যোগিবর হেসে বললেন, 'বেটা, তা হলে দেখছ, তোমার দেহের শক্তি কতটুকু? এই শক্তির এত গর্ব করছিলে তুমি?' শ্যামাকান্ত লজ্জিত হয়ে যোগিবরের কৃপা প্রার্থনা করলেন। তাঁর কাছেই সন্ধান পান তিব্বতী বাবার। তাঁর নির্দেশেই তাঁর চিহ্নিত গুরু তিব্বতী বাবার কাছে এসে উপস্থিত হন শ্যামাকান্ত।

১৮৯৯ সালের এক শুভক্ষণে লখনো শহরে তিব্বতী বাবা শ্যামাকান্তকে দীক্ষা দান করলেন। সেদিন হরিদ্বার থেকে সর্বস্তরের সন্ন্যাসীকে আনিয়ে তাঁদের সামনে শ্যামাকান্তকে দীক্ষাদানের পর তাঁর নূতন নামকরণ করা হল—সোহহং স্বামী।

সন্ন্যাস নেবার পর শুরু হল সোহহং স্বামীর তপস্যার পালা। গুরুপ্রদত্ত চৈতন্যমন্ত্রের ফলে তাঁর জীবনে এক অপূর্ব ধ্যানতন্ময়তা দেখা দিল। সেই ধ্যানস্থ ভাব একাদিক্রমে ছয় মাস তাঁর দেহমনকে আচ্ছন্ন করে রইল।

লোকচক্ষুর অন্তরালে একটি নিভৃত কুটিরে বসে সোহহং স্বামী কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। সেই সময়ে আহার-নিদ্রার কথা তিনি ভুলে গেলেন। পুত্রাধিক স্নেহে গুরু তিব্বতী বাবা শিষ্যের খাওয়া-পরা এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। অনেক সময়ে শিষ্যের শৌচক্রিয়ার পর মলমূত্রাদিও তাঁকে নিজের হাতে পরিষ্কার করতে হত।

এইভাবে ছয় মাস কেটে গেল। তিব্বতী বাবা তাঁকে একদিন বললেন—'শালা, আমি কি তোর চাকর না মেথর? আর কতকাল তোর পেছনে খাটব? এবার তুই নিজের পথ দ্যাখ। অনেক দূর তো এগিয়েছিস।'

সোহহং স্বামী কেঁদে আকুল হলেন। বললেন—'আমাকে বলে দিন কিভাবে কোথায় আমি থাকব?'

তিব্বতী বাবা বললেন—'জীবনের সবকিছু প্রতিষ্ঠা, সম্মান, স্ত্রীর মায়া সমস্ত ছেড়ে বেরিয়েছিস আত্মজ্ঞান লাভ করবার জন্যে। এজন্যে চাই নিরন্তর আত্মচিন্তন, আত্মধ্যান। শক্তি-বিভূতি তো সব সাধকের জীবনেই আসে—তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এগিয়ে যা—শুধু এগিয়ে যা। তাই আমার নির্দেশ—নৈমিষারণ্যে গিয়ে কিছুদিন সাধনভজন কর্। তারপর ডেরা বেঁধে বসে পড়্ হিমালয়ের কোন জায়গায়। আর দ্যাখ, সন্ন্যাসীরা প্রায়ই ভিক্ষা গ্রহণ করে বেশি বাড়াবাড়ি করে, ওটা করবি না। তোকে কয়েকটা কঠিন রোগের ওষুধ বাতলে দেব, তাতে লোকের প্রাণ বাঁচবে, আর তোর জীবিকার ভাবনাও তেমন ভাবতে হবে না।'

গুরুর কাছ থেকে শেষ উপদেশ ও মূল্যবান ওষধির সন্ধান নিয়ে সোহহং স্বামী বারাণসী ত্যাগ করলেন। নৈমিষারণ্যে গিয়ে শুরু করেন কঠোর সাধনা। একদিন এক দিব্য অনুভূতিতে অভিভূত হবার পর অলৌকিক আনন্দে তাঁর মনপ্রাণ ভরে যায়। এর পর তিনি প্রস্থান করেন হিমালয়ের দিকে।

১৯০৯ সালে সোহহং স্বামী বেদান্তবিষয়ে বাংলা পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত 'সোহহং গীতা', 'সোহহং তত্ত্ব', 'বিবেক-গাথা', 'সোহহং সংহিতা' ইত্যাদি গ্রন্থ তাঁর গভীর অধ্যাত্মজ্ঞানের পরিচয় বহন করে।

উত্তরকালে নৈনিতালের গোঠিয়াগাঁও-এ স্থাপন করেন নিজের ভজন কুটির। সেখানেই সাধনরত অবস্থায় ১৯১৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর একদিন চির-সমাধি লাভ করেন সোহহং স্বামী।

সন্তদাস বাবাজী



কলকাতা হাইকোর্টের নামকরা ব্যারিস্টার তারাকিশোর চৌধুরী। আয়ও তাঁর কম নয়। মনে তবু শান্তি নেই।

শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জের বনেদী জমিদার বংশে ১৮৫৯ সালের ১০ই জুন জন্ম হয় তারাকিশোরের। পিতা হরকিশোর চৌধুরী ছিলেন পরম বৈষ্ণব।

যে বছর তারাকিশোর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন সেই বছরই তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। পত্নী অন্নদা দেবী সুন্দরী ও নিষ্ঠাবতী। এম. এ. ও আইন পাস করে তারাকিশোর শ্রীহট্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। তারপর যোগ দেন কলকাতা হাইকোর্টে। কর্মনিষ্ঠা ও প্রতিভাবলে অল্পকালের মধ্যেই আইনজীবীদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। কিন্তু অন্তরে অনুভব করেন অধ্যাত্ম-জীবনের প্রেরণা।

তারাকিশোর প্রায়ই গঙ্গা স্নান করতেন। গঙ্গাতীরে বসে ধ্যান, জপ ও প্রার্থনা নিবেদনে তাঁর বহু সময় কেটে যেত। একদিন প্রার্থনা করতে করতে ব্যাকুলকণ্ঠে বলে উঠলেন--'মাগো, তুমি ত্রিতাপনাশিনী কলুষ-হারিণী। আমার পাপ কি এতই বেশি যে তোমার পবিত্র জলেও তা শুদ্ধ হল না?'

সহসা তারাকিশোরের চোখের সামনে ভেসে উঠল এক অলৌকিক দৃশ্য। হিমালয় থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে। সেই মূল গঙ্গোত্রী গোমুখী স্থানে বিরাজমান উমা-মহেশ্বর। মহেশ্বর দেব তাঁকে একটি একাক্ষরী বীজমন্ত্র দিয়ে বললেন--'এই মন্ত্র জপের দ্বারা তুমি যথার্থ সদ্‌গুরু লাভ করবে।'

মুহূর্তেই সেই অলৌকিক দৃশ্য মিলিয়ে গেল। এর তিন বছরের মধ্যেই তারাকিশোর সদ্‌গুরুর সন্ধান পেলেন। মহাযোগী কাঠিয়াবাবা মহারাজের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

দীক্ষাদানের পর গুরুদেব বললেন—'এখন বাড়ি গিয়ে সংসারধর্ম পালন কর্। সময় হলে সংসার থেকে বেরিয়ে আসবি।' তারাকিশোর তাই করলেন। কলকাতা হাইকোর্টেই ওকালতি চালিয়ে যেতে লাগলেন।

একবার তারাকিশোর গৃহত্যাগে কৃতসংকল্প হলেন। যাত্রার সমস্ত আয়োজন ঠিক করে তিনি শয়নঘরে গিয়েছেন। হঠাৎ দেখলেন সামনে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব মূর্তি। সারা ঘর পবিত্র সুগন্ধে ভরপুর। মুহূর্তের মধ্যেই মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গেল। শয়নকক্ষে কৃষ্ণ-দর্শন সম্বন্ধে বিবেচনা করে তারাকিশোর স্থির করলেন—আপাততঃ সংসারে তাঁর অবস্থানই ভগবানের অভিপ্রেত। তাই গৃহত্যাগ করলেন না।

কয়েক মাস পর তারাকিশোর সস্ত্রীক বৃন্দাবনে গিয়ে কাঠিয়াবাবা মহারাজের আশ্রয় নিলেন। শিষ্যের আন্তরিকতা বহুবার পরীক্ষা করেছেন বাবাজী। তারাকিশোরের স্ত্রীকেও তিনি কঠিন পরীক্ষার সামনে ফেলেছিলেন। একদিন অন্নদা দেবী কোন কাজে আশ্রমের বাইরে গিয়েছেন। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হল। বাবাজী শিষ্যদের বললেন সমস্ত জানলা-দরজা

বন্ধ করে দিতে। অন্নদাদেবী ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরে বসে ভিজতে থাকলেন। পরে বাবাজীর আদেশে দরজা খোলা হল। তারাকিশোর ও অন্নদাকে এইভাবেই কাঠিয়াবাবার কাছে সহ্যশক্তির পরীক্ষা দিতে হয়েছিল।

অনেকদিন পর একবার বৃন্দাবনে গিয়ে তারাকিশোর গুরুদেবের চরণ ধরে মিনতি করলেন—'প্রভু, নামজপ ও ভজন-পূজনের সময় আমার মন যে স্থির থাকছে না। আমার প্রতি আপনার কবে কৃপা হবে?' বাবাজী বললেন—'সংসারে থেকে আরও অনেক কল্যাণকর কাজ তোকে করতে হবে। সময়মত আমি বাঁধন খুলে দেব।'

কয়েক বছর পর সেই বাঁধন ছিন্ন করার সময় এল। ১৯১৫ সালের অগাস্ট মাসে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের কাজ ছেড়ে দিলেন।

বাড়ির অধিকাংশ জিনিসপত্র আগেই বেচে দিয়েছেন। যা অবশিষ্ট ছিল, তাও বিলিয়ে দিলেন। শুধু বৃন্দাবন যাওয়ার তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়াই সম্বল রইল। তারাকিশোর বৃন্দাবনে গিয়ে পৌঁছলেন। ছয় বছর আগেই গুরুদেব মরদেহ ত্যাগ করেছেন। আশ্রম যেন শ্রীহীন। বিষ্ণুদাসজী মোহান্ত পদে অধিষ্ঠিত হয়ে কোনরকমে আশ্রম পরিচালনা করছেন। তারাকিশোরকে মোহান্ত পদ দেবার জন্যে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু তারাকিশোর রাজি হলেন না। এমন সময় হঠাৎ একদিন তাঁর সামনে কাঠিয়াবাবার জ্যোতির্ময় মূর্তি আবির্ভূত হল। গুরুজী বললেন—'বেটা, তুই যেসব কাজ করছিস, তা কি নিজের শক্তিতে করছিস? তবে তোর ভয় কী?'

এক শুভদিনে তারাকিশোর কাঠিয়াবাবার আশ্রমে মোহান্ত নিযুক্ত হলেন। বৈষ্ণব প্রথানুযায়ী তাঁকে সন্ন্যাস দেওয়া হল। নতুন নামকরণ হল সন্তদাস।

'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।' এইভাবেই সন্তদাস শিষ্যদের সামনে যথার্থ আদর্শ তুলে ধরতেন। একদিন কার্যোপলক্ষে বৃদ্ধ বাবাজী মথুরায় গিয়েছেন। সন্ধ্যের পরেও ফিরছেন না দেখে শিষ্যেরা দুশ্চিন্তায় পড়ল। অনেক রাতে দেখা গেল, বড় একটি চাল-কুমড়ো কাঁধে নিয়ে বাবাজী আশ্রমে ফিরছেন। শিষ্যদের বললেন, 'সন্ধ্যেবেলা মথুরায় একটা এক্কা দরদস্তুর করলাম। এক টাকা ভাড়া চাইল। ঠাকুরজীর পয়সা অপব্যয় করব? তাই হেঁটেই চলে এলাম, কষ্টও কিছু হয়নি।'

১৩২৩ বঙ্গাব্দে বৃন্দাবনের অর্ধকুম্ভ মেলা উপলক্ষে চার সম্প্রদায়ের হাজার হাজার সাধু যমুনাতীরে জড় হয়েছেন; মোহান্ত সন্তদাস প্রাত্যহিক সাধুভোজনের বিরাট পর্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছিলেন। পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার দিন বৈষ্ণব মোহান্তরা চেপে ধরলেন, হাতিতে চড়ে রাজকীয় শোভাযাত্রা সহকারে সন্তদাস বাবাজীকে এই পরিক্রমা উদ্‌যাপন করতে হবে। কাঠিয়াবাবা মহারাজের মানসপুত্র সন্তদাস এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করে বৈষ্ণব সাধু পথপরিক্রমা করবেন—এ প্রস্তাব তিনি বাতিল করে দিয়ে পদব্রজেই সেদিন পরিক্রমা উৎসব সম্পন্ন করেন।

১৩২৩ সনের হরিদ্বার কুম্ভমেলায় ভোলানন্দ গিরি মহারাজ সন্তদাস বাবাজীকে সম্মেলনের সভাপতি পদে বরণ করেন। সমবেত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সাধুদের উদ্দেশে বাবাজী বলেন, 'শীতের অবসানে যেমন আম্রমুকুল উদ্‌গত হয়ে জানিয়ে দেয় ঋতুরাজ বসন্তের আগমনের আর বিলম্ব নেই, তেমনি বর্তমানে নানা ধর্মসম্প্রদায় নানা কর্মপদ্ধতি নিয়ে জনকল্যাণব্রতী যে সব সেবাকাজ করে চলেছেন, তা দেখে মনে হয়—ভারতের শুভদিন নিকটবর্তী। আপনারা স্ব স্ব সাধন ও আদর্শ প্রচারে চেষ্টিত থাকুন—কিন্তু মনে রাখবেন, ভগবৎ উপাসনাই সমস্ত কর্মের মুখ্য কেন্দ্রবিন্দু।'

১৩২৭ সনে সন্তদাসজী নাসিক কুম্ভমেলায় যোগদান করেন। সর্বভারতের বৈষ্ণব মণ্ডলীতে শ্রী, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী ও মাধ্ব—চারটি সম্প্রদায়েরই নিজ নিজ মোহান্ত রয়েছে। এঁরা সকলে মিলিত হয়ে একজনকে তাঁদের এই চার সম্প্রদায়ের প্রধানের পদে বরণ করেন। এই পরম সম্মানের পদ সেবার লাভ করলেন সন্তদাসজী।

১৩৪২ সনের কার্তিক মাসে শেষ বারের জন্যে সন্তদাসজী কলকাতায় এলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সঙ্গীদের বললেন—'আমার শরীরটা যাতে বৃন্দাবনে পৌঁছে তার ব্যবস্থা কর।' তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হল। জীবিত অবস্থায় তিনি বৃন্দাবনে ফিরলেন না। যমুনার ঘাটেই তাঁর দেহ সংকার করা হয়।

রামঠাকুর



১৮৬০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাঙলার ফরিদপুরের ডিঙামাণিক গ্রামে রামচন্দ্রের জন্ম। বাবা মাধব চক্রবর্তী ছিলেন গরিব ব্রাহ্মণ তন্ত্রসাধক। মা কমলাদেবী। ছেলেকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল, কিন্তু পড়াশোনা বেশি এগোল না। রামের বয়স যখন আট বছর তখন বাবা মারা গেলেন। সংসারে অভাব-অনটন বেড়ে চলেছে; আর ঘরে বসে থাকা চলে না। চাকরির সন্ধানে বেরিয়ে রাম ঘুরতে ঘুরতে এলেন নোয়াখালির ফেণীতে। নিরুপায় হয়ে এক উকিলের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। তারপর একদিন সেখান থেকেও রাত্রির অন্ধকারে নিরুদ্দেশ হলেন।

শক্তিসাধকদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ কামরূপ-কামাখ্যার কথা রাম অনেকের মুখেই শুনেছিলেন। এইবার সেখানে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে পয়সা কড়ি কিছুই নেই। সারাদিন উপবাসে কাটল। মন্দিরের এক কোণে বসে শুরু করলেন জপ সাধনা।

তখন অনেক রাত। হঠাৎ শোনা গেল কার ডাক—'রাম!' জপ বন্ধ করে রাম চমকে উঠলেন। এক সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন। দীর্ঘ দেহ, মাথায় জটা। রাম আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কয়েক বছর আগে স্বপ্নে এই মূর্তিই তিনি দেখেছিলেন; এই মহাপুরুষই স্বপ্নে তাঁকে দিয়েছিলেন বীজমন্ত্র। রাম সন্ন্যাসীর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। সন্ন্যাসী বললেন—'রাম, এসো আমার সঙ্গে।' মন্ত্রমুগ্ধের মত রাম তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলেন. কিছুদূর যেতেই সামনে পড়ল এক পাহাড়ের চড়াই। আরও একটু এগোতেই দেখা গেল ঘন জঙ্গলে ঢাকা এক পর্বত-গহ্বর। রামকে সঙ্গে নিয়ে সন্ন্যাসী গুহার ভেতরে ঢুকলেন।

দীক্ষা গ্রহণের সময় রামের কিন্তু বিস্ময়ের অবধি রইল না। যে বীজমন্ত্র তিনি স্বপ্নে পেয়েছিলেন, সেই মন্ত্রই সন্ন্যাসী তাঁর কানে প্রদান করলেন।

দীক্ষালাভের পর শুরু হল রামঠাকুরের পরিব্রাজক জীবন। গুরুর সঙ্গে কামাখ্যাধাম ত্যাগ করলেন। আরও দুই গুরুভ্রাতাও তাঁদের সহযাত্রী হলেন। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা উপস্থিত হলেন হিমালয়ের শিখরে এক গুহায় পরিব্রাজনের এই বিরতির সময়ে রামঠাকুরের অভিলাষ হল, গুরুদেবের একটু সেবাযত্ন করবেন। তাই কিছু ফলমূল সংগ্রহের জন্যে বেরোলেন।

কিন্তু ফলমূল কোথায় পাওয়া যাবে? কাছাকাছি কোন গাছ পর্যন্ত নেই। অবশেষে একটি টিলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। হঠাৎ দেখলেন এক অপরূপ যুগলমূর্তি টিলার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে রামচন্দ্র পরম ভক্তিভরে প্রণাম করতেই নারীমূর্তিটি তাঁর হাতে একটি ফল দিলেন। তারপর কোথায় যুগলমূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। ফিরে এসে রাম গুরুকে সব কথা জানাতেই গুরু বললেন—'বৎস, এ ফল তোমারই ভাগ্যে এসেছে, তুমিই আহার কর।' রাম ফলটি খেলেন।

পরিব্রাজনের পালা এবার শেষ হল। শুরু হল

কঠোর যোগসাধনার পালা। পর্বতের এক গুহায় গুরু তাঁকে বসিয়ে দিলেন। সেখানে মাসের পর মাস যোগ ও তন্ত্রের নানা প্রক্রিয়া চলতে লাগল।

এর পর গুরু বললেন, 'রাম, তুমি এবার লোকালয়ে ফিরে যাও। যোগ ও তন্ত্র সাধনার মহাশক্তি তোমার আয়ত্ত হয়েছে। এবার থেকে জীবের কল্যাণে তুমি লেগে পড়।'

গুরুকে প্রণাম করে রাম বিদায় গ্রহণ করলেন। একজন গুরুভ্রাতা তাঁকে একটি পবিত্র নারায়ণ শিলা প্রদান করে তাঁর সেবার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানালেন। রামঠাকুর এক পার্বত্য রাজার প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে নারায়ণ শিলার সেবাপূজার ভার নেবার জন্যে রাজাকে মিনতি করলেন। রাজা তখন সুরাপানে মত্ত, চারদিকে নর্তকী ও মোসাহেবদের ফুর্তি চলছে। ক্রুদ্ধ রাজা প্রহরীদের ডেকে রামঠাকুরকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। পথশ্রম ও ক্ষুৎপিপাসায় ঠাকুরের দেহ অবসন্ন। নারায়ণসেবাও হয়নি। একটি লতা ভেঙে ফেলতেই দুধের মতো রসধারা ঝরে পড়তে লাগল। তাই দিয়ে পবিত্র শিলাকে স্নান করালেন, বনের ফল পেড়ে ভোগ দিলেন। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এল। হঠাৎ একটি হিংস্র বাঘ এসে সামনে দাঁড়াল। কিন্তু আশ্চর্য, ঠাকুরকে দেখে সে তার হিংসাও ভুলে গেল। একটি বিষধর সাপ এসে পা জড়িয়ে ধরল; কিন্তু আশ্চর্য, সেও দংশন করতে ভুলে গেল। ঈশ্বরের অশেষ কৃপা লক্ষ করে রামঠাকুরের চোখ জলে ভরে আসে। শিলাখণ্ডটি পাশে রেখে বনের মধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। গভীর রাত্রে প্রচণ্ড চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। রক্ষিদল নিয়ে রাজা ও রানী খুঁজে খুঁজে সেখানে উপস্থিত। তাঁরা সেদিন রাতেই স্বপ্নে দেখেছেন, নারায়ণ ও ব্রাহ্মণকে লাঞ্ছনা করার জন্যে এক দেবতা তাঁদের অভিশাপ দিয়েছেন—বংশের সর্বনাশ হবে। তাই ঠাকুরের কাছে তাঁরা আজ নতজানু হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী। রামঠাকুর তাঁর ইষ্টদেবতার অলৌকিক লীলা দেখে বিস্ময়াভিভূত। রাজাকে বললেন—ওই বনের মধ্যেই নারায়ণের জন্যে মন্দির নির্মাণ করে তাঁর পূজার্চনার ব্যবস্থা করতে। রামঠাকুরের আদেশমতোই কাজ হল।

দীর্ঘকাল পর রামঠাকুর ঘরে ফিরলেন। জননীর আনন্দের সীমা নেই। সংসারে অভাব অনটন তখনও চলছে। রাম তাই চাকুরির খোঁজে বেরোলেন।

লেখাপড়া বিশেষ শেখেননি। ভাল চাকুরি পাওয়া সম্ভব নয়। অবশেষে নোয়াখালিতে পি. ডব্লিউ. ডি.র এক এঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে পাচকের কাজ গ্রহণ করলেন। এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক রামঠাকুরের ভিতর অলৌকিক কোন শক্তির পরিচয় পেয়ে রামঠাকুরকে রান্নাঘরের কাজ থেকে সরিয়ে, এক ওভারসিয়ারের সরকারের কাজ দিলেন। পরে রামঠাকুর বদলি হলেন ফেণীতে।

গুরুদেবের নির্দেশেই রামঠাকুর চাকুরি ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ একদিন ফেণী থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। সতের বছর পরে আবার ফিরে এলেন লোকালয়ে।

জীবের কল্যাণে, বিশেষ করে ভক্ত গৃহস্থের কল্যাণে ঠাকুর এইবার জোর দিলেন নামমন্ত্রের ওপর। পাপ-কলুষিত মানুষের মনের দুয়ারে এই নামমন্ত্রই তিনি পৌঁছে দিতে লাগলেন। ভক্তদের উৎসাহে ও চেষ্টায় চট্টগ্রামে কৈবল্যধাম, ডিঙামাণিক ও অন্যান্য জায়গায় আশ্রম গড়ে ওঠে। কিন্তু শেষ জীবনের কয়েক বছর তিনি চৌমোহনীতেই অবস্থান করেন।

একবার একটি রুগ্ন ছাত্র রামঠাকুরের কাছে এসে আরোগ্য প্রার্থনা করে। ছেলেটি কোন কলেজে পড়ে। পেটের এক্স-রে করিয়েও কোন ফল পাওয়া যায়নি। ঠাকুর তাকে বললেন, 'হরিনাম কর। রোজ ঠাকুরঘরে বসে একমনে হরিনাম করবে, সব ভাল হয়ে যাবে।' রামঠাকুর ছিলেন সিদ্ধবাক পুরুষ। তাঁর কথা মিথ্যা হবার নয়। ছাত্রটি বাড়ি ফিরে গিয়ে ঠাকুরের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। অল্পদিনের মধ্যেই তার রোগের উপশম হল।

ঠাকুর রামচন্দ্রদেবের উপদেশ ছিল—নাম করবার সময় শরীর বা নাকের ভিতর দিয়ে যে শ্বাসপ্রশ্বাস বয় সেদিকে লক্ষ রাখতে নেই। দেহের মধ্যে যে প্রাণ আছে, যে প্রাণ একই সঙ্গে দেহস্থিত ও দেহাতীত সত্তায় বিশ্বের সকল চেতন পদার্থে সঞ্চারিত রয়েছে সেই প্রাণের দিকে লক্ষ রেখে নাম করতে হয়। সুস্থিত হয়ে নীরবে ঐ নাম মনে মনে উচ্চারণ করতে করতেই প্রাণের সন্ধান পাওয়া যাবে।

এই মহাসাধক লীলা সংবরণ করেন ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের (ইং ১৯৪৯) ১৮ই বৈশাখ।

বালানন্দ ব্রহ্মচারী



'পীতাম্বর! ওরে পীতাম্বর, তুই কোথায় গেলি?' মা নর্মদাবাঈ তীর্থে তীর্থে ও তপোবনে খুঁজে বেড়ান তাঁর ঘরছাড়া সন্তানকে। নয় বছর বয়সের ছেলে, মা কত সাধ করে তার উপনয়ন দিলেন, কিন্তু কয়েকদিন পরই বিবাগী হয়ে কোথায় চলে গেল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে উজ্জয়িনীর এক সারস্বত ব্রাহ্মণকুলে বালকের জন্ম। শিশুকালেই হল পিতৃহীন। মায়ের একমাত্র নয়নের মণি পীতাম্বর।

ঘরছাড়া ছেলের সন্ধানে মায়ের ক্লান্তি নেই। দেখতে দেখতে চল্লিশ বছর কেটে গেল। যুবতী নর্মদা দেবী এখন বৃদ্ধা। তবু খুঁজে বেড়ান একমাত্র সন্তানকে।

চল্লিশ বৎসর পর। মা এসেছেন দেওঘরের সীমান্তে পাহাড়ের এক তপোবনে। ক্লান্ত বৃদ্ধা একটি পাথরের ওপর বসে ডাকলেন—'পীতাম্বর! আমার পীতাম্বর!'

এমন সময় ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন এক পরিণতবয়স্ক সুদর্শন সন্ন্যাসী। গোঁফদাড়িতে সমস্ত মুখ ঢাকা, মাথায় বিরাট জটা। বৃদ্ধার পায়ের ওপর মাথা ঠেকিয়ে বলে উঠলেন—'মা!'

বৃদ্ধা আনন্দে ও বিস্ময়ে নির্বাক্। সন্ন্যাসীর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে চিনতে পারলেন—এ যে তাঁরই পীতাম্বর।

কিন্তু সেই পীতাম্বর আর নেই। তিনি এখন বিখ্যাত যোগী বালানন্দ ব্রহ্মচারী।

দেওঘরের এই তপোবন-পাহাড়ে আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে দিয়েই বালানন্দ মহারাজের যোগিজীবন পূর্ণতা লাভ করে। একদিন শীতের রাত্রে ধুনির কাছে শুয়ে আছেন কম্বল গায়ে দিয়ে। মাঝরাত্রে যেন কে কম্বলটা ফেলে দিল ধুনির নিচে। সজাগ হয়ে বালানন্দ দেখেন কে একজন সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে পাহাড়ের উপরে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। নির্দেশকের পিছন পিছন বালানন্দ চলতে লাগলেন। অবশেষে পাহাড়ের শীর্ষে এক গুহার মধ্যে দুজনে প্রবেশ করলেন। লোকটি তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বালানন্দজী সমস্ত রাত্রি সেখানেই কাটালেন সমাধিস্থ অবস্থায়।

পীতাম্বর কিভাবে বালানন্দ ব্রহ্মচারী হলেন—তাও এক বিচিত্র কাহিনী। ঘর ছেড়ে অনির্দিষ্টভাবে বালক পথের পর পথ অতিক্রম করছিল। পথে সৌভাগ্যক্রমে দেখা হল নর্মদা-পরিক্রমকারী এক সাধুর সঙ্গে। সেই সাধু পীতাম্বরকে নিয়ে এলেন গঙ্গোনাথে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আশ্রমে।

বরোদা শহর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে নর্মদাতটে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ গঙ্গোনাথজী বিগ্রহ বিরাজিত। এঁরই সামনে মহাযোগী ব্রহ্মানন্দের আসন পাতা। পাশে প্রজ্বলিত ধুনি ও দীপ। ব্রহ্মানন্দের পাশে বসতেই পীতাম্বরের মনে কী যেন এক ভাবের সঞ্চার হল। সে বলল—'মহারাজ, আপনার চরণতলে আমাকে আশ্রয় দিন।'

মহারাজ হেসে বললেন -'জানি বেটা, তুমি এখানে আসবে। আসছে শ্রাবণী পূর্ণিমা দিন তোমাকে দীক্ষা দেব। কিন্তু তার আগে তুমি গ্রামে গ্রামে গিয়ে ভিক্ষা করে নিয়ে এসো। তোমার দীক্ষার দিনে গ্রামবাসীদের ও নর্মদা-পরিক্রমাকারী সাধুদের ভোজন করাব।'

ভিক্ষা সম্বল করে দীক্ষার দিনে এত লোককে ভোজন করানো সহজ ব্যাপার নয়। এত সামর্থ্য তার কোথায়? কাজেই পীতাম্বরের দুশ্চিন্তা হল। বালকের মনোভাব বুঝতে পেরে ব্রহ্মানন্দ নিজের ভিক্ষার ঝুলিটি দেখিয়ে বললেন—'আমার এই ভিক্ষার ঝুলিটির ভিতর ঋদ্ধি ও সিদ্ধি দুই-ই আছে। ভয় কী?'

কার্যতঃ তাই হল। মহারাজজীর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে আশাতীত ভিক্ষা লাভ হল। নির্দিষ্ট শুভলগ্নে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দিলেন। পীতাম্বরের নতুন নাম হল -বালানন্দ।

ব্রহ্মচারী বালানন্দ এইবার সাধনভজনে রত হলেন। সাত-আট মাস নিরবচ্ছিন্ন সাধন-ভজন করবার পর বাহির হলেন তীর্থ পরিক্রমায়। সেই যাত্রাপথেই গৌরীশঙ্কর মহারাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। এই গৌরীশঙ্করই হলেন বালানন্দের শিক্ষাগুরু। বালানন্দ তাঁর সঙ্গে সাত-আট বছর কাটান। তারপর বালানন্দের জীবনে শুরু হয় দীর্ঘ পথ পরিক্রমণের পালা। অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ভারতের অগণিত তীর্থ ও নগরে তিনি ঘুরে বেড়াতে থাকেন।

বালানন্দ বঙ্গদেশে কয়েকবার এসেছেন এবং বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছেন। এক সময় তিনি রানাঘাটে উপস্থিত হন। সেখানকার সার্বডিভিসনাল অফিসার রামচরণবাবু তাঁর ভক্ত ছিলেন। একবার রামবাবুর পিঠে কার্বাঙ্কল হওয়ায় তাতে অস্ত্রোপচার করতে হয়। রামবাবু তাঁর উপর ক্লোরোফরম প্রয়োগ করতে দেননি। যখন অস্ত্র করা হয় তখন তিনি একমনে গুরু বালানন্দের ধ্যান করতে থাকেন। কোন জ্বালাযন্ত্রণাই তিনি অনুভব করেন নি। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই গুরুর এক পত্র এল। তিনি তখন গিরণার পাহাড়ে বসে তপস্যা করছিলেন। ধ্যানস্থ অবস্থাতেই সেই অস্ত্রোপচারের দৃশ্যটি দেখেছিলেন। দেখেছিলেন রামবাবু তাঁকে একান্তমনে স্মরণ করছেন। চিঠি পেয়ে রামবাবু বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

রামচরণের দেহত্যাগের পর তাঁর পত্নীর অর্থানুকূল্যে যোগিবরের জন্যে করণীবাদে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে শিক্ষিতসমাজে বালানন্দজীর প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে। শিষ্যদের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি বিষয়ে তাঁর উপদেশ ছিল—

'চারো পরীক্ষামে যব শিষ্য উতরে
তব্ হী গুরু উস্‌কো পাকা ঠহরে।'

এই চারটি পরীক্ষা হচ্ছে—ঘর্ষণ, তাপন, ছেদন এবং তাড়ন। গুরু পাকা স্বর্ণকারের মতো শিষ্যদের জীবন দিয়ে অলঙ্কার তৈরি করছেন। প্রথমে কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ করে তিনি বুঝে নেন—ধাতুটি প্রকৃত সোনা না মেকি। এরপর তাপন, অর্থাৎ ত্যাগ-তিতিক্ষার অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বুঝা যায়, খারাপ ধাতুর মিশ্রণ, ময়লা ও গাদ কতটা কেটেছে। সবটা সহজে নিষ্কাশিত হয় না, তাই প্রয়োজন হয় ছেদনের। সবশেষে খাঁটি সোনা পরীক্ষার জন্যে লাগে তাড়ন, অর্থাৎ হাতুড়ির ঘা।

বালানন্দজীর সহজ উপদেশ ছিলঃ 'সব মেরা' মনোভাবটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলতে হবে—'সব তেরা' নিজের অহংবোধকে সরিয়ে ঈশ্বরকেই সর্বকর্মের নিয়ন্ত্রণকারী জ্ঞান করতে হবে; তিনিই মালিক, তুমি মালিক নও—ম্যানেজার মাত্র।

১৯০৬ সালে আবার গঙ্গোনাথ আশ্রমে যান বালানন্দ। মহাযোগী ব্রহ্মানন্দ এই সময় মহারুদ্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। অনুষ্ঠানশেষে বালানন্দকে বললেন, "এবার আমি নরদেহ ত্যাগ করব। পুরনো হয়ে গেছে এ দেহটা।" একদিন কুটিরে বসে ধ্যানস্থ হলেন ব্রহ্মানন্দ। বালানন্দ হঠাৎ দূর থেকে দেখেন গুরুজীর কুটিরে আগুন ধরে গেছে। তারপর সেই কুটির থেকে এক অগ্নিশিখা ঊর্ধ্বে উঠে আকাশে মিলিয়ে গেল। বালানন্দ বুঝলেন তাঁর গুরুজীর আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করে দিব্যধামে প্রস্থান করল।

শেষ জীবনে বালানন্দ দেওঘর বৈদ্যনাথ ধামে বাস করেন। তাঁর আশ্রম অল্পকালের মধ্যে এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। সেখানেই ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ (১৯৩৭ সাল) এই মহাযোগী পরমধামে প্রস্থান করেন।

স্বামী যোগানন্দ



দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর জন্ম হয়। তিনি পরমহংসদেবের নাম শুনেছিলেন। কিন্তু চোখে দেখেননি কখনও। একদিন দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির বাগানে বেড়াতে গিয়েছেন। একটি ফুল দেখে খুব লোভ হল। সামনেই দেখলেন সাধারণ পোশাক পরা একটি লোক। তাকে বাগানের মালি ভেবে ফুলটি তুলে দিতে বললেন। লোকটি ফুলটি তুলে দিয়ে আপন মনে চলে গেল।

পরে যোগীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন, যাঁকে মালি ভেবেছিলেন, তাঁকেই দক্ষিণেশ্বরের লোকেরা 'পাগলা বামুন' বলে, তিনিই সেই পরমহংস ঠাকুর রামকৃষ্ণ। ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, 'তবে তো তুমি আমাদের চেনা ঘর গো! তোমাদের বাড়িতে আমি তখন কত যেতুম, ভাগবত পুরাণ শুনতুম...জানা-শোনা হল, বেশ হল—এখানে যাওয়া-আসা করো। মহদ্বংশে জন্ম—তোমার লক্ষণ বেশ সব আছে। বেশ আধার—খুব হবে!' এর পর থেকে তিনি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসতে লাগলেন। ঠাকুরের সঙ্গগুণে তাঁর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হল। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর আর তিনি লেখাপড়া করতে চাইলেন না।

পিতা নবীনচন্দ্র ছেলেকে বিয়ে করিয়ে সংসারে বাঁধতে চেষ্টা করলেন। যোগীন্দ্রনাথ কিছুতেই বিয়ে করবেন না। অবশেষে মায়ের অনেক অনুরোধে রাজি হলেন। বিবাহ করে যোগিন মরমে মরে যেতে লাগলেন। দক্ষিণেশ্বরে যেতে সংকোচ হয়। ঠাকুর একদিন ডাকিয়ে আনলেন। বললেন, 'বে করেছিস—তা কী হয়েছে? এখানকার কৃপা থাকলে একটা কি, লাখটা বে-তেও তোর কিছু করতে পারবে না।'

বিবাহ করেও যোগীন্দ্রনাথ মা-বাবাকে সুখী করতে পারেননি। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত তাঁর বেড়েই চলল। ক্রমে ক্রমে আশ্রম-জীবনে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুললেন।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণেরও চরিত্র সম্পর্কে যোগীন্দ্রনাথ সন্দিহান হয়েছিলেন। ঠাকুরের ঘরেই যোগিন শুয়ে ছিলেন। মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে দেখেন, ঠাকুর ঘরে নেই। সন্দেহ হল, তবে কি তিনি নহবৎঘরে শ্রীমার ঘরে শুতে গিয়েছেন? তাই যদি হয় তা হলে কি ঠাকুরের মন আর মুখ এক নয়? পরে নিজেই যোগানন্দ বলেছেন—"স্থির করলুম, নিতান্ত কঠোর এবং রুচিবিরুদ্ধ হলেও যা সত্য তা জানতে হবে। নিকটবর্তী একস্থানে দাঁড়িয়ে নবতখানার দ্বারদেশ লক্ষ করতে থাকলুম। কিছুকাল ওরূপ করতে না করতে পঞ্চবটীর দিক থেকে চটিজুতার চট্ চট্ শব্দ শুনতে পেলুম এবং অবিলম্বে ঠাকুর এসে সম্মুখে দাঁড়ালেন। আমাকে দেখে বললেন, 'কীরে, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে?' তাঁর উপরে মিথ্যা সন্দেহ করেছি বলে লজ্জা ও ভয়ে জড়সড় হয়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলুম, ওই কথার কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

ঠাকুর আমার মুখ দেখেই সকল কথা বুঝতে পারলেন এবং অপরাধ গ্রহণ না করে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'বেশ বেশ, সাধুকে দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি'।"

যোগিন খেয়ানৌকায় দক্ষিণেশ্বরে আসছিলেন। যাত্রীরা সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে নিন্দাবাদ করছিল। ক্রুদ্ধ হয়ে যোগিন ভাবলেন নিন্দাকারীদের দু-চার কথা শুনিয়ে দেবেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, শ্রীশ্রীঠাকুরের মাহাত্ম্য এইসব সাধারণ লোক বোঝে না বলেই নিন্দা করছে তাঁকে। যোগিন শান্ত হয়ে রইলেন।

পরে ঠাকুরের কাছে ঘটনাটা বলতেই তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "অযথা আমার নিন্দে করল, আর তুই চুপ করে থাকলি? শাস্ত্রে আছে, গুরুনিন্দাকারীর মাথা কেটে ফেলবে নয়ত সেস্থান ত্যাগ করবে। আর তুই মিথ্যে রটনার কোন প্রতিবাদ করলি না?"

যে ছয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে ঈশ্বরকোটি বলে জগদম্বার কৃপায় ঠাকুর পরে জানতে পেরেছিলেন, যোগিন তাঁদের অন্যতম ছিলেন। বিবেকানন্দ বলতেন, 'আমাদের ভিতর যদি সর্বতোভাব কেউ কামজিৎ থাকে তো সে যোগিন।' রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে তিনি ছিলেন 'মাথার মণি'।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কাশীপুরে গুরুতরভাবে পীড়িত। গুরুগতপ্রাণ যোগিন তখন নিজের দেহের প্রতি লক্ষ না রেখে ঠাকুরের সেবায় মন ঢেলে দিলেন। ফলে গুরুতর পরিশ্রমে নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তা জানতে পেরে ঠাকুর ভর্ৎসনা করলেন যোগানন্দকে।

ঠাকুরের লীলাসংবরণের কিছুদিন পরে শ্রীমা বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। বৃন্দাবনে যোগানন্দকে একটি বিশেষ ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা দেবার জন্যে মা ঠাকুরের কাছে আদেশ পেলেন। তখন পর্যন্ত তিনি কাউকে দীক্ষা দেননি। তাই প্রথম ওই আদেশকে মনের খেয়াল ভেবে তিনি চুপ করে রইলেন। কিন্তু পরপর তিন দিন ওই ভাবে আদেশ পেয়ে অবশেষে যোগানন্দকে দীক্ষা দিলেন।

ঠাকুরের চরিত্রে ভুল সন্দেহপ্রকাশের সেই রাত্রিতেই চন্দ্রালোকে নহবৎশীর্ষে শ্রীসারদামণিকে সমাধিস্থ অবস্থায় দেখে যোগিনের মনে দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছিল, মা সাধারণ মানবী নন। সেদিন থেকেই তিনি প্রকৃত মাতৃভক্ত হয়েছিলেন এবং ঠাকুরের দেহত্যাগের পর নিজের জীবন প্রধানতঃ মাতৃসেবাতেই নিয়োগ করেছিলেন।

বৃন্দাবনে শ্রীমা এক বছর বাস করেন। এই সময়ে মায়ের সেবার পূর্ণ দায়িত্ব ছিল যোগানন্দের উপর। হরিদ্বার, পুষ্কর, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থান পরিক্রমা করে তাঁরা কলকাতায় ফিরে আসেন। এর পর যোগানন্দ হলেন শ্রীমায়ের নিত্যসঙ্গী।

স্বামী বিবেকানন্দকে যোগানন্দ খুব ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। একদিন তিনি বললেন—'নরেন নর-ঋষির অবতার। নরেনের মধ্যে ঋষির বেদজ্ঞান, শঙ্করের ত্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, শুকদেবের মায়ারাহিত্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণবিকাশ রয়েছে।' স্বামিজী আমেরিকা থেকে ফিরে এলে যোগানন্দ অগ্রণী হয়ে তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। ১৮৯৫ সালে তাঁরই প্রেরণায় ও উদ্যোগে দক্ষিণেশ্বরে ঘটা করে ঠাকুরের জন্মোৎসব পালনের সূচনা হয়।

কঠোর পরিশ্রম এবং অতিরিক্ত নিয়ম আচরণ মেনে চলার ফলে যোগানন্দের স্বাস্থ্য কোনদিনই ভাল ছিল না। যোগানন্দ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে বিবেকানন্দ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে আলমোড়া থেকে খবর দিলেন 'যোগেনের চিকিৎসার যেন কোন ত্রুটি না হয়। আসল ভেঙেও টাকা খরচ করবে।' সবরকম চিকিৎসা সত্ত্বেও কোন ফল হল না। অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে দেখে স্বামিজী কলকাতা চলে এলেন। একদিন বললেন —'যোগিন তুই বেঁচে ওঠ, আমি মরি।'

অসুখের যখন খুব বাড়াবাড়ি তখন শ্রীমা যোগানন্দের স্ত্রীকে বলরাম-মন্দিরে নিয়ে এলেন। যোগানন্দ আপত্তি করে বললেন—'মৃত্যু যখন আসন্ন, তখন এই শেষ মুহূর্তে আবার স্ত্রীর সেবাগ্রহণ করা কেন?' কিন্তু মায়ের আদেশ শেষ পর্যন্ত অমান্য করতে পারলেন না।

১৮৯৯ সালের ২৮শে মার্চ স্বামী যোগানন্দ পরমব্রহ্মে লীন হয়ে গেলেন।

যোগানন্দের জীবনাবসানের পর স্বামী বিবেকানন্দ বললেন—'কড়ি খসলো। এবার ধীরে ধীরে বর্গা সবও খসে পড়বে।' শ্রীমা বললেন—'বাড়ির একখানি ইট খসলো। এবার সব যাবে।'

স্বামী প্রেমানন্দ



সুন্দর সুঠাম কিশোর ছেলেটিকে দেখে পল্লীবাসীর চোখ জুড়িয়ে যায়। নাম তার বাবুরাম। হুগলি জেলার আঁটপুর গ্রামের তারাপদ ঘোষের ছেলে। জন্ম ১২৬৮ সনের ২৬শে অগ্রহায়ণ; ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৬১ সাল। বাবুরামের অল্প বয়সেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়।

বাবুরাম ইতিপূর্বে রামকৃষ্ণদেবের কথা সংবাদপত্রে পড়েছেন, লোকমুখেও শুনেছেন। দূর থেকে অজ্ঞাতসারে হরিসভায় একবার দর্শনও করেছেন; কিন্তু কেমন করে তাঁর কাছে যাবেন? এক শনিবার বিদ্যালয়ের ছুটির পর সতীর্থ রাখালচন্দ্র তাঁকে সঙ্গে করে দক্ষিণেশ্বর এলেন। ভাবাবিষ্ট রামকৃষ্ণকে সেদিন দর্শন করেই মুগ্ধ হলেন বাবুরাম। ক্রমে ক্রমে বাবুরামের দক্ষিণেশ্বরে আসবার একটা বিশেষ নেশা ধরে গেল।

একদিন জননী মাতঙ্গিনী দেবীকে নিয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপস্থিত হলেন। রামকৃষ্ণ দু-একটি ভগবৎ প্রসঙ্গের পর বাবুরাম-জননীকে বললেন—'তোমার এই ছেলেটিকে এখানে দাও।' পরমা ভক্তিমতী মাতঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ উত্তর করলেন—'আজ্ঞে, বাবুরাম আপনার সেবক হয়ে থাকবে, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।'

১৮৮২ সালের ডিসেম্বরের একটি দিন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরবাড়িতে আরতি হচ্ছে। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। ভাব উপশমের পর বলছেন, 'মা, ওকেও টেনে নাও। ও অত দীনভাবে থাকে! তোমার কাছে আসা-যাওয়া করছে!' সেদিন বাবুরামের কথাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন। আর একদিন (২০-৬-৮৪) ঠাকুর বলছেন, 'বাবুরামকে দেখলাম—দেবীমূর্তি। গলায় হার। সখিসঙ্গে। ও স্বপ্নে কী পেয়েছে, ওর দেহ শুদ্ধ, একটু কিছু করলেই ওর হয়ে যাবে।' রামকৃষ্ণ যখন ভাবস্থ হতেন তখন তাঁর অর্ধবাহ্যজ্ঞান অবস্থায় যাঁরা পাশে থাকেন তাঁরা সব অবস্থাতে তাঁকে ছুঁতে পারেন না। ঠাকুর সে সময় সঙ্কেত করে বাবুরামকে বলছেন, 'হ-ছু-না-রা-ছু—এ অবস্থায় আর কাকেও ছুঁতে দিতে পারি না—তুই থাক্ তা হলে ভাল হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে নবাগত সব যুবকদেরই দৈহিক লক্ষণ পরীক্ষা করতেন। তিনি মনে করতেন যে, দৈহিক লক্ষণ দেখেই একজন মানুষের আধ্যাত্মিক চরিত্রটি বোঝা যায়। তিনি চোখ পরীক্ষা করতেন, কনুই থেকে হাতের ওজনও পরীক্ষা করতেন। লঘু হলে বলতেন এর বোধশক্তি হিতকর। রামকৃষ্ণ বাবুরামেরও কনুই থেকে হাতের ওজন পরীক্ষা করে বললেন, বেশ! অল্প যে ক'জনকে রামকৃষ্ণ তাঁর দিব্যদেহ স্পর্শ করার অধিকার দিয়েছিলেন, বাবুরাম তাঁদের অন্যতম।

৭ই মার্চ, ১৮৮৫। শ্রীম-র কথামৃত থেকে অমর জীবনালেখ্য তুলে ধরা যাকঃ

"ঠাকুর বাবুরামের দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন। মাস্টার যে স্কুলে অধ্যাপনা করেন, বাবুরাম সে স্কুলে এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়েন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বাবুরামের প্রতি)॥ তোর বই কৈ?

পড়াশুনো করবি না? (মাস্টারের প্রতি) ও দুদিক রাখতে চায়। বড় কঠিন পথ, একটু তাঁকে জানলে কী হবে! বশিষ্ঠদেব, তাঁরই পুত্রশোক হল! দেখে, লক্ষ্মণ অবাক হয়ে রামকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাম বললেন, ভাই, এ আর আশ্চর্য কী? যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। ভাই, তুমি জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও! পায়ে কাঁটা ফুটলে, আরেকটি কাঁটা খুঁজে আনতে হয়; সেই কাঁটা দিয়ে প্রথম কাঁটাটি তুলতে হয়, তারপর দুটি কাঁটাই ফেলে দিতে হয়। তাই অজ্ঞান-কাঁটা তুলবার জন্যে জ্ঞান-কাঁটা যোগাড় করতে হয়। তারপর জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে হয়!

বাবুরাম (সহাস্যে)॥ আমি ওইটি চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)॥ ওরে, দুদিক রাখলে কি তা হয়? তা যদি চাস্ তবে চলে আয়!

বাবুরাম (সহাস্যে)॥ আপনি নিয়ে আসুন!"

বাবুরাম সম্বন্ধে ঠাকুর বলতেন, 'ও আমার দরদী!' আবার সুর করে গাইতেন—'মনের কথা কইব কী সই—কইতে মানা। দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না!'

মঠজীবনে বাবুরাম পরিচিত হলেন প্রেমানন্দ মহারাজ নামে। বিবেকানন্দ প্রেমানন্দকে এত ভালবাসতেন যে, বেলুড়মঠে আহারের সময় মাঝে মাঝে তাঁকে সাদরে নিজের পাশে বসাতেন এবং উভয়ে পরস্পরের পাত্র থেকে অন্নব্যঞ্জন তুলে খেতেন।

১৮৯৭ সালের ১লা মে স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন। তাঁর দেহত্যাগের পর মিশনের কাজ ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করলে কাজের সুবিধার জন্যে ১৯০৯ সালে স্বামী প্রেমানন্দ তার কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন। মহামারী, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে রামকৃষ্ণমিশনের সন্ন্যাসীরা এগিয়ে আসতেন। মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের মধ্যে থেকে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করে তাঁদের সেবাকার্যে পাঠাতেন স্বামী প্রেমানন্দ এবং প্রয়োজন হলে তিনি নিজেও যেতেন। তিনি বহুবার বরিশাল, ময়মনসিংহ, মালদহ, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে সেবাকার্যে গিয়েছেন।

স্বামিজীর বাণী, "জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"—এই মহাপুরুষের আচরণে সেই বাণীর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা যেত।

১৯১৫ সালের মে মাসে ঢাকা থেকে বেলুড় মঠে ফিরে এসে কিছুদিন পরে প্রেমানন্দ কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। রোগমুক্ত হবার পর তিনি স্বাস্থ্য-লাভের উদ্দেশ্যে পুরীধামে যান। সেখান থেকে ফিরে আবার মঠের কাজকর্ম দেখাশোনা করতে লাগলেন। সে সময় মঠের ভক্তসংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছিল। ভক্তদের সঙ্গে তিনি সর্বদা ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করতেন, নানাবিধ সৎকাজে তাঁদের উৎসাহ দিতেন। এ ভাবে বহু মানুষ আধ্যাত্মিক সাধনায় ও সৎকাজে প্রেরণা লাভ করত।

প্রেমানন্দের ছিল ভারি মিষ্টি স্বভাব। সবাই তাঁকে ভালবাসে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'ওর প্রকৃতি-ভাব'। আরও বলতেন, 'ও একেবারে নতুন আধার। দুধ রাখলে টকে যাবে না।' তবুও এই আত্মভোলা মানুষটিই ১৯০২ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠের প্রধান রূপে অসংখ্য শিক্ষানবিস ভক্তদের লোকশিক্ষা দিয়ে গেছেন। ভক্তদের প্রতি প্রেমানন্দের স্নেহ-ভালবাসা ছিল অফুরন্ত। নবাগতদের যত ত্রুটিই থাকুক না কেন, প্রেমানন্দ তা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতেন। তবুও তিনি ভক্তদের বলতেন, "তোদের কি আমি যথার্থ ভালবাসি? না—কারণ তেমন করে ভালবাসতে পারলে তোদের আমি চিরকালের জন্যে বেঁধে রাখতুম। ঠাকুর আমাদের কতই না ভালবাসতেন। তাঁর ভালবাসার শতাংশের একাংশও তোদের আমি দিতে পারিনি।"

১৯১৮ সালে স্বামী প্রেমানন্দ জ্বরে ও পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হন। শরীর জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়ল। তাঁকে তখন পাঠানো হল মধুপুরে। সেখানে তিনি ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠছিলেন, কিন্তু হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ তাঁর জীর্ণ দেহকে আক্রমণ করল। ডাক্তারের পরামর্শে তাঁকে কলকাতায় তাঁর ভগিনপতি রামকৃষ্ণ-ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে রাখা হল।

জীবনদীপ ধীরে ধীরে নিভে আসতে লাগল। স্বামী প্রেমানন্দ মহাসমাধিতে লীন হচ্ছেন দেখে মঠের সাধুবৃন্দ মধুর রামকৃষ্ণ নাম কীর্তন করতে লাগলেন। সেই পবিত্র নাম শুনতে শুনতে ৩০শে জুলাই, ১৯১৮ প্রেমঘনমূর্তি প্রেমানন্দ ধীরে ধীরে মহাসমাধিতে বিলীন হলেন।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ



ছেলেবেলায় লাটুর নাম ছিল রাখ্‌তু-রাম। শৈশবে নাকি বসন্তরোগের আক্রমণে তার প্রাণসংশয় উপস্থিত হলে তার মা শ্রীরামচন্দ্রের কাছে সন্তানের জন্যে আকুল প্রার্থনা জানান। শিশু সুস্থ হলে মায়ের ধারণা হল, শ্রীরামচন্দ্রই পুত্রকে রক্ষা করেছেন। তাই তার নাম হয় রাখ্‌তু-রাম। বিহারের ছাপরা জেলার এক গ্রামে এক মেষপালকের ঘরে ১৮৬২ সালে তার জন্ম। বাবা-মা ছিলেন অতি গরিব। রাখ্‌তু-রাম মাত্র পাঁচ বছর বয়সে অনাথ হয়। তারপর কাকার সঙ্গে কলকাতায় আসার পর রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে কাজ পায়। দত্তবাড়িতে এই পরিশ্রমী, সচ্চরিত্র বালকটির আদরের নাম হল লাল্‌টু।

রামচন্দ্র দত্ত ঠাকুরের পরম ভক্ত। লাল্‌টুকে সঙ্গে নিয়ে এলেন একদিন দক্ষিণেশ্বরে।

ঠাকুর ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে একটু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কীরে, বাড়ি কোথায়?'

—ছাপরা জেলায়।

—এখানে থাকিস কার কাছে?

—রামবাবুর বাড়িতে চাকরি করি।

'ইস্, তোর মুখ যে শুকিয়ে গেছে। কিছু খাস্‌নি বুঝি? আয়, খাবি।' বলে ঠাকুর তাকে খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন। কাছে বসিয়ে নিজের অন্ন থেকে অন্ন তুলে দিলেন লাল্‌টুর পাতে। বালক লাল্‌টু ভোজন করে পরিতৃপ্ত হল।

লাল্‌টু ঠাকুর রামকৃষ্ণের পরম প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। রামচন্দ্র দত্তের বাড়ির চাকুরি ছেড়ে ঠাকুরের কাছেই রয়ে গেল। ঠাকুর তাকে সস্নেহে ডাকতেন লাটু, লেটো, নোটো, ইত্যাদি নানা নামে। পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্বামী অদ্ভুতানন্দ নামে তিনি পরিচিত হন।

ঠাকুর লাটুকে শুধু সেবকরূপেই গ্রহণ করলেন না, তাঁর শিক্ষকের দায়িত্বও নিলেন। বর্ণপরিচয় কালে ব্যঞ্জনবর্ণে এসে লাটু তাঁর বিহারী সংস্কারানুসারে ক-কে বলেন কা, খ-কে বলেন খা। ঠাকুর যতই বলেন—ওরে, ওটা ক—লাটু ততই বলেন—কা। ঠাকুর বলেন, 'আরে, এখানেই যদি কা বলবি, তবে ক-য়ে আকারকে কী বলবি?' তবু লাটুর সেই এক কথা—কা। হতাশ হয়ে ঠাকুর তখন বললেন, 'যা, আর তোর পড়ে দরকার নেই।' লাটুর বিদ্যাচর্চার এখানেই ইতি। পুঁথিগত বিদ্যা শুরুতেই শেষ হলেও ঠাকুর তাকে অধ্যাত্মবিদ্যায় পরিপূর্ণ করে দিতে লাগলেন। লাটু মহারাজ বলতেন, 'ঠাকুর আমায় কত শেখাতেন, কত বুঝাতেন। নেশা করতেও শেখাতেন—যে-সে নেশা নয়—একদম রাজা (ভগবানের) নেশা। ঠাকুর আমায় টেনে নিলেন। তিনি বলতেন—দ্যাখ্, দিল্ সাফ রাখবি, আর গরদা (অহঙ্কার) ঢুকতে দিবি না।' একদিন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল্ দিকিনি, তোর রামজী এখন কী করছেন? ওরে, এখন তোর রামজী সুচের ভিতর হাতি চালাচ্ছেন।'

লাটু পরে একথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে মন্তব্য

করেছিলেন, 'আমার এতটুকু আধার—আমার মধ্যে তিনি সাধন ঢেলে দিচ্ছিলেন।' লাটু মহারাজ বিহারী ও বাংলা ভাষা মিশিয়ে এক অপূর্ব চিত্তাকর্ষক ভাষায় কথা বলতেন।

শ্যামপুকুরে একদিন তাঁর গভীর ভাবাবেশ হল। ভাবাবেশে গায়ের জামা ছিঁড়তে লাগলেন। ঠাকুর তাড়াতাড়ি জামাটি খুলে দিয়ে তাঁর বুকে শ্রীহস্ত বুলিয়ে দিলেন। চরিতামৃতে আমরা পাই ভক্ত পুণ্ডরীকের কথা—যিনি গদাধর মুকুন্দের মুখে শ্রীভাগবত-সঙ্গীত শুনে সমস্ত সজ্জা ছিঁড়ে ফেলে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়েছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরেই লাটুর একদিন নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। সেদিন ঠাকুর লাটুর মাথায় হাত বুলোচ্ছিলেন। একটু পরেই তাঁর গভীর সমাধি হল। অন্যান্য ভক্তরা তাঁর গায়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল। ঠাকুর বললেন—'ওকে আর বিরক্ত করিসনি, ওর মন কি এ জগতে আছে!'

লাটু মহারাজ একবার ছিলেন কাশীতে। সেই সময়ে একজন স্ত্রীলোক স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে আত্মীয়দের প্ররোচনায় তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছিল। লাটু মহারাজ কী করে সেই ব্যাপার জানতে পারলেন। স্ত্রীলোকটি যখন আত্মীয়দের সঙ্গে লাটু মহারাজকে প্রণাম করতে গেল, তখন তিনি তাকে উপলক্ষ করে বললেন—'দেখ! স্ত্রীদের স্বামীকে মেনে চলতে হয়। যে মানে না, তার সংসারে অশান্তি লেগেই থাকবে।'

এই দলের মধ্যে দুজন বিধবা লাটু মহারাজের পায়ের কাছে দুটি টাকা রেখে প্রণাম করেছিল। টাকা দেখে লাটু মহারাজ তাদের বললেন—'হামনে কি তোমাদের গুরু গোঁসাই আছে যে টাকা দিয়ে প্রণাম করছ? ও টাকা হামনে লিবে না!' তিনি বলতেন গরীব আর বিধবার টাকা সন্ন্যাসীকে নিতে নেই।

সেই বছর কোন এক ভক্ত দুর্গাপূজোর সময় কাশীতে গিয়েছিলেন। ভক্তটি ছ'বছর হল বিয়ে করেছেন, দুটি ছেলেমেয়েও হয়েছে। কাশীতে ছোট ছেলেটির চূড়াকরণ উৎসব উপলক্ষে গিয়েছিলেন। তাঁকে লাটু মহারাজ বলেছিলেন—'দেখ! ছেলে হলেই হয় না—বাঁচাই হল প্রধান। এইতো মাইনে পাও, তার ওপর যদি অনেকগুলো ছেলে হয়, খেতে দেবে কী? তাই তো ঠাকুর বলতেন—দু'একটা ছেলেমেয়ে হবার পর (স্বামীস্ত্রীতে) ভাইবোনের মতো থাকতে হয়। অল্প ছেলেমেয়ে হলে তবু দুমুঠো তাদের পেট ভরে খেতে দিতে পারবে, ভালমন্দ দু'একটা পরাতেও পারবে, অনেকগুলো হলে তো আর পেরে উঠবে না। তখন তো কেবল ভাবতে হবে কী করে ছেলেমেয়েদের খাওয়াবে, পরাবে, মানুষ করবে, বিয়ে-থা দেবে।'

অদ্ভুতানন্দ শিষ্যদের ভগবানের নামজপ করতে বলতেন। এক শিষ্য বলে উঠল, "যাঁকে দেখিনি তাঁর নামজপ কী করে করব?" লাটু জবাব দিয়েছিলেন, "ভগুয়ানকে দেখনি তো কী হয়েছে? তুম্ তো তাঁর নাম জানো? দপ্তরমে কাম করতে গেলে দরখাস্ত্ ভেজতে হোয়। যাঁর নামে দরখাস্ত্ লিখবে তাঁকে তো পহচানো না। তব? ওহি মতলবমে ভগুয়ানকে নাম মে দরখাস্ত্ ছোড় দো। উন্‌কা কৃপা জরুর মিলবে।" শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা-পরিচর্যার পর ধ্যান করবার সময় কখন পেতেন—এ প্রশ্নের উত্তরে লাটু বলতেন, "ঠাকুরের সেবাই হল হামার ধ্যান!"

লাটু মহারাজ শেষ সময়ে যখন রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন তখন একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'মহারাজ! আপনারা ভগবানকে দর্শন করে জগতের সম্বন্ধে কী বুঝলেন, বলুন।' তাতে লাটু মহারাজ বলেছিলেন—'দেখ, এটুকু বুঝেছি যে এক ভাঁড় জল আলাদা করে রেখে দিলে তা শুকিয়ে যায়, বাকি সেই ভাঁড়কে যদি গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখতে পারি, তাহলে জল আর শুকোতে পারে না। তেমনি এই জগতে আমাদের মনকে যদি ভগবানের পায়ে সঁপে দিতে পারি, বিষয়-বাতাসে মন আর শুকিয়ে উঠতে পারবে না।'

১৯২০ সালে লাটু মহারাজ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তারেরা তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করতে বাধ্য হন। উপর্যুপরি তিন-চারদিন ডাক্তারেরা তাঁর শরীরে অস্ত্রোপচার করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, অস্ত্রচালনার সময় লাটু মহারাজ একটুও অস্থির হতেন না। স্বেচ্ছায় ডাক্তারের দিকে পা বাড়িয়ে দিতেন।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে থেকেই লাটু মহারাজ খাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। 'মৎ খা'—এই ছিল তাঁর শেষ মায়ানির্মুক্ত উক্তি। ১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল তিনি মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করলেন।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ



প্রচুর অর্থশালী এক ব্যক্তি আঠার বছর যাবৎ অনিদ্রা রোগে ভুগছেন। কোন চিকিৎসাতেই তাঁর ফল হচ্ছে না। তিনি এসে নিত্যনিরঞ্জন ঘোষের শরণাপন্ন হলেন। নিত্যনিরঞ্জন এক ভুতুড়ে দলে যাতায়াত করেন। সেই ভুতুড়ে দলটি নিরঞ্জনের মাধ্যমে (মিডিয়ম) ভূত আনিয়ে বহু অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সাধন করে এবং বহুলোকের দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করে।

সেই ধনী লোকটি নিরঞ্জনের কাছে আসার পর তাঁর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হল। ভাবলেন, এত ধন-সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও যখন মানুষ সুখী হতে পারে না, তখন সেই ধনের লোভ করে লাভ কী?

লোকমুখে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত ভগবৎপ্রেমের কথা শুনে নিরঞ্জন একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর বাড়ি ২৪-পরগনা জেলার রাজারহাট বিষ্ণুপুর গ্রামে। জন্ম ১৮৬২ সালে। কলকাতায় মাতুলালয়ে থেকে পড়াশোনা করতেন। কয়েকদিন দক্ষিণেশ্বরে আসার পর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের খুবই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। একদিন ঠাকুর বললেন—'ওরে নিরঞ্জন, দিন যে যায় রে—তুই কবে ভগবান্ লাভ করবি?' সেই থেকে নিরঞ্জন দক্ষিণেশ্বরে থাকাই স্থির করলেন। তার বয়স তখন আনুমানিক আঠার বছর। সুন্দর চেহারা, দীর্ঘ আকৃতি; চোখে যেন নির্মল জ্যোতি প্রতিভাত হত। নিরঞ্জনানন্দ সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছিলেন—রামচন্দ্রের অংশে তাঁর জন্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ দীক্ষা দিলেন নিরঞ্জনকে। লাটু মহারাজের কথায়—'নিরঞ্জন ভাইকে ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে ছুঁয়ে দিলেন। তাতেই তিন দিন, তিন রাত্রি তার চোখের পাতা পড়েনি, কেবল জ্যোতি দেখেছে আর জপ করেছে। তিন দিন জিব থেকে তার জপ ছুটে যায়নি। ভারী ভূত নামাত কিনা, তাই ঠাকুর মস্করা করে বলেছিলেন—এবার আর যে-সে ভূত নামেনি, একেবারে ভগবান্-ভূত ঘাড়ে চেপেছে। তোর সাধ্য কী যে তুই তাকে ঘাড় থেকে নামাস!'

বলরাম ভবনে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় একদিন ঠাকুর বলেছিলেন, আলেখ্ নিরঞ্জন। নিরঞ্জন, আয় বাপ—খা রে, শো রে—কবে তোরে খাইয়ে জন্ম সফল করব! তুই আমার জন্যে দেহধারণ করে নররূপে এসেছিস।' ওইদিনই তিনি ভক্তদের বলেছিলেন, 'দেখ না নিরঞ্জন! কিছুতেই লিপ্ত নয়। নিজের টাকা দিয়ে গরিবদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়। বিবাহের কথায় বলে—বাপ্ রে, ও বিশালাক্ষীর দ! ওকে দেখি যে একটা জ্যোতির ওপর বসে রয়েছে।' শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনকে অশেষ স্নেহ করতেন, কারণ তাঁর 'লেনা-দেনা নেই; যখন ডাক পড়বে, যেতে পারবে'।

ঠাকুর শ্রীমুখে বলেছেন, 'এ ছোকরাটি বড় সরল। সরলতা পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না। কপটতা পাটোয়ারী এসব থাকতে ভগবানকে পাওয়া

যায় না।' নিরঞ্জনের বৃদ্ধা মার ভরণপোষণের জন্যে তাঁকে চাকুরি নিতে হয়। ঠাকুর তাঁকে বললেন, 'দ্যাখ্, তোর মুখে যেন একটা কালো আবরণ পড়েছে। তুই আফিসের কাজ করিস কিনা, তাই পড়েছে। আফিসের হিসাবপত্র করতে হয়—সর্বদা ভাবতে হয়। সংসারী লোকেরা যেমন চাকরি করে, তুইও চাকরি করছিস। তবে একটু তফাৎ আছে। তুই মার জন্যে চাকরি স্বীকার করেছিস। মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ীস্বরূপা।'

ইশারউড তাঁর গ্রন্থে নিত্যনিরঞ্জন সম্পর্কিত একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন: "ভালমানুষ হলেও নিরঞ্জনের ক্রোধ ছিল উগ্র। একদিন খেয়ানৌকায় চড়ে নিরঞ্জন দক্ষিণেশ্বরে আসছেন। সঙ্গে আরও অনেক যাত্রী। তারা সবাই অকারণে রামকৃষ্ণের নিন্দেমন্দ করছিল। বলাবলি করছিল যে রামকৃষ্ণ ত্যাগী নন; এ নাকি তাঁর এক ঢং। ভাল খাচ্ছেন, গদিতে শুচ্ছেন আর ধর্মের ভান করে ইস্কুলের ছেলেদের মাথা খাচ্ছেন। এমন অকারণ নিন্দামন্দ শুনে নিরঞ্জন প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু কেউ নিরস্ত হল না দেখে, ক্রোধে আত্মহারা হয়ে নৌকোটি মাঝনদীতে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। অন্য আরোহীরা নিরঞ্জনের ক্রোধদৃপ্ত মূর্তি দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে কোনক্রমে সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিল।...রামকৃষ্ণ সে কথা জানতে পেরে নিরঞ্জনকে সেদিন যথেষ্ট তিরস্কার করলেন: ক্রোধ চণ্ডাল; ক্রোধের বশীভূত হতে আছে? হীনবুদ্ধি লোকে কত কী অন্যায় বলে; তা নিয়ে বিবাদ করতে গেলে সারা জীবনটা তাতেই কাটাতে হয়। এমন অবস্থায় ভাববি, লোক না পোক্ (কীট) এবং তাদের কথা উপেক্ষা করবি। দাঁড়ি-মাঝিরা তোর কী অপরাধ করেছিল যে সেই গরিবদের ওপরেও অত্যাচার করতে গিয়েছিলি!"

শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের শেষ অবস্থায় ভক্তরা যখন-তখন যাকে-তাকে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দিতেন না। এই অপ্রিয় কার্যটির ভার দেওয়া হল নিত্যনিরঞ্জনকে। একদিন রাম দত্ত এসেছেন। নিরঞ্জন বাধা দিলেন। লাটু মহারাজ খোঁটা দিয়ে বললেন, 'শ্যামপুকুরে সেদিন দানা-কালী যখন বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল, তুমি তাকে ছেড়ে দিতে পারলে, আর আজ এ'র মতো লোককে ছাড়তে চাইছ না!' প্রসঙ্গটি এই -নটী বিনোদিনীর ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাতের কোনমতেই সম্ভাবনা নেই বুঝে দানা-কালী (কালীপদ ঘোষ) তাকে সাহেবের পোশাকে সাজিয়ে নিয়ে আসেন এবং নিরঞ্জনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তাকে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত করেন। সেখানে গিয়ে অবশ্য দানা-কালী সব খুলে বলেন এবং তাই নিয়ে খুব হাসাহাসি হয়। যা হোক, লাটুর কথায় নিরঞ্জন সেদিন রামচন্দ্রকে ওপরে যেতে অনুমতি দেন।

নিরঞ্জন ঠাকুরের অধ্যাত্মস্পর্শে সম্পূর্ণ আত্মহারা হয়েছিলেন। তাই শ্যামপুকুরে যে রাত্রে গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তগণ ঠাকুরের দেহে মা কালীর আবির্ভাব দর্শন করে শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন, সে রাত্রে নিরঞ্জনও 'ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মময়ী' বলে অঞ্জলি দিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করেছিলেন।

১৮৮৭ সালে বরানগর মঠে যোগদান করার পর নিরঞ্জন সন্ন্যাস অবলম্বন করে নিরঞ্জনানন্দ নাম গ্রহণ করেন। ১৮৮৯ সালের শেষভাগে তপস্যায় বেরিয়ে প্রথমে তিনি দেওঘরে বৈদ্যনাথ দর্শন করেন। তারপর কাশী যান এবং সেখানে কিছুদিন তপস্যা করেন। এই সময়ে মাধুকরী ভিক্ষাই তাঁর সম্বল ছিল। তীর্থরাজ প্রয়াগে গিয়ে তাঁর কল্পবাস হয়। তারপর উত্তর ভারতের অনেক তীর্থ পর্যটন করেন। ১৮৯৪ সালে নিরঞ্জনানন্দ সিংহলে যান। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করেন। এইভাবে সেখানে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অনুরাগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৯৬ সালের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্ত্য দেশ পরিক্রমা করে ভারতে ফিরে আসেন তখন কলম্বো গিয়ে তাঁকে সর্বপ্রথম অভ্যর্থনা জানান নিরঞ্জনানন্দ। ১৯০২ সাল থেকে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সেবায় নিরত থাকেন।

বিবেকানন্দের তিরোধানের পর নিরঞ্জনানন্দ হরিদ্বারে এসে তপস্যায় রত হলেন। তাতে শরীরের উন্নতি না হয়ে অবনতিই হতে লাগল। আমাশয়ে ভুগছিলেন, তার ওপর বিসূচিকায় আক্রান্ত হলেন। পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে তিনি শেষ শয্যা গ্রহণ করলেন। তিনি মনে মনে গীতার বাণী স্মরণ করছেন আর মহামরণের প্রতীক্ষা করছেন। ১৯০৪ সালের ৯ই মে বীরসাধক চিরতরে এই পৃথিবীর মায়ার বন্ধন কাটিয়ে চলে গেলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ



১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি কলিকাতাস্থ সিমলার দত্ত পরিবারের ভুবনেশ্বরী দেবীর কোল আলো করে জন্ম নিয়েছিলেন বীরেশ্বর। শুভ অন্নপ্রাশনের সময় তাঁর নাম হল নবেন্দ্রনাথ। সিমলার দত্ত বংশ ছিল ধন, মান, বিদ্যা ও যশে বিশেষ প্রসিদ্ধ। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন হাইকোর্টের একজন নামকরা উকিল। ছোটবেলা থেকেই নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সাহসী ও সত্যনিষ্ঠ। ধর্মভাবও ছিল প্রবল। পরবর্তী কালে এই ধর্মভাবের সঙ্গে তাঁর স্বদেশানুরাগ মিলে তাঁর অন্তরে এক নবভাবের বিকাশ ঘটেছিল। এই নবভাব হল দরিদ্রনারায়ণের সেবাব্রত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এলেন নরেন্দ্রনাথ। গেলেন দক্ষিণেশ্বরে—যেন দুজনের কতকালের পরিচয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—'কী রে, তুই এসেছিস? আমি যে তোর জন্যে বসে আছি!' ঠাকুর নরেনকে মহাদেবের অবতার রূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের পিতা তখন মারা গিয়েছেন। সংসারে নানা অভাব অভিযোগ। তিনি বললেন—'ঠাকুর, আমার সংসারের যাতে অভাব ঘোচে তার ব্যবস্থা করে দিন।'

রামকৃষ্ণ বললেন—'তোর যা দরকার মায়ের কাছে চা. তিনি দেবেন।' নরেন্দ্রনাথ মন্দিরে ঢুকে মা-কালীর মূর্তির দিকে এগিয়ে গেলেন। ভাবলেন ধনরত্ন চাইবেন। কিন্তু মূর্তির সামনে গিয়েই কী যেন মনের ভাব হয়ে গেল। বললেন—'মা, আমাকে শুদ্ধাভক্তি দে, শ্রদ্ধা দে।' একবার নয়, তিনবারই নরেন্দ্রনাথ এ কথা বললেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বরেই নরেনের অধ্যাত্মজীবনের সূত্রপাত। শ্রীশ্রীঠাকুর অশেষ ধৈর্য ও মমতা দিয়ে নরেনের জীবনটাকে আধ্যাত্মিক চেতনারসে নির্মাণ করেছিলেন। ঠাকুর বলতেন, নরেন হচ্ছে পাতাল-ফোঁড়া শিব—বসানো শিব নয়। বলতেন, 'নরেন্দ্র নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটী। নরেন্দ্র কাউকে কেয়ার করে না। আবার যা জানে, তাও বলে না— পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে নরেন্দ্র এত বিদ্বান। মায়ামোহ নেই, যেন কোন বন্ধন নেই। খুব ভাল আধার।' নরেন একদিন নির্বিকল্প ভূমিতে আরোহণ করেছেন, শরীর স্থির নিস্তব্ধ। রাত্রি এক প্রহর পরে সহজ অবস্থা ফিরে পেয়ে তিনি ঠাকুরের কাছে এলে ঠাকুর বলেন, 'কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলে! চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে, তখন আবার চাবি খুলব।' লীলাবসানের তিন-চারদিন আগে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে সামনে বসিয়ে সমাধিস্থ হলে নরেন্দ্র অনুভব করলেন, যেন একটা সূক্ষ্ম তেজঃরশ্মি বিদ্যুৎকম্পনের মতো তাঁর দেহে সঞ্চারিত হচ্ছে। ক্রমে

তিনি বাহ্যজ্ঞান হারালেন। পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিভঙ্গ হয়েছে, তাঁর দুই চোখে জলধারা। আবেগমথিত কণ্ঠে ঠাকুর বললেন, 'আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পরে ফিরে যাবি।'

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দীক্ষা নিয়ে নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করলেন। নাম হল বিবেকানন্দ। ১৮৮৬ সালে গুরুদেবের দেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করলেন। কোথাও তিনি শান্তি পেলেন না। শুধু দেখেন—মানুষের দারিদ্র্য, দুঃখ, শোক আর তাপ। তাঁর হৃদয় সমবেদনায় উথলে উঠল। একদিন ভারতের শেষ প্রান্তে সমুদ্রতীরে কন্যাকুমারীতে নিশ্চল ভাবে বসে আছেন—হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভারত প্রকাশিত হল। বললেন—'এই আমার ভারতবর্ষ, এই আমার মাতৃভূমি;—দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দুঃখ, রোগ-শোক, ব্যথা ও নিরাশায় জর্জরিত নরনারী। এদের ফেলে আমি কোথায় ঈশ্বর খুঁজি? এরাই তো জীবন্ত ঈশ্বর!' দরিদ্র উপেক্ষিত মানুষের মুক্তির জন্যে বিবেকানন্দ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

ভারতবর্ষের বাণী ও ধর্ম প্রচারের জন্যে বিবেকানন্দ বিদেশ যাত্রা করলেন। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ঘুরে ভারতের মর্মবাণী বিদেশীদের অন্তরে পৌঁছে দিতে লাগলেন। আমেরিকার শিকাগো শহরে তখন বিশ্বধর্ম-সম্মেলন হচ্ছিল। বিবেকানন্দ সেখানে যে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিলেন তাতে সম্মেলনের সমস্ত লোক মুগ্ধ হয়ে গেল। আমেরিকার এবং ইংলণ্ডে অনেক মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। বিবেকানন্দের বিদেশী শিষ্যাশিষ্যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মিস্ মার্গারেট নোবেল। জন্মভূমি আয়ারল্যাণ্ড পরিত্যাগ করে ১৮৯৮ সালে চলে এলেন ভারতে। ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন ভগিনী নিবেদিতা নামে।

বিজয়ীর বেশে দেশে ফিরে এসে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের যুবকদের শারীরিক শক্তি অর্জনে ও ব্রহ্মচর্য পালনে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলকে উৎসাহিত করলেন সমাজ-সংস্কারের কাজে। বলতেন, 'আমার কাজ হবে বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্র এবং বজ্রের মতো দৃঢ়।' যুবকদের ডেকে বললেন—'দুর্ভিক্ষ হয়েছে, চলে যা সেইদিকে, না হয় মরেই যাবি। তোর আমার মতো কত কীট হচ্ছে, মরছে; তাতে জগতের কী আসছে যাচ্ছে? একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা!'

'কথামৃত' থেকে বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ উল্লেখ করিঃ "এই কর্ম-সন্ন্যাস, এই ত্যাগ করিতে পারিলে মানুষ অভয় হয়—আর সকল বস্তুই ভয়াবহ।...ঠাকুর বলিতেন, 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া যেখানে ইচ্ছা যাও।' স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনি যেন বলিলেন, 'হে জগদ্‌বাসিগণ, আগে বিষয় ত্যাগ করিয়া নির্জনে ভগবানের আরাধনা কর, তাহার পর যাহা ইচ্ছা কর, কিছুতেই দোষ নাই;...ভগবানের সাক্ষাৎকারের পর দেখিবে তিনিই পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'ছুরির ব্যবহার জানিয়া ছুরি হাতে কর!' স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ কর্মযোগী কাহাকে বলে, দেখাইলেন। দেশের কী উপকার করিবে? স্বামী জানিতেন যে, দেশের দরিদ্রদের ধন দিয়া সাহায্য করা অপেক্ষা অনেক মহৎ কার্য আছে। ঈশ্বরকে জানাইয়া দেওয়া প্রধান কার্য। তৎপরে বিদ্যাদান; তাহার পরে জীবনদান; তাহার পরে অন্নবস্ত্রদান।" যুগপ্রয়োজনে স্বামীজী ভারতবাসীকে নর-নারায়ণের পূজায় আহ্বান করেছেনঃ 'প্রথমে পূজা—বিরাটের পূজা। তোমার সম্মুখে তোমার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের পূজা। ইহাদের পূজা করিতে হইবে, সেবা নহে।'

এই স্বদেশভক্ত বীর সন্ন্যাসীর প্রতি রক্তকণায় স্বদেশের প্রতি গভীর মমতার স্রোত প্রবাহিত হত। তিনি বলতেন—'যে পর্যন্ত আমার জন্মভূমির একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে ততদিন তাকে আহার প্রদানই আমার ধর্ম। এ ছাড়া আর যা কিছু সব অধর্ম।'

বিবেকানন্দ অমরনাথে মহেশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শন পেয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে বললেন, 'বাবা অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়েছেন।'

৪ঠা জুলাই, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ। সন্ধ্যার পর বেলুড় মঠে নিজের কক্ষে প্রবেশ করে ধ্যানে মগ্ন হলেন। তারপর নিজের জীবনকে বিলীন করে দিলেন অসীমের লীলাসঙ্গে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ



"রাখাল আসবার কয়েকদিন আগে দেখছি, মা একটি বালককে হঠাৎ আমার কোলে বসিয়ে দিয়ে বলছেন, 'এটি তোমার ছেলে।' শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠে বললাম, 'সে কী? আমার আবার ছেলে?' তিনি তাতে হেসে বুঝিয়ে দিলেন, 'সাধারণ সংসারী ভাবে ছেলে নয়, ত্যাগী মানসপুত্র।' তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরে রাখাল এসে উপস্থিত হল এবং বুঝলাম এই সেই বালক।" এ ভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর 'মানসপুত্র' রাখালের বর্ণনা দিয়েছেন।

চব্বিশ পরগনা জেলার অধীন বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিকরা একটি প্রাচীন গন্ডগ্রাম। সেই গ্রামের সম্ভ্রান্ত ঘোষ পরিবারের আনন্দমোহন ঘোষের পুত্র রাখালচন্দ্র। জন্ম ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী। রাখালচন্দ্রের বয়স যখন পাঁচ তখন তাঁর মা কৈলাসকামিনী মারা যান।

শৈশবেই রাখালের সংগীতের প্রতি প্রবল অনুরাগ ছিল। বৈষ্ণবী ভিখারী কৃষ্ণলীলা গান করলে তিনি আবিষ্টভাবে তা শুনতেন। কেউ শ্যামাসংগীত বা রামপ্রসাদের 'মালসী' গাইলে তন্ময় হয়ে তা শুনে শিখে নিতে চেষ্টা করতেন।

পাঠশালার পড়া শেষ হলে আনন্দমোহন ছেলেকে উচ্চ শিক্ষা দেবার জন্যে কলকাতায় পাঠালেন।

ছাত্রজীবনে রাখাল ভগবদ্ধ্যানে ও ধর্মচিন্তায় বেশির ভাগ সময় কাটাতেন। জন্মগত সংস্কারবশেই হোক বা সরল পবিত্র চরিত্রবশতঃই হোক, কিশোর রাখাল ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্যেই ব্যাকুল হলেন। ছেলের উদাসীন ভাব দেখে আনন্দমোহন তাঁকে অবিলম্বে দাম্পত্য-বন্ধনে আবদ্ধ করাই যুক্তিসংগত বোধ করলেন। কাঁসারিপাড়া পল্লীর নিকটবর্তী সরকারী কর্মচারী মনোমোহন মিত্রের বোন শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গেই রাখালচন্দ্রের বিবাহ সম্পন্ন হল। তখন কে জানত এই বিবাহ-বন্ধনই তাঁর মুক্তিলাভের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

মনোমোহন মিত্র এবং তাঁর মা শ্যামাসুন্দরী আগে থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি পরম অনুরক্ত ছিলেন। ভক্ত মনোমোহন ভগ্নিপতি রাখালচন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভ করাবার জন্যে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গেলেন। ১৮৮০ সালের প্রথম ভাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রাখালকে দেখে শ্রীশ্রীজগদম্বার দান বলে চিনতে পারলেন। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করে রাখাল মনে মনে এমন প্রবল আকর্ষণ অনুভব করলেন যে সুযোগ পেলেই তিনি একা দক্ষিণেশ্বরে চলে যেতেন। কখনও কখনও সেখানে কয়েকদিন থাকতেন। এককালে রাখালচন্দ্র ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে উঠলেন।

রাখাল সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ বলেছেনঃ "তখন রাখালের এমন ভাব ছিল যেন তিন-চার বছরের ছেলে। আমাকে

ঠিক মায়ের মতন দেখত। থেকে থেকে কোত্থেকে দৌড়ে এসে আমার কোলে বসে পড়ত। এখান থেকে কোথাও এক পা নড়তে চাইত না।...রাখাল এখানে আসবার কিছুদিন পরে তার শাশুড়ি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে একদিন এখানে এল। রাখালের বালিকা বধূ বিশ্বেশ্বরীকে দেখে আমার আশঙ্কা হয়েছিল! ভাবলাম, রাখালের ঈশ্বরভক্তির কোন হানি হবে না তো! এই ভেবে বধূকে কাছে ডেকে তার শরীরের গড়ন অঙ্গ তন্ন তন্ন করে দেখে বুঝলাম যে, ভয়ের কারণ নেই। মেয়েটি সাক্ষাৎ দেবীশক্তি। তখন সন্তুষ্ট হয়ে নহবতে সারদার কাছে বলে পাঠালাম, যেন টাকা দিয়ে বৌমার মুখ দেখে।"

দক্ষিণেশ্বরে রাখালের একাদিক্রমে বাস করবার পক্ষে প্রধান অন্তরায় হল তাঁর স্বাস্থ্য। শরীর ক্রমাগত অসুস্থ হওয়ায় অনেকে তাঁকে জলবায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এক ভক্ত পরিবারের সঙ্গে তিনি বৃন্দাবন চলে গেলেন। বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানগুলি দর্শন করে আনন্দে আত্মহারা হলেন। তাঁর হৃদয়ের প্রেমপদ্ম বিকশিত হল।

তিন মাস পরে রাখালচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে ফিরলেন। এবার কিছুতেই তিনি ঠাকুরের সঙ্গছাড়া হতে চাইলেন না। কিন্তু কী দুর্দৈব! ঠাকুরের গলক্ষত রোগ দেখা দিল। ক্রমে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। রাখালচন্দ্রের দুর্ভাবনার অবধি রইল না। ছায়ার মতো কাছে কাছে থেকে ঠাকুরের সেবা-যত্ন করতে লাগলেন। লীলাবসানের প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবী রামকৃষ্ণ-সংঘ গঠন সম্পর্কে প্রত্যহ নরেন্দ্রকে গোপনে ডেকে নানা উপদেশ দিতেন। একদিন বললেন, 'রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছে করলে সে একটা রাজ্য চালাতে পারে।' এ ইঙ্গিতের অর্থ বুঝতে নরেন্দ্রের দেরি হয়নি। তিনিও গুরুভ্রাতাদের ডেকে বললেন, 'আজ থেকে আমরা রাখালকে রাজা বলে ডাকব।' সেই থেকে গুরুভ্রাতাদের কাছে রাখাল পরিচিত হলেন 'রাজা' এবং আরও পরে 'মহারাজ' নামে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর ভক্তমণ্ডলী শোকে অধীর। রাখালচন্দ্র স্তব্ধ। তিনি তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। মানসিক অশান্তিতে জর্জরিত ব্রহ্মানন্দ তীর্থ পর্যটনে বেরোলেন। পুরী, কাশী, ওঙ্কারনাথ, দ্বারকাধাম বহু তীর্থ পর্যটন করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিতের তাৎপর্য শিরোধার্য করে স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০১ সালে বেলুড়স্থ মঠ ও মিশনের সভাপতির পদ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে অর্পণ করলেন। স্বামীজীর তিরোধানের পর ব্রহ্মানন্দ এই গুরুদায়িত্ব পরম নিষ্ঠাভরে পালন করেছেন। ভারতের নানা শহরে মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার কাজে তাঁকে নিরলস পরিশ্রম করতে হয়। কর্মসাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরলাভ—এই ছিল ব্রহ্মানন্দের মূলমন্ত্র। তাঁর মতে সমাজসেবকদের জীবনেও ধর্মভাব থাকা একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলতেন, 'অনেকে বলে, দেশের ও দশের কাজ করবে। আমার মনে হয়, এ ভাব ইংরেজী শিক্ষার বদহজম। নিজের চরিত্র তৈরি না হলে তার দ্বারা অপরের কল্যাণ কখনও সম্ভব হয় না। যারা তাঁকে ঠিক ঠিক আশ্রয় করেছে, তাঁর কৃপালাভ করেছে তাদের কখনও বেচাল হয় না—তাদের কাজকর্ম, কথাবার্তা, চালচলন দেশের মঙ্গলের কারণ হয়।'

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন সদাহাস্যজ্যোতি পুরুষ। গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে হাস্যপরিহাসে মুখর। আবার মঠ-মিশনের প্রথমাবস্থায় গঠনমূলক কর্মে কখনও কোথাও ত্রুটি বা শৈথিল্য ঘটলে বিবেকানন্দ কত সময় মঠাধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দকে ভর্ৎসনা করেছেন; সব তিনি সহ্য করেছেন অম্লানবদনে।

৮ই এপ্রিল, ১৯২১। সাধকজীবনের মহৎ পথ-পরিক্রমার অন্তিম লগ্ন সমুপস্থিত। বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেদিন রাত্রে সাধু ও ভক্তদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে ধ্যানমগ্ন হলেন। অকস্মাৎ নিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হল আবেগময় আকৃতিঃ 'এই যে পূর্ণচন্দ্র! রামকৃষ্ণ! রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটি চাই। আমি ব্রজের রাখাল; দে দে, আমায় ঘুঙুর পরিয়ে দে—আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচব —ঝুম-ঝুম ঝুম-ঝুম! কৃষ্ণ এসেছ? কৃষ্ণ কৃষ্ণ! তোরা দেখতে পাচ্ছিস নে? তোদের চোখ নেই। আহা-হা, কী সুন্দর আমার কৃষ্ণ-কমলে কৃষ্ণ, ব্রজের কৃষ্ণ—এ কষ্টের কৃষ্ণ নয়। এবার খেলা শেষ হল। দেখ দেখ, একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে আর বলছে, আয় চলে আয়!'

১০ই এপ্রিল, সোমবার শ্রীরামকৃষ্ণের 'রাখালরাজ' নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ



তখনও আকাশ পরিষ্কার হয়নি—অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছেন গ্রামের কয়েকটি মানুষ। হঠাৎ একটা সোরগোল উঠল—কুমির কুমির! যাঁরা স্নান করছিলেন তাঁরা তাড়াতাড়ি পাড়ে উঠে পড়লেন। হরিনাথ কিন্তু নড়লেন না। কিছুদূরে তাকিয়ে দেখেন কুমিরের মতো কী একটা জলে ভাসছে। তিনি আর সবার মতো নদী থেকে না উঠে গঙ্গায় স্থিরভাবে থেকেই বিচার করতে লাগলেন—আমি যে বেদান্ত অধ্যয়ন করছি, এইবার তা যথার্থ আয়ত্ত হল কিনা পরীক্ষা দেবার সময় এসেছে। বেদান্ত মতে আমি তো শুদ্ধ আত্মস্বরূপ। আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই আমি দেহ মন বুদ্ধি কিছুই নই; তবে আমি এখান থেকে ব্যস্ত হয়ে পালাব কেন?

হরিনাথ জলে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, এদিকে যাঁরা তীরে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা তাঁকে জল থেকে ওঠবার জন্যে বারবার চিৎকার করতে লাগলেন। হরিনাথ উঠলেন অনেকক্ষণ পরে—তখন কুমির চলে গিয়েছে।

এই যুবকই পরবর্তী কালের স্বামী তুরীয়ানন্দ।

হরিনাথ বাগবাজার বসুপাড়া নিবাসী তেজস্বী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শ্রীচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর জন্ম ১২৬৯ সালের ২০শে পৌষ; ইংরাজী ১৮৬৩ সালের ৩রা জানুয়ারী। তিন বছর বয়সে তাঁর মাতৃবিয়োগ ও বার বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটে।

প্রথমে তিনি কম্বুলিয়াটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে, পরে জেনারেল অ্যাসেমব্লি (স্কটিশ চার্চ) স্কুলে পড়াশোনা করেন। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার আগেই নানা কারণে তাঁকে স্কুল ছাড়তে হয়। ছোটবেলা থেকেই হরিনাথের প্রবল ধর্মভাব ও সংস্কৃতশাস্ত্র আলোচনায় অনুরাগ প্রকাশ পায়।

উপনয়নের পর থেকেই হরিনাথ ব্রহ্মচারীর উপযোগী দীর্ঘকেশ রক্ষা করে সামান্য হবিষ্যান্ন আহার করতে থাকেন। কখনও নির্জনে, কখনও বাল্যসঙ্গী গঙ্গাধরের (স্বামী অখণ্ডানন্দ) সঙ্গে সাধন ভজনে, বেদান্তাদি শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনায় বা কোন সাধুর কাছে গিয়ে উপদেশ শুনে তাঁর দিন কাটতে থাকে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে হরিনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয় সম্ভবতঃ ১৮৭৮ কিংবা ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। এরপর তিনি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতে থাকেন। হরিনাথ জানতেন, মুক্তি বা নির্বাণলাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই ভুল ধারণা ভেঙে দিয়ে বলেছিলেন, 'নির্বাণকে আদর্শ করেছিস কেন? নির্বাণের চেয়েও উচ্চতর অবস্থা আছে এবং তা লাভ করা যায়। যারা নির্বাণ প্রার্থনা করে তারা হীনবুদ্ধি, ভয়তরাসে—যেমন দশ-পঁচিশ খেলায় কেবলই চিক খুঁজছে—কিসে ঘরে উঠে যায়, সেই চেষ্টা। ঘুঁটি একবার পাকলে আর নামাতে চায় না। একে বলে কাঁচা খেলোয়াড়। আর পাকা খেলোয়াড় মার পেলে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দেয়, আবার তখনই কচেবারো বলে পাশা ফেললেই আবার উঠে গেল। তাদের পাশা হাতের

বশ। যেমন বলে, তেমনি পড়ে। তাই ভয় নেই, নির্ভয়ে খেলে।' সেদিন থেকে হরিনাথ বুঝলেন, তিনি হরির দাস—তাঁর পক্ষে ঈশ্বরই একমাত্র অবলম্বনীয়।

ব্রহ্মচারী হরিনাথ একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—'মশায়, মনের কামভাবটা একেবারে যায় কী করে?' ঠাকুর তা শুনে জবাব দিলেন—'যাবে কেন রে? মোড় ফিরিয়ে দে না।' উত্তর শুনে হরিনাথ স্তম্ভিত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর, বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছু পরেই, ১৮৮৭ সালে হরিনাথ মঠে যোগ দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। নাম হল স্বামী তুরীয়ানন্দ। তাঁর বয়স তখন মাত্র চব্বিশ।

মঠে কিছুকাল বাস করার পর তুরীয়ানন্দ তপস্যা ও তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরুলেন। পাঞ্জাব, সিন্ধু-প্রদেশ, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, মিথিলা প্রভৃতি স্থান পর্যটন করে তিনি আসেন প্রয়াগতীর্থে। একদিন পথ চলতে চলতে তাঁর মনে হল, জগতে সকলেই কোন-না-কোন কর্তব্যকর্মে রত; তিনিই শুধু ভবঘুরের মতো ব্যর্থ জীবন কাটাচ্ছেন। তারপর কেশীঘাটে শায়িতাবস্থায় ধ্যান করতে করতে তাঁর অনুভূতি হল—তিনি যেন বিশাল এক ভূমিতলে শায়িত আছেন এবং তাঁর দেহ আকাশ-পাতাল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে; আর সেই গভীর নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে এক অশরীরী বাণী উত্থিত হচ্ছেঃ 'দেখ, তুমি কত মহান! কেন তুমি ভাবছ তোমার জীবন ব্যর্থ? ওঠ, জাগো, পরম সত্য লাভ কর—সে সত্যের কণামাত্র বিশ্বকে মুক্ত করতে পারে। এটিই মহত্তম জীবন।' তুরীয়ানন্দ চমকে উঠলেন। মন থেকে ব্যর্থতার গ্লানি চিরতরে দূরীভূত হল।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হল। তার কয়েকমাস পরে স্বামিজী ইংলণ্ড হয়ে দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রা করলেন এবং তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। যাত্রার আগে তুরীয়ানন্দের ভাবনা ছিল কেমন করে মার্কিনবাসীদের আপন করে নেবেন। তিনি বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার শরণাপন্ন হলেন। তুরীয়ানন্দের সমস্যাটি নিবেদিতা বুঝলেন। চট করে একটি ছুরিকা তুলে নিলেন তিনি। তারপর অস্ত্রের দিকটা নিজে ধরে হাতলের দিকটা তুরীয়ানন্দের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "যখনই কাউকে কিছু দান করবেন তখন অপ্রীতিকর ভাগটি নিজে নেবেন, আর যে অংশটি প্রীতিসুখকর সেটি গ্রহীতাকে দেবেন।" ছোট্ট এই উপদেশটুকু শিরোধার্য করে আমেরিকার পথে পা বাড়ালেন তুরীয়ানন্দ।

১৮৯৯ সালের অগাস্ট মাসে স্বামিজীর সঙ্গে তুরীয়ানন্দ লণ্ডন থেকে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে পদার্পণ করেন। সেখানে তিনি বেদান্ত সমিতির গৃহে নিউইয়র্ক ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বালক-বালিকাদের ধর্ম ও নীতি বিষয়ে শিক্ষা ও বক্তৃতা প্রদান করেন। তুরীয়ানন্দের সংস্পর্শে এসে অনেক ধর্মপিপাসু নরনারী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এক মার্কিন ভক্ত বিবেকানন্দকে আশ্রম স্থাপনের জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার নিকটে সান অ্যান্টনিও উপত্যকায় কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। তুরীয়ানন্দকে সেখানকার আশ্রমের ভার দেওয়া হল। ভক্তেরা আনন্দের সঙ্গে গৃহস্থালীর কাজকর্ম দেখত। তুরীয়ানন্দ তাদের স্তোত্রপাঠ করাতেন, রামকৃষ্ণকথা শোনাতেন, ধ্যানাভ্যাস করাতেন। তাঁকে কেন্দ্র করে সেখানে একটি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিবার গড়ে উঠেছিল।

স্বামী তুরীয়ানন্দ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত, কঠোর তপস্বী, পরম ভক্ত এবং প্রেমিক সন্ন্যাসী ছিলেন। বজ্রকঠিন স্বরে তিনি উপদেশ দিতেনঃ 'সিংহতুল্য হও, সিংহতুল্য হও। পিঞ্জর ভেঙে ফেলে মুক্ত হও। একটা বড় লাফ মার, আর কাজ ফতে কর।' আমেরিকার সাধু সন্ন্যাসিগণ তাঁর তপস্যা ও পাণ্ডিত্য দেখে তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি তাঁর সাধক-জীবনের কথা উল্লেখ করে বলতেন—'উপনিষদের উপদেশগুলি শুধু পড়তাম না, প্রত্যেক উপদেশটি ধরে ধরে দীর্ঘকাল ধ্যান করতাম যাতে ঐগুলির যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে পারি। পরে আবার এমন অবস্থা হয়েছিল যে মা মা বলে কেঁদে ভাসিয়েছি ও বলেছি, মা, সব শাস্ত্রজ্ঞান ভুলিয়ে দে—দে মা, আমায় পাগল করে, আর কাজ নাই গো মা জ্ঞান বিচারে!'

তুরীয়ানন্দ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে কাশীধামে যান এবং প্রায় সাড়ে তিন বছর সেখানে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে বাস করে ১৩২৯ সালের ৫ই শ্রাবণ (১৯২২ সালে) মহাসমাধিতে চিরশান্তি লাভ করেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ



হুগলী জেলার ময়াল ইছাপুর গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন মস্ত তান্ত্রিক সাধক ও শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত। শোনা যায় কালীঘাটে এক গভীর রাত্রে কালিকাদেবী তাঁকে বালিকা বেশে দর্শন দিয়েছিলেন। তাঁরই পুত্র শশিভূষণ পরবর্তী জীবনে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দরূপে পরিচিত হয়েছিলেন।

শশিভূষণের জন্ম ১৮৬৩ সালের ১৩ই জুলাই। শরৎচন্দ্র বা স্বামী সারদানন্দ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা। ছাত্রজীবনে শশী ও শরৎ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কেশবচন্দ্রের কাছে যাতায়াত করতে থাকেন। পরে উভয়েই ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হন। কেশবচন্দ্র সেনের 'ইন্ডিয়ান মিরর' নামক কাগজে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে বিবরণ পাঠ করে তাঁকে দর্শনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তারপর দুজনেই একদিন (১৮৮৪ সালে) দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হন।

প্রথম দিনেই ঠাকুর শশীর মন জয় করে নিলেন। তার ফলে তিনি কলেজের ছুটির দিনে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের কথামৃত পান করতে লাগলেন।

ঠাকুর বরফ খেতে ভালবাসতেন। তাই এক গ্রীষ্মের দিনে কলকাতায় বরফ কিনে শশী পায়ে হেঁটে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। বরফখন্ডটিকে তিনি এতই যত্ন সহকারে গামছা জড়িয়ে নিয়ে গেলেন যে, তা গলতে পারেনি। ঠাকুর তাঁকে দেখে বললেন—'আহা, তোর বড় কষ্ট হয়েছে! দ্যাখ্, ঠিক রোদ্দুরে যার হাতে জল গলে না তাকে লোকে বলে কৃপণ। কিন্তু আমি দেখছি তুই কৃপণ নোস্, তুই দাতা।'

ঠাকুর একবার বলেছিলেন—'শশী আর শরৎ ছিল শ্রীকৃষ্ণের দলে।' দক্ষিণেশ্বরে থাকবার ইচ্ছা থাকলেও কলেজের পড়ার দরুন শশিভূষণের সে ইচ্ছা তখন পূরণ হয়নি। তার ওপর ছিল সংসারের অসচ্ছল অবস্থা। নিজের পাঠের খরচ নিজেকেই যোগাতে হত। কিন্তু ঠাকুর যখন গলরোগে আক্রান্ত হয়ে শ্যামপুকুরে এলেন তখন রাত্রিকালে তাঁর সেবার লোকের অভাব হওয়ায় নরেন্দ্রনাথের অধীনে তিনি সেই ভার গ্রহণ করলেন। শ্যামপুকুরের পর কাশীপুরেও তিনি ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত থাকেন।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর শশিভূষণ মনে ভয়ানক আঘাত পেয়েছিলেন। কাশীপুর শ্মশানে শশী চিতা থেকে ভস্মাস্থি তুলে একটি তামার কলসিতে রাখলেন এবং সেটি মাথায় করে নিয়ে উদ্যানবাটীতে ঠাকুরের শয্যার উপর স্থাপন করলেন। শশীর বিশ্বাস —ঠাকুর যাননি। ভস্মাস্থিপূর্ণ কলসিটিকে তিনি নিয়মিত পুজো করতে লাগলেন।

ভস্মাবশেষ ঐ অবস্থায় সারাদিন থাকার পর প্রবীণ ভক্তদের পরামর্শ অনুযায়ী তা কাঁকুড়গাছিতে নিয়ে যাবার কথা উঠল। নিরঞ্জন ও শশী তাতে ঘোরতর আপত্তি তুললেন। তখন নরেন্দ্রনাথ সমস্ত বিবাদ মিটিয়ে দিলেন। রামচন্দ্র দত্তের প্রস্তাব অনুসারে স্থির হল তা কাঁকুড়গাছিতেই যাবে। তখন গোপনে শশী ও নিরঞ্জন অন্য একটি কলসিতে অধিকাংশ অস্থিভস্ম তুলে নিয়ে তা বলরামবাবুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

যেদিন কীর্তন সহ কলসিটি কাঁকুড়গাছির বাগানে নিয়ে যাওয়া হল—শশিভূষণ অধিকাংশ পথ পবিত্র কলসিটি মাথায় বহন করেছিলেন। কাঁকুড়গাছিতে পূজার পর যখন কলসিটি সমাহিত করে তার ওপর মাটি ফেলা হতে লাগল তখন শশিভূষণ কাঁদতে কাঁদতে বললেন : 'ওগো, ঠাকুরের গায়ে বড় লাগছে!'

এর পর ঘরে ফিরে শশিভূষণ লেখাপড়ায় মন দিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের ডাকে আবার তাঁকে কয়েকমাস পরেই বরাহনগর মঠে যেতে হল। এ সময়কার একদিনের (৮ই মে, ১৮৮৭) এক মর্মস্পর্শী ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে 'কথামৃতে': বরাহনগর মঠে শশীর বাবা এসেছেন। বাবা মঠ থেকে ছেলেকে নিয়ে যাবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের সময় প্রায় নমাস ধরে অনন্যচিত্ত হয়ে শশী তাঁর সেবা করেছেন। বাপ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু সাধক ও নিষ্ঠাবান্। ইনি বাপ-মায়ের বড় ছেলে। তাঁদের বড় আশা যে, ইনি লেখাপড়া শিখে রোজগার করে তাঁদের দুঃখ দূর করবেন। কিন্তু ভগবানকে পাবার জন্যে ইনি সব ত্যাগ করেছিলেন। বন্ধুদের কেঁদে কেঁদে বলতেন, 'কী করি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। হায়! মা-বাপের কিছু সেবা করতে পারলাম না! তাঁরা কত আশা করেছিলেন। মা আমার গয়না পরতে পাননি! আমি কত সাধ করেছিলাম, আমি তাঁকে গয়না পরাব। কিছুই হল না! বাড়িতে ফিরে যাওয়া যেন ভার বোধ হয়! গুরুমহারাজ কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছেন; আর যাবার যো নেই!'

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর শশীর বাবা ভেবেছিলেন, এবারে বুঝি ছেলে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু শশী আর মঠ থেকে ফিরলেন না। তাই বাপ মাঝে মাঝে তাঁকে নিতে আসেন। তিনিও কোনমতে যাবেন না। আজ বাবা এসেছেন শুনে আরেকদিক দিয়ে পালিয়ে গেলেন, যাতে তাঁর সঙ্গে দেখা না হয়।

ঠাকুরের পাদুকা সামনে রেখে আরও কয়েকজনের সঙ্গে সন্ন্যাস গ্রহণ করে শশিভূষণ 'রামকৃষ্ণানন্দ' নামে পরিচিত হলেন। নরেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল তিনি নিজে ঐ নাম নেবেন। কিন্তু শশিভূষণের সেবা ও ভক্তির দাবি মেনে নিয়ে তাঁকেই ঐ নামটি দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারের জন্যে রামকৃষ্ণানন্দ ভারতের বহুস্থান পর্যটন করেন। মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের গোড়াপত্তন তাঁর চেষ্টাতেই হয়। তাঁর আগ্রহে ত্রিবান্দ্রমে একটি বেদান্ত সমিতি স্থাপিত হয়।

মাদ্রাজে যারা নবব্রতী হয়ে আসত কিংবা যারা গৃহীভক্ত তাদের সম্বন্ধে রামকৃষ্ণানন্দ কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রচলন করেছিলেন।

তিনি নানাস্থানে বহু মঠ ও কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন যথার্থ কর্মযোগী পুরুষ। অন্তর্দ্রষ্টা বিবেকানন্দ সত্যই বলেছিলেন, 'শশী খুব এক্জিকিউটিভ (কাজের লোক)।' মাদ্রাজ মঠ প্রতিষ্ঠার পর রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দক্ষিণদেশে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে দিয়ে ১৯০৯ সালের ২০শে জানুয়ারি বাঙ্গালোর আশ্রমবাটীর দ্বারোদ্ঘাটন করান। পরবৎসর শ্রীশ্রীসারদামণি দাক্ষিণাত্য তীর্থভ্রমণে এলে রামকৃষ্ণানন্দ তাঁর সমস্ত দর্শনাদির ব্যবস্থা করে দেন।

শ্রীশ্রীমা কলকাতায় ফিরে যাবার পরেই শশী মহারাজের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। ডাক্তারের মতে, যক্ষ্মারোগ হয়েছে। তাঁকে কলকাতা আনা হল। রোগের শেষ কয়দিন তিনি নিদারুণ কষ্ট ভোগ করেছিলেন। অসহ্য রোগযন্ত্রণায় বিছানায় গড়াগড়ি দিতেন ও ছট্ফট করতেন। এই সময় তাঁর নিত্যসেবককে কিন্তু তিনি অসীম স্নেহ করতেন। ঠাকুর বলতেন 'ভক্তের জাতি নেই', সেকথা স্মরণ করে তার হাতে খেতে তিনি আপত্তি করতেন না। রথযাত্রার দিন সেবকের হাতে কিছু পয়সা দিয়ে রথ দেখতে পাঠালেন আর বলে দিলেন দু-চার পয়সার কিছু আনতে। বললেন, 'কাশীপুর বাগানে ঠাকুরও আমাকে রথযাত্রার দিন ঐরকম করতে বলেছিলেন। রথযাত্রা দেখে তাঁর জন্যে দু'পয়সা দামের একটি ছুরি (লেবু কাটার জন্যে) এনেছিলাম। তাতে প্রসন্ন হয়ে তিনি বলেছিলেন এগুলি মেনে চলতে হয়। গরিব লোকে দু'পয়সা পাবার জন্যে দোকান দেয়। এই সব মেলাতে দু'চার পয়সার কিছু কেনা উচিত।'

১৯১১ সালের ২১শে অগাস্ট এই মহাসাধক নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। সেই সংবাদ পেয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন -'একটা দিক্‌পাল চলে গেল। দক্ষিণ দিকটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল।'

স্বামী অখণ্ডানন্দ



গঙ্গাধর দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করলেন। বিদায়ের সময় ঠাকুর বললেন— 'শনিবার দিন আবার আসবি।'

শনিবার দিন গঙ্গাধর গিয়ে উপস্থিত হতেই ঠাকুর তাঁকে একখানি মাদুর দিয়ে সেটি পশ্চিমের বারান্দায় পাততে বললেন। তারপর বললেন 'সুখাসনে বসে ধ্যান কর।' আসনের নিয়মও ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন। অবশেষে গঙ্গাধরের জিহ্বায় কী যেন একটা লিখে তাঁকে দীক্ষা দিলেন।

গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতার নাম শ্রীমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়। আদি নিবাস যশোহর হলেও তাঁরা বহুদিন যাবৎ কলকাতা-প্রবাসী। আহেরীটোলার এক পল্লীতে গঙ্গাধর ১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

গঙ্গাধর দক্ষিণেশ্বরে যান, ঠাকুরের বিভিন্ন ভাবাবেশ দেখে মুগ্ধ হন। মহানন্দে শ্রীমুখের কথামৃত-রস পান করেন। একবার ঠাকুর তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরের অভ্যন্তরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এই দ্যাখ্ চৈতন্যময় শিব।' গঙ্গাধর তখনই উপলব্ধি করলেন যেন চৈতন্যময় শিব নিঃশ্বাস ফেলছেন। মৃন্ময়ে সেদিন তিনি চিন্ময়ের দর্শন পেলেন।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর গঙ্গাধর একদিন গৃহত্যাগ করে বৈদ্যনাথের টিকিট কেটে ট্রেনে উঠলেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের আকর্ষণে বৈদ্যনাথে না নেমে বাঁকিপুর হয়ে বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হলেন। তারপর পদব্রজেই তিনি বহু তীর্থ ভ্রমণ করেন।

মঠে ফিরে এসে গঙ্গাধর যথারীতি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর নাম হল অখণ্ডানন্দ।

আলমবাজারে তাঁর এক অপূর্ব দর্শন হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনি মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন। কিছুতেই উপশম হয় না দেখে তিনি অদ্বৈত চিন্তায় মনকে ডুবিয়ে দিলেন। সারা রাত্রি এইভাবে কাটিয়ে শেষ রাত্রে যেমন একটু চোখ বুজেছেন, অমনি দেখেন সামনে এক হামা-দেওয়া সজীব নাড়ুগোপাল। কী সুন্দর মূর্তি! গোপালের দিব্য জ্যোতিতে সারা ঘর আলোকিত। এমন সময় অখণ্ডানন্দের মনে হল ব্রজবাসিনীদের মতো দিব্য বসন-ভূষণে শোভিতা মা যশোদা গোপালকে খাবার হাতে নিয়ে ডাকছেন। সেই সময় যেন সেখানে উপস্থিত হলেন ঠাকুর। ঠাকুর বললেন—'দ্যাখ্ দেখি, একী ভাব!' অমনি অখণ্ডানন্দ বলে উঠলেন—'নির্বাণে আমার কাজ নেই প্রভু!' এই বলে তিনি ঠাকুর, গোপাল ও মা যশোদাকে আঁকড়ে ধরতে গেলেন—অমনি চমক ভেঙে গেল।

কাটোয়া থেকে পদব্রজে মুর্শিদাবাদ যাচ্ছিলেন অখণ্ডানন্দ। পথিমধ্যে পেলেন দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ পরিচয়। দাদপুর বাজারের দিকে আসতে পথে দেখেন শতচ্ছিন্ন কাপড় পরা একটি চৌদ্দ বছরের মুসলমান বালিকা ডাক ছেড়ে কাঁদছে। তার কাঁকালের মাটির কলসিটির তলা খসে গেছে; মা মারবে—সেই ভয়ে সে

কাঁদছে। অখণ্ডানন্দ দু'পয়সা দিয়ে তাকে নতুন কলসি কিনে দিলেন, কিছু মুড়কিও কিনে খেতে দিলেন। অমনি কোথা থেকে দশ-বারোটি ছেলে-মেয়ে দোকানে এসে তাঁর কাছে দাঁড়াল- আকালের জন্যে তারাও খেতে পায়নি। স্বামিজীর হাতে তখন মাত্র তিন আনা সম্বল। তাই দিয়ে চিঁড়ে-মুড়কি কিনে ক্ষুধার্ত ছেলে-মেয়েদের দিলেন। পথে যেতে যেতে দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড করাল-মূর্তি দেখে অখণ্ডানন্দ স্থির করলেন, এখানেই তাঁর সেবাকার্যের ক্ষেত্র। আলমবাজার মঠের গুরুভ্রাতাদের কাছে তিনি দুর্ভিক্ষের বিবরণ জানিয়ে সাহায্য চাইলেন। যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থের কথা স্মরণ করলেনঃ "কর্ম ও পুরুষকার যোগবাশিষ্ঠের মেরুদণ্ড। কর্মই মহাসাধন এবং নির্বাণমুক্তির একমাত্র উপায়।" স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য গুরুভ্রাতারা অখণ্ডানন্দের পরিকল্পনা সমর্থন করলেন। ১৮৯৭ সালের ১৫ই মে মহুলা গ্রামে সেবাকার্য আরম্ভ হল। এটাই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম দুর্ভিক্ষ-ত্রাণকার্য। মহুলার আশ্রমটি পরে সারগাছি গ্রামের প্রশস্ত চত্বরে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯১৩ সাল থেকে পুর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করে। অখণ্ডানন্দজীর সুব্যবস্থায় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বহু অনাথ বালকের প্রাণরক্ষা, সুশিক্ষা এবং সৎ জীবনযাপনের দৃঢ়ভিত্তিস্থাপন হল। আশ্রমে বালকদের বাং ...রের সংগে শিল্পশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষাও চলত। পল্লী-উন্নয়ন, নৈশ বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থাও ছিল। আশ্রমে কার্পাসের চাষ থেকে যে তুলো পাওয়া যেত তা গ্রামে বিতরিত হত, গ্রামবাসীরা তুলো থেকে সুতো কেটে পাঠাত- সেই সুতো দিয়ে আশ্রমে কাপড় তৈরি হত। প্রত্যহ বেলা তিনটা পর্যন্ত চাষীদের সংগে সমানে পরিশ্রম করে অখণ্ডানন্দ অপরাহ্ণে লেবু দিয়ে পান্তাভাত খেয়ে পরিতৃপ্ত হতেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ ছিলেন আদর্শবাদী নীরব কর্মী। ১৯৩৪ সালে ভয়ংকর ভূমিকম্পে যখন বিহারের বহু নগর বিধ্বস্ত হয় তখন তিনি প্রৌঢ়বয়স্ক হলেও যুবকের মতো ধ্বংসলীলা পরিদর্শন করে সেবাকার্য করেছিলেন।

১৯২৫ সালে অখণ্ডানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উপসভাপতি এবং ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে সভাপতি নির্বাচিত হন।

বিবেকানন্দের জীবসেবার মন্ত্র অখণ্ডানন্দ জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। দেশপ্রেমও তাঁর এই আদর্শের অন্তর্গত ছিল। ইতালির দেশভক্ত-বীর মাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্‌ডি তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ও নিগ্রোজাতির একনিষ্ঠ সেবক বুকার টি. ওয়াশিংটনের সেবাধর্ম তাঁকে অনুপ্রাণিত করত, বালগঙ্গাধর তিলক ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বদেশসেবা ও ত্যাগ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করত।

স্বামী অখণ্ডানন্দের বক্তৃতার ভঙ্গি যেমন সজীব ছিল, লেখনীও ছিল তেমনি সতেজ ও সাবলীল। একবার নফরচন্দ্র কুণ্ডুর (মেথরবালককে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে যিনি নিজে জীবন দিয়েছিলেন) এক স্মৃতিসভায় দধীচির ত্যাগমাহাত্ম্য অবলম্বনে তিনি এমন প্রাণস্পর্শী ভাষণ দিয়েছিলেন যে, গুণমুগ্ধ স্বামী সারদানন্দ বলে উঠেছিলেন, "ভাই, তোমাকে আর সারগাছিতে যেতে দেওয়া হবে না, এখানে তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে।" অখণ্ডানন্দ দারুণ রসিকও ছিলেন। একবার এক যুবক-সাধু তাঁকে প্রণাম করতে গেলে তার বুকপকেট থেকে কিছু পয়সা চারদিকে গড়িয়ে পড়ল। অখণ্ডানন্দ বলে উঠলেন, "ও প্রণামী পড়েছে, ছুঁয়ো না!" কথা শুনে সকলে হেসে আকুল।

অখণ্ডানন্দের একটি বিশেষ গুণ ছিল, তিনি প্রাণস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারতেন। তিনি কপর্দকহীন অবস্থায় বহু দুর্গম তীর্থ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর রচিত 'তিব্বতের পথে হিমালয়ে' এবং 'স্মৃতিকথা' পাঠক সমাজে খুবই সমাদর লাভ করেছে।

মহাসমাধির এক বছর আগে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বেশিদিন তিনি ইহজগতে থাকবেন না। শেষ কয়টি দিন ভগবচ্চিন্তায় ব্যয় করার উদ্দেশ্যে তিনি আশ্রমে রামায়ণ পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন। সারগাছিকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, অথচ এটাও তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, গুরুভ্রাতাদের সহস্র-স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র বেলুড় মঠে গঙ্গাতীরে যেন তাঁর দেহাবসান ঘটে। মহাসমাধির পূর্বরাত্রে তাঁকে বেলুড়ে নিয়ে আসায় এই বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

১৯৩৭ সালে ৭ই ফেব্রুয়ারী এই মহাসাধক লীলা সংবরণ করেন।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ



সারদাপ্রসন্নের পিতা শিবকৃষ্ণ মিত্র ছিলেন নিষ্ঠাবান গৃহী মানুষ। কিন্তু সংসারের দিকে মন নেই দেখে গোপনে ছেলের বিয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। সারদা তা জানতে পেরে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। টেবিলের ওপর রেখে গেলেন একটি চিঠি। তাতে লেখা—"শ্রদ্ধেয় পিতা এবং স্নেহময়ী জননী আমার! আমি বিয়ে করতে পারব না। চোখের দৃষ্টি যেদিকে নিয়ে যায় সেইদিকে আজ চল্লুম আমি।"

১৮৬৫ সালের ৩০শে জানুয়ারি ২৪-পরগনার নওরা গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। একটু বড় হয়েই চলে আসেন কলকাতায় পিতৃভবনে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এফ. এ. পড়তে আরম্ভ করেন। সেই সময়েই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতে থাকেন। একদিন তাঁকে দেখেই রামকৃষ্ণ জল এনে তাঁর পা ধুইয়ে দিতে বললেন। বন্ধুদের সামনে এ কাজ করতে বলাতে সারদার মুখচোখ অপমানে লাল হয়ে গেল। এ সব হীনকাজ বলে তিনি মনে করতেন। অবশেষে আদেশ পালন করতেই হল। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, এ ঘটনাই তাঁকে সেবাকর্মে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। ক্রমশ তিনি ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা শোনা ও ধর্মগ্রন্থাদি পাঠের দিকে বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েন। সেজন্যই বাবা সংসারে তাঁর মন বাঁধবার জন্যে বিবাহের চেষ্টা করেন। কিন্তু সব চেষ্টা বৃথা হয়। সারদা কাশীপুর বাগানবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে হেঁটে রওনা হলেন পুরীর দিকে।

পথে কী নিদারুণ কষ্ট। একদিন এক গভীর জঙ্গলের কাছে আসতে রাত হয়ে গেল। নিশুতি অন্ধকার, ক্ষুধায় কাতর। নিরুপায় হয়ে একটি বড় গাছে উঠে ডালের ওপর ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ কার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে মুখ চেনা দায়। লোকটি বলল,—'সন্ন্যাসী ঠাকুর, ক্ষিদে পেয়েছে? এই নাও, খাও।' এক ঘটি জল ও কয়েকটি বাতাসা রেখে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

পুরীতে যাওয়ার কিছুদিন পর তাঁর বাবা-মা খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হলেন। অনেক কষ্টে ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন বাড়িতে। সকলের অনুরোধে সারদা এফ. এ. পরীক্ষা দিলেন এবং খুব ভালভাবে পাসও করলেন।

এর পর সারদার মনে আবার বৈরাগ্যের উদয় হল। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর তিনি বরাহনগর মঠে যোগ দিলেন; তাঁর নতুন নাম হল ত্রিগুণাতীতানন্দ।

১৮৯৭ সালে দিনাজপুর জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ত্রিগুণাতীতানন্দ সেখানে গিয়ে রিলিফের দল গঠন করে ত্রাণকার্য চালাতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীমার প্রতি ছিল ত্রিগুণাতীতের অসাধারণ ভক্তি ও বিশ্বাস। একবার ত্রিগুণাতীত তাঁকে নিয়ে জয়রামবাটিতে যাচ্ছিলেন। মা ছিলেন গোরুর গাড়িতে, তিনি চলেছিলেন পদব্রজে। রাত্রে গাড়িখানি রাস্তার এমন এক গভীর গর্তময় জায়গায় এসে পড়ল, যেখানে

গাড়ি উলটিয়ে যেতে পারে কিংবা ঝাঁকানিতে মায়ের নিদ্রাভঙ্গ হতে পারে। অবস্থা বুঝে ত্রিগুণাতীত রাস্তার গর্তে শুয়ে পড়ে তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে গাড়ি চালাতে আদেশ দিলেন। এমন সময় হঠাৎ মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি ত্রিগুণাতীতের কান্ড দেখে গাড়ি থেকে নেমে তাঁকে স্নেহমিশ্রিত ভর্ৎসনা করতে লাগলেন।

তীর্থভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা ত্রিগুণাতীতের মনে ছিল খুব প্রবল। অসংখ্য তীর্থস্থান দর্শন করেও ত্রিগুণাতীতের আশা পূরণ হল না। তিনি আবার তিব্বতের লাদাখ, কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শনের জন্যে যাত্রা করলেন। পথ চলতে চলতে একদিন সন্ধ্যের পর এক বিস্তীর্ণ খরস্রোতা পার্বত্য নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে তিনি দেখলেন, পার হওয়ার জন্যে একটিমাত্র পুরানো বাঁধ আছে। তাও স্থানে স্থানে ভাঙা। অতি সাহসে পার হতে গিয়ে মাঝখানে গিয়ে পড়লেন বিষম বিপদে। অন্ধকারে এগোতেও পারেন না, পিছনেও যেতে পারেন না। মনে মনে ঠাকুরের নাম জপ করতে লাগলেন। এমন সময় শুনতে পেলেন কে যেন তাঁকে বলছে— 'আমাকে অনুসরণ কর।' মন্ত্রমুগ্ধের মতো তিনি চলতে লাগলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, নদীর পাড়ে কোন লোকের চিহ্ন তিনি দেখতে পেলেন না।

কৈলাস, মানস সরোবর ও লাদাখ থেকে ফিরে তিনি কলকাতাতেই বেশির ভাগ সময় বাস করতে লাগলেন। সেই সময়ে তাঁর চেষ্টায় 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশিত হল। স্বামী বিবেকানন্দ দিলেন এক হাজার টাকা এবং ঠাকুরের ভক্ত হরমোহন মিত্র ধার দিলেন এক হাজার। নিজস্ব ছাপাখানা থেকে ঐ পত্রিকা বেরোতে লাগল।

স্বামী তুরীয়ানন্দ সানফ্রান্সিসকোতে 'শান্তি আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ত্রিগুণাতীত প্রতি বছরই সেখানে যেতেন এবং নানা উৎসব, ধ্যান-ধারণা ও শাস্ত্রপাঠে কিছুকাল কাটাতেন। তুরীয়ানন্দজী ১৯০২ সালে সানফ্রান্সিসকো থেকে ভারতে ফিরে এলে ত্রিগুণাতীত তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে আমেরিকা গেলেন। তাঁর অতুলনীয় উদ্যম ও উদ্দীপনায়, আমেরিকার ভক্ত নরনারীর অর্থানুকূল্যে সানফ্রান্সিসকো শহরে ১৯০৬ সালে বেদান্ত সমিতির নতুন 'হিন্দুমন্দির' নির্মিত হল। তাঁর লক্ষ ছিল, মন্দিরের সংলগ্ন বাসকক্ষগুলিকে অবলম্বন করে আশ্রম-জীবন গড়ে তোলা এবং তাতে পাশ্চাত্যবাসীকে ব্রহ্মচর্যের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া। ছাত্রেরা আগের মতো জীবিকা অর্জন করত এবং আশ্রমের ব্যয়নির্বাহের জন্যে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করত। আশ্রমের যাবতীয় কাজ ছাত্ররাই সম্পন্ন করত। প্রত্যূষে উঠে ধ্যান করা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, বাগানে জল দেওয়া,—সবই তারা করত। এই সব কাজের মধ্যে দিয়ে যাতে তাদের চরিত্রগঠন ও চিত্তশুদ্ধি হয় সেদিকেই ত্রিগুণাতীতানন্দজীর দৃষ্টি ছিল। সকালে ও সন্ধ্যায় চলত শ্রীরামকৃষ্ণের আলোচনা। সপ্তাহে একদিন ছিল উপবাস ও নির্জনে সাধন ব্যবস্থা। স্বামী ত্রিগুণাতীতের মূল্যবান বাণীগুলি বিদেশী ছাত্রদের অভিভূত করে রাখত: 'ঋষির মতো জীবন কাটাবে, কর্ম করবে অশ্বের মতন', 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপাতন—কিন্তু শরীরের ক্ষয় নেই', 'সদাসতর্ক থেকে প্রার্থনা করো', 'যা করণীয় তা এখনই কর'—ইত্যাকার বাণী লিখে তিনি মার্কিন ব্রহ্মচারীদের ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিতেন। অতি প্রত্যূষে তাদের নিয়ে চলে যেতেন আশ্রমের অদূরবর্তী সানফ্রান্সিসকো উপসাগরের তটে; সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে সবাই মিলে উদাত্ত সুরে ভজনসংগীত করতেন—সেই সুমধুর গীতধ্বনি শুনে সমুদ্রবক্ষের জেলেরা বা জাহাজের নাবিকেরা মুগ্ধ হয়ে যেত। স্বামিজী তাঁর প্রিয় শিষ্যদের বলতেন, 'তোমাদের টেনে হিঁচড়ে সেই অমৃতসাগরের পাড়ে নিয়ে যেতে আর তার গর্ভে ফেলে দিতে চাই—তবেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু তাতে যদি তোমাদের হাড়গুলি এক এক করে ভেঙে ফেলতেও হয়, আমি এতটুকু দ্বিধাবোধ করব না।'

১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে মন্দিরে একটি বড়দিনের উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে ত্রিগুণাতীতানন্দ এক অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত বোমাতে আহত হলেন। আহত স্বামিজীকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তিনি তখন আততায়ীর প্রতি খ্রীষ্টসুলভ সমবেদনা জানাচ্ছেন: 'কোথায়, কোথায় সে? আহা, নির্বোধ বেচারী!' এই আঘাতই তাঁর কাল হল। ৯ই জানুয়ারী বিকালে তাঁর সেবায় নিযুক্ত শিষ্যকে বললেন, 'আগামী কাল তো স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব, সেদিনই আমি দেহত্যাগ করব।' সত্যসত্যই পরদিন এই মহাসাধক পরমধামে চলে গেলেন।

স্বামী অভেদানন্দ



শ্রীরামকৃষ্ণ কালীপ্রসাদকে উত্তর দিকের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে একটি তক্তপোশের ওপর বসতে বললেন এবং তার জিহ্বায় আঙুল দিয়ে মূলমন্ত্র লিখে দিয়ে বুকের ওপর হাত রাখলেন। সেই মন্ত্রশক্তি কালীর মনকে অচিরেই গভীর ধ্যানে নিমগ্ন করে দিল। ঠাকুর আবার বুকে হাত দিয়ে কালীর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনলেন।

বাড়িতে কিছু না বলে যে ছেলেটি একদিন বেরিয়ে এসেছিল, সে প্রতি সপ্তাহে দু-তিন দিন ঠাকুরের কাছে আসতে লাগল। ঠাকুর বলতেন—'তুই না এলে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়। তোকে রোজ দেখতে ইচ্ছা হয়।'

কালীপ্রসাদ দক্ষিণেশ্বরে প্রথম রামকৃষ্ণ-দর্শন করেন সম্ভবতঃ ১৮৮৪ সালের মধ্যভাগে। ঝাউতলায় পাদচারণা করার সময় ঠাকুর অনেক সময় কালীপ্রসাদের কাঁধে হাত রেখে চলতেন এবং অনেক উচ্চ তত্ত্ব শেখাতেন। একদিন রাত্রে ধ্যানকালে তাঁর বোধ হল—তাঁর আত্মা দেহ ছেড়ে ঊর্ধ্বলোকে চলেছে। অনেক সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে তিনি এক মনোরম প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে দেখেন, সেখানে সর্বধর্মের প্রতীক ও মূর্তবিকাশ রয়েছে। চারপাশে বেদীর ওপর বিভিন্ন ধর্মের দেবদেবী ও অবতারগণ বসে আছেন—আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ক্রমে সব দেবদেবী ও অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় বিরাট দেহে মিশে গেলেন। পরে কালীর এই দিব্যদর্শনের কথা শুনে ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন, 'তোর বৈকুণ্ঠদর্শন হয়ে গেল—এখন থেকে তুই অরূপের ঘরে উঠলি, আর রূপ দেখতে পাবিনে।'

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর কলকাতার আহিরিটোলা অঞ্চলে নিমু গোস্বামী লেনে কালীপ্রসাদের জন্ম হয়। তার বাবা রসিকলাল চন্দ্র ছিলেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুলের শিক্ষক। কালীপ্রসাদও সেই স্কুলের ছাত্র ছিল।

ছোটবেলা থেকেই কালীপ্রসাদের মনে জ্ঞানপিপাসা ছিল প্রবল। পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দু-ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় তখন বাংলাদেশকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। সতের বছরের তরুণ কালীপ্রসাদ আলবার্ট হলের ভিড় ঠেলে সেই ধর্মকথা শুনতে যেতেন। পণ্ডিতজীর মুখে ওজস্বিনী ভাষায় পাশ্চাত্যদর্শন ও সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে প্রাচীন ও নবীন ইওরোপের দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্যে তাঁর হৃদয়ে একটি সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হল।

অল্পবয়সেই পুত্রকে গীতা পাঠ করতে দেখে রসিকলাল তা কেড়ে নিয়ে বললেন—'একী পড়ছ? গীতা পড়লে পাগল হয়ে যাবে।' ছেলের হাত থেকে বাবা গীতাখানি কেড়ে নিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে গীতা পাঠ থেকে নিরস্ত করতে পারলেন না। কালীপ্রসাদ গভীর রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে গীতা পড়তেন।

রামকৃষ্ণ যখন কাশীপুর উদ্যানবাটিতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন কালীপ্রসাদ প্রাণপণে গুরুর সেবা করেছিলেন। কালী দু'ঘণ্টা দিনে ও দু'ঘণ্টা রাত্রে সেবা করতেন। দুপুরে ঠাকুরকে তেল মাখিয়ে গাড়িবারান্দার ছাদের ওপর রৌদ্রে জলচৌকিতে বসিয়ে স্নান করাতেন এবং ঐ সুযোগে শ্রীমুখনিঃসৃত তত্ত্বকথা শুনতেন। একদিন ঠাকুর তাঁকে বললেন—'ছেলেদের মধ্যে তুই-ই

বুদ্ধিমান, নরেনের নিচেই তোর বুদ্ধি। নরেন যেমন একটা মত চালাতে পারে, সেরকম তুই-ও পারবি।'

নরেন্দ্রই কালীপ্রসাদের ভাবধারাকে সমধিক প্রভাবিত করেছিলেন। একদিন—ফাল্গুনী শিবরাত্রি। নরেন্দ্র পূজার আসনে বসে সঙ্গীদের সঙ্গে কথোপকথন করছেন। এমন সময় নরেন্দ্রের শরীরে সহসা দিব্য বিভূতির তীব্র অনুভব হল। তিনি এর ফলাফল পরীক্ষা করে দেখার উদ্দেশ্যে কালীপ্রসাদকে বললেন, 'আমাকে খানিকক্ষণ ছুঁয়ে থাক তো।' সঙ্গীরা দেখেন, নরেন্দ্র স্থিরভাবে ধ্যানস্থ রয়েছেন আর কালী চোখ বুজে ডান হাত দিয়ে নরেন্দ্রের দক্ষিণ জানু স্পর্শ করে আছেন, তাঁর ঐ হাতটি ঘন ঘন কম্পিত হচ্ছে। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যস হয়েছে। কীরকম মনে হল?' কালীপ্রসাদ উত্তর দিলেন, 'ব্যাটারি ধরলে যেমন কী-একটা ভিতরে আসছে জানতে পারা যায় ও হাত কাঁপে—ঐ সময়ে তোমাকে ছুঁয়ে সেইরকম অনুভব হতে লাগল।' এরপর কালীপ্রসাদ ধ্যানে বসলেন। তাঁর সর্বশরীর আড়ষ্ট হয়ে মাথা ও চিবুক বেঁকে গেল, কিছুক্ষণের জন্যে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল।

একবার কাশীপুরের নবীন সন্ন্যাসিগণ পণ করলেন, প্রাণ যায় যাক্, ঈশ্বর লাভ করতেই হবে। বুদ্ধদেবের সাধনপথ তাঁরা অনুসরণ করবেন স্থির হল। নরেন্দ্রনাথ বললেন—'চল্ কালী, বুদ্ধগয়ায় গিয়ে বুদ্ধদেবের তপস্যার স্থানে বসে তপস্যা করা যাক্।'

নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ ও তারকনাথ বুদ্ধগয়ায় গিয়ে প্রথমে সমস্ত রাত্রি বুদ্ধগয়ার মন্দিরের বাইরে বোধিবৃক্ষের নিচে, তারপর দিনের বেলা মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধদেবের মূর্তির নিচে বসে ধ্যান করলেন। একদিন ধ্যানাবসানে নরেন্দ্রনাথ দেখলেন, একটা জ্যোতিঃ তারকনাথ ও কালীপ্রসাদের দিকে এগিয়ে মিলিয়ে গেল।

ঠাকুরের তিরোধানের পর নরেন্দ্রের আহ্বানে একে একে সকল অন্তরঙ্গ ভক্তই গৃহত্যাগ করে চলে এলেন এবং বৈদিক বিধানানুসারে সন্ন্যাস নিলেন। যজ্ঞান্তে সন্ন্যাসিগণ যে যাঁর ভাব অনুযায়ী নাম গ্রহণ করলেন। অভেদ মন্ত্রে দীক্ষিত কালীপ্রসাদের নাম হল 'অভেদানন্দ'।

এর পর শুরু হল অভেদানন্দের তীর্থপর্যটন। হৃষিকেশে এক ঘাসের ঝুপড়িতে বাস করে তপস্যা করবার সময় অদ্বিতীয় ষড়দর্শনবিৎ বেদান্তী সাধু ধনরাজ গিরির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। তিনি গিরি মহারাজের কাছে বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে লাগলেন। অদ্বৈতজ্ঞানে সিদ্ধির শেষ সোপান অতিক্রম করার জন্যে অভেদানন্দ সেখানে বিষ্ঠা ও চন্দন নিয়ে সাধন করতেন। বাক্‌সিদ্ধি ঘটেছে কিনা দেখবার জন্যে একদিন মনে মনে বললেন—'আমার দেহে কঠিন রোগ হোক। কী আশ্চর্য! তিন দিন যেতে না যেতেই তিনি কঠিন ব্রঙ্কাইটিস রোগে আক্রান্ত হলেন। পরে ক্রমে সুস্থ হয়ে তিনি এলাহাবাদের কাছে ঝুসিতে এসে 'রাজযোগ' সাধনে আত্মনিয়োগ করলেন।

নরেন্দ্রনাথও স্বামী বিবেকানন্দ নাম ধারণ করে ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করছেন। আমেরিকা যাত্রা করে শিকাগোর ধর্মসম্মেলনে ভারতীয় ধর্মের জয়ধ্বজা উড়িয়ে বিবেকানন্দ বেরোলেন ইওরোপের নানাস্থানে ধর্মপ্রচারে। ১৮৯৬। লন্ডন থেকে খবর পাঠালেন—অবিলম্বে কালীকে সেখানে পাঠিয়ে দিতে। অভেদানন্দের সংস্কৃতে মোটামুটি জ্ঞান ছিল; কিন্তু তিনি ইংরেজীতে খুব পাকা ছিলেন না। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেওয়ায় অভ্যস্ত করালেন। পরবর্তীকালে অভেদানন্দই হয়ে উঠলেন ইওরোপ ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের প্রধান প্রচারক। ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ তাঁকে নিউইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটির দায়িত্বভার নিতে বলেন। আমেরিকায় তাঁর কৃতিত্ব খুব বেশি। মাত্র একটিবার (১৯০৬) অল্প কয়েকদিনের জন্যে ভারতে ফিরে আসা ছাড়া ওই দেশেই তিনি লোকশিক্ষার কাজ করে গেছেন ১৯২১ সাল পর্যন্ত। ১৯২২ সালে অভেদানন্দ পদব্রজে তিব্বতে যান। সেখানে একটি মঠের পুস্তকাগারে হাতে-লেখা পুঁথির কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করলেন। সেই পুস্তকটি পাঠ করেই তিনি জানতে পারেন যীশুখ্রীষ্ট ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

মহাযোগী অভেদানন্দ ১৯৩৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর বেলুড়মঠে সমাধিযোগে মহাপ্রয়াণ করেন।

স্বামী সারদানন্দ



দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ একদিন হঠাৎ এক যুবকের কোলের ওপর উঠে বসলেন এবং কিছুক্ষণ ঐভাবে থেকে উঠে গেলেন। উপস্থিত ভক্তরা অবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ঠাকুর বললেন—'দেখলাম ও কতটা ভার সইতে পারে।'

এই যুবকই পরবর্তী কালের স্বামী সারদানন্দ।

সারদানন্দের পূর্বনাম শরৎচন্দ্র। জন্ম ১৮৬৮ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। পিতা গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী হুগলী জেলার জনাই গ্রাম ত্যাগ করে কলকাতায় আসেন এবং ঔষধের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান।

পড়াশোনায় যেমন তাঁর মনোযোগ ছিল তেমনই ছিল সৎ-চর্চা, আর্তসেবা ও ব্যায়ামাদির প্রতি মনোযোগ। তাঁরই চেষ্টায় পাড়ায় একটি সমিতি গঠিত হয়েছিল। একবার সেই সমিতির বার্ষিক আনন্দোৎসব উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে গিয়ে ঘটনাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পেলেন। তারপর কলেজে অধ্যয়নকালে ১৮৮৩ সালে সমবয়স্কদের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর উপদেশ শুনে মুগ্ধ হলেন।

সেই উপদেশ শরতের জীবনে এক নতুন পথের সন্ধান দিল। পরে সকলের অজ্ঞাতসারেই দক্ষিণেশ্বরে যেতে লাগলেন। কোন কোন দিন দক্ষিণেশ্বরে থেকেও যেতেন। তখন গভীর রাত্রে ঠাকুর তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে পঞ্চবটী বেলতলা বা ভবতারিণীর নাটমন্দিরে ধ্যান করতে পাঠাতেন।

১৮৮৫ সালে এফ. এ. পরীক্ষা পাস করার পর শরতের বাবা বললেন—'তোকে মেডিকেল কলেজে ভরতি করিয়ে দিই, ডাক্তারি পড়।' কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তার ও উকিলের অন্ন গ্রহণ করেন না—এই কথা ভেবে শরৎ রাজি হলেন না। অবশ্য পরে নরেন্দ্রনাথের পরামর্শে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষায় অগ্রসর হলেন।

ঠাকুর কাশীপুর আগমনের পর সেবকের অভাব দেখে শরৎ ঐ কাজের ভার নিলেন। ঠাকুরের অসুখ যখন বেড়ে গেল তখন দিনরাত কাশীপুরেই কাটাতেন। এ দেখে বাবা ভয় পেলেন। তিনি একদিন পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকে সঙ্গে করে ঠাকুরের কাছে গেলেন। গিরিশচন্দ্র ভাবলেন পণ্ডিতের যুক্তি শুনে নিশ্চয়ই ছেলের মতিগতি ফিরবে। কিন্তু ফল হল বিপরীত। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে পণ্ডিত, গিরিশচন্দ্রকে বললেন—'তোমার ছেলে বহু ভাগ্যে এমন গুরু লাভ করেছে।'

ঠাকুরের লীলাসংবরণের পর বাবার আদেশে শরৎ ঘরে ফিরে পড়াশোনায় মন দিলেন। বাবা ভাবলেন, এইভাবে ছেলের মন ঘরেই আটকা পড়বে। কিন্তু বরাহনগরে মঠ স্থাপিত হওয়ার পর একদিন কৌশলে শরৎ পালিয়ে চলে গেলেন মঠে। তারপর আঁটপুর গিয়ে কিছুদিন আত্মগোপন করে রইলেন। এর পর সন্ন্যাস অবলম্বন করে শরৎ পরিচিত হলেন সারদানন্দ নামে। এর পর সারদানন্দ তীর্থ পরিক্রমার উদ্দেশ্যে

অভেদানন্দ ও প্রেমানন্দের সঙ্গে পদব্রজে নীলাচলে চলে গেলেন। তারপর একাই গয়া, কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করলেন। হৃষিকেশে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে সেখানেই সাধনায় নিমগ্ন হলেন।

একবার সারদানন্দের কেদার বদরীনাথ দর্শনের খুব ইচ্ছা হল। কিন্তু সেই বছর পাহাড়ে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় সরকার বাহাদুর সদর রাস্তায় পাহারা বসিয়ে যাত্রীদের ঐ অঞ্চলে যেতে নিষেধ করেছিলেন। সারদানন্দ ঘুর পথে মুসৌরি হয়ে খালি পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। ক্ষিদেয় কাতর হয়ে চলতে চলতে ভাবলেন—'যদি এই ক্ষিদের সময় এখানে লুচি ও হালুয়া খেতে পাই তবেই বুঝব ঠাকুর সত্যিই আছেন।' অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল একটি লোক একঘটি জল ও কিছু গরম লুচি হালুয়া নিয়ে উপস্থিত। তা খেয়ে সারদানন্দের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্ত হল।

কিছুকাল পরে বিদেশে প্রচারকের প্রয়োজন হওয়ায় স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে সারদানন্দ বিলাত চলে গেলেন। তারপর গেলেন আমেরিকায়। বহু বছর পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত প্রচার করলেন।

গঠনমূলক কার্যে সিদ্ধহস্ত সারদানন্দের কর্ম-দক্ষতার সঠিক পরিচয় পাওয়া গেল স্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার পর। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রকাশ যখন বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম, তখন সারদানন্দই শক্ত হাতে তার হাল ধরেন। উদ্বোধন-এর নিজস্ব ভবন তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় নির্মিত হয়। এই ভবনের দ্বিতলটি নির্দিষ্ট হয় শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর থাকার জন্যে ও ঠাকুরঘর-রূপে। নতুন বাড়িতে পদার্পণ করে শ্রীমা আন্তরিক আশীর্বাদ করেছিলেন সারদানন্দকে; তিনি বলতেন, 'আমার ভার শরৎই নিতে পারে—আর কেউ নয়।' উদ্বোধন-বাটী নির্মাণ উপলক্ষে অনেক ঋণ হয়ে গিয়েছিল; তা পরিশোধকল্পে সারদানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' লিখতে আরম্ভ করেন। "স্বামী সারদানন্দের এই অমূল্য অবদান বাংলার ধর্ম ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। (শ্রীরামকৃষ্ণের) জীবনের ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষা, শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ তাঁহার নিপুণ লেখনীতে পরস্পর-সংবদ্ধ হইয়া পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থখানিকে ধর্ম-জীবনের পঞ্চামৃততুল্য করিয়াছে।"

কর্মযোগী পুরুষ সারদানন্দ সহযোগী কর্মীদের সর্বদাই উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন। তাঁর উপদেশ ছিল—"সকলের আত্মা চিরস্বাধীন বলিয়া তাহার মনে সকল বিষয়ে সর্বদা স্বাধীনতালাভের ইচ্ছার উদয় হয়। যথার্থ নেতা কখনও তাহার ঐ স্বাধীনতালাভের ইচ্ছায় বাধা দেন না। কেবল ঐ স্বাধীনতালাভ করিলে যাহাতে সে উহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে তাহার চেষ্টাই করিয়া থাকেন।" তিনি নিজের জীবনেও কার্যে পরিণত করেছিলেন এই সব উপদেশ—"ক্রোধ, বিরক্তি, কাহারও ত্রুটিতে অসহনীয়তা, মনমুখ এক রাখিতে না পারা এবং সর্বোপরি প্রেমের দ্বারা না হইয়া কৌশলে সকলকে বশে রাখিবার চেষ্টা অতি সহজেই আশ্রমভঙ্গের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।"

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময়ে স্বামী সারদানন্দের প্রাণ বিচলিত হত। তখন তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক। শ্রীমা বলতেন, 'শরতের দিল্ দেখলে? নরেনের পর এত বড় প্রাণ আর একটিও পাবে না। ব্রহ্মজ্ঞ হয়ত অনেকে আছেন, শরতের মতো এমন হৃদয়বান দিলদরিয়া লোক ভারতবর্ষে নেই, সমস্ত পৃথিবীতে নেই।' সেবার মূলমন্ত্র সারদানন্দের একখানি পত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে, 'পরের টাকা পরকে দিবি, তুই কী দিবি? তুই দিবি তোর হৃদয়, প্রাণ-মন, ভালবাসা।'

১৯০৯ সালে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধাচরণের জন্য অভিযুক্ত দুজন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী রামকৃষ্ণ-সংঘে প্রবেশের অনুমতি চান। তাঁরা শপথ নেন যে বিপ্লবী জীবন থেকে সরে আসবেন এবং সংঘের কাজে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবেন। সারদানন্দ তাঁদের কথা বিশ্বাস করে তাঁদের সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করেন। এ ঘটনায় সারদানন্দের সমালোচনা হয়েছিল; কিন্তু সারদানন্দ মানুষ চিনতে ভুল করেননি। এই দুই বিপ্লবী তাঁদের শপথ রক্ষা করেছিলেন।

১৯২৭ সালের ১৯শে অগাস্ট এই জ্ঞানী সাধক নির্বাণ লাভ করেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ



রামকৃষ্ণের ঘরে সেদিন অনেকক্ষণ আনন্দিত মনে বসে ছিলাম আর অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখছিলাম। একে একে ভক্তেরা চলে যাচ্ছেন; হঠাৎ দেখলাম ঘরে আমি একা। মনে হল এবার ফেরা দরকার। সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে যেমনি উঠে দাঁড়িয়েছি, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কুস্তি লড়তে পারিস? দেখি কেমন তুই কুস্তি করিস?" এই বলে রামকৃষ্ণ উঠে দাঁড়ালেন, তারপর আমায় যেন জাপটে ধরবেন এইরকম ভাব দেখালেন। আমি তো অবাক। শ্রীরামকৃষ্ণ আমার দিকে এগিয়ে এলেন; ঠোঁটে সুধামাখা হাসি। আমার হাতদুটি ধরে আমায় ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু আমি তখন রীতিমত বলিষ্ঠ যুবক—আমার সঙ্গে পারবেন কেন! আমি অনায়াসে তাঁকে দেয়াল অব্দি ঠেলে নিয়ে গেলাম। তখনও তিনি শক্ত করে আমার হাতদুটি জড়িয়ে ধরে তেমনি মিটিমিটি হাসছেন। ক্রমে আমার মনে হল, যেন এক বিদ্যুৎতরঙ্গ তাঁর হাত থেকে প্রবাহিত হয়ে আমার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করছে। সব দৈহিক শক্তি তখন আমার হারিয়ে গেছে। তাঁর ছোঁয়ায় সারা শরীরে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। এবার শ্রীরামকৃষ্ণ আমায় ছেড়ে দিলেন। মধুর হেসে বললেন, "শেষ পর্যন্ত তুইই জিতলি!" ...তারপর আমার পিঠে মৃদু করাঘাত করে বললেন, "এখানে আসবি, প্রায়ই আসবি।" ...বেশ বুঝতে পারছিলাম যে সেদিন তিনি স্পর্শদ্বারা আমার মধ্যে অধ্যাত্মশক্তি সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ এইভাবে দিয়েছেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—যাঁর গৃহী নাম ছিল হরিপ্রসন্ন।

রামকৃষ্ণ মঠ আলমবাজার থেকে উঠে গেল বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে। পরে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়ে মঠের জমি কিনে মঠ নির্মাণের ভার দিলেন হরিপ্রসন্নের উপর। স্বামিজীর আদেশ! কাজেই এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনজ্ঞানে হরিপ্রসন্ন মঠবাড়ি তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এজন্যে তাঁকে জমির মাপ, বাড়ির নকশা, আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদি সমস্ত কাজই নিজের হাতে করতে হত। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা ও কর্মকুশলতায় অল্পদিনের মধ্যেই মঠের মূলবাড়ি ও ঠাকুরঘর প্রভৃতি তৈরি হয়ে গেল। ১৮৯৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর শুভদিনে স্বামিজী মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন।

হরিপ্রসন্নের পিতা তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়। আদি বাসস্থান ছিল চব্বিশপরগনা জেলার বেলঘরিয়া গ্রামে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর হরিপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর শৈশবের বিদ্যারম্ভ হয় কাশীধামে বাঙ্গালীটোলায়। পরে কলকাতায় পড়াশোনার জন্যে তিনি পৈতৃক বাসস্থান বেলঘরিয়ায় চলে আসেন। ঐ সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি দুবার দর্শন করেন।

১৮৮৪ সালের ১৩ই অগাস্ট জন্মাষ্টমীর দিন হরিপ্রসন্ন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় গিরিশ ঘোষ স্বরচিত "কেশব কুরু করুণা দীনে"

গানটি গেয়েছিলেন। গান শুনে ঠাকুরের চোখে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হয়েছিল। রাত্রে হরিপ্রসন্ন দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়িতেই থেকে গেলেন। মাঝ রাত্রে জেগে দেখেন, ঠাকুর ঘরময় পায়চারি করছেন—মুখে শুধু 'মা মা' ধ্বনি। এ দৃশ্যটি হরিপ্রসন্নকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। হরিপ্রসন্ন প্রথম যেদিন ঠাকুরের মুখে শুনলেন—"যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই এ শরীরে রামকৃষ্ণ"—সেদিন তাঁর তেমন বিশ্বাস হয়নি। পরে একদিন স্বকক্ষে দণ্ডায়মান ঠাকুর রাসলীলা ও গোপীদের কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাখ্যাচ্ছলে যখন বললেন, "যে বৃন্দাবনে রাসলীলা করে-ছিল, সে-ই এই শরীরটাতে আছে," সেদিন ঠাকুরের চোখ-মুখের ভাব ও কথার ভঙ্গিতে এমন একটা সংক্রামক দৃঢ়প্রত্যয়ের ছাপ ছিল যে, হরিপ্রসন্ন তা স্বচক্ষে দর্শন করে আর অবিশ্বাস করতে পারলেন না।

১৮৮৫ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে হরিপ্রসন্ন প্রথম বিভাগে এফ-এ পাস করেন। স্বামী সারদানন্দ সেই কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। হরিপ্রসন্ন বাঁকিপুরে থেকে পাটনা কলেজে অধ্যয়ন করতেন। যে রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেহত্যাগ করেন সে রাত্রে হরিপ্রসন্নের একটি অদ্ভুত দর্শন হয়। তিনি দেখেন যেন ঠাকুর সশরীরে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। পরদিন সংবাদপত্রে ঠাকুরের দেহত্যাগের খবর পেয়ে ঐ দর্শনের কারণ বুঝতে পারলেন।

পুনা থেকে এঞ্জিনিয়ারিং পাস করে ১৮৯৩ সালে হরিপ্রসন্ন গাজীপুরের জিলা এঞ্জিনিয়ারের পদে প্রথম চাকুরি গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে সেখানে অবস্থানকালে তিনি পওহারী বাবাকে কয়েকবার দর্শন করেন—ঐ সময়ে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন।

এটোয়াতে বাবুরাম মহারাজের সঙ্গ পেয়ে হরিপ্রসন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও গুরুভাইদের প্রসঙ্গে আলোচনা হলে তাঁর কোন কিছুর দিকে খেয়াল থাকত না। এভাবেই যেন হরিপ্রসন্ন প্রাণে প্রাণে ঠাকুরের ডাক শুনতে পেলেন। সেই দুর্নিবার আহ্বান তাঁকে বিচলিত করে ফেলল। চাকুরি করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভবপর হল না। বাবুরাম মহারাজ চলে আসবার কিছুদিন পরেই স্বামিজীর নির্দেশে হরিপ্রসন্ন কর্মত্যাগ করে ব্রহ্মচারীর বেশে যোগদান করলেন আলমবাজার মঠে।

হরিপ্রসন্ন হলেন—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিল বিজ্ঞানানন্দ এলাহাবাদে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব প্রচার করেন। এজন্য তাঁকে 'এলাহাবাদের ধর্মযাজক' বলতেন। স্বামিজীর নির্দেশকে মাথা পেতে নিয়ে বিজ্ঞানানন্দ ১৯০০ সাল থেকে তীর্থরাজ প্রয়াগকে সাধনপীঠ ও কর্মক্ষেত্র করলেন। প্রকৃত ধর্মজীবন যাপন দ্বারা গুরুদেবের জীবন ও বাণী প্রচারের জন্যে সেখানে অবস্থান করেন। সুদীর্ঘ ৩৮ বছর এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্বামিজী-প্রদত্ত পতাকা সগৌরবে বহন করে ঐ পুণ্যক্ষেত্রে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন—১৯৩৮ সালের ১৫ই এপ্রিল।

স্বামিজী-পরিকল্পিত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা বিজ্ঞানানন্দের জীবনে এক মহৎ কাজ। ১৮৯৭ সালের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে বিজ্ঞানানন্দ যখন উত্তর-পশ্চিম ভারত অঞ্চলে পর্যটন করছিলেন তখন তাঁরা ভারতের স্থাপত্যশিল্প পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য-বেক্ষণ ও শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যমন্দিরের গৃহনকশা কীরকম হওয়া উচিত আলোচনা করতেন। স্বামিজীই বেলুড়ের ভাবী মন্দিরের প্ল্যান করেন এবং সেই অনুযায়ী বিজ্ঞানানন্দের তত্ত্বাবধানে মন্দির নির্মিত হয়। জীবনের অন্তিমক্ষণ আসন্ন বুঝে তিনি মন্দিরের নির্মাণ-কার্য দ্রুত শেষ করার জন্য সবাইকে তাড়া দিতেন। ১৯৩৮ সালের ১৪ই জানুয়ারি বেলুড়ে নবনির্মিত মন্দিরে 'আত্মারামের কৌটা' প্রতিষ্ঠিত করে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহাতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন 'আমার কাজ শেষ হয়েছে।'

প্রয়াগে বাসকালে সুরেশ দত্ত রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ'-এর হিন্দি অনুবাদ এবং 'দেবী ভাগবত' ও 'বৃহজ্জাতক'-এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। প্রয়াগে ফিরে যাবার দিন রামায়ণের অনুবাদ করা সম্বন্ধে কথা উঠতে তিনি বলেছিলেন—'যখন আমি রামায়ণ লিখতে বসি তখন জগৎ ভুল হয়ে যায়। আর সামনেই রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও মহাবীরকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। শেষ জীবনটা রাম নাম করেই কাটিয়ে দেব।' দেহরক্ষার বারোদিন পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানানন্দ একরকম শোওয়া অবস্থাতেই রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন।

দুর্গাচৈতন্য ভারতী



একটি মাত্র সন্তান—তাও অকালে গেল মারা। কাশীনাথ ঘোষ অভিজ্ঞ বৈদিক আনিয়ে সাতদিনব্যাপী এক যজ্ঞ করালেন। পূর্ণাহুতির দিন স্ত্রী মুক্তকেশী দেবী প্রসাদ গ্রহণ করে রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন এক জটাজুট-ভূষিত ত্রিশূলধারী সাক্ষাৎ শিবরূপী পুরুষ তাঁকে বলছেন "তোমার এক দীর্ঘায়ু সৎপুত্র হবে, তুমি এই মন্ত্রটি নিত্য জপ করো।" এই বলে সেই পুরুষ মুক্তকেশী দেবীকে একটি বীজমন্ত্র দান করে অন্তর্ধান করলেন।

এর কিছুকাল পরেই ১২৭৮ বঙ্গাব্দের ২২শে আষাঢ় (১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে) ফরিদপুর জেলার উলপুর গ্রামে জন্ম হয় দুর্গানাথের। দুর্গানাথের ভাগ্যে পিতার স্নেহ-বাৎসল্যের পরিচয় লাভ বেশিদিন ঘটেনি, কারণ মাত্র চার বছর বয়স না পেরোতেই তাঁর পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন।

দুর্গানাথের বয়স যখন মাত্র পনর বৎসর, সেই সময়েই সংসার-বৈরাগ্যের ভাব তাঁর চিত্ত অধিকার করে বসে।

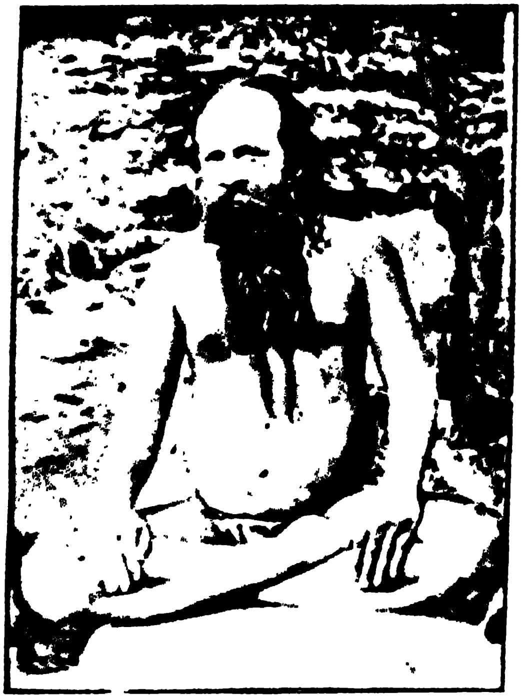
১২৯৮ সনে কলকাতায় থেকে দুর্গানাথ মেট্রোপলিটন কলেজে পড়াশোনা করতেন। সেই সময় পরিব্রাজকাচার্য **স্বামী রামানন্দ ভারতীজী** মহারাজ সুকিয়া স্ট্রীটে এক বাড়িতে এসেছেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে দুর্গানাথের সাক্ষাৎ হয়। সেই সন্ন্যাসীর অসাধারণত্বে দুর্গানাথ আকৃষ্ট হলেন।

জনৈক ভক্ত-দর্শক রামানন্দ ভারতীজী সম্পর্কে লিখেছেন: "দেখিলাম বৃহৎ ব্যাঘ্রচর্মাসনে উপবিষ্ট, কৌপীনমাত্র পরিহিত, দীর্ঘশ্মশ্রু, স্কন্ধলম্বিত অযত্নবিন্যস্ত কেশ, উন্নতললাট, উজ্জ্বলকান্তি, সদাপ্রফুল্লবদন, সৌম্যদর্শন, আনন্দমূর্তি একজন প্রৌঢ় সন্ন্যাসী সমবেত শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। ইহার পূর্বে অনেক সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কেননা সাধুদর্শন আমার একটি ব্যাধি ছিল। কিন্তু কই, এমনটি তো দেখি নাই।" তুলসীদাসের দোঁহাবলীতে আছে—'নখ কাটে না এরূপ লোক দেখেছি, মস্তকে জটাভার বহন করছে এরূপ লোক দেখেছি, ছিন্নকর্ণ যোগী দেখেছি, শরীর ভস্মাবৃত করেছে এরূপ লোক দেখেছি, অরণ্যগুহাশ্রয়ী দেখেছি, বীর দেখেছি, গুণী দেখেছি, মূর্খ দেখেছি, ধন পেয়ে মায়ায় ভুলে আছে এরূপ লোক দেখেছি, চিরসুখী দেখেছি, জন্মদুঃখী দেখেছি,—অথচ এমন লোক দেখলাম না যার মনে লোভ নেই।' কিন্তু স্বামী রামানন্দ ভারতীকে দেখে দুর্গানাথের মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। তাঁর স্নেহের ডোরে বাঁধা পড়ে গেলেন।

২৩শে মাঘ, শুক্রবার, অষ্টমী তিথিতে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর আবির্ভাব-দিবসে দুর্গানাথ স্বামী রামানন্দ ভারতীর নিকট দীক্ষা লাভ করলেন। সেই সময়ে তিনি একেবারে সন্ন্যাস পর্যন্ত চেয়েছিলেন, স্বামিজী সে প্রস্তাবে রাজি হননি। কিন্তু শিষ্যের মনের গতি তিনি ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। দীক্ষান্তে স্বামিজী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস বিষয়ক কীর্তনটি—"আমার ডোর-কৌপীন দাও ভারতী গোসাঁই, সংসার-বাসনা আমার মনে নাই"—গাইতে গাইতে কাশীধামের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

নবদীক্ষিত দুর্গানাথের মনও উদাস হয়ে গেল।

তিনিও এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক পড়তে পড়তে খোলা রেখেই এক বস্ত্রে কাশীধামের দিকে পাড়ি



স্বামী রামানন্দ ভারতী

দিলেন। পৌঁছলেন স্বামিজীর পদপ্রান্তে। স্বামিজী বুঝতে পারলেন দুর্গানাথ বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন। তখন তাঁর আত্মীয়দের খবর দিলেন। দুর্গানাথের এক ভাই এসে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ময়মনসিংহে তাঁর মায়ের কাছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনায় সেখানেই ইতি।

স্বামিজীর উপদেশ মতো দুর্গানাথ দিনচর্যা, গীতাদি পাঠ, জপাদি কাজ যথানিয়মে করতে লাগলেন। এই সব দেখে মা ও আত্মীয়স্বজনেরা খুবই চিন্তিত হলেন। উদাসী দুর্গানাথের কিন্তু কোনদিকে খেয়াল নেই– তিনি যথানিয়মে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ব্রহ্মপুত্র নদের নির্জনতটে বসে একমনে গভীর ধ্যানে ডুবে থাকেন। একদিন রাতের অন্ধকারে ব্রহ্মপুত্র তট থেকে ফেরবার সময় একটি উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ আলোকে তাঁর আপাদমস্তক ঢেকে গেল। কী আশ্চর্য সেই অনুভূতি!

একজন পন্ডিত সন্ন্যাসী দুর্গানাথকে উপনিষদাদি অধ্যাত্মশাস্ত্র কিছু কিছু পড়িয়েছিলেন। দুর্গানাথও সেই সব শাস্ত্রের মধ্যে তাঁর নিজ হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়ে তৃপ্ত হলেন। ফিরে যাওয়ার সময় সন্ন্যাসী বললেন—"তুমি পঞ্চদশী ইত্যাদি পড়ো।"

দুর্গানাথ স্বপ্নে অনেক তথ্য জানতে পারতেন। একসময় দুর্গানাথের মনে তাঁদের কুলদেবতা কী তা জানবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। সে কথা অন্য কাউকে তিনি জিজ্ঞাসা করেননি। কিন্তু স্বপ্নে তথ্যলাভ হয়ে গেল। তিনি দেখেন যে, তাঁর গুরু একটি ঝাঁপি খুলে এক জ্যোতির্ময়ী শক্তি মূর্তি দেখাচ্ছেন। পরে তিনি জানতে পারলেন যে ঐটি তাঁদের কুলদেবতা। রামানন্দ স্বামী কিন্তু দুর্গানাথ তাঁকে বলবার আগে এ সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। শ্রীদুর্গানাথ বলেন—"এতে প্রমাণিত হয় যে চিৎশক্তিই জীবের অন্তরস্থ ব্রহ্মশক্তিই, গুরুরূপে প্রকটিত হন।"

দুর্গানাথ ১৮৯৪ সালে মুঙ্গেরে যান। সেখানে তিনি এক সাহেবের চেষ্টায় একটি চাকরি পান। সেই চাকরিতে যথেষ্ট উপরি ছিল। অন্য সকলেই তা অবাধে নিতেন, কিন্তু দুর্গানাথ এই উপরিকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন।

ইংরাজী ১৯০৫ সাল। দুর্গানাথের মায়ের ইচ্ছা হয় সেবার তিনি ভরা কার্তিক মাসটা কাশীধামে বাস করবেন। মাতৃবৎসল পুত্রও মায়ের ইচ্ছাপূরণে সচেষ্ট হলেন এবং মাকে নিয়ে কাশীধামে এলেন। কাশীতে তাঁকে নিরাপদ স্থানে রেখে ফিরে এলেন মুঙ্গেরে। মায়ের কথা তিনি কখনো অমান্য করেননি। তাই মায়ের নির্দেশেই দুর্গানাথ বিবাহ করলেন। বিবাহের সময় স্পষ্ট অনুভব করলেন যে শ্রীগুরু তাঁর মস্তকে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন। কিন্তু বেশিদিন স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতে হয়নি। ১৯১০ সালের মার্চ মাসে স্ত্রী হঠাৎ মারা গেলেন।

এর পর দুর্গানাথের শুরু হল তীর্থপরিক্রমা ও যোগ-সাধনার পালা। তাঁর যোগ-বিভূতির মহিমা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীমৎ স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতীজী নামে তিনি প্রখ্যাত হন। তাঁর তিরোধানে এক মহাসাধকের অভাব অনুভূত হয়।

শ্রীঅরবিন্দ



পশ্চিম বাংলার কোন্নগরের কৃষ্ণধন ঘোষ বিলাত-ফেরত ডাক্তার। তাঁরই পুত্র অরবিন্দ ঘোষ। ১৮৭২ সালের ১৫ই অগস্ট তাঁর জন্ম। কৃষ্ণধন ছিলেন ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী। বিলাতে থেকেই অরবিন্দ পড়াশোনা করেছেন। আই. সি. এস. পরীক্ষাও দিলেন। ভারতে তখন রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে। পাস করে ইংরেজ শাসকের অধীনেই চাকুরি করতে অরবিন্দ চাইলেন না। আই. সি. এস. পাস করে ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষা না দিয়েই চলে এলেন ভারতবর্ষে।

বরোদার গাইকোয়াড় সয়াজি রাও এই বাঙালী যুবকটিকে তাঁর রাজ্যে একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু জ্ঞানতপস্বী অরবিন্দের সে কাজ বেশিদিন ভাল লাগল না। সেই নীরস কাজ ছেড়ে বরোদা কলেজে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করলেন। ১৮৯৩ থেকে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তের বছর তিনি বরোদায় ছিলেন। এই সময় তিনি প্রসিদ্ধ মারাঠী নেতা বালগঙ্গাধর তিলকের সংস্পর্শে এলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবার পথ তৈরি হতে লাগল। আবার যোগানুশীলনের দিকেও তাঁর আগ্রহ ছিল অসীম। মারাঠী যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলে এলেন বরোদায়। অরবিন্দের সঙ্গে লেলের সাক্ষাৎ—বরোদা রাজমন্দিরভবনের প্রাসাদশীর্ষে অরবিন্দের যোগমন্ত্রে দীক্ষা ও ধ্যানসিদ্ধি নির্বিকল্প সমাধির পর অব্যর্থ যোগসিদ্ধ সংগপ্রেরণা—এসব ঐতিহাসিক ঘটনা। শ্রীলেলের মাধ্যমে অরবিন্দের তপঃশুদ্ধ শরীরে ও ধ্যানসিদ্ধ মানস-আধারে সঞ্চারিত হল গীতার আত্মসমর্পণ-মহাযোগবীর্য।

এই সময় কলকাতায় স্থাপিত হল জাতীয় কলেজ। ছাত্রদের জাতীয় শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। অরবিন্দ বরোদার দেড়হাজার টাকার চাকরি ছেড়ে কলকাতার জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কাজ নিলেন। ক্রমে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন অরবিন্দ। ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল। একটি বোমার মামলায় অরবিন্দ গ্রেফতার হলেন।

যে অরবিন্দ ইচ্ছা করলেই আই. সি. এস. হয়ে কত মানুষের বিচার করতে পারতেন, তিনিই আসামী হয়ে আদালতে অভিযুক্ত হলেন। আর বিচারকের আসনে বসলেন বীচক্রফট্—যিনি বিলাতে ছিলেন অরবিন্দের সহপাঠী। ভাগ্যের কী পরিহাস!

দেশে এক বিপুল সাড়া পড়ে গেল। অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করতে স্বেচ্ছায় ছুটে এলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। মামলা চলার সময় চিত্তরঞ্জন বিচারকের সামনে বললেন—'আজ যিনি কাঠগড়ায় আসামীরূপে দাঁড়িয়েছেন, একদিন মানুষ তাঁকে স্বদেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তার ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মহাপুরুষ বলে পূজা করবে।'

অরবিন্দ এক বছর জেলে কাটাবার পর নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তি পেলেন। কিন্তু এই এক বছরের নির্জন কারাবাস তাঁর জীবনে এক আশীর্বাদ স্বরূপ

হল। এখানেই তিনি জীবনে সর্বপ্রথম ঈশ্বরানুভূতি লাভ করেছিলেন। কারাগারে বাসুদেব-দর্শনলাভের পর কারার বাহিরে এসে তিনি ঘোষণা করলেন : "ভারতের জাগরণ ও মুক্তি বিশ্বমানবেরই জন্য।"

কিন্তু ইংরেজের রোষদৃষ্টি থেকে অরবিন্দ রেহাই পেলেন না। বিপ্লবী আন্দোলনের গুপ্ত পরিচালক সন্দেহ করে পুলিস তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। ১৯১০ সালের মার্চ মাসে অরবিন্দ ফরাসী-শাসিত চন্দননগরে চলে গেলেন। মতিলাল ঘোষের গৃহে গোপন অজ্ঞাতবাস-কক্ষেই অরবিন্দের ঘটল কালী-সিদ্ধি। কিন্তু সেখানেও থাকা নিরাপদ নয় মনে করে এপ্রিল মাসে অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

পণ্ডিচেরীতে এসে অরবিন্দের জীবনধারা আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা অরবিন্দ সহিংস পন্থা ছেড়ে দিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন। যোগানুশীলনে তো আগেই অভ্যস্ত ছিলেন; এবার তাকে সাধনায় রূপান্তরিত করলেন। সে সময় তিনি মাত্র আট-দশ জন অনুচর নিয়ে সাধনা করতেন। আশ্রম বলতে মাত্র একখানি দোতলা বাড়ি। চারদিকে গাছপালার এক বিশাল নিস্তব্ধতা। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের অমোঘ আকর্ষণে পণ্ডিচেরীতে এলেন বিদুষী ফরাসী মহিলা মীরা রিচার্ড। ১৯১৪ সালেও একবার এসেছিলেন স্বামীসহ। এবার কিন্তু সংসারজীবন সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পাকাপাকি ভাবে আশ্রমবাসিনী হলেন। পরে ইনিই 'শ্রীমা' নামে ভক্তদের কাছে পরিচিতা হলেন, আশ্রমের সমস্ত ভার তুলে নিলেন নিজের কাঁধে।

১৯২৬ সালের ২৪শে নভেম্বর পূর্ণসিদ্ধি লাভ করেন শ্রীঅরবিন্দ। বিপ্লবী দেশপ্রেমিক হলেন মহাযোগী। এক দিব্যজ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল। সেদিন থেকে বাহ্য জগতের সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করে একটি ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেন তিনি। বৎসরের বিশেষ কয়টি দিনে শুধু তিনি দর্শন দিতেন সহস্র সহস্র দেশী ও বিদেশী ভক্ত নরনারীদের। আশ্রমটি ক্রমে বিশাল আকার ধারণ করল। এটি শুধু ঋষি অরবিন্দের যোগপীঠই নয়—ধীরে ধীরে পরিণত হল ভারতের বিখ্যাত পুণ্যতীর্থে। ধর্মপিপাসু, তত্ত্বান্বেষী বহু দেশী ও বিদেশী নরনারী বিভিন্ন দেশ থেকে এসে এই আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের কন্যা এঁদের মধ্যে অন্যতম।

শ্রীঅরবিন্দ হচ্ছেন অনন্ত প্রেম ও প্রজ্ঞার মূর্ত ও জীবন্ত বিগ্রহ। শ্রীমার মতে, তিনি একাধারে উপনিষদের পরব্রহ্ম, মূর্তিমান রসস্বরূপ, বৃন্দাবনের প্রেমঘন শ্যামসুন্দর, গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ সর্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণ। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার পরম সিদ্ধির এক সারভূত সত্তা যেন শ্রীঅরবিন্দ। শুধু জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ নয়—পূর্ণাঙ্গ যোগ বলতে বোঝায় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম যোগের সমন্বয়। মনে অনন্ত জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, অন্তরে অপরিসীম ভক্তি আর হাতে অফুরন্ত কাজ। কর্মফলের প্রতি সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করে শুধু নিরাসক্ত চিত্তে জীবকল্যাণের জন্যে কাজ করে যাওয়া।

অচিরেই শ্রীমার পরিচালন-নৈপুণ্যে খাদ্য, কৃষি, শিল্প, গো-পালন প্রভৃতি বিভাগ খোলা হল, আশ্রমটি এক বিরাট স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে উঠল। পণ্ডিচেরীর ক্ষুদ্র আশ্রমটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল এক আদর্শ মহানগরী।

ঋষি অরবিন্দের 'সাঙ্গীকৃত আদর্শবাদ' যে দার্শনিক চিন্তাসূত্রের উপর গড়ে উঠেছে তা হল (১) সবকিছুই ব্রহ্ম থেকে জাত, ব্রহ্মেই আবার লয়প্রাপ্ত হচ্ছে—এই চক্রটি চিরন্তন; (২) জীবন ও মৃত্যু একই চক্রের দুটি স্তর—আসলে এটা আত্মারই পুনরুজ্জীবন; (৩) বিশ্ব-জগতের যা শাশ্বত নীতি সেই কর্মই মানবাত্মার ও নিখিল প্রকৃতির পরিণাম নির্ধারণ করে দেয়; (৪) মানুষের লক্ষ হল 'দিব্য জীবন' যা ব্রহ্মে মিশে যায়; আত্মজ্ঞানের মাধ্যমেই দিব্য জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

১৯৫০ সালের ৫ই নভেম্বর ঋষি অরবিন্দ মরদেহ পরিত্যাগ করেন। তাঁর পার্থিব দেহ দু-তিন দিন পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় ছিল। সেই দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল এক অপূর্ব জ্যোতি। তারপর শ্রীমার ইচ্ছানুসারে মরদেহের সৎকার করা হল।

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী



মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী, সন ১২৮০ (সাল ১৮৭৩), পুরী জগন্নাথধামে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৃহে ভাগবতী দেবীর কোল আলো করে জন্ম নিল এক শিশু। তার নাম রাখা হল বিমলাপ্রসাদ। শিশুর বয়স যখন দশ মাস তখন তার মা তাকে সঙ্গে করে বঙ্গদেশে শ্রীরামপুরে চলে আসেন: পাঁচ বছর বয়সে সেখানেই তার শিক্ষা আরম্ভ হয়। বিদ্যালয়ের গতানুগতিক পাঠ্যক্রম বিমলাপ্রসাদের মনঃপূত হয় না; সাধারণ জ্ঞান-বৃদ্ধি হওয়ার পরই তিনি ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। অল্প বয়সেই বালক ধর্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি বিদ্যায় বিশেষ জ্ঞানলাভ করে। বড় বড় পন্ডিতেরা বিমলাপ্রসাদের জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে যান। মহাভাগবত গুরুবর্গ এরপর তাকে শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী উপাধি দেন।

বিমলাপ্রসাদের বয়স যখন সতের তখন তিনি সতীর্থ কয়েকজনের সঙ্গে মিলে একটি সমিতি গঠন করেন। তাতে সমস্ত সভ্যরা প্রতিজ্ঞা করেন সারাজীবন তাঁরা চিরকুমার থাকবেন। কিন্তু পরবর্তী কালে সমস্ত সভ্যই একে একে বিবাহ করে সংসারী হয়ে যান। শুধু বিমলাপ্রসাদই তাঁর প্রতিজ্ঞায় অটল থাকেন।

আঠারো বছর বয়স পেরোবার পর বিমলাপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজে বেদ অধ্যয়নে রত হন। কিন্তু তখন পন্ডিত পৃথ্বীশ্বর শর্মার সঙ্গে তাঁর মতভেদ ঘটে। পুঁথিপড়া বিদ্যাকে তিনি জড়বিদ্যা জ্ঞান করে তা পরিত্যাগ করেন। নিজে তখন স্থাপন করেন 'সারস্বত চতুষ্পাঠী'। শিক্ষার্থীদের তিনি গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি যত্নসহকারে শেখাতে থাকেন। তাঁর শিক্ষাগুণে বহু ছাত্র জীবনে কীর্তিমান হয়ে ওঠেন।

কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর বিমলাপ্রসাদ জ্যোতিষের বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'জ্যোতির্বিদ', 'বৃহস্পতি' প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তারপর তাঁর কার্যস্থল হয় ত্রিপুরায়। সেই সময়ে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'রাজরত্নাকর' রচনা। এর পর তিনি বাবার সঙ্গে নানা তীর্থস্থান দর্শন করার জন্যে বেরিয়ে পড়েন।

চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করতে গিয়ে বিমলাপ্রসাদ অশেষ দুঃখ বরণ করেন। এই ব্রতপালন খুব দুষ্কর। নিজে হবিষ্যান্ন রান্না করে খেতে হয় সুদীর্ঘ চারটি মাস। কোন পাত্রে ভোজন করা চলে না; মাটির উপর রেখে খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। বালিশ ব্যবহার করা চলে না, শুতে হয় মাটিতে।

অবধূত-কুলচূড়ামণি ছিলেন **শ্রীগৌরকিশোর দাসবাবাজী**। ত্রিশ বছর ব্রজমন্ডলে বাস করেন। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হন। যোগপীঠ মায়াপুর প্রকাশ হওয়ার পর শ্রীগৌরকিশোর গৌরমন্ডলে আসেন এবং নবদ্বীপে বাস করে মহানন্দে সাধন-ভজন করতে থাকেন। ভিক্ষা করে যা পান তা-ই গঙ্গাজলে ধুয়ে এবং নিজের হাতে রান্না করে কোনমতে উদরপূরণ করতেন।

১৩২২ বঙ্গাব্দের ৩০শে কার্তিক শ্রীগৌরকিশোর লীলা সংবরণ করেন। তখন কোথায় তাঁর সমাধিসেবার স্থান স্থাপিত হবে তা নিয়ে ভক্তদের ও বৈষ্ণবদের মধ্যে

বিবাদ উপস্থিত হয়। তাঁর প্রধান শিষ্য শ্রীল সরস্বতী কুলিয়ায় উপস্থিত হয়ে দেখেন—ভেকধারী সন্ন্যাসীরা



গৌরকিশোর দাস বাবাজী

যাতে ভবিষ্যতে টাকার সংস্থান হয় সেই অনুসারে কোন স্থানে গৌরকিশোরের সমাধিস্থান করবার জন্য উদ্‌যোগী হয়েছে। শ্রীল সরস্বতী তাতে বাধা দিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর ভেকধারী সন্ন্যাসীরা বললেন-শ্রীসরস্বতী সন্ন্যাসী নন, সন্ন্যাসী ছাড়া সন্ন্যাসীর সমাধিসেবার কোন অধিকার নেই। তখন শ্রীল সরস্বতী জবাব দিলেন—'আমি অবশ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিনি কিন্তু আমি শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর শিষ্য, আকুমার ব্রহ্মচারী, আমি মর্কট বৈরাগী নই। বাবাজীর পাদুকা আমি বহন করেছি, গোপনেও কখনও কদাচার-পরায়ণ হইনি। আমি জোর করে বলতে পারি এখানে প্রকৃত সদাচারী কেউ উপস্থিত নেই।' একথা শুনে কেউ আর কোন প্রতিবাদ করতে পারল না। কুলিয়ার চরে গৌর-কিশোরের সমাধি দেওয়া হল।

কিন্তু গৌরকিশোরের ইচ্ছা ছিল তাঁর দেহ যেন শ্রীধামের পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বিধাতার বিচিত্র লীলায় মহাসাধকের সে ইচ্ছা পূরণ হল। একদিন সেই সমাধি ভেসে এল গঙ্গানদীতে। তাঁর পরম ভক্ত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী তাকে গঙ্গার পূর্বতটে মায়াপুরে অবস্থিত শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে নিয়ে এলেন। সেখানেই আবার সেই মহাসাধকের দেহ সমাহিত করা হল।

১৩২৪ বঙ্গাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মদিনে বৈদিক বিচারে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য মঠের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। মায়াপুরের আচার্য ভবন মহাপ্রভুর মেসোমহাশয় শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যের বাটী; এখানে মহাপ্রভু 'কৃষ্ণলীলা' নাটকাভিনয় করেছিলেন। তাই তার নাম হয়েছে ব্রজপত্তন। পরে সেখানেই শ্রীচৈতন্য মঠ স্থাপিত হয়।

এর পর শ্রীসরস্বতীর প্রধান কর্তব্য হয় নাম-প্রচার। ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর বেশে তিনি দেশে দেশে নাম প্রচার করতে থাকেন। ভাগবতের বিচার অবলম্বনে তিনি প্রথম ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের প্রবর্তন করেন।

একবার চৈতন্য মঠে মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে এক উৎসবের আয়োজন করা হল। তার উদ্যোক্তা হলেন শ্রীসরস্বতী। সেদিন প্রভাতে এক বিরাট সংকীর্তনের দল বাহির হল। কেউ নাচে, কেউ গায়, কেউ পথের ধূলায় গড়াগড়ি যায়। মহানন্দে কীর্তন করতে করতে সেই জনসমুদ্র যোগপীঠ, শ্রীমন্দির, অদ্বৈতভবন, শ্রীবাস অঙ্গন—যেটি খোল-ভাঙার ডাঙ্গা বলে প্রসিদ্ধ-ব্রজপত্তন, মাধাইয়ের ঘাট, বারকোনা ঘাট প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা করতে লাগল। এই বিশাল শোভাযাত্রায় ভক্তসংখ্যা যে কত ছিল, তার হিসেব কে করবে! সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। শতচ্ছিদ্র লোহপাত্রে জলপান করে মহাপ্রভু যেখানে ভক্তের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন সেই শ্রীধর-অঙ্গন এবং কাজীর সমাধি—সব স্থান পরিভ্রমণ করে সেই বিরাট কীর্তনের দল ফিরে এল শ্রীচৈতন্য মঠে। এই ভাবেই হয়েছিল লুপ্তপ্রায় বৈষ্ণব-ধর্মের পুনরুদ্ধার।

ভারতে এবং ভারতের বাইরে ৬১টি মঠ প্রতিষ্ঠা করে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী এক অতুল কীর্তি স্থাপন করে গিয়েছেন।

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের কৃষ্ণা চতুর্থীর শেষ নিশিযামে শ্রীসরস্বতী লীলাসংবরণ করেন।

নামাচার্য রামদাস



'বৃন্দাবন থেকে একটি হরিনামের চারা আনাচ্ছি। ভাল বীজের চারা। এর আগে তাকে বৃন্দাবনে রেখে এসেছি। সেখানকার জল-হাওয়ায় বেশ হয়েছে, অল্-প্রুফ হয়ে গিয়েছে, শিগ্‌গীরই আসছে।' এ কথা ভক্তজনদের বলেছিলেন বিখ্যাত সাধক, প্রভু জগদ্বন্ধু। বলেছিলেন রামদাস সম্পর্কে। কলিযুগের শ্রেষ্ঠধর্ম নামসংকীর্তন—এই সত্য সামনে রেখে রামদাস বাবাজী ব্রতী হয়েছিলেন নামব্রতে। অক্লান্ত-ভাবে নামের মহিমা প্রচার করে, অহিংসা ও প্রেমভক্তির আদর্শ স্থাপন করে অগণিত লোকের পারমার্থিক জীবন-গঠনে সহায়তা করেছিলেন।

ফরিদপুর জেলার কুমারপুর গ্রামে ১৮৭৬ সালে আবির্ভূত হন রামদাস। পিতার নাম দুর্গাচরণ গুপ্ত। রামদাসের বাল্যকালের নাম রাধিকারঞ্জন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সময় পাটুরিয়া গ্রামে কিছুদিন ছিলেন এবং সেখানে টোল খুলে বিদ্যাদান করেছিলেন। সেই স্মৃতিতেই মাঘী পূর্ণিমার দিন থেকে প্রায় একমাস সেখানে মেলা বসে। রাধিকারঞ্জন তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে সেই মেলায় এলেন। সেখানে দেখলেন বৈষ্ণব ও বাউলদের ভিড়। তা দেখে তাঁর মনে ভাবান্তর হল। এক জায়গায় দেখলেন কাপড়ের ছাউনির ভিতরে ছোট একটি গৌরাঙ্গের মূর্তির সামনে আরতি হচ্ছে। আর কোন বিগ্রহ সেখানে নেই। একজন সাধু বললেন—এটি গৌরবাদী সম্প্রদায়ের আখড়া। এ'দের মূল মন্দিরেও নিত্যানন্দের বা অন্য কারও বিগ্রহ নেই। এ সম্প্রদায়টি বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের। সাধুর কথায় রাধিকারঞ্জন বিস্মিত হলেন। কারণ সকলেই বলছেন, আমরা বিশুদ্ধ বৈষ্ণব; অথচ কারও সঙ্গে কারও মিল নেই।

রাত্রে রাধিকার মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিল। হে ঠাকুর! বিশুদ্ধ পথ কী, কিছুই জানি না। মনে নানা প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও রাধিকারঞ্জনের অন্তরে ক্রমে সাধুসঙ্গের আকর্ষণ বাড়তে লাগল। পরদিন দেখলেন কয়েকজন সাধু মহানন্দে নামকীর্তনের রোল তুলেছেন। এ'রা আবার অন্য সম্প্রদায়। গৃহত্যাগীদের মধ্যেও যে উপাসনাগত তারতম্য এত আশ্চর্য রকমের আছে তা তিনি কল্পনা করতে পারেননি।

নিজের ছাউনিতে এসে দেখলেন, একজন বৈষ্ণব ও একজন বৈষ্ণবী, গান করতে করতে ভিক্ষা করছেন। রাধিকারঞ্জন জিজ্ঞাসা করে জানলেন তাঁরা আউল সম্প্রদায়ের। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তরজা কীর্তনের আদি রচয়িতা। যোগ আর তন্ত্র-মার্গেই তাঁদের সাধন।

বিদায়ের আগে সব সম্প্রদায়ের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে রাধিকারঞ্জন মনে মনে জানালেন—আপনারা আশীর্বাদ করুন যেন অচিরেই আমার গৃহ-কারাগারের বন্ধন ছিন্ন হয়। আর ভগবানের উদ্দেশে মিনতি জানালেন—মনের সংশয়জাল যেন ছিন্ন হয়।

রাধিকারঞ্জন সাধুদের এবং ভগবানের কৃপালাভ করেছিলেন। পাবনার প্রবীণ বৈষ্ণব দীনবন্ধু দাস

বাবাজী রাধিকারঞ্জনের নব নামকরণ করেন, রামদাস।

সতের বছর বয়সে রামদাস রওনা হন বৃন্দাবনধামের দিকে। তাঁর ভক্তজীবনের সখা ও পথনির্দেশক, বিখ্যাত সাধক প্রভু জগদ্বন্ধু তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'প্রিয় রামদাস! তুমি একাকী বৃন্দাবনে যাবে। বৈরাগী একাকীই যায়, একাকীই আসা-যাওয়া করে। কাহারও অপেক্ষা করে না, কাহাকেও অনুরোধ করে না, তার কাহারও সহিত বিরোধ হয় না। সে সর্বদা সহজ সত্যবস্তু উপলব্ধি করে। প্রভুর অনন্ত বিভূতি—তাহার মধ্যে ছয়টি প্রধান। বৈরাগ্য তাহাদের মুকুটমণি। তুমি সেই বৈরাগ্যের আশ্রয় পাইয়াছ। সর্বদা নির্ভয়, নিরপেক্ষ হইয়া থাকিবে। মাধুকরী করিয়া জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করিবে। কোথাও স্থূল ভিক্ষা করিও না।'

বহু তীর্থ পরিক্রমা করে শ্রীরামদাস বাবাজী মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন এবং নবদ্বীপে এসে জীবনের অভীষ্ট লাভ করেন। বৈষ্ণব মহাজনরা বলেছেন—

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিতে ফিরেন আপনি শ্রীহরি॥

সিদ্ধ বৈষ্ণব চরণদাস বাবাজীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকে রামদাসের জীবনে শুরু হয় এক নবতম অধ্যায়। কলিযুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম নামকীর্তন মানুষের মধ্যে প্রচার করে শ্রীরামদাস বাবাজী পাপীতাপী মানুষের মনে প্রবাহিত করেন শান্তির স্রোত।

বরিশালের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত বাটাজোর-নিবাসী হুসেন আলিকে পাঠিয়েছেন রামদাস বাবাজীর কাছে। হুসেনের অপরাধ—সে হিন্দুদের হরিনাম করে। স্বজাতীয় মুসলমানেরা তাই তাকে প্রহার করে, দাঁত ভেঙে দিয়েছে, একটি চোখ পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছে। এখন তার জীবন-সংশয়। কোন হিন্দু বা মুসলমান তাকে রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে আসেনি। পুলিস দূরে দাঁড়িয়ে হাসে। বাবাজী সেদিন শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙ্গার বার্ষিক উৎসবে ভক্তদের নিয়ে নামগান করছেন। এমন সময় হুসেন আলি—বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, পরনে ছেঁড়া চট—দরবেশের বেশে এগিয়ে এসে বাবাজীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। সে এক হৃদয়বিদারক করুণ দৃশ্য। রামদাস বাবাজীর দেহে করুণার প্লাবন, নয়নে স্নেহের অশ্রুবিন্দু। সেদিন থেকে মুসলমান হুসেন আলি বাবাজীর ভক্তমণ্ডলীতে স্থান পেল।

শুধু কি হুসেন আলি? মানকুণ্ডুর কুখ্যাত খুনী গুণ্ডা, পাঁড় মাতাল উপেন দত্তকে রামদাস বাবাজী মানুষে পরিণত করেন, কলকাতার পটুয়াটোলার দাম্ভিক রায়বাহাদুরের মনের পরিবর্তন ঘটান, রূপসী পতিতা রমণী উর্মিলা দাসীকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন, সমাজচ্যুতা বৃদ্ধা সত্যদাসীকে নামদীক্ষা দিয়েছিলেন।

আরামবাগ শহরের ভক্তেরা অষ্টপ্রহর সংকীর্তনের আয়োজন করে রামদাস বাবাজী ও তাঁর শিষ্যদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। শ্রাবণের ঘোর বর্ষা। কীর্তনিয়া দল অন্ধকারে পথ দেখতে না পেয়ে একটি চালাঘরের বারান্দায় উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের মালিক ষাট বছর বয়স্কা এক বৃদ্ধা তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করল। এদিকে আরামবাগের ভক্তেরা লণ্ঠন নিয়ে বাবাজীকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে হাজির। বাবাজী তখন কীর্তনানন্দে আত্মহারা। ভক্তেরা সামিয়ানা ইত্যাদি সংগ্রহ করে বৃদ্ধার অঙ্গনেই অষ্টপ্রহর কীর্তনের ব্যবস্থা করে ফেলল। যৌবনে এই বৃদ্ধা ছিল পথভ্রষ্টা, অসংযমী। আজ বাবাজীর পদার্পণে তার গৃহ ধন্য হল। বৃদ্ধাকে বাবাজী দীক্ষা দিলেন তাঁর নাম হল সত্যদাসী। কয়েক মাস পরে তাকে বৃন্দাবনধামে দেখেছিলেন বাবাজী; সে তখন প্রত্যহ এক লক্ষ নামজপ করে, প্রতিটি ব্রতে নিরম্বু উপবাস করে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস বলতেন "সকালে ও সন্ধ্যায় হাততালি দিয়ে হরিনাম করো। তা হলে সব পাপতাপ দূর হয়ে যাবে। গাছের তলায় হাততালি দিলে যেমন গাছের সব পাখি উড়ে যায়, সেইরূপ হাততালি দিয়ে হরিনাম করলেও সমস্ত অবিদ্যারূপ পাখি উড়ে পালায়।" শ্রীরামদাস বাবাজী ছিলেন সেই মতের সমর্থক। একমাত্র নামই ছিল তাঁর আশ্রয়। নামই তাঁর আরাধ্য এবং কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করতেন যে নাম থেকে সর্বসিদ্ধি হয়।

নানা দেবস্থানের উদ্ধার ও সংস্কার সাধন করে তিনি ধর্মজগতের মহা কল্যাণ সাধন করেছেন। বরাহনগর পাঠবাড়ির সংস্কারসাধন ও উন্নতিসাধনের জন্যে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এই পাঠবাড়িতেই ১৯৫৩ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

শ্রীমা ঃ মীরা রিচার্ড



চার বছর মাত্র বয়স—মেয়েটি মাঝে মাঝে ধ্যানমগ্ন হয়ে ঢুলে পড়ে যায়। চেয়ারে বসে গভীর আবেশে বাহ্য চেতনা হারিয়ে ফেলে। দশ বছর বয়সের সময় প্রায়ই সে স্বপ্ন দেখে—একটা আলোর ঘাঘরা পরে নাচতে নাচতে সে ক্রমশই ওপরে উঠছে; যতই সে ওপরে উঠছে ততই সাদা মখমলের মতো নরম, আলোকোজ্জ্বল সুন্দর ঘাঘরাটা বড় হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বড়—আরও বড়। দেখতে দেখতে সমস্ত পৃথিবীটাকে যেন ছেয়ে ফেলছে ঘাঘরাটা—আর অজস্র মানুষের দল এসে ভিড় করে দাঁড়াচ্ছে তার তলায়।

এ স্বপ্নের তাৎপর্য কী, তা বোঝে না ছোট্ট মেয়েটি যার নাম মীরা। ১৮৭৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ফ্রান্সের পারী শহরে ধনী পরিবারে জন্মেছিল মীরা। বয়স যখন তার বারো, পারী শহরের উপকণ্ঠে এক নির্জন বনে গিয়ে সে একা বসে থাকত। সেই বিশাল অরণ্যের নিস্তব্ধতার মধ্যে সে লাভ করত এক নিবিড় প্রশান্তি, আত্মীয়তা বোধ করত গাছপালা পশুপাখির সঙ্গে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যুবতী মীরা খবর পেয়েছেন আলজিরিয়ার অন্তর্গত ক্লেমসেন শহরে যোগবিদ্যায় গুণী একজন আছেন—নাম তাঁর তেঁও। তাঁর কাছে যোগবিদ্যা শেখবার ইচ্ছা হল মীরার। শুনে মা রাগে ফেটে পড়লেন। বাবা অবশ্য অনুমতি দিলেন। সাহারা মরুভূমির উত্তরে ক্লেমসেন শহরে এক ফাঁকা মাঠে তেঁও থাকতেন এক কুঁড়েঘরে। জাতিতে ইহুদী, গুণিন তেঁও বহু গুপ্তবিদ্যা জানতেন। মীরার একাগ্র সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে তেঁও তাঁর সমস্ত অধীত বিদ্যা উজাড় করে দিলেন মীরার কাছে। জড় ও জীবজগতের ওপর নিজের আত্মাকে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে এক মহাজাগতিক চেতনার অধিকারিণী হয়ে ওঠেন মীরা। তেঁওর কাছ থেকে যোগবিদ্যা আয়ত্ত করে স্বদেশে ফেরার সময় সমুদ্রপথে তাঁদের জাহাজ একদিন প্রচণ্ড ঝড়ের সম্মুখীন হয়। তেঁও নিজেও সেই জাহাজে ছিলেন। তাঁর নির্দেশে মীরা ঝড় প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে নিজের দেহটাকে ত্যাগ করে বিশুদ্ধ আত্মারূপে সারা সমুদ্রের ওপর ছোটাছুটি করে দুষ্ট অসদাত্মাদের বুঝিয়ে শান্ত করলেন। মায়াবলে শান্ত হল সমুদ্রের উত্তাল ঝড়।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর গভীরতর সাধনায় মনোনিবেশ করলেন মীরা। এই সময় তিনি আকৃষ্ট হলেন ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনশাস্ত্রে। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি ভারতবর্ষকে দেখবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় একদিন স্বামীকে নিয়ে সাগরপাড়ি দিলেন মীরা রিচার্ড। ১৯১৪ সালের ঘটনা। পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের যোগপীঠে এসে উঠলেন তাঁরা। মীরা বুঝলেন, শ্রীঅরবিন্দই তাঁর অভীষ্ট গুরু—এই জ্যোতির্ময় পুরুষের আশ্রয়লাভের জন্যেই যেন তিনি এতকাল প্রতীক্ষা করছিলেন। বুঝলেন, "ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য সত্যসত্যই এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।"

শ্রীঅরবিন্দকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অন্তরাত্মা উদ্বেল হয়ে উঠল মীরা রিচার্ডের। তাঁর মনে হল, ঈশ্বরের কোন নির্দিষ্ট ব্রত পালনের জন্যে তিনি পৃথিবীতে এসেছেন এবং এই মহৎ ব্রতে শ্রীঅরবিন্দের সহযোগিতা ভিন্ন তাঁর সিদ্ধিলাভের কোন সম্ভাবনা

নেই। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের মতোই মনে হল শ্রীঅরবিন্দকে। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন এক আদর্শ পুরুষ যিনি আগে থেকেই ভগবান ছিলেন না—যিনি মানুষ থেকে দুর্লভ দিব্যচেতনা ও ভগবৎসত্তার অধিকারী হয়েছিলেন স্বীয় শৌর্য, চারিত্র্য, জ্ঞান ও কর্মের পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়ে।

ধীরে ধীরে অরবিন্দ-আশ্রমের কাজকর্মের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন মীরা ও তাঁর স্বামী। কিন্তু ঐ বছরই তাঁদের ফিরে যেতে হল ফ্রান্সে।

দেশে ফিরে মনে শান্তি নেই মীরার। পৃথিবীটাকে বড় শূন্য মনে হয়। অসহ্য শূন্যতা। তারপর ঈশ্বর মুখ তুলে তাকালেন। ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে আবার পণ্ডিচেরীর আশ্রমে ফিরে এলেন মীরা রিচার্ড। আশ্রমের সমস্ত ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। সকলের কাছে পরিচিতা হলেন—'দি মাদার' বা শ্রীমা নামে।

১৯২৬ সালের ২৪শে নভেম্বর পূর্ণসিদ্ধি লাভ করেন শ্রীঅরবিন্দ। এখন থেকে শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগাযোগ। নিজেকে ঘরের সংগোপনে গুটিয়ে নিলেন। বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে শুধু দর্শন দেন দেশ-বিদেশের অগণিত ভক্তসাধারণকে। শ্রীমায়ের উপর দায়িত্ব অর্পিত হল বিরাট আশ্রম পরিচালনার। আশ্রমের এতগুলি শিষ্য এবং বহিরাগত ভক্তদের জন্যে দৈনিক খরচের পরিমাণ বিপুল। ইতোমধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে অগাধ সম্পত্তি ও অর্থের অধিকারিণী হলেন শ্রীমা। তাই দিয়ে আশ্রমের ব্যয়নির্বাহ হতে লাগল।

ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠল শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রম। শ্রীমার অসাধারণ কর্মনৈপুণ্যে গড়ে উঠল কৃষিবিভাগ, শিল্পশালা, জিমন্যাসিয়াম, হাসপাতাল, বিদ্যালয়। 'অরোভিল' নামে এক বিরাট শহর নির্মাণের পরিকল্পনা নিলেন শ্রীমা, যেখানে ছয় হাজার লোক বাস করবে, জমি পাবে, ঈশ্বরচিন্তা করবে। এ ছাড়া গড়ে উঠেছে শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্ন—আন্তর্জাতিক শিল্পকেন্দ্র নামে এক বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫২ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করে শ্রীঅরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন সূত্রে শ্রীমা বলেন, 'শ্রীঅরবিন্দ আমাদের মধ্যেই বিরাজিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা তাঁর বহু বৎসরের চিন্তার ফসল। তিনি বলেছিলেন—অতিমানসের আলোক গ্রহণ করবার জন্যে ভবিষ্যৎ মানুষের প্রস্তুতির পক্ষে এটা হল এক সর্বোত্তম পন্থা। তিনি আরও বলেছিলেন—আজকের দিনের যারা উন্নত মানুষ তারা এর সাহায্যে এক উন্নততর জাতিতে পরিণত হয়ে উঠবে এবং এক নতুন ধরনের আলো জগতে শান্তি ও নবজীবনের সূচনা করবে।'

শ্রীঅরবিন্দ-পরিকল্পিত ও শ্রীমা-রূপায়িত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বের সকল দেশের সব জাতির ও ধর্মের নারী-পুরুষ কর্তৃপক্ষের দ্বারা মনোনীত হলেই বসবাস করতে পারে। এখানে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মূল লক্ষ হবে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা লাভ। পাশ্চাত্ত্য বা প্রাচ্যের যা কিছু ভাল, তা-ই এখানে গ্রহণ করা হয়। এখানে পড়াশোনার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা উদ্বুদ্ধ হয় এক পবিত্র আধ্যাত্মিক ভাবে—যার প্রভাবে এক উদার চেতনা জাগে মনে। এইভাবে তাদের জীবনে ঘটে 'দিব্য জীবনের' সূচনা। ধর্মচেতনা ও কলাবিদ্যার এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ক্রমে। ধর্মের গোঁড়ামি নেই, জাতপাতের সংকীর্ণতা নেই, কপটতা-প্রতারণা নেই—আছে সর্বধর্মসমন্বয়ের এক মহৎ আদর্শের অনুসরণ ও অনুরণন।

শ্রীমার মতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ অগ্রসর হবে পাঁচটি স্তর পরম্পরায়। এক: বিশ্ববীক্ষণ ও ধর্মসাধনা অব্যাহত রাখার জন্যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুষ্টিসাধন। দুই: প্রাণের শিক্ষা। তিন: মনের একাগ্রতা সাধন। চার: অন্তরাত্মার শিক্ষা। পাঁচ: আধ্যাত্মিক শিক্ষা-যার মাধ্যমে সঞ্চারিত হবে শাশ্বত জীবনচেতনা।

শ্রীমা তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন: 'আগুন যেমন দেয় আলো আর তাপ, ঝরনা দেয় জল, গাছ দেয় ছায়া—আমিও যেন তাদের মতো হই। জগতে বড় দুঃখ। কেবল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা আর পৃথিবীর সব মানুষের জন্যে চিন্তা ও করুণায় যেন পূর্ণ থাকে আমার হৃদয়।'

ভারতবর্ষকে ভালবেসে, ভারতের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এই পরমসাধিকা—১৯৭৩ সালের ১৭ই নভেম্বর।

নিগমানন্দ পরমহংস



ছ'সাত বছরের ছেলে। হাতে সন্ধ্যাপ্রদীপ নিয়ে চলেছে চণ্ডীমণ্ডপে। হঠাৎ মণ্ডপে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। মণ্ডপের মেঝেতে দপ্ করে খানিকটা আগুন জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে দেখা গেল দশভুজার এক মূর্তি।

একী অলৌকিক কাণ্ড! ভয়ে হাতের প্রদীপটি মাটিতে ফেলে দিয়ে বালক ছুটে এল মায়ের কাছে। মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে চুপি চুপি সব কিছু বলল। মা মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন—'ভয়ের কী আছে! তোর কী ভাগ্যি মা দুর্গার দেখা পেয়েছিস।'

ছেলেটির নাম নলিনীকান্ত; বাড়ি নদীয়া জেলার কুতুবপুরে। পিতা ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়। জন্ম ১২৮৬ বঙ্গাব্দের (১৮৭৯ সাল) ঝুলন পূর্ণিমায়।

ছোটবেলা থেকেই অনেক অলৌকিক দৃশ্য নলিনীকান্তের চোখে পড়ে। কুতুবপুরে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ার দিন সুদূর দিনাজপুর জেলার নারায়ণপুর গ্রামে থেকেও নলিনীকান্ত স্ত্রীকে সশরীরে দেখেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন রাসমণির জমিদারী সেরেস্তার পরিদর্শক।

এর পরই নলিনীকান্তের জীবনে ভাবান্তর উপস্থিত হল। পরলোক ও অলৌকিক রাজ্যের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের জন্যে ব্যাকুল হলেন। একদিন কলকাতায় স্বামী পূর্ণানন্দ পরমহংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে চাইলেন। কিন্তু পূর্ণানন্দ বললেন, 'আমি তোমার গুরু নই। সময়মত তুমি তাঁর দেখা পাবে।' কিছুদিন পরে তিনি ছিলেন তাঁর কর্মস্থল নারায়ণপুরে। একদিন রাত্রে ঘুমিয়ে আছেন। সহসা এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন—'তুমি মন্ত্রলাভের জন্যে ব্যাকুল হয়েছ, এই নাও মন্ত্র।' মন্ত্রলেখা একটি বেলপাতা তাঁকে দিলেন।

মন্ত্রটি কী তা দেখবার জন্যে নলিনীকান্ত দেশলাই ধরালেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মহাপুরুষের মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল এবং বেলপাতাটিও আর খুঁজে পেলেন না। নলিনীকান্ত কাশীতে গেলেন কয়েকজন সিদ্ধপুরুষের কাছে মন্ত্রপ্রাপ্তির এই রহস্যের সমাধানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কোথাও এই রহস্যের সমাধান মিলল না। তখন তিনি গঙ্গায় ডুবে প্রাণ বিসর্জন দেবেন স্থির করলেন। সেই দিনই রাত্রে নলিনীকান্ত স্বপ্ন দেখলেন, এক মহাপুরুষ তাঁকে বলছেন—'বৎস, তুমি বীরভূম জেলার তারাপীঠে যাও। সেখানে গিয়ে বামাক্ষেপার শরণাপন্ন হও।'

নলিনীকান্ত তারাপীঠে এলেন। জড়িয়ে ধরলেন মহাসাধক বামাক্ষেপার চরণ। বামাক্ষেপা নলিনীকান্তকে তন্ত্রসাধনার নানা ক্রিয়াপদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। তারপর একদিন গভীর রাত্রে তাঁকে বসিয়ে দিলেন তারাপীঠের মহাশ্মশানে। চোখ বুজে নলিনীকান্ত একমনে তারামন্ত্র জপ করে চললেন। রাত্রির শেষ যামে ইষ্টদেবী আবির্ভূতা হলেন নবীন সাধকের সামনে। পরদিন সকালে বামাক্ষেপা বললেন—'ওরে, তুই সন্ন্যাস নে।'

সংসারত্যাগী হয়ে নলিনীকান্ত উদ্‌ভ্রান্তভাবে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কোনদিন সামান্য কিছু জুটত, কোনদিন অনাহারেই দিন কাটাতেন। এমনিভাবে ঘুরে ঘুরে আজমীরে এলেন। সেখানে এক সুন্দরকায় সন্ন্যাসীকে দেখে চমকে উঠলেন। এই মহাপুরুষই তো তাঁকে স্বপ্নযোগে বেলপাতাতে লিখে মন্ত্র দিয়েছিলেন। নলিনীকান্ত তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে সচ্চিদানন্দ পরমহংসের চরণে লুটিয়ে পড়লেন। সচ্চিদানন্দও চিনতে পারলেন নলিনীকান্তকে। তাঁকে আশ্রয় দিলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা হয়ে গেল। নতুন নামকরণ হল নিগমানন্দ সরস্বতী।

সন্ন্যাস গ্রহণের কিছুদিন পর গুরুজীর নির্দেশে নিগমানন্দ তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হলেন। একবার তিনি দ্বারকার মঠে অবস্থান করছেন। সেখানে এলেন এক পূর্ণযৌবনা সুন্দরী ভৈরবী। যুবক নিগমানন্দকে দেখে ভৈরবী প্রস্তাব দিলেন, তন্ত্রমতে তাঁদের শৈববিবাহ হতে পারে। নিগমানন্দও ভাবলেন, তরুণী ভৈরবীকে বিবাহ করে নতুন ভাবে ধর্মাচরণে দোষ কী? শৈববিবাহের শুভ দিনটিও পাকাপাকি স্থির হয়ে গেল। বিবাহের পূর্বদিন রাত্রে নিগমানন্দ স্বপ্নে দেখেন, বধূবেশে সজ্জিতা ভৈরবীর দেহ গলে যাচ্ছে মাখনের মতো; শেষে তার কঙ্কালটি নিগমানন্দকে আলিঙ্গন করার জন্যে এগিয়ে আসছে। নিগমানন্দের জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্বারকা মঠ পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। বুঝলেন, সাধকজীবনের চরম সম্ভাব্য বিপর্যয় থেকে গুরু সচ্চিদানন্দই তাঁকে রক্ষা করেছেন।

নানা তীর্থস্থান ঘুরে নিগমানন্দ গেলেন পার্বত্য অঞ্চল পরিভ্রমণে। সেখানে এক গৌরকান্তি সন্ন্যাসী তাঁকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর বললেন, 'কোন কথা না বলে আমার সঙ্গে এস।' নিগমানন্দের ভয় হল। কোন কাপালিক নয় তো? কিছুক্ষণ পর সন্ন্যাসী একটি ছোট পাহাড়ের সামনে গিয়ে থামলেন। পাহাড়ের ওপরে খানিকটা উঠে গিয়ে বড় একটি পাথর ঠেলে দিলেন। দেখা গেল এক প্রকাণ্ড গহ্বর। সেখানে দুটি কক্ষ, একটিতে দণ্ড-কমণ্ডলু ও আসন, অপরটিতে থরে থরে সাজান তালপাতায় লেখা অসংখ্য পুঁথি। নিগমানন্দ বুঝলেন, এই সন্ন্যাসীই তাঁর ঈশ্বর-নির্দিষ্ট গুরু সুমেরদাস বা ছামরদাস মহারাজ।

এবার ছামরদাসজী নিগমানন্দকে প্রকৃত যোগসাধনায় ব্রতী করলেন। তিনমাস ধরে তাঁকে শিক্ষা দিলেন নানা গুপ্ত সাধনপ্রণালী।

কেবল অন্তর্জীবনের নিবিড় সাধনায় নিগমানন্দ সময় অতিবাহিত করেননি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থত্রয়—যোগীগুরু, জ্ঞানীগুরু এবং তান্ত্রিকগুরু প্রভৃতির মাধ্যমে জনসমাজে তাঁর বিপুল খ্যাতিলাভ হয়। সারস্বত মঠ, ঋষিকুল শিক্ষায়তন প্রভৃতি সংগঠনের মধ্যে দিয়েও তাঁর কর্মধারা প্রসারিত হয়। আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের বহু ভক্ত নিগমানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। কর্মময় বহিরঙ্গ জীবনের অন্তরালে নিগমানন্দের এ সাধনজীবন প্রেমমাধুর্য, কৃপালীলা ও যোগৈশ্বর্যে ভরপুর। সহজ প্রেম ও আন্তরিকতার স্পর্শেই তিনি ভক্ত শিষ্যদের আকৃষ্ট করতেন, তাঁর অলৌকিক যোগ-বিভূতি দ্বারা শিষ্যদের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন করতেন, তাদের কল্যাণ সাধন করতেন। তিনি বলতেন, 'দেখ, আমি অবতার-টবতার নই—সাধারণ মানুষ। জন্মজন্মান্তরের সাধনার পর এ-জন্মে আমি শ্রীভগবানকে জেনেছি, সত্য লাভ করেছি, ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। আমি সাধনা দ্বারা নিজে মুক্ত হয়েছি—তোমাদেরও মুক্তির পথ দেখাব—এই আমার কাজ।'

উজ্জয়িনীতে সে বছর কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করাচার্য বেদান্তবাদী সাধুদের নেতারূপে জমায়েত আলো করে বসে আছেন। সচ্চিদানন্দ পরমহংসও উপস্থিত আছেন। গুরুজীকে দেখামাত্র নিগমানন্দ ছুটে গিয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। উপস্থিত সাধুবর্গ এতে রুষ্ট হলেন—কেননা, জমায়েতের সাধুমণ্ডলীর মধ্যে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যকেই সর্বপ্রথম সম্মান দেখানো নিয়ম। নিগমানন্দ উত্তর দিলেন, 'তা কী করে সম্ভব? আমার গুরুর গুরু নেই। যদি গুরুর গুরু স্বীকার করা হয় তাহলে গুরুতে অনবস্থা দোষ আসে।' শঙ্করাচার্য স্মিতহাস্যে এ যুক্তি সমর্থন করেন। পরে তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিগমানন্দকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন এবং তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট হন। তাঁরই পরামর্শে সচ্চিদানন্দ মহারাজ সেইদিন নিগমানন্দ স্বামীকে 'পরমহংস' আখ্যা প্রদান করেন।

এই সাধকের তিরোধান ঘটে ১৩৪২ বঙ্গাব্দে।

মহর্ষি রামন



দক্ষিণ ভারতের মাদুরাই থেকে কিছু দক্ষিণে তিরুচুলি গ্রাম। এখানেই ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর ভেঙ্কটরামনের জন্ম। পিতা সুন্দরম আয়ার, জননী আলাগাম্মল। বাবা পেশায় উকিল হলেও অত্যন্ত দানশীল ও ধার্মিক ছিলেন। রামনের প্রাথমিক লেখাপড়া গ্রামের স্কুলে, পরে ডিণ্ডিগুলের স্কুলে। বারো বছর বয়সের সময় বাবা মারা গেলেন। ফলে মাকে নিয়ে রামনকে আশ্রয় নিতে হল মাদুরাই শহরে কাকার বাড়িতে। এখানে প্রথমে স্কটস্ মিডল স্কুলে এবং পরে আমেরিকান মিশন হাই স্কুলে পড়াশোনা। বিদ্যাচর্চা বেশিদূর এগোয়নি। কিন্তু যেমন তার সুন্দর স্বাস্থ্য, তেমনি অসীম সাহস। ষোল বছর বয়সেই মনের ভাবান্তর হল অরুণাচলেশ্বর মন্দিরের কথা শুনে। সেক্কিলার পেরিয়পুরাণম ধর্মগ্রন্থ পড়ে তার মনে জাগে আধ্যাত্মিক পিপাসা, মীনাক্ষি মন্দিরে যাওয়া হয়ে দাঁড়াল তার নিত্যকর্ম। ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভে ব্যাকুল হয়ে উঠল কিশোরের অন্তর।

১৮৯৬ সালে—রামনের বয়স তখন সতের বছর—ভগবান মুখ তুলে তাকালেন। একদিন দাদা বললেন—'তুই স্কুলে যাচ্ছিস রামন? এই নে পাঁচটা টাকা। আমার কলেজের মাইনেটা দিয়ে আসিস।'

ভেঙ্কটরামন ভাবলেন—এই সুযোগ। ভগবান বুঝি পথের খরচ যুগিয়ে দিলেন। তিরুভান্নামালাই-এ অরুণাচলেশ্বর পাহাড় তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আর দেরি করা উচিত নয়। রওনা হওয়ার আগে ভেঙ্কটরামন তাঁর দাদার নামে একটি চিঠি লিখে রেখে গেলেন—'পুণ্যকর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে আমি যাত্রা করলাম। তোমার কলেজের বেতন দেওয়া হয়নি। তিনটি টাকা নিয়ে দুটো টাকা রেখে গেলাম।'

মাদুরা স্টেশনে এসে ভাগ্যক্রমে ট্রেন পেয়ে গেলেন। তিরুভান্নামালাইয়ে যেতে হলে ভেলুপুরম জংসনে নেমে গাড়ি বদল করতে হবে। শেষ রাত্রে এসে পৌঁছলেন সেই ভেলুপুরমে। গাড়ির তখনও দেরি অনেক। ভোর হয়ে গেল। ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে। অথচ সঙ্গে আছে মাত্র দশটি পয়সা। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটি হোটেলে ঢুকে পড়লেন রামন।

খাওয়ার পর হোটেলের মালিক কী ভেবে পয়সা নিলেন না। সুদর্শন তরুণের ক্ষুধার্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে আগেই তাঁর কেমন এক মায়া জন্মেছিল। তখন সেই দশটি পয়সা দিয়েই ট্রেনের টিকিট কেটে নিলেন রামন। অরুণাচলে যেতে কত খরচ পড়ে তা ভেঙ্কটরামন জানেন না। তাই মাত্র তিনটি টাকা সম্বল করে বেরিয়েছিলেন। ভেলুপুরমে আসতেই টাকা শেষ। দশ পয়সার টিকিটে পাওয়া গেল মাম্বলপট্টু অবধি। সেই পর্যন্ত ট্রেন গিয়ে ভেঙ্কটরামন হেঁটে চললেন।

দশ মাইল পথ হেঁটে এসে পৌঁছলেন আরিয়ানিনেলুরে। তখন প্রায় সন্ধ্যা। কাছেই পাহাড়ের গায়ে অতুল্যনাথের মন্দির। সেখানেই রাত্রি কাটালেন। ভাগ্যে মিলে গেল যৎসামান্য ভোগের প্রসাদ।

ভোর হতে না হতেই আবার যাত্রা শুরু। অরুণাচল এখনও কুড়ি মাইল দূরে। পথঘাট জানা নেই, হাতে নেই একটিও পয়সা। চলতে চলতে ক্লান্তিতে ও ক্ষিধেয় কাতর হয়ে পড়লেন। পথের পাশে এক ধনী গৃহস্থের বাড়ি। আহার্যের আশায় তিনি বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বাড়ির কর্ত্রী ব্রাহ্মণ তরুণকে দেখতে পেয়ে সমাদরে অতিথি ভোজন করালেন।

রামনের সহসা মনে পড়ল তাঁর কানে দুটি সোনার কুণ্ডল রয়েছে। সে দুটি বাঁধা রেখে চারটি টাকা সংগ্রহ করলেন। পথে এসে টাকার রসিদটা ছিঁড়ে ফেললেন।

অরুণাচলে এসে রামনের জন্মলাভ ঘটল। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি কোন গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেননি। কিন্তু এখানেই তিনি মস্তক মুণ্ডন করে পৈতাসহ সর্বকিছু ত্যাগ করে কঠোর সাধনায় ব্রতী হলেন। এই সময় শেষাদ্রি নামে এক সন্ন্যাসী তাঁকে বাইরের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন।

অরুণাচলে ভেঙ্কটরামন প্রথমে সুব্রহ্মণ্যম মন্দিরে ও পরে পাতাললিঙ্গম গুহায় ধ্যানের আসন পেতে বসলেন। শ্বাপদসংকুল পর্বতারণ্যে দিনের পর দিন কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে লাভ করলেন অধ্যাত্মজ্ঞান, ঈশ্বরের পরম প্রসাদ। যোগবিভূতির গুণে তাঁর শরীরে দেখা দিল দিব্য জ্যোতি।

এচাম্মল নামে এক বিধবা নারী রামনকে দেখতে এসেছে। স্বামী পুত্র কন্যা সব কিছু হারিয়ে সে শোকে অধীরা। রামনের পদতলে লুটিয়ে পড়ে বিধবা রমণী বলে, 'আমার যে সব গেছে প্রভু। মনে আমার শান্তি নেই। জীবনে বাঁচার আর আকাঙ্ক্ষা নেই আমার।' স্নিগ্ধহাস্যে রামন তাকে সান্ত্বনা দিলেন, আর দিলেন ভক্তিপথের সন্ধান। রামনের উপদেশ শুনে তার শোকতাপ সব দূর হয়ে গেল। সে সেবিকা হয়ে রইল মহর্ষি রামনের আশ্রয়ে।

আরও অনেক গল্প আছে রামন মহর্ষি সম্পর্কে। একই সময়ে তাঁকে নাকি বহু জায়গায় দেখা যেত। লোকে বলত, প্রয়োজন হলে শিষ্যদের কল্যাণের জন্যে তিনি দিব্য দেহ নিয়ে সর্বত্র বিচরণ করতে পারতেন। মহাযোগী সাধুসন্তদের জীবনে এমন অলৌকিক শক্তির প্রকাশ বহুবার দেখা গিয়েছে। এরকমই একটি ঘটনা। রামন তখন বিরূপাক্ষ গুহায় তাঁর আসন পেতেছেন। গুরুদেবের খাবার নিয়ে রোজই এচাম্মল সেই গুহায় যায়। একদিন খাবার নিয়ে যাচ্ছে এমন সময় দেখল মহর্ষি পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। কিন্তু একটু পরেই গুহায় প্রবেশ করে এচাম্মলের বিস্ময়ের অবধি রইল না। গুরুদেব এক বিদেশী পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করছেন। তা দেখে এচাম্মল বলল—'একী গুরুদেব! আপনাকে যে এইমাত্র পাহাড়ের নিচে দেখে এলাম।' মহর্ষি রামন এচাম্মলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন মাত্র।

ধীরে ধীরে মহর্ষির আশ্রমটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হল। তাঁর চরণপ্রান্তে এসে সমবেত হলেন দেশ ও বিদেশের বহু মুমুক্ষু ও মনীষী। এঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক সমারসেট ম্যম ছিলেন অন্যতম। অদ্বৈত তত্ত্বভাবনার এক মূর্ত বিগ্রহরূপে এই জ্ঞানতপস্বী দিগ্বিদিকে পরিচিত হয়ে উঠলেন।

মানুষের জীবনে প্রকৃত কল্যাণ আসতে পারে যদি তার আধ্যাত্মিক জীবন পরিপূর্ণ হয়। ইহজীবনের সুখদুঃখকে বড় করে দেখা নিতান্তই অর্থহীন। এই বাণীই তিনি প্রচার করেছেন। সেবার এক ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসী রামনের আশ্রমে এসেছেন। একটি হাত তাঁর দিনরাত ওপরের দিকে উঠানো থাকে। আশ্রমে এসে তিনি মহর্ষির কক্ষে প্রবেশ করেননি। আশ্রমে এসে তিনি মহর্ষির কক্ষে প্রবেশ করেননি। বহিরঙ্গনে বসে মহর্ষিকে বলে পাঠান, 'আমার এই সাধনার ভবিষ্যৎ কি?'

রামন উত্তর দিলেন—'ভবিষ্যৎ ঠিক বর্তমানের মতোই।' ঊর্ধ্ববাহু থেকে শরীরকে অনর্থক নির্যাতন করাকে তিনি পছন্দ করেননি। তা ছাড়া প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে সন্ন্যাসীর মনে যে গোপন কামনা রয়েছে তা বুঝতে পেরে মহর্ষি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

১৯৫০ সালে মহর্ষি রামনের দেহে এক বিষাক্ত টিউমার দেখা দিল। চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার অনেক কিছুই হল, কিন্তু কিছুতেই আরোগ্যলাভ হল না। ১৪ই এপ্রিল। দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভক্তদল মহাযোগীর শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি প্রশান্ত দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকিয়ে মধুর সম্ভাষণ করছেন। কে জানত সেইদিন রাত্রি ঘনাবার সঙ্গে সঙ্গেই মহর্ষির জীবননাট্যের ওপর যবনিকা নেমে আসবে।

জটীয়া বাবা



ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ রাজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন বাংলার শান্তিপুরের অধিবাসী। কার্যোপলক্ষে আগ্রার অন্তর্গত টুণ্ডুলায় এসে তিনি বসবাস করেন। একদিন রাজেন্দ্রচন্দ্রের ধর্মপ্রাণা পত্নী গিরিবালা দেবী স্বপ্ন দেখেন, এক শিবাবতার ঠাকুর তাঁর গর্ভে আসছেন। অবশেষে ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ২৫শে পৌষ (১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে) এক শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করে এক সর্ব-সুলক্ষণযুক্ত পুত্র। যথাসময়ে ঐ শিশুর নামকরণ হয় অমরনাথ।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অমরনাথের বিস্ময়কর আকর্ষণশক্তি, অসাধারণ শ্রুতিধৃতি ও গভীর দেবতা-প্রীতি দেখে পিতামাতা উভয়েই মুগ্ধ হন।

বালক অমরনাথ তার বাল্যলীলার বয়স্যদের সঙ্গে টুণ্ডুলার এক বড় দীঘির তীরে, মধুর যাত্রাভিনয়-লীলা করত। এই অভিনয়-লীলা যখন পূর্ণোদ্যমে চলছিল, তখন একজন সঙ্গী বলে ওঠে—'আমাদের মধ্যে কে ঐ পুকুরের সবচেয়ে ভালো পদ্ম ফুলটি তুলে আনতে পারে?' ঐ পুকুরে ছিল ভয়ানক কালসর্পের উপদ্রব, তাই কেউ পুকুরে নামতে সাহস করল না। কিন্তু অমরনাথ এক অলৌকিক কাজ করে বসল। সে একটির পর একটি পদ্মফুলের ওপর পা দিয়ে সেই বড় পদ্মফুলটি তুলে নিয়ে এল।

এটাও কি সম্ভব! সকলে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কোন্ দৈববলে তুমি এই কাজটি করতে পারলে?'

বালক অমরনাথ উত্তর দিল—'চিত্তশুদ্ধি হয়ে যারা যথার্থ কৃষ্ণগত প্রাণ হয়ে থাকে, অষ্টসিদ্ধিগুলি আপনা থেকেই তাদের মধ্যে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন।'

সেই দিন থেকে অমরনাথকে তারা কোন বিশিষ্ট ঈশ্বরাবতার স্বরূপ বলে মনে করতে লাগল।

অমরনাথ জীবনে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন। কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সাধারণ গৃহীর ন্যায় তাঁকে চাকুরিও গ্রহণ করতে হয়েছিল। রেলওয়ে কোম্পানির কাজে নিযুক্ত হয়ে পরে উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। খুব অল্প বয়সেই তাঁর গার্হস্থ্য জীবন শুরু হয়েছিল। স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেছিলেন। দুই স্ত্রীর গর্ভেই ছেলেমেয়ে হয়েছিল। কিন্তু সংসারে আবদ্ধ হতে তিনি আসেননি।

চাকুরি ত্যাগ করে অমরনাথ যাত্রা করলেন নিরুদ্দেশের পথে—জীবনে সদ্‌গুরু লাভের উদ্দেশে। বহুস্থান পরিভ্রমণ করলেন। বহুদিন তাঁকে নিরম্বু উপবাসে কাল কাটাতে হয়েছিল। এর ফলে তিনি কঠিন রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হন। তখন জীবনের উপর বীতস্পৃহ হয়ে নীলগিরি পর্বতের কাছে এক পার্বত্য নদীতে আত্মবিসর্জনের মনস্থ করলেন। খরস্রোতা নদীতে যেমনই ঝাঁপ দিতে যাবেন, অমনি অপূর্ব জ্যোতিসম্পন্ন এক সন্ন্যাসী তাঁকে বাধা দিলেন। আত্মহত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করলে অমরনাথ বললেন—'মহান সদ্‌গুরুর আশ্রয় সদাসর্বদা প্রার্থনা করি, তা লাভ না হলে নিজের জীবন বিসর্জন করাই আমি শ্রেয়ঃ মনে করি।'

সন্ন্যাসী তাঁকে বললেন—'সময়ান্তরে নিশ্চয়ই তোর সদ্‌গুরু লাভ হবে।' অমরনাথ ঐ মহাপুরুষকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করবার পর উঠে দেখেন তিনি অন্তর্ধান করেছেন।

অবশেষে দৈবযোগে একদিন এক সদ্‌গুরু বৈষ্ণবাচার্যের সঙ্গে দেখা হল। তিনি অমরনাথকে নদীতে স্নান করে আসতে বললেন এবং তাঁকে দিলেন দেবদুর্লভ সিদ্ধমন্ত্র কামবীজ ও কামগায়ত্রী। অমরনাথের নতুন নামকরণ করলেন—'কৃষ্ণানন্দ'।

কৃষ্ণানন্দের এবার শুরু হল নতুন জীবন। জপ সাধনায় তাঁর দিন কাটতে লাগল। এর পর ১৯২০ সালে কৃষ্ণানন্দের দেখা হল পরিব্রাজক-চূড়ামণি শ্রীপ্রেমানন্দ ভারতীর সঙ্গে। শ্রীপ্রেমানন্দ ভারতী কৃষ্ণানন্দকে নয়া পথের সন্ধান দিলেন। কৃষ্ণানন্দ চিত্রকূট পর্বতের গভীর গুহায় একরকম আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে একাদিক্রমে বারো বছর ভজন-সাধনে নিমগ্ন হলেন। নিবিড় তপস্যা ও কঠোর সাধনার পর গ্রহণ করলেন সন্ন্যাস ধর্ম। পরিচিত হলেন 'জটীয়া বাবা' নামে।

অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবসায়িতা—এই অষ্টসিদ্ধি আয়ত্ত করলেন কৃষ্ণানন্দ। অচিরেই নানা যোগৈশ্বর্য এবং ত্রিগুণাতীত অবস্থা তিনি লাভ করলেন। এর পর তাঁর প্রকাশ হল উলঙ্গ বাল-গোপাল জটীয়া বাবা রূপে। যথার্থ বিরাট পুরুষ, মূর্তিমান নীলকণ্ঠস্বরূপ তাঁর দেহজ্যোতিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হত। বাহ্য আচরণ দেখে এই বিরাট যোগিবর পুরুষকে বুঝবার উপায় ছিল না। লোকচক্ষুর অন্তরালে, লোকোত্তর মহাজীবনের গভীরতার মধ্যে তিনি আত্মগোপন করে থাকতেন। শুধু বিশেষ বিশেষ করুণার ক্ষেত্রে দেখা যেত, তাঁর অলৌকিক যোগৈশ্বর্য মুহূর্তমধ্যে বিদ্যুৎচমকের মতো বিচ্ছুরিত হয়েছে। সম্ভ্রমে, বিস্ময়ে পরিবেশের ভক্ত মানুষজন এ বিরাট পুরুষের জ্যোতির্ময় সত্তার সামনে নির্বাক হয়ে বসে থাকত। এই শক্তিধর মহাপুরুষের জীবনে লৌকিক ও অলৌকিক দুটি সত্তারই এক অপরূপ মিলন সংঘটিত হয়েছিল। বহির্জগতের প্রয়োজন ও পরিপার্শ্ব অনুযায়ী অতি সহজ আচরণ করতেন জটীয়া বাবা; তিনিই আবার আপন সাধনসত্তার গভীরে লুকিয়ে রাখতেন অপরিমেয় শক্তির উৎস, অলৌকিক অধ্যাত্মপ্রজ্ঞা।

শ্রীজটীয়াবাবা সর্বধর্মের চরম সিদ্ধাবস্থা লাভ করবার পর চিত্রকূট পর্বতের নিভৃত গুহাকন্দর থেকে অবতরণ করে বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণে বেরুলেন। গির্ণার, বদরিকাশ্রম, বদরীনারায়ণ, কেদারবদরী, পশুপতিনাথ, দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, উলার হ্রদ, কান্দাহার, নেপাল, কামরূপ কামাখ্যা প্রভৃতি পার্বত্য প্রদেশ ভ্রমণ করেন। তারপর সেতুবন্ধ রামেশ্বর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, গয়াধাম, কাশীধাম, দ্বারকাধাম, পুরীধাম প্রভৃতি নানা শ্রেষ্ঠধাম, নানা পীঠস্থান ও তীর্থস্থান একাকী পদব্রজে পরিক্রমা করেন।

ঐ সকল পুণ্যধাম ও পীঠস্থানের অধিবাসীদের অনেকেই তাঁকে গুরুত্বে বরণ করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ, পার্শী, জৈন, খ্রীষ্টান ও ইহুদী প্রভৃতি সকল ধর্মের ও সকল বর্ণের উন্নত, অনুন্নত অধিবাসিবৃন্দের অনেকেই ঠাকুরের কাছ থেকে ইষ্টমন্ত্র দীক্ষা ও বহু ধর্মশিক্ষাদি লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন।

এক বিরাট অধ্যাত্মশক্তির উৎসরূপে যোগিরাজ জটীয়াবাবা ভক্তমণ্ডলীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। অধ্যাত্মসাধনা ও যোগশক্তির অমৃতভাণ্ডখানি তিনি জনকল্যাণের জন্যে ধারণ করেছিলেন। ভক্ত, মুমুক্ষু ও যোগসাধনরত সাধকগণ এই যোগিবরের দর্শনপুণ্যধারায় অভিসিঞ্চিত হতেন, অগণিত নরনারী তাঁর দর্শনে ও স্পর্শনে আধ্যাত্মিক চিন্তাসমুদ্রে অবগাহনের সুযোগ পেতেন।

অন্যান্য মহাসাধকদের মতোই শ্রীজটীয়াবাবা মনুষ্যজীবনের প্রকৃত কল্যাণ বলতে বুঝতেন—মোহ-বন্ধন থেকে মুক্তি ও ঈশ্বরপ্রাপ্তি। তাই শিষ্যদের অধ্যাত্মজীবনের বিকাশ ও পরিণতির দিকে তাঁর ছিল সতর্ক সজাগ দৃষ্টি।

১৩৫৬ সনের ৬ই অগ্রহায়ণ ২৪-পরগনার অন্তর্গত উত্তরায়ণ পুণ্যপীঠ ইছাপুর শহরের নর্থল্যাণ্ড কোয়ার্টারে নির্বিকল্প মহা-সমাধি যোগে তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন।

সঙ্ঘগুরু মতিলাল



মতিলালের জন্ম ১৮৮২ সালের ৬ই জানুয়ারি চন্দননগরে। পিতা বিহারীলাল সিংহ রায় ছিলেন চৌহানবংশীয় ক্ষত্রী রাজপুত।

মাত্র ১৫ বছর বয়সে মতিলালের বিবাহ হয় চুঁচুড়ার ন-বছর বয়সী বালিকা রাধারাণীর সঙ্গে। বছর চারেক পরে একটি সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু দশ মাস পরেই শিশুটির মৃত্যু ঘটে। এই শোকে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই ভেঙে পড়লেন। সন্তান-বিয়োগ তাঁদের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাল।

এই সময়ে মতিলালের ধর্মপিপাসু মন আধ্যাত্মিক সাধনার পথ খুঁজে বার করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল। পথহারা পথিকের মতো তিনি সহজিয়া, সাঁই, আউল, বাউল, কর্তাভজা, সতীমা ইত্যাদি বাংলা দেশের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে ছুটাছুটি করতে লাগলেন। অবশেষে শক্তিমান তন্ত্রগুরু কালিকানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে তিনি সস্ত্রীক বৈষ্ণবী শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। পরে তিনি স্বামী সচ্চিদানন্দের নিকট ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। শক্তিমন্ত্র ও ব্রহ্মমন্ত্র দুটিই তাঁর ভাবী সংঘ-জীবন গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী রামানন্দ গিরি তাঁকে অজপা মন্ত্র প্রদান করেন। এই অজপা সাধনে তাঁর অন্তরবৃত্তি কতক পরিমাণে প্রশান্ত হয়। এরপর এলেন অনামী অবধূত। তিনি মতিলালের জন্মকোষ্ঠী বিচার করে বললেন—'তুমি এখানেই থেকো, এখানেই তোমার সন্ন্যাস, এখানেই সিদ্ধি। তুমি বিবাহিত। কিন্তু ব্রহ্মচর্য ছাড়া ভগবানের পথে যাওয়া যায় না। আমি তোমাদের দুজনকে এই ব্রত দিয়ে যেতে চাই।' স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করলেন। মতিলালের বয়স তখন চব্বিশ বছর, স্ত্রীর আঠার।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও আদর্শ তাঁকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করে। তিনি বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন—ঠাকুর রামকৃষ্ণের নরনারায়ণের পূজা মন্ত্রের রূপায়ণে, স্বামী বিবেকানন্দের আরব্ধ সেবাব্রতের অনুপ্রেরণায় ও দৃষ্টান্তে। তিনি পল্লীর যুবক ও বন্ধুদের নিয়ে একটি সেবাপ্রতিষ্ঠান গঠন করলেন। তার নাম দিলেন সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

এদিকে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলায় এক বৈপ্লবিক আন্দোলন দেখা দিল। স্বদেশভক্ত কর্মযোগী মতিলাল ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে। ১৯০৬ সালে পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলায় যে তীব্র দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন আর্ত মানুষদের বাঁচাবার উদ্দেশ্যে মতিলাল চন্দননগর থেকে অর্থসংগ্রহ করে বরিশালে পাঠালেন। তাঁর রচিত গান গেয়ে এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল:

"চোখের জলে বুক ভেসে যায় বরিশালের কথা শুনে।
(সেথা) ঘরে ঘরে হাহাকার মুষ্টিমেয় অন্ন বিনে॥...
ওরে আমরা তবু খেতে পাই, না খেয়ে যে মরে ভাই,
এক মুঠো চাল দে না সবাই, বাঁচুক তারা জীবনে॥"

১৯০৮ সাল থেকে ১৯২০ পর্যন্ত বৈপ্লবিক কার্যোপলক্ষে চন্দননগরে মতিলালের বাসভবনে বিভিন্ন সময়ে বহু বিপ্লবী যাতায়াত করেছেন। অরবিন্দ, বারীন, বাঘাযতীন, রাসবিহারী বসু, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রমুখ বহু বিপ্লবী তাঁর গৃহে গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

মতিলালের সংগঠনী শক্তি ছিল অসাধারণ। স্বদেশের উন্নয়ন-কল্পে তিনি যে সমস্ত কাজ করে গিয়েছেন, সেগুলি তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর কল্পনাপ্রবণ মানসে যে সব প্রকল্প প্রতিভাত হত, সেগুলির রূপায়ণে তিনি বিলম্ব করতেন না। তারই ফলে প্রবর্তক সঙ্ঘকে অবলম্বন করে অনেক জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। মুদ্রণ-শিক্ষা, বয়ন-শিল্প, কাঠের উৎকৃষ্ট আসবাব-পত্র নির্মাণ, ব্লক তৈরি, বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রবর্তক সঙ্ঘের কর্মতৎপরতা খুবই প্রশংসার যোগ্য। বাঙালী জাতির একটা অপবাদ আছে, তারা পরিকল্পনা-পটু কিন্তু পরিকল্পনা রূপায়িত করবার মত উৎসাহ উদ্যম তাদের নেই। কিন্তু মতিলাল রায়ের প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের গঠনমূলক কাজের দ্বারা বাঙালী জাতির দীর্ঘকালের দুর্নাম কিছুটা দূর হয়েছে। মতিলালের রচিত প্রবন্ধগুলি বাঙালী যুবকদের কাছে ছিল অগ্নিমন্ত্র: "প্রবর্তক কী করিবে? নূতন ভাবের ভাবুক করিবে, নূতন চিন্তা করিতে শিক্ষা দিবে—নূতন মন্ত্রে দীক্ষা দিবে। যাহা না থাকিলে মানুষে মানুষে সহানুভূতি থাকে না, ঘরে ঘরে হাহাকার উঠে, যাহা না থাকিলে মানুষ স্বার্থপর হয়, বিশ্বের জ্বালা অনুভব করে—'প্রবর্তক' সেই অমূল্য বস্তু গঠনে সহায়তা করিবে। সেটা কী? চরিত্র। এই চরিত্র দেবচরিত্র। ইহা মানববুদ্ধির অতীত, ইহা সাধনার সামগ্রী।"

শ্রীমতিলালের জনৈক ভক্ত লিখেছেন—"অরবিন্দের চন্দননগর-ত্যাগের পরই শ্রীমতিলালের জীবনে শ্রীঅরবিন্দের নিকট হতে প্রাপ্ত আত্মসমর্পণ-যোগের সাধনা গভীর হতে গভীরতর হয়ে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র সংসার ধীরে ধীরে তাঁর চেতনা হতে অপসৃত হতে লাগল। এ সময়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে তিনটি মন্ত্র-জপের নির্দেশ দেন। তিনি একা এই মন্ত্রত্রয় জপে সুখী হননি; বহু নারীপুরুষের কণ্ঠে এ মন্ত্রের উদাত্ত ঝঙ্কারেই তিনি তৃপ্ত হয়েছেন। আত্মসমর্পণ-যোগের অমর বীর্য তাঁর জীবনে রূপায়িত হয়। শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—'Our whole life is yoga'. The yoga we practise is not for ourselves but for humanity." —এ যোগের লক্ষ জীবনের লয় বা নির্বাণ নয়, জীবনের রূপান্তর-বিধান,—জীবনকে অমৃতরসে অভিষিক্ত করে দিব্যজীবনের প্রকাশ। সমষ্টিজীবনকে দিব্য করার সঙ্কেত পাই শ্রীঅরবিন্দের একটি বাণীর মধ্যে—'Culture, Commune and Economy on spiritual basis.' জীবনকে মুক্ত করবার জন্যে জীবনের সঙ্কোচনের পথে যাত্রা নয়, ভগবানের সাথে জীবনকে সংযুক্ত করে জীবনকে পূর্ণ এবং বিরাট করার উদাত্ত আহ্বান। ...যোগ—ভিত্তি। সঙ্ঘ—ইমারৎ। সমর্পণ-সিদ্ধির সহজ উপায়রূপে শ্রীঅরবিন্দ বলতেন—'চাই absolute and sincere aspiration, surrender of ego, and patience—এই তিনটি condition রেখে চল, সব হবে।' শ্রীমতিলাল সঙ্ঘধর্মীদের জীবনে এই সাধনবীর্যকে গুণান্বিত করার চেষ্টাই করেছিলেন।"

উদার ধর্মের বাণী তাঁর লেখায় উচ্চারিত: 'যে সত্তা ভূমার ধর্মে অনুপ্রাণিত সেই হিন্দুসত্তায় ধর্মবস্তুই বিসর্জন দিতে হবে। ধর্মের কোনরূপ বেশভূষা নাই, যাতে বিশিষ্ট মূর্তি বলে ধরা যায়। আমরা ধর্মের পরিচ্ছদ যতদিন ধারণ করি ততদিনই হিন্দু। হিন্দু পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করার পর ধর্মের কোন আকার থাকবে না অধর্মেরও নয়। তখন একটা জীবন থাকবে—সে জীবন ধর্মাধর্মবর্জিত।'

দেশপ্রেম ও ধর্মকে সমন্বিত করে জীবনকে পরহিত ব্রতে উৎসর্গ করেছেন এমন মহাপুরুষের সংখ্যা ভারতে খুব অল্পই আছে। তন্মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের নাম যেমন সর্বাগ্রে করা যায় তেমনি নির্ভয়ে করা যায় সঙ্ঘগুরু মতিলাল রায়ের নাম। গীতায় প্রচারিত নিষ্কাম অনুষ্ঠেয় কর্মসাধনাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ। এই আদর্শই তিনি স্বীয় জীবন ও কর্মের মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে রেখে গিয়েছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যথার্থ বলেছিলেন, 'আশ্রম করুন—ছেলেমেয়েদের চরিত্রগঠনের জন্যে। ইহাই মুক্তির শক্ত বনিয়াদ হইবে। জাতিগঠনের ইহাই প্রকৃত সোপান।' এই কর্মযোগী ও ধর্মবীর ১৯৬৬ সালে পরলোকগমন করেন।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র



মনোমোহিনী দেবী শিশুপুত্র অনুকূলচন্দ্রকে নিয়ে গিয়েছেন পাবনায় হরিপুর গ্রামের জমিদার উমেশ লাহিড়ির বাড়িতে। সেখানে আছে গোপালদেবের বিগ্রহ। উমেশবাবু অনুকূলচন্দ্রকে রোজই মন্দিরে নিয়ে যেতেন। একদিন সকালে মন্দিরে গিয়ে শিশুকে দারোয়ানের কাছে রেখে তিনি পূজায় বসেছেন। হঠাৎ দেখেন সিংহাসন থেকে গোপাল ঠাকুরের বিগ্রহ ফেলে দিয়ে শিশু নিজেই সেখানে বসে হাসছে।

অনুকূলচন্দ্রের পিতা শিবচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ি ছিল পাবনা জেলার অন্তর্গত গুয়াখাড়া গ্রামে। শিবচন্দ্র ঠিকাদারের কাজ করতেন। হিমাইতপুরে মাতুলালয়ে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ৩০শে ভাদ্র (১৮৮৮ সাল) অনুকূলচন্দ্রের জন্ম হয়।

১৩১৩ সনে অনুকূলচন্দ্র বিবাহ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র সতের, পাবনা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র। এর পর ঢাকা ও নৈহাটি বিদ্যালয়ে পাঠ করে তিনি কলকাতায় গিয়ে ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলে ভরতি হন। কলকাতায় এসে অনুকূলচন্দ্র দেখলেন চারদিকে শুধু কুসংগ আর ভোগের উপকরণ। মানুষ ভালমন্দ বিচার না করে সেই আপাতমধুর ভোগের পথে ছুটে চলেছে। তাঁর অনেক সহপাঠীও সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র এসব দেখে নিজেকে সংযত করলেন। মনের অসৎপ্রবৃত্তি দমন করবার জন্যে তিনি পড়াশোনার সময় ছাড়া অন্য সময়গুলি নামজপ করে কাটাতেন। কলেজ থেকে ফিরে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি গঙ্গার ধারে একটি নির্জন স্থানে একা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকতেন। এতে তাঁর কয়েকজন সহপাঠী ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠল। একদিন তিন-চারজন সুন্দরী বারবনিতাকে তারা নিযুক্ত করল অনুকূলচন্দ্রকে প্রলোভিত করবার জন্যে। অনুকূলচন্দ্র মোহময়ী রমণীদের দেখে বুঝতে পারলেন তাঁকে চক্রান্তের জালে ফেলা হয়েছে। তিনি একমনে সত্যনাম জপ করতে লাগলেন। ভাবলেন—মা একী তোর লীলা! এক সময়ে জননীরূপে জঠরে ধারণ করেছিস, স্তন্য দিয়েছিস, আবার মোহিনীরূপে এসেছিস সন্তানের সামনে! সঙ্গে সঙ্গে বারবনিতাদের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হল। লজ্জায় কেউ কেউ পালিয়ে গেল। বাকি যারা রইল তারা কেঁদে লুটিয়ে পড়ল অনুকূলচন্দ্রের পায়ে।

ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অনুকূলচন্দ্র বাড়ি ফিরে এসে ডাক্তারি ব্যবসায় শুরু করলেন। অর্থাগমও হতে লাগল; তবে গরিব রোগীদের কাছ থেকে তিনি কোন টাকাপয়সা নিতেন না। সবাই বলত—অনুকূল-ডাক্তার গরিবের মা-বাপ।

অনুকূলচন্দ্র তখন পূর্ণ যৌবনে পড়েছেন। মনোমোহিনী দেবী পুত্র অনুকূলচন্দ্রের পূর্ণ দীক্ষার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অনুকূলচন্দ্র যখন নিতান্ত শিশু তখন তিনি পুত্রের কানে স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত দীক্ষামন্ত্র দান করেছিলেন। সেই মন্ত্র তিনি পেয়েছিলেন বালিকা অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বহু প্রার্থনার পর। কিন্তু পুত্র তখন নিতান্ত শিশু ছিল,

এখন সেই মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম ও মহিমা শিশুর মনে প্রতিষ্ঠা করা দরকার। তাই একটি শুভদিন দেখে জননী পুত্রকে দীক্ষা দিলেন।

সেই দীক্ষাগ্রহণের সময়টি বড় বৈচিত্র্যময়। জননী তাঁকে দীক্ষা দিলেও আসলে পশ্চিমদেশীয় এক মহা সাধকপুরুষের নির্দেশ অনুসারেই তা করেছিলেন। সেই মহাপুরুষকে অনুকূলচন্দ্র কখনও দেখেননি। কিন্তু তাঁর মনে হল দীক্ষাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁর দেহে প্রবেশ করলেন। পরে তাঁর ছবি দেখে বুঝতে পারলেন, ইনিই সেই মহাপুরুষ। কিছুদিন পর খবর এল, অনুকূলচন্দ্রের দীক্ষাপ্রাপ্তির মুহূর্তেই সেই মহাপুরুষ ইহলীলার অবসান করেন।

দীক্ষা গ্রহণের পর অনুকূলচন্দ্রের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। তিনি নিজে নামগানে মত্ত হয়ে পড়েন আর হয়ে ওঠেন নামগানের প্রচারক।

অনুকূলচন্দ্র ক্রমে আত্মপ্রকাশ করলেন ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র রূপে। বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। তাঁর যোগবিভূতির মহিমা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তিনি বিভিন্নস্থানে স্থূলদেহে অবস্থান করে শিষ্যদের বিপদ থেকে রক্ষা করতে লাগলেন।

জয়নগর-মজিলপুরের অজিতকৃষ্ণ বসু নিদারুণ শূলব্যথায় আর্ত। তাঁর সকাতর প্রার্থনায় অনুকূলচন্দ্র তাঁর গৃহে গেলেন। বহু চিকিৎসাতেও তাঁর শূলবেদনা প্রশমিত হয়নি। ঠাকুরকে দর্শন করে অজিতকৃষ্ণ বললেন, "ঠাকুর, আমি তোমার রোগ সারাবার কথা বলতে চাইনে। রোগ আমার দেহেই থাকুক। আমি চাই শুধু তোমাকে। তুমি আমার পরকালের কাজ করে দাও।" এমন নিষ্কাম প্রার্থনা এত রোগযন্ত্রণার মধ্যে! সেইদিনই অজিতকৃষ্ণ সত্যনাম গ্রহণ করলেন। ক্রমে তাঁর শূলবেদনা পুরোপুরি সেরে গেল।

ঠাকুরের অলৌকিক লীলা ও মহিমার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে ভক্তরা তাঁকে পুরুষোত্তম বা অবতার বলে মানতে লাগল। তিনি কিন্তু চাইতেন না যে ভক্তরা তাঁর উপর অবতারত্ব আরোপ করুক। বলতেন-- আমাকে ভাই, দাদা বা বন্ধু বললে আমি খুশি হই।

ঠাকুরের নির্দেশিত আধ্যাত্মিক উচ্চতম তত্ত্বলাভের সহজ সরল পন্থাগুলি 'পুণ্যপুঁথি'তে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখা অমূল্য উপদেশামৃত 'সত্যানুসরণ' নামে প্রকাশিত। পুণ্যপুঁথির উপদেশগুলি পাঠ করে মনে হয় স্বয়ং পরমাত্মা যেন জীবজগতের উদ্ধারের জন্যে এই ভাবনাগুলি ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন খোঁজ কর অন্তরে তুমি কে।...খুব নাম কর। নাম ও প্রেম সকলকেই জয় করতে পারে।...থাকবি সংসারে, মন রাখবি ভগবানে। ভগবানের পিছনে ছোট, শান্তি তোমার পিছনে ছুটবে।...তাঁর নামে সব হয়- ধর্ম, অর্থ, কাম। সমস্ত দিন মত্ত হয়ে সংসারের কাজ কর, সন্ধ্যাবেলা ছুটে আয়, পাগল হয়ে কয়েক ঘণ্টা মাত্র কীর্তন কর। একটু বিশ্বাস- দেখ আমার কত শক্তি। দেখ, আমি মায়ার আবরণ ছিঁড়ে দিতে পারি কি না। মহা মহা পাপ আমি মুছে দেব। নামের শক্তি: নাম করতে করতে প্রণব চড়া যায়। নামের উপর উঠলে নাম করলেই কুলকুণ্ডলিনী জাগরিত হয়।...তুই কে? সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষ। প্রাণে প্রাণে জানা চাই ঈশ্বরকে। মেয়েগুলিকে দেখা চাই মায়ের মতো। বেশি যুক্তিতর্কের মধ্যে যাসনে। বিশ্বাসটাকে সবল করে ফেল আর ভালবাস— সব উঁচু নীচু সমান হয়ে যাবে।

মহাভাব অবস্থার এইরকমের বহু বাণী আছে অনুকূলচন্দ্রের। বলতেন ভক্তবৎসল হব দেখি। এগুলি ধর ধর করে নাচিয়ে দেবো, শক্তিসঞ্চার হলে সব ছুটে আসবে। নামের দ্বারা সহজেই এই শক্তিকে জাগানো যায়। বিশ্বাসের সঙ্গে কেবল উদ্দেশ্যে ভগবানের নাম করলেই আমাদের মন অন্তর্মুখী হয়। মনস্থান উত্তেজিত হলে একটা প্রবাহ খেলে যায় এবং সেই প্রবাহের ফলে শরীরের ও মনের কার্যকারিতা বেড়ে যায়। মনের মাধ্যমে সুপ্ত আরোগ্যকারী শক্তিকে জাগাতে পারলেই দেহের রোগ সারে।

অনুকূলচন্দ্রের আদর্শ সদাচার, সদালাপ ও সৎসঙ্গ। এই আদর্শ নিয়েই তিনি গড়ে তুললেন সৎসঙ্গ আশ্রম। পাবনাতে যার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল, দেশবিভাগের পর তাই পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে দেওঘরে। সেখানে গড়ে উঠেছে অসংখ্য শাখা সমন্বিত এক বিরাট প্রতিষ্ঠান। সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু কৌতূহলী ও মুক্তিকামী নরনারী এসে সমবেত হয় সেই আশ্রমে। ১৯৬৯ সালে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ইহধাম ত্যাগ করেন।

সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ



হুগলী জেলার কেদুয়া গ্রামে প্রবোধচন্দ্রের মামার বাড়ি। সেখানেই তাঁর জন্ম হয় ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ৬ই ফাল্গুন (১৮৯১ সাল)। অপরূপ লাবণ্যময় এই শিশুকে দেখে অনেকেই সেদিন ধারণা করেছিলেন এই শিশু এককালে মহাপুরুষ হবে।

পিতা প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ডুমুরদহের নাম-করা ডাক্তার। নিজের বাড়িতে ছেলেকে ফিরিয়ে আনার পর প্রাণহরি নাম-করা জ্যোতিষীদের ডেকে আনলেন। তাঁরা জন্মকুণ্ডলী বিচার করে বললেন—পঁচিশ বছর বয়স হওয়ার পর থেকে এই শিশুর জীবনে সাধক পুরুষের সব লক্ষণ প্রকাশ পাবে। এই আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী শুনে বাবা-মা উভয়েই পুলকিত হলেন।

ছেলের বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ব্যান্ডেল চার্চ স্কুলে ভরতি করে দেওয়া হল। ইংরেজী শিক্ষার দিকে ছেলের রুচি নেই দেখে বাবা তাকে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বালিতে পণ্ডিত যাদবচন্দ্র স্মৃতিরত্নের টোলে ভরতি করলেন। শুধু সংস্কৃত শিখেই প্রবোধচন্দ্রের মন তৃপ্ত হল না। গুরুর আশ্রয় পাবার জন্যে মন তার ব্যাকুল হল। অবশেষে দিকসুই গ্রামের যোগসিদ্ধ পুরুষ দাশরথি ঠাকুরের সন্ধান পেয়ে তার মনের বাসনা কিছুটা পরিতৃপ্ত হল। সেখানে তার যোগসাধনা-শিক্ষা চলতে লাগল।

এই সময়ে পিতার মৃত্যু প্রবোধচন্দ্রের জীবনে এনে দিল প্রবল আলোড়ন। দীক্ষালাভের জন্যে সে আকুল হল। অবশেষে শিক্ষাগুরুই হলেন তার দীক্ষাগুরু।

গুরুর ইচ্ছা অনুসারেই প্রবোধচন্দ্র সংসারধর্মে প্রবেশ করলেন। যখন তাঁর বিবাহ হল তখন তাঁর বয়স পঁচিশ বছর। ওদিকে তিনি উপনিষদের আদ্য, মধ্য, পুরাণতীর্থ ও পুরাণরত্ন পরীক্ষাগুলিতে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে তৈরি হতে লাগলেন। জপতপও সেই সঙ্গে চলতে লাগল।

একদিন গভীর রাত্রিতে তিনি চুঁচুড়ার বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর ঘরে বসে ধ্যান করছেন, এমন সময় অন্তরে তাঁর শিবমূর্তির আবির্ভাব হল। প্রথমে প্রবোধচন্দ্র ভয় পেলেন। একটু পরেই সাহস করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'কে আপনি?' জবাব এল—'আমি তোমার গুরু।' প্রবোধচন্দ্র প্রাণপণ শক্তিতে প্রথমে ইষ্টমন্ত্র জপ শুরু করলেন। তারপর রামনাম, তারপর ওঙ্কারমন্ত্র। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর চোখের সামনে এক দিব্যজ্যোতি দেখতে পেলেন। মুহূর্তের মধ্যেই সম্বিৎ হারিয়ে তিনি পড়ে গেলেন। চেতনা ফিরে পাওয়ার পর তিনি গুরুর সামনে উপস্থিত হলেন। তখনও প্রবোধচন্দ্রের সারা শরীর কাঁপছে। অষ্টসাত্ত্বিক প্রেমবিকারের লক্ষণগুলি তাঁর শরীরে ফুটে উঠেছে।

গুরুদেব বুঝলেন, এক মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে প্রবোধচন্দ্র পৃথিবীতে এসেছেন। নিরন্তর নামগানের মধ্যে দিয়ে তিনি জীবের উদ্ধার করবেন। তাই অন্তরে তাঁর রামের ধ্যান—কণ্ঠে রাম নাম। গুরুদেব প্রবোধচন্দ্রের নতুন নামকরণ করলেন—সীতারাম দাস।

১৩৩৭ সনে সাধ্বী স্ত্রী মারা গেলেন। ঐ বছরেই সাইনোভাইটিস নামে এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন

সীতারাম। ডান পায়ে অস্ত্রোপচার করা হল। রামনাম করতে করতে অস্ত্রোপচারের সময়কার তীব্র যন্ত্রণাও হাসিমুখে সহ্য করলেন সীতারাম। রোগজর্জরিত দেহে শুয়ে শুয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন অধিকাংশ সময়। রামনাম করতেন সর্বদা। এই সময় ভিতরে এক-একসময় নাদ শুনতে পেতেন। সাধকদের অন্তরে জ্যোতিরূপ পরমাত্মার প্রকাশের পূর্বে বা ইষ্ট-দর্শনের সময় তাঁরা একরকম সূক্ষ্ম অলৌকিক ধ্বনি শুনতে পান—এই ধ্বনিকে বলা হয় নাদ। অ, উ, ম যে তিন অক্ষরে ওঙ্কারমন্ত্র গঠিত, সেই তিনটি অক্ষরের এক একটি নিয়ে নাদের অভ্যাস করতে হয়। এই নাদ শুনতে শুনতে সাধকের চিত্ত থেকে সব রকমের চিন্তা, সংস্কার ও ভেদজ্ঞান দূরে সরে যায়। নাদের শেষ পরিণাম হল ব্রহ্মলাভ। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় এই নাদ শুনতে শুনতে চেতনা হারিয়ে ফেলতেন সাধক সীতারাম। ভ্রূমধ্যে ঘটত জ্যোতির্বিন্দু-রূপ আত্মার প্রকাশ।

এই সময় কয়েক বৎসর তিনি গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, পুরীধাম প্রভৃতি তীর্থগুলি পর্যটন করে বেড়ালেন। ১৯৩০ সালে তিনি খণ্ড মৌন অভ্যাস করতে লাগলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তিনি মৌন অবলম্বন করে থাকেন।

ঐ বৎসর তিনি 'চোখের জলে মায়ের পূজা' নামে একটি বই লেখেন। গ্রন্থের বিষয়বস্তু—নারীর কর্তব্য ও উন্নতির উপায়। তিনি বলছেন—যথাকালে মেয়েদের বিবাহ দিতে হবে; বিবাহ-সংস্কারই স্ত্রীলোকের বৈদিক উপনয়ন সংস্কার। পতিসেবা তার গুরুকুলে বাস, গৃহকাজ তার সন্ধ্যায় ও প্রভাতে হোমস্বরূপ অগ্নি-পরিচর্যা। নারী বিশ্বজননী, তার মধ্যে মহাশক্তি সুপ্ত—আজ ভোগবিষ্ঠা-কুণ্ডের মধ্যে ডুবে গিয়ে সেই শক্তির কথা সে ভুলে গিয়েছে। এই শক্তিকে জাগাতে হলে আগে মনকে বশীভূত করতে হবে। এর সহজ উপায় হল যথাসম্ভব স্বল্পবাক্ হয়ে সংযত চিত্তে স্বামী-নাম জপ করা। জপ কর, অবিরাম। কাজ করতে করতে, বিশ্রামকালে বা শয়নকালে জপ কর।

ক্রমে ক্রমে পূজা, সন্ধ্যাহ্নিক, পাঠ প্রভৃতি কর্মগুলির অবসান হল। ধ্যানধারণা আর জপতপ নিয়ে মত্ত হয়ে রইলেন সীতারাম। সাধনার বলে তাঁর প্রাণ ওঙ্কারে প্রবিষ্ট হল। তাই পণ্ডিতগণ তাঁকে সম্মানিত করলেন 'ওঙ্কারনাথ' উপাধিতে।

১৩৪৪ সনে বৈশাখ মাসে সীতারাম গেলেন পুরীর জগন্নাথধামে। একদিন শেষ রাত্রিতে জগন্নাথদেব স্বয়ং প্রকট হয়ে তাঁকে দর্শন দিলেন। বললেন—'যাও, নাম প্রচার কর।'

সমস্ত ভারত পরিক্রমার পর সীতারাম বাংলায় ফিরে এলেন। প্রতিটি জেলায় ঘুরে ঘুরে করতে লাগলেন নাম প্রচার। দীক্ষা দিলেন অজস্র মানুষকে।

অনেক ভক্তশিষ্য ওঙ্কারনাথের অলৌকিক শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। ১৯৬১ সালে তাঁর এক শিষ্য অজিতকুমারের স্ত্রী স্নানের ঘরে পড়ে গিয়ে আহত হন। অত্যধিক রক্তপাত হওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে মেডিকেল কলেজে এনে রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু রোগীর রক্তধারণ করবার ক্ষমতা নেই। তাই অক্সিজেন দেওয়া হতে লাগল। জীবনের কোন আশাই আর নেই। তখন হাসপাতালের বারান্দায় বসে অজিতকুমার আকুল হয়ে গুরুদেবকে স্মরণ করতে লাগলেন। সত্য সত্যই রাত্রির মধ্যেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠলেন।

নামই অমৃত। যদি নাম জপ করে সিদ্ধিলাভ করা যায় তা হলে কি শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন নেই? এর উত্তরে সীতারামদাসের সুস্পষ্ট নির্দেশ হল নামের প্রতি মানুষের অনুরাগ স্থায়ী করে তুলতে হলে শাস্ত্রপাঠ অপরিহার্য। কেমন করে নাম করতে হয়, নামীর স্বরূপ, নামীর লীলা—এই সব শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শাস্ত্র না পড়লে নাম-অনুরাগ জন্মাবে কেন? মৃত্যুকালে অজামিল পুত্রকে 'নারায়ণ নারায়ণ' বলে ডেকে পরমগতি লাভ করেছিলেন, একথা পুরাণ না পড়লে আমরা জানতে পারতাম না। সহজ উদাহরণ দিয়ে সীতারামদাস বলেছেন—একটি কলসিতে গঙ্গাজল ভরে কলসিটা গঙ্গায় ভাসিয়ে দে। কলসির জলে আর গঙ্গার জলে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য না থাকলেও কলসির ব্যবধানের জন্যেই দুই জল মিশে এক হতে পারছে না। কলসিটা ভেঙে গেলেই দুটি জল এক হয়ে যায়। তেমনি ভগবৎ-সাগরে ডুবে থেকেও আমাদের দেহঘটের জন্যেই পৃথক হয়ে আছি। ১৯৮২ সালে পরমসাধক সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী ইহলীলা সংবরণ করেন।

মা আনন্দময়ী



ভূমিষ্ঠ হবার পর শিশুরা কাঁদে। কিন্তু নির্মলা-সুন্দরীর কান্না কেউ শুনতে পায়নি। অনেকে তাই বলেছিল -এ কেমন সৃষ্টিছাড়া মেয়ে?

সত্যি সৃষ্টিছাড়া মেয়ে নির্মলাসুন্দরী। সাধারণ মেয়েদের থেকে একেবারে আলাদা। ১৩০৩ সনের ১৯শে বৈশাখ (১৮৯৬ সাল) ত্রিপুরা জেলার খেওরা গ্রামে তার জন্ম। পিতা সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য, মাতা মোক্ষদাসুন্দরী। শিশুকাল থেকেই নির্মলার মনে সব সময় সমাধির মতো একটা ভাব জেগে থাকত। কীর্তন গান শুনলে ভাবের ঘোরে তার শরীরে নানারকম অলৌকিক অবস্থা প্রকাশ পেত।

অল্পবয়সেই বিবাহ হল রমণীমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে। কিন্তু সংসার করবার জন্যে নির্মলাসুন্দরীর জন্ম হয়নি। তাই পরবর্তী জীবনে রমণীমোহনকেও তিনি টেনে এনেছিলেন আধ্যাত্মিক জগতে। ইনি বাবা ভোলানাথ নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

নির্মলাসুন্দরীর বধূজীবনের শিক্ষানবিসী চলতে থাকে তাঁর ভাসুর রেবতীমোহনের অন্তঃপুরে। ঢাকা জগন্নাথগঞ্জ স্টেশনসংলগ্ন ছোট্ট একটি রেলওয়ে কোয়ার্টারে তিনি থাকতেন। সংসারের কোন কাজে নির্মলাসুন্দরীর আলস্য ছিল না। কিন্তু সবকিছুর মাঝখানেও সদাসর্বদা জেগে থাকত অন্য জগতের আর একটি ভাব।

ভাসুরের মৃত্যুর পর স্বামীর কর্মস্থল অষ্টগ্রামে যখন তিনি নিজের সংসারে স্থায়িভাবে অধিষ্ঠিতা হলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠার বছর। ১৩২৪ সনে সেটেলমেন্টের কাজে বদলি হয়ে রমণীমোহন বাজিতপুরে এলেন। নির্মলাসুন্দরীর দেহে যে অলৌকিক ভাবগুলির ক্রিয়া দেখা দিত সেগুলি তখন আরও ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেতে লাগল। লোকের মুখে মুখে মায়ের কথাও কিছু কিছু ছড়িয়ে পড়ল। তখন অনেকের মনে বিশ্বাস জন্মাল যে ব্যাপারটা ভৌতিক ছাড়া আর কিছু নয়।

নির্মলাসুন্দরীর নিজের মুখের কথা থেকে জানা যায় যে সেই বছরের শ্রাবণ মাসে ঝুলন পূর্ণিমার দিন অলৌকিকভাবে আপনা আপনি তাঁর দীক্ষা হয়েছিল। কিন্তু কিসের সেই দীক্ষা তা কারও জানবার উপায় নেই।

কয়েকমাস অবিরত ধারায় নাম জপ চলতে লাগল। মাঝে মাঝে তাঁর কণ্ঠ থেকে অনর্গল উৎসারিত হতে লাগল দেবভাষায় রচিত স্তব-স্তোত্র। কয়েকমাস পরেই নির্মলাসুন্দরী হঠাৎ একদিন মৌনী হয়ে গেলেন। দীর্ঘ তিন বৎসর ধরে চলল এই একটানা স্বেচ্ছাকৃত মৌন। আহারের পরিমাণ কমতে কমতে প্রায় অনাহারের পর্যায়ে এসে দাঁড়াল।

বাজিতপুর বাসের মেয়াদ শেষ হল ১৩৩০ সনের শেষভাগে। এর পর তাঁরা এলেন ঢাকার শাহবাগে। কিছুকাল আগে নির্মলাসুন্দরীর কাছেই দীক্ষা নিয়ে

রমণীমোহন বাবা ভোলানাথরূপে ধর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। শাহবাগের প্রকাণ্ড বাগানের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে ভোলানাথ সেখানেই বাস করতে লাগলেন। এখানেই নির্মলাসুন্দরীর মধ্যে শ্রীমায়ের আসল স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হল। নির্মলাসুন্দরী প্রতিষ্ঠিত হলেন 'আনন্দময়ী মা' রূপে। মাকে কেন্দ্র করে ঢাকার শাহবাগে প্রথম মাতৃমণ্ডলী গড়ে উঠল। মা আনন্দময়ীকে উপর থেকে দেখে মনে হয় সৌম্য স্নিগ্ধ বিনম্র এক সাধারণ কুলবধূ। কিন্তু কাছে গেলেই দেখা যায় উচ্চতর সাধনলব্ধ দিব্যভাবের এক অলৌকিক বিভূতি ঝরে পড়ছে সর্বাঙ্গ হতে। যে দেখে, এক গভীর স্বতঃস্ফূর্ত মাতৃভাবে ভরে যায় তার অন্তর। ইনি আমার মা, সারাজগতের মা। জগন্মাতা যেন অসংখ্য জীবের মুক্তির জন্যে দেহধারণ করেছেন পাপতাপ-জর্জরিত এই সংসারে। মায়ের হাসির দিব্য ছটায় জগৎ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে যত অশান্তি আর পাপের গভীর অন্ধকার। মার মুক্ত কেশপাশ যেন অখণ্ড মুক্তির প্রতীক। মা ভববন্ধনের অষ্টপাশ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছেন বলেই এক জগদ্ব্যাপী সত্তায় ছড়িয়ে পড়তে পারেন সমস্ত জীবের হৃদয়ে।

শ্রীমায়ের লীলা-বিস্তারের অলৌকিক কাহিনীর আভাস দিতে হলে প্রথমেই বলতে হয় সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের কথা। ভাবাবেশে মা যখন ঐ স্থানটির উল্লেখ করেন, তখন কোথায় এ মন্দির, কেমন এ মন্দির সে কথাও কেউ জানত না। সেই মন্দিরের সন্ধান মিলল অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে। দেখা গেল বনজঙ্গলের মধ্যে পূর্বনির্দিষ্ট মন্দিরটি যেমনটি মা দেখেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই অবস্থিত আছে। পরে সাতদিন সাতরাত্রি মা সেই মন্দিরে অবস্থান করলেন। ১৩৩২ সনের ফাল্গুন মাসে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের উত্তরদিকে মায়ের আদেশে ভক্তদের চেষ্টায় সাতদিনের মধ্যে একটি ঘর উঠল এবং মহাসমারোহে বাসন্তীপূজার অনুষ্ঠান হল। এইভাবেই মায়ের নাম ছড়িয়ে পড়ল পূর্ববঙ্গের ঘরে ঘরে।

পরের বছর বৈশাখ মাসে মা গেলেন বৈদ্যনাথ। তারপর কত জায়গায় মায়ের কত আশ্রম গড়ে উঠল, কিন্তু মা কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারলেন না।

পুরীতে অবস্থানকালে একজন ফরাসী ডাক্তার ঘণ্টার পর ঘণ্টা মায়ের কথা শুনেছিলেন। তিনি বাংলার বিন্দুবিসর্গ জানেন না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল—'মায়ের কথা কিছু বুঝলেন?' ডাক্তার গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন—'না, বুঝলাম না, কিন্তু তাঁকে চিনলাম।'

জলে পূর্ণ হলে কলসির শব্দ থাকে না। সেই পূর্ণতা অর্জনের জন্যে তিনি ভক্তদের মৌনব্রত অবলম্বন করতে আদেশ দেন। বলেন—'যতটা নিজেকে খালি করে দিতে পারবে পরমার্থের দিকে, তিনি ততটাই তোমাকে ভরতি করে দেবেন।'

মায়ের কথা—নামজপে তন্ময়তা আনতে পারলেই রূপসাগরে ডুব দেওয়া যায়। নাম ও নামীর মধ্যে ভেদ নেই। তাই নাম করতে করতে দেখবি বাইরের জগতের সব ভাব লুপ্ত হয়ে যায়। তখন নামের যে স্বপ্রকাশ শক্তি তা আপনা থেকেই ফুটে বেরোয়। আরও বলেছেন—সব ধর্মই এক—সব ধারাই এক। একজনকেই তো সবাই চাইছে, সবাই ডাকছে; তাহলে কীর্তনে আর নমাজে প্রভেদ কোথায়? একবার ঢাকার, জয়নুদ্দি হোসেনকে শাহবাগে নিয়ে এসেছেন মার ভক্তরা। মৌলবীসাহেবকে সঙ্গে করে মা হাঁটতে হাঁটতে উপস্থিত হলেন শাহবাগের প্রান্তে এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান ফকিরের কবর-ভূমিতে। অনেক লোক সেখানে নমাজ পড়ছেন; মাও নমাজের নিয়ম অনুযায়ী ওঠা-বসা করতে লাগলেন। নমাজের মন্ত্রগুলিও মা ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে লাগলেন। মন্দিরে ফিরে আসার পর মৌলবীসাহেবও হাততালি সহ ঘুরে ঘুরে কীর্তন করতে লাগলেন।

আর একদিনের ঘটনা। এক মুসলিম বেগম মাকে কবরে নমাজ পড়বার জন্যে অনুরোধ করলেন। মার নমাজ পড়া দেখে শিক্ষিতা মুসলমান মহিলাটি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। আর একটি মুসলিম পরিবারে মা আনন্দময়ী হরিনাম প্রবর্তন করেছিলেন। সেই পরিবারের লোকেরা হরিনাম করতে করতে বিভোর হয়ে যেতেন।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই মহাধর্ম নিজের জীবনে প্রতিটি কথায় ও কাজে রূপায়িত করেছেন আনন্দময়ী মা। ১৯৭৮ সালে এই মহাসাধিকা মানবলীলা সংবরণ করেন।

স্বামী প্রণবানন্দ



বাংলা দেশে একটি যুগ ছিল—সেটি স্বদেশী যুগ। সেই যুগের একজন পরিচালক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন বিনোদ ব্রহ্মচারী।

বিনোদ ব্রহ্মচারীর জন্ম হয় ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার বাজিতপুর গ্রামে। জন্ম তারিখ বাংলা ১৩০২ সনের ১৬ই মাঘ, ইংরাজী ১৮৯৬ সালের ২৯শে জানুয়ারি। পিতা বিষ্ণুচরণ ভূঁইঞা বাবু সূর্যকান্ত রায়ের অধীনে বাজিতপুরের নায়েবের পদে কাজ করতেন।

বঙ্গদেশে যখন বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তখন বিনোদ ব্রহ্মচারীর বয়স মাত্র নয়-দশ বছর। সেই সময় বয়কট অর্থাৎ বাঙালীরা বিলাতে তৈরি কোন জিনিস ব্যবহার করবে না এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ চলতে থাকে। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে তাঁত চালানো, স্বদেশী দ্রব্য প্রস্তুত ইত্যাদি নানারকম কাজের সূত্রপাত হয়। সেই সময়ে বিনোদ ব্রহ্মচারী সমবয়স্কদের সঙ্গে একটি 'তরুণ-সঙ্ঘ' গড়ে তুলে তরুণদের নৈতিক চরিত্র গঠনে ও দুঃস্থ মানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

ছোটবেলা থেকেই তাঁর শিবভক্তি ছিল। সেই সময় থেকে তিনি প্রণব-সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ওঁ-কারের উপর ত্রাটক অভ্যাস করতে আরম্ভ করেন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অধ্যাত্মসাধনা কঠোর থেকে কঠোরতর রূপ পরিগ্রহ করে। বাল্যে, কৈশোরে ও যৌবনে যে আদর্শ ও ধর্মপ্রবণতা নিয়ে তিনি ব্রহ্মচারীরূপে পল্লীর শ্মশানে দিনের পর দিন নির্ভীকভাবে তপস্যা করেছিলেন, সেই দৃঢ়তা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় স্মরণ করলে স্তম্ভিত হতে হয়।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ব্রহ্মচারী গোরক্ষপুর মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ও নাথ সম্প্রদায়ের নেতা অলৌকিক যোগৈশ্বর্য-সম্পন্ন মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথজীর নিকট দীক্ষিত হন। তখনই তাঁর নাম হয় স্বামী প্রণবানন্দ। দীক্ষাদানের সময় নাথজী ব্রহ্মচারীকে প্রথমে বলেন, 'তোমার সাধনা তো হয়েই গেছে। দীক্ষার কী প্রয়োজন?'

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গম্ভীরনাথজী লোকগুরু রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। যোগিজীবনের এক করুণাঘন অধ্যায় শুরু হয় এ সময় থেকে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুমুক্ষু নরনারী ও সাধুর দল বাবাজীর নিকট আসতে থাকেন। প্রথম দিকে দীক্ষাদানে তাঁর বড় একটা উৎসাহ ছিল না। বলতেন, "ক্যা, মায় এক পল্টন বনায়েঙ্গে?" ১৯০৬ সাল থেকে স্থায়িভাবে তিনি গোরক্ষপুর মঠে এসে বাস করতে থাকেন। ব্রহ্মচারী বিনোদ তাঁর কৃপালাভে ধন্য হলেন। শিষ্যদের কাছে যোগিবর গম্ভীরনাথজীর প্রধান উপদেশ ছিল: ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখো। আর মায়াচ্ছন্ন সংসার সম্বন্ধে বিচার করো।'

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবী যুবকদের চরিত্রগঠনে প্রণবানন্দ যথেষ্ট সহায়তা করতেন।

তাঁর এই যোগাযোগের ফলে একবার তিনি কারারুদ্ধ হন, পরে মুক্তি পান। প্রণবানন্দজী ছিলেন বীর সাধক। যেমন তাঁর বজ্রদৃঢ় শরীর তেমনি দুর্জয় সংকল্প।

১৯২১ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে খুলনা জেলাভুক্ত সুন্দরবন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অসহায় আবালবৃদ্ধবনিতাদের সেবাকার্যের উদ্দেশ্যে স্বামী প্রণবানন্দ তাঁর অনুগামী সহচর সেবাব্রতীদের সাহায্যে এক অস্থায়ী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৩ সালে আশ্রমের নামকরণ হয় 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ'।

স্বামী প্রণবানন্দের অমরকীর্তি ও অসাধারণ কার্যাবলীর মধ্যে তীর্থসংস্কার কার্য অন্যতম। বাঙালী তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ভারতের সমুদয় তীর্থযাত্রী অপেক্ষা অনেক বেশি। সুদূর দুর্গম কৈলাস, মানস সরোবর, বদ্রি ও কেদারনাথ, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, মাদুরা, কাঞ্চি, কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত প্রতি বৎসর বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন উৎসবে বিভিন্ন ক্ষণে বাঙালী তীর্থযাত্রী পুরুষ ও নারী তীর্থক্ষেত্র পর্যটন করে থাকেন। কিন্তু এই সব নিরীহ যাত্রীরা যেভাবে পাণ্ডাদের হাতে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত হন ও যেভাবে নিজেদের মর্যাদাহানি সহ্য করে আসছেন তার বিরুদ্ধে কেউ একটি কথাও বলতে সাহসী হননি। এমনি মোহাচ্ছন্ন, দুর্বল, আত্মরক্ষায় অসমর্থ এই বাঙালী যে চোখের সামনে অত্যাচার, নিপীড়ন সইতে দেখেও তার প্রতিকারের জন্যে কেউ অগ্রসর হননি; হয়েছিলেন এক দরিদ্র সন্ন্যাসী, যাঁর সম্বল ছিল না, অর্থ ছিল না, উপযুক্ত সহযোগী কেউ ছিল না।

প্রথমে এই প্রচেষ্টায় বহু বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি হয়েছিল। স্বামী প্রণবানন্দ যখন তীর্থস্থানগুলিতে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেন তখন স্বার্থহানির ভয়ে পাণ্ডারা নানাভাবে বাধা দিতে লাগল। বহু বাধাবিঘ্ন সহ্য করেও আচার্য প্রণবানন্দজী গয়া সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়ে গয়ার তীর্থযাত্রীদের ওপর গয়ালী পাণ্ডাদের অত্যাচার চরমে উঠেছিল। সে সময়ে জুন মাসে কতকগুলি যাত্রীর উপর অমানুষিক অত্যাচার হয় এবং একজন মহিলা যাত্রী নিহত পর্যন্ত হয়েছিলেন।

রাজনৈতিক ভাবে, সামাজিক ভাবে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা কত ভাবে বিপদে ফেলতে চেষ্টা করেছিল; কিন্তু অসমসাহসী প্রণবানন্দজী দুঃখে কাতর হননি, বাধাতে টলেননি। কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি নানাস্থানে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন।

এই সেবাশ্রমের মূল উদ্দেশ্য শুধু যাত্রীদের রক্ষণাবেক্ষণ নয়, পরন্তু তীর্থের সংস্কার—তীর্থস্থানের বহু শতাব্দব্যাপী অনাচার, কদাচার, ব্যভিচারকে দূর করে তীর্থস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করাই ছিল সেবাশ্রমের দেশব্যাপী কর্মকাণ্ডের প্রধান লক্ষ্য।

প্রণবানন্দ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে স্থির করলেন চারণদল গঠন করবেন। শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে শোভাযাত্রা বার করে চারণদল প্রাণমাতানো গান গেয়ে জনসাধারণের কাছে তাঁদের ভাব, আদর্শ ও কর্মপন্থা বিবৃত করবেন। এই চারণদল হারমোনিয়াম, খোল, করতাল সহকারে দেশ ও জাতির গৌরবসূচক গান করতে করতে রাজপথ দিয়ে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। এদের দ্বারাই সমগ্র দেশে জনগণের মধ্যে তাঁর মহৎ আদর্শ, নীতি, সমাজসেবা, শিক্ষা-সংস্কার তীর্থ-সংস্কার ও জাতিগঠনমূলক কার্যাবলী প্রচারিত হয়েছিল।

প্রণবানন্দজী বলেছেন 'এ জগতে সবল যে, সেই দুর্বলের উপর অত্যাচার করে। ...শক্তির জয়, প্রবলের প্রভাব ও দুর্বলের পরাভব সর্বত্র।'

রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যেও এর প্রমাণ প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যে দেখতে পাই। এজন্য তিনি সংঘ-সন্ন্যাসী বিদ্যার্থী, শহর ও পল্লীবাসী তরুণদের সকলকেই নিয়মিতভাবে লাঠিচালনা ও ব্যায়াম দ্বারা দেহ সুগঠিত করবার জন্যে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করতেন। ভারতবর্ষের যে প্রান্তে যে কোন মানুষ যখনই দুর্ভিক্ষ বা বন্যায় পীড়িত হয়েছে অমনি তাদের পরিত্রাতার মহান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে ভারত সেবাশ্রমের নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসিবৃন্দ। আর্তত্রাণের কার্যসূচীতে সেবাশ্রম সঙ্ঘের অবদান একেবারে প্রথম সারিতে।

১৯৪১ সালে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে স্বামিজী অমরধামে চলে গিয়েছেন। তাঁর মহান কীর্তি অবিনশ্বর 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে'র মধ্যে দিয়ে চিরকাল তিনি বেঁচে থাকবেন আর্ত জনসাধারণের হৃদয়মন্দিরে।

মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী



প্রখ্যাত সাধক বালানন্দ ব্রহ্মচারী স্নিগ্ধ-হাস্যজ্যোতিঃ মূর্তিতে তাকিয়ে আছেন দিব্য-কান্তি শিশুর দিকে; শিশুও তেমনি নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে সন্ন্যাসীর প্রতি। উপস্থিত ভক্তজন সবাই বিস্মিত হয়ে দেখছে এই আশ্চর্য লীলা। অনেকক্ষণ দেখার পর গুরুদেব শিশুর মাকে স্মিতহাস্যে বললেন, 'মায়ী, তেরা লেড়কা বহুৎ সজ্জন হোগা।' গুরুদেব শুধু সাদাসিধা আশীর্বাদ করলেন, তা নয়। পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। মার মন তৃপ্তিতে ভরে গেল। মায়ের জীবনে এর থেকে আনন্দের কথা আর কী থাকতে পারে।

অপরূপ এক দেবশিশু! আদি বাড়ি নদীয়া জেলার শিবনিবাস হলেও তার জন্ম মেদিনীপুরে। পিতা হেমচন্দ্র ছিলেন সরকারী ইনস্পেক্টর।

বিখ্যাত জ্যোতিষী আনিয়ে শিশুর ভবিষ্যৎ গণনা করানো হল। জ্যোতিষী বললেন এই শিশু কালে একজন বিখ্যাত লোক হবে; বহু লোক তার কাছে আসবে। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল।

বড় হয়ে কলকাতায় পড়াশোনা করতেন মনোমোহন। তবু তাঁর মনে হত, এ বিদ্যা প্রকৃত বিদ্যা নয়। পরম অমৃতময় পরমার্থকে লাভ করাই হল জীবনের সার্থকতা। একদিন মনোমোহন এক হরিসভায় যোগদান করে প্রাণ-ভরে নামসংকীর্তন শুরু করে দেন। অলৌকিক ভক্তি-ভাবে বিভোর মনোমোহন যখন নাচতে নাচতে কীর্তন করতেন হরিসভায় তখন তাঁকে দেখে দর্শকদের মনে হত, এ যেন নতুন গৌরাঙ্গ।

আই. এস-সি. পাস করে বি. এস-সি.তে ভরতি হলেন মনোমোহন। কিন্তু মন তাঁর উদাস। কলেজের হোস্টেলে বড়লোকের ছেলেদের ভিড়। তাদের সঙ্গ তাঁর ভাল লাগে না। কুলগুরু বালানন্দ ব্রহ্মচারীর কথা বার বার তাঁর মনে হয়। তিনি যেন অলক্ষ্যে তাঁকে আকর্ষণ করেন। একদিন মনের সঙ্গে সংসারের শেষ বন্ধনটুকু ছিন্ন হয়ে যায়। সমস্ত জিনিসপত্র, টাকাকড়ি হোস্টেলে রেখে শুধু গাড়িভাড়া সঙ্গে নিয়ে দেওঘরে চলে যান। উপস্থিত হন যোগিশ্রেষ্ঠ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর চরণপ্রান্তে। খবর পেয়েই বাবা-মা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু মনোমোহন ঘরে ফিরবেন না।

পিতামাতার সম্মতি নিয়েই পুত্র বালানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর নতুন নামকরণ হয় মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী। প্রখ্যাত গুরুর সার্থক শিষ্য।

মোহনানন্দের সাধনার মাধ্যম হল সংগীত। যোগ নয়, যজ্ঞ নয়, কেবল গান আর গান। যেমন কাব্যসৌন্দর্য-মণ্ডিত গানের বাণী, তেমনি সুললিত তার সুর। গানের ভাব ও ভাষা কেমন হওয়া উচিত, তা প্রকাশ করেছেন তিনি একটি কবিতায়:

ভাব যেখানে গভীর সেথা ভাষায় থাকে প্রাণ
প্রেমসেতুতে বাঁধা আছে দুটির ব্যবধান।
অরূপ যিনি লুকিয়ে থাকেন আপন গুঞ্জনে
ভাবুক তাঁরে বাইরে আনেন ভাবের লিখনে।
যাত্রাপথে জীবন-মরণ যমজ দুটি ভায়
অসীম হতে জন্ম লভি অসীম পানে ধায়।

একদিন গুরু বালানন্দ বলে উঠলেন, "হামারা মোহন তো আউর বালক নেহি হ্যায়; আভি উনকা মোচ্ বাহার হুয়া!" বালানন্দের মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। গুরু এবার কৈলাসবাস করবেন; তাই আশ্রমের ভার ন্যস্ত করবেন মোহনানন্দের হাতে।

কর্মসাধনার মূর্ত প্রতীক শ্রীমোহনানন্দ। ভোর চারটায় শয্যাত্যাগের পর নিজের হাতে ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে, পূজার বাসন মেজে আশ্রমের পুকুরে স্নান, পরে জপতপ ও গীতাচণ্ডী-পাঠ। সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত বালেশ্বরী মন্দিরে শিবপূজা, নারায়ণপূজা। এর পর কুকারে নিজের রান্না চাপিয়ে দিয়ে ভক্তদের সঙ্গে কীর্তনে যোগদান। বেলা বারোটা পর্যন্ত চলে কীর্তন। তারপর আহারাদি শেষে নিজের হাতে থালা-বাটি-ঘড়া মাজেন। দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত অফিসের বৈষয়িক কাজ দেখাশোনা। সন্ধ্যায় বেদপাঠ ও হরিমণ্ডপে সংকীর্তন। রাত্রি বারোটায় শয়ন ও বিশ্রাম।

দেওঘর, করণীবাদের আশ্রমে মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর শুভ জন্মতিথিতে তাঁর ভক্তগণ অভিনন্দন প্রদান করবার সময় বলেছিলেন—মানুষকেই লোকে অভিনন্দন দিয়ে থাকে—আর দেবতাকে লোকে পূজা করে। কিন্তু আমরা যাঁকে অভিনন্দন দিচ্ছি, তিনি নরাকারে দেবতা, নরনারায়ণ। তিনি আমাদের মতো ভজনসাধনবিহীন, দুঃখতাপক্লিষ্ট নরনারীকে উদ্ধার করবার জন্যে মর্ত্য-ধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

ভক্তগণ তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন—

সারা বিশ্বের সাধনা ক্ষেত্রে তুমি যে অতুলনীয়,
পাপীতাপীদের টেনে নাও কাছে ভাবো সবাকার প্রিয়।
কীর্তনীয়া চূড়ামণি,
তব কীর্তনে, বিশ্বের প্রাণে, জেগেছে প্রেমের ধ্বনি।
নমো নারায়ণ শিবায় গুরবে
মধুমাখা সুর মধুমাখা রবে
নাম গেয়ে গেয়ে চল ধেয়ে ধেয়ে তুমি হে গৌরমণি।

একদিন এক দর্শক তাঁর পরিচিত এক ভক্তকে বললেন 'তোমার ঠাকুর খুব ধনী লোক, রেশমী পশমী পোশাক পরেন, হীরের আংটি পরেন এসব কিন্তু আমার কাছে ভাল মনে হয় না।'

বন্ধুভক্তটি বললেন 'ভক্তরা বহুমূল্যে মাণিক্যখচিত পোশাক পরিচ্ছদে ও হীরকশোভিত স্বর্ণালংকারে ভূষিত করে, সর্বত্যাগী দেবাদিদেব মহাদেবের রাজরাজেশ্বর মূর্তি দর্শনে কৃতার্থ হন, তাই বলে আমরা কি ধারণা করে নেব যে মহাদেব ঠাকুর ঐ পরিচ্ছদ ও অলংকারের প্রত্যাশী? তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তিনি রাজবেশ পরেন, ক্ষণপরেই সে বেশ পরিত্যক্ত হয়। আমাদের ধর্মবীর দানবীর গুরুমহারাজও যতক্ষণ পর্যন্ত না ভক্তনিবেদিত দ্রব্যগুলি যথোপযুক্ত সংপাত্রে দান করতে পারেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পান না—দান করে তিনি শান্তি পান। তুমি শালগ্রাম শিলাকে পাথরের নুড়ি বলে ভেবে নিলে, কিন্তু সেই পবিত্র শিলার মধ্যে যে অন্তঃসলিলা প্রেমফল্গু বইছে, তা কি বহিদৃষ্টিতে দেখা যায়?'

বৈদনাথের বিদ্যাপীঠ শ্রীমোহনানন্দের এক সুমহান কীর্তি—শিক্ষা ও দীক্ষার অনুপম স্থান।

ভক্তি আর প্রেমই হচ্ছে মোহনানন্দ স্বামীর সাধনার মূলমন্ত্র। যিনি উপনিষদের ব্রহ্ম, যিনি পরমপিতা, যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, বিকাশ ও লয়ের কারণ, তিনিই আবার শ্রীমোহনানন্দের পরম সখা। তাঁর সাধনা হল—কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে চলা। সাধনভজনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাজ করে যেতে হবে কৃষ্ণপদে মতি রেখে। কীর্তনই পরম যোগসাধনা। চিরচঞ্চল বাতাসের মতো, ধাবমান জলপ্রবাহের ন্যায় শ্রীমোহনানন্দের মন এক মহাসত্যের আবিষ্কারের সন্ধানে ছুটে চলেছে অসীমের পানে। সে চলার বিরাম নেই, নেই কোন ক্লান্তি।

সমাপ্ত